সূচীপত্র

(দি ৩৪৪৫৭)

সূচীপত্র

সব রকমেই ভালো
ফিলিপ্‌স ল্যুমিনায়র
ফিলিপ্‌সের প্রতিটি ল্যুমিনায়র ডিজাইন করা হয়
অসংখ্য সুবিধের কথা মনে রেখে। সৌন্দর্য্য খুবই বড়
জিনিষ মানি, তবে তার চেয়ে বড় হল সাশ্রয়, দক্ষ
আলো দেবার ক্ষমতা আর শ্রেষ্ঠ গুণমান! সবচেয়ে সেরা
বাছাই করা কাঁচামালের ওপর প্রয়োগ করা হয়
কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত নির্মাণ পদ্ধতি। কর্মক্ষেত্রের বাস্তব
পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে, সেখানে প্রত্যেক ব্যাচের একটি
করে নমুনার ওপর প্রচণ্ড পরীক্ষা চালানো হয়।
যে ধরণের আলোই আপনি লাগাতে চান না কেন,
ফিলিপ্‌সের কাছে পাবেন প্রয়োজনের উপযুক্ত
ল্যুমিনায়র···সঠিক আলো ও সঠিক
আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম!
ফিলিপ্‌স—ল্যাম্প ও আলোর জগতে অগ্রণী
PHILIPS
ফিলিপ্‌স
ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড
PHL 9366
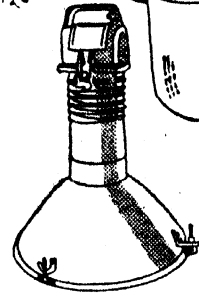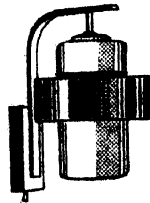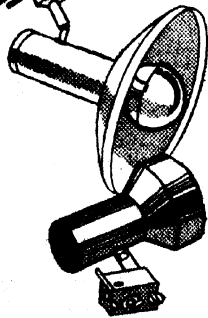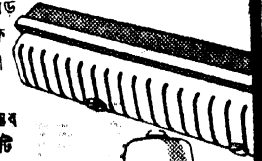
সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বসন্ত পণ্ডিত

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "নির্জন আকাশ ও সমতলভূমি" (জলরঙ ১২"×৭")। এক অর্থে এই মহারাষ্ট্রীয় শিল্পী কলকাতার নির্জনতম চিত্রকর। নিসর্গ-প্রীতি তাঁকে ভারতের প্রান্তরে পর্বতে নিয়ে গেছে। সবুজ, গাঢ় খয়েরী আর নীল মিলিয়ে নদী, জল, আকাশ ও ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যাকে ধরেছেন। দূরে একটা গাছ, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। সব মিলিয়ে একাকিত্ব আর হয়তো একটা ঔদাস্য। তুলি চলেছে অনুভূমিকভাবে। গোপাল ঘোষের পর প্রকৃতিকে বোধহয় এমন ক'রে আর কেউ ভালবাসেনি।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৫৭ সংখ্যা
শনিবার ২৬ আষাঢ় ১৩৮৩

ঐতিহাসিক গুপ্তধন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে প্রসঙ্গত একটি করুণ স্মৃতিকথা শুনিয়েছেন। আচার্যের পিতা একবার কঠোর অর্থাভাবের কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পৈতৃক দালানের একটি থাম ভেঙ্গে দেখবার ইচ্ছা করেছিলেন। পিতার ধারণা ছিল, ওই থামের ভিতরে গুপ্তধন আছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দালানের থাম ভেঙে গুপ্তধন আবিষ্কার করবার চেষ্টা আর করতে হয়নি। ইচ্ছাটা ইচ্ছা হয়েই থেকে গিয়েছিল। যা-ই হোক আচার্যের স্মৃতিকথার মধ্যে গুপ্তধনের সম্পর্কে ব্যক্তির যে মোহময় বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশ হয়েছে, সেটা ছলনা হিসাবেও বড়ই মোহময়। গুপ্তধনের সন্ধানে বহুজনের সারা জীবনের সময় একাগ্র ব্যস্ততার ও প্রয়াসের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা তাঁদের আশা নিরস্ত করতে পারেনি। বিস্ময়ের বিষয় গুপ্তধনের সন্ধানের জন্য পরিকল্পিত চেষ্টা ও অধ্যবসায় সাধারণত ব্যর্থ হলেও এমন কিছু প্রমাণিত হয় না যে, গুপ্তধন সত্যই একটা অলীক অলৌকিক অথবা কাল্পনিক বস্তু। গুপ্তধন আছে, গুপ্তধন পাওয়া যায়। এবং ঘটনার শত দৃষ্টান্ত আছে যাতে দেখা যায় যে, ব্যক্তি তার বিনা ইচ্ছায় ও চেষ্টায় আকস্মিক সৌভাগ্যের উপহারের মতো সহসা গুপ্তধন পেয়ে গিয়েছেন।

জয়পুরের জয়গড় দুর্গের ভিতরে একটি স্থানে গুপ্তধন সঞ্চিত আছে বলে ধারণা করা হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গুপ্তধন বের করবার চেষ্টা ও কাজ শুরু হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, এক্ষেত্রে গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারও প্রচলিত বিশ্বাসের ভাগী হয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখার্জী বলেছেন: তবে একথা জোর করে বলা যায় না যে, এই স্থানে গুপ্তধন সমাহিত হয়ে আছেই আছে। সংবাদে প্রকাশ, একটি পুরনো দলিলের লেখার অর্থ ও নির্দেশ গ্রাহ্য করে ধারণা করা হয়েছে যে, জয়গড় দুর্গের ভিতরে ওই স্থানে গুপ্তধন আছে। কাহিনী এই যে, বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের দ্বারা বহু রাজ্যজয়ের অবদান হিসাবে বহু ধনরত্ন সংগৃহীত হয়ে জয়গড় দুর্গের গোপন নিভৃতে প্রোথিত করে রাখা হয়েছিল। এই কাহিনীর সঙ্গে আরও অজস্র কাহিনী মিশে জয়গড় দুর্গের গুপ্তধনকে একটি লোভনীয় রহস্যের ঐশ্বর্যে পরিণত করেছে।

জনসাধারণের মনের প্রশ্ন অনুমান করা যায়: গুপ্তধনের এই অনুসন্ধান কি সফল হবে? এর আগে উত্তর প্রদেশে প্রাচীন নবাবী অট্টালিকার ভিত খনন করে গুপ্তধন আবিষ্কারের কয়েকটি চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তধনের চিহ্নও পাওয়া যায়নি। জয়গড় দুর্গের গুপ্তধন আবিষ্কার করবার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হতে দেখে স্বভাবত জনসাধারণের মনে এই ধারণা দৃঢ়তর হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণের সূত্র পেয়েছেন, নইলে নিদারুণ ছলনাময় বলে অভিহিত গুপ্তধনের সন্ধানে ব্যাপৃত হতেন না।

চুক্তি হয়েছে যে, যদি গুপ্তধন পাওয়া যায় তবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার ও জয়গড় দুর্গের মালিকপক্ষের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করা হবে। চুক্তিগত এই প্রতিশ্রুতির সার্থকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে দেশের লোক আপাতত এটাই কামনা করবে যে, সন্ধান সফল হোক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রহস্যময় অন্ধকারের গোপন কক্ষে লুক্কায়িত বিপুল পরিমাণের ঐতিহাসিক ধনরত্ন আবার বাইরের আলোকের স্পর্শ লাভ করুক।

গুপ্তধনের সন্ধান অবশ্য সরকারের সাধনীয় কোন কর্তব্য হিসাবে বিহিত অথবা গৃহীত হতে পারে না। কারণ গুপ্তধনের অস্তিত্বের যদিও বা কিছু সত্যতা থাকে, তবে সেটা স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে দেবার অথবা বুঝিয়ে দেবার মতো কোন বাস্তব তথ্যের প্রমাণ সাধারণত থাকে না। লোকপ্রচলিত একটি সংস্কারের কথা এই যে, নিদ্রাহীন যক্ষ কিংবা অতিবৃদ্ধ অজগর, এবং এধরনের আরও নানারকমের অদ্ভুত প্রহরী প্রাচীন গুপ্তধনের রক্ষাসাধন করে। গুপ্তধন সম্পর্কে প্রচারিত ও প্রচলিত কাহিনীগুলির মধ্যে মায়া আছে, মোহ আছে ও লোভ আছে; কিন্তু যুক্তি নেই। এসব কাহিনী এবং জাদুওয়ালার তুকতাক বুলি, দুই সমান নিরর্থক উপচার। সরকারের পক্ষে গুপ্তধন সংগ্রহের জন্য কোন ব্যয়সাপেক্ষ প্রয়াস ও কর্তব্য মেনে নেওয়া প্রায় ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পরিণত হবার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু সেজন্য কি ঐতিহাসিক কৌতূহলের আবেগ একেবারে স্তব্ধ করে রেখে দিতে হবে। দেখা গিয়েছে যে, গুপ্তধন অনেক ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য হিসাবে গুহার ভিতরে কিংবা সমাধির ভিতরে, অথবা ভবন-চত্বরের নিম্নস্তরে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। মিশরীয় তুতেনখামেনের সমাধির আবিষ্কার একহিসাবে যেমন বিপুল পরিমাণের গুপ্তধনের আবিষ্কার, তেমনই আর-এক হিসাবে ঐতিহাসিক তথা প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্যের আবিষ্কারও বটে। অন্য দেশে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সূত্রে গুপ্তধনের আবিষ্কৃত হবার কথা শোনা যায়। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কোন ঘটনায় বিপুল পরিমাণের গুপ্তধনের আবিষ্কার কখনও সম্ভব হয়েছে বলে শোনা যায় না। সাম্প্রতিক কালে হীরা কুড়িয়ে পাওয়ার কয়েকটি ঘটনা ভারতীয় জনজীবনের কৌতূহল চমকিত করেছে। পান্না জেলার একাধিক গরীব ব্যক্তি অকস্মাৎ বড় আকারের হীরা কুড়িয়ে পেয়েছে। একরকম একটি হীরার সরকারী নাম হয়েছে 'বিজয় হীরা'। এধরনের ঘটনাও ভাগ্যের আকস্মিক কীর্তি বলে বোধ হয়ে থাকে, এবং আবিষ্কার এক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক বিস্ময়ে সমাকীর্ণ। প্রতীকী অর্থে এধরনের ঘটনাকে দেশের ভূতাত্ত্বিক গুপ্তধনের সঙ্কেত বলে মনে করা চলে। ভারতের ভূতাত্ত্বিক বক্ষের নিভৃতে কত যে ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে, তার হিসাব নির্ণীত হয়নি। কবি রামপ্রসাদের ভাষার অনুকরণ করে বলা চলে কত রত্ন পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে। ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি, ভূতাত্ত্বিক সত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সত্য—সবই গুপ্তধনের মতো লুকিয়ে থাকতে পারে। তাকে উদ্ধার করাই জাতীয় গৌরবের পুনরুজ্জীবন, এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির নবসঞ্চার। জয়গড় দুর্গের গুপ্তধন যদি পাওয়া যায়, তবে তার দাম টাকার অঙ্কে যা দাঁড়াবে, তার তুলনায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময়ের মূল্যে অনেক বেশী দাঁড়াবে।

এই সপ্তাহে

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যেসব সিদ্ধান্ত মে মাসে দুই দেশের বিদেশ সচিবদের বৈঠকে নেওয়া হয়েছিল সেগুলির আরও কয়েকটি কার্যকর করার দিনক্ষণ ও খুঁটিনাটি প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী নীতি ও মত চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত যেটি ঘোষিত হয়েছে সেটি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ সম্পর্কে। পাকিস্তানে ভারতের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন কাত্যায়নীশঙ্কর বাজপেয়ী, এদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে আসছেন সৈয়দ ফিদা হুসেন। জুলাই মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে তাঁদের কার্যভার গ্রহণ করার কথা। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে। ভারত সরকার বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ হিসাবে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে। তখন থেকে দুটি দেশই পরস্পরের সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুইশ দূতাবাসের উপর ন্যস্ত করেছে। সাড়ে চার বছর পরে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার স্থাপিত হলে স্বভাবতই সুইশ দূতাবাসের দায়িত্ব শেষ হবে।

পাকিস্তানের অ্যামবাসাডর সৈয়দ ফিদা হুসেনের বয়স ৬৮। তিনি ১৯৩২ সালে ভারতীয় সিভিল সারভিসে যোগ দেন। হুসেন পাকিস্তানের মুখ্যসচিব ও কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রধান সচিব ও উপদেষ্টা ছিলেন। তবে ইতিপূর্বে তিনি কোন কূটনৈতিক পদে নিযুক্ত হননি। বাজপেয়ীর বয়স ৪৮, হুসেনের চেয়ে কুড়ি বছর কম। তিনি ভারতীয় ফরেন সারভিসে যোগ দিয়েছেন ১৯৫২ সালে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের ফারসট সেক্রেটারি। বাজপেয়ীকে জন্ম কূটনীতিক বলা যায়। তিনি ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত সিভিলিয়ান ও স্বাধীন ভারতের ফরেন সারভিসের সংগঠক গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর পুত্র। ভারতীয় সিভিল সারভিসে গিরিজাশঙ্কর ও ফিদা হুসেন সহকর্মী ছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আবার বাণিজ্য শুরু করবার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল গত বছর। এই বাণিজ্য হওয়ার কথা ছিল স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন মারফৎ। গত মাসে বিদেশ সচিবদের বৈঠকে এক সমীক্ষায় দেখা যায় এই চুক্তি সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের প্রসার আশানুরূপ হয়নি। বিদেশ সচিবরা তখন স্থির করেন সরকারী ক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিপূরক হিসাবে বে-সরকারী ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চালু করা হোক। বিদেশ সচিবদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে ১৫ই জুলাই থেকে সাধারণ অর্থাৎ বে-সরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীরা পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা করতে পারবেন।

সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশে তৃতীয় যে ঘোষণাটি নয়াদিল্লি থেকে করা হয়েছে সেটি রেল যোগাযোগ সম্পর্কে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়, তখন থেকে এক দশকের উপর দুই দেশের মধ্যে রেল চলাচল বন্ধ আছে। রেল চালু করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি নিয়ে দুই দেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এখনও আলোচনা চলছে। তবে আলোচনার শুরুতেই বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেছেন যে অমৃতসর ও লাহোরের মধ্যে অন্তত একটি একসপ্রেস ট্রেন চালু করা হবে।

বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে পাঁচদিন আলোচনার পর ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশন নয়াদিল্লি ফিরেছেন। মিশনের নেতা পার্থসারথি বলেছেন যে-সব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তাদের একটি হল, দুই দেশের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন সব সংবাদের প্রকাশ ও প্রচারণ। সীমান্ত এলাকায় পরিস্থিতি, সীমান্ত ঘটনা এবং অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পর্ক সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। পার্থসারথি বলেছেন, দুই প্রতিনিধি দলই নিজেদের সরকারের কাছে এই আলোচনা সম্পর্কে রিপোরট পেশ করবেন এবং এ-বিষয়ে দুই দেশের সরকার পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এইচ খান বলেছেন ভারতের সঙ্গে সুপ্রতিবেশী-সুলভ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে বাংলাদেশ খুব আগ্রহী।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে জোট নিরপেক্ষ সংবাদ সংস্থাগুলির মন্ত্রী-পর্যায়ের এক সম্মেলন হবে। পঞ্চাশটি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি মহম্মদ ইউনুস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এই সম্মেলনের আলোচ্য হবে, বিশ্ব সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর না করে নিরপেক্ষ দেশগুলির নিজস্ব সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে খবরের আদান প্রদান।

মেদিনীপুরের কংগ্রেস এম এল এ রজনীকান্ত দলুই, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুহাস দত্তরায় ও সহসভাপতি রাজকুমার মিশ্রকে মিসায় গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাংবাদিকদের বলেছেন, ওই তিনজন কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও গুণ্ডাবাজির কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ আছে। তাঁরা কিছু বেকারকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছেন, যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পাননি তাঁরা পরে টাকা ফেরত চাইলে তাঁদের বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করা হয়েছে এবং মারপিটের ভয় দেখানো হয়েছে। দু-মাস ধরে পূর্ণ তদন্তের পর তিনি এই তিনজন কংগ্রেস কর্মীকে মিসায় আটকের আদেশ দিয়েছেন। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা এ-ধরনের ব্যাপারে লিপ্ত আছেন বা ওই কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁদের সম্পর্কেও তদন্ত হচ্ছে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৫শে জুন এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, আমাদের রাজনৈতিক লাভের চেয়ে অর্থনৈতিক লাভটাই বেশী হয়েছে। জরুরী অবস্থায় বিরোধীরা দমে আছেন কিন্তু পরাস্ত হননি। নানারকম পোশাকে ও বিভিন্ন স্লোগান আওড়ে তাঁরা পুনরাবির্ভূত হলেও তাঁদের উদ্দেশ্য একই রয়েছে। তাঁরা চান, জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অন্যায় দূরীকরণ ইত্যাদি প্রচেষ্টা থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখতে। তিনি বলেন, দেশের বিপদ এখনও আগের মতোই রয়েছে।

নিখিল ভারত ফরওয়ারড ব্লকের সভাপতি হেমন্তকুমার বসুকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ছয়জনকেই নগর দায়রা আদালত বেকসুর খালাস দিয়েছেন। খালাস ছয়জনকেই পুলিশ অন্য কেসে আটক করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর রায়ে কঠোর মন্তব্য করে বিচারক শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, পুলিশ তৎপর হলে অপরাধীদের হাতে-নাতে ধরতে পারত। ১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে দশটার সময় হেমন্তবাবু উত্তর কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে নিহত হন।

২৮।৬।৭৬

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

জুনের বিশে আর একুশের পাশে ইউরোপের সব দেশই তাদের পাঁজিতে একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন এ'কে দিয়েছিল। পশ্চিমেও, পুবেও। সনাতনী গণতন্ত্রেও, গণ-প্রজাতন্ত্রেও। তারিখটা ছিল ইতালির সাধারণ নির্বাচনের। নির্বাচনটা অবিশ্যি অকালে। ওটা আইনমাফিক হবার কথা তিয়াত্তরে। কিন্তু হালে পানি না পেয়ে রাষ্ট্রপতি গিওভানি লিওনি তারিখটা এক বছর এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুতেই একটা টেকসই মন্ত্রিসভা ইতালিতে গড়া যাচ্ছিল না। বাহাত্তরের নির্বাচনে কোনও দলই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা ইতালির সংসদে পায়নি। সাবেক ধারা বজায় রেখে পয়লা নম্বর দলের মর্যাদা পেয়েছিল খ্রীষ্টান ডেমোক্রাটরা। মন্ত্রিসভা তারা গড়েছে বরাবরই অন্য দুটো তিনটে দলের সঙ্গে মিলেজুলে। তাই-ই হচ্ছিল বাহাত্তরের ভোটাভুটির পরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আর জুড়ি মেলেনি। তাদের বাদ দিয়ে কোনো সরকার গড়া যায় না। ঝামেলা চুকে যেতো তারা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে রাজী হলে। তাতে তারা নারাজ। কাজেই সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের বন্দোবস্ত করা ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না।

দেশের বাইরে ইতালির নির্বাচন নিয়ে যে মাথা ঘামানো সেটা অসময়ে হচ্ছে বলে নয়। ও দেশে অমন তো আগেও হয়েছে। কিন্তু এবারে রটে গিয়েছিল রং বদলাবে ইতালির নির্বাচনে—তার গায়ে লাগবে ঘন লালের ছোপ। অতলে তলিয়ে যাবে সনাতনী গণতন্ত্রীরা—নির্বাচনী দরিয়া সাঁতরে ক্ষমতার ঘাটে উঠবে কম্যুনিস্ট দুনিয়ার বাইরে সবচেয়ে বড় কম্যুনিস্ট দল পার্তিতো কম্যুনিস্তা ইতালিয়ানো অর্থাৎ ইতালির কম্যুনিস্ট পার্টি। ইতালির সংসদে এটাই চিরকাল দু নম্বর দল কিন্তু তার সঙ্গে পয়লা নম্বর দল খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাট-দের থাকতো আসমান জমিন ফারাক। অনেকের ধারণা ছিল ভোল বদলাবে এবারের নির্বাচনে। আসমানের চাঁদ হাতে পাবে কম্যুনিস্টরা, জমিনে লুটোপুটি খাবে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা। গেল বছর গাঁয়ে-গঞ্জে আর শহরে-পাড়ায় নির্বাচনে জয়জয়কার হয়েছিল কম্যুনিস্টদের। ভোট পেয়েছিল তারা ৩৩ শতক—খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে মোটে ২ শতক কম। তাদের হাতে এসে গেল তুরিন, ফ্লোরেন্স আর নেপলসের কর্তৃত্ব। এ বছর রোমেও তারা উড়িয়েছে লাল নিশান।

ব্যাপার দেখে ভেবড়ে গেল পশ্চিমী দেশগুলো আর খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলো কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলো। পশ্চিমীরা ভাবলে ইতালিতে বাঁধ ভেঙে কম্যুনিজমের বেনোজল বুঝি তাদের এলাকায় ঢুকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কম্যুনিস্টদের আশা হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বুঝি আর এক ধাপ এগুলো। কম্যুনিস্টরা অধীর আগ্রহে দিন গুণতে লাগলো আর পশ্চিমীরা মতলব ভাঁজতে লাগলো কী করে কম্যুনিস্টদের ইতালিতে ঠেকানো যায়। ভাবনা সবচেয়ে বেশী হলো আমেরিকার। এত কষ্ট করে তারা যে কম্যুনিস্টবিরোধী জোট বানিয়েছে সে ন্যাটোর কী হবে যদি তার এক চাঁই ইতালির সরকার চালাবার ভার পায় কম্যুনিস্টরা? পুরো ক্ষমতা তারা যদি নাও পায় তারা যদি পাঁচমিশেলী সরকারের পাঁচ শরিকের এক শরিক হয় তা হলেই তো চিত্তির। —চিচিং ফাঁক হবে কম্যুনিস্ট-বিরোধী পশ্চিমী জোটের। সবই তখন তো জানতে পারবে কম্যুনিস্টরা আর তাদের মারফত সে সব ঘোড়ার মুখের খবর পৌঁছুবে সরাসরি মস্কোর দপ্তরে। মন্ত্রগুপ্তি তখন থাকবে কী করে?

ইতালির কম্যুনিস্টরা কিন্তু কখনো কবুল করেনি যে, তারা মস্কোর কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে। দুনিয়ার পয়লা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র রুশিয়াকে তারা শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়, সমাজতন্ত্রের পথ সেই খুলে দিয়েছে এ কথা স্বীকার করে। তাই বলে মস্কোর কথা বেদবাক্য বলে মানতে তারা রাজী নয়। এখন ইতালির কম্যুনিস্ট দলের নেতা এনরিকো বের্লিংগুয়ের। দেশে তাঁর খুব নামডাক, বিদেশেও। কম্যুনিজমে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি কিন্তু মনে করেন না কম্যুনিজমে দীক্ষা নিলে মস্কোকে গুরু বলে মানতে হবে। তাঁর ধারণা দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজস্ব ধারায় কম্যুনিজমের পথ বেয়ে চলার অধিকার ইতালির আছে—মস্কোর ফতোয়া না মেনে উপায় নেই এ কথা তিনি মানেন না, যদিও তার মানে এ নয় তিনি আগ বাড়িয়ে মস্কোর সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চান। পশ্চিমীরা কিন্তু অত চুলচেরা বিচার করতে চায় না। তাদের কাছে সব কম্যুনিস্টই সমান আর আলবেনিয়া ছাড়া ইউরোপের সব কম্যুনিস্ট দলই মস্কোভক্ত। তারা তাই প্রমাদ গণেছে ইতালিতে কম্যুনিস্টদের বাড়বাড়ন্ত দেখে।

নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের সবচেয়ে বড় সহায় ছিল তাদের ঘোর শত্রু খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা। কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও সত্যি। তিরিশ বছর একটানা ইতালিকে তারা শাসন করে এসেছে। আর কিছু না হোক একঘেয়েমি কাটাবার জন্যেই লোকে বদল যদি চায় তা হলে তা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার হবে না। তার ওপর এমন সব কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাট দল যে, দেশ জুড়ে ঢিঢি পড়ে গেছে। মার্কিন বিমান তৈরি কোম্পানি লকহীড দেশবিদেশে যে ঘুষের জাল পেতেছে তাতে জড়িয়ে পড়েছেন দলের জনকতক চাঁই। দুর্নীতিতে তো দেশ ছেয়ে গেছে আর তার জন্যে লোকে দুষছে ওই দলকেই। তা ছাড়া দলটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়োদের আড্ডা। নেতারা সব ষাটের ওপারে। তাঁদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে একালের ধ্যানধারণার মিল নেই। এ বছর ভোট দেবার বয়েস কমিয়ে করা হয়েছে ২৫ থেকে ১৮। নতুন ভোটাররা বুড়োদের দলকে পুছবে না এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর তা হলেই তো কম্যুনিস্টদের পোয়া বারো হবার কথা।

ভোটের অঙ্কটা পুরোপুরি ইতালিতে মেলেনি। ন'টা দল নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলেও আসলে যুদ্ধটা হয়েছে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের। নির্বাচনী রায়ে কিন্তু দু পক্ষই খুশী—দুপক্ষেরই ধারণা তারাই জিতেছে। আসলে যে যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা চেয়েছিল আবার পয়লা নম্বর দল বনতে। তারা তাই হয়েছে। লোকসভায় ৩৮.৭ শতক ভোট পেয়ে তারা দখল করেছে ২৬৩টা আসন, সেনেটে পেয়েছে ১৩৫টা। কম্যুনিস্টরা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা তো পারেই নি, পয়লা নম্বর দলও হয়নি। তারা দু নম্বর দল। ৩৪.৪ শতক ভোট পেয়ে তারা জিতেছে ২২৮টা আসন লোকসভায়, সেনেটে ১১৬টা। আগের বারের চেয়ে তাদের ভোট বেড়েছে ৭.৩ শতক, খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাট-দের যা ছিল তাই। আসন বেশী পেয়েছে কম্যুনিস্টরা লোকসভায় ৫২টা, সেনেটে ২৫টা। খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের আসন কমেছে দুটো লোকসভায়, সেনেটে কমেওনি, বাড়েও নি। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যারা সমঝোতা চায় সেই সোস্যালিস্টরা লোক-সভায় খুইয়েছে চারটে আর সেনেটে চারটে আসন যদিও ভোট তাদের ঠিকই আছে। পাত্তা পায়নি অতি দক্ষিণ আর অতি বাম দলগুলো। অতি দক্ষিণ পেয়েছে মোট ৩১টা আসন—আগের বারের চেয়ে ৫০টা কম। অতি বাম এই প্রথম পেয়েছে ১০টা আসন।

দেবব্রত

মনোহরপুকুর

শঙ্খ ঘোষ

জহর তার বুকের থেকে খুলে দিয়েছে ঢাল
অরক্ষিত যে-কোনো দিকে ছুটেছে মানুষেরা
এক নিমেষে মিশে গিয়েছে তরঙ্গ ও ত্রাস

গলির মুখে খুলে গিয়েছে সুড়ঙ্গের ডালা
হাজার হাত ছড়িয়ে আছে অকালভৈরবী
এ চোখে যদি অসুর তার অন্য চোখে সুরা

অগস্ত্যের চুমুক শুষে নিয়েছে সব জল
পাতাল ছিঁড়ে জেগেছে যত মাছের মৃতদেহ
মাথার থেকে মাথায় ছোটে বিদ্যুতের শিরা

দিনদুপুরে নিলাম ডাকে বিকিয়ে গেছে পাড়া
আমিও শুধু একলা বসে মনোহরপুকুরে
ছিপ করেছি নিজের হাতে নিজেরই শিরদাঁড়া!

দুঃখ ছুঁয়ে আসে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ডুব দিয়ে দুঃখ ছুঁয়ে আসে
দুঃখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসে
দুঃখ ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসে
নিঃস্বতায়।

উদ্যোগে সাঁতার কেটে যায়
কামড়ে ধরে সম্মুখে যা পায়—
প্রাপ্তি-বা কম কী শেষটায়—
মহোল্লাসে!

দুঃখ ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসে
প্রাপ্তিগুলি নিষ্ফল নিশ্বাসে
গজরায়।
দুঃখটুকু শুধু
শিশুর মতন বুকে ভাসে।

এইবার

দেবাশিস বসু

সারাক্ষণ দুলছে তো দুলছেই
রহস্যময় একটা কালো পর্দা আমার চোখের সামনে
আজ কতদিন হ'য়ে গেলো;
কুয়াশার মতো অস্পষ্ট অনুভূতি
স্মৃতি যেন ফাঁকা মাঠের ওপর একলা দাঁড়িয়ে থাকা
পোড়োবাড়ি, তার ইঁটের গায়ে
পুরু শ্যাওলার আস্তরণ;
ঘড়িতে সময় নেই, শামুকের পিঠে সেঁটে আছে
বুকের কোথাও একটা ঠাণ্ডা মরা নদী
স্রোত নেই, শিহরণ নেই
ভোঁতা জিভে কথা আটকে আসে...
রহস্যময় ঐ কালো পর্দা তবু
একটানা দুলেই চলেছে

এইবার ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

কবিতার হাড়গোড়

দেবী রায়

ফুলস্কেপ কাগজে, জড়তাবিহীন—সে লেখে স্বচ্ছন্দে
অবহেলায়;
'কিছু দেরী হ'লো'.....এই ত্রুটি ক্ষমা পাবে
আরও ত্রুটি একাধিক লেখা; হাজার—
ইচ্ছাসত্ত্বেও পাঠাতে পারছি না, হাত কেঁপে যায়.....

কবিতার হাড়গোড়, ঠিক একদিন—তার
আগাপাস্তলা—চিবিয়ে খাবে
আমরা যারা শুধুই হৈ চৈ, মদ্যপান-ই সার
আমরা যারা শুধুই 'রেওয়াজ'—
হয়তো—তেমনভাবে বুঝিনি পরিণতি

আমরা যারা শুধুই প্রকাশের ইচ্ছা—
কোথাও দেখা হ'লে—তাকে, বোলো—
সমস্ত সুখদুঃখ শেষে : হরি ও তৎসৎ!'

স্কেচ

গিরিধারী কুণ্ডু

শীত: কুয়াশালিপ্ত নক্ষত্রের মধ্যরাত।
নীচে মানুষের পৃথিবীতে
গোলাপ কম্বলের উষ্ণতায়
ক্রমশই রক্ত অভিলাষী;
আঁতিপাতি করে শুধু খোঁজা
দেহসর্বস্ব অষ্টাদশীকে

শীত: কুয়াশালিপ্ত নক্ষত্রের অধিক রাত।
জীবনশূন্য, নাকি নিরুদ্যম অথবা বড় নির্মম

আহত নগরী সাময়িক শরীরী উৎসবে
শীত শীত অতীন্দ্রিয় রাত!!

দিগ্বিদিকের বক্ষ ক্রন্দনে
প্রকৃতির বন্ধনও কেটে পড়ে;
শোনা যায় হৃদপিণ্ড থেকে অলেখা শব্দের হাহাকার
দোল খায় বুকে ঝুঁকে থাকা ভগ্ন-মুখ...
দূরে না গেলে, সরে না থাকলে,
পেতে কী ভালবাসার যোগ্য স্পর্শ?

অনিলকুমার চন্দ

সুহৃদ্বরেষু

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে শান্তিনিকেতনের ছোট্ট সংসার। তাতে একটু যদি ভাঙচুর ঘটে তা হলে অনেকখানি নিয়ে টান ধরে। একেক জন মানুষ চলে যান আর অনেকটা জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে যান। মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে পর পর কয়েকজন চলে গেলেন। আগের দিন রাত্তিরে একজনের মৃত্যু হয়েছে; পরদিন সকাল বেলায় বৈতালিকে ছেলেমেয়েরা গান করেছিলেন—আরো কি বাণ আছে তোমার তূণে। বিধাতা বোধ করি অলক্ষ্যে হেসেছিলেন; বলেছিলেন, আছে বৈকি আছে। ব্যস, কদিন না যেতেই স্বয়ং ইন্দিরা দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এবারেও তাই হল। অল্প দিনের ব্যবধানে প্রথমে সুনীলচন্দ্র সরকার, পরে প্রমদারঞ্জন ঘোষ এবং হরিদাস মিত্র একে একে চলে গেলেন। কলকাতায় বসে এসব খবর পাচ্ছিলাম আর শান্তিনিকেতনের কথা ভাবছিলাম। আমার মনেও সেই প্রশ্নই জেগেছিল—আরো কি বাণ আছে তোমার তূণে? ঠিক সেই সময়টিতে আকাশবাণী সে বাণটি নিক্ষেপ করল—আজ প্রত্যূষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য এবং এককালে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অনিলকুমার চন্দ তাঁর শান্তিনিকেতন বাসগৃহে পরলোকগমন করেছেন। একেই বলে একেবারে direct hit—কারণ রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব আমার একান্ত সুহৃদ ছিলেন। বয়সে আমার চাইতে কিছু ছোটই ছিলেন কিন্তু বয়সে ছোট হলেও বন্ধু হতে কোন বাধা থাকে না। অনিলবাবু, সুনীলবাবু, দুজনে সমবয়স্ক—দুজনের সঙ্গেই গভীর প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলাম। বিশেষ করে অনিলবাবু এত সহজে মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন যে তাঁকে একান্ত আপনার জন হিসাবে গ্রহণ করা খুব সহজ ছিল। সে জন্য অনিলবাবুর অভাবে নিজেকে নিঃসঙ্গ তো বটেই, একটু যেন অসহায় বোধ করছি। এখন আমরা যে বয়সে উপনীত হয়েছি তাতে সঙ্গী সাথীরা একে একে খসে পড়বেন, এটা জানা কথা। নিঃসঙ্গতা এ বয়সের অনিবার্য বিধান। তবে ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতির কথা ছেড়ে দিলেও শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে মন বড় অবসন্ন হয়। ও বেচারী আমাদের চাইতেও নিঃসঙ্গ। যাঁরা একদিন হাতে ধরে ওকে গড়ে তুলেছিলেন আজ তাঁদের দুজন একজন ছাড়া কেউ আর বেঁচে নেই।

আমরা যারা পরে এসেছিলাম শান্তিনিকেতন তাদের বলত, তোমরা এসেছ দিন ক্ষণ খুইয়ে, এখন কি বা আছে, কি বা দেখবে। তাও এক শ' বার বলব যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

শান্তিনিকেতনের কথা ভাবলে একটি কথা প্রায়ই আমার মনে হয়। একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র কিন্তু সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ। ঠিক আমাদের কলকাতা বন্দরটি যেমন; সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর নয়—একটি অনতিবৃহৎ নদীর সাহায্যে দেশ বিদেশের বৃহদাকার পণ্যবাহী পোতসমূহকে অনায়াসে কোল দিচ্ছে। লণ্ডনের টেমসও ঠিক তাই। পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরটি ক্ষুদ্র এক নদীর মারফত বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। শান্তিনিকেতনও একদিন অন্যবিধ এক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন, 'a world-wide commerce of heart and mind' দেশ বিদেশের কত জ্ঞানী গুণী মহা মনীষী ব্যক্তি শান্তিনিকেতনের এই গ্রামীণ পরিবেশে থেকে জ্ঞানচর্চায় নিবৃত্ত ছিলেন। (অবশ্য শান্তিনিকেতন এখন আর সেই গ্রাম নেই, এখন বলতে গেলে শহর। তবে চেহারাটা যত বেশি শহুরে হয়ে উঠছে আচারে ব্যবহারে তত তার গ্রাম্যতা প্রকাশ পাচ্ছে।) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক ক্রমে শিথিল হয়ে এসেছে। শান্তিনিকেতনের সেই গৌরবের ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। সে ইতিহাসের সূত্রপাতে একদিন যাঁরা ছিলেন এর প্রত্যক্ষদর্শী প্রমদারঞ্জন ঘোষ এবং হরিদাস মিত্রর সঙ্গে তার শেষ বর্ণচ্ছটা মুছিয়া মিলিয়ে গেল।

অনিলবাবু এসেছেন পরে—তিরিশের দশকে। তখনও শান্তিনিকেতনের হাট জমজমাট। অনিল চন্দ বিচিত্রকর্মা পুরুষ—নানা ক্ষেত্রে নানা ধরনের কাজ করেছেন এবং কৃতিত্বের এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর আসল পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে। এক সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরে অধ্যাপনা করেছেন, বহু বৎসর বিশ্বভারতী কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিই তখন অনিলবাবুকেই দেখেছি শান্তিনিকেতন জীবনের সব কিছুর সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই হত না। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সুরেন কর এবং অনিল চন্দ ছিলেন রথীন্দ্রনাথের প্রধান উপদেষ্টা। রথীবাবু, সুরেনবাবু,

আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। পিতৃ পরিচয়ে অনিলবাবুকে আচার্যদেব সহজেই চিনতে পারলেন। দু কথার পরেই তুমি থেকে তুই সম্বোধনে এসে গেলেন। গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই শুয়ে পড়লেন। অনিলবাবুকে বললেন, বোস্ দেখি এখানে, শুনি তোর খবর। অনিলবাবু পায়ের কাছে বসতেই বললেন, পাটা একটু টিপে দে দিকিনি। পরমুহূর্তেই বললেন, তুই সাহেব মানুষ, পা টিপতে বলছি, কিছু মনে কচ্ছিস না তো। অনিলবাবু বললেন, আজ্ঞে না, It's an honour, বলে পা টিপতে লাগলেন। আচার্য রায় বললেন, ও দেশে কদ্দিন ছিলি?

আজ্ঞে, চার বছর।

তা, চার চারটা বছর ওখানে কি করলি শুনি? ও দেশের ছুঁড়িগুলির পেছনে ছুটোছুটি করলি তো?

আজ্ঞে, বললে বিশ্বাস করবেন না, things have changed considerably since your days. অর্থাৎ কিনা দিনকাল যথেষ্ট বদলে গিয়েছে। আপনাদের কালে আপনারা যা করেছেন, আজকালকার ছেলেরা তা করে না।

আচার্যদেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুই তো বড় ত্যাঁদড় ছেলে রে।

এমন আরো অনেক কাহিনী তাঁর-মুখেই শুনেছি। সকলের সঙ্গেই নিজেকে অতি সহজ করে নিতে পারতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সামনেও অনিলবাবুর ব্যবহারে কোন আড়ষ্টতা থাকত না। রবীন্দ্রনাথ হাস্য পরিহাস ভালোবাসতেন। সেক্রেটারির সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা লেগেই থাকত। সুযোগ পেলে অনিলবাবুও ফোড়ন কাটতে ছাড়তেন না। একজন ভিজিটার গুরুদেবের একখানা ফটোতে সই করিয়ে নিতে চান। অনিলবাবু ফটোখানা এনে গুরুদেবের হাতে দিয়েছেন। ফটোতে মুখখানা দেখাচ্ছে খুব জ্বলজ্বলে। রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, লোকে বলবে মুখে রোদ্দুর এসে পড়েছিল, তাই অমনটা দেখতে হয়েছে। আরে তাই কি হয়? আসলে আমার মুখ থেকে জ্যোতি ফুটে বেরিয়েছে। কি বল? রানী চন্দও ওখানে ছিলেন। দুষ্টুমি করে ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কি আর সবার ছবিতে হয়? হবে তোমাদের ফটোতে? অনিলবাবু বললেন, জানেন, শম্ভুবাবু (শম্ভু সাহা) আমার একটা ফটো তুলে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। সেটা কম্পিটিশানে প্রাইজ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চোখ বড় বড় ক'রে বললেন, বটে! তা প্রাইজের চাইতে সারপ্রাইজটাই তো বড় বলে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় মগ্ন থাকি। বাদ সাধেন সেক্রেটারি, এসে হাজির করেন। বলেছেন, মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করতে আসতেন মেনকা-রম্ভা। কলি যুগের রকম আলাদা। এ যুগে ধ্যানভঙ্গকারীর নাম প্রাইভেট সেক্রেটারি। এই নিয়ে কবিতাও লিখেছেন—

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।

অনিলবাবু বড় শান্তিনিকেতন-প্রেমিক ছিলেন। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু মনটা পড়ে থাকত শান্তিনিকেতনে। চিঠিপত্রে সব সময়েই তা প্রকাশ পেত। অবসর গ্রহণ করে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন তখন ভেবেছিলাম, আমাদের পুরোনো হাট আবার জমে উঠবে। কিন্তু তখন আমরা ছত্রভঙ্গ—কেউ চলে গিয়েছেন স্থানান্তরে, কেউ বা লোকান্তরে। গিয়ে থুয়ে যে ক'জনা ছিলাম তাতেও জমে উঠতে পারত কিন্তু সে অবকাশও মিলল না। এসে থিতিয়ে বসতে না বসতেই চলে গেলেন। এমন প্রাণবন্ত জীবন-রসিক মানুষ জীবনে কমই দেখেছি। সে মানুষের এমন অকস্মাৎ অন্তর্ধান অবিশ্বাস্য মনে হয়, মন মানতে চায় না। দিব্য সুস্থ সবল মানুষ, সন্ধ্যাবেলায় এখানকার সাহিত্যসভায় উপস্থিত ছিলেন, সেই রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন অবসান। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আর কাকে বলে!

রেডিয়োতে, খবরের কাগজে বয়স বলা হয়েছে চুয়াত্তর। ওটা ভুল, ওঁর বয়সটা আমার জানা আছে—সত্তর হতে তখনও এক মাস বাকি ছিল। অবশ্য সত্তরও কিছু কম নয় কিন্তু চেহারায়, চলায় বলায়, ভাবে ভঙ্গিতে বয়সের ছাপ এতটুকু ছিল না। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম দিনটিতে যেমন দেখেছিলাম এই সেদিনও ঠিক তেমনটিই দেখেছি। হার্টের গোলযোগ দেখা দিয়েছিল কিন্তু তাতেও তাঁকে নিস্তেজ করতে পারেনি। উচ্ছ্বাসে আনন্দে, হাস্যে পরিহাসে সারাক্ষণ যেন টগবগ করছেন। শেষ দিকে 'হৃদয় দৌর্বল্য' তাঁকে আরোই যেন সহৃদয় করে তুলেছিল। আমি কয়েক মাসের জন্যে কলকাতায় যাচ্ছি শুনে এমন বিচলিত হলেন যে, চোখ ছলছলিয়ে উঠল। খুব মিনতি করে বলেছিলেন যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। ফেরা হয়নি দেখাও হয়নি বললেই চলে। একবার কলকাতায় গিয়ে তিনি কষ্ট করে আমাকে দেখা দিয়ে এসেছিলেন। আমিও মাঝে একবার এসে ঐ দেখাটুকুই করে গিয়েছিলাম। এমন বন্ধুবৎসল মানুষ সংসারে বিরল। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সহৃদয়তার প্রমাণ আমি অনেক উপলক্ষে অনেক সময় পেয়েছি। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটি ঘটনার উল্লেখ করছি; অনেক বছর আগে যখন শান্তিনিকেতনে বেতনের হার ছিল যৎসামান্য তখন একবার আমি খুব আর্থিক সংকটের [illegible] পড়েছিলাম। অনিলবাবু তখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিল্লি চলে গিয়েছেন। লোকমুখে সংবাদ পেয়ে আমাকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে থোকে কয়েক শ' টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বন্ধুকৃত্যের ঋণ এ জীবনে শোধ হবার নয়। টাকাটাও পুরোপুরি শোধ হয়েছিল কিনা সে হিসেব রাণী দেবীর সঙ্গে বসে একদিন করতে হবে। অনিলবাবু নিজে হিসেব কিতেব জানতেনও না, করতেনও না। বলতেন, আহা, সবই যদি শোধ করে দিলেন তবে চিরঋণী থাকবেন কি করে? মানুষের দুই মহৎ গুণ—একটি ব্যক্তিগত Charm, অপরটি হৃদয়গত warmth, এই দু-এ মিলে একটি বড় মধুর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরাই এর স্বাদ গন্ধ পেয়েছেন তাঁরাই আমার ন্যায় চিরকাল অনিল চন্দের গুণমুগ্ধ থাকবেন।

॥ ৬ ॥

গণপতিবাবুর বকুনিতে বুঝলাম কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি। অথচ মালিককে নমস্কার জানাবো না তা কেমন করে হয়? জলসাঘরে ঢুকবার আগে গণপতিবাবু তো সেরকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

গণপতিবাবু বাড়ির বাইরে এসে একটা খাবারের দোকানে ঢুকলেন। শুনলাম, কচুরি সিঙাড়া ছাড়াও এখানে সম্প্রতি চা বিক্রি শুরু হয়েছে। সময়ের চাপে এ-পাড়ার অনেক মিষ্টির দোকান তাদের বাঙালী কৌলীন্য বজায় রাখতে পারছে না—কেউ চা-কফি, কেউবা আলু-টিকিয়া, দইবড়া, কেউ বা কুলপি বরফের সহ-অবস্থান নতমস্তকে মেনে নিচ্ছে।

গণপতিবাবু দোকানে ঢুকে খুশী মনে চারখানা করে ছোট কচুরি ও আলু-তরকারি অর্ডার দিলেন। শালপাতার একখানা গরম ঠোঙা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খেয়ে দেখো—এমন টুকরি আলুর চচ্চড়ি হোল-ওয়ার্লডে কোথাও পাবে না। কচুরি কিনলে আলু ফ্রি। আলু বেশী পাবার আশায় অনেকে দফে-দফে দু'খানা করে কচুরি অর্ডার দেয়।"

কড়া করে ভাজা হাতে-গরম টাকা-সাইজের সোনা-রং কচুরি সেই মুহূর্তে অমৃত মনে হলো। গণপতিবাবু মিষ্টিভাবে হাঁক দিলেন, "আর একটু চচ্চড়ি দেখাও না ভাই—বড্ড কম দিয়েছে।"

দোকানের কৃশকায় বালকটি কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে আরও দু' চামচ ফ্রি-চচ্চড়ি আমাদের ঠোঙায় আলগোছে ঢেলে দিল। প্রসন্ন গণপতিবাবু আশীর্বাদ জানালেন, "জয় হোক তোমাদের। ঈশ্বরের দয়া রয়েছে এই দোকানের ওপর—সাধে কি আর ডেলি আড়াই মণ আলুর তরকারি কেটে যায় এখানে।"

গণপতিবাবু এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। মচমচে কচুরির শেষাংশ মুখের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে পমা তো হেসেই বাঁচে না।'

পমা বলতে গণপতিবাবু যে জলসা ঘরের চতুর্দশীকে বোঝাচ্ছেন তা আন্দাজ করতে পারছি। গণপতিবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "বিলাসিনী দেবী নাম রেখেছেন অনুপমা —কিন্তু সবাই ওই শেষ অক্ষর দুটো ব্যবহার করে।"

আমি জানতে চাইছি, লোক হাসাবার মতো কী করলাম?

গণপতিবাবু এবার বললেন, "পমাই তো সব—শেষ পর্যন্ত এই বিরাট বিষয়-সম্পত্তি সব ও পাবে। সামনে যে-ভদ্রলোক বসেছিলেন তুমি তাকেই মালিক ঠাউরে সেলাম ঠুকলে! কিন্তু উনি কিসসু নন। বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে মাঠাকুরন বললেন, তুমি বরং মাস্টারের সঙ্গেও একবার কথা বলে নাও। ভদ্দরলোক এ-বাড়ির মাস্টার—পদ্মার প্রাইভেট টিউটর।'

গণপতিবাবুই খবর দিলেন, ভদ্রলোকের নাম বিপুলভূষণ বারিক। প্রাইভেট টুইশানি করতে এসে নিজের কপাল ফিরিয়ে ফেলেছেন। বিলাসিনী দেবী ওঁর ওপর খুব নির্ভর করেন—সব ব্যাপারেই বারিক মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।

গণপতিবাবু এবার শালপাতার খালি ঠোঙাটা বিরাট এক ড্রামের মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজের মনেই বললেন, "বারিকবাবু যতই তোমার হাতকশ থাকুক—তুমি কিন্তু মালিক নও। সুতরাং, গণপতি সামন্ত কিছুতেই তোমাকে সেলাম ঠুকবে না।" গণপতিবাবু আমাকে বকুনি লাগালেন, "আর তুমি এমনই বোকা যে, বারিকের কাছেই মাথা নোয়ালে আর সেই দেখে পমা খিলখিল করে হেসে উঠলো।"

জটিল প্রটোকলের এই সব চুল-চেরা বিশ্লেষণে এখন আমার মোটেই আগ্রহ নেই। চাকরিটার কী হলো তাই জানতে চাই। জলসাঘর থেকে আমাকে বিদায় করে দিয়েও গণপতিবাবু ওখানে মিনিট পনেরো বসে ছিলেন। সেই সময়েই যে আমার ভাগ্য-নির্ধারিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

রাস্তায় নেমে এসে বাস স্টপেজের সামনে দাঁড়িয়ে গণপতিবাবু সুসংবাদ দিলেন, "শনিবারের বারবেলাটা তোমার পক্ষে

সত্যিই খারাপ নয়। তোমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে।"

অনাস্বাদিত আনন্দের মধুর উত্তেজনায় আমি গণপতির হাত দুখানা উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরলাম। প্রসন্ন গণপতিবাবুর স্নিগ্ধ ডান হাতখানা আমার পোড়া কপালের কাছে রাখলাম। গণপতিবাবু বোধ হয় বুঝলেন আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তিনি বললেন, "আঃ, করো কী। আগে যাও, চাকরিটা দখল নাও—তারপর।"

চোখের জল মুছে বললাম, "আমার কথা ভাববার মতো লোক এ-পৃথিবীতে বেশী নেই, গণপতিবাবু।"

গণপতিবাবু সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। 'যার কেউ নেই, তার জন্যেই তো ওপরওয়ালা আছেন'—এই বলে তারাভরা আকাশের দিকে গণপতিবাবু তাঁর সরু লম্বা হাতখানা এগিয়ে দিলেন।

গণপতিবাবু আমাকে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ থেকে বিরত করলেন, বললেন, 'কাজটা কেমন তাও আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু শাস্ত্রে যখন বলছে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল তখন জয় দুর্গা বলে ফিলডে নেমে পড়ো।'

জয় মা দুর্গা। জয় বিপত্তারিণী। জয় দশভূজা। রেখো মা দাসেরে মনে এ-মিনতি করি পদে।

রবিবারের ভোরবেলায় খ্যাত-অখ্যাত, জ্ঞাত-অজ্ঞাত সুরলোকবাসী সকল দেবদেবীদের নিষ্ঠাভরে স্মরণ করে আমি সনাতনের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়েছি। গণপতিবাবুর দেওয়া সাত রাজার ধন এক মানিক খামখানা বুকে আগলে ধরে গতকাল রাত ন'টা নাগাদ আমি ফোর্ডসন কোম্পানির ক্যানটিনে সনাতনের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসেছিলাম।

ওই রাত্রেই আমি নতুন চাকরির পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্যে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সদাসতর্ক স্নেহশীল সনাতন আমাকে যেতে দিল না। মৃদু বকুনি লাগিয়ে বললো, "এতো রাত্রে কোথায় যাবেন স্যরেব? তাছাড়া অজানা জায়গা, সময় ভাল নয়, কোথায় কী বিপদে পড়ে যাবেন ভগবান জানেন।"

সনাতনের ইচ্ছে, অত তড়বড় না-করে, সেই রাত্রে তার হাতে-তৈরি রান্না আমি টেস্ট করি। আমার কোনো ওজর আপত্তি টিকলো না। আমার সঙ্গে পুরনো দিনের নানা গল্প করতে করতে রেকর্ড টাইমে সনাতন রুটি, আলু-পিঁয়াজ ভাজা ও পটল বেগুন কুমড়ো ঢেঁড়স ইত্যাদির সমন্বয়ে একটা মিশ্র তরকারি রেঁধে ফেললো।

আমি একাই খেতে বসেছি, সনাতন নিজের কোনো ব্যবস্থা করে নি। সনাতন হেসে বললো, শনিবারের রাত্রে বারের দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সে উপোস করে। এ-জানলে আমি কিছুতেই সনাতনকে রাঁধতে দিতাম না, কিন্তু সনাতন এ সব বিষয়ে আমার কথামতো চলতে মোটেই রাজী নয়।

রান্না নয় তো, অমৃত! কিন্তু সনাতন সলজ্জভাবে ক্ষমা চাইলো, "মাছ নেই, আপনার অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়।"

মাছ! এতো যত্ন করে সামনে বসে কেউ গরম গরম রুটি খাওয়াবে তাই আমার অকল্পনীয় ছিল। তরকারিটা মুখে দিয়ে স্যাটা বোসের কথা মনে পড়ে গেলো। হোটেলের বিলিতি সুপ এবং মোগলাই কারিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বোসদা মাঝে মাঝে এই পাঁচমিশেলী বেঙ্গলী ঘ্যাঁটের জন্যে কুককে ফরমাস করতেন। একান্তই স্বদেশী এই ঘ্যাঁটের বিলিতি নাম দিয়েছিলেন—মিক্সড গার্ডেন চচ্চারি!

সনাতনও ব্যাপারটা ভোলে নি। আমাকে বললে, "আপনার মনে আছে? স্যাটাবাবু, এই তরকারি খেতে খুব ভালবাসতেন।"

সমস্ত রাত চাপা উত্তেজনায় ঘুম এলো না। মশা না-থাকা সত্ত্বেও পোকামাকড়ের কাল্পনিক কামড়ে বিছানায় ছটফট করছি। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখছি—গণপতিবাবুর দেওয়া মহামূল্যবান খামটা কলুটোলার মোড়ে পকেটমার হয়েছে! ধড়মড় করে উঠে দেখি খামটা হারায় নি। বালিশের তলায় যেমনটি রেখেছিলাম—ঠিক তেমনটি আছে। অলীক উত্তেজনায় সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

শুভরাত্রি জানাবার আগে সনাতন নিজেও আমার চাকরি সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোনো খবর নিজেই এখনও জানি না। তবু উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলাম, "বেশ ভাল চাকরিই জুটেছে মনে হচ্ছে, সনাতন।"

সুখবরে বেজায় খুশী হয়ে সনাতন বলেছিল, "আমি জানতাম, আপনার বড় চাকরি জুটবে। শাজাহান হোটেলে যাদের ট্রেনিং হয়েছে তাদের সঙ্গে কম্পিটিশনে ইন্ডিয়ায় কেউ পেরে উঠবে না—আমরা সব জায়গায় চাম্পিয়ন হবো।"

সনাতন তুমি আমার দুঃখদিনের বন্ধু—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু এ-চাকরি তো আমি কম্পিটিশনের জোরে নিজের এলেম দেখিয়ে পাইনি। পিতৃবন্ধু গণপতি সামন্তর ধরাধরিতেই কোনোক্রমে ভাগ্যের সিকে ছিঁড়েছে। কিন্তু এমনই কপাল, সে কথা কাউকে বলবার উপায় নেই। গণপতিবাবুর নির্দেশ, "তোমার এই চাকরির পিছনে যে আমি আছি, এ কথা যেন কাকপক্ষী জানতে না পারে।"

সনাতনকে অন্তত ব্যাপারটা বলবার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নামটা প্রকাশ করতে সাহস পেলাম না, গণপতিবাবুর গা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। গণপতিবাবু শুধু শুধু কেন যে এমন দিব্যি করালেন।

ভোরবেলায় আমি উঠে পড়েছি। আমার চলাফেরার খুটখাট শব্দে সনাতনেরও ঘুম ভেঙে গেল।

সনাতনের এই সময় ওঠবার কথা নয়—রবিবার সকালে সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ঘুম থেকে উঠেও আলস্য করে, অর্থাৎ বিছানা ছেড়ে ওঠে না, কুমিরের মত গা-ছড়িয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে।

সনাতন আজ উঠে পড়লো। কুলুঙ্গিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেব-দেবীদের আলাদা-আলাদা নমস্কার করে সে গ্যাসের উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিল। ততক্ষণ আমি গোসলের কল খুলে দিয়ে একটা ফুটো ডেকে মগের মত ব্যবহার করে স্নান সেরে ফেলেছি। ওর কাছ থেকে রবারের নল চাইনি বলে সনাতন রাগ করলো। তারপর সে নিজেও দ্রুত স্নান সেরে নিল, সদ্যস্নাত অবস্থায় সনাতন এবার চা তৈরিতে মন দিল।

ভারী সুন্দর একটা কাপে সনাতন আজ আমাকে চা দিল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট। সনাতন ব্যাপারটা চেপে রাখলো না। —ফোর্ডসন ইন্ডিয়ার খোদ বড়সায়েব প্রতিদিন যে-কাপে চা-কফি পান করে থাকেন সেই পাত্রটাই সনাতন আজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। বড়সায়েবের নাম শুনে সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো। খোদ বড় সায়েব যদি একবার জানতে পারেন তাঁরই কাপে ক্যানটিনের এক শরণার্থী চা খেয়েছে! দ্বিতীয় দফা দেবদেবী নমস্কার সেরে সনাতন আমাকে শান্ত করলো, "কেন বড় সায়েবের গেস্ট আসে না? এমনও তো হতে

ায়ে, একদিন গটগট করে আপনি ই কোম্পানির খোদকর্তার সঙ্গে দেখা রতে আসবেন—ঘণ্টি বাজিয়ে বড় সায়েব াপনাকেই চা দেবার জন্যে আমাকে হুকুম রবেন।"

সনাতন তোমার মুখে ফুল ন্দন পড়ুক। কিন্তু ওসব এ জন্মে সম্ভব বে না। মনে মনে ওড়িশানিবাসী নাতনকে জিজ্ঞেস করলুম "তুমি তো ামার কেউ নয়—আমাদের ভাষা, দেশ, াত, শিক্ষা সব আলাদা। তবু কেন তুমি ামাকে এমনভাবে আপন করে নিয়েছো?"

ময়ের শেষে সনাতন সজল চোখে ামাকে বিদায় দিয়ে বলেছিল, যেখানে াচ্ছি সেখানে যদি কোনো অসুবিধে হয় া হলে যেন আমি সোজা সনাতনের ্যানটিনে ফিরে আসতে দ্বিধা না করি। দারোয়ানের কাছে পারমিশন তো নেওয়াই াছে—আপনি যতদিন খুশী থাকবেন, াপনার কোনো অসুবিধে হবে না," নাতন আশ্বাস দিয়েছিল।

ভোরবেলায় এই সময় কলকাতার ট্রামে েমন ভিড় থাকে না। পিক-আওয়ারের নেক নিয়মকানুন সদাশয় কণ্ডাক্টররা এই ময় প্যাসেঞ্জারকে মেনে চলতে বাধ্য করেন া। আমার বাইশ ইঞ্চি চামড়ার ব্যাগ ও তরঞ্জিমোড়া বেডিংটা ট্রামের ফার্স্ট ক্লাশে ুলতে তেমন অসুবিধে হলো না।

সোনালী রোদে ভোরের কলকাতা িস্নিগ্ধ পবিত্র হাসিতে ঝলমল করছে। মান ট্রামের জানালা দিয়ে গড়ের াঠের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে মনে লো মহাকাশের অদৃশ্য আয়ুষ্মতীরা ারী পৃথিবীর গাত্রহরিদ্রা উৎসবে বেত হয়েছে। রসবতী কোনো াচারিণীর প্রগলভ নির্দেশে ওয়েসেন্ট হলুদ রঙ লজ্জাবতী পৃথিবীর দেহে ছড়িয়ে পড়ছে।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রকৃতির ই আনন্দ যজ্ঞে অনেক দিন আমি শ গ্রহণ করিনি। নতুন জীবন ুরু করার প্রথম প্রভাতে আমি অকস্মাৎ ন এক অনুভূতির স্পন্দনে বিভোর হয়ে াছি।

সংসারের এই বিচিত্র যাত্রার পথ-িস্তিতে আমি মাঝে মাঝে হতাশা ও িন্ত অনুভব করেছি। জীবনের ৃশ্য দেবতাকে একান্তে কর-াকে করুণভাবে প্রশ্ন করেছি, 'প্রভু, আর তদিন? মানসিক বয়োবৃদ্ধি ও জরার মস্ত লক্ষণ আমাকে বিপন্ন করে তুলছে।' ন্তু রবিবারের এই প্রসন্ন ভোরবেলায় ামি আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠছি—আমার

হারিয়ে-যাওয়া আশা আবার আমার হৃদয়ে ফিরে আসছে। নতুন পরিবেশে, নতুন জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত। আমার কীসের দুঃখ? কীসের দৈন্য? সব কিছু হারিয়েও যে সনাতন ও গণপতির মতো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে তার কীসের ভয়, কীসের ভাবনা?

পার্ক স্ট্রীট মেয়ো রোড পেরিয়ে উত্তর বাহিনী ট্রাম এবার মরা-সোসাইটির হলদে বাড়িটার সামনে দিয়ে অভয়ারণ্যে হরিণীর মতো আপন আনন্দে ছুটছে। আমার লটবহরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে মধ্যবয়সী কণ্ডাক্টর সায়েব নির্ধারিত স্টপেজের একটু আগেই ঘণ্টি মারলেন। সকালবেলায় পৃথিবীর সবাই বোধ হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রসন্ন থাকেন—কারণ কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না-করেই ড্রাইভার সায়েব সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টির নির্দেশ মান্য করলেন।

কয়েক মুহূর্তের সেই সুযোগে আমি চৌরঙ্গীর রাজপথে নিরাপদে নেমে পড়লাম।

এই ভোরবেলায় সরকারী আর্ট স্কুলের এক হবুশিল্পী গাছের তলায় বসে আপন মনে তার নিজের কলেজের শতাব্দী প্রাচীন গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় কলেজের এই লৌহকপাটের নানা মুড সে ক্যানভাসে ধরে রাখবার আশায় অনেকক্ষণ এখানে ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

চৌরঙ্গীর প্রশস্ত রাজপথে এখনও সদা-ব্যস্ত যানবাহনের চিহ্ন নেই। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে চৌরঙ্গী এই ভোরবেলাতেই যেন একটু ঘুমিয়ে নেয়—দুরন্ত অবাধ্য অনেক শিশুদের মতো চৌরঙ্গীর এখনই মধ্যরজনী।

প্রশস্ত এই রাজপথ নির্দ্বিধায় পেরিয়ে এসে যাদুঘরের উত্তর দিকের সরু রাস্তার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। এইমাত্র

গড়ের মাঠে যে ঝলমলে সূর্য দেখে এলাম, কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই খেয়ালী সূর্য পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া এই রাস্তার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

পকেট থেকে গণপতিবাবুর দেওয়া খামটা বার করে ঠিকানাটা দেখে নিলাম। রাস্তার নাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার তাকালাম অপরিচিত এই পথের দিকে। অদূরে সায়েবী নামাঙ্কিত এক বিরাট বিভাগীয় বিপনির বন্ধ দরজা। তারই পাশে আর একখানা পুরনো বাড়ি। শীর্ণ বিবর্ণ একসারি রেলিং গলিত নখদন্ত সান্ত্রীর মতো বৃদ্ধ বাড়িখানা পাহারা দিচ্ছে। সেই রেলিঙেরই এক কোণে এই পথের অস্পষ্ট বিবর্ণ পরিচয় পত্র ঝুলছে। ঝুলোতে ঢাকা হলেও সামান্য চেষ্টাতেই পড়া যায়—সাডার স্ট্রীট। আমি ভাবলাম—হ্যারিংটন স্ট্রীট, মেয়ো রোড, কিড স্ট্রীট ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় সায়েবদের নামাঙ্কিত পথ পেরিয়ে এবার হয়তো সাডার নামের কোনো এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজনন্দনের ঐতিহাসিক স্মৃতিধন্য এলাকায় হাজির হলাম। স্বাধীন কলকাতার এই অঞ্চলে সায়েবরা এখনও 'পাস্ট টেন্স' হননি—রীতিমত 'প্রেজেন্ট টেন্স' হয়ে রাজত্ব চালাচ্ছেন।

[illegible] 'সাডার' সায়েবের একটা ছবিও দেখতে পেলাম। রাস্তার মেজাজ দেখে কল্পনা করলাম ঈষৎ স্থূল এক কটিবলামুখ মধ্যবয়সী বৃটিশনন্দনকে। সায়েবের বিরাট গোঁফ এবং চিবুক পর্যন্ত নেমে-আসা গালপাট্টাও আমি সেই মুহূর্তে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। মরচে-পড়া জরাগ্রস্থ পথলিপিখানা দেখেই মনে হলো কলকাতা কর্পোরেশন কয়েক যুগ আগে সেই যে নামকরণের কর্তব্য সেরেছেন তারপর হয়ত কখনও সায়েবের কোনো খোঁজখবর নেয়নি।

এই অবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করাই উচিত ছিল। কিন্তু আজকের ভোরবেলায় কারও ওপর বিন্দুমাত্র অপ্রসন্ন হওয়ার মতো মানসিকতা নেই আমার। মনে মনে কর্পোরেশনের সমস্ত কর্মচারিকে ক্ষমা করে দিলাম। ভাবলাম কোথাকার কে সাডার সায়েব? এতোদিনে তাঁর তিন পুরুষ নিশ্চয় মরে ভূত হয়ে গেছেন। সুতরাং কবেকার কোন্ পুরনো কাল্পনিক সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? সাডারের আসল ইতিবৃত্ত তখনও আমার জানা হয়নি।

মিউজিয়মের লাগোয়া ফুটপাথের কাছে রঙ সাইডে পার্ক করে একখানা রিকশ মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভোরবেলায় রাস্তায় আর একটিও মানুষ নেই। সায়েবী সাডার স্ট্রীট যে এখনও বাবিবাসরীয় প্রভাতী ঘুমে আচ্ছন্ন তা বুঝতে সময় লাগলো না।

"রিকশ, রিকশ"—দু'বার ডাকেও রিকশওয়ালা কোনো আগ্রহ দেখলো না। মালপত্র ফুটপাথের ওপর রেখে রিকশর সামনে গিয়ে দেখলাম, নিজের দেহটাকে বিচিত্র কায়দায় কয়েকভাঁজ করে রিকশ-ওয়ালা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গমুরারি এই রূপ দেখে আমার মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ক্ষমাসুন্দর ছবিটিও ভেসে উঠলো। আমি কিছুক্ষণ ওই ঘুমন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বেশ কয়েক ডাকেও ঘুম ভাঙছে না রিকশওয়ালার। এই সময় এ-পাড়ায় যে নতুন যাত্রীর যাতায়াত একটু কম তা আন্দাজ করতে পারছি। রিকশওয়ালাকে কয়েকবার ডাকবার পর সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ খুললো। আমাকে ভাল করে যাচাই করে নিয়ে সে একবার চোখ রগড়ালো। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে বিরক্তভাবে যা নিবেদন করলো তার অর্থ—আমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অনেক ব্যাপারে আমার যে অযথা দেরি হয়েছে তা অবশ্যই আমার অজানা নয়। কিন্তু আজ কিসে দেরি করলাম? এবং আমি দেরি করলেও রাস্তার রিকশ-ওয়ালার তাতে কী এসে যায় তাও বুঝতে পারছি না। শুভ কাজে বেরিয়ে প্রথমেই এই বাধা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

বিরক্ত রিকশওয়ালার ঘণ্টাটা এবার নিজেই বাজিয়ে দিলাম। রিকশওয়ালা নিদ্রাভঙ্গের জন্যে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় বললো, "সমস্ত রাত এখানে জেগে কাটিয়ে দিলাম তখন এলেন না। এখন সূর্য উঠে গিয়েছে—সব দরজা বন্ধ, কোনো জেনানা পাওয়া যাবে না। আপনি সকাল দশটার পরে আসুন", এই বলে রিকশওয়ালা আবার ঘুমোতে যাচ্ছিল—কিন্তু এবার আমি ধমকানি লাগালাম। বললাম, "রাস্তায় রিকশ দাঁড় করিয়ে রেখে কী সব আবোল তাবোল বকছো? যদি রিকশ নাই চালাবে, তাহলে গাড়ি গ্যারেজ করে দাওনি কেন?"

রিকশওয়ালা এবার সংবিৎ ফিরে পেল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে আমাকে সেলাম করলো। আমার গন্তব্যস্থান ও খামের ওপর লেখা নাম বলায় রিকশওয়ালা আর একখান সেলাম ঠুকলো। বললো, "হুজুর, সকালবেলায় বউনি! পুরো পাঁচসিকে লাগবে।"

দূরত্ব কতখানি, কীভাবে যেতে হবে জানি না—সুতরাং রিকশওয়ালার দামে রাজী হয়ে গেলাম।

আমার ব্যাগ ও বিছানা রিকশয় তুলতে তুলতে কাঁচা ঘুম-ভাঙা রিকশওয়ালা বললো, "হুজুর আমার কসুর মাফ করবেন। কাল রাতে সাড়ে-এগারোটা থেকে রাস্তায় জেগে বসে আছি। একটা পেসেঞ্জার মিললো না।"

রিকশওয়ালার মুখে শুনলাম রাত্রে সওয়ারী না-মিললে রিকশওয়ালাদের চোখের ঘুম অদৃশ্য হয়ে যায়। বহু ঘণ্টা ব্যর্থ অপেক্ষা করে ভোরের আলো পড়লে তবে নিরাশ রিকশওয়ালা চোখের পাতা বুজেছে। এ সময় এ-পাড়ায় খদ্দের আসে না। বাসায় ফিরে যাবে ভেবেছিল রিকশওয়ালা—কিন্তু বউনি না করে একেবারে খালি হাতে ঘরে ফিরতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

ঠুন ঠুন। রিকশওয়ালা এবার গাড়ির হ্যাণ্ডেল তুলে ফেললো। "হুজুর আমি ভেবেছিলুম—কোনো ফালতু আদমি।"

ঠিকই ভেবেছে রিকশওয়ালা—ফালতু আদমি ছাড়া আমি কী?

ফালতু আদমির আরও অর্থ আছে তা অচিরেই বুঝলাম। রিকশওয়ালা বললো, এই ফালতু আদমিরা একদম ফালতু আছে! সারারাত প্রাইভিট মদ খেয়ে রাস্তায় টোঁটোঁ করে ঘুরবে—ভোরবেলায় এসে রিকশওয়ালাকে জ্বালাবে গার্ল ফ্রেণ্ডের জন্যে। একদম ফালতু আদমি বাবু—এদের পকেটে একটা পয়সাও থাকে না; রিকশ ভাড়া পর্যন্ত আদায় হবে না।

আমি তাজ্জব। এ আমি কোথায় আসছি? এই ভোরবেলায় আমার যেন নতুনভাবে নগরদর্শন হচ্ছে।

রিকশওয়ালা ঘুমের ঘোর কাটবার জন্যেই যেন একটানা ঘণ্টি বাজানো শুরু করলো—ঠুন ঠুন, ঠুন ঠুন। ঘুমন্ত সাডার স্ট্রীটের মধ্য দিয়ে আমার রিকশ এবার মধ্যগতিতে চলতে শুরু করলো।

[ক্রমশ]

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

চৈতন্য কলা-বিজ্ঞান কেন্দ্র

বিগত ষোল বছর ধরে এই কেন্দ্র উত্তরপাড়ায় শিল্পকলা শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। কলকাতায় প্রতি বছর একটি চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এবারও প্রদর্শনীর যথারীতি আয়োজন করা হয়েছিল আকাদমী অব ফাইন আর্টসের চিত্রশালায় (১৪—২০ জুন)। কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং শিল্পগুরুর ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আর্টের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

এর আগে ব্যক্তিগতভাবে এই কেন্দ্রটির কোনো প্রদর্শনী দেখিনি। এবারকার প্রদর্শনী কিন্তু তেমন সুবিধার লাগল না।

শিল্পসৃষ্টিতে আন্তরিকতা হয়তো যথেষ্ট নয়, সবও নয়। আমরা শিল্পীদের কাছে সামান্যতম দক্ষতা আশা করি এবং চিত্রাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাও খুঁজি তাঁদের কাজে। তাছাড়া বর্তমান কালের বিষয়ে শিল্পী সচেতন থাকবেন, এটাও চাই।

এই প্রদর্শনীতে জলরঙ, প্যাস্টেল, রেখাচিত্র এবং দু-একটি তৈলচিত্র নজরে পড়েছে। কিন্তু দুটি জিনিসের অভাব মনকে ভারাক্রান্ত করেছে—নৈপুণ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা। বিশেষভাবে চিন্তার দৈন্যই পীড়াদায়ক। অথচ কলাকেন্দ্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় দলের কাজই প্রদর্শিত হয়েছে।

ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা যেমন, তেমনি তার পুনর্মূল্যায়নও প্রয়োজন। এক ধরনের মধ্যযুগীয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া তৈরী হয়েছে। অথচ যে মুনশীয়ানা থাকলে এই যুগকে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপিত করা যেতো, তাও অধিকাংশ শিল্পীর আয়ত্তের বাইরে। এর মধ্যে চৈতন্যদেবের রেখাধর্মী 'গঙ্গাচিত্রে' বরং রসের আভাস মেলে। বস্তুত এমন নৈরাশ্যজনক যৌথ প্রদর্শনী আমি কম দেখেছি।

এ যুগের নন্দনতত্ত্বের আলোকে পুরাতন প্রতীক ও প্রতিমা কতদূর পুনঃপ্রচল করা যায় সেটা অবশ্যই বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যা কিছু দেশজ তাই শ্রেয়—এমন একটা ভাবের, জাতির জীবনের চরম সংকটকালে, যদি বা প্রয়োজন পড়ে, তারপর কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধরলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি।
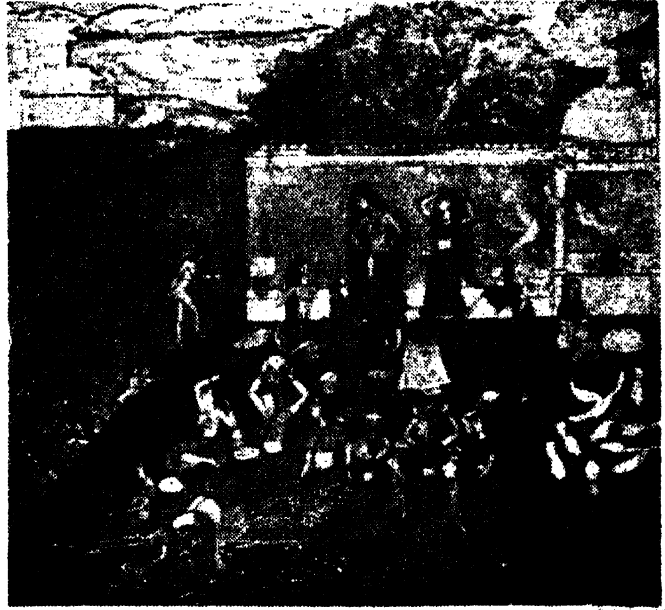
বাণীনাথ ঘোষের 'পঞ্চকন্যায়' মধ্যে এক ধরনের সারল্যই আছে শুধু। বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'উদয়পুর বাজার'-এ পুরোনো আমলের সাহেবদের আঁকা ছবির ধরন আর লোকশিল্পের বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে। রাস্তার ভিড়, গরু-ছাগল, দোতালায় ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সাহেব—চিত্রীকরণ হিসাবে মন্দ নয়। কিন্তু তাঁর 'স্নানযাত্রা' ছবিতে পরিশ্রমের ছাপ থাকলেও, রচনা-সৌকর্য ও ভারসাম্যের অভাব প্রকট। ছবিটার কোনো কেন্দ্রস্থল নেই—দেওয়ালে দাঁড়ানো মেয়েটিকে কেন্দ্র বলে ধরে নিয়েও দেখা যাবে, ভারসাম্য বজায় রেখে নারীদের সাজানো হয়নি। ভিড় দেখাবার জন্যে অনেক মেয়ে-মানুষ—এমন কি কিছু নগ্নিকা নারীকে—ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে নকশার কথা না ভেবে। বিশেষত ঘাটের সিঁড়ি, নদী, ওপারের বাড়িঘর মূল রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন। তা ছাড়া অঙ্কন, বর্ণলেপন ইত্যাদিও খুব কাঁচা।

স্নানযাত্রা — বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়

যথারীতি এতে তথাকথিত 'তান্ত্রিক' ছবি ছিল, ছিল নিসর্গচিত্র, প্রতিচিত্র, পুষ্পচিত্র সাগরচিত্র—অর্থাৎ বৈচিত্র্যের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু সব কাজই এমন বিশেষত্বহীন যে আলাদাভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখি না।

সন্দীপ সরকার

হায়ার নদীতে আশ্বিন মাসেও এক-গলা জল। আষাঢ়, শ্রাবণে মাথা ছাপিয়ে যায়। কপনার মুণ্ডু মালসার মতো ভেসে আসছিল। সঙ্গে দুটো গাই, তাদেরও শরীর ছিল না। এই গাই আসছে পাদ্রী সাহেবের জন্যে। দুধের অভাবে ভগবানের নাম করতে তাঁর বড় অসুবিধে হচ্ছিল। বন-জঙ্গলেও শহরের ভেজাল ঢুকেছে। আজকাল জলের সঙ্গে একটু-একটু দুধ পাওয়া যায়। তাই দু টাকা করে সের। তাও কি সহজে মেলে? ছুটোছুটি, খোশামোদ, তকরার—তবে একটু জল খেতে পায়। না, জীবনে স্বস্তি নেই। স্বস্তি বড় বনের পাখি।

আর লোকগুলোও বড় অদৃষ্টের ধামাধরা। মড়ে বসতে পড়ে গেলে অদৃষ্টের দোষ দেয়। ফাদার পেটিগ্রু কত বাবা-বাছা করেছিলেন। কেউ গরু দিতে পারে নি। সবাই কপাল চাপড়েছিল: 'হেই দ্যাখেন, গাই-দুধ কুথাকে পাবেন পাদ্রীবাবা। কল-কারখানা কোলিয়ারী সব লিঁয়ে লিচ্ছে যে গ'। ইয়ার পর ঘাস আলুটিও মিলবেক নাই।'

কথা খুব মিথ্যে নয়। মাটিতে কাঁড়া-আঁকাড়া যা জন্মাচ্ছে, মানুষ হুপ-হাপ করে খেয়ে ফেলছে। ইণ্ডিআর আসল গড শিব নয়, বিষ্ণু নয়—ওই পেটসর্বস্ব গণেশ। লোকে এবার তাঁর ইঁদুরটাকেও খেয়ে ফেলবে। এই অঞ্চল থেকেই পনেরো হাজার ডিম পাঁচশ খাসি রোজ কলকাতায় চলে যায়। তিন বছর আগেও কিন্তু এত টানা-টানি ছিল না। দুধ, মুরগী শাকসবজী দিব্যি পাওয়া যেত। এক সিএমএ-র অফিস বসতে সব উধাও হয়ে যেতে লাগল। শোঁসে যাও, বুগবুগায় যাও হাট খালি, বাজার আক্রা। ব্যাটা শুকুরা ওঁরাও তিন বছর আগে পেটিগ্রু-র গীর্জার জমিতে পাটা দেবার জন্যে সাধাসাধি করত। এখন সে সাড়ে এগারো টাকায় মুরগি ঝুলিয়ে হাট থেকে ফেরে, বগলে বোতল। গাছের পাতাও কারুর কারুর কাছে নম্বরী নোট হয়ে গেছে। না, স্বস্তি বড় বনের পাখি।

এর আগে ফাদার পেটিগ্রু পাটা রেঞ্জে ছিলেন। সেখানে সুখের নাম দুধ আর গুড়। বনের ভেতর খাপরার চালের ঘর ছিল। কুয়োর পাশে প্রকাণ্ড চবুতরা। তাতে গম আর মকাই শুকোত। গাঁয়ের লোক বলোয়া হাতে সাঁ-সাঁ করে জঙ্গল পেরিয়ে চলে আসত রেডিও শুনতে। কেঁড়ে করে দুধ তাঁকে এমনি দিয়ে যেত। আর, নতুন ঝোলাগুড় কলসি-ভরতি। নতুন গুড়ের পাকা গন্ধ এখনও তাঁর নিশ্বাসে রয়েছে।

খাসা ছিলেন পেটিগ্রু। সুযোগ পেলেই ভগবানকে গাঁয়ের লোকেদের কাছে বিক্রী করতেন। বেশ গণেশমার্কা খাঁটি ভুঁড়ি হয়েছিল। এখানে এসে সেই জিনিস পাঁচ আঙুল কমে গেছে। প্যাটনের গ্যালিস এমন কাছির মতো ঢিলে লাগে। কপালে দুধ, গুড়, সয় নি। সুখ বড় নম্বরী নোট। ফসফস করে খরচ হয়ে যায়। ক্যানবেরার গড-চার্চ গম আর গুঁড়ো দুধ পাঠিয়েছিল। ফাদার পেটিগ্রুর ভুলো মন। তিনি হিসেব রাখতে পারেন নি। বারোয়ারি আর ডাল্টনগঞ্জের খোলা বাজারে সেগুলো বিক্রী হয়। রাঁচি থেকে উপরওয়ালারা এসে বলেছিল, 'এ কি করেছ! ভগবান বেওয়ারিশ মাল। তাকে যত খুশি বেচ। কিন্তু তাঁর খাবার-দাবারের হিসেব না রাখলে তো চলে না। লোকে বলবে কি!'

ফাদার পেটিগ্রুকে পাটন রেঞ্জ ছেড়ে চলে আসতে হয়।

জলের উপর দিয়ে আলো চলে যাচ্ছে। একপাশ এর মধ্যেই ছায়া-ছায়া। আরেকটু অন্ধকার করে এলেই গাছে-গাছে, পাহাড়ে-পাহাড়ে জড়াজড়ি শুরু হয়ে যাবে।

ফাদার পেটিগ্রু নদীর এপারে দাঁড়িয়েছিলেন। কপনা প্রায় এসে পড়েছিল। তার মুখের ওপর অন্ধকার জমে উঠছে। পেটিগ্রুকে সে ঝকঝকে দাঁত দেখাল। কিন্তু পেটিগ্রু গাই দুটো দেখছিলেন। হাঁটু জলের তলায় কিন্তু আড়া দেখে মনে হচ্ছিল, নধর দুধেলা গাই। সকালে আধসের, রাতে ক্ষীর খাওয়ার পরও দুধ বেচা যাবে।

নেহাৎ ওই যমদূতটা ছিল তাই, নইলে এ-ও ফসকে গিয়েছিল। নওয়াদার এক উঠতি ভুঁইয়ার দাদা দেব-দেব করছিল, সেই সময়ে কপনা ডাকাতের মতো গিয়ে পড়ে। লোকটার মুখের খাদ্য ছোঁ মেরে নিয়ে এসেছে।

কপনা ছেলে বড় চৌকশ, বরাত মন্দ; বার তিনেক জেল খেটেছে। তা কি করা যাবে: পেট সামলাবে না বউ সামলাবে! দুটোই বড় বেসামাল অবস্থা। বউটা বড়
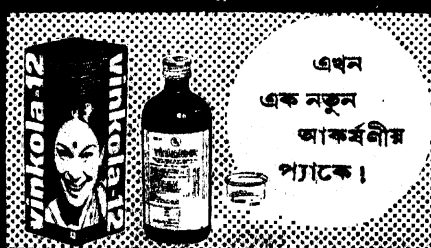
ষারমুখো, আজুলী মেয়েছেলে। একবার তার জন্যে মার-দাঙ্গা, রক্তারক্তি করতে হয়। যে-সেপাইটা তদন্তে এসেছিল সে কপ্‌নার বউকে পরিষ্কার চোখ মারে। তাতে ওর খুন আরও চড়ে যায়। সেপাইটাকেই ও ঘা-কতক বসিয়ে দিয়েছিল। তার বুকের লোম ছিঁড়তে যাচ্ছিল, ফাদার পেটিগ্রু রুখে দিয়েছিলেন। কপ্‌নার ছমাস জেল হয়। বরাত বড় এক চোখো। একই বস্তিতে শুকরা আর কপনা থাকে। শুকরা সি এম এ-র দৌলতে মুরগি খায়, পালিশ করা মহুয়া খায়। আর একটু কাঁজি, একটু পকচিসেদ্ধ জোটাতে না পেরে কপনাকে চুরি করতে হয়। গত বছর 'করমা' পুজোর আগে র‍্যামসবটম সাহেবের কিচেন থেকে ও রান্না করা গরুর মাংস, চাপাটি, চকোলেট-পুডিং চুরি করেছিল। আর একবার বটব্যালবাবুর বাড়ি থেকে এক বস্তা সরিষা। দুবারই পেটিগ্রু রুখতে চেয়েছিলেন। পারেন নি. পাঁচ মাস জেলের হাওয়া খেয়ে এই কিছুদিন হল সে ফিরেছে।

লোকে ফাদার পেটিগ্রুকে নিন্দে করে। যতসব চোর-চামারকে আসকারা দেওয়া! শুধু তাই নয়, গোঁফের তলায় তারা সব জান্তার হাসি হাসে। পাদ্রীবাবাই আসলে গণেশবাবা। আর ওই ব্যাটা তার ইঁদুর। কপনার চুরির মালে পেটিগ্রুর ভাগ থাকে নির্ঘাৎ. আর উনিও ওকে খয়রাতি গম, গুঁড়ো দুধ কমাবার কাজে লাগান। বলুক, ফাদার পেটিগ্রু এ সব গ্রাহ্য করেন না। বড় অজ্ঞান, অচৈতন্য। ভগবানের হাত কত লম্বা আর মানুষ হ'ল গিয়ে লিলিপুটের বাচ্চা। ভগবান নির্বিশেষে সকলকে হাতের তেলোয় নাচান ভগবানের কাছে ক্লাসস্ট্রাগল নেই। মানুষ স্বভাবে অন্ধ. চোখ থাকতে তার চোখ নেই। তাঁর ভুঁড়ি যে পাঁচ আঙুল কমে গেছে, কই তারা তো দেখেও দেখে না! অন্তত গ্যালিসটা তো নজর করবে! সেটা যে কাছি হয়ে গেছে।

মাঃ, স্যানসক্রিট লিটারেচার এদিক থেকে সত্যি উৎকৃষ্ট. তাতে বেশ দামী-দামী কথা বলেছে...'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়াঃ'। কে বুঝবে এসব কথা! মানুষ বড় মূর্খ, তারা ভাবে সিঁদকাঠি আর জ্ঞানাঞ্জন শলাকা বুঝি এক। শুকরা ও'রাওকে যদি সি এম এ আশ্রয় দেয় তো কপনাকে ভগবানের আশ্রয়ে যেতেই হবে। এ তো অতি সহজ কথা। তিনি ভগবানের লাইফওয়্যার সেলসম্যান। একটা আস্ত জীবকে ফসকে যেতে দেন কী করে?

কপনা পাড়ে উঠে চুলের জল ঝাড়ল। ছোকরার হাঁতে গায়ে বেশ তিজ আছে।

ল্যান আপনকার গাই, পাদ্রীবাবা! ইখার কন্তুক পাব্ব নাই ইটো জানাবেন।' কপনা াতি বের করল। কোমরের তলায় আধ-াত কাপড় ছিল। সেটা খুলে ফেলে সে একদম উদম হ'ল। তাই দিয়ে গা ুছতে লাগল।

ফাদার পেটিগ্রু চোখ নামিয়ে গাইয়ের ভজে গায়ে হাত বুলোলেন। 'ক্যানে রে! বার কী বটে?'

'জ্বর, ছাড়ব নাই।' কপনা ভিজে াপড় আবার কোমরে জড়াল।

'কী লিবি? অত লিবার চিন্তা ্যানে রে?'

'বাঃ, অ্যামা জুটোয়ে দিলম, জন্ম াই।' কপনা একটা গাইয়ের পিঠে থাপ্পড় ারাল।

'বিটিছেল্যার দুধিওস্তা আর গাইয়ের টই যদি ঠিক থাকে তো জানবেন ুনিয়া ঠিক রয়্যাছে।' বলে সে তড়াক করে াইটার পিঠে চড়ে বসল।

নদীর জলে দিন ফুরোচ্ছে। কপনা আর গাইটার শেষ ছায়া পড়ল মাটিতে। ্যাটা সাক্ষাৎ যমদূত যেন। কিন্তু 'বিটি-ছল্যা'র কথায় পেটিগ্রুর মনে পড়ে গেল। তখানি সাইকেল চালিয়ে নদীর পাড়ে তিনি জোড়া গাই রিসিভ করতে আসেননি। কপনাকেও একটা জরুরী খবর দেওয়ার ছিল। ওর সেই 'আজুলী বউটা আজ বোধ হয় একটা কাণ্ড বাধাবে।

নাঃ জরু আর গরু জীবের বড় যন্ত্রণা।

'কপনা তু সিধ্যা ঘরকে যা।' ছেলেটার বুকেও ডিম আছে। এমন ডিমভরা তাগড়া একটা শরীর কাজের অভাবে বিফলে গেল। বড় অপচয় চার দিকে।

কপনার কালো মুখ শিলপাটার মতো শক্ত হয়ে উঠছিল। সে হাতের ডিম নাচাল।

'ক্যানে পাদ্রীবাবা, ঘরকে কী আছে?'

ফাদার পেটিগ্রু কপনার ধাত, মেজাজ জানেন। রক্তে ওর সহজে শান পড়ে। তিনি হিউমার করলেন : 'ঘরকে জরু আছে, আর কি!'

কপনা ঠিক আঁচ করতে পারল। সর্বদা তুষের আগুন নিয়ে বাস। 'পাদ্রীবাবা! ই ঘুষকী বিটিছেল্যার কী গতি হবেক? আমি ত আর ইয়াক সামলাতে লারি। মন যায় উয়ার তল্যাটো ফুঁকে দি...।'

ফাদার পেটিগ্রু হাওয়ায় হাত তুললেন, 'ধীরে কাম লিবি কপনা! জরু তুয়ার গরু লয়। ফুঁক্যে দিলে দুধ বেরাবে? তু চুপ যা ক্যানে। ভগবান উয়ার ঠিক গতি করে্যা দিবেক।'

সিনাটাড়ের আশপাশ দিয়ে কয়লার অফিস। পিছনে সবুজ, গালচে-বিছানো পাহাড়, মাঝে বুকখোলা হা-হা করছে মাঠ। দূরে দূরে দু'একটা ইটখোলা। স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছে। পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়াল, দু' কামরার ঘর, ছাদ কংক্রীটের, প্রিভি ইন্ডিয়ান স্টাইল। সদর অফিসটা ভাড়া। এককালে আর্মি কোয়ার্টার ছিল। সাবেকি, পাতলা রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদ। লম্বা ছড়ানো বারান্দা। সেখানে টেবিল টেনিস খেলা হয়, নাচাও যায়। বেশ বিলিতি মৌতাত আছে বাড়িটায়। ফটকের কাছে প্রকাণ্ড গুলার গাছ।

ফাদার পেটিগ্রু যখন পৌঁছুলেন তখন বেশ অন্ধকার। তাঁর হাতের টর্চ জোনাকির আলো মনে হচ্ছিল। পিছনের পাহাড় সরে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। মাথার উপর দু'চারটি তারা। লর্ড ক্রাইস্টের চোখের মতো। ফাদার পেটিগ্রু চীনে জবা গাছের গায়ে সাইকেল রাখলেন। রান্নাঘরে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। পেয়ালা পিরিচের ঠুংঠাং আওয়াজ হচ্ছিল।
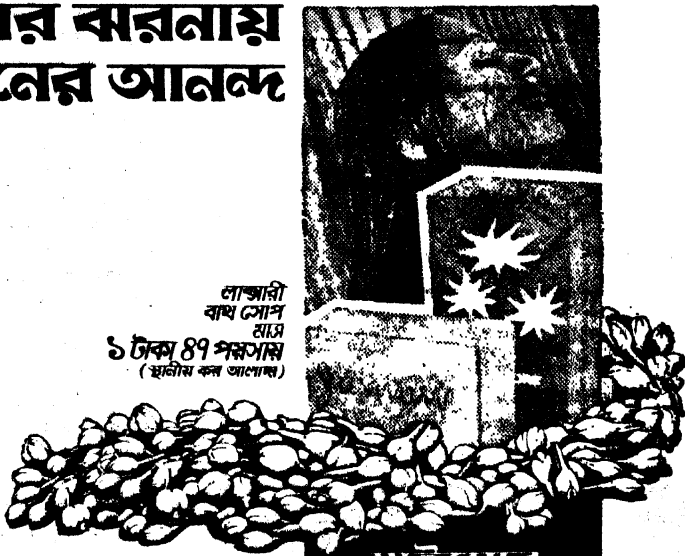
জামার আস্তিন ধরে সিঁড়ির কাছে টেনে আনলেন। কি নীল জমিদারী আকাশ! চাঁদের আলো গায়ে-মাখা সাবানের মতো গলে পড়ছে। বাতাসে গাছপালার সুগন্ধ নিশ্বাস। ছোকরা নাকি কবিতা লেখে। কিন্তু চোখ দুটো রাখে কোথায়? জাঁপিয়ার তলায়? মনটাকে তো মদে আর কয়লায় জং ধরিয়ে ফেলেছে। চারদিকের এই যে মহা সম্পত্তি...'সী' ফাদার পেটিগ্রু বলে, পাহাড়ে, আকাশে হাতছানি দিলেন। 'গড টুক এ গ্রেট ইকনমিস্ট।'

বিকিউঁনি এসে দাঁড়াল। হাত-ভরতি কাচের চুড়ি। হাতে কতবার আওয়াজ হল। খোঁপায় বাঁধুলি, কপালে লাল টিপ। কানে কাঁচা কাপড়টাও লাল। কিন্তু পায়ের কাছে তার এত মানানসই সাজগোজ মার খেয়েছে। বাঁ হাঁটুর তলায় একটা নীল ছাপ্প বসানো। বিকিউঁনি হাসল। হাসির আজকাল অনেক দাম। কে জানে মেয়েটা কোথা থেকে এই হাসি ধার করে আনে? ভগবানের কাছ থেকে না ডাইনির কাছ থেকে —ফাদার পেটিগ্রুর মাঝে মাঝে ধাঁধা লেগে যায়।

'ক্যারে?' পাধো মেঝের জুতো ঘষল। 'তু ক্যা কিয়া?'

'কুছ নেই সরকার।'

'কুছ নেই?' পাধোর গলা আরেক পর্দা চড়ল। 'তো ক্যা শুনতা হুঁ? কিসকা পাশ রুপিয়া পৈসা লিয়া হ্যায়?'

'নহী লিয়া হুজুর।'

'ফির ঝুটো বাত—'

এই সময় ফটকের কাছে কতকগুলো ছায়া পড়ল। তাদের ধড়, মুণ্ডু আলাদা করা যাচ্ছিল না। চাঁদের আলোয় কালি ছিটিয়ে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। তা ছাড়া শিমুল গাছের ছায়াও ছিল। তারা বিকিউঁনিকে চাইল। শুক্রবার হপ্তার দিন। নেশায় সবাই টান-টান হয়ে ছিল। ফাদার পেটিগ্রু বুঝতে পারলেন, এরা সিনাটাঁড়ের বাইরের লোক। তবে কাছে-পিঠের কেউ আছে নিশ্চয়ই। সে ব্যাটা মুখ দেখাচ্ছিল না। তবে কি শুকরা ও'রাও পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে? মানুষের এত অধঃপতন পেটিগ্রু মন থেকে মানতে পারছিলেন না। এক বস্তিতে বাস, শুকরার কনেকার সাঙাত কপনা। নাঃ, সম্পর্ক বড় ঠিকেদারী কারবার হয়ে উঠছে।

পাধো তেড়ে গেল, পেটিগ্রু বোঝালেন। লোকগুলো নেশা করেছিল, কিন্তু একবিন্দু টলল না। তারা মুখে-মুখে জবাব করল, আপনারা অন্যায় জুলুম করছেন। এই মেয়েটা বহুত রোজ আমাদের পয়সা খেয়েছে। রোজ বলে আসব, কিন্তু আসে না। কেবল গা বাঁচায়। আজ আমরা ছাড়ছি না। মহাজন পয়সা দিলে সুদে-আসলে খাদা খাদা জমি তুলে নেয়। আর আমাদের পয়সার দাম নেই? আমরা ওই দিটিছেলার এক টুকরো জমি পাব না? ভাল চান তো আমাদের হাতে জিম্মা করে দিন।

সেনগুপ্ত এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে বিড়বিড়িয়ে উঠল, 'লে হালুয়া, এরা দেখি নোংরা কথা বলে। তবে রে হারামখোরের দল—' এই বলে সে একটা বাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে তেড়ে গেল। 'বেরো এখান থেকে, বেরো বলছি। শালা ছোট জাত! হাতে দুটো পয়সা পড়ে রক্তে পেচ্ছাপে পয়সা ঢুকে গেছে?'

সেনগুপ্তের কষ দুটো আরও টকটকে হয়ে উঠছিল, মুখ থেকে পান ছিটকে পড়ছিল। মিত্তির আর চক্রবর্তীর এতক্ষণে সাহস এবং ফুরসৎ হল, 'সব পুলিসকো হাওলা কর দেগা। হাঁ, সব হাওলা কর দেগা।'

ছায়াগুলো গেল, কিন্তু শাসিয়ে গেল। যেতে যেতে নোংরা ছড়িয়ে গেল। আমরা দুম্বা নই, সব বুঝি। আমাদের ভাগিয়ে কয়লাবাবুরা নিজেরা ভোগ করবে, তাই এত বাহানা। আর বুড়ো পাদ্রীটার কোন মুরোদ নেই, ওর ভুঁড়ির ওপারে অন্ধকার। ও ব্যাটা ভগবানের নাম করে পাই-গরুর মতো গায়ে হাত বুলোবে। তাতেই ওর আনন্দ।

ফাদার পেটিগ্রু সাইকেল হাঁটিয়ে 'জ্যোতি ভবনে' চললেন। সঙ্গে বিকিউঁনি আসছিল। দূরের জঙ্গলে মাদল বাজছে। সামনের ঝাঁকড়া গাছের মাথায় সেই সুর কাতর কান্নার মতো আটকে আছে। চাঁদের আলোয় পথের লাল ধুলো রেণু রেণু সোনা হয়ে ছড়িয়ে ছিল। সন্ধেটা আজ তাঁর একদম মাটি। আপেল খাওয়া, অস্ট্রেলিয়ান নিউজ শোনা, ভগবানের নাম করা—কিছুই হল না। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পৃথিবীটা বড় আস্তাকুঁড়। যে-সে ধাঙ্গড়ের কর্ম নয় একে সাফ রাখা।

বিকিউঁনি হঠাৎ ফাদার পেটিগ্রুর হাত ধরে কেঁদে উঠল। তাঁর জামার হাতা খিমচে ধরে মুখ ঘষতে লাগল। 'আমি বড় খারাপ বিটিছেলা, পাদ্রীবাবা। আমার পার নাই। ই শরীলটো পাপে ভরে গেইছে...' ফাদার পেটিগ্রু মুশকিলে পড়লেন। এক হাতে সাইকেল, এক হাত মেয়েটা যেন আর কোনদিন ছাড়বে না। তিনি সাইকেল ভুঁড়িতে রাখলেন। বাঁ হাত আলতো করে ওর পিঠে দিলেন, 'চুপ যা, বিকি। ভগবান ঠিক গতি করবে দিবেক।'

বিকিউঁনি শান্ত হল না, আরও যেন ডুকরে, ফাঁপিয়ে উঠল। তার মুখ ঘষাঘষি আর খামচাখামচির চোটে পেটিগ্রুর আলখাল্লা ছিঁড়ে যাবার দাখিল। 'না পাদ্রীবাবা, ই জান আর রাখব নাই, ওলন্দা জলাশয়ে ঝাঁপে কুদে পইড়ব।'

তা পারে এ মেয়ে, ভাবলেন পেটিগ্রু। বড় কঠিন, আদিম স্বভাব। কোন কিছুই বাগে নেই। কাঁদলে নদী বইয়ে দিতে পারে। মিথ্যে কথার পাহাড় তৈরি করতে পারে,

রেগে—হ্যাঁ, তা নিজের চিতা জ্বালাতে পারে বই কি!

'জ্যোতি ভবনে'র পিছন দিকে বিকিউনির ঘর। খাপরার চাল লাউডগায় ঢাকা। চাঁদের আলোয় একটা লাউ ফুটে ছিল। মনে হচ্ছিল, মানুষের ন্যাড়া মাথা। কপনাকে ফাদার পেটিগ্রু সোজা ঘরে যেতে বলেছিলেন। সে ঘরেই ছিল, ছেলে দেখছিল। বিকিকিউনিকে সে ঘরে নিয়ে গেল।

ফাদার পেটিগ্রু একটু স্যুপ, একটু প্যানকেক খেয়ে রাত ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়লেন। কাল থেকে ক্ষীর খাওয়া যাবে। বেশ গাই দুটো হয়েছে। জঙ্গলে মাদলের শব্দ আর ফুরোচ্ছে না। একটু পরে শুধু তাঁর ভুঁড়ি জেগে রইল। ঘুমিয়েও সেটি তিনি দু-হাতে আগলে রেখেছিলেন।

রাত তখন ক'টা হবে কে জানে! ফাদার পেটিগ্রুর ঘুম ভেঙে গেল। পাশেই কোথাও ভীষণ গোলমাল, ছুটোছুটি হচ্ছিল। রাতে তিনি গেঞ্জি আর ইজের পরে শোন। ক্রুশ টাঙানো থাকে দেওয়ালে। তিনি সব ভুলে গেলেন। প্রথমেই তাঁর মনে হল, ডাকাত পড়েছে। বন্দুক আর টর্চ হাতের কাছে রাখা থাকে। সেই দুটি নিয়ে তিনি বৈঠকখানা ঘরের জানলা খুললেন। সামনে কিছু নেই, তাঁর নাকের ডগার ওপার থেকে খাঁ-খাঁ অন্ধকার। এই সময় একটা টর্চের আলো ছুটে এল। তিনি হাঁক পাড়লেন, 'ক্যা হুয়া রে? এ হল্লা—'

টর্চ জবাব দিল, 'আগ লাগা পাদ্রীবাবা! আপকা পিছে—'

ফাদার পেটিগ্রু অবাক হলেন। তাঁর পিছনে আগুন দিল কে? তাঁর পিছন মানে তো রান্নাঘর, হাঁস-মুরগির ঘর, তারপরেই গোয়ালঘর। অতি কষ্টের গাই দুটো সেখানেই রয়েছে। তবে কি—তাঁর বুক কেঁপে উঠল।

কিন্তু আগুন লেগেছিল কপনাদের বস্তিতে। শুকরার ঘর দাউদাউ করে জ্বলছিল। আকাশের একটা পাশ, গাছপালা লাল। ফাদার পেটিগ্রু যখন পৌঁছুলেন তখন জল ঢালাঢালি চলেছে। কয়লাবাবুরা এসেছে। পাধ্যে নিজে তদারকি করছে। পেটিগ্রু ঘড়ি দেখলেন, রাত বেশি হয়নি, এগারোটা। এর মধ্যে এত কাণ্ড! সময় বড় ঘটনাবহুল!

পাধ্যের কাছে পেটিগ্রু সব শুনলেন। কপনা শুকরার ঘরে আগুন দিয়েছে। রাতে বিকিউনি শুকরার ঘরে চলে গিয়েছিল। সে কয়লার অফিসে কাজ করে, তার বিস্তর হপ্তা মেলে। বিকিউনি তার কাছ থেকে দফায় দফায় টাকাও খেয়েছে। শুকরা তাকে অনেকদিন ধরে তাতাচ্ছিল। আজ সন্ধ্যের ছায়াগুলোর আড়ালে সেও ছিল। কপনা ঘুমিয়ে পড়ার পর বিকিউনি তার বিয়ের কাঁসার থালা, দু'একটা জামাকাপড়, মুখ দেখার আয়না, প্লাস্টিকের 'বুক' সব নিয়ে উঠোন পেরিয়ে শুকরার ঘরে চলে আসে। অথচ ক'ঘণ্টা আগে মেয়েটা পেটিগ্রুর কাছে পাপ কবুল করেছে, বলেছিল, চিতায় পড়বে। নাঃ, মেয়েমানুষের প্রকৃতি বড় ভয়ংকর!

কপনা ঘুমোয় নি। সে বলোয়া নিয়ে ওদের কাটতে যায়। গিয়ে যা দেখে তাতেই ওর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ঘুমন্ত ছেলেটাকে সে মাঠের মাঝখানে রেখে আসে। শুকরার দাওয়ার চালে শুকনো মকাই টাঙানো ছিল। কপনা প্রথমে তাতে আগুন দেয়। কত যত্ন করে শুকরা বিছানা পেতে ছিল। কপনা সেই বিছানায় ওরই লণ্ঠন ছুঁড়ে মারে।

আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল। লাউগাছ সুদ্ধ চালা ভেঙে পড়ল। ঢিলখাওয়া কুকুরের মত বিকিউনির যন্ত্রণার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে কান্না ঃ 'আমাক ছেড়ো' দে রে। আমি ওলদাকে কুঁদে পইড়ব।' কজন মেয়ে বোধ হয় তাকে ধরে রেখেছিল। হঠাৎ সে ফাদার পেটিগ্রুকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। ফাদার পেটিগ্রুর পরনে ইজের, গায়ে গেঞ্জি। ক্রুশ আনতে তিনি ভুলে গেছেন। বিকিউনিকে দেখে তিনি ভয়ে 'ওহ্ লর্ড' বলে চোখ বুজলেন।

পিছনে আগুনের আঁচ, চুল খোলা গায়ে কিছু নেই—বিকিউনি একদম ল্যাংটো। তাকে শ্মশানকালীর মতো দেখাচ্ছিল।

চক্রবর্তী কবিতার প্রেরণা পাচ্ছিল কিনা কে জানে! কিন্তু মিত্তল বমি করল নিজের গায়ে। পাধ্যে বলল, 'ইনক্রেডিবল।'

ফাদার পেটিগ্রু সহজে চোখ খুললেন না। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর গোয়ালে আঁচ পৌঁছয় নি। ভগবানের গাই দুটো নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'ম্যাডনেস।' সেনগুপ্তের কষে রক্ত, সে পান চিবুনো ভুলে বলল, 'লে হালুয়া।'

ঘরে বাইরে

রানী রাজকন্যা তো ছিলেনই, এবার রাজপুত্তুর !

ভেবেছিলাম রূপসীবরণের কথা এবার লিখবো না। অনেকবারই তো অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু সম্প্রতি ঝড়ের মত পর পর বেশ কয়েকটি 'বিউটি কনটেস্ট' হ'লো। সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা নতুনত্ব। রাজপুত্তুরের প্রবেশ একেবারে আনকোরা টাট্‌কা ব্যাপার। তার উপর আবার রাজপুত্তুরদের কেউ কেউ মেয়েদের টেলিফোন করে অল্পবিস্তর উত্যক্তও করেছেন। কেউ বা টেলিফোন যোগেই মস্করা করেছেন মেয়েদের মন মজাবার জন্য। কাজেই স্ত্রী-পুরুষের এমন সাম্যের যুগেও রাজপুত্তুর বাছা বেশ বিপজ্জনক হতে পারে। নতুনত্বই তো সব নয়। সেদিন দেখলাম কোন দেশে রূপসী-বরণ উৎসবের একটি শর্ত হলো সঙ্গে বেশ কয়েকটি ইঁদুরের ল্যাজ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে। ইঁদুরের উৎপাত কমাবার পক্ষে অবশ্য এটা একটা লাগসই ব্যবস্থা। কিন্তু সুন্দরীবরণ আর ইঁদুরের ল্যাজ সংগ্রহ কেমন যেন পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার ! কোথায় ইঁদুরের ল্যাজ আর কোথায় ললিতলবঙ্গলতা রূপসী! আমাদের এখানে নতুনত্ব অবশ্য নানারকম ছিল। তাই আজকের আলোচনার অবতারণা। কিন্তু ইঁদুরের ল্যাজ অবশ্যই ছিল না।

দুটি 'মহিলা-পত্রিকা' এই বরণ-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সাথী ছিলেন দুটি কৃত্রিম তন্তুজাত পোশাকের উপাদান উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কৃত্রিম তন্তু ভারতবর্ষের পোশাকের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু পোশাকের অবস্থা বদলে চলেছে। আভিজাত্যপূর্ণ কার্পাস বস্ত্র আর রেশম ক্রমবর্ধমান চাহিদা যোগাতে পারছে না। জন-সাধারণ যে পরিমাণ পণ্য চায় তাতে নতুন উপাদানের দরকার। জীবনযাত্রার ধারা বদলেছে। কৃত্রিম তন্তুর সুবিধা অনেক। এজন্য ফ্যাশনের বাজারে ঢেউ এসেছে কৃত্রিম তন্তুকে রকমারিভাবে ব্যবহার করার। পোশাকে মাত্র নয়, বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস কৃত্রিম তন্তু বা তার সংমিশ্রণে তৈরী।

এক মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী বিমলা পাতিল তাঁদের রূপসী বরণে আর একটি নতুনত্বের সংবাদ দিয়েছিলেন প্রেস্‌ কন্‌ফারেন্সেই। পোশাক পরিচ্ছদের নমুনা, ধারা বা গতিতে পত্রিকাটির অবদান প্রচুর। তা সত্ত্বেও তাঁরা এবার নতুন চিন্তায় সাজিয়েছিলেন সুন্দরীবরণ সমারোহকে। মেয়েরা দেখতে কেমন তা বিচারের বিষয় অবশ্যই বটে কিন্তু তাদের বর্তমান চিন্তাধারা কি বা আজকের বাস্তবকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন তাঁরা নিজেদের জীবনের সঙ্গে, এসব মিলে বরণ উৎসবের পালা ছিল। দেখলাম তাই এই সমারোহে সুন্দরীদের নানাভাবে প্রশ্ন করা হলো। কি তাঁদের জীবনের লক্ষ্য, কেমন স্বামী হলে তাঁদের পছন্দ, পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত কি—এই ধরনের নানা প্রশ্ন দর্শকদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল।

অন্য নতুনত্ব ছিল সমারোহকে ভিন্নভাবে সাজানোতে। মাঝে-মধ্যে নাচ বা সাধারণত যে-ভাবে প্রদর্শনীতে মডেলরা ওঠানামা করেন তার বদলে ছিল দোল খেলার পোশাকের বাহার বা ঈদের আনন্দ উৎসবে নারী-পুরুষের নানা সাজের পরিবর্তন। বোম্বাই-এর অষ্টাদশী মিস বম্বে নায়না বালসাবার ভারতসুন্দরী হয়েছেন। তাঁর দেহের গঠন চমৎকার ৩৬-২৪-৩৪ তাঁর ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস। বিচারকরা মনে করেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন তাঁর বাইরের রূপকে দিয়েছে সম্পূর্ণ সার্থকতা। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা মনোহারিণী নায়না কমার্স পড়েন। এখানেও শ্রীমতী পাতিলের কথা উল্লেখ করেই বলছি এবারের প্রতিযোগীরা এসেছিলেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে। দ্বিতীয় রানার আপ প্যামেলা গোস্বামী (কলকাতার রূপসী প্রধানা) অনেকগুলি

ভারতসুন্দরী নায়না

দোকানের মালিক। প্রথম রানার আপ বিনীতা বোস। হাসিখুশি গোলগাল বিনীতা বোস অমৃতশহর সুন্দরী।

দুটি সুন্দরী বরণ উৎসব গোষ্ঠীই ভারতবর্ষের বহু শহরে অনুষ্ঠানের পরে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেন দিল্লিতে। 'ফেমিনা'

কাগজ মোদিপনের সঙ্গে একযোগে রূপসীবরণ করছিলেন। উৎসব শুরু হবার পরই মোদি শিল্প গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান গুজরমল মোদির মৃত্যুর কারণে বরণউৎসব স্থগিত রাখা হয়। তাই এত দেরী। তাই এত কাছাকাছি ও ঠাসাঠাসি হয়ে দুটি কাগজের বরণোৎসব চলেছিল।

আর একটি নতুনত্বের উল্লেখ করতে প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। যদিও মায়না বাজসাবার কাঞ্চনবরণী ধনী কিন্তু শ্যামা মেয়ের স্থান শ্যামলতার জন্য বাধা পায়নি। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এও এক নতুনত্ব। রূপের মানদণ্ডে গৌরবর্ণ আর প্রধান গৌরব নয়। মার্কিন মুলুকে পথে ঘাটে সর্বত্র শুনবেন কালোই আলো বা ব্লাক। ইজ বিউটিফুল। শ্বেতাঙ্গ সমাজও শ্যামলতাকে কোমল নরম মাধুর্য বলে স্বীকার করছেন, তার রূপ ভিন্ন, পৃথক। কিন্তু রূপের হাটে অচল নয়। লায়লা শ্যামলী ছিলেন, মজনু ছিলেন গৌরবরণ। তাতে মজনু মজেছিলেন। পাঞ্জাবী অতীন্দ্রিয়বাদী কবি বুল্লে শাহ্ বর্ণ নিয়ে যে অনুভূতি আর ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করেছিলেন তা আমাদের রাধাকৃষ্ণের লীলায় ছেয়ে আছে। কৃষ্ণ কালো তাই কালো রূপের এত কদর। কিন্তু সে মান বিবাহের পণপ্রথার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেলে তবেই না সার্থকতা। বুল্লে শার কথা রূপসীবরণ উৎসব উপলক্ষে সংবাদপত্রে পড়লাম অনুবাদে। আমি কালো আর আমার প্রেয়সী কালো। আমরা কালো বলেই অভিহিত মানুষ। কোরাণের অক্ষর কালো। মসজিদে মসজিদে সেই কালো অক্ষর সবাই পড়ে। কাজল কালো, সেই কাজল টেনে দেয় রূপপিয়াসী মানুষ তার চোখে। বল বলে আমরা সাদা রং-এর কি ধার ধারি? পথে-ঘাটে শ্বেতাঙ্গের দেখা তো কতই মেলে? যাক, সংবাদপত্রটি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আমাদের প্রসঙ্গ হচ্ছে গৌরবর্ণ অসুন্দর বলছি না কিন্তু স্নিগ্ধ শ্যামলকে অবহেলা করা মনোবিকৃতি বা চিত্তাচ্ছন্নতা। মনের স্বাভাবিক অবস্থালোপী ধারণা। ভারতবর্ষে আর্যরা এলেন, বসতি স্থাপনা করলেন। তাঁরাই হলেন মান্য ও শ্রেষ্ঠ। অনার্যরা কৃষ্ণকায় তাঁরা নীচে রয়ে গেলেন। তারপর থেকেই প্রভুত্ব করেছে গৌরবরণ ফরসা মানুষ। তাই রূপের মানেও তাদেরই প্রভুত্ব। স্বর্ণকান্তি গৌরচন্দ্র বা কাঞ্চনবরণী রাধার রূপের প্রশস্তির সঙ্গে তার যোগ নেই। এখন নতুন যুগের আহ্বান এসেছে সর্বত্র। তাই ফেমিনামোদিপনের শ্যামলসুন্দরীদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

খবরের টুকরো

জানেন কি যে আমাদের জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় আমরা ঘুমিয়ে কাটাই?

আবার সেই ঘুমের পাঁচ ভাগের একভাগ সাধারণত স্বপ্ন দেখি। খবরটা গবেষণা করে পাওয়া। অল্পদিন আগেও সাধারণ লোক নিদ্রাকে অসাড়, অক্রিয় সময় মনে করতেন। দেখা গেল বিদ্যুৎ-এর উদ্দীপক উত্তেজনা বা স্টিমুলেশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো যায়। হইচই পড়ে গেল। এতদিন যে ধারণা ছিল ঘুমে শরীর যেমন সম্পূর্ণ বিশ্রামে এলিয়ে যায়, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুও ঠিক সেভাবেই জিরিয়ে নেয়, হঠাৎ সেখানে সংশয় দেখা দিল। প্রচলিত বিশ্বাস বিরোধী বলে বহু গবেষক চিন্তা এবং পরীক্ষা চালালেন। ফ্রান্স থেকে সুইডেন, জার্মানী থেকে আমেরিকা গবেষকরা খেটেখুটে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে নিদ্রাও মস্তিষ্কের সক্রিয় অবস্থা। স্বপ্ন দেখলেও সক্রিয় না দেখলেও সক্রিয়। ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক্তার উইলিয়াম ডিমেণ্ট ঘোষণা করলেন, স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় মস্তিষ্কের তরঙ্গ বা ওয়েভ জাগরণের মতই প্রায়। কেবল একটু মন্থর। মাত্র একটু ভিন্ন। ডাঃ ডিমেণ্ট আটজন মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। স্বপ্ন না দেখলে কি হয় তার পরীক্ষা। প্রথম পাঁচটি রাত তাদের স্বপ্ন রেখা বন্ধ ছিল। তারা স্বপ্ন দেখলেই জাগানো হতো। স্বপ্ন দেখার সংবাদ মিলতো মস্তিষ্কের ক্রিয়া নির্ধারক যন্ত্রে। তারপর তাদের স্বপ্ন দেখতে দেওয়া হলো। কেউ কেউ বহুক্ষণ স্বপ্ন দেখলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যখন তাদের স্বপ্ন দেখতে দেওয়া হতো না তখন সারাদিন তারা খিট্‌খিটে হয়ে থাকতো—যেন ঘুমই হয় নি। আবার অতটাই সময় ঘুমোতে দেওয়া হলো। কিন্তু তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে দিনের কাজ করলেন। ক্লান্তি কম হলো। কাজেই এতদিনে গবেষকরা বলছেন স্বপ্ন-দেখা ঘুমে ভাল ফল হয়। স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত ঘুম না ঘুমোনোর কাছাকাছি।

শোনা যায় মদ্যপান যাঁরা করেন তাঁরা অনেক সময় সকালে খিটখিটে হয়ে থাকেন। তাদের এই হ্যাংওভার-এর কারণও নাকি স্বপ্নমুক্ত নিদ্রা। মদ্যপানে নিদ্রা হয়, কিন্তু স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটে।

শ্রীমতী

পথের শেষ কোথায়

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আমি কেমন করিয়া জানাবো
আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে
আমি কেমন করিয়া জানাবো
আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।

অনেক দিনের খোঁজার পর এ নিধি পেয়েছিলেন; তবু হয়তো ঠিকমতো পান নি, কোথায় যেন বাধা ছিল গোপন, একটা খটকা লুকোনো ছিল মনের কোণে। সন্ধান শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রায় গোড়ার দিকেই।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ অবশ্য তরুণ কবি ছিলেন বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ঈষৎ-রুগ্ণ হৃদয়ের চতুঃসীমায় বড় বেশি আবদ্ধ। কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রিকতা অকস্মাৎ ভেঙে গেল এক স্মরণীয় প্রভাতে আশ্চর্যভাবে, রহস্যিক-ভাবে; রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ একাত্মতা বোধ করলেন আশপাশের সামান্যতম মানুষের সঙ্গে, ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ডের সঙ্গে। সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কথা লিপিবদ্ধ করলেন একটি বহু পরিচিত কবিতার অতি-উচ্ছ্বসিত তরল তারুণিক ভাষায়, এবং পরবর্তী অনেক গদ্যরচনায়। কিন্তু এও গেল ভেসে, স্বপ্নের চেয়ে স্বপ্নভঙ্গ আরো দ্রুতবিলয়ী সাব্যস্ত হল এই মন্থরগতি চিরপরিণতিশীল কবির হৃদয়পটে। তারপরে এক প্রচণ্ড শোকের ধাক্কায় সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল; তিনি অনুভব করলেন তাঁর পরমাত্মীয়া বাল্যসহচরী ও তাঁর এতদিনকার সমূহ সাধনার প্রেরণাস্বরূপিণী কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ যেন আত্মহত্যা করেছে। সামনে দেখা দিল এক অপার সূচিভেদ্য অন্ধকার গহ্বর। একে নাস্তিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা ("encounter with nothingness") ছাড়া আর কী বলা যায়?

জানি না ঠিক ক'মাস, হয়তো বৎসরাধিককাল, কাটালেন তিনি এই মিশকালো গহ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ-অপার গহ্বরও পার হলেন তিনি আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে। পার হয়েই রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি এবং বিরাট পুরুষ হতে পারলেন। "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।"

নান্দনিক দূরত্ব

যে দূরত্বের (নিশ্চয়ই নান্দনিক দূরত্ব, aesthetic distance) কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'-র শেষ অধ্যায়ে তার প্রথম প্রকাশ দেখি ১৩০২ সালে রচিত একটি গানে। গানটির শব্দৈশ্বর্য ও ধ্বনিগরিমা যেমন অসাধারণ তেমনি অসাধারণ কথা ও সুরের মিতালি:

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা।

বিশ্ববীণারবে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন সেই music of the spheres যা পাইথাগরাস শুনেছিলেন আড়াই হাজার বছর পূর্বে।

এ গানে বসন্তের মধুর এবং বর্ষার ভৈরব রূপের চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর একটি জনপ্রিয় গানে বর্ষার মধ্যেই পাশাপাশি দেখেছেন দুই রূপ—মধুর এবং ভয়ঙ্কর। শেষ দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করি:

সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়
বামে রাখ ভয়ংকরী বন্যা মরণ-ঢালা।

এ হেন নির্লিপ্ত দৃষ্টির সবচেয়ে জোরালো প্রকাশ অতি অপ্রত্যাশিতভাবে, প্রায় বেখাপভাবে, এসে পড়েছে 'গীতাঞ্জলি'-রই একটি গানে। গানটি এতই চমকপ্রদ যে প্রায় সমস্তটি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না:

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে;
চলেছে গরজি চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘন ঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

'গীতাঞ্জলি' পর্বের শতাধিক গানে উচ্ছ্বসিত স্বরে নন্দিত ও বন্দিত প্রেমকরুণাময় ঈশ্বরের কোনো আভাস পর্যন্ত নেই এই দর্শনসত্যদৃষ্টিনির্ভর গানটিতে।

শেষ পর্বের অনেক কবিতায় পাই এই নান্দনিক দূরত্ব-জনিত ভাবনার প্রকাশ। নিরাভরণ, স্বচ্ছ, প্রায় গদ্যের মতো ঋজু প্রকাশ বোধহয় 'রোগশয্যায়'-এর ২১ সংখ্যক কবিতায়।

'রোগশয্যায়'-এরই অন্য একটি কবিতায় (৯ সংখ্যক) যেন নিজেকে সংশোধন ক'রে বলছেন: যদিও আকাশে আকাশে দেখা যায় 'প্রকাণ্ড সুষমা', তবু ঠিক এই

মুহূর্তেই যে বিশ্বজগৎ অশীতিপ্রায় কবির অনুভব বা মানসনেত্রের সম্মুখে একটি বিরাট গোলাপের মতন ফুটে রয়েছে তা নয়; বিশ্বজগৎকে দেখতে হবে শুধু মহাদেশের নয়, মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে। এই মুহূর্তে তো অনেক কিছু আছে অনেক জায়গায়, অন্তত আমাদের এই বসুন্ধরার কোলে তার লক্ষ কোটি সন্তানের জীবনে, যা কুৎসিৎ ও বিকলাঙ্গ, ক্রমশ লক্ষ লক্ষ বৎসরের পর্বে পর্বে তা সম্পূর্ণ হবে, সৌষ্ঠবমণ্ডিত হবে।

আদি মহার্ণব গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুসে ফুলে উঠিতেছে—
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিন্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ়
সংকল্পের ধারা।

অতি অতি সুদূর ভবিষ্যতে যদি উদ্ঘাটিত হয়ও বিধাতার অন্তর্গূঢ় অভিপ্রায়, ইতিমধ্যে লক্ষ কোটি ব্যক্তিমানুষের দুঃখ-ভারনত পঙ্গু জীবনের ব্যর্থতা কি কবির সংবেদনশীল হৃদয়কে পীড়িত করবে না?

কং-এর মানবিকতাবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুবই পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁর দার্শনিক মন অনেকটা সাড়াও দিয়েছিল তাতে। এই মানবিকতাবাদে কিন্তু ব্যক্তিমানুষের স্থান খুবই সংকুচিত, অনন্ত প্রগতিশীল ও প্রগতিক্ষম মনুষ্যজাতির প্রত্যঙ্গরূপেই তার সার্থকতা ঠিক যেমন জীবদেহের শত লক্ষ জীবকোষ স্বতন্ত্রভাবে নগণ্য, সমগ্র জীবদেহের ধারক ও বাহক রূপেই তাদের যতটুকু মূল্য। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কং-এর মানবিকতাবাদের দিকে আকৃষ্ট হলেও কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্তই রইলেন। ব্যক্তিমানুষের এমন নিদারুণ অবমূল্যায়ন এবং স্বল্পকালিকতা তাঁকে বরাবরই দুর্ভাবিত ও ব্যথিত করেছে, তার বিবিধ ঋজু তীব্র প্রকাশ আমরা পাবো শেষ পর্বের অনেক কবিতায়। কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতার ভাষায়, রূপকের ভাষায়, তা ব্যক্ত হয়েছে "সোনার তরী" শীর্ষক বহুবিখ্যাত এবং বহুব্যাখ্যাত কবিতাটিতে। আমার সারাজীবনের কৃষিকার্যের যেটুকু ফসল আমি তুলে দিতে পারলাম মনুষ্য-জাতির অনন্ত প্রগতিধারায় সেটুকুরই মূল্য আছে, আমার আমিত্বের কোনই কদর নেই নিখিলের মাধুরীরুচিতে, আমি শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ব, নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাব পঞ্চভূতে চিরতরে।

একেও এক-প্রকার কর্মফলবাদ বলা যায়—যদিও প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের কর্ম-ফলবাদ থেকে এ একেবারেই ভিন্ন। আমার মনে হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩য় অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ) যে-কর্মবাদের কথা বলা হয়েছে তাই ব্যঞ্জিত হয়েছে 'সোনার তরী' কবিতাটিতে। তবে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য যেন এই অতি নিগূঢ় সত্যটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, এবং কোনো গুরুতর নিগূঢ় সত্যের আবিষ্কর্তাসুলভ বিস্ময়ে ও আনন্দে বলছেন। কিন্তু বলতে আরম্ভ করেই থেমে যাচ্ছেন, আর্তভাগকে হাত ধরে একটি নিভৃত কক্ষে নিয়ে যাচ্ছেন। স্পষ্টতই তাঁর ধারণা ছিল যে এই মহা-সত্যটি সাধারণ লোকের কানে গেলে সামাজিক স্থিতি বিপন্ন হবে, সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য (গীতার ভাষায় 'লোক-সংগ্রহের' জন্য) সাধারণ লোকের মনে প্রচলিত জন্মান্তর ও কর্মফলবাদে আস্থা থাকাই ভালো। 'সোনার তরী'তে কিন্তু এই কর্মবাদ ব্যক্ত হয়েছে গভীর বিষাদ ও বেদনার ভাষায়। কারণ কোনো মানুষই তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার কৃতকর্মের একীকরণ মেনে নিতে পারে না, মেনে নিতে পারে না যে তার সমূহ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্ফুরণের সম্ভাবনা তার কৃতকর্মের মধ্যে পরিসমাপ্ত। সকল মানুষের এ বেদনা রবীন্দ্রনাথের মনে বরাবরই বেজেছে এবং এর থেকে পরিত্রাণ না হোক একে গ্রহণ করবার নানা পন্থা তিনি খুঁজেছেন।

আগেই বলেছি যে একটি পথ দুঃসহ
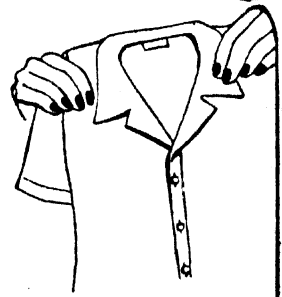
মৃত্যুশোকের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলেন —'নান্দনিক দূরত্ব'। কিন্তু এই নান্দনিক দূরত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা দার্শনিক পাইথাগোরাস বা স্পিনোজার পক্ষে যতটা সহজ ছিল, কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ততটা সহজ হয়নি। ভাগ্যাহত ও সমাজ-নিপীড়িত অসহায় মানুষের হাহাকার সর্বদাই তাঁর মর্মে আঘাত করে বিশ্ব-বীণার সংগীতের মাঝখানে, সুর-বেসুরের যেন দ্বন্দ্ব বেধে যায়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ মহাকাল বা নটরাজ শিবের মতো সম্পূর্ণ উদাসীন নির্মম দেবতার কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন শেষ পর্বে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে দেখে যে নটরাজ শিবের নির্মমতম স্বরূপ তিনি ব্যক্ত করেছেন বালকবালিকাদের জন্য রচিত 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের প্রথম বা ভূমিকাপ্রতিম কবিতাটিতে।

যে দেবতার কাছে "কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই" তাঁরই কাছে একটি শিশুপাঠ্য কাব্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ "মোরে ভক্ত ব'লে/নেরে তোর তান্ডবের দলে"— সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর মূল্যবোধ এতো তীক্ষ্ণ, সজাগ ও পরিব্যাপ্ত যে মনে হয় তিনি বনের প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা ফুল পাখীকে ভালোবাসেন, নাম ধরে ডাকেন, ভালোবাসেন কত বিচিত্র ধরনের মানুষকে —"পরের ঘরে মানুষ" ছোটো-জাতের লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা থেকে, বিজ্ঞানগৌরব জগদীশচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত; খুঁজেন এবং বহু বৎসরের খোঁজার শেষে আবিষ্কার করেন নিজের অন্তরের ভালো-বাসার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'-র করুণাস্নিগ্ধ প্রেমাসক্ত ভগবানকে।

আসলে রবীন্দ্রমানসে বহু বিচিত্র ভাবধারা পাশাপাশি চলেছে, ত্রিবেণী বা পঞ্চবেণী সংগম ঘটেছে বলা যায় না, কখনো এটা প্রাধান্য লাভ করেছে, কখনো অন্যটা,, কখনো দুটো তিনটে পরস্পরকে সমর্থন করেছে, কখনো একটার সংগে আরেকটারি সংঘাত অনিবার্য ও বেদনা-দায়ক হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে দান করেছিল, সেই বহুদূরের উদাসীন নির্মম দৃষ্টি যাতে তিনি সৃষ্টির যেমন প্রলয়েরও তেমনি আনন্দস্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন।

'শিশু ভোলানাথ'-এর ভূমিকায় তিনি ধ্বংস থেকে ধ্বংসের মাঝে চক্রগতির কথা বলেছেন। এই অর্থহীন, লক্ষ্যহীন চক্রগতি ঠিক ট্র্যাজেডী নয়, তবে তার উপলব্ধি ট্র্যাজিক চেতনার খুব কাছাকাছি।

অথচ কাদম্বরী দেবীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত কাব্যসংকলন 'কড়ি ও কোমল'-এ দেখি রবীন্দ্রনাথ মাটি এবং মানুষের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন. প্রথম কবিতাটিতেই ঘোষণা করছেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

ভূমিকাতে খানিকটা জোর দিয়ে বলেছেন যে এই কথাটি "পরবর্তীকালে আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে, যা 'নৈবেদ্য'-তে আর একভাবে প্রকাশিত হয়েছে—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের প্রতি, নারী ও প্রকৃতির প্রতি, নিবিড় অনুরাগ সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূল ধারা। এই ভূমিকারই পরের অনুচ্ছেদে তিনি যোগ করেছেন "আর একটি প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে

মৃত্যুর আবির্ভাব।" এই উপলব্ধির মধ্যে কিন্তু বৈরাগ্যের, উদাসীনতার, এমন কি নটরাজসুলভ নির্মমতার সুর শোনা যায়।

'কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকায় যে-দুটি প্রবর্তনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনার মূল ভাব বলেছেন—মানবপ্রেম এবং মানসিক দূরত্ব ও নির্লিপ্তির সাধনা—তার গুরুত্ব সকল রবীন্দ্রানুরাগী সমালোচক ও পাঠক যথোপযুক্ত পরিমাণে উপলব্ধি করেন নি বলে আমার মনে হয়. তাই আমি এই ঘোষণার উপর একটু জোর দিতে চাই। তুলনায় 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের ঈশ্বরনিমগ্নতা বহু-আলোচিত ও সর্বজন-বিদিত হলেও সাময়িক ব্যাপার।

'কড়ি ও কোমল'-এর এই উদ্ধৃতি-জীর্ণ সনেটটি আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগায়। হঠাৎ কী প্রয়োজন ঘটলো যে ঘণা করবার "মরিতে চাহি না আমি?" শত দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনাবঞ্চনাময় জীর্ণ যাদের জীবন তারাও তো মরতে চায় না, হাজারে একজনও না। তবে কি তিনি মৃত্যুশোকের কালো গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মঘাতী হবার কথা ভেবেছিলেন কোনো ধাবমান মুহূর্তে? সম্ভবত। তাই বোধ হয় সে-ইচ্ছা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন একথা ঘোষণা করবার তাগিদ অনুভব করলেন রবীন্দ্রনাথ। সন্দেহ জাগে এই আত্ম-ঘোষণার মধ্যে কিঞ্চিৎ আত্মভর্ৎসনাও লুকানো ছিল। একদিন বিরহিনী রাধাকে তিনি "ছিয়ে ছিয়ে" বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন সে তার জীবনবল্লভের অবহেলার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মরণের শান্ত শীতল কোলে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল দেখে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রথম পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ভুবনকে সুন্দর বলেছেন, 'ভুবন' বলতে কি শুধু বিশ্বপ্রকৃতি বোঝাতে চেয়েছেন, নাকি সমস্ত মানুষ ও মানবসমাজও 'ভুবন'-এর অভিধাভুক্ত? মানুষের মাঝে বাঁচতে চান তিনি তাঁর এতদিনকার লালিত একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বর্জন ক'রে। কিন্তু মানবসমাজেও কি তিনি সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন যা প্রকৃতির রঙে রূপে ছন্দে গানে ব্যক্ত? সম্ভবত এই চতুর্দশীপদীতে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যজাতি কিংবা মানবসমাজের কথা ভাবেন নি, ভাবছিলেন আশপাশের অল্পবিস্তর পরিচিত মানুষের কথাই, বলতে চেয়েছিলেন, আমি তাদের ভালবাসি বলেই তাদের মাঝখানে থাকতে চাই, সন্ন্যাসীর মতন দূরে সরে গিয়ে মুক্তির সাধনা করতে চাই না। তাদের মধ্যে নানারকমের দোষত্রুটি এমন কি দুর্নীতিপরায়ণতাও থাকতে পারে, সেসব মেনে নিয়ে কি তাদের ভালোবাসা যায় না? যায়, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত।

তাঁর মহত্তম সৃষ্টি 'শ্যামা' গীতিনাট্যের নায়ক "মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি, উন্নতদর্শন" বজ্রসেনও শ্যামাকে বলেছিল, ভালোবাসা ভালো-মন্দ সব কিছু মেনে নিতে পারে :

> জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে
> জেনো, প্রিয়ে॥
> সব পাপ ক্ষমা করি ঋণ শোধ করে সে
> জেনো, প্রিয়ে॥
> কলংক যাহা আছে দূরে হয় তার কাছে
> কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে॥

কিন্তু সে নিজে মেনে নিতে পারেনি। শ্যামা যখন অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বীকার করলো যে তার প্ররোচনায় তারই প্রেমে আত্মহারা কিশোর উত্তীয় আত্ম-বলিদান ক'রে বজ্রসেনকে কারামুক্ত করেছিল, তখন সে-কথা শোনা মাত্রই বজ্রসেন একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে শ্যামাকে কলঙ্কিনী, পাপিষ্ঠা ইত্যাদি বলে লাঞ্ছনা দিল। শ্যামা দুঃখে ক্ষোভে অন্তিম হতাশায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বলে উঠল : "তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্মাঘাত।" নীতিবিশুদ্ধতায় নিষ্ঠুর বজ্রসেন শ্যামার বুকে এমন মর্মান্তিক আঘাত করলো যে শ্যামা মৃতবৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তাকে মৃত জেনেই সে ওখান থেকে চলে গেল।

অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি অবিস্মরণীয় কবিতায় প্রশ্ন করেছিলেন স্বয়ং ভগবানকে :

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
> নিবাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
> তুমি কি বেসেছো ভালো?

এ প্রশ্ন এবং প্রশ্নের বিমূঢ় বেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি 'কড়ি ও কোমল'-এর লেখকের মনে, কোনো প্রকার উত্তর তো নয়ই।

[ক্রমশ]

বিশ্ববিজ্ঞান

কলকাতার জাহাজ কারখানা এখন জাতীয় ঐতিহ্য

কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তবে সেটা বাইরের মানুষের কাছে। ভেতরটা অন্য জগৎ। নিয়মশৃংখলার মধ্যে দিয়ে সেখানকার প্রতিটি মানুষের কর্মতৎপরতায় যেন ভরা জোয়ার।

জন-সংযোগ অফিসার শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য বললেন, গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের বর্ণনা আমার মুখে শোনার চেয়ে বরং নিজের চোখে দেখে নিন এখানকার কাজকর্ম।

বুঝলাম, কি বলতে চান জ্যোতিবাবু। কথায় অনেক সময় থাকে অতিরঞ্জন। কখনও বা অসম্পূর্ণতা। প্রত্যক্ষদর্শন এই অভাবটুকু অনেকটা দূর করে। হয়ত এর জন্যেই তিনি আমাকে সরাসরি কাজের আঙিনায় নিয়ে যেতে চান। তাই কালক্ষেপ না করে তাঁর সঙ্গ নিতে হল।

কারখানার চত্বরে হাজির হতেই চোখে পড়ল বড় বড় ক্রেইন। বিভিন্ন ডিজাইনের। এসব ক্রেইনের কোন কোনটির ভার তোলার ক্ষমতা তিরিশ টন। কোনটির বা চল্লিশ টন। এদের তৈরি করেছেন গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপেরই কুশলীরা। নকশা এখানকার প্রযুক্তিবিদদের।

এক জায়গায় থামলেন জ্যোতিবাবু। হাতের ইশারায় দেখালেন, 'ওই যে দেখছেন, ওর নাম মন্দোদরী। মন্দোদরী একটি টাগ। এটি তৈরী হচ্ছে কলকাতা পোর্ট কমিশনারের জন্যে। এটি হলদিয়া-কলকাতার মধ্যে কাজ করবে।'

চিড়িয়াখানার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যদি হঠাৎ বলেন, 'ওই হল সুন্দরবনের বাঘ', শুনেছি কেউ কেউ তখন চোখ কচলান। প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে অমন একটি জায়গায় প্রথম দর্শনে বাঘকে চিনতে ভুল হয়। স্বীকার করছি, জ্যোতিবাবুর কথা শুনে এবং মন্দোদরীকে দেখে আমার অবস্থাও কতকটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছিল। মাচার ওপর দাঁড় করান লঞ্চটি জ্যান্ত হয়ে একদিন জলে ভেসে বেড়াবে ভাবতে গিয়ে যেন হোঁচট খেতে হচ্ছিল।

জ্যোতিবাবু বললেন, মন্দোদরীর নকশা থেকে প্রায় যাবতীয় যন্ত্রপাতি এদেশে তৈরি। বলতে পারেন, এটি প্রায় শতকরা একশভাগ ভারতে তৈরি। কাজের দিক দিয়েও আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য।
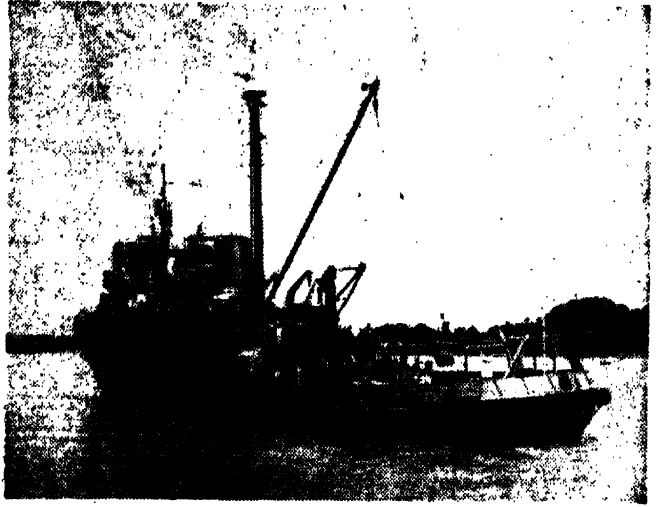
ভারতের তৈরি বৃহত্তম টাগ গজ তৈরি করেছেন গার্ডেনরীচের কুশলীরা। ভারতীয় নৌ-সেনা বিভাগের জন্যে তৈরি ১৪৪০ টনের এই টাগের টানার Static Ballard Pull ক্ষমতা ৪০ টন। একে আগুন নেবান এবং বহুমুখী ত্রাণ কাজে লাগান যায়। এটি ২০,০০০ টনের জাহাজ টেনে নিয়ে যেতে পারে।
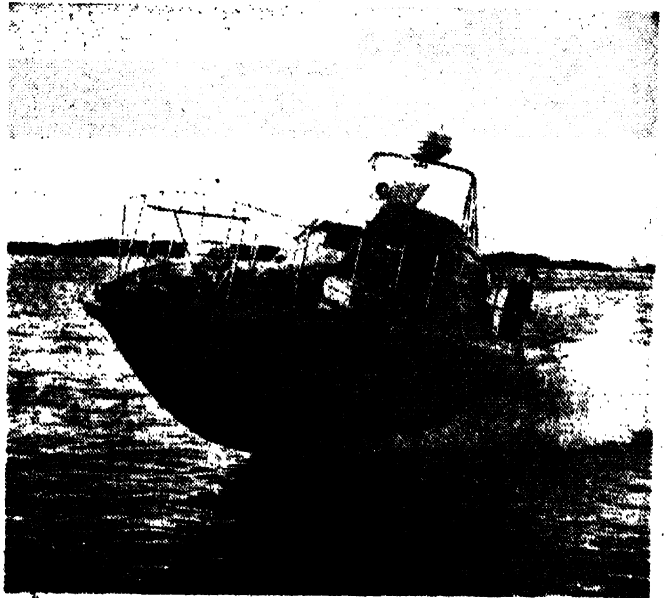
গার্ডেনরীচের আর এক কৃতিত্ব ফাইবার গ্লাসের তৈরি দ্রুতগামী এই প্রহরী জলযান। নাম এল এম-৪৫ এফ আর পি পেট্রোল বোট। আধুনিক ইলেকট্রনিক চালিত এই জলযানের গতি ঘণ্টায় ৩১ নট।

মন্দোদরীর পাশে তৈরি হচ্ছে আর একটি লঞ্চ। লম্বার তুলনায় চওড়া অনেক কম। তন্বী।

এখানে দেখা হল শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এখানকার জাহাজ তৈরি বিভাগের তিনি একজন সুপারভাইজার। ১৯৬২ থেকে কাজ করছেন এই কারখানায়।

তন্বী লঞ্চটি দেখিয়ে বললেন, এটা আমাদের কনস্ট্রাকশন নম্বর—১০২৭।

একটি সার্ভে ভেসল। প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

প্রশ্ন: সাধারণ লঞ্চ থেকে এর তফাৎটা কোথায়?

শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, বিরাট তফাৎ। প্রথমত এ ধরনের ভেসলের ডিজাইনই বেসরকারী বা কমার্শিয়াল ভেসল থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। এদের অনেক হাল্কা করে তৈরি করতে হয়, যাতে খুব কম সময়ের মধ্যে বেশি গতিসম্পন্ন করে তোলা চলে। যে ধাতব চাদর দিয়ে সাধারণ ভেসল তৈরি করা হয় তুলনায় তা অনেক পুরু। কিন্তু যে ভেসলটি দেখছেন, তার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের ধাতু সংকর। এ চাদর পুরুও কম। এক ইঞ্চির আট-ভাগের এক ভাগ মাত্র। ফলে অনেক হাল্কা।

হ্যাঁ, অনবদ্য কর্মতৎপরতা। এই ভেসলটির কাজ শুরু হয়েছে এ বছরের এপ্রিলে। সুপ্রিয়বাবু বললেন, আগামী অক্টোবরের মধ্যে এটিকে আমরা জলে ভাসিয়ে দেব।

ভাবা যায় না। এত কম সময়ের মধ্যে আধুনিকতম একটি সার্ভে জাহাজ, যা নাকি আবার তৈরি হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রয়োজনে—তৈরি করার মত অসামান্য পারদর্শিতা আমাদের কুশলীরা অর্জন করেছেন—নিজের চোখে না দেখলে সত্যিই যেন তা বিশ্বাস করা যায় না। দেখলাম, সবেমাত্র খোল এবং আনুষঙ্গিক কিছু অংশের কাজ শেষ হয়েছে। এর পর বসান হবে ইঞ্জিন। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, মানুষের বাস করার মত স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা। এসব কাজ শেষ করতে হবে আগামী তিন মাসের মধ্যে। এর সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ৩২ নট। প্রায় ৩৫ মাইল। এত দ্রুতগামী জলপোত তৈরির সাফল্য পৃথিবীর যে কোন দেশের কাছেই একটা বড় রকমের কৃতিত্ব।

সার্ভে ভেসলের কাছেই আর একটি ভেসল। এটিও মাচার ওপর বসান। তৈরি হচ্ছে। নাম 'বরাহ'।

জ্যোতিবাবু বললেন, এটা একটি ড্রেজার। এখানেই তৈরি হয়েছে, ভিশাখাপট্টনমের পোর্ট ট্রাস্টের জন্যে।

জ্যোতিবাবুর কথায় চমকে উঠতে হল। বললাম, সে কি? ভিশাখাপট্টনমের হিন্দুস্থান শীপ ইয়ার্ড'ই তো একটি বড় রকমের জাহাজের কারখানা। সেখানে ড্রেজার তৈরি না করে সেখানকার পোর্ট ট্রাস্ট এতদূরে তাঁদের ড্রেজার তৈরির বায়না দিয়েছেন কেন?

জ্যোতিবাবু কোন মন্তব্য করতে নারাজ। তবে শুনলাম, ভিশাখাপট্টনমের কুশলীরা সাধারণত বাইরে থেকে নকশা নিয়ে আসেন। সেই নকশা অনুযায়ী কাজ করেন। আর এখানে এই গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়ে উঠেছে আত্মনির্ভর প্রযুক্তিগত যোগ্যতা। অনুকরণ বা ইঞ্জিনিয়ারের ছক অনুযায়ী কেউ যেমন বাড়ি তৈরি করেন, তেমনটিও নয়। এখানকার বিশেষজ্ঞরা নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে কাজ করেন। জাহাজের খোলটি কেমন হবে, ইঞ্জিনের ডিজাইন, সাজসরঞ্জামের কায়দা-কানুন, সব কিছু নিয়ে এ'রা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করেন। আর চিন্তা করেন বলেই ভিশাখাপট্টনমের মত গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের কাজকর্ম শুধু 'আসেমব্লিং ইনডাসট্রিজ' হিসেবেই থেকে যায় নি। আরও মৌলিক এবং অনেক বহুমুখী হিসেবে বিস্তৃত হয়েছে। এর জন্যেই এ'রা সব রকমের জলযান নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে সক্ষম।

ড্রাই ডকের সামনে দেখা হল ফোরম্যান শ্রীসুধাংশুশেখর দত্তের সঙ্গে। ড্রাই ডকের সামনে আধুনিকতম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইস্পাতের চাদর ভাঁজ করে তৈরি করা হচ্ছে জাহাজের খোলের এক একটি অংশ। এক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আধুনিকতম বিজ্ঞান নির্ভর। বিশেষজ্ঞরা জাহাজের খোলের খণ্ড খণ্ড নকশার পরিকল্পনা করেন। অভিজ্ঞ ড্রাফটসম্যানের কুশলী হাতে সেই নকশা কাগজে রেখাঙ্কিত হয়। রেখাঙ্কিত নকশা চলে যায় বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রে। ফটো ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে নকশাগুলি প্রায় দশগুণ বিবর্ধিত হয়। তখন বিবর্ধিত ওই নকশার মাপে স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র নিখুঁতভাবে কেটে চলে বড় বড় ইস্পাতের চাদর থেকে, খণ্ডে খণ্ডে, যথাযথ মাপে, জাহাজের খোলের এক একটি অংশ তৈরির অংশ। এ যেন এক থান কাপড়ের ওপর ফর্মা ফেলে জামা, কোট তৈরির অংশগুলি কেটে নেয়া। ইস্পাতের অংশগুলি এর পর ক্রেইনের সাহায্যে নিয়ে আসা হয় ডকের সামনের এই শপে। বড় বড় যন্ত্র প্রয়োজন মত তাদের ভাঁজ করে, জোড়া দিয়ে তৈরি করে জাহাজের এক একটি অংশের আকার বা আয়তনের মত অংশ বিশেষ। তারপর এই অংশগুলি পর পর জুড়ে তৈরি হয় জাহাজের খোল।

দেখলাম, ড্রাই ডকের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বেশ বড়সড় একটি জাহাজ।

সুধাংশুবাবু বললেন, এটা মোঘল লাইনস থেকে আমরা অর্ডার পেয়েছি। ২৬০০০ টনের জাহাজ।

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে এত বড়

বিশ্ববাণী-র সশ্রদ্ধ ঘোষণা

দুর্লভ সেই মহাভারত আবার প্রকাশিত হচ্ছে

মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতাচার্য্য

শ্রী হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-এর

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর

বাংলা হরফে মূল শ্লোক

দর্শনাচার্য **শ্রীমন্নীলকণ্ঠের টীকা**

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-এর

টীকা, পাঠান্তর, প্রতি পর্বের ভূমিকা, ভারতযুদ্ধের কালনির্ণয়, বৃহৎ সূচীপত্র এবং

গদ্যে বঙ্গানুবাদ

আনুমানিক ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

রয়াল সাইজের এই শোভন সংস্করণ রেক্সিনে বাঁধাই ও প্রচ্ছদে সোনার জলে নাম লেখা। এই শোভন সংস্করণের প্রতি খণ্ডে আনুমানিক ৫৫০ পৃষ্ঠা থাকবে। প্রতি খণ্ডে শ্রীহরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের দুষ্প্রাপ্য ছবি থাকবে।

প্রতি খণ্ডের আনুমানিক মূল্য ৩০৲ টাকা। ৪০ খণ্ডের মোট মূল্য ১২০০৲ টাকা।

কিন্তু যাঁরা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এর মধ্যে অগ্রিম ২৫৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, তাঁরা প্রতি খণ্ড ২২৲ টাকায় পাবেন অর্থাৎ ৯০৫৲ টাকায় ৪০ খণ্ডের ফুল সেট পাবেন। কলকাতার বাইরের গ্রাহকদের বই পাঠাবার রেজিস্ট্রি ডাক খরচ আলাদা।

যাঁরা এককালীন ৭০১৲ টাকা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা সমগ্র মহাভারতটিই খণ্ডে খণ্ডে পাবেন। আমরা মাত্র ৪০০ জন এককালীন গ্রাহক নেবো।

এককালীন গ্রাহকেরা কী কী সুবিধা পেতে পারেন ঃ

৪০ খণ্ডের বেশী হলে বা মোট ধার্যমূল্য বাড়লেও এককালীন গ্রাহকরা ঐ ৭০১৲ টাকাতেই সমগ্র মহাভারতটি খণ্ডে-খণ্ডে পাবেন। আপনার বাঁচবে ৫০০৲ টাকা।

প্রথম খণ্ডটি শুভ মহালয়ার আগেই শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হবে। পরবর্তী খণ্ডগুলি আনুমানিক দু মাস অন্তর প্রকাশিত হবে।

নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হচ্ছে

M. O., ব্যাঙ্ক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার বা চেক পাঠিয়ে গ্রাহক হতে পারেন। পাঠাবার ঠিকানা ঃ

Biswabani Prakasani
79|1B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.

॥ কোন বিকৃত, সংক্ষিপ্ত বা পরিমার্জিত সংস্করণ নয় ॥

॥ সম্পূর্ণ মূলানুগ সংস্করণ ॥

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

(সি ৩৩৬২০/২)

জাহাজ তৈরির ঘটনা এই প্রথম। এর থেকে বড় জাহাজ তৈরির ক্ষমতা এঁরা রাখেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে হুগলী নদীকে নিয়ে। এ নদী আরও নাব্য এবং আরও গভীর হলে এখানে বড় এবং ভারী জাহাজ তৈরি অনায়াসেই করা যেত।

তবে বলা চলে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দরুন এখানকার যোগ্যতা ভারতীয় জাহাজশিল্পে এখন শিরোনাম। বিশেষ করে ড্রেজার, টাগ, লঞ্চ, সার্ভে ভেস্‌ল প্রভৃতি। এখানেই তৈরি হয়েছে ফারাক্কা ব্যারেজের জন্যে বিশেষ ধরনের ড্রেজার 'শুশুক'। যা ঘণ্টায় ১৬০ ঘন মিটার মাটি নদীর গভীর থেকে কেটে তুলতে পারে। তৈরি হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রেজার। নাম 'দেশাং''। নয় মিটার গভীর থেকে প্রতি ঘণ্টায় এটি মাটি তুলতে পারে ১৬০ ঘন মিটার। কাটার এবং সাকসন ড্রেজার তৈরি হয়েছে জাহাজ এবং পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের জন্যে। নাম 'মট ড্রেজ-৪'। ২২ মিটার গভীর থেকে এই ড্রেজারটি ঘণ্টায় মাটি তুলতে পারে ১৫০০ ঘন মিটার। ভারতের প্রথম এবং এ পর্যন্ত একমাত্র সামুদ্রিক গবেষণা চালানোর জন্যে জাহাজ, নাম 'গবেষণী'—তৈরি করেছেন গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপ। নিঃসন্দেহে বলা চলে, অত্যন্ত জটিল গবেষণা চালানোর মত সাজসরঞ্জামওয়ালা এই জাহাজ এই প্রতিষ্ঠানের এক অসামান্য কৃতিত্ব। 'গবেষণী' এখন কাজ করছে 'বম্বে-হাই'-এ। সম্প্রতি এখানে কোচিন পোর্টের জন্যে তৈরি হচ্ছে একটি নতুন ধরনের ড্রেজার।

কথা হল ডঃ পুলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুরের বি-ই, পরে ডক্টরেট করেছেন। গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপের গবেষণা এবং উদ্ভাবনা বিভাগের তিনি অফিসার ইনচার্জ। বললেন, জাহাজ তৈরির প্রথম ধাপ হল পরিকল্পনা অনুযায়ী নকশা তৈরি। নকশার যাবতীয় হিসেব-নিকেশ। ইঞ্জিনটি কিভাবে বসবে, সাজ-সরঞ্জাম কিভাবে বসবে, জাহাজ চলার সময় বিভিন্ন ধরনের বল যাতে প্রপেলার, স্যাফট প্রভৃতির ক্ষতি না করতে পারে তার সতর্কতা এই সব হিসেব-নিকেশের মধ্যে—এসব ব্যাপারই মুখ্য। জাহাজ গড়ার আগে এ সব হিসেব-নিকেশ আন্তর্জাতিক-স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের কাছে পেশ করতে হয়। তাদের ছাড়পত্র পেলেই তবে জাহাজ তৈরিতে হাত দেওয়া সম্ভব। এর জন্যে সময় যায়, বেশ কিছু অর্থও গুনে দিতে হয়। এ কথা ভেবেই এ ধরনের কাজেও আমরা হাত দিয়েছি। আমরা সাফল্যও অর্জন করেছি।

না। শুধু জলযান নয়। গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। আর এই সে দিনও, স্বাধীনতার পর এখানে কাজের মধ্যে ছিল ছোটখাটো জাহাজের মেরামতি এবং ইত্যাদি। এখন এই প্রতিষ্ঠান মাত্র দুই দশকের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে কাজ করছে কলকাতা, রাঁচি এবং নাগপুরে। ভারতে এতদিন জাহাজ তৈরি হত, ইঞ্জিন আসত বাইরে থেকে। গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ এখন জাহাজের ইঞ্জিন তৈরি করছে রাঁচির কারখানায়। এরা তৈরী করছে ভারী ভারী ক্রেইন। ফর্ক লিফট ট্রাক, ভাইব্রেটিং রোড রোলার থেকে হাজারো সাজসরঞ্জাম। সব মিলিয়ে কর্মী-সংখ্যা এখন ৯০,০০০-এর ওপর।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ভারতে ভাইব্রেটিং রোড রোলার প্রথম তৈরি হল এই ওয়ার্কশপে। এদের বৈশিষ্ট্য, এরা ওজনে হাল্কা। অথচ রাস্তা পেষণের ক্ষমতা ওজনের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। ১·৫ টন রোলারের পেষণ করার ক্ষমতা ৭ টনের মত। ৭ টনের রোলার ৩২ টনের মত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে এই সব রোলার আনা-নেয়ার অসুবিধে কম। অথচ কাজে অনেক দড়।

হাল ডিজাইনের সহকারী ম্যানেজার অমিত রুদ্র বললেন, টাগের টানার যন্ত্রটি আমরা এমনভাবে তৈরি করেছি যাতে করে কোন কিছু টানার সময় আমরা একটা নির্দিষ্ট বলের মধ্যে টানার কাজটি সীমাবদ্ধ রাখতে পারি। অর্থাৎ টান বেশি পড়লেই স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে টানার কাজটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে করে টাগটিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা চলে।

শক্তিশালী পাম্প উৎপাদন করছে এই প্রতিষ্ঠান। যান্ত্রিক মই, আরও কত কি। আর তৈরি করছেন প্লাস ফাইবারের তৈরি আধুনিকতম পেট্রল বোট। এসব তৈরি হচ্ছে আমাদেরই কুশলী এবং বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে।

প্রশ্ন করেছিলাম, এ সব করতে কতটা আমাদের বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়?

জনৈক বিশেষজ্ঞের উত্তর : কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই না। শতকরা একশ ভাগ কাঁচামাল ভারতের। জাহাজ তৈরির ব্যাপারেও শতকরা ৮০ ভাগ মালপত্র এবং সাজসরঞ্জাম ভারতেরই তৈরি। খুব কম সময়ের মধ্যে এ ফাঁকটিও আমরা কমিয়ে নিতে পারব।

*

রূপকথার মতই মনে হয় যেন। নানান ছলছুতোয় তখন ইংরেজরা এদেশের স্বাধীন রাজ্যগুলি একে একে দখল করে নিচ্ছে। তার কোপ পড়ল লক্ষ্ণৌ-এর বাদশাহ ওয়াজিদ আলী শাহ'র ওপর। ইংরেজরা বললেন, আপনার রাজ্য আমরা অধিগ্রহণ করলাম। এখন থেকে আমরা আপনাকে বছরে বারো লক্ষ টাকা এবং আপনার 'নুলুসী লশকর' (সিংহাসন অর্থাৎ বাদশাহকে রক্ষার জন্যে নিযুক্ত সেনা) রাখার জন্যে বছরে তিন লক্ষ টাকা পেনশন হিসেবে দেব। মনের দুঃখে সপরিজন ওয়াজিদ আলী শাহ চলে এলেন কলকাতায়। বাসনা, এখান থেকে হিন্দ-এর গভর্নর জেনারেলের কাছে দরবার করে ব্যর্থ হলে আর্জি পেশ করবেন 'ইংগালিস্তানের মালকা'র (ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী) কাছে। সেটা ১৮৫৬।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিশিষ্ট সাংবাদিক, গ্রন্থকার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম উর্দু অনুবাদক আবদুল হলীম 'শরর' লিখেছেন, কলকাতার মাইল তিন-চার দক্ষিণে হুগলী নদীর পাশে 'গার্ডেনরিজ' (গার্ডেনরীচ) শান্ত মহল্লা। এখানে একটি মাটির ঢিবি থাকায় লোকে জায়গাটির নাম রেখেছিল 'মাটিয়া বুর্জ'। ওয়াজিদ আলী শাহ এখানে এসে ইংরেজদের দেয়া কয়েকটি বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। আর নদীর ধারে বিস্তৃত জায়গায় আশ্রয় নিল বাদশাহের কর্মীরা। এর অল্প দিনের মধ্যেই 'মাটিয়া বুর্জ' গড়ে উঠল এক নতুন সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে।

আর অবশেষে 'মাটিয়া বুর্জ' হল মেটে-বুরুজ। তার অন্যতম অঙ্গ গার্ডেনরীচ ভারতীয় প্রযুক্তি উদ্যোগের অন্যতম এক পাদপীঠ।

সমরজিৎ কর

আলোচনা
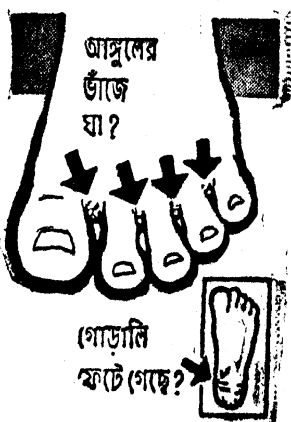
রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি বিভ্রাট

গত ২৬ জুন 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের স্বাক্ষরে লিখিত বিবৃতিটি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়,—রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর গানের স্বরলিপিতে সম্পাদনার যে আবশ্যকতা ছিল, তা রবীন্দ্র প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই সুনির্দিষ্টরূপে বিলুপ্ত হয়। কারণ, সম্পাদনার কাজ যথাযথভাবে নির্ভুল হল কি হল না—তা সুরস্রষ্টা স্বয়ং উপস্থিত থেকে যদি বিচার না করেন তাহলে সেটা ত সম্পাদনাকারীরই নিজস্ব মনগড়া সুর হবার সম্ভাবনা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর গানের স্বরলিপির সম্পাদনার পরিকল্পনা বা প্রস্তাবটি ছিল একেবারে অসার। তা-সত্ত্বেও দশচক্রে জন্ম হল একটা 'স্বরলিপি-সমিতি'র,—যে-নামের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রসুরের মূল স্বরলিপির ভিতর অপ্রামাণিক নূতন নূতন সুর বসাতে পারলে গ্রন্থন-বিভাগের অর্থকরী ব্যবসা ভাল চলবে সেই উদ্দেশ্যে। এবং ঐ সূত্রে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত কোন কোন স্বরবিতানগ্রন্থে আমরা দেখি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এবং অনাদিকুমার দস্তিদারের নাম সম্পাদনাকারী হিসেবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু এঁরা বস্তুত রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি পরিবর্তন করেন নি। পরিবর্তন করেছেন গ্রন্থন বিভাগেরই অন্য কেউ বা কারা যাঁদের নাম বরাবর সযত্নে অনুল্লিখিত আছে। এই মূল তথ্য কয়টি ধামাচাপা দিতে গিয়ে শ্রীদাস নিরুপায়ের মত তাঁর বর্তমান বক্তব্যকে পল্লবিত করে ফেলেছেন অনেকটা। কেননা, এও তো ঠিক, কোনো অবৈধ কাজ করে একবার গোলমাল পাকিয়ে সেই গোলমালকে যদি ঢাকতে যাই তাহলে যে সেখানে আমাকে আরো দশটা গোলমালের সৃষ্টি করতেই হয় তা নৈলে উপায়ই বা কি। বিষয়টা আরেকটু খোলসা করে বলা দরকার।

যে সকল শ্রদ্ধেয় স্বরলিপিকারগণ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি করে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই জীবদ্দশায় ছাপিয়ে প্রকাশ করে সর্বত্র প্রচার করেছিলেন, সেই সকল স্বরলিপিকারদের স্বরলিপিই যে রবীন্দ্র-সুরের প্রামাণিকতা বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ কারুরই থাকতে পারে না,—এই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী এবং অনাদিকুমার দস্তিদার উভয়েই ভাল করে জানতেন এবং বুঝতেন। কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের পূর্বযুগের প্রামাণ্য স্বরলিপিকারদের কৃত স্বরলিপির উপর বিনা কৈফিয়তে বিশ্বভারতী-গ্রন্থবিভাগের পক্ষে ও স্বরলিপি-সমিতির নামে এতাবৎকাল যত সব পরিবর্তন-পরিমার্জন সাধিত হয়ে এসেছে—সেগুলি যে ইন্দিরা দেবী কিংবা অনাদিকুমার দস্তিদার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কখনও করেন নি তা সহজেই অনুমেয়। অথচ তাঁদের দুইজনের নাম গ্রন্থন বিভাগের বৈষয়িক স্বার্থে নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে—কোন্‌দেশীয় অজ্ঞাত বিস্ময়কর পদ্ধতিতে। এমন অভিমত জানাচ্ছি আরো এই কারণে, যে, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী যদি যথার্থই হাতেকলমে এই সম্পর্কে কিছু করতেনও তাহলে তাঁর স্বাক্ষরে একটা সন্তোষজনক সম্পাদকীয় বিবৃতি তিনি নিশ্চয় দিয়ে যেতেন। কিন্তু সে রকমের কোনো কিছু আমরা পাই না। তেমনি, অনাদিকুমার দস্তিদার মশাই যখন অসুস্থ হয়ে চলচ্ছক্তি, বাকশক্তি এবং বোধশক্তিহীন অবস্থায় গৃহবন্দী হয়ে পড়লেন তখন আমরা দেখতে পাই,—তাঁর নামটি 'সম্পাদক' হিসাবে স্বরবিতান গ্রন্থে যুক্ত করা হল।

তাই জন্যে, তাঁর স্বাক্ষরেও কোনো সম্পাদকীয় বিবৃতি নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশের কাজ বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ যে কোন আদর্শ অনুসারে করে চলেছেন তা এবার শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের বর্তমান বিবৃতি এবং তৎপূর্বে (দেশ ২২ ও ২৯ মে) প্রকাশিত শ্রীশান্তিদেব ঘোষের প্রবন্ধ পাঠে দেশবাসী সকলে অবহিত হোন। গ্রন্থন বিভাগের কাজের ভিতর গোঁজামিল ও গোলমালের ডিপো যে দিনের পর দিন কী পরিমাণে জমে উঠছে তা-ও নূতন নূতন প্রকাশিত স্বরবিতান গ্রন্থগুলির পরিশিষ্টাংশে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করুন। এই ওজুহাতে, সেখানে দেখবেন, গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ব্যবহারের অযোগ্য হিসাবে যেমন অযথা বেড়েছে সেই অনুপাতে গ্রন্থের মূল্যটিও। এবং এই ক্রমবর্ধিত মূল্য আদায় করা হচ্ছে বড় অন্যায়ভাবে তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা এমনতর স্বরলিপি বিভ্রাটের তাৎপর্য কিছুই বোঝেন না। আসলে আজ শুধু অপরিণত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপিগ্রন্থ ক্রেতারা নন,—অনেক পরিণত সজ্জনও এই বিভ্রান্তির শিকার।

কিরণশশী দে
কলকাতা-৩২

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রসঙ্গে

এবারকার রবীন্দ্র-পুরস্কার নির্ধারণ প্রসঙ্গে অভিনন্দ ২৯ মে তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় যে মনোজ্ঞ সমীক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রতিবাদে রবীন্দ্র-পুরস্কার বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম বিচারক ক্ষুদিরাম দাস ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে যে ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন তা সত্যিই খুব দুঃখের। এব্যাপারে বিচারকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য যে, ন্যায়নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন সে বিষয়ে বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যসেবিগণও যে মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে।

ক্ষুদিরামবাবু নিজের গা বাঁচাবার জন্য লিখেছেন যে তিনি 'সায় দেন নি' বা 'হাত তোলেন নি' এবং সেটি প্রমাণ করতে তিনি বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়ের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (২৮ মে ১৯৭৬) বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন : 'আমরা কেউই মনে করিনি যে 'নাট্যকার'ই বাংলা উপন্যাস জগতের শ্রেষ্ঠ রচনা কিন্তু অনিবার্য কারণে (?) দু-একটা বাদ যাওয়ার পর 'নাট্যকার'ই সব থেকে জোরালো ব্যক্তিত্বপূর্ণ রচনা বলে বিবেচিত

"লিওর শ্যাম্পুর
মনমাতানো সুরভির রেশ...
তাজা হয়ে থাকবে
আপনার তাঁর মনে."
বলেন, অ্যানিটা রবিন্‌স্‌, এক্সপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
লিওরের রকমারি নতুন শ্যাম্পুর প্রত্যেকটিতে আছে নিজস্ব বিশিষ্ট সৌরভ। আর, এই শ্যাম্পুগুলি সবরকম যত্ন নিয়ে আপনার চুল করে তোলে পরিষ্কার, সুন্দর, আকর্ষণীয় সৌরভে ভরপুর...যাতে আপনার তাঁর মন মেতে ওঠে।
লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয় সৌন্দর্য্য, লিওর শ্যাম্পুর যত্নে হয়—নির্মল, সুন্দর, সুরভিত অনিবার্য্য!
Lure
Lure
Lure
Lure
Creative Unit-A 2381

হয়েছিল।' কিন্তু দু-একটা উচ্চ মানের গ্রন্থ কেন বাদ দেওয়া হয়, সে কথা তিনি ইচ্ছা করেই উল্লেখ করেননি।

অন্নদাবাবুর প্রথম বিবৃতি প্রকাশিত হয় দৈনিক সান্ধ্য 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় ২৭ মে তারিখে। এবং তার পর দিন ২৮ মে উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাঁর মূল বিবৃতিটি ইংরাজীতে ছিল বলে সেটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো।

Dr. Haraprasad Mitra for instance wanted Sudhir Kumar Mitra's "Hooghly Jelar Itihas" (a history of Hooghly district) to be considered for the prize. The proposal according to Mr. Roy, was bound to fall through because the book was published "a good twenty years ago."

অভিনন্দ লিখেছিলেন যে রবীন্দ্র-পুরস্কার নির্ধারণ নিয়ে এবারে অবিচার করা হয়েছে, আর কমিটির মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলেই এটা করেছেন, তার প্রতিবাদে ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন আনন্দ-বাজারে প্রকাশিত অন্নদাবাবুর বিবৃতি 'ভ্রম নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট হবে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্নদাবাবুর বিবৃতি প্রকাশের পর দিন ২৯ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্র-পুরস্কার বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন :

হরপ্রসাদবাবু সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার দেব দেউল' বইখানির নাম তুললেন। বইটি ১৩৭৮ সালে প্রকাশিত। অন্নদাবাবু এই বইটির সঙ্গে সুধীরবাবুর আগের বই 'হুগলী জেলার ইতিহাস' মিশিয়ে ফেলে ভুল বিবৃতি দিয়েছেন। সুতরাং যে বিবৃতি ভুল, সেই বিবৃতি ক্ষুদিরামবাবুর কথামত কি করে 'আপনাদের ভ্রম নিরসনে যথেষ্ট হবে' তা আমরা বুঝতে পারি না।

এর পর বিচক্ষণ সভাপতি অন্নদাবাবু ৩০ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় দ্বিতীয় বিবৃতি দিয়ে সব জিনিস আরো গুলিয়ে দিলেন। তিনি বলেন : ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র যে বইটির উল্লেখ করেছিলেন সেটি শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার দেব দেউল'। তাঁর সেই প্রস্তাব আর কেউ সমর্থন করেন না।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী আনন্দবাজার পত্রিকায় (২ জুন ১৯৭৬) প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন : 'এই সভাটি ঠিক প্রস্তাব আনয়ন' ও 'সর্বান্তঃকরণে সমর্থনের' নয়; কিছুটা আলোচনার পরে একে একে অভিমত প্রকাশ করা হয়।' তিনি আরও লিখেছেন যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রস্তাবিত 'নাট্যকার'কে সর্বপ্রথম সমর্থন জানান, ক্ষুদিরাম দাস। যদিও তিনি মনে করেননি 'নাট্যকারই বাংলা উপন্যাস জগতের শ্রেষ্ঠ রচনা।'

অভিনন্দ ক্ষুদিরাম দাসকে "সায় দেওয়া" ও "হাত তোলা" বলে যে লিখেছেন তাতে উপরোক্ত সদস্যদের বিবৃত্যানুযায়ী কোথায় ভুল হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি না। অতঃপর ১১ জুন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবীণ সাহিত্যিক ও সংসদ সদস্য ডঃ প্রমথনাথ বিশী যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে দিবালোকের মতন সব জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন :

উক্ত প্রবীণ সদস্য (প্রেমেন্দ্র মিত্র) এসেই 'নাটাকাং' বইখানার নাম করলেন আর শেষ পর্যন্ত সে বই আঁকড়ে বসে থাকলেন। আর সমস্ত বই কাটবার ভার যেন নিয়েছিলেন চেয়ারম্যান।

উমা বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৬

॥ ২ ॥

এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার সম্পর্কে ২৯ মে তারিখের দেশ পত্রিকায় 'সাহিত্য প্রসঙ্গে' অভিনন্দর সমীক্ষা পড়ে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এতই মর্মাহত হয়েছেন যে, তা প্রকাশ করতে গিয়ে ১৯ জুনের দেশ পত্রিকায় লেখা তাঁর চিঠিটি শুধু রাগকরই হয়নি, আজগুবি যুক্তির এক অপূর্ব উদাহরণও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাল হোক, মন্দ হোক, বহু আশা পোষণ করে যাঁরা তাঁদের বই পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যেই একজনকে পুরস্কার না দিলে তিনি নাকি ন্যায়নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতেন। হা ঈশ্বর! এ কি অদ্ভুত যুক্তি! 'সর্বশ্রেষ্ঠ' না হলেও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত একটি বই যে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ফসল হবে তা নিশ্চয়ই আশা করা যায়। সুতরাং ভাল হোক মন্দ হোক, যে-কোন একটি বইকে পুরস্কার দেবার মনোভঙ্গীটি বড়ই যেন রহস্যের গন্ধে ভরা।

সাহিত্যের 'জীজয়তি' করতে আসায় অভিনন্দ ডঃ দাস সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা হয়তো একটু কর্কশ, কিন্তু কর্কশতাটুকু বাদ দিলে যা থাকে অর্থাৎ মূল বক্তব্য তা যথার্থই। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হয়ে 'ভাল হোক মন্দ হোক' মনোভঙ্গী নিয়ে রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য থাকা কতটুকু বাঞ্ছনীয় তা ভেবে দেখার জন্য ডঃ দাসকে বিনীত অনুরোধ করি।

ডঃ দাস মনে করেন, নির্বাচন বিষয়ে তাঁদের হাত-পা বাঁধা ছিল, কিন্তু কমিটির অপর এক সদস্য প্রমথনাথ বিশী মশাই সংবাদপত্রে বিবৃতির মারফত উল্টো কথাই বলেছেন। বই জমা না পড়া সত্ত্বেও যে পুরস্কার দেওয়া যায় তার প্রমাণ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নয়, সকলেই এবারের পুরস্কারপ্রাপ্ত বইটির পক্ষে সায় দিয়েছিলেন—এই বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ দাস কমিটির সভাপতি অন্নদাশংকর রায় মশাইয়ের সংবাদপত্রের একটি বিবৃতির শরণাপন্ন হয়েছেন। সভাপতির বিবৃতি যে অভ্রান্ত ছিল না তা এখন আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তিনি বলেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র বইটির নাম প্রস্তাব করেছেন আর আশাপূর্ণা দেবী সমর্থন করেছেন। অথচ আশাপূর্ণা দেবী সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফত জানিয়েছেন, প্রস্তাব ও সমর্থনের রীতি এই বই নির্বাচনের ব্যাপারে কোন দিন ছিল না এবং এবারেও সেই রীতি অনুসৃত হয়নি। খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই সভাপতির বিবৃতি আশাপূর্ণা দেবীর যথেষ্ট উষ্মার কারণ হয়। সভাপতি মশাইয়ের বিবৃতিটিও ভ্রম নিরসন তো করেই না, উপরন্তু আমাদের আরও রহস্যের গভীরে ঠেলে দেয়।

তারাশংকর রায়
কলকাতা-২৮

॥ ৩ ॥

১৯শে জুনের দেশ পত্রিকায় ক্ষুদিরাম দাস গত ২৯শে মে তারিখে অভিনন্দের লেখা রবীন্দ্র পুরস্কার সম্পর্কিত লেখাটিকে অযথা গালাগালি দিতে গিয়ে নিজেই বহু মিথ্যাভাষণ করে ফেলেছেন।

(১) তিনি লিখেছেন, 'আমি মনে
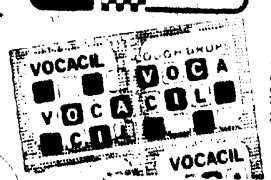
করি, ভালো হোক মন্দ হোক, যে সব লেখক বহু আশা পোষণ করে তাদের বই পাঠিয়েছেন, তার দিকে না তাকিয়ে বাইরে থেকে কোনো বই যদি পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হত তাহলে তাতেই আমরা ন্যায়নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতাম।" অথচ পুরস্কার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আট নম্বর ধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে "বইয়ের তালিকায় উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া অন্য পুস্তকও এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারে" আইনে অন্য পুস্তক বিবেচনা সম্পর্কে আরো অনেক কিছু নির্দেশ দেওয়া ছিল। এইবার ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় বলুন তো আইনের বিধান অমান্য করে নিজের মনোমত ইচ্ছামত কাজ করাটা কি ন্যায়নীতি থেকে ভ্রষ্ট হওয়া নয়?

(২) যে সমস্ত বই জমা পড়েছিল তার মধ্যে অনিবার্য কারণে নাকি দু-একটি বই বাদ গিয়েছিল ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় এই রকমই বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলি জেলার দেবদেউল' বইটিকে 'হুগলি জেলার ইতিহাস' বলে ভ্রম করাতেই ঐ প্রথমোক্ত বইটি বাতিল হয় কারণ 'হুগলি জেলার ইতিহাস' কুড়ি বছর আগে লেখা। কি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সব বিচারকমণ্ডলী! তাঁরা সামান্য সামান্য সব ভুল করবেন আর তার খেসারত দিতে হবে অন্যদের। পরে আবার সেই ভুলগুলিকে তারা 'অনিবার্য কারণ' বলে চালাবার চেষ্টা করবেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলায় লেখা একটি ইতিহাস বইকেও ঠিক একইভাবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি ইংরেজীতে লেখা ইতিহাস বই বানিয়ে, যেহেতু সেটি আগে জমা পড়েছিল সেই যুক্তিতে বাতিল করে দেন ('ঐকতান' শীর্ষক সংবাদ আনন্দ-বাজার পত্রিকা '২৮শে মে') জমা পড়ল রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা বই অন্নদা-শঙ্কর তাকে বানিয়ে দিলেন ইংরেজী বই। পরে অবশ্য তিনি ভুল স্বীকার করলেন কিন্তু আমরা ভাবি এত সামান্য সামান্য ভুল যে ব্যক্তির হয় তিনি কিরকমভাবে নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠাবান বিচারক হিসাবে কাজ করতে পারেন? সেটাই রহস্য। এদিকে প্রমথনাথ বিশীও এই সব অপ-কর্মের খবর ফাঁস করে দিয়েছেন ১১ই জুনের আনন্দবাজারে এক বিবৃতি দিয়ে। আমরা জানলাম রমেশচন্দ্র মজুমদারের বই বাতিল হল যেহেতু তিনি আগে পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা বইয়ের ক্যাটেগরিতে পুরস্কার পেলে (রমেশবাবু পেয়েছিলেন) বাংলা ভাষায় লেখা বইয়ের ক্যাটেগরীতে তিনি আর কখনও পুরস্কার পাবেন না এরকম কোন আইন আছে কি? প্রশ্ন হল পত্রলেখক আইন মেনে চলেছিলেন কিনা? অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা যখন এক বইকে আরেক বইয়ের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছিলেন 'ইতিহাস হয়েছে সাহিত্য হয়নি' বলে কোন বই বাতিল করার অপচেষ্টা করছিলেন তখন কেন চুপ করে বসেছিলেন আপনি? এতে যদি শ্রীযুক্ত অভিনন্দ মনে করে থাকেন "সায় দেওয়া বা হাত তোলা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার ছিল না" তবে কি তিনি খুব অন্যায় মনে করেছিলেন? ক্ষুদিরামবাবু লিখেছেন বিচার সভায় কোন সদস্য যদি যে বই আসেনি সে রকম কোন বইয়ের নাম প্রস্তাব করতেন (যেটা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত) তার প্রতিবাদ করতেন। সেটা বোধহয় খুব খুব ন্যায়সঙ্গত হত।

জ্যোতিষ্ক গুপ্ত
কলকাতা-৩৪

সাহিত্য প্রসঙ্গ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই

একটি খবরে দেখলাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এ-যাবৎ যত বই ছেপেছেন তার অর্ধেকও বিক্রী হয়নি। কথাটা বোধ হয় সামান্য ভুল হল, এ যাবৎ না বলে বলা উচিত ছিল—১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ৭০ থেকে ৭৫—এই পাঁচ বছরে ট্রাস্ট ইংরেজী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষের মতন বই ছেপেছেন। তার মধ্যে অবিক্রীত বইয়ের সংখ্যা শতকরা পঞ্চান্ন ভাগেরও বেশী। অর্থাৎ ট্রাস্ট এই বই ছেপে এখন যে পরিমাণ গুদোম ভাড়া গুনছেন তার চেয়ে অনেক কম টাকা বই বিক্রী করে ফেরত পাচ্ছেন।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কোনো ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে না, সরকারী অর্থ আনুকুল্যে চলে, নয়ত এভাবে বই ছেপে ব্যবসা চালানো নিশ্চয় পোষাত না। যে পাঁচ বছরের কথা বললাম—সেই পাঁচ বছরে সংখ্যায় ৯৪৪টি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। অবিক্রীত গ্রন্থ বাবদ আটকে আছে উনসত্তর লক্ষ টাকা।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ভারতীয় ভাষায় প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় বই ছাপেন বটে কিন্তু একমাত্র পাঞ্জাবী ও গুজরাতী ভাষাতেই তাঁদের যা বই বিক্রীর বাজার। এই দুই ভাষাতে ট্রাস্টের ছাপা বই, শতকরা ষাট ভাগের বেশী বিক্রী হয়েছে। সবচেয়ে কম বিক্রী বাংলা ভাষায় ছাপা বই, আর তামিল ভাষায়। বাংলা ভাষায় ট্রাস্ট উনষাটটি বিভিন্ন ধরনের বই ছেপেছেন—সংখ্যায় প্রায় পৌনে দু লক্ষের মতন বই, তার মধ্যে শতকরা বিরানব্বই ভাগ বই বিক্রী হয় নি। তামিল ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের বিক্রীর হার শতকরা মাত্র কুড়ি। অথাৎ আশি ভাগ বই বিক্রী হয় নি। হিন্দীর বেলাতেও শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ বই গুদোমে পড়ে আছে।

বুক ট্রাস্টের ডিরেক্টর বলেছেন, গত বছরে বই বিক্রীর হার বেড়েছে—বিক্রীর ব্যাপারে ট্রাস্ট নানাভাবে চেষ্টাও করছেন।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সম্পর্কে খুঁটিনাটি আমি কিছু জানি না। তবে তাঁদের দু চারটি বই নিশ্চয় চোখে পড়েছে। ট্রাস্ট যে খারাপভাবে বইপত্র ছাপেন তা নয়। মূল্যও বেশী ধরেন না। যাঁদের বই ছাপেন আঞ্চলিক ভাষায় তাঁরা খ্যাতনাম। বুক ট্রাস্ট ভারতীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উল্লেখযোগ্য বইয়ের কিছু কিছু পছন্দ করে তা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তরজমা করে প্রকাশ করেন। এটি নিশ্চয় ভাল কাজ। তাঁদের উদ্দেশ্যও মহৎ। কিন্তু বই কাটানোর ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাঁদের কম। গুদোমে পড়ে থাকার জন্যে তো বই নয়। বিক্রীর ব্যবস্থা দরকার। সেদিকে ট্রাস্ট কেন যে এতকাল মনোযোগ দেন নি জানি না।

বাংলা ভাষার কথা ধরা যাক। সম্প্রতি এক জায়গায় আমি তিন চারটি বই দেখলাম, যা ট্রাস্ট বাংলায় প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অন্তত দু তিনটি বইয়ের বিক্রী না হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পাঠক বা ক্রেতা যদি জানতে না পারেন বইয়ের বৃত্তান্ত, যদি কলেজ স্ট্রীটের দোকানে দেখতে না পান কোনো বই—কোথা থেকে বই কিনবেন? বাঙালী প্রকাশকরা আজকাল বই ছেপে সেই বই বিক্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন এবং প্রচারে যে কী পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেন তা তো ট্রাস্টের কর্মকর্তারা জানেন না। বলতে কি, বাংলা বইয়ের বাজারে যে প্রতিযোগিতা সে-প্রতিযোগিতায় ট্রাস্টকে নামতে হলে নতুন করে ভাবতে হবে। দু একটা দোকানকে পরিবেশক হিসেবে রেখে ট্রাস্ট নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। বই বেচার ব্যাপারটিকে খানিকটা ব্যবসা হিসেবে নিতে হবে, তার জন্যে বিজ্ঞাপন চাই, প্রচার চাই, দোকান চাই। তা ছাড়া ট্রাস্ট অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার যেসব লেখকদের বই বাংলায় ছাপেন, বাংলায় তাঁদের অধিকাংশের পরিচয় অজানা। যতক্ষণ না বাঙালী পাঠককে এঁদের সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে ততক্ষণ এঁদের বই বাংলায় বিক্রী হওয়া মুশকিল। এদিক থেকেও ট্রাস্ট নতুন কিছু ভেবে দেখুন।

ট্রাস্টের প্রকাশিত কোনো কোনো বই আমি দেখেছি। তাঁদের কাজের নিন্দা আমি করব না। কিন্তু বলব, যেহেতু তাঁরা ভাল কাজে হাত দিয়েছেন—সেহেতু আরও যত্ন তাঁদের নিতে হবে বই প্রকাশের বেলায়, এবং বই বিক্রীর ব্যাপারেও খানিকটা পেশাদারী হতে হবে।

অভিনন্দ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিবেদন

আগামী ৩১ ভাদ্র ১৩৮৩ (১৭ সেপ্টেম্বর '৭৬) শুক্রবার শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সপ্তাহকালব্যাপী একটি প্রদর্শনী ও স্মরণসভার আয়োজন করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, স্বাক্ষরিত পুস্তকাবলী, তাঁহার রচনাসম্বলিত পুরাতন পত্রপত্রিকা এবং তাঁহার জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদি প্রদর্শিত হইবে। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্য, শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরিত গ্রন্থাদি পরিষদের প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিবার জন্য দেশবাসীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের সহায়তা পরিষৎ পত্রিকায় কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাঙালী মনীষী ও সাহিত্য-সাধকগণের বহু চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী "শরৎচন্দ্রের পত্রগুচ্ছ" নামে একখানি গ্রন্থ এই উপলক্ষে প্রকাশিত হইবে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী পরিষদ মন্দিরে সংরক্ষণের জন্য দিবেন, সেগুলি ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

বিনীত
শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

॥ ২৮ ॥

সতীর্থ যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল, অস্পষ্ট চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাতে তাকাতে পরিষ্কার হয়ে উঠল যেন তার চোখ—সন্দেহে না সাহসে পৃথিবী মিথ্যে এই রক্তোপলব্ধিতে—না সবই সত্য এই সংকল্প স্থিরতায় ?

খুব বেয়াদবি হল বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষের। কিন্তু মানুষকে কখনো শিশুর মতন মনে হয়। আমরা নারীরা মায়ের মতন—' মণিকা বললে, 'বিরূপাক্ষ যে মতলব নিয়ে আমার কাছে এসেছে সেটা প্রথম রাতেই তার চেহারা দেখে বুঝেছি আমি। বাতিটা নেভাও সতীর্থ।'

বাতি নেভাতে গেল না সে।

ঘরের বারান্দার সবদিকের সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে খুব বেশী অন্ধকারের ভেতর মণিকা বললে, 'আমি তোমাকে সেদিনকার কথা বলব শোন। এর ভেতর কিছুই নেই বলেই না বললেই ভালো হত; কিন্তু তবুও তোমার শোনা দরকার। তুমি সে রাতে এমন সময়ে এসে এমন অবস্থা দেখেছ যে, নিজের কান্ডজ্ঞান বা মর্মজ্ঞানে যখন কিছুই বুঝলে না—অগত্যা সবই তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে হচ্ছে আমার।'

সেদিনকার ব্যাপারটা সত্যিই জলের মত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল মণিকা। মণিকা যে সত্য কথা বলছে উপলব্ধি করল সতীর্থ। কোথাও কোনো খিচ রইল না আর।

মণিকা তারপরে বললে, 'আমায় উইল দেখিয়েছে, উইল শুধরে দিতে বলেছে, গুর বিষয়সম্পত্তির ট্রাস্টি হতে বলেছে বিরূপাক্ষ। চেক কেটেছে, ভাঙিয়ে টাকা পেয়েছি। আমি মানুষকে সহজে বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিরূপাক্ষ নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে। আমরা বলি : চাকরটা খুব বিশ্বাসী, নায়েবমশাই বেশ বিশ্বাসী মানুষ ; বিরূপাক্ষের কথাবার্তা কাজকর্ম দেখে সব সময়ই প্রায় আমার মনে হয়েছে চাকরটা খুব বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও বুঝেছি চাকরটা মোটেই বিশ্বাসী নয়।'

মণিকা হাই তুলে কুঁড়েমি ভেঙে বললে, 'আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলে ছিল ও সব। যেমন নীলু চাকর—বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী, রামচরণ খুব ধর্মভীরু। কোথায় গেছে সে সব।'

মণিকা আগে তুড়ি দিয়ে তারপর আলসেমি ভাঙতে লাগল; হাই ছাড়তে লাগল একটার পর একটা; অনেক আলসেমি জড়ো হয়েছে শরীরে।

'তুমি ঘুমোলে তোমার সোফায় গেল বিরূপাক্ষ ?'

'তাই তো গেল, না হলে এল কখন ? আমি জেগে থাকতে আসেনি তো।'

'ঘুমোলে কেন ?'

'ওকে দিয়ে কোনো পাপ হবে না জেনেই ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম এসে পড়ে আমার, সেদিনও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ মুখার্জির মত হলে ঘুমের আগে ওপরে উঠে যেতুম আমি।'

'যে পাপী তাকে দিয়ে পাপ হবে না নিষ্পাপিনীরা কি তাই মনে করে ? কে বললে তাই মনে করে ?'

'তুমি ওরকমভাবে প্রশ্ন করলে আমি কথা বলব না।'

'অনেক নিরপরাধিনী তো আমি দেখেছি।'

কোনো কথা বললে না মণিকা।

'তারা তোমার মতনই সতর্ক।'

সতীর্থ অপোগন্ডের মত কথা বলে ভাবছে সেটা শ্লেষ—ভাবছিল মণিকা; কি উত্তর দেবে—মিছে উত্তর খুঁজে মরছিল না তার মন।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন ?'

অন্ধকারের ভেতর ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না মণিকাকে। সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে ? সতীর্থের প্রশ্নের আর কোনো উত্তর দিতে গেল না, বলেছে যা বলবার। আর কিছু বলবার নেই।

'বিরূপাক্ষকে সামনে রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে।' মণিকা উঠে দাঁড়াল।

'বিরূপাক্ষের জামা তোমার ব্লাউজের

ওপর লেপটে পড়েছিল সেদিন। তার মাথা তোমার বুকের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু ঘুমন্তকে যদি ঘুমন্ত বিষ খাওয়ায় কিংবা অমৃত তাতে কার কি অপরাধ ?'

'দেখেছি আমি—তুমি খুব বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছিলে সেদিন।' মণিকা দাঁড়িয়ে রইল। মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর নিঃশব্দে নিজ মনে পায়চারি করছিল—

'এত ঘুমের ভেতর কেউ যদি কিছু করে ঘুমন্তের সেটা অজ্ঞাত থেকে যায়। থেকে যায় ?'

আর কিছু বলবে না ভেবেছিল সুতীর্থ, কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে তার এই কেমন একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল বলে একটু কুঁকড়ে গেল সে। সে জানে, মণিকা কিছু করে নি। তার স্বচ্ছ ধারালো অন্তর্ভেদী চোখ সত্য দেখেছে; সে সত্য সৎ। মিছিমিছি তবু কথা বাড়াচ্ছে সুতীর্থ ?

'কি করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে বেশী কথা শুনতে চাও তুমি, বারবার শুনতে চাও। কিন্তু যা বললুম এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার নেই আমার।' বলতে বলতে মণিকা শীতের রাত ভেঙে বনঝাউয়ের মত শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে গেল যেন যেখানে কোনো অভিজিৎ নক্ষত্র নেই সেই তেতলার অন্ধকারের ভেতর।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল সুতীর্থের—অনেকক্ষণ আগে। সে জ্বালাল না আর। অন্ধকারে আক্রম, আড়ষ্ট কর... সদ্যোজাত শিশুর মত, শীতাক্রান্ত ক... মত সেই শিশুর, বসে রইল সে। মোটা-মুটি এইরকমভাবে বসে রইল সে অনেক-ক্ষণ। তারপর আর খারাপ লাগছিল না তার। ভালো না লাগবার কথা নয়। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল সুতীর্থের ঘরের ভেতর যেন একটা রাধাঠুঁটী পাখি ঘিয়ের মত ডানা পালক মেলে ঝরঝর জলজল ঝরঝর জলজল বসন্ত রাতের হিজল বনের নদী নির্ঝরের মত শব্দে কথা বলে গেল। স্বচ্ছ জল সেই নদীর নির্ঝরের শব্দ—নির্মল, শাশ্বত।

তন্দ্রায় ঢলে ঢলে পড়ছিল সুতীর্থ। যেমন আমরা বলি, মাস্টার মশাই খুব বিশ্বাসী মানুষ—চাকরটা খুব বিশ্বাসী। যেমন বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী; রামচরণ খুব ধর্মভীরু; কোথায় গেছে সেসব ? অনেক ওপরের হাওয়ার থেকে কে যেন বলছে এইসব তন্দ্রার ঢুলে মনে হল সুতীর্থের। মস্ত বড় রাত্রির ময়দানে—নিশুথির তারাটা স্বাতী সপ্তর্ষি অভিজিৎ লুব্ধক বিশাখা—কী স্থির দার্ঢ্য নিবিড়

অনন্ত আকাশ সিন্ধুর, অবিরল হাওয়া— অনেক স্বর্গীয় পাখি উড়ছে ঢের ওপরে— তার মধ্যে সবচেয়ে অনির্বচন পাখিটিই মানুষী। কি অসংস্থিত পৃথিবীর নিচের কয়লার গুঁড়ি উড়িয়ে ঘুরছে। কিন্তু সন্তীর্থ যেখানে বসেছে সেখানে বাতাস ঠান্ডা নয়, কিন্তু বরফের মত শাদা, বেলফুলের মত ঝর্ঝরে পাখিদের পালক, জুঁয়ের মতন গন্ধ স্নিগ্ধতা, অথচ কোনো রঙ নেই এমনই আশ্চর্য পরমাত্মার এক মেয়েমানুষের নিবিড়-তর বাতাসের ভেতর বাতাসের মত যেন মিশে গেছে সন্তীর্থ—কোনো শরীর নেই সেই নির্ঝরের ভেতর—কোনো সময় নেই সেই অপরিমেয় আলোর—অনালোকিত অনন্ত বাতাসের ভেতর।

পরদিন সকালবেলাও নিজের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রোদের ভিতর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সন্তীর্থ।

'কটা বাজে সন্তীর্থ?' মণিকা জিজ্ঞেস করল।

সন্তীর্থকে নিরুত্তর দেখে মণিকা বল্লে, 'তোমার হাতঘড়িটা দেখছি না তো।'

'আছে।'

'কোথায়?' মণিকা দেরাজ খুলে বললে, 'এখানেও তো নেই।'

'তাহলে চুরি হয়ে গেছে।'

'স্ট্রাইক ফন্ড ছাড়া আর কোথাও চুরি হবার জায়গা তো দেখছি না। অমন দামী জিনিসটা দিয়ে দিলে?'

মণিকা কাল রাত্রের সেই সোফার ঠিক নির্দিষ্ট কিনারা দখল করে বসল। আকাশ পৃথিবীর সমস্ত রৌদ্রের অদ্ভুত জেল্লায় ঘর বার ভরে গিয়েছিল সব। ফাল্গুন আসেনি এখনও—তবুও বাতাসে তার অস্পষ্ট দিব্যতা—কেমন স্নিগ্ধ আগুনের ঘ্রাণ—মাঝে মাঝে করুণ আগুন। রোদ এড়িয়ে কিছুটা ছায়ার কিনারা বেছে বসেছিল মণিকা। কিন্তু তবুও রোদের অনেকগুলো চুমকি শাড়িতে গালে চুলে ছড়িয়ে ছিল। যার অর্ধেক নারী সেই মূর্তির নারীর দিকটার মত দেখাচ্ছিল মণিকাকে—বাকি সব বিশ্বব্জর প্রকৃতির; রৌদ্রের বাতাসের নীল শাড়ীর নীলাম্বর যেন।

'হাতঘড়ি মানুষের কব্জিতে খুঁজতে নাকি?'

সন্তীর্থের ঘড়ি তার শার্টের আস্তিনের নিচে হারিয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'কাল রাত থেকে বড় মনের ধাঁধায় আছি সন্তীর্থ। সবই কেমন বেভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি ধাঁধা?'

'এখন কটা বেজেছে?'

'নটা।'

'এই ঘুমের থেকে উঠলে বুঝি?'

শার্টের হাতার বোতাম খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে নিতে লাগল আস্তে আস্তে সন্তীর্থ। 'সাত মিনিট বাকি আছে নটা বাজতে।'

'আমি তো দেখেছি, তুমি সারারাত ঘুমোওনি। আমি চলে গেলুম। তুমি ঠায় বসে রইলে; এখনো বসে আছ। কেন?'

'তোমার কথায় মনে পড়ে গেল: ঘড়িটা খাঁটি সোনার—অনেক দাম হবে এখনকার বাজারে। দেব ধর্মঘটীদের?'

'ওটা কোনো কাজের স্ট্রাইক নয়—'

'ওরা বোকা, তা আমি জানি। কিন্তু ওদের পরিবার তো না খেতে পেয়ে মরছে—'

'সে সব ভাবনা মুখার্জির হাতে ছেড়ে দাও। ও-ই তো ফ্যাক্টরির মালিক। মানুষ নয়, কিন্তু মিটমাট করবার শক্তি মুখার্জির আছে, তোমার নেই।'

'তার মানে?'

'তুমি তো চাঁদের বুড়ীর চরকার বাতাস—'

'রূপকে কথা বলছ মণিকা—'

'এ রূপকের কোনো মানে নেই বুঝি?'

'কি মানে?'

'তুমি যা চাও তা কি করে পাবে? কেউ কস্মিনকালেও তা পায় না। স্থান কাল জিনিস বিচার করে কাজ করতে হবে তো। এসব ধর্মঘটীরা কে? কেমন হৃদয় মন? কি শিখেছে তারা? কতদূর জানে? না খেতে পেয়ে সুকীট মরেছে, তবুও কথা বলে বলে ওদের মন মজানো হচ্ছে এমনিই, যেন কথা খেয়েই থাকতে পারবে এই-ই মনে করে ওরা। মুখুজ্যে যদি আরো কিছুদিন গোঁ ধরে থাকে, কিংবা ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে এখুনি যদি কিছু রফা করে নেয় তাহলে কথা-গেল হাড়গিলের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুখুজ্যের কোলে আদর খাবার জন্যে। মুখুজ্যের ছাড়া ওদের কোনো মিটমাট হতে পারে না।' মণিকা বললে, 'মিছেমিছি কেন বক্তৃতা দিতে যাও?'

উঠে গিয়ে একটা জানালা বন্ধ করে এল। কড়া রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে।

'তোমার বক্তৃতা শুনিনি কোনোদিন আমি। কেমন দাও?'

'আমার নিজের কানে তো মন্দ শোনায় না।'

'মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বল?'

'এমনি, খালি গলায়। থাকে মাইক মাঝে মাঝে—'

'বক্তৃতা দিতে পার, কোনো পার্টিতে ভিড়ে গেলেই তো হয়। যদি বিশেষ কোনো বালাই না থাকে তোমার মনে তাহলে তো সুড়সুড় করে ওপরে উঠে যাবে। সেই-ই তো সবচেয়ে সোজা পথ—টিট্ পাখিদের পক্ষে। কাজ করবে চাকরবাকর চেলা চেংড়ারা; পল্লী সংগঠন, ধর্মঘট, শিল্পবিপ্লব, রক্ত-

বিপ্লব—ওদের হাতে ছেড়ে দাও সব। কথা বলে হদ্দো মাত করে রাখ।'

'তোমার চেয়ে ভালো কথা আমি বলতে পারি?'

'তোমরা বাইরের পৃথিবীর মানুষ।'

'তুমিও বাইরে চলো না আমার সঙ্গে।'

'সেরকম একটা রক্তবিপ্লব হলে আমাকেও নামতে হবে।'

'বড় বিপ্লব হবেই তো।'

'হলে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে সে বিপ্লবে আমি নাল ঠুকতে যাব কেন?'

'না আমার সঙ্গে নয়—আমি ভাড়াটে—' সতীর্থ হেসে বললে। 'বিপ্লব হলে আমিও কারো ভাড়াটে হতে যাব না। নিজে একটা দিক নিয়ে দাঁড়াব।'

সতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মেঝেয় রোদে দক্ষিণ দিকের জানালার লোহার গরাদের বিচিত্র নকশার ছায়া পড়েছে। সূর্যকে মা বলে অনুভব করে তারি স্বচ্ছ শিশু সন্তানদের মত যেন রোদ। কত মাছি উড়ছে রোদে। সতীর্থ আবার তাকিয়ে দেখল চায়ের পেয়ালার সোনালি কিনার ঘিরে মাছি; রোদের ভেতর পেয়ালাগুলো হীরেকষের ধূসরতা পেরিয়ে হঠাৎ হীরে হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে।

'কোন পার্টিতে যাবে বললে?'

'সে তুমি জান। এটা নিজের ঠিক করে নিতে হয়।'

'আমার তো মনে হয় আমি কংগ্রেসরই চারআনা সদস্য হতে পারতুম যদি—'

সতীর্থের যদিটা শসের মত ফলে উঠছিল যেন, কিন্তু বুলবুলিরা এসে খেয়ে গেল: কিছু বললে না সে আর, চুপ করে বসে রইল সতৃষ্ণ বিষণ্ণভাবে অনেক দূরের একটা গ্যাসের বেলুন—হাওয়া অফিস থেকে ছেড়েছে হয়তো—সেই দিকে তাকিয়ে।

'সোসালিস্ট পার্টিতে যেতে পারে।'

'আমার মনে হয় আমার কোনো পার্টিই সইবে না।'

মণিকা রোদের ভেতর ঝিমুতে ঝিমুতে জেগে উঠতে উঠতে বললে, 'তা সয় না আত্মারাম চিঁড়িয়ার। কোনো পার্টিই ধাতে সয় না, অথচ সবই সয়ে যায়। পার্কে ময়দানে একটা ভিড় জমলেই হাতের ভেতর একটা লোষ্ট্র খুঁজে পাওয়া যায়—পৃথিবীটাকে চমৎকার লাট্টু ঘোরাবার জায়গা বলে মনে হয়; পাঁচটা পার্টির স্বতোবিরোধের ওপরে উঠে নিজের মর্যাদায় দাঁড়িয়ে কথা বলা বক্তৃতা দেওয়া—'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

আপাদমস্তক জ্যোতির দিকে চায়ের ট্রের দিকে বিরস কটাক্ষে তাকাল মণিকা; কেমন অশ্রদ্ধার ব্রন ফুটে উঠল যেন সমস্ত মুখ ভরে।

'এত দেরিতে চা এল যে মণিকা দেবী?'

'চা তো ও এনেছে। আমি তো ওকে চা তৈরি করতে বলিনি; আনতে বলিনি।'

'কেন, তোমার চাকর নেই?'

'তুমি জান না সে পালিয়ে গেছে?'

'আমাকে বলে পালিয়ে গেছে, আমাকে না জানিয়ে তোমার কুটুম্ব পালায়?'

জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'চায়ের সঙ্গে পাঁপড় এনেছিস কেন? একশোবার তো তোকে বলেছি ওসব কাশীর পাঁপড় ডাক্তারবাবুর জন্যে রেখে দিয়েছি; সতীর্থবাবু তো পাঁপড় খেতে ভালোবাসে না।'

'ফাঁপর এনেছে জ্যোতি—এটা খেতে ভালবাসি আমি—' সতীর্থ একটু মুখ মিঠিয়ে হেসে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

'নিয়ে যা এসব পাঁপড় জ্যোতি। নাকি তুমি খাবে সতীর্থ? জ্যোতিকে পই পই করে বলেছি এসব পাঁপড় কাশীর ডাক্তারের জন্যে।'

'ডাক্তার কাশীর?'

'না না, কাশীর পাঁপড় ডাক্তারকে খাওয়াব ভেবেছিলুম।'

'আরো তো আছে, সব পাঁপড়ই কি ভেজে নিয়ে এসেছে জ্যোতি? ডাক্তারটি কে? চাটুয্যে? অংশুবাবুকে দেখছেন যিনি?'

'হ্যাঁ।'

'ভিজিট নিচ্ছেন না?'

'কেন নেবেন না? আমরা প্রত্যেকটি কলে ভিজিট দিই; দিনে চারবার এলে চারবার—'

'তবে আর পাঁপড় কেন?'

মণিকার ঠোঁটের কোণ মুচড়ে উঠল কেমন একটু হেলে বিঁধে যেন; গম্ভীর হয়ে মণিকা বললে, 'আমরা ডাক্তারকে দিতে ভালবাসি।'

'দিচ্ছই তো ভিজিট দিনে চারবার করে।'

'যার যা বরাত। কই আর দিতে পারলুম, ডাক্তারের পাঁপড় তুমিই তো খাচ্ছ।'

জ্যোতি চলে গিয়েছিল, হয়তো বিড়ি টানতে; আবার এল—কেউ তাকে ডাকেনি যদিও।

মণিকা বললে, 'বাবু কি ঘুমুচ্ছেন জ্যোতি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'আর দিদি?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'এখনও!' সামনের শূন্যটাকে চোখ দিয়ে একটু আস্তে ঠোকর দিয়ে সতীর্থ বললে।

জ্যোতি চলে গেল।

'ঘুমুচ্ছে তো। জীউ নিয়ে শুধু শুয়ে থাকা যেমন আমার স্বামীর, তেমন আমার মেয়ের।'

সতীর্থ চায়ের পেয়ালায় চুমুক না দিয়ে টিপয়ের ওপর সেটা রেখে দিল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার মেয়েকে তো বেশ ভালোই দেখায়। অসুখ আছে? কি অসুখ?'

'হার্ট খারাপ,' মণিকা বললে, 'এত অল্প বয়সে এতটা যে খারাপ হতে পারে,—হল তো।'

'কে বললে?'

'কেউ বলেনি, মনে হয় আমার।'

'মনে হলে মনেই রেখে দিও মণিকা ঘোষাল।' পাঁপড়ের একটা কিনার ভেঙে টোকা দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে সতীর্থ বললে।

'ঘোষাল কেন?'

'অংশু মজুমদাররা নাকি আগে ঘোষাল ছিলেন; তোমার নিজের হার্ট কেমন?'

সতীর্থের এ প্রশ্নের একটা বাঁকা উত্তর দেবে ঠিক করেছিল মণিকা, অপারেশন টেবিলে ছুরির মত কাজ করে এমনি একটা জবাব মুখে এসে পড়েছিল প্রায় মণিকার, কিন্তু ভালো লাগে না, চোখ বুজে আসে,

উৎসাহ বুতে যায়, মণিকা বললে, 'আমাকে তো থিওগ্যাগ'নাল খেতে হয়। যখন তখন। হার্টের জন্যে।'

'দেখিনি তো খেতে তোমাকে কোনো-দিন।'

'খাই। হার্ট খারাপ।'

'তোমার চেয়ে ভালো হার্ট মুখার্জির আছে?'

'মুখার্জির চেয়ে সুস্থ মানুষ বুঝি তোমার চোখে পড়েনি আর?'

'ও তো চ্যাপসা নয়—দোহারা।' সুতীর্থ বললে, 'কিন্তু তোমার পায়ের নখে ওগুলো কি পড়ে আছে? চাঁদ? কিন্তু মুখার্জি চাঁদ নয় বলেই ওখানে নেই। ওখানেও নেই?'

যে শিশু মাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—এবং যে মা জানে যে চাঁদ পেড়ে দেওয়া যায় না, তাদের আকুতি ও অভিজ্ঞতায় কয়েক মুহূর্ত জড়ীভূত হয়ে থেকে তারপরে আস্তে আস্তে নিজের স্বতন্ত্র জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ফিরে এল সুতীর্থ।

মণিকা একটা পাঁপড় হাতে নিয়ে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল আধাআধি, চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, 'মুখুয্যের গাড়িতে চড়ে আমাদের ফটকে নামলে রাত তিনটের সময়। কি ব্যাপার বল তো সুতীর্থ—'

'ওরা স্ট্রাইকটা ভেঙে দিয়েছে।'

'জবরদস্তি করে?'

'হ্যাঁ। আমি দলের সর্দার নই অবিশ্যি—তবুও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের মুখপাত্র হিসেবেই। ওদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলুম আমারও জেল হবে—কিন্তু তা হল না আপাতত—'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'বড্ড বিশ্রী বেকায়দা যাচ্ছে।'

'কি হয়েছে?'

'গয়ানাথ মালোর কথা তোমাকে বলেছিলুম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে ধর্মঘটী খুন হয়েছে?'

'প্রমাণিত হয়েছে আমিই নাকি ওকে খুন করেছি।'

মণিকার চোখমুখে বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছিল যেন একটু দমে গিয়ে মুহূর্তের ভেতরেই সাব্যস্ত হয়েছে। ওর শরীরের ভেতরেই যেন সঞ্চিত আছে সে জিনিস যাতে নিজেই নিজেকে শুশ্রূষা করে স্থির করে নেয়—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

'কিন্তু তুমি তো তাকে খুন করনি। করেছ?'

সুতীর্থ বললে, 'ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলছি মণিকা দেবী—'

গয়ানাথ মালোর মৃত্যু সংক্রান্ত আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বললে মণিকাকে সে। এর ভেতর মুখার্জির কতখানি হাত, মুখার্জির চেহারার সঙ্গে নিজের সৌসাদৃশ্য, মানুষ যা ভাবে বলে করে সে সমস্তকে অতিক্রম করে সময়পুরুষের ভিন্ন রকমের সিদ্ধি সমস্তই মণিকার কাছে পরিষ্কারভাবে আনুপূর্বিক বিবৃত করল।

'কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত।'

'মনে হয় যেন বানিয়ে বলছি।'

'না, তা নয়। তবে—'

'গয়ানাথকে কি আমিই খুন করেছি মণিকা?'

'কথা বলছ সহজভাবে—কিন্তু মনটা তোমার আড় ভাঙছে না। একটা কথা তোমাকে বলব আমি—' মণিকা সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'বল।'

'গয়ানাথ তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল না।'

'কি করে বুঝলে?'

'গয়ানাথ তোমাকে মুখুয্যে বলেও মনে করেনি। মুখুয্যের চেহারার সঙ্গে তোমার কোন সাদৃশ্য নেই—'

'নেই?' সুতীর্থ মণিকার চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমার নিজের চেহারা আমি নিজে তো দেখি না, আরশিও নেই আমার ঘরে। মুখার্জির সঙ্গে আমার কোন দিক দিয়ে কতদূর কি সাদৃশ্য বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি বলছ আমাদের চেহারায় কোনো মিল নেই—'

'নেই,' মণিকা বললে, 'আছে মনে করে ছোরা বাগিয়ে তোমার দিকে সে ছুটেছিল একথা যারা বলে তাদের বেকুবির সঙ্গে পারবে না তুমি। কিন্তু বেকুবি নয়—' মণিকা একটু থেমে বললে, 'অভিসন্ধি স্পষ্ট না হলেও সোজা ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে আবছা ঠেকছে?'

'কেন ছুটে ছিল তবে গয়ানাথ?'

'তুমি বলেছিলে না বঙ্কু ওর পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বঙ্কুই ছোরা মেরেছে ওকে—তোমার সামনে খাদের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে গেছে তাই লোকটা—'

'কি যে বল তুমি; তা হলে বঙ্কুকে দেখতুম না আমি—'

'তুমি পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলে?'

'কোনো দিকেই তাকাইনি আমি—যে খাদে পড়ে গেল তার দিকে ছুটে গেলুম আমি—'

'জায়গাটার আশেপাশে ঝাড়জঙ্গল ছিল?'

'দেখিনি আমি—তবে মাঠজঙ্গল নিয়েই জায়গাটা। আচ্ছা আমি আরেকবার ঘুরে দেখে আসব। তুমি যা বললে তার—কিন্তু জায়গাটা দেখে আসব আমি।'

'গেলে হবে কি? যে জায়গায় হয়েছিল এসব তো তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না; সব জায়গাই একই রকম মনে হবে তোমার কাছে; ঠেলেঠেলে বের করতে পারবে না কিছু—গুলিয়ে যাবে সব। কাচা-ছাড়া ভাবের মানুষ তুমি, মুখুয্যের মতন কাজের মানুষ তো নও—'

'কিংবা বিরূপাক্ষের মতন। না, তা নই।'

'বিরূপাক্ষ কাজের লোক বইকি; বাড়ি মোটর পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে তার। তোমার মতন ভাড়া না দিয়ে পরের বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই তো তার—'

মণিকার কথাটা যে তার পেটের থেকে বেরাচ্ছে, হৃদয়ের থেকে নয়, মাথার থেকে নয়—উপলব্ধি করেও পাল্টা রগড় করতে গেল না, কেমন নিঃশব্দ হয়ে রইল সুতীর্থ।

'ক' মাসের ভাড়া বাকি তোমার?'

'সাত-আট মাসের তো বটেই—'

'তোমাকে দশ মাসের ভাড়া দিয়ে দেব আমি—'

'অতটা পাওনা কিনা বলতে পারি না।'

'সেলামিও দিয়ে দেব।'

'দেবে তো বেশ করবে—' মণিকা বললে, 'কিন্তু মুখ লম্বা করে আছ কেন? তুমি

এখন এ-বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলে তখন সেলামির রেওয়াজ ছিল না তো। তবুও দেবে—এক কান কাটলেই দু-কান কাটা হয়—নিজেরই হয়। আর কার কি হবে! তা দিও—দিয়ে দিও দশ মাসের ভাড়া—সেলামী—' মণিকা হাসতে হাসতে বললে। 'ভাড়া দেও না বলে অবিশ্যি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যেত; নতুন ভাড়াটে বসানো যেত। কিন্তু অংশুবাবু আর আমি তো চড়কের গাজন গেয়ে গেয়ে মাথা খারাপ করিনি—আমাদের ঠাণ্ডা মাথা; তুমি এরকম বিগড়ে যাচ্ছ কেন?'

মণিকার কথা, গলার আওয়াজ কানের পটহে গিয়ে আঘাত করে, আঘাত করবার অনুমতি দিলে মনে হয় মর্মেও। কিন্তু কারু অনুমতিসাপেক্ষ মেয়ে মণিকা নয়, যদি হত তা হলে এরকম ষোলো আনা মানুষ হতে পারত না সে। মণিকা নিট ষোলো আনা নয়, তবুও খাদ আছে বলেই নিখাদ সোনার মত। সুতীর্থ যা চায় ঠিক সেরকমভাবে কথা বলছে না বটে মণিকা, কিন্তু তবুও খুব খারাপ লাগছে সুতীর্থের?

(ক্রমশ)

নীললোহিতের চোখের সামনে

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, আমার দিদির নামে নানান দেশবিদেশ থেকে ঝকঝকে নতুন স্ট্যাম্প লাগানো খামের চিঠি আসতো। আমরা ছোটরা, ডাকবাক্সে দিদির চিঠি কে প্রথম আবিষ্কার করবে, তাই নিয়ে রীতিমতন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে-ছিলাম। কারণ, দিদির চিঠি যে প্রথম দেখবে, সে-ই নতুন স্ট্যাম্পগুলো পাবে।

দিদির চিঠি আসতো অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ—এই সব জায়গা থেকে। যারা চিঠি লিখতো, তারা দিদিকে কখনো চোখে দেখেনি, দিদিও তাদের দেখেনি। এরা সবাই পেন ফ্রেন্ড। দিদি তখন মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু তখনই ইংরিজিতে বেশ বড় বড় চিঠি লিখতে পারে বলে আমরা রীতিমতন অবাক হয়ে যেতাম। তবে দিদির হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর—পাতলা ফিনফিনে কাগজে দিদি তার মুক্তোর মতন অক্ষরে বন্ধুদের চিঠি লিখতো।

বন্ধুরা সবাই ছবি পাঠাতো দিদিকে। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে উইলো গাছের নীচে দাঁড়ানো একটি ফুটফুটে জাপানী মেয়ের ছবিই আমাদের বেশী মুগ্ধ করেছিল। মেয়েটিকে ঠিক যেন পুতুলের মতন দেখতে। সে এমনকি দিদিকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেছিল জাপানে গিয়ে তাদের বাড়িতে থাকবার জন্য। আর অস্ট্রেলিয়ার একটি গম্ভীর মুখের ছেলে দিদিকে চিঠি লিখতো আট পাতা ন' পাতা করে।

একবার বিলেত থেকে এক বাক্স রুমাল এলো দিদির নামে। বিলেত থেকে তার এক বান্ধবী পাঠিয়েছে। এর উত্তরে দিদিরও কিছু পাঠানো উচিত। কিন্তু কী পাঠানো যায়? নানা রকম জিনিসের কথা চিন্তা করা হলো, কিন্তু কোনোটাই ঠিক পছন্দ হয় না, শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, বাইরে আমাদের দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস চা—সেই চা পাঠানো হবে এক প্যাকেট। শুধু বিলেতের বন্ধুকেই নয়, দিদির সব বন্ধুকেই খুব ভালো জাতের দার্জিলিং চা পাঠানো হলো উপহার হিসেবে। পত্রবন্ধুরা অভিভূত, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানালো। এবং তারাও সবাই উপহার পাঠাতে লাগলো নানানরকম।

জাপানী মেয়েটি পাঠিয়েছিল একটা হাত পাখা। ভারী সুন্দর জিনিসটা। সাধারণত জাপানী পাখা যেরকম ছবিতে দেখা যায়, এটা সেরকম নয়—এটার রং সবুজ। গোটানো পাখাটাকে খুললে মনে হয় যেন ঠিক একগুচ্ছ গাছের পাতা।

আমরা সাধারণত ভালো জিনিস পেলে সেটা ব্যবহার করি না, আলমারিতে তুলে রাখি। বিলিতি জিনিস হলে তো কথাই নেই। দিদিও তার বন্ধুদের পাঠানো জিনিসগুলো সযত্নে তুলে রাখলো কাচের আলমারিতে, কারুকে হাতই দিতে দেয় না। এক সময় দিদির চিঠিপত্রের স্রোত বন্ধ হয়ে গেল, বড় হবার পর দিদির আর ইংরেজি ভাষায় সেরকম দক্ষতাও দেখা গেল না। কিন্তু সেই উপহারের জিনিসগুলো রয়েই গেল।

কয়েক বছর বাদে দেখা গেল, সেই জাপানী পাখাটির ভেতরে একটু ফুটো হয়ে গেছে, রঙটাও খানিকটা জ্বলে গেছে। তবু জিনিসটা এখনো দিদির খুব প্রিয়।

সে বছরই আমরা সদলবলে আগ্রা বেড়াতে গেলাম। জুন মাসের সাংঘাতিক গরম, ঐ সময় কেউ উত্তর ভারতের ঐ সব উত্তপ্ত জায়গায় বেড়াতে যায় না। কিন্তু সেই সময় আমাদের স্কুলের ছুটি যে! পুজোর ছুটিতে আমাদের বেশী দূরে বেড়াতে যাওয়া হয় না, কারণ তার পরেই পরীক্ষা।

সেবার অবশ্য আগ্রায় যাবার আর একটা গুপ্ত কারণ ছিল। আমাদেরই এক মাসতুতো দাদা, রমেনদা, তখন থাকতেন আগ্রায়। তাঁর আবার এক বন্ধু আগ্রাতেই সেনাবাহিনীতে উপসেনাপতি। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, খুব বড় বংশের ছেলে। তাঁর সঙ্গে দিদির বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে। বাবা-মা ঠিক করেছিলেন আগ্রাতে বেড়াতে যাবার ছুতোয় পাত্রটিকে দেখে আসবেন—পাত্রও দিদিকে দেখবে। এ খবর আমরা ছোটোরা কেউ তখন জানতুম না, কিন্তু দিদি নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছিল।

যাবার পথে ট্রেনে যখন আমরা গরমে ছটফট করছি, দিদি তখন তার হাতব্যাগ থেকে সেই গোটানো পাখাটা বার করলো। এতদিন বাদে দিদি তার শখের জিনিসটা ব্যবহার করতে চায়। তখন অবশ্য বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম যে বিয়ের কথা শুনলে সব মেয়ের মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসে।

দিদির মুখ চোখও যেন খানিকটা বদলে গিয়েছিল। চোখ দুটি বেশী উজ্জ্বল, মুখের রংটা বেশী লালচে। এবং জীবনের এত বড় একটা ঘটনার সম্মানেই দিদি আলমারি থেকে পাখাটা বার করে এনেছে।

আমরা ছোটোরা জালনার ধারে বসবার জন্য সর্বক্ষণ মারামারি করছিলাম। কেউ একটু উঠে গেলেই অন্যজন সেইখানে ঝপাস করে গিয়ে বসে পড়ে। জানলা মোটে দুটো, আর ছোটোরা চারজন।

দিদি হাত পাখাটা বার করবার পর আমাদের মনোযোগ গেল সেদিকে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হাত পাখাটা একটু নিই। পাখাটা আগের মতন আর সুন্দর নেই—তবু ওটার আকর্ষণ আমাদের কাছে কমেনি। দিদি পাখাটা একটু নামিয়ে রাখলেই আমরা কেউ না কেউ সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিই। ঠিক একগুচ্ছ সবুজ পাতার মতন পাখা—তাতে হাওয়া অবশ্য খুব বেশী হয় না, কিন্তু মনের খুব আরাম হয়।

শেষ পর্যন্ত বোকার মতন কাজটা করলাম আমিই। পাখাটা সমেত আমার ডান হাত অন্যমনস্কভাবে একবার বাড়িয়েছিলাম জানলার বাইরে, পরক্ষণেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা! কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেই। পাখাটা আমার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে, জানলা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। চলন্ত ট্রেন থেকে কোনো জিনিস পড়ে গেলে তা আর কেউ কখনো পায় না।

ব্যাপারটা সবাই যখন বুঝতে পারলো, তখন আমার ওপর শুরু হয়ে গেল বকুনির ঝড়। বাবা, মা আর সবাই মিলে আমায় নিয়ে পড়লেন। শুধু ঐ পাখা হারানোই নয়—এর আগেও যতদিন যতরকম দোষ করেছি সব টেনে আনা হলো।

শুধু দিদি বললো, যাকগে, গেছে যাক। নীলু তো আর ইচ্ছে করে ফেলেনি! পুরোনো জিনিস, এমন আর কি!

দিদির এই কথাটার জন্য আমি দিদির কাছে সারা জীবনের মতন কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। কারণ শুধু দিদির কথা ভেবেই আমি খুব অনুতাপ বোধ করছিলাম। একটা পাখা হারানো এমন কিছু ব্যাপার নয় কিন্তু যেহেতু ওটা ছিল দিদির খুব প্রিয় জিনিস, তাই ওটা নিয়ে অসাবধানে খেলা করা আমার অন্যায় হয়েছে। দিদি যখন আমার গায়ে হাত দিয়ে বললো, যাকগে ও নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না তখন আমার চোখে জল এসে গেল।

আমি মন খারাপ করে বসে রইলাম। আমার মনে পড়লো সেই জাপানী মেয়েটির ছবির কথা। ছবিতে কারুর বয়েস বাড়ে না। সেই তুলতুলে পুতুলের মতো মেয়েটি হাতে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট নিয়ে উইলো গাছের নীচে দাঁড়ানো—কত দূর জাপান থেকে সে পাঠিয়েছিল একটা পাখা, সেটা শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের ট্রেন লাইনের পাশে পড়ে রইলো একা একা।

তারপর স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে গেল, আমার আর কারু সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগলো না। দিদি বারবার বলতে লাগলো, এই, তুই মন খারাপ করছিস কেন? আমি তবু কোনো উত্তর দিই না।

পাখাটা হারাবার পর যেন সকলেরই গরম বোধ আরও বেড়ে গেল। সবাই গরমে ছটফট করছে আর ঘন ঘন জল খাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে নেমেই ফ্লাস্কে জল ভরে আনতে হয়। একটা স্টেশনে আমি জল ভরতে নামলাম।

জলের কলটা অনেক দূরে। সেখানে আবার ভিড়। ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ যেন চুম্বকে আমার চোখ এক দৃষ্টে আকৃষ্ট হলো।

একটা কামরা থেকে একটি বাঙালী পরিবার নামছে প্রচুর মালপত্র নিয়ে। তাদের মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ের হাতে একটি পাখা, অবিকল আমার দিদির পাখাটার মতন। আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এ কি করে সম্ভব? ঠিক এক রকমের দুটি পাখা? এ পর্যন্ত দিদির ঐ জাপানী হাত পাখাটার মতন দ্বিতীয় কোনো পাখা আমরা দেখিনি। অবশ্য জাপানে নিশ্চয়ই ওরকম একটাই পাখা তৈরি হয়নি—আর কেউ জাপান থেকে ওরকম আর একটা পাখা আনতেও পারে।

কিংবা এমনও তো হতে পারে, আমার হাত থেকে পাখাটা উড়ে গিয়ে ট্রেনের অন্য কোনো কামরায় ঢুকে গেছে। এরকম তো হয়ই। অনেক সময় যেমন ছেঁড়া কাগজ কিংবা চীনে বাদামের খোসা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে।

পাখাটা ফেরৎ চাইবো? দিদির অতি প্রিয় জিনিস। কিন্তু যদি ওটা আমাদের না হয়? যদি সত্যিই ওটা ওদেরই পাখা হয়, তাহলে আমাকে কী ভাববে? নিশ্চয়ই ভাববে একটা জোচ্চোর।

তখন আমি মনে মনে কয়েকটা সংলাপ তৈরি করে নিতে লাগলাম। যদি গিয়ে বলি, দেখুন, এই পাখাটা কি আপনাদের?

একটি কিশোরী মেয়ের হাতে একটি পাখা অবিকল আমার দিদির পাখার মতন

আমাদেরও এরকম একটা পাখা ছিল—

না, না, এভাবে ঠিক বলা যায় না।

কিংবা যদি বলি, বাঃ পাখাটা খুব সুন্দর তো! কোথা থেকে কিনেছেন?

তা হলেই নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো এটা কিনিনি! জানালা দিয়ে উড়ে এসেছে।

তারপরই আমি হেসে বলব, ওটা আসলে আমাদের। বিশ্বাস না হয়, আমাদের কামরায় চলুন, সবাই সাক্ষী দেবে!

এ পর্যন্ত তো ঠিক করা হলো। কিন্তু একটা অচেনা মেয়ের সামনে গিয়ে হঠাৎ তার হাতের পাখাটার প্রশংসা করার জন্য যতখানি সাহস থাকা দরকার, আমার তা নেই। দারুণ লজ্জা করতে লাগলো।

এই রে, মেয়েটি যে এবার পাখাটা গুটিয়ে নিচ্ছে। এবার নিশ্চয়ই ব্যাগে ভরে রাখবে। তারপর তো আর কিছুই করা যাবে না!

ওদের দিকে দু' এক পা এগিয়েছি, এমন সময় মেয়েটির মা মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুই ঐ পাখাটা এখনো ফেলিস নি! কার না কার পাখা, পুরোনো একটা জিনিস—

মেয়েটি বলল, না, আমি এটা রাখবো!

কক্ষনো না! পরের জিনিস ওরকম নিতে নেই। রাস্তায় ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস কিছুতেই বাড়িতে ঢোকাবি না। ফেলে দে, ফেলে দে!

আমি হাঁ-হাঁ করে ওঠার আগেই মেয়েটি রাগ করে পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্ল্যাটফরম পেরিয়ে সেটি গিয়ে পড়ল লাইনের কাছে।

আমি স্তম্ভিত। সত্যিই ওটা আমাদের পাখা। এত কাছে এসেও ফেরৎ পেলাম না। ট্রেন দাঁড়ানো অবস্থায় লাইন থেকে কোন জিনিস তোলা যায় না। তাছাড়া ওখানে কত লোক কত ময়লা জিনিস ফেলে—

তবু একবার চেষ্টা করবো ভেবেছিলাম। এমন সময় ফুর্-র-র করে গার্ডের বাঁশী বেজে উঠল। ট্রেন নড়েচড়ে উঠলো। আমি দৌড়ে নিজেদের কামরার দিকে চলে গেলাম।

ফিরে এসে, উত্তেজনা ও হতাশা মিশিয়ে ঘটনাটা বললাম সবাইকে। আমি যদি অতটা লাজুক হয়ে না গিয়ে মেয়েটিকে একটু আগে বলতাম, তাহলে পাখাটা যে ফেরৎ পাওয়া যেত তাও জানালাম। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলো না। এমন কি দিদি পর্যন্ত বললো, উঃ, নীলুটা কী গুলবাজ হয়েছে! বানিয়ে বানিয়ে কত গল্পই যে বলে!

পুস্তক পরিচয়

রম্যরচনাঃ নির্মল ও স্মিত কৌতুকে স্নিগ্ধ

রোজনামচা। ফাদার দ্যতিয়েন। অনন্য প্রকাশন। ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য : বারো টাকা।

গল্প-উপন্যাস বা নাটক লেখেননি, কবিও নন, এমন কি বাঙালীই নন, তবু 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা' আর 'রোজনামচা' বই দু'খানির লেখক কি করে বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল ও রমণীয় আসন দখল করে নিলেন ভেবে অবাক হতেও আমার ভুল হয়ে যায়—এতোটাই সজীব ও সাবলীল তাঁর রচনা। এতোটাই যে, ফরাসী গদ্যের স্বচ্ছতা ও সরস বুদ্ধিপ্রবণতাও তাঁর হাতে হয়ে ওঠে যেন বাংলা ভাষারই জন্মগত অধিকার। ফাদার দ্যতিয়েনের মাতৃভাষা যে ফরাসী এবং তিনি যে লেখেন আমাদের মাতৃভাষায়—এটাকে বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ ঘটনা হিসেবে আমি উল্লেখ করতে চাই।

তাঁর ভাষার মতন তাঁর বিষয়ও আমাদের নিজস্ব। আমাদের সমাজ সংসার প্রথা সংস্কার, জীবনযাপনের নানান টুকিটাকি লেখক দীর্ঘ দিন ধরে দু চোখ ভরে দেখেছেন, চোখ দুটিও দরদ ও স্মিত কৌতুকে সব সময় চিকচিক করছে। তাঁর এইসব চলমান দেখাশোনা থেকে তিনি শিল্পের নিপুণতায় তুলে এনেছেন হরেক চরিত্র, নানান বৃত্তান্ত। আবার তীরে ব'সে তিনি স্রোত দেখেননি, দূরে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখ আঁকেননি, তাঁর চেনা-অচেনা মানুষ-জনের সঙ্গে কখনো মাননীয় গুরু, কখনো বিশ্বস্ত বন্ধু, কখনো সমব্যথী সাক্ষী হিসেবে তিনি জড়িত। 'রোজনামচা'র এক-একটি রচনা-টুকরো তারই গল্প-পরিণাম। 'গল্প-পরিণাম' কথাটায় পাঠক চমকে উঠতে পারেন, কেননা এ তো রোজনামচা। ঠিকই, আটসাট ছোটগল্পের মতন সীরিয়াস শিল্প-সৃষ্টি এগুলি নয়, আবার লেখকের সঙ্গে তাঁর বর্ণিত বাস্তব মানুষজনের পরিচয়ের নিরবচ্ছিন্ন সূত্রটি সত্ত্বেও এগুলি ঠিক রোজনামচাও নয়। আমার তো মনে হলো, অল্প কয়েকটি টুকরো বাদ দিলে, রোজনামচার ভাবটা আসলে এক ধরনের ছদ্মবেশ, আর এই ছদ্মবেশ রচনাগুলিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে যায়। নীললোহিতের ভাষা আলাদা, জগৎ ভৌগোলিক অর্থে ব্যাপক, কিন্তু এই সূত্রে তাঁর দশ-বারো বছরের বৃত্তান্তগুলি নিয়ে ভাবতে বসলে পাঠক দুটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লুব্ধ হবেন : 'ছোটগল্প', 'রোজনামচা' ও 'ছদ্মবেশী'। তবে—সব সময়ই যেমন দেখা যায় সাহিত্য তার যে-কোনো সংজ্ঞার চেয়ে বেশী, এ-সব কচকচির চাইতে বইটিও তেমনি বড়ো।

'রোজনামচা'র বৃত্তান্তগুচ্ছকে আমাদের দেশভাগের মতনই ফাদার দ্যতিয়েন দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। প্রথম চোদ্দটি [illegible] এপার বাংলা, আর [illegible] ওপার বাংলা যখন তিনি সেখানে ভ্রাম্যমাণ। দুটি অংশের নামকরণও চমৎকার : গৌড়ে, বঙ্গে।

দুই বাংলার নানা পেশার, জাতের, ধর্মের মানুষজন, তরুণ-তরুণী, তাদের ঘর-গেরস্থালি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, বিয়ে-ভালোবাসা, বিবাদ-বিরহ—এইসব সুখ-দুঃখময় নানান খুঁটিনাটি নিয়ে ফাদার দ্যতিয়েনের এই রোজনামচা। তুচ্ছ, সাধারণ মানুষজনের জীবনে এতো যে আশ্চর্য সব গল্প লুকিয়ে ছিলো, কে জানতো! ভালোবাসার কাহিনীগুলি তো

অবিনশ্বর প্রেমগাথার মতন জ্বলজ্বল করছে। লেখকের কথা বলবার ধরনটিও এমন নির্মল ও স্মিত কৌতুকে স্নিগ্ধ যে, মনে হয় পাঠককে আবিষ্ট করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো।

আবিষ্ট হতে হয় রচনার সরসতায় শুধু নয়, বৃত্তান্তগুলির অসাধারণ সাহিত্য-মূল্যেও। এগুলিকে বৃত্তান্ত বলা সঙ্গত মনে হয় না—মণির কণ্ঠ, ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক অ্যান্ড সন্, নন্দকিশোর রাজার নাতনী, মনের মতো গ'ড়ে তোলা, মমতাজের প্রস্থান ইত্যাদি ছোটগল্প ছাড়া আর কি! বইটি না পড়া সাহিত্যপাঠকের পক্ষে খুবই লোকসানের।

ছাপা আরো একটু কেন পরিষ্কার হলো না? আর সূচিপত্রের লে-আউটের প্রয়োজনে 'ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক অ্যান্ড সন্'কে ধীরেন প্রামাণিক অ্যান্ড সন্ হতে হলো—এমন অসামান্য বইয়ের এই সামান্য ত্রুটিও ভালো লাগে না।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রস্তাবনা, শেষ সংলাপ ও মধ্যবর্তী চারটি সর্গে বিভক্ত এক দীর্ঘ কবিতা—এই নিয়ে পার্থ রাহার **অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা** (বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা ৯. তিন টাকা)। দীর্ঘ কবিতা লেখার প্রবণতা মধ্যে কিছু দিন যেন কমে গিয়েছিল। অতি তরুণ অনন্য রায়ের পর, সম্ভবত, পার্থ রাহাই আবার পরিক্রমা শুরু করলেন।

প্রস্তাবনায় পার্থ 'সময়ের শরীরে একবার মগ্ন' হবার প্রার্থনা করেছেন। প্রথম সর্গে তাঁর অনুভব এই প্রাচীন জীবাশ্মের জটিল শহর আর তাঁর নিজস্ব একাকার ভালবাসা ও নিঃসঙ্গতা। দ্বিতীয় সর্গের অন্বিষ্ট এক যাত্রা। 'তোমার কাছে যাব বলে/সেই কোন আদিম প্রত্যূষে আমার যাত্রা শুরু'। সেই পথ-পরিক্রমার পরিচয় পরবর্তী সর্গে। 'আমার আমাকে নিয়ে বড়ো বেশী ক্লান্ত হওয়া'র, 'অন্ধকারে আলো অন্ধকারে' ঝুঁকে পড়ার স্বীকারোক্তিতে শেষ হয়েছে এই সর্গ। শেষ সর্গে এসে তাঁর 'অপেক্ষা' ও উপলব্ধির চূড়ান্ত পরিচয়—"রক্তের ভিতরে এক রক্তহীনতা নিয়ে/সময়ের ভিতরে এক সময়হীনতা নিয়ে/ভালোবাসা, পৃথিবী এবং তোমাকে আমার/শেষবার বিদায় জানবো.../ অতঃপর নচিকেতা আমার মৃত্যুঞ্জয়ের পাঠ এনে দেবে।" এই মৃত্যুঞ্জয় পাঠ তাঁকে একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে দেবে মুক্তি, দগ্ধ করা, ধ্বংস করার ঊর্ধ্বে রাখবে প্রেম-পুণ্য-শিল্প-স্মৃতি—প্রায় চ্যালেঞ্জের মতো বলেছেন পার্থ।

কবিত্ব বেশ অনায়াসে ইতস্তত ছড়ানো পার্থ রাহার এই দীর্ঘ রচনায়। বক্তব্য অবশ্য তেমন জোরালো কিছু নয়। তবু তিনি যখন লেখেন "জন্ম থেকে আমি যেন স্বপ্নের-মধ্যে-কথা-বলা কোন এক অসহায় শিশু"—সেই অ স হা য় তা র তীব্রতা পাঠককেও আর্দ্র করে। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

এই বইয়ের পেছনের মলাটে কবি-পরিচিত কে লিখেছেন জানি না। কিন্তু বোঝা গেল বাংলা ভাষা তাঁর খুব একটা করায়ত্ত নয়। নইলে 'আয়ত্বাধীন'-এর মতো মার্কা-মারা বানান ও গঠনগত ভুল শব্দ ব্যবহার করতেন না।

*

পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা হরণের ঠিক এক শো বছর পর থেকেই স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচার গ্লানি নানান বিদ্রোহের আকারে একের-পর-এক দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে। আরো প্রায় এক শো বছরের সেই ইতিহাস আমাদের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। পলাশীর পরে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম, কংগ্রেসের জন্ম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিপ্লবী সংগঠন, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অহিংস-অসহযোগ, আইন অমান্য, কৃষক-শ্রমিক ও যুব আন্দোলন, ভারত-ছাড় অভিযান, আগস্ট বিপ্লব ও নেতাজীর গড়ে তোলা আজাদ হিন্দ ফৌজ—এই মহা-ইতিহাসের এক-একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

অশোক গুহ তাঁর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা ৬, সাড়ে পাঁচ টাকা) গ্রন্থে খুব সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষায় এই অধ্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্বচ্ছন্দে জানতে পারে এই অবশ্য-পাঠ্য ইতিহাস, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বইটি লিখেছেন তিনি। তাঁর এই প্রয়াস সার্থক।

বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে অরুণা রায়চৌধুরীর সম্পাদনায়।

প্রমথ
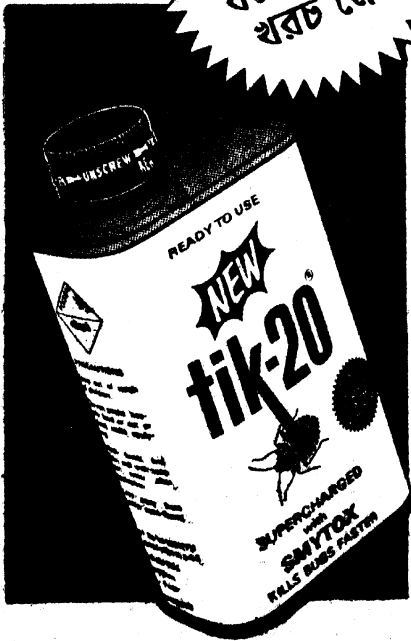
খেলার মাঠে

ফুটবল মাঠে দর্শকদের বিড়ম্বনা

ফুটবল লীগের তিনটি বড় খেলার প্রথমটি নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর এই খেলাকে কেন্দ্র করে দর্শকদের বিড়ম্বনাও কম হয়নি। বিশেষ করে দামী টিকিটের ময়দান-যাত্রীদের। অত্যুক্তির জন্যই একটা কথা আছে—'গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা ছিল না।' আক্ষরিক অর্থেই বোধ হয় বলা যায় মোহনবাগান মাঠের পাকা স্টেডিয়ামের পাঁচ টাকার টিকিটের গ্যালারিতে তিল ধরাবার জায়গা ছিল না। শ্বাসরোধের অবস্থায় গাদাগাদি হয়ে দেড়-দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকদের খেলা দেখতে হয়েছে। বসার কোন প্রশ্নই ছিল না। তুলনায় দু টাকা ও তিন টাকার টিকিটের গ্যালারি ছিল অনেক পাতলা। পাতলা অর্থে কোন আসন খালি ছিল তা নয়—অন্তত বসার মত অবস্থা ছিল। কিন্তু পাঁচ টাকার গ্যালারির অবস্থা অফিস টাইমের বাস-ট্রামকেও বোধ হয় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন, আসনসংখ্যার অতিরিক্ত এত বেশী দর্শক মাঠে ঢুকল কিভাবে?

আজকাল বড় তিনটি ক্লাবের সাধারণ লীগ ম্যাচে এত ভিড় হচ্ছে যে দর্শকরা বেলা দেড়টা বা দুটোয় মাঠে না ঢুকলে আর বসার জায়গা পাচ্ছে না। খেলা আরম্ভ হচ্ছে সওয়া চারটে বা সাড়ে চারটেয়। দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে। প্রতীক্ষা টিকিটের লাইনেও। অফিস-কাছারির কর্মীদের পক্ষে ফুটবল খেলা দেখা সত্যিই বিড়ম্বনা। বিড়ম্বনার ভয়েই অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ময়দানমুখী হতে চান না। রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শুনে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল-মহমেডান খেলায় ঘোলও তো ঠোঁটের চুমুকের আগে সরে গেল।

কেন খেলাটির ধারাবিবরণী প্রচারিত হল না? কেন বাংলার ও বাংলার বাইরের কয়েক কোটি শ্রোতা ঘরে বসে এ খেলার ধারাবর্ণনা শোনা থেকে বিমুখ হলেন? কারণ মোহনবাগান মাঠে এখনও এমন রেডিও বক্স তৈরী হয়নি যেখানে কমেন্টেটররা নিরাপদে বসে খেলার খবর প্রচার করতে পারেন। তাই রেডিও কর্তৃপক্ষ ও মাঠ থেকে খেলার ধারাবিবরণী প্রচার করতে অস্বীকার করেছেন।

শুধু কি কমেন্টেটরদেরই নিরাপত্তা-বোধের অভাব? ওই মাঠে প্রেস বক্সের অবস্থাও তো সঙ্গীন। এখনও প্রেস বক্স ঠিকমত তৈরী হয়নি। অথচ পাকা গ্যালারি স্টেডিয়াম তৈরীর জন্য রাজ্য সরকার ও মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে যে চুক্তিপত্র হয়েছিল তাতে প্রেস বক্সের জন্য একটি ধারা ছিল। তাতে লেখা ছিল উপযুক্ত জায়গায় সব রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে প্রেস বক্স তৈরি করা হবে। শুনেছি প্রেস বক্সের সঙ্গে রেডিও বক্স ও টেলিভিসন বক্স করার দায়িত্ব পরে বর্তেছে রাজ্য সরকারের উপরে। দায়িত্ব যারই হোক, খেলার প্রসার-প্রচারে এবং ক্রীড়ামোদীদের স্বার্থে অচিরেই সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়া উচিত।

লর্ডস টেস্ট ড্র

ইংল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টও ড্র হল। ট্রেন্টব্রিজের প্রথম টেস্ট ড্র হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের পরাজয় আশঙ্কার মধ্যে। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হার এড়িয়েছে শঙ্কার মধ্যে থেকে এবং নেতিমূলক ক্রিকেট খেলে।

যদি তৃতীয় দিনের খেলা বৃষ্টিতে ধুয়ে না যেত তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হয়তো পরাজয় এড়াতে পারত না। শেষ দিনের খেলা পুরো সময় হলেও বিপদ ছিল। কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল শেষ দিকের ৪টি উইকেট। লর্ডস পীচে তখন বল দারুণ ঘুরপাক খাচ্ছিল। ওই সময় অধিনায়ক লয়েড আলো কমের আবেদন জানান এবং নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে খেলা শেষ হয়ে যায়।

একটি খেলোয়াড়ের অভাবেই বোধ হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং চেহারা বদলে যায়। সে খেলোয়াড়টির নাম ভিভিয়ান রিচার্ডস। প্রথম ইনিংসে ২৩২ এবং ৬৩ রান-কারী রিচার্ডস দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে পারেনি জীবাণু সংক্রমণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ক্রিকেট এমন এক খেলা যাতে কারও সম্পর্কেই জোর করে বলা যায় না সে রান করবেই। তবু রিচার্ডস এ বছর যে ফর্মে রয়েছে তাতে তার ব্যাট থেকে বড় রান আশা করা অমূলক নয়। সে থাকলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস হয়তো মাত্র ১৮২ রানে শেষ হত না। গ্রিনিজ ও লয়েড ছাড়া কেউ দুই দশকের ঘরে রান করতে পারেনি। কেউ স্নো ও আণ্ডারউডের বলের মোকাবিলা করতে পারেনি আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে।

দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডকেও অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে এখনকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান জন এডরিচকে বাদ দিয়ে। উরুর মাংস-পেশীতে টান ধরায় এডরিচ লর্ডসে খেলতে পারেনি। তবে ইংল্যাণ্ড সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ। ৪৫ বছর বয়সে তাকে আবার টেস্ট খেলতে ডাকা হয়েছে বলে পত্র-পত্রিকায় কলমের রসালো মন্তব্যের বান ডেকে গিয়েছিল। ব্যাটের বলিষ্ঠ প্রলেপে সব মুছে দিয়েছেন ব্রায়ান ক্লোজ ৬০ ও ৪৬ রান করে। বলতে গেলে প্রথম ইনিংসে অ্যাণ্ডি রবার্টসের বলের গোলায় ইংল্যাণ্ডের প্রায় সবাই নাজেহাল হয়েছে। ব্যতিক্রম ওই ব্রায়ান ক্লোজ।

টসে জিতে ৩১ রানের মধ্যে ইংল্যাণ্ড দুটি উইকেট হারিয়ে ক্লোজ ও ব্রিয়ারলির দৃঢ়তায় ৩ উইকেটে ১১৫ রানে পৌঁছয়। তারপর তাদের পাঁচটি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৫৫ রানের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য করে ২৫০ রান। ওই রানের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস মাত্র ১৮২ রানে শেষ হবার মূলে পেস বোলার জন স্নো ও স্পিনার আণ্ডারউড।

লর্ডসে দুই দলের বোলারদেরই আধি-পত্য দেখা গেছে। তার মধ্যে অ্যাণ্ডি রবার্টসের সবচেয়ে বেশী। দুই ইনিংসে ১০টি উইকেট পেয়েছে ১২০ রানে।

প্রথম ইনিংসের বাড়তি ৬৮ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৪ রান নিয়ে ইংল্যাণ্ড চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ম্যাচ জেতার জন্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিন্তু ২৯৫ মিনিটে ৩২৩ রান করার ঝুঁকি নেয়নি। পরাজয় এড়িয়েছে নেতিমূলক মন্থর ক্রিকেট খেলে। তার মধ্যে ওপেনার রয় ফ্রেডেরিকস করেছে ১৩৮—লর্ডস টেস্টে একমাত্র সেঞ্চুরি।

ইংলণ্ডে যে-কোন টেস্ট ম্যাচে অর্থ সংগ্রহের যে রেকর্ড হয়েছিল গত বছর ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া খেলায়, এই ম্যাচ সে রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। তৃতীয় দিনের (যেদিন বৃষ্টিতে খেলা হয়নি) হিসাবে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১,৩৭,০০০

পাউণ্ড। ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে সংগৃহ হয়েছিল ১,১৯,০০০ পাউণ্ডের মত। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ইংল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস ২৫০ (ব্রায়ান ক্লোজ ৬০, মাইক ব্রিয়ারলি ৪০, বব উলমার ৩৮, ডেরেক আণ্ডারউড ৩১; অ্যাণ্ডি রবার্টস ৫—৬০, ভানবার্ন হোল্ডার ৩—৩৫)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ১৮২ (গর্ডন গ্রিনিজ ৮৪, ক্লাইভ লয়েড ৫০; ডেরেক আণ্ডারউড ৫—৩৯, জন স্নো ৪—৬৮)।

ইংল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৪ (ডেভিড স্টিল ৬৪, ব্রায়ান ক্লোজ ৪৬, ব্যারী উড ৩০, বব উলমার ২৯; অ্যাণ্ডি রবার্টস ৫—৬৩, রফিক জুমাদিন ৪—৪১, মাইকেল হোল্ডিং ২—৫৬)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ৬ উইঃ ২৪১ (রয় ফ্রেডেরিকস ১৩৮, আলভিন কালীচরণ ৩৪, ক্লাইভ লয়েড ৩৩; টনি গ্রীগ ২—৪২, ডেরেক আণ্ডারউড ২—৭৩)।

একলব্য

এক ঠ্যাংয়ের ফুটবলার

মোহনবাগানের লেফ্‌ট লিঙ্কম্যান প্রসূন ব্যানার্জী গত ফুটবল মরসুমে দর্শক-সমর্থকদের প্রশংসা তো দূরের কথা, দু-চারটি খেলায় ব্যতিক্রম ছাড়া নিন্দা-বাদই পেয়েছে বেশী। তার সঙ্গে দুই একটি বক্রোক্তিও। 'দাদার নামে চলে যাচ্ছে।' 'এক ঠ্যাং নিয়ে কি ফুটবল খেলা যায়?'

যাদের এক পায়ে জোর বেশি, অপর পা প্রায় চলে না, ফুটবল মহলে তারা এক ঠ্যাংয়ের খেলোয়াড় নামে নিন্দিত হয়ে থাকে। যে পায়ে জোর একেবারেই থাকে না সেই পাকে বলা হয় 'কাঠের পা।' অবশ্য বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের ডান পায়েই জোর থাকে বেশি। দুই পায়ে সমান জোরে শট করনেওয়ালা খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম। কিন্তু এক ঠ্যাংয়ের খেলোয়াড়রাও যে বড় ফুটবলার হতে পারে তার নজিরও অনেক আছে। আমাদের চোখে দেখা সব-চেয়ে বড় নজির ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাগসলে. নায়ার। সাম্প্রতিক উদাহরণ প্রসূনে ব্যানার্জী।

পাগসলে ছিলেন বর্মার খেলোয়াড়। ফুটবল সূত্রেই কলকাতায় এসেছিলেন। চাকরী করতেন বার্ণপুরে। ঠিক প্রসূনের মতই ডান পা ছিল 'কাঠের পা।' কিন্তু বাঁ পা খানা? রূপক অর্থে বলা যায় সোনায় তৈরী। কী খেলাই না খেলে গেছেন চল্লিশের দশকে। নায়ারের বেশি গোল করার রেকর্ড তো এখনো অম্লান।

প্রসূনকে অবশ্যই আমি নায়ার বা পাগসলের পর্যায়ে ফেলছি না। কিন্তু এ বছর ওই বাঁ ঠ্যাংয়ের বিক্রমে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে যারা গত বছর তার আশপাশের বায়ু যথেষ্ট বিষাক্ত করে তুলে-ছিল। উল্টে এখন তাদের মুখেই প্রসূনে সম্পর্কে প্রশংসাবাণী।

প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসাবেই ময়দানে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তারপর নামও করেছিল বি ক্যাটাগরির বড় খেলোয়াড় হিসাবে। না হলে মোহনবাগান ক্লাব ওকে দলে টানবে কেন?

প্রসূনে কি এ-বছর তার ফর্ম ফিরে পেয়েছে? নাকি দাদা পি কে ব্যানার্জীর সাক্ষাৎ প্রশিক্ষণে এসে মনোবল বহুগুণ বেড়ে গেছে? দল হিসাবেও মোহনবাগান এবার শক্তিশালী। সহ খেলোয়াড়রা সবাই ট্যালেন্টেড। সেটাও ভাল খেলা এবং বাড়তি বিক্রম দেখানোর কারণ হতে পারে।

ফুটবলে ভ্রাতৃ-সমাবেশের গর্ব করার মত উদাহরণ নন্দী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের। অজিত, অনিল, নিখিল, সুনীল—চার ভাইই জাতীয় দলে খেলেছে। উদাহরণ আরও আছে—চুণী-মানিক, রবি-শশী, আজম-হাবিব-আকবর প্রভৃতি। ছয় ভাই—প্রদীপ, প্রদ্যোৎ, প্রণবেশ, পার্থ, প্রেমাংশু ও প্রসূনদের মধ্যে অগ্রজ প্রদীপ তো 'পি কে' নামে ভারতীয় ফুট-বলে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। প্রেমাংশু প্রথম ডিভিসনে খেললেও ঠিক মাঝারিয়ানার

প্রসূন ব্যানার্জি

মধ্যেও পড়েনি। প্রসূনই পারিবারিক ঐতিহ্য জিইয়ে রাখছে। বাবা প্রভাতকুমার ব্যানার্জী ছিলেন বাঁকুড়ার আদি অধিবাসী। ময়না-গুড়িতে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে চাকরী করতেন। পরে চাকরী নেন জামসেদপুরে টেলকোতে। ভাল টেনিস খেলতেন। ফুটবলও খেলেছেন অল্প-স্বল্প।

একবার বোধ হয় আমি লিখেছিলাম প্রদীপের পদাঙ্কে প্রসূনের ফুটবল। শিয়ালদার ক্রেস্ট ব্রাউন ইনস্টিটিউট মাঠে প্রদীপের কাছ থেকেই প্রসূনের ফুটবলের প্রথম পাঠ গ্রহণ। ১৯৬৯-এ জর্জ টেলিগ্রাফে প্রথম ডিভিসন শুরু। ৭১-এ খিদিরপুরে ক্লাবে। ৭৩-এ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতা দলের অধিনায়কত্ব।

দাদার মত ফরোয়ার্ডে খেলা শুরু করেছিল। খিদিরপুরের কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জী সরিয়ে আনেন হাফ ব্যাকে। দাদা বাধা দেননি। বরং বলেছেন, 'তোমার ভাল আমার চেয়েও উনিই বেশি বুঝবেন।

মোহনবাগান ক্লাবে আসার পর এ-ক'বছর দাদা ছিলেন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোচ। তখনো শিখিয়েছেন। বয়সে কুড়ি বছরের ছোট ভাইটিকে কি শিখিয়েছেন? 'যে দলে খেলবে সর্ব-শক্তি নিয়ে খেলবে। খেলার মাঠে দাদা-ভাইয়ের দুর্বলতা যেন কণামাত্র না আসে।' ১৯৭৩-এ খিদিরপুর ক্লাব ২—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করার পর ব্যাঙ্গালোর থেকে ইস্টবেঙ্গল কোচ পি কে ব্যানার্জী ভাইকে কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন একটি গোল করার জন্য।

রেডিওর সুইচের মত প্রশ্নের সুইচটা খুলে দিলেই প্রদীপ ব্যানার্জি চালু হয়ে গেলেন। তখন মিডিয়াম এ-বি, শর্ট-ওয়ান, শর্ট-টু—যে কোন ওয়েভ ব্যান্ড থেকে অনর্গল খেলার কথা বেরিয়ে আসবে। হ্যাঁ, খেলার যে কোন বিষয়ে টেকনিক, ট্যাকটিকস, প্রশিক্ষণ, পরিসংখ্যান সম্পর্কে এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে যেতে পারেন প্রদীপ ব্যানার্জি। বলেও থাকেন। কনিষ্ঠ প্রসূনে ঠিক তার উল্টো। বোমা মারলেও মুখচোরা ছেলেটির মুখ থেকে কথা বের করা শক্ত। স্বল্পবাক, শান্ত এবং বিনয়ী। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলে—আমার বলার কি আছে? আমি কি দাদার মত খেলোয়াড়? নাকি তাঁর ধারেকাছে আসতে পেরেছি?

পারেনি ঠিকই। কিন্তু ফুটবলের ধ্যান-ধারণায়, স্পোর্টসম্যানস স্পিরিটে এবং ক্রীড়া দক্ষতায় 'এক ঠ্যাংয়ের' খেলোয়াড়টি দাদার কিছুটা কাছাকাছি এসেছে বইকি। এক পায়ের জোরের ঘাটতি তারাই পুষিয়ে নিতে পারে আর এক পায়ে যাদের জোর অনেক বেশি। সেই সঙ্গে যাদের আছে পজিশন জ্ঞান, ক্রীড়াশৈলী এবং ট্যাকলিং দক্ষতা। প্রসূন সেই ধরনের ফুটবলার।

মুকুল

অরণ্যদেব ✿ লী ফক

রিভলবার খাপে পুরেছে.....
জাপটে ধর!

নিরস্ত্র লোকের ওপরে আমি গুলি চালাই না!
!!!
আমার হাত দুখানাই যথেষ্ট!

উঃ!
আঃ!
ওঃ!
দমাস্
দুম্ঃ

অরণ্যদেব... আপনি আপনার রিভলবার খাপে পুরে ফেলতে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম!
এবারে সুইলমান, তোমার জখম কতটা দেখা যাক!

আট শো বস্তা হলেই আমরা সরে পড়ব, বুঝলে?
বিলক্ষণ!

11/23
কী করছে ওরা? ঘুমোচ্ছে নাকি?

এই, তোমরা শুয়ে আছ কেন?
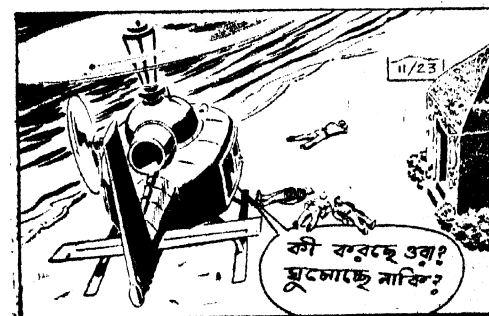
সত্যজিৎ রায়ের সর্বাধুনিক ডকুমেন্টারি **বালা** ছবিতে শ্রীমতী বালা সরস্বতী। ফটো : দেশ

সেক্স এবং ভায়োলেন্স সম্পর্কে সেনসরের নতুন বিধি হিন্দী ছবির কিছু কিছু প্রযোজককে বিপাকে ফেলেছে। সত্যজিৎ রায় সে সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন ক'দিন আগে এক সাংবাদিক সমাবেশে। ফেডারেশন অব ফিলম সোসায়েটিজ অব ইনডিয়া এবং পুস্তক প্রকাশক সংস্থা ওরিয়েণ্ট লংম্যান যুক্তভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের মুখোমুখি হবার জন্য। তাঁর লেখা নতুন ইংরিজী প্রবন্ধের বই "আওয়ার ফিলমস, দেয়ার ফিলমস" ওই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হল। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটসে সেই উপলক্ষেই এই সাংবাদিক সম্মেলন।

হিন্দী ছবি এবং সেনসরের নতুন বিধির কথা উঠল যেহেতু সত্যজিৎ রায় তাঁর আগামী ছবিটি হিন্দী ভাষায় করছেন। শ্রী রায় প্রেম চন্দের উপন্যাস "শতরঞ্জ কে খিলাড়ী"-র চিত্ররূপ দেবেন। তিনি বললেন, অন্যদের বিপাকে ফেললেও তাঁর কোন অসুবিধা হবে না, কারণ তাঁর ছবিতে ওই জাতীয় বস্তু কিছুই থাকে না। তবে সেনসরের এই কড়াকড়ি হয়তো কিছুটা শিথিল হতে পারে।

ওই নতুন বিধির ফলে বাংলা ছবির কোন ক্ষতি হতে পারে কি না—সে কথাও সাংবাদিকরা জানতে চাইলেন। সত্যজিৎ রায় বললেন, না, তেমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা আপাতত তিনি দেখছেন না, যদি না কেউ সেক্স আর ভায়োলেন্স ইত্যাদি নিয়ে বাংলা ছবি করতে উদ্যোগী হন।

প্রসঙ্গত তিনি জানালেন, তাঁর ছবি শহরের শিক্ষিত দর্শকরাই পছন্দ করেন, মফস্বলের দর্শকদের কাছ থেকে তেমন সাড়া মেলে না। মফস্বলের দর্শকরা কেমন ছবি পছন্দ করেন—এমন একটি প্রশ্নও সত্যজিৎ রায়কে করা হয়েছিল। উনি উত্তর দিলেন, ওই যে সব ছবি চলছে। তবে মনে হয় হিন্দী ছবির প্রতিই মফস্বলের দর্শকদের পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি।

ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন মুভমেন্টের দরুণ দর্শকের রুচি কতটা বদলেছে সে প্রশ্নও উঠল। সত্যজিৎ রায়ের ধারণা এ ব্যাপারে হতাশাব্যঞ্জক। তিনি বললেন, কিছু দর্শকের রুচি বদলেছে ঠিকই, তবে তাঁরা মোট দর্শকসংখ্যার পয়েণ্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেণ্টের বেশি নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবির প্রদর্শন সমস্যা সমাধানে যে অরডিনান্স জারী করতে চলেছেন সে সম্পর্কেও সত্যজিৎ রায়ের মতামত জানতে চাওয়া হল। উনি বললেন, ছবি রিলিজ একটা বড় সমস্যা। আমাদেরও ছবি নিয়ে বসে থাকতে হয়। তবে সব হাউসে বাংলা ছবি দেখানো বাধ্যতামূলক করলে ফল কি ভাল হবে? অত ছবি পাওয়া যাবে কোথায়? অবশ্য ছবি রিলিজের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে কিছু বেশি ছবি তৈরী হবে ঠিকই।

তাঁর নতুন বই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় জানালেন, বিভিন্ন সময়ে ফিলমের উপর তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন এটা তারই সংকলন।

মূল অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

ও'রা দুজনেই স্বকীয় ভঙ্গিতে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। একেবারে শেষে দেখানো হলো সত্যজিৎ রায়ের তোলা দুটি ডকুমেন্টারি ছবি। প্রথমটি শিল্পী বিনোদবিহারীকে নিয়ে তোলা। "ইনার আই"। ছবিটি পুরনো। দর্শকরা আগেই দেখেছেন। দ্বিতীয়টি নতুন। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীকে নিয়ে তোলা। ছবির নামও দিয়েছেন "বালা"। এটির আনুষ্ঠানিক মুক্তি এখনো ঘটেনি। আগস্ট মাস নাগাদ দর্শকরা দেখতে পাবেন।

—রবি বসু

চলচ্চিত্র

সলাখেঁ/ঈগল ফিল্মস

হেডলী চেজ, অ্যালিস্টার ম্যাকলিন, রস ম্যাকডোনাল্ড, স্ট্যানলী গার্ডনার, মিকী স্পিলানী, কার্টার ব্রাউন, নিক কার্টার প্রমুখ পাশ্চাত্যের তাবৎ ক্রাইম গল্পকারকে একত্রে পাক করলেও ঈগল ফিল্মসের (পরি-

সুলক্ষণা পণ্ডিত/সলাখেঁ

চালনা : এ সালাম) স্টোরি ডিপার্টমেন্ট-এর পরিকল্পিত এই কাহিনীটি ঘটনার উদ্ভটত্বে ও কষ্টকল্পনার দিক থেকে পাল্লা দিতে পারবে না।

মুখ্য চরিত্র রাজু আর গুড্ডি। রাজু অনাথ। বাল্যকাল থেকেই জুয়াড়ী এবং গুণ্ডা প্রকৃতির। গুড্ডির বাবা কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য পকেটমার থেকে চুরি ও ছিনতাই কোন কিছুতেই পিছপাও নয়। শেষে বিশ লক্ষ টাকার হীরে চুরির অপরাধে তার পনেরো বছরের জেল হল। গুড্ডি গ্রামে গিয়ে নাচ-গান শিখে বড় হয়ে খ্যাতি অর্জন করলো। তখন তার নাম সীমা (সুলক্ষণা পণ্ডিত)। রাজু বড় হয়েও জুয়াড়ী। তখন তার নাম চন্দন। এক গুণ্ডা দলের চক্রান্তে চন্দনের তিন বছরের জেল হল। কিন্তু অদ্ভুত কৌশলে সে জেল থেকে পালিয়ে এল এবং সেই ফেরারী অবস্থাতেই চন্দন (শশী কাপুর) আশ্রয় পেল সীমার গৃহে। পরস্পরের প্রকৃত পরিচয় ওরা তখনও জানে না। এদিকে সীমা তথা গুড্ডির বাবার মেয়াদ শেষে মুক্তির দিন সমাগত। গুণ্ডা সর্দারের বিশ্বাস গুড্ডির বাবা চুরি-করা হীরে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। কাজেই ওদের প্রয়োজন হল এমন এক ধুরন্ধরের যে গুড্ডির বাবাকে মুক্তির আগেই জেল থেকে অপহরণ করে আনতে পারে। চন্দনের কয়েদখানা দেখা আছে। অতএব সে শত্রু হলেও গুণ্ডা সর্দার তারই শরণাগত হল। চন্দন রাজি হল লাখ টাকার বিনিময়ে। গুড্ডির বাবাকে উদ্ভট কৌশলে জেল থেকে অপহরণ করলো। কিন্তু লুকনো হীরের সন্ধানের পর চন্দনের সঙ্গে সর্দারের বিরোধ ঘটলো। প্রচণ্ড মারপিটের মধ্যে সীমা তথা গুড্ডির বাবার মৃত্যু ঘটে। চন্দন ও সীমাও তাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে।

শাস্ত্রোক্ত নবরসের কোনটাই এই কাহিনীতে বাদ রাখা হয়নি। বরং মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই আছে। তবে শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, রুদ্র ও কৌতুক রসকে এমন উৎকট-রূপে প্রকাশ করা হয়েছে যা দৃশ্য মনে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। ছবিখানির 'U' সার্টিফিকেট পাওয়াটাই আশ্চর্য লাগে।

সুলক্ষণাকে যেভাবে লাস্যময়ী নর্তকীর চরিত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা কামনালালায়িত দর্শকদের হয়তো খুশী করবে, কিন্তু বিদগ্ধ দর্শকরা তাঁর অভিনয় সৌকর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আক্ষেপ বোধ করবেন। উদ্ভট মারপিটের দৃশ্যগুলি ব্যতিরেকে শশী কাপুরকে ভাল লাগবে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—আবাল্য ঠগের চরিত্রে একজন জনপ্রিয় শিল্পীকে দেখলে অপরিণত-মতীদের মনের ওপর কী প্রভাব পড়ে সেটা কি কেউ চিন্তা করে?

দুঃখ হয় এককালের প্রভূত জনপ্রিয় শিল্পী শাম্মী কাপুরকে দেখে। ছবির আরম্ভেই তাকে দেখা যায় জেলচালকের চরিত্রে। আর দেখা যায় কাহিনীর শেষে নায়ক-নায়িকাকে দারুণ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার দৃশ্যে। কিন্তু কি হাস্যকর সে দৃশ্য!

গান (সুর : রবীন্দ্র জৈন) এবং নাচের দৃশ্যগুলি সুপরিকল্পিত এবং উপভোগ্য।

—শৌভিক

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

সবচেয়ে বড় কথাটা হল সবচেয়ে ছোট কথা। অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের মাত্র কয়েকটি ওঠা-পড়ায়; দু-একটি কৃপণ কিন্তু সযত্ন উচ্চারণে; এক মুঠো রঙিন ছবির দ্রুত মনতাজে; এবং মাত্র সময়ের একেবারে টান-টান এক মিনিট পরিব্যাপ্তির মধ্যে আপনাকে বক্তব্যটি ঐ অন্ধকারে বসে থাকা একেবারে অচেনা, অজানা কিছু মানুষের মধ্যে ছুড়ে দিতে হবে—এবং এমনভাবে যাতে তাঁরা চমকে যান, বিশ্বাস করেন, মনে রাখেন। এই হল ওই যে আপনি আসল ছবিটি শুরু হবার আগে যে-সব টুকরো টুকরো রঙিন ছবি দেখে শিখে নেন কোন মাজনটি আপনার দাঁতের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, আর কোন টায়ারটি কলকাতার রাস্তা এবং আপনার গাড়ির পক্ষে, সেই-সব অ্যাড-ফিল্ম-এর (বিজ্ঞাপনের ছবি) পিছনে সবচেয়ে জরুরী কথাটা। আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সমালোচনায় এ-সব ছবির প্রসঙ্গকে কেউ কখনো কানামাছি খেলতে খেলতে ভুল করেও ছুঁয়ে যাননি। এবং এই অবজ্ঞার সবচেয়ে নির্মম দিকটা হল এই যে আমাদের দেশে তৈরি এই সব বিজ্ঞাপন-ছবির অনেকগুলিই এতখানি উন্নত পর্যায়ের শিল্প হয়ে উঠতে পেরেছে যেখানে পৌঁছবার মত ফুসফুসের জোর অধিকাংশ ভারতীয় ফিচার ফিল্ম-এর নেই! যেমন ধরুন, একটি

বরুণ চন্দ : অ্যাড-ফিলম এক ধরনের সিডাকশান। ফটো : দেশ

সাবানের বিজ্ঞাপনে—যেখানে একটি মেয়ে প্রাণের খুশিতে ঝরনার জলে স্নান করছে—সেখানে কি আশ্চর্য সাবলীলতায় আমরা লক্ষ্য করি মিচেল-এর কাজ—রিভার্স-ক্যামেরার কাজ—জুম-এর কি দারুণ দক্ষ ব্যবহার—এবং একেবারে পাকা হাতের এডিটিং!...কিংবা ধরুন সুন্দর চ্যাটার্জির (ধৃতিমান) স্ক্রিপ্ট থেকে তৈরি জিনাত-খচিত সেই চায়ের বিজ্ঞাপনটি, টুকরো-টুকরো স্টিলের সমন্বয়ে গড়ে উঠে যেটা দারুণ ধাক্কা দেয়। কিন্তু এই সব খুদে ফিলম-এর মাপ-রেখা মাত্র এক মিনিট। যদিও এই এক মিনিটের ছবির জন্যে কখনো কখনো দিন দশ-বারো থেকে মাস খানেক শুটিং চলে; খরচা হয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার

সুরেশ মালিক : এক মিনিটের অ্যাড-ফিলম আমার কাছে দীর্ঘ মনে হয়। ফটো : দেশ

টাকা; আর ভাবনার প্রথম কুঁড়িটি থেকে সম্পূর্ণ ছবিটিতে চলে আসতে লাগে চার-পাঁচ মাস; এবং এর পিছনে থাকেন কিছু চকচকে-ঝকঝকে-সৃষ্টিশীল তৎপর মানুষ! এবার একটি এক মিনিটের বিদেশী বিজ্ঞাপন-ছবির উদাহরণ দিয়ে আমি আমার এই বিদ্যুৎ-ভূমিকাটি শেষ করছি : "—একটি ছোট্ট মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, সমুদ্রের তীর দিয়ে ছুটছে-ছুটছে, কখনো লংশটে তার সমুদ্র, কখনো ক্লোজআপে তার মুখের বেদনা, সে প্রায় ছাপান্ন সেকেন্ড ছুটলো, এবং একেবারে অন্তিম শটে সে তার মার সামনে একটি ক্লোজআপে তুলে ধরছে তার ছোট্ট একটি আঙুল, আমরা মুহূর্তের জন্যে দেখছি রক্ত পড়ছে আর একই সঙ্গে সমুদ্রের তীর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি উচ্চারণ : "কিস ইট উইথ জনসন অ্যান্ড

মধুছন্দা কারলেকার : ভারতীয় বিজ্ঞাপন-চিত্রে সেক্স বড্ড বেশি মিসইউজড।

জনসন!" ভাবতে পারেন? কিন্তু এত কথা বলার আগে আপনাকে আমার একটা ছোট্ট কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আপনি কি সেই স্বল্প-সংখ্যকদের একজন যাঁরা বিজ্ঞাপনের রঙিন ছবিগুলি মন দিয়ে দেখেন? এবং বছরে একবার ব্লেজ-এর অ্যাড-ফিলম ফেসটিভ্যাল-এ একটি প্রবেশপত্র পাবার জন্যে হয়রান হয়ে যান?

এদেশের বেশির ভাগ অ্যাড-ফিলমই বম্বেতে তৈরি হয়। কয়েকটি চাবুক মারার মত নাম বম্বেতেই পাবেন। যেমন ধরুন, শুকদেব। কিংবা জাফার আলি। আর আপনাদের অঙ্কুর-খ্যাত শ্যাম বেনেগল কিংবা 'গরম-হাওয়া' খ্যাত শাতু—এঁরা তো সবাই এক সময়ে বিজ্ঞাপনের ছবি করেছেন। কিন্তু এঁদের আর এই মুহূর্তে হাতের কাছে কোথায় পাই বলুন? আর তা-ছাড়া আমাদের

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় : এদেশে মডেলের বড় বেশি অভাব। ফটো : দেশ

কলকাতা বিজ্ঞাপনের ছবির ব্যাপারে কিছু কম যায় না। বিশেষ করে বরুণ চন্দ, সুরেশ মালিক, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, অভিজিৎ মিত্র এবং মধুছন্দা কারলেকার এক মিনিটের রঙিন সেলুলয়েডে বাজিমাৎ করেছেন অনেকবার। এবং এই পাঁচজনের কাছ থেকেই কিছু নতুন ভাবনা ধার করে নিজের পকেটে রাখতে পেরেছিলাম।

বরুণ আপনাদের চেনা লোক, যেহেতু 'সীমাবদ্ধ' ছবির নায়ককে ভুলতে গেলে একটি সর্বগ্রাসী অ্যামনেশিয়ার প্রয়োজন। বরুণ বিজ্ঞাপন-ছবির সঙ্গে গত পাঁচ বছর জড়িত। এবং এক মিনিটের মধ্যে কিছু মনে রাখার মত কথা বলার প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্রের আঙ্গিক নিয়ে সাহসী ভাবনা ভেবেছেন।

অভিজিৎ মিত্র : সব সমস্যারই সমাধান পেয়ে যাই। ফটো : দেশ

শোনা যাক, বরুণ তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কি বলেন : "অ্যাড-ফিলম-এর দুটো দিক আছে। একটা অডিও; আর একটা ভিডিও। অডিওতে আপনি যা শুনছেন সেটা থাকে; আর ভিডিওতে যেটা দেখছেন। যখন স্ক্রিপ্ট কিংবা স্টোরি বোর্ডটা তৈরি হয় তখন ভিডিওটা বোঝাতে ট্রান্সপেরেনসির বা রঙিন ছবির প্রয়োজন হয়। এই স্লাইড স্টোরি-বোর্ডগুলো করার মধ্যে একটা উন্মাদনা পেতাম। এবং এরই ফলে সরাসরি ফিলম তৈরিতে এলাম। কিন্তু আমার প্রথম ছবিটা আমার কাছে খুব নৈরাশ্যজনক মনে হয়েছিল। কেননা তখন আমার এডিটিং সেনস বলে কিছু ছিল না। ফলে আমার ছবিটায় গতির খুব অভাব বলে মনে হয়েছিল আমার। অথচ অ্যাড-ফিলম-এর মেয়াদ যেহেতু এক মিনিট, সেখানে গতিটাই সবচেয়ে বড় কথা। একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই গতিটাকে বাড়ানোর জন্যেই বিজ্ঞাপন-ছবির ব্যাকরণ ফিচার ফিলম-এর ব্যাকরণের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, বিজ্ঞাপন-ছবিতে জাম্পকাট আমাদের বিরক্ত করে না। পরে ছবি করতে করতে প্রবলেম-গুলো বুঝতে এবং সমাধান করতে পেরেছি। একটা উদাহরণ দি। একবার একটা গাড়ির চাকার বিজ্ঞাপনে প্রবলেম হল এক মিনিটের মধ্যে ডিসট্যানস বোঝাব কি করে। ছবিটা এইভাবে করেছিলাম। প্রথমে ছুটন্ত গাড়িটাকে দেখিয়ে কাট করে নেমে এলাম

সন্ধ্যা রায়/অর্জুন/পরিচালনা ঃ ইন্দর সেন

চাকাটায় এবং দেখালাম চাকার কাপটাতে এক-একটা জায়গা—যেমন তাজ, কুতব, মেরিন ড্রাইভ—খুব তাড়াতাড়ি ডিজলভ করে যাচ্ছে!"

সুরেশ মালিকের সমস্যা একেবারে ভিন্ন ধরনের। সবে নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরেছেন তিনি। প্রদীপ্ত কথাবার্তা। এবং বিদেশে ছবি তৈরির অভিজ্ঞতা আস্তিনে গুটিয়ে কলকাতায় নানান প্রাথমিক অসুবিধের সামনে আসতে হচ্ছে। "বিদেশে যাবার আগে ভাবতাম, একটা কিছু মনে রাখার মত বলার জন্যে এক মিনিটটা বড্ড কম সময়। বিদেশ থেকে এসে দেখছি, আমাদের বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনের ছবিই বড় বেশি বাজে বকে। ওগুলো আসলে তিরিশ সেকেন্ডে করা যেত।—আর একটা কথা, এখানে বিজ্ঞাপন ছবিতে অডিওটা একটু বেশি ইল্যাবরেট বলে মনে হয়। কথা কমিয়ে আরো বেশি ভিসুয়াল করা উচিত। করতে পারলে আধ মিনিটেই এক মিনিটের কাজ হয়ে যাবে।" সুরেশ বিদেশে অনেকগুলি বিজ্ঞাপন ছবি করেছেন। তার মধ্যে দুটির কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য। একটি বিজ্ঞাপন ছবির বিষয়বস্তু উন্নত ধরনের হাই-ফাই স্টিরিও সেট। প্রথমে সুরেশ দেখালেন নানা মাসকুরি গান গাইছেন। তাঁর মুখ ফোকাসের বাইরে। এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। আস্তে আস্তে মাসকুরি স্পষ্ট হয়ে উঠলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর সুঠাম হয়ে এল। সুরেশ পিছন থেকে বললেন, "সাউন্ড ইন ফোকাস!" আর একটি লিপস্টিক-এর বিজ্ঞাপনে সুরেশ কতকগুলি দাবার ঘুঁটিকে লিপস্টিক-এর মধ্যে ডিজলভ করিয়ে দিয়ে বাজিমাৎ করেছিলেন।

মধুছন্দা ইতিমধ্যে কয়েকটি অ্যাড ফিলম করেছেন। এর মধ্যে একটাতে বেশ মজা আছে। এটা একটা ব্যাটারির বিজ্ঞাপন। মধুছন্দা ব্যাটারিটাকে স্যাটালাইট হিসেবে কল্পনা করেছেন। ওটা সোজাসুজি স্পেস থেকে এসে ল্যান্ড করছে। আসল মজাটা আছে সাউন্ড এফেকটে। ল্যান্ড করার পরে ব্যাটারির লোগো অংশটি খুলে যাচ্ছে। এবং একটি বেড়াল বেরিয়ে এসে ব্যাটারিটার পরিচয় দিচ্ছে। "ভারতীয় বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে যেটা আমায় বিরক্ত করে তা হল সেকস-এর ব্যবহার। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনে সেকস অভারইউজড এবং অ্যাবইউজড। এবং এর ফল ক্ষতিকর হতে পারে", জানালেন মধুছন্দা।

অভিজিৎ মিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে খুব নীচু গলায় কথা বলেন। অভিজিৎ একটি বড় বিজ্ঞাপন সংস্থার আর্ট-ডিরেকটর। এবং কয়েকটি বিজ্ঞাপন ছবি তাঁরই মাথা থেকে বেরিয়েছে। যদিও অভিজিৎ প্রথম দর্শনে খুব মৃদু-সঞ্চারি মানুষ, ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বললেই বোঝা যায়, উনি নিজের সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত। এবং এই দৃঢ়তা ছাড়া বিজ্ঞাপন-ছবি করা যায় না। "অ্যাড ফিলম-এর কোনো সমস্যাই আমার কাছে সমস্যা নয়। আমার সমস্ত সমস্যারই সমাধান পেয়ে যাই। এই তো সেদিন একটা বিজ্ঞাপন-ছবি করতে গিয়ে প্রবলেম হল একাধিক ভাষায় লিপ-সিনকিং করা হবে কিভাবে। ভেবে ভেবে বার করলাম, যখন যে কথা বলবে তার মুখটা দেখানো হবে না। দেখানো হবে যে শুনছে তার মুখটা, তার রিঅ্যাকশন। সমস্যার এইভাবে সমাধান হল।"

বিজ্ঞাপন জগতের আর একটি দুর্দান্ত উপস্থিতির নাম ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র পরে ধৃতিমানের আর বিশেষ পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞাপন-ছবির এসথেটিক এবং টেকনিকাল দিকগুলি নিয়ে ধৃতিমান অনেক পড়েছেন, এবং অনেক নতুন দিক থেকে ভেবেছেন। এবং এঁর সেই সিদ্ধান্তকে নিয়ে ছবি আমরা তো আজও ভুলতে পারিনি। "আমি যখন একটা

বিজ্ঞাপনের ছবি ভাবি, তখন আমার একটা নিজস্ব অ্যাপ্রোচ আছে। প্রথমত, আমি যে কোনো অ্যাড-ফিল্মকে টোটাল ক্যামপেটোর সঙ্গে ভাবি। দ্বিতীয়ত, এক মিনিটের ছবিটাকে এইভাবে করার চেষ্টা করি যাতে সেটা অন্যান্য ছবির ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এবং তৃতীয়ত, যেহেতু এটা দু ভাবে করা যায়—সিচুয়েশন-এর দিক থেকে, কিংবা নতুন একটা ভিস্যুয়াল ফরম্যাট-এর মধ্যে দিয়ে—আমি ঠিক করে নি একটি বিশেষ ছবিতে কোন দিক থেকে যাব। যে প্রবলেমটা এখানে সবচেয়ে বড়, সেটা হল এখানে মডেল পাওয়া যায় না, বিশেষ করে কলকাতায়", জানালেন ধৃতিমান। —রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাই থেকে

হলিউডের একমাত্র ভারতীয় চিত্র-প্রযোজক, লেখক ও পরিচালক কৃষ্ণ শা একটু অন্য ধরনের মানুষ। দীর্ঘ পনের বছর আমেরিকায় কাটিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন সম্প্রতি।

বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে লেডিস ডে রোটারী ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণ শা তাঁর হলিউড-জীবনের নানা ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। তিনি হলিউডের ফিল্ম জগতে প্রবেশ করেছিলেন টি ভি থেকে। ভারতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে টি ভি সিরিজের একটি গল্প লেখার কাজ তিনি প্রথমে পান। এই সুযোগে তিনি রাইটার্স গিল্ডের সদস্যপদও পেয়ে যান। রাইটার্স গিল্ড ওখানে খুব শক্তিশালী এবং তার সদস্য না হলে ফিল্মের গল্প লেখার জন্য প্রবেশাধিকার পুরোপুরি বন্ধ।

কৃষ্ণ শা বললেন, আমেরিকার তরুণ সমাজ ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে সত্যিই আগ্রহী। বিশেষ করে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁদের কাছে গুরু। তবে বয়োবৃদ্ধদের এসব ব্যাপারে কোন কৌতূহল নেই, তাঁদের কাছে ভারতবর্ষ এখনও সাপুড়ে এবং রাজা-মহারাজার দেশ। এ সম্পর্কে তাঁদের কিছু বোঝাতে যাওয়াও বৃথা।

ভারতবর্ষে এখনই কোন ছবি তৈরী করবার পরিকল্পনা নেই কৃষ্ণ শা-র। তবে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে জানতে বিশেষ উৎসুক। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজনার কেন্দ্র হয়েও বহির্ভারতে ভারতীয় ছবির কোন চাহিদা কেন নেই—এটা তাঁর কাছে একটা বিস্ময়। পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন আছেন সে সব জায়গায় ছাড়া ভারতীয় ছবি চলে না। যে সব ছবি এদেশ থেকে রফতানী করা হয় বিদেশী দর্শকের কাছে তার আবেদন খুবই সামান্য।

শ্রীশা জানালেন, চলচ্চিত্রের মার্কিন থেকে হলিউডের নাম আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। অনেক পুরোনো স্টুডিও এখন অফিসে রূপান্তরিত। এখন বছরে পঞ্চাশ-খানি ছবিও তৈরী হয় কিনা সন্দেহ।

এই অনুষ্ঠানে সুরসিক ডেভিড আব্রাহাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে 'প্রোডিউসার' বলে কিছু নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা 'রিপ্রোডিউসার'। কৃষ্ণ শা বললেন, আমেরিকাতেও তাই। ওখানেও প্রডিউসাররা একটি সাফল্য দেখলে সবাই তার অনুগামী হয়ে পড়েন। একটি ছবি যদি ভাল চলে তবে সেই বিষয় নিয়ে অন্তত পাঁচ-ছখানি ছবি তো হবেই।

প্রসঙ্গত জানাই, গত বছর নিউদিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে কৃষ্ণ শা-র দুখানি ছবি দেখানো হয়েছিল প্রতিযোগিতার বাইরে।

—সুরঞ্জন

শান্তিদেব ঘোষ পরিবেশন করছেন রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান

সংগীত

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান

রবীন্দ্র পরিষদ গত ২৩ জুন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে আচার্য শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান উপভোগ করবার সুযোগ প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ শুধু শোনা বা উপভোগ নয়, উপলব্ধিও বটে। অনেকেরই হয়ত মনে পড়ে যাবে জীবিত-কালে কবিগুরু সুযোগ পেলে বর্ষায় এক-বার কলকাতায় আসতেন, শুনিয়ে যেতেন তাঁর সুপরিচিত এবং নবরচিত গান। শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে গানগুলি শুনে সেই সুখস্মৃতিই জেগে উঠেছিল সেদিন। এই দিনের গানে যা উপলব্ধি করা গেল তা হচ্ছে বর্ষায় রবীন্দ্রচিত্তে যে বিচিত্র রসের অনুভূতি ঘটেছিল তার সার্থকতম প্রতি-ফলন। কোথাও রুদ্র, কোথাও করুণ, কোথাও শান্ত রসের যে মূর্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে ঘটেছে তাকে এক অপূর্ব সংবেদনশীলতার সঙ্গে আমাদের মানস গোচর করলেন আচার্য শান্তিদেব তাঁর বলিষ্ঠ, উদাত্ত এবং স্নিগ্ধ কণ্ঠে। এই রূপায়ণ বোধ করি একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি বাল্যাবধি কবিগুরু এবং দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুধু গান কণ্ঠধার্যই করেন নি, মন প্রাণ দিয়ে পর্য-বেক্ষণ করেছেন কোন মধুকোষের পথে গানগুলি তাকে আবিষ্ট করে, জাগ্রত করে, রসায়িত করে এবং উদ্বেলিত করে। রবীন্দ্রনাথের গানে, বিশেষ করে তাঁর বর্ষা এবং বসন্তের সংগীতে বিবিধ নাট্যগুণ বর্তমান এবং সেগুলি এমন কিছু ইঙ্গিত বহন করে যা কেবলমাত্র বিশিষ্ট গায়ন-ভঙ্গীতেই অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর অননুকরণীয় গায়কীতে এই অভিব্যক্তিগুলিই আমাদের কাছে প্রতিভাত করলেন এই দিনের সান্ধ্য আসরে।

এই বয়সে একাদিক্রমে আটাশটি গান বসে বসে সম্পূর্ণভাবে প্রচার করা সহজ নয়। কিন্তু পূজনীয় গুরুদেবের প্রেরণায় তিনি অবলীলাক্রমে গেয়ে গেলেন গান-গুলি একটির পর একটি। "প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন", "বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি", "আষাঢ় কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া", "আজ বারি ঝরে ঝর ঝর", "বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা", "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে", "এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে", "থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ"—প্রভৃতি গানের বৈচিত্র্য, ছন্দ, দৃপ্তভঙ্গি এবং স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তিনি সমানভাবে শ্রোতাদের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিয়ে-ছিলেন। আবার—"ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে", "চিত্ত আমার হারালো" প্রভৃতি গানে যে প্রশান্ত অনুভূতিগুলি আছে সেগুলিও তাঁর কণ্ঠে আবেদনবিস্তার করেছিল অসাধারণভাবে। বর্ষার পরি-প্রেক্ষিতে গীতিনাট্য থেকে নির্বাচিত "ওই

মেঘ করে বুঝি গগনে" গানটিতে নাট্যগুণ ও সঙ্গীতের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর চিরাচরিত "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" গানটি গেয়েও তিনি শ্রোতৃচিত্তের চাহিদার পূরণ করেছিলেন। গানগুলি তিনি এমনভাবে নির্বাচিত করেছিলেন যাতে বর্ষার গানে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সমস্ত রসসৃষ্টিই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। আমরা সেই পূর্ণতার আস্বাদন পেয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছি।

যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেছিলেন নির্মলকুমার নন্দী, প্রভাতকুমার পাল, বিজয়কুমার সিংহ, সুজিতকুমার সাহা, মণি বিশ্বাস, পি রায় এবং শীতল গঙ্গোপাধ্যায়। এর মধ্যে কয়েকটি গানে দোতারার কতকগুলি নিপুণ ও মনোরম স্পর্শ রসসঞ্চারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

—শার্ঙ্গদেব

ব্রিজের ওপর কবিপ্রণাম

কুঁদঘাট ব্রিজের কিছুটা অংশ ও ব্রিজের নীচের বাঁ-হাতি রাস্তা জুড়ে অনাড়ম্বর মঞ্চ, আলপনা-দেওয়া মাটির কলসীতে ফুলের তোড়া, রবীন্দ্রনাথের জলরঙ ছবি, আর ব্রিজ ও রাস্তা ভরে উৎসুকচিত্ত অসংখ্য শ্রোতা—উত্তরণ গোষ্ঠী আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিকী কবিপ্রণাম অনুষ্ঠিত হল সম্পূর্ণ অভিনব পরিবেশে। গত ৬ জুন আমন্ত্রিত চারজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, একজন আবৃত্তিকার, সভাপতির ভাষণ ও স্থানীয় শিল্পীদের দু-চারজন—এই ছিল সামগ্রিক অনুষ্ঠানের সূচী। খুবই ছিমছাম পরিকল্পনা।

কিন্তু দুর্দৈব এড়ানো যায়নি। অনিবার্য কারণে সাতটার অনুষ্ঠান শুরু হল আটটা নাগাদ। উদ্বোধনী সম্মেলক সঙ্গীত ও সুবিবেচক সভাপতির সংহত ভাষণের পর গান শোনালেন স্থানীয় দু-জন শিল্পী। এঁদের মধ্যে মৃদুলা মজুমদারের গলা মিষ্টি,

অঞ্জনা ভৌমিক/ভাগ্যলিপি/পরিচালনা : নিরঞ্জন দে

কিন্তু যথার্থ 'ট্রেনিং' যে নেই ধরা পড়ল 'হৃদয়নন্দন বনে' গানটিতে। ঠিকমতো শিখলে এঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সুমিত্রা সেন উঠলেন আসরে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গান। মাইক যে খারাপ বোঝা গেল। সুমিত্রা সেনের গলার তীক্ষ্ণতা কমে গিয়েছিল, সাবলীলতাও যেন কমের দিকে। মাইক যে কত খারাপ টের পাওয়া গেল সুবিনয় রায়ের প্রথম গানেই। 'এ কী সুন্দর শোভা' পরিত্যক্ত হল মধ্যপথে, চতুর্থ গানে (কে উঠে ডাকি) পড়ল সাময়িক ছেদ। তবু বিশুদ্ধ লয়ে তালে সুরে মেজাজে সাতখানি গানে সুবিনয়বাবুর নিরুপম গায়কী সমস্ত যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাপিয়ে মনে থেকে যায়।

পরের শিল্পী ছিলেন ঋতু গুহ। কী কারণে জানা গেল না, তিনি আসেননি। উদ্যোক্তারা সুমিত্রা সেনকে দ্বিতীয়বার গাইতে অনুরোধ জানাচ্ছেন, এমন সময় আসরে এলেন জনপ্রিয় তরুণ আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ। মাইক তখনো খারাপ। কিন্তু মার্জিত কণ্ঠস্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিমিত আবেগে, নিয়ন্ত্রিত নাটকীয়তায় ও স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় প্রদীপ ঘোষ আধঘণ্টা সময় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন শ্রোতাদের। বিশেষ করে তাঁর দেবতার গ্রাস অনবদ্য।

প্রদীপ ঘোষের পর দ্বিতীয়বার সুমিত্রা সেন। উন্নততর মাইকে তাঁর গলা তখন অনেকটা ভালো শোনাচ্ছে। পঞ্চম গানে 'শেষ গানের রেশ' নিয়ে ফিরে আসতে হল এই সমালোচককে। রাত তখন এগারোটা। আসরের শেষ শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান তখনও বাকী।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

বিবিধ

পরলোকে সংগীত শিল্পী

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ জহরলাল মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলকাতায় মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন। তাঁর প্রতিভা আক্ষরিক অর্থেই বহুমুখী ছিল—নিজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইতেন, গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেছেন। উত্তরপাড়ায় মামার বাড়ীতে জহরলালের জন্ম। সেজমামা মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গানের প্রথম তালিম। ধ্রুপদ শেখেন। পরে গিরিজাশংকর চক্রবর্তী এবং দিলীপচন্দ্র বেদীর কাছেও দীর্ঘকাল গান শিখেছিলেন। 'প্রতিরোধ' চলচ্চিত্রের তিনি সুরকার ছিলেন। তাঁর রচনা ও সুরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া 'শিল্পী মনের বেদনা মিতালি' গানখানি আজও শ্রোতাদের মনে আছে। জহরলাল কিছুকাল হিন্দুস্থান এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনার ছিলেন।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদলাদিত্য রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১১·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

মশলা
নতুন সাজে
সানরাইজ
সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬, পাথুরীয়াঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
SUNRIS

বাচ্চাদের রক্তে চাই
লোহার
প্রাণশক্তি
SYRUP
MINADEX
MINADEX
মিনাডেক্সে যে লোহা আছে তা
ওদের দেয় সুস্থ রক্ত, নতুন প্রাণশক্তি !
বাচ্চাদের শরীরে চাই স্বাস্থ্য আর বৃদ্ধি, আর তার জন্যে প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন যা একমাত্র লোহার ভরপুর রক্তই যোগাতে পারে।
গবেষণায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ ভারতীয় বাচ্চারা যে খাবার খায় তা দিয়ে, ক্রমাগত রক্তক্ষয়ের ফলে শ- যে লোহার ঘাটতি হয় তা সঠিক পরিমাণে পূরণ হয়।
সেইজন্যেই আপনার বাচ্চার প্রয়োজন সহজে শরীরে মিশে যায় এমন লোহা, অর্থাৎ লোহার শক্তিতে ভরপুর মিনাডেক্স।
এছাড়া মিনাডেক্সে আছে বাচ্চার "বৃদ্ধিতে সহায়ক একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন, ভিটামিন এ ও ডি, কপার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পোটাসিয়াম এবং সোডিয়াম। এতে অ্যালকহল জাতীয় কোনো কৃত্রিম উত্তেজক পদার্থ তো নেইই বরং কমলালেবুর মুখরোচক স্বাদগন্ধে ভরপুর—যা বাচ্চারা খুবই ভালোবাসে।
মিনাডেক্সে অন্য যেকোনো জনপ্রিয় লৌহ-টনিকের চেয়ে বেশী লোহা আছে।
এক চায়ের চামচে (৫ মিলি) লোহার পরিমাণ
ব্র্যাণ্ড X ব্র্যাণ্ড Y ব্র্যাণ্ড Z মিনাডেক্স
৫.৫ মিগ্রা ৪৫.৬ মিগ্রা ৩৮.৬ মিগ্রা ১৭০ মিগ্রা
মিনাডেক্সে যে লোহা আছে তা সহজে হজম হয়।
অক্সিজেনের বাহক হিমোগ্লোবিনের কাজ দ্রুত করে তোলার জন্যে মিনাডেক্সে কপার আছে।
লোহার শক্তিতে ভরপুর
মিনাডেক্স
-গ্ল্যাক্সোর তৈরী

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর সুতী
কাপড় এত মজবুত ও টেকসই
যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই সুতী কাপড়
BCCM-3: 75 BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : যোগেন চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিচিতি : 'নরকের প্রতিনিধি' (তৈলচিত্র ৩০" × ২০")-এ যুগের শ্রেষ্ঠীদের প্রতিকৃতি। দেহের মধ্যে মেদ ও শিথিলতার চিহ্নই প্রধান। মুখের মধ্যে লোভ ও লালসার নগ্ন ভাব। ছবির পশ্চাদপটে দ্রুত তুলি চালিয়ে একটু লাল, ধূসর এবং বেগুনী রঙে বিমূর্ত মায়াজাল রয়েছে। শিল্পী এখানে ক্রুদ্ধ। নিন্দায় মুখর হয়েও শিল্পী কখনোই স্বধর্মচ্যুত হননি। নিছক বার্ধক্যের বিপর্যস্ত দেহের রূপ হিসাবে এই ছবির তুলনা নেই।

পূর্ণেন্দু পত্রীর
নতুন কবিতার বই

তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

দাম ৪·০০

এক অনশ্বর শব্দবোধ থেকে উঠে আসে যে কবিতা, তার শ্লোকধর্মী ব্যঞ্জনা ও স্বতোৎসারিত ঝঙ্কার, ভুবনপ্লাবী তার মাধুর্য এ-সবের এক নয়নমোহন সংমিশ্রণ ঘটেছে পূর্ণেন্দু পত্রীর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থটিতে বিধৃত আছে কবির সীমানাহীন অন্তর্ভূগোলের পরিচয় এবং

প্রকাশিত হল

আশ্চর্য ভাস্বরতায় উজ্জ্বল প্রতীক ও চিত্রকল্পের সেই অনিবার্য ব্যবহার, যেন প্রতিমার শরীরে গর্জনতেল। আছে সেই ধরনের কিছু দুর্লভ কবিতার সমাবেশ যা পাঠককে এক বিরল আস্বাদ অর্জনের সুযোগ এনে দেবে। আমাদের প্রতিদিনের দেখা জগতের বিপরীতে রয়েছে যে পরাজগৎ, কবি যেন তার অনুপুঙ্খ উদ্‌ঘাটনে বেরিয়েছেন। সেখানে তাঁর চোখে পড়েছে কত লাজুক মুখের শালুক, আর 'বাতাসের ব্যস্ত ছুটোছুটি'। পেয়েছেন 'সন্ধ্যায় কুসুমগন্ধ', শুনেছেন 'সন্ধ্যার শঙ্খনাদ'। একসময়ে নিজের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছেন, তিনি ক্রমশই একলা, আরো একলা হয়ে যাচ্ছেন।
মধুমক্ষিকার মতো নিরলস পরিশ্রমে পূর্ণেন্দু পত্রী জড়ো করেছেন এক-একটি শব্দের ফোঁটা, তাই দিয়ে গড়ে তুলেছেন নিটোল এক-একটি কবিতা। আর অন্তর্লীন ব্যঞ্জনার প্রসাদগুণে প্রতিটি কবিতাই যেন ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে।

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস
লজ্জা ৭.০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস
যার যা ভূমিকা ১০.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
ধরণী যখন তরুণী ছিল ৪.০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
লোহার গরাদের ছায়া ৬.০০

মতি নন্দীর

নতুন উপন্যাস

বারান্দা

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আশাপূর্ণা দেবীর যুগল-উপন্যাস | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

চাঁদের জানালা ৭.০০

প্র কা শি ত হ ল
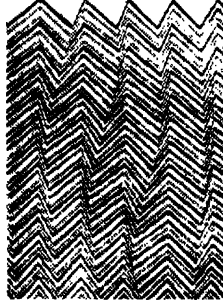
বিষণ্ণ করুণ সকালবেলার রাগ আশাবরী। মৃত্যুদণ্ড টগরের দুঃখ : কেন উস্তাদের কাছে আরও জোর তালিম পাইনি আশাবরীর? গান দিয়ে ভূত নামাতে গিয়ে পোড়ো বাংলোয় অপঘাতে মরলেন যুগন্ধর গাইয়ে বুরহান-উদ্দিন। গহর বাঈজীর জন্য বুকের মধ্যে তাঁর রক্ত ঝরছিল টপটপ। নবাবসাহেবের মঞ্জিলে বাচ্চা নোকরানীর ইজ্জত বাঁচাতে তলোয়ার চালাল কানী জুবেদা। জানে না তার পেটের ছেলেই ধর্ষণকারী। প্রবাসী শঙ্খকে লিখছে সুমন : খুব গান শিখছি। কিন্তু ভয় হয়, শরীরে টান দিয়ে আবার কে ঘরছাড়া করবে। সরোদিয়া কুমারনাথের কাছে মুক্তি চাইছে প্রিয়া রঙ্গনাথন : সাঁইবাবার কাছে পাপ লুকোতে পারিনি। এবার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দাও। বড়ে গোলাম আলি বললেন, দ্যাখো, আমার মাথায় সরস্বতীর পায়ের ছাপ। গ্রীনরুমে বসে তবলিয়া চন্দ্রজিৎ ভাবছে আমেরিকার কথা, গুলিভরা পিস্তল হাতে আত্মহত্যার চিন্তায় রাতের পর রাত পার করা। রমেন চাইছে এমন এক কনফারেন্স করতে, যাতে সব ক'টা প্রতিদ্বন্দ্বী কাত হয়ে যায়। উচ্চাঙ্গসংগীতজগৎ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'আশাবরী'। কাবুল, বোমবাই, লাখনাউ, মোরাদাবাদ, কাশী, কলকাতা ছড়ানো দৃশ্যপট। চেনা অচেনা অজস্র চরিত্রের ভিড়। সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা, শিল্পী, সমালোচক, শ্রোতা—সবাইকে নিয়ে এক অভিনব অভিজ্ঞতার জমাট কাহিনী 'আশাবরী' ॥ দাম ৬·০০ ॥

অরুণ বাগচীর
উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জগৎ নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস

আশাবরী

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
৭৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

৪৩ বর্ষ ॥ ৩৯ সংখ্যা
শনিবার ৮ শ্রাবণ ১৩৮৩

কিপলিং মনোবৃত্তির ঐতিহ্য

ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের: তার মধ্যে বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরাট ও মহান এক দায়িত্ব আছে বলে অদ্ভুত এক উচ্চভাষিত তত্ত্ব প্রচার করে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, শ্বেতাঙ্গ জাতির উন্নত প্রকারের মনুষ্যত্বের কথা যিনি গল্পে, কবিতায় ও নিবন্ধে মুখরিত করেছিলেন, সেই কিপলিং আজও তাঁর স্বদেশী জনসমাজের সাংস্কৃতিক বস্তুবোধ আসরে বেশ ভাল রকমের অভ্যর্থনা পেয়ে থাকেন। 'টেক আপ দি হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডেন'— শ্বেতাঙ্গ মানুষটিকে তার ঘাড়ের ওপর একটি পবিত্র বোঝা বহন করতে আবেদন করেছিলেন কিপলিং। [illegible] 'কৃষ্ণাঙ্গ' দেশগুলির পিছিয়ে পড়া জাতিকে মনুষ্যত্বে উন্নত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিরা আজ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করেছে, বাস্তব ইতিহাসের এই উজ্জ্বল সত্যের সম্মুখে তবু একটি কৃষ্ণচ্ছায়া দ্বিতীয় প্রকারের এক সাম্রাজ্যবাদী বৃত্তির অনাচার হয়ে কাজ করছে। এটা হলো অনুভবাত্মক এবং বিদ্বিষ্ট ও স্বার্থপ্ররোচিত প্রচার। পশ্চিমের বেতার, চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-প্রকাশন, এবং আরও নানা প্রচারিক মাধ্যম, বর্তমানে বস্তুত সেই কিপলিং ঐতিহ্যের সংস্কার আরও পরিপুষ্ট করে এশীয় ও আফ্রিকীয় জাতিসমূহের, বিশেষ করে রাজনীতিক স্বভাবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্পর্কে অপবাদের এক সুসংগঠিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এটা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ জাতিসমূহের সঙ্গত স্বার্থ, ঐক্য, মৈত্রী, সম্মান, শান্তি ও উন্নতির বিরুদ্ধে প্রবল এক দৌরাত্ম্যের অভিযান। এর সঙ্গত ও সমুচিত প্রতিকার সম্ভব করতে হলে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ জাতি-সমূহের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রচারিক সংগঠন অবশ্যই চাই। এই উদ্দেশ্যে দিল্লীতে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ জাতিসমূহের প্রতি-নিধিত্বে যে সম্মেলন হয়েছে, তার বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সংকেত একটুও অস্পষ্ট নয়।

এ বিষয়ে ভারতের বক্তব্য ব্যাখ্যাত করে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রবক্তা যে-কথা বলেছেন, তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায়: পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তি-গুলি এখনও সংবাদ ও প্রচারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে। এর প্রতিকার সম্ভব করবার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে পার-স্পরিক সহযোগিতায় একটি কার্যকর সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। 'প্রেস এজেন্সী পুল', এর সম্যক অর্থ: জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি 'নিজস্ব' সংবাদ ও প্রচারের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে জানাশোনার সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। সন্দেহ হয়, এই অভিমত ও সিদ্ধান্তের, তথা উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ ও নিন্দা বর্ষণ করে পশ্চিমী প্রচার-মাধ্যমের কণ্ঠ এই নতুন অপবাদ রটনা করবে যে, ভারতের নেতৃত্বে পশ্চিমের বিরুদ্ধে একধরনের জাতিবিদ্বেষপ্রধান ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা করা হলো। কিন্তু উপলব্ধি করতে অসুবিধে নেই যে, পশ্চিমী প্রচারিক মাধ্যমের একচেটিয়া আধিপত্য যদি নিরাকৃত করবার কোন সুসংগঠিত ব্যবস্থা না করা হয়, তবে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিরপেক্ষ দেশগুলির জাতীয় স্বার্থের উপর বিরাট এক হানি সম্ভব করে ফেলবে পশ্চিমের ওই ঔপনিবেশিক স্বার্থপরতার মুখর প্রচার।

মিস ক্যাথেরাইন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' সারা বিশ্বের কয়েকমাসের মধ্যে কয়েক লক্ষ বিক্রীত হয়েছিল বলে শোনা যায়। ভারতের বিরুদ্ধে অজস্র কুৎসার সঙ্কলন এই 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইটিকে ড্রেন ইনস্পেক্টারের রিপোর্ট বলে মহাত্মা-গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন। 'ড্রেন' অসত্য বস্তু নয় এবং তার রিপোর্টও অসত্য বস্তু নয়। কিন্তু সেটা কোন জনপদের পৌর পরিচয় নয়। পাশ্চাত্ত্য প্রচারিক মাধ্যমের স্বভাবে দেখা যায় যে তারা সূক্ষ্ম চতুরতার রীতিতে অনেক সময় ভারতের সম্পর্কে এমন তথ্য ও সংবাদ উচ্চকণ্ঠে মুখরিত করে যেগুলি ঘটনা হিসাবে অসত্য নয়; কিন্তু সবই ড্রেনের সংবাদ। এর ফলে যেমন পশ্চিমে তেমনই প্রাচ্যের দেশগুলির জনসাধারণের উপর ভয়ানক এক বিভ্রম সত্য হয়ে ওঠে। ভারত স্বাধীন হবার পর কাশ্মীর সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও মার্কিন টুরিস্টের লিখিত অন্ততঃ এক হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে বলে শোনা যায়। বিস্ময়ের প্রশ্ন, এক হাজার জন ইউরোপীয় ও মার্কিন টুরিস্ট সব বিষয় ছেড়ে শুধু এক কাশ্মীর সম্বন্ধে কেন এত মাথা ঘামালেন? নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, এটা ভারতের বিরুদ্ধে পশ্চিমী মনোভাবের একটি চেষ্টাকৃত ও সাহায্য-প্রদত্ত প্রচারণার চেষ্টা। এই এক হাজার পুস্তকের মধ্যে একটিও গ্রন্থে কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থার এবং সত্য কথার উল্লেখ নেই। সবই পাকিস্তানী দাবীর প্রতি বিগলিত মমতা করুণা ও সমর্থনের প্রগল্ভ কলরব। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক অভিমতের বিশেষজ্ঞ বললেন, এর দ্বারা পাকিস্তান কাশ্মীর ও ভারত, তিন পক্ষের সবারই অপকার করা হয়েছে।

ভারতের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তারও একটি বড় অপঘাতক এই পশ্চিমী প্রচার মাধ্যম। মনস্বী সাংবাদিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, সাণ্ডার-ল্যাণ্ডের লিখিত 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' গ্রন্থের প্রশংসা করে এক পংক্তি লেখাও তিনি কোন প্রধান মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবাদপত্রের মন্তব্যে দেখতে পাননি। এই বইটির প্রধান বক্তব্য, ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতার পক্ষসমর্থন। পশ্চিমী প্রচার-মাধ্যমের কণ্ঠ ও অন্তঃকরণ যে ভারত-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তারই ভাষা শুনতে পায়, বিশ্বাস করে এবং খুশি হয় পশ্চিমের সাধারণ জনতা। বিভ্রান্ত হয় এশিয়া ও আফ্রিকার জনতা। প্রশ্ন করা চলে এটা, কি পশ্চিমী প্রচার-মাধ্যমে পক্ষে নিজ দেশেরই জনজীবনে একটা অন্ধতাপূর্ণ অজ্ঞতা সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়াস নয়? কিন্তু প্রশ্ন করলেই বা কী আসে যায়? প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রলোভের সংস্কার ও অহংকার নিজ দেশের জনমতকেও বিভ্রান্ত করতে কুণ্ঠিত নয়। পশ্চিমের প্রচার-মাধ্যমের অভ্যস্ত মিথ্যাভাষণ ভারতের বন্ধু-রাষ্ট্রের জন-জীবনেও যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি সম্ভব করে থাকে। ভারতের পক্ষে এটাই বড় ভয়ের এবং প্রধান ভয়ের বিষয়। তাই ভারতের মতো দেশের সকলেরই পক্ষে সঙ্গত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রচার-মাধ্যম গড়ে তোলা বস্তুত একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনের কর্তব্য।

এই সপ্তাহ

এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার প্রায় ৬০টি দেশের তথ্যমন্ত্রী ও সংবাদ মাধ্যমের প্রধানদের ছয়দিনব্যাপী এক সম্মেলন নয়াদিল্লিতে শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা গঠন। ইতিপূর্বে লিমা ও তিউনিস-এ এই প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়ে গেছে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই নয়াদিল্লির বর্তমান সম্মেলন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে স্বনির্ভরতা কারিগরি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা এখনও বিদেশী শক্তি ও ভাষার মুখাপেক্ষী, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে তারা এখনও পূর্বতন শাসক দেশের উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি থেকে উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য সকলকেই প্রয়াসী হতে হবে। সম্মিলিত সংবাদ সরবরাহ সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা সেদিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

পাশ্চাত্য সংবাদ ও প্রকাশনা সংস্থা-সমূহের প্রদত্ত ভাষ্য বিনা বিচারে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কে প্রতিনিধিদের সচেতন করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন : কোনও বিষয়ে আমাদের পরস্পরের অভিমত জানার জন্য নিজেদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ চাই। আফ্রিকার ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা আফ্রিকাবাসীর কাছ থেকেই তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য শুনব। তেমনি ভারতীয় ঘটনার ভাষ্য শুনতে হবে ভারতীয়দের কাছ থেকে।

এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল। তিনি বলেন, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের বাস এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়, অথচ এই এলাকায় মাত্র ২৮ শতাংশ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতে ১২০০০ সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও প্রতি এক হাজার জনের জন্য গড়পড়তা ছাপা হয় মাত্র ১১ কপি সংবাদপত্র। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো-র) মান অনুসারে প্রতি ১০০ জনের জন্য ১০ কপি দৈনিক সংবাদপত্র পাঁচটি রেডিও সেট, দুটি টেলিভিসন সেট ও সিনেমা হলে দুটি আসনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এই মান পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীর নাগালের বাইরে।

নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদ সংস্থা সমাহার সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য সম্মেলন থেকে দুটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। একটি কমিটির বিচার্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংবাদ প্রেরণের মাশুলের হার; অপর কমিটিকে বলা হয়েছে সমাহারের প্রস্তাবটি খুঁটিয়ে বিচার করতে। এই নয়া ব্যবস্থার কোন সদর দফতর থাকবে কিনা, প্রস্তাবিত সম্মিলিত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান উন্নত দেশগুলির খবরও সরবরাহ করবে কিনা এই সব বিষয়েই কমিটি অভিমত দেবে। প্রতিনিধিদের অনেকে সুপারিশ করেছেন সদর দফতর নয়াদিল্লিতে খোলা হোক, আবার আর এক দলের মত সদর দফতরের কোন দরকার নেই।

প্রধানমন্ত্রীর চারদিন আফগানিস্তান সফরের শেষে নয়াদিল্লি ও কাবুল থেকে এক যুক্ত ইসতাহার প্রচারিত হয়েছে। এই যুক্ত ইসতাহারে প্রেসিডেন্ট দায়ুদ ও ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্য ও উপযোগিতা বজায় রাখার জন্য এই আন্দোলনের ইতিপূর্বে ঘোষিত মান ও নীতিগুলি অবশ্য পালনীয়। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেই বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এই আন্দোলনের গুরুত্ব কত তা বোঝা যায়। আগামী মাসে কলম্বোয় জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ও আফগানিস্তানের সহযোগিতার সিদ্ধান্তও যুক্ত ইসতাহারে ঘোষণা করা হয়েছে।

কাবুলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারত ও আফগানি-স্তানের মধ্যে সহযোগিতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, সমঝোতার প্রক্রিয়াকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রকৃত সমঝোতায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলি উপকৃত হবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট দায়ুদকে ভারত সফরের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রেসি-ডেন্ট দায়ুদ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

সংসদের আগামী অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বিল আসছে। এই বিলে স্বর্ণ সিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবগুলিও সন্নিবিষ্ট হবে। নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তাবিত নতুন ধারাগুলিও এই বিলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নয়াদিল্লির খবরে প্রকাশ, আইন-মন্ত্রী গোখলে এই সুযোগে স্বর্ণ সিং কমিটি হাত দেননি এমন কয়েকটি ধারারও পরিবর্তন করে ফেলতে চান। যেমন হাই-কোর্টের উপর সুপ্রিম কোর্টের একতিয়ারগত নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সব সন্দেহ দূর করা তাঁর ইচ্ছা।

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শাসকদল, দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘম-এর মধ্যে অন্তর্বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই বিরোধের সূত্রপাত দলের কার্যকরী সমিতির এক সাম্প্রতিক বৈঠকে। এই বৈঠকে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন স্পীকার মাথিয়ালগন ডি এম কে-র সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি ও দলের অন্য নেতাদের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, করুণানিধি ও অন্য যেসব নেতা-দের বিরুদ্ধে সারকারিয়া কমিশনের কাছে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে সেই সব নেতাদের দলের উচ্চপদ ত্যাগ করা উচিত। তাঁকে সমর্থন জানান আর একজন সদস্য রাজেন্দ্রন। এই সভা থেকে রাজেন্দ্রন বেরিয়ে এলে তিনি প্রহৃত হন। এই ঘটনা সম্পর্কে 'বিকৃত বিবৃতি' দেওয়ায় দলবিরোধী কার্য-কলাপের অভিযোগে ডি এম কে-র চারজন বিশিষ্ট নেতা, মাথিয়ালগন, রামচন্দ্রন, রাজেন্দ্রন ও নারায়ণস্বামীকে দলের প্রাথমিক সভাপদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই চারজন বিক্ষুব্ধ নেতা দলের সভাপতিত্ব থেকে করুণানিধির পদত্যাগের দাবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অবিলম্বে দলের সাধারণ পরিষদের বৈঠক ডাকার পাল্টা দাবি তুলেছেন। রাজেন্দ্রনকে প্রহারের অভিযোগে পুলিশ ডি এম কে দলের ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

চীনের সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সিনহুয়া-র এক খবরে বলা হয়েছে, চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত কে আর নারায়ণ পিকিং-এ চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়াও কুয়ান-হুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। নারায়ণ ৭ই জুলাই পিকিং পৌঁচেছেন, কার্যভার গ্রহণ ও পরিচয়পত্র প্রদান সম্পর্কিত ব্যবস্থা নিয়ে তিনি চিয়াও-এর সঙ্গে আলাপ করেন।

কলকাতা ময়দানে বজ্রাঘাতে পাঁচজন তরুণ ক্রীড়ামোদীর মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন প্রায় ৬০ জন। আহতদের মধ্যে ২৭ জনকে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কলকাতায় বজ্র দুর্ঘটনার এমন নজির আর নেই।

১২।৭।৭৬

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

বেপরোয়া

যাত্রী বোঝাই উড়োজাহাজ ছিনতাই এখন লোকের গা-সহা হয়ে গেছে। ও ধরনের ঘটনা এখন আর চমক লাগায় না, ছিনতাই বিমানের যাত্রী আর কর্মীদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। লোকে ধরে নেয় কোনও ডাকাত দলের কীর্তি এ সব নয়—কাণ্ডটা ঘটানো হয় টাকা পয়সা লোটবার জন্যে নয়, রাজনৈতিক মতলব হাসিল করতে। পথ দেখিয়েছিল বামপন্থী মার্কিনীরা ছিনতাই বিমানে চেপে কিউবায় পাড়ি দিয়ে। এখন এই আক্রমণী পালার মূল গায়েন হচ্ছে ফেলিস্তিন গেরিলারা। গোড়ায় গোড়ায় তারা দুনিয়ার চোখের সামনে ভিটেছাড়া ফেলিস্তিনদের দুর্গতির ছবি তুলে ধরে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়ে তোলবার দাবি জোরদার করতে চেয়েছে। তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের এ কায়দাকে কিন্তু ফেলিস্তিনদের বন্ধুরাও ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারেনি যারা তাদের ওপর চটা তারা তো নয়ই। এখন আর ও ধরনের নাটুকেপনার দরকার নেই—তামাম দুনিয়ার নজর পড়েছে ফেলিস্তিন সমস্যার ওপর। প্যালেস্টাইন মুক্তিফ্রণ্টও সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে দিয়েছে।

তবুও কিন্তু ফেলিস্তিনদের দোহাই দিয়ে বিমান ছিনতাই বন্ধ হয়নি। এখন অবিশ্যি দুনিয়ার সব বিমান বন্দরেই খুব কড়াকড়ি কেউ যাতে লুকিয়ে কোনো অস্ত্র কিংবা বোমা না নিয়ে যেতে পারে তার জন্যে জোর তল্লাসি চালানো হয় যাত্রীরা বিমানে চড়ার আগে, তাদের মালপত্তর তন্ন তন্ন করে দেখা হয়তো বটেই তাঁরা নিজেরাও রেহাই পান না। এত করেও সামলানো যাচ্ছে না, পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে কী যোগ-সাজসে বেপরোয়া সন্ত্রাসবাদীরা বিমান ছিনতাই করছে আর দেশে দেশে কর্তাদের বেকায়দায় ফেলে জেলে আটক সঙ্গীসাথী-দের খালাস করিয়ে নিচ্ছে। আরবদের সঙ্গে ইহুদিদের লড়াইয়ের এটাও একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো আরব দেশ অবিশ্যি ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে বিমান ছিনতাই করে ইহুদিদের ওপর ঝাল ঝাড়বার চেষ্টা করে নি। কিন্তু কেউ করলে তারা খুশী ছাড়া অখুশী হয় না। তাদের সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে একদল অতিবাম উগ্রপন্থী। তারা এক কালে ছিল প্যালেস্টাইন মুক্তি ফ্রণ্টের সামিল। ফ্রণ্ট সন্ত্রাসবাদকে এখন আর আমল দেয় না। তাই তারা ফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে চলছে। সন্ত্রাস-বাদ তাদের হাতিয়ার।

প্যালেস্টাইন মুক্তি ফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে আসা এমনি এক ক্ষুদে গেরিলা দল আচম্বিতে এয়ার ফ্রান্সের বিরাট একটা হাওয়াই জাহাজ দখল করে ২৭ জুন। এথেন্স ছেড়ে বিমানটা রওনা হয়েছিল প্যারিস। সাত রাজ্যি ঘুরে সেটা আস্তানা গাড়লে উগান্ডার এনটেবি বিমান বন্দরে— রাষ্ট্রপতি ইদি আমিন ছিনতাইকারী গেরিলাদের অভয় দিয়েছিলেন, তিনি এমন কথা বলেননি যে তাদের তিনি তাঁর দেশে ঘর বাঁধতে দেবেন। তবে এটুকু কবুল তিনি করেছিলেন যদ্দিন না ফয়শালা হচ্ছে তদ্দিন তিনি ছিনতাইকারী গেরিলা আর আটক যাত্রী-কর্মীদের তদ্বির তদারক করবেন, খাবার দাবার যোগাবেন, মিটমাটের আলোচনা চালাবার বন্দোবস্তও করে দেবেন। বিমানে মোট লোক ছিল আড়াইশোর ওপর। দফায় দফায় শ' দেড়েক লোককে ছেড়ে দেওয়া হয়—ধরে রাখা হয় শ'খানেককে। বিমানকর্মী ছাড়া এরা সবাই জাতে ইহুদি, কেউ বা ইস্রায়েলের বাসিন্দা, কেউ বা অন্য কোনও দেশের। ছিনতাই-কারীদের শর্ত ছিল বিদেশে বন্দী ৫৩ জন গেরিলাকে ছেড়ে দিলে তারা সবাইকে রেহাই দেবে, নয়তো বিমানটা উড়িয়ে দিয়ে তাতে আটক সব লোককে মেরে ফেলবে। সলা-পরামর্শের জন্যে তারা সময় দিয়েছিল ৪ জুলাই পর্যন্ত।

এর মধ্যে এক কাণ্ড করে বসলো ইস্রায়েল। যে সব বন্দীর মুক্তি চেয়েছিল ছিনতাইকারীরা তাদের বেশীর ভাগই আছে ইস্রায়েলের গারদখানায়। এনটেবি বন্দরে যে সব যাত্রী বসেছিলেন মৃত্যুর পরোয়ানা বুকে ঝুলিয়ে তাঁরা সবাই ইহুদি। ইস্রায়েল মুখে বলেছিল ছিনতাই-কারীদের দাবি তারা খতিয়ে দেখছে। আসলে কিন্তু তাদের ছিল অন্য মতলব। তারা ছিল চোরের ওপর বাটপাড়ি করার তালে। রাষ্ট্রপতি আমিন আর গেরিলাদের ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে তারা ফন্দি এঁটেছিল ২৫০০ মাইল দূরে এনটেবি বন্দরে হানা দিয়ে ছোঁ মেরে আটক বন্দীদের সবাইকে উড়োজাহাজে তুলে ইস্রায়েলে নিয়ে আসতে। এরকম কাণ্ডকারখানা গল্প-উপন্যাসেই ঘটে। কিন্তু ইস্রায়েল প্রমাণ করেছে গল্পের চেয়েও সত্যি ঘটনার চমক কম নয়। এণ্টেবি বিমান ঘাটিতে ছিনতাই বিমান আর যাত্রী-দের চৌকি দিচ্ছিল উগান্ডার ফৌজ। রাত-দুপুরে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে চড়াই পাখির ওপর চিলের মতো ইস্রায়েলি কম্যাণ্ডোরা। বাধা যে তারা পায়নি তা নয়। লড়াই হয়েছিল উগান্ডার ফৌজের সঙ্গে তাদের। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাম ফতে করে তারা দেশে ফিরে গেল আটক লোকদের নিয়ে।

তারা দেশে রেখে গেল কেবল এয়ার ফ্রান্সের উড়োজাহাজটা নয় সব কজন গেরিলার আর নিজেদের একজনের মরা দেহ। মারা গেল বেশ কিছু উগাণ্ডার সেনা, নষ্ট হলো তার রুশিয়া দেশ থেকে পাওয়া জঙ্গীবিমান। ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল ইস্রায়েলে। সাতবট্টির ছ'দিনের লড়াইয়ের পর এত খুশী তারা কখনও হয়নি। যদিও তারা বলছে নিজের ঝুঁকিতেই তারা কাণ্ডটা করেছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ঝুঁকিটা তারা নিলেও সায় ছিল তাদের কাজে আমেরিকার তো বটেই পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স আর ব্রিটেনেরও। এদের না জানিয়ে অভিযানে নামেনি ইস্রায়েল। সলাপরামর্শ গোপনেই করা হয়েছিল—কাগজপত্তরে তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু পশ্চিমী বন্ধুরা মদত না দিলে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজে নামবার সাহস ইস্রায়েলের হতো না। বোম্বেটেগিরি নিশ্চয়ই অন্যায়। তা বন্ধ করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু বোম্বেটেগিরি করে কি বোম্বেটেগিরি রোখা যায় এ জিজ্ঞাসার জবাব কী ইস্রায়েল কী তার স্যাঙাতদের কেউই দিতে পারেনি। ছিনতাইকারীদের নিন্দে করেছে প্যালেস্টাইন মুক্তিফ্রণ্ট—বলেছে—এরা আমাদের কেউ নয়। আমিনও তাদের ছেড়ে দেননি। তবে কেন ইস্রায়েলের এ বাহাদুরি?

অনেক কথা উঠেছে ইস্রায়েলি হানা নিয়ে। ইহুদি কম্যাণ্ডোরা হামলা না চালালে কি আটক যাত্রীরা কেউ রেহাই পেত না? অনেক লোককে গেরিলারা ছেড়ে দিয়েছিল। পটিয়ে-পাটিয়ে তাদের কি বাকী লোককে ছাড়তে দিতে রাজী করানো যেত না? আটক যাত্রীরা বেঁচে গেছে বটে কিন্তু মরেছেও তো বিস্তর নিরীহ লোক। ইস্রায়েল আর তার বন্ধুদের কাছে ওই কালা আদমীদের জীবনের কি কোনো দাম নেই? বলা হচ্ছে আমিন ভিড়ে গিয়েছিলেন গেরিলাদের দলে। তিনি অবিশ্যি সব পারেন, তাঁকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু তিনি যা করেছেন তা তো যাত্রীদের ভালোর জন্যেই তাদের ক্ষতি তো তিনি কিছু করেননি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিরীহ লোকদের প্রাণ বাঁচাবার অজুহাতে এক দেশের সরকার যদি আর এক দেশের ওপর সেনাসামন্ত নিয়ে চড়াও হতে পারেন তা হলে দেশের স্বাধীনতা কী সার্বভৌম অধিকারের মূল্য কী থাকবে? ইস্রায়েলও বিশ্বাস করে না সে যা করেছে তাতে বিমান ছিনতাই কিংবা গেরিলাদের আন্দোলন বন্ধ হবে। তবে কেন এমন একটা সাংঘাতিক নজির সে খাড়া করলে? কেনই বা তাকে বাহবা দিচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়া?

দেবরাজ

চূড়ান্ত শর্ত

রত্নেশ্বর হাজরা

যার ভালো বুক আছে তার কাছে চুম্বক রয়েছে
এই জেনে রাজি হই—(তার সঙ্গে দেখা উৎসবে)—
ফিরে এসে মেঘ দিয়ে ধুয়ে রাখি চোখ
আরো গন্ধ নিয়ে ঘরে এলে
বেরুবো ভ্রমণে (কিন্তু যোদ্ধার পোশাকে যেতে হবে)।

এরকম আরো শর্ত থাকে
জেগে থেকে খুলে দেব ঘর (রাত্রে যখনই ফিরুক)
বিছানা বালিশে পাবে শুতে

কিছুতে চন্দ্রের দিকে লক্ষ্যবিদ্ধ হবে না তখন
বড়জোর জিবে ও উরুতে

শিলাবৃষ্টি হবে. আর সাবালক কিছু অন্ধকার
বাহুমূলে রেখে দিয়ে নাড়াবো-চাড়াবো তর্জনীতে।

তখন শেখানো হবে ভাষার আরম্ভ আর শূন্যের আস্বাদ
আনন্দ শব্দের অর্থ—দেখাবো বিদ্যুৎ
এবং সে যদি চায় বিষ
তাকে একটু মধু দেবো—তারপর চেনাবো বিষাদ।

যার ভালো বুক আছে তার কাছে চুম্বক রয়েছে
এই জেনে কিনেছি কম্পাস (কম্পাসের উত্তর দক্ষিণ)
সমুদ্রে যাবার আগে এরকম শেষ কথা থাকে
আমি তাকে দুই চক্ষু দেবো
সে দেখাবে চম্বক আমাকে।

ঘাস

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ঘাসের গন্ধের কথা
ঘাসই জানে
কোন শাস্ত্রে লেখা নেই
লেখা নেই অন্য কোনখানে
কিছু কিছু জানে বুঝি
গঙ্গা ফড়িং প্রজাপতি
সেই সব পোকা ও মাকড় যারা
ঘাসেতেই বেঁধেছে বসতি
ঘাসের চেয়েও নীচু
আর কিছু নেই যারা
ভাবে তারা
ভাবে বড় ভুল
ঘাস তো সবুজ এক
পৃথিবীর আগুরাখা
যেখানে হয়নি তার
কৃত্রিম উপায়ে থেমে থাকা
সেখানেই ওড়ায় সে
প্রশান্তির শ্বেতবর্ণ ফুল
আমি তো উদ্ভিজ্জ বসতে
ঘাসকেই সেরা বলে মানি
যে ঘাস বুকের পরে
সযত্নে রাখে ধরে
শিউলি ৷

সুন্দরদির বন্ধু

অরণি বসু

বিজ্ঞাপনের মত প্রেম, পোস্টার আর নিয়নসাইন, এই শেষ নয়
আছে ট্রাম ও বাস, অফিস-কাছারী, তাদের
পেটের ভেতরের লোকজন, হই-চই আর
অজস্র ম্যাজিক, এই সব নিয়ে কলকাতা
কলকাতার গভীর অন্ধকারে ছিলো আর একজন,
সে সুন্দরদির বন্ধু।

দীর্ঘজীবন ধ'রে সে খুঁজে বেড়িয়েছে পথ ঘাট,
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছিলো সিঁড়ির সুষমা, যা দিয়ে ওপরে ওঠা যায়
তার জন্যে কোন মঞ্চ ছিলো না, ফুল ছিলো না,
অভ্যর্থনা ছিলো না
সব ডুবে গেছে ভর্ৎসনায়, বন্যায়, বেদনায়—

এই শেষ নয়, অভিমান যত হোক ভারী,
যতই চোখের জলে ভেসে যাক চাঁদ
আরো দীর্ঘদিন তাকে কাটাতে হবে এই কলকাতায়—
ব্যর্থতায়, অপমানে—
দুঃখ ও শোকে কুঁজো হ'তে হ'তে
সে যুবক একদিন খুব রোগা হ'য়ে যাবে,
তখনো ভীড়ের মধ্যে থেকে ছেঁকে, সেই কৃশ শরীরের দিকে চেয়ে
কেউ কেউ হঠাৎই ব'লে উঠবে, 'ওই যে, ওই আমাদের
সুন্দরদির বন্ধু'।

নির্ভর

যুগল সেন

কুসুম যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে বাসব ভাবেনি। কুসুম শুধু ফোনে বলেছিল, 'এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো, দেখো, তুমি ঠিক চমকে যাবে।' বাসব অবাক হয়নি, চমকেও ওঠেনি। সংসারে চমকানোর মতন জিনিস আছে? হয়ত আছে; বাসবের জীবনে নতুন করে চমকানোর কোন ব্যাপার নেই। তবে বাসব খুশী হয়েছে। বাসব জানলায় মুখ রেখে, দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল, কুসুম রেল-ব্রিজের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ছাতি, রোদ নেই তেমন। কিন্তু দূর থেকে সে দেখতে পেয়েছিল কুসুমের মুখে রোদের লাল আভা। ট্রেন থামতেই কিছু দেহাতি মেয়েপুরুষ হুড়মুড় করে নেমে গেল; তারপর বাসবও নামল। সঙ্গে কিছু জিনিস আনবে ভেবেছিল, কিন্তু আনব আনব করে শেষকালে আর আনা হয়নি। আসলে ইচ্ছে করেনি। দু-দিনের জন্যে আসা। দূর থেকে কুসুম লোকজন, ভিড় চিৎকারের পাশ কাটিয়ে আসছে। মাথায় রঙীন ছাতা।

কুসুমকে আসতে দেখে বাসব সামনের দিকে এগোল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কুসুম কাছে এসে সামান্য হাঁপিয়ে বলল, 'ইস তোমার ট্রেনের সামনে ওঠার কথা ছিল, শেষে উঠলে কেন?'

বাসব বলল, 'আমি তো শেষেরই মানুষ। আর, আমায় দেখে কি মনে হচ্ছে না আমি কথা রেখেছি।'

কুসুম হালকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তোমায় খুঁজতে খুঁজতে আমি হয়রান হয়ে গেছি।'

'আমার জন্যে না হয় এইটুকু হয়রান হলেই। আমি যে সারাজীবন তোমায় খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম।'

'খোঁজার মত খুঁজলে কেউ হয়রান হয় না।' বলে কুসুম আবার কি বলতে গিয়ে আচমকা হেসে বলল, 'চলো, পরে তোমার সাথে খুব ঝগড়া করব।'

ছোট্ট স্টেশন; প্লাটফর্ম আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। রেল লাইনের পাশে মাইল মাইল ধুধু মাঠ। মাঠে এক কিশোরী ঝুড়ি কোমরে নিয়ে কাঠ কুড়োচ্ছে। আকাশে মেঘ নেই, জায়গায় জায়গায় ছোপ ছোপ নীল রঙের ভাব। মাঠে কিছু গরু চরছে, কিছু চালা ঘর, কিছু ছড়ানো মাটির ঘর চোখে পড়ল। আকাশ থেকে খুব মিহি স্বরে চিলের স্বর ভেসে এল। বাসব ছেলেবেলায় শুনতো চিলের ডাক নাকি কান্নার মত। তখন বাসব ভাবত, ডানা কেটে গেলে কাঁদে; উড়তে পারলে কেন কাঁদে তার উত্তর খুঁজে পেত না। মানুষ চিল না; মানুষের অনেক রকম কান্না আছে। অনেক কান্না আছে যা কাঁদা যায় না। সেই কান্না মানুষ হাসিতে ঢেকে রাখে, স্তব্ধতায় ঢেকে রাখে, আবার কেউ বা অস্থিরতায়, রাগে ঢেকে রাখে। আসল জিনিসটাই ঢাকা থাকে। অফিসে স্বারেশবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। পঞ্চাশের কোঠায় বয়স, রোগা ধীর-স্থির মানুষ। অনেক দিন আগে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন হুগলীতে। অবস্থাসম্পন্ন ঘরে। গত বছর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, একই ছেলে। ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সংসারে বারোয়ারি ঝামেলা, হুজ্জুত্তি নেই। ছেলে বউ নিয়ে স্বারেশবাবু বেশ মিলেমিশে ছিলেন। অফিসে আসার সময় প্রত্যেকদিন পুত্রবধূ পান সেজে দিত। স্বারেশবাবু দিব্বি ঠোঁট লাল করে অফিসে আসতেন। স্বারেশবাবু এমনিতে ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, সৎ, এবং যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করেন। কোন প্যাঁচের মধ্যে তিনি থাকেন না, সাফ কথাবার্তা বলেন। ভগবান জানেন, হঠাৎ কি হলো, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছেলে-বউ আলাদা হয়ে গেল। বেশীর ভাগ যা হয়ে থাকে, শাশুড়ীর সাথে ঠুকঠাক অশান্তি চলছিল হয়ত। যে ছেলেকে দুধ খাইয়ে, বুকের রক্ত তুলে মানুষ করেছেন—সেই বৃদ্ধ মা বাবাকে ছেড়ে তারা চলে গেল। ভাবা যায়! পোষাল না। পঁচাত্তরটা মধ্যবিত্ত পরিবারের এই একই ছবি। বাসব মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, যে বউ অমন অপরূপ সুন্দর পান সাজতে পারে সে কি ভাবে সংসারে মানিয়ে নিতে পারল না। শালা যত্তসব প্যাঁচের ব্যাপার। আবার পরে এও মনে হয়, বাইরে থেকে নিজের মত করে অনেক সময় যা ভাবা যায় প্রকৃত তা নাও হতে পারে। অথচ আশ্চর্য, প্রত্যেক মানুষ নিজের ধ্যান-ধারণা, রুচি-বিশ্বাস ইত্যাদির গণ্ডি টেনে সব কিছু বিচার করে; নিশ্চিন্তে বিচার করে সুখীও হয় এবং সগর্বে মত প্রকাশও করে। বাসব সহসা কোন মত প্রকাশ করে না। করতে পারে না। একদিন বাসব স্বারেশবাবুকে বলেছিল, 'দাদা পান খাওয়াটা ছেড়ে দিলেন?' স্বারেশবাবু শিশুর মত হেসে বলেছিলেন, 'কাটা ঘা-এ নুনের ছিটে দিয়ে

কি হবে?'

আকাশে হালকা সাদা মেঘের পাশ দিয়ে রোদের ফালি ভেসে বেড়াচ্ছে। কুসুম কথা বলে যাচ্ছিল। বাসব ঠিক শুনছিল না; অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানছিল। সবে শীত চলে গেছে। কিন্তু শীতের ক্ষীণ ভাবটা এখনও রেখে গেছে। কোন কোন গাছে নতুন পাতা বেরোচ্ছে, কুঁড়ি ধরব ধরব ভাব। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক অচেনা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। আস্তে আস্তে রোদ বাড়ছে।

স্টেশন থেকে নেমে সামনের কিছু জায়গা ঢালু ভাবে নেমে গেছে। সেখানে একটা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। অল্প বয়সী ছেলেটা হিন্দী সিনেমার নায়কের মত হ্যান্ডেলে বাঁ হাত রেখে, কোমর বেঁকিয়ে বিড়ি টানছিল। ওদের দেখেই বিড়ি ফেলে দিয়ে হাসল, অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে।

বাসব বলল, 'এই তোমার রথ?'

কুসুমের চেহারা একটু ভারিক্কি ভারিক্কি হয়েছে। সে উঠে বলল, 'এসো।'

বাসব দেরী করল না, কুসুমের পাশে গিয়ে বসে পড়ল। ছেলেটা রিকশা চালাতে লাগল। রাস্তার পাশে নানা রকম ছোট-বড় দোকান। একটা সাইকেলের দোকানে মাইক বাজছে, কিছু ছোট্ট ছেলেমেয়ে নতুন জামা-পরে আনন্দে হৈ-চৈ করছে। দোকানের দরজার সামনে আমপাতা, সোলার ফুল ঝুলে আছে। হয়ত নতুন দোকান খুলেছে।

বাসব সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল 'আজ তোমার ছুটি।'

কুসুমের কপালে ঘাম জমে গেছে। কানের কাছে পাতলা চুল ঘামে লেপটে গেছে। আঁচলের কোণা টেনে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কুসুম বলল 'এক সপ্তাহ ছুটি।'

'আমি আসছি বলেই—' বাসব কৌতুক চোখে তাকাল।

'না মশাই। তুমি কে? তোমার জন্যে ছুটি হবে?'

'আমি কেউ না?

'নাই তো।'

'এই আমি, ইহকাল পরকাল বল, আর মা-বাবা ভাই বোনই বলো, সবই তো এককালে তোমার ছিলাম বাবা।

'তাই বুঝি!'

'ছিলাম না। তখন আমার মুখের দিকে তাকালে বেগম মমতাজ হয়ে যেতে। মুখে খই ফুটতো। বলতে 'আমি তোমাকে দেখবো।' দু-দিন দেখা না হলে রেগে আগুন হয়ে যেতে। বলতে 'তোমার জন্যে আমার সব সময় কষ্ট হয়।' কতো কথা। মহাভারত শেষ হয়েছে—তোমার কথা বলে, লিখে শেষ করা যাবে না। আমার জন্যে তোমার এখনও কষ্ট হয়?'

'আমার জন্যে হয় না?' বলে কুসুম হঠাৎ খেয়াল করল ছেলেটা হয়ত সব শুনছে।

রোদে বাসবের মুখটা সামান্য জ্বালা করছিল। হাই তুলে সে বলল, 'তিন বছর আগে হলে বলতে পারতাম।'

বলেই বাসব অনুভব করল কুসুমের গায়ের সেই গন্ধটা এখনও আছে। বাসবের আলস্য আসছিল। কয়েকদিন ধরে ঘুম হচ্ছিল না। ভোরের লালগোলার ট্রেন ধরার জন্যে কাল রাতে ঘুম হয় নি। এখানে আসার জন্যে নয়, ক্লান্তিতে। সে সব কিছু করে বলতে—অফিস যায়, অফিসের এক-ঘেঁয়েমি কাজ করে, অবশ্য মন দিয়েই করে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারে। কোন কোনদিন সিনেমা থিয়েটারে যায়। হুই-হুই করে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকলেই রাজ্যের যত দুশ্চিন্তা ক্লান্তি মাথায় ভর করে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে হয়। অনেক কিছু ভুল হয়ে যায়। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে পড়ে, আরে দরজা লাগানো হয় নি তো! ঘরে

অনেক জিনিস আছে। উঠে আলো জেবলে ঘুম চোখে দরজা লাগাতে হয়। এই রকম ভুল হয় আর কি! বাবা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। বাবা এক অফিসের সামান্য কেরানী ছিল। কিছু জমানো দূরের কথা, ভালোভাবে সংসারই চলত না। অভাব অনটনের ভিতর বাসব মানুষ হতে না পারলেও, মানুষের মত বড় হয়েছে। হঠাৎ বাবা স্ট্রোকে মারা যাওয়ায় অনেক কিছু উলটে পালটে গেল। বাসবের এম এ পড়ার ইচ্ছে ছিল। পারে নি। সে সংসারে বড়। মাথার উপর অনেক দায়িত্ব। বি এ পাশ করে একটা চাকরি জোগাড় করে নিল। দুটো জীবন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; নির্ভরতার আশায়। মা আর ভাই অনিল। চাকরি পাওয়ার পর বাসব ভেবেছিল, চেয়েছিল নতুন কোন পাড়ায় চলে যাবে। মা ক্রমশ ঠান্ডা মেরে যাচ্ছিল। কিন্তু মা যেতে চায় নি। পুরোনো ভাড়া বাড়িতে বাবার পনেরো বছরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে। মা বাবার সেই স্মৃতি সম্বল করেই থাকতে চায়। বাসব প্রথমে আপত্তি করেছিল, শেষে করে নি। মা যাতে সুখী হয় তাই করেছে, করতে চেষ্টা করে। বাসব অনিলকে অন্তত বি এ পাসটা করাতে চেয়েছিল। অনিল ফার্স্ট ইয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে পড়া ছেড়ে দিল। তার অভিমত, 'ফালতু পড়ে কি হবে? সময় নষ্ট করে কি লাভ। তার থেকে ছিট কাপড়ের ব্যবসা করব।' বাসব চায় নি, ভাই ছিট কাপড়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াক। তা অবশ্য অনিলকে করতে হয় নি, সে চালু ছেলে। মাথায় ব্যবসা বুদ্ধি আছে। ঠিক সে দেড় বছরের মাথায় একটা ছোট কাপড়ের দোকান খুলে বসল। বাসব সোজাসুজি কোনদিন জিজ্ঞেস করে নি, কিন্তু অনুমান করতে পারে অনিলের ভালোই আয় হয়। বাবা মারা যাওয়ার পর পশুর মত দিনরাত পরিশ্রম করে সংসারটাকে বাসব মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ভাইকে মানুষ করেছে। অনিল এখন মানুষ হয়েছে। অনিল এখন বাড়ির লিডার। বাসব প্রথম প্রথম টের পায় নি, পরে টের পেয়েছিল, এখন মা সংসারের কথা আলোচনা অনিলের সঙ্গে করে। বাসবের সাংসারিক জ্ঞান কোনদিন ছিল না, এখনও নেই। শুধু সে মাসের মাইনেটা দুতিন তারিখে মার হাতে তুলে দেয়।

একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে কুসুম রিকশাটা থামাল। 'কি ব্যাপার?' কুসুম প্রায় রানীর মত নেমে বলল, 'দাঁড়াও, আসছি।'

মিনিট পাঁচেক পর সে কফির ছোট একটা কৌটো আর দামী দু-প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এল। বাসব রিকশায় বসে মুগ্ধদৃষ্টিতে ক-পলক তাকিয়ে থাকল, দেখল। কিছু বলল না। বাসব কফি আর ভালো সিগারেট চিরকাল ভালোবাসে। ভালো সিগারেট সে সব সময় খায়। কফি সব সময় খাওয়া হয় না। শ্যামবাজারের মোড়ের মাথায় একটা পাঞ্জাবির দোকান আছে, সেখানে ভালো কফি পাওয়া যায়। আগে কুসুমকে নিয়ে প্রায়ই গিয়ে কফি খেয়ে আসত বাসব। এখন আর ওদিক যাওয়া হয় না। কুসুমই তাকে কফির অভ্যেসটা করিয়ে দিয়েছিল। কুসুমের মনে আছে।

বেশীক্ষণ রিকশা চলল না। বড় রাস্তার ডানদিকে সরু একটা সুরকির রাস্তা। ডানদিকে রিকশা নামতেই কুসুম হাতের আঙুল তুলে বলল, 'ঐ দেখো, আমার স্কুল।'

বাসব দু-পাশের দোকান-পাট, পথ-ঘাট, অপরিচিত লোকজন দেখছিল। নতুন জায়গায় প্রথম অবস্থায় সব কিছু নতুন মনে হয়। বাসব দেখল, সত্যিই সুন্দর বাড়ি। সামনে অনেকটা জায়গা। দু-পাশে নানা রকম ফুলের বাগান। তার ভিতর দিয়ে সরু ঘাসের রাস্তা স্কুলের ভিতর ঢুকে গেছে। একটা বুড়ো মালী বাগানে কাজ করছিল। স্কুল বাড়ির একটু দূরে কুসুমের কোয়ার্টার। স্কুল-বাড়ির চারপাশে পাঁচিল ঘেরা। কুসুমের কোয়ার্টারের জানলার পাশে একটা মাঝারি দেবদারু গাছ। লাগানো নিশ্চয়। বাসব রিকশা থেকে নেমে দেখল—বাড়িই শুধু সুন্দর না, পরিবেশটাও চমৎকার। এখানে কোনরকম ঝামেলা নেই মনে হয়। কিছুটা দূরে বড় রাস্তা, বাস চলে। রাস্তার ওপাশে গ্রাম দেখা যায়। স্কুল-বাড়ির পিছন কয়েকটা নারকোল গাছ। হাওয়ায় পাতার চেরা শব্দ ভেসে আসছে। কতদিন এমন মুগ্ধ নিস্তব্ধ পরিবেশ, গাছ-গাছালী আর পাখি ওড়াউড়ি দেখেনি বাসব। ভালো লাগছিল। কয়েকবার চোখ বুজে ওই ভালোলাগাটুকু বাসব ভেবে নিচ্ছিল।

কুসুম খুচরো কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। বাগান পেরোনোর সময় মালীটা ঘাড় বেঁকিয়ে একবার বাসবকে দেখে নিল। কফির কৌটো আর সিগারেট বাসবের হাতে দিল, তারপর ব্যাগ খুলে চাবি বার করল, ঘরের তালা খুলল। বারান্দায় একটা পাতাবাহারের টব।

ঘরে ঢুকে কুসুম ব্যাগটা বিছানায় ফেলে দিল, তারপর হেসে বলল, 'এই আমার ঘর।'

পাশাপাশি দুটো ঘর। এ ঘরের সামনের দেওয়ালে একটা রঙিন ক্যালেন্ডার; খোলা আকাশে একটা পাখি উড়ছে। সুন্দর

পরিষ্কার ওয়াড়ে বিছানা পাতা। একটা ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে একটা ঘড়ি। দেওয়ালে একটা লম্বা তাক, একটা বাক্স, ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ঘর। জানলায় আকাশী পর্দা; টেবিলে কিছু বই-পত্তর, ধূপদানী। বাসব বুঝল কুসুম ধূপ ধরায়। একা থাকার পক্ষে সাধারণ যা জিনিসপত্র থাকে, তাই আছে। কিন্তু সুন্দর করে সব সাজানো। কুসুম একেবারে গিন্নী হয়ে গেছে। পাশের ঘরটা থাকার মত, আবার রান্নাঘর হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ও-ঘরে ঢুকতে এ দরজায় পর্দা ঝুলছে। বাসব পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল, একটা স্টোভ। কাঠের তাকে রান্নার জিনিস।

বাসব ক্লান্ত ছিল। সে বিছানায় বসে পড়ল। কুসুম জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি বোস, আসছি।' কুসুম চলে গেল।

বাসব আর একবার কয়েক পলক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরটা দেখে নিল। দরজার মাথায় মায়ের ফটো। সময় কতো তাড়াতাড়ি চলে যায়। আশ্চর্যভাবে দেখা হয় নি, হঠাৎ কিভাবে কুসুমের সাথে দেখা হয়ে গেল। এই তিন বছরে বাসবের শরীর মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কুসুমের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের ভিতর প্রথম চোখে পড়ল কুসুমের চেহারা। আগে সে খুব ছটফটে আর রোগা ছিল। অনেকদিন কুসুমকে ধরার সময় কুসুমের পিঠের হাড় হাতে লাগত। তিন বছর পর আজ বাসব প্রথম কুসুমকে দেখল। একটু মোটা হয়েছে, গিন্নী-গিন্নী ভাব শরীরে এসেছে। দেখতেও সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে রিকশায় আসার সময় যখন কুসুম মুখ কাত করে তাকিয়ে কথা বলছিল, তখন বাসবের মনে হচ্ছিল তিন বছরের ভিতর সে যেন বসে আছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে কুসুম মাঝে মাঝে বাসবের বাড়ি যেত। মা একদিন কুসুমকে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যে দিতে বলল। মার কড়ায় মাছ ছিল। কুসুম খুব ভক্তি ভরে সন্ধ্যে দিল। তিনবার শাঁক

কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

কারণ তারাই বেশী দায়ী

'রসগোল্লা খান' বা 'রসগোল্লা মিষ্টি' বলে কোন বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে কি? আর বিজ্ঞাপন না দিলেও, রসগোল্লা যে মিষ্টি সে আমরা সবাই জানি। তাহলে কলকাতার জয়ঢাক পেটানো বিজ্ঞাপনের মানেটা কি?

কেবল বিজ্ঞাপন দিয়েই কি শহরটা ভাল করা যায়? প্রশ্নটা নিজেদেরই করছি। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, লোকে পড়ছে, আবার ভুলেও যাচ্ছে।

এই দেখুন না, 'জল নষ্ট করবেন না' এটা এই 'হতভাগা' শহরে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝাতে হয়। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে বেশ কতগুলি রাস্তার কলে যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হোল, কষ্ট করে কতজন বন্ধ করলেন? যদি শাস্তি হিসেবে জল বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে আবার চেঁচামেচি শুনবো। জানেন কি যে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তুলনা আমাদের মাঝে মাঝে শুনতে হয় সেখানে রাস্তায় সিগারেটের টুকরো ফেললে জরিমানা হয়?

রাস্তায় সময় নেই, অসময় নেই, স্থান-কালপাত্র ভেদ নেই, পেচ্ছাপ, পায়খানা করতে বসে গেলেই হল। এ যেন চরম ব্যক্তি স্বাধীনতা। আর পুলিশ যদি কলার চেপে ধরে, তখন তার পায়ে ধরে পীড়াপীড়ি দু'পাঁচটা টাকা ঘুষ দিয়ে পরিত্রাণের চেষ্টা। অথচ রাস্তার ধারে না বসলেই কি নয়?

বহু জায়গায় বহু মানুষ লাইন দিয়ে পুরো ভাড়া টিকিট কিনে বাসে উঠছেন। তবু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের 'খেলা পাগলে' পঙ্গপালের মত যাঁরা বাস-ট্রাম অধিকার করে বসলেন তাঁদের কাছে বিজ্ঞাপন এর আবেদন পৌঁছাল না।

সত্যিকারের হকারদের বলা হচ্ছে,—'ফুটপাথে দোকানের দিন শেষ হয়ে এসেছে'' শুনছে কজন? তাঁদের ধারণা 'যেমন চলছে তেমনি চলবে'। চলবে না। সারা কলকাতা বলছে, চলবে না। ফুটপাথ 'ফুটচারীদের' জন্য। রাস্তা গাড়ীর জন্য। বাজার কেনাবেচার জন্য। ডাস্টবিন ময়লার জন্য। আর পুলিশ? নিশ্চয় রাস্তায় পেচ্ছাপ করলে। ধরবার জন্য।

পুলিশের পায়ে ধরে পীড়াপীড়ি করবার দরকারটা কি? আরও প্রশ্ন আছে—কলকাতার ভবিষ্যৎটা কি? বিজ্ঞাপনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। জানেন কি যে সি এম ডি এ-র বিজ্ঞাপন পড়ে লোকে যেমন গালাগালি দিয়েছে, তেমনি কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এসেছেন কলের জলের অপচয় বন্ধ করবার জন্য নতুন 'মেশিন' নিয়ে। জেনে রাখুন, এই 'মেশিন' ভাঙলে রাস্তার কল থেকে এক ফোঁটা জলও পড়বে না। 'অটোম্যাটিক' বন্ধ হয়ে যাবে।

এই বিজ্ঞাপন পড়েই শিল্পীরা এগিয়ে আসছেন কলকাতাকে আর একটু সুন্দর করতে। আবার এই বিজ্ঞাপন বোধহয় না পড়েই যুব সমাজ জঞ্জাল পরিষ্কারের অভিযানে নামছেন।

কিন্তু আগেই বলেছি বিজ্ঞাপন পড়েও রাস্তায় পেচ্ছাপ বন্ধ হয়নি, জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হয়নি, বাসভাড়া ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হয়নি, আর কলকাতা সম্বন্ধে নাক সেঁটানি বন্ধ হয়নি। এখনও বোধহয় সবাই প্রতীক্ষায় আছেন, গুঁতো যদি পড়ে, আইনের বজ্রমুষ্টি যদি ধরে, তখন হয়তো পীড়াপীড়ি করে বাঁচার ব্যবস্থা করা যাবে। একটু দেরী হয়ে যাচ্ছে না কি?

দেরীতে ভয় পাই কেন জানেন? এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। যে উন্নয়নমূলক কাজগুলি পনেরো কুড়ি বছর আগে হওয়ার কথা, সেগুলি আজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যেগুলি শেষ হচ্ছে সেগুলিও সংরক্ষণের অভাবে খারাপ হচ্ছে। আরও ভয় পাই কেন জানেন? কলকাতার সুনামটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে। অথচ গুঁতো না খেয়ে বিজ্ঞাপন না পড়ে শুধু যদি খাবারের দোকানগুলির সামনে একটা ঝুড়ি রাখা হয় যাতে চায়ের ভাঁড় আর শালপাতা ফেলা হবে, যদি কর্পোরেশনের জঞ্জালগাড়ি আসবার ঠিক আগে রাস্তায় জঞ্জাল জমা করা হয়, ডাস্টবিন থাকলে তার ব্যবহার হয়, দোতালা তেতালা থেকে জঞ্জাল না ছোড়া হয়, ট্রামে বাসে পুরো টিকিট কাটা হয়, বিদেশী বা কলকাতা দেখতে অভিলাষীদের একটু সাহায্য করা হয়, ভিড়ের মধ্যে অক্ষম এবং মহিলাদের একটু সুবিধে করে দেওয়া হয়, এমন কি যদি থুথুটা বাইরে না ছিটিয়ে গিলে ফেলা হয়, তাহলেই দেখবেন কলকাতায় সুনাম ছড়াচ্ছে। এতে পয়সা খরচ নেই বা নামমাত্র।

হাওড়া স্টেশন এলাকা ব্যবহারকারীরা এত অসুবিধা সহ্য করেছেন বলেই সেখানে সাবওয়ে সম্ভব হয়েছে, আগামী দিনে রেলওয়ের সহযোগিতায় শিয়ালদহে উড়াল পুল আর কাছারি বাড়ীর পুনর্বিন্যাস যখন আরম্ভ হবে, তখনও লক্ষ লক্ষ যাত্রী হকার অনুরূপভাবেই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, এটা আমরা জানি। এর জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। সাধারণ লোক কলকাতার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করবেন, অথচ যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা কলকাতার জন্য কিছুই করবেন না, যে সব প্রতিষ্ঠান কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত অথচ শহরের ভালোর জন্য কিছুই করছেন না, তাঁদের আমরা 'খোঁচা' দেবই। দেখি চৈতন্য হয় কিনা। তাঁরা এই শহরকে কটা হাসপাতাল স্কুল, ডিসপেনসারী, পার্ক, জঞ্জাল সরাবার লরী দিয়েছেন? তাঁদের পেল্লাই অফিস ঘরে বা বাইরে শিল্পনিদর্শন কিছু রেখেছেন কি?

আসল কথাটা কি জানেন? বিজ্ঞাপনটা সব সময় সি এম ডি এ বা তার চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেনকে জাহির করবার জন্য নয়। যদি কলকাতার একটু ভাল হয়, তাহলেই লাভ। যদি একজনও আসেন সেটাই লাভ।

আর অন্যদের কাছে যদি প্রমাণ করা যায় যে কলকাতাটা জাহান্নামে যাচ্ছে বা যাবে, তাহলে সেটাই বা কম লাভের কি? না হলে আমরা আর 'কলকাতা-প্রেমী' হলাম কেন?

বাজাল। প্রদীপ ধরাল। আর কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে কুসুমের নমস্কারের বহর দেখে মা কুসুমকে কাছে বসিয়ে বলেছিল 'তোমার মত মেয়ের সাথে আমার বাসুর বিয়ে দেব।' শুনে কুসুমের চোখের পাতা সুখে কেঁপে উঠেছিল। তখন সময়টা অন্যরকম ছিল। সামনের জানলা দিয়ে পুব আকাশের অংশ দেখা যায়। নীল নেই, রোদের উজ্জ্বল রং সারা আকাশ জুড়ে আছে। কলকাতায় এমন আকাশ দেখা যায় না। জানলা খুললে রাস্তার মারামারি দেখো, না হয় দেখো কোন ফ্যাক্টারীর মোটা নল থেকে রাশি-রাশি কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

গায়ের পাঞ্জাবি খোলার পর, বাসব ভালোভাবে টের পেল হাওয়া আসছে। বাসব দেখল এরই মধ্যে কুসুম কাপড় ছেড়ে কফি বানিয়ে এনেছে।

ছোট টুলটা কুসুম বিছানার কাছে সরিয়ে আনল। টুলে কফি রেখে বলল, 'নাও খাও।'

বাসব শরীর হাত-ভেঙে শুয়েছিল। হাত বাড়িয়ে কফিটা আগে নিল, তারপর সন্তর্পণে উঠে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ, মাইরি, তোমার মত মেয়ে বাজারে আর পাওয়া যাবে না। সত্যি বাল্মীকি যদি থাকত, তবে তোমায় নিয়ে আরেকটা রামায়ণ লিখে যেত।'

কুসুমও চুমুক দিয়ে বলল, তোমরা শুধু লম্বা-চওড়া কথাই বলতে পারো। কাজের কাজ করতে গেলে তোমাদের শরীরে জ্বর আসে। তোমাদের চিনতে আর বাকি নেই।'

'মাইরি এই কথাটা বলো না। আমি রেগে যাব বলছি। আমরা হচ্ছি দেবতার অংশ। এক এক সময় এক এক দেবতার রূপ ধারণ করি। রামায়ণ মহাভারতের কোথাও দেখেছো মেয়েরা ধ্যান করছে আর পুরুষরা সে ধ্যান ভাঙিয়েছে? দেখো নি। আমরা ধ্যান করি, তোমরাই আমাদের ধ্যান ভাঙাও। গায়ে পড়ে এসে ধরা দাও। তোমরা অল্প করে যে আওয়াজ দাও, আমরা সারাজীবনেও দিতে পারি না। সত্যি কুসুমকুমারী আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তোমায় আমি—'

কুসুম রসিয়ে রসিয়ে শুনছিল। বাসব যেন সেই আগের মতই আছে। বাসবের কথা ঢং দেখে সে একটু একটু করে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। ভালো লাগছিল। বাসব শেষে 'আমি'-র পর আর কোন কথা বলতে না পারায় অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল, বোকা ভাব হচ্ছিল। দেখে কুসুম ছেলেমানুষের মত ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'ভাবতে পারি নি তুমি আসবে। কতদিন পরে দেখা হোল, তাই না।'

বাসব সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। সত্যি, পরশুদিন যখন কুসুম টেলিফোন করল, বাস্তবিক বাসব চমকে গিয়েছিল। ফোনে কথাবার্তা বলা যায় না। হয়ও নি। শুধু কুসুম ঠিকানা দিয়েছিল, আর কিভাবে আসতে হবে বাসবকে, প্রায় বলা যায়, মুখস্ত করিয়ে নিয়েছিল। ফোনে যখন প্রথম কুসুমের গলা শুনল, তখন বাসবের বিশেষভাবে মনে পড়ে গিয়েছিল—সময় কত পালটে যায়। অথবা সময় যা ছিল তাই আছে। সময় পালটায়নি। নিজেই কতো পালটে গেছে। বাসব বালিশে হেলান দিয়ে কফি খেতে লাগল।

কুসুম বলল, 'তুমি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছ।'

'তুমি কিন্তু অনেক মোটা হয়েছ।'

'লোভ হচ্ছে?'

বাসব হাসতে হাসতে বলল, 'হবে না। যা বানিয়েছো।'

কুসুম লজ্জা পেল হয়ত। সে তাড়াতাড়ি কফিতে চুমুক দিল। দেবদারু গাছের পাতা শিরশির করে কাঁপছে। রোদের কুচি জ্বলছে পাতায়। কুসুম বাসবের রোগা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল 'আমি নিজে হাতে তোমায় খেতে দিতে পারি না।'

বাসব সিগারেট টানতে গিয়ে থমকে তাকাল। কুসুম একবার তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

'তোমার বাড়ির খবর কি?'

বাসব বলল, 'সবাই ভালো আছে। মাস পাঁচেক আগে অমিল বিয়ে করেছে। বউ পেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'মা কেমন আছে?'

'মা-ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল। বাসব তার একটা শাড়ি পরে শুয়ে আছে। দেবদারু গাছের ছায়া জানলা দিয়ে ঢুকে বাসবের পায়ের পাতায় পড়েছে। বাসব মোটামুটি ফরসা। সেই ফর্সা পায়ের দিকে তাকিয়ে কুসুম গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল 'তুমি এখন কি করছ?'

'তুমি যা করছ, আমিও তাই করছি।

অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস। ব্যাস।'

'বাড়ির নতুন বউ তোমার সেবা-যত্ন করে তো?'

'ভালো কথা বললে, তার সময় কোথায়। অনিলের সেবা, ঘর সেবা, সিনেমা দেখে, হরদম বাপের বাড়ি গিয়ে দিব্বি সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। আর বাড়িতে আমি বেশী থাকি না। বাড়ির সাথে আমার সম্পর্ক মাস গেলে টাকা দেওয়া, রাতে ঘুমোনো, আর খাওয়া।'

'তোমার বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না?' কুসুম কিসের ইঙ্গিত করল বাসব বুঝতে পারল না। বাসব বলল, 'আমার কর্তব্য ছিল অনিলকে মানুষ করা; করতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে ওরা সুখে আছে, আমার কথা ভাবি না।'

কি ভেবে কুসুম আর কথা বাড়াল না। উঠে বলল, 'নাও, স্নান খাওয়া করে নাও।'

কফি খাওয়া শেষ হয়েছিল। তার স্বাদটা মুখে এখনও লেগে আছে। অনেকদিন পর কফি খাওয়া হোল। এখুনি ওঠার ইচ্ছে ছিল না। সিগারেট জানলা দিয়ে টোকা মেরে বাসব বলল, 'এখুনি?'

ঘরে রোদ আসছিল। কুসুম জানলা পর্দায় ঢেকে বলল, 'তুমি তো পরিশ্রান্ত।' কুসুম খুব ভোরে উঠে রান্না সেরে নিয়েছে।

বাসবের ঘুম আসছিল। মাথাও একটু একটু ভার ভার লাগছিল। বাসব উঠে পড়ল। স্নান ভালো করে করতে হবে। তিনদিন স্নান হয় নি।

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন 'মা মা' বলে চিৎকারের মত কাতর স্বরে ডাকতে লাগল। কুসুম ঘর ঝাড় দিয়ে বাসবের স্নানের ব্যবস্থা করছিল। কুসুম দরজা খুলতে বাসব দেখল একটা ভিখারী। শরীরে হাড় ছাড়া কিছুই নেই। পাঁজরার হাড় গোনা যায়। ভিখারীটা পেটে একটা হাত চেপে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর একটা হাত শূন্যে ভাসিয়ে ফিসফিস করে গোঙাতে গোঙাতে বলতে লাগল, 'খেতে দে মা, খেতে দে—' ভিখারীর মাংসহীন হাত, শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। মনে হয় এক্ষুনি মাটিতে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কুসুম দেরী করল না, কয়েক টুকরো পাঁউরুটি আর একটা কলা রান্নাঘর থেকে এনে দিল। ভিখারীটা কি ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে খেতে লাগল। সহ্য হয় না। খেতে খেতেই সে চলে গেল।

খাওয়ার পর কুসুম বলল, 'পাশের গাঁয়ে থাকে। এই লোকটা প্রায়ই রোজ আসে।'

গাঁয়ের অবস্থা চিরকালই খারাপ। সংসারে দুর্ঘটনার শেষ নেই। দিনে নানা দুর্ঘটনায় হাজার হাজার লোক মরছে। পঙ্গু হচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই দুর্ঘটনা কারও বাইরে ঘটে, কারও ভেতরে ঘটে। কত লোক, কত শিশুকে কলকাতার ফুটপাথে বাসব মর-মর পড়ে থাকতে দেখেছে। তাদের পাশ কাটিয়ে দিব্বি ছেলেমেয়েরা প্রেম করে বেড়াচ্ছে, কেউ তাকিয়ে দেখে না। বড়জোর নাকে রুমাল দেয়, এই অবধি। অনেক রকম মৃত্যু, অনেক রকম দুর্ঘটনা বাসব দেখেছে। এমনিতে কিছুই না, কুসুম অনেক যত্ন করে নানারকম রান্না করেছিল। কিন্তু বাসব খেতে পারছিল না। বারবার ভিখারিটীর মুখ ভেসে উঠতে লাগল।

কোন রকমে খেয়ে বাসব উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ দুপুর পার হয়ে যাচ্ছে। জানলায় একটা ঘুঘু এসে হঠাৎ ডেকে উড়ে গেল।

কুসুমের সাজগোজের বহর দেখে বাসব বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

কুসুম ঠোঁটে হালকা গোলাপী রং লাগাচ্ছিল। আয়নাতে বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কিন্তু যাবে না।' কুসুম হেসে শেষবারের মত কাপড়ের সামনের কোঁচাটা ঠিক করতে লাগল। মেয়েদের এই এক, কিছুতেই কাপড় পরার আয়োজন শেষই হয় না। পুরুষদের জামা-প্যাণ্ট শরীরে ঢোকালেই শেষ। কিন্তু বাসব অনেক পথচলতি মেয়েদের দেখেছে কথা বলতে বলতে তারা গোপনে আঙুলের খেলায় কাপড়ের পরিপাটি ঠিক করে নেয়।

বাইরে দুজনে যখন বেরোল, তখন বিকেল। রাস্তা ফাঁকা। হুসহাস করে মাঝে মাঝে গাড়ি চলে যাচ্ছে। এখানে কাছাকাছি কোন হাট আছে হয়ত। এক গরুর গাড়ি বোঝাই খড় যাচ্ছে। কুসুমকে বেশ লাগছিল। হালকা চটি পরে ফটাস ফটাস করে হাঁটছিল। ওরা হালকা ভিড় ছেড়ে অনেক দূর চলে এল। রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। ফসলহীন রুক্ষ মাঠ। একদল বক খাবার খুঁজছিল, ওদের দেখেই সাঁ করে উড়ে গেল।

কুসুমের গায়ের সেই গন্ধটা আবার পেল। বাসব মনে মনে বলল—মেয়েদের শরীর দারুচিনি. ঝালও আছে। মিষ্টিও আছে। বাসব হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম বিয়ে-থা করে জমিয়ে সংসার করছ।'

কুসুম ক-মুহূর্ত তাকিয়ে বলল 'আমিও তো সে কথা ভাবতে পারি।'

'ধুস, এই বুড়োকে কে মালা দেবে?'

'তুমি বুড়ো হয়ে গেছো?'

কুসুমের মুখের কাছে কান বাড়িয়ে দিয়ে বাসব বলল, 'দেখো, কানের কাছে দু-একটা চুল পেকেছে। পায়ে কড়া পড়েছে। জোরে হাঁটতে পারি না।'

কুসুম মিচকে মিচকে হাসছিল। দূরে

একটা ঝাঁকড়ানো খেজুর গাছ। ফিঙে ওড়াউড়ি করছে, এখানে ওখানে ছোট-বড় ঝোপ গাছ। ছোট-ছোট লাল নীল ফুল ফুটেছে। একটা প্রজাপতি একটা ফুলে একটু বসছে, আবার উড়ছে। এমন আদিগন্ত মাঠ, ধূসর প্রান্তর আর ফর্সা আকাশের দিকে তাকিয়ে বাসবের মন্দ লাগছিল না। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। এমন মিষ্টি হাওয়া কলকাতায় স্বপ্নেও পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে ঝাপটা হাওয়া কুসুমের আঁচল খসিয়ে দিচ্ছিল। কুসুম দু-পা ভাঁজ করে, হাঁটুর উপর বাঁ গাল রেখে পুরোনো কথাটা বলল, 'তুমি বিয়ে করলে না কেন?'

খেজুর গাছের ঝোপ থেকে কয়েক ঝাঁক চড়াই কিচির মিচির করে উড়ে গেল। পাখি হওয়া যায় না, হলে মন্দ হত না। ইচ্ছেমত যেখানে খুশী যাওয়া যেত।

হাওয়ায় দেশলাই ধরানো যায় না। বাসব কোন রকমে সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'হল কি? পাগল হয়েছো। এখন বিয়ে করলে বাজারে মুখ দেখাতে পারব না। লোকে বলবে ভীমরতি আর কাকে বলে।'

কুসুম বিশ্বাস করল না। অনুযোগের গলায় বলল, 'বিয়ে করার বয়স তোমার চলে যায়নি।'

'তোমার বয়েস কতো?'

একটু অবাক হয়ে কুসুম বলল, 'তোমার কতো?'

'জলজ্যান্ত আটত্রিশ।'

'আমার ছত্রিশ।' সহসা বলেই কুসুম যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। কুসুম মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। বাসব দূরে তাকিয়ে দেখল, দিগন্তে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। গাঁয়ের সন্ধ্যা বাসব অনেকদিন দেখেনি।

'জানো বাসব, আমাদের কলিগ উমা দেবী তোমার বয়সী। তার কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়েছে। সুখীও হয়েছে।'

'তুমি কি করে বুঝলে সুখী হয়েছে?'

'দেখে, কথার ভাবে বোঝা যায়।'

'কিছু বোঝা যায় না। আসলে তুমি সুখের কথা ভাবো বলে, তোমার মনের সেই ভালোবাসার ছাপ অন্যের মুখে দেখো বলে, তোমার মনে হচ্ছে তারা সুখে আছে। সুখে অবশ্য থাকতে পারে। সবাই সুখ চায়। আমি বলতে চাইছি বিয়েটাই মানুষের জীবনে সব নয়। সুখের মানদণ্ড নয়।'

কুসুম বলল, 'সবাই কিন্তু অবলম্বন চায়।'

বাসব কুসুমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বাসব আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই সাধারণ মানুষ। অসাধারণ স্বপ্ন কোন দিন দেখেননি, সামর্থ্যের বাইরে কোন বিলাসিতা বা আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি। মোটামুটি শান্ত জীবন, একটু ভদ্রভাবে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিল, এখনও চায়। বাবা মারা যাওয়ার আগে মনে যে কিছু রং ছিল না, তা নয়; কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর মনের সমস্ত রং রাতারাতি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখন একটা চিন্তাই আগুনের মত জ্বলত—যেভাবে হোক সংসারটাকে বাঁচাতে হবে। মার যেন কোন কষ্ট না হয়। ভাই যেন কোন দিন বলতে না পারে, দাদা আমাকে দেখল না। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সামান্য সাধারণ সাধ-আহ্লাদ ভাসিয়ে দিল সংসারের জন্যে। তখনই কুসুমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বাসব টিউশনি, অফিস, সংসারের বারোয়ারি ঝামেলায় পুরোপুরি জড়িয়ে গেল। সত্যিই বাসবের বিয়ে করার মত বয়স নেই; সব থেকে বলা ভালো মানবিক অবস্থা নেই। কুসুম সেই দুঃসময়ে স্কুল-মাস্টারি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে এল। দাদার সংসারে সে থাকত। ছাড়াছাড়ির আগে কুসুমও দেখা করতে পারেনি, বাসবও পারেনি। এখন মাঝে মাঝে বাসব একটা অবলম্বনের কথা ভাবে। এতদিন ভাবেনি। মা-ভাই আছে। অবলম্বনের পক্ষে এরাই যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হঠাৎ অনিল বড়-লোক হওয়ায় সংসারের হাওয়া আস্তে আস্তে পালটে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল বাসবের উপস্থিতি এ সংসারে আর না থাকলেও চলে। মা ভাই ঠিক আগের মত হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়ায় না। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তার সাথে কেউ কথা বলে না। আভাসে বাসব শুনেছে, অনিল নাকি এ-বাড়ি ছেড়ে দেবে। এ-ঘরে নাকি মানুষ বাঁচতে পারে না। পুচকে ঘর, অন্ধকার ঠাসা। শুনে বাসব স্তম্ভিত হয়ে যায়। একটা কথা আছে না—দু দিনের বোস্টম ভাতকে বলে অন্ন। অনিলের সেই অবস্থা। এই ঘরেই তো বাবা আমাদের মানুষ করেছে। এই পুচকে ঘরে অন্ধকারে অনিল এতকাল বেঁচে ছিল, এখনও বেঁচে আছে। এত বছরের ঘর অনিল ছেড়ে দেবে? মার মত আছে? আশ্চর্য! এ বাড়ি ছাড়ার প্ল্যান কার বাসব না শুনলেও জানে। নতুন মেয়েটার। ভালো কথা চলে যাক। বাধা দেবে না বাসব। হাসিমুখে মেনে নেবে। কারও সুখের থালায় হাত দেবে না। বাড়িতে নিজেকে কেমন অপরিচিত মনে হয়। বাড়িতে চুপচাপ ঢোকে, চুপচাপ থাকে। অফিস থেকে মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি ফিরলে, আগে মা নিজে হাতে চা-জলখাবার দিত। মা দেওয়া বন্ধ করল। তারপর অনিলের বউ দিত। এখন বাড়ির ঝি দিয়ে যায়। বাসব সব

বুঝতে পারে। ...তে পারে এ বাড়ির কেউ তার উপর নির্ভর করে না। বাসব যা মাইনে পেত, তাতে মা-ভাইকে কোন দিন রাজার হালে রাখতে পারেনি ঠিকই; কিন্তু মরে তো ভারা যায়নি। অনেক দিন উপোস গেছে। আজকাল প্রায় রোজই বাড়িতে নানা রকম রান্না হয়। বাসবও খায়। সে বাড়ির বড়। বাড়ির বড় হয়ে সে কি এইটুকু আশা করতে পারে না—বাড়ির মানুষগুলো অন্তত একটু নির্ভর করুক। কত সামান্যতে মানুষকে সুখী করা যায়, বাড়ির মানুষ-গুলো ভাবে না। বাসব অবাক হয়ে যায়; যন্ত্রণায় মাথা টলে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে বাসব এসবের কিছু কোন দিন বলেনি। সে বড় লজ্জার ব্যাপার। অনিলের বউ এমন বড়লোকি দেমাকে থাকে, ফাটে থাকে—দেখলে গা জ্বালা করে। বেশরমের একশেষ। তুমি, আমার থেকে আমার ভাইকে বেশী চেনো। এখন বিয়ে করলে বাড়িতে টেঁকা যাবে না। ফিসফাস, গুজগাজ লেগেই থাকবে। এরা কেউ বাসবের বউকে সহজে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবে না। মা হয়ত করবে, কিন্তু অনিলের হিরোইন করবে না। আর অনিলই বা কি ভাববে! অভাবের ভিতর বাসব মানুষ হয়েছে. অভাব সহ্য করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু দীনতা সহ্য হবে না, মনের দীনতাকে বাসব সব থেকে ঘৃণা করে। আজকাল অনেকদিন পায়ে কড়ার ব্যথায় সময় মত বাসব অফিসে পেঁছোতে পারে না। কলিগরা ঠাট্টা করে 'দাদু' বলে। বিয়ে করলে ঢোল বাজিয়ে 'ঠাকুরদাদা' বলবে। ছিঃ ছিঃ। যন্ত্রণা হয়ত সহ্য হবে, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রুপ বাসব সহ্য করতে পারবে না। সহ্য হবে না বিয়েকে কেন্দ্র করে আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে কেউ সমালোচনা করুক। আরো নানান অসুবিধা আছে। বিয়ে বললেই হলো না। বাবারা এমন সময়ে ছিল না। এমন চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিছু জায়গা-জমি ছিল, গো ফের রেখা ধরল কি ধরল না, ব্যাস বিয়ে করে বসল। অল্প বয়সে বিয়ে করার অনেক সুবিধে আছে।

হঠাৎ বাসবের হাসি পেয়ে গেল। বেশ জোরেই হাসল। কুসুম বলল, 'এ কি হাসছ যে।'

আস্তে আস্তে বিকেল ফুরিয়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। একটু করে সন্ধ্যার ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। মাঠের গরুগুলো গোয়ালে যাচ্ছে। বাসব বলল, 'দারুণ লাগছে।'

'আরেকটু বসি।'

'জানো কুসুম, ভাবছি এখানেই থেকে যাই। আমাকে রাখবে? একদিন তো বলে-ছিলে, 'আমার কাছে তোমায় রেখে দেবো।'

'থাকবে না। কেন এ-সব বলে কষ্ট দিচ্ছ।'

'সত্যি বলছি, সংসারে আমার এখন কোন রোল নেই।'

কুসুম আস্তে করে বাসবের হাত ধরল। কুসুমের হাত ভেজা। তার গলা কাঁপছিল। নীচু স্বরে বলল, 'সত্যি তুমি আমার কাছে থাকবে?'

বাসব হেসে বলল, 'বাঃ কেন? ভয় করছে?'

'না ভয় না; ভাবছি—' কুসুম কথা শেষ করতে পারল না। বাসবের হাতটা আরো জোরে চেপে ধরল।

আকাশে সন্ধ্যে উঠছে। দু-একটা জোনাকি বেরিয়েছে। হালকা হাওয়ার ভিতর মিহি কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে।

কুসুম বলল, 'তুমি হয়ত হাসবে, ভাববে ছেলেমানুষ। কিন্তু সত্যি আমি মনে মনে তোমার পথ চেয়ে থাকতাম।

'সত্যি ভালো লাগছে না কুসুম।'

'আমারও তাই। মা দাদা তো তোমার সব জানে। তারা রাজি হবে। তুমি তাড়া-তাড়ি একটা ব্যবস্থা করো। আমার মাথার চুল পাকতে বেশী সময় নেই। আর কবে সংসার করব?' বলে কুসুম একটু হাসল।

দূরে রাস্তার ধারে এক নারকোল গাছের মাথায় সন্ধ্যা জেগেছে। একদলা পাতলা আলো নারকোল পাতার চেরা ঝোপে জ্বলছে। বাসব কুসুমের হাতটা নিজের বুকে তুলে চেপে ধরে বলল, 'আমার বরাতে সুখ সহ্য হয় না।'

কুসুম চোখ বুজে বলল, 'সহ্য হবে।'

শীত শীত লাগছিল। দুজনে উঠে পড়ল। চারপাশে কুয়াশা আর চাঁদের আবছা আবছা আলো মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। এবড়ো খেবড়ো মাঠ দিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগল। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে বেরিয়েছে। কুয়াশার ভিতর জোনাকি নৌকোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে আচমকা বাসবের মাথা ঘুরে গেল। যন্ত্রণায় বুকের হাড় পর্যন্ত গুঁড়ো হয়ে ... লাগল। ধু-ধু নির্জন অন্ধকার কুয়াশার মাঠের মধিখানে বাসব অন্ধের মত কুসুমকে জড়িয়ে ধরল, তারপর কাঁধে মুখ রাখল। কেন যেন মনে হলো, যদি দুপুরের সেই ভিখারিটা এসে থাকে? বিকলাঙ্গ হাত বার করে কাঁপতে কাঁপতে ভিক্ষে চায়। বাসব যদি নিজেকে ভিখারিটার সঙ্গে তুলনা করে বসে অজান্তে। কুসুমকে জড়িয়ে বাসব যন্ত্রণায় কাঁপতে লাগল।

ফেরার পথে বাসব কথা বলতে পারছিল না। ঘুম আসছিল। হাঁটতে পারছিল না। বাসব পাশের ঘর থেকে কুসুমের ঘরে গেল। আস্তে করে মশারি তুলল, কুসুমকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। কুসুম বুকে একটা হাত রেখে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। সারা বালিশে কুসুমের কালো চুলের রাশ ছড়িয়ে আছে। বাসব অনেকক্ষণ কুসুমের ঘুমন্ত মুখ দেখল, এমন গভীরভাবে সে কখনও দেখেনি। বাসব কুসুমের মাথার চুলের ঘ্রাণ নিল, তার পর নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

পথের শেষ কোথায়

আবু সয়ীদ আইয়ুব

॥ ৩ ॥

বিপদের ঘনায়মান ছায়া

'মানসী'-তে যেমন নারীপ্রেম ও মানব প্রেম অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, 'চিত্রা' কাব্যে তেমনি 'জীবন দেবতা' প্রত্যয়ের স্থান বিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য সাধনায় ও জীবনচর্যায় উৎকর্ষের যে আসংজ্ঞাত প্রেরণা অনুভব করতেন তাকেই তাঁর 'জীবন দেবতা' আখ্যা দিয়েছেন। জীবন-দেবতা কখনো নারীরূপে কখনো পুরুষ-রূপে কল্পিত। জীবন দেবতা কি সমস্ত বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথকে পরমোৎকর্ষ বা ঈশ্বর পর্যন্ত পেঁৗছিয়ে দিতে পারবেন? সে-কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে 'সোনার তরী'-র শেষ এবং সবচেয়ে সুন্দর কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য়।

'সোনার তরী' 'চিত্রা' ও 'কল্পনা' কাব্যের তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতা যথাক্রমে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'সন্ধ্যা' ও 'দুঃসময়'—বলাবাহুল্য আমার রুচিতে ও বিচারে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ও 'দুঃসময়' তুলনীয় এবং প্রতি-তুলনীয়। দুটি কবিতার কাল ঘনায়মান সন্ধ্যা ও আসন্ন রাত্রি, দুটিতে অকূল সাগরে পাড়ি দেবার কথা বলা হয়েছে; প্রথমটিতে কবি চলেছেন তরীতে, দ্বিতীয়টিতে কবি তাদাত্ম্যবোধ করছেন সেই সব সাগরপারে উড়ে যাওয়ার মতো সক্ষম ডানাওয়ালা পাখীর সঙ্গে যারা এককূল ছেড়ে ওকূলে আশ্রয় খোঁজে। তবে দুটি কবিতার অনুভূতি ও মনোপ্রতিন্যাস ভিন্ন। প্রথমটিতে আশঙ্কা প্রবল কিন্তু আশঙ্কা বিধৃত রয়েছে আশার মধ্যে, এবং সে আশা অত্যন্ত ক্ষীণ নয়। দ্বিতীয়টিতে নৈরাশ্য গভীর ও দুর্ভেদ্য, তবু এতোটা দুর্ভেদ্য নয় যাকে আতঙ্ক বলা যায়। দুটিতেই ভাবী স্বর্ণযুগের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু খুব বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়নি সে-দিকে; বরঞ্চ আমার মনে হয় দুটিতেই কবি পেঁৗছতে চান সেই মানবভাগ্যবিধাতার কাছাকাছি যিনি সকল স্বর্গের ও স্বর্ণ-যুগের অঙ্গীকারস্বরূপ।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য় কবি চলেছেন একা সোনার তরীতে বসে। হাল ধরে অবশ্য সামনেই রয়েছেন তাঁর জীবনদেবতা। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ আমি সোনার তরীর কর্ণধারকে মানসসুন্দরী (Muse) বলেছিলাম। এখন আট বছর পরে আবার ঐ কবিতা বিষয়ে কিছু লিখতে গিয়ে মনে হল জীবন দেবতাকেই কর্ণধাররূপে কল্পনা করলে কবিতাটির ভাবসঙ্গতি আরো স্পষ্ট হয়, ভাবচ্ছবিগুলি আরো সুবিন্যস্ত হয়। তাঁর জীবনদেবতা কি নৌকোর হাল ধরে কবিকে পেঁৗছিয়ে দেবেন ঈশ্বরের কূলে?

'চিত্রা'-র অনেক কবিতাতে জীবন-দেবতার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ; বলে ভরসা পেয়েছেন, বল পেয়েছেন জীবন-রচনায় ও কাব্যরচনায়। তাঁর সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কবিতা 'সন্ধ্যা'য় ভাবমণ্ডল থেকে ঐ প্রত্যয়টি লক্ষণীয় ভাবে অপসৃত। তাই সেখানে বিষাদের ছায়া অত্যন্ত ঘন। তবে কবিতাটি উত্তমপুরুষে লেখা নয়, এই সুগভীর ক্লান্ত বিষাদের অনুভূতি আরোপিত হয়েছে মা বসুন্ধরার বক্ষে।

কিন্তু এ-কবিতার বিস্তারিত আলোচনা আমি 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ করেছি; আরো কিছু যোগ করব এই প্রবন্ধের 'সন্ধ্যা ও রাত্রি'-উপশীর্ষক প্রত্যংশে।

ঈশ্বরের ব্যাকুল সন্ধান 'মানসী' কাব্য থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তবে সে-ব্যাকুলতা স্পষ্ট ভাষা পেয়েছে 'চিত্রা'-র 'জ্যোৎস্না-রাত্রে' শীর্ষক কবিতায়—

..............................আমি যে কাতর
অনন্ত ক্ষুধায়, আমি নিত্যনিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা-লাগি, বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত-যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা।

অর্ঘ্যভার ক্রমে উঠেছে কিন্তু দেবতা তখনো অজ্ঞাত, অনুপলব্ধ। কার চরণে তিনি নিবেদন করবেন এই অর্ঘ্য?

ইতিপূর্বে 'মনের মাধুরী মিশায়ে' প্রেয়সীর মানস-প্রতিমা বা ideal image গড়বার কথা আলোচনা করেছি। 'কাল্পনিক' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করেছিলেন এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে রক্তমাংসে গড়া এমন মেয়েকে যে ঐ "মম-শূন্যগগনবিহারী" প্রতিমার সমুপযুক্ত আধার হতে পারে। সে সন্ধান তাঁর ব্যর্থ হয়েছিল। উদ্ধৃত পংক্তি-গুলিতে তিনি সন্ধান করছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

বা বিশ্বোত্তীর্ণ পরলোকে এমন কোনো সত্তার যা তাঁর আপন হৃদয় ভেঙে মনের বাসনা ও মাধুরী মিশিয়ে গড়া মানস-প্রতিমার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যাবে। এই সন্ধানও কি ব্যর্থ হবে? এই সন্ধানের সাময়িক সাফল্যের আনন্দ এবং অন্তিম ব্যর্থতাবোধের বেদনাই আমার প্রবন্ধের মৌলিক প্রসঙ্গ।

প্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ খুব বন্ধুর নয়, খুব বেশি দীর্ঘও নয়। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে কিংবা মানবসমাজের মধ্যে পরম প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতিকৃতি আবিষ্কার করা মোটেই সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা সে সন্দেহও জাগে মনে। কারণ সেখানে বহু লোকের ঘৃণ্য পাপের এবং দুঃসহ যন্ত্রণার অস্তিত্ব ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছবার পথকে অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল করে রেখেছে। ঈশ্বর-প্রেমিক কবি নিজের দুঃখকে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করতে পারেন; যতই বাথা বাজুক বুকে, ভাবতে পারেন দুঃখের অনলেই জ্বলবে তাঁর মঙ্গল-আলোক। কিন্তু যে-বিধবার একমাত্র তরুণ পুত্র রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছে অথচ কোনোরূপ চিকিৎসা করাবার সঙ্গতিও নেই যার, তার কাছে গিয়ে ঐ সব ললিত বাক্য উচ্চারণ করা একটু নিষ্ঠুর শোনাবে না কি?

স্বকীয় ঈশ্বর-ভাবনায় পরের দুঃখের চ্যালেঞ্জকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করেছেন—ভাবের সামঞ্জস্যের মধ্যে নয়, কর্মের আহ্বানের মধ্যে :

"এর ('এবার ফিরাও মোরে' রচনার) পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।...এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।...

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে-শান্তিময় মাধুর্য—আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।" *

অনুরূপ ভাব রবীন্দ্রনাথ বার বার প্রকাশ করেছেন গদ্যে ও পদ্যে। উদাহরণত :

দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরি ফেলি পরি বর্ম;
সেথায় নির্মম কর্ম;

'নির্মম' বিশেষণটা লক্ষণীয়।

কিন্তু ধ্যানের চোখে কি দুঃখ ও পাপের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না? বিশ্বজাগতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কি মানব-সমাজের কোনো স্থান নেই? সামঞ্জস্য কি একেবারে অসাধ্য, নাকি শুধু অত্যন্ত কঠিন? অত্যন্ত কঠিন বলে কি জগতের এই বিরাট (পরিমাণগত নয়, গুণগত বিরাট) অংশটাকে কবি ধামা-চাপা দিয়ে রাখবেন, অথবা কাঁচি চালিয়ে ছাটাই করে ফেলবেন?

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ
কেমনে দিই ফাঁকি,
আধেক ধরা পড়েছি গো
আধেক আছে বাকি।

ফাঁদ কি সত্যিই বিশ্বজুড়ে পাতা আছে, আমি যে ধরা পড়ছি না সেটা আমারই হৃদয়ের বা দৃষ্টির অনবধানী অনাগ্রহবশতঃ? নাকি বিশ্বের একটি প্রধান অংশে, আমাদের পক্ষে প্রধানতম অংশে, ফাঁদ আদৌ পেতে রাখেন নি ভগবান; মানবসমাজে দুঃখ ও পাপের 'অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ' কি জাগতিক সৌন্দর্যের চিত্রে তথা ঈশ্বরের প্রেম-কল্যাণময় মূর্তিতে একটা বিরাট কলঙ্ক-স্বরূপ নয়? রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা এবং মানবদরদ যে ঐ সময়ে কতখানি তীব্র ছিল তার অত্যন্ত জোরালো প্রকাশ, এবং অসাধারণ সার্থক প্রকাশ, 'কল্পনা'র অব্যবহিত পূর্বকর্তী কাব্য 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'সন্ধ্যা'-তে—যথাক্রমে।

'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিষাদের সবচেয়ে ঘনীভূত রূপ আমরা দেখি 'দুঃসময়' কবিতাটিতে। দুঃসময় বললে মনে হয় যে সুসময় ছিল; যে কোনো কারণে হোক সেটা কেটে গিয়ে দুঃসময় নেমে আসছে 'মন্দ মন্থরে' তারো অবসান হবে, সুখের দিন আবার আসবে মানবভাগ্যে। কি ব্যক্তির জীবনে, কী মনুষ্যজাতির ইতিবৃত্তে এমন ঋতুরঙ্গ-সুলভ চক্রগতির কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক, বলা প্রত্যাশিত। বলেছেনও একাধিকবার। কিন্তু এই কবিতাটিতে তার চেয়ে বেশি বলতে চাইছেন।

দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মূল্যবান কিছু হারানোর বেদনা অপেক্ষা অশুভ কিছু যে আসন্নপ্রায় তারই মহা-আশংকা স্পষ্টতর রূপ পেয়েছে এই কবিতায়; কবিও যেন চরাচরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেই আশংকা 'জপিছে মৌন মন্তরে'। কবিতাটি মন্ত্রোচ্চারণধর্মী। কারো কারো মতে শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই তাই।

*'কল্পনা' পৃঃ ১২৫, শ্রাবণ ১৩৫৬ সংস্করণ।

'সঙ্গীত' বলতে এখানে মানবজগতের কোলাহল এবং হাহাকার বোঝাতে চাইছেন না রবীন্দ্রনাথ, চাইতে পারেন না। গালিব অবশ্য দুঃখের হাহাকারকেও সঙ্গীত রূপে ভাবতে পেরেছিলেন ঃ "দুঃখের রাগ-রাগিণীর মূল্যও বুঝতে শেখো, হৃদয় আমার,/অস্তিত্বের এই বিচিত্র বাঁশিটি একদিন একেবারে নিঃশব্দ হ'য়ে যাবে।" সম্ভবত এ সঙ্গীতের অর্থ বিশ্বজাগতিক সঙ্গীত (music of the spheres)। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল কোন্ অপদেবতার ইঙ্গিতে? না, থেমে ঠিক যায়নি, তবে তাতে কবি আর তৃপ্তি বোধ করছেন না, মনোযোগ দিতে পারছেন না। "গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া"র অর্থ কি এই যে সেই অপূর্ণ সঙ্গীত একটি পূর্ণতর সঙ্গীতের ইঙ্গিতে পরিণত হয়েছে? হয়তো বা কবির মনে সন্দেহ জাগছে যে বিশ্বসঙ্গীত এখনো রচিত হয়নি, কেবল একটি গর্জন শোনা যাচ্ছে—"এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে",—জগৎবাসীরা "নিঃশ্বাস-বায়ু সম্বরি/স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে"। সকলের যখন একই দশা তখন আবার বিরলে কেন? ঐ শব্দটা কি অনভ্যুদিত ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষমান জগতের বেদনা ব্যক্ত করছে?

"দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা" বলা হয়েছে বটে প্রথম স্তবকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একেবারে ঢাকা নয়, অথবা অবগুণ্ঠনটি খুব পুরু নয়; ঊর্ধ্ব-আকাশে তারাগুলি দেখতে পাচ্ছে বিহঙ্গ, যদিও তাদের ইঙ্গিতময় ভাষা ঠিক বুঝতে পারছে না; "ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা"ও দূরদিগন্তে দৃশ্যমান। যেটুকু আলো অবশিষ্ট তাকে অগ্রাহ্য করে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে পূর্ব দিগন্তে; আকাশ ঊষা-দিশাহারা ব'লেই সমস্ত আশংকা ও আকুলতা, এমন-কি গভীর নৈরাশ্যও। তৎসত্ত্বেও নিজের কবিপুরুষকে বলছেন, এখনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লে চলবে না, "এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।" 'অন্ধ' কেন? যে-বিহঙ্গ ঊর্ধ্বে তারাভরা আকাশ, বাঁকা চাঁদ, এবং নিম্নে "গভীর অধীর মরণ"-এর ধাবমান তরঙ্গের পর তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছে সে তো "অন্ধ" নয়।

"অন্ধ-"-এর অর্থ কি তবে এই যে মোরুসীসূত্রে পাওয়া পশুসুলভ অন্ধ-প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্যদেহমনকে এখনও আঁকড়ে রয়েছে, আমরা তা ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি বেশি দূরে? দ্বিতীয়ত, জাগতিক নিয়মকে ন্যায়ের রাজ্য বলা যায় না এখনো। কোনো দিনই বলা যাবে না হয়তো, কারণ নিয়মের রাজ্য (natural order) এবং নীতির রাজ্য (moral order) ভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার, পরস্পরবিরোধী না-হলেও পরস্পরনিরপেক্ষ। বরণ্চ বলা উচিত যে বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক সাধনার ফলে নিয়মের রাজ্য যতই আমাদের চোখের সামনে উন্মাটিত হচ্ছে এবং পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করছে, আমরা ততই নীতির রাজ্যের প্রকাশ দেখতে না পেয়ে ক্লিষ্ট হচ্ছি, হতাশায় ভেঙে পড়ছি।

কবিতাটি আরম্ভ হচ্ছে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে। কিন্তু সন্ধ্যা তো একটি দিনের সমাপ্তি, তার পূর্বে অনেক-গুলি প্রহর কেটে গেছে—ঊষা, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন। বিহঙ্গটি নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী ঊষার আলো দেখে পাখা মেলে

আকাশে উড়তে শুরু করেছিল, এবং প্রহরের পর প্রহরে দিবালোকে অনেক কিছু দেখেছে সে। তার কোনো মূল্যবোধ বা তাকে হারানোর বেদনা পাই না কবিতাটিতে। কেন? কবি-বিহঙ্গের বিগত দিনের ওড়া অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্লান্তিই এনেছে; সে শুধু নিয়মের রাজ্যই দেখতে পেয়েছে, নীতির রাজ্য দেখতে পায়নি। তাই তো সে "এখনো অন্ধ"। নিয়মের এবং নীতির রাজ্য পাশাপাশি উপলব্ধ হলে তাকেই ঈশ্বরোপলব্ধি বলা যায়। এই উপলব্ধি যখন হবে তখনই তার অন্ধতা ঘুচবে।

ঊষা থেকে বিকাল পর্যন্ত বিহঙ্গ যে-দিন পেরিয়ে এল সেটা ছিল জ্ঞানের যুগ। তার স্বাশ্রয়ী (intrinsic) মূল্য এবং বিশুদ্ধ আনন্দময়তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করছেন না। তবে হতাশ বোধ করছেন জ্ঞানের সঙ্গে সার্বিক কল্যাণের অতি অপূর্ণ অন্বয় দেখে। সমন্বয় পূর্ণ হবে যে-ঊষায় তারই পানে চেয়ে আছেন সব ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে। অথচ তার ক্ষীণতম আভাস নেই দিগন্তের কোনো কোণে, ঊষা-দিশাহারা আকাশের ঘনীভূত তিমির যেন শ্বাসরোধ করছে তাঁর।

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কোনোদিন পূর্ণ হবে না, পরহিতৈষণাও সীমিতই থাকবে। জড়বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা মানবত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থরগতিতে উত্থানপতন বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আটকে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে। উপরের দিকে টানছে যে-শক্তি তাকে রবীন্দ্রনাথ পরে "মনের মানুষ" বা "চিরমানব" বলে অভিহিত করবেন। এই দেবতা সত্য, কেবল মনগড়া আদর্শ নন, কারণ টানটা সত্য। কিন্তু এই সত্য দেবতা সর্বশক্তিমান নন। সর্বশক্তিমান যিনি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি "বিশ্বজাগতিক দেবতা"—তিনি সংখ্যাতীত নীহারিকাখচিত সীমাহীন দেশকালকে বেঁধে রেখেছেন কঠিন নিয়মের জালে। সে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই শক্তির দেবতা নির্মম উদাসীন; তাঁকে শুভ বা অশুভ কিছুই বলা যায় না।

শক্তির সঙ্গে কল্যাণের যোগ বহির্বিশ্বে অখণ্ডিত নয়; মানবমনেও হয়ত পূর্ণ হবে না কোনো দিন। তবুও হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না "তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর/এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।" সার্ত্র বলেছেন, "man is a futile passion"। 'দুঃসময়' কি এই কথাটারই অপরূপ সুন্দর ও সার্থক ভাষান্তর? অবশ্য 'দুঃসময়' রচিত হওয়ার সাত বছর পরে সার্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে সার্ত্র-এর জীবনদর্শনে যে-সিনিকাল ভাব কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রকট তা রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, 'দুঃসময়'-এ নৈরাশ্য যতই গাঢ় হোক, একেবারে নিশ্ছিদ্র নয়, ঐকান্তিক নয়।

কী সে আশ্চর্য গতিবেগ যা মাত্র কয়েকটি প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রায় সমভাবে আকাশময় ছড়ানো আলো ও বিদ্যুৎকণাগুলির মধ্যে এমন এক মহা-আলোড়ন জাগিয়ে তুলল যার ফলে কোটি কোটি বায়বীয় নীহারিকার সৃষ্টি হল, বায়বীয় নীহারিকাগুলির অনেক কটি পরিণত হল লক্ষ লক্ষ তারকা-পুঞ্জে, অল্প কয়েকটি তারকার ছিটকানো অংশগুলি ঘুরতে লাগল গ্রহরূপে, তাদের মধ্যে অন্তত একটিতে এমন অত্যন্ত দুর্ঘট ও অসম্ভাব্য রাসায়নিক যোগাযোগ তবু ঘটে গেল যাতে এককোষী প্রাণীর বিকাশ সম্ভব হল। এককোষগুলির সমন্বয়ে বহুকোষী প্রাণীর জন্ম, অসংখ্য শাখায় প্রশাখায় তাদের বিবর্তনের গতি, প্রগতি, অধোগতি ও বিলোপের পর আজো যারা অবশিষ্ট—virus কণা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়া থেকে বৃহদাকার হস্তী, উষ্ট্র, হিপোপটেমস ও তিমি, সর্বোপরি আমাদের গর্বের এবং লজ্জার মনুষ্যজাতি—তাদের সংখ্যাও আজ গণনার অতীত। এরই মাঝখানে অভ্যুদিত (নাকি আবির্ভূত?) হল 'মন' নামক এক অত্যাশ্চর্য পদার্থ, যা দেহের সঙ্গে, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পৃক্ত হয়েও দেহের ব্যাপারমাত্র (function মাত্র) নয়; যা অন্তর্দর্শী, অনুধ্যানী (introspective), হিতাহিতবোধসম্পন্ন, বিজ্ঞানান্বেষী, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়াসী।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে,
ভ্রমি বিস্ময়ে।

জাগতিক অবক্ষয়ের বিপুল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ভাটার স্রোতোধারাকে যেন স্পর্ধাপূর্বক অগ্রাহ্য করে থার্মো-ডাইনামিক্স-এর বহুবিঘোষিত দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে উজান বেয়ে কোন্ শক্তিবেগে চলেছে প্রাণের বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তন? এ স্পর্ধা নিশ্চয়ই অনন্তকাল টিঁকবে না। প্রাণীলোকের ইতিবৃত্ত ভূত এবং ভাবী দুদিকেই অত্যন্ত দীর্ঘ, কিন্তু সান্ত। তারপরে? তারপরে কি ধ্বংস থেকে ধ্বংসে অর্থহীন চক্রগতি? যে-শক্তিবেগে প্রাণের এই ধৃষ্টতা, বের্গস তাকে আখ্যায়িত করেছেন "এলাঁ ভিতাল" নামে। যে-নামই দিই না কেন, এসব কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই; মাথা আপনিই নত হয়। ভগবদ্ভক্তিতে? কথাটা বেখাপ

লাগে।

'ভগবান' শব্দটা অবশ্য ধর্মে ও দর্শনে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্পিনোজা 'ভগবান' এবং 'ভগবৎপ্রেম' যে-অর্থে প্রয়োগ করেছেন তাতে বেখাপ লাগার কিছু নেই। কিন্তু ঠিক এই ঈশ্বরের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে, তাঁর উপলব্ধি ঘটেনি 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে। সে-ঈশ্বরের ভাবনা, এবং 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বরে ফিরে যাওয়ার কিংবা তাঁকে আপন সম্বন্ধতর হৃদয়মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার ব্যর্থ-প্রায় চেষ্টার বেদনা আমরা পাব শেষ পর্বের কাব্যে।

'চিত্রা'-র 'সন্ধ্যা' এবং 'কল্পনা'-র 'দুঃসময়'-এর পর যে-কবিতাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি 'খেয়া'-র 'দিনশেষ'। প্রসঙ্গত বলে রাখতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের সমূহ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'খেয়া' আমার মতে সবচেয়ে অমূল্য। এতগুলি অর্থঘন মর্মস্পর্শী কবিতা বোধ করি আর কোনো একখানা বইতে পাওয়া যাবে না। এই রত্নভাণ্ডারে 'শুভক্ষণ'—'আত্মত্যাগ'-ই সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন। তবে 'দিনশেষ'-ও অতীব সুন্দর কবিতা।

মধ্যবর্তী দুটি বই সম্পর্কে এখানে বিশেষ কিছু বলতে চাই না, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। 'দুঃসময়'-এর ক্লান্ত বিষাদ ও ঘনান্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণের পথ এ দুখানি কাব্যে নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের পথ নয়, এটা তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন। 'নৈবেদ্য' বড় বেশি পরাশ্রয়ী, উপনিষদভাবে ভাবিত এবং পিতৃদেবের দ্বারা প্রভাবিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে-"রাজার রাজা"-র, যে-সুন্দরের, যে-"পরাণসখা বন্ধু হে আমার"-এর সন্ধানে বেরিয়েছেন সে-সন্ধান তাঁকে নিজের মতন ক'রে একান্ত নিজস্ব পথ কেটে নিজেই করতে হবে।

'ক্ষণিকা'-তে যেন তিনি নিজেকে বলছেন: 'অভিলাষ' সম্বৃত করো, তোমার আশেপাশে কত নরনারীর ছোটো-বড়ো সুখদুঃখের কথা তোমার চোখে পড়ে, কানে পৌঁছয়, মর্মে বাজে। সেই সব কথার মূল্য কি কম? তাই কবিতাতে ফুটিয়ে তোলো; তোমার কবিসত্তা তাতেই সার্থক হবে। সার্থক হল, কিন্তু তৃপ্ত হল না: আরো পথ তাঁকে কাটতে হবে, বিক্ষত পায়ে আরো দীর্ঘ দুর্গম পথ হাঁটতে হবে।

হয়তো সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে তিনি পৌঁছবেন কোনো পান্থশালায়, কিছু আতিথ্য, কিছু বিশ্রাম পাবেন আশা করে। দিনশেষে পৌঁছলেন তিনি ঠিকই, কিন্তু

> ভাঙা অতিথশালা;
> ফাটা ভিতে অশথ বটে
> মেলেছে ডালপালা
> আমি যেদিন এলেম, সেদিন
> দীপ জ্বলে না ঘরে
> বহুদিনের শিখার কালি
> আঁকা ভিতের পরে।

অতএব কবি বিহঙ্গ যেমন পাখা বন্ধ করতে পারেন না, নিচে কোনো আশ্রয়শাখা নেই যেখানে তিনি নামতে পারেন, আছে শুধু মৃত্যুগর্জমান অকূল সমুদ্র; তেমনি কবি পথিকও কোথাও থামতে পারেন না:

> হায়রে বিজন দীর্ঘরাতি
> হায়রে ক্লান্ত কায়া।

বহু বৎসর পরে জীবনের শেষ লগ্নে সারাজীবন ধরে পথ চলার পর তিনি হতাশায় মুহ্যমান হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—বোধকরি শূন্য আকাশকেই প্রশ্ন করেছিলেন—"পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে"; শুনতে পেয়েছিলেন, শুধু নিজের বুকে নয়, সমগ্র মানবজাতির বুকে "ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার"; অথচ তখনো "সম্মুখে ঘন আঁধার"। তারপরে একটি আশ্চর্য পংক্তি: "পার আছে গো পার আছে"। মনে হয় কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে ভগ্ন ভরসার আভাস দিচ্ছেন, আমরা আশা করি তার পরে সংযুক্ত হবে "নিশ্চয়ই কোনো দেশে পার আছে"; কিন্তু সংযুক্ত হয় আবারও একটি প্রশ্ন "পার আছে কোন্ দেশে", যার উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই নাতিপ্রচ্ছন্ন—কোনো দেশেই পার নেই, কোনো দেশে কোনো কালে পথ শেষ হবে না। মনে মনে ভাবছেন—সারাটা জীবন মরীচিকার অন্বেষণ করেই কাটিয়ে দিলাম। অথচ তাঁর পরম অন্তিকটকে—'গীতাঞ্জলি' পর্বের প্রেম-করুণাঘন স্নেহসিক্ত ভগবানকে—তো চরম আনন্দেই তিনি পেয়েছিলেন একদিন। আজ কি তাঁকেও মায়া-মরীচিকা (অদ্বৈত-বাদীর ভাষায় "সর্বোচ্চ মায়া") বলে ঠাহর হচ্ছে? সম্ভবত। তাই তো আজ জীবনের শেষ প্রহরে "হালভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"। 'পথের শেষ কোথায়' নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার অন্যতম। বস্তুত পক্ষে এমন ক্লান্ত, নৈরাশ্যঘন, বেদনাভারাতুর ভাবনার এতখানি রসোত্তীর্ণ প্রকাশ আর কোনো কবির লেখায় আমি পাইনি।

শেক্সপীয়রের কথা আলাদা। "To-morrow, and tomorrow"* ম্যাকবেথের অন্তিম স্বগতোক্তির সবখানি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা বলা আবশ্যক যে নাটকীয় পরিস্থিতি-বিশেষে নায়কের তীব্র ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারিত ঐ জীবনভাবনার সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করা আদৌ অসম্ভব ছিল না নাট্যকারের পক্ষে, কারণ এলিয়ট যাকে বলেছেন "mixed and muddied thinking of the renaissance" শেক্সপীয়র ছিলেন তারই শেষ দিককার অভিব্যঞ্জক। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অতখানি অসম্বদ্ধ তিক্ত জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করা একেবারেই অসম্ভব। তাঁর পথক্লান্তি যতই দুর্বহ, বিষাদ যতই ঘন, নৈরাশ্য যতই মর্মান্তিক। নাস্তিক্য যতই বেদনার্ত হোক, তাঁর ভাব ও অনুভব ছিল অন্য তারে বাঁধা, তুলনায় অনেকখানি কোমল মৃদু স্বরে উচ্চারিত।

---

*"She should have died hereafter;
There would have been a time
for such a word.
To-morrow and to-morrow, and
to-morrow,
Creeps in this petty pace from
day to day,
To the last syllable of recorded
time;
And all our yesterdays have
lighted fools
The way to dusty death. Out,
out, brief candle!
Life's but a walking shadow,
a poor player
That struts and frets his hour
upon the stage
And then is heard no more:
it is a tale
Told by an idiot, full of sound
and fury,
Signifying nothing.

॥ সমাপ্ত ॥

সাহিত্য প্রসঙ্গ

গল্পের চেয়েও সত্যি

আজকাল 'সিক্রেট এজেন্ট' কথাটা আমাদের কানে আর নতুন লাগে না। একসময় লাগত। তখন জেমস বন্ড আমদানি হয়নি। বোধ হয় জেমস বন্ড আসার পর একে একে এতরকম মারাত্মক, সর্ববিদ্যাবিশারদ, দুর্ধর্ষ সিক্রেট এজেন্ট বাজারে এসে গেছে যে, আমরা প্রায়শই বইয়ের পাতায় তাঁদের সঙ্গ পাই। ট্রেনে, হোটেলে শীতে কিংবা বর্ষার দিনে বাড়িতে বসে সন্ধ্যে কাটাতে হলে এ ধরনের বই চমৎকার সঙ্গী হতে পারে। আমাদের এক বন্ধু আছেন যিনি স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি হলেই সিক্রেট এজেন্ট-এর শরণাপন্ন হন, কলহ-বচসার মধ্যে যান না। কোনো সন্দেহ নেই, এক প্যাকেট ভাল সিগারেটের মতন একজন সিক্রেট এজেন্ট রীতিমত উপভোগ্য।

তবে, আমরা বইয়ের পাতায় যা দেখি, যাতে কৌতূহল ও কৌতুক দুই-ই অনুভব করি—তার ষোলো আনাই কাল্পনিক এমন মনে করার কারণ নেই কোনো। একসময় আমারও মনে হত, এ সব গল্পের বইয়ে মানায়, সত্যি সত্যি কি আর বাস্তবে ঘটে? পরে একবার একটি বই পড়েছিলাম—গল্পের বই নয়—সেটি পড়ে আমার ধারণা পালটেছিল। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত রকম নতুন নতুন মারণাস্ত্র, জঙ্গী বিমান ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল তার চেয়েও বোধ হয় বেশী সৃষ্টি হয়েছিল গুপ্তচর বা বলা যাক অত্যন্ত গোপনীয় গোয়েন্দাচক্র। সিক্রেট এজেন্টকে আমরা এরই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। শত্রুপক্ষকে সব দিক দিয়েই কাবু করাই ছিল এদের কাজ, নরহত্যা থেকে শুরু করে যাবতীয় যা কিছু ক্ষতিকর সবই এদের দ্বারা করানো হত।

সম্প্রতি এইরকম এক মহিলা এজেন্টের কাহিনী পড়লাম, যিনি বইয়ের অনেক এজেন্টের মতন উত্তেজক চরিত্র নন, তবু এজেন্ট। এবং লেখিকা। এঁর নাম রোজঅ্যান পিট। জন্ম ফ্রান্সে। বাবা ছিলেন স্কচ, মা ছিলেন ফরাসী-রুশ-ইহুদী রক্তের উত্তরাধিকারী। বাবা একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। রোজঅ্যানের জীবনের প্রথম পর্বটা কাটে কায়রোতে। পরে মিলান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাসিক্স বিষয়ে পড়াশোনা করে গ্র্যাজুয়েট হন। তারপর চলে যান অক্সফোর্ডে আইন পড়তে। কিছু দিন আইন পড়ে চলে গেলেন প্যারি, ইচ্ছে মা-বাবার কাছে থাকবেন, অভিনয় সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন এবং অভিনয় শিখবেন। জার্মানরা প্যারি অবরোধ করার পর ফরাসীদের মধ্যে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠল। এই প্রতিরোধ বাহিনী ঠিক করল, তারা প্যারি শহরকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে দেবে না, জার্মানদের পদে পদে অপদস্থ করবে, তাদের মতলব বানচাল করে দেবে। এমন কি, নিজেরা কোনোরকমেই জার্মানদের আদেশমতন কোনো কাজও করবে না। জার্মানরাও ছাড়বার পাত্র নয়, ফরাসীদের মতলব বুঝে তারাও রাস্তা থেকে যখন তখন বাড়ি দেওয়ার মতন লোক তুলে নিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে রোজঅ্যানের মা আর ছোট বোন একদিন রাস্তা থেকে হারিয়ে গেল।

রোজঅ্যান পিট

রোজঅ্যানের বাবার এক পুরোনো বন্ধু ছিলেন ব্রিটিশ এজেন্ট। রোজঅ্যান তা জানতেন না। তিনি তখন জার্মান সৈন্যদের আনন্দ দেবার কাজে ব্যস্ত, কেননা জার্মান ভাষাটা চমৎকার জানা ছিল, অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন জার্মানীতে।

হিটলার ভেবেছিলেন, প্যারি শহরকে তাঁর সৈন্যদের জন্যে মজাদার করে রাখবেন। রোজঅ্যানকে প্রায়ই সৈন্যদের অফিসার মেসে যেতে হত। জার্মান সৈন্যরা নিজেদের রক্তের শুদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিল খুব কাজেই খাঁটি আর্য রক্তের নারী ছাড়া তারা অন্য মেয়েদের শয্যাসঙ্গিনী করত না। রোজঅ্যানকে বলা হয়েছিল, বোবাকালার অভিনয় করে যেতে। জার্মানরা তাকে নিতান্তই নির্বোধ মেয়ে বলে ভাবত। মুখের সামনেই সবরকম কথা বলত। আলোচনা করত। ব্রিটিশ এজেন্ট রোজঅ্যানকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, জার্মানরা যা বলবে সব কথা শুনতে ও মনে রাখতে। ভুল করেও যেন কখনো কিছু না লেখে।

প্যারি থেকে রোজঅ্যানকে ইটালীতে পাচার করা হয়। ওর বোন এক ইটালীয়ান ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিল। তার পাসপোর্ট ছিল। সেই ভুয়ো পাসপোর্টকে কাজে লাগিয়ে রোজঅ্যানকে পাঠানো হল ইটালী। সেখানে স্থাপত্যবিদ্যার গবেষণা করছেন এই পরিচয়ে তাঁকে খবরাখবর সংগ্রহের কাজ করতে হত। রোবার্টো নামের এক ইটালীয়ান অফিসারের প্রেমে পড়েও রোজঅ্যান তাকে বিয়ে করতে পারলেন না, কেননা বিবাহিতা হিসেবেই তাকে অভিনয় করতে হত।

মিত্রপক্ষ যখন সিসিলি আক্রমণ করল, তার সাত দিন আগে হুকুম এল রোজঅ্যানকে নার্সের পরিচয় নিয়ে সিসিলিতে যেতে হবে। সাত দিন আগে তাঁকে প্যারাশুটে করে সিসিলিতে ফেলে দেওয়া হল। রোবার্টো তখন তার ইউনিট নিয়ে সিসিলিতে। ব্রিটিশরা সিসিলিতে এসে নামলে রোজঅ্যান তাদের রোবার্টোর কাছে নিয়ে গেলেন। রোবার্টো এবং তার ইউনিটকে ব্রিটিশরা বন্দী করল। দেখা গেল, ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স রোজঅ্যানের সব কথাই জানে। ব্রিটিশরা যখন ইটালীতে নামল, রোজঅ্যানের ছদ্মপরিচয় হল ওয়েলফেয়ার অফিসার।

যুদ্ধ থামার পর রোজঅ্যান মারশাল প্ল্যানের সঙ্গে যুক্ত চেস ন্যাশনাল ব্যাংকে কাজ পেলেন। এলেন রোমে। সেখানে আবার রোবার্টোকে দেখতে পেলেন। বিয়ে করলেন রোবার্টোকে। কিন্তু রোবার্টো পরিবার জানতে পারল উনি ব্রিটিশ স্পাই। ইটালী সরকার তাঁকে দেশে থাকতে দিল না। অগত্যা রোজঅ্যানকে দেশে ফিরতে হল। রোবার্টোও এলেন ইংল্যান্ডে। আইন ব্যবসা করতে। সফল হল না। বিবাহ-বিচ্ছেদও ঘটল। এর অনেক আগে রোজঅ্যান একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিলেন।

রোজঅ্যান গোটা পনেরো বই লিখেছেন। তার মধ্যে ইতিহাস আছে, রাজনীতি আছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনীও আছে। তাঁর শেষ বই 'অপারেশান ডবল লাইফ'। সরকারী নিষেধ (O S act) বলে সব কথা বলা যায় না বলে অনেক কিছুই রোজঅ্যান বলতে পারেননি।

অভিনন্দ

॥ ৮ ॥

সশব্দ খড়মের মালিক এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

তেল-চকচকে পাকা সোনালী বাঁশের মতো মেদমুক্ত ঋজু দেহ। সাধারণ বাঙালীর থেকে সামান্য ছোট চেহারা বলা যেতে পারে। দিন-তিনেকের সাদা-পাকা দাড়ি মুখের সর্বত্র ক্ষৌরকর্মের অপেক্ষায় রয়েছে। নাকটা একটু চাপা, ওপরের ঠোঁটের তুলনায় নিচের ঠোঁট একটু বেরিয়ে এলেও বেশ প্রসন্ন স্নিগ্ধ চেহারা।

অনেকদিনের পুরনো একটা সরু ফ্রেমের গোল্ড-প্লেটেড পাকানো চশমা পরেছেন ভদ্রলোক। সেই চশমার দুটো বাই-ফোকাল নীলাভ কাঁচের মধ্য দিয়ে খড়মের মালিক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমার দৃষ্টি কোন্ সময়ে ওঁর মাথার দিকে চলে গিয়েছে নিজেই খেয়াল করিনি। সৌজন্য বিনিময়ের জন্যে তৈরি হচ্ছি, কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় প্রশ্নবাণ ছুড়লেন, "মাথার দিকে তাকিয়ে দেখছেন কী! চুল একদিন আমারও ছিল—আপনার মতোই একখানা সুন্দরবনের জঙ্গল মাথায় বয়ে বেড়াতাম। নাপিতরা কাঁচি ধরবার আগে ডবল পয়সা চাইতো। কিন্তু এই ঠাকুরে ম্যানসনে এসে সব চুল গিয়েছে। যে কটি অবশিষ্ট আছে তাও এবার যাবে।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিলাম। যেখানে-সেখানে হেসে ফেলে এর আগে আমি বেশ কিছু শত্রু তৈরি করেছি।

আমি ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে চিঠি বার করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, "আসুন, আসুন—অত তাড়াহুড়ির কী আছে? পেটের ছেলে তো পড়ে যাচ্ছে না! আগে একটু পুজোর প্রসাদ এবং ঠাকুরের চরণামৃত নিন।"

ভদ্রলোকের হাতের বারকোশটা এবার ভালভাবে নজরে পড়লো। ডান হাতে সামান্য চরণামৃত ঢেলে দিলেন ভদ্রলোক। সাবধানে কপালে ঠেকিয়ে গঙ্গোদক সেবন করে নিলাম। তারপর ভক্তিভরে কয়েক টুকরো কলা ও পেয়ারার কুচি প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

ভদ্রলোক এবার ব্যস্তভাবে বিদায় নেবার আগে বললেন, "একটু বসুন—আমি তেলকালি বিশ্বাসকে একটু পেসাদ খাইয়ে আসি। কয়েকবার ঘুর-ঘুর করে গিয়েছে। খেস্টান মানুষ—মায়ের পা-ধোয়া জলটা ওকে দিই না, কিন্তু পেসাদ পেতে খুব ভালবাসে। না-দিলে বরং রেগে যায়।"

ব্যাপারটায় আমি বেশ মজা অনুভব করছি। ভদ্রলোক আমার মনোভাব অনুমোদন করলেন না। বললেন, "তেল-কালিও অধার্মিক নয়। ডিসেম্বর মাসে ওদের দুর্গাপুজোর সময় মস্ত বড় কেক প্রসাদ খাওয়ায়।"

ডিসেম্বরে আবার দুর্গাপুজো কোথায়! "আপনি ক্রিস্টমাসের কথা বলছেন?" আমি নিঃসংশয় হবার জন্যে জিজ্ঞেস করি।

কোনোরকম বিচলিত না হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ওই হলো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। ডিসেম্বর মাসেই ওদের বড় পুজো—তেলকালি বিশ্বাস নতুন জামা-কাপড় কেনে, ওই সময় খুব ভক্তিভরে পুজো আচ্চা করে, আমাদের জন্যে কেক পেসাদ আনে।"

তেলকালির সন্ধানে বারকোশ হাতে ভদ্রলোক এবার বিদায় নিলেন। আমি ওঁর ধুতিপরা দেহের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

মিনিট পনেরো পরে সরকার মশায় ফিরে এলেন। এবার খড়মের খট-খট শব্দ নেই। সরকার মশাই এখন কাল ক্যাম্বিসের নিউকাট রাবারসোল জুতো পরেছেন, গায়ে চড়িয়েছেন হাফসার্ট। প্রসাদের বারকোশও ইতিমধ্যে যথাস্থানে রেখে এসেছেন।

"ভেরি স্যরি, অনেক লেট করে ফেললাম," এই বলতে-বলতে ভদ্রলোক এবার আমার মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

আমার নাম বললাম তাঁকে। নাম শুনে সরকার মশায় নমস্কার করে বলেন, "ভোলা শংকর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। আপনার কীসের চিন্তা?"

আমি এবার পকেট থেকে খামখানা বার করবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। সরকার মশায় তখনও খুব কাছে সরে এসে আমার

মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছেন। আমাকে অপ্রস্তুত হতে দেখেও তাঁর খেয়াল নেই।

ভদ্রলোক যে এতোক্ষণ আমার মুখচন্দ্রে তিল সন্ধান করছেন তা বুঝতে পারলাম। বেশ অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নিশ্চয় কোনো দুঃখ নেই।"

প্রথম পরিচয়েই সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ তোলার কোনো মানে হয় না। তাই কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে হাসলাম। চশমার মধ্য দিয়ে ভদ্রলোক আর একবার তিলের খোঁজ করলেন। তারপর বললেন, "ললাটের দক্ষিণ পাশে নাকের ওপর তিলটি নতুন না পুরনো?"

তিলতত্ত্ব নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। ভদ্রলোক বকুনি লাগালেন, "অবহেলার জিনিস নয়, মশায়। তিল থেকেই তাল হয়! যথাস্থানে ছোট ওই ফুলস্টপের দাম কত জানেন?"

আমি তখনও চুপ করে বসে আছি। সরকার মশায় ঘোষণা করলেন, "আপনি ভাগ্যবান লোক। আপনার দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।"

তিলতাত্ত্বিকের ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই মুহূর্তে মনে-মনে হেসেছিলাম। ফুটপাথের টাইপিস্টের যশোলাভ সম্ভাবনা থাকবে না তো কার থাকবে!

সরকার মশায় বললেন, "আপনারা আধুনিক শিক্ষিত—হয়তো এ সব বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আমারও একটা তিল আছে। কোথায় বলুন তো?"

মুখটা এগিয়ে দিয়ে ওঁর মুখের তিল খুঁজতে আমাকে বাধ্য করলেন। অবশেষে তিল খুঁজে পেলাম। সরকার মশায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়?"

"ভ্রু-এর নিচে মনে হচ্ছে।"

"নজর আপনার ভালই" সার্টিফিকেট দিলেন সরকার মশায়। "ভ্রু-নিম্নস্থ তিলের অর্থ কী জানেন?"

আমি কোত্থেকে জানবো? এসব ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। সরকার মশায় বললেন, "আজন্ম দুঃখের শীলমোহর ওই তিলটা।" এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন তিনি।

আমি এইবার পকেটের চিঠিটা বার করলাম। বিলাসিনী দেবীর এই নির্দেশ-নামা তাঁর হাতে তুলে দেবারই নির্দেশ পেয়েছিলাম। এই চিঠিতে পত্রবাহকের কিছু পরিচয় আছে এবং তারপর লেখা আছে *'উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট'* পত্রবাহককে ম্যানসনের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে। নতুন ম্যানেজারকে সব রকম সহযোগিতা দেবারও অনুরোধ জানানো হয়েছে সরকার মশায়কে।

গত রাত্রে টেলিফোনে যে আগাম খবর এসেছিল, তার সঙ্গে এই চিঠির বোধহয় পুরোপুরি মিল হচ্ছে না। মুখের খবর থেকে বরদাপ্রসন্ন হালদার হয়তো আন্দাজ করেছিলেন, আরও একজন কালেকশন সরকারকে এই ম্যানসনে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সম্পত্তির সর্বময় কর্ত্রীর দস্তখত থেকে সোজাসুজি জানা যাচ্ছে, আমিই এখন থেকে এই ম্যানসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবো।

চিঠি পড়তে-পড়তেই বরদাবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে আমাকে নমস্কার জানালেন। তাঁর মনের অবস্থা কীরকম হচ্ছে তাও আন্দাজ করতে পারছি না। উড়ে এসে ঘাড়ের ওপর জুড়ে বসবার জন্যে তিনি যে আমার ওপর বিরক্ত হবেন এমন একটা আশংকা করছি। হাজার হোক, এতোদিন তিনিই এ-বাড়ির হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন।

বরদাপ্রসন্নর মুখ কিন্তু একটুও অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো না।

বললেন, "আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো এবার। ছাগল দিয়ে এরা এতোদিন ধান মাড়াচ্ছিলেন। আমি অর্ডিনারি কালেকশন সরকার লেখাপড়া তেমন নেই আমার। আমি এই ম্যানসনের চাকরিতে হিমসিম খাচ্ছি, আর সুযোগ পেলেই মা-ঠাকরুনের কাছে দরবার করছি—একটা বিহিত করুন।"

বরদাবাবু এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে জোর করে বসালাম। বললাম, "আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। আপনি বসুন।"

আমার কথায় বরদাপ্রসন্ন হালদার সন্তুষ্ট হলেন বোধ হয়। তিনি চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "অনেক কথা আছে—সেসব বলতে-বলতে মহাভারত হয়ে যাবে। তার আগে আপনার থাকার একটা ব্যবস্থা করি। লাগেজগুলো তখন থেকে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে।"

থাকার ব্যাপারে আমি নিরুত্তর। এখানে কাজ করে অন্য কোথাও থাকবার মতো সংগতি আমার এখনও নেই। গণপতিবাবু সেই কথাটাই বিলাসিনী দেবীকে অন্যভাবে বুঝিয়ে এসেছেন। বলেছেন, "আমরা খুব লাকি—শংকরবাবু ওই বাড়িতেই থাকতে রাজী হয়েছেন। ঠাকুরে ম্যানসনের যা-অবস্থা তাতে ম্যানেজারের সর্বক্ষণ উপস্থিত আপনাদের খুবই কাজে লাগবে।"

বরদাবাবু বললেন, "যদি কিছু না মনে করেন, স্যার।"

বেকার অবস্থা থেকে সাকার হয়েই 'স্যার' কথাটা কানে যেন মধুবর্ষণ করলো। কিন্তু এই বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ ভদ্রলোকের মুখে স্যার শব্দটা শুনতে ভাল লাগছে না। বরদাবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "আপনার মনে যখন যা আসবে তা আমাকে নির্দ্বিধায় বলবেন—কখনও অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আর দয়া করে ওই স্যার কথাটা ব্যবহার করবেন না, বিশেষ করে আমার যখন একটা নাম রয়েছে।"

আমার কথাবার্তার ধরনে বরদাপ্রসন্ন হালদার খুশী হলেন। ধুতির খুঁটে টাকের ওপর জমে-ওঠা ঘামের বিন্দুগুলো মুছে ফেলে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "বেশ! এক ঢিলে দু'পাখি মারার ইচ্ছে হলে আপনার পৈত্রিক নাম ব্যবহার করবো—ভগবানের নামও হবে, আপিসের কাজও হবে। তবে মাঝে-মাঝে আপনাকে স্যার বলবো, যাতে সম্পর্কটা ভুল না যাই।"

এবার হাসতে হাসতে বরদাবাবু বললেন, "চলুন শংকরবাবু, আপনার থাকবার একটা ব্যবস্থা করা যাক।"

একবার বলতে গেলাম, ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে কর্মজীবনে ওই ছোট্ট নামটকু চালু করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এক আশ্চর্য ইংরেজ। এই বিরাট বিশ্বের চাবি

তিনিই আচমকা আমার জন্যে খলে দিয়ে কোথায় যে চিরতরে বিদায় নিলেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আমাকে এইভাবে পথে-পথে ঘুরতে হতো না।

বলতে গিয়েও কিন্তু এসব বলা হলো না। কি জানি, সামান্য সময়ের পরিচয়—আমার সুখ-দুঃখের কথা শোনবার মতো মানসিকতা এঁর নাও থাকতে পারে।

ঘরের একটা ব্যবস্থা হলো। বরদাবাবুকে বলতে গেলাম বাড়িতে ঢুকেই আপনাকে অসুবিধায় ফেলছি। বরদাবাবু হেসে উত্তর দিলেন, "অসুবিধে কী! ঠাকরে ম্যানসনের ম্যানেজারের একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই হবে না—এটা কি কথার কথা হলো।"

চারতলার এই ঘরখানা ছোট হলেও সুন্দর। ঘরের মধিখানে একখানা সিংগল সাইজ খাট দেখে আমি অবাক হলাম। বরদাবাবু বললেন, "খাট যখন রয়েছে, তখন আপনার কাজে লেগে যাবে।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। আমাকে আধঘণ্টা বিশ্রাম নেবার সময় দিয়ে বরদাবাবু কেটে পড়লেন।

বললেন, "আপনার ঘর-সংসার ছড়িয়ে বসুন, আমি দু-একটা কাজ ঝপ করে সেরে নিয়ে ফিরে আসছি।"

সিংগল খাটের ওপর আমার হোল্ড-অলের কম্বল ও চাদর বিছিয়ে দিলাম। বহু ব্যবহারে মলিন ও শিথিল বালিশখানা তার ওপর রেখে শরীরটা বিছানায় ছড়িয়ে দিলাম। নতুন এক আনন্দের অনুভূতিতে সমস্ত শরীর শির-শির করছে। এখন আমি আর তাহলে বেকার নই। অবশেষে আমার একটা চাকরি জুটেছে। যা-তা চাকরি নয়—দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ ইতিমধ্যেই আমাকে স্যার বলেছেন। এখন আমি নিরাশ্রয়ও নই। বিলিতি পাড়ার বিলিতী ম্যানসনে আমার নিজস্ব একটা ঘর জুটেছে। চারতলায় উঁচু এই ঘরের প্রশস্ত জানালা দিয়ে আমি সায়েবপাড়ার অনেকখানি দেখতে পাচ্ছি।

জামা খুলে পা-ছড়িয়ে আরও আরাম করবার আগে প্রয়োজনীয় কাজটা সেরে ফেললাম। মনে মনে ভাগ্যের দেবতাকে আবার স্মরণ করলাম। বললাম, "তোমার মনে এবার কী খেলা খেলবার ইচ্ছা আছে জানি না। তবু এই আনন্দের মুহূর্তে তোমাকেই নতমস্তকে প্রণাম করি।"

গণপতিবাবুর মুখটাও চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কলকাতায় কত রকমের কাজের সুযোগ রয়েছে তা গণপতিবাবু দয়া না-করলে জানবার সুযোগ পেতাম না। গণপতিবাবু কিন্তু একবার আমার সঙ্গে এই বাড়িতে এলেন না।

এখানে একটা আলাদা ঘরে আমাকে মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখলে তাঁর আনন্দই সবচেয়ে বেশী হতো। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি নিজেই বারবার বলে দিয়েছেন, "আমার সঙ্গে যে তোমার জানা-শোনা আছে তা যেন মোটেই চাউর না হয়।"

সায়েবপাড়ার রাজপথ দিয়ে এখন রীতিমত লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে। উঁচু তল্লার এই জানালা থেকে আমি নিচু তলার জীবন নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখতে পাচ্ছি। কয়েকজন পথচারীর উদ্দেশ্যহীন হাঁটার কায়দা থেকে মনে হচ্ছে, তারাও আমারই মতন কাজের সন্ধানে দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রবিবারের এই প্রসন্ন প্রভাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমার অকারণে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। আমার হাতে এই ভুবনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার থাকলে, আমি কাউকেও কর্মহীন ও নিরাশ্রয় রাখতাম না। পৃথিবীর পথে-পথে অনেক ঘুরে ঘুরে, অনেক অবহেলা-অপমানের বোঝা কুড়িয়ে আমি জেনেছি বেকারত্ব বিষের জ্বালা কী।

মধ্যদিনে ঘুমিয়ে পড়বার অভ্যাস নেই আমার। কিন্তু অনেক পথ হেঁটে অবশেষে একখানা মাথা গুঁজবার ঘর খুঁজে পেয়ে, আমার রণক্লান্ত দেহ এবার বিশ্রামবিলাসী হতে চাইছে। আমি হঠাৎ চোখ বুজে দেখছি, সনাতনের ক্যানটিনের ঘরে আমি রাতের পর রাত কাটিয়ে চলেছি। গণপতি সামন্ত দিনের পর দিন চেষ্টা করেও আমার কাজের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। হেস্টিংস স্ট্রীটের ইটালিয়ান টাইপিস্ট বটকৃষ্ণ বটব্যালও আমাকে আর কাজকর্ম দিতে পারছেন না। সনাতন অনেকদিন আমাকে হাসিমুখে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু সেও এবার বিপদে পড়েছে। ফোর্ডসন ইণ্ডিয়ার পুরনো দারোয়ান ছুটিতে দেশে গিয়েছে। নতুন যিনি হেড দারোয়ান হয়েছেন তাঁর সঙ্গে সনাতনের সম্পর্ক তেমন সুবিধের নয়। তিনি সোজাসুজি সনাতনকে জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যানটিনের জায়গা রাতে

অন্য কাউকে ভাড়া দেওয়া চলবে না। সনাতন যে আমাকে বিনামূল্যে আশ্রয় দিয়েছে তা এই দারোয়ানজী বিশ্বাস করতে মোটেই রাজী নন। এই দুঃসংবাদ সনাতন আমাকে সজল চোখে দিচ্ছে। বলছে, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম স্যার। কিন্তু কিছুতেই দারোয়ানজীকে রাজী করাতে পারলাম না। কালকের মধ্যে ঘর খালি না-করলে প্রপার্টি ম্যানেজার জি কে বাসুর কাছে লিখিত রিপোর্ট করবে।"

সনাতনকে কী উত্তর দেবো বুঝতে পারছি না। সমস্ত শরীর আমার ঘামে ভিজে গিয়েছে। এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখলাম নতুন চাকরির নতুন ঘরে আমি বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছি। কোথায় সনাতন! বরদাপ্রসন্ন হালদার তাঁর কাজকর্ম সেরে আমার ঘরে ফিরে এসে আমাকে ঘুমন্ত দেখে চুপচাপ বসে আছেন।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, "আমাকে ডাকলেন না কেন? ছি ছি, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি।"

বরদাপ্রসন্ন হেসে উত্তর দিলেন, "সাত রাজার ধন এক মানিক এই ঘুম। সমস্ত রাত ধরে কত সাধ্য-সাধনা করি এক ফোঁটা ঘুমের জন্যে। শুধু-শুধু ঘুমন্ত মানুষকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া এক মহাপাপ। কী আমাদের জরুরী রাজকার্য পড়ে আছে যে এখনই আপনাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে হবে?"

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিলাম। প্যানের ফ্লাশ টানবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঢক-ঢক করে আওয়াজ ছাড়া কিছুই ফল হলো না। বাথরুমে আমার বিপদটা বুঝতে বরদাপ্রসন্নের দেরি হলো না। তিনি চীৎকার করে পরামর্শ দিলেন, "এখন বেসিন থেকে জল নিয়ে ঢেলে দিন। কলকালিকে খবর পাঠাচ্ছি। আমাদের প্লাম্বারের নাম কলকালি।"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বরদাপ্রসন্ন বললেন, "বোতাম টিপলেই আলো, কল টিপলেই জল, চেন টানলেই বান—এসব সুখ ক্রমশই উবে যাচ্ছে মিস্টার শংকর। হাতের গোড়ায় তেলকালি ও কলকালি না-থাকলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি।"

চোখে অন্ধকার দেখবারই কথা। বাথরুমের কমোড কাজ না-করলে রীতিমত এমার্জেন্সি অবস্থা। বরদাপ্রসন্ন এবার ফিস-ফিস করে বললেন, "যা-সব হাড়-হারামজাদা যন্ত্রপাতি এই বাড়ির। আপনাকে-আমাকে দেখে বিগড়ে বসে রইলো—শত টানেও সাড়া দিলো না; আর যেমনি কলকালি আসবে অমনি হাত তুলবার আগে সুড়-সুড় করে বন্যা বইয়ে দেবে। মিস্তিরি আপনাকে মিষ্টি-মিষ্টি করে দুচার কথা শুনিয়ে দেবে। বলবে, 'কই কিছুই তো হয়নি!' যেন কলকালির ওই ঘেমো দে'তো মুখখানা দেখবার জন্যেই আপনি তাকে শখ করে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"কাজকর্ম বুঝে নেবেন নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার।

"হাজার হোক রবিবার ছুটির দিন। যদি কোনো অসুবিধে না থাকে আপনার।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ছুটির দিনেই তো বেশী কাজ এখানে। ক্রমশ বুঝে যাবেন।"

রবিবারে বরদাপ্রসন্নের আপত্তি নেই। বললেন, "নৃপাভিষেক, যুদ্ধযাত্রা, রাজকার্য, রাজদান এবং অগ্নিক্রিয়ার পক্ষে রবিবারই প্রশস্ত। ভানুভূসুতমন্দানাং শুভকর্মসু কেধ্বপি।" একটা লম্বা সংস্কৃত শ্লোক ভদ্রলোক গড়গড় করে আওড়ে গেলেন।

আমি এবার উঠে পড়লাম। বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "তালা লাগালেন না?"

এর আগে কোথাও তালা লাগাতে অভ্যস্ত ছিলাম না আমি। বরদাপ্রসন্ন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "তালা লাগিয়ে পকেটে চাবি না-পুরে এখান থেকে এক-পা বেরোবেন না।" সাবধান করে দিলেন বরদাপ্রসন্ন। আমার সঙ্গে কোনো তালা-চাবি নেই শুনে সামনের এক সুইপারকে হাঁক ছাড়লেন, "লক্ষ্মী-সোনা আমার, যা তো আপিস থেকে একটা তালা-চাবি নিয়ে আয়। দারোয়ানকে বলিস আমি চাইছি।"

"আপিসে তালা-চাবি রাখেন বুঝি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার আনাড়ি প্রশ্নে বরদাপ্রসন্ন বোধ হয় একটু কৌতুক বোধ করলেন। বললেন, "রাখবো না? তালা-চাবিরই তো কাজ! কোন্ ঘরে কখন ডবল চাবি ফেলতে হবে কিসসু ঠিক নেই। আমার চাবির গোছা দেখলে আপনার খুব আনন্দ হবে। নট্ লেস দ্যান টু-হানড্রেড ফিফটি ফাইভ চাবি আছে আমার কালেকশনে। কতরকমের সাইজ। বেঁটে মোটা চ্যাপটা লম্বা গোল—কোনোটা লোহার, কোনোটা পিতলের, কোনটা তামার। একসঙ্গে দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে চাবিচর্চা করছি। উৎসাহিত বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চাবি ছিল সেকালে! যেমন স্বাস্থ্য তেমন সেবা। একখানা আলীগড়ের তালা ইজিকলটু একখানা দারোয়ান! এখন যেমন যুগ তেমন চাবি! গায়ে একটু হাড়মাস নেই। চ্যাপটা চেহারা। দেখলে মনে হবে দুর্ভিক্ষের গোরু!"

তালাচাবি হাতে সুইপার এবার ফিরে এল। বরদাপ্রসন্ন জিনিসটি দেখে খুব খুশী হলেন। তালাটাকে নিজেই দু'বার হাতে তুলে তারিফ করলেন। তারপর আমার দিকে চাবি-সমেত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একবার হাতে নিয়ে দেখুন। অলমোস্ট একসের ওজন। মেড্ ইন বার্মিংহাম—একেবারে অরিজিন্যাল জিনিস। প্রত্যেক বাড়িতে এরকম একখানা তালা থাকলে, উইদিন ফিফটিন ডেজ কলকাতার সমস্ত চোর না-খেতে পেয়ে লালবাজারের সামনে মরে পড়ে থাকবে!"

চাবি-তালা লাগাবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় বরদা হালদারের নজর পড়লো ঘড়ির দিকে। সময়টা হিসেব করেই আঁতকে উঠলেন বরদাবাবু। বললেন, "চাবি-তালা লাগানোর সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন কাজ শুরু করার প্রশ্নই ওঠে না।"

আবার কী হলো?

বরদাপ্রসন্ন ভক্তিভরে বললেন, "বার বেলা পড়ে গেল। বড় ডেঞ্জারাস জিনিস এই বারবেলা। এই সময় যাত্রা করলে মরণ, বিয়ে করলে বৈধব্য, ব্রত করলে ব্রহ্মবধ। সমস্ত শুভকর্ম বারণ। এবার তিনি মন্ত্র ছাড়লেন, "যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে। ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্বকর্মসু তং ত্যজেৎ।"

বরদাপ্রসন্ন আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, "রবিবারের চতুর্থ ও পঞ্চম দিবাযামার্ধে শুভকর্ম নিষিদ্ধ।'

কাজ শুরুর প্রথমেই বাধা পড়ায় আমার ভাল লাগলো না। পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আপনি বসুন। আমি আসছি।"

[ক্রমশ]

বিশ্ববিজ্ঞান

সুদর্শনের সঙ্গে কলকাতায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনস্টিটিউট অভ্ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস-এ কোন এক মুহূর্তে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি রচনার মধ্যে আত্ম-মগ্ন আলোর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কণিকার অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক ই সি জি সুদর্শন
ফটো: অলোক মিত্র

তাঁর সব কিছুর মধ্যেই যেন প্রচণ্ড গতিশীলতা। চলনে, কথা বলায়। এমন কি বিদগ্ধ সমাবেশে যে কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়েও। কথা বলতে বলতে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হন যেমন, মুহূর্তে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন করে তোলার ব্যাপারটাও তাঁর কাছে যেন তাৎক্ষণিক ঘটনা।

দক্ষিণেশ্বরে সান্ধ্য মুহূর্তে পঞ্চবটীর নীচে দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুনেছি বহুমুখী মন না থাকলে ভাল বক্তা হওয়া যায় না। আর গভীর চিন্তা ভাবনা যাঁরা করেন, তাঁরা হন অত্যন্ত অন্তর্মুখী। আপনি কি তার ব্যতিক্রম নন?

পঞ্চবটীর নিচে দাঁড়িয়ে মনে হল তিনি যেন সমাধিস্থ। আমার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন, তারপর গঙ্গার দিকে চেয়ে বললেন, 'দ্য প্লেস ইজ সো বিউটিফুল। সো পিসফুল।'

আমার প্রশ্নের অনুক্ত সম্মতিসূচক উত্তর? হয়ত তাই।

নীরবে দক্ষিণেশ্বরের চত্বর ঘুরে দেখলেন। এসে দাঁড়ালেন রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে। নীরবে। দাঁড়ালেন মায়ের মূর্তির সামনে। মুখোমুখি। নীরবে। গঙ্গার ঘাট থেকে দেখলেন ওপারে বেলুড় মঠের আলোকমালা। রাত হয়ে যাওয়ায় নৌকো পাওয়া গেল না। ইচ্ছে ছিল বেলুড় ঘুরে দেখবেন।

'এবার যখন আসব, বিবেকানন্দের বেলুড় মঠ দেখে যেতে হবে।' বললেন সুদর্শন।

ই সি জি সুদর্শন। আলোর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কণা 'ট্যাকাইওন'-এর (যদিও এখনও তত্ত্বগত) অন্যতম প্রবক্তা এবং পৃথিবীতে কণা-পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে যিনি এখন শিরোনাম।

অধ্যাপক সুদর্শন কলকাতায় এসেছিলেন ৫ জুলাই। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনস্টিটিউট অভ্ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস এবং সেন্টার অভ্ অ্যাডভান্সড স্টাডি ইন অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিক্স-এর আমন্ত্রণে। ওঁদের ব্যবস্থাপনায় তিনি ৫ এবং ৬ জুলাই বক্তৃতা করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। বিষয় পদার্থবিজ্ঞান এবং চেতনা। উল্লেখ্য, অধ্যাপক সুদর্শন টেকসাস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেন্টার অভ্ পার্টিকল ফিজিক্স-এর ডাইরেকটার। এ ছাড়াও ব্যাঙ্গালোরের সেন্টার অভ্ থিওরেটিক্যাল স্টাডিজের ডাইরেকটার। যে সব ভারতীয় বিজ্ঞানী বিদেশে থেকেও ভারতীয় গবেষণার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনি বিশিষ্টতম। প্রতিবছর জুন, জুলাই, অগাস্ট এই তিন মাস তাঁর কর্মক্ষেত্র ব্যাঙ্গালোরে এবং ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে।

সুদর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বছর কয়েক আগে। পরে ঘনিষ্ঠতা। এবার দেখা হতেই বললেন, আপনাকে খুঁজছিলাম। বক্তৃতার পর ইচ্ছে, কলকাতার কিছু দ্রষ্টব্য দেখে নিই। এই সংবাদেই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া।

বিজ্ঞান কলেজ থেকে গাড়িতে পাশা-পাশি বসে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হল।

বললেন, আগের বার যখন এসেছিলাম তখন কলকাতাকে অনেক বিশৃঙ্খল মনে হয়েছিল। এবার অনেকটা শৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। শুধু কলকাতার নয়। ভারতের যেখানে গেছি, সেখানে। 'দি সিচুয়েশন ইজ মাচ মোর নরম্যাল। আই মিন, পাবলিক লাইফ, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড প্রাইস লেভেল।'

'কিন্তু' মন্তব্য করলেন সুদর্শন, 'দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিশেষ করে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাটমসফিয়ার' দেখে আমি খুবই বিচলিত। সুষ্ঠু দূরদৃষ্টি এবং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এ সবের

পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন এখন। এ দেশে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীর যে কোন দেশের কাছেই দুর্লভ। তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এ কাজ সহজেই করা যেতে পারে। দরকার উপযুক্ত পরিবেশ, বিমুক্ত মানসিকতা।'

প্রশ্ন, অধ্যাপক সুদর্শন, গত কয়েক বছরে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, ওই সব গবেষণার উত্তরফল স্বরূপ যে নানা রকম উদ্ভাবনা ঘটছে, আপনি কি মনে করেন না, তাদের মাঝে আজকের মানুষ অনেক বেশি বিভ্রান্ত? অর্থাৎ যা আমি বলতে চাই তা হল, মানুষের স্থূল প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বিজ্ঞান এ পর্যন্ত অনেকভাবেই সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের আরও যে সব দিক, যেমন তার আত্মিক স্ফুরণ, ইত্যাদি, যা না হলে পারস্পরিক শান্তি, সমঝোতা, ভালবাসা অর্থাৎ এক কথায় মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় না, তার কি হচ্ছে?

সুদর্শন: এ প্রশ্ন এখন পৃথিবীর সব দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। সময় এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এখন বলা হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় মানব-কল্যাণের ব্যাপারটা স্থান দিন। এমন ধরনের গবেষণা করুন যা মানব কল্যাণে কার্যকর। ভাল কথা, এতে আমারও সমর্থন আছে। তবে এর সঙ্গে আর একটি ব্যাপার আমি যোগ করতে চাই। সেটা হল মানুষের 'ব্যক্তি সত্তা', 'সেলফ'। স্থূল জড় জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান এ পর্যন্ত বিস্তর ব্যাখ্যা জুগিয়েছে। এখন দরকার, ওই সব ব্যাখ্যা তৈরির পেছনে মানুষের যে চেতনা, অর্থাৎ অনুভূতি কাজ করে তার সাক্ষাৎকারের স্বরূপ উদ্ঘাটনের পথের সন্ধান করা। আমার বিশ্বাস, এই প্রচেষ্টাই হয়ত মানুষকে পরিপূর্ণ উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। তখনই সম্ভব একের মধ্যে বহুর মিলন আর বহু অস্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের যথাযথ সম্পর্ক কি তখনই হয়ত বুঝে ওঠা সম্ভব হবে।

✲

অধ্যাপক সুদর্শন বললেন, পদার্থ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য অখণ্ডকে আবিষ্কার করা। ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞান থেকে ক্রমে একক, অদ্বিতীয়দের উদ্দেশে যাত্রা মাধ্যাকর্ষণ বলের কথাই ধরা যাক। মাধ্যা-কর্ষণ বলের জন্যে জোয়ার-ভাটা হয়, ওই একই বলের প্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে, বৃন্তচ্যুত আম পড়ে মাটিতে, ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত ঢিল মাটির বুকে নেমে আসে। এবং ওই একই ভাবে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক শক্তি গড়ে তুলেছে বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান, আকাশে বিদ্যুৎ-চমক, তড়িৎ-রসায়নের কার্যাবলী।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডি বাড়তে লাগল। এক সময়ে যা ছিল রসায়ন, তার অনেক কিছুই এখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের সেই বিশেষ অঞ্চল 'পরমাণুর সাহায্যে। ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 'আণবিক রসায়ন' বা 'মলেকুলার বাইওলজি'র—যেমন, ডি এন এ, আর এন এ, প্রভৃতি স্বরূপে এবং কার্যকারণ সম্পর্ক। ভূ-তত্ত্ব এখন হয়েছে ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানে। শারীর বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য

উদ্ঘাটনের জন্যেও এখন পদার্থবিদ্যাকে কাজে লাগান হচ্ছে। ইলেকট্রোএনসিফেলোগ্রাম, কার্ডিওগ্রাম, ত্বকের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, রক্তের গঠন—সর্বত্র পদার্থবিদ্যার কোন না কোন রকম সম্পর্ক যে আছেই এখন তা প্রমাণিত। এর সবই আমাদের স্থূল বৈষয়িক উপলব্ধি। 'অবজেকটিভ'। কিন্তু এ সব ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মূলে যে সম্পর্কটি নিহিত রয়েছে সে ব্যাপারে যথাযথ 'উপলব্ধি' বা 'চেতনা' তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এখনও কি সম্ভব হয়েছে? আমার বিশ্বাস, যে পথ ধরে আমরা ভৌতিক কার্য কারণগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলেছি, সেই পথ ধরেই আগামী কুড়ি অথবা তিরিশ বছরের মধ্যে 'চেতনার' হদিশ পেতে সমর্থ হব।

অধ্যাপক সুদর্শন আমার প্রশ্নের সূত্র ধরে বললেন, তথাকথিত মানবিক কল্যাণে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সাফল্য বলতে সাধারণত যা বোঝান হয় তার অর্থ যথেষ্ট সংকীর্ণ, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কাজকর্মের পরিকল্পনা এমন ধরনের হওয়া উচিৎ যা প্রতিটি মানুষের চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে (স্থূল প্রয়োজন মেটান ছাড়াও)। একের মধ্যে বহুর উপলব্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তার রূপায়ণ এদিকে লক্ষ্য রেখেই করা দরকার।

❋

প্রশ্ন করেছিলাম ট্যাকাইওন প্রসঙ্গে। অর্থাৎ সেই কণা যার গতি আলোর চেয়েও বেশি। বলা বাহুল্য, কয়েক বছর আগে সুদর্শন এবং অনেক বিজ্ঞানী তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেন, ব্রহ্মাণ্ডে আলোর চেয়েও বেশি গতি সম্পন্ন কণার অস্তিত্ব সম্ভব। তখন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। কারণ আইনস্টাইনের সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব 'আপেক্ষিকবাদ' অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুরই গতি আলোর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তেমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব কি করেই বা স্বীকার করা যায়?

সুদর্শন বললেন, ট্যাকাইওন নিয়ে এখনও আমি গবেষণা করে চলেছি। তত্ত্বের দিক দিয়ে সব ঠিক আছে। তবে এর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। অনেকে মনে করছেন বিষয়টি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান বা ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানের (কসমলজি) অন্তর্গত, এ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার দুজন বিজ্ঞানী ক্লে এবং কাউচ এবং উইনিপেগের বিজ্ঞানী স্মিথ দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে তাঁরা নাকি ট্যাকাইওনের সন্ধান পেয়েছেন। তবে এ সম্পর্কে আমি খুব একটা স্থির নিশ্চয় নই।

বলা হয়েছে, ট্যাকাইওন-এর গতি আলোর চেয়ে বেশি। এদের গতি কমতে কমতে যখন আলোর গতির সমান এসে দাঁড়ায় তখন এদের শক্তির মাত্রা এসে দাঁড়ায় 'অসীম'-এ। অপরপক্ষে প্রায় অসীম গতিশীল অবস্থায় এদের শক্তি গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। অথবা শূন্য।

প্রশ্ন : অধ্যাপক সুদর্শন, আপনি এবং টাটা ইনস্টিটিউট অভ্ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের অধ্যাপক জয়ন্ত নারলিকার সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলেছেন, ট্যাকাইওন, সম্ভবত বর্তমান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিতে যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে—যাকে বলা হয় 'বিগ ব্যাংগ'—সেই সময় সৃষ্ট হয়ে থাকবে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

সুদর্শন : অধ্যাপক নারলিকার এবং আমি দেখিয়েছি, সাধারণ পারমাণবিক কণার মত ট্যাকাইওনও মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে এবং ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভরবেগ কমতে থাকে। এই ভাবে চলতে চলতে এমন একটি সময় আসে যখন তাদের পথের পরিবর্তন হয়। তাদের গতিপথ তখন বেঁকে গিয়ে বিপরীতমুখী হয়। আবার তারা ফিরে চলে তাদের সৃষ্টির আদি মুহূর্তে। এরা বস্তুর সঙ্গে কোন বিক্রিয়া করে না।

সুদর্শন মনে করেন, 'বিগ ব্যাংগ'-এর সময় প্রচণ্ড শক্তির মাধ্যমে পারমাণবিক বিক্রিয়া চলাকালে দু রকম ট্যাকাইওন তৈরি হয়েছিল। ট্যাকাইওন এবং অ্যান্টি-ট্যাকাইওন। ঠিক বস্তু এবং প্রতিবস্তু কণার মত। এদের বেশির ভাগই কালের গতিতে পরস্পর মিলিত হয়ে বিলীন হয়ে গেছে

বলেই এদের আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে মহাশূন্যে সেই আদি বিস্ফোরণের দরুন সৃষ্ট অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব যেমন ধরা পড়ে, যাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভ তেমনি হয়ত ওই পরিবেশে যৎসামান্য ট্যাকাইওন এখনও পাওয়া যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, তাত্ত্বিক হিসেব মত ট্যাকাইওনের ভর ইলেকট্রনের ভরের ১০০০ ০০০০০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইলেকট্রনের ভর ৯·১০৬৬×১০০০০০০০০-০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ গ্রাম। এই হিসেব থেকেই বোঝা যাবে ট্যাকাইওন কত ক্ষুদ্র কণিকা।

ব্যক্তি জীবনে সুদর্শন খুবই বন্ধু-বৎসল। স্বতঃস্ফূর্ত বক্তা এবং একনিষ্ঠ শ্রোতা। প্রচণ্ড পরিশ্রমী। খাটেন দিনে প্রায় আঠারো ঘণ্টা। যে কোন মানুষের প্রশ্ন ধৈর্য নিয়ে শোনেন। এবং উত্তর দেন। প্রশ্নকর্তা এবং নিজের মধ্যে ব্যবধান রচনা না করে। এর জন্যেই মনে হয়েছে, সুদর্শন যেখানেই যান, সর্বত্র এবং সবার কাছে তিনি একান্ত কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়ান।

সমরজিৎ কর

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের একটি নবাবিষ্কৃত কবিতা

গত ২৯ মে ১৯৭৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা' প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী সকলকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতাগুলি সম্বন্ধে নূতন করে চিন্তা করতে হবে। আমিও এ বিষয়ে আগ্রহী। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত কতগুলি নূতন তথ্য পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মতান্তর পোষণেরও কিছু অবকাশ আছে। তাই এই ছোট প্রবন্ধের অবতারণা।

রথীন্দ্রবাবু তাঁর প্রবন্ধে 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮১ মাঘ সংখ্যা) 'হোক ভারতের জয়' কবিতাটিকে রবীন্দ্র-রচিত 'একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা' বলে নানা বহিরাশ্রিক ও আভ্যন্তরিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। বলা বাহুল্য, আর কোনো বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান'—এই জাতীয় সংগীতের পরিমণ্ডলে তারই একটি পংক্তি 'হোক ভারতের জয়' অবলম্বন করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটি কবিতা রচনা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত কবিতার শেষে মুদ্রিত আছে 'র'। তিনি বলেছেন, রচয়িতার নামের প্রথম অক্ষর 'র' মুদ্রিত থাকায় কবিতাটি যে রবীন্দ্র রচিত এ ধারণা আরও সুদৃঢ় হয়, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া র—আদ্যাক্ষরযুক্ত আর কোনো কবি সে যুগে হিন্দুমেলার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত নেতিবাচক। এ বিষয়ে ইতিমূলক যুক্তিও আছে। 'র' অক্ষরটি নামের আদ্যক্ষর কি-না এবং ঐযুগে র-যুক্ত নাম আর কারু ছিল কি না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনায় 'র' স্বাক্ষরের নিদর্শনও দুর্লভ নয় (যেমন, শ্রীর :—'প্রত্যুত্তর', ভারতী ১২৮৯ পৃ ২৫৭-৬২); বিশেষত, যখন 'ভানু সিংহ' নামের আদ্যক্ষর 'ভঃ' লেখা ছিল তার সে-যুগের একটি বিশেষ প্রবণতা। তাই 'র' অক্ষরটি রবীন্দ্রনাথের নামেরই প্রথম অক্ষর বলে ধরে নেওয়া যায়।

এ ছাড়া তিনি সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' তথা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ভারতবর্ষ বিষয়ক কবিতা, প্রধানত, 'প্রকৃতির খেদে'র সঙ্গে ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ মিলও অনেকগুলি দেখিয়েছেন। সে দিক থেকেও কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বলে বিবেচিত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এ বিষয়ে আরও কিছু দেওয়া যায়। তবে এ স্থলে তার উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখি না। এ বিষয়ে রথীন্দ্রবাবু যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা-ই স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু পরিশেষে, সমকালে রচিত 'হিন্দু-মেলায় উপহার' ও 'হোক ভারতের জয়' কবিতা দুটি সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তিনি বলেছেন, হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে (১২৮১ মাঘ ৩০/১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ১১) রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা পাঠ করার [Delivered from memory] সংবাদ দিয়েছেন সমকালীন Indian Daily News পত্রিকা, সেটি 'হিন্দু মেলার' উপহার নয়, হোক ভারতের জয়। তাঁর যুক্তি অনুসারে, অমৃতবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম দিয়ে যখন 'হিন্দু মেলার' উপহার প্রকাশিত হল তখন হিন্দু মেলায় পঠিত হবার কোনো সংবাদ তাতে ছিল না। অপরপক্ষে, বান্ধবে উক্ত কবিতাটিতে লেখা ছিল 'হিন্দু মেলা উপলক্ষে রচিত কবিতা।' ঐ কবিতার একটা

ভাষণ দেওয়ার ভাবও ছিল, তা-ও লেখক বলেছেন। অতএব, সেটিকেই হিন্দু মেলায় 'পঠিত' বলে ধরে নেওয়া যায়। 'হিন্দু মেলার' উপহার পরে ঐ মেলার 'অনুপ্রেরণায়' লেখা হয়।

এ বিষয়ে আসলে 'হিন্দু মেলায় উপহার' কবিতাটির যথার্থ নামটি কি সে বিষয়েই রয়ে গেছে লেখকের অনবধানতা। 'হিন্দু মেলায়' উপহারকে 'হিন্দু মেলার' উপহার বললে সম্পূর্ণ অর্থটিই বদলে যায়। মনে রাখতে হবে, কবিতাটি লেখক হিন্দু মেলায় উপহার দেবার নিমিত্ত পাঠ করেছিলেন। 'হিন্দু মেলার' উপহার বললে হিন্দু মেলা উপহার দিচ্ছে—এই অর্থ দাঁড়ায়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ—রবীন্দ্র রচনাবলীতেই (চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৮২৪) ত্রুটি রয়ে গেছে এবং রথীন্দ্রবাবু হয়তো সেই পাঠ গ্রহণ করেই বিপথে চালিত হয়েছেন। অপরপক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' গ্রন্থে (২য় সং ১৩৫০ মাঘ, পৃ ৭৫), যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (১৩৭৫ শ্রাবণ, পৃ ১১৮) এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী'তে (প্রথম খন্ড, ১৯৭০, পৃঃ ৪৭, ৪৯-৫০, ৬২) 'হিন্দু মেলায় উপহার' এই যথার্থ অর্থজ্ঞাপক নামটিই মুদ্রিত করেছেন। সর্বোপরি, যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর গ্রন্থে অমৃতবাজারের যে আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন (হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, পৃ ১১৮ সংযোজন) তাতেও আছে 'হিন্দু মেলায়'। কাজেই ঐ কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথ উপহার স্বরূপ হিন্দু মেলায় পাঠ বা আবৃত্তি করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, একই অধিবেশনে একটিকে স্বাগত-ভাষণরূপে ও অন্যটিকে উপহাররূপে প্রদত্ত বলে স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা দেখি না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটি কবে পড়া বা আবৃত্তি করা হয়েছিল? মনে রাখতে হবে, হিন্দু মেলার উক্ত অধিবেশন হয়েছিল পাঁচদিন—১৮৭৫, ১১-১৫ ফেব্রুআরি (দ্র হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, পৃ ৩৯-৪২)। Indian Daily News-এর সংবাদ অনুযায়ী মনে হয় 'হোক্ ভারতের জয়' কবিতাটি রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে প্রথম দিন (১১ই ফেব্রুআরি) উদ্বোধনে আবৃত্তি করা (Delivered from Memory) হয়েছিল, 'পঠিত' হয়নি। কারণ, সংবাদটিতে স্পষ্ট করেই লেখা আছে "A Bengali poem on Bharut (India) রথীন্দ্রবাবু 'রচিত' অর্থেই 'পঠিত' ধরেছেন। কিন্তু 'রচিত' মানেই 'পঠিত' বা আবৃত্তি করা কোনোটিই না-ও হতে পারে। তবে উক্ত সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, কবিতাটি আবৃত্তি করাই হয়েছিল, 'পঠিত' হয়নি। সম্ভবতঃ প্রথমদিনের কার্যক্রম শেষ হবার পরেই 'বান্ধব' পত্রিকার তরফ থেকে কবিতাটি গৃহীত হয়। অপরপক্ষে অধিবেশনের চতুর্থদিন (৩রা ফাল্গুন), যেদিন ছিল 'মেলার প্রধান দিবস' সেই দিনই 'হিন্দু মেলায় উপহার' কবি পড়লেন (অথবা আবৃত্তি করলেন)। ঐদিন সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু এবং 'বক্তৃতাপাঠ' ইত্যাদি ছিল অধিবেশনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কবির এই কবিতায় একদিকে রয়েছে তাঁর আন্তরিক অনুভূতির প্রকাশ, অপরদিকে রাজনারায়ণ পরিচালিত সঞ্জীবনী সভার আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে, 'হোক্ ভারতের জয়' অপেক্ষা 'হিন্দু মেলায় উপহারের' সাহিত্যিক গুরুত্ব অনেক বেশি। 'হোক ভারতের জয়' আগাগোড়াই 'মিলে সবে ভারত সন্তানে'র একটা প্রতিধ্বনিস্বরূপ এবং বারেবারেই আছে উপস্থিত সভ্যদের প্রতি একটা আহ্বানসূচক ভাষণের ভাব। কবির স্বকীয় অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ সে ক্ষেত্রে কম। অপরপক্ষে, 'হিন্দু মেলায় উপহারে'র স্তবকে স্তবকে রয়েছে পরাধীন ভারতের জন্য গ্লানি অনুভব করে কবির বেদনাময় অনুভূতির প্রকাশ, আছে প্রাচীন ভারতের আদর্শে মৃতপ্রায় ভারতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করার উদ্দীপনা। তাঁর মনের এই গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আন্তরিক ভাষায় ও ছন্দে। তাতেই কবিতাটির সাহিত্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। তাই কবিতাটি এই 'প্রধান দিবসে' উপহার দেওয়া বেশি স্বাভাবিক। সাহিত্যিক গুরুত্বের দিক থেকে 'হিন্দু মেলায় উপহার' 'হোক্ ভারতের জয়ে'র উপরে। কবিতাটির নামেই প্রকাশ, সেটি হিন্দু মেলার এই অধিবেশনে উপহৃত হবার জন্য রচিত হয়েছিল। সেই কারণেই সম্ভবতঃ অমৃতবাজারে সেই সংবাদটুকু দেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল।

তাই পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করা চলে, হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে প্রথম দিন আবৃত্তি করা হয়েছিল হোক্ ভারতের জয় এবং চতুর্থদিন সভার কার্যক্রম অনুসারে কবি নিবেদন করেন তাঁর হিন্দু মেলায় উপহার। কিন্তু হিন্দু মেলায় উপহার অনুষ্ঠিত সভার 'অনুপ্রেরণায়' পরে রচিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রসঙ্গে

গত ৩রা জুলাইয়ের 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় মশায়ের উক্তি—'আমি তো এক এক করে চার-পাঁচখানা বইয়ের নাম করে-ছিলুম' বিভ্রান্তিকর। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীও তা মনে করতে পারেননি বলে পূর্বেই অন্যত্র বিবৃতি দিয়েছেন। আমাকেও বিশী মশায়ের কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে—অন্নদাবাবু কোনো বইয়ের পক্ষে কিছু বলেছিলেন বলে মনে পড়ে না, শুধু পুরস্কৃত বইটির পক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রস্তাব ও প্রশস্তি তিনি চলতে দেন। বেশ তারিফের ভাব ছিল তাঁর চোখে-মুখে।

সভার আবেগ-উচ্ছ্বাসের 'গোপনীয়তা' বজায় রাখার আমলাতান্ত্রিক বাসনায় বাধা পড়েছে বলে তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন। পুরস্কৃত বইটির পক্ষে পূর্বোক্ত প্রবীণ সদস্যের প্রস্তাব শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী সমর্থন করেছিলেন বলে সভাপতি মশাই আগেভাগেই যে বিবৃতি দেন, পরে দেখলুম আশাপূর্ণাও তার প্রতিবাদ করেছেন। প্রস্তাব ও সমর্থন, তথাকথিত আলোচনা—সবই এখন বোঝা যাচ্ছে কেমন যেন আরোপিত। সব সদস্য নিঃসন্দেহে একমতাবলম্বী ছিলেন না। মানুষ সামাজিক জীব। পুরস্কার-প্রত্যাশী কেউ কেউ একালের আর-পাঁচটা কৃতিত্বের বাঁধা-রাস্তার মতন যদি বুঝে থাকেন যে রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সভাপতির যুগ শেষ হয়ে এখন গলাবাজি আর কায়দাবাজির জোরে 'শোভনতা'কে ভীরুতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সাহিত্যিক-চমাবৃত এই নবযুগের পুরস্কার-সাধকদের সঙ্গে সামাজিক মৈত্রীবন্ধন যে কী বিপজ্জনক ব্যাপার, সেটা শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর আশা করি মুখে বলতে না চান, কিন্তু মনে মনে বুঝছেন?

ভাগ্যিস আমাদের খবর কাগজগুলি ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা অন্তত রবীন্দ্র-পুরস্কার-সম্পর্কিত প্রহসনের হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন! রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। না, সব কান্না নীরব থাকে না। এসব ব্যাপারে গোপনীয়তা নিপাত যাক!

অন্নদাবাবু লিখেছেন—'উৎকর্ষ অপকর্ষের আলোচনাও হয়েছিল নিশ্চয়।' আজ্ঞে না, সভাপতি-মশাই। শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার দেব-দেউল' বইটি 'নাটাকার'-এর উৎসাহী প্রস্তাবক বা সভাপতি-মশাই কি পড়ে দেখবার সময় পেয়েছিলেন? যদি ঐ বইখানির অযোগ্যতা সম্বন্ধে সেই সাহিত্য-বিচার সভায় একটু আলোচনা ঘটতে দিতেন, তাহলে ঐ বইটির পক্ষে এই দ্বিধাহীন প্রস্তাবকের আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ থাকতো। একজন প্রস্তাব করবেন, আর-একজনকে সমর্থন করতে হবে—তবেই সভার কার্যবিবরণীতে সে বই নথীভুক্ত হতে পারবে—এ আইন কোন কেতাবে লেখা আছে? সুবিধা মাফিক লাল ফিতার গেরো বাঁধা চাই বুঝি? যদি অন্য কোনো সদস্য প্রস্তাবিত বিশেষ কোনো বইয়ের আলোচনা না করেন, তাহলে অন্তত যিনি সভাপতি তাঁকে প্রস্তাবিত কোনো বই ও-ভাবে উপেক্ষা না করে বইটির যোগ্যতা-অযোগ্যতা ভাববার সময় নিতে হবে। সরকারকে তিনি তা জানাতে পারতেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক-বন্ধু। সেই কারণেই শোভনতার সীমা মেনে চলতে বাধ্য হয়েছি। ভেবেছিলুম তিনি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে, রবীন্দ্রনাথের সত্যধর্মে আগ্রহী। এখন বুঝতে পারছি তিনিও অসহায়!

কাগজে দেখেছি একজন প্রবীণ সদস্য রিপোর্টার-কে বলেছেন—জনমতের প্রতিবাদে বেশ ফরাসী মেজাজ দেখে তিনি উৎফুল্ল। ঝড় উঠেছে,—আহা! আহা! আজ্ঞে হাঁ, ঝড়ের খেয়ার ভরাডুবিও দেখা গেল।

আর একটি কথা—শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন যে, তিনি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বইয়ের নাম করেছিলেন। আবার বলছি, আমি সে-সব শুনতে পাইনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা ধার করে বলতে ইচ্ছে করে—অতো চুপি চুপি কেন কথা কও। প্রমথবাবুও হয়তো শুনতে পাননি। তবে, শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের পূর্বোক্ত বইখানি সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব সভাপতি-মশাই শুনতে পেয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রাহ্য না করলেও বিশীমশাই বলেছিলেন—'হাঁ, হাঁ—সুধীরকুমার মিত্রের বই ভাল।' সভাপতি-মশাই সে কথাও কি শুনতে পাননি? সেটা কি সমর্থন নয়? আর দক্ষিণাবাবু আমাদের অনেকদিনের দক্ষিণাদা। কিন্তু তাঁর 'সাঁকো পেরিয়ে' গোছের সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইটি আমার অনেক দিন আগের 'সাঁকো থেকে দেখা' নামে একখানি কবিতার বইয়ের নামের প্রতিধ্বনি হলেও সে-বিষয়ে আমার কোনো দুর্বলতা নেই। অন্নদাবাবু যদি কবিতার কথাই বিশেষভাবে তুলতেন তাহলে আমি নিশ্চয় অনেকের যথার্থ ভাল ভাল কবিতার বইয়ের কথা বলতে পারতুম। ভাল ভাল কবিতার চেয়ে কি 'নাটাকার' আরো ভাল? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নেই আর। এখন উড়কি-ধানের-মুড়কি চিবুতে চিবুতে সম্রাটদের সাম্রাজ্যবিস্তার দেখি জ্বলে জ্বলে ক'রে।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন—আপনি সভার সিদ্ধান্তে আপনার অমত জানালেন না কেন? শ্রীযুক্ত সমরেশ বসুর একখানি বইয়ের কথা মনে পড়ে। আজ সেই নায়কের

এতোই বলতে চাই—আহা, সব যদি বলা যেতো,—সব সত্য যদি প্রকাশ করা যেতো! শোভনতা যে সংস্কৃতির এতো বিরোধী তা কি আগে জানতুম? গত বছর অচিন্ত্য-কুমারের একখানি বই যে পুরস্কৃত হয়েছিল, তার প্রস্তাবক ছিলুম আমিই। এবং একজন বলিষ্ঠ প্রতিবাদীর বিরোধিতার উত্তরে বলতে পেরেছিলুম—'আমার অকাট্য ও একমাত্র অনুমোদন অচিন্ত্যকুমারের পক্ষে।' সেদিনও সভাপতি ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। এবার শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের বইখানি সম্বন্ধে অন্নদাবাবু মোটেই শুশ্রূষু ছিলেন না।

কিন্তু এখন এসব কথা অবান্তর। আদি গঙ্গার ওপর ঝড়ের মেঘও আর নেই। ফরাসী উৎফুল্লতায় যাঁরা আগ্রহী তাঁরা নিশ্চয় পরবর্তী পুরস্কার-সম্ভাবনার পথ জরীপ করছেন। আমার একটি বাংলা প্রবচন নিয়েই ঘরসংসার—'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।'

হরপ্রসাদ মিত্র

॥ ২ ॥

রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅন্নদাশংকর রায় তাঁর দীর্ঘ পত্রে ('দেশ', ৩ জুলাই, ১৯৭৬) অনেক কথাই বলেছেন, শুধু আসল কথাটা এড়িয়ে গেছেন। শ্রীরায় ইতিপূর্বে অন্তত বার দুই এ প্রসঙ্গে বিবৃতি দিয়েছেন। প্রতিবারই তাঁর যুক্তির অপসরণ লক্ষণীয়। প্রথমে তিনি 'নাটাকার' বইটিকে পরিশীলিত রুচি, সংযম ও ভাষার সৌকর্যে একটি অনুপম সৃষ্টি বলে পুরস্কার প্রদানের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এখন গুণাগুণের কথা এড়িয়ে বলছেন ঐ বইটিকে নির্বাচন করার বিকল্প কিছু ছিল না। আইনকানুন, কার পরে কে কি বলেছিলেন সে ইতিহাস কিন্তু আজ গৌণ হয়ে গেছে। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে একটা কথাই আজ জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহস থাকলে সেটারই মুখো-মুখি দাঁড়াতে হবে,—সেটা হচ্ছে সততার প্রশ্ন। শ্রীরায় ভুলে যাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে শ্রীগুহ অভিযুক্ত হবার পরে নয়, তাঁর অনেক আগেই।

মোহিতকুমার মজুমদার
বর্ধমান

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে অন্নদাশংকরবাবু তাঁর দায়দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধ কার্যক্ষমতার যে বিবরণ পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে দিয়েছেন তাতে তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে সর্বেসর্বা ভেবে একতরফা দোষ বা নিন্দাবাদ করা কি শোভন হচ্ছে? তা ছাড়া আমরা জানি, অন্নদাশংকর রায় চিরদিন সত্যের জন্য লড়াই করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সততা ও নির্ভীকতা প্রশংসার দাবি করে। এ বছর পাকচক্রে যে তাঁকে জনতার আদালতে আসামী হয়ে জবাবদিহি করতে হচ্ছে সেটা শুধু তাঁর নয়, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। তিনি তাঁর এই চিঠিতে যে সরল স্বীকারোক্তি ও কৈফিয়ত দিয়েছেন সেগুলিকে শুধু একচক্ষু হরিণের মতো বিচার না করলে তাঁর সম্পর্কে সুবিচার করা হবে। কারণ, তাঁর যুক্তিগুলি কোনটিই দুর্বল বা মনগড়া নয়। তবু তাঁর বিরুদ্ধে যে কটূক্তি করা হচ্ছে, বোধ হয়, 'হুজুগে জাতি' বলে বাঙালীর যে দুর্নাম আছে, এ বুঝি তারই প্রকাশ মাত্র।

তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

॥ ৪ ॥

অন্নদাবাবু লিখেছেন, পুরস্কারের বিবেচনার জন্য যে সব বই কমিটিতে জমা পড়ে, তা পড়ার জন্য বা সভায় যোগ দেবার জন্য সদস্যরা কোন ফী পান না। পাবার মধ্যে পান পঞ্চাশ-ষাটখানা বই। যার 'বেশির ভাগই ঘরে রাখার অযোগ্য।' প্রশ্ন হলো, পুরস্কারের জন্য জমা দেওয়া বই পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত না হতে পারে, কিন্তু তার 'বেশির ভাগই ঘরে রাখার অযোগ্য' হলে আমরা কি বুঝবো যে রবীন্দ্র পুরস্কার মানেই বহু অযোগ্য বইয়ের মধ্যে কোনপ্রকার যোগ্যতর একটি বই? এবং এ ব্যাপারে বেশির ভাগ বিখ্যাত লেখক যদি বই না পাঠান তবে রবীন্দ্র পুরস্কারের রীতি-নীতি পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে অন্নদাবাবুর কয়েকটি নতুন প্রস্তাবকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাই।

রমেশ সরকার
পাটিয়ারী, কলিকাতা

যাত্রার দ্বীপান্তর

খোলা আকাশের নিচে সামিয়ানা টাঙিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে, জনতার মাঝখানে এক সময় যে যাত্রাপালার অভিনয় হত, আজ তা উঠে এসেছে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহে; গ্রামীণ মানুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত হচ্ছে আধুনিক শহুরে রুচি ও নব্যশিক্ষিতের লঘু রসের তৃষ্ণা। তরুণ অপেরার 'হিটলার' দিয়েই এর সূচনা। ইতিহাসে হিটলারের ছিলো আগ্রাসী ভূমিকা। যাত্রার হিটলার বাংলা নাটকের মুমূর্ষু অবস্থা ত্বরান্বিত করে পাকাপাকিভাবে যাত্রার আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে দর্শক ও শ্রোতার হৃদয়-মনে! এও এক ইতিহাস। মেকি পুরনো ভাবধারা নিয়ে চিৎপুরের যাত্রার দলগুলো যখন কোনোমতেই আর সামনে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, পেশাদারী থিয়েটারের ভেলকি যখন সস্তায় আসর মাত করছিল, সেই সময় নতুন করে চিন্তা শুরু করলেন কেউ কেউ—গ্রামের মানুষের যাত্রা শহরের মানুষকে দেখাতে হবে। দেখাতে হবে রাজধানীর মানুষকে—তা ছাড়া মুক্তি নেই! তাঁরা অর্থাৎ যাত্রার আসরের নেপথ্য নায়করা ঠিকই বুঝেছিলেন যে কলকাতাও আসলে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম! নব্যশিক্ষিতের হালকা অপরিণত রুচি এখানে সস্তা সাহিত্যের প্রচারে সাহায্য করে, দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে মোটামুটিভাবে তাবৎ বাংলা সিনেমাকে তা করে তুলেছে উৎকট পাগলামির আস্তাকুঁড় এবং নাটককে বিদেশের পরিত্যক্ত আধুনিকতার চর্বিতচর্বণে উদ্‌ভ্রান্ত। সুতরাং উপযুক্ত ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে—তাকে কাজে লাগাতে হবে। খাঁটি বাংলা আদর্শ নিয়ে চিৎপুরের প্রায়ান্ধকার গলিতে আত্মহত্যা করার কোনো মানে হয় না। যাত্রাকে নতুন রক্ত দিতে এগিয়ে এলেন শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী। যাত্রার কথা বলতে গেলে আজ সর্বাগ্রে তাঁর প্রসঙ্গই উঠবে। পরিকল্পনায় কোনো খুঁত ছিলো না তাঁর। ১৯৬১-তে ঐতিহ্যমণ্ডিত শোভাবাজার রাজবাড়িতে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর পক্ষ থেকে তিনি আয়োজন করলেন যাত্রা উৎসব। স্ত্রীর গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে কলকাতার বুকে যাত্রার জয়যাত্রা শুরু করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। বেশ বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি আজ বুঝতে পারি। তাঁর সাফল্যের প্রমাণ এখনকার যাত্রাদলগুলোর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা ও নিত্য নতুন দিগ্বিজয়ের চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

১৯৬১-র ঐ যাত্রা উৎসবে হাজার হাজার দর্শক ও শ্রোতার সামনে যাত্রাপালার অভিনয় তো হয়েছিলই, আর অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচিত কিছু ব্যক্তিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেমিনার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে, আনন্দময়, যাত্রাজগতের জীবন্ত পুরাণ—আজকের ১০৪ বৎসর বয়স্ক 'মোশান মাস্টার' সূর্যকুমার দত্ত, অভিনেতা ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী), ফণী মতিলাল (ছোট ফণী), পঞ্চু সেন, ভোলা পাল প্রভৃতি। ছিলেন যাত্রা কোম্পানীর মালিকরা নিজে। আশ্চর্যের বিষয় যে, যাত্রার চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার পক্ষে শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী মহাশয় যে সময়োপযোগী বক্তব্য রেখেছিলেন প্রবীণ সূর্যকুমার দত্তই সেদিন একমাত্র তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। ভবিষ্যৎ-নীতি ও পরিকল্পনার ব্লুপ্রিণ্ট মোটামুটিভাবে সেদিনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা তারপর থেকে পেয়ে আসছি যাত্রাস্কোপ, আলোর মাধ্যমে ইলিউশন সৃষ্টি, টেপরেকর্ডারে পাখির ডাক, গরুর হাম্বা, এমন কি সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রোজেক্টর, এপিক অপেরায় দেবতার আবির্ভাব, ভূতপ্রেতের উৎপাত ইত্যাদি।

কলকাতার যাত্রা পাড়ার একাংশ

এখন [illegible] এসেছে একটি জাহাজ। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার! উট! এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় প্রবোধবাবু বললেন—'শো-বিজনেসের মধ্যে লক্ষ করেছি শ্রেষ্ঠ হলো সার্কাস। সিনেমা নাটক যাত্রায় যত ভিড় হয় তার থেকেও বেশী মানুষ যায় সার্কাসে। সব বয়সের মানুষের সেখানে সম্মেলন বসে যায়। আমরা তাই যাত্রায় উট আনলাম।' 'উটের গ্রীবার মতো অন্ধকার' কবিতার এই চিত্রকল্পটি একদিন সমালোচক ও পাঠকদের মধ্যে ঝড় তুলেছিল। যাত্রায় অবলা উট আজ দর্শক ও শ্রোতাদের শুধু চমৎকৃতই করেছে। তাঁরা যেন নিত্য নতুন চমক প্রত্যাশা করেই যাত্রার আসরে যান! প্রোজেকটারের মাধ্যমে ইস্টম্যানকালারের প্রতিচ্ছবি দেখে হন মুগ্ধ, যুগপৎ লেনিন এবং হিটলার তাঁদের প্রিয় এবং চলচ্চিত্রে যে কাহিনী জনপ্রিয় হয়েছে বার বার দেখতে চান তারই যাত্রারূপ।

'স্ত্রী' ছবিটি বায়োস্কোপের দর্শকদের কাছে একদা বেশ সুগৃহীত হয়েছিলো। 'নটসম্রাট' স্বপনকুমারের যাত্রাজীবনের রজত-জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে স্বপনবন্দনা অনুষ্ঠানে জনতা অপেরা এই বইটির অভিনয় করেন রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। দেখছিলাম হ্যাজাগ বা পেট্রোম্যাক্স জ্বালানো জোনাকির আলো মেশানো রাত্রির মুক্ত পরিবেশের যাত্রা কিভাবে সরাসরি মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসে। দু' সারিতে বিভক্ত হয়ে বাদকবৃন্দ (যাত্রার ভাষায় 'সুর-পার্টি') বসেছিলেন মঞ্চেই। মাঝখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল অভিনয়। অঙ্কবদলের সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকাপতন হচ্ছিল না। একেবারে শেষে নেমে এসেছিল ভেলভেট বা সিল্কের যবনিকা, ফলে সামনে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্যে আছে এই সুদৃশ্য, শৌখিন বস্ত্রখণ্ড—দর্শকরা তা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। আমি ছিলাম উইংসের এপাশে খোলা জায়গায়। আরো অনেকেই ছিলেন সেখানে। ছিলেন অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা, প্রযোজক, ম্যানেজার, টুকি-টাকি কাজের সহায়কবৃন্দ আর সেই সদাতৎপর মানুষটি পদমর্যাদায় যিনি যাত্রা কোম্পানীর পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। তখন পুরোদস্তুর অভিনয় জমে উঠেছিল মঞ্চে, বিশাল তার খেলার মাঠের মতো নেপথ্যের কাঠের জমিতেও অভিনীত হচ্ছিল রীতিমতো নাটক! নর্তকীর ঘুঙুরের শব্দ যেন মঞ্চে না পৌঁছয়, তিনি পা টিপে টিপে হাঁটছিলেন। ইমার্জেন্সী মেক-আপ রুমে স্বপনকুমার চিরুনি দিয়ে শেষবারের মতো আঁচড়ে নিচ্ছিলেন নিখুঁত-ছাঁটা ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ। চিরুনি বুলিয়ে নেবার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তিনি প্রসাধন বিষয়ে অতি মনোযোগী। এমন কি চুলের স্টাইলও এক সময় পছন্দ হচ্ছিল না। অনেকবার আঁচড়ানোর পরেও যখন সুবিধে করতে পারছিলেন না তখন হুবহু তারই চুলের আদলে এল সুন্দর উইগ। অবশ্য তার দরকার হলো না। দামী স্প্রে দিয়ে তিনি চুলের গুচ্ছকে বশ মানালেন। সেদিন তিনি সেজেছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার মাধব দত্ত। প্রবল প্রতাপে তিনি বিচরণ করছিলেন মঞ্চের বাইরেও। মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন দেখলাম একজন নায়ককে সক্রিয় রাখতে কতজন সহযোগীর দরকার। 'স্ত্রী'র প্রথম দুটি দৃশ্যে স্বপনকুমারের অভিনয় ছিল না। তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম মেক-আপ রুমের সামনে। 'আমি আসছি' বলেই মুহূর্তে তারপর এক সময় কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন উনি। দুটি পটকা খুব শব্দ করে ফাটতেই সম্বিত ফিরে এলো আমার। ইতিমধ্যেই তখন শিকারী মাধব দত্ত দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ করেছেন মঞ্চে—তার আগেই প্রসারিত হাতে কেউ একজন ধরিয়ে দিয়েছেন বন্দুক—সমস্ত চোখ তখন তাঁর দিকে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, সহজ স্বাভাবিকভাবে আসছেন যাচ্ছেন, কথা বলছেন আমাদের সঙ্গে। নিজে তিনি আদৌ বিচলিত নন, বরং তাঁর মুড নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে দুশ্চিন্তিত হয়ে আমাদের দিকে ধাবিত হলেন রহস্যময় পাবলিক রিলেশন্স অফিসার—এ তাঁর কাজের মধ্যে পড়ে কিনা ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু বুঝলাম স্বপনকুমার নিজে কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী—অভিনয় তাঁর কাছে জল-ভাত! কৃত্রিম কোনো 'মুড' সৃষ্টির আর প্রয়োজন হয় না তাঁর! ভালো লাগল এই আত্মস্থ ভঙ্গি। জীবনকেও তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছেন। সচেতন শিল্পী। স্থায়ী যাত্রা মঞ্চের পরিকল্পনায় সর্বদাই বিভোর। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র—এই তিন মাস বেকার বসে থাকার যন্ত্রণা নায়ক থেকে পরিচারক কমবেশী সকলকেই ভোগ করতে হয়। তাই বর্ষা পেরিয়ে গ্রামের পথে শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের তলা দিয়ে যখন দলের বাস চলতে শুরু করে তখনও যে স্থায়ী জীবিকার কথা স্বপনকুমারের মনে থাকে না তা নয়।

জীবিকার প্রশ্নেই মনে পড়ল একজন নায়কের মাইনে ১৫,০০০ টাকা। ভেবেছিলাম বার্ষিক মাইনে হবে বোধ হয়। এ বিষয়ে যে কোনো ধারণাই ছিলো না আমার বোঝা গেল উত্তরদাতার চোখের বিস্ফারে তিনি সংক্ষেপে কিছুটা হেসে জানালেন, 'ওটা মাসিক।' জনৈক পালাকার লেখক এবং পরিচালক হিসেবে পান পালা-পিছু ৩০,০০০ টাকা। পরিচালনার কাজ তিনি এক মাসের মধ্যে সেরে নেন। টাকা পয়সার এই এলাহি কারবারে চিৎপুরের যাত্রা কোম্পানীর গদিগুলোরও চেহারা বেশ ফিরে গেছে। ঝুল মাখা সঙ্কীর্ণ ঘরে নড়বড়ে চৌকি এবং প্রদীপ বা সেজের আলো আর নেই। তার বদলে এখন ডালহৌসি পাড়ার সওদাগরি অফিসের চেহারা নিয়েছে এক একটা গদি। নায়ক-নায়িকাদের আনা-নেওয়ার জন্যে বহু কোম্পানী গাড়ি কিনেছেন। এর পর হয়ত গদির জন্যে কিনবেন এয়ারকুলার। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কিংবা টাটার কোনো আপিসের মতো ঝলমল করবে অপেরা কোম্পানীর আপিস অর্থাৎ গদি। লক্ষ করার বিষয় যে বাংলার মহাজনী শব্দ দেনা-পাওনার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো শিল্পী বা কর্মচারী আগাম টাকা নিলে তাকে বলা হয় 'দাদন'। ক্যাশ বাক্সকে ক্যাশ বাক্স বলা হলেও বায়না, অনাদায় ইত্যাদি শব্দগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অকাতরে ব্যবহার করতে দেখি। যাঁরা দূর দূর গ্রাম গঞ্জ মহকুমা বা জেলার সদর থেকে দলের বায়না নিয়ে আসেন তাঁদের বলা হয় 'প্যায়েক'। রথের দিনই চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় কর্মব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি। আসেন পরিচিত অপরিচিত নায়েকগণ, সামনের অনেকগুলো মাসের জন্যে যাত্রাদলের দুধেভাতে থাকার ব্যবস্থা একদিনেই পাকা হয়ে যায়! সেদিন হয় দেবদেবী ও রামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি দেবোপম মহাপুরুষদের পুজো। কোম্পানী ও অপেরাগুলিতে যতটা সম্ভব বাংলা রীতিনীতি মেনে চলা হয়। যেমন ইংরেজি সাল তারিখের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। ঠাকুরের পায়ে অনেক ক্ষেত্রেই হয় টাকা-পয়সার লেনদেন। ঠাকুরকে খুব ভক্তি করা হয়। ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদলের সুটকেসে বা বাক্সে থাকে ঠাকুরের ছবি। থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে ফুলবেলপাতা দিয়ে প্রতিদিন পুজো করা হয় ঠাকুরের। নায়ক-নায়িকা পালাকার সকলেই কমবেশী ঈশ্বরবিশ্বাসী।

নায়ক-নায়িকা পালাকারদের বিষয়ে বলা ভালো যে সকলেই যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন তা নয়। অর্থের চেয়েও অনেকে বেশী পেয়েছেন সম্মান ও যশ। যেমন 'পালাসম্রাট' ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র পালার সংখ্যা ২৫৩টি, যার মধ্যে ১৯৮টিই সুপারহিট। পৌরাণিককাল থেকে আধুনিক সমাজজীবন পর্যন্ত তাঁর অবাধ বিচরণ। চিত্তাকর্ষক কাহিনী-সম্ভারের জন্যে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন।

নায়ক নায়িকাদের ব্যক্তিগত প্রেম-কাহিনীগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। বছরের মধ্যে ২১০ রজনী যাদের জেগে কাটাতে হয় সব রকমের উত্তাপ যদি তাঁদের কিছু বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হয়ই তাতে আর যাই হোক আমরা অন্তত বিস্মিত হতে পারি না! জনৈক যাত্রা কোম্পানীর মালিক নিজেই ছিলেন পরিচালক। অভিনেত্রী স্ত্রী নায়কের প্রতি বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। নায়কেরও ততোধিক দুর্বলতা মালিকের চোখে গোপন থাকেনি। তিনি দুজনের মেলামেশার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন! কিন্তু বিধিনিষেধ যেখানে প্রবল, ইচ্ছাশক্তি

সেখানে প্রবলতর। অভিনেতা-অভিনেত্রী দুজনেই প্রকাশ্য মঞ্চে নিজেদের মধ্যে বার্তা-বিনিময় করতেন। দূরে থেকে দর্শক-শ্রোতাদের পক্ষে কোনো কিছু টের পাওয়া সম্ভব হতো না। এমন কি সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও অনেক সময় কোনো কিছু বুঝতে পারতেন না। মঞ্চে দুজনের যখন সংলাপ থাকতো না, অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ যখন কথা বলতেন তখনই প্রেমিক প্রেমিকাযুগল নিচু স্বরে নিজেদের কাজ সেরে নিতেন। মৌন আলিঙ্গন দৃশ্যেও তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেছেন শোনা যায়। কোনো নায়িকা সুদূর গ্রামাঞ্চলে অভিনয় করতে গিয়ে প্রেমিকের একটি চিঠির জন্যে একা আট মাইল পথ নৌকোয় পাড়ি দিয়েছিলেন। আবার এমনও উদাহরণ আছে যে জমাট প্রেম, কিন্তু নায়কের কাছে বড় হয়ে উঠল জীবনে প্রতিষ্ঠা। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পিছু দৌড়ে প্রেমিকার প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারলেন না। প্রেমিকাও দমে যাবার পাত্রী নন। ওয়েটিং লিস্টে যাঁর স্থান ছিলো দ্বিতীয় সাগ্রহে তাকেই বেছে নিলেন।

এই হলো জীবন, আর জীবন নিয়ে যাত্রা। অদম্য এর আকর্ষণ। সেই অধিকারীর কথা ভাবুন যিনি ব্যবসায়ে সুবিধে করতে না পেরে বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে থিয়েটারের দল খুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যেই বেজে উঠলো সুরপার্টির রিহার্সালের বাজনা অমনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ফিরে গেলেন যাত্রার আসরে, ফিরে পেলেন নতুন উন্মাদনা। যাত্রার এমনই আকর্ষণ ও পসার প্রতিপত্তি যে হাওড়ার একটি থিয়েটারের দল যাঁরা বেন জনসনের নাটক অভিনয় করতেন তাঁরাও নতুন দল খোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই প্রসঙ্গে সুপারহিট ভালোবাসার রোহট নাটকের কথাও ভেবে দেখুন।

আজ যাত্রার দল যেমন বাড়ছে, তেমনটি বাড়ছে যাত্রার চাহিদা। প্রবোধবাবু আশঙ্কা করছিলেন ১৯৮০ নাগাদ একটা মন্দা আসতে পারে। কিন্তু দিল্লিতে যাত্রানুষ্ঠান করে সদ্য ফিরে এসে তাঁর ধারণা হয়েছে এই মন্দা আপাতত আর আসছে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যাত্রার সম্ভাব্য বাজার সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। শ্রীঅধিকারীর সঙ্গে কথা বলার সময় যাত্রা দলের এক জনপ্রিয় নট এসে বললেন—দাদা আসামকে জাগান, না হলে যাত্রা বাঁচবে না।

আমি আন্দামানকে জাগাচ্ছি—এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু আসর বসেনি ওখানে।

দেখা যাক কালাপানি পেরিয়ে বাঙালীর যাত্রা নতুন কি বিজয়বার্তা বহন করে আনে আমাদের জন্য।

মাত্র পাঁচ মিনিটে নিজের ছবি আঁকিয়ে নেওয়ার ভালো সুযোগ ছিল জাতীয় মেলায়

জাতীয় মেলা '৭৬

হুইল চেয়ারে বসে একজন খঞ্জ এসেছিলেন জাতীয় মেলা দেখতে। জাতীয়তা ব্যাপারটির এমন এক তীব্র মাদকতা আছে লক্ষ করা যায়, যে কোনো বয়সের মানুষকেই তা মাতিয়ে তোলে। পরাধীনতার আমলে জাতীয় মেলা এই জন্যেই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জনপ্রিয়ই হয়নি, স্বদেশী মেলাও স্বদেশী আন্দোলনকে বিশেষভাবে জুগিয়েছিলো প্রাণের স্পন্দন ও উৎসাহের জোয়ার। আজকের জাতীয় মেলায় অবশ্য পুরনো দিনের সেই স্বদেশী মেলার ঐতিহ্য বা ইতিহাসের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তার ওপর আবার মেলা বসেছিল অসময়ে। শেষ গ্রীষ্মে ও আষাঢ়ের সূচনায় ধারাবর্ষণের সম্ভাবনা ছিলো প্রচুর। তবু সুদূর নাগাল্যান্ড থেকে এসেছিল দোকান, রাজস্থান ও হরিয়ানা থেকে। ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন মণ্ডপ। জাতীয় মণ্ডপে কৃষ্ণনগরের পুতুলের সাহায্যে শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনীর চিত্তাকর্ষক এক প্রদর্শনী। বাদ বাকি যা কিছু—যেমন তালগাছ মহাসংঘের সুপরিচিত তালমিছরি কিংবা মেদিনীপুরের জনকল্যাণ সমিতির সিসলজাত শিল্পসম্ভার, পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পের ঢালাও সমাবেশ, তন্তুজ শাড়ি—স্বাভাবিক কারণেই এগুলির কোনোটিই দর্শকদের কাছে আর নতুন কোনো বিস্ময়ের সূচনা করেনি। তাছাড়া রবীন্দ্রসদনের বিপরীত পার্শ্বের এই জায়গাটিতে অল্পদিনের ব্যবধানেই হয়ে গেলো জমজমাট কয়েকটি মেলা, যেখানে হৃদয় ও মন রাঙিয়ে দেবার ছিলো অত্যাশ্চর্য সব উপকরণ। সেদিক থেকে জাতীয় মেলা সকলকে ভীষণভাবে কেবল হতাশই করেছে। মেলা কর্তৃপক্ষ অনেকখানি জায়গা নিয়েছিল, কিন্তু তার একটা অংশও তাঁরা দোকানপাট দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারেননি। ফাঁকা জমিতে নতুন বৃষ্টিতে বিনা বাধায় গজিয়ে উঠেছিল অগোছালো বড় বড় ঘাসের গুচ্ছ। সতেজ সবুজ। বর্ষার সজল বাতাসে আন্দোলিত তৃণশীর্ষই ছিল একমাত্র দেখার বিষয়। কোনো পার্কে বা গড়ের মাঠের দ্রুতবিলীয়মান রঙ্গমঞ্চে এ দৃশ্য অনেক চেষ্টা করেও আমাদের চোখে পড়ে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কঙ্কালের মতো বিশাল প্যাণ্ডেল ছিল ধু ধু ফাঁকা। মেলা ছিল, কিন্তু মানুষ

ছিল না, এটাই লক্ষণীয় বিষয়।

ছোটবেলায় আমরা গ্রামে দেখেছি পৌষের পাকা ফসল ঘরে উঠলেই বেজে উঠত মেলা আর উৎসবের বাজনা। আমরা ছুটে যেতাম। গরুর গাড়ির চাকার ধুলোয় কিংবা নদীর চরের বালিতে সারা শরীর হতো পাউডারচর্চিত। সার্কাস, ভ্রাম্যমাণ চিড়িয়াখানা, পুতুলনাচ, ইন্দ্রজাল এসব কিছুর আকর্ষণ ছিল অদম্য। তাই সার্কাসের বন্দী ব্যথিত সিংহের হুঙ্কার শুনতে আমাদের ভালোই লাগত, ইন্দ্রজালের আসরে হাত সাফাইয়ের খেলায় বোকা বনে যেতে ছিল কী এক নাম-না-জানা আনন্দ! কিন্তু এবারের জাতীয় মেলায় না ছিল জাতীয় জীবনের ইতিহাসের কোনো সুষ্ঠু প্রদর্শনী, না অনাবিল রসের যোগান। মাঝখানে আবার কলকাতা পুলিস মণ্ডপে অপরাধ নিবারণে কুশলী গোয়েন্দা বিভাগের নানা তৎপরতা ও কৃতিত্বের হাতেকলমে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সার্কাসের লোমহর্ষক খেলার চেয়ে এটাই ছিলো দর্শকদের কাছে একমাত্র রোমাঞ্চের উপকরণ।

মরা মেলা। বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ও নিরেট যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুতুলকৃষ্ণ অনেকবারই কংসবধ করেছিলেন। ২৫ পয়সার টিকিট কেটে কংসের রক্তপাত দেখতে কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ভিন্ন আর ক'জনই বা উৎসাহ প্রাবেন এই ১৯৭৬-এ? সেখানে কিছু কিছু রূপকথাপ্রিয় কল্পনাপ্রবণ শিশুর সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু শিশু পার্কের দোলনা ছিল প্রায় সর্বদাই শূন্য। ছোট্ট একটি অ্যাকোরিয়ামে দুয়েকটি অভুক্ত মাছকে ছেড়ে দিয়ে কেন যে তাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছিল কে বলবে! কোনো কারণে না হয় ওইসব মাছের চামড়া নানা বর্ণের, কিন্তু তা বলে ক্ষুধার্তের জলকেলি কি শিশুদের পক্ষে খুবই দ্রষ্টব্য বিষয়? সুখের কথা যে, এখানে আমরা পেয়েছি বর্ণবিদ্বেষ নয়, বর্ণপ্রেম, কিন্তু দুঃখ এই যে, নামে মাত্র শিশু পার্ক—প্রায় সর্বদাই শিশুদের তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেখা গেলো না। নাগরদোলার খটখটে কাঠের শূন্য পিঁড়িগুলোকে আমি হলুদ বাতাসে বহুবারই নড়তে দেখলাম! মরচে-পড়া নাটবল্টু কবজায় উঠছিল দীর্ঘশ্বাস বা মৃদু আর্তনাদের মতো বুক-ভাঙা চাপা শব্দ!

একইভাবে পাশের আলোবাতাসহীন সংকীর্ণ জাতীয় মণ্ডপে নির্জনতাপ্রিয় শরৎচন্দ্রকে বিরক্ত করতে খুব বেশি লোকের সমাগম হয়নি! বেচারা প্রতিকৃতি আঁকিয়েরা! কলকাতা আর্ট ফেয়ারে যাঁর নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পাননি, তুলির আঁচড় টানতে টানতে যাঁদের আঙুল [illegible] গিয়েছিল অসাড়, তাঁরা এখানে দার্শনিক সুলভ প্রজ্ঞায় স্রেফ মৌনতার ধ্যানে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন! একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যেতো তাঁদের শরীর লক্ষ করে অন্ধকার থেকে ছুটে আসছিল অজস্র অগণ্য বল্মীক!

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্য যে মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল বুদ্বুদ! রাজা বুদ্বুদ! ছোট শিশির ভেতর কী এক রাসায়নিক পদার্থ বিক্রী করছিলেন একজন। নাম দিয়েছিলেন রাজা বুদ্বুদ! ওই পদার্থ কাঠির ডগায় নিয়ে ফুঁ দিলেই সৃষ্টি হচ্ছিল নানা আকারের রঙীন বুদ্বুদ। বাতাসে যা অনেকক্ষণ ভেসে থাকছিল। শিশু পার্ক থেকে শিশুদের এই বস্তু টেনে এনেছিল তার আশেপাশে। তারা বুদ্বুদগুলিকে তাড়া করছিল যতক্ষণ না তা মিলিয়ে যাচ্ছিল বাতাসে! শিশুদের ওই সুন্দর চঞ্চল্য দেখে কী যেন হয়েছিলো আমার, মনে মনে বলেছিলাম—হায় বুদ্বুদ! আমি কী ?
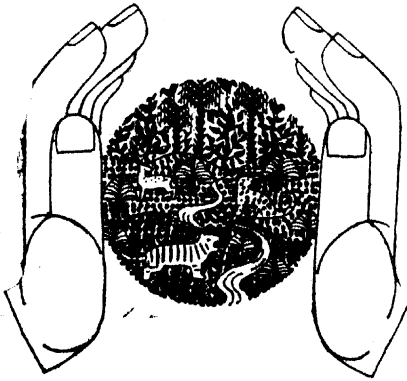
বিধান শিশুউদ্যান : প্রতিদিনের উৎসব

চৌষট্টি বিঘা জমির সবটাই সবুজ। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। বিধান শিশু উদ্যানের কথা বলছি। সারা বছর ফুটে থাকে নানারকমের ফুল। ফুলের মতো সুন্দর শিশুরা এসে খেলা করে মনভোলানো সবুজ মাঠে। তাদের খেলার এবং সেই সংগে শরীর ও মন চাঙ্গা করার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় নিজে। রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন এই একটি গঠনমূলক কাজে। বিধান শিশু উদ্যানের কর্মযজ্ঞ দেখে আজ আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ যেমন তিনি গড়ে দেবেন, তেমনিই কিছু স্বাস্থ্যবান সৎ নাগরিকও সৃষ্টি করে রেখে যাবেন আমাদের সমাজে যারা আবার পরবর্তীকালের নাগরিকদের সুস্থ সমর্থ হয়ে বেঁচে থাকার পথ দেখাবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আমাদের এই বিপর্যস্ত পশ্চিম বাংলাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর ১৯৬২ সালের ৪ঠা জুলাই ময়দানের এক বিরাট জনসভায় গঠিত হয় ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটি। কমিটি ডাঃ রায়ের স্মৃতিতে প্রথম পর্যায়ে ২০০ বিছানার একটি শিশু হাসপাতালই শুধু নির্মাণ করেননি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পুস্তকাগার, পাঠাগার, প্রেক্ষাগৃহ, সাঁতার পুল, খেলার মাঠ, ছবি সেন্টার আলামণ্ডপ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে তুলেছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান শিশু উদ্যান—যার জুড়ি আর এদেশে নেই বললেই চলে। জনসাধারণের অভূতপূর্ব সহযোগিতার ফলে এই উদ্যানটির নির্মাণকার্য সম্ভব হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অর্থ-সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ছিল ২৫ লক্ষ, কিন্তু মাত্র তিন মাসেই সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৫০ লক্ষেরও কিছু বেশী। অর্থ সাহায্যে লক্ষপতি যেমন এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনিই আবার এগিয়ে এসেছিলেন অগণিত জনসাধারণ। অতুল্যবাবু জানিয়েছেন, এই পঞ্চাশ লক্ষের মধ্যে কুড়ি লক্ষের ওপর অর্থ সংগৃহীত হয়েছে ১ থেকে ১০০ টাকার দানের মাধ্যমে। সুতরাং এই শিশু উদ্যান বিষয়ে সাধারণ মানুষের সাড়া ও সমর্থন যে স্বতঃস্ফূর্ত একথা বেশ সহজেই বোঝা যায়। এই প্রসংগে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। পুস্তকাগারে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নেই জানতে পেরে, জনৈক উৎসাহী ব্যক্তি

বিধান শিশু উদ্যান : শিশুদের মেলা

তাঁর সদ্য কেনা বহু খণ্ডে সম্পূর্ণ অমূল্য সেই এনসাইক্লোপিডিয়া বিধান শিশু উদ্যানের লাইব্রেরীকে দান করেন। এই ভদ্রলোক বইটি কেনার পর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আর প্যাকিং বাক্স খোলার সুযোগ দেননি নিজেকে। যে অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন বইটি সেই অবস্থাতেই সরাসরি তা পাঠিয়েছেন বিধান শিশু উদ্যানের কর্তৃপক্ষের হাতে।

ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে এমন একটি আবহাওয়া যেখানে শিশুদের সংগে এসে মিলিত হচ্ছেন বড়রাও, ফলে শিশুরা কি চায়, কি করতে ভালোবাসে সব বিষয়েই তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকছেন। তাই কিছুদিন আগেও যেখানে দিনদুপুরে লোকে পথ চলতে ভয় করত, আজ সেখানে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে জিমন্যাসিয়ামের আখড়া, তিন শ ছেলেমেয়ের পিকনিক স্পট, পার্কল্যাণ্ডে দোলনা, মেরী গো রাউণ্ড, স্লিপ প্রভৃতি। খেলাধুলো, সাঁতার, ছবি সেন্টার এবং লাইব্রেরী ও পাঠাগারের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ১৬৮৪ জন। পার্কল্যাণ্ডে গড়ে ৬০০ জন ছেলেমেয়ে বিভিন্ন খেলাধুলো করে। ব্রতচারি, কাবাডি, খোখো ইত্যাদি নিয়ে বাইশ রকমের খেলাধুলোর ব্যবস্থা রয়েছে ওখানে। তৈরী হচ্ছে ফুটবল ও ক্রিকেটের মাঠ। মাঝখানে লাঞ্চ টাইমটুকু বাদ দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকেন অতুল্যবাবু নিজে। ঘুরে ঘুরে উদ্যানের সমস্ত কাজকর্ম দেখেন। মাটি ভরাট করে খেলার মাঠ তৈরী হয় তাঁর চোখের সামনে, মালীরা তাঁরই উপস্থিতিতে নিকোনো সুন্দর উঠোনের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে উদ্যান যাকে সবদিক থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যমের শেষ নেই। অবিচ্ছেদ্য এক ভালোবাসা ও মায়ামমতার সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলেছেন এই উদ্যানের সংগে। এটিকে তিলোত্তমা করে গড়ে তোলাই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। কমিটির সৌভাগ্য যে তাঁর মতো অসাধারণ এক গঠনকর্মীকে তাঁরা পেয়েছেন। যিনি দীর্ঘ বহু বছর ছিলেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান কর্ণধার, আজ তিনি হাল ধরেছেন এমন একটি সংগঠনের যার প্রভাব ও প্রতিপত্তি আমাদের জাতীয় জীবনে অনুভূত হবে দীর্ঘদিন।

বহু বিচিত্র কর্মতৎপরতায় এই শিশু উদ্যান যেন এক মিনি ভারতবর্ষ। এটিকে পুরোদস্তুর সজীব সুন্দর করে গড়ে তোলার অনেক সমস্যা। প্রচুর জমি থাকা

সত্ত্বেও সি আই টি নতুন আর কোনো জমি দেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। হাসি-খুশি ভরা বিকেলে শিশুদের আসা-যাওয়ার পথের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুয়োর, আশে-পাশে নাকি চোলাই হচ্ছে মদ! এগুলো তো আছেই, আর আছে গঠনমূলক কাজের নানা সমস্যা। কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস অতুল্য-বাবুর। তিনি জানেন যেভাবেই হোক কাজ করে যেতে হবে, কাজ শেষ করার মধ্যেই আছে কাজের আনন্দ।

আনন্দের হাট বসে যায় বিধান শিশু উদ্যানে প্রতিদিন। অবশ্য ছুটির দিন-গুলো এর মধ্যে ধরছি না। প্রতিদিন যেন বসে উৎসবের আসর। পাঁজি-পুঁথি দেখে দেখে সে উৎসবের শুভলগ্নের সূচনা করতে হয় না কোনোদিন। তাই লোকনৃত্য বা ছড়ার খেলায় শিশুদের প্রবল উৎসাহ, উৎসাহ ব্যায়াম ও সাঁতারে, হবি সেণ্টারের মাটির কাজে, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়— সব মিলে তাজা টাটকা প্রাণের আসর। শুধু হাসি আর হাসি। অফুরন্ত মুক্তি ও শান্তির আনন্দ।

সুন্দর ছোটো একটি ফোয়ারা আছে উদ্যানে। সাজানো জলের বাগানে খেলে বেড়ায় মুক্ত তাজা রঙীন মাছ। আমি দেখলাম সেলফিন ব্ল্যাক মলি, অ্যাঞ্জেল, গাম্বুশিয়া। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে গোল্ডফিশ। কিন্তু ফাইটার সেদিন কোনো যুদ্ধ করেনি। রেড-সোর্ড-টেল-এর নরম তরোয়ালের মতো পাখনা গভীর মমতাময়। ভালো লাগল, দেখে খুব ভালো লাগল আমার। আরো ভালো লাগল দেখে যে স্বর্গের উদ্যানে নেমে এসেছে নিষ্পাপ দেবশিশুরা, মহা-সময়ের কোলে চারপাশে ঢেউ।

চেক ছবি 'এ গ্রেট নাইট অ্যাণ্ড এ গ্রেট ডে'-র একটি দৃশ্য

চেক চলচ্চিত্রোৎসব

নেপথ্যে সেলুলয়েডের ফিতে ঘুরে যায় আর পর্দায় প্রদর্শিত হয় ছবি যা নড়াচড়া করে, কথা বলে অবিকল মানুষের মতো, আর এই ছায়ার মানুষের আকর্ষণে জীবন্ত মানুষ প্রেক্ষাগৃহে যায়, ছবি দেখে চুপচাপ, শেষে বাড়ি ফিরে আসে। এই ছবির কথা বাড়ি ফিরে মনে পড়ে কখনো সখনো, কখনো আবার কোনো কিছুই মনে থাকে না। বেবাক সব কিছুই আমরা ভুলে যাই। চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় মুক্তির ৩১তম বার্ষিকী উপলক্ষে সিনে সেন্ট্রাল আয়োজিত চেক চলচ্চিত্র উৎসবে যে ক'টি ছবি দেখানো হলো তার কোনোটির কথাই বোধ হয় কিছুদিন পর আর আমাদের মনেই থাকবে না। যুদ্ধ, বিপ্লব, লড়াই ইত্যাদির ছবি যে খারাপ তা বলছি না। কিন্তু এত যুদ্ধচিত্র এই কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছে যে একটি ছবির থেকে আরেকটি ছবিকে আর আলাদা করা যায় না। যেমন ভাভরার 'সোকোলোভো' ছবিটির কথাই মনে করুন। তাঁর Days of Betrayal ছবিটির সঙ্গে এই ছবিটির একটি ঐতিহাসিক যোগ-সূত্র আছে। দুটি ছবিতে চেকোশ্লোভা-কিয়ায় ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সূচনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বছর ১৯৪২-এর ঘটনাবলী দেখানো হয়েছে। সোকোলোভো গ্রামের যুদ্ধ পৃথিবীর যে কোনো গ্রামেরই যুদ্ধ। খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই বাস্তবের নিখুঁত ঘটনাবলীর উন্মোচন করেছেন ভাভরা। কিন্তু আমার মনে হলো এত কিছু উদ্যোগ ও আয়োজনের দরকার ছিল না। যুদ্ধবিষয়ক একটি কবিতার মাধ্যমেই তিনি হয়ত তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন। উইলফ্রেড ওয়েনের একটি কবিতা কি যুদ্ধচিত্রের চেয়ে কম আবেদনময়? যুদ্ধ ও প্রতি-রোধের আন্দোলন আর ইতিহাস। সেই ভয়ংকর আত্মঘাতী দিনগুলোর কথা যত আমরা ভুলতে পারি ততই মঙ্গল। মূলত আজকের চলচ্চিত্র শুধু সেলুলয়েডে অতীত ইতিহাস দেখাতে চায় না, মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার রক্ত ঝরার ইতিহাস তার অন্যতম প্রধান উপজীব্য। তাই A great night and a great day/ The day which does not die ছবিগুলি প্রার্থিত সাড়া জাগাতে পারল না। শেষোক্ত বইটির শ্লোভাক চরিত্রটির জন্য কষ্টই হয়—তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে নির্মিত ছবি The Roads of Men। কিন্তু যুদ্ধ ফুরিয়েও ফুরোতে চায় না—অন্তর্ঘাত-মূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুরু হয় জেহাদ ও যুদ্ধ। প্রচুর বুলেট নিঃশেষ হয় বইটিতে। এমন কি বর্বর অত্যাচারের নিদর্শন দেখাতে গিয়ে স্টেনগান দিয়ে নির্বিচারে গোয়ালের গরু বাছুরদের হত্যা করার নৃশংস দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নিছক সিনেমোই নতুবা কর্ডাইটের গন্ধে আমাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হতো!

চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় মুক্তির একত্রিশতম বার্ষিকীর কথা ভাবতেই মনে পড়ল ঠিক একত্রিশ বছর আগেই সেখানে সিনেমাশিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ আগমার্কা স্নেহপদার্থের মতোই সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র। যে চলচ্চিত্রশিল্প মন্বন্তর কাটিয়ে উঠেছে আজ তার বার্ধক্যের বলিরেখাগুলো মুছে দিতে সরকারের তরফ থেকে শুরু হয়েছে হর্মোন চিকিৎসা। বৃদ্ধ হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পায় কিনা এটাই দেখার বিষয়!

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরে বাইরে

"নারী ও প্রগতি" সম্মেলন

হঠাৎ অমিতা বর্ধনের সঙ্গে দেখা হলো। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি নানা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত। এর আগেও অমিতার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছি। সম্প্রতি তিনি ম্যাসাচুসেট এবং উইসকনসিন-এ 'নারী এবং প্রগতি' সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক কনফারেন্সের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্স হয়েছিল ম্যাসাচুসেটের ওয়েলেসলি কলেজে এবং কনফারেন্সোত্তর কর্মশালা বা ওয়ার্ক-শপ বসেছিল উইসকনসিনের উইংস্প্রেডে। অমিতা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছিলেন আরও তিনজন। মণিকা সরকার, বীণা মজুমদার ও লতিকা সরকার। ভারত সরকারের তরফ থেকে ছিলেন অমিতা বর্ধন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ থেকে ছিলেন বীণা মজুমদার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করলেন লতিকা সরকার আর ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি ছিলেন মণিকা সরকার। তিনি যুক্ত রাজ্যে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন এবং নারী ও প্রগতি সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করেছেন। কনফারেন্সের বিষয়ও ছিল তাই। কাজেই স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ এসেছিল মণিকা সরকারের। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সব ক'জনই বাঙালী মেয়ে। এও আমাদের গর্বের কথা।

গত জুন মাসের দু' তারিখ থেকে ছ' তারিখ অবধি কনফারেন্স বসেছিল ওয়েলেসলি কলেজে। কনফারেন্স-এর উদ্‌যোগীদের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন তাঁরাও ছিলেন। অবশ্য এ গবেষক দল ওয়েলেসলির সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইমেন বা নারীজীবনের নানা দিক নিয়ে যে গবেষণা কেন্দ্র তার সঙ্গে একযোগে কাজ করেন।

কনফারেন্সের মুখ্য আলোচ্য ছিল প্রগতিতে নারীর ভূমিকা ও সমাজে তাদের স্থানের উপর তার কি প্রভাব। প্রগতি কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি মাত্র নয়, পারিবারিক জীবনে নারীর স্থান কোথায়, সামাজিক সংগঠনেই বা তার কি ও কতটুকু অংশ ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে পরিবর্তন যা হয়েছে মোটামুটি তারই আলোচনা। আলোচনায় বর্তমানের পরি-বর্তন ছিল কিন্তু ইতিহাসকে বাদ দেওয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক যুগকেও চর্চা ও বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল।

ধারণাগত ছাঁচের সংগে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের মিল বা অমিল কতটুকু তাও ছিল চিন্তার বিষয়। বিদুষীরা তাই বিভিন্ন স্তরের মহিলা এবং বিভিন্ন উপজীবিকায় নিযুক্ত নারী—শহরের মেয়ে, গাঁয়ের মেয়ে—সকলের জীবন আলোচনা করে তাদের পার্থক্য কোথায় তা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। শক্ত কাজ বটে! দেশে দেশে প্রভেদ, এমন কি পরিবারে পরিবারে ভিন্ন ভাব। কাজেই যদি আমাদের সমস্যার মূল কোথায় নির্দেশ করা যায় তবে সমাধান সহজ হয়ে আসে। সমাজতত্বে বলে সমস্যা সম্যক ভাবে উপস্থাপিত করাও অর্ধেক সমাধান। ওয়েলেসলিতেই কনফারেন্স করুন বা মেক্সিকোতেই বৈঠক বসুক, অথবা বার্লিনেই যান—সমস্যার জটিলতার জাল ভেদ করাই সবচেয়ে কষ্টকর।

নিত্য পরিবর্তনের যুগে আমরা বাস করছি। কনফারেন্সের আরম্ভে ও শেষে বিধি-নিষেধহীন পূর্ণ সমাবেশ-এ নারীর জীবন-ধারা সম্বন্ধে কি নিয়ম-কানুন হবে তার সম্যক বিচার হয়েছিল। তার জন্য গবেষণা দরকার প্রচুর। যথানুপাতিক তত্ত্বানুসন্ধান বিনা সমাধানের অন্বেষণ হার মানবে।

কনফারেন্সকে তিনটি মুখ্য বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল—প্রথমটি, রাজনীতিতে মহিলার ভূমিকা। প্রথানুযায়ী বা প্রথার ধার না ধারা রাজনীতি, রাজনীতিতে সফল ও সেরা মহিলাদের কথা, আপত্তি আন্দোলন, ভোটনীতি, পরিবার সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি আলোচিত হয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে মহিলা ও উপজীবিকা। কর্ম সংস্থান, শ্রমিক দলের স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ মাইগ্রেশন, "বিধিনিয়ম না মানা শ্রমিক কারবার" যাকে ও'রা ইনফরম্যাল লেবার মার্কেট বলে অভিহিত করেছেন। গ্রামের মেয়ের সমস্যা, বৃত্তিমূলক পেশা ইত্যাদি।

তৃতীয় ছিল নারী ও সমাজের প্রথা, যেমন : ধর্ম; নারী-পুরুষের সম্পর্কে বিস্তর পরিবর্তন, শিক্ষা, পরিবারের গঠন ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় গর্ভাধানে নারীর বিবেচনার অধিকার। সামাজিক পরি-প্রেক্ষিতে সন্তানধারণ যে করে তার মতা-মতের স্থান কতটুকু।

প্রজনন এখন পৃথিবীর সর্বত্রই মস্ত সমস্যা। উন্নতির পথযাত্রী দেশগুলিতে বিশেষ করে জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত ও বিভ্রান্ত সরকার ও সমাজ। অমিতা বর্ধনের গবেষণার বিষয়ও তাই। সন্তান সংখ্যা কত হবে, কতটা সময় মাঝে রেখে গর্ভসঞ্চার হবে, তাতে নারীর ভূমিকা ভয়া-বহরূপে অকিঞ্চিৎকর। ব্যাপারটি এতই ব্যক্তিগত যে তার ঠিকানা রাখা কোন গবেষণার পক্ষেই সম্ভব নয়। অমিতাই বল-ছিলেন দুটি ছোট কাহিনী। দুটিই শিক্ষিত ও সচ্ছল স্বামী-স্ত্রীর কথা। প্রথমটি হচ্ছে ব্যবসায়ী ও বিত্তবান স্বামী ও তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রীর জীবন। স্বামী যে কোন রকম জন্ম নিরোধের বিপক্ষে। স্ত্রী ক্লিনিকে লুকিয়ে আসেন ও গর্ভনিরোধ বড়ির ব্যবস্থা নিয়ে ঘরে ফিরে যান। দুটি সন্তান। বড় হয়েছে। সুস্থ সবল। মা মনে করেন নতুন আগন্তুকের আর দরকার কি? লুকিয়ে বড়ি খান। বর্তমানে আমাদের সরকার যে অন্য গর্ভনিরোধের চেয়ে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেক-টমির দিকে বেশী নজর দিচ্ছেন তার একটি কারণ হলো বড়ি ইত্যাদি হর্মোনঘটিত ওষুধে কখনও কখনও নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবু মহিলাটি বড়িই বেছে নিলেন। মাস যায়, বছর যায়। এই ক্লিনিকের ডাক্তার দেখলেন ভদ্রমহিলার ওজন দারুণ বাড়ছে। নির্দেশ দিলেন বড়ি বন্ধ করে অন্য জন্মশাসন বিধি গ্রহণ করতে। কিন্তু মহিলা মানেন না। অবশেষে মহিলার স্বামীও মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেন। অনেক ছেলেমেয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে দেখতে তাঁর ভাল লাগে। কেন তাঁর স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হচ্ছে না! স্বামীকে লুকিয়ে পিল খাবার কথা ক্লিনিকের লোক জানতেন না। তাঁরা বলে ফেললেন। স্বামী রেগে আগুন। পরদিন মহিলাটি এলেন। সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। গায়ে হাতে মারধোর করার চিহ্ন বর্তমান। জানা গেল বড়ি ব্যবহার করবার খবরে স্বামী স্ত্রীকে নৃশংস নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত করেছেন। স্ত্রী অসহায়। সে ক্লিনিকে জানিয়ে গেল আর তার ক্লিনিকে আসা চলবে না। তার পরের খবর জানা নেই। আন্দাজ করতে পারেন।

অন্য কাহিনীটি আরও বিচিত্র। ভাল-বাসার বিয়ে। সহপাঠী দু'জনা। দু'জনেই ভাল কাজ করেন। কিন্তু বিয়ের আট দশ বছর পরেও সন্তান ধারণ করেনি বলে স্ত্রীর উপর বিরূপ স্বামী। ক্লিনিকে এলে নানা

পরীক্ষা করেও তুষ্ট নন। নানা কুৎসিত মন্তব্য করেন স্ত্রীর সম্বন্ধে। কুলটা স্ত্রী। না হলে এমন হবে কেন? স্ত্রীকে পরীক্ষার পর ডাক্তার স্বামীকে পরীক্ষার কথা তুলতেই আবার সেই পৌরুষ! নিজেকে পরীক্ষার প্রস্তাবে স্বামী কিছুতেই রাজী নন। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ পাকিয়ে উঠলো। আলাদা থাকেন, বিবাহ বিচ্ছেদও দূরে নয়। কিন্তু কেন? কারণ নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায় নারীর মর্যাদা শিক্ষাতেও হয়নি, আর্থিক স্বাধীনতাতেও হয়নি। সে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকই রয়ে গেছে!

জন্ম শাসনের গবেষণায় প্রজনন সম্বন্ধে যে তিনটি তথ্যকে সত্য বলে ধরা হয় তা হলো :

(ক) শ্রমিক মেয়েদের সন্তান কম হয়;
(খ) উচ্চ শিক্ষায় পরিবার ছোট হয়;
(গ) আধুনিকতা ও নারীর উপজীবিকা ছোট পরিবারের অন্যতম কারণ।

অমিতা বর্ধন বলছিলেন, সবক্ষেত্রে এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ হয়নি। বারান্তরে সে বিষয় আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।
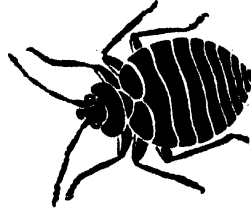
শ্রীমতী

॥ ৩০ ॥

'তোমার বাইশ দফার দশ দফা মেনে না নিলে যদি খুশি না হও, বাইশ দফাই মেনে নেবে, কিন্তু কালই প্রমাণ করে দেবে যে আইন ওদের দিকে—তোমার দিকে নয়।'

'বড় বেগতিক জীবন আমাদের--রাষ্ট্রে সমাজে সব দিকেই। এ অবস্থায় কিসের দরকার?'

'বিপ্লবের। যা কোনোদিন ভারতবর্ষ দেখেনি এমনি একটা বিপ্লবের।'

'জলের, না রক্তের?'

'রক্তের যাতে না হয় সেই চেষ্টা করাই দরকার। খুব বড় বিপ্লব, অথচ খুব শান্ত-ভাবে হচ্ছে—এ জিনিসটা যে একেবারে অসম্ভব তা নয়। কিন্তু কে করবে? উপকরণ কোথায়? গান্ধীজী নিরাশ নন। কিন্তু তিনি একা ছাড়া কেউই তো আর গান্ধীজী নন।'

'এসব লোক একক থেকেই বেশি কাজ করতে পারে। পথে ঘাটে গান্ধী জন্মালে কারু কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া খুব বড় কেজো রেভল্যুশান গান্ধীদের দিয়ে হবে না। ওঁরা সে সবের ঢের ওপরে—মানুষ, ও'দের চেয়ে নিচে বলতে পার, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মানুষ ও'দের চেয়ে ঢের আলাদা রকমের।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

'কে চা আনতে বলেছে জ্যোতি?' জ্যোতি ইতস্তত করছিল।

'বাবু কি করছেন?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'ডাক্তারবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—হয়ে এলুম তো এই।'

'কখন আসবেন?'

'একটা নাগাদ।' জ্যোতি চলে গেল।

'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে সুতীর্থ?'

'ঘড়িটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি।'

মণিকা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল; তরল গরম জিনিসে গলা পুড়িয়ে নিতে ভালো লাগছিল; টনসিলে কেমন ব্যথা। গলায় আঁচলের পাক জড়িয়ে নিতে নিতে বললে. 'আমার কাছে বিক্রি করলেই পারতে—'

'তোমার ঘড়ি কি হবে—তোমার তো টাকার দরকার।'

'তোমার ঘড়িটাকে আরো চড়া দামে বিক্রি করে কিছু কাঁচা টাকা পাওয়া যেত।'

নাও হতে পারে খাঁই, সত্যিই কেবলই টাকার দরকার মণিকার ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ বললে, 'চেকটা ভাঙিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ওষুধ আর ডাক্তারের ভিজিটের বড় বাড়াবাড়ি চলছে আজকাল। আমাদের তো রোজগার নেই, ব্যাংকেও টাকা নেই। নিচের তলার ভাড়াটেদের টাকায়ই খেতে হয়।'

সুতীর্থ চিন্তিতভাবে চুরুট টানতে টানতে বললে, 'তোমার কথা কয়েকবার জিজ্ঞেস করলে মুখার্জি। আমার সঙ্গে যাবে একদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতে?'

'আমি? কেন?'

'আমরা তিনজনে মিলে কথাবার্তা বলব —আমার সঙ্গে চলে আসবে আবার।'

আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকার, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তা পুড়ে যাবার আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজস্ক্রিয় তাপ; কিন্তু তারপরে কালো ছাই পড়ে থাকে। কালো ছাই ছড়াবে না মণিকা. মনকে উত্তেজিত করবে না, মূর্খদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করাই লিখন যখন এই ভীষণ দুর্ঘটনার গ্রহে তখন নিজেকে জ্বালিয়ে চড়িয়ে মনটাকে পীড়ন করতে যাবে না সে। শান্ত ঠান্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিস এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পারে না কিছু আর ; বেশ তিরিক্ষে তামাসাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মুখার্জির গাড়ি তোমাকে নিতে আসবে তাহলে মণিকাদি?'

গাড়ি আসবে না—মণিকাকে যেতে হবে না; গাড়ি এলেও যেতে হবে না; জানে মণিকা। আগে বেশ পরিষ্কারভাবে চিন্তা করত সুতীর্থ, কিন্তু এখন এই রকম? ভাবছিল মণিকা। কিন্তু স্পষ্টভাবে আবার চিন্তা করতে পারবে সুতীর্থ,—এ যুগের বাঙালী ও ঠিক নয়—আগেকার যুগের বাঙালীর বেশি ভালো জিনিস আছে ওর ভেতর।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমাদের শীগগিরই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—'

'কি কথাবার্তা হবে?'

'এমনি—ধর্মঘট সংক্রান্ত—'

'ওখানে কে কে থাকবে?'

'আমরা তিনজন—'

'অ্যাডজুডিকেটর কারা?'

'অনেকেই আছে—কিন্তু মুখার্জিই সব।'

'তুমি কথাবার্তা চালাবে তোমার নিজের প্রতিনিধি হয়ে ?'

'না, না, তুমি আর আমি ধর্মঘটীদের প্রতিনিধি—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও—স্ট্রাইকাররা তোমাকে তাদের সর্দার মেনে নিয়েছে ?'

'মেনে নিয়েছে বলেই তো মনে হয়।'

'মনে হয় ? তারা সব জেলে, আর তুমি জেলের বাইরে; তাদের স্ত্রী-সন্তান খেতে পাচ্ছে না, আর তুমি খ্যাট মেরে প্রতিনিধিত্ব করছ। এ তো চারপেয়েদের প্রতিনিধি। হামিদ যদি ওখানে থাকে তা হলে তো তোমার জুতো ছিঁড়ে খুর বার করে নাল ঠুকে দেবে—'

সুতীর্থ ঈষৎ মুখ ফাঁক করে হেসে বাগেশ্বরীর দিকে তাকাল—তাকের আশ্চর্য ঈশ্বরীর দিকে; মণিকা মুখ চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে চুপ করেছিল। অনেকক্ষণ পরে সুতীর্থ বললে, 'আমাকেই ওরা প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছে—'

'মুখার্জির ওখানে মদের ব্যবস্থাও থাকবে ?'

'তুমি গেলে মুখার্জি মদ খাবে না।'

এসব স্ট্রাইকফাইক ব্যাপারের কিছু বুঝি না আমি। অ্যাডজুডিকেটরের সঙ্গে আমি কি কথা বলব।'

'তুমি যতক্ষণ থাকবে তোমার ইচ্ছে না হলে স্ট্রাইকের কথা বলব না আমরা—'

'তবে ?'

'পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে তোমার রুচি আছে তাই নিয়ে কথাবার্তা হবে। বেশি কিছু বলবার ইচ্ছে না যদি থাকে তোমার, বসেই থাকবে না হয়, আমাদের কথা শুনবে।'

'তোমাদের কথা তো বেড়ালেও শোনে না—'

সোফার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'চলো আমার সঙ্গে ওর এখানে ;—দিনখন ঠিক করে নেয়া যাক।'

'তোমার মেয়েকে স্ত্রীকে নিয়ে যেও সুতীর্থ।'

'আমি বিয়ে করলে তো নিয়েই যেতুম আমার পরিবারকে।'

'তুমি বিয়ে করনি ?'

'কবে করলুম ?'

'এতদিন তো বলে আসছ তোমার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে—'

'পাশগাঁ বলে কোনো জায়গা আছে পৃথিবীতে ?'

'নেই ?'

'তুমি জান যে তা নেই।'

'নেই ? মা, মেয়ে, স্ত্রী নেই ?'

'নেই।'

'কিন্তু ছিল একদিন সব। আমরা যে জায়গার থেকে রওনা হই চলতে চলতে সে জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছই আবার। পৃথিবীটা গোল বলে নয়—আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা বাঁকিয়ে চলে বলে যা ভোগ করেছে—অনুভব করেছে সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে চায়। তুমি সম্মুখে তো চলেছ সুতীর্থ—কিন্তু ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছঃ যা দেখেছিলে বুঝেছিলে সেই সীতা—নাকি সেই সোনার সীতার দিকে।'

সুতীর্থ পায়চারি করতে করতে থেমে গিয়েছিল; আবার পায়চারি শুরু করে বললে, 'খুব আশ্চর্য কথা বলেছ তুমি। এরকম কথা সেকালের গ্রীসে সিবিলরা বলত। স্ফিংস বলত। ঈডিপাস ছাড়া কেউ স্ফিংসের হেঁয়ালির উত্তর দিতে পারেনি। তুমি যা বললে তার মানে বার করতে হলে অনেক দিন বসে চিন্তা করতে হবে।'

'কর চিন্তা।' মণিকা আস্তে আস্তে বললে।

'কিন্তু আমি কি ঈডিপাস?'

'তা তুমি জান।'

সুতীর্থ সোফায় এসে বসে যে সব বই অনেক আগে সে পড়েছিল, যে সব ছবি প্রতিনিয়তই চোখে এক সময় ভাসত তার, ইসকাইলাস সোফোক্লসের যে সমস্ত কোরাস প্রবহমান রোদমীর সবচেয়ে বড় বিশেষত্বের মত তার কানে ক্রন্দম করে বেজে উঠত, তার চিন্তা চেতনাকে প্রসৃতি ও সুগভীরতা দান করত এক সময় সেই সব কথা ভাবছিল। কোথার থেকে সে কোথায় চলে এসেছে। অন্তরপীঠ ছেড়ে সে বাইরে এসেছে—বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে? সত্তার বেশি বিকাশ হচ্ছে তার? বেশি সত্যকে পাচ্ছে সে? না, তা নয়। বরং আগেকার সেই অধ্যয়ন ভাবনা সংকল্পনার পৃথিবীতেই বস্তুকে বুঝি পেয়েছিল সে—বস্তুর অক্ষ থেকে একেবারে অন্তিম উঁচু অব্দি সমস্ত নিরতিশয় বিকাশের ভেতর; বস্তুর উচ্চ, নীচ, নীচকে মনে রেখে উঁচু মর্মমঙ্গলা ভিত্তিই যে যথার্থ সত্য এ উপলব্ধিকে ধারণ করবার মত নির্মল ও নির্বিদ আধার হিসেবে নিজের মনকে পেয়েছিল সে; এ মন নিয়ে এতদিনে মহাভারতের বড় অবশ্য গল্পকার হয়ে উঠবার কথা তার, সোক্রাতেস, সোফোক্লেস ও প্লেটো আইনস্টাইনের ঋষিমিশ্র এক আশ্চর্য আত্মা হয়ে উঠবার কথা। কি হয়েছে সে? কি বলছে? কি করছে?

'যেতে হবে কখন?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'কোথায়?' চারদিককার সময় ও পরিসরের ভাসমান বিশৃঙ্খলার ভেতর একজন নারী একটি কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে টের পেল সুতীর্থ যেন হঠাৎ।

'মুখুজ্যের ওখানে।' মণিকা বললে।

'যাবে তুমি?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

সুতীর্থ উপলব্ধি করল যে আবার যেন সে ধুলোর পৃথিবীতে এসে পড়েছে; ধুলো কাদা রক্ত পৃথিবীকে জয় করে আলোর পৃথিবী বার করবার জন্যে কে যেন তাকে বাছের বাছ মর্দ টেনে এনেছে। কোৎকা গাছে হেলান দিয়ে এই তালপাতার সেপাইগিরিই ভালো লাগছে তার, এই একটু আগের আশ্চর্য হিরণ মেঘগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে মাটি পৃথিবীতে নেমে তিতু মীরের তাড়ুস লাভ করতে লাগল আস্তে আস্তে সে; মনে হয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

'হ্যাঁ চলো মুখার্জির ওখানে, কি করবে, বেড়ালের পায়েও তো ধরতে হয়।' সুতীর্থ বললে।

'কেন?'

'গলায় কাঁটা ফোটে যদি বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়।'

'আমার গলায় কোথায় ফুটল?'

'আমার ফুটেছে।

গয়ানাথ মালোর খুনের ব্যাপার নিয়ে স্ট্রাইকের বাইশ দফা নিয়ে স্ট্রাইক চালানো নিয়ে সুতীর্থের গলায় কাঁটা ফুটেছে, উপলব্ধি করছিল মণিকা; চৈতন তো সুতীর্থ; মুখুজ্যে হয়তো চৈতনকে বলেছে, মণিকা দেবীকে মুখুজ্যের রাতের বৈঠকে নিয়ে গেলে সুতীর্থের গলার কাঁটা বের করে দেবে সে। যাবে কি সে? চৈতন বটে—তবুও চৈতনকে ভালোবাসে মণিকা; ভালোবাসে কি সুতীর্থকে? সত্যিই গলায় কাঁটা ফুটেছে—তুলে দেবে কি মুখুজ্যে? কাঁটা তোলবার অন্য কোনো উপায় নেই? বেড়ালের পায়েই ধরতে হবে গিয়ে?

'কখন যেতে হবে মুখুজ্যের ওখানে?'

'রাতের বেলায়।'

'দিনে হবে না?'

'না। বড্ড ব্যস্ত থাকে সারাদিন। অনেক লোকজনের হল্লা। রাত দশটা অব্দি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না।'

'কটা আন্দাজ যেতে হবে?'

'এই সাড়ে দশটা এগারোটা—'

'ফিরব কখন?'

'আড়াইটে তিনটের সময়—ওর গাড়ি নেই।

মণিকার রক্ত ঠান্ডা হয়ে আছে। নিজের অনুভূতিকে বিদ্যুতের বাহক বানালে রক্ষা নেই আজকের এ পৃথিবীতে। প্ররোচনা ও উত্তেজনার হাত এড়িয়ে, সৎ রসিকতার আশ্রয় নিয়ে কখনও কখনও বা নিজেরই স্থিরতায় সহিষ্ণুতায় শান্ত হয়ে থাকতে হবে—সিদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

'তোমার সঙ্গে আমি যদি যাই মুখুজ্যের ওখানে যা চাচ্ছ পাবে তুমি সতীর্থ?'

'গয়ানাথ মাল্লোর ব্যাপার চাপা পড়ে যাবে। কথা দিয়েছে আমাকে মুখার্জী।'

'যে মানুষকে তুমি খুন করনি, খুন করেছে মুখুজ্যে, সেই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য তুমি দেবে ঘুষ?'

'তুমি তো ইতুপুজোর ঘট ভাসিয়ে দিয়ে কথা বললে, কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম গড়িয়েছে দেখছ না—

'আমি কেন দেখতে যাব? আমি কে? আমি এ সবের ভেতর নেই তো।'

'নেই? মুখার্জিকে এখানেও ডেকে আনতে পারি। আনব? এ বাড়ির থেকে তুমি অবিশ্যি তাড়িয়ে দিয়েছিলে তাকে। সতীর্থ বললে।

সতীর্থের কথায় মর্মভেদী ছেলে-মানুষী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে চোখ বুজল মণিকা। কিন্তু বিষয়ই বিষ, বিষয় মাতায় মানুষকে, বিষয় নিয়ে মেতে উঠলে, দেখ, কেমন বড় গড়নের মানুষ কি রকম চিমসে হয়ে যায়—কি বলে, কিভাবে, কি করে।

'এ স্ট্রাইক আমায় চালাতেই হবে। তুমি সাহায্য করলে ভালোই হত। হয়তো কুড়ি দফাতেই রাজি হয়ে যাবে মুখার্জি। কিংবা তুমি যদি আর কিছু বেশি খুশি করতে পার তাকে—

মণিকা সোফায় এক কিনারে মাথা কাত করে চোখ বুজে ছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সতীর্থকে স্বচ্ছ জিনিসের মত দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করে দূরতর কোনো কিছুর দিকে যেন তাকিয়ে মণিকা বললে, 'খুশি করতে পারি যদি? কি দিয়ে?'

'বিরূপাক্ষকে কি দিয়ে করেছিল অন্ধকারের ভেতর? আমি তো সেখানে ছিলুম না।'

কিছু যে করেনি, কিছু যে হয়নি, বিরূপাক্ষের ব্যাপারটা যে কিছু নয় সেটা খুব ভালো করে জেনেও সতীর্থের রক্তে গোত্রান্তরের বিষ ঢুকেছে বলেই সে যা বললে সেই কথাটা বলা সম্ভব হল তার পক্ষে। কিন্তু নিজের রক্ত নির্মল—শুদ্ধ ছিল মণিকারও স্নিগ্ধ ছিল—ঠান্ডা ছিল; সে চুপ করে রইল।

'সেদিন সেই বেশি রাতের অন্ধকারের ভেতরে কি হয়েছিল—কিনা হয়েছিল তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তোমার সুপ্ত শরীর জানে। এবারেও আধার আধেয় নয়। তোমাকে নিজেকে কিছু জানতে হবে না।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সতীর্থ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখল মণিকা সেই জায়গাতেই সেইরকম ভাবেই কেমন যেন একটা সাদা নারী সারসের ছায়ার মতন নিঃশব্দ হয়ে বড়, গোল, রোদ্র পরিবেষ্টনীর ভেতর বসে আছে।

'এখনও বসে আছ তুমি।' মণিকাকে বললে সতীর্থ। মণিকার মুখোমুখি সোফায় বসে সতীর্থ বললে, 'ছেড়ে দেব এসব। মল্লিকের কাছে যাব আজ—আমাদের ফার্মের। তাকে গিয়ে আমি বলব আমাকে কাজে বহাল করে নিতে। নেবে বলেই মনে হয়। না, যদি নেয়, তাহলে কোনো একটা কলেজে ঢুকে পড়ব।'

'স্ট্রাইক হয়ে গেল?'

'যারা বড় লীডার ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। কিন্তু আমার মতন চুনোপুঁটির তো সব সময় স্ট্রেচার নিয়ে হাজির থাকবার কথা: ওটা কে গেল? ইয়াসিন বুঝি, এটা? লছমন, আর ওটা বড়রাম সেটা মাকুরাম, এই লাসটা। পাঁচীর, ওটা খোকনার। কিন্তু মানবকে তলাতে গিয়ে মানুষগুলোকে গণ্যই করছি না। আমি আজকাল। এটা খারাপ হচ্ছে। অবিশ্যি একটা বেশ ঘনিয়ে ফাটিয়ে বিপ্লব এলে কেই বা থাকবে ব্যক্তি, কোথায় থাকবে মানব। কিন্তু সেরকম বিপ্লবের একটা মাছিকেও তো উড়তে দেখা যাচ্ছে না এখনও; মিছে-মিছি তবে কতগুলো ঘরপোড়া গরু নাচিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে আজকের হাতের কাছের মানুষগুলোর দুঃখ দরদ সম্বন্ধে কাঠ হয়ে থাকলে চলবে কেন! বিনিময়ে সে বিপ্লবের উজ্জ্বল উপকারগুলো পাওয়া যাবে না।'

সতীর্থ বললে, 'সত্যিই কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি। এই ধর্মঘটীদের বা তাদের জেনানা-দের ছেলেপুলেদের দিনরাত্রির বস্তির দুঃখ-কষ্টের ওপরে চলে গেছি যেন,—কিংবা নিচে তলিয়ে গেছি; সেখানে মানুষ মরলে বাঁচলে কিছু এসে যায় না, কিন্তু মানুষের ভালোর জন্যে চিন্তা—মানে ভাবনাগ্রন্থির সরসতটা ঠিক থাকা চাই নিতান্তই নিজে চরিতার্থ করবার জন্যে। দেখলাম ও আমার ধাতে সয়না। হওয়া উচিত ছিল হয় তো অন্য কিছু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি মানুষ —আমি মানুষ, আমরা মানুষ মণিকা।'

সতীর্থ চুরুট জ্বালাচ্ছিল—একটা দুটো তিনটে দেশলাই কাঠিতেও কিছু হল না।

'তুমি, গয়ানাথ। ইয়াসিন, হামি মকবুল, বিশ্বম্ভর—সব—'

'তুমি নিজেও তো?'

হ্যাঁ, সে নিজেও তো ব্যক্তি মানুষ। চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে কিছু বললে না সতীর্থ, যা বলবার একটু আগেই তা বলেছে।

'এদের সকলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে? একথা যদি মনে করে থাক তুমি তাহলে খুক কেটে চলে যাবে বুঝি?' মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, মানুষদের নিকেশ করে মানবতাকে মঙ্গল করবার মত ফরাসী রুশ বিপ্লবের নায়ক হবার সে দাবী আমার নেই। মহাত্মার অপর পথ আমি মোটেই ধ্যান-সাধ্য মনে করতে পারছি না। কোনো তৃতীয় পথ দেখছি না। মানুষ নিয়েই থাকতে হবে আমাকে। মানবতাকে এগিয়ে কিংবা তলিয়ে দেবার জন্যে লোহার কার্তিকের দরকার কিংবা মায়া-কাজলের: লেনিন গান্ধী কল্কীর।'

(ক্রমশ)

নীললোহিতের চোখের সামনে

কে একজন হুংকার দিয়ে বলল—এই কে রে ওখানে?

একখানা দেড় তে কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি পাবার দারুণ বাসনা ছিল আমার এক সময়। চকচকে কড়িটানা সেরকম কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি দোকানেও কিনতে পাওয়া যেত না। সেরকম ঘুড়ি শুধু রায়দের বাড়ি থেকে আলাদা অর্ডার দিয়ে তৈরি করা।

রায়দের ঐ ঘুড়িগুলিকে আমরা বলতাম গুন্ডা ঘুড়ি। আকাশের অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ হুড়মুড় করে নেমে এসে পাড়ার সব ঘুড়ি কেটে সাফ করে দিয়ে যেত। কখনো যে ওদের ঘুড়িও কেটে যেত না তা নয়, কিন্তু কাটলে তক্ষুনি ঠিক ঐ রকম আর একটা ঘুড়ি রায়দের বাড়ি থেকে উড়ে এসে প্রতিশোধ নিয়ে যেত।

রায়দের ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে আর একটা বিশেষ চালিয়াতি ছিল। যে ঘুড়ি একবার তারা আকাশে ওড়ায়, সেটা আর তারা মাটিতে নামায় না। সন্ধেবেলা, যখন তারা পাড়ার আর সব ঘুড়িকে কেটে ছারখার করেছে, তারপর তারা নিজেদের ঘুড়ির সুতো ইচ্ছে করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত।

সেই ঘুড়ি ধরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত পাড়ার ছেলেদের মধ্যে। সাধারণত সন্ধেবেলায় সেই শেষ ঘুড়ি উড়ে যেত অনেক দূরে, অন্য কোনো পাড়ায় কিংবা মনে হতো যেন নিরুদ্দেশে। আকাশের অনেক উঁচুতে ঐ কালো চাঁদিয়াল রাত্রির সঙ্গে মিশে যাবে, কোনোদিন মাটিতে নামবে না। কেউ কেউ অবশ্য বলতো, ঐ ঘুড়িগুলো উড়ে গিয়ে গঙ্গায় পড়ে। রায়রা প্রত্যেকদিন ঐভাবে ঘুড়ি দিয়ে গঙ্গা পুজো দেয়। উত্তর কলকাতায় আমাদের পাড়া থেকে গঙ্গা খুব দূরে ছিল না।

অবশ্য পাড়ায় দু'তিনজন ছেলে ঐ ঘুড়ি ধরেছে, তারপর সগর্বে সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছে। যাদের ঘুড়ি ওড়াবার নেশা আছে বা কখনো ছিল, তারা বুঝতে পারবে সুতো সমেত একটা জ্যান্ত ঘুড়ি ধরে ফেলার আনন্দ কতখানি। লটারিতে টাকা পাওয়ার চেয়েও বেশী। ঐ কালো চাঁদিয়াল যে ক'জন পেয়েছে, প্রত্যেকেই সেটা টাঙিয়ে রেখেছে ঘরের দেয়ালে, বিশেষ কোনো প্রাইজের মতন।

আমি কখনো পাইনি। সেইজন্য আমার মনের মধ্যে বেশী তীব্র দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ তীব্রতর হল আরও একদিন, যেদিন আমি ঐ রকম একটা ঘুড়ি পেয়েও হারিয়েছিলাম!

সেদিন সন্ধেবেলা রায়রা হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিয়েছে, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছি। হাওয়ায় বেশ জোর ছিল, আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যদি গঙ্গা পর্যন্ত যেতে হয়, তাও গিয়ে দেখে আসবো!

কিন্তু সেদিন ঘুড়িটা বেশী দূরে গেল না, আহিরীটোলার কাছে এসে গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে নীচে নামতে লাগলো। আমি তাকিয়ে দেখি, আমার পিছনে আর কোনো অনুসরণকারী নেই। আবছা আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে, অন্য কেউ আকাশের ঐ কালো রঙের ঘুড়িটা এখন দেখতেও পাবে না। শুধু আমার চোখই ওকে দেখবে।

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। তাহলে সত্যিই এতদিন বাদে আসবে আমার হাতে রায় বাড়ির কালো চাঁদিয়াল। এতদিনের স্বপ্ন!

ঘুড়িটা শেষ গোত্তা খেয়ে পড়লো একটা বাড়ির উঠোনে। আমিও কোনো চিন্তা না করে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম।

বাড়িটা আমার মুখ চেনা। সেটাও আর এক রায়েদের বাড়ি। পুরোনো কলকাতার বনেদী বেনেদের বাড়ি যেমন হয়। সামনে লোহার গেট, এক সময় সেখানে দারোয়ান থাকতো। এখন থাকে না। হয়তো সেখানে এক কালে গেটের মাথায় নহবৎখানায় নিত্য গানবাজনাও হতো—এখন ইঁট ভেঙে পড়ছে। ভেতরে খানিকটা বাগান, এককালে সেখানে ছিল ফোয়ারা ও নগ্ন নারীমূর্তি—এখন আগাছার জঙ্গল। নারী মূর্তির নাক ভাঙা, হাত ভাঙা। এক পাশে আস্তাবল, জুড়িগাড়ির ঘোড়াগুলো রাখার জন্য—এখন ঘোড়া জুড়িগাড়ি কিছুই নেই—আস্তাবলটায় একটা সাইকেল সারাবার দোকান হয়েছে।

যাওয়া আসার পথে বাড়িটা অনেকবার দেখেছি। ও বাড়ির একটা ছেলে একসময় আমাদের স্কুলে পড়তো, পড়াশুনোয় একেবারে অগামার্কা, ক্লাস এইটে উঠেই পড়া ছেড়ে 'বিজনেস' করতে চলে গেল।

বাড়ির গেটটা হাট করে খোলা, সুতরাং সে বাড়ির বাগানে গিয়ে ঘুড়ি ধরার জন্য কোনো দ্বিধাই করিনি। ঘুড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা পেয়ারা গাছে। সুতোটা নীচে ঝুলছে। সুতোটা ধরে সবে মাত্র টান দিয়েছি, এমন সময় কে একজন হুংকার দিয়ে বললো, এই কে রে ওখানে?

তাকিয়ে দেখলাম; আমাদের সঙ্গে যে গজেন পড়তো, তার মেজ কাকা। অর্থাৎ এ বাড়ির মেজবাবু। গজেনের মুখে শুনে-ছিলাম, উনি রেস খেলেন। অবশ্য যে ঠিক কী রকম খেলা, তা তখন জানতাম না!

মেজবাবুর বয়েস তখন বেশী না, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হবে। চেহারা ও গলার আওয়াজ ঠিক বনেদীবাড়ি সুলভ। ধপধপে ফর্সা রং, লম্বা, মুখে একটা পুরুষ্টু গোঁফ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। একটা সাদা গেঞ্জি আর সিল্কের লুঙ্গি পরে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে একটা সোনার তাগা।

আমি বললাম, আমার ঘুড়িটা এখানে পড়েছে, তাই নিতে এসেছি!

কে তোকে ভেতরে ঢুকতে বলেছে? এই রঘু, দ্যাখ তো!

আমি তখনও ঘুড়িটা ধরে টানছি! সেটা নেমে এলেই দৌড়ে পালাবো। ঘুড়িটা সহজেই গাছ থেকে নীচে এসে পড়লো। কিন্তু আমি সেটা তুলে নেবার আগেই একজন হুঁৎকো মতন লোক ভেতর থেকে এসে আমার ঘাড় চেপে ধরলো!

আমি বললাম, ওটা আমার! ওটা আমার!

লোকটা পা দিয়ে ঘুড়িটা চেপে ধরে আমাকে জোরে একটা ধাক্কা দিল। ওপর থেকে মেজোবাবু বললে, রঘু, ওটা ওপরে নিয়ে আয়।

আমি বুঝলাম, ঘুড়িটা আমি পাবো না। কিন্তু এই লোকটা আমাকে মারবে কেন?

আমি মেজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখুন, ও আমায় মারছে!

মেজবাবু হ্যা-হ্যা- করে হেসে বললো, মারবে না কি আদর করবে? যত সব চোর ছ্যাঁচোড় যখন তখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে।

আমি অভিমানের সঙ্গে বললাম, আমি গজেনের বন্ধু।

মেজবাবু বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে বললো, তবে আর কি, কৃতার্থ করেছ! গজেনের বন্ধু। সবকটাই তো হতভাগা! বদমাইশ! যা ভাগ্ এখান থেকে!

কালো চাঁদিয়ালটার দিকে আর একবারও না তাকিয়ে আমি ধীর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। আমার সারা গা জ্বালা করছে। ঘাড়ের কাছে কেউ যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে। বাড়িটার সামনে রাস্তায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, সমস্ত পৃথিবী আমার শত্রু।

তারপর সেই বাড়িটার গায়ে থুক্ করে থুতু ফেলে বললাম, তোমায় আমি দেখে নেবো, শালা?

জীবনে সেই প্রথম শালা কথাটা উচ্চারণ করলাম আমি!

কিন্তু এক বনেদী বাড়ির মেজোবাবুকে আমার মতন সামান্য এক স্কুল মাস্টারের ছেলে কীভাবেই বা দেখে নেবে! কোনো প্রতিশোধই নেওয়া হলো না। শুধু মনের মধ্যে রাগ পোষা রইলো। মাঝে মাঝে ঐ বাড়িটার পাশ দিয়ে যাই, আর ঘৃণার চোখে তাকাই। লোকটার মুখ আমি ভুলিনি, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে।

ঘুড়ি ওড়ানো বা ঘুড়ি ধরার শখ অবশ্য আমার কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল। আকাশের দিকে চোখ আটকে রাখবার বদলে আজ মাটির পৃথিবীতে অনেক কিছু দেখার মতন পেয়ে গেছি।

কলেজে পড়ার সময় একদিন আমার জীবনের প্রথম বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গেছি গঙ্গার ধারে। হঠাৎ দারুণ বৃষ্টি। নদীর ধারে বৃষ্টিতে ভেজার মতন আনন্দের আর কিছুই নেই। সব লোক যখন ছুটোছুটি করছে আমরা দুজন তখন মন্থর পায়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। খুব জোর বাতাস দিলে বৃষ্টিকে মনে হয় পাতলা চাদর। গঙ্গার ওপর তখন শত শত পাতলা চাদর উড়ছে।

ভালো হলো। কিন্তু ফেরার পথে ঐ রকম ভিজে জামাকাপড় নিয়ে ট্রাম বাসে ওঠা যায় না। মেয়েদের পক্ষে ভিজে শাড়ি পরে পথ দিয়ে হেঁটে আসারও অসুবিধে আছে। আমার পকেটে চারটে টাকা ছিল, সেটা দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে ভরে রেখেছিলাম, যাতে ভিজে না যায়। সুতরাং অনায়াসেই ট্যাক্সি চাপতে পারি। কিন্তু ট্যাক্সি আর কিছুতেই পাই না। ঠিক এই সময় কোনো ট্যাক্সিই কি খালি থাকতে নেই। বহু ছুটোছুটি করলাম, বান্ধবীর কাছে আর প্রেস্টিজ রাখা যায় না।

তারপর একবার রাস্তার উল্টো দিকে একটা ট্যাক্সি থামলো। তক্ষুণি খালি হলো। আমরা দুজনেই ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! করে চেঁচাতে লাগলাম। ড্রাইভার আমাদের দেখলো। আমরা ছুটে রাস্তা পার হয়ে এলাম। কিন্তু ট্যাক্সিটার কাছে পৌঁছানোর আগেই আর একজন সিল্কের পাঞ্জাবী

পরা লোক দরজা খুলে ঝট্ করে উঠে বসলো।

আমি গিয়ে বললাম, একি, আমরা আগে ডেকেছি!

লোকটা আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ড্রাইভারকে বললো, চলো, চলো!

আমি ড্রাইভারকে বললাম, কেয়া? হামলোগ আগে নেহি বোলায়া?

ড্রাইভার বললো, হাম কেয়া করেগা!

আমি সিল্কের পাঞ্জাবীকে বললাম, আপনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন না। আমরা আগে এটা ডেকেছি!

লোকটা উত্তর দিল না। ড্রাইভারকে বললো, চলো! দেরি কাঁহে করতা!

এবার আমি লোকটাকে চিনলাম। সেই রায়বাড়ির মেজোবাবু। আমার মনে পড়ে গেল পুরনো কথা। সেই সুন্দর নির্দয় মুখ। মনে হলো, এই লোকটা আমার জীবনের চরম শত্রু।

ট্যাক্সি ছেড়ে গেল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ঠিক আছে, একদিন দেখে নেবো।

তাও কিছু দেখে নেওয়া হয়নি!

এর পর অনেকদিন কেটে গেছে। সে

পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি অনেকদিন। উত্তর কলকাতার ঐ অঞ্চলটায় আর যাওয়াই হয় না। বছর পঁচেক বাদে একদিন হঠাৎ কোনো কারণে ঐ পাড়ায় গিয়ে চমকে উঠলাম। সি আই টি থেকে নতুন রাস্তা বানিয়েছে, তাতে সেই রায় বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সে বাড়ির আর চিহ্নও কোথাও নেই। রায়বাড়ির বাগানে যে-জায়গাটায় আমি ঘুড়ি ধরতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলাম. আন্দাজে বুঝলাম, সেই জায়গাটা এখন রিকশা স্ট্যান্ড হয়েছে। কুড়ি পঁচিশখানা রিক্‌শা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেললে অনেকের দুঃখ হয়। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে আমার একটুও দুঃখ হলো না। মনে মনে বললাম, বেশ হয়েছে। এই সমস্ত পুরোনো বাড়ি না ভাঙলে শহরের উন্নতি হবে কী করে? রাস্তাটার জন্য উপকার হয়েছে কত লোকের!

এর পরও কেটে গেছে বেশ কিছু বছর। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি আমার এক পরিচিত প্রেসের অফিস ঘরে বসে চা সিংগাড়া খাচ্ছি—এমনসময় একজন বুড়ো মতন লোক ঢুকে টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

প্রেসের মালিক জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই?

লোকটি একটা ছোট বাক্স খুলে কিছু সস্তা ধরনের পেন আর ডট পেন্সিল বার করলো. তারপর বললো, আমরা এগুলো নতুন বার করেছি. যদি লাগে. একদম নাম্বার ওয়ান জিনিস—

প্রেসের মালিক বললেন, এটা ছাপাখানা মশাই। এখানে পেন-পেন্সিল দিয়ে কী হবে? এটা তো ইস্কুল নয়।

লোকটি বললো. তাও যদি একটু ট্রাই করে দেখেন। বাঙালীর তৈরি—

চেহারা দেখে বুঝতে পারিনি, গলার আওয়াজে চিনতে পারলাম। সেই রায়বাড়ির মেজোবাবু।

এতটা তো বুড়িয়ে যাবার কথা নয়। ফর্সা, লম্বা সুপুরুষ ছিলেন। এখন চেহারাটা পাকিয়ে গেছে, কুঁচকে গেছে মুখের চামড়া। গায়ের জামাটা খুব ময়লা হলেও সিল্কের। গলার আওয়াজটা অবশ্য সেইরকম বাজখাই আছে—অনেকটা যাত্রা-দলের সেনাপতির মতন।

আমি স্তম্ভিতভাবে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি আমাকে চিনতে পারেনি, চেনবার কোনো কথাই নয়। কিন্তু আমি ভুলিনি। কৈশোরের ক্রোধ ও অভিমান কখনো মোছে না। এই আমার সেই জন্মশত্রু, যার ওপর আমার প্রতিশোধ নেবার কথা। সে এত কাছে।

কিন্তু এর ওপর আমি কী প্রতিশোধ নেবো? ওর ওপর আমার আবার রাগ হলো। কেন ও আমার প্রতিশোধের অযোগ্য হয়ে গেল? ও যদি শক্ত সমর্থ চেহারায় আগেকার মতন দর্প নিয়ে এখন এসে এখানে দাঁড়াতো, আমি ঠিক উঠে দাঁড়িয়ে ওকে অপমান করতাম। কিংবা ওকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান জানাতাম। তার বদলে ও কেন এমন মলিন, এমন হতশ্রী. দুর্বল হয়ে আমার সামনে এলো? ও আমাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিল না। আমার আগেই অন্য কেউ, কিংবা অনেকে ওর ওপর সেই প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে।

লোকটি তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছিল, প্রেসের মালিক বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে যান না মশাই। বলছি তো লাগবে না! এটা কি ইস্কুল?

লোকটি বললো, একটা অন্তত নিন!

ট্রেনের কামরায় এরকম কলম ফেরি করতে দেখেছি, কিন্তু লোকের বাড়ি বাড়ি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যবসাটা আপনার নিজের? মানে, আপনার কোম্পানি?

লোকটি বললো, না, না, [illegible] এজেন্সি নিয়েছি।

রেসের খেলা ছেড়ে দিয়ে কেন যে এই এজেন্সির খেলা উনি খেলতে নামলেন, তা বুঝলাম না। আমি মুখ ফিরিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

লোকটি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছিল. আমি ডেকে বললাম, ঠিক আছে, আমাকে একটা দিন। একটা ডট পেন কিনবো কিনবো ভাবছিলাম।

দেড় টাকা দাম, দু' টাকার নোট দিলাম। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে তালুর ওপর রেখে খুব সাবধানে গুণতে লাগলো, ভূতপূর্ব রায়বাড়ির মেজোবাবু। তারপর জিভ কেটে বললো, এই রে, পাঁচ নয়া কম আছে যে!

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই দিন!

—আজ্ঞা স্যার, নমস্কার, খুব উপকার করলেন—

আমি আর ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ ॥ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য

শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য। ডঃ নিতাই বসু। পরিবেশক, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : পনের টাকা।

অসামান্য জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। যে স্তরে পৌঁছলে কোন কীর্তিমান ব্যক্তির সমালোচনা দেশবাসী সহ্য করে না, শরৎচন্দ্র প্রায় সেই স্তরে পৌঁছে গেছেন।

'শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে লেখক শরৎচন্দ্রকে সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই গবেষণা গ্রন্থটির মধ্যে অপ্রিয় প্রসঙ্গও অনেক আছে। লেখকের ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যজীবন, প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রত্যেকটি তথ্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেই সমালোচক সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাই গ্রন্থের মধ্যে কোনরকম চমকপ্রদ ভাষণের সুযোগ নেই।

'দেশকালের প্রতিক্রিয়া' পর্যায়ে স্বদেশ শরৎচন্দ্রকে কতোটা প্রভাবিত করেছে এবং স্বদেশের বিভিন্ন ঘটনার সংগে, মূলত সাহিত্য আন্দোলনের প্রশ্নে, তিনি নিজেকে কতোটা জড়িয়ে ছিলেন পুরনো পত্রপত্রিকা ও চিঠিপত্রের সাহায্যে সমালোচক সেগুলি তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর অনুরাগ বিরাগের ইতিহাস, অনুজ লেখক অন্নদাশঙ্কর বুদ্ধদেব বসুর সংগে তাঁর সংঘর্ষ এবং সমকালের লেখকদের প্রতি শরৎচন্দ্রের আক্রমণাত্মক কটূভাষণ এই গ্রন্থে তথ্যসহ আলোচিত—যা সেণ্টিমেণ্টাল মানুষে শরৎচন্দ্রকে বুঝতে সাহায্য করবে। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল না, বরংতো বা আবেগের দ্বারা তিনি প্রধানত চালিত হতেন, এই ধরনের বক্তব্য তুলে ধরে এবং যুক্তিসহ তা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় সমালোচক সাহস ও সততার পরিচয় দিয়েছেন।

'চরিত্রচিত্রণ'—অধ্যায়ে শরৎ সাহিত্যের মূল ত্রুটিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। সমালোচক বলেছেন তাঁর সাহিত্যের নারী বন্দনার জন্যই শরৎচন্দ্র মূলত 'নারীদরদী' লেখক বলে খ্যাত। বাংলা সাহিত্যের সতীত্বের আবহমান জয়গানে তিনি গলা মিলিয়েছেন বিদ্রোহী ভাবমূর্তি যতোই গড়ে উঠুক না কেন, তিনি সার্থক ছিলেন ঋজু স্থিতিস্থাপকতায়। প্রচলিত সমাজ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কখনও যাননি।

তবে সংলাপ রচনায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতায়, বিচিত্র মানসিকতা রূপায়ণে তিনি যে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়নি। জননী চরিত্র তাঁর পারদর্শিতার নতুন দিগন্ত। বোহিসেবী, উদাসীন, অন্যমনস্ক, পরনির্ভর ও আত্মিক পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র শরৎ সাহিত্য। শিল্পী অথবা ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক অথবা জমিদার-সকলেই একসূত্রে বাঁধা। সব্যসাচী রাজেন ব্রজানন্দ বা ইন্দ্রনাথ কিছুটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করলেও সমালোচক সাহসের সংগে বলেছেন এরা কেউ সাংসারিক বা সামাজিক মানুষ নয়, রাজনীতি বা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত সমাজে স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত হয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এদের কারো ছিল না।

রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোকে সমালোচক যেখানে শরৎচন্দ্রকে বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ ছিল না, কি জীবনে কি সাহিত্যে তিনি সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। আর অর্থনীতি? সে তো আরো শোচনীয় অবস্থা! জমিদার যদি উদার প্রকৃতির মানুষ হন, তাহলে শরৎচন্দ্রের প্রচুর শ্রদ্ধা তিনি আদায় করতে পারেন।

তবে নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তিনি বারবার থেকেছেন, প্রয়োজনের সময় সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে পরম শ্রদ্ধার সংগে সে কথা উল্লেখ করেছেন সমালোচক।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর গতিশীল ভাষা। যার জন্য সমালোচনা গ্রন্থ হয়েও সুখপাঠ্য। শরৎ গ্রন্থপঞ্জী, আবার গ্রন্থের তালিকা এবং নির্ঘণ্ট—এই গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

বিজ্ঞান :

গাণিতিক পরিভাষা (প্রথম খণ্ড) : অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেণ্ট অভ ম্যাথমেটিকস টিচিং, ২৫ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। এক টাকা।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান গণিত পঠন পাঠনের সব চাইতে বড় অন্তরায় যে পরিভাষা জনিত অভাব এটা সর্বজন স্বীকৃত। স্বর্গত রাজশেখর বসু এ ব্যাপারে কিছুটা সচেষ্ট হলেও বিজ্ঞানের সম্প্রসারিত আঙিনায় তাঁর সে চেষ্টা অনেক বেশি সীমায়িত। পরিভাষা সংকলন বা

তৈরির ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন অনেক দিন আগে। কাজ এগোয়নি। খানিকটা অসমন্বয় এবং বেশির ভাগই দীর্ঘসূত্রতার দরুন। ইতিমধ্যে বে-সরকারী কিছু সমিতি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু তা উদ্যোগের মধ্যেই থেকে যায়। সুখের কথা এমন বড় একটি গুরুদায়িত্ব নেবার জন্যে মাত্র বছর দুই আগে এল অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেণ্ট অভ ম্যাথামেটিকস টিচিং। গোড়াতেই এই সংস্থা বলে নিলেন, 'বাংলার পরিভাষা রচনা একটি দুরূহ কাজ এবং শুধুমাত্র গণিতে পারঙ্গম ব্যক্তিবিশেষ বা তাঁদের যৌথ প্রয়াসে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে না।' এর জন্যেই তাঁরা কাজ শুরু করলেন এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গণিতজ্ঞ, গণিত শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনাকার, ভাষাতাত্ত্বিক, দার্শনিক, বিজ্ঞান ঐতিহাসিক, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক প্রভৃতি। দীর্ঘ দুই বছর ধরে এ'রা নিয়মিত এক একটি শব্দ তৈরির জন্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন, ভাষাগত তত্ত্ব এবং ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণ করেছেন, এবং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পরিভাষা তৈরি করেছেন। যার নজির বাংলা পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে এই প্রথম। এর জন্যেই **গাণিতিক পরিভাষা** গ্রন্থটি শিক্ষক, ছাত্র, গণিত লেখক প্রভৃতির কাছে সমাদর পাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম খণ্ডে আছে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বলবিদ্যা, ম্যাথমেটিকেল লজিক বা গাণিতিক ন্যায় এবং কমপিউটার বিজ্ঞান। এ ছাড়া পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে ওই সব বিষয়ের উপর রচনার নমুনা। সুখের কথা সম্পূর্ণ বে-সরকারী এই প্রচেষ্টা এবং সফল প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ। তাঁদের আর্থিক সাহায্য না পেলে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ছাপাই এবং বাঁধাই করা এমন একটি সংকলন মাত্র এক টাকায় দেয়া কখনই সম্ভব হত না।

সমরজিৎ কর

উপন্যাস

হাত নেই। চণ্ডী মণ্ডল। পরিবেশক : বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৯। মূল্য : পাঁচ টাকা।

হতাশা বর্তমান যুগের মারাত্মক অসুখ, সম্ভবত অনেক অসুখের মধ্যে জটিল অসুখ। ক্যান্সারের মত, ধরলে রক্ষে নেই। আজকালকার তরুণ লেখকদেরও বড় অসুখ হতাশা বা অতৃপ্তি এবং তজ্জনিত বিচ্ছিন্নতা। এমন কি তাঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও। ওটাই যেন আধুনিকতার বড় তকমা। অন্তত তাঁরা ভাবেন। কত গোলমাল

ওখানেই। যাঁরা শক্তিমান, অসুখে মত্ত ধীভুবাজ হোক, তাঁদের ট্রিটমেন্ট জোরালো। রোগ সারে। যাঁদের অভিজ্ঞতা কম, পুরনো রোগ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটান। অসুখ তো সারেই না, বরঞ্চ হাত ফসকে যায়। ব্যাপারটা হয়ে ওঠে উদ্বেগের। চণ্ডী মণ্ডলের 'হাত নেই' পড়ে তাই মনে হল। স্বপ্নেশের মত একজন অসুস্থ যুবককে, যে কি দেহে কি মনে পুরো অসুস্থ, নায়ক করে এবং তার অসুস্থ মানসিকতা—যা তার ক্ষেত্রে যত-না স্বাভাবিক চতুর্গুণ অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য—গোলকধাঁধার মত ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে, কৌশলী বর্ণনায় লেখক আরেকবার প্রমাণ করলেন তিনি বর্তমান যুগের 'হতাশা' নামক অসুখে আক্রান্ত। কারণ স্বপ্নেশ, স্বপ্নেশ নয়—লেখকের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ। অবশ্য পরিণতিতে অসুস্থ স্বপ্নেশের মৃত্যু ঘটেছে। ইংগিত আছে দীপ্ত স্বপ্নেশের জন্ম-প্রকরণের। কিন্তু তা নিতান্তই কাকতালীয়, অনিবার্য পরিণাম নয়। উত্তরণ দর্শানোর বিধিবন্ধ নিয়মকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বপ্নেশ প্রধান চরিত্র হলেও অস্বাভাবিক, বিরক্তিকর। বীণা বউদি, বুলা গৌণ চরিত্র। কিন্তু লেখকের নিপুণ তুলির আঁচড়ে চমৎকার ফুটেছে তারা। রেবা অস্পষ্ট। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাণময়, নিশ্চিতভাবে বাস্তব। হাসপাতাল প্রসঙ্গ উপন্যাসের এক উজ্জ্বল অংশ। স্বপ্নেশের মনোবিকলন ঘটিত কার্যকারণের সূত্র আবিষ্কারে সাইকিয়াট্রিস্টের ভূমিকা মামুলি। প্রসঙ্গত নিজস্ব অভিরুচি অসংগতির বিবরণ যেভাবে স্বপ্নেশ দিয়েছে, তা খুবই ডিরেক্ট, বলিষ্ঠ। ফলে তার চরিত্রের কিছু দানা বেঁধে যায় সেই ক্ষেত্রে। লেখকের গদ্য মন কাড়ে। মৌলিকত্বে চরিত্রবান। অতীব সতর্কতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অপসৃত হলে তা বাংলা গদ্যের সম্পদ হবে।

অমল আচার্য

দুরন্ত মৌসুমী। যতীন দাশ। ভারতী প্রকাশনী। ১৩ কলেজ রো। কলকাতা-৯। ছ টাকা।

নতুন ঔপন্যাসিক। প্রথম বইয়েই প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। এমন একটি বিষয় তার উপন্যাসের প্রতিপাদ্য যে পাঠকের শেষ পর্যন্ত না পড়ে উপায় থাকে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সেখানে কি ভাবে জনমনে বিক্ষোভ জমা হয়েছিল তারই হুবহু রূপচিত্র এই বই। পাত্র-পাত্রী সবাই মুসলমান,—তাদের মুখে আঞ্চলিক কথ্যভাষা। পারিপার্শ্বিক পূর্ব বাংলার সুপরিচিত স্থলভাগ। বইটিকে যদি পুরোপুরির রাজনৈতিক আবেষ্টনীর ফলশ্রুতি ধরি,—তবুও এর মূল্য এবং যথার্থতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। মনে হয়,

ভেজাবে লেখক মুসলমান সমাজ,—আঞ্চলিক ডায়েলকট—শোষক ও শোষিতের বাস্তব চিত্র, আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন তাতে তিনি পুরোপুরি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধ। বইটি এ বাংলার পাঠকদের প্রশংসা ত পাবেই, ওপার বাংলার এক মহান আন্দোলনের দলিল হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু ছাপা-বাঁধাইতে আর একটু যত্ন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

সুনীল বসু

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নামকরণ দেখেই চমকে উঠতে হয়। **তাজমহল হিন্দু মন্দির** (প্রাপ্তিস্থান: সন্দীপন, স্টল নং ৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২, বারো টাকা)—বইটির মূল রচয়িতা পি এন ওক। বাংলায় একটি ঝরঝরে অনুবাদ উপহার দিয়েছেন দীপককুমার ভট্টাচার্য। মলাটে তাজমহলের চির-পরিচিত ছবির পাশে সম্পূর্ণ নতুন ভাবার লেখা—'তাজমহলের উৎপত্তি সম্পর্কে যুগান্তকারী আবিষ্কার।'

আবিষ্কার কিনা এ-নিয়ে নিশ্চিত তর্ক চলবে ঐতিহাসিকদের মধ্যে। তবে ভাবনা হিসেবেও খুব যুগান্তকারী ভাবনা সন্দেহ কী। তাজমহল যে একটি সুপ্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ, শাজাহান জবরদখল ওই প্রাসাদের দেয়ালে কোরাণের বয়েৎ উৎকীর্ণ করে-ছিলেন মাত্র, মমতাজের মৃত্যুর একশ বছর আগে বাবর স্বয়ং ওই প্রাসাদে বাস করে গিয়েছেন, ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে 'তেজ-মহালয়' হিসেবে এই বিশ্বশ্রুত প্রাসাদের উৎপত্তি—এই জাতীয় কিছু অন্যতর ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচলিত সমস্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেবার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ শ্রীযুক্ত ওকের রয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। কিন্তু একথাও ঠিক, চিন্তাকে উসকে দেবার মতো কিছু কিছু তথ্য-প্রমাণ বেশ ভালোভাবেই সাজিয়েছেন তিনি। কৌতূহলী পাঠক বইটি পড়ে ফেললে দ্বিতীয় চিন্তায় মনস্ক হবার খোরাক অবশ্যই পাবেন।

*

ছোটদের কাগজে ছড়াকার শান্তিকুমার দাসের নাম মাঝে-মধ্যেই চোখে পড়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সংবলিত **ঘোড়ায় চড়ে আসছেন মা** (ফুলকি প্রকাশনী, কলকাতা-৬, তিন টাকা) শান্তিকুমারের ছড়িয়ে-থাকা ছড়ার একটি সুষ্ঠু সংকলন। ছড়া যে মর্জি মতন লেখার জিনিস নয়, মেজাজ মতন হাত খুলে খেলার বস্তু—দু-এক কথায় চমৎকারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

শান্তিকুমারের মেজাজ অবশ্যই ছড়াকারের। হাত খুলে খেলতেও জানেন তিনি। 'বাগনানে আটলের পোল/বাঁয়ে ফেলে বাটুলের ঢোল/বাঁকশীর হাটে হেঁটে যায়/চাঁদশীর ডাক্তার রায়।' কিংবা 'আগডুম বাগডুম ঢাগডুম ঘোড়া/কাটুলেট ফিসলেট/খায় জোড়া জোড়া/টগবগ টগবগ/ময়দানে ছোটে/চানা-দানা দেশী খানা/চলে না কো মোটে'—সহজ মেজাজে লেখার চমৎকার দৃষ্টান্ত। প্রথমটিতে চন্দ্র-বিন্দুর প্রাবল্য ছায়াচ্ছন্ন দূরে গ্রামের একটি ছবিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। বাঁশবন, চাঁদ, গাঁ—অনুস্ত এই শব্দগুলিকেও যেন চোখে দেখা যায়। দ্বিতীয়টিতে ঘোড়ার খুরের ধ্বনি কানে এসে লাগে। কিন্তু শান্তি-কুমারের সমস্ত লেখাই যে এত উত্তীর্ণ বলা যাবে না। ছড়ার ফাঁকে-ফাঁকে কিছু কাঁচা পদ্যও জায়গা পেয়েছে।

প্রমথ

বাঁ-দিক থেকে কালো জার্সি গায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাজল ঢালি, আনোয়ার ও হাবিব খাঁ. মাঝখানে মোহনবাগানের তিনজন—উলাগানাথন, হাবিব ও আকবর। ফুটবল লীগের এই দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগান ৩—০ গোলে জয়ী হয়। প্রথম গোলদাতা আকবরকে টেনে তুলছে সহোদর হাবিব —ফটো দেশ

অলিম্পিক কোথায় যাচ্ছে ?

পৃথিবীর প্রতিযোগীদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি শেষ পর্যন্ত মণ্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বাতিল করেননি। তবে অলিম্পিকের নীতি ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নতি স্বীকার করেছেন কানাডা সরকারের কাছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিলানিন বলেছেন, যদি ছয় মাস আগেও তাঁরা কানাডা সরকারের মনোভাব জানতে পারতেন তবে গেমস বাতিল করে দিতেন। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, রাজনৈতিক চাপের কাছে তাঁদের নীতি বিসর্জন দিতে হল!

সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তাইওয়ানের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে। তাইওয়ান "রিপাবলিক অব চীন" নামে আই ও সি-র সদস্য। সেই নামেই তাঁরা অলিম্পিকে অংশগ্রহণের অধিকারী। কিন্তু কানাডা সরকার তাইওয়ানের রিপাবলিক চীনকে স্বীকার করে না। তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯৭০ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে পিকিং-এর "পিপলস রিপাবলিক অব চীন"কে। এদিকে পিকিং আই ও সি-র সদস্য নয়। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিক থেকে পিকিং (চীন) নাম প্রত্যাহার করে নেয় তাইওয়ানের অংশগ্রহণের প্রতিবাদে। দু' বছর পরে তারা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করে। চীন অবশ্য কয়েক বছর ধরে আবার অলিম্পিকে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁদের দাবি—তাইওয়ানকে বহিষ্কার করে তাঁদের সদস্য করতে হবে। এশিয়ান গেমস ফেডারেশন ওই দাবি মেনে নিয়ে চীনকে তেহরান এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করতে দিলেও আই ও সি চীনের অযৌক্তিক দাবি স্বীকার করে নিতে পারেননি।

এখন যেহেতু চীনের সঙ্গে কানাডা সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং তাইওয়ান অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করলে চীন রুষ্ট হবে সেহেতু কানাডা সরকার কিছুতেই তাইওয়ান প্রতিযোগীদের অলিম্পিকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। কিন্তু অলিম্পিকের নীতি, নিয়ম ও আদর্শ হচ্ছে আই ও সি-র সদস্যভুক্ত সব দেশের প্রতিযোগীকেই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। দিতে হবে আয়োজনকারী শহরে প্রবেশের অনুমতি। তার জন্য কোনও ভিসার প্রয়োজন হবে না—অলিম্পিক সংগঠন সমিতির আমন্ত্রণপত্রই ভিসার কাজ করবে। তাইওয়ান প্রতিযোগীদের কিন্তু কানাডা সরকার সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দেশেই ঢুকতে দেননি।

কানাডা সরকারের কাজ বহু দেশই সমর্থন করেনি। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও হুমকি দিয়েছিল—গেমস বাতিল করা হবে। এমন কি, কানাডা অলিম্পিক কমিটিও সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। কানাডা অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হ্যারল্ড রাইট ত্রুদো সরকারকে চুক্তিভঙ্গের দায়ে দায়ী করে বলেছিলেন—অলিম্পিক কমিটির সদস্য প্রতি দেশের প্রতিযোগীদের গেমসে শর্তহীন প্রবেশাধিকার দিতে হবে এই নীতি মেনে নিয়েই মণ্ট্রিলে অলিম্পিক করার জন্য ১৯৬৯ সালে সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সরকারও সেই নীতি মেনে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন সে নীতি না মানা গুরুতর,

কিনসরকারের [illegible] কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী [illegible] বর্তমান প্রধানমন্ত্রী [illegible] কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, সরকারের নীতির ফলে কানাডা বিশ্বের চোখে হেয় হল।

কানাডা সরকারের অযৌক্তিক ও অটল মনোভাবে ২৬টি বিশ্ব ক্রীড়া ফেডারেশনের ২৪টি ফেডারেশনও গেমস থেকে নাম প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছিল। শুধু কানাডাকে সমর্থন করেছিল বাস্কেটবল ও ওয়েটলিফটিং ফেডারেশন, চীন যে দুটি ফেডারেশনের সদস্য। একসময় আমেরিকাও গেমস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে চেয়েছিল। তবু অলিম্পিকস হচ্ছে। কেননা অলিম্পিক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান—চার বছর ধরে যার প্রস্তুতি, উদ্যোগ-আয়োজন, পরিকল্পনা ও সংগঠন।

কিন্তু আজকের বড় প্রশ্ন—অলিম্পিক কোথায় যাচ্ছে? কি তার ভাবমূর্তি? সুদীর্ঘ বারো শো বছর ধরে অলিম্পিক খেলাধুলা চলার পর রাজনৈতিক স্বার্থ এবং অনাচার প্রবেশের ফলেই প্রাচীন অলিম্পিক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খেলাধুলার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তন করেছিলেন ফ্রান্সের মহা-চিন্তানায়ক পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যারন পিয়ের দা কুবার্তাঁ। সেই অলিম্পিকে আবার রাজনৈতিক প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, অবিশ্বাস ও অনাচার দানা বেঁধে উঠছে। সন্ত্রাসের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এর আগেও একাধিকবার নানা দেশের পক্ষ থেকে অলিম্পিক বয়কটের হুমকি উঠেছে। এখন প্রায় প্রতি অলিম্পিকে প্রতিযোগীদের মূত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তারা কোন উত্তেজক ওষুধ খেয়ে বা ইনজেকশন নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে কিনা। এই রকম অসৎ প্রতিযোগীর বাতিল হবার নজিরও কম নয়। মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমেরিকার নিগ্রো প্রতিযোগীদের 'ব্ল্যাক পাওয়ার' ডিমনস্ট্রেশন বা বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়দের পাদুকা উত্তোলনও কি অলিম্পিকের মর্যাদা ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেনি। তার চেয়েও বোধ হয় বড় কথা—আজ প্রতিযোগীদের নিরাপত্তার অভাব? মিউনিখ অলিম্পিকে আরব গেরিলাদের নৃশংস কাণ্ডের জন্যই মণ্ট্রিলে ৯ হাজার প্রতিযোগীর নিরাপত্তার জন্য ১৪ হাজার সৈন্য ও পুলিসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম সারির ক্রীড়াবিদদের মহা-মেলায় শান্তি, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ব্যারন কুবার্তাঁ এই কি সেই অলিম্পিক?

ফুটবল লীগ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ৩—০ গোলে পরাজিত করে মোহন-বাগান প্রথম বড় বাধা অতিক্রম করেছে। বাটার সঙ্গে ড্র করে প্রথম ম্যাচে একটি পয়েন্ট এবং দশম খেলায় টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কাছে আর একটি পয়েন্ট হারালেও মহমেডানের সঙ্গে খেলার আগে সত্যিকারের কোন বাধা ছিল না। দ্বিতীয় বড় বাধা ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন ইস্ট বেঙ্গল। বলা বাহুল্য, ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য সে খেলাটিকে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলাও বলা যেতে পারে। ওই খেলার ফয়সালা হলে বলা যাবে কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হবে। মোহনবাগান অথবা ইস্ট বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হবে এ ভবিষ্যৎবাণী বালকেও করতে পারে। কিন্তু কেউই জোর করে বলতে পারে না অন্য খেলাগুলিতে দুই প্রধান পয়েন্ট হারাবে না। মাঠের বাইরে যদি আগে থেকে খেলার ফল গট-পেটা করা হয়, পৃথক কথা।

আগের তিন দিন বৈকালিক বৃষ্টির এবং ১০ জুলাই খেলার আগে প্রবল বর্ষণের ফলে ওই দিন যাঁরা মোহনবাগান ও মহ-মেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটি দেখতে মাঠে যায়নি তারা সত্যিকারের একটি ভাল ফুটবল ম্যাচ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ৩—০ গোলে যে খেলার মীমাংসা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যেতে পারে সেটা একতরফা খেলা। কিন্তু গোলের সংখ্যা ক্রীড়াধারা ও ক্রীড়াবিন্যাসের সম্যক পরিচয় নয়। মোহনবাগান তিনটি গোল করেছে তাদের সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড়দের শেষ কাজটুকু করার ক্ষমতা আছে বলে। ওই গুণের ঘাটতিতেই মহমেডান গোল করতে পারেনি। ভিজে মাঠে খেলাটি কিন্তু চড়ে-ছিল গতির রথে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ছন্দে ৭০ মিনিটের খেলাতেও ছিল নৈপুণ্য ও সংগ্রামের পরিচয়।

একলব্য

বেস্ট ফুটবলার অফ দি ইয়ার

বেস্ট ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ভেটারেন্স ক্লাবের সভাপতি বাবা সোম ও বেস্ট স্কুল ফুটবলার নরেন দত্ত

ফটো—সেন

কোন্ নিরিখে বছরের সেরা ফুটবলার নির্বাচন করা হয়? ক্রীড়াদক্ষতা এবং মাঠের মধ্যে ও মাঠের বাইরে খেলোয়াড়ের আচার-আচরণের নিরিখে। অর্থাৎ শুধু চোখ ধাঁধানো ফুটবল খেললেই হবে না, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে হলে তোমাকে হতে হবে শিষ্ট, বিনয়ী, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান। এই গুণেই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের রাইট আউট সুরজিৎ সেনগুপ্ত ভেটারেন্স ক্লাবের নির্বাচনে বেস্ট ফুটবলার অব দি ইয়ার-এর সম্মান পেয়েছে। এ নির্বাচন ১৯৭৫-এর ক্রীড়া-ভূমিকায়। ক্রীড়া সাংবাদিকরাও বছর বছর বেস্ট ফুটবলার নির্বাচন করে থাকেন। আশা, তাঁরাও রায় দেবেন সুরজিতের পক্ষে।

ভেটারেন্স ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ সভায় শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের ট্রফিটি হাতে নিয়ে সুরজিৎ অনুষ্ঠানের সভাপতি পুলিস কমিশনার (এখন পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল) সুনীল চৌধুরীকে প্রণাম করতেই সুনীলবাবু মন্তব্য করলেন, বাঙালীর একটি লুপ্তপ্রায় প্রথাকে খেলোয়াড়রাই বাঁচিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, ওই ছোট অনুষ্ঠানে একটি প্রণামের মাধ্যমেই ছেলেটির বিনয়নম্র ব্যবহারের প্রমাণ ফুটে উঠেছিল।

আর একদিনের আর একটি ঘটনা। ১৯৭৪-এর ২৮ জুন তারিখ, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের শেষ খেলা। উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়নের সম্মান করায়ত্ত হতেই আনন্দে উচ্ছ্বাসে আত্মহারা অগণিত অনুরাগী বাঁধভাঙা স্রোতের মত নেমে পড়েছেন মাঠে লাল-হলুদ জার্সিপরা ক্রীড়ানটদের অন্তরের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাতে। একদিকে অপরাহ্ণ বেলার আলো-আঁধারের খেলা, অন্যদিকে গ্যালারিতে হাজার হাজার মানুষের হাতে মশালের মেলা। খেলোয়াড়দের উপর ভালবাসার অত্যাচার একটু থিতু হতেই ক্লাব-সভাপতি খেলোয়াড়দের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে লাগলেন। সুরজিৎ একটু থমকে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল কোচ প্রদীপ ব্যানারজির দিকে। নিজের গলার মালাটি খুলে প্রশিক্ষকের গলায় পরিয়ে দিতেই প্রদীপ গভীর আলিঙ্গনে প্রিয় খেলোয়াড়কে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগ আনন্দ অনুভূতি বিন্দু বিন্দু সুখ হয়ে গড়িয়ে পড়ল দুজনের গণ্ড বেয়ে। মনে রাখার মত এক মুহূর্ত। ক্রীড়া-আচার্যের প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা নিবেদনের ঘটনাটিও।

অসাধারণ ক্রীড়াদক্ষতার সঙ্গে কয়েক বছর ধরেই দেখছি মাঠে ও মাঠের বাইরে ছেলেটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। স্বল্পবাক, প্রচারবিমুখ এবং কিছুটা আত্মস্থ। খেলায় হার-জিৎ আছে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জয়ে যেমন উচ্ছ্বাস নেই, তেমন পরাজয়ে নেই বড় রকমের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যে ফুটবল ওকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পরিচিত করেছে সেই ফুটবল সম্পর্কে অসম্ভব সিরিয়াস।

"আমি যখন খেলি তখন অন্য কোন চিন্তা আমার মাথায় থাকে না। খেলার আগে ভাবি পরিকল্পনার কথা। খেলার সময় বিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে গোল করা বা সতীর্থদের গোল করার সহজ পথ তৈরি করে দেবার কথা। খেলার শেষে মনে মনে ভুল-ত্রুটির পর্যালোচনা করি। খেলার দিন শুধু ফুটবলের চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যেদিন খারাপ খেলি কিছুতেই মনে শান্তি পাই না।"

বড় খেলোয়াড় এবং জাত খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হবার মূলে বোধ হয় সুরজিতের মানসিকতাই কার্যকারণ।

না হলে যে স্কুল টিমে কোনদিন ফুটবল খেলেনি, বলতে গেলে ফুটবল শুরু করেছে হুগলী মহসীন কলেজে বি এস সি পড়ার সময়—সে ধাপে ধাপে এত উঁচুতে উঠল কিভাবে?

সুরজিৎদের আদি বাড়ি ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। বাবা সুহাস সেনগুপ্ত যৌবনে সেখানে ফুটবল ও হকি খেলেছেন। চুঁচুড়ার মাঠ থেকে গড়ের মাঠে নিয়ে এসেছিলেন অতীত দিনের খেলোয়াড় পরিমল মজুমদার। প্রথমে দ্বিতীয় ডিভিসন টিম রবার্ট হাডসনে। তালিম দিয়ে প্রথম ডিভিসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ফুটবলের অন্যতম কারিগর অচ্যুৎ ব্যানারজি, খিদিরপুর ক্লাবে থাকাকালে। ৭২-৭৩-এ মোহনবাগানে খেলার সময়ই সারা ভারতে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ইস্ট বেঙ্গলে এসে সুরজিৎ পরিণত হয়েছে শিল্পী খেলোয়াড়ে। ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি মাথায় উঁচু দোহারা গড়নের ২৫ বছরের ছেলেটি বিজ্ঞানের সম্মানী স্নাতক। চাকরি করে স্টেট ব্যাঙ্কে।

ইনসাইড ও আউটসাইড ডজে, লম্বা পাসের ছন্দশৈলীতে সুরজিৎ নিঃসন্দেহে সত্তর দশকের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার। অতীতের অনেক নামকরা খেলোয়াড়ের চেয়েও ওর পায়ে কাজ বেশী। তার সঙ্গে আছে দুরন্ত গতিবেগ এবং শটের জোর। ফলে প্রতিপক্ষকে অবলীলায় ফাঁকি দিতে পারে। বহু খেলায় পায়ের একটি দুটি ছোট টানে প্রতিপক্ষকে মাতাল করে পাঁচ-সাত ফুট মাইনাস করতে দেখেছি। গত বছর আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের ব্যাক নিজের দিকপতিকে যেভাবে সাত-আট ফুট মাইনাস করেছিল, আমার মনে হয় সেলুলয়েডের ফিতেয় ধরে রাখলে সেটা হয়ে উঠত এক শিল্পের ছবি।

মুকুল

অরণ্যদেব ★ লী ফক
বুকের উপর খুলির ছাপ! এ কাজ কে করল?
পাইলটের মনে প্রশ্ন জেগেছে! সেইসঙ্গে ভয়!
প্রশ্নের উত্তর অবশ্য চটপট মিলে যায়!
?!
সোনা-বেলায়... অরণ্যদেবের ঘুষিতে পাইলটও অজ্ঞান...
দমাস!
আঃ!
সুইলম্যান... সাংকেতিক বার্তা পাঠিয়ে লোকজন ডেকো... এদের শাস্তি দিতে হবে।
এখুনি পাঠাচ্ছি।
পাইলটকে নিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে এবারে জাহাজে যাব... এদের কেউ যদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালাতে চেষ্টা করে, তাহলে...
বুঝেছি কী করতে হবে!
ওই আট বস্তা তুলেই আমি জাহাজ ছাড়ব... তারপর খানিকটা পথ গিয়ে পাইলট-ব্যাটাকে খতম করব।
বাস, তারপর সব সোনা আমার, একা আমার।
এবারে এত দেরি হল কেন হে?
এ কী ব্যাপার!
১৭

বিজন ভট্টাচার্য, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়/আমার পৃথিবী/পরিচালনা : বিমল ভৌমিক ফটো—দেশ

প্রসঙ্গত

কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, তেমনি ইদানীং চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যে কোন জমায়েতে সেকস আর ভায়োলেনস নিয়ে সেনসর বোর্ডের নতুন পলিসি ছাড়া কথা নেই। গত সপ্তাহে বোম্বাই থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট প্রযোজক ও পরিচালক মোহন সাইগল। তিনি অবশ্য তাঁর আগামী দুটি ছবি—সন্তান এবং এক হি রাস্তা—নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন। কথায় কথায় আলোচনা মোড় ফিরল ওই সেকস আর ভায়োলেনসের দিকে। শ্রীসাইগল এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা শোনালেন। তিনি বললেন, এতদিন দর্শক আকর্ষণের জন্যে সেকস আর ভায়োলেনসই ছিল হিন্দী ছবির মোক্ষম অস্ত্র। গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শকের রস-পিপাসাকে ওই দুটি জিনিস দিয়েই তৃপ্ত করতে চাইতেন হিন্দী ছবির নির্মাতারা। পক্ষান্তরে রিজিওনাল ছবি-গুলিতে থাকত সমাজ এবং সমস্যার কথা। ঘরোয়া জীবনের নানা সুখ-দুঃখ। হিন্দী ছবিকে এখন থেকে সেকস আর ভায়োলেনস বর্জিত হয়ে ওই সব পথেই চলতে হবে। সুতরাং রিজিওনাল ছবিগুলি এখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আজকাল রিজিওনাল ছবি আপন আপন রাজ্য সরকারের নানাবিধ সাহায্য পাচ্ছে। আর্থিক সাহায্য, প্রমোদকর মকুব, প্রদর্শনের অগ্রাধিকার ইত্যাদি সুবিধা-গুলি রাজ্য সরকার নিজেদের রাজ্যে তোলা ছবিগুলিকে দিচ্ছেন। ফলে আগামী দিনে হিন্দী ছবির অবস্থা যে ভয়াবহ হয়ে উঠবে এ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মোহন সাইগল।

উদাহরণস্বরূপ শ্রীসাইগল গুজরাট এবং পাঞ্জাব রাজ্যের কথা বললেন। গুজরাট সরকার যেসব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন ওই রাজ্যে তোলা ছবির ক্ষেত্রে তাতে ওখানকার প্রযোজনার সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। বোম্বাইয়ের তোলা হিন্দী ছবির প্রদর্শনের জন্য ওখানে এখন প্রেক্ষাগৃহ পাওয়াই মুশকিল হচ্ছে। পাঞ্জাবেও ঠিক একই অবস্থা। উপরন্তু পাঞ্জাব সরকার বোম্বাই চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উদার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁদের রাজ্যে গিয়ে ছবি করবার জন্য। শ্রীসাইগল এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কথাও উল্লেখ করলেন। তাঁর ধারণা আগামী দু-এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তোলা ছবির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং তখন এই রাজ্যে বোম্বাই ছবির পাত্তা পাওয়া খুবই মুশকিল হবে।

শ্রীসাইগলের এই আশঙ্কা যে আদৌ অমূলক নয় এ-কথা স্বীকার করতেই হয়। তবে বোম্বাই ছবিকে আরও একটি অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে। সেকস আর ভায়োলেনস বাদ দিয়ে যে-সব ছবি তুলবেন বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রকাররা তার নির্মাণব্যয় কিন্তু আগের চেয়ে খুব একটা কম হবে না। অথচ প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে তোলা রিজিওনাল ছবির খরচ অনেক কম। সুতরাং সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে ওদিক থেকেও তাঁদের বাণিজ্যিক লোকসানের একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। তবে এর জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই, তাঁদের কৃতকর্মের ফলই এখন তাঁদের ভোগ করতে হচ্ছে।

হিন্দী ছবির নির্মাতারা তাঁদের এই দূরবস্থার জন্য সেন্সর বোর্ডের নতুন পলিসিকে দায়ী করছেন। কিন্তু সেনসর বোর্ড তাঁদের উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে না দিলেও একদিন না একদিন তাঁরা এই দুরবস্থার মুখোমুখি হতেনই। যেমন হয়েছে এখন বিদেশে। বিদেশী দর্শকরা এখন সেকস আর ভায়োলেনস সম্বলিত ছবির উপর কী পরিমাণ বিরক্ত তার একটি উদাহরণ দিলেন সত্যজিৎ রায়ের "জন-অরণ্য" ছবির প্রযোজক সুবীর গুহ। গত জুন মাসে শ্রীগুহ সিডনী এবং মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেবার জন্য অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন। ওখানকার ওই দুটি উৎসবে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পোল্যান্ড, আফ্রিকা ইটালী ইত্যাদি বহু দেশ থেকে ছবি এসেছিল। ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল "জন-অরণ্য"। শ্রীগুহ জানালেন, পোল্যান্ড এবং ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশের যে সব ছবি এসেছিল তার অধিকাংশেরই মূলধন সেকস। ওই সব ছবি যখন দেখান হচ্ছিল তখন প্রেক্ষাগৃহ আস্তে আস্তে খালি হতে লাগল। দর্শকরা রীতিমত বিরক্ত হচ্ছিলেন ওই সব ছবি দেখে। কিন্তু পোল্যান্ডের ছবি জানুসির "দি ব্যালেন্স" এবং ভারতবর্ষের ছবি সত্যজিৎ রায়ের "জন-অরণ্য" দেখবার সময় প্রেক্ষাগৃহ যেন উপচে পড়ছিল। ছবি দেখার পর দর্শকদের সে কি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

সুতরাং হিন্দী ছবির নির্মাতারা যে ভাবছেন তাঁদের দুর্গতির জন্য সেনসরের নতুন পলিসিই একমাত্র দায়ী সেটা ঠিক নয়। দর্শকরাই একদিন এই সব ছবিকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। এবং দর্শকের রুচি যে ক্রমাগতই বদলাচ্ছিল, ভালো ভালো হিন্দী ছবি যে ক্রমশই দর্শক-সমর্থন পাচ্ছিল, এটা কি তাঁরা লক্ষ্য করেননি? না করতে চাননি?

চলচ্চিত্র

তথ্যচিত্র : দেবীপ্রসাদ

এক জীবনে অনেক কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ছবি এঁকেছেন অজস্র; তাঁর তৈরি ভাস্কর্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারা দেশের রাজপথে, রাজগৃহে, মিউজিয়ামে; সাহিত্যের সেবা করেছেন; সংগীতেও অল্পবিস্তর দখল ছিল তাঁর। এই সব মিলিয়ে দেবীপ্রসাদ একটি পরিপূর্ণ মানুষ—যিনি বিশ্বাস করতেন ফাঁকি দিয়ে কোনদিন বড় হওয়া যায় না। কর্মের মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে দিতে না পারলে সাফল্য দূরে অস্ত।

দুঃখের বিষয় : এমন একটি মানুষকে সেলুলয়েডে ধরে রাখার চিন্তা করেননি কোন চলচ্চিত্রকার। সুখের বিষয় : দেবীপ্রসাদের এক তরুণ ভক্ত—সুনীল ঘোষ—চলচ্চিত্রের সঙ্গে যাঁর কোন সম্পর্কই নেই—তিনি ১৬ মিলিমিটারের এক তথ্যচিত্রে দেবীপ্রসাদকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। দু-তিন বছর ধরে একটু একটু করে তিনি দেবীপ্রসাদের জীবনের নানা মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। ধরে রেখেছেন তাঁর মহৎ শিল্পকর্মের কিছু কিছু—যা ভাবীকালের মানুষের কাছে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট।

শ্রীঘোষ চলচ্চিত্রকার নন, তাই তাঁর তোলা এই আধ ঘণ্টার তথ্যচিত্রে কিছু এলোমেলো ভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে আবেগ মিশিয়ে দেবীপ্রসাদের যে-ছবি তিনি তুলেছেন তার আন্তরিকতাটুকু দর্শকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেবীপ্রসাদের বহুমুখী জীবনকে স্পষ্ট করে

তথ্যচিত্রে দেবীপ্রসাদ

তুলেছেন। রাজপরিবারে যাঁর জন্ম তিনি কেমন করে সাধারণের মনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন সে পরিচয় ছবিতে আছে। এ-ছবির চিত্রগ্রহণে উপদেষ্টা সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়। এই তরুণের কিছু অসাধারণ পরিকল্পনার গুণে ছবির কোন কোন অংশ শিল্পের সিংহদ্বার স্পর্শ করে গেছে। ছবিতে যেমন একদিকে দেবীপ্রসাদের মহৎ সৃষ্টিগুলিকে চোখের সামনে এনে দেওয়া হয়েছে, তেমনি মানুষ দেবীপ্রসাদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাঁর একক জীবনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি বড় চমৎকার করে দেখানো হয়েছে। ছবির একটি জায়গায় একটি পাখার সামনে বসে চুরুট ধরাবার জন্য দেবীপ্রসাদ একের পর এক দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে চলেছেন। অবশেষে চুরুট জ্বলন্ত হল। নেপথ্যে ধৃতিমান [illegible]-পাধ্যায়ের কণ্ঠ শোনা গেল : এই হলেন দেবীপ্রসাদ, এই হল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সত্যিই সুন্দর একটি ব্যঞ্জনা। তবে ছবির শুরুতে দেবীপ্রসাদের শবদেহ দেখানো ভাল লাগেনি। নির্মাতারা তো জীবনকেই দেখাতে চেয়েছেন, মৃত্যুকে নয়। বরং একেবারে শেষ দৃশ্যে শূন্য ঘর, দেওয়াল জুড়ে দেবীপ্রসাদের আঁকা ছবির সম্ভার, শূন্য চেয়ারের উপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা, নেপথ্যে একটি করুণ সুর বাজছে—বুকের মধ্যে প্রচণ্ড দোলা দিয়ে যায়।

এরা ফিল্মস প্রযোজিত এই তথ্যচিত্রের পিছনে সম্পাদক দুলাল দত্তর প্রচণ্ড পরিশ্রম অনুভব করা যায়। শব্দ খুব স্পষ্ট নয়, যে-কারণে দেবীপ্রসাদের স্বকণ্ঠে গাওয়া গানটির রস উপভোগ করা গেল না। তবে তাঁর বাজানো বাঁশীর সুর মন উদাস করে দেয়। অলোকনাথ দে-র আবহসংগীতের পরিকল্পনাও জায়গায় জায়গায় খুবই ভাল।

—রবি বসু

এখনো অনেক ছকে বাঁধা নিয়ম, অতীত কাসুন্দি চটকানো, সেই সব থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় তো দিব্যি রয়ে গেছে বাংলা ফিলম-এ, যদিও দু-একটা দলছুট দোয়েল এদিক-ওদিক চোখে পড়ে না এমন নয়, যেমন ধরুন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কিংবা 'কলকাতা ৭১' কিংবা 'মেঘে ঢাকা তারা', এবং সে-সব তো শুধু সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল এই তিনটি ডালেই ঘুরেফিরে—কিন্তু তাতে টালিগঞ্জের সনাতন আবহাওয়ার তো বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখছি না, এবং স-ঋ-মৃ এই তিন-কোণা বাগানের বাইরে এখনো তো কত রঙিন কাগজের ফুল—হাওয়ায় দুলে-দুলে কত নাচ, কত গান, এবং সেই সাবেকী গ্ল্যামার-লাইটিং, চকচকে, ঝকঝকে, চোখের কোল ফর্সা-করে-দেয়া, সাদা, চ্যাপ্টা সমতল আলো!

অপর্ণা সেন, অনিল চট্টোপাধ্যায়/**অসময়**/ পরিচালনা : ইন্দর সেন

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনো প্রতিবাদ নেই। আজ পর্যন্ত কোনো মরিয়া বাঙালী দর্শক পকেটে ব্যাং-কটকটি নিয়ে সিনেমা গিয়ে নায়িকা জানলার ধারে তার চতুর্থ গানটি শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ অব্যর্থ যন্ত্রটির সদ্ব্যবহার করেছেন বলে আমি জানি না। আমার মনে হয় এর কারণ মূলত তিনটি। প্রথমত, বাংলাদেশে অনেক কিছু ফুসমন্তরে উড়ে গিয়েও ভদ্রতার নির্জীব তলানিটুকু পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত, আহা, এত অভাব-অনটন-সমস্যাদীর্ণ বাঙালী ছেলে বউ নিয়ে একটু নাচনাগানা দেখে মাসে একবার কি দুবার একটু আনন্দ করবে না? তাছাড়া, গানের ব্যাপারে তো একটা ট্র্যাডিশন আছেই। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল নজরুল ইত্যাদি ছাড়াও, এই মূল স্রোতের বাইরে তো দেদার বাঙালী গীতিকার-সুরকার তাঁদের মোচার খোলা অহরহ ভাসাচ্ছেন। সুতরাং সন্দেহ নেই বাঙালী সংগীতপ্রিয় জাত। সেই ছেলেবেলার 'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়োলো' থেকে শুরু করে একেবারে নিবু-নিবু মুহূর্তের নাম-সংগীত পর্যন্ত—এও তো একটা অনেক দিনের ঐতিহ্য। সুতরাং এ-দেশের সিনেমায় গোটা ছয় গান কারও কাছে কোনো জবাব-দিহির ধার না ধেরেও স্রেফ নিজের অধিকারেই থেকে যেতে পারে। ধারণাটা কিন্তু খুব জোরের সঙ্গেই চলতি। এবং তার ফল যে কি ভয়ানক হতে পারে তার প্রমাণ অধিকাংশ বাংলা ছবি। (আমি এতদূর বাতুল নই যে এই প্রসঙ্গে হিন্দি ছবির উদাহরণ টানবো। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে হিন্দি ছবিতে গানের আস্তারেজ কষলে সংখ্যাটা রিপলের 'বিলিভ ইট অর নট'-এ পাঠানো যাবে।)

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অমিত দে/**চাঁদের কাছাকাছি**/পরিচালনা : যাত্রিক

যাই হোক, একটা এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে বাংলা ছবিতে গান থাকতেই হবে, নিদেন পক্ষে তিন থেকে চারটি। এ-পুজোর এই মন্ত্র। এবং তা না হলে ঘটনাটা প্রায় স্যাকরিলেজ-এর পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু গল্পটা, বা চরিত্রগুলো, বা সব মিলিয়ে সমস্ত আবহাওয়াটা তো এমনো হতে পারে যে সেখানে গানের কোনো সুযোগ নেই, গান সেখানে চোখে-আঙুল দিয়ে বেমানান, কাবাবের মধ্যে হাড্ডি। কিন্তু আমাদের পরিচালকদের কাছে মনে হয় না সেটা কোনো সমস্যা। গানের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা ভেবেচিন্তে কিংবা ধারধোর করে কয়েকটা ফরমুলা জোগাড় করেছেন। এবং এ সব পুরোনো চাল, তাঁদের ধারণা, সব সময়েই ভাতে বাড়ে।

যেমন ধরুন, কোনো একটি বিশেষ প্রাণীর কোনো একটি বিশেষ জরুরী কাজের জন্যে প্রয়োজন হয় একটি থাম, নল, বা নিদেন পক্ষে একটা দেয়াল গোছের কিছু, তেমনি আমাদের নায়িকাদের গান পেলে এক সময়ে প্রয়োজন হত ছুটোছুটি করবার মত কিছুটা জায়গা এবং মুহূর্তে মুহূর্তে জড়িয়ে ধরবার মত একটি মোটাসোটা গোলাকৃতি থাম বা পিপে। এ-রকম দৃশ্য তো দেখে-দেখে আপনারা এবং আমি একেবারে হদ্দ। তারপর তো এল একটা নতুন ফরমুলা, নায়িকার বা নায়কের—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নায়কের—রেডিওতে গান এবং সেই রেডিওকে ঘিরে-ঘিরে নায়িকার গা-রিরি করা সেনটিমেনটাল অতিঅভিনয়। তারপর

দেবব্রত মুখোটি/**বালক শরৎচন্দ্র**/পরিচালনা : জয়ন্ত সাহা

ভাবুন, স্রেফ একটা গান আনতে হবে বলেই, সন্দেশেলে। নদীর বুকে এমন একটি পটে আঁকা মাঝিকে জোর করে আমাদের বিশ্বাস আর ধৈর্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া হল যে হেমন্ত মুখার্জী বা মান্না দে-র মত ভাল গান গায়। আমি অন্তত কখনো কলকাতার গঙ্গায় অমন মাঝি দেখিনি। তারা বোধ হয় সবাই বম্বে ফিলম-এ প্লে-ব্যাক গায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছে। গানের এরকম চল্লতি চাল আরো অনেক আছে। যেমন ফুটবল খেলতে যেতে-যেতে ট্রেনের মধ্যে গান, পিকনিক-এর পথে বাসের মধ্যে নির্ভুল, মাপাসুরের কোরাস, এমন কি বাংলা সিনেমায় চানাচুরওলাও শ্যামল মিত্রর মত ভাল গান গায়। সে যে কেন চানাচুর বেচছে সেটাই আমার মাথায় ঢোকে না।

আর একটা কথাও আমার মাথায় ঢোকে না যে কি অবার্থ যুক্তিতে বাঙালী পরিচালকেরা মনে করেন যে, প্রেমে পড়লেই যে কোনো মানুষ গান গাইতে পারবে, এবং কখনো-কখনো একেবারে বেস্ট সেলারস হবার মত ভাল গান? মোটর গাড়িতে আনতাবাড়ি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নায়কের গান, কিংবা নায়ক-নায়িকার ডুয়েট, আর কখনো আড়াআড়ি, কখনো লম্বাটে সোজা, ক্লান্তিহীন লং প্রোজেকশান—আর কতদিন বাঙালী দর্শক প্রেমের ফিডিং বটল-এ গানের স্কিমড-মিল্ক চুষবে? ভেবে দেখুন সারা বাংলা ফিলম-এর ইতিহাস তোলপাড় করে ফেললেও জেমস বন্ড-এর মত একটি অনিরুদ্ধ প্রেমিক পাবেন না যে সুপারসনিক গতিতে প্রণয় থেকে প্রণয়ে চলে যায়, কিন্তু একবারও কি তাকে কোনো ক্ষণিকার চুম্বনের জন্যে চুরি করতে হয়েছে হামপারডিনক, কিংবা বাউই, বা স্টুয়ার্ট-এর ভেলভেট কণ্ঠ?

একটা কথা, কখনো-কখনো গান যদি বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকাদের গাইতেই হয়, তাহলে তা কেন সব সময়েই একেবারে প্রোফেশনাল পর্যায়ের ভাল গান হবে? আপন মনের গুন গুন (মনে পড়ে চারুলতার 'বঙ্কিম, বঙ্কিম'?) কিছু কাঁপা কাঁপা সংশয়ী কণ্ঠের ওঠানামা কেন প্রায় কখনই ফরমুলো ভেঙে আসতে পারে না বাংলা সিনেমায়?

আচ্ছা, ভাবুন একবার, যদি সত্যজিৎ রায় তাঁর 'গুপী' ছবিটা ঐ ফরমুলো অনুসারে তৈরি করতেন, তাহলে ছবির গানগুলো নিশ্চয় তিনি হেমন্তবাবু-মান্না দে-র পর্যায়ে পরিচিত কাউকে দিয়ে গাওয়াতেন। এবং তাহলে ছবিটার কি সর্বনাশ হত ভাবতে পারেন? সমস্ত বইটার মেজাজের সঙ্গে ওঁদের গলার সফিসটিকেশন একদম যেত না।

আপনারা হয়তো এ ক্ষেত্রে বলতে পারেন, তাহলে 'চারুলতা'র কিশোরকুমারের প্রয়োজন হল কেন? কিন্তু এটা তো আপনাদের মানতেই হবে যে সেখানে অন্তত কিশোর একেবারে প্রয়োজনমত আশ্চর্যভাবে 'নাইভ'। এবং সেটা হয়তো শুধু কিশোরের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ছবিতে গানের ব্যবহার দক্ষ হলে যে তা কতখানি মর্মস্পর্শী হতে পারে, কত তাড়াতাড়ি তা আমাদের বিঁধতে পারে, তার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল 'জন-অরণ্যের' কোনো সান্ধ্য-সিকোয়েনস-এ রবীন্দ্র সংগীতটি। কিংবা ধরুন, 'পথের পাঁচালী'র সেই অবিস্মরণীয় "দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল"। কিংবা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র এক অলৌকিক সন্ধ্যা সংলগ্ন, "এ পরবাসে রবে কে?" কিংবা ঋত্বিক-ব্যবহৃত সেই বেদনা আপ্লুত গান, "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে"। এর বাইরেও তো বাংলা ফিলম-এ কত গান, অযাচিত, অবাঞ্ছিতভাবে গান। কিন্তু তবু বাংলা ভাষার সার্থক মিউজিক্যাল বলতে এ পর্যন্ত মাত্র একটি। এবং সে-জন্যেও আমাদের যেতে হয় সেই সত্যজিৎ রায়ের কাছে যাঁর ছবিতে প্রায় গান থাকেই না, অন্তত অপ্রয়োজনীয়ভাবে কখনই না।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতার থেকে

বেতার শ্রোতারা এ-বছরের ২৮ এপ্রিল তারিখে আকাশবাণীতে কিশোরকুমারের কোন গান শুনতে পেলেন না। তাঁদের বিস্ময় ক্রমাগত বাড়তে লাগল যখন পর পর কিছুদিন বেতার কেন্দ্রগুলি কিশোরকুমার বর্জিত হয়ে রইল। এবং এই ঘটনা ঘটতে লাগল টি-ভিতেও। এই সম্পর্কে বিদ্যুৎগতিতে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগল সর্বত্র। এরই ফাঁকে ঘটে গেল প্রায় ভুলে যাওয়া শিল্পী মহম্মদ রফির প্রত্যাবর্তন।

অনিরুদ্ধ, শম্পা চক্রবর্তী/**কিশোর কবি সুকান্ত**/পরিচালনা : সরোজ রায়

রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়/মন্ত্রমুগ্ধ/পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আকাশবাণীর অনুরোধের আসরের অর্ধেকটা সময় জুড়ে প্রচারিত হতে লাগল তাঁর গান। গড়ে একখানি করে তাঁর গান প্রতিদিন রেকর্ড হতে লাগল ছবির জন্য। তারপর আবার কিশোরকুমারের প্রত্যাবর্তন। গত ২৪ জুন তারিখে বম্বে টি-ভির জনপ্রিয় ছায়াগীত প্রোগ্রামে কিশোরকুমারের কণ্ঠ আবার শোনা গেল। পরদিন থেকে আকাশবাণীতেও। কিশোর-অনুরাগীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দীর্ঘ ৮ সপ্তাহ পরে তাঁরা কিশোরকুমারকে আবার কাছে পেলেন টি-ভি, ট্রানজিস্টার এবং রেডিও মারফৎ।

ব্যাপারটা যে আসলে কি ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে জানা মুশকিল। কারণ কোন পক্ষই এ-সম্পর্কে কোন বিবৃতি দেননি। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, কিশোর-কুমার টি-ভির জন্যে চল্লিশ মিনিটের একটি প্রোগ্রাম করেছেন যার ফলে বরফ গলেছে। গোলমালটা শুরু হয়েছিল কিশোরকুমারের সদলে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে। ওঁর দলের লোকেরা নিজেদের পাসপোর্ট দেখিয়েছেন কর্তৃপক্ষের কাছে। ওঁদের পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল নাইরোবির ভারতীয় দূতাবাস থেকে। তবে যতদূর মনে হয় আসল গোলমাল ছিল অন্যত্র। মূল কারণ সম্ভবত কিশোরকুমারের টি-ভি প্রোগ্রামে এবং আকাশবাণীর জয়মালা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি। যাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটা ভালয় ভালয় যে শেষ পর্যন্ত মিটে গেছে এটাই আনন্দের।

* * *

প্রযোজক গিরিজা সামন্তর আকস্মিক মৃত্যুতে বোম্বাইয়ের চিত্রজগৎ শোকাহত। তিনি ছিলেন শক্তি সামন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যদা হালিখহে এই মানুষটির বয়স হয়েছিল আটচল্লিশ, কিন্তু সে বয়সটা বোঝা যেত না। দেখলে মনে হত আটত্রিশ-টাটত্রিশের মত। গিরিজা তাঁর সান্তাক্রুজের বাড়িতে খেয়েদেয়ে রাত্রে ঘুমোচ্ছিলেন, অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগের আক্রমণ। ভাল ভাল ডাক্তার আর ওষুধপত্রের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু কিছুই কাজে আসেনি। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। স্ত্রী, দুটি সন্তান এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবকে শোকার্ত করে গিরিজা চলে গেলেন লোকান্তরে।

গিরিজা ছিলেন একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ার। রাঁচিতে থাকতেন। বছর কয়েক আগে শক্তি সামন্তর ডাকে বোম্বাই আসেন। শক্তিবাবুর ফিল্ম ব্যবসা তখন চারিদিকে প্রসারিত। গিরিজা এসে তাঁর অনেক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। প্রযোজক হিসেবে গিরিজার প্রথম ছবি 'আজনবী'। দ্বিতীয় ছবি 'অনুরোধ'-এর কাজ চলছিল। রাজেশ খান্না আর সিম্পল কাপাডিয়া ছবির নায়ক-নায়িকা। শক্তি সামন্ত পরিচালক। এ ছবির শেষ তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

গিরিজার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সান্তাক্রুজ ক্রিমেটোরিয়ামে। তাঁর শবযাত্রায় চিত্রজগতের প্রচুর ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন। ইদানীংকালে আর কোন শবযাত্রায় এত শোকবিহ্বল মানুষ জমায়েত হয়নি। এতেই বোঝা যায় গিরিজা সকলের কত প্রিয় ছিলেন।

—অনুরাগ

নাটক

তিতুমীর/আপেক্ষিক

'আপেক্ষিক সংবাদ' ঘোষণা করেছে, এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুতি তারা চালিয়েছেন আট মাস। নিঃসন্দেহে এই দীর্ঘ নিরলস পরিশ্রম প্রশংসনীয়। গ্রুপ থিয়েটারের মূলধন আন্তরিকতা কিন্তু পরিণতিতে যখন এই মূলধনের অপ-প্রয়োগটাই প্রকট হয়ে ওঠে, তখনকার ফলশ্রুতি বড়ই করুণ। একটি ঐতিহাসিক নাটক শুধু তো ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়, পুনর্মূল্যায়নও বটে। আপেক্ষিক প্রযোজিত 'তিতুমীর' শুধুই ব্যর্থ রোমন্থন। প্রায় দেড়শ বছর আগের ঘটনাগুলোকে ধরবার প্রয়াস সর্বত্রই এলোমেলো। পোশাক ও মঞ্চসামগ্রী ব্যবহারে একাল ও সেকালের বিচিত্র সহাবস্থান। ভাষার ব্যবহারেও কোন সুনির্দিষ্ট রীতি নেই। ইংরাজ শিবিরে একজন কথা বলেন পরিষ্কার

পার্থ, বুলবুল চৌধুরী, দিলীপ রায়/জয়/ পরিচালনা : গুরু বাগচি

বাংলায়, আর একজন জড়ানো অস্পষ্ট বাংলা, অন্যজন ত্রিশ বা চল্লিশ দশকে ট বর্ন সহযোগে যে সাহেবী-উচ্চারণের রেওয়াজ ছিল, তাকেই আদর্শ করে নিয়েছেন।

প্রাচীন পরিবেশ রচনায় সক্ষম না হলেও একথা অনস্বীকার্য, টিমওয়াকে এঁরা পুরোপুরি কয়েক যুগ আগের অভিনয় ধারা অনুসরণ করেছেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক নাট্যভাবনা—কাছা খুলে ডিগবাজি খেয়ে লোক হাসানো। নিরর্থক অট্টহাস্য, এর সঙ্গে অবিশ্রাম বেজে চলেছে সেই ধরনের আবহ যা ব্যবহৃত হতে হতে ভোঁতা হয়ে গেছে। এরই মধ্যে পরিচালক (রমেন দাস) দু-তিনবার আধুনিক কায়দায় ব্রিজ ব্যবহার করেছেন, দুটি গানের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের সংগ্রাম প্রস্তুতি এবং সমবেত নমাজের পরিকল্পনা বেশ ভাল, যদিও গান দুটি অসহ্য। মানিকপীরের সুন্দর গানের মধ্য দিয়ে একটি লৌকিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল কিন্তু কুলো ঝাড়তে ঝাড়তে খুবুজান (সুমিত্রা মজুমদার) কি ছড়া বললেন, তার একবর্ণও বোধগম্য হল না। কৃষকরা প্রত্যেকেই প্রথম দিকে উচ্চগ্রামে কথা বলেছেন যার কিছুই স্পষ্ট নয়। তাই বিদ্রোহের আহ্বান অত সোচ্চার হয়েও নিষ্ফল। শেষ দৃশ্যের আগে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আছে, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন দুবার তরোয়াল ঠোকাঠুকি করেই উইংস-এর ভেতরে চলে যায়! মৃদু কিছু যুদ্ধের শব্দের পরই তিতুমীর শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, যে মৃত্যুর শোক মুক্ত অঙ্গনে উপস্থিত কোন দর্শককেই স্পর্শ করতে পারল না। মৃত্যুর পরে দৃশ্যান্তরের জন্য যখন যন্ত্রসংগীত বাজে তখন কিছু দর্শক তুড়ি দিয়ে তাল দিয়েছেন।

নাট্যকার (কমল সাহা) অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলেন এ নাটকে। তাই শুধু নাটকের মধ্যেই নয়, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে মঞ্চসজ্জার অবকাশে অন্ধকারে একজন

মহুয়া রায়চৌধুরী / **প্রতিশ্রুতি** /, পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়

সূত্রধার, 'দুই পুরুষ' নাটকের গুপী মিত্তিরের মত, সন, তারিখ, বার সমেত যুগের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আলোকিত মঞ্চে অভিনয় শুরু হতেই বোঝা গেল কথায় ও কাজে ফারাক আসমান জমিন। ভরসা এই যে, 'আপেক্ষিক' জানেন 'পরিশ্রম মাত্রেই সাফল্য নয়'। এর সঙ্গে সবিনয়ে আর একটি কথাও তাঁদের ভেবে দেখতে বলি : ইতিহাসের আনুগত্য মাত্রই কি নাটক?

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

সংগীত

সংগীতে ভাবনাট্য

স্বচ্ছন্দে বলা যেত প্রেম ও পূজা পর্যায়ের নির্বাচিত কিছু গান, আলোকিত মঞ্চে যন্ত্রসংগীত-সহযোগীদের মুখ দেখা গেলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কোনো প্রাক্-কথনেরও ছিল না প্রয়োজন—কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য একক-অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো পার্থক্য থাকতো না, কিংবা যেটুকু পার্থক্য চোখে পড়ত তা সম্পূর্ণতই শিল্পীর যোগ্যতাগত। সেই দুর্বলতাকে আড়াল করতেই বোধ করি সনাতন সিংহ তাঁর একক-সংগীতের অনুষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছেন 'ভাবনাট্য' শীর্ষক এক অলীক নামে। অলীক, কেননা 'ভাবনা বর্ণনা' প্রসূত কোনো নতুন ভাষা নয়, নয় অনান্তর কোনো রসসঞ্চারের প্রয়াস, গানের বাণীরই গদ্য-রূপান্তর—ইংরেজীতে যাকে বলে প্যারাফ্রেজিং। ('নিঃসঙ্গ নায়ক' ও 'বসে আছি হে'—আসলে প্রেম ও পূজার গান।) আধো-অন্ধকার মঞ্চ, যন্ত্রীকে নেপথ্যে রেখে শুধু যন্ত্রাংশ-প্রদর্শন, শিল্পীর পশ্চাৎপটে একটি জ্যোতির্ময় বলয় স্থাপন—কোনো নাটকেরই পরিবেশ গড়ে তোলেনি।

শুরুতে ডঃ অরুণ বসু সংক্ষিপ্ত সুন্দর একটি ভাষণে "রবীন্দ্র সংগীতের কথার সম্পদকে অভ্যাসের ধূসরতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের কাছে নতুন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসকে" প্রশংসার যোগ্য বলে গেলেন। কিন্তু তিনিও নিশ্চিত ভাবেননি যে, তরুণ এই শিল্পী কথার সম্পদের ওপরেই কেবল গুরুত্ব দেবেন। সুরের সম্পদ বিন্দুমাত্র ছিল না সনাতন সিংহের কণ্ঠে, থাকলেও বিন্দুমাত্রই ছিল। একটি গানে শিল্পী যখন গাইছিলেন "তোমার দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী"—মনে হচ্ছিল গানের দেবতার কাছে এ তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাপ্পাদিত্য রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

৪৩ বর্ষ

(২৭ সংখ্যা থেকে ৩৯ সংখ্যা পর্যন্ত)

— দ —

— ধ —

— ন —

— প —

— ফ —

— ব —

— ভ —

— ম —

— য —

— র —

— শ —

— স —

— হ —

REGD. NO. WB|CC|184|74

আপনার শিশুর
জন্যে ভাগ্যতারকা কি
সৌভাগ্য এনে দেবে?

প্রচুর পরিমাণে
গ্ল্যাক্সো ইনফ্যান্ট
মিল্ক ফুড!

আপনার শিশুর পক্ষে এ সময়টি খুবই অনুকূল। গ্ল্যাক্সো ইনফ্যান্ট মিল্ক ফুড আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে আর আপনার শিশুটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।

সুন্দর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হবে। ফলে, আপনার শিশুটি প্রফুল্ল, স্বাস্থ্যবান ও প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। গ্ল্যাক্সো ইনফ্যান্ট মিল্ক ফুডের পুষ্টিতে তার চোখ হবে উজ্জ্বল, হাড় হবে শক্ত আর হাসি হবে মোহনীয়। হাল্কা গোলাপী বা নীল রংএর পোষাক পরিয়ে দেখুন।

হঠাৎ প্রয়োজনের জন্যে, ১ টিন গ্ল্যাক্সো সানশাইন বা অস্টারমিল্ক ঘরে রাখুন। এগুলি সহজেই পাওয়া যায় এবং আপনার নাগালের মধ্যেই।

**গ্ল্যাক্সো ইনফ্যান্ট
মিল্ক ফুড**

Interpub/GL/7/78 BN

৩১ জুলাই ১৯৭৬

CHAITRA-BLS-19-BEN. REV

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাথা
সারিডন

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : চিন্তামণি কর

প্রচ্ছদ পরিচিতি : 'জলকন্যা' (৮'' পোড়ামাটির মূর্তি। ৮' মূর্তির নমুনো বা 'ম্যাকেট')। ফোয়ারার জন্যে পরিকল্পিত। ঝিনুকের ওপর জলকন্যা বিশ্রাম নিচ্ছে আর ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তরতর ক'রে যেন ঝিনুকটা চলেছ ভেসে ভেসে। জলের ওপর পড়েছে ছায়া। সামান্য কয়েকটি রেখার মধ্যে জলকন্যা আর ঝিনুকটা বাঁধা হয়েছে। আকার ও রূপের মধ্যে নিহিত সাবলীল ছন্দ।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪০ সংখ্যা

শনিবার ১৫ শ্রাবণ ১৩৮৩

বিশ্বমৈত্রীর আঙিনা

আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি ও মৈত্রীর সম্বন্ধ সংস্থাপিত করবার কর্তব্যে বিশ্বের জাতিসমূহের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে যে সমালোচনার রব অনেক সময় অনেক মর্মান্তিকভাবে আসরেও শোনা যায়, তার যথার্থতা তথা সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টার মধ্যে কী ত্রুটি নিহিত আছে, এবং বিশ্বের জীবনে মৈত্রী শান্তি ও সুবিচারের মর্যাদা দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখবার কর্তব্যে কী অবহেলা আছে, ইত্যাকার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক বাধালে অবশ্যই আধুনিক মানবতার আন্তর্জাতিক স্বভাবটাকে অল্প-বিস্তর নিন্দা করবার দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু মানবীয় আকাঙ্ক্ষার ও আশার বিরুদ্ধে এ ধরনের ঘটনার ক্রিয়া থাকলেও বিশেষ একটি ক্ষেত্রে মানুষজাতির মৈত্রী-ভাবনার এবং প্রীতিশীল আগ্রহের একটি জীবন্ত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধুভাষিত সংজ্ঞা অনুসারে যে ব্যাপারটাকে ক্রীড়ামোদ বলে আখ্যায়িত করা যায়, যার সাধারণ জনপ্রিয় নাম খেলাধুলো, তার মনস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক সার্থকতার স্বরূপ সামান্য নয়। আধুনিক আন্তর্জাতিক জনজীবনে 'অলিম্পিক' ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার বিপুল আবেদন এবং বিরাট মর্যাদার হিসাব করলে এই বৃহৎ সত্যটির হিসাব পাওয়া যায় যে, বিস্তর বিরোধ ও প্রভেদের মধ্যেও বিশ্বের জনজীবনের আনন্দ একঠাঁই হয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কেই প্রীতিযুক্ত করে তুলতে পারে।

প্রাচীন গ্রীসের সাংস্কৃতিক জীবনের কল্পনাগুণে দেবতা জেউসই রোমক নামানুসারে জুপিটার অলিম্পাস। জেউসের প্রসন্নতা সম্পন্ন করবার জন্য প্রাচীন গ্রীসের জনজীবনে বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক কর্তব্য হিসাবে প্রতিযোগিতার যে আনন্দোৎসব প্রচলিত করা হয়েছিল তার মধ্যে গীত বাদ্য নৃত্য এবং রম্যকলাও ছিল। অলিম্পিক অনুষ্ঠান ছিল প্রাচীন গ্রীসের ধর্মাচারের অনুগত একটি ব্রত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাংস্কৃতিক প্রকৃতির একটি বিশেষ গৌরব এই যে, ক্রীড়ামোদ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক রম্যকলার অনুশীলন জনমানসের কাছে একই প্রকারের সম্মানিত অভ্যর্থনা পেত। দুই-ই ছিল সমান গুরুত্বের অনুশীলন। রোমক মনস্বী প্লাটিনাসের একটি উক্তি, যে-উক্তি প্রাচীন সমাধির ভগ্নস্তূপের মধ্যে একটি ফলকের উপর উৎকীর্ণ অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা বস্তুত একটি শিক্ষণীয় সত্যের প্রবাদে পরিণত হয়েছে। মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন। শারীর সুস্থতার যে আদর্শ, যার সঙ্গে সামাজিক আনন্দের আদর্শ সম্মিলিত হয়ে ক্রীড়ামোদ ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করেছে, তাকে মানবতার ও সভ্যতার, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মৈত্রীর একটি বিরাট আন্তরিক সম্পদ বলে উপলব্ধি করতে হয়।

এমন অভিযোগ করা চলে যে, যদিও অলিম্পিক সংস্থার সনদে কোন অনুদারতা অথবা পক্ষপাতিত্ব নেই, এবং অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রতিযোগিতা মানবীয় প্রীতি ও মৈত্রীর আবেদনে গুরুত্ব লাভ করেছে, তবু যেন কিছু-কিছু বিরোধ প্ররোচিত করে। যেমন বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্নে, রাজনীতিক বিশ্ব-আসরে স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির প্রশ্নে, এবং পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনীতিক ভেদ-বিরোধের প্রশ্নে কোন কোন সদস্য-দেশের এমন আচরণ প্ররোচিত হতে দেখা গিয়েছে যে, কেউ-কেউ অলিম্পিক ক্রীড়ামোদের আঙিনাতেও পরস্পরের হাতে হাত মেলাতে রাজি হতে পারেন না। এক্ষেত্রে ত্রুটি অথবা ভুলের ব্যাপারটাকে অলিম্পিক আঙিনার কোন অপকৃতিত্বের সঙ্কেত বলে মনে না করে, আন্তর্জাতিক জীবনের সাধারণ দুর্ভাগ্যেরই দ্বারা প্ররোচিত ঘটনা বলে মনে করতে হয়। খুব সত্যি কথা, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে একই অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়ে কোন ক্রীড়ানুশীলনে প্রবৃত্ত হতে অনেকে চাইবেন না। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, এর দ্বারা বর্ণবিদ্বেষবাদের আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের মর্যাদাকে জয়যুক্ত করা হয়। কিন্তু আর-এক যুক্তির দিক দিয়ে বিষয়টির বিচার করা যেতে পারে। অলিম্পিকের ক্রীড়ামোদের আঙিনাকে যদি অন্য কোন রাজনীতিক অথবা আদর্শিক দাবির বৃত্ত থেকে বাইরে রাখা হয়, যদি দুই অবন্ধু দেশের দুই খেলোয়াড় দল অলিম্পিকের আঙিনার মধ্যে এসে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলামেশি করে সামান্য সুস্মিতও হন, তবু সেটা পূর্ণ মৈত্রী-সম্বন্ধেরই অনুকূলে একটি সুস্মিত ঘটনা হয়ে কাজ করবে। অলিম্পিকের মতো ক্রীড়ার আঙিনাতে আন্তর্জাতিক কিংবা জাতি বনাম জাতির আদর্শগত ভেদাভেদের বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে কি একটি সদাপ্রসন্ন মৈত্রীর পরিবেশ সত্য করে রাখা সম্ভব হতে পারে না? মনে হয়, খুবই সম্ভব, যদি অবশ্য বিশুদ্ধ ও মহোচ্চ এক অলিম্পিক আদর্শ স্বীকৃত হয়। প্রসঙ্গত মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দুই পক্ষের ভয়াল যুযুৎসতার মধ্যেও একটি মৈত্রী-নীতির সার্থক প্রবৃত্তির কথা স্মরণ করা চলে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হবার পর যুদ্ধের বিরতি সূচিত হবার পর এক পক্ষের যোদ্ধারা অপর পক্ষের শিবিরে প্রবেশ করতে এবং প্রসন্ন বাক্যালাপের দ্বারা পরস্পরের প্রীতি সম্পাদিত করতেন। নির্দিষ্ট একটি অলিম্পিক নীতিতন্ত্রের প্রতি সকলের বাধ্যতা স্বীকৃত থাকলেই হলো। মনস্তত্ত্বের পক্ষ থেকেও যুক্তি প্রদান করা চলে, মৈত্রী নামে অভিহিত সদাচার অথবা ভাবনা নিয়ে যদি পরিবেশ রচিত হয় তবে তার মধ্যে প্রবেশ করে অমৈত্রীর ভাবনাও রূঢ়তা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

জানি না, অলিম্পিক ক্রীড়ার আঙিনাতে আন্তর্জাতিক জীবনের বিরোধ ও প্রভেদগুলির প্রবেশ নিষিদ্ধ করবার মতো কোন বিচার তথা বিবেচনা শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করবে কিংবা করতে পারবে কি না। বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্বাসের বাণী অনুসরণ করে সত্যিই যদি বিশ্বাস করতে হয় যে :

আত্মার সাথে হবে আত্মার
নবীন আত্মীয়তা।
মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে
এ নহে স্বপ্নকথা ॥

তবে অলিম্পিকের ক্রীড়ার আঙিনাতে সবারই ঠাঁই স্বীকার করবার নীতি স্বীকার করে নিতে হবে। কোন সন্দেহ নেই, অলিম্পিক অনুষ্ঠান বিশ্বজীবনে মৈত্রী ও প্রীতির সম্প্রসার সম্ভব করবার একটি অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন সাংস্কৃতিক অনুশীলন।

এই সপ্তাহ

গত কয়েক মাসে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন। এই মূল্য বৃদ্ধি শুরু হয়েছে এপ্রিল মাসে। ওই মাসে পাইকারি মূল্যের সূচক বেড়েছিল দুই শতাংশ, মে মাসে ১.৬ শতাংশ ও জুন মাসে ১.৩ শতাংশ। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জিনিসের দাম কমবার যে প্রবণতা দেশের অর্থনীতিতে দেখা গিয়েছিল তার ব্যতিক্রম মারচ মাসের শেষে দেখা যায়; তখন থেকে ২৬শে জুনের মধ্যে সূচক ২৮২.৪ থেকে ৩০১.৭এ দাঁড়িয়েছে; ১৪ সপ্তাহে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৬.৮ শতাংশ।

এই সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যমের নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেছে। এই বৈঠক সম্পর্কে সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে খাদ্য উৎপাদন, সরকারী শস্যভাণ্ডারে মজুত খাদ্যের পরিমাণ ও বিদেশী মুদ্রার সংস্থান, সব দিক থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল। তার উপর বর্ষা পুরোপুরি শুরু হয়েছে। কাজেই অবস্থা আরও ভাল হতে বাধ্য। এই পর্যালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে যথেষ্ট মজুত থাকা সত্ত্বেও চিনি, খাবার তেল ও তুলোর দাম খুব বেড়েছে। এই তিনটি জিনিসের দাম বাড়া বন্ধ করা হবে দুভাবে —মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে ও আমদানি বৃদ্ধি করে। স্থির হয়েছে, প্রয়োজন হলে সরকার অথবা সরকারী বাণিজ্য সংস্থা মজুত মাল অধিগ্রহণ করে সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করবেন।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রাম অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশে খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে এবং জনগণের চাহিদা মেটাতে সরকার সক্ষম। সুতরাং দাম বাড়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। জগজীবনবাবুর প্রস্তাব, খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করতে ও শস্য ব্যবসায়ে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, মিসা ও ভারতরক্ষা আইনে মজুতদার, মুনাফাখোর ও অসাধু ব্যবসায়ে উৎসাহ-দানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তিনি ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে রিপোরট পাঠানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পশ্চিম বাংলাতেও তেল, চিনি, মাছ প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে। সমস্যাটি আলোচনার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব বি আর গুপ্তের সভাপতিত্বে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় কমিটির এক বৈঠক হয়। বৈঠকে বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কিছু কিছু অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করবেন বলে রাজ্য সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন; এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারও তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন।

স্বর্ণ সিং কমিটি সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে আরও পাঁচদফা প্রস্তাব করেছেন। এবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল, লোকসভায় বা রাজ্য বিধানসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক কোন প্রস্তাব মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী সদস্যের সমর্থন না পেলে গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না। সংবিধানে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় রীতি দাঁড়িয়েছে যে উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশী সমর্থন করলে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বর্ণ সিং কমিটির সুপারিশ কার্যকর হলে আমাদের পশ্চিম বাংলায় তার অর্থ হবে বিধানসভায় অন্তত ১৪১ জন সদস্যের (বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০) সমর্থন না পেলে কোন অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হবে না। এখনকার নিয়মে ২৮০ জনের মধ্যে যদি ২০০ জন উপস্থিত থাকেন ও তাঁদের ১০১ জন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন তাহলেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

স্বর্ণ সিং কমিটি ইতিপূর্বে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে আরও দুটি রিপোরট পেশ করেছেন। প্রথম রিপোরটে আদালতের রিট জারির ক্ষমতা হ্রাস করা, আঞ্চলিক ভিত্তিতে জরুরী অবস্থা জারির ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়া ও আমাদের দেশকে সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রিপোরটে নাগরিকদের আটদফা মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। কমিটির বৈঠক আবার ২৬শে জুলাই বসবে। এই বৈঠকে সংবিধান সংশোধনের চতুর্থ দফা প্রস্তাব আলোচিত হবে। এইসব সুপারিশ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত একটি সংবিধান সংশোধনী বিলের আকারে আগামী মাসে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে পেশ হবে।

চীন সরকার নয়াদিল্লিতে তাঁদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে চেন চু-ইউয়ানের নাম প্রস্তাব করেছেন; ভারত সরকার এই নিয়োগে সম্মতি জানিয়েছেন। চেন বর্তমানে স্পেনে চীন সরকারের রাষ্ট্রদূত। তাঁর বয়স ৫৮। ভারত চেন-এর কাছে অপরিচিত নয়। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি নয়াদিল্লিতে চীনের চারজ দ্যফেয়ার ছিলেন।

নয়াদিল্লিতে ৬০টি জোট নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে একটি যুক্ত সংবাদ সংস্থা গঠনের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে ভারত যে খসড়া ঘোষণা পত্রটি পেশ করেছিল সেটি কিছু রদবদলের পর সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। ঘোষণা পত্রে একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবার এই প্রস্তাবটি আগামী মাসে নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বিবেচিত হবে।

প্রায় এগার বছর পরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। আগামী ২২শে জুলাই একটি একসপ্রেস ট্রেন ভারতের অমৃতসর থেকে পাকিস্তানের লাহোর যাবে; আড়াই ঘণ্টা পরে সেই ট্রেনটিই লাহোর থেকে অমৃতসর রওয়ানা হবে। ট্রেনটি অমৃতসর ছাড়বে সকাল ন'টায়, ফিরে আসবে সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়। ইনটারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েজ-এর সাধারণ সচিব নয়াদিল্লিতে বলেছেন, ইরান আফগানিস্তান পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আগামী এক দশকের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। তিনি এদেশে এসেছেন রেলপথ প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য।

প্রভিডেনট ফানড-এর সঞ্চয় ও বীমা ব্যবস্থাকে যুক্ত করে একটি নতুন প্রকল্প চালু করবার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি অরডিনান্স জারি করেছেন। এই প্রকল্পের অন্তর্গত কোন কর্মীর চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে তাঁর পোষ্যবর্গকে সর্বাধিক দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

আসামে আবার বন্যা হয়েছে। বন্যায় মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৫১।

১৯।৭।৭৬.

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

এ কী গো বিস্ময়

দু শো বছরের নওজোয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার এবার কে নেবেন সে জিজ্ঞাসার জবাব মিলেছে নিউ ইয়র্ক শহরের মাডিসন গার্ডেন্স্ স্কোয়ারে ১৪ জুলাই মার্কিন ডেমোক্র্যাট দলের মাতব্বরদের এই বিশ্বাস। দু পাঁচজন বাদে তামাম দুনিয়ার লোকও তাই মনে করছে। প্রশ্নটার চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এখনও আসেনি। আসবে দোসরা নভেম্বর। সেদিন নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাছাইয়ের পালা। জেরাল্ড্ ফোর্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আসছে বছর জানুয়ারিতে গদিতে বসবেন নতুন রাষ্ট্রপতি। পুরোনো রাষ্ট্রপতিরও সে তখতে বসতে কোনো বাধা নেই, তাঁর ইচ্ছেও আছে। কিন্তু তাঁর সে সাধ মিটবে না বলেই ধরে নিয়েছেন কেবল বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের কর্তারা নন শাসক দলের চাঁইরাও—যদিও সেটা তাঁরা খোলাখুলি কবুল করছেন না, তাঁদের ভাবগতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছেন ডেমোক্র্যাট দলের পাণ্ডারা যাঁরা দলকে চালান পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে আর টাকা যুগিয়ে।

আমেরিকায় রাজনৈতিক দল অনেক। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের জোট। কানাকড়ির মুরোদ তাদের নেই। মুরোদ আছে দুটো দলের—রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের। দেশ পালা করে শাসন তারাই করে আসছে। সে পালার কোনো বাঁধা মেয়াদ নেই। এমন কোনো রেওয়াজ নেই যে, ডেমোক্র্যাটরা দেশ চালাবে এবার, পরের বার রিপাবলিকানরা। কোন্ দল গদিয়ান হবে তা নির্ভর করে ভোটারদের মর্জির ওপর। একনাগাড়ে অনেককাল ডেমোক্র্যাটদের হাতে ক্ষমতা থাকতে পারে, আবার তার উলটোটাও হওয়া সম্ভব। তবে হাওয়া বদলের আভাসটা অনেক দিন আগেই প্রায় পাওয়া যায়। লোককে তাক লাগানোর মতো কিছু যে মার্কিনী নির্বাচনে হয় না তা নয়। না হলে তো নির্বাচনের মজাই মাটি হতো। তবে এবার যে ডেমোক্র্যাটরা বাজীমাত করবে ২ নভেম্বরের নির্বাচনে এটা ঘরে বাইরে লোকে এক রকম ধরে নিয়েছে। আট বছর আগে তারা ক্ষমতা খুইয়েছিল যখন তাদের প্রার্থী হিউবার্ট হাম্ফ্রি হেরে যান রিচার্ড নিক্সনের কাছে। তাদের প্রতাপ চাকাটা এবার তাদের দিকেই ঘুরবে।

দলের ধ্বজা বইবার ভার কার ওপর দেওয়া হবে তা ভেবে কিন্তু ডেমোক্র্যাট মাতব্বররা কূল পাচ্ছিলেন না। এক ডাকে দেশসুদ্ধ লোক চিনবে—চোখ বুজে তাঁকে ভোট দেবে এমন মানুষ ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে কই? কেনেডি নামের মোহ আমেরিকানদের আজও কাটেনি। কেনেডি বংশের বাতি এখনও নেবেনি। তা জ্বালিয়ে রেখেছেন রবার্ট কেনেডি। কিন্তু তাঁর পরিবার পরিজন তাঁর জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে রাজী নয়। হারজিত তো পরের কথা তাদের ভয় রবার্ট কেনেডিকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে হবে প্রাণটি হাতে নিয়ে। কী তার দরকার? এ ছাড়া চাপ্পাকুইডিকের কেলেঙ্কারি চাপা পড়েছে মাত্তর, ঢাকা পড়ে নি। আগে ভাগেই রবার্ট কেনেডি সাফ বলে দিয়েছিলেন ভোটাভুটির ঝামেলায় তিনি নেই। আর এক তালেবর নেতা হিউবার্ট হাম্ফিরও ওই মত। তাঁর শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছেন নিক্সন ১৯৬৮ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। যেটুকু বাকি ছিল তাও গেছে ১৯৭২-এর দলের প্রার্থী নির্বাচনী সম্মেলনে। সেখানে তাঁকে হার মানতে হয়েছিল সেনেটর জর্জ ম্যাকগভর্নের কাছে। বার বার বেলতলায় যেতে তিনি আর রাজী নন।

নামী কাউকে বাগ মানাতে না পেরে দলের পাণ্ডারা রাশ ছেড়ে দিলেন। তাঁদের ভাবখানা হলো দেখা যাক না কাকে লোকের মনে ধরে। তাল ঠুকে আসরে নামলেন অনেকেই। আলাবামার দুঁদে গভর্নর জর্জ ওয়ালেস, ফ্র্যাঙ্ক চার্চ, হেনরি জ্যাকসন, মরিস উডল জেরি ব্রাউন। নিজের নিজের এলাকায় এঁরা সবাই এক একটা কেষ্ট বিষ্টু, দলেও তাঁদের প্রতিপত্তি বেশ। এঁদের সঙ্গে আসরে নামলেন জর্জিয়ার এককালের গভর্নর জিমি কার্টার। তিনি একটা কেউকেটা না হলেও এমন কিছু গণ্যমান্য লোক ছিলেন না যাঁকে দেশসুদ্ধ লোক এক ডাকে চিনবে। তাঁর শত্রুরা ঠাট্টা করে বলেছিল বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা—ঘরের লোক আর ইয়ার বকসিদের কাছে তিনি একটা দারুণ লোক হতে পারেন কিন্তু তাঁর গণ্ডির বাইরে কে তাঁকে পোঁছে? কথাটা খুব মিথ্যে ছিল না বছর দেড়েক আগে। তখন বিদেশের কথা ছেড়ে দিলুম দেশেও তাঁকে বড় একটা কেউ চিনতো না। তিনি রাষ্ট্রপতি পদের উমেদার শুনে অনেকে ভুরু কুঁচকে বলেছিল জিমি আবার কোন্ জন?

কিন্তু যাঁকে আঠারো মাস আগেও কেউ আমল দেয়নি, যাঁর ভোটের লড়াইয়ে দাঁড়ানো বামন হয়ে চাঁদে হাত বলে নাক সিঁটকেছেন রাজনীতির শিরোমণিরা তিনি সবাইকে বোকা বানিয়ে উঠেছেন গিয়ে ডেমোক্র্যাট দলের চূড়ায়। নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা এলাহি কাণ্ড। শেষ ফয়সালা হয় নিয়মতান্ত্রিক ভোটাভুটিতে। তা হবে এবার সারা দেশ জুড়ে ২ নভেম্বর। তাতে ঠিক হবে কোন দলের বরাত খুলবে—ডেমোক্র্যাটদের না রিপাবলিকানদের। কিন্তু তার আগে চলছে উদ্যোগ পর্ব। সে নাটকেরও অনেক অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দলগুলো করে রাজ্যে রাজ্যে ভোট নিয়ে নিজেদের প্রার্থী বাছাই। সেই প্রাথমিক পর্ব থেকেই আঁচ পাওয়া যায় কোন দলের প্রার্থী কে হবেন। অনেক সময় অবিশ্যি জোর লড়াই চলে শেষ পর্যন্ত। ফয়সালা হয় দলের জাতীয় সম্মেলনে। তার আগে পর্যন্ত থাকে কী হয় কী হয় ভাব। উৎকণ্ঠা থাকে উমেদারদের মনে, তাদের অনুচরদেরও দুর্ভাবনার শেষ থাকে না। দেশের লোকও আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে সম্মেলনের দিকে?

এবার সে সব কিছুই হয়নি ডেমোক্র্যাটদের সম্মেলন নিয়ে। জিমি কার্টার রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন যেন মহীরাবণের মতো একেবারে অব্যর্থ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, ভোজবাজীর মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তাঁর প্রতিপক্ষরা। একের পর এক প্রাথমিক নির্বাচনে তিনি জিতে চললেন সবাইকে টেক্কা দিয়ে। সম্মেলন বসার আগেই বোঝা গেল তাঁকে রোখার সাধ্যি সেখানে কারুর নেই। হয়ওনি। নির্বাচন হয়েছে নামকা ওয়াস্তে। আসলে সেখানে হয়েছে জিমি কার্টারের অভিষেক। পয়লা বেড়া মাকুর তিনি ডিঙিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনী সাগর তিনি যে নভেম্বরে অনায়াসে তরে যাবেন তা নিয়ে তাঁর মনে একটুও সন্দেহ নেই। কার সঙ্গে তাঁকে লড়তে হবে তা আজও অজানা। রিপাবলিকানদের তরফ থেকে কে নামবেন আসরে—ফোর্ড না রীগান তা ঠিক হবে আগস্টে দলের সম্মেলনে। জিমি কার্টারের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি ভাব দেখাচ্ছেন নিয়মকর্মটা না করলেই নয় তাই নির্বাচনের বন্দোবস্ত নইলে তিনি তো রাষ্ট্রপতি হয়েই গেছেন, কেবল আইনমাফিক অনুষ্ঠানের অপেক্ষা। গতিক দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই বলছেন—আকাশে ইমারত বানাচ্ছেন না। লড়ায়ে তাঁর দোসর (জিতলে তিনি হবেন উপরাষ্ট্রপতি) হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন মিনেসোটার সেনেটার ওয়ালটার মন্ডেলকে।

দেবরাজ

অতিথি

তারাপদ রায়

আমি তোমাদের জন্যে বসে থাকি।
সব দিন নয়, হঠাৎ কখনো
সকাল বেলার ভেজা-ভেজা বাতাসে
কেমন পুরনো কালের ছোঁয়া লেগে থাকে,
দু'একটা গাছের পাতা প্রতিবেশীর ছাদ থেকে
আলতো চিবুক ছুঁয়ে পড়ে যায়।
পোষা কুকুর পায়ের কাছে চোখ বুজে
কার জন্যে, কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করে।

বুঝতে পারি, গাড়ি এতক্ষণে এসে গেছে,
শুধু রিকশাওলার সঙ্গে দামদর করতে করতে
তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে
তবু আর একটু পরেই মেহেদির বেড়ার কাছে
হর্ন বেজে উঠবে.
ফলের ঝুড়ি, বেডিং, শিশুর কলহাস্য
গেট পেরিয়ে ছুটে আসবে।
আমি বাথরুমে যাই. দেখি তোয়ালে, তেল, সাবান
সব ঠিকমত আছে কিনা ॥

প্রিয় মানুষ

কবিরুল ইসলাম

দুটি প্রিয় মানুষ দিনরাত আমার চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে
রাত দিন আমার চোখের ভিতরে হেঁটে বেড়াচ্ছে দুটি প্রিয় মানুষ
দুঃস্বপ্নে এবং স্বপ্নহীন জাগরণে।

একজনের কোমরে সাইলেন্সার লাগানো আগ্নেয়াস্ত্র
একই সঙ্গে হত্যা এবং আত্মহত্যার প্রস্তুতি
তোমার শোয়ার ঘরে
সেই ঘরের ছাদ ও মেঝে তাসের মতো বিনা হাওয়ায়
উড়ে গেলো দিক চিহ্নহীন।

আর একজনের সমাজ সংসার বলে কিছুই রইলো না
কিংবা সবই রইলো নদীর ওপারে, সাজানো গোছানো
শুধু স্বপ্নবর্ণ-দুঃস্বপ্নে মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেলো যা
কিছু বর্তমান
যেমন করে গেছে অদূরের দুপুরও—
হায়, প্রিয় মানুষের পতনেরও কোনো শব্দ হয় না

আমারও শোয়ার ঘরে পাশাপাশি দুটি মৃত্যু আমি দেখেছিলুম
কিন্তু এসবের নাড়ি নক্ষত্র আমি কিছুই জানতুম না।

এই দ্যাখো, আমার দুহাত পেতে দিলুম
আমার হাতে কোনো ময়লা লেগে নেই ॥

তুমি লিখে যাও

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পর্ক যেমনই হোক, তুমি লিখে যাও
আলোছায়া খেলা করে, পাতাবাহারের নড়াচড়া……
মানুষ এসেছে. তার দুই চোখে স্বপ্ন নেই আজ
তুমি লিখে যাও. তুমি স্পষ্ট লিখে যাও
মিলেমিশে তৈরী হয় নকশায় সুতোর চাতুর্য।

কে ডাকে ওখানে আজ? কারা কথা বলে?
রাস্তার কুকুর জানে চাঁদ ওঠে কখন আকাশে—
কিছু ভিড় বাড়ে, আর কেউ কেউ আস্তে স'রে যায়,
সম্পর্ক যেমনই হোক. সুখদুঃখ আসুক. যেভাবে
আলোছায়া খেলা করে. পাতাবাহারের নড়াচড়া……
তুমি লিখে যাও, তুমি শব্দ লিখে যাও

মৃত্যু সম্পর্কে আরো

ভাস্কর চক্রবর্তী

এখন শীতের রাতে ওই ট্রেন
কতো দূরে যাবে?
আমি যাবো।
জানালার দেশ থেকে
তোমাকে লিখেছিলাম কতো চিঠি—
কতো কথা
তোমাকে বলেছিলাম
পথে-পথে, নির্জন টেবিলে।
অনেক বছর হ'লো
সেই সব—।
মনে পড়ে. আজো মনে পড়ে।
সমস্ত ভাঙ্গিছিলো আজ মনে পড়ে।
নির্জন চোখের জল
মনে পড়ে।
মাথা, ভারী হ'য়ে আসে—
মৃত্যু
দুই-তিন পয়সার খেলা।

মেঘ ডেকেছে শুনেই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মেঘ ডেকেছে শুনেই আমি জলের কাছে নারীর কাছে
আতাগাছে পাঁটিমাছে
দুঃখ আছে কি না আছে
দেখতে গিয়ে দেখি পুকুর শহর বিশ্ব
ভীষণ নিঃস্ব
লোকের মতন কেমন ক'রে চেয়ে আছে

গ্রামীণ মেয়েদের নীরব বিপ্লব

সুজাতা মিত্র

পশ্চিম বাংলার পল্লীসমাজের মেয়েদের অবস্থা এতই খারাপ যে তার থেকে তাদের বাঁচাবার উপায় চিন্তা করাও এক দুরূহ কাজ। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন মেয়েরা। অথচ পল্লীসমাজের তারা হলেন সংসারের বোঝা মাত্র। কারণ তাদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই। যদিও মেয়েরা ঘর-গৃহস্থালির কাজে তাদের যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেন অর্থনৈতিক পরিমাপে মাপলে তা মোটেও কম হয় না। কিন্তু তবু সে পরিশ্রম ও তার ফলকে পারিবারিক উপার্জন বলে ধরা হয় না। তাই কঠিন ও কঠোর হীনমন্যতার মাঝে মেয়েদের দিন কাটে।

আমরা 'গৃহশ্রী' মহিলা সমিতির মাধ্যমে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের আশেপাশে যে সব গ্রাম বা পরিবারের মধ্যে কাজ করছি, সেখানে দেখা গেছে পরিবারে মেয়ের সংখ্যাই বেশী, যারা পরনির্ভরশীল। কম, মাঝারি, বৃদ্ধা সব বয়সেরই আছে। এতগুলি মুখকে যদি একার আয়ে খাওয়াতে হয়, তবে সে পরিবার কোনদিনই আর মাথা তুলতে পারবে না। কাজেই মেয়েরা যদি পরিবারকে অর্থনৈতিক সাহায্য করার সুযোগ না পান তবে যত দফাই অর্থনীতি প্রকল্প নেওয়া হোক না কেন গরিবী তাদের পেছনের দিকে অবিরতই টানবে। কেবলমাত্র কৃষিভিত্তিক ও পুরুষ-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা সামগ্রিক আয় বৃদ্ধির সহায় হতে পারেই না। উৎপাদনহীন এতগুলি গ্রামের গহ্বরে সবই তলিয়ে যাবে।

অনেকেই মনে করেন নারীবর্ষ উদ্‌যাপিত করে, অনেক স্লোগান, অনেক সভা সমিতিতে অনেক সোচ্চার দাবী নিয়ে ধ্বনি তুললেই বুঝি মেয়েরা সচেতন হবেন। অথবা সমাজ তাদের সম্বন্ধে সচেতন হবেন। আমার মনে হয় এ পন্থা একেবারেই ভুল। সাক্ষরতা বা সমাজ শিক্ষার চেয়েও এক্ষুনি যা প্রয়োজন এই সব পল্লীবাসিনীদের জন্য, তা হলো ঘরে বসেই কিছু আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে শতকরা ৯০/৯৫টি পরিবার এখানে। এবং এই সব পরিবারে বাড়তি পারিবারিক আয়ের পথ করে দেওয়াই এখন একমাত্র জেহাদ হওয়া দরকার। কিন্তু সেটা করতে হবে তাদের ঘর থেকে বের করে এনে কলকারখানায় মাঠে মজদুর হিসেবে জুড়ে দিয়ে নয়। সেখানে পুরুষ যথেষ্ট পাওয়া যাবে। দিনে আট/নয় ঘন্টা মেয়েরা কাজ করলে বাইরে, ঘরের সন্তান সন্ততি ও গৃহস্থালীর মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, আমাদের ঐতিহ্যময় পল্লীসমাজের পক্ষে সেটা মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে। নানান রকম সামাজিক সমস্যা, দুর্নীতি নতুন করে পল্লী-অঞ্চলেও প্রবেশ করবে। এবং তাই নিয়ে ভবিষ্যতে আমরাও তাহলে পশ্চিমী দেশগুলির মত সমস্যায় পড়ব। তাই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোকে ঠিক রেখে, ঘরে বসেই মেয়েরা যাতে বাড়তি আয় ঘরে আনতে পারেন, এবং তার দ্বারাই তারা হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে নিজেদের মূল্যবোধ বাড়াতে পারেন, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। শিল্পজাত চারুকলাই হল একমাত্র উপায় যা দিয়ে মেয়েদের ঘরে রেখেই ভাল আয় দেওয়া যায়। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই কাজ করে দেখা যাচ্ছে যে বীরভূমের এই অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। এ অঞ্চলের মেয়েরা পূর্বেই অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাব নিয়েই জীবনযাপন করতেন। এবং কোন কারণেই অর্থ রোজগার হেতু বাইরে যাওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু এখন পুরুষ অভিভাবকরাই সোৎসাহে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দরবার করছেন ও পাঠাচ্ছেন। যত-রকম ভাবে পারেন মেয়েদের সাহায্যও করছেন। এ সবই ঘটছে নীরবে কোন রকম স্লোগান দিয়ে নয়।

আরেকটি দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি সেটি হল মেয়েরা যেন একাজে আনন্দ পান। তাদের রুচিবোধ ও সুপ্ত শিল্পবোধকে যেন জাগানো যায়। সৌন্দর্য চেতনা যেন তাদের মধ্যে ফিরে আসে। পল্লী অঞ্চলের যে একঘেয়েমি তার থেকে তারা যেন একটু মুক্তি পান। কেবলমাত্র টাকা রোজগারের যে যান্ত্রিক যন্ত্রণাবোধ তা যেন তাদের মধ্যেও সংক্রামিত না হয়।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ পল্লী সংগঠনের কাজে অনেকবার জোর দিয়ে বলেছেন যে পল্লীবাসীদের কাছে আমরা যেন কেবলমাত্র শুষ্ক কাজ নিয়েই না যাই। কাজের সঙ্গে আনন্দ, রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও সৃষ্টির তৃপ্তি যেন পৌঁছয় সেখানে। এই বিষয়ে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্য প্রকট ভাবে তাঁকে সমালোচনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি ও বাণীর প্রতিটি অক্ষর কত যে বাস্তবধর্মী সত্য, তা আজ আমরা কাজের মধ্যেই বুঝতে পেরেছি। তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের তথাকথিত অশিক্ষিত, অসভ্য, অর্ধভুক্ত পল্লীবাসীদের মধ্যেও যে সহজাত শিল্পবোধ ও সৃষ্টির ক্ষমতা আছে তাকে পুনরুদ্ধার করে জাগিয়ে তোলাই হবে আমাদের কাজ। ভারতের জনগণের ঐতিহ্যময় কারু ও চারু-শিল্পকে অনাদরে অবহেলায় ভুলে যেতে দেওয়া হয়েছে বহুদিন। জনজীবন থেকে তাই দূরে চলে গেছে সে সব। অনেকে আবার এ-সবকে শিকেয় তুলে রাখতে
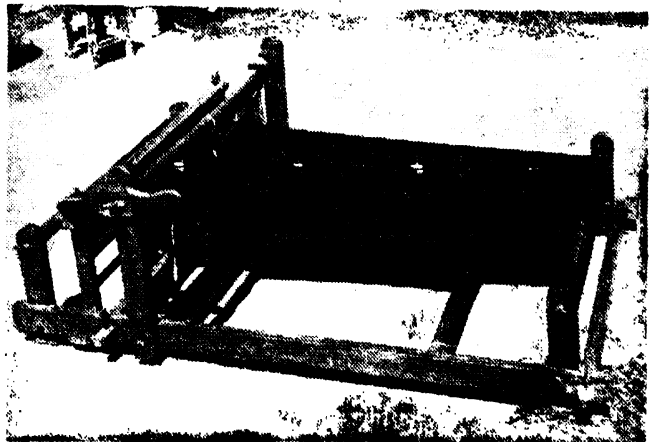
সহজ তাঁত

সহজ তাঁতে টানা দিচ্ছে মা ও মেয়ে

চেয়েছেন। কিম্বা রিসার্চ উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য যাদুঘরে সযতনে ভরে দিয়েছেন। এইভাবে দৈনন্দিন জীবন ছেলে নিংড়িয়ে সাদাসিধে করে ফেলেছেন অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু তা করলে আর চলবে না, একেবারে সাদামাটা বাস্তব কারণেই। কারণটি হল—এই শিল্পসৃষ্টিই তাদের দিতে পারে ভালো দাম, বেশী আয়। কবির কথার মধ্যে শুধুই কবি কল্পনার সৌন্দর্য উপাসনাকেই দেখতে পেয়েছিলেন অনেকে। কতখানি বাস্তব সত্য তাঁর কথায় নিহিত ছিল তা এখন বোঝা যাচ্ছে। একটি বিশেষ উপায়ে বিদেশী মুদ্রা আয়ের পন্থাও হল এই উচ্চমানের ঐতিহ্যময় চারুকলার উৎপাদনই।

কারো কারো মতে কেবল গামছা বানিয়ে সাদামাটা পানসে, নিত্য প্রয়োজনীয় সস্তা ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিয়েই তাদের আয় বাড়ানো যাবে। কথাটা সত্য নয়। তাতে করে তাদের ব্যয়ের সাশ্রয় হতে পারে আয়ের বৃদ্ধি ঘটে না। যেমন বেনারসী ও টাঙ্গাইল তাঁতীরা যদি কেবলমাত্র তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুরই উৎপাদন করেন তবে তাদের আয় বাড়ে কি? এটাও ঠিক সেই রকম। কাজেই এদের মধ্যে জনে জনে সৌন্দর্যবোধকে ক্রমশ আরও উচ্চমানে টেনে তুলে ভাল দাম আনাই হল একমাত্র পথ। অন্য কোন পথ আমি তো আর দেখি না।

যে হাত জাঁতা পেষে, ঢেঁকি চালে, মাটি কাটে, ধান সেদ্ধ করে, মোট বয়, গরু বাঁধে, বিচালি কাটে, গোবর মাটি নিকোয়, সেই হাতই অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করারও ক্ষমতা রাখে, এটা এখন প্রমাণিত সত্য। এখন এখানে তার জন্য বিশেষ সৌন্দর্য চর্চার ক্লাশের প্রয়োজন হয় না। গুরুদেব বরাবর বলেছেন শিল্পকে প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে নিতে। কেবলমাত্র নিজেদের জীবন-ধারণের জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় সস্তার জিনিসই কেবল উৎপাদন করা, যেহেতু আমাদের দেশ গরিব, *এটা হল একপেশে ধারণা।* এই ধারণার সঙ্গে গুরুদেবের ধারণার কোন মিলই নেই। এইসব জিনিসের উৎপাদন যা বাজার দর দেবে, তাতে পল্লীবাসীদের খাটুনি সার হবে, পেট ভরবে না। এই উৎপাদনের সঙ্গে শিল্পের সংযুক্তিকরণ ঘটলে লাভ দুই ভাবে। এক—অধিক আয়, দুই—সৃষ্টির আনন্দ। যা হয়ে ওঠে বিনোদনও। এই সব ছোটখাট শিল্পসৃষ্টির পর এই ম্লান, মূক মুখে যে তৃপ্তির লাজুক হাসি দেখি তার বর্ণনা দিই এমন ভাষা আমার কোথায়?

কাজেই গুরুদেবের কথা স্মরণ রেখে দুইটি সৃষ্টিধর্মী কুটির শিল্পকে আমরা ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে দেবার চেষ্টা করছি।

(১) উন্নত ও ঐতিহ্যময় সূচীশিল্প ও (২) সহজ তাঁত প্রকল্প।

সূচীশিল্পে মূলধন কম লাগে। অর্থনৈতিক ঋণ বা সাহায্যের তেমন দরকার

সূচীশিল্পের কাজে ব্যস্ত গ্রামের মেয়েরা

হয় না। শুধু বাজারটিকে উচ্চমানের কাজ দিয়ে সর্বদা জিইয়ে রাখতে হয়। তাহলে আপনা থেকে ঘরে বসেই কাজকে ঘরে টেনে আনা যায়, সঙ্গে সঙ্গে। কাম টানলে মাথা টানার মত টাকাও আসে। আমাদের দেশের সূচীশিল্পের যে উচ্চ মান ও ঐতিহ্য তার তুলনা মেলা ভার। এখন এই শিল্পটিকে বিলুপ্ত অবস্থা থেকে এবং কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের ফ্যাশনের কাঁচবাক্স থেকে আবার বের করে এনে ছড়িয়ে দেওয়া গেছে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে। এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের একটি বৃহৎ আয়ের সহায় হয়ে পড়েছে এই শিল্প। বর্তমানে ৭০টি পরিবার এর দ্বারা এ অঞ্চলে উপকৃত হচ্ছে। এবং সূচী শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। দেশ বিদেশ থেকে চাহিদা আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে মা, মেয়ে, দিদিমার মিলিত প্রয়াসে এই চারুকলাটির মারফতে গড়ে মাসে ২০০।২৫০ টাকা এদের ঘরে আসছে। একটিমাত্র যাদু এতে কাজ করে—সস্তা করার জন্য মানকে খেলো করা নয়। তা করতে গেলেই হিতে বিপরীত হবে। সর্বদাই শিল্পকলাটিকে উচ্চমানের দিকে টেনে রাখতে হবে। ভাল শিল্পকলার ধ্বংস নেই। এই দিকেই রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর দৃষ্টি ছিল। তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী এই কাজে।

এবার দ্বিতীয় প্রকল্প 'সহজ তাঁতের' কথা বিশদভাবে বলি। শ্রীনিকেতনের বয়ন-শিল্প বিভাগের অধিকর্তা মহীশূরনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনিভাসন বিশ্বভারতীতে বিগত কুড়ি বৎসর ধরে নানান রকম 'সহজ তাঁত' তৈরীর কাজে ধ্যানমগ্ন আছেন। বিশেষ করে ইস্কুলে, কলেজে ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কি করে এই তাঁতের সমাদর আনা যায়, বা 'হবি' হিসেবে একে কি করে সমাদৃত করা যায়, সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি এতদিন ধরে ছিল নিবদ্ধ। আমরা প্রথমে একটি ছোট মহিলা সমিতি 'গৃহশ্রী'র মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ করি তাঁর এই তাঁতকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অর্থকরী দিকে দৃষ্টি দিয়ে গঠন করতে। শ্রীযুক্ত শ্রীনিভাসন তক্ষুণি তৈরী হয়ে যান সোৎসাহে একাজের জন্য। নিজে তার ব্যক্তিগত খাটুনিতে মিস্ত্রির সঙ্গে বসে কাঠ নিয়ে ঠোকাঠুকি করেন। জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার বোলপুর শাখার এজেণ্ট শ্রীদত্তও হাত মেলান একাজে। তাঁদের অর্থ সাহায্যে তৈরী হল প্রথম সাতটি তাঁত। যে সব পরিবারের মেয়েদের একরকম ভদ্রোচিত আয়ের ব্যবস্থা না হলে পুরো সভারাও উপোস থাকেন, সেই রকম পরিবার থেকে দারিদ্র্য সীমার নীচের, অত্যন্ত দুরবস্থা-জনক অবস্থার সাতটি মেয়েকে এই সমিতি থেকে বেছে নেওয়া হয়। এবং ডিফারেন্সিয়েট রেট অফ ইণ্টারেস্ট প্রকল্পে মাত্র ৪% সুদে প্রতিটি মেয়েকে তাঁত কেনা ও প্রাথমিক পর্যায়ে সুতো কেনার জন্য টাকা ঋণ হিসেবে সাহায্য দেন ঐ ব্যাঙ্ক। কোন রকম সিকিউরিটি ব্যতিরেকেই। তাঁতের দাম পড়ে ৩৫০ টাকা, সর্বপ্রকার আনুষঙ্গিক অংশ সমেত। সুতোর জন্য ৫০ টাকা দিয়ে মোট ৪০০ টাকার ডিড হয় মেয়েদের ও ব্যাঙ্কের মধ্যে। শ্রীনিভাসন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে সস্ত্রীক, দুজনে মিলে সাত-দিনে আমাকে ও ওই সাতটি মেয়েকে তাঁতের কাজকর্ম শিখিয়ে দেন। মেয়েরা প্রথম মাসেই আয় করে ৭৫ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে দাঁড়ায় সে আয় ১৫০ টাকায়। প্রতি মাসে নিয়মিত ১০ টাকা করে মেয়েরা ব্যাঙ্কে ধার ও সুদ শোধ করতে থাকেন কিস্তিতে কিস্তিতে।

একটি ছোট বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গ পূর্ব দিগন্তভালে উদিত হল বলে অনেকেই তখন বুঝতে পারেন। তখন শ্রীনিকেতনেও সরকারি ভাবে এই প্রকল্পটিকে রূপদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয় আরও বৃহত্তর পরিধিতে। আমরা মনে করি এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পরিকল্পনা। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যাতে দেশের বৃহত্তর পরি-কল্পনাতে গ্রামীণ সর্বাঙ্গীণ আরবৃদ্ধির কথাই ভাবা হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।

সূচীকলা

কাঁথার কাজের শাড়ি

আগেই বলেছি যে আমাদের চেষ্টা মেয়েদের ঘরে রেখেই, তাদের দ্বারা পরিবারের সহযোগিতায় আয়বৃদ্ধি করা। এই তাঁতটি এ কাজে আদর্শস্বরূপ। তাঁতটি ছোট ও সহজ। এটি চালনা করতে মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রমের কম প্রয়োজন হয়। তাঁতটি হালকাও। গ্রামাঞ্চলে ঘরের সমস্যা থাকায় এদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। রাত্রে এটিকে দেয়ালে আলনার মত করে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো যায়। সেখানে বিছানা পড়ে। দিনে মেঝেয় পেতে নিয়ে বোনা চলে। অতি সহজেই, বোনা-পদ্ধতিতে প্রতি ইঞ্চিতেই, নতুন নকশা ফোটানো যায়। এর জন্য কেবলমাত্র একমাসের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট। কোনরকম পূর্ব অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন পড়ে না। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, টেবিলম্যাট, চাদর, পর্দা, বিছানা পাশের কার্পেট এই সবই এ তাঁতে বোনা হচ্ছে। মাত্র একমাসের প্রশিক্ষণের পর সৌন্দর্য সৃষ্টি করছেন আদিবাসী মেয়েরাও। এখন দেখা যাচ্ছে এই সব ঘরে পূর্বে যেখানে শিশুরা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বাচ্চা আগলানো, বা পরের গরুর বাগালী, বা অন্যের সংসারে কাজ করে ক'টা টাকা রোজগার করতেন, এখন তারাই, সবাই ধীরে ধীরে ওই একটি তাঁতকে ঘিরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ সুতো গুটোচ্ছে, কেউ টানা দিচ্ছে। মা নাইতে গেলে বা খামার বসলে অন্যরা একটু বুনে ফেলছে। বাবাও অবসর মত সুতো নাটাই করছে। সবার অজান্তে স্বাভাবিকভাবে ওই তাঁতটিকে জড়িয়ে ঘিরে তারা ব্যস্ত। এই যে ধীরে ধীরে জীবনধারণের নকশা নীরবে নিভৃতে বদলে যাচ্ছে তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এমনও দেখা যাচ্ছে যেখানে পুরুষদের কোন আয়ই নেই মেয়েরা সেখানে তাকতের সঙ্গে সংসারের বায়ভার বহন করছেন। অন্ন জোগাচ্ছেন অনেকগুলো মুখের। এতে করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মর্যাদার যে পরিবর্তন লক্ষ করছি সেইটেকেই আমরা মস্ত বড় বিপ্লব ঘটেছে বলে মনে করি। নীরবে নিভৃতে সবার অলক্ষে।

সভা সমিতি করে একাজ কখনোই সম্ভব হত না।

শ্রীনিকেতনে এই পরিকল্পনাটিকে রূপ দিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের এস-ও-এস ফান্ড থেকে অর্থ আনুকূল্য পাওয়া যায়। দারিদ্র্য সীমার নীচে যারা আছেন সেই সব পরিবার থেকে ৫০টি মেয়েকে বেছে নেওয়া হয় প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। এই প্রকল্পে আদিবাসি মেয়ে ১১ জন ও বাকি তপশীল জাতিভুক্ত ও কিছু বর্ণহিন্দু পরিবারের মেয়েও আছেন। শ্রীনিকেতন পল্লী উন্নয়ন বিভাগের আওতায় যে ২৫টি গ্রাম নিয়ে সামগ্রিক উন্নতির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই ২৫টি গ্রামের মধ্যে ১০টি গ্রাম থেকে প্রথম বারের মত, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি, সমবায় সমিতির মাধ্যমে এদের পাঠানো হয়েছে। প্রতি মাসে ১০জন করে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। 'গৃহশ্রী' সমিতির সভ্যাদের মতই শিক্ষার্থিনীরা ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে তাঁত পান। তাঁতগুলি এবার তৈরী হয় শ্রীনিকেতনের বয়নশিল্প বিভাগে। ব্যাংকগুলি সুতোর জন্য সিকিউরিটি জমার টাকাও শিল্পসদনে জমা দেন এদের পক্ষ হতে। প্রশিক্ষণের পর শিল্পসদনের মাধ্যমে সুতো দিয়ে মেয়েদের কাজ দেওয়া হয়। তারা বাড়ি থেকে বুনে এনে শিল্পসদনে জমা দিয়ে মজুরী বাবদ টাকা পেয়ে যান। এবারে ৪৬০ টাকা করে ঋণপত্র তৈরী হয়। ঠিক হয় এদের মজুরী থেকে নগণ্য শতাংশ কেটে রেখে মাসে মাসে অথবা কয়েক কিস্তিতে এদের ধার ব্যাংকে শোধ করা হবে। এবারে সহযোগিতা করেন—

১। ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, বোলপুর শাখা।

২। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বোলপুর শাখা

৩। ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বোলপুর শাখা

রাজ্যপালের এস-ও-এস ফান্ড থেকে যে টাকা অনুদানএর জন্য পাওয়া যায় তা থেকে প্রতি মাসে টিফিন ও যাতায়াত খরচ বাবদ ৩০ টাকা করে মেয়েরা পান।

প্রশিক্ষণকালীন কাঁচামাল এর থেকেই দেওয়া হয়।

সর্বভারতীয় খাদি কমিশনের চেয়ারম্যান ঘনশ্যামদাস ওঝা বিগত সেপটেমবর ১৯৭৫ সালে এখানে আসেন শিল্পোৎসবের প্রধান অতিথি হয়ে, খাদি ও গ্রামীণ কুটির শিল্পের একটি অম্বর চরকা প্রকল্পের উদ্বোধন করতে বিশ্বভারতীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সেই সময়ে প্রশিক্ষণকালীন মেয়েদের হাতের কাজের উৎকর্ষ দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি খাদি কমিশনের পক্ষ থেকে কথা দেন এই রকম উচ্চমানের [illegible] তাদের খাদি সুতোর করে দিলে—সুতো তাঁরাই দেবেন, বিক্রি তাঁদের দায়িত্বেই থাকবে। আমাদের কাজ হবে মেয়েদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে তাঁদের কাছে পাঠানো। মজুরী মেয়েরা পাবে। তার থেকে তাদের ঋণ শোধও হবে।

পুরোপুরি ৫০টি মেয়ের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পূর্বেই সর্বভারতীয় খাদি কমিশনের কাছ থেকে খাদি সুতো আমাদের হাতে এসে যায়। এবং ৩০টি মেয়েকে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পে এনে কাজ শুরু হয়ে যায়। ৭৫টি পরিবার এই 'সহজ তাঁত' নিয়ে এ অঞ্চলে উপকৃত হয়েছেন। সর্বভারতীয় খাদি কমিশন তাদের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসায়, তার সঙ্গে বিশ্বভারতীর দক্ষতা, শিল্প নৈপুণ্য, রুচিবোধ ও কর্মী এবং জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলির অর্থসাহায্য এবং রাজ্যপালের অনুদান একসঙ্গে পাওয়ায় ফলে যে ঘটনা ঘটল তাকেই আমি গ্রামীণ মেয়েদের নীরব বিপ্লব বলেছি। •

হাল্কা বাদামি, গাঢ় বাদামি, গাঢ় লাল, হাল্কা সবুজ, চারটে দেয়াল চার রকম রং। পুরোন হাঁড়ির মত পাখার কাঠের ব্লেডের হাওয়া। জেঠু বলতেন মিষ্টি হাওয়া, সঙ্গে মৃদু কিচকিচ শব্দ লেগেই থাকত। সেখানে নতুন পাখা। ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়ে যে উঁচু খাট ছিল, ছোটবেলায় আমি যার পা বেয়ে ওপরে উঠতাম, সেখানে হাল ফ্যাশানের নীচু খাট ঝকঝক করছে, বসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অনেকটা বসে যায় গদিতে। তবে জেঠু প্রায় একইরকম আছেন। ছোট বেঁটেখাটো মানুষ।

আমি প্রায় এক বছর পর এ বাড়ি আসছি। ক'দিন ধরে বাড়ি থেকে তাগাদা দিচ্ছিল অফিস ফেরত জেঠুর বাড়ি হয়ে যেতে। অথচ এককালে জেঠুর বাড়ি ছিল আমার সবচাইতে প্রিয় জায়গা। আমি যেতেই উনি বললেন 'বোস'।

আমি বসলাম।

'খাটের নরম গদিতে শুয়ে কি যে অভ্যাস হয়ে গেছে, কোথাও দু-একদিনের জন্য গেলে ঘুমই আসে না।' জেঠু বললেন।

আমি ঘরের চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিলাম।

ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি চুন-খসা দেয়াল। জল ছাদ চুঁইয়ে দেয়ালে দাগের নানা বিচিত্র দৃশ্য চোখে ভাসত। আমরা রামায়ণের গল্প শুনে কখনও দেয়ালে দেখতাম মেঘের আড়াল থেকে মেঘনাদ যুদ্ধ করছে, কিংবা রাবণের দশটা মাথা বড় বড় দাঁত বার করে হাসছে। পিছন দিকে দেয়াল রেখে জেঠু খাটের উপর পা গুটিয়ে বসতেন আর দরাজ গলায় হাঁকডাক করতেন। তখন জেঠুকে বড় নির্দয় মনে হত। বাড়ির লোক সব ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। কার কখন ডাক পড়ে।

জেঠুর পুরোনো সেকালের চৌদ্দ পনেরোটা ঘর নিয়ে বিশাল বাড়ি। মধ্য কলকাতায় কয়েক পুরুষের বাস। পড়তি অভিজাত পরিবার হিসাবে এঁদের নাম আছে। কলকাতার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে পূর্বপুরুষের নাম এসে যাবে। তখন আমি ছোট। আমাদের বাড়িটা ছিল জেঠুর বাড়ির কাছাকাছি। প্রায়ই বাবার সঙ্গে এবাড়ি বেড়াতে আসতাম। বাবা বলতেন, আত্মীয়-বাড়ি। তাড়াতাড়ি জামা পরে নে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটতাম মার কাছে। ছোটবেলায় আমাদের একটা পেটেন্ট সাজ ছিল। চোখে জোর করে কাজল দেবে, ও দিলে নাকি চোখ ভাল থাকে। যখনই চোখে কাজল দেবে বুঝতে হবে বেড়াতে বেরুবো। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে সাজগোজের কোন রেওয়াজ ছিল না। কোনরকম একটা প্যান্ট ঢলঢল করছে, তার ওপর শার্ট পরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেত। তখন সিনেমা বা খেলা কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঘুরে-ফিরে জেঠুর বাড়ি যেতুম। আর একটা কথা মাথার মধ্যে বসে গিয়েছিল—আত্মীয়বাড়ি। তখন আত্মীয়বাড়ি কথার অর্থ বুঝতুম না। জেঠুর বাড়ি গেলে বড় বড় সাইজের রসগোল্লা খেতে দিত। তখন আমার ধারণা হয়েছিল আত্মীয় মানে খাওয়া দাওয়া। ছোটবেলায় জেঠুর বাড়ি আমাদের কাছে বেড়ানোর একটা আদর্শ জায়গা ছিল।

জেঠুরা ন' ভাই। তাদের ডালপালা গজিয়ে বিরাট সংসার। বাড়ির মেম্বার একশ'র কাছাকাছি। খাওয়ার ব্যবস্থা সব একসঙ্গে। মাসের প্রথমে সকলেই টাকা জমা দেবে জেঠুকে। তাঁর বড় রেজিস্ট্রি খাতায় সবার নাম আছে। ঠিক করা আছে কে কত টাকা জমা দেবে। মাসের প্রথমে একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং-এ ম্যানেজার ঠিক হয়। তার আয়ু এক মাস, ওর মধ্যেই সে এক সেট জামা প্যান্ট আর একটু চেপে করতে পারলে জুতো অব্দি করে নেয় কিংবা গরমে দার্জিলিং যাওয়ার খরচটা তুলে নেয়। আর প্রায় প্রত্যেক মাসেই যে কোন একজন জেঠুকে টাকা জমা দেবে না। মাইনে পেয়ে বাড়ি ফেরার সময় ট্রামে পকেট কেটে পুরো টাকা চলে যাবে। ক'দিন জেঠুকে এড়িয়ে

চলবে এবং তার পূর্ণ বিশ্বাসের জন্য একদিন নিখুঁতভাবে পুরোন জামার পকেট ব্লেড দিয়ে কেটে দেখাবে, তারপর রেহাই পাবে। তখন বাড়িতে যে আসবে ছেলেবুড়ো থেকে শুরু করে সকলের কাছেই জেঠু ঐ এক গল্প করবে। যার একবার পকেটমার যাবে সকলে না ভোলা অব্দি অন্তত বছর না ঘুরতে দ্বিতীয়বার তার পকেটমার যেতে পারবে না। যার একটু বেশী শখ বা ভাল কামাই সে প্রতিমাসেই জামা-কাপড় কপে। আর যার ওসবের বালাই নেই., সে যারটা হাতের কাছে পাবে পরে বেরিয়ে যাবে। প্রায় আট দশজনের সাইজ এক, জুতো থেকে শুরু করে যায় জামা প্যান্ট অব্দি। এ নিয়ে মাঝে মাঝে অশান্তিও যে হয় না, তা নয়। কখনও কখনও এমন চরমে উঠে যায়, মারপিট সোডার বোতল অব্দি চালাচালি হয়ে যায়। জেঠু এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নিস্পৃহ। খুব কঠোর-হস্তে দমন করে। তার জাজমেণ্ট বড় নিরপেক্ষ। তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হত, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতা হলে জেঠুকে বড় মানাত।

কলেজের হোস্টেলে যেমন ব্যবস্থা, সপ্তাহে একদিন ডিম, তিনদিন মাংস, বাকি দিন মাছ। মাছের-টুকরো ছোট, মাংসে হাড়—এ নিয়ে প্রায়ই অশান্তি দেখা দিত। বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে ঠাকুরের গোলমাল লেগেই থাকত। যদিও বাড়ির ভেতর জেঠুর জন্য ঠাকুরদের কিছু বলার উপায় ছিল না। কারণ, এতগুলো লোকের রান্নার ঠাকুর হঠাৎ কাজ ছেড়ে গেলে বড় অসুবিধেয় পড়তে হতো। তাই ছেলেরা বাড়িতে কেউ কিছু বলতো না। ঠাকুররা রাস্তায় বেরুলে পেটাত, কিংবা পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দিত। এর ফলে, অসময়ে ভাঙ্গা মাসে প্রায়ই তারা পালিয়ে যেত। আবার নতুন লোক আসতে দু'একদিন দেরি হতো। সে সময় কাকীমার দল বেঁধে কোমরে কাপড় গুঁজে রান্নার কাজে হিমসিম খেত। এই সময়টা বড় মজার ছিল। কাকীমাদের বাড়ি থেকে 'এমার্জেন্সি' ফোন আসত। কারো একশ বারো বছরের ঠাকুমার মরণাপন্ন অবস্থা, কারো বাবার শরীর খুব খারাপ, ডাক্তার বলেছে যে কোন সময় স্ট্রোক হতে পারে, স্ট্রোক হলে তো আর কাউকে দেখতে পারবে না। এর মধ্যে রাঙা কাকীমার বাড়ির অবস্থা সবচাইতে ভাল ছিল। তার একভাই বিদেশে গেছে উচ্চ শিক্ষায়। সপ্তাহে দুটো চিঠি দেয়ার কথা, এ সপ্তাহে একটা চিঠি এসেছে। আর ছোট বোন দার্জিলিং-এ পড়াশোনা করে। সেখানে খেতে বসে দেয়ালের গায়ে আরশোলা দেখেছে। এ সপ্তাহে একটা চিঠি কেন এলো না—নিশ্চয়ই কোন কিছু হয়েছে, আর দেয়ালে আরশোলা ঘুরতে যখন দেখা গেছে, ওটা খাবারে নেমে আসতে কতক্ষণ? আরশোলা খেলে কেউ বাঁচে না। দার্জিলিং-এ কোন কিছু ঘটলে একটু শেষ দেখাও যাবে না। এমন জায়গা, ট্রেনের টিকিট অব্দি আগে থেকে 'বুকড', এসব সাত পাঁচ ভেবে রাঙা কাকীমার মা গতকাল থেকে বিছানা নিয়েছেন। ব্যাস্, ফোন পাওয়ার পর থেকেই কলকাতা কর-পোরেশনের জল কাকীমার দুচোখ দিয়ে ঝরনার মতো নেমে আসতে লাগল। এ বাড়িতে বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে জেঠুর অনুমতি দরকার হত। রাঙা কাকীমা জেঠুকে প্রণাম করে বাড়ি যাওয়ার কথা বলতে—

জেঠু বলতেন 'বিশুকে নিয়ে যাও।'

বিশু এ বাড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ছোটবেলা থেকে ওর মা বাবা কেউ নেই। জেঠুর বাড়িতেই মানুষ। খুব বিশ্বস্ত। বাড়ির সকলেই ওকে ভালবাসে। যখ্ন যখন দরকার বিশুর ডাক পড়ছে। একার বিশু নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। দুচার পয়সা আম-দানিও করছে।

রাঙা কাকীমাকে আর কিছু বলতে হবে না। জেঠুই খুব সমবেদনার সঙ্গে বলবেন, বৌমা, তোমার ভাই আবার বুঝি চিঠি দেয়নি।

রাঙা কাকীমাকে উত্তরে কিছু বলতে শোনা যায় না।

জেঠুকে আবার বলতে শোনা যায়, হোস্টেলে তোমার বোনের খাবারে আরশোলা পড়েনি তো আবার?

রাঙা কাকীমা ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে।

শোনা যায় রাঙা কাকীমার বাবা একবার অফিসের কাজে মাস খানেকের জন্য বিদেশ গিয়েছিলেন। ঐ এক মাসেই সারা পৃথিবী দেখে এসেছেন। ভদ্রলোক প্লেনে উঠতে উঠতে দেখেছেন, নামতে নামতে দেখেছেন। 'ঐ সব দেশ ছবির মত সাজান।' 'এমন প্যাচপেচে বর্ষা ওদেশে হয় না।' 'কলকাতা

এত বড় একটা শহর, কত লোকজন।' 'এখানে বলা নেই কওয়া নেই বর্ষা।' 'এখানে গ্রাম ছেড়ে বর্ষার আসার কি দরকার।' 'শহরে এত জল দিয়ে কি হবে।' 'জলের দরকার গ্রামে, চাষ হবে ওখানে।' 'কাল হাজরায় গাড়ি নিয়ে চল্লিশ মিনিট আটকে ছিলাম।' 'এখানকার মানুষ তো বর্ষাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেই, তা এমন কি, যারা একটু সমালোচনা করে—প্রেস, তারাও বর্ষাকে কিছু বলছে না।' বরং বর্ষার 'ফেবারে' কাগজে ফলাও করে নানা খবর ছাপা হচ্ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় আবার ছবি। জেনে রাখ, বড় শহরের একটা নেশা আছে 'কেউ একবার এলে যেতে চায় না।' বর্ষার যদি সে নেশা পেয়ে বসে তা হলে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবে। তখন দেখবে দেশে দুর্ভিক্ষ—চাষের অবস্থা হবে গয়া।

ঐ দেশে খাওয়ার ঘরে এমন আরশোলা কেউ দেখতেই পাবে না। যদি দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলবে। আসল কথা, ও-দেশের আরশোলারা এমন স্বাধীন নয়, ইচ্ছে করলেই যেখানে সেখানে যেতে পারে না। যদি খাবারে আরশোলা পড়ে, তা হলে কি হবে। ভাবা যায় না। আমি ও-দেশেই চলে যাবো। অনেক চেষ্টা করলাম এখানে থাকতে, কিছুতেই সম্ভব নয়। কি করব ভাই, সবই কপাল। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি জেঠুকে বলো তার কথা আমার মনে থাকবে। জেঠুকে বলো মাঝে মাঝে রাত্তিরে ট্রাংক কলে কথা বলতে। রাত্তিরে ট্রাংকের চার্জটা কম। আর একটা কথা জেঠুকে বলো, তিন মিনিটের বেশী সময় যেন না নেন। বুঝতে পারছো, গাড়ির মডেল পাল্টানো, ঘন ঘন পার্টি, উইক-এন্ডে যাওয়া, এত বড় একটা সংসার মাথায় নিয়ে যাচ্ছি, পেরে উঠবো না।

'বিশু এবার থাম'—জেঠু গম্ভীর গলায় বললেন।

আসলে এ সব বিশুর আবিষ্কার। ও যেদিন রাঙাকাকীমার বাবার বাড়ি যাবে, ফিরে এসে এসব গল্প ফাঁদবে। রাঙাকাকীমার বাবার সঙ্গে বিশুর খুব জমে—হয়ত ভদ্রলোক কিছু বলেছেন, তার ডালপালা গজিয়ে বিশাল গল্প বিশু তৈরী করবে।

যাত্রার আসর যেমন বসে। একদিকে মেয়েরা সামনে বাচ্চা ছেলেপুলেরা আর বড়রা একটু দূরে। এর মধ্যে কেউ জেঠুর পা টিপছে, মাথার চুল টানছে, পিঠে হাত বোলাচ্ছে।

বিশেষ করে গরমের দিনের রাতে আসর বেশ জমে ওঠে। বাড়ির প্রায় ফিফটি পারসেন্ট জেঠুর ঘরে ভিড় করে। গল্পের কোন মাথামুণ্ডু নেই—নানা রাজ্যের গল্প হয়।

এর মধ্যে জেঠু বললেন, 'ভোম্বলটাকে দেখছি না!'

ভোম্বল ন'কাকার ছেলে। তিন মেয়ের পর অনেক ওঝা বদ্যি করে ভোম্বল। ভোম্বল যখন বড় হতে শুরু করল, তখন ওর মাথাটা শরীরের তুলনায় বড় দেখাতে লাগল। আর হাত-পাগুলো সরু সরু। ভোম্বলের আর একটা রোগ ছিল। যেখানেই জায়গা পেত, ঘুমিয়ে পড়তো। ও চান করতে করতে ঘুমোত, খেতে খেতে ঘুমোত, পড়া-শোনাও ঘুমের মধ্যেই করত। আর দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার পড়ত। খালি মেজেতে পড়ত, খাট থেকে পড়ত, মাথাটা বড় থাকায় ওর ভার সামলাতে পারত না। তাই কান্না ওর লেগেই ছিল। ন'কাকা ভোম্বলকে এক-দম পছন্দ করত না। বাড়িতে ওরই বয়সী আরও ছেলেপুলে ছিল, তারা ওরকম দেখতে বেমানান ছিল না। আর বাচ্চা ছেলেদের দেখতে সুন্দর না হলে কেউ কি কখনও আদর করে। ন'কাকীমা একটু এদিক ওদিক হলেই ন'কাকা ভোম্বলকে ধরে ঝাড় দিত। সেবার গরমের দিন, দুপুরবেলা। ভোম্বলকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে সারা বাড়ি, ছাদ, বাড়ির আশেপাশে গলি ঘুপচি—তারপর কাকাদের অফিসে ফোন শুরু হল। থানায় লোক চলে গেল। তখন ছেলেধরার খুব হিড়িক পড়েছিল। কাগজে কদিন ধরে ছেলেধরার ঘটনা খুব ফলাও করে ছাপাচ্ছিল। কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে এলো। ক্রমে সবাই অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করল। জেঠুর ঘরে শলাপরামর্শ—দূর সম্পর্কের কে পুলিস অফিসার আছে, তার কাছে লোক পাঠান হলো। মেজকাকার গাড়িতে দশ গ্যালন পেট্রল ভরা হল, যে এক গ্যালন তেল কিনে একমাস চালায়। কেউ গাড়ি চাইলে বলে, ড্রাইভার নেই অথবা গাড়ি খারাপ। অবশ্য ভোম্বলের উপর মেজকাকার টান ছিল একটু বেশি। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় প্রায়ই ভোম্বলের জন্য এটা ওটা নিয়ে ফিরত। মেজকাকা কেমন করে যেন বাড়িতে কিপ্টে নাম কিনেছিল। সেই মেজকাকা দশ গ্যালন তেল কিনে বিশুকে এখানে সেখানে খুঁজতে পাঠাতে লাগল। এদিকে ন'কাকীমা সুর তুলে কান্না জুড়ে দিল। প্রথমে একটু আস্তে, বাড়িতে ভাশুরেরা আছে, তারপর সন্ধ্যে যখন হয়ে এলো আর কোন খবরই কেউ জোগাড় করতে পারল না, তখন ন'কাকীমার কান্না

সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ল। আমার ভোম্বলের কি হল গো, আমার ভোম্বল আমাকে রেখে কোথায় চলে গেল গো। আমার ভোম্বলকে ওর বাবা কি মার মেরেছে গো, সেজন্যই ভোম্বল চলে গেল। আর তখন সকলে মিলে ন'কাকাকে বকছে। মেজকাকা বলছে, তোর অত্যাচারে চলে গেছে। দাদা কিছু বলত না আর তুমি ওকে ধরে ধোলাই দিতে। কিংবা রাঙাকাকীমা বলছে—আপনি বড় খারাপ ব্যবহার করতেন।

আর জেঠু তো বলছেই—ওই শুয়োরটার জন্যই তো চলে গেছে।

ন'কাকার অত্যাচারে ছেলেধরারা ভোম্বলকে ধরেছে। ন'কাকার কোন কথা নেই। মাথা নীচু, অফিস থেকে এসে বসে আছে। জামাকাপড়ও ছাড়েনি। আর তখন ন'কাকার মুখটা বাংলার পাঁচ-এর মত দেখাচ্ছে। তিন মেয়ের পর এক ছেলেকে ছেলেধরায় নিয়ে গেল।

বিকেল থেকে রান্নাঘর 'লক আউট', কারো পেটে কোন দানা পড়েনি। রান্নার ঠাকুর থানায় গেছে ওর এক কনেস্টবল বন্ধুর কাছে। যদি ভোম্বলের কোন খবর বার করা যায়। বয়স্ক আর একজন কাজের লোক আছে। অনেকদিনের বাড়ির লোকের মতই। নাম তার হরি। কারো কিছু হলে তাকে সবচাইতে বেশী বিচলিত দেখা যায়। কারো জ্বর হলে রাত জেগে সেবা করে। ঘন ঘন ডাক্তারের বাড়ি ছোটে। বাড়ির কেউ ফাংশনে বা বিয়ের বরযাত্রী গেছে, ফিরতে রাত হবে, ও জেগে বসে আছে, দরজা খুলে দেবে। হরি সেই দুপুর থেকে ছটফট করছে, আর এঘর থেকে ওঘর করছে। ওসব পুলিস দিয়ে কিছু হবে না। মার যদি ইচ্ছে হয়, তবে সেই হবে। ওর এক মা আছে। বরানগরে থাকে। কালী ভর হয়। হরি প্রায়ই সেখানে যায়। পুজোর সন্দেশ ফলফলাদি এনে বাড়ির সকলকে দেয়। বাড়ির ছেলেরা চুপে চুপে হরিকে প্রণামীর পয়সা দেয় আর পরীক্ষার রেজাল্ট জানার জন্য বছরের শেষে হিড়িক পড়ে যায়। হরিকে বাড়ির লোক একটু বেশী খাতির করলে জেঠু ভীষণ খচে যেত। জেঠু বলত—হারামজাদা হরিটা সবগুলোর মাথা খেল।

তখন ক'দিন হরি বাড়ি থেকে কখন বেরোল কখন ফেরে তা নিয়ে বড় কড়াকড়ি করত। হরি দুপুরবেলা বেরিয়েছে, ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। জেঠু দু একবার চা চেয়েছে। আর কিছু বোঝা গেল না। রাত্তিরে জেঠুর ঘরে যখন আসর বসল তখন ডাক পড়ল হরির।

—হরি তুই সারা দুপুর কোথায় ছিলি? জেঠু বললেন।

—বাবু পোস্টকার্ড আনতে গিয়েছিলাম; হরি বলল।

—পাশে পোস্ট অফিস। তা আনতে সারা দুপুর। চালাকির জায়গা পাস না।

—বাবু অনেক পোস্টকার্ড, তাই জি পি ও গিয়েছিলাম।

—অনেক পোস্টকার্ড মানে? ক'টা?

—দশটা!

—দশটা!

—বড় পোস্ট অফিস তো। পাইকারি বেচাকেনা, দামটা একটু সস্তা হয়।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মনে আছে সেই রাতটা ছিল হরির রাত। জেঠু হরিকে নিয়ে পড়ল। অনেক রাত অব্দি চলল, আসলে হরি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে বা অনেকক্ষণ কোথায় গিয়েছিল বলে ব্যাপারটা নয়, জেঠু হরিকে খুব ভালবাসে। দু'চার দণ্ড না দেখলেই অস্থির হয়ে পড়ত। হরি হরি করে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিত। তখন বাইরের ঘরে যদি কোন অপরিচিত লোক বসে থাকে তো জেঠুর হরি হরি শুনে ভাববে বাড়িটা হরিভক্ত লোকে ভর্তি। জেঠু আবার নানা সুর তুলে হরিকে ডাকে। আর হরিরও জেঠুর সঙ্গে যে কি সম্পর্ক, সবসময় শুয়োর গাধা বলছে—তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এর মধ্যে কত কাজের লোক এলো গেলো তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু হরি ঠিক আছে। হরিকে মাঝে মাঝে আমাদের মনে হত, ও বাড়ির চাকর নয়, আমাদের গার্জিয়ান।

আমরা দুপুরবেলা আইসক্রীম ডেকেছি চুপে চুপে। হরি কোত্থেকে এসে হাজির। হল্লা করে আইসক্রীমওয়ালাকে তাড়িয়ে দিত, আর আমাদের কপালে জেঠুর বকুনি জুটত। গরমে আইসক্রীম খেয়ে কার গলা ব্যথা হয়েছিল, কে কতদিন জ্বরে ভুগেছে, তার ইতিহাস শুরু হল। এরপর হরি কখনও ছুটিতে দেশে গেছে বা দুপুরে বড়বাজারে ডাল কিনতে গিয়েছে, ওই ফুরসত-এ আমরা আইসক্রীম বা আলুকাবলি ডেকেছি—কিছুতেই ওরা আসবে না। ওরা বলবে, না বাবু তোমাদের বাড়িতে যাবো না। আইসক্রীমের বেলায় গলাব্যথা হতো—আর আলুকাবলির বেলায় জেঠু বলতেন—বৌমা ওদের ভাল করে খেতে দাও। বাড়িতে যাদের খাওয়া জোটে না, তারা ওই পায়খানার হাতে দেওয়া আলু-কাবলি খায়। কলকাতার আলুকাবলি-ওয়ালারা নাকি পায়খানা করে হাতমাটি করে না। আলুকাবলি ঘাঁটাঘাটি করে তার কাজ সেরে নেয়। তখন আমাদের যে কি দুঃখ ছিল, বোঝান যাবে না। আমরা প্রায় ডজন দুয়েক ভাইবোন কত মানত করতাম পাড়ার কালীমার কাছে। হরির মৃত্যুর জন্য প্রায়ই আমরা জোড়া পাঁঠা মানত করতাম। কিন্তু আমাদের পাড়ার কালী তখন একদম ঘুষ খেত না। তাই আমাদের মানত কোন কাজে লাগে নি। আমরা আবার কোন বে-পাড়ার যাবো। কোথাও তেমন চেনাশোনা নেই। এসব ভেবে আর যাওয়া হত না। তাই হরির কোন পাকা বন্দোবস্ত আমরা করতে পারি নি।

সেদিন জেঠুর বাড়িতে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এর আগে কখনও দেখি নি। আমার নিকট কোন আত্মীয়কে ছেলেধরায় নিয়ে গেছে, আমি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করছি। ছেলেধরা যে কি বস্তু আমি সেদিন বুঝতে পারলাম। খাটের ওপর রেবাদি পড়ে আছে একপাশে। বার দুয়েক স্কুল ফাইনাল ফেল করেছে। বয়সের তুলনায় একটু ভারী বলে ওকে আমরা ঢেপসি বলে খেপাতুম। ঢেপসি কথাটা অবশ্য জেঠুর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। রেবাদির ওপর কয়েক প্রস্থ হয়ে গেছে। কাকা কাকীমা অনেকেই অনেক কিছু বলে গেছে। ভোম্বলকে ছেলেধরায় ধরার জন্য রেবাদি দায়ী। আসল কথাটা অন্য, সেটা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। পাড়ার হুলোদার সঙ্গে রেবাদির যে প্রেম তার যোগাযোগ মন্ত্রী হল ভোম্বল। ভোম্বলের রেট খুব কম আর 'রিজনেবল'। রেট বলতে যা বোঝায় দু'একটা লজেন্স বা দু'পয়সার চীনে বাদাম। আর চিঠি দিয়ে আসা বা নিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের মত নয়। আমরা এসেই বাড়িতে বলে দি। সে সব কারণে মাঝে মাঝে রেবাদির বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হতো। বিশুদার সঙ্গে রেবাদির ঝগড়া হলে বিশুদা বলত 'ফেল করবি না তো কি? অত প্রেম থাকলে কেউ পাস করে?' রেবাদি এখন কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢেকে পড়ে আছে, হয়তো ভোম্বলের জন্য কাঁদছে কিংবা হুলোদার কথা ভাবছে। মেয়েদের একটা বিশেষ বয়সে বাবা মা দাদা কাকা ভাই বোনের চাইতে প্রেমিক অনেক বড়। তখন এসব কিছু বুঝতুম না। রেবাদিকে দেখতাম হুলোদার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে কথা বলতে, অবশ্য সঙ্গে যদি কেউ থাকে তাহলে রেবাদি রাস্তা দিয়ে এমনভাবে হেঁটে যেত, যেন কাউকে চেনে না। একদিন
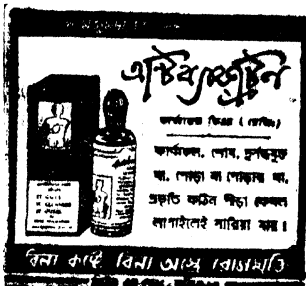
আমরা পার্কে খেলছি, বলটা বাগানের দিকে গেছে, আমি ছুটে আনতে গিয়েছি, দেখি ওখানে হুল্লোদা আর রেবাদি আমাকে দেখে সরে বসল।

খেলার পর হুল্লোদা আমায় ডেকে নিয়ে গেল। প্রথমে আইসক্রীম, তারপর বাদাম, হজমি আর লজেন্স খাওয়াল। বলল, কাউকে বলবি না।

তখন আমাদের কাছে আইসক্রীম খাওয়াটা একটা স্বপ্নের মত ছিল। মাঝে মাঝে যদি আমরা কখনও আইসক্রীম খেতাম, তাহলে যে কি আনন্দ হত বোঝান যাবে না। এত আনন্দ ঐ বয়সে আর কতক্ষণ ধরে রাখা যায়। বাড়িতে ঢুকেই আমার সমবয়সী প্রায় সকলকেই বললাম খুব গোপনে। প্রত্যেককে বলার সময় খুব কালী দিব্যি করিয়ে নিলাম, যেন কাউকে না বলে। আমাদের ছোটবেলায় কোন কথা গোপন রাখার এই রীতি ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কথাটা বিশুদার কানে গেল। আর বিশুদার কাছে যাওয়া মানে জেঠুর ঘরে ডাক পড়ল।

—কি খেয়েছিস? জেঠু বললেন।

আমি বললাম—আইসক্রীম, চীনেবাদাম।

—কে খাইয়েছে?

—হুল্লোদা।

উঃ হুল্লোদা! জেঠু মুখ বিকৃতি করে হুল্লোদা কথাটা উচ্চারণ করলেন। তারপর মুখটা জানলার দিকে ফিরিয়ে বললেন—যা এখন!

এরপর রেবাদির বাইরে বেরুনো একদম কমে গেল। স্কুলে নিয়ে যেত হরিদা। এরকম করে কিছুদিন যাওয়ার পরে রেবাদির বিয়ে হয়ে গেল, টাটায়। বিয়ের সময় হুল্লোদা আর পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রীদের পরিবেশন করে ফূর্তিভরে খাওয়াল।

এরপর প্রায়ই হুল্লোদাকে দেখতাম। ওকে মোটেই গুণ্ডা মনে হত না আমার। ও আমাদের মতই খায়-দায় ঘুরে বেড়ায় একজন মানুষ মাত্র, তাছাড়া আর কিছু নয়। বিশুদা হুল্লোদা এরা সব একবয়সী। কিন্তু একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারে না। দুজনেই পাড়ার রংবাজ। হুল্লোদা আর বিশুদার মধ্যে কিছুটা তফাৎ আমরা বুঝতাম। হুল্লোদা সোজা মানুষ, বিশুদা বাঁকা। যদি বিশুদা মনে করে কাউকে জব্দ করতে হবে, এমন কৌশল করবে যে, পার্টি একেবারে লেজেগোবরে হয়ে যাবে। গুণ্ডামিতে কে কতটা আমরা বুঝতে পারতাম না। কারণ কখনই কাউকে তেমন মারপিট করতে দেখি নি। বিশুদা হুল্লোদাকে দেখলে বলত—পেরেম করছ, নাও শালা এবার হাফসোল লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও। জান না তো মেয়েদের বিয়ের আগে এসব প্রেমটেম হল ফাউ।

পাশের ঘরে ন'কাকীমার কান্নার সঙ্গে প্রায় সব কাকীমা জ্যাঠিমাও যোগ দিয়েছে। সবাই সুর মিলিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করছে। শত হলেও 'একান্নবর্তী' পরিবার, যা হোক সকলে একসঙ্গে করবে। এখানে একজনের বিপদ সকলের সঙ্গেই জড়িত। তাই ন'কাকীমা একা একা কাঁদবে, সেটা বড় অশোভন দেখায়। সকলের চীৎকারকে পেছনে রেখে মেজকাকীমার গলা এগিয়ে আসছে। এ বাড়িতে মেজকাকীমার গলার খ্যাতি আছে। একবার ফোনে বালিগঞ্জে গীতাদির শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলছিল। জেঠু ঘরে থাকতে না পেরে হরিকে ডেকে বলেছিলেন, 'বৌমাকে বল ফোন ছেড়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলতে'। হরিটা হাঁদা রাম। বলল, বৌদি বালিগঞ্জের দিদিমণির শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলছেন। জেঠু বললেন 'বালিগঞ্জ কি ডায়মণ্ডহারবার অব্দি ট্রাংককল-এর পয়সা বেঁচে যাবে।' মেজকাকীমার পাঁচ ছেলে। ছেলেদের উপর মেজকাকার কাকীমার যত অত্যাচার, সকালে চা পেতে দেরী হল, ছেলেদের পেটাবে। ডালে ঝাল হয়েছে রাগ দেখাবে ছেলেদের উপর। মেজকাকার পেট্রল কেনার পয়সা নেই, এর জন্য পাঁচ ছেলে দায়ী। ওদের ঝাড় লাগাও। মেজকাকা আর কাকীমা পালা করে ওদের পিটত। মেজকাকার ভাল কামাই হয়েছে। সেদিন ছেলের মুখ দেখে বেরিয়েছিল। বাড়ি ফিরে ছেলেকে ঝাড়ল। যদিও ওটা ছিল আনন্দের ঝাড়। ছেলেদেরও এমন অবস্থা হয়েছে একদিন পিঠে না পড়লে বলতে বাধা, আজ হবে না? মেজকাকা বরাবর ডানপিটে। ছোটবেলায় পাড়ার বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে মারপিটের ট্রেনিং পেয়েছিল তাই বৃহত্তর সংসার জীবনে কোন অসুবিধা হয় নি। কাকীমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। সেখানে তো আর কলকাতার মত ঘিঞ্জি বাড়ি নয়! একমাইল দূরে দূরে সব বাড়ি। গলা ছেড়ে কাঁদতে না পারলে আশেপাশের বাড়ির লোক শুনতেই পায় না। তাই মেজকাকীমার কান্নার উপর বেশ দখল আছে।

আমরা ঘরের মেঝেতে বসে গল্প করছি। কোন কিছুতেই মন নেই। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সকলের। সারা বাড়িতে ভোম্বলের ব্যাপারে হুলুস্থুল চলছে। ভোম্বল বাড়ির সকলের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। এখন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কারো ভাবনা নেই। এর মধ্যে থানা থেকে ফিরে আসছে, এক্ষুণি একটা ভোম্বলের ছবি নিয়ে যেতে হবে। ন'কাকীমা দু-এক মিনিটের জন্য কান্না থামিয়ে আলমারি খুলে অনেক খুঁজে পেতে একটা ছবি বের করল। বলল 'ছবিটা ফেরত আনতে।' এই একটাই ভোম্বলের ভাল ছবি। খালি গা, ডোরাকাটা প্যাণ্ট পরে তোলা।

বিশুদা ছবিটা আমাদের সকলকে একবার দেখাল। আমরাও ছিলাম একটা কিছু পেলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। বিশেষ করে ছোটবেলায় ছবির উপর বড় লোভ ছিল। বাড়িতে কাকা দাদাদের বন্ধু কেউ ক্যামেরা নিয়ে এলে আমরা ছেলেপুলেরা ঘিরে ধরতাম ছবি তোলার জন্য। যদিও তারা বুলাদি, রেবাদি, নতুন কাকীমাদের ছবি তোলার ব্যাপারেই বেশী ইণ্টারেস্টেড ছিল। মুহূর্তে বাক্স থেকে বেনারসী শাড়ি বেরুত আর স্নো পাউডারের গন্ধে সারাবাড়ি ম-ম করত। বুলাদি রেবাদিকে চেনাই যেত না,

যেন অন্য জগতের মানুষ। নানা পোজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াত। ওদের পাঁচ সাতটা তোলার পর আমাদের কথা মনে পড়ত। তখন বড় দুঃখ হত। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম সামনের জন্মে যেন মেয়ে হয়ে জন্মাই। ওদের ছবি প্রিণ্ট হয়ে আসত। আর আমাদের ছবিগুলো যথারীতি জ্বলে যেত। তখন এর রহস্য বুঝতাম না।

রাত্তিরে জেঠুর ঘরে রাঙাকাকুর ছেলে রতনের ডাক পড়ত।

'সকালে যে ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল ও কি তোমার বন্দুক'। জেঠু বন্ধুকে বন্দুক বলতেন।

রতন মাথা নাড়ল, হুঁ।

—'এই ছেলেটার একটু ইয়ে ইয়ে ভাব আছে। বন্দুকে টন্দুক বাইরের ঘর অব্দি যেন থাকে, ভেতরে একদম ঢুকবে না।' জেঠু বললেন।

যা হোক বিশুদা ভোম্বলের ছবিটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল—স্মল সাইজের কয়েদী মাইরি।

আমরা ঘরের মেঝেয় বসে ছেলেধরা প্রসঙ্গে যে যা জানে বলছিলাম, বড় ব্রীজ তৈরী করার সময় অল্প বয়সের ছেলে বলি দিতে হয়। কালীঘাটে যেমন মা কালীকে পাঁঠা বলি দেয় তেমনি। একবার একটা হোটেলে মাংসের মধ্যে একজনের হাত নখ পাওয়া গেছল। ছেলেধরাদের দেখতে কেমন হয়! রাক্ষসের মত চেহারা! পুরো বাড়ির এক সপ্তাহের রেশন খেয়ে নেবে একবারে। একটা আস্ত পাঁঠা দিয়ে লাঞ্চ করে। যার যা জানা ছিল, বলতে শুরু করল। কেউ কেউ খিদের জ্বালায় ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি শুরু করল। হঠাৎ বিল্লু সাপ সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা উঠে দাঁড়ালুম। সন্ধ্যে হয়েছে, ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। ঘর থেকে অনেকে ছুটে পালিয়েছে। চ্যাঁচামেচি শুনে বড়রা অনেকে এ ঘরে এসেছে। ঘরে আলো জ্বালতে দেখা গেল খাটের নীচ থেকে কতকটা জল মেঝের দিকে গড়িয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাপ এঁকেবেঁকে মেঝের দিকে আসছে। খাটের নীচে কোন জলের জায়গা ছিল না যে জল আসতে পারে। হারমোনিয়ামের বাক্স, তার ওপর বাঁয়া তবলা। ধোপাবাড়ি যাওয়ার ময়লা কাপড়-চোপড়ের পুঁটলি, পিণ্টুর ঘুড়ি লাটাই, দুটো হাতল ভাঙ্গা কাপ। সবাই দেখছে। কেউ এগুতে সাহস পাচ্ছে না। বিশুদা সবসময়ই একটু বেশী 'ডেস্পারেট'। কোত্থেকে ছুটে এসে খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামের বাক্সটা টানল। আর ঘরে একটা রব উঠল কামড়াবে, কামড়াবে। খাটের তলায় ঠাণ্ডা জায়গা পেয়ে ভোম্বল দিব্যি ঘুমোচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কাকীমাদের কান্না কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। তারপরই আবার শুরু হল। ভোম্বলকে তো পাওয়া গেল, তবে আবার কান্না কেন? কান্না অবশ্য আর বেশীক্ষণ কণ্টিনিউ করল না। দু'চার মিনিট পরেই থেমে গেল। এবার বুঝলুম, ভোম্বলকে পাওয়ার পর যে কান্না ওটা আনন্দের কান্না।

এরপর থেকে ভোম্বলের আদর আরও বেড়ে গেল। স্কুলে গেলে সঙ্গে লোক যায়, হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দেয়। পার্কে আগের মত খেলতে যেতে পারে না। বাইরে বেরুনো একদম বন্ধ। এতে ভোম্বলের জীবন আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কোন স্বাধীন ব্যাপার নেই। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে না। একদিনও স্কুল পালাতে পারে না। এ রকমভাবে কেউ বাঁচতে পারে! আগে আমরা ভোম্বলের আদর দেখে একছেলে না হয়ে জন্মানোর জন্য দুঃখ করতাম। এখন সে দুঃখ আমাদের কেটে গেল।

জেঠু বললেন—এখন তো আসিস না।

—বড় ব্যস্ত। একদম সময় পাই না। অফিসে ভীষণ ঝামেলা চলছে। আমি বললাম।

চা এলো। জেঠুর বাড়ির চা, মানে একটা কাঠের টুকরো, চারদিক এক ইঞ্চি উঁচু করে বাঁধান। এই হল ট্রে। তাতে বিভিন্ন সাইজের পঁচিশ ত্রিশটা কাপ। সব কটারই হাতল ভাঙা। চায়ের সময় ট্রে নিয়ে এঘর ওঘর সকলের সামনেই উপস্থিত হয়, যার যা খুশিমত কাপ নামিয়ে নেয়। কেউ দু কাপ তিন কাপ অব্দি নেয়। জেঠু এক কাপ নেন। জেঠুর কাপ আলাদা সাইজের। একটু বড় প্রায় মগের কাছাকাছি হবে।

অফিসের পর এসেছি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সেখানে জেঠুর বাড়ির চা, এ-বাড়ির চায়ের খুব হাঁকডাক চারিদিকে, ন'কাকার বড় মেয়ে বুঁচি। বুঁচিকে দেখতে শুনতে ভালই, খুব যাদের চোখ আছে, তারাই শুধু বুঝতে পারে বুঁচির যেন কি নেই, বুঁচির বিয়ের চেষ্টা চলছে। একটা মফঃস্বল পার্টি অনেকদিন ধরে দেখাদেখি করছে। পছন্দ হয়ে গেছে। তবুও ওদের বাড়িতে এক থিটকেল মামা ছিল, সে দেখলেই ফাইনাল কথা দেবে। মামা এসে দেখল, বেশ দরাজ গলায় কথাবার্তা বলল, অল্প সময়ের মধ্যে জমিয়ে দিল সবাইকে। কিন্তু দেখাদেখির পর কাল হল জেঠুর বাড়ির চা। ওরা চা খেয়ে যে অগস্ত্য যাত্রা করলো আর ফিরল না। আমাদের সঞ্জীবের অফিসের চা-এরও খুব সুনাম আছে। ওর অফিসে যে যায় তাকে চা না খাইয়ে ছাড়ে না। এখন আবার বলে স্পেশ্যাল চা। আমি যখনই যাই, দু' একবার মুখ ছুঁইয়ে রেখে দিই। তাতেই অবস্থা খারাপ। একবার আমাদের এক বন্ধু সরল মনে পুরো এক কাপ চা খেয়েছিল। বাড়ি গিয়ে ওর বউকে ফুটবল ভেবে কিক মেরেছিল। শুনেছি ওর বৌ বেঢপ সাইজের মোটা আর বেঁটে। যা হোক, ঐ চা খাওয়ার পর ফুটবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। হাওড়ার মানতুদের বাড়ির চায়ের সুনাম অনেক দূরদেশ পর্যন্ত গেছে। ক'দিনের জন্য ওর এক মামা আমেরিকা থেকে এসেছিল। ফিরে গিয়ে মানতুর আমেরিকা যাওয়ার সব ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ঐ চা। চা খাওয়ার পর মানতুর মামা আর কোন চিঠি দেয়নি। ওদের বাড়িতে লোকের তুলনায় ঘরসংখ্যা বেশী। সে কারণে দু'তিনটে ঘরে ভূতের আড্ডা ছিল। মানতু ওর বন্ধুদের জন্য চা করে রেখে খাবার দিতে গিয়েছিল, বাইরের ঘরে। ফিরে এসে দেখল কারো চা নেই। বাড়িতে লোকজন আর কেউ ছিল না যে চা খাবে। তারপর থেকে ভূতের উপদ্রব একদম কমে গেল। পাড়ায় রটে গেল চা খেয়ে মানতুদের বাড়ির ভূত পালিয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির চাও জেঠুর বাড়ি থেকে কমতি যায় না। প্রায় সারাদিন ধরে একটা হাঁড়িতে জল ফুটছে। আর দফায় দফায় চা হবে। বাড়িতে কেউ এলে চা দেবে, না এলেও দেবে। মা বাবার ঝগড়া হলে দুজনে চা নিয়ে বসবে, ঝগড়া না হলেও চা নিয়ে বসবে। বাড়ির সকলে গোল হয়ে বসে কারও প্রশংসা করবে, তাতে চা লাগবে আবার কারও নিন্দা করবে তাও চা চাই। মোট কথা, আমাদের বাড়িতে চা নামে পাঁচনটি সব কিছুতেই চাই। বাড়ির চায়ের ভয়ে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় দেশত্যাগী হয়ে যাই। যারা দেশ ত্যাগ করে তাদের বাড়ির চা নিশ্চয়ই তাদের এমনভাবে সাহায্য করে।

আমি ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুললাম না।

—কি হলো তোর, চা নিলি না। জেঠু বললেন।

চা! আমার হাসি পেল।

তবুও বললাম, 'আমি চা খাই না'।

'চা খাস না, সে কি।' জেঠু বললেন।

আমি চা খাই না শুনে জেঠুর মুখে এমন একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন খেলে গেল যেন আমি পৃথিবীর একাদশ আশ্চর্যের কোন কথা বলছি। তারপর জেঠুর হাঁক-ডাক শুরু হল। উদাত্ত কণ্ঠে নাম ধরে ধরে বাড়ির লোকজন জড়ো করতে লাগলেন। যদিও জেঠুর ডাকে আর সেই ধার নেই, কয়েক সেকেণ্ডে ঘরের মধ্যে একটা ছোটখাটো জমায়েত হয়ে গেল। যে আসছে তাকেই জেঠু বলতে লাগলেন, 'দেখ দেখ ও চা খায় না।'

গানের আসর

পুরাতন বাংলা গানের প্রসঙ্গ উঠিয়েছিলুম। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আরও কিছু বলা দরকার। কেবল আকাশবাণীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমাদের শিল্পী-মহলও গত যুগের গান সম্বন্ধে আশ্চর্য-রকম উদাসীন। প্রথম শ্রেণীর যে-সব শিল্পী বাংলা গানে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই সচেতনভাবে তাঁদের অতীতকে জানেন। দু-চারজন প্রবীণ শিল্পী ছাড়া এ আমলের কারুর গানই বোধ হয় এমন তৈরি নয় যে এ-সব গান তাদের প্রকৃত সুরে রসে একটা আর্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারে। আগেকার আমলে যেমন শেখবার একটা ধারা ছিল—একেবারে গলা সাধা থেকে—এখন সেটি আর দেখা যায় না। আগে যাঁরাই গান শিখেছেন তাঁরাই নানান ধরনের পুরোনো বাংলা রাগ-সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করেছেন। অতএব বাংলার সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা তাঁদের ছিল। কিন্তু এ যুগে সেটি নেই। এখন নানান সূত্র থেকে শুনে শুনে ছেলে মেয়েরা গান শেখে যার মধ্যে ঐতিহ্যের কোনও প্রভাব নেই। এর ফলে কেবলমাত্র চলমান বস্তু ছাড়া আর কিছুকেই তারা জানবার অবকাশ পায় না। সুতরাং তারা যেটা জানে সেটাই গায়—তাদের কাছে পুরাতনের কোনও মূল্য নেই এবং ভবিষ্যতেরও কোনও দায়িত্ববোধ নেই। তারা কেন চাইবে বাংলার রাগ-সঙ্গীত গাইতে? চাহিদার শোচনীয় অভাবেই বাংলা গানের একাংশ লুপ্ত হতে চলেছে।

আধুনিক সঙ্গীত মহলে আর একটা ধারণা আছে,—পুরাতন বাংলা গান মানে কেবলমাত্র ভক্তি-গীতি আর শ্যামা-সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছু নয়। এই দুটি পর্যায়ের গান গাওয়া হয় বলেই এই ধারণা গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু বিচিত্র সুরে তালে বাংলা গানে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে লোকে ভৈরবীসিদ্ধ বলেন। বোধ করি সে আমলের প্রচলিত বহু বাংলা ভৈরবী গান থেকে রবীন্দ্রনাথ কম প্রেরণা পাননি। বাংলার সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু রেফারেন্স দিয়ে গেছেন সেটুকুই তিনি শোনেননি, তার আরও অনেক অনেক বেশী শুনেছিলেন, সেটা তাঁর সুবৃহৎ কম্পোজিশন থেকেই বোঝা যায়। বাংলার খাম্বাজ, সিন্ধুকাফী, ঝিঁঝিট, সিন্ধুড়া, আলাইয়া, ইমন, বেহাগ, বসন্ত, বাহার, পুরবী সোহিনী—কত সুরই যে কত মনোহারিত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে তা যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন। একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন যে, সারাজীবন ধরে তিনি বাংলা গানে খাম্বাজের বৈচিত্র্যের শেষ খুঁজে পাননি। ঝিঁঝিট একটা রাগ যার পরিচয় আজ প্রায় অজানা অথচ গত শতাব্দীতে খাম্বাজ আর ঝিঁঝিটের কত-না সুললিত মিশ্রণ ঘটেছে! সিন্ধুড়া এইরকম একটি রাগ যা আজকে কেউ গান না, অথচ বাংলা গানে এর প্রয়োগ প্রচুর দেখা যেত। এইটুকুই শুধু নয়, বাংলা সঙ্গীতের রাগের অনেক বিবর্তনও ঘটেছে। বেহাগে কোমল নি বাংলার বৈশিষ্ট্য,—বাঙালী গায়কেরা একে কোনও কালেও 'বিহগড়া' বলতেন না। প্রসিদ্ধ গীতিকার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সখি শ্যাম না এল'—গানটির স্বরলিপি করতে গিয়ে সঙ্গীতাচার্য দক্ষিণাচরণ সেন বলছেন,—'ইহাতে বেহাগের রীতিবিরুদ্ধ কোমল নি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা এইরূপ সুরেই প্রচলিত।' শুধু এইটিই নয়, খাদের 'পানিসারেগাসা' এই অলঙ্কারটিও বাংলার বেহাগে বহুল প্রচলিত। শ্রীধর কথকের একটি গান আছে—'এখন করি কি উপায়, বাজায়ে মোহন মুরলী শ্যাম ঘটালে কি দায়।' এটি বেহাগে গাওয়া হয়ে আসছে। এর সুরেও বাংলার বহু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আবার সাতুবাবুর নামে প্রচলিত 'হেরিব না কালবরণ' গানটিতে কড়ি মা এবং শুদ্ধ মধ্যমের চমৎকার সংযোগ ঘটেছে। শুধু একটি রাগেরই উল্লেখ করলুম, এই-ভাবে প্রত্যেকটি রাগেরই উদাহরণ সহযোগে বাংলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যায়। বিভাস রাগটি তো বাংলার বাইরে শোনাই যায় না, অথচ এক সময় বাংলায় বিভাস কম রচিত হয়নি।

সংগঠনের দিক থেকে বৈচিত্র্যও তো বাংলা গানে কম ছিল না। "আড় খেমটা" রবীন্দ্রনাথকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। আড়া-ঠেকায় অতি চমৎকার গান বর্তমান। বর্তমানে কাউকেই আড়াঠেকায় গাইতে শুনি না, এ ছাড়া একতাল, ত্রিতালের যে কত রকমফের ছিল তা বলে বোঝাবার নয়। ঝাঁপতালে বহু বিখ্যাত গান নিবদ্ধ হয়েছে এবং বড় বড় সুরকারগণ এই তালে বড় কম গান রচনা করেননি। নাট্যসঙ্গীতের মাধ্যমেও বহু বিচিত্র গান রক্ষিত হয়ে

এসেছিল। এইগুলির খোঁজখবর আজকাল আর রাখা হয় না। দুঃখের বিষয়, যাঁরা রাগ-সঙ্গীতের শিল্পী তাঁরা হিন্দী গান ছাড়া আর কিছুই জানেন না। বাল্যকাল থেকেই তাঁরা হিন্দী গানে পারদর্শিতা অর্জন করতে থাকেন এবং শেষ করেন হিন্দী গানের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা নিয়ে। তাঁরা যখন বাধ্য হয়ে বাংলা গান গাইতে বসেন তখন সেটা হিন্দী গানেরই একটা বাংলা সংস্করণ হয়ে পড়ে—যা আদৌ সুখশ্রাব্য হয় না। যাঁরা ছেলেমেয়েদের গান শেখাচ্ছেন তাঁদের উচিত বাংলা রাগসঙ্গীতের মাধ্যমে যাতে তাদের প্রথম ভিত্তি প্রস্তুত হয় তার চেষ্টা করা। এইভাবে শিখলে তবেই রাগসঙ্গীতে বাংলা স্বকীয় একটা স্টাইল আনতে পারবে নতুবা তাদের স্বার্থকতা লাভের অবকাশ ঘটবে কিনা বলা শক্ত। মোটের ওপর যাঁরা রাগ সঙ্গীতের চর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে বাংলার পূর্বতন রাগ সঙ্গীতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাতে হবে যাতে তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলা গান গাইতে এগিয়ে আসেন। এখন যেমন কেউ কেউ ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে তথাকথিত রাগ-প্রধান রচনা করছেন তেমন করলে বিশেষ কোনও সাফল্য না অর্জন করবারই কথা। কেননা, বাংলা গান এর বহু আগে কিভাবে গড়ে উঠেছে সেটা না জানা থাকলে বাংলার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতকলাকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যাবে না। নিছক বাঁধা ধরা হিন্দী খেয়ালের ধরনে বাংলার রাগ সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি।

এই উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে পুরাতন স্বরলিপি এবং গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি উদ্ধার করা দরকার। ইচ্ছে থাকলে উপায় নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যায়। নিজে গাইতে পারেন না, অথচ পুরোনো বাংলা গান ভাল-বাসেন—এমন দু-একজন বন্ধুকে গত কিশ বছরের মধ্যে চমৎকার সংগ্রহ গড়ে তুলতে দেখেছি। তা ছাড়া কেউ কেউ আছেন যাঁরা তাঁদের নিজস্ব ও পারিবারিক দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের কথা। কী সুন্দরভাবে কত দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড তাঁর সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে একটা অ্যাকাডেমিক আগ্রহ শিল্পীদের মধ্যে জাগ্রত হওয়া উচিত। যে আগ্রহে তাঁরা হিন্দী গান শিখছেন সেই আগ্রহে পুরাতন বাংলা গানও শিখতে হবে। এই আগ্রহকে তাঁরা যদি সফল করতে পারেন তাহলে আমাদের ঐতিহ্য সগৌরবে আমাদের সঙ্গীতজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। একমাত্র তখনই বাংলার রাগসঙ্গীত সর্বত্র সর্বাগ্রে সমাদৃত হবে।

পরলোকে বংশীবাদক গৌর গোস্বামী

প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী এবং সজ্জন সঙ্গীতশিল্পী গৌর গোস্বামী আর ইহজগতে নেই। সহসা মস্তিষ্কের রক্ত-ক্ষরণের ফলে তিনি এগারোই জুলাই রবি-বার লোকান্তরিত হয়েছেন। উৎকৃষ্ট বংশী-বাদক আমাদের দেশে বেশী নেই। তিনি সেই স্বল্প কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন। সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। এই অভাব অপূরণীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। আকাশবাণীতে তাঁকে প্রতি কাজে সর্বত্র প্রয়োজন হত। সমস্ত দিন এবং সন্ধ্যা অতীত হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে দেখেছি। কিন্তু কখনও তাঁকে বিরক্ত বা অপ্রসন্ন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কাজের মধ্যেও একটি পান বা টিফিনের কৌটো খুলে ঘরের তৈরি সন্দেশ তিনি হাতে তুলে দিয়ে খাবার জন্য পীড়া-পীড়ি করেছেন কতবার। ইদানীং তিনি অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর নিজের সাধনা ছিল এবং ছিল ছাত্রদের সাধনার দায়িত্ব। কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনেই দেখা, বেরুচ্ছেন আকাশবাণীর কাজে। চেহারায় কোনও দুর্বলতার আভাস দেখিনি, চিত্তেরও প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ। সহসা তাঁর তিরোধান একান্ত অপ্রত্যাশিত। যে বয়সে শিল্পীরা খ্যাতির সোপানে আরোহণ করতে থাকেন সেই প্রৌঢ় বয়সেই তাঁর জীবনের পরি-সমাপ্তি ঘটল। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শার্ঙ্গদেব

॥ ৯ ॥
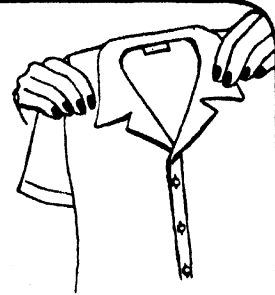
বারবেলার বাধা এড়িয়ে বরদাপ্রসন্ন
ালদার যথাসময়ে আমাকে কাজের দায়িত্ব
ুঝিয়ে দেবেন আন্দাজ করেছিলাম।

কিন্তু দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার আগে
রদাপ্রসন্ন যে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে
াগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তা আমার
ানবার কথা নয়। কিন্তু নতুন এই
রিবেশে গোপন খবরগুলো যে দ্রুত
াচল করে, নিষিদ্ধ এলাকায় প্রথমে
বেশ করেই তার প্রমাণ পেতে আমার
শীক্ষণ লাগলো না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ
শ্রাম নিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ এক
য় মেঝেতে একটা খামের দিকে নজর
লো। আমার নামটাও খামের ওপর
তে কষ্ট হলো না। আমার অজ্ঞাতে
জার ফাঁক দিয়ে কেউ এই গোপন বার্তাটি
স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। সইবিহীন
পকরা এই উড়ো চিঠির সারমর্ম:
কার মশায় সম্পর্কে সাবধান! তিনি এই
ড়রই কোনো এক টেলিফোন থেকে
বার বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে যোগা-
গের চেষ্টা করেছেন এবং ফিস ফিস করে
ার সম্পর্কে কথা বলেছেন।'

কে এই চিঠি লিখলো? আমার নাম,
মার পরিচয়, আমি কোন ঘরে আছি—
ব খবর এত সামান্য সময়ের মধ্যে কী
র অজ্ঞাত পত্রলেখকের কানে পৌঁছলো?
চেয়ে বড় কথা, পত্রলেখক আমার
ভানুধ্যায়ী, না শত্রু? আরও সব প্রশ্ন
দশ্ধ মনের মধ্যে গোঁজিয়ে উঠবার চেষ্টা
লো, কিন্তু আমি এবার শক্ত হবার চেষ্টা
াম। ভালমন্দ যাই হোক, আমি এখন
ান্ত অভিভাবকহীন নাবালক নই।
কোর্ট এবং হোটেলে অনেক ঘনঘটার
ভজ্ঞতায় আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। জীবনের
ন যাত্রাপথে সমস্যা এবং সংকটের
াবিলা করবার জন্যে আমি এখন
ত।

শুরুতে আমার মনের মধ্যে যে সংশয়
না এমন নয়। বিলাসিনী দেবীর বাড়ি
বেরিয়ে গণপতিবাবু যখন চাকরির
বর দিয়েছিলেন তখন প্রথমেই প্রশ্ন
করেছিলাম, "কাজটা কী ধরনের?" গণপতি-
বাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "কাজ ইজ কাজ!
সুশৃঙ্খল বুদ্ধিমান ব্যাটাছেলের কাছে
কোনো কাজই ইমপসিবল নয়।"

বুঝতে পারছি গণপতিবাবু আমাকে
আশ্বাস ও বকুনি দুটোই একসঙ্গে দিচ্ছেন।
তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে জানতে
চেয়েছিলাম, কাজটা কী ধরনের?

গণপতিবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,
"ম্যানেজারীর কাজ। পৃথিবীর সবচেয়ে
সোজা এবং সবচেয়ে শক্ত কাজ!"

ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারী! এই
ধরনের বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত আমি জীবনে
ঢুকিনি। "আমার যে কোনো অভিজ্ঞতা
নেই," আমি গণপতিবাবুর কাছে করুণ
আবেদন জানিয়েছিলাম।

গণপতিবাবু হেসে ফেলেছিলেন।
"তোমার বাবা একবার খুব দামী কথা
শুনিয়েছিলেন। 'অভিজ্ঞতা নিয়ে
পৃথিবীতে কেউ জন্মায় না। জন্মাবার সময়
ভগবান যে একজোড়া চোখ, একজোড়া কান
এবং একখানা মাথা দেন তা খাটিয়ে
অভিজ্ঞতা জমিয়ে নিতে হয়।'" গণপতিবাবু
ঘাড় নাড়লেন: "মহামূল্যবান কথা। হরি
উকিলের সাকরেদ হয়ে অশিক্ষিত আমি
বিষয়সম্পত্তির ডাক্তারি করছি; আর তুমি
তাঁর ছেলে হয়ে একখানা ছোট প্রপার্টির
ম্যানেজারি করতে পারবে না!"

গণপতিবাবু শেষ পর্যন্ত সাহস
দিয়েছিলেন, "মাথার ওপর গড্-গডেসরা
রয়েছেন, হরি উকিলের রক্ত রয়েছে
বডিতে—তোমার আবার চিন্তা কীসের?
পেট থেকে পড়েই তো তুমি ম্যানেজার।"

ভবানীপুরের বাসে তুলে দেবার আগে
গণপতিবাবু দ্বিতীয়বার আশ্বাস দিয়ে-
ছিলেন, "পৃথিবীতে কী এমন কাজ আছে
যা পুরুষমানুষের অসাধ্য? মনের আনন্দে

কাউকে তোয়াক্কা না-করে নিজের কাজটি করে যাবে—ভুল হলে বা না-পারলে ফাঁসি তো হবে না।"

গণপতিবাবুর শেষ কথাটা আমার কাছে এখনও মহা মূল্যবান হয়ে আছে। আজও যখন সংশয়মেঘে মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশানিরাশার দুরন্ত দোলায় দুলতে থাকি, তখন গণপতিবাবুর স্নেহময় মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি শুনতে পাই—"মনের আনন্দে নিজের কাজ করে যাও, ফাঁসি তো হবে না?"

সায়েবপাড়ায় ঠাকুরে ম্যানসনে এই মুহূর্তে অবশ্য ফাঁসির চেয়েও বড় ভয় রয়েছে—চাকরি হারিয়ে নিরাশ্রয় হবার আশঙ্কা এদেশে মানুষকে ফাঁসির আসামীর চেয়েও দুর্বল করে তোলে।

বরদাপ্রসন্ন হালদার অপরাহ্ণে আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে এসেছিলেন। উড়োচিঠিটা আমি তৎক্ষণে সযত্নে সরিয়ে ফেলেছি।

বরদাপ্রসন্ন ঘরের মধ্যে ঢুকেই ক্ষমা চাইলেন। 'ডিসটার্ব করলাম না তো! রবিবারের এই সময়টা সায়েবদের কাছে বড় পবিত্র—যতবড় রাজকাজই থাক, ওঁদের ডিসটার্ব করা চলবে না।'

"তাই বুঝি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

বরদাপ্রসন্ন চোখ বড় বড় করে শোনালেন, "এসব কি আর বই পড়ে জানা যায়! এসব ঠেকে শিখেছি! আমাদের এখানেই এক টেনান্ট—অধর সায়েব। একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট খাঁটি সায়েব—এক ফোঁটাও ভেজাল নেই। কিন্তু একেবারে খাঁটি বাঙালী নাম—এখানে সবাই অধর সায়েব বলে ডাকতো।'

অদ্ভুত জায়গাতো! "সব লোকের নাম নিয়ে টানাটানি। অ্যাডেয়ার হয়ে গেলেন অধরবাবু!"

বরদাপ্রসন্ন বিরক্তভাবে বললেন, "শক্ত-শক্ত সব উচ্চারণ। অর্ডিনারি লোক কী করবে? তাই নিজেদের সুবিধে মতো নামধাম কাটছাঁট করে নেয়।'

"তা, যা-বলছিলাম," বরদাপ্রসন্ন আবার আরম্ভ করলেন। "অধর সায়েব রবিবারের সকালবেলায় এক আর্জেন্ট স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি নতুন এসেছি। কাজকর্মের অত ঘাঁত-ঘোঁত বুঝি না। নানা ঝঞ্জাটে সকাল বেলায় সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। অগত্যা রবিবারের দুপুরে ভাত-টাত খেয়ে একটু ফ্রি হয়ে ভাবলুম, কাজে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই; কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাক, এখনই সায়েবের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"তখন মশায়, সাড়ে তিনটে বাজে!" বরদাপ্রসন্ন আবার আরম্ভ করলেন। "সায়েবের দরজার বেল বাজিয়েই চলেছি। আমি ভেবেছি বেল খারাপ। তারপর মশায়, সায়েবের বাচ্চা অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মতো মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে এল—খালি গা, একখানি জাঙিয়া ছাড়া সর্বাঙ্গে কিছু নেই! কাঁচা ঘুম ভেঙে, বুলডগের মতো মুখের চেহারা হয়েছে।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

বরদাপ্রসন্ন স্বীকার করলেন, "তারপর যা নিগ্রহ হয়েছিল সে কাউকে বলা যায় না। কোনোরকমে পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষে হয়েছিল। সায়েব সারা জন্মের মতো বুঝিয়ে দিয়েছিল, এক পার্সেন্ট সায়েব রক্ত আছে এমন কোনো লোককেও জীবনে কখনও রবিবারে আফটার নুনে ডিসটার্ব করবে না।"

গম্ভীর মুখে বরদাপ্রসন্ন বললেন "খুব শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, মশাই। [illegible] শত বছর ধরে সায়েবসুবোদের রা[illegible] চলছে—কার বাড়িতে কত পার্সেন্ট রাজরক্ত ছুটকে এসেছে ভগবান জানে! আমি তাই এসময় কোনো টেনান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করি না। আর্জেন্ট ডেকে পাঠালেও না।"

"আমার সব কর্মচারী সুযোগ পেলে এসময় মনের সুখে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। অথচ শাস্ত্রে বলছে দিবানিদ্রা নিন্দনীয়।"

বরদাপ্রসন্ন এবার ঠাকুরে ম্যানসনের কর্মচারীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। "অনেক বকাবকি করেছি। কিন্তু প্রায় সবাই এখানে দিবানিদ্রার খপ্পরে পড়ে যায়। দোষ ওদের নয়, দোষ আমাদেরই—দেখে-দেখে শ্লেষ্মাপ্রধান লোকদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে এর থেকে ভাল কী হবে?"

শ্লেষ্মাপ্রধান বলতে বরদাবাবু কী বলছেন তা বুঝতে পারছি না। বরদাবাবু একগাল হেসে জানালেন, "বাপ-পিতামহের আমল থেকে পরিবারে একটু আধটু আয়ুর্বেদ চর্চা আছে। আমার কাছে ব্যাপারটা অ্যাজ-ইজি-অ্যাজ-ওয়াটার—জলের

মত সোজা। লোক দেখলেই বলতে পারি, বায়ু পিত্ত কফ কোনটা প্রবল। রাম-সিংহাসন থেকে আরম্ভ করে আমাদের দারোয়ানগুলো দেখুন—সব শ্লেষ্মাপ্রধান। যাদের শ্লেষ্মা প্রবল তাদের দেখলেই চিনতে পারবেন—একটু মোটা চেহারা, কথায় কথায় ঘুমুতে পছন্দ করে, স্বভাবে একটু কুঁড়ে—গতর নড়তেই চায় না, খাওয়া-দাওয়া যত কমই হোক এদের মেদ বেড়েই চলেছে।"

বরদাবাবু আরও ব্যাখ্যা করলেন: "আর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে—মিষ্টি খাবার পেলে এরা বেজায় খুশী হয়। রামসিংহাসন আধ সের জিলিপি জলখাবার খায়।"

একটু থেমে বরদাবাবু বলে চললেন, "শ্লেষ্মাপ্রধান এই রাজত্বে আমিই একমাত্র বায়ুপ্রধান। বায়ুপ্রধানদের চেনা খুব সহজ! রোগা চেহারা, একটু খিটখিটে—ঘুমুতে চাইলেও ঘুম আসবে না। বেশী শীত সহ্য হয় না। অল্পে উত্তেজনা—এই অনুরক্ত তো এই বিরক্ত! আর একটা লক্ষণ আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমার মধ্যে লক্ষ করেছেন।"

কী লক্ষণ? বরদাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। "বেশী কথা বলবার অভ্যাস!" হা-হা করে হেসে উঠলেন বরদা-প্রসন্নবাবু। "বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদের ওই একটি দোষ।"

বরদাপ্রসন্নবাবু যে তাঁর অভিজ্ঞ চোখে আমাকেও পরীক্ষা করছেন তা বুঝতে পারছি। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যতটুকু আপনাকে বুঝেছি—আপনি গরম সহ্য করতে পারেন না, ঠাণ্ডা খোঁজেন একটু বেশী। অল্পতেই আপনার চোখ লাল হয়। আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন বলুন তো?"

এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। স্বপ্নের জমাখরচ রাখতে আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু বরদা-প্রসন্ন আমাকে সহজে ছাড়বেন না। প্রশ্ন করলেন, "রাগারাগি হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে—এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখেন কী?"

"মনে করতে পারছি না", আমার উত্তর।

বরদাপ্রসন্ন ছাড়লেন না। "ফুলের বাগানের স্বপ্ন দেখেন?"

কয়েকদিন আগে স্বপ্নে নিউমার্কেটের ফুলের দোকানগুলো দেখেছিলাম একবার। "ওই হল। নিউমার্কেটের ফুলের দোকান ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ফুলের বাগান," মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন। তারপর সগর্বে রায় দিলেন, "আমার মনে হচ্ছে আপনি পিত্তপ্রধান। ঝিঙে, পানিফল, লাউ—দই রসুন, পেঁয়াজ, যতটা পারেন আপনি এড়িয়ে চলবেন।"

বরদাবাবুর মতামতে আমি মনে-মনে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বায়ু-পিত্ত-কফ তিনটাই এবার এই ঠাকুরে ম্যানসনে প্রবল হয়ে চলেছে। অজানা আশংকায় আমি শিউরে উঠলাম, যদিও বরদাপ্রসন্নবাবু তার কিছুই বুঝতে পারলেন না।

রবিবারের অবসন্ন অপরাহ্নে আমি নিজের বিছানায় পা-মুড়ে বসে আছি। দিবানিদ্রায় অনভ্যস্ত বরদাপ্রসন্ন বোধ হয় বারবেলা বিদায়ের প্রতীক্ষায় সামনের চেয়ারে শান্তভাবে বসে আছেন। দূরে থেকে একজোড়া কাকের ক্লান্তিকর কর্কশ কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে ভেসে আসছে। সায়েবপাড়ার কাকগুলো এখনও সায়েবী কেতার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে ওঠেনি।

এমনি এক শান্ত অথচ ক্লান্ত পরিবেশে বরদাপ্রসন্ন হালদার ঠাকুরে ম্যানসনের পুরনো ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

"বাড়ির মধ্যে বাড়ি, ঘরের মধ্যে ঘর—বিচিত্র স্থান এই ম্যানসন বাড়ি।" নিজের মনেই বললেন বরদাপ্রসন্ন

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বরদাপ্রসন্ন নিজের চশমাটা কাপড়ের খুঁটে পুঁছে নিয়ে বললেন, "সেই ছোটবেলায় ছড়া শুনেছিলাম—

ঘরের মধ্যে ঘর
নাচে কন্যে-বর।

ছেলে ঠকানো ধাঁধার উত্তরে ঘরের মধ্যে ঘর বলতে এতদিন আমরা মশারিই বুঝে এসেছি। মফস্বলের লোক, তখন কী জানতাম আজব এই কলকাতা শহরে বাড়ির মধ্যে বাড়ি জিনিসটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। বাড়ির মধ্যে বাড়ির পায়রা-খুপরীকে এই শহরে ম্যানসন বাড়ি বলে।"

"আপনি তো এতোদিন হোটেলের কামরা দেখে এসেছেন—এবার ম্যানসন বাড়ির ম্যাজিক দেখুন," মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার।

"কতরকমের ম্যানসন বাড়ি আছে এ পাড়ায়—কারনানি ম্যানসন, কুইন্স ম্যানসন, পার্ক ম্যানসন, মোহিনী ম্যানসন, আর আমাদের এই ঠাকুরে ম্যানসন—যেখানে এসে হাজির হয়েছেন আপনি।"

সংসারের লক্ষ্যহীন স্রোতে ভাসতে-ভাসতে শেষ পর্যন্ত একদিন যে এই ঠাকুরে ম্যানসনে হাজির হবো তা সত্যি কল্পনা করিনি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ভাবছেন নিশ্চয় ঠাকুরে ম্যানসনের এই ঠাকুরটি কে? আমিও মশাই প্রথমে ঠকে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলুম নিশ্চয় কোনো ধর্মস্থান—কালীঘাটের কাছে জাগ্রত কোনো ঠাকুরদেবতার পীঠস্থান হবে। ওমা! তারপর চাকরিতে এসে দেখলুম—ঠাকুরের 'ঠ' নেই এখানে। ম্লেচ্ছ-স্থান বলতে যা বোঝায় তাই—দেড়গজ দূরে গোমাংস বিক্রি হচ্ছে। তারই পাশে শুঁড়িখানা। এমন জায়গায় কে ঠাকুরের নামে ম্যানসন বানালো ভাবছিলাম।"

বরদাপ্রসন্নের কথার ভঙ্গীতে এমন এক চাপা কৌতুক আছে যে হাসি চেপে রাখা দায়।

"হাসবেন না, মশাই। যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না।" আমাকে সাবধান করে দিলেন বরদাপ্রসন্ন। মনে করিয়ে দিলেন, "পিত্তপ্রধান লোকদের ওই একটা প্রধান দোষ, ভীষণ অভিমানপ্রধান হয়—সহজে হাসে, সহজে কাঁদে, সহজে রাগে।"

এরপর হাসার কথাই ওঠে না।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এডিথ ব্রাউন মেমসায়েব—আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। এ-বাড়ির ওল্ডান অফ দি ওলডেস্ট ভাড়াটে। ওঁর দিদিমাও এই ঠাকুরে ম্যানসনে থাকতেন। ওঁর কাছে শুনেছি, এ-বাড়ির

প্রতিষ্ঠাতা সায়েব নাকি এক সায়েব গপ্পো লিখিয়ের খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস পেলে এই সায়েবের নাকি আর কিছুই রুচতো না। মদ, মাংস, মেয়েমানুষ ফেলে এই সায়েব নাকি ওই ঠাকুরে সায়েবের লেখা গপ্পো গোগ্রাসে গিলতেন।"

"লেখাপড়া কিছু করেছেন?" বরদাপ্রসন্ন এবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন।

লেখা-পড়ার অভ্যেস এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারিনি। অবশ্য এর একটা কারণ, পৃথিবীর অন্য যে কোনো আনন্দের জন্যই কিছু খরচের প্রয়োজন। কিন্তু বড় বড় শহরে, পকেটে একটি পয়সা না থাকলেও এখনও বিনামূল্যে বই সংগ্রহ করে পড়াশোনার আনন্দ উপভোগ করা যায়। মনে পড়লো, একবার ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র এ টেল অফ টু সিটিজ এসেছিল। বন্ধুরা অনেকে টিকিট কেটে সেই ছবি দেখতে গেল। প্রয়োজনীয় রেস্তর অভাবে আমার যাওয়া হলো না। কিন্তু সেদিনই হাঁটতে-হাঁটতে ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে ডিকেন্সের সেই উপন্যাসটা আমি সংগ্রহ করি, সমস্ত রাত জেগে বই শেষ করে পরের দিন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের আলোচনায় যোগ দিই। বন্ধুরা বিশ্বাসই করে না যে আমি সিনেমা দেখিনি—বিনামূল্যে আমার মানসলোকে যে চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই সিনেমা দেখার আনন্দ মিটিয়েছিলাম।

বরদাপ্রসন্ন মন্তব্য করলেন, "লেখা-পড়া করে থাকলে আপনি নিশ্চয় ওঁর নাম শুনেছেন। কয়েক পা-দূরে ওই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটেই ওঁর নাকি জন্ম হয়েছিল।"

উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে, নামটা মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে জ্বলে উঠলো। ইংরিজী সাহিত্যকে নগর কলকাতার সবচেয়ে মূল্যবান উপহারের নাম থ্যাকারে।

বরদাপ্রসন্ন জানালেন, "ওই থ্যাকারে সায়েবের নামেই এই ম্যানসনের নাম। থ্যাকারে কী করে পাকে-চক্রে ঠাকুরে হলেন তা যীশুখ্রীষ্টই জানেন!"

থ্যাকারে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন। এক সময় খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে তিনি সমকালীন লেখক ডিকেন্স থেকে এক কাঠি এগিয়েছিলেন এ কথাও আমার অজানা নয়। কয়েক যুগের বিস্মরণের পর তিনি আবার সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, এ খবরও আমার কানে এসেছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "লেখালেখির খবর আমি অত সব রাখি না। তবে ব্রাউন মেম সায়েবের কাছে শুনেছি 'ভ্যানিটি ব্যাগ' না কী নামে মস্ত এক বই আছে ভদ্রলোকের। মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহারের রেওয়াজ নিশ্চয় ওর থেকেই চালু হয়েছে," মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন।

"ভ্যানিটি ব্যাগ না, ভ্যানিটি ফেয়ার।"

"ওই হলো।" আমার কথা শুনে বরদা-প্রসন্ন পাল্টা মন্তব্য করলেন, 'যাঁহা চুয়ান্ন তাঁহা পঞ্চান্ন। কী বলেন?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "খুব বেশী দিনের কাসুন্দি নয়। এই শ'খানেক বছরের। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ওপর বাড়িখানা আপনাকে দেখিয়ে দেবোখন। আর্মেনিয়ানদের কী একটা ইস্কুল না কলেজ রয়েছে ওখানে। থ্যাকারে সায়েবের পৈতৃক ভিটেটা এখনও কলকাতায় টিকে রয়েছে। একখানা হলদে রঙের দোতলা বাড়ি।"

আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বরদা-প্রসন্নর কথা শুনছি। বরদাপ্রসন্ন আমার অবগতির জন্যে জানালেন, "হলদে রঙের ইস্কুল বাড়িটার গেটের বাইরে একখানা কালো গ্রানাইট পাথরের ওপর খোদাই করা আছে—হিয়ার ওয়াজ বর্ন উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে।

সাল তারিখও হুড় হুড় করে শুনিয়ে দিলেন বরদাপ্রসন্ন: ১৮ জুলাই, ১৮১১।

সাল তারিখ যখন মনে রেখেছেন তখন থ্যাকারে সম্বন্ধে বরদাবাবুও নিশ্চয় আগ্রহী।

আমার কথা শুনে তিড়িং-বিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন বরদাপ্রসন্ন। "ভ্যানিটি ব্যাগ-ফ্যাগে আমার মশায় এক চামচ আগ্রহ নেই। কিন্তু পাথরখানা দেখে-দেখে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আমাদের মদনা আছে না?"

মদন আবার কে? এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।

বরদাপ্রসন্ন মুখ বিকৃত করলেন। "আমাদের মদনা মশাই! এখানে থাকলে তার সঙ্গে আলাপ হবেই। ওই মদনা, প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক পাথরখানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

একটু নিশ্বাস নিলেন বরদাপ্রসন্ন। তারপর বললেন, "মদনাকে কতবার আমি বকেছি। আমার পায়ের ধুলো খেয়ে দিব্যি করেছে সে আর ওখানে দাঁড়াবে না। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়।"

মদন ওরফে মদনা সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়ছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "পরশুদিনও দেখলাম একখানা ফুলহাতা বুশশার্ট ও ছুঁচলো প্যান্ট পরে মদনা ওই পাথরখানার সামনে শিকার ধরবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। রাস্তার ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো ওই কালো পাথরখানার ওপর এসে পড়েছে। উইলিয়ম বলুন, থ্যাকারে বলুন সায়েবী নামের একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু ওই মধ্যনাম—মেকপীস—কথাটা যেন কীরকম কীরকম কানে বেসুরো বাজে।"

আমার মনে পড়লো নেপোলিয়নী বিক্রমে যখন প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকার বিপর্যস্ত তেমনই কোনো এক সময়ে উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারের জন্ম। আমাদের বিপন কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক সুধাংশু সেনগুপ্ত থ্যাকারের ভক্ত ছিলেন। সম্রাট তৃতীয় জর্জের জীবনবৃত্তান্ত পড়াতে-পড়াতে তিনি থ্যাকারের জীবনের নানা ঘটনা বলতেন। বিশেষ করে 'মেকপীস'—অর্থাৎ নেপোলিয়নের সঙ্গে মিটমাট করে শান্তি ফিরিয়ে আনো—এরকম কী একটা যেন বলেছিলেন। ১৮১১ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে দুটি স্মরণীয় ঘটনা: সম্রাট নেপোলিয়নের পুত্রসন্তান লাভ ও উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারের জন্ম।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "অতশত বুঝি না। মদনাকে আমি সেদিনও বকুনি লাগিয়ে বললাম, হারামজাদা, তোর সাহস কম নয়। তুই বিদ্যাস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে পাপকর্ম করছিস। তুই কোনদিন পুলিসের খপ্পরে পড়বি। আর মরবার পরে তোর নরকেও স্থান হবে না। ওই ঠাকুরে সায়েব একদিন ভূত হয়ে তোর ঘাড় মড়মড় করে ভাঙবে—তোর রক্ত চুষে চুষে খাবে। তবে তোর যদি শিক্ষা হয়।"

বরদাপ্রসন্ন বিরক্তভাবে মন্তব্য করলেন, "কিন্তু দুঃখের কথা কী বলবো আপনাকে, হতভাগা ওই মদনা আমাকে একটুও পাত্তা দিল না। উল্টে মুলোর মতো দাঁতগুলো বার করে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো হাসতে লাগলো।"

অপরিচিত এই মদন সম্পর্কে আমিও বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠছি। থ্যাকারে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে এখন জানতে চাই—কে এই মদনা? থ্যাকারের জন্মফলকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি সন্ধ্যায় সে কী কাজ করে?

[ক্রমশঃ

বন্ধু রাজেশ্বরী দত্ত

প্রতিভা বসু

রাজেশ্বরী আমার বন্ধু ছিলো। ছিলো শব্দটা ব্যবহার করতে হৃদয় বেদনা অনুভব করছি কিন্তু এই-ই সত্য। এই বয়সে নানা পথে হাঁটতে হাঁটতে নানান ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হতে হতে ক্রমশই বন্ধুর সংখ্যা বিরল হয়ে আসে। বলা যায় সমস্ত দিক থেকে এই মানুষটির সঙ্গে এখনো আমার যে বন্ধুতা অটুট ছিলো তা আর কারো সঙ্গেই প্রায় নেই। রাজেশ্বরী ছিলো আমার ঘনিষ্ঠতম। সুতরাং তাঁর মৃত্যু আমাকে শেলবিদ্ধ করেছে।

আমি মাস দুই যাবত উত্তরভারতের নানা প্রদেশে ভ্রাম্যমান। এখন যেখানে আছি সেখানে ওর মৃত্যুর খবর পৌঁছতে তাই এতো দেরি হয়েছে। অবশ্য কদিন বেশী আগে পেলেই বা আর কী হতো। কদিন বেশী কষ্ট পাওয়া ছাড়া অন্য লাভের তিল-তম আশাও ছিলো না। তবু মনে হচ্ছে যদি আরো একবার দেখা হতো! যদি শেষ মুহূর্তে কাছে আসতাম।

বেরিয়েছিলাম আমরা প্রায় একসঙ্গেই। সে গেল দক্ষিণ ভারতে লোকসঙ্গীত সংগ্রহে, আমি উত্তর ভারতে গঙ্গার উৎস সন্ধানে এবং কিছুটা একাকীত্বের উপশমের আশায়। এই শেষোক্ত সন্ধান তারও ছিলো। কেননা তার ভয়ঙ্কর একাকীত্বের কথা আমি ছাড়া আর কে বেশী ভালো করে জানে? কলকাতা ছাড়ার দুদিন আগে এসে সারাদিন রইলো, সারা সন্ধ্যা স্মৃতি রোমন্থন করে জড়িয়ে ধরে বললো আবার য়েক মাস বাদে, কেমোন? আমি হাসতে হাসতে বললাম, ভাবছি কি জানো? আমাকে যেন আমার সঙ্গীরা মন্দাকিনীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পারে। এই কথায় তার চোখে জল এলো সে-ও হাসতে হাসতে বললো, খুব বাজে বাজে কোথা বোলছ কিন্তু।

পাঞ্জাবী মেয়ে, ভারি মিষ্টি বাংলা বলতো। নিজে যে বাঙালী বউ একথা শুনতে তার বড়ো সুখ ছিলো। মুখখানা হাসিতে ভরে যেতো। বাংলা সাহিত্য তার প্রাণ। তার স্বামীর প্রতিভা সে অবুঝ অন্তরে গ্রহণ করেনি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ওকে বাংলা বলতে উৎসাহ দিতেন না, বলতেন ঐ উচ্চারণ নিয়ে আর বাংলা বলে কাজ নেই। আমি অনেক দিন পর্যন্ত জানতাম না যে ও বাংলা বলতে পারে।

এই ভাষার জন্য আমাদের বন্ধুতো অনেক দিন পর্যন্ত পঙ্গু হয়ে ছিলো। ইংরিজি ভাষায় দক্ষতার সঙ্গে কথা বলা আমার অভ্যাস ছিলো না, আমি এ জন্য সব সময়ে আপসোস করতাম। কেননা রাজেশ্বরীকে আমার যতোটা ভালো লাগতো ভাষার ব্যবধানের জন্য ততোটা কাছে আসতে পারতাম না। দেখতে রাজেশ্বরী ভারি সুন্দর আর স্বভাব ততোধিক। গলার আওয়াজ, কথা বলার ধরন, মৃদুতা সব মিলিয়ে এতো স্নিগ্ধ মেয়ে খুব কম দেখা যায়। সেই সময়ে আমাদের দুজনেরই বয়েস অনেকটা কম ছিলো। রাজেশ্বরী আমার চেয়ে দু চার বছরের ছোটো, কিন্তু তখন আমি আরো ছোটোর মমতায় তাকে দেখতাম। রাজেশ্বরীর চেয়ে সংসার চালনার দায়িত্ব, আর্থিক পরমার্থিক দুই অর্থেই আমার উপর অনেক বেশী ছিলো। রাজেশ্বরী ধনী গৃহিণী নিঃসন্তান, উপরন্তু তার স্বামী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাকে সংসারের সব ঝড়ঝাপট থেকেই দুহাতে আড়াল ক'রে রাখতেন। এর কোনোটার সঙ্গেই আমার জীবনের মিল ছিলো না। রাজেশ্বরীর স্বভাবে একটা অদ্ভুত ছেলেমানুষী সারল্যও এতো অধিক মাত্রায় প্রবল ছিলো যে মনেই হ'তো না তাকে সাহায্য না করলে সে এক পাও এই ভবমণ্ডলে চলতে পারে।

যে বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো, এবং 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শিক্ষক হ'য়ে এলেন সেই বছর আমার স্বামী বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুতা অনেকটা বেশী গভীর হবার অবকাশ পেলো। শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতা সৌজন্য কৌলীন্য সব বিষয়েই সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রেণীর মানুষ বলে ধরা যায়। সেই সঙ্গে তাঁর চেহারাও তাঁকে আরো উচ্চে উত্তীর্ণ করেছিলো। সুধীন্দ্র-নাথের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি যদিও দেশে-বিদেশে সর্বত্রই বিরল তথাপি তাঁর ডিগ্রির জোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত না থাকায় এই শিক্ষকতা করা বিষয়ে

অলজ্ঞাতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রথী মহারথীরা অনেকেই খুব বিপক্ষে ছিলেন। বিভাগীয় প্রধানকে কিছুটা যুদ্ধ করতে হ'য়েছিলো। এবং তাতে তিনি জয়ীও হ'য়েছিলেন। এ বিষয়ে সেই সময়কার উপাচার্য ত্রিগুণা সেনকেও সাধুবাদ দিতে হয়। তাঁর গুণগ্রাহিতা এবং আধুনিকতা সেই প্রধানের সহায় না হ'লে শেষ পর্যন্ত এই জয় সম্ভব হ'তো কিনা কে জানে।

এটা অন্য প্রসঙ্গ। অন্য প্রসঙ্গ হলেও অবান্তর নয়। অবান্তর নয় এই কারণে স্বামী এই কর্মে যোগদানের পরে রাজেশ্বরী এতো খুশি হলো যে সেটা তার চোখে মুখে বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। সাহিত্য এবং সাহিত্য পাঠ ছেড়ে তার স্বামী যতোই ইঙ্গ বঙ্গ সমাজে মেলামেশা করুন না কেন, বিদ্বান বিদেশী বন্ধুবান্ধবের সমাগমে তাঁদের রাসেল স্ট্রীটের ড্রইংরুম অথবা বারান্দা যতোই আলোকিত হোক না কেন রাজেশ্বরী অনুভব করেছিলো একজন বাঙালী লেখকের পক্ষে সেই পরিবেশ সর্বতোভাবে সহায় নয় এবং সমকক্ষ, সমকর্মী, সমধর্মী, স্বভাষী মানুষের সঙ্গ না পেলে তাঁর স্বামীর প্রতিভা অচিরেই নিষ্প্রভ হবে। সুধীন দত্ত নিজেও খুব সুখী হলেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একেবারে মিশিয়ে দিলেন নিজেকে। পড়াতে যে তাঁর কতো ভালো লাগতো, ছাত্রছাত্রীদের জন্যে যে কতো ভালোবাসা ছিলো সে কথা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা মনেপ্রাণে জানে। আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দুশো দুই নম্বর বাড়িতেও বহুবার তাঁর নিজের মুখেই এই ঘোষণা শুনেছি।

সুধীন দত্তর মৃত্যুর দিনটাও এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আমার। জানি না সত্যি আত্মা বলে কিছু আছে কিনা, থাকলে রাজেশ্বরী স্বস্থানে গিয়ে জুড়োবে।

সুধীনবাবু মারা যান উনিশ শো ষাট সালে। সেই সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বি এ পরীক্ষা চলছিলো। তাই নিয়ে তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন। তারই মধ্যে কোনো একদিন শেষ রাত্রে আমাদের বাড়িতে সজোরে ফোন বেজে উঠলো। আমার ঘুম তখুনি ভেঙে গিয়েছিলো, আমার আগে আমার ছোট মেয়ে দময়ন্তী (সে সুধীন দত্তর ছাত্রী, তারও বি এ পরীক্ষা চলছিলো তখন) লাফিয়ে উঠে বসলো। ভয়ে ভয়ে বললো, 'এই অসময়ে ফোন কেন মা?'

আমিও আতঙ্কিত গলায় বললাম 'কী জানি।'

সে গিয়ে ফোন ধরলো। ধরেই কেঁদে উঠলো। ওপার থেকে কেউ একজন বললো, 'এইমাত্র সুধীন দত্ত মারা গেছেন, বুদ্ধদেববাবুকে এখুনি চলে আসতে বলুন।'

বুদ্ধদেববাবুর ঘুম খুব পাকা। তা সহজে ভাঙে না। সেই ফোনের আওয়াজ তাঁর কানে যায়নি, আমাদের কান্নাকাটি কথোপকথনও শুনতে পাননি। সেই শান্তির ঘুম ভাঙিয়ে এই প্রচণ্ড শোকাবহ খবরটা দিতে আমার মন চাইছিল না। কিন্তু মেয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, 'বাবা, সুধীন দত্ত মারা গেছেন।'

'খুখী!' যেন ভয়ঙ্কর মার খেয়ে উঠে বসলেন।

'কী বললি!'

আর কী বলা! যা হয়ে গেছে তা তো হয়েইছে। কিন্তু সেই সময়ে যাওয়া যায় কী করে? তখনো কোনো যানবাহন চলতে শুরু করেনি, আলো ফোটেনি। আমাদের পুরোনো ভৃত্য গণেশকে তৎক্ষণাৎ কর্নফিল্ড রোডে আমার বড়ো কন্যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। আমার জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত সুধীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়পাত্র ছিলো। যখন আমার কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়, বিয়ে বাড়িতে সুধীন দত্ত আর রাজেশ্বরীর ব্যবহার অতিথি অভ্যাগতের মতো ছিলো না, পিতামাতার মতো ছিলো। সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে কতোবার এসেছেন তার ঠিক নেই। বিয়ে হয়েছিলো আনোয়ার শা রোডে দু নম্বর স্টুডিয়োতে। একটি সেডের তলায় একটি চা কোকোকোলা ইত্যাদি পানীয়ের রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছিলো। যে যখন আসবে, খাবে, বিশ্রাম করবে, গল্প করবে, আড্ডা দেবে। তারপর রাত্তিরে ভোজ। সেই রেস্তোরাঁটি ঘন ঘন এসে সুধীন দত্তই সরগরম ক'রে রাখলেন।

বিয়ে হ'য়েছিলো বৈদিক মতে। রেজিস্ট্রির পরে সেই অনুষ্ঠানটুকু মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠলো রাজেশ্বরী দত্তর গানে। কী গলা! কী গলা! কী প্রাণঢালা গান!

গানের জগতে আমার বিচরণ খুব সঙ্কীর্ণ নয়। সারা ভারতের প্রায় সমস্ত গুণীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গেই সেই সময়ে আমার পরিচয় ঘন ছিলো। আমি রাজেশ্বরীর গান শুনে সম্মোহিত হ'য়ে গেলাম। মনে হ'লো না একমাত্র হীরা-বাঈয়ের গান ছাড়া এমন সুললিত কণ্ঠস্বর আর কারো শুনেছি।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই, রাজেশ্বরীর সঙ্গে এতোটা ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কাছাকাছি বসে তাঁর গলার গান আমি সেই প্রথম শুনলাম। আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ির বসবার ঘরের আড্ডা অথবা সুধীন দত্তর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দার আড্ডা কোনোদিনই সঙ্গীতের দরজায় প্রবেশ করেনি। সাহিত্যের রাজপথেই ছিলো বুদ্ধদেব এবং সুধীন দত্তর বিচরণ ক্ষেত্র। কখনো সখনো আমি আর রাজেশ্বরী গান নিয়ে আলোচনা করেছি বটে তবে সেটা খুব সরব নয়। বুদ্ধদেব এবং সুধীন দত্ত দুজনেই সাহিত্য এবং ছবি বিষয়ে যতোটা উৎসাহী এবং বোদ্ধা ছিলেন, সঙ্গীত বিষয়ে ততোটা নয়। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের কানে মধু-বর্ষণ করতো সেটা সত্য কিন্তু তার কারণটা অন্তত বুদ্ধদেবের কাছে ছিলো কবিতার মোহ। কথাগুলোর জন্যই শ্রবণ একান্ত উৎসুক হয়ে থাকতো। সুর গৌণ। আরো একটা কথা, সুধীনবাবু কলেজে তাঁর সহকর্মী থাকার দরুন, যেদিনই আসতেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়েই অনেক কথা থাকতো। 'তুলনামূলক সাহিত্য' নতুন বিষয়, যে কোনো নতুন কিছু করতে গেলেই কিছু লোক তাদের ঠাট্টা টিটকিরি বিরোধিতা হিংসা ইত্যাদি বৃত্তি দিয়ে সেটাকে উচ্ছেদ করতে এমন বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে যে দেবতা আর অসুরের ঝগড়ার মতোই সেই বিষোদ্গার প্রায় ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। এই ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া তখন এঁদের প্রায় প্রাত্যহিক ছিলো। সুতরাং সমস্যারও অন্ত ছিলো না। সেই সবের সঙ্গে টিঁকে থাকার পরামর্শ করতে করতে আর অন্য বিষয়ে মন দেয়া হতো না।

এই সব সমস্যার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ও সম্পৃক্ত ছিলো। তার কাঁচা মাথার বুদ্ধি এই দুই পাকা মাথাকে অনেক সময় হক-চকিয়ে দিত। সুতরাং সে এঁদের বন্ধু। সুধীনবাবুর বিশেষ পক্ষপাত ছিলো জ্যোতির উপরে, বিশেষ দুর্বলতা ছিলো।

এই ভীষণ সংবাদ পেয়ে সেই মুহূর্তেই ওরা ছুটে এলো। তারপর একটু আলো ফুটলো, একটা ট্যাকসি পাওয়া গেল, আমরা সারা পরিবার শোকার্ত হৃদয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে।

খাটে শুয়ে আছেন সুধীন দত্ত, আগের রাত্তিরে নিমন্ত্রণ খেয়েছেন, বাড়ি ফিরেছেন রাত বারোটায়, বোধহয় একটি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছিলেন, বইটি মেঝেতে পড়ে আছে, মাথার কাছের টেবিলে জলের গ্লাশ ছিলো, বোধহয় জল খেয়েছেন কখনো, ঢাকনাটি কাৎ হয়ে আছে, রাজেশ্বরী পাশের খাটে প্রায় অচেতন। কাছে যেতেই ফুঁপিয়ে বলে উঠলো, 'মানু, আমার কী হ'লো? আমি কেমন ক'রে থাকবো।'

পুরোপুরি বাংলা ভাষায় এমন স্পষ্ট এই কথা কটা সে বলে উঠলো যে আমি

এতোদিনের সাহচর্যেও তার যতোটা কাছের মানুষ না হ'তে পেরেছিলুম, সেই মুহূর্তে তা হ'য়ে গেলুম।

বলাই বাহুল্য, এই শোকে কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, আমিও পারিনি। শুধু একাত্ম হ'য়ে শোকের ভাগ নিতে চাইলাম। কিন্তু তাই কি কেউ পারে? তবু সেদিন থেকেই আমি আর রাজেশ্বরী একই সঙ্গে অনুভব করেছিলুম, আমরা অভিন্ন, আমাদের বন্ধুতা নির্মল, অম্লান। সেই থেকেই আমি আর রাজেশ্বরী আর কখনো ইংরিজিতে বাক্য বিনিময় করিনি। এবং জেনেছিলুম, বাংলা ভাষায় তার দখল যথেষ্ট জোরালো। সুধীন দত্ত প্রায়ই ঠাট্টা করতেন, 'রাজেশ্বরী কিন্তু আপনার খুব অ্যাডমায়ারার।' কী কারণে আমি জানতাম না। ভাবতাম এমনিই। তখন জানলাম সে আমার উপন্যাসের একজন মস্ত পাঠিকা। সে যে এতোটা পড়তে পারে বুঝতে পারে তাও আমার ধারণা ছিলো না।

রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে সে একা থাকে, আমি আর বুদ্ধদেব প্রায়ই যাই, সেই বারান্দায় বসি, সুধীনবাবুর চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নানা কথা হয়, নানা গল্প হয়, তারপর ঐ অত বড়ো বাড়িটায় আবার তাঁকে একা রেখে চলে আসি। অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের বিদেশ যেতে হলো। সেটা একষট্টি সাল। গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই খবর পেলাম রাজেশ্বরীও গানেরই কোনো ব্যাপারে আসছে এদেশে।

দেখা হ'লো প্যারিসে। তেমনিই মন খারাপ, তেমনিই বিষন্ন, তেমনিই একা।

রাজেশ্বরী বিখ্যাত গায়িকা এটাই সকলে জানে। রাজেশ্বরী যে কতো বিদুষী সেটা অনেকের জানা নেই। এমনিতেই মেয়েদের সৌরভ ছড়ায় না, পুরুষ শাসিত সমাজের আড়ালে সর্বদাই তারা চাপা পড়ে আছে। তদুপরি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে মানুষ সব ঠেলেঠুলে নিজের জায়গা ক'রে না নিতে পারে তাকে চিনতে বেশ কয়েক পুরুষ কেটে যায়। বুকে চাপড় মেরে যে যতো ঢাক পিটোতে পারে, অনিবার্য জয়মাল্য তার গলাতেই ঝুলতে থাকে। তার মধ্যে রাজেশ্বরী একে মেয়ে তায় লাজুক, তার তো কথাই নেই। একমাত্র গানের ব্যাপার ছাড়া আমাদের সমাজে মেয়ে পুরুষের তফাৎ সাংঘাতিক। গান বড়োই সরব, শ্রবণকে সে বাধ্য করে শুনতে, সে কারণেই মেয়ে হোক পুরুষ হোক কাউকেই নস্যাৎ করা যায় না। আমি নিজে অল্প বয়সে গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলুম, সেখানে কখনো স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ অনুভব করিনি, পরবর্তী জীবনে যখন অন্য পেশায় নিযুক্ত হলুম, দুঃখ পাবার কারণ অনেক ঘটেছে, অনেক কারণে অসম্মানিত বোধ করবার অবকাশ ঘটেছে। অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘর করতে করতে এতোদূর পথ হাঁটতে হয়েছে।

রাজেশ্বরীর মাতৃভাষা পাঞ্জাবী, উর্দু বলতো উর্দুভাষীর মতোই, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাস করে শান্তিনিকেতন এলো। বেশ অধিক বয়েস পর্যন্তই নিজের দেশের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। শান্তিনিকেতনে আসবার পরে তার গান শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, অনেক গান নিজে শিখিয়েছিলেন, অনেকের কাছে তার যোগ্যতার উল্লেখ করেছেন। সেখানেই রাজেশ্বরীর বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি। কিন্তু দেখতে দেখতে সে সে-ভাষার অন্তরে প্রবেশ করে ফেললো, এবং কিছুকাল পরে একজন বিখ্যাত বাঙালী কবিকেই নির্বাচন করলো স্বামীরূপে। বোধ হয় উনিশশো তেতাল্লিশ সালে তার বিয়ে হয়েছিল। বাসুদেব পদবী দত্ত পদবীতে পরিণত হলো। ইংরিজি

ভাষাও তার কাছে মাতৃভাষার মতোই সহজ ছিল। এবং ফরাসী ভাষাও এতোটাই ভালো জানতো যে মূল ভাষা থেকে ফরাসী সাহিত্য পাঠে অথবা অনুবাদ কার্যে সুধীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক রকম সাহায্য গ্রহণ করেছেন স্ত্রীর কাছে। এতগুলো ভাষায় একজন পুরুষের এত দখল থাকলে তার নাম অনেকেরই কর্ণগোচর হতো, কিন্তু রাজেশ্বরী গান গায়, এ ছাড়া এসব যোগ্যতার পরিচয় তার প্রায় ছিলোই না বলা যায়।

সে সময়ে প্যারিসে মাদমোয়াজেল বসিনেকের কাছেই বোধ হয় সে অতিথি ছিলো। আমার ঠিক মনে নেই। এই ফরাসী মহিলাটি রবীন্দ্রভক্ত ও এককালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছি রাজেশ্বরীর ফরাসী উচ্চারণ অনেক ফরাসীকেও হার মানায়, এতো সুন্দর, এতো সাবলীল।

আমরা প্যারিসে গিয়ে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজেশ্বরী চলে এলো আমাদের হোটেলে। রাত্রিবেলা দশটার পরে আমরা একটি মূল্যবান ক্লাবে টিকিট কেটে ঢুকলাম। ঝাপসা ঝাপসা আলোর তলায় ছোট ছোট টেবিল, খাদ্য পানীয় উৎকৃষ্ট, কিন্তু দাম তার চেয়েও উৎকৃষ্ট। অদূরে উজ্জ্বল আলোকিত ফ্লোরে অনেক তামাশা হচ্ছে; রাজেশ্বরী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আমি বললাম, 'তোমার কদ্দিনের প্রোগ্রাম? কবে ফিরবে?'

সে বললো, 'ফিরবো?'

'ফিরবে না? এখানেই থাকবে নাকি?'

'কী হবে ফিরে? কোথায় ফিরবো? কার জন্য ফিরবো? আমাকে কলকাতায় কেউ পছন্দ করে না।'

বুদ্ধদেব হেসে উঠে বললেন, 'পাগল নাকি? কলকাতায় কতো আপনার নাম, কতো আপনার ভক্ত।'

'না না, আমার অনেক দুর্নাম।' বলতে বলতে রুমালে চোখ মুছলো, আমার দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু গলায় বললো, 'জানো, আমার একবার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম যক্ষ্মা। ডক্টর বললো, বাচ্চা আছে ভিতরে। তখন আমি ভাবলুম এইবার আমি মরে যাবো। তখন আমি তাকে চাইলুম না। কিন্তু সে থাকলে এতোদিনে বেশ বড়ো হতো। এখন আমার কেউ রইলো না।'

সত্যিই তার কেউ ছিলই না একরকম বলা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পরে মেয়েরা মা-বাবার কাছে জুড়োয়, সন্তানাদি নিয়ে সঙ্গীহারা জীবন সহনীয় হয়ে ওঠে। রাজেশ্বরী সেই দু-দিক থেকেই কাঙাল ছিল। তখন আর তার বয়েস কতো!

প্যারিসে যে কদিন ছিলাম, প্রায় একসঙ্গেই সময় কেটেছে।

তারপর আবার দূরে ফিরে দেখা হলো রোমে। সুধীনবাবুর বন্ধু আই সি এস সুশীল দে তখন সেখানে পোস্টেড। আছেন সপরিবারে, রাজেশ্বরী তাঁদেরই অতিথি। খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমরা রোম ছাড়ি। রাজেশ্বরীর সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হলো।

দেশে ফিরেই শুনতে পেলাম, রাজেশ্বরী বিয়ে করতে ইংল্যান্ড গেছে। কাকে বিয়ে করবে তা-ও দেশের লোকেরা জানে। সুধীন দত্তেরই কোনো ইংরেজ বন্ধু। নাম বললে অনেকে চিনবেন। কিন্তু নাম বলে আর কী হবে। তর্ক করে লাভ হলো না। সংবাদদাতারা মৃদু হেসে তা খণ্ডন করে বললেন, 'সে কি আর কেউ বলে? ও সব গোপনে গোপনেই হয়।'

কিন্তু গোপনে গোপনে হলো না। দু' বছর বাদে আমরা আবার বিদেশে গেলাম। রাজেশ্বরীর সঙ্গে শিকাগোতে দেখা হলো। ইতিমধ্যে সে বিবাহের বদলে লাইব্রেরিয়ানশীপ পাস করেছে এবং কাজ পেয়েছে একটি। ছোট্ট একটি সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে, তেমনিই বিষণ্ণ, তেমনিই অসহায়, তেমনিই একা।

আমরা আমেরিকা থাকতে থাকতেই সে কেম্ব্রিজে এলো লেকচারার হয়ে। একটি থীসিসও সাবমিট করলো। বিষয়টা ভাষা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। এখন সেই থীসিস একটি অতি মূল্যবান তথ্যের বই হিসেবে গণ্য। তারপর উনিশশো উনসত্তর সালে সেই কাজ ছেড়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডিপার্টমেণ্ট অব ওরিয়েণ্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ'-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সেই কাজেই সে এই অক্টোবর মাসে দেশে আসে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললো, 'রাণু, তুমি দুঃখ করো না, তোমার ছেলেমেয়েরা আছে, নাতি-নাতনীরা আছে, বাট্ হোয়েন সুধীন লেফট মী অ্যালোন' এই বলে হাতের পাতায় মুখ ঢাকলো।

এসেছিলো দশ মাসের জন্য। উঠেছিলো সুধীনবাবুর কনিষ্ঠতম এবং প্রিয়তম ভ্রাতা সৌরীন দত্তের ওখানে। এবার দেশে এসে ওর এতো ভালো লাগছিলো যে বলছিলো, 'ফিরে গিয়ে এই কোর্সটা সাঙ্গ করেই আমি চলে আসবো। দেশে। শুধু ভাবনা যে কোথায় থাকি?'

আমি বললাম, 'তোমার তো লাভলক প্লেসে বাড়ি আছে।'

রাজেশ্বরী বললো, 'সে বাড়িতে যে ভাড়াটে আছে সে বাড়ি ছাড়বে না। বলছে সারা জীবনেও ছাড়বে না।'

রাজেশ্বরীর মতো নিরিবিলি ভালোমানুষের পক্ষে এই ধরনের লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো প্রশ্ন ছিল না। বাড়িটাতে জমি আছে অনেকটা (যতোটা স্মৃতিতে আছে, রাজেশ্বরী বলেছিলো, দশ অথবা তেরো কাঠা), অতএব বাগান আছে, জায়গা তো ঐ রকম, একতলা দোতলা তেতলা মিলিয়ে ঘরের সংখ্যাও কম নয়, ভাড়া মাত্র এক হাজার, সুতরাং ভাড়াটে যে উঠতে চাইবে না সে তো ধরাই ধার্য। আমি বললাম, 'তা হলে বাকী জমিটায় আর একটা ছোট বাড়ি তুলে নাও।'

ভয়ার্ত মুখে রাজেশ্বরী বললো, 'আমি কেমন করে বাড়ি তুলবো? সে যে অনেক হাঙ্গামা। অনেক খরচ। তা ছাড়া ঐ লোক যদি রাগ করে?'

'কোন্ লোক?'

'সেই ভাড়াটে?'

আমি হেসে ফেললাম, 'তোমার জমিতে তুমি বাড়ি তুলবে তাতে ঐ লোক রাগ করবে কেন?'

'সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না, তুমি অন্য বুদ্ধি দাও। আমি শান্তিনিকেতনের কথা ভাবছি, বুলবুল আছে সেখানে। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার ভালো লাগলো বেশ।'

বুলবুল আই সি এস সুশীল দে-র পত্নী। সুশীল দে মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী এখন সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। রাজেশ্বরী শান্তিনিকেতনে তার কাজে গিয়ে মিসেস দে-র বাড়িতেই ছিল।

এর পরে শান্তিনিকেতনে বাড়ি জমি কেনাকাটার প্রসঙ্গ চললো খানিকক্ষণ। আমি বললাম, 'সেখানে আমার দু' বিঘা জমি আছে, আর তার এক কোণে ছোট্ট একটি কুটির আছে। বাকী জমিটা তো পড়েই থাকে অথচ দান-বিক্রীর ক্ষমতা নেই। তুমি যদি চাও, কোনো অংশে পছন্দমতো একটা বাড়ি তুলে থাকো না। তাতে তো আমাকে কেউ বাধা দিতে আসবে না। তখন আমিও চলে যাবো, তুমি থাকবে তোমার বাড়িতে, আমি থাকবো আমার বাড়িতে।' কারোই আর একা লাগবে না। এ হলো কথার কথা, ইচ্ছের কথা। কিন্তু সেই সুতো নাটাই নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ালাম। সে তার বাড়ি বানাতে যতো উৎসাহ খরচ করতে লাগলো, আমিও আমার জীর্ণ কুটির সংস্কারে ততোই অগ্রসর হতে লাগলুম।

কিন্তু আমার কুটির আর সংস্কৃত হলো না, সে চলে গেল তার পাকা বাড়িতে। ইহলোকের মতো পরলোকের পাথেয়ও যে তার আমার থেকে এতো বেশী ছিলো আমি তা জানতাম না। আমাদের জানার পরিধি কতো ছোটো!

একটি ঐতিহ্যপূর্ণ গবেষণা-কেন্দ্রের শতবার্ষিকী

ঐতিহ্যপূর্ণ, কারণ ভারতে এই গবেষণাকেন্দ্রেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন। ঐতিহ্যপূর্ণ, কারণ, সরকারী নয়, এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র দেশবাসীর শুভেচ্ছা এবং প্রচেষ্টায়। যার পুরোহিত ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

ঐতিহ্যপূর্ণ, কারণ দেশবাসীর কাছে যাঁর পরিচয় পণ্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে, তিনি,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এই প্রতিষ্ঠানটির বিশিষ্টতম পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঐতিহ্যপূর্ণ, কারণ নোবেল পুরস্কারে বৃত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যিনি ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন এখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের গৌরচন্দ্রিকা। তিনি চন্দ্রশেখর বেংকট রামন।

নাম, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অভ সায়ান্স।

২৯ জুলাই তার শতবার্ষিকী উৎসব।

উৎসবের উদ্বোধক আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং।

প্রথম সূত্রপাত একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম On the Desirability of a National Institution for the Cultivation of Sciences by the Natives of India. লেখক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা জার্নাল অভ মেডিসিন-এর আগাস্ট, ১৮৬৯ সংখ্যায়। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র, কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডি পরীক্ষায় প্রথম মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান শিক্ষাকে শুধুমাত্র কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বিজ্ঞান সম্পর্কে সত্যিকারের বোধ, বিজ্ঞান সম্পর্কে সত্যিকারের মানসিকতা কখনই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এর জন্যে দরকার মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা। এবং এই গবেষণায় এমন সব ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করবেন, যাঁরা নিজস্ব চিন্তাভাবনার অধিকারী, বিজ্ঞানের মৌল চিন্তাভাবনা অনুধাবন করার মত ক্ষমতা রাখেন। ক্যালকাটা জার্নাল অভ মেডিসিন-এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে মূলত এই ধরনের একটি বক্তব্য উপস্থাপন করে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্যে আহ্বান জানালেন দেশবাসীর কাছে।

বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তখন নবজাগরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহনের সমাজ সংস্কার এবং ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এদেশের মানুষ নতুন এক মানসিকতার অধিকারী। রামমোহনের পর ওই কাজে অবতীর্ণ হলেন ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড ফাদার লাফোঁর মত আরও অনেকে। মহেন্দ্রলালের প্রবন্ধ এঁদের অনেকের মনে সাড়া জাগায়।

কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের সমর্থন এল বিস্তর। এই অনুপ্রেরণাতেই মহেন্দ্রলাল ৩ জানুয়ারি, ১৮৭০ সর্বসাধারণের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে আহ্বান জানালেন। প্রস্তাব করলেন একটি সমিতি গড়ে তোলা

ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্বপ্ন দেখেছিলেন এদেশে এমন ধরনের বিজ্ঞানচর্চা হোক যা এদেশের মানুষের মধ্যে একটি নিজস্বতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে

হোক। এই সমিতির নাম হবে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ সায়ান্স।

সাড়া পাওয়া গেল। ১৮৭৫ সালের মধ্যে সংগ্রহ হল প্রায় ৮০,০০০ টাকা। ওই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কয়েকবার মিলিত হয়ে আর্থিক সাহায্যকারীরা তাঁদের মূল কর্মসূচীর একটি কাঠামো দাঁড় করালেন। অবশেষে ১৫ জানুয়ারি, ১৮৭৬, বাংলার গবর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর পৌরোহিত্যে সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং কলকাতার বহু গুণী নাগরিকের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ সায়ান্স। সভায় ঠিক হল, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা এবং ওই গবেষণার সাহায্যে মানবিক কল্যাণ —এমন একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাবে। শুরু হল আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের প্রথম গবেষণা-কেন্দ্রের কাজ।

বলা বাহুল্য এই প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল, সেটা কতকটা নিয়ম রক্ষার মত। বিদেশী সরকারের বদান্যতায় পাছে মূল আদর্শ ব্যাহত হয় সে সম্পর্কে মহেন্দ্রলাল নিজেও যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। সদস্যবৃন্দের একটি সভায় তিনি উল্লেখও করেছেন :

....You are aware, that one characteristic of my scheme is that we should endeavour to carry on the work with our own efforts, unaided by Government, or perhaps more properly speaking, without seeking its aid. Now this does not mean that we will not accept any aid from that quarters, if it comes to us unasked, and unhampered with conditions and restrictions, excepting the all important condition of the continuance of the Association.... I want for the Institution. I want it to be entirely under our own management and control. I want it to be solely native and purely national.

বাংলা সরকার ১৮৭৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার ২১০ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে বিনে ভাড়ায় একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। শর্ত রইল, সমিতি চাঁদা হিসেবে অথবা সাহায্য হিসেবে যে টাকা সংগ্রহ করেছে তা থেকে ৫০,০০০ টাকা সরকারী সিকুরিটি হিসেবে জমা রাখতে হবে। এবং তার সঙ্গে পরিষ্কারভাবে দেখাতে হবে এই সমিতির চাঁদা বাবদ মাসিক আয় ১০০ টাকা।

নতুন আবাসে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধন হল ২৯ জুলাই, ১৮৭৬। কার্যত ওই দিন থেকেই এর কার্যক্রমের শুরু। এর চার বছর পর বৌবাজার স্ট্রিটের ওই বাড়িটি এবং তার আশপাশের কিছুটা জমি সরকারের কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়া হয়।

পরবর্তী কুড়ি বছর মহেন্দ্রলাল ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক—সম্পাদক। বক্তৃতা কক্ষ, যন্ত্রপাতি, অধ্যাপকের পদ খোলা, পদক এবং পুরস্কার—এ সবের জন্যে দরকার প্রচুর অর্থ। দেশবাসীর কাছে হাত বাড়ালেন মহেন্দ্রলাল। সাহায্য এল কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছ থেকে ২৫,০০০

টাকা। কালীকিষণ ঠাকুর বললেন, এই টাকায় গবেষণাগার তৈরি করুন। ১৮৮৩ সালে বক্তৃতা কক্ষ তৈরির কাজ শেষ হল। শহর কলকাতায় এটাই তখন একমাত্র সুরম্য বক্তৃতাকক্ষ। এর জন্যে সাহায্য পাঠালেন দারভাঙ্গার মহারাজা, বিজনির রাজা কুমুদ নারায়ণ ভুপ, কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিং এবং বাবু কালীকিষণ ঠাকুর। প্রত্যেকে দিলেন ৫০০০ টাকা অনুদান। ১২ মার্চ, ১৮৮৪ লর্ড রিপন এর উদ্বোধন করলেন।

১৮৮৯ সালে ২১০ নম্বরের এই বাড়িটির জীর্ণদশা ঘটলে উদার হাতে এগিয়ে এলেন বিজয়নগরের মহারাজা ২৫০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য হাতে। পরে এই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ তিনি ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন।

মহেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন সার্থক গবেষণার জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত পঠন পাঠন ব্যবস্থা। আর তার জন্যে দরকার উপযুক্ত অধ্যাপক এবং পরীক্ষাগার। গোড়ায় তাঁর পরিকল্পনা ছিল এই প্রতিষ্ঠানে যে সব বিষয় নিয়ে কাজ হবে তাদের মধ্যে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, শারীর বিদ্যা এবং ভূ-তত্ত্ব। ১৮৭৬ থেকে অবৈতনিক শিক্ষকদের দিয়ে শুরু হল পঠন-পাঠনের কাজ। পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন, প্রথম দিকে এই দুটি বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। পদার্থবিদ্যা পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন দুজন। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ফাদার লাফোঁ। মহেন্দ্রলাল নিলেন গতিবিদ্যুৎ, চুম্বক এবং তাপ বিষয়ক অধ্যায়গুলি পড়ানোর ভার। ফাদার লাফোঁ দায়িত্ব নিলেন আলোক বিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান এবং সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানোর। পড়ানো, সেই সঙ্গে চলল নানা রকম পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়বস্তু বোঝানো।

১৮৮৫ সালে কেমব্রিজ থেকে ফিরে এসে আচার্য জগদীশচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হলেন। তিনি নিতেন প্র্যাকটিকেল ক্লাশ। পদার্থবিজ্ঞানের। এরপর এলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর আগমনে পদার্থবিদ্যার পঠন-পাঠন আরও অনেকটা সমৃদ্ধ হল। এখানে এসে তিনি খুললেন জ্যোত-আলোকবিজ্ঞান, বিশুদ্ধ এবং ফলিত গণিতের পাঠক্রম। পরে এইসব বিষয়ে শিক্ষকতার কাজে এগিয়ে আসেন মহেন্দ্রনাথ রায়, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রলালের পুত্র অমৃতলাল সরকার।

রসায়নের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব নিলেন ডঃ কানাইলাল দে, পরে তারাপ্রসন্ন রায়, রামচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত সেন এবং চুনীলাল বসু। এঁরা সবাই তখন জড়িত ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং স্কুলের সঙ্গে। ১৮৯৯ সালে ডঃ চুনীলাল বসু শুরু করেন বিশ্লেষণী রসায়নের কাজ।

১৮৮০ সালে শুরু হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই বিষয়টির পঠন-পাঠনের পরিকল্পনার দায়িত্ব পড়ল কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ফাদার এ দ্য পেনেরাঁদার ওপর। ফাদার লা ফোঁও এখানে পড়াতেন। ১৮৮৭ সালে প্রমথনাথ বসু শুরু করলেন ভূ-তত্ত্বের পঠন-পাঠন। ১৮৯৪ সালে মহেন্দ্রলাল উদ্বোধন করলেন জীব-বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্লাশ। যার পরিকল্পনা করেন বনোয়ারিলাল চৌধুরী এবং পরে গিরীশচন্দ্র বসু। ১৮৯৫ সালে এখানে শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রসায়নের ওপর ক্লাশ নেন স্যার নীলরতন সরকার।

খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট বক্তাদের বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা শোনার জন্যে এখানে ভিড় করতেন অনেকে। ছাত্র থেকে শুরু করে বিদগ্ধজন। ১৮৮০-৮১ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র—তখন তিনিও এসে এখানকার ক্লাসে যোগ দিতেন। বক্তৃতা শুনতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পি কে রায়ের চেষ্টায় এখানে শুরু হল রাসায়নিক গবেষণার কাজ। এই বিদগ্ধ অধ্যাপকের অনুপ্রেরণা উত্তর-কালে তৈরি করেছিল পি এন বসু, জে সি বসু এবং পি সি রায়ের মত রসায়নবিদ।

বাধা। তবু প্রচুর বাধা। এভাবে সার্থক গবেষণা বা পঠনপাঠনের কাজ চলতে পারে না। অবৈতনিক বা আংশিক সময়ের মানুষকে দিয়ে পরিপূর্ণতা আনা অসম্ভব। মহেন্দ্রলাল ভাবলেন বড়লাট লর্ড রিপনকে সভাপতি করে দাবি রাখবেন অনুদানের। যাতে করে পূর্ণ সময়ের জন্যে অধ্যাপকের পদ খোলা যেতে পারে। টাকার সংস্থান করবেন লাটসাহেব।

কিন্তু ব্যর্থ হলেন মহেন্দ্রলাল। টাকা উঠল। মোট ১৭,০৫০ টাকা। দারভাঙ্গার

সি ভি রামনের বিজ্ঞানী জীবনের গৌরচন্দ্রিকা ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অভ কালটিভেশন অভ সায়ান্সে

মহারাজা দিলেন ১০,০০০, হায়দরাবাদের নিজাম ৩০০০। আর বড়লাট বাহাদুর ১০০০ টাকা। অন্যান্য সূত্র থেকে এল আরও কিছু টাকা। কিন্তু এত কম টাকায় কাজ হবে কি করে?

পরবর্তী কালে মহেন্দ্রলাল দুঃখ করে লিখেছেন, এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে যে পরিশ্রম আমি করেছি, সেই পরিশ্রম যদি ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্যে আমি ব্যয় করতাম, তা হলে সমিতির জন্যে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে আমি নিজেই তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ হয়তো আয় করতে পারতাম। এখন মনে হয়, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্নটাই আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ভুল।

বলা বাহুল্য, মহেন্দ্রলাল পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি তখন অসাধারণ। অতএব টাকার পাহাড় তৈরি করা তাঁর পক্ষে হয়তো কোন কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর যে আফসোস তিনি ভুল করেছেন, সত্যিই কি তাই?

তা যে নয়, সেটা অবধারিত প্রমাণ করলেন অন্ততঃ একজন। চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন।

অগাস্ট ১৯০৭। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রামন এলেন কলকাতার অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিসে কাজ নিয়ে। এর আগেই তিনি কালটিভেশন অভ্ সায়ান্সের নাম শুনেছিলেন। শুনেছিলেন এখানে বিজয়নগর মহারাজার নামে একটি গবেষণাগার আছে। ঠিক করলেন কাজের অবসরে সেখানে বসে তিনি বিজ্ঞানচর্চা করবেন। শুরু হল তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের গৌরচন্দ্রিকা। এখানে কাজ করেই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা-পত্র তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'নেচার', ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন প্রভৃতির মত বিজ্ঞান-পত্রে। আশুতোষের আহ্বানে পরে ১৯১৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকপদে বৃত হন। তাঁর পরবর্তী জীবন আর এক কাহিনী। গৌরবের কাহিনী। বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা চলে এই সব কাজই রামনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছিল।

এই প্রতিষ্ঠানটির আর এক বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক কে এস কৃষ্ণন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর এক শিরোনাম। এখানে গবেষণা করেছেন কে আর রামনাথন, কে শেষাগিরি রাও, এল এ রামদাস, এন কে সুর এবং এ এস গণেশন। যাঁরা ছিলেন রামনের সহযোগী। এবং উত্তরকালে ভারতীয় বিজ্ঞানের এক একটি রত্ন।

হ্যাঁ। নাম আরও আছে। আছেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। যাঁর উপস্থিতি রসায়ন গবেষণা-ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত করেছে। যাঁর উত্তরসাধক অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পালিত ভৌত-রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে এখন স্বনামধন্য।

ক্রমে সম্প্রসারিত হল। প্রসারিত হল কার্যক্রম। ২১০ বৌবাজার স্ট্রিট থেকে (বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) অ্যাসোসিয়েশন উঠে এল যাদবপুরে। এই নব রূপায়ণের যিনি হলে নায়ক—আমাদের আর এক রত্ন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ যাদবপুরে এই প্রতি-ষ্ঠানের নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন আর এক 'ভারতরত্ন' স্বগত' ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী হল ছয়টি গবেষণা বিভাগ : সাধারণ বিজ্ঞান, একস-রে এবং ম্যাগনেটিজম, আলোকবিজ্ঞান, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা, ভৌত-রসায়ন, জৈব রসায়ন এবং অজৈব রসায়ন। লক্ষ্য দুটি : মৌলিক গবেষণা এবং মানব-কল্যাণে যথাযথ প্রায়োগিক দিক নিয়ে অনুসন্ধান। গড়ে উঠল সুন্দর একটি ওয়ার্কশপ। এখানকার কর্মযজ্ঞে যোগ দিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। একসময়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এখানকার পরিচালকের ভার গ্রহণ করেন। বললে হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না, তাঁর সময়েই এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে এখানে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন ৩১৫ জন। প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ২০১৪।

এবং বর্তমানে এটি এখন একটি জাতীয় গবেষণাগার। মহেন্দ্রলাল যাকে 'ভুল' বলে আফসোস করেছেন, সেটা যে ভুল নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণ করেছেন তাঁর উত্তরসূরীরা।

এই প্রতিষ্ঠানের আর এক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক কে এস কৃষ্ণন। যিনি প্রমাণ করেন গ্র্যাফাইট কেলাসের মধ্যে চলার সময় ইলেকট্রন স্রোতের আচরণে দ্বিমাত্রিকতা দেখা দেয় এবং তা ফের্মি-ডিরাকের সংখ্যায়ন মেনে চলে

বরং এই মুহূর্তে মনে হয় 'আফসোস' করার যদি কিছু থাকে সেটা আমাদের। এক সময়ে সরকারের মুখে দিকে না চেয়ে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেশের সম্পদ-সম্পন্ন মানুষ। রাসবিহারী ঘোষ, পালিত, দারভাঙ্গার মহারাজা—এমন অনেক দৃষ্টান্ত তো চোখের সামনে। এখন ধনী এবং সম্পদসম্পন্নের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু সেকালের মানুষের মত দৃষ্টান্ত তেমন চোখে পড়ে না কেন?

সমরজিৎ কর

সাহিত্য প্রসঙ্গ

নকুল চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

আগের দিন বিকেলে যাকে হাসিমুখে দেখেছি, পরের দিন দুপুরে শুনি সে আর নেই। এ জগতে এরকম নাটকীয় ঘটনা কত ঘটে জানি না, তবে নিতান্ত কমও ঘটে না। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে এই কয়েক মাসেই এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটল। নকুল চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি মঙ্গলবার বিকেলে, পরের দিন দুপুরে (১৪ জুলাই) তিনি আর নেই। অফিসে এসে লাইব্রেরির নিজের চেয়ারটিতে বসলেন। সামান্য পরেই অন্তর্ধান, দেহটি আমাদের দেখার জন্যে রেখে গেছেন—যেন বোঝাতে চেয়েছেন—এ জগতে থাকা আর চলে যাওয়ার মধ্যে কয়েকটি মুহূর্তের ব্যবধান।

নকুল চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা দেশের অসংখ্য পাঠক হয়তো চিনবেন না—কেননা তিনি গল্প উপন্যাস কবিতা লিখতেন না। কিন্তু দেশ পত্রিকার বহু পাঠকেরই মনে থাকার কথা যে, নকুল এই পত্রিকাতেই কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন যার প্রধান গুণ ছিল তথ্য সন্নিবেশ। ইদানীং এমন কয়েকজন লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যাঁদের সঙ্গে ভারতীয় পাঠকের যোগাযোগ ছিল অল্প। নকুল চট্টোপাধ্যায় এঁদের পরিচয় ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে বেশ কয়েকটি রচনা দেশ পত্রিকায় লিখেছেন বলে আমার মনে হয়।

অবশ্য নকুল চট্টোপাধ্যায়ের অন্য এক পরিচয় ছিল—সেই পরিচয়ে তিনি বোধ করি বহুজনের পরিচিত ছিলেন। তাঁর সেই জ্যোতিষী পরিচয়ের কথা আমার বলার বিষয় নয়।

নকুল পেশায় ছিলেন লাইব্রেরিয়ান। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে এসেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক হিসেবে। আর এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—তাঁর হাতে এই লাইব্রেরিটি সুন্দর, গোছানো, প্রয়োজনীয় ও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে।

তবু পেশার বাইরে আমরা যে নকুল চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি—তিনি সাহিত্য-রস বোদ্ধা, সাহিত্যিকদের বন্ধু, নিজেও লেখক। আমি যতদূর জানি, পুরোনো কলকাতা সম্পর্কে নকুলের প্রচুর পড়াশোনা ছিল। তাঁর লেখা বইও আছে কলকাতার ওপর। 'তিন শতকের কলকাতা' খুবই প্রয়োজনীয় বই। বইটির সাহায্য গবেষকদের না নিলেই নয়।

নিজে যেমন পড়াশোনা করতেন, নানা বিষয়ের খোঁজ রাখতেন—সেইরকম সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের প্রয়োজনীয় বই যোগাড় করে দিয়ে লেখায় সাহায্য করতে তাঁর উৎসাহ ছিল দেখার মতন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে থাকার সময় অনেক নামী লেখককে তিনি তাঁদের চাহিদামতন বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে এ বিষয়ে অনেকের ঋণ রয়েছে।

মানুষ হিসেবে নকুল ছিলেন সদা-হাস্যময়, রসিক প্রকৃতির। দেখা হলেই দু দণ্ড কথা না বলে নড়তেন না। জ্যোতিষ জ্যোতিষ করে লোকে তাঁকে বিরক্ত করত, তবু তাঁর মুখের প্রসন্নতা, স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, চাঞ্চল্য নষ্ট হতে দেখিনি। মাত্র বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়েসে এমন করে তিনি চলে যাবেন কে ভেবেছিল?

নকুল নেই। হঠাৎ প্রয়োজন হলে বলতে পারব না—আমার ওই বইটা চাই, অমুক কাগজটা, ওই রেফারেন্সটা।

আমাদের অনেক প্রয়োজন সে হাসিমুখে মিটিয়েছে। কি জানি, আমরাই তার কাছে কোনো অপরাধ করলাম কি না! তাই বুঝি এমন করে অকস্মাৎ চলে গেল। তাকে কি জানাব? শ্রদ্ধা না প্রীতি? আমাদের বেদনা, না ক্ষোভ? সব মিলিয়ে যদি কিছু জানানো যায় তবে সেই প্রচণ্ড বেদনাই জানালাম।

অকিনন্দ

শরৎস্মৃতি পুরস্কার

শরৎ সমিতি প্রদত্ত ৫০০০ টাকা সম্মানমূল্যের শরৎস্মৃতি পুরস্কারের জন্য ১৯৭৬ সালে স্বর্গত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মনোনীত হয়েছেন। এই পুরস্কারের টাকা নগদে সাহিত্যিকের আইনানুগ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হবে।

মহান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে শরৎ সমিতি প্রবর্তিত এই পুরস্কার প্রতি বৎসর লেখকের সামগ্রিক সাহিত্যকীর্তির বিচারে বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে শরৎজন্মতিথি ৩১শে ভাদ্র তারিখে প্রদান করবেন। এই উপলক্ষে অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়কে নিয়ে একটি বিচারকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। এবং এই বিচারকমণ্ডলী প্রথম বৎসরের পুরস্কারের জন্য স্বর্গত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মনোনীত করেছেন।

আলোচনা

রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্বরলিপি বিভ্রাট

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি যে যথাযথ হচ্ছে না, তাতে যে ইচ্ছামত পরবর্তী কালের কেউ হস্তক্ষেপ করছে এ কথা সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর অনেক আগে থেকেই বলতে শুরু করেন। তখন ইন্দিরা দেবী জীবিত, অনাদিকুমার দস্তিদারও। শুধু কলকাতার সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় নয়, নানা রচনায়ও তিনি ঐ স্বরলিপি বিভ্রাটের কথা ক্রমাগত বলতে থাকেন। পুরানো স্বরলিপি কোনরকম সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাড়াই চুপিচুপি বদল হয়ে যাচ্ছে—এই দায়িত্বহীনতার অবসান তিনি দাবি করেছিলেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁর কোন কথার জবাব দেননি। তবে তাঁর চিঠির উত্তরে রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দেরাদুন থেকে ৩০ জুলাই ১৯৫৮ সালের চিঠিতে—'বাবার গান সম্বন্ধে যা লিখেছিস তোর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু কিছু করার আমার ক্ষমতা নেই।' সৌমোন্দ্রবাবুর কাছে শুনেছিলুম যে, উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য মশায় তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, স্বরবিতানে পুরানো-প্রকাশিত মূল রূপটি ছাপা হবে—সেই থেকেই ছন্দোভেদ, স্বরভেদের পরিশিষ্ট জোড়া হ'তে লাগলো।

সৌমোন্দ্রনাথের পরে কিরণশশী দে অনেক দিন ধরে বলে চলেছেন এই কৈফিয়তহীন স্বরলিপি বদলের বিরুদ্ধে। অনেক প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের করা স্বরলিপি বদল হচ্ছে—এবং এটা অন্যায়। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশেষ পাত্তা দেননি। ভাব দেখে মনে হয়েছে কে কি বললো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। অবশেষে স্বয়ং শান্তিদেব ঘোষ আজ যখন প্রকাশ্যে স্বরলিপি বিভ্রাট নিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করলেন তখন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সঙ্গীত অধীক্ষক প্রফুল্লকুমার দাস এক দীর্ঘ কৈফিয়ত প্রকাশ করেছেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে যে প্রশ্ন রবীন্দ্রানুরাগী মহলে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে সে সম্পর্কে এই প্রথম একটা সরকারী বিবৃতি পাওয়া গেল।

প্রফুল্লবাবুর বক্তব্যে নূতন কিছুই নেই। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতলিপি' প্রবন্ধে তিনি যে কথা বলেছিলেন সেই কথাই পত্রাকারে আবার বলেছেন। তাঁর চিঠিকেই যদি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের বক্তব্য বলে ধরে নিতে হয় তা হলে বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, এইসব কাঁচা খেলো যুক্তি ছাড়া বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের কি আর কিছু বলবার ছিল না!

যেমন প্রথমেই তিনি বলেছেন, 'কোনো গীতরচয়িতা তাঁর নিজের গানের স্বরলিপি নিজেই করলে তার সুরের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনো সমস্যা থাকে না।' কিন্তু গীতরচয়িতা যদি তা না করে থাকেন, যদি তিনি তাঁর নিকটস্থ সঙ্গীতজ্ঞদের দিয়ে স্বরলিপি করিয়ে রাখেন, তাঁর জীবৎকালেই তা প্রকাশ করেন—তা হলে? তা হলে কি ধরে নেবো না যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন গায়কদের দিয়ে নিজের গানের কাঠামোটা ধরে রাখলেন এবং তাঁর জীবিতকালেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে সেই স্বরলিপি ধরেই গান গাওয়া চললো—এই যুক্তিতেই সেটা প্রামাণিক?

এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একই গান তো একাধিক স্বরলিপিকারের হাতে ভিন্ন সুরে লিপিবদ্ধ আছে। এর উত্তর খুবই সহজ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একই গানের স্বরলিপি করেছেন—তাতে সুর ও ছন্দের সামান্য ভেদও থাকতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী এই দুটিকেই মেনে নেবেন; কারণ কোনটিই স্বরলিপিকারের মনগড়া নয়—কবিকণ্ঠ থেকেই সোজাসুজি লিপিবদ্ধ হয়েছে তারা। এবং কবি তা নিজের জীবনেই দেখে গেছেন।

প্রফুল্লবাবু এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ও তাঁর গানের অন্যকৃত স্বরলিপিতে একটা মূলগত পার্থক্য আছেই।' রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা স্বরলিপি ক'টি? তার সঙ্গে অন্যদের স্বরলিপির পার্থক্য কি? প্রফুল্লবাবু সে আলোচনায় যাননি। সুতরাং এ প্রসঙ্গের তাৎপর্য বোঝা গেল না—অন্য সকলের স্বরলিপিই অপ্রামাণিক হয়ে যায় রবীন্দ্রকৃত স্বরলিপির সঙ্গে তুলনায়—এইরকম একটা ইঙ্গিত কটাক্ষে যেন নিক্ষেপ করলেন।

সবিস্তারে স্বরলিপি সমিতির কাজের তিনটি পর্যায় প্রফুল্লবাবু তুলে ধরেছেন—
১) রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপির পুনঃপ্রকাশ,
২) সাময়িক পত্র থেকে স্বরলিপি সঙ্কলন
৩) অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশ। এ পর্যন্ত কোন তর্ক নেই, কোন বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু ঐ ৩য় অংশেই প্রফুল্লচন্দ্র লিখলেন 'পূর্বপ্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি-গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনার ফলে কোন কোন স্বরলিপির অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে।'

স্বরলিপির সম্পাদনা ও পরিবর্তন (প্রফুল্লবাবুর ভাষায় সংস্কারসাধন) দিনেন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন এই হলো প্রফুল্লবাবুর প্রধান যুক্তি। মনে রাখা দরকার ছিল যে, দিনেন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তা নিজেরই কৃত স্বরলিপিতে এবং তাও কবি জীবিত থাকতেই। তিনি অন্য কোন স্বরলিপিকারের লেখার 'সংস্কার-সাধনে'র চেষ্টা করেননি।

সুতরাং এ প্রশ্ন আমরা তুলতে পারি যে, স্বরলিপি সমিতি যে তিনটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তার মধ্যে সংস্কার সাধনের প্রসঙ্গ আসে কি করে? অনাদিকুমারের কাছে দিনেন্দ্রনাথের সম্পাদিত ও সংশোধিত বহু স্বরলিপি নাকি ছিল। অনাদিকুমার আজ নেই, তিনি নিজে এ কথা কোথাও বলে গেছেন বলে জানি না। আর যদি থেকেই থাকে তার নতুন প্রকাশ হোক; তার ভিত্তিতে পুরানো স্বরলিপির সংস্কার সাধন করবার অধিকার কি স্বরলিপি সমিতি নিজের উপর নিতে পারেন?

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বই তাঁর জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরেও সম্পাদিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কোন নূতন অংশের সংযোজন বা সংশোধন আবিষ্কার করলে সম্পাদকেরা গ্রন্থশেষে তার উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের মূলে টেক্সট-এর 'সংস্কার সাধন' করেন নি। ঠিক তেমনি কাঙালীচরণ ও দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্বরলিপি সংগ্রহ ও গ্রন্থনের কাজে সম্পাদনা অবশ্যই চলতে

বাল্মীকি-প্রতিভা ১৭

(১) ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত সংশোধিত স্বরলিপির প্রতিকৃতি

পারে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন কোন স্বরলিপির অকপোলকল্পিত 'পরিবর্তন' চলে কি?

স্বরলিপি সমিতির কাজ কারা চালাতেন বা চালাচ্ছেন। শান্তিদেব ঘোষ তো অনেক আগেই পদত্যাগ করেছেন। শৈলজারঞ্জন তো করেন নি। অথচ তিনিও নতুন স্বরলিপি দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর লেখা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি নিজেও এ পরিবর্তনের কারণ জানেন না। তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, 'বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' গানটির ১৩২৬ সালের স্বরলিপিতে 'কথার সঙ্গে সুরটি বেশী খাপ খেয়েছে মনে হয়। এর সুরের ভিতরে বনান্তের পরিধিটি ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে।' ১৩৬২ সালের ঐ গানেরই নূতন 'সংস্কার সাধিত' স্বরলিপি থেকে 'আলোকের নৃত্যে বনান্ত' অংশটির স্বরলিপি তুলে তিনি পার্থক্যটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তা হলে জিজ্ঞাস্য এই যে, শুধু শান্তিদেব নন, কখনো কখনো শৈলজারঞ্জনও জানেন না, যে কি করে স্বরলিপি বদলায় এবং কেন বদলায়।

প্রফুল্লবাবুর চিঠির শেষাংশ শান্তিদেবের সঙ্গে স্বরলিপি সমিতির সম্পর্ক নিয়ে। কে ঠিক কে বেঠিক, কার আচরণ যুক্তিসঙ্গত কার আচরণ নয়, তা নিয়ে আমাদের কোন উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। যে প্রশ্ন সৌমেন্দ্রনাথ তুলেছিলেন, সেই প্রশ্নই শান্তিদেবও তুলেছেন। স্বরলিপির 'সংস্কার সাধনের' অধিকার কারও আছে কি না? এই হল প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর প্রফুল্লবাবুর লেখায় নেই। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও কি ঐ মনগড়া ছেঁদো যুক্তির চেয়ে ভাল কিছু দিতে পারলেন না?

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা থেকে যায়। ইন্দিরা দেবী চলে গেছেন। অনাদিবাবুও নেই। শান্তিদেব পদত্যাগ করেছেন। এখন তা হলে স্বরলিপি সমিতির 'সংস্কার সাধনের' মহৎ কর্মটি কে করছেন?

সৌমেন্দ্রনাথ বসু
শিক্ষক, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় ৪৩ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা : ২৬ জুন ১৯৭৬ প্রকাশিত বক্তব্যে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, স্বরবিতান গ্রন্থমালার সম্পাদনা করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও অনাদিকুমার দস্তিদার।

নিদর্শনস্বরূপে তাঁদের সম্পাদিত এবং স্বহস্তে সংশোধিত স্বরলিপি পাঠের দুটি অংশের স্বতন্ত্র ফোটোস্টাট কপি এখানে দেওয়া হলো। তথ্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য আগ্রহী হলে অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

১। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী-কৃত সম্পাদিত বাল্মীকি প্রতিভা : স্বরবিতান ৪৯॥
গান : কালী কালী বলো রে আজ
২। অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত সম্পাদিত স্বরবিতান ১॥
গান : ওগো বধূ সুন্দরী

রণজিৎ রায়
অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

স্বর-বিতান ৭৫

(২) অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত সংশোধিত স্বরলিপির প্রতিকৃতি

সাহিত্য পুরস্কার

৩ জুলাই-এর দেশ পত্রিকাতে শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের বিবৃতি পড়ে মনে হল এই প্রসঙ্গে আরো কতকগুলি কথা বলার প্রয়োজন আছে। গত কুড়ি-বাইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের নানান বিচারকমণ্ডলীর সদস্যরূপে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ওপরেই নির্ভর করে কথাগুলি বলবার সাহস পাচ্ছি। আমার একমাত্র ইচ্ছা এতে যদি ভবিষ্যতের সাহিত্যবিচারের কাজে একটুও সাহায্য পাওয়া যায়। আমি কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর সভ্য নই, সাম্প্রতিক রবীন্দ্র পুরস্কার বিচার সম্পর্কে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা আমার অভিপ্রায় নয়, যদিও সত্যের খাতিরে এটুকু বলতে হয় যে, আমার মনে হয় এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার কাউকে না দিলেই সব চাইতে ভালো হত।

নানা ভাবে, নানা ভাষায়, প্রকাশ্যে ও অশোভন ইঙ্গিতে বিচারকদের দোষ দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সাহিত্যবিচার খুব সহজ কাজ নয়। হাজার সততাপূর্ণ সুদক্ষ বিচারকরাও তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কারণে কোনো কোনো সময়ে বিভ্রান্ত হন। তাকে অ-সততা বলে না। এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে যাঁরা বিচারক ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই আমি কম করে কুড়ি-বাইশ বছর ধরে চিনি। তাঁদের অসাধু বললে অতি বড় অন্যায় করা হয়। তাঁদের কারও এক কানাকড়ি ব্যক্তিগত লাভের কথাও উঠতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র দুর্বলতা লক্ষ করেছি। সেটি হল আমাদের জাতীয় দুর্বলতা, অর্থাৎ সংসাহসের অভাব। ভালোকে ভালো বলবার, মন্দকে মন্দ বলবার, নিজের প্রকৃত মতামত অকপটচিত্তে প্রকাশ করবার এবং তার ফলে যদি কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা হলে নিজের মতামতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কোনো হতভাগ্য সভাপতির ঘাড়ে না চাপিয়ে, নিজে বহন করবার বলিষ্ঠতা যে ব্যক্তির নেই, তাঁর বিচারক হওয়া উচিত নয়, তা তিনি যত বড় মহাপণ্ডিত কিংবা লেখকই হন না কেন।

এবার সাহিত্যবিচারের পদ্ধতির এবং নিয়মাবলীর কথায় আসা যাক। মনে হয় নিয়মগুলি কিঞ্চিৎ তাড়াহুড়োর মধ্যে, বিশদভাবে চিন্তা না করেই তৈরি করা হয়েছিল। ফলে ভাষাও প্রাঞ্জল হয়নি, অ-পরিণামদর্শিতার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী পদাধিকারীরা বাঙালী লেখকদের বাংলা বইয়ের বিচার ব্যাপারের নিয়মকানুন কেন অ-স্বচ্ছ ইংরিজী ভাষায় লিখবেন, এরও কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। নিয়মগুলি স্পষ্ট করে সহজে বোধগম্য বাংলায় লেখা হোক না কেন।

বিচারের নিয়ম তৈরি হলে বিচারক নির্বাচন করতে হয়। আমাদের বড় গর্ব যে এই ছোট্ট প্রদেশেও অগুনতি সাহিত্যিক, সা হি ত্য - র সি ক, সাহিত্য-সমালোচক, সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন। এক্ষেত্রে এক-ই বছরে এক-ই ব্যক্তিকে কেন একাধিক বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি করা হয়, তারও মানে বোঝা যায় না। আর শুধু সভাপতি

কেন, এক-ই বিচারককেও একাধিক বিচারক-মণ্ডলীর সদস্য হবার জন্য ডাকা উচিত নয়। শত সদিচ্ছা সত্বেও মানুষের নিজের ব্যক্তিত্বই, অর্থাৎ লজিকের বইতে যে জিনিসটিকে 'পার্সনাল কো-এফিশিয়েন্ট' বলা হয়েছে—সে-ই হয়ে দাঁড়ায় সুবিচারের অন্তরায়।

মোট ছয়টি পুরস্কার দিচ্ছেন বঙ্গ সরকার তিনটি রবীন্দ্র পুরস্কার, একটি বঙ্কিম পুরস্কার ও দুটি বিদ্যাসাগর পুরস্কার। প্রত্যেক বিচারকমণ্ডলীতে যদি সাতজন করে সদস্য থাকেন, তাহলে বিয়াল্লিশজন সজ্জন হলেই কাজ সুসম্পন্ন হয়।

কর্তৃপক্ষের আশা করি সম্ভাব্য বিচারক-দের তালিকা প্রস্তুত করা আছে—অন্তত তাই থাকাই বাঞ্ছনীয়—তাতে যদি ৩×৪২= ১২৬ জন বিচারকের নাম রাখা যায়, তাহলে তিন বছরে মাত্র একবার করে এক-একজন বিচারকের ডাক পড়বে। জনসাধারণ যে 'ভেস্টেড ইন্টারেস্টের' কথা উত্থাপন করেন, তার কোনো ক্ষেত্রই থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও না বলে পারছি না। এ বছরের বঙ্কিম পুরস্কারের বিচারকদের অধিবেশনে গিয়ে দেখি আমি একা লেখক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, বাকি সকলে মাস্টারমশাই। তাঁদের মধ্যে একজন অকপটভাবে বললেন যে গল্প উপন্যাস সাধারণত খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় না। মনে হল 'সীরিয়াস লেখা' বলতে তাঁরা প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদিই বোঝেন। ভাবলাম তবে কি মৌলিক লেখার চাইতে, তাঁদের সমালোচনার মূল্যই বেশি? অবশ্য সব সময় এমন নির্বাচন হয় না, মৌলিক লেখকরাও থাকেন। রবীন্দ্র পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীতে তো অনেকেই ছিলেন।

বছরে বছরে এতগুলি পুরস্কার দেবার উদ্দেশ্য শুনেছি সাহিত্যিকদের ও সাহিত্যকে উৎসাহিত করা, সাহায্য করা। তাহলে নিয়মাবলীও সেইভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত। বর্তমান নিয়মের কতকগুলিকে অসন্তোষজনক মনে হয়। মরণোত্তর পুরস্কার কখনো টাকা দিয়ে হতে পারে না। অনেক সময়ই দেখা যায় মৃত লেখকের ওয়ারিশদের সাহিত্য জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে উৎসাহিত করবার যে পুরস্কার, সে পুরস্কারে ওয়ারিশদের কোনো অধিকার থাকা উচিত নয়। মৃত সাহিত্যিকদের বাস্তবিক সম্মানিত করতে হলে তাঁদের একাধিক রচনার সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। টাকা দিতে হয় জীবিত লেখকদের।

অনেক সময় যথেষ্ট ভালো বই উপস্থাপিত হয় না। বর্তমান নিয়মে সেখানে দুটি পন্থার একটিকে অবলম্বন করা যায়। সে বছর ঐ পুরস্কার বন্ধ রাখা যায়। নতুবা বিচারকরা তাঁদের বিচার-মতো নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত অন্য বই উপস্থাপিত করতে পারেন। সমস্যা হল আজকাল বইয়ের দাম বড় বেশী তাই প্রকাশকরা দশ কপি বই দিতে চান না। বিচারকরা প্রায়ই ধনী ব্যক্তি নন, তাঁরাই বা কিনবেন কি করে? ভালো লেখকদের নিজেদের বই পেশ করতে বাধে। আমি বলি কি এ ক্ষেত্রে কোনো বিচারক যদি এক-খানি কিংবা দুখানি বই এনে দেন। সকলে পালা করে সে বই পড়ে, দশ দিন পরে আবার মিলিত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাহলে বেশী সুবিচার হয়।

বিচারসভায় আরো সমস্যা ওঠে। বিদ্যাসাগর পুরস্কার দেওয়া হবার কথা সাহিত্যিকের সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের ওপর। এজন্য বই পেশ করবার কোনো মানেই হয় না, কার্যকরী দিক থেকে করাও অসম্ভব, কারণ সব বই সব সময় প্রচলিত থাকে না। কাজেই দশ কপি দূরের কথা, এক কপি করেও পাওয়া মুশকিল।

আরেকটি সমস্যাও উঠছে। ইংরিজীতে নিয়মাবলীতে লেখা আছে। কোনো একটি বই যদি কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারের পুরস্কার পেয়ে থাকে, সে বই আর কোনো পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না। এ নিয়মটি খুবই ভালো।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম যে, এ বিষয়ে নিয়মাবলীতে বিশদভাবে নির্দেশ না থাকাতে কোনো কোনো বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি এর এইরূপ ব্যাখ্যা করলেন যে, শুধু পুরস্কৃত বইটি নয়, যে ব্যক্তি একবার কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারের যে-কোনো একটি পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁর অন্য কোনো বইয়ের কিংবা সমগ্র সাহিত্যকর্মের জন্য তিনিও আর কখনো পুরস্কৃত হতে পারবেন না। অর্থাৎ কেউ যদি ৫/১০ বছর আগে একটি বইয়ের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়ে থাকেন, তিনি আর কখনো তাঁর অন্য কোনো বই, কিংবা সামগ্রিক সাহিত্য-কর্মের জন্য অন্য কোনো পুরস্কারও পাবেন না।

অর্থাৎ উত্তম লেখকদের বেশির ভাগই কোনো না কোনো সময়ে পুরস্কার পাওয়াতে, তাঁরা সকলেই অ-পাঙক্তেয় হয়ে যাবেন এবং প্রতিযোগিতা হবে আরো দুর্বল লেখকদের মধ্যে। গ্রন্থবিচার করতে গিয়ে এ-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

বিচক্ষণ বিচারক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় দুটি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথমটি হল, সভাগৃহে বিচারকরা অনেক সময় না ভেবে কথা বলেন এবং পরে ভুলে যান। টেপ করা সব চাইতে ভালো হত, কিন্তু ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যবস্থা। সমস্ত আলোচনা শর্ট-হ্যান্ডে তুলে রাখা উচিত এবং সভার শেষে প্রত্যেক বিচারককে দিয়ে নিজের মতামত সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি লিখিয়ে সই করিয়ে নেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কথা হল, একজনকে দশ হাজার টাকার পুরস্কার না দিয়ে, একজন প্রবীণ লেখককে ৫ হাজার, একজন নবীন লেখককে ৫ হাজার দিলে, পুরস্কারের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

শীলা মজুমদার
কলকাতা ১৬

॥ ২ ॥

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁর দীর্ঘ পত্রের (৩ জুলাই) এক জায়গায় প্রশ্ন করেছেন, "কোন্ পুস্তকটিকে পুরস্কার দিলে সবাই সন্তুষ্ট হতেন তার নাম কি কেউ বলেছেন?" সবাই সন্তুষ্ট হবেন এমন বইয়ের নাম বোধ হয় কেউই বলতে পারবেন না। তবে 'নাটাকার' পুরস্কার পাওয়ায় যতজন সন্তুষ্ট হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী জন সন্তুষ্ট হতেন এমন একটা বইয়ের নাম করি : মৈত্রেয়ী দেবীর "ন হন্যতে"। সম্ভবত শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ও শেষ পর্যন্ত বেশী সন্তুষ্ট হতেন এই বই পুরস্কার পেলেই। অন্তত লেখিকার কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তিনি ১৭ মে ১৯৭৫ তারিখে লিখেছিলেন : "এ বই বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।"

বইটি আগের বছরে পুরস্কারের জন্য দাখিল করা হয়েছিল শুনলাম, এ বছরে নয়। তবে সে তো স্বর্গীয় অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর বইও যে বছর পুরস্কার পেয়েছিল সে বছরই দাখিল করা হয়নি বলে পড়লাম কোন্ কাগজে। তাতে ক্ষতি কি? তা ছাড়া গত বছরে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের যে বই পুরস্কৃত হয়েছিল তার নামও তো কেউ আগে কোনো দিন শোনে নি। রবীন্দ্র পুরস্কার কোনো সাহিত্যিকের সারা জীবনের 'সাহিত্য-কর্মের' পুরস্কার, না একটি বিশেষ বইয়ের জন্য পুরস্কার এ কথাটাও স্পষ্ট হয়নি।

গৌরী আইয়ুব
কলিকাতা ১৭

[রবীন্দ্র পুরস্কার প্রসঙ্গে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব নয়]

আবৃত্তি

গত ১৯ জুন ১৯৭৬-এর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এই কলকাতায়' শীর্ষক আলোচনায় 'রবীন্দ্রসদনে আবৃত্তির আসর' শিরোনামে লেখক লিখেছেন যে, '......আবৃত্তিকারদের সামনে নতুন এক দরজা খুলে দিয়েছেন মে মাসের বাইশ তারিখে শুধুমাত্র আবৃত্তিরই একটি অনুষ্ঠান করে। ......আবৃত্তিকারদের নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা চিন্তা করে অনেকেই সে ঝুঁকি নিতে পারছিলেন না। শংকরবাবু তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছেন।'

আবৃত্তির উৎসব নিঃসন্দেহে একটি অভিনব অনুষ্ঠান এবং তা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আবৃত্তির এই ধরনের অনুষ্ঠান সর্ব-প্রথম রবীন্দ্রসদন আয়োজন করেন নি। কিছুকাল আগে গত ডিসেম্বর মাসের একুশ তারিখে আমরা বয়েজ ওন লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে আমাদের নিজ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজন করেছিলাম এমনই একটি অনুষ্ঠানের—কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির—'কবিতার সকাল' শিরোনামে। রবীন্দ্রনাথ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বিদগ্ধ কবিদের কবিতা থাকে ওই অনুষ্ঠানে, সঙ্গে ধারাভাষ্য। ওই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, আর আবৃত্তিকার হিসেবে উপস্থিত থাকেন সবিতাব্রত দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, তরুণ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে তরুণতম আবৃত্তিকার পর্যন্ত। সুতরাং রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রথম আয়োজন করেছেন—এ ধারণা ভুল।

সনৎ মিত্র
বয়েজ ওন লাইব্রেরি কলকাতা ৬

রবীন্দ্র সংগীত

গত ৮ মে শার্ঙ্গদেব তাঁর 'গানের আসরে' একজন অবাঙালীর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে তিনি যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন তখন একটা সুগভীর শান্তরসে তাঁর মন আপ্লুত হয়ে যায়। সেইসঙ্গে স্বীকার করেছেন, এটা অবশ্য ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে যাঁরা বাংলা বোঝেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান পরিতৃপ্তির সঙ্গে শ্রবণ করেন, কিন্তু বাংলা যাঁরা জানেন না রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবেদন তাঁরা ঠিক ধরতে পারেন না।

না-পারাটা অস্বাভাবিক নয়, ভাষা দুস্তর ব্যবধান। আমার এক উত্তর প্রদেশীয় সঙ্গীত শিল্পী বন্ধু বেশ ক-বছর এখানে ছিলেন। তিনি বাংলা জানতেন, নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন। স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে এই সাধনা তাঁর বিশেষ কাজে লাগেনি। কারণ ভাষায় ব্যবধান।

তাঁর সমস্যার কথা জেনে আমি হাথরাস সঙ্গীত কার্যালয় থেকে অধ্যাপক রাধেশ্যাম পুরোহিতের এক কপি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আনিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। এই গ্রন্থে অধ্যাপক পুরোহিত রবীন্দ্রনাথের কটি নির্বাচিত গানকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে হিন্দিতে রূপান্তরিত করেছেন। এই রূপান্তর সাধনে তিনি বলতে গেলে ক্রিয়াপদগুলিকে একটু বদলিয়েছেন মাত্র। রূপান্তরিত প্রত্যেকটি গানের সুর তাল তো বটেই স্বরলিপি পর্যন্ত মোটামুটি অবিকৃত রেখেছেন। আমার বন্ধু এখন পরমানন্দে ভারতের বৃহত্তম লোকভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে অবাঙালী শ্রোতাদের খুশী করছেন ও অবাঙালী শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করছেন।

আমার আমেরিকা প্রবাসিনী কন্যারও একই সমস্যা হয়েছিল। প্রবাসের জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে সর্ব ভারতীয় শ্রোতা,-বাঙালী নগণ্য মাত্র। জাতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ পূজনীয় হলেও সেখানে বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেদন কতটুকু? একমাত্র হিন্দী রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েই সে সভায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিবিড়তম আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষায় অধিকাংশ শব্দই তৎসম। বিশেষ্য-বিশেষণ নিয়ে তো কোনো অসুবিধেই নেই। প্রাকৃতজ শব্দগুলিও হিন্দি শব্দের কাছাকাছি। ক্রিয়াপদকে একটু সংযতভাবে ব্যবহার করলে বা সুযোগ মত উহ্য রাখলে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানই সুষ্ঠুভাবে হিন্দিতে রূপান্তরিত করা শক্ত নয়। আর শুধু সুর তাল নয়, তার প্রতিটি ধ্বনিকেও স্বরলিপির মধ্যে চিহ্নিত করা সম্ভব।

আমার মনে হয় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজই এখন করা দরকার। নইলে বিশ্বকবির গান কেবল বাঙালী গাইয়েদের গলাতেই ফুটবে, বাঙালী শ্রোতাদেরই কানে বাজবে। শার্ঙ্গদেব যে আশংকা করেছেন, যাঁরা অবাঙালী তাঁরা এ গান শিখতেও চাইবেন না, শুনতেও চাইবেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে শুধু বাঙালীর মনোপলি নয়, সারা ভারতের সম্পদ, একথা বাঙালী যদি গর্ব ও পরিশ্রমের সঙ্গে সারা দেশবাসীকে না বোঝায়, তাহলে কে বোঝাবে?

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

রবীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র প্রসঙ্গ

দেশ ১২ জুন সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র প্রসঙ্গে (৩)' রচনায় কিছু ভুল তথ্য আছে। তিনি লিখেছেন ঋণশোধ নাটকে সন্তোষ মজুমদার সাজেন সন্ন্যাসী, উপনন্দ হন সুনীল মজুমদার। কথাটা ঠিক নয়, সন্ন্যাসী সাজেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং উপনন্দ সাজি আমি। সে-ই আমার শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়। প্রভাতবাবু লিখেছেন, জগদানন্দ রায় সাজেন লক্ষীশ্বর এবং রবীন্দ্রনাথ সাজেন কবিশেখর। ওই চরিত্র দুটির নাম লক্ষেশ্বর এবং শেখর। সেবার অভিনয়ে শ্রুতিকায় ছিলেন প্রমথনাথ বিশী।

প্রভাতবাবু লিখেছেন, ১৩৩৩ পঁচিশে বৈশাখ কবির ৬৫তম জন্মদিন। লেখা উচিত ছিল ৬৬তম জন্মদিন অথবা ৬৫তম জন্মবার্ষিকী।

নটীর পূজা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৯২৬ সালের ৮ মে। প্রভাতবাবু ভুল করে লিখেছেন ৭ মে। তা ছাড়া তিনি প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নটীর পূজায় কোন পুরুষ চরিত্র নেই—কেবলমাত্র উপালি ছাড়া।' এ কথাটিও সত্য নয়। নটীর পূজা-র গ্রন্থপরিচয়েই লেখা আছে—"প্রথম অভিনয়ে উপালি চরিত্র ছিল না, উপালি চরিত্র সংবলিত সূচনা অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সময় ছিল না। ১৯৩৩ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়, উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন।"

নটীর পূজা অভিনয়ের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে আরও উল্লেখ করি, প্রথম অভিনয়-স্থল ছিল, কোণার্ক উত্তরায়ণ। অভিনয়ে ছিলেন : লোকেশ্বরী—মালতী চৌধুরী (সেন), মল্লিকা—অমিতা সেন, রাজকুমারীগণ—মমতা দাশগুপ্তা (সেন), রমা কর (মজুমদার), লতিকা রায়, চিত্রা ঠাকুর, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, উৎপলপর্ণা—ইভা বসু, শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ (বসু), মালতী—অমিতা ঠাকুর, রাজকিংকরীগণ—অমিতা সেন (খুকু) ও অন্যান্য, রক্ষিণীগণ—সুমিতা বাহাদুর সিং (চক্রবর্তী) ও অন্যান্য।

অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা-৪০

হীরের টুকরো ইলিশ

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

ইলিশকে কেউ বলেছেন জলের উজ্জ্বল শস্য, কেউ বলেছেন জলের দুলাল। ইলিশ বাঙালীর অতি প্রিয় মাছ, গর্বের মাছ। যে যাই বলুক - ইলিশ রূপোলী মাছ, স্বপ্নের ইলিশ, সাধের ইলিশ, প্রবাদের ইলিশ। বাঙালীর ইলিশ-প্রিয়তার নানা প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলা প্রবাদে। নিরামিষাশী সাধক পর্যন্ত ইলিশ দেখিয়ে চঞ্চল। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে তিনি ভক্তকে বুঝিয়েছেন—পাঁচ জাতের মাছ বস্তুত নিরামিষ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরামিষ ইলিশ। শুনেছি মাছের নামে গাছও হাঁ করে। তারপর ইলিশ হলে তো কথাই নেই। সেই মহান হীরের টুকরো ইলিশ এখন আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নদীসমুদ্রে এদের আনাগোনা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। সবারই প্রশ্ন বাঙালীর এত সাধ আহ্লাদের প্রিয় মাছ কোথায় উধাও হচ্ছে? কেন?

কি স্বাদে, কি চরিত্রে, কি দর্শনে ইলিশ মৎস্যকুলে অদ্বিতীয় ভি-আই-পি। খাঁটি গঙ্গা বা পদ্মার ইলিশ রান্নায় চাপালে বাড়ির চার পাশে পাঁচ সাত বাড়ির লোকজন টের পাবেন। হ্যাঁ ইলিশ এসেছে বটে। আর ইলিশ অঙ্গের প্রতিটি বস্তুই তা কানকোই হোক আর পাখনাই হোক আঁশ বাদে কিছুই ফেলনা নয়। রান্নার মধ্যে কয়েকটি অনবদ্য পদ দই ইলিশ, সরষে ইলিশ, ঝাল কাঁচালংকা ঝোল, বেগুন ইলিশের তো কোন তুলনাই নেই। প্রবাদে অবশ্য আছে ইলিশ কাঁটা বন্ধা দিয়ে গিলিস। ইলিশ ভাতে বা সরষে কাঁচালংকা হলুদে দিয়ে ভাত ভাপানো এই রয়েল বেঙ্গল ইলিশের তো কোন তুলনাই নেই। আমার মনে হয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার যদি বাঙালীর গর্ব হয় তবে বাঙালীর অহংকার হল এই রয়েল বেঙ্গল ইলিশ।

ইলিশ গোত্রের মাছ অবশ্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশে নদী-সমুদ্রে আছে তবে কৌলিন্যে গঙ্গার ইলিশের কাছে তারা দাস অনুদাস। এর রাজকীয় চেহারার চেকনাই ও গতিবিধিতে পদ্মার ইলিশ ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে বিশেষ মিল নেই। স্বাদ-গন্ধের কথা তো দূরে অস্ত। আমেরিকার 'স্যাদ' মাছ স্বাদ গন্ধে কিছুটা ইলিশের কাছাকাছি। তবে স্থানীয় ইলিশ মাছে স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা কথা বোধহয় খুবই কাজের। অনেকের ধারণা কলকাতার বাগবাজারের বিচালি ঘাটের ইলিশ, বাবুঘাট, জগন্নাথ ঘাট, এদিকে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর-চাপদানীঘাট, ওদিকে উলুবেড়িয়া-কোলাঘাটের ইলিশের নামডাক সব চেয়ে বেশি। মাঝে মাঝে মাতলা, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার বা ফ্রেজারগঞ্জের নামডাকও শোনা যায় বাজারে, তবে গঙ্গার ইলিশের গৌরবের কাছে তা একেবারেই নস্যি।

আমাদের দেশেই শ্রীমান ইলিশ নানা নামে বিরাজমান। তেলেগু ভাষায় এর নাম পালশ, তামিল ভাষায় উলুম আর আসামে এর নাম ইলিচ। এবং সিন্ধু নদের ইলিশ পাল্লা বা পালা নামে পরিচিত। ব্রহ্মদেশে এর নাম এন গা-দি লোক। অবশ্য টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস বা জামবেসিতেও এর নাম ইলিশ। শুনেছি বিশ্বযুদ্ধের পর গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশ খেয়ে মুগ্ধ ব্রিটিশ সেনারা ফেয়ার ওয়েল প্যারেডের আগেই প্রত্যেকেই দু'চার প্যাকেট শুকনো ইলিশ সঙ্গের ব্যাগে ঢুকিয়েছিল, পাছে নিতে ভুলে যায় ভেবে। এবং শোনা যায় সে সময় থেকেই শুকনো নোনতা ইলিশের চলন ব্যাপক হয়। পদ্মা ও গঙ্গার ইলিশের মধ্যে চেহারাগত কোন পার্থক্য নেই। তবে সাধারণ পদ্মার ইলিশের গায়ে গোলাপী আভা এবং গঙ্গার ইলিশের গায়ে থাকে সোনালী আভা।

ভারতের ইলিশ এলাকা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশ। বোম্বে থেকে আসে একটু কালো রঙের ইলিশ—যাকে অনেকেই 'মুখপোড়া' ইলিশ নাম দিয়েছে, মুখের অংশটা বেশি কালো বলে। গায়ে কাঁটা বেশি— স্বাদও ইলিশের মত নয়। উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা, গোমতী, যমুনা ও চম্বল, পশ্চিম উপকূলের নর্মদা, উলাস, মালাবার ও সিন্ধু নদে ইলিশের ছড়াছড়ি। বিহারের বকসার, ধুলিয়ান বা রাজমহলের ইলিশ, ওড়িশার চিলকা, বালেশ্বর, ছত্রপুর থেকে কলকাতার বাজারে প্রায় নিয়মিত ইলিশ আসে। আর আসে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণা, গোদাবরী ও কাবেরীর ইলিশ। তবে তারা নামেই ইলিশ, স্বাদে গন্ধে নয়।

দেশ বিভাগের পর ইলিশ অঞ্চলের বিরাট এলাকা পড়েছে বাংলা দেশে। স্বাদ ও গন্ধে পদ্মার ইলিশ প্রায় গঙ্গার ইলিশের সমকক্ষ। পদ্মা ছাড়া মেঘনা ও যমুনায়ও ইলিশের ছড়াছড়ি। ছোটখাটো নদীগুলির মধ্যে বরিশালের তেতুলিয়া, কাজলিয়া, যশোহরের মধুমতী, ময়মনসিংহের ধনু, কালি নদী, বাকেরগঞ্জ, ভৈরব বালেশ্বর, শ্রীহট্টের সুর্মা, রাজশাহীর মহানন্দা, চট্টগ্রামের মেঘনা, কর্ণফুলী,

বাংলার গৌরব এই ইলিশ আমাদের নদী মোহনা আর সমুদ্র থেকে ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে

পদ্মানদীর হয়রাসাগর, ফরিদপুরের মধুমতী, কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে ওঠে প্রচুর ইলিশ। তবে এসব নদী থেকেও ক্রমশ ইলিশ কমে আসছে। কমছে স্বাদ-গন্ধ চেহারা চেকনাই।

ইলিশের কদর কি শুধু এর স্বাদের জন্যই? বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—ইলিশের দেহে তেল ও চর্বির ভাগ বেশি থাকার জন্যেই এত সমাদর এর। সেজন্যই এত এর স্বাদ ও গন্ধ। খাদ্যগুণও আছে যথেষ্ট। প্রচুর ভিটামিন 'এ' ছাড়াও আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন আর আছে আয়রন। ইলিশ মাছ খেয়ে সহ্য করতে পারলে এ মাছ শরীরের কফ ও বায়ু নষ্ট করে এবং গোটা পাকস্থলীকে সহজে সক্রিয় করে তোলে।

বর্ষা পড়লেই বাংলা ও ওড়িশার উপকূলের বড় ইলিশ জলের উজান বেয়ে নদীতে উঠতে থাকে ডিম ছাড়ার জন্য। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের হাজার মুখ দিয়ে জলের তোড় ভেঙে ইলিশ উপরের নদীতে উঠতে থাকে ঝাঁক বেঁধে। আষাঢ়-শ্রাবণের প্রবল বর্ষায় প্রচণ্ডবেগে জল গঙ্গার বিভিন্ন খাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়তে শুরু করে। পাহাড়ী ঝরনা ও বৃষ্টির জল পড়ে সমুদ্রের নোনা জল মিষ্টি হতে থাকে। এত প্রবল জলের বন্যা আসে যে চট্টগ্রাম শহর এলাকার সমুদ্রের জল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠে। এ গ্রহে অন্য কোন সমুদ্র এভাবে নদীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইলিশ মাছ খুব মোহনা ও খাড়িপ্রিয়। কাজেই এই উপসাগর এলাকায় এদের গতিবিধি।

মূলতঃ সমুদ্রের মাছ হলেও নদীর মোহনা ও খাড়ির কাছাকাছি ঘোরাফেরা এদের খুব পছন্দ। আর স্রোতের উজান বেয়ে চলা এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্ষাকালই ইলিশের ডিম পাড়ার উপযুক্ত সময়। তবে দেখা গেছে সারা বছরই ইলিশ ডিম ছাড়ে তবে বর্ষাকালের মত ব্যাপক ভাবে নয়। এদের গতিবিধি সাধারণত জলের দু তিন ফুট নিচ দিয়ে। আর স্রোত যদি খুব তীব্র থাকে তবে আরো নীচে নেমে যায়। নদীর মোহনা বা খাড়ি দিয়ে উজান বেয়ে অনেক দূরে উঠে নদীতে স্রোতের টানহীন কোন থমথমে স্থানে স্ত্রী ইলিশ ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ ইলিশ সেই ডিমে মিলন ঘটায়। ঐ পরিবেশে ডিম থেকে চারা পোনা হবার পর প্রায় মাস খানেক থেকে বড় হয়ে নদীর স্রোতের টানের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। এসময় অন্যান্য অনেক মাছের মত ঝাঁক বেঁধে মা ইলিশের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। এবং এক সময় প্রবল স্রোতের সঙ্গে নদীর নালা বা মোহনা বেয়ে সমুদ্রে হাজির হয়। নদীর মিষ্টি জল থেকে সমুদ্রের নোনা জলে পৌঁছে এদের শারীরিক অনেক পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে বছর দুই সমুদ্রের বিরাট পরিধির মধ্যে কাটিয়ে অধিকাংশ ইলিশই আবার বর্ষার শুরুতে উজান বেয়ে নদীতে তাদের জন্মস্থানে ফিরে আসে। হুগলী নদী দিয়ে আট নশো মাইল এভাবে উজান বেয়ে উঠতে দেখা গেছে ইলিশকে।

অনেক ইলিশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন ইলিশের গতিবিধি গভীর সমুদ্রেই বেশি। তবে পাড় থেকে মাত্র ছয় সাত মাইল দূরে থাকে। খুব একটা তীরের কাছাকাছি ঘেঁসে না। ডঃ সুন্দর লাল হোরা প্রায় সারা জীবন ধরেই ইলিশের জীবনের গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ইলিশ খুব গভীর সমুদ্রের মাছ নয়। কারণ প্রথম বয়সে ইলিশ নদীর যেখানে খাদ্য পায় সেখানে ঘোরাফেরা করে, তারপর আসে নদীর মোহনায় বা খাড়িতে। তার জন্য শীতকালে বেশি 'খোকা ইলিশ' ধরা পড়ে। এ সময় খাড়ির কাছাকাছি শান্ত সমুদ্রে জেলেরা ইলিশ ধরতে শুরু করে। এমনকি

'ছার্কান' জালে ইলিশ ধরার চেষ্টা।

ডঃ হোরা লক্ষ্য করেছেন শ্রাবণে প্রবল বর্ষা শুরু হলেও জেলেরা খুব কাছাকাছি জাল পেতে মাছ ধরে।

ডঃ হোরার সমীক্ষা অনুসারে ইলিশের প্রাচুর্য দেখা দেয় প্রতি দশ বছরে মাত্র দুবার। সাধারণত প্রায় পাঁচ বছর অন্তর। ইলিশের জন্মচক্র নাকি এভাবেই আবর্তিত হয়। এইতো সেদিন ১৯৭১ সালের কথা। মাতলা নদীর জল রুপোলী ইলিশে ভরে গিয়েছিল। লোকে বলেছে মাতলার জল মাছ সমান সমান। রোজ খান চল্লিশ চাউশ লরি সেই মাছ কলকাতায় পার করতে হিমসিম খেয়েছিল। আর ১৯৩৯ সাল তো আন্তর্জাতিক ইলিশ বছর। সেবার সব ইলিশ মাছ কলকাতা ও তার পাশের বাজারগুলিতে চালান দিতে না পেরে মাটিতে পুঁতে দিতে হয়েছিল। বাংলার মানুষ সেবার আয়াখেয়া করে ইলিশ মাছ খেয়েছিল। তারপর থেকেই ইলিশ নদী সমুদ্রে ডুমুরের ফুল হতে বসেছে। প্রতি পাঁচ বছরের হিসাবে ১৯৭৬ সাল আবার ইলিশের বামপার ইয়ার। ডঃ সুন্দরলাল হোরার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ১৯৩৯ সালের ইলিশ শুধু সংখ্যায়ই বেশি ধরা পড়েনি, তাদের চেহারার চেকনাই, গা-গতর, ওজন ও আকারেও আন্তর্জাতিকতার মান বজায় ছিল। এদের আকারের বৈচিত্র্য লক্ষনীয়। সংখ্যায় পাঁচ বছর বয়সের ইলিশই ছিল বেশি। বেশ কিছুর বয়স ছ' বছর। শতকরা পাঁচ ভাগ ছিল সাত বছরের। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঐ বছর আট বছর বয়সের ইলিশও উঠে ছিল বেশ কয়েকটি। ভাবা যায় না যে কিভাবে এইসব মহাশয় প্রবীণ ইলিশরা জেলেদের সবরকম দক্ষতাকে 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' দেখিয়ে ও মানুষের লোভ এবং বাধা বিপত্তিকে কলা দেখিয়ে এত বড় দীর্ঘ জীবন যাপন করেছে। অথচ ইলিশের গড় জীবন মাত্র আট মাস।

এই রয়েল বেঙ্গল ইলিশ কিন্তু আমাদের নদী, মোহনা এবং সমুদ্র থেকে ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে। এ রকম ভাবে চললে বাঙলার গৌরব এই মাছটি আমাদের জীবন থেকে প্রায় অদৃশ্য হবে। কারণ হিসাবে ইলিশ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের নদী উপত্যকায় ঘন ঘন বাঁধ দেওয়ায়, ইলিশের গতিবিধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া যে উজান বেয়ে ইলিশ নদীতে আসবে সেই উজানে ভাটা পড়েছে। এইসব প্রতিবন্ধকতার ফলে ইলিশ সমুদ্রের নোনা জল ছেড়ে নদীর মিষ্টি জলে ডিম ছাড়তে যে পরিবেশে এসে জমায়েত হত সে পরিবেশও নদী থেকে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকতার দরুন অনেক মাছ বাধা পেয়ে বাঁধের কাছে জমায়েত হয়। জেলেরাও সহজেই এসব স্থানের ইলিশকে তাদের জালে কব্জা করতে সুযোগ পায়। এভাবে ইলিশের বংশ বৃদ্ধিতে ভাটা পড়ে। এজন্য কোন কোন বাঁধে ইলিশ অতিক্রম করার ব্যবস্থা থাকলেও তাতে বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। সুতরাং বাঁধের দু তিন মাইলের মধ্যেই কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে। তাতেও খুব একটা সুবিধা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ কে কে নায়ার এ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের জন্য দুটি প্রস্তাব দিয়েছেন: বাঁধের কাছাকাছি এলাকায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা ও কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করা। এবং ইলিশ তদন্ত কমিশনের প্রাক্তন সদস্য মিঃ পিল্লে পরামর্শ দিয়েছেন যে পুকুরে এমনকি পশ্চিমবঙ্গের স্রোতময় ভেড়ি এলাকাতেও ইলিশের কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইলিশের উপর সমবেত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ১৯৫২ সালে কলকাতায় ৪ থেকে ৬ সেপটেম্বর তিন দিনের হিলসা সাব কমিটির যে সেমিনার হয়েছিল তাতে প্রায় প্রতিটি সদস্যই বংশলোপ ও এর উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার উপর জোর দেন। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানা গেছে যে পুকুরে বা বড় জলাশয়ে ইলিশ চাষ নিয়ে গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে।

গঙ্গায় ইলিশের প্রাচুর্য কমে [illegible] অন্যতম প্রধান কারণ গঙ্গায় দূষণকর কারখানার জল পড়ে জলদূষিত হয়ে [illegible] যার জন্য ইলিশের কাছে এ অঞ্চল [illegible] হয়ে পড়ছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে কাগজ, বস্ত্র, পাট, চামড়া, রবার, রং, প্লাস্টিক, রাসায়নিক ও ঔষধপত্রের কারখানা থেকে নির্গত ময়লায় জল দূষিত হচ্ছে। এছাড়া গঙ্গার জলে উত্তাপ, পঙ্কিলভাব এবং পলি মৎস্য-জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীর জলের

[illegible] ইলিশটিও লক্ষণীয়। কারণ, [illegible] কতটা রাসায়নিক মাত্রা গ্রহণ করতে পারে ও মাছ তা কতটা সহ্য করতে পারে তা দেখার প্রয়োজন। এইসব দূষিত উপাদানের মধ্যে আছে কারবন ডাই-অক্সাইড, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তেল এবং আরো অনেক জিনিস যা জলজ জীবনের পক্ষে মৃত্যু। এছাড়া গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল আবর্জনা নদীতে ইলিশ মাছের জলজ খাদ্যকেও দূষিত করে তোলে। এবং এসব আবর্জনা ও কারখানা নির্গত ময়লা ইলিশের ডিম ছাড়ার পরিবেশ অঞ্চলকেও দূষিত করে তোলে। ফলে ইলিশ ডিম ছাড়তে বাধা পায়। আর অনবরত ময়লা ও জঞ্জাল জমে নদী ভূমি হয় উঁচু ও সংকীর্ণ। এসব কারণে উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হয়। খাদ্যাভাব কম মাছ সমাবেশের অন্যতম কারণ। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে খাড়ি সন্নিহিত নদী-গর্ভে প্রতিদিন প্রায় ২৫ কোটি গ্যালন তরল অব্যবহার্য ময়লা পড়ে। ব্যাপারটা কত ভয়াবহ ভেবে দেখার মত।

ইলিশ কেন নদীমুখীন হচ্ছে না বিশেষজ্ঞরা তার একটি অন্যতম কারণ বাতলেছেন এই বলে যে নদীর খাড়িমুখ ক্রমশঃ বুজে আসছে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিম-বঙ্গে ইলিশ ধরা পড়েছিল বারোশো টন আর ১৯৭৩-এ ধরা পড়েছে মাত্র দেড়শো টন। অথচ এই দশ বছরে জেলের সংখ্যা বেড়েছে আট গুণ। গড় হিসেবে প্রত্যেকের জালে পড়ছে মাত্র দেড় কেজি মাছ। এছাড়া কেউ কেউ বলছেন মোহনায় পলি জমে চড়া পড়েছে। নদী ও খাড়িগুলিতে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়ায় ইলিশ মাছ ডিম ছাড়তে পারছে না সেখানে। বছরের [illegible]ময় মাছ ধরা চলায় মাছেরাও বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে না। এমনকি ডিম ছাড়ার সময় পর্যন্ত মাছ ধরার বিরতি নেই। প্রায় সারা বছরই যেন নদী-সমুদ্র জেলে নৌকায় থিকথিক করছে। পূব বাংলা থেকে প্রচুর ইলশা-জেলে আসায় গঙ্গায় প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। এছাড়া অন্যান্য মাছের অভাব, পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি, পাইকার ফড়েদের কারসাজি, ইলিশের পাঁচ বছর উৎপাদন চক্র ও খুচরো দোকানদারদের সংখ্যা বৃদ্ধিও ইলিশের দর বাড়ার অন্যতম কারণ।

সম্ভবত ইলিশের বংশ রক্ষায় সাহায্যের জন্যই আগে বাঙালী হিন্দুদের ঘরে বিজয়া দশমী থেকে শ্রীপঞ্চমী পর্যন্ত ইলিশ ঘরে আনা ও খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অবিভক্ত বাংলায় বিশেষ করে পূব বাংলায় কয়েকটি জেলার হিন্দুরা ইলিশ মাছকে আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গেও এ প্রথা চালু আছে তবে ততটা ব্যাপক নয়। যার জন্য ঐ ক'-মাস জেলেরাও নদীতে ইলিশ ধরত না। প্রায় চার মাসে ইলিশ অনায়াসেই বড় হতে পারতো। সরস্বতী পুজার দিন ছিল ইলিশ বরণের পালা। ছোটবেলায় দেখেছি বাবা ঐ দিন দাঁড়িতে ঝুলিয়ে জোড়া ইলিশ নিয়ে এসেছেন। মা ও অন্যান্য এয়োতিরা তখন ইলিশের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে নোড়া, ধান, দুর্বা, শুকনো পাটপাতা, আম্র-পল্লবসহ কুলায় করে বরণ করে হুলুধ্বনিসহ ঐ ইলিশ ঘরে নিলেন। মাছ কুটে আঁশ, কাঁটা মাটির দলায় পাকিয়ে পাটাতনে রেখে দেওয়া হয় এবং একবছর পরে জলে ফেলে দেওয়া হয়। কোথায়ও দেখেছি আঁশগুলোকে ঘরের খুঁটির গোড়ায় বা অন্য কোথায়ও মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পরে এ মাছ না ভেজে বিনা তেলে রান্না করা হয়। এ অনুষ্ঠান আজও আমাদের বাড়িতে হয়। এরকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে বর্ষার চার মাস যে ইলিশ মাছ খাবে না—সে গৌরব, দীর্ঘ-জীবন, যশ ও প্রতিপত্তি এই চার শক্তির অধিকারী হবে। তাছাড়া সদ্য ডিম ছাড়া ইলিশ বা জাটকা ইলিশের স্বাদ কম বলে অনেকেই এসময় এদের খায় না।

১৯৫১ সালে এক সমীক্ষায় ডঃ হোরা দেখেছেন ঐ বছর কলকাতার বিভিন্ন বাজারে গড়ে রোজ ১২ শ' টন ইলিশ আসতো শুধু সুন্দরবন এলাকা থেকেই। এসবের অধিকাংশই ধরা পড়ত মাতলা, চিংড়িখালি, গেঁয়োখালি, কুলপি, হেরোখালি ও ক্যানিং এলাকা থেকে। তাঁর মতে গঙ্গা, পদ্মা ও চিলতার জল স্বাদযুক্ত ইলিশ বসবাসের উপযুক্ত। এবং এসব এলাকায় ভাল জাতের ইলিশের পরিবর্তে অন্যজাতের বাজে ইলিশের অনুপ্রবেশ ঘটছে। হাওড়ার ইলিশ মাছের পাইকারি হাট থেকে পাওয়া হিসাবে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইলিশের মণ প্রতি দাম ছিল ৭০ টাকা। ওটাই ও বছরের সবচেয়ে বেশি দাম। সবচেয়ে কম দাম ছিল নবেম্বর মাসে ২৫ টাকা মণ। ১৯৪৮ সালের আগস্টে দাম ওঠে ১৩৫ টাকা এবং সব চেয়ে কম ছিল জুন মাসে ৪০ টাকা মণ। ১৯৫২ সালের জুলাইতে ৯০ টাকায় মণ ওঠে এবং কমে ডিসেম্বরে দাঁড়ায় ৪০ টাকা। তারপর থেকে ইলিশের আকাল শুরু হয় এবং দর বাড়ে। রূপনারায়ণ বা সুন্দরবন এলাকায় দক্ষ ইলশা-জেলের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। ইলিশের অভাব জেলেদের অর্থনৈতিক সঙ্কট-এর অন্যতম কারণ।

আজকাল ইলিশ মাছ ধরতে অন্তত ১৪ রকমের জাল ব্যবহৃত হয়। অবশ্য জাল ব্যবহার নির্ভর করে জেলের অর্থনৈতিক অবস্থা, জলের গভীরতা, স্রোতের জোর, ইত্যাদির ওপর। কলকাতা ও তার আশপাশের নদীসমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের জালের মধ্যে বেড় জাল, টানা জাল, কোনা জাল, পাতন জাল, দাঁড়া বা ইলশা জাল, ছাদি জাল, ছাঁকনি, হর, [illegible], ভেশাল, সাংলা জাল উল্লেখযোগ্য। তবে এর সব-গুলিই ইলিশ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় না।

জেলেদের মতে জলে ইলিশের প্রচণ্ড তেজ। তবে সূর্যের মুখ দেখলেই কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। নৌকায় তোলার পর খুব কম ইলিশই পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচে। অধিকাংশ ইলিশই জালের মধ্যেই মারা পড়ে। জলে প্রচণ্ড গতিতে এরা চলতে পারে। ঘণ্টায় ১৫ মাইল গড়ে এদের দৌড়ের গতিবেগ।

পর্যবেক্ষকরা বলেছেন বর্ষাকালই ইলিশ ধরার শ্রেষ্ঠ মরসুম। দীর্ঘক্ষণ মেঘলার পর বজ্রবিদ্যুৎসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়লে ইলিশ মাছ দলে দলে ঝাঁক বেঁধে নদী বা সমুদ্রে আনন্দে আত্মহারা হয়ে জলের উপরের দিকে এমনভাবে চলাফেরা করে যে জেলেরা অনায়াসেই মাছের গতিবিধি ধরতে পারে এবং জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে। এই পরিবেশের কথাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ইলশে গুঁড়ি' কবিতায় লিখেছেন—

> ইলশে গুঁড়ির নাচ।
> ইলশে গুঁড়ির নাচন দেখে
> নাচছে ইলিশ মাছ।
> কেউবা নাচে জলের তলায়
> ল্যাজ তুলে কেউ ডিগবাজী খায়;
> নদীতে তাই। জাল নিয়ে আয়
> পুকুরে ছিপছাপ।

শীতকালেও ইলিশ ধরা পড়ে বেশি। তবে তা অধিকাংশই সমুদ্র খাঁড়ি এলাকায় ও বেশির ভাগই 'খোকা' ইলিশ।

গত শীতে দীঘা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার এই বিরাট এলাকায় ইলিশ ধরার ধূম পড়ে গিয়েছিল। এসময় ৪০টি বেসরকারি লঞ্চ ও হাজার খানেক নৌকা সমুদ্রের ভিতর ১০ মাইল দূরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গত কয়েক বছর ধরে ইলিশের বাসস্থান সমুদ্রের তীর থেকে ৫০।৬০ মাইল দূরে সরে গেছে। এজন্য দরকার আরো লঞ্চ ও মোটরবোট। লঞ্চ চড়েই সমুদ্রের ভিতরে অনেক দূরে গিয়েছিলাম মাছধরা দেখতে। দীঘা থেকে মাইল চল্লিশ দূরে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম। একটি লঞ্চ ঘিরে ১০ খানা জেলে নৌকা জাল ফেলে চুপচাপ। হঠাৎ জলে একটা চাঞ্চল্য দেখে জেলেরা নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে হালকা লম্বা বাঁশ দিয়ে জলে পেটাতে শুরু করল। বাঁশ দিয়ে জালের দিকে ইলিশগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে জাল টেনে তুলতেই দেখি হাজার খানেক হীরের টুকরো ইলিশ।
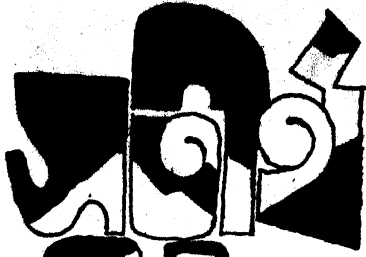
॥ ৩১ ॥

দু তিন দিন পরে মণিকা সুতীর্থকে বল্লে, 'তোমার কোনো সুবিধে হত তোমার সঙ্গে আমি মুখুয্যের বাড়ি গেলে?'

'মনের এরকম অবস্থা নিয়ে তুমি ওসব জায়গায় যেওনা।'

'মনকে আমি তৈরি করে নিতে পারি।'

সুতীর্থ কাজে ব্যস্ত ছিল, বল্লে, 'আচ্ছা, আরেক সময়ে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে।'

পরদিন মণিকা বল্লে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'ছেড়ে দিয়েছি, বলেছিই তো তোমাকে।'

'আর এটা?'

'স্ট্রাইক? হামিদের হাতে ছেড়ে দেব।'

'তারপর কি করবে তুমি?'

'কিছু টাকা হাতে আছে—কয়েকদিন লিখব পড়ব, ঘুরে বেড়াব, চিন্তা করব। এক সময় আমি আদি গ্রীকদের লেখা খুব পড়তুম আর আমাদের দেশের জীবন মনীষীদের; পড়তে হবে আবার এই সব। আজকাল অনেক নতুন বই বেরুচ্ছে: দেখব কিছু কিছু নেড়ে চেড়ে; ফ্রয়েড ওপর ওপর পড়েছি, মার্ক্স দেখেছি, ফরাসী শিখছিলুম, বোদেলেয়র, ভিয়োঁ, প্রুস্ত, ভেরলেন ফরাসীতে পড়া দরকার। অনেক দিন হয় দেশ ছেড়ে দিয়েছি, কিছু লিখব।'

'তোমার লেখা পড়িনি আমি কোনো-দিন।'

'পুরনো পাণ্ডুলিপি হাতের কাছে কিছু নেই। নতুন কিছু লিখলে শোনাব তোমাকে।'

'কোথায় যাচ্ছ? বেরুবার যোগাড় করছ বুঝি?'

'বেলগাছিয়ায় যেতে হবে: ক্ষেমেশ চৌধুরীর কাছে।'

'কে কে?'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল; সোফার হাতলের ওপর বসে বললে, 'বিরূপাক্ষ আর আসেনি এখানে?'

'এলেও পারত। আমি নিষেধ করিনি।'

'না এলেই তো ভালো হত।'

'সেটা যেদিন সে বুঝবে সেদিন আসবে না।'

'বুঝবে কি?'

'ও বুঝে ফেলেছে, সেই জন্যেই ভিড়ছে না আর। আসবে না আর। আমার কথাবার্তা হাবভাব মিষ্টি চারের মত জলের ভেতর ঝরে পড়েছিল। ও তো বোয়াল—গন্ধে গন্ধে টোপ খেতে এসে দেখল হ্যাঁচকা খাওয়ার মত কিছু নেই—মৃত্যু ছাড়া খাদ্য নেই—কেঁচোটা বঁড়শিতে গাঁথা।'

'কেঁচো কে?'

'ও যা চাচ্ছিল সেটা।'

'ও জিনিসকে ভিয়োঁ কেঁচো বলে না।' সুতীর্থ একটু হেসে বললে।

'ভিয়োঁ কে?'

'একজন ফরাসী কবি।'

'ফরাসী কবিদের পড়া নেই আমার।'

'পড়লে পারতে ভিয়োঁ অবিশ্যি যদি ফরাসী জানতে।'

'তুমি তো কেঁচো মনে কর?'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো উত্তর দিল না।

চুরুট নামিয়ে বললে, 'সেই দশ-বারো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি যেন আবার—সেই গ্রীকদের, ফরাসীদের আমলের সেই নাবিকে, ও তার পরের সময়ের মনীষীদের, এই সেদিনকার বাংলার পটের আমলের পৃথিবীতেও—কিন্তু আগের চেয়ে খানিকটা বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার মনের একগুঁয়েমি—প্রাণের সেই এখন আর—মনটা জল, চিলের ডানা, আগুনের মত

হয়ে উঠেছে। মনের আগেকার সে বিপত্তি।'

'তুমি তো কেঁচো মনে কর জিনিসটাকে।'

'তা করি।' সুতীর্থ বললে।

'বিরূপাক্ষ টোপ খেতে এসে দেখল কেঁচোটা বড়শীতে গাঁথা। ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে কানকো কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে জল গিলে বুড়বুড়ি কেটে উপুড় চিত ফলিকাত প্যাঁচ কষে যখন দেখল কোনো ফয়সালা নেই, তখন ভুস করে বারো বাঁও জলে ডুব দিয়ে গেল বোয়ালটা।'

'এত বেশি জল ওর পৃথিবীতে?'

'বেশি টাকায় বেশি জল, বেশি তেল, বেশি হাঁসফাঁস; ও এক আশ্চর্য নিদেন পৃথিবীতে থাকে।'

'বিরূপাক্ষের স্ত্রী কোথায় গেছে? নিজেই তো বলছিল যে ছেড়ে গেছে না যাচ্ছে?'

'ক্ষেমেশ চৌধুরীর ওখানে আছে। বিরূপাক্ষ কাকে বিয়ে করেছে আমি জানতুম না। ক্ষেমেশ বললে জয়তীকে বিয়ে করেছে।'

সুতীর্থ চুরুটে দু-তিনটে টান দিয়ে বললে, 'আমি জয়তীকে চিনি।'

'বেলগাছিয়া থেকে কখন ফিরবে?'

'রাত হয়ে যাবে। নাও ফিরতে পারি।'

'তোমার ঘর সংসারের জন্যে একটা চাকর জোগাড় করবে না?'

'আমি টাকা দেব—আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোমাদের সঙ্গেই হোক।'

'কত দেবে?'

'যা চাও।'

'আজ রাতে ফিরবে? ফেরবার সময় একটা চেক আনতে পারবে?'

'কত টাকার।'

'চেক বই তো এখানেই আছে তোমার? ক্যাশ আনলেই ভালো হয়।'

সুতীর্থ একটু ভেবে বললে, 'এক্ষুনি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি তোমাকে।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলছিল; মণিকা বললে, 'এত টাকা পেলে কোথায়? ঘড়ি বিক্রি করে?'

'আমার উপায়ের কি অন্ত আছে? কাল আর পাঁচশো টাকা দেব।' টাকাগুলো হাতে নিয়ে মণিকা বললে, 'কিন্তু ওদের ছেলেপুলেদের জেনানাদের কি ব্যবস্থা হবে?'

'এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাব না।'

'গয়ানাথ মালোকে যে মেরেছে সে তোমাকেও মেরেছে বটে।'

'হামিদ ইয়াসিন সত্যকিঙ্কর বিশ্বনাথ—লোক ঢের ভিড়ে গেছে ওদিকে। আমি কিছুদিন আত্মবিচারের—'

'আত্মবিচার—' মণিকা নদীর জলে কলকল জলপাই পড়ার মতো এক ধরনের শব্দে হেসে বললে, 'ওটা বোধ হয় মনের অগোচরে পাপ—নাকি ধর্ম সুতীর্থ—অনেক দিন ধরে বাঙালীর ছেলেদের? তাহলে মুখুয্যেই জিতল! কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে?'

'সবই ক্যাশ বাক্সে আছে—খুলে দেখ।'

'আমাকে যে পাঁচ শো টাকা দিলে তাও তো ঘুষের টাকা?'

সিদ্ধার্থের মত গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় মাথা নেড়ে সারিপুত্রকে যেন বললে, 'না না, ও আলাদা টাকা।'

'কেন ঘুষ দিয়েছে তোমাকে? কেন ঘুষ খেলে?'

সুতীর্থ নেবা নেবা চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? তোমাকে তো যেতে হচ্ছে না মুখার্জি সাহেবের ডিনারে।'

'কত টাকা দিয়েছে আপাতত?'

'পাঁচ হাজার। এ টাকার সঙ্গে তোমার যাওয়া-আসার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার কথা মুখার্জি কোনদিন বলেওনি আমাকে।'

'আমরা ভাবুকরা' সুতীর্থ বললে, 'কাজের মানুষদের মত সোজা মোটা পথে চলতে পারি না। এই স্টাইকের ব্যাপারটা হাতে নিয়ে তোমাকেও জড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলুম: থাকতে তুমি আমার সংগ্রামটাকে ঘিরে। কিন্তু মসলিন যারা তৈরি করত, যে সব রূপসীরা তা পারত কেউই অশুদ্ধ নয়—যাদের চোখ টাটাত সেই লোকগুলো ছাড়া। হয়তো আমাদের পৃথিবীই খারাপ—কোনো চিন্তা বা কাজের মিহি মসলিন জমিন এখানে স্বাভাবিক নয় তাই ভালো নয়, ঠিক নয়।'

মণিকা সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু কথার দিকে নয়,

কোনো কথা শুনেছে, বলে মনে হল না।

'কি হিসেবে ভাঙল স্ট্রাইক?'

'ভাঙেনি এখনও। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুখার্জি আমাকে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুতীর্থ সোফায় বসেছিল উঠে গেল, চুরুট টানতে টানতে ফিরে এসে বললে, 'কোনটা চাকরির টাকা, কোনটা ব্যবসার আর কোনটাই বা ঘুষের সেকালের মানুষেরা টাকার উপর একটা পাঁচনের বাড়ি মেরে সেটা ঠিক করে নিতে পারতেন। ঘুষের টাকাটা সরিয়ে রাখতেন তাঁরা মদ, মালাই ইত্যাদি সাঁইত্রিশ রকম মাধুরীর জন্যে। সে পাঁচন এখনও আমাদের আছে, কিন্তু পাঁচন দিয়ে টাকার ওপর বাড়ি মারলে পাঁচন বলে যে সব টাকা ঘুষের আর জোচ্চোরির—এবং সব টাকা; রসের মালপো হবে—দেশ দশের পাল চরানো হবে এ টাকা দিয়ে; ইস্কুল-কলেজ সাহিত্য জ্ঞান জিজ্ঞাসা নিরীক্ষা—ও সব কোনো জিনিসই হবে না। ও সব জিনিস হয়ে গেছে—আর হবে না। এখন থেকে টাকা হবে শুধু—না হলে মানুষের মৃত্যু হবে।'

'সে টাকাটা নিলে তুমি?' মণিকা বললে। 'ঘুষ হিসেবে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঘুষ ছাড়া টাকার চলাচল নেই; আজ কেউ কাউকে টাকা নিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয় মণিকা?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?

'বেলগাছিয়ায়।'

খুব আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বললে মণিকা মিনিট চারেক; তারপর গলা খাকরি দিয়ে সহজ গলায় বলতে আরম্ভ করল। শুনে সুতীর্থ সাবধান হয়ে বললে, 'ওঃ—'

'কখন কি হয় বলা যেতে পারে না।'

'আমাকে আগে বলনি কেন তুমি?'

'না, না, এখন তখন কিছু নয়, তবে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের থাকা দরকার।'

সুতীর্থের চুরুট নিবে গিয়েছিল। জানালার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল; মাঘ শেষ হয়ে যাচ্ছে; অনেক দূরে বুঝি পাড়াগাঁর পানবন খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ বেরঙের পালক কলমী কাঞ্চন নতুন দুধ সোনামণি শরৎকালের ফুল চারদিককার চাঁদাকাঁটা কেয়াকাঁটা দল ঘাসের জল উজ্জ্বল করে উড়ে যাচ্ছে নীলের থেকে নীলের দিকে, রোদের থেকে মেঘের কণা-কণিকার উজ্জ্বলতা ভেদ করে কোন দিগন্তের মাতৃগণের দিকে ফাল্গুনের বাতাস। এদিকে ট্রাম লাইন চকচক করে উঠছে, কোনো ট্রাম নেই, ফুটপাথে চীৎকার করে উঠছে গাধাটা; গায় তার একজন ইমানদার নেতার নাম চক দিয়ে লিখে গিয়েছে কে যেন, রাস্তায় জিলিপি কচুরি ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছেলেটার ঠোঙায় চিলে ছোঁ মেরে গেছে বলে, সামনের লাল রঙের বাড়িটার ছাদে সাদা সাদা জামা কাপড় উড়ে পড়ছে; ছাদের দড়িতে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সব, ইলেকট্রিক তার কাঁপছে, পাশের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল, কি একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা আছে যেন; ঘোড়েল নেতাটির নাম পিঠে আঁকিয়ে গাধাটা হাঁকডাকছে আবার, যেন নামটা মুছে না দিলে বেচারী কাঁকিয়ে কূল পাবে না আর। বেঘোর হুল্লোড়ে ফাল্গুনের বাতাস উড়ে এসে পড়ছে মণিকার চোখে চুলে, সুতীর্থের দেশলাইয়ের আগুনে, যে ট্রামটা হুস করে ছুটে গেল তার আগে ছুটে কোথায় উধাও হয়ে চলে গেল—থেমে গেল বাতাস। পর-মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল তার দেশলাইয়ে শুধু একটা কাঠি আছে। ঘরের দরজা জানালা সবই বন্ধ করে দিতে লাগল সে তাই।

চোখ বুজে কুমারী মেয়ের ধ্যানের মত শান্তিতে বসেছিল মণিকা। শীত প্রথম যখন আসে দেশে তেমনই একটা আশা আমেজ চমকিত ভাবে টের পাওয়া যায় শীত প্রথম যখন ছেড়ে যায় দেশ থেকে।

অন্ধকারের ভেতর দেশলাইটা জ্বলে উঠল সুতীর্থের; আগুনের ধুকে লাল হয়ে উঠতে লাগল চুরুটের মুখ। ভালো করে চুরুট জ্বলে উঠলে দরজা জানালা খুলে দিতে দিতে সুতীর্থ বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল ঘুমোচ্ছ।'

মণিকা যেন স্বর্গের থেকে হারিয়ে স্বর্গে ফিরে এসেছে আবার, এমনই চোখে সুতীর্থের দিকে একবার তাকিয়েই ওপরে চলে গেল।

নাঃ, বেলগাছিয়ায় যাওয়া হবে না আজ আর। সুতীর্থ ঘণ্টাখানেক পরে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই নিয়ে বসল, তারপরে একটা ইকনমিকসের—একটা উপন্যাস টেনে নিল—একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করল—কিন্তু কাকে?

একটা দীর্ঘ কবিতা ফেঁদে বসল—কিন্তু কেন?—ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুই হল না তার।

স্ট্রাইক অনেক দূরে কাঁদছিল। মণিকা তেতলার ঘরে নাক ডাকাচ্ছিল।

কয়েকদিন পরে ক্ষেমেশের বেলগাছিয়ার বাড়িতে আকাশে বাতাসে পাখির পালকে সকালবেলার রোদ এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সুতীর্থ গিয়ে পৌঁছল।

'এই যে তুমি এসেছ সুতীর্থ—বোস—'

'আমি তোমার চেয়ে পনেরো বছরের বড় ক্ষেমেশ—'

'তাই কি? আমি তো ভেবেছিলুম, তুমি আর আমি শিবের গুরু রাম'—ক্ষেমেশ একটু তেরচা কামিক মেরে বললে, 'রামের গুরু শিব।'

'তুমি আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকবে আমার চেয়ে এত ছোট হয়ে, তা ডেকো। আমাকে সেদিন তুমি বলেছিলে বেল-গাছিয়ার এই বাড়িতে আছ—নিরিবিলিতে—এর চেয়ে বেশি কোনো দাবি তোমার নেই,, চাকরি-বাকরি করবার দরকার নেই, অবসর আছে, রোদ পাখি মাটি ঘাসের কোলে সময় কেটে যায়; এমনি নির্লিপ্ত নিকাজের ভেতর দিয়ে যদি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়—শান্তিতে—তা হলে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার—বলেছিল—'

'এর চেয়ে বেশি সাধ কার আছে?'

'সকলেরি প্রায়—তোমার মত দু-একজন ছাড়া।'

'থাকা কি উচিত?'

সুতীর্থ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আকাশের নীল ফিকে ধূসরতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ তো থিসিয়ুসের এথেনস নয়—এমন কি পট এঁকেছিল যে খাঁশ মানুষেরা আমাদের দেশে—সে দিনও নেই। তুমি দেখছ তো কি রকম পৃথিবীতে আছ। তোমার বাবার বাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা আকাশ আলো পাখি ফড়িঙের ভেতর ঘুরে ফিরে জীবন কাটানো খারাপ নয়। খারাপ নয়, খুব ভালো। কিন্তু চারদিকের পৃথিবী এমনই বেয়াড়া যে এ রকমভাবে মৌচুষকির নীড় বানিয়ে শান্তি চর্চা করতে দেবে না তোমাকে—'

'কি করবে? নীড় ভেঙে দেবে?'

'শীগগিরই। এখুনি তো ভেঙে পড়ছে—'

'ভেঙে পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি না তো।'

'এক-আধটা পাখি থাকে, তাদের বাসার থেকে ডিম চুরি গেলে কিংবা পিছলে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলেও টের পায় না।'

'কি ভেঙে যাচ্ছে আমার?'

'এই তো আমিই এসে তোমার মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছি। আমার মতন আরো অনেকে অনেক দিন থেকে তোমার পেছনে লেগে আছে। ভবিষ্যতে আমরা সবাই মিলে এমন দল বেঁধে আসব যে এখন থেকেই নিজেকে যদি তুমি তৈরি করে না নাও বড় অঘটন হবে তোমার।'

'অঘটন? মরে যেতে হবে?'

'মরে যাওয়া সহজ জিনিস যদি শান্তিতে মরা যায়। কিন্তু খুব অশান্তিতে মরতে হবে। কত ভালো মানুষ রুশ বিপ্লবে জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মরেছে, আমরা বাঙালীরা মন্বন্তরে যাচ্ছি। খুব খারাপ। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ সব বিকট রকমের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে চারদিক থেকে। এদিকেও আসবে।'

সুতীর্থ পকেট থেকে চুরট বার করে জ্বালিয়ে নিল।

'ফেরারি যদি না হতে চাও তা হলে মানুষের ভেতর মিশে যেতে হবে তোমার, গঠন করতে হবে; একদিকে বিরূপাক্ষের মতন ভাম আর একদিকে তোমার মতন খরগোশকে দেখে নন্দনবনের পরীরা তামাশা বোধ করতে পারে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে গুলি মেরে মরতে হবে তোমাদের—'

'ভামটাকে মারা কঠিন।'

'কেন?'

'কি করে মারবে তুমি নিজেকে?'

'তা হবে। কিন্তু তুমি তো খরগোশ।'

'তা হবে। কিন্তু খুব লম্বা কান নেড়ে নেড়ে কথা বলছ তুমি আজ সকালবেলা থেকে ধোপাবাড়ির ছাঁদন দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে। তুমি তো এ রকম ছিলে না। রুচি বিকার হয়েছে তোমার; চরিত্রে বিকার দেখা দিয়েছে। আমাকে গুলি করবার কথা বলছিলে তুমি—'

'হ্যাঁ বলেছিলুম—'

'নিজের হাতে করবে?'

'দরকার হলে করব।'

'তোমার চাকর কাকে গুলি করবে?'

'আমার চাকর নেই—'

'আমার আছে। আমার কুকুরও আছে। কিন্তু আমার কুকুরও আমার গুণীমানী বন্ধুকে গুলি করতে লজ্জা বোধ করে।'

'কুকুরটা আশ্রমে থাকে বুঝি? মোহনভোগ খায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা আমাকে বলতে চায় না; তোমার কাছেও ঘেঁষবে না; কি ছিলে তুমি ওর? শুনেছি খুব মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল নাকি?'

'ও যতদিন বাচ্চা ছিল ততদিন ছিল; একটু সোমত্থ হতেই তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ক্ষেমেশ—'

নরম, স্নিগ্ধ গলায় বলছিল সুতীর্থ; গলায় আরো আন্তরিক আকুতি এসে পড়ল; সুতীর্থ বললে, 'এটা তোমার বাড়ি ছিল একদিন, এখন আমার বাড়ি। আমি যাদের থাকতে বলব এখানে তাদের বাড়ি। এখানে ছ' হাজার লোক অনায়াসেই থাকতে পারে। কলকাতার পথে ঘাটে ফুটপাথে ভাগাড়ে লেজ খসবার আগে ব্যাঙাচির মত কাতরাচ্ছে তারা। এইখানে জায়গা দিতে হবে তাদের,—সুতীর্থ বললে।

'দেখ। পুলিস কমিশনার কি বলে?'

'পুলিস কমিশনারের দোহাই দিচ্ছ?'

'দেখ। মন্ত্রীরা কি বলে—'

'মন্ত্রীরা?'—

'জনসাধারণের প্রতিনিধি তো তারা।'

'বাড়ি রেকুইজিশনের অফিসার হিসেবে আমি আসিনি ক্ষেমেশ।'

'এসেছ স্বাধীনভাবে, কিন্তু শাসন কর্তাদের ডিঙিয়ে তো কিছু করতে পারবে না। কলকাতার প্রায় সব লোকই তো আজ সাদা দাঁত কেলিয়ে ঘোড়া হয়ে গেছে—ছ্যাকড়া গাড়ির। দিন রাত ছুটছে—নাদছে—কর্পোরেশনের চামচ দিয়ে শায়েস্তা করতে পারছে কি ঘোড়ার নাদগুলো ঝাড়ুদার? কর্পোরেশন ভেঙে পড়ছে—দানা পাচ্ছে না ঘোড়াগুলো। আমার বাড়িতে তো ঢের ঘাস, কিন্তু রি-হ্যাবিলিটেশন অফিসারকে ডিঙিয়ে ঘাস পাবে সেই ঘোড়াগুলো? কই, নোলা দেখা যাচ্ছে না তো সে সব ঘোড়ার। আসুক না অফিসার সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে। আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেহাতে চলে যাব—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে চুরুটের মুখে বেশ অনেকখানি ছাই জমিয়ে ফেলেছে; চুপ করে বসেছিল সে, কোনো কথা বললে না।

'তুমি উদমহরের ঘোড়ার মত এসে দাবনা ঝাপটালে কি হবে সুতীর্থ—তোমার উমফাই ঘোড়ারা কোথায়? পথে পথে না চেঁচিয়ে না নেদে, দলঘাস আর বুটের বদলে হাওয়া না চিবিয়ে সমস্ত ঘোড়াগুলো যদি একটা নিদারুণ হ্রেষাগর্জনে জেগে উঠত, তা হলে বেছে বেছে আমাকে এসে গুলি করতে চাইতে না তুমি, কাদের গুলি খেয়ে তুমি নিজেই লাট মেরে পড়ে থাকতে ভেবে দেখেছ নিশ্চয়ই। তুমি বোকা বলেই আজ সকালবেলা আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এসে লেজ নাড়ছ। তোমার মাথায় আগে ঢের জিনিস ছিল সুতীর্থ—কিন্তু আজকাল এই রকম হয়ে যাচ্ছ? যারা কাজের মানুষ তারা অন্য জায়গায় অন্যভাবে কাজ করছে।'

'রক্ত ছাড়া বিপ্লব করতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু সে রুচি বা ওজস শক্তি এখনও লাভ করেনি তো মানুষ।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বাতাসে বাতাসে কয়েকটা পুড়ে গেল—বাতাস থেমে গেলে বললে, 'কিন্তু কিই বা হবে রক্ত বিপ্লব করে। অনেকবার তো সে সব করা হল। কিছু হল না তো। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, স্পেন চীনের বড় বড় বিপ্লব সব এল গেল—কিন্তু কোনো দিক-নিরূপণ মন পরিবর্তন হল না তো মানুষের। আরো খারাপ হল তো। এর চেয়ে আগেকার পৃথিবী ঢের ভালো ছিল ঃ লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙ যুগের চীন, অশোক চক্র, হোয়েন সঙ ফা হিয়েন শ্রীজ্ঞানের ভারত আরো আগেকার স্নিগ্ধ ভাত কাপড়ের, মিহি চেতনার মহৎ চিন্তার ভারতবর্ষ, থিসিয়ুস পেরিক্লিসের গ্রীস—মানুষ তখন পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলোতেই খেলা করত, কাজ করত, কথা ভাবত; মাটি খুঁড়ে ইঁদুর ছুঁচো শেয়াল ভোঁদড়ের মত থাকবার দরকার হয়নি তো তার মারণ শিল্পের ভয়ে।'

'হ্যাঁ, মৃত্যুশিল্পী হয়ে দাঁড়াল মানুষ, ভয়ের আকর সে শিল্প বটে সুতীর্থ, কিন্তু তবুও পরস্পরের ভয়। মারণশিল্প খারিজ করলেও মানুষকে মাটি খুঁড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে মানুষেরই ভয়ে—' ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার চুরুটটা বড্ড কড়া সুতীর্থ; অত ধোঁয়া ছেড়ো না; গাঁজা, না কি?'

'মিঠে গাঁজা; কড়া বলেই মিঠে।'

'চা খাবে?'

'দাও—নেবুর রস দিয়ে।'

'রঞ্জন এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি হয়তো। উঠলে চা হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'রঞ্জন কে?'

'আমার চাকর।'

'এত বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছে যে?'

'রাত জাগতে হয়।'

'তুমি তো একা মানুষ। অনেক রাত অব্দি জাগিয়ে রাখ চাকরকে?'

'না, তা নয়। ও রোজই প্রায় সিনেমা-থিয়েটার যায়। ন'টার শোতে যায়। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে। আমি অবিশ্যি আগেই খেয়ে নিই। ও এসে গান গায়, গাজন গায়, ডালপাতায় পিরভু কাঁপে দেখে, তারাবনের তারা দেখে রাতের আকাশে, শিন্তায়ের কথা ভাবে—'

'শিন্তাই কে?'

'ওর আছে একজন। বাঁচ বলে ও। মেয়েটা বাঙালী নয়, বেহারীও নয় ঠিক—'

'যায় তার কাছে?'

'যায়, সে আসে; প্রায়ই তো।'

ক্রমশ

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

কৃষ্ণনারায়ণ কক্কড়

কক্কড় উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক ললিতকলা আকাদমীর সদস্য। হিন্দী ভাষায় কবিতা ও নাটক লেখেন। পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারেও বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে। রুশ দেশে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯৬৮ সালে। সম্প্রতি তাঁর জলরঙের একটা প্রদর্শনী দেখলাম (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ৮—১৪ই জুলাই)।

এক হিসাবে তাঁর কাজের সুনির্বাচিত এবং স্বনির্বাচিত প্রদর্শনী। অবশ্য শুনলাম তিনি তেলরঙে ছবি আঁকেন। প্রথম দিকের কাজ ১৯৬০ সালের। প্রধানত লখনউয়ের বন্যার রূপ। এইসব ছবিতে চিত্রনির্মিতির প্রাধান্য এবং জ্যামিতিক ভাবে ভূমি বিভাজন নিয়ে ভেবেছেন। হয়তো পটের দুদিক দিয়ে দুই সারির বাড়ি একটি বিন্দুতে অদৃশ্য হয়েছে। রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে। লোক চলেছে জল ভেঙে। স্লেট বা ধূসর রঙের আকাশ আর সবকিছু কেমন ভেজা—গাছপালা, গাড়ি, মানুষ যেন সিক্ত, স্যাঁতসেঁতে। '৬০-এর বন্যার ভয়ংকরতায় কক্কড় বিচলিত হয়েছিলেন বেশ বোঝা যায়। এই ছবিগুলোতে রঙের বাহুল্য নেই। এর মধ্যে দুটো ছবি বেশ মনে দাগ কেটে বসে। কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা বিপরীত দিকের অট্টালিকা, মেহেদীর বেড়া, দুটো বিশাল গাছ। রাস্তায় জল। রিকশা ডুবু ডুবু, আর একটা ঘোড়া হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ভিজছে। ঘোড়াটার দাঁড়ানোর মধ্যে অবলা অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর একটা ছবিতে একা ঝড়ে বাঁকা ইলেকট্রিক পোস্ট নিঃসঙ্গতার দোতনা হিসাবে আশ্চর্য চিত্রকল্প। সাংকেতিক 'জ্যোতির্ময় বৃক্ষ' মন্দ লাগে না।

এরপর কিছু ছবিতে রঙের মধ্যে অস্পষ্ট সব মুখ। এর মধ্যে সরল একটা মেয়ের সম্রত দৃষ্টি মনকে কেমন বিষণ্ণ করে। কিছু ছবির কাগজ অতিরিক্ত ভিজিয়ে যথেষ্ট শুকোবার অবসর না দিয়ে রঙ ছেড়েছেন। ফলে রঙগুলো ধেবড়ে গেছে। এই ছবিগুলো বাদ দিলে আমার মনে হয় প্রদর্শনীর কোনো ক্ষতি হতো না।

শেষ ও সাম্প্রতিক ছবি বিমূর্ত এবং সেখানে প্রাথমিক বর্ণের বিস্ফোরণ। দেখলে বসন্তের সুরে বর্ণের রঙীন প্রজ্বলিত রূপের কথা মনে হয়। মনে হয় সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময়কার আকাশের বর্ণময় রূপান্তরের কথা। এইসব ছবিতে রঙ নিয়ে তিনি শিশুর মতো খেলেছেন। হয়তো হলুদ, কমলা, সবুজের মধ্যে এক চিলতে সিঁদুর ছেড়েছেন, ফলে চোখ ভীষণ তৃপ্তির খোরাক পেয়েছে।

কক্কড় নিসর্গ বর্ণনায় দক্ষ এটা বোঝা গেল। কিন্তু তাঁর অতৃপ্তি আর অস্থিরতা সুস্পষ্ট।

'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে, তবু...'

আজ থেকে সিকি শতাব্দী পরের কথা। কলকাতায় তখন ভূগর্ভ রেলপথ হয়েছে। আকাশচুম্বী অট্টালিকার সারিতে ছয়লাপ। সুপ্রশস্ত রাজপথ আলোকমালায় ভাস্বর। পরিচ্ছন্ন ফুটপাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষজন বায়ুসেবন করছেন সকাল সন্ধ্যা।

এমন একটা দিন দাদুর হাত ধরে, মানে আপনার হাত ধরে আপনার নাতি শহর ঘুরতে বেরিয়েছে। কলকাতার কিছু মূর্তি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হচ্ছে সে, আবার কিছু মূর্তি দেখে আপনাকে প্রশ্ন-বানে জর্জরিত করছে।

গোলপার্কের বিবেকানন্দ আপনার নাতির কাছে বড় পুতুল বলে ভ্রম হচ্ছে (হায়! তার দোষ কী!)। রবীন্দ্রসদনের সামনে রবীন্দ্রনাথ কি বালির বস্তা দিয়ে গড়া? পাঁচমাথার মোড়ের নেতাজীর ঘোড়ার পেছনে একটা কুমীর কামড়ে ধরেছে কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আপনার নাজেহাল অবস্থা। আর কুৎসিৎ মূর্তির সংখ্যা শহরে কম নেই। আছে সূর্য সেনের কাঠ-কাঠ মূর্তি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শ্রীঅরবিন্দ।

কিছু কিছু মূর্তি তার কিন্তু ভাল লেগেছে। ভাল লেগেছে দেবীপ্রসাদের করা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গান্ধী মূর্তি, চৌরঙ্গী স্কোয়ারে স্যার আশুতোষ, কার্জন পার্কে সুরেন্দ্রনাথ। ভাল লেগেছে চিন্তামণি করের বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রদোষ দাশগুপ্তের নলিনীরঞ্জন সরকারের মূর্তি।

অথচ তরুণ ও প্রতিভাবান ভাস্করের অভাব কলকাতায় নেই। মীরা মুখোপাধ্যায়, বিপিন গোস্বামী, ফুলচাঁদ পাইন এবং মাধব ভট্টাচার্য কলকাতায় থাকেন। শর্বরী রায়চৌধুরী এবং অজিত চক্রবর্তী থাকেন শান্তিনিকেতনে। তরুণতরদের মধ্যে আছেন মানিক তালুকদার, দিলীপ সাহা, অনি

জ্বলন্ত গ্রহ —কৃষ্ণনারায়ণ কক্কড়

ঘোষ প্রমুখ। এ'দের অনেকেই জাতীয় এবং ভিন দেশী বৃত্তি পেয়ে বিদেশে স্নাতকোত্তর পাঠ নিয়েছেন শিল্পশাস্ত্রে। কেউবা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। কারো বা কাজ রয়েছে দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় এবং ললিত-কলার জাদুঘরে।

অথচ কলকাতার মূর্তি গড়ার কাজ পাচ্ছেন অনেকক্ষেত্রে কৃষ্ণনগর বা কুমোর-টুলির কারিগরেরা। পুতুল ও প্রতিমা ভাস্কর্য নয়—এই জ্ঞান কবে আমাদের হবে? প্রতিভাবানদের বঞ্চিত করে কুমোরদের হাতে শহর সাজাবার ভার দিয়ে আমরা কি নিম্নমানের শিল্পরুচির পরিচয় ক্রমাগত দিয়ে যাব? শিল্পী, বিশেষজ্ঞ এবং সমালোচকদের হাতে এই কর্মসূচী রূপায়ণের ভার দিলে কি ভাল হবে না? প্রত্যেক শিল্পীকে কিছুটা দিয়ে এবং কাউকে বঞ্চিত না ক'রে কি কাজটা করা যায় না?

মনে রাখা দরকার, মূর্তি একবার উঠলে তাকে নামানো কঠিন। কদাকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে উত্তরকালে আমরা ধিক্কৃত হবো। ইতিহাস বড়ো নির্মম বিচারক!

সন্দীপ সরকার

সকাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে ছিল। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মন বসলো না। দাঁত মাজতে গিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে মুখে দিয়েই থুঃ থুঃ করে উঠলাম। ব্রাশে টুথ পেস্ট লাগাবার বদলে দাড়ি কামাবার ক্রিম লাগিয়ে বসে আছি। যতবার কুলকুচো করি, কিছুতেই আর সাবানের স্বাদটা মুখ থেকে যায় না।

এরপর চা খেতে গিয়ে কাপটা হঠাৎ উল্টে গেল। গরম চা পড়ে গেল পাজামায়। রাগে আমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু কার ওপর রাগ? আসলে আমিই তো অন্যমনস্ক হয়ে আছি। একটা কিছুতেই মন বসানো দরকার।

ইস্তিরির প্লাগ পয়েন্টটা ক'দিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। আজ একটা জামা ইস্তিরি করতেই হবে। প্লাগ পয়েন্টটা সারিয়ে ফেললেই হয়। সেটা তবু একটা কাজ হবে। স্ক্রুড্রাইভারটা নিয়ে এসে সুইচ বোর্ডটা খুলে ফেললাম। একটা তার আলগা হয়ে গেছে। জুড়ে দেওয়াটা কিছুই না। একটা ছোট কাঠের চৌকির ওপর সাবধানে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু কখন একটা হাত মনের ভুলে দেয়ালে রেখেছি। এমন শক খেলাম যে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। তখন বলে উঠলাম, বেশ হয়েছে! আমার এই শাস্তিই পাওনা ছিল!

পরপর এসবগুলো হচ্ছে শুধু একটিই কারণে। আজ আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। সকালবেলা ঘুম ভাঙবার পর এই কথাটাই প্রথম মনে পড়েছে। কী কঠোর উপলব্ধি! পয়সা নেই, এর থেকে বড় কোনো ঘটনা আর হয় না! তাহলে আজ সারাটা দিন কাটবে কী করে? আজ সাড়ে চারটের সময়—

অনেক ভেবে চিন্তেও কোনো দিক থেকেই টাকা পাওয়ার কোনো উজ্জ্বল আশা দেখা যায় না। সবগুলি উপায়ই বহু ব্যবহৃত হবার ফলে এখন অচল। এমনকি পুরোনো খবরের কাগজ বা শিশিবোতলও বিক্রি করার মতন জমেনি। ধার পাওয়া যেতে পারে অবশ্য। বন্ধুবান্ধবরা এখনো ধার দেয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রথম মুখ ফুটে ধারের কথাটা বলাই যে বড় শক্ত! একবার অন্য কথা শুরু হয়ে গেলে আর টাকার কথাটা উচ্চারণ করা যায় না। কতবার এমন হয়েছে, কারুর কাছে ধার চাইতে গিয়ে দু'ঘন্টা গল্প করার পর শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। সেই বন্ধু জানতেও পারেনি, তার রসিকতা শুনে হাসবার সময় আমার ভেতরে ভেতরে কত যন্ত্রণা হচ্ছিল।

আজ কিছু টাকা চাই-ই। কিছু না পেলে চলবেই না। আজ সাড়ে চারটেয় সময়—

দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। আমার জামা-প্যান্ট পরিষ্কার, মসৃণভাবে দাড়ি কামানো, পায়ের চটিজোড়াও প্রায় নতুন—অথচ পকেটে মাত্র কুড়ি পয়সা। কেউ বিশ্বাস করবে? পকেটে দু'চারটে টাকা অন্তত না থাকলে নিজেদের কী মলিন আর নীচু মনে হয়। লোকের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না পর্যন্ত।

একটা ট্রাম ধরে চলে এলাম ডালহৌসিতে। বন্ধুদের মধ্যে অরবিন্দর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবেই। ওর পকেটে না থাকলেও ওর অফিস থেকে টাকা জোগাড় করার একটা রাস্তা আছে। অরবিন্দ আবার টিফিনে বেরিয়ে না যায়।

লিফ্টম্যানকে পাওয়া গেল না, পাঁচ-তলার সিঁড়ি ভেঙে অরবিন্দর অফিসে এসে পৌঁছে গেলাম। এই পরিশ্রমের মূল্য হিসেবেই বোধ হয় অরবিন্দকে ওর টেবিলেই পাওয়া গেল। একটা বই পড়ছিল, আমাকে দেখে বইটা মুড়ে রেখে বললো, তুই এসেছিস? খুব ভালো হয়েছে!

পাছে লজ্জায় বলতে না পারি, তাই আগেই একটা কাগজে লিখে এনেছিলাম। প্রথমেই সেই কাগজটা বাড়িয়ে দিলাম। অরবিন্দ, পনেরোটা টাকা চাই। আজই। শোধ করে দেবো সামনের মাসে।'

সামান্য দু'লাইনের চিঠি, তবু অরবিন্দ সেটা মন দিয়ে পড়লো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে খুব যত্নের সঙ্গে কুটিকুটি করে ছিঁড়লো। উঠে

দাঁড়িয়ে বললো, তুই বোস, আমি এক্ষুনি আসছি।

পাঁচ মিনিট বাদে ফিরে এসে অরবিন্দ বললো, চল, বেরোই। আমি হাফ-ডে ছুটি নিয়ে এলাম, আর অফিসে ফিরবো না।

যতক্ষণ টাকাটা হাতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ বুকের মধ্যে একটু দুরুদুরু ভাব থাকে। হবে কি হবে না! আজ কি টাকাটা কোনো কারণে...। অরবিন্দর অফিসের এক বেয়ারার কাছ থেকে যখন তখন ধার চাওয়া যায় জানি। আজ যদি সে না এসে থাকে?

অফিসের বাইরে এসে অরবিন্দ বললো, মধুসূদন বেয়ারার কাছে খুচরো টাকা নেই। দিতে চাইছিল না। তাই একটা একশো টাকার নোটই নিয়ে এলাম। তুই পঞ্চাশ, আমি পঞ্চাশ। পাশের দোকান থেকে টাকাটা ভাঙাই আগে।

বেয়ারার কাছে খুচরো পনেরো টাকা নেই, একশো টাকার নোট? এক-একটা বেয়ারাও কত বড়লোক! পাশের দোকান একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে দেয়—সেই বা কম বড়লোক কিসে?

অরবিন্দ গুনে গুনে পঞ্চাশ টাকা আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বললো, চল কিছু খাই! চিকেন আর মোগলাই পরোটা—

আমি বললাম, নারে, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

অরবিন্দ বললো, দামটা আমার টাকা থেকে দেবো, চল না!

—সত্যি আমি বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেছি!

—ধ্যুৎ! মোগলাই পরোটা-মাংস কি কেউ পেট ভরাবার জন্য খায়? এ তো যখন তখন খাওয়া যায়।

জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকে অরবিন্দ এক গাদা খাবারের অর্ডার দিল। তারপর বললো, আজ সারা দিন একদম মেজাজটা ভালো নেই, জানিস?

—কেন?

—কি জানি! এমনিই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। রোজ রোজ সেই একঘেয়ে অফিস, সেই ভিড়ের ট্রাম-বাস ধরে আসা, সেই একই মানুষ জন, ভালো লাগে না। তুই আজ এসেছিস, আজ খুব ভালো হয়েছে! আজ চুটিয়ে আড্ডা দেবো!

আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আজই? ইস্, কেন আজ অরবিন্দর কাছে এলাম? এর বদলে অন্য কারুর কাছে গেলেই হতো।

অরবিন্দ বললো, চল, একটা সিনেমা দেখবি।

আমি বললাম, না রে, আমার একটা কাজ আছে। তুই যা না।

—একা একা? একা সিনেমা দেখতে ভালো লাগে? কতছেলের কত মেয়ে বন্ধু থাকে, আমার শালা তাও একটাও জোটে না! তোর কী কাজ আছে?

আমাকে একবার সায়েন্স কলেজে যেতে হবে সাড়ে চারটের সময়—

অরবিন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সায়েন্স কলেজে?

বলেই বুঝেছি যে ভুল করেছি। সত্যিই তো, সায়েন্স কলেজে আমার কী দরকার থাকতে পারে? কোথায় বিজ্ঞান, আর কোথায় আমি! ঠিক সময় মতন মিথ্যে কথা কিছুতেই আমার মুখে আসে না। অন্য কোনো একটা জায়গার কথা জানিয়ে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত!

অরবিন্দ বললো, ঠিক আছে, চল, আমিও তোর সঙ্গে যাবো। আমাদের অপরেশদা তো ওখানে পড়ান, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবো!

আমার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সর্বনাশ, অরবিন্দকে এড়াই কি করে?

আমতা আমতা করে বললাম, আমি ঠিক সায়েন্স কলেজে যাবো না। তার পাশের গলিতে একটা বাড়িতে......খুব জরুরি একটা কাজ......

—ঠিক আছে, তোর কাজটা কতক্ষণ লাগবে?

—বেশীক্ষণ নয়।

আসলে তখনই অরবিন্দকে আমার সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল। তাহলে

অরবিন্দ আমাকে ঠিকই ছেড়ে দিত। কিন্তু রাজ্যের লজ্জা আমাকে পেয়ে বসলো। সত্যি কথাটা মুখে এলো না।

অরবিন্দ বললো, আমি তোর জন্য দাঁড়াবো। তুই তোর কাজটা সেরে নিবি। তারপর কোথাও একটু বসে দু'জনে একটু গল্প করবো। বললাম না, আজ আমার মেজাজটা একদম ভালো লাগছে না। তুই আজ আমার বাড়ি যাবি? বাড়িতে কেউ নেই, সবাই বেড়াতে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে আমার একলা একলা ফিরতেও ইচ্ছে করে না।

আমি চুপ করে রইলাম। দোকানের ঘড়ির দিকে চোখ। পৌনে তিনটে বাজে। এখনো অনেক দেরি আছে।

বললাম, চল এখন একটু কফি হাউসে যাই। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

কফি হাউসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আর কারুর দেখা পাওয়া গেল না। সে রকম কারুকে পাওয়া গেলে, তার হাতে অরবিন্দকে সঁপে দিতাম। আধ-চেনা ছেলেদের একটা বড় দল বসে আছে একটা টেবিলে। তারা ডাকলো, সেখানেই গিয়ে বসলাম। তারা সুভাষ বসু সম্পর্কে দারুণ তর্কে মেতেছিল, অবিলম্বে অরবিন্দ সেই তর্কে যোগ দিয়ে বসলো।

তর্ক যখন তুমুলে তুঙ্গে উঠেছে, সেই সময় আমি চুপি চুপি উঠে পড়লাম টেবল থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে যখন নেমে এসেছি, তখনই সিঁড়ির ওপর থেকে অরবিন্দ বিস্মিত ভাবে ডেকে বললো, কি রে, তুই চলে যাচ্ছিস?

আমি মুখ থেকে ধরা-পড়া ভাবটা নিমেষে মুছে ফেলে বললাম, না তো! সিগারেট কিনতে এসেছিলাম!

অরবিন্দ বললো, সাড়ে চারটে বাজতে তো আর দেরি নেই, যেতে হবে না আমাদের? চল্।

নীচে নেমে এসে অরবিন্দ বললো, দূরে দূরে যতসব বাজে এঁড়ে তর্ক। ছেলেগুলো কিছু বোঝে না সোঝে না! কেন যে ওদের সঙ্গে এতক্ষণ বাজে বকতে গেলাম! মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে গেল—। চল, তোর কাজ সেরে নেবার পর আমার বাড়িতে যাবো—ছাদের ওপর মাদুর পেতে খুব হাওয়া দেয় ওদিকে...টবে অনেকগুলো যুঁই ফুলের গাছ বসিয়েছি—তুই যদি জিন-টিন খেতে চাস, তাও খাওয়াতে পারি—

একটা ট্রাম ধরে চলে এলাম সায়েন্স কলেজের কাছে। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। এখনো যদি অরবিন্দকে বলা যায়, এখনো—। অথচ বলতে পারলাম না।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলো, কোন্ গলিটায় তুই যাবি?

আমি শুকনো মুখে, একদিকে আঙুল তুলে বললাম, ঐ তো—

—আমি আর তাহলে ভেতরে যাবো না। আমি এখানেই দাঁড়াই। কতক্ষণ লাগবে তোর, আধঘণ্টা?

আমি ধীরে পায়ে হাঁটতে লাগলাম। ঢুকে পড়লাম গলিতে। কিন্তু গলিতে থাকলে তো চলবে না। ঠিক সাড়ে চারটের সময় সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকের ফুট-পাথে বকুল গাছের নীচে আমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সেখানে নীরা আসবে, ওর ছুটির পরে।

প্রত্যেকদিন নীরার সঙ্গে দেখা করা যায় না। ওর এক মাসতুতো দাদাও পড়ে এখানে। সে থাকলে আর আসা হয় না, আমি তার চোখে পড়তে চাই না। যেদিন তার ক্লাস ছুটি থাকে, কিংবা কোনো কারণে অনুপস্থিত হয়, সেদিনই নীরার সঙ্গে এখানে আমার দেখা করার কথা থাকে। নীরাদের বাড়িতে হঠাৎ অনেক লোক এসেছে, সেখানে গেলেও নিরিবিলিতে কথা বলার উপায় নেই। আজ প্রায় দশ বারো-দিন বাদে নীরার সঙ্গে আমার দেখা হবে—ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ গঙ্গার ধারের রেস্তোরাঁয় ওকে নিয়ে চা খেতে যাবো।

রাস্তা পেরিয়ে আমি বকুল গাছটার নীচে এসেই দাঁড়ালাম। উল্টো দিকে, বেশ খানিকটা দূরে অরবিন্দ একটা মুচির সামনে উবু হয়ে বসে চটি সারাচ্ছে। ভাগ্যিস আমার দিকে পেছন ফিরে বসা!

প্রতিটি মিনিট যেন এক ঘণ্টার চেয়েও লম্বা। নীরা এত দেরি করছে কেন? সাড়ে চারটে কি বাজেনি? সায়েন্স কলেজ থেকে কিছু ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি সমস্ত মন প্রাণ দু'চোখের মধ্যে এনে সেদিকে তাকিয়ে আছি। কই, ওদের মধ্যে তো নীরা নেই! নীরা আজ আসেনি? হতেই পারে না, নিশ্চয়ই আসবে।

মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি অরবিন্দর দিকে। ও এখনো [illegible] আছে মুচিটার

নীরা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল

সামনে। চটি সারাতে কি এতক্ষণ লাগে? নাকি কথা বলার কেউ নেই, ও মুচিটার সঙ্গেই গল্পে মেতে আছে?

বেশ কিছুক্ষণ পর নীরা বেরুলো। আর কোনো ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে নয়, একা। এই জন্যই বোধ হয় ও দেরি করছিল। গাঢ় নীল রঙের শাড়ী পরে এসেছে নীরা। আমার দিকে না তাকিয়ে ও একবার তাকালো আকাশের দিকে। ওর সেই [illegible] ভঙ্গিতে সমস্ত কলকাতা আলো হয়ে গেল।

নীরা যখন রাস্তা পেরিয়ে আসে, তখন সমস্ত ট্রাম বাস ওর সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। কোনো লোক চেঁচিয়ে কথা বলে না, কেউ ওর সামনে রাস্তায় থুথু ফেলে না।

নীরা আমার কাছে এসে বললো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো? চলো—

আমি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। এবার অরবিন্দকে বলতেই হবে, আজ ওর সঙ্গে যেতে পারবো না। কাল নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে যাবো।

অরবিন্দ এই সময় উঠে দাঁড়ালো। ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। এগিয়ে এলো কয়েক পা। তারপর থমকে দাঁড়ালো। আমার পাশে নীরাকে দেখে ও কিছু একটা বুঝে নিল। তারপর উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে লাগলো হন হন করে।

আমি অরবিন্দর প্রতি খুব কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। আমাকে আর মুখে কিছু বলতে হলো না। নীরাও জানলো না কিছু। নইলে, অরবিন্দকে দেখে ও হয়তো ভাবতো, আমাদের এই গোপন কথাটা আমি আরও অনেককে বলে দিয়েছি। কিংবা ভাবতো, একদিনও কি আমি বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে ওর জন্য আলাদা সময় দিতে পারি না?

পরমুহূর্তেই দারুণ অনুশোচনা হলো আমার। ছি ছি ছি, এ আমি কী করলাম! আমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার কাছে টাকা ধার চাইতে গেলেও খুশী হয়, যে পনেরো টাকা ধার চাইলে পঞ্চাশ টাকা দেয়, তাকে আমি এমন ভাবে বিদায় করে দিলাম? তার আজ মন খারাপ, সে আজ আমার সঙ্গে সময় কাটাতে চায়, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কত যত্ন করবে বলেছিল—সে-সবের আমি কোনো মূল্যই দিলাম না! শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে একা সময় কাটাবার লোভে? আমার যে-কোনো জিনিস আমি বন্ধুদের ভাগ করে দিতে পারি—তা হলে আজ সন্ধেবেলার নীরাকে আমি আর অরবিন্দ দু'জনে ভাগ করে নিতে পারি না?

নীরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি একটাও কথা বলছো না যে?

আমি বললাম, নীরা, আমার এক বন্ধু এখানে রয়েছে, তাকে ডাকবো? আমাদের সঙ্গে যদি যায়—

নীরা একটু অবাক হলো, চোখ তুলে বললো, বন্ধু? কোথায়? বাঃ, ডাকো—

অরবিন্দ ছিল রাস্তার ওপারে। তাকে ধরবার জন্য আমি এমনভাবে ছুটে গেলাম, যে আর একটু হলেই গাড়ি চাপা পড়তাম। দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল আর কি! একজন বাস ড্রাইভার বিশ্রীভাবে গালাগাল দিয়ে উঠলো আমাকে। সে সব অগ্রাহ্য করে আমি ছুটে গেলাম।

কিন্তু রাস্তার ওপারে এসে অরবিন্দকে আর পেলাম না। ও এর মধ্যেই কোনো চলন্ত ট্রামে উঠে পড়েছে।

পুস্তক পরিচয়

বিবেকানন্দ জীবনী

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। শংকরীপ্রসাদ বসু। প্রথম খণ্ড। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন বহুদিন থেকেই দেশী-বিদেশী মনীষী ও ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর বহুমুখী দীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রথম দিকে কিন্তু বিদেশীরাই প্রামাণিক জীবনী লেখার চেষ্টা করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বোধ হয় এ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য বই। তারপর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ'-লিখিত ইংরেজী ভাষাতেই লেখা বিস্তৃত জীবনী লেখা হয়েছে। রোমাঁ রোলাঁর বিখ্যাত বিবেকানন্দ-জীবনী তো সকলেরই জানা। পরে বাংলায় লেখা হয়েছে গম্ভীরানন্দের তিন খণ্ডের বিবেকানন্দ জীবনী এবং শেষ উল্লেখযোগ্য বই স্বামীজীর আমেরিকান জীবনী নিয়ে মেরী লুই বার্কের লেখা দু খণ্ডের বিরাট বই : 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা : নিউ ডিসকভারিজ'। শেষোক্ত বইটি শংকরীপ্রসাদকে যেমন উল্লসিত করেছিল তেমনি লজ্জিত করেছিল। বিবেকানন্দের স্বদেশবাসীর সেই লজ্জা ঘোচাতেই শংকরীপ্রসাদ 'পরিব্রাজকে'র পথ ধরে ঘুরেছেন সারা ভারতবর্ষ। এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সন্ধানী মানুষের সূত্রে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা বিবেকানন্দ-পাঠকের কাছে এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। প্রায় পনর বছর পরিশ্রমের ফলে বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা ও সমকালীন ইতিহাসের এই পরিচয়ের প্রথম খণ্ড লেখক প্রকাশ করলেন। ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ব্যক্তি ও সমকালীন ইতিহাসকে এমন প্রচণ্ড নিষ্ঠায় সংগে তুলে ধরার নজির সাম্প্রতিক বাঙলা জীবনী-সাহিত্যে দুর্লভ বলেই মনে হয়েছে।

বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত দেশী-বিদেশী মনীষীদের উল্লিখিত বইগুলি মূলত বিবেকানন্দের জীবনী। সেই দিক থেকে বইগুলির মধ্যে স্বামীজীর ব্যক্তিজীবনের বিকাশ এবং তাঁর কর্মকীর্তির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। সমকালীন ইতিহাস সেখানে পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু লক্ষণীয়, শংকরীপ্রসাদের বইটির নাম 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ।' ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবনকে এখানে সমান মূল্য দেওয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে, বইটি বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত এক বিশাল 'ঐতিহাসিক জীবনী'। বিবেকানন্দের জীবন-বিকাশসূত্রে এই বইটিকে এমন অজস্র তথ্য এসে পড়েছে যা অজ্ঞাতপূর্ব। অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য শুধু সাধারণ পাঠকের কাছে নয়, বিবেকানন্দ-গবেষকের কাছেও। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁরা লিখতে বা পড়তে চাইবেন তাঁদের পক্ষে এই বইকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দের বহুকথিত যে ঐতিহাসিক ভূমিকা এত দিন পর্যন্ত যথেষ্ট তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয় নি, সেই ভূমিকাকেই শংকরীপ্রসাদ তথ্যানির্ভর করতে চেয়েছেন। বেশ কয়েকবার ভারত ভ্রমণ করে, সমকালীন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে যেসব সংবাদ শংকরীপ্রসাদ সংগ্রহ করেছেন তার বিপুলতায় বিস্মিত হতে হয়। লাইনো টাইপে আপাদমস্তক ঠাসা প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠা বইটির আয়তন। এর মধ্যে আবার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় একশো পৃষ্ঠার ফুটনোট—যাকে পাদটীকা না বলে পাদ-প্রবন্ধ বলাই উচিত।

কিন্তু প্রায় সীমাহীন এই তথ্যভার রচনার গতিরোধ করেনি। তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধে

শঙ্করীপ্রসাদ সংবাদের পর সংবাদ গেঁথে অনিবার্য বেগে সিদ্ধান্তে এগিয়েছেন—জেগে উঠেছে সেই মহাপৌরুষের ব্যক্তিত্ব—যার নাম বিবেকানন্দ। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে বিবেকানন্দের জীবনের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চেহারা দেখেছি। দেখেছি, সকল আঘাত সহ্য করেও অগ্নিবীণাবাদক সেই মহাকায় মূর্তি।

দশটি অধ্যায়ে বইটির আলোচনা বিভক্ত। 'কাহিনীর সূচনায়' সমুদ্রপারে পাড়ি দেবার প্রেরণার কথা। তারপর একে একে পরবর্তী অধ্যায়গুলি এসেছে। 'পাশ্চাত্যাগমনের পরিকল্পনা, আয়োজন ও সহায়কগণ', 'ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ', 'ভারতে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের প্রাথমিক সংবাদ', আবির্ভাব: প্রথম শিহরণ, অপরিচিত সন্ন্যাসী কি সত্যই অপরিচিত? ভারতের নবজাগরণ : বিবেকানন্দের ভূমিকা', 'জাতির কৃতজ্ঞতা,' 'কিছু অসুখী ব্যক্তি' এবং 'ভারতে মিশনারি আক্রমণ। বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এই অধ্যায়গুলিতে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কয়েকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ কেবল করছি। ১) বহির্ভারতে বিবেকানন্দের সাফল্যের ফলে ভারতে যে আনন্দোল্লাস ঘটেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নবচেতনার যে উদ্বোধন হয়েছিল তার পরিচয় পাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে, বিবেকানন্দই প্রথম সর্ব-ভারতীয় নবজাগরণের সূত্রপাত করেন। পূর্ববর্তী জাগরণগুলি চরিত্রগত দিক থেকে ছিল আঞ্চলিক ও আংশিক। ২) বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে কেবল বাঙলা দেশের পটভূমিকায় তাঁকে স্থাপন করা চলবে না। লেখকের বিশাল তথ্যসম্ভার প্রমাণ করেছে বিবেকানন্দের যথার্থ মূল্য ভারতীয় পটভূমিকায়। বিবেকানন্দ সব সময়েই ভারতের কথাই ভেবেছিলেন, ভারতের কোনো বিশেষ অঞ্চলের কথা নয়। ৩) আরো দেখি, বিবেকানন্দই মিশনারিদের ভারত-কুৎসা বন্ধ করেছিলেন। এবং, তাঁরই প্রভাবে মিশনারি মহলের একাংশে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল। মোট কথা, পৃথিবীতে উদার ধর্মচেতনাসৃষ্টির মূলে বিবেকানন্দের যে দান আছে তা অনস্বীকার্য।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচুর উপযুক্ত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, এবং এই সব তথ্যের অধিকাংশই লেখকেরই ব্যক্তিগত আবিষ্কার। কিন্তু এই রুদ্ধশ্বাস তথ্যের চাপের মধ্যেও বর্ণনার নাটকীয় বেগে বিবেকানন্দের অসাধারণ রূপ, অলৌকিক বাগ্মিতা, চৌম্বক ব্যক্তিত্ব, ব্যাকুল মানব প্রেম এবং দিব্য ভাবাবেশের অজস্র সংবাদ বইটিকে আকর্ষণীয় করেছে। আকর্ষণীয় করেছে বিরোধী শক্তির ওপরে বিবেকানন্দের আত্মিক

বিজয়ের কাহিনী, যার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো ব্রহ্মবান্ধবের রূপান্তর-কথা। 'অপরিচিত সন্ন্যাসী কি সত্যই অপরিচিত' অধ্যায়ে বিবেকানন্দের প্রথমাবধি বিকশিত প্রতিভার বিষয়ে অনেক অজানা সংবাদ পরিবেশন করে লেখক প্রমাণ করে দিয়েছেন, যে অপরিচিত তরুণ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ওইকালে কয়েকজন দেশীয় রাজার গুরু হয়েছেন, নবীন ও প্রবীণ পন্ডিতদের (যার মধ্যে 'তিলক'ও ছিলেন) যিনি মনীষায় স্তম্ভিত করেছেন, যিনি এমন বেশ কয়েকজন যুবককে প্রভাবিত করেছেন যারা তাঁর জন্যে সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন, সর্বস্বত্যাগ করেছিলেন—তিনি কখনো অপরিচিত হতে পারেন না। আসলে তিনি 'অপরিচিত' থাকতে চাইতেন, তাই তিনি 'অপরিচিত'।

উজ্জ্বল মজুমদার

সংক্ষিপ্ত

যোগাযোগটা আকস্মিক। লন্ডনে বহু দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে অন্যতম ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী। ভারত সম্পর্কে বহু বইপত্র, দলিল ও মূল্যবান তথ্য রয়েছে ওই গ্রন্থাগারে—এটুকু জানা ছিল। কিন্তু সশরীরে উপস্থিত হয়ে আবিষ্কার করলেন এক অতীব কৌতূহলকর খনি। ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত শতাধিক বাংলা বই নিউজ লেটার, পোস্টার, লিফলেট, চিত্র প্রভৃতির এক বিপুল সংগ্রহের দেখা পেলেন সাংবাদিক শিশির কর। সেই অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাহিনীর বর্ণনা তাঁর **নিষিদ্ধ বাংলা** (প্রধান পরিবেশক : বুক ট্রাস্ট, ছ টাকা) গ্রন্থে।

বিষয় হিসেবে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিষয়ের গুরুত্বও কম নয়। তখনকার দিনে শোনা যেত, বাজেয়াপ্ত বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু কার্যত তা যে হয়নি, জানা গেল। জানা গেল বহু অধুনাবিস্মৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম একদা যা স্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগাবে ভেবে ভয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এইসব বইয়ের অনেকগুলিই এখন সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য। যেমন, চারণ কবি মুকুন্দদাসের 'পথ' নামে বাজেয়াপ্ত নাটক। প্রকাশিত এই নাটকটির কোনো হদিস-এখন আর নেই। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের অন্যতম একটি দিক সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত ছিলাম, নিষিদ্ধ বইয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির চেষ্টা পর্যন্ত এ-যাবৎকাল করা হয় নি। শিশির কর-এর এই বইটি সেদিক থেকে মূল্যবান এক আকর-গ্রন্থের প্রয়োজন মেটাবে।

তবে গ্রন্থটি তেমন মনোযোগ সহকারে

মুদ্রিত হয় নি। শুদ্ধিপত্র অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তার বাইরেও বেশ কিছু ভুল রয়ে গেছে। আলোচনাও সর্বত্র স্বচ্ছন্দ নয়। বইটি নিশ্চিত বাঙালী পাঠকদের জন্যই লেখা, তা সত্ত্বেও শরৎজীবনীর কিছু টুকরো অংশ হঠাৎ জুড়ে দেওয়া কিংবা 'পথের দাবী'র সারাংশ বর্ণনা কেমন বিসদৃশ লাগে। বস্তুত মূল আলোচনার গতি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত করেছে এই ধরনের গ্রন্থান্তর। পরিশিষ্টে বরং জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবিষ্ট করা ভালো ছিল। তা ছাড়া, অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনার আলোচনা বা সার-সংক্ষেপ পাঠককে বেশী কৌতূহলী করে তুলতো। শিশিরবাবু সেদিকে কিন্তু তেমন জোর দেন নি।

✻

কবিতাকে যিনি 'নিঃশ্বাসবায়ুর মতো অপরিহার্য বলে গ্রহণ করেছেন' তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করার সুযোগ নেই। বস্তুত কবি-পরিচিতির এই চূড়ান্ত পরিচয় স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পাঠককে দ্বিগুণ কৌতূহলী করে তুলবে।

কবি হিসেবে স্নেহলতার পরিচয় শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর কবিতার মধ্যেই খুঁজবেন পাঠক। **সত্যবন্ধ উচ্চারণ** (পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, চার টাকা) স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংকলনে যেমন হয়, দু-একটি কাঁচা লেখাও দুর্বলতার সুযোগে জায়গা করে নেয়, এ ক্ষেত্রেও তেমন হয়েছে। ছন্দের কিছু নড়বড়ে ভাবও ইতস্তত রচনায় চোখে পড়ে। যেমন, 'স্বপ্ন এবং স্বদেশ' কবিতায় বেশির ভাগ পঙ্‌ক্তিরই ঝোঁক বিশুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক মাত্রাবৃত্তের দিকে, তবু প্রথম, সপ্তম ও শেষ পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ ছন্দছুট। 'তোমাকে গাওয়া'র পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে 'ছিন্ন মেঘ, আর' কিছুতেই পাড়া যায় না ছ' মাত্রায়, দশম পঙ্‌ক্তির 'শুভেক্ষণ'-কে আধ মাত্রা বাড়িয়ে উচ্চারণ করতে হয়।

কিন্তু এ-সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা শক্ত নয় তাঁর পক্ষে, কেননা ছন্দে লেখার ঝোঁক তাঁর রয়েছে।

স্নেহলতার কবিতার প্রধান মূলধন সৎ অনুভব ও সত্যবন্ধ উচ্চারণ। 'নিঃস্বতার কিছুই মেলে না/পৌরুষে যোগ্য হও, পৌরুষই পুরুষের প্রেম' যিনি অবলীলায় উচ্চারণ করতে পারেন, যিনি দেখতে পান চন্দ্রভুক রাতগুলি মেঘের অন্তরা খ' বনবাসে জেবলে দেয় চারপ্রহর আলো', ঘাসের সবুজে ঘনিষ্ঠ মুগ্ধ কাঁচপোকা, অশ্রুপাতের মত নদী, যাঁর স্মৃতির চালচিত্র, বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের হাহাকারকে যিনি প্রকাশ করেন তীব্রতম ভাষায়—'এ হৃদয় হল না হরণ! ধনুক ভেঙেছে অর্জুন/টান দিতে পারে নি ছিলায়।'—তিনি, বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই কবিতায় নিজের জায়গাটি খুঁজে নিতে চলেছেন। এবং বেশ দক্ষতার সঙ্গে।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবিধ

পদাতিক (৩য় বর্ষ, ১ম সংকলন) ত্রৈমাসিক। বারুইপুর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক—অসিত গুহঠাকুরতা। ২টি গল্প, ১টি প্রবন্ধ, ফণীভূষণ আচার্য এবং অন্যান্যদের ১৫টি কবিতা ছাড়াও ২টি কবিতা ও ২টি প্রবন্ধ সম্বলিত শরৎ-ক্রোড়পত্র। সজল রায় চৌধুরীর লেখা ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি-চারণ মূলক প্রবন্ধটি তথ্যমূলক। শরৎ-ক্রোড়পত্র গতানুগতিক।

খেলার মাঠে

দলগত খেলা ফুটবল, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, ওয়াটারপোলো প্রভৃতির চেয়ে অলিম্পিকে অ্যাথলেটিকস ও সাঁতারের ব্যক্তিগত ইভেণ্টগুলির আকর্ষণ বেশি। এই সব বিষয়ে আবার বেশি আগ্রহ কে অলিম্পিক রেকর্ড করেছে, কে করেছে বিশ্ব রেকর্ড তাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য দলগত প্রতিযোগিতাতেও নাটকীয় মুহূর্ত আছে আছে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও মরণপণ সংগ্রাম। তবু অ্যাথলেটিকস এবং সাঁতার প্রধান আকর্ষণ, কুড়ি-একুশ রকমের খেলা মধ্যে।

আর একটি আকর্ষণ অলিম্পিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠান, পুতাগ্নি প্রজ্বলন। নতুনত্ব অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। সেই মার্চপাস্ট, শপথ গ্রহণ, পারাবত উড্ডয়ন, সামরিক বাদ্য, তোপধ্বনি, বর্ণাঢ্য সমাবেশ এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা। পুতাগ্নি প্রজ্বলনেরও প্রাচীন রেওয়াজ। প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিয়ায় হেরা দেবীর মন্দিরের সামনে সূর্যরশ্মি থেকে আতস কাচের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলন, তারপর কয়েক হাজার মাইল অ্যাথলীটদের হাতে হাতে বাহিত হয়ে উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে মূল স্টেডিয়ামের অগ্নিস্থলীতে স্থাপন। এ সবই পৃথিবীর চতুর্বার্ষিক বৃহত্তম অনুষ্ঠানের মামুলী ব্যাপার। তবে এর জন্যও বিশ্বজনীন আগ্রহ যেমন প্রতি বছরের দুর্গোৎসব মামুলী ব্যাপার হলেও তার জন্য আমাদের অধীর প্রতীক্ষা। এবার পুতাগ্নি প্রেরণে অবশ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে লেসার বীম-এর সাহায্যে পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে অপর গোলার্ধে প্রেরণ করা হয়েছে আকাশ পথে। অ্যাথলীটদের হাতে হাতে মশাল বাহিত হয় অলিম্পিয়া থেকে এথেন্সে এবং অটোয়া থেকে মণ্ট্রিলের মূল অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণে।

অলিম্পিকের বড় আকর্ষণের কথা নিয়েই আলোচনা শুরু করেছিলাম। বোধ হয় এখনকার এক বড় আকর্ষণ কোন দেশ বেশি পদক পাচ্ছে। সিটিয়াস, অলটিয়াস ফর্টিয়াস অর্থাৎ আরও গতির পরিচয় দাও, আরও উঁচুতে ওঠ এবং আরও শক্তি দেখাও এই মটো তো আছেই। কোন দেশ খেলাধুলায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে তা প্রমাণের মাপকাঠি বিশ্ব অলিম্পিক। এবং বলা বাহুল্য, ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকে শুরু করে রুশ-মার্কিন দ্বৈত লড়াই অলিম্পিকের বড় আকর্ষণ। ১৯০০ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত জার আমলে রাশিয়া পেয়েছে মাত্র একটি সোনা, চারটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক। তারপর কয়েকটি অলিম্পিকে যোগ দেয়নি।

হকির ফ্লিক মাস্টার গোবিন্দ

গোবিন্দর হাতের চমকের মত এত চমক আছে আর কোন্ খেলোয়াড়ের খেলায়! সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র গোবিন্দকেই ভারতের হকি ঐতিহ্যের উত্তরসূরী বলা যায়। বিশ্বের বিরল প্রতিভা "জাদুকর" ধ্যানচাঁদের সঙ্গে অবশ্যই কারো তুলনা করা চলে না। রূপ সিং কিংবা বাবুর সঙ্গেও গোবিন্দর তুলনা করছি না। প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলছি, বলবীর সিংয়ের পর সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হিসাবে এতখানি দক্ষতার পরিচয় আর কেউ দিতে পারেনি।

অথচ জাতীয় দলের জামা গায়ে দেবার পর গোবিন্দকে এক পজিশনে খেলানো

হয়নি। কখনো লেফ্‌ট আউটে, কখনো লেফ্‌ট ইনে, কখনো-বা রাইট ইনে, আবার কোন কোন প্রতিযোগিতায় সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে খেলানো হয়েছে। হকি বিশারদদের ধারণা, এর ফলে গোবিন্দ সমগ্র পুরোভাগের স্বয়ংসম্পূর্ণ খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার ধারণা, এক পজিশনে খেললে ও আরও পূর্ণ হয়ে উঠত।

গোবিন্দর খেলার বৈশিষ্ট্য কি? না, ছুটন্ত বলের সঙ্গে দুরন্ত গতিবেগ, স্টিকের চাতুর্যে এবং দেহের দোলায় প্রতিপক্ষকে মাটাল করে ডিফেন্স ফুঁড়ে আক্রমণ রচনা আর ব্যাকহ্যাণ্ড-ফ্লিক—বেশী ক্ষেত্রে রিভার্স স্টিকে। গুরুত্বপূর্ণ কত খেলায় যে গোবিন্দ এভাবে গোল করেছে তার সঠিক হিসাব কেউ রাখেনি। তবে তার নিজের কথায়, ১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১৯৭৩এ বিশ্বকাপ হকির সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে দুটি গোল করেছিল সমজদাররা সে দুটি গোলকে শিল্প ও সৌন্দর্যের ছবি বলে অভিহিত করেছিলেন।

গোবিন্দ প্রথম ভারত দলের জার্সি পরে ১৯৭০-এ বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায়। লাইট ব্লু দলে ভাল খেলার সুবাদে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে খেলার সুযোগ। তারপর থেকে ভারতের অপরিহার্য খেলোয়াড়। প্রতি প্রতিযোগিতায়, অলিম্পিকে এবং বিশ্ব কাপে।

মিউনিখ অলিম্পিকে কোচবাবু ওকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড থেকে সরিয়ে লেফ্‌ট আউটে খেলালেন। গ্রুপ লীগে পোল্যাণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করে এগিয়ে গেল। লেফ্‌ট আউট থেকে গোবিন্দই গোল শোধ করে পরাজয় এড়াল। ওখানে ব্রোঞ্জ পাবার খেলাতেও হল্যাণ্ড প্রথম গোল করল ভারতের বিরুদ্ধে। ওইদিন গোবিন্দকে আবার সেণ্টার ফরোয়ার্ডে আনা হয়েছিল। ২৫ গজ লাইন থেকে একটি বল ধরে তীরের মত ছুটতে আরম্ভ করল গোলের দিকে। হল্যাণ্ডের বিশাল দেহী গোলরক্ষক সিকিং বিপদ দেখে ছুটে এল গোবিন্দর দিকে। তুলির আঁচড়ের মত বলের উপর স্টিকের একটি ছোট আঁচড়। সিকিং চলে গেল রং সাইডে। টাল সামলে আবার গোবিন্দকে বাধা দেবার চেষ্টা করতেই বাঁ দিকে স্টিকের আর একটি ছোট টান এবং রিভার্স-ফ্লিক চকিত কার্যকারণে জালের মধ্যে বল, গোল শোধ হয়ে গেল। হ্যাঁ এইভাবে গোবিন্দ নিজেই গোলটির বর্ণনা করেছে। ১৯৭৩এ বিশ্ব কাপের সেমিফাইনালে প্রায় একইভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গোল করে কুর্গ-এর কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়টি ভারতকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছিল। '৭৫এ কুয়ালালামপুর বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের মূলেও খেলোয়াড়টির অবদান অনেকখানি।

কলকাতা থেকে খ্যাতি শুরু হলেও গোবিন্দর ধমনীতে রয়েছে হকির রক্ত। বাবা এবং দাদা ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই প্রথম অনুপ্রেরণা। হকির দৌলতেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে চাকরি এবং হকির জন্যই বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে প্রশিক্ষক হবার জন্য। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন কোন দেশের অফারই গ্রহণ করেনি।

মুকুল

...নুদ্রিত হয় নি। শুদ্ধিপত্র অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তার বাইরেও বেশ কিছু ভুল রয়ে গেছে। আলোচনাও সর্বত্র স্বচ্ছন্দ নয়। বইটি নিশ্চিত বাঙালী পাঠকদের জন্যই লেখা, তা সত্ত্বেও শরৎজীবনীর কিছু টুকরো অংশ হঠাৎ জুড়ে দেওয়া কিংবা 'পথের দাবী'র সারাংশ বর্ণনা কেমন বিসদৃশ লাগে। বস্তুত মূল আলোচনার গতি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত করেছে এই ধরনের প্রসঙ্গান্তর। পরিশিষ্টে বরং জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবিষ্ট করা ভালো ছিল। তা ছাড়া, অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনার আলোচনা বা সার-সংক্ষেপ পাঠককে বেশী কৌতূহলী করে তুলতো।

এখন ইংলণ্ডের লেখকরা কিন্তু মুখে খোলেনি।

সে কথা যাক, ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। যেমন একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রীনিজ ছাড়া এই মাঠে টেস্টের দুই ইনিংসে কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেনি। গ্রীনিজের কথায় বলব, ভারতের বিরুদ্ধে তার পর আবার তার ব্যাটে রান ফিরে এসেছে। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টেও সে করেছিল ৮৪ রান, ১৮২-র মধ্যে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে করেছে ১৩৪ ও ১০১। দ্বিতীয় ইনিংসে ভিভিয়ান রিচার্ডস ১৩৫ রান করে এই বছর ছয়টি টেস্ট সেঞ্চুরি করল। এখন পর্যন্ত এক বছরে বেশি রান সংগ্রহের রেকর্ডের অধিকারী ববি সিম্পসনের প্রতিদ্বন্দ্বী।

দুই ইনিংসে অ্যান্ডি রবার্টস মাত্র ৫৭ রানে ৯টি এবং হোল্ডিং মাত্র ৪০ রানে ৭টি উইকেট দখল করেছে। জীবনের প্রথম টেস্টে দুটি দেশের দুই নবাগত, কলিস কিং ও মাইক সেলভির ভূমিকা সফল বলা যেতে পারে। প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপর্যয়ের মুখে কিং পঞ্চম উইকেটে গ্রীনিজের সঙ্গে জুটি বেঁধে ১১১ রান যোগ করতে সাহায্য করে। মিডলসেক্সের খেলোয়াড়, ২৮ বছর বয়সী স্কুল মাস্টার মাইক সেলভি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে আক্রমণ করায় মাত্র ২০ বলের মধ্যে দুটি এবং পরে আরও দুটি উইকেট নিয়েছে। তার সুইং বলে ফ্রেডেরিকস, রিচার্ডস ও কালীচরণ বিপর্যস্ত হয়।

বৃষ্টি বিঘ্ন সৃষ্টি না করলে চারদিনের মধ্যেই ইংলণ্ড হেরে যেত। চতুর্থ দিন ৯ উইকেটে ১২৫ রান এবং মোট ৪২৫ রানে পিছিয়ে থাকা কালে বৃষ্টি নামল। ইংলণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। পঞ্চম দিনের সকালে আর একটি মাত্র রান যোগ হয়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—২১১ (গ্রীনিজ ১৩৪, কলিস কিং ৩২; মাইক সেলভি ৪—৪১, আণ্ডারউড ৩—৫৫, হেনড্রিক ২—৪৮, পোকক ১—১০)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৭১ (স্টিভ স্টিল ২০; হোল্ডিং ৫—১৭, রবার্টস ৩—২২, ড্যানিয়েল ২—১৩)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইঃ ডিক্লে: ৪১১ (গ্রীনিজ ১০১, রিচার্ডস ১৩৫, ফ্রেডেরিকস ৫০, লয়েড ৪৩; পোকক ২—৯৮, সেলভি ২—১১১)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ১২৬ (এডরিচ ২৪, ক্লোজ ২০; রবার্টস ৬—৩৭, হোল্ডিং ২—২৩, ড্যানিয়েল ২—৩৯)

(ইংলণ্ড ৪২৫ রানে পরাজিত)

একলব্য

হকির ফ্লিক মাস্টার গোবিন্দ

কলকাতাকে বলা হয় ফুটবলের বারানসী—হকির ব্যাসকাশী। ভারতীয় ফুটবলে বা নিজ খাজ্যে কিছুটা প্রতিষ্ঠা অর্জনের পরই সাধারণত কলকাতার কোন ক্লাবে ফুটবল খেলার সুযোগ মেলে। একইভাবে কিছু কিছু হকি খেলোয়াড়েরও আগমন ঘটে কলকাতার মাঠে। কিন্তু কলকাতায় প্রথম হকি খেলে ভারতীয় হকিতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের নজির বেশী নেই। হালফিল নজির এবং সবচেয়ে বড় নজির বিলিমোগা পুত্তস্বামী গোবিন্দ—হকি ক্ষেত্রে বি পি গোবিন্দ নামে যার পরিচয়। পরিচিত খেলোয়াড় মহলে পরিচয় ফ্লিক-মাস্টার নামে।

সুদূর কুর্গ থেকে ১৭ বছরের ছেলেটি ১৯৬৮ সালে যখন প্রথম কলকাতায় খেলতে এসেছিল তখনই কল্পনার কলমে কেউ কেউ ওর গায়ে "প্রতিশ্রুতিবান" কথাটি লিখে দিয়েছিলেন। একই কারণে মোহনবাগানের শিকার পরের বছরই চলে গিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গলের জালে। নতুন ময়দানযাত্রী কাউকে বলে দিতে হত না, কে গোবিন্দ। বড় বড় অবাধ্য চুলকে বশে রাখার জন্য মাথায় পটি বেঁধে খেলত। মাঠের পাশ দিয়ে যখন তীর বেগে দৌড়ত হকি স্টিকের সংগে বল দৌড়ত বাধ্য বালকের মত। চেহারাটা চেনা হয়ে গিয়েছিল। খেলার ভঙ্গিটা মনের উপর দাগ কেটে রেখেছিল। অবশ্যই খেলায় পরিমার্জন ছিল না। এখন ভারতের সবচেয়ে পরিমার্জিত হকি খেলোয়াড়।

মাসখানেক আগে ফ্রান্সে অনুশীলন ম্যাচ খেলার সময় গোবিন্দর কণ্ঠার হাড় ভেঙে যাবার খবরে ভারতের করেক কোটি মানুষ যেমন উদ্বেগ বোধ করেছিল, মন্ট্রিল অলিম্পিক আরম্ভের মুখে তেমনই উদ্বেগ নিয়ে ছিল তার খেলার অনিশ্চয়তায়।

ভারতবাসী মাত্রেই জানত, অলিম্পিকে যদি ভারতের ভাগ্যে কোন স্বর্ণপদক জোটে সেটা জুটবে হকি খেলোয়াড়দেরই দৌলতে এবং এও জানত, গোবিন্দ যদি খেলতে না পারে সোনা জেতার সম্ভাবনা অনেকটা দূরে সরে যাবে। তাই সবার প্রার্থনা ছিল গোবিন্দ যেন সেরে উঠে মন্ট্রিলে খেলতে পারে।

খেলেছে, কি খেলেনি—এ লেখা হাতে পড়ার আগেই সবার জানা হয়ে গেছে। এবং ভাল না খেললে অবশ্যই তার পেছনে যুক্তি আছে। কারণ অত বড় চোটের পর স্বাভাবিকভাবে খেলা শক্ত। বিশেষ করে অনভ্যস্ত অ্যাস্ট্রো টার্ফে (কৃত্রিম পাঁচের মাঠ)। ভাল খেললে তার অসাধারণত্বের সংগে যোগ হয়েছে চমক।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমাদের হকিতে গোবিন্দর হাতের চমকের মত এত চমক আছে আর কোন্ খেলোয়াড়ের খেলায়! সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র গোবিন্দকেই ভারতের হকি ঐতিহ্যের উত্তরসূরী বলা যায়। বিশ্বের বিরল প্রতিভা "জাদুকর" ধ্যানচাঁদের সংগে অবশ্যই কারো তুলনা করা চলে না। রূপ সিং কিংবা বাবুর সংগেও গোবিন্দর তুলনা করছি না। প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলছি, বলবীর সিংয়ের পর সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হিসাবে এতখানি দক্ষতার পরিচয় আর কেউ দিতে পারেনি।

অথচ জাতীয় দলের জামা গায়ে দেবার পর গোবিন্দকে এক পজিশনে খেলানো

হয়নি। কখনো লেফ্‌ট আউটে, কখনো লেফ্‌ট ইনে, কখনো-বা রাইট ইনে, আবার কোন কোন প্রতিযোগিতায় সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে খেলানো হয়েছে। হকি বিশারদদের ধারণা, এর ফলে গোবিন্দ সমগ্র পুরোভাগের স্বয়ংসম্পূর্ণ খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার ধারণা, এক পজিশনে খেললে ও আরও পূর্ণ হয়ে উঠত।

গোবিন্দর খেলার বৈশিষ্ট্য কি? না, ছুটন্ত বলের সংগে দুরন্ত গতিবেগ, স্টিকের চাতুর্যে এবং দেহের দোলায় প্রতিপক্ষকে মাতাল করে ডিফেন্স ফুঁড়ে আক্রমণ রচনা আর ব্যাকহ্যাণ্ড-ফ্লিক—বেশী ক্ষেত্রে রিভার্স স্টিকে। গুরুত্বপূর্ণ কত খেলায় যে গোবিন্দ এভাবে গোল করেছে তার সঠিক হিসাব কেউ রাখেনি। তবে তার নিজের কথায়, ১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১৯৭৩এ বিশ্বকাপ হকির সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে দুটি গোল করেছিল সমঝদাররা সে দুটি গোলকে শিল্প ও সৌন্দর্যের ছবি বলে অভিহিত করেছিলেন।

গোবিন্দ প্রথম ভারত দলের জার্সি পরে ১৯৭০-এ বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায়। লাইট ব্রুজ দলে ভাল খেলার সুবাদে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে খেলার সুযোগ। তারপর থেকে ভারতের অপরিহার্য খেলোয়াড়। প্রতি প্রতিযোগিতায়, অলিম্পিকে এবং বিশ্ব কাপে।

মিউনিখ অলিম্পিকে কোচবাবু ওকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড থেকে সরিয়ে লেফ্‌ট আউটে খেলালেন। গ্রুপ লীগে পোল্যাণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করে এগিয়ে গেল। লেফ্‌ট আউট থেকে গোবিন্দই গোল শোধ করে পরাজয় এড়াল। ব্রোঞ্জ পাবার খেলাতেও হল্যাণ্ড প্রথম গোল করল ভারতের বিরুদ্ধে। ওইদিন গোবিন্দকে আবার সেণ্টার ফরোয়ার্ডে আনা হয়েছিল। ২৫ গজ লাইন থেকে একটি বল ধরে তীরের মত ছুটতে আরম্ভ করল গোলের দিকে। হল্যাণ্ডের বিশাল দেহী গোলকিপার সিকিং বিপদ দেখে ছুটে এল গোবিন্দর দিকে। তুলির আঁচড়ের মত বলের উপর স্টিকের একটি ছোট আঁচড়। সিকিং চলে গেল রং সাইডে। টাল সামলে আবার গোবিন্দকে বাধা দেবার চেষ্টা করতেই বাঁ দিকে স্টিকের আর একটি ছোট টান এবং রিভার্স-ফ্লিক চকিত কার্যকারণে জালের মধ্যে বল, গোল শোধ হয়ে গেল। ঠিক এইভাবে গোবিন্দ নিজেই গোলটির বর্ণনা করেছে। ১৯৭৩এ বিশ্ব কাপের সেমিফাইনালে প্রায় একইভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গোল করে কুর্গ-এর কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়টি ভারতকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছিল। '৭৫এ কুয়ালালামপুর বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের মূলেও খেলোয়াড়টির অবদান অনেকখানি।

কলকাতা থেকে খ্যাতি শুরু হলেও গোবিন্দর ধমনীতে রয়েছে হকির রক্ত। বাবা এবং দাদা ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই প্রথম অনুপ্রেরণা। হকির দৌলতেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে চাকরি এবং হকির জন্যই বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে প্রশিক্ষক হবার জন্য। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন কোন দেশের অফারই গ্রহণ করেনি।

মুকুল

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

ওয়াম্বেসি-যোদ্ধারা সাংকেতিক শব্দ শুনেছে..
ওয়াম্বেসির যোদ্ধারা এখুনি কিলাউয়িতে এসো
?
?

এখুনি কিলাউয়িতে এসো... এখুনি...

কিলাউয়ির সমুদ্র বেলায়.....
কী হয়েছে পাইলট ..তোমার চোয়ালেও কিসের দাগ? এ কী?

লোকটা গুলি চালাবার আগেই.....
!

হুঁশ ফিরেছে পাইলট? ভালো, এবারে থলিভর্তি সোনা হেলি-কপটারে তোলো!
অ্যাঁ...?
12/14

কে তুমি? উঃ, এ যে বড্ড ভারী...
ওখান থেকে চুরি করবার সময় তো তা মনে হয়নি!

দস্যুরা জ্ঞান ফিরে পেয়ে হতভম্ব.....
ব্যাপার কী?
প্রত্যেকের চোয়ালে তাঁর খুলির দাগ!
?!
পাজী ব্যাটারা!

ওই অরণ্যদেব আসছেন।
??!!
আগামী সপ্তাহে বিচার ১৮

আরতি ভট্টাচার্য, উত্তমকুমার/**অসাধারণ**/পরিচালনা : সলিল সেন

অর্জুন/ইউ ডি এম

ছবির অর্জুন মহাভারতের সব্যসাচীরই মতন। অনন্য প্রেমিক, অসাধারণ সংগ্রামী। এই জাতীয় চরিত্র, আমাদের দেশের ছবিতে, সাধারণত বাস্তবের ধার-কাছ ঘেঁষে না। কিন্তু "অর্জুন" ছবির নায়ক, যার নামেই ছবির নামকরণ, তার পরিবেশ এবং পটভূমির একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। ছবির শুরুতেই অর্জুনের (স্বরূপ দত্ত) মুখে শোনা যায় একটি দীর্ঘ কবিতা—যার মধ্যে দিয়ে তার সম্পূর্ণ পরিচয়টি দর্শকের কাছে উদ্ঘাটিত। ওই কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক একদিকে যেমন কয়েকঘর উদ্বাস্তু মানুষের

চলচ্চিত্র

জবরদখল করা কলোনির চেহারা স্পষ্ট করেছেন তেমনি এই পরিবেশের একজন হয়েও অর্জুন যে স্বতন্ত্র এক চরিত্রের মানুষ এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ছিন্নমূল কিছু মানুষের এলোমেলো জীবনযাত্রা, দারিদ্র্যের চিহ্ন চতুর্দিকে প্রকট, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ-যেন একটি মানুষের উন্নত জীবন-আকাঙ্ক্ষার প্রত্যয়নিষ্ঠ শপথ! সুন্দর একটি পরিকল্পনায় ছবি শুরু করেছেন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ইন্দর সেন।

কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবির মেজাজ অনেকবার বদলেছে। উদ্বাস্তু কলোনির দখল নিয়ে যে-সব নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে তাতে ছবিকেও নাটকীয়তার পথে চলতে হয়েছে। কিন্তু শেষের অতিনাটকীয় ব্যাপারটি—যেখানে চরম সংগ্রামের মুহূর্তে লাবণ্য (সন্ধ্যা রায়) তার শারীরিক নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছে, অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে দিব্যর (সমিত ভঞ্জ) দেহটাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, সেখানে একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়। দিব্য অসামাজিক, কলোনীর ছেলে হয়েও কলোনির প্রতি তার সহানুভূতি কম, পাশের ফ্যাক্টরির মালিক কেওয়ল সিং-এর (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) সে পোষা গুণ্ডা, তার জীবনের এইরকম সমাপ্তিই হয়তো অভিপ্রেত। কিন্তু এ-সবের উপরেও একটা কথা আছে, অত বীভৎসতার মধ্যে না গিয়েও কি এরই কাছাকাছি কোন সমাপ্তি ছবিতে দেখানো যেত না? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে যে সমাপ্তি দেখিয়েছিলেন চিত্রনাট্যকার সেটিকে অনুসরণ করলে পারতেন। ব্যাপারটা তা হলে বাস্তব হত, সুন্দর হত, হত শিল্পনিষ্ঠ। শেষ সংঘর্ষে অর্জুন আবার আহত, ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলোনির উদ্বাস্তুরা জবরদখল করা জমির উপর স্থায়ী অধিকার পেয়ে গেলেন, একটি সংঘবদ্ধ সংগ্রামের জয় সূচিত হল। আহত অর্জুন তখন মনে মনে ভাবছে, দু-দুবার আক্রান্ত হয়েও আমি মরিনি, আমরা মরব না, আমরা মরতে পারি না। এমন চমৎকার একটি সমাপ্তির সম্ভাবনা কেন এড়িয়ে গেলেন চিত্রনাট্যকার?

হয়তো পরিচালক ছবির বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথাই বার বার ভেবেছেন। যে-কারণে তার ছবিতে চিন্ময় রায় নজরুল-রচিত প্রেমের গান শুনিয়েছেন সন্ধ্যা রায়কে। অনুপ ঘোষাল যত ভালই গান না কেন সমস্ত ঘটনাটাই

কেমন বেমানান ঠেকেছে। আর একটি গান (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত) দল বেঁধে গেয়েছেন রাজশ্রী বসু (ধনীকন্যা; অর্জুনের প্রেমিকা) এবং তাঁর ছেলে-বন্ধুর দল গাড়ি চেপে পথপরিক্রমা করতে করতে। ওটাও চূড়ান্ত রকমের বেমানান। রাজশ্রীর সঙ্গে স্বরূপের প্রেমের সম্পর্কটি ওদের বাড়ির ফ্ল্যাটে কী সুন্দর, কত শিল্পরসমণ্ডিত করে দেখিয়েছেন পরিচালক। ওই ঘটনার আর জের টানার প্রয়োজন ছিল কি? হয়তো কমার্শিয়াল চিন্তাই এই সব পরিকল্পনার উৎস, কিন্তু আসলে সেটা ফলপ্রসূ হবে কি না গভীর সন্দেহ আছে।

কিন্তু এই সব চিন্তার সঙ্গে পরিচালকের আন্তরিক যোগ যে খুব কমই ছিল এটাও উপলব্ধি করা যায়। হয়তো তিনি পারিপার্শ্বিকের শিকার হয়ে পড়েছেন। নতুবা ছবির চরিত্রগুলি কত জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে চিত্রনাট্যে। অমন যে অসামাজিক চরিত্র সমিত ভঞ্জের সেটাও কেমন মমতার সঙ্গে, কত বাস্তব করে দেখানো হয়েছে। উদ্বাস্তু কলোনির বাঁধন-ছাড়া জীবনের ফসল ওই যুবক। সম্পূর্ণ মায়ামমতা বর্জিত নয়, কিন্তু অর্জুনের প্রাধান্য ও স্বীকার করতে পারে না, সহ্য করতে পারে না। অর্জুনের সমস্ত অস্তিত্বটাই ওর কাছে যন্ত্রণার মত। ওর সমস্ত অসামাজিক কাজই যেন অর্জুনের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। সমিতকে দিয়ে ভারী চমৎকার অভিনয় করিয়েছেন পরিচালক। স্বরূপ দত্তর অর্জুনও একটি চমৎকার চরিত্র রূপায়ণ। ওই চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, বিবেকবোধ, দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী মনোভাব শিল্পী চমৎকার ফুটিয়েছেন। সন্ধ্যা রায় তাঁর চরিত্রের তেজস্বিতা এবং অসহায়তা সুন্দর করে দেখিয়েছেন। চিন্ময় রায়ের অভিনয়ে প্রথম দিকের ছুঁকছুঁকে স্বভাব যেমন ফুটেছে, শেষের দিকের ভেঙেপড়া ভাব কিন্তু তেমন করে প্রকাশ পায়নি। বরং ওঁর চিৎকার করে "আমি মাসে তিনশো টাকা রোজগার করলে তুই আমায় বিয়ে করবি তো" সংলাপটি ওই চরিত্রের ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ করে দেয়। ওই মুহূর্তটির জন্য ইন্দর সেনও সাধুবাদের যোগ্য।

শুধু কি ওই চরিত্রগুলিই? ছোট ছোট সব কটি চরিত্রই কত বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। অসাধারণ অভিনয় করেছেন প্রেমাংশু বসু, বিজন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা। তবে সুলতা চৌধুরী অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে কথা উঠতে পারে। মদ্যপ অবস্থায় অমন আবেগজড়িত সংলাপ বড় বেমানান। আবার ফ্ল্যাশব্যাক পর্বে দাঙ্গাবিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গের পটভূমিতে পঞ্চানন ভট্টাচার্য আর কয়েকটি মুহূর্তের অশ্রু চোখে জল এনে দেন। সেখানেও

স্বরূপ দত্ত/অর্জুন

আবেগ, কিন্তু কত সাবলীল। ছবির ফ্ল্যাশ-ব্যাক পর্বগুলিও বড় সুন্দর। পুলিস অফিসারের একটি প্রশ্নের জবাবে অর্জুনের চোখের সামনে হঠাৎ তার প্রেমাস্পদার কয়েকটি ছবি ভেসে চলে গেল—এটি একটি সুন্দর পরিকল্পনা। ওই মুহূর্তে সংগীতের ব্যবহারও বড় চমৎকার। শুধু ওই মুহূর্তে কেন, আনন্দশংকর আরও কিছু কিছু দৃশ্যে যে-সংগীত সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষ করে তারিফ পাবার মত। ছবিতে আরও অনেক মুহূর্ত আছে যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যায়। প্রশংসা করা যায় শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ এবং অরবিন্দ ভট্টাচার্যর সম্পাদনা—যা ছবির শিল্পগত মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তের ওই বীভৎসতা—ওটাই যে ভয়ানক পীড়া দিতে থাকে।

—রবি বসু

মেরা জীবন/শ্রীজী ইণ্টারন্যাশনাল

শল্য চিকিৎসার ছাত্র আনন্দ শর্মা (অম্বিকা জোহর) মারাত্মক আহত সহপাঠি অমর শর্মার দেহে অস্ত্রোপচার করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। এই কৃতিত্ব তাকে সম্মান এনে দিলেও ডিগ্রী-না থাকা সত্ত্বেও একটা কঠিন অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগে তাকে তিন বছরের জন্য 'রাসটিকেটেড' হতে হয়। নিরুপায় আনন্দকে আশার আলো দেখান এক গ্রামের সেবাব্রতী বৃদ্ধ ডাক্তার ত্যাগী (হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। ডঃ ত্যাগীর সঙ্গে আনন্দ গ্রামবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু ডাঃ ত্যাগীর আকস্মিক মৃত্যু আনন্দকে অসহায় করে তোলে।

সন্ধ্যা রায়/লালন ফকির/পরিচালনা: শক্তি চট্টোপাধ্যায়

থেকে অমর শর্মার নিয়োগপত্র হস্তগত করে গ্রামের হাসপাতালে সে চাকরি নেয়। এই গ্রামেরই মেয়ে সন্ধ্যা (বিদ্যা সিনহা) যে একদা তার জটিল হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল এবং সেখানেই আনন্দের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ।

নিষ্ঠা, অমায়িক ব্যবহার এবং সুচিকিৎসার জন্য আনন্দ ওরফে অমর শর্মা গ্রামে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। সন্ধ্যার সঙ্গে আলাপ ক্রমে প্রণয়ে রূপান্তরিত হল। ঠিক এই সময়েই সন্ধ্যা আক্রান্ত হল গুরুতর হৃদরোগে। অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি নেই। গ্রামের হাসপাতালেও যথেষ্ট সরঞ্জামের অভাব। অথচ রোগিণীর যা অবস্থা তাতে তাকে দূর শহরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। অগত্যা আনন্দ ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্রোপচার করে সন্ধ্যাকে বাঁচিয়ে দেয়। কাহিনীর পরিসমাপ্তি মিলনান্তক ঘটনায়।

নাট্যাবেগ সম্পৃক্ত কাহিনীটির সঙ্গে বহু বছর পূর্বে যাত্রিক প্রযোজিত বাংলা ছবি 'কাচের স্বর্গ'র মিল অত্যন্ত প্রকট। হয়তো এই অনুকরণই 'মেরা জীবন'কে আর পাঁচটা হিন্দী ছবির তুলনায় কিছুটা ভব্য দেখায়। সরলভাবে দৃশ্য বিন্যাসে ও ঘটনার পরিকল্পনায় পরিচালক বিন্দু শুক্লা যথেষ্ট পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গানের পরিবেশন ক্ষেত্রে (সাধুদের দিয়ে প্রায় 'ডাক-টুইস্ট' নাচ, বা প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশে সন্ধ্যার গান গাইতে গাইতে মাঠ-ঘাট বাজার—বলতে গেলে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা) পরিমিতি বোধকে বিসর্জন দিয়েছেন। প্রেমের স্ফুরণ বোঝাতে শুকনো গাছকে পল্লবিত করে তোলার মতো প্রতীক হাসিরই উদ্রেক করে।

সাধারণত যে ধরনের হিন্দী ছবি দেখা যায় সে-পরিপ্রেক্ষিতে ছবিখানি একটু ভিন্ন স্বাদের। গ্রামবাসীর সেবায় ডাক্তারদের উদ্বুদ্ধ করে তোলার দিক থেকেও একটি সৎ প্রচেষ্টা।

কাহিনীকার এম জি হাসমৎ ও সুরের নখনৌবির সংলাপ সরস। এদেরই পূর্ববর্তী ছবি 'কোরা কাগজ'-এর অনুকৃতি হলেও গানগুলি (সুর : স্বপন-জগমোহন) সুশ্রাব্য। পুরনো দিনের অভিনয়শিল্পী চন্দ্রাজ, সুলোচনা প্রভৃতিকে নতুন ধরনের চরিত্রে ভাল লাগবে। ভাল লাগবে হরীন্দ্রনাথের ডাঃ ত্যাগীর চরিত্রচিত্রণ।

—শৌভিক

জীবন নিয়ে সাধনা ফিল্মে

জীবন নিয়ে অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু এমন একটি ছবি যে হতে পারে, যার আদ্যন্ত অনুসন্ধান করেও কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় না সেটাও একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে। প্রথমে তো ভাবা গিয়েছিল যে সংগীতের উৎস সন্ধানে এ এক ডকুমেন্টারি ছবি। পরে বোঝা গেল যে না, এটা এক প্রায়-পাগল সংগীতশিল্পীর কাহিনী। কাহিনী বললাম কি? না, ওটা বলা বোধ হয় উচিত নয়। এটা বোধ হয় কোন সংগীতশিল্পীর কিছু পাগলামির নির্বাচিত দৃশ্যাবলী।

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবি নাকি ভারতে অনুষ্ঠিত ৫ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা-বহির্ভূত মার্কেটিং সেকশনে পাঠানো হয়েছিল। রাশিয়া, নাইজিরিয়া, ইউ কে এবং মিশরের কোন কোন ব্যক্তি নাকি ছবিটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। খুব ভাল কথা। ওই সব দেশে যদি এই ছবির কদর হয় তবে ভারতবাসী হিসেবে আমরা অবশ্যই গর্ব অনুভব করব। তবে আপাতত সেটা পারা যাচ্ছে না বলে আন্তরিক দুঃখিত।

ছবিতে চিত্রনাট্য বলে কোন পদার্থ আছে কিনা সেটা গবেষণার বস্তু। মনীষকুমার (অসীমকুমার?), তরুণকুমার, সুমিত্রা সান্যাল, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, কণিকা সরকার এবং স্বর্গত জহর গাঙ্গুলি, ধীরাজ দাস ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা যত ক্ষমতাশালীই হোন না কেন এ-ছবিতে অভিনয় করে দর্শকের মনে পৌঁছানোর ক্ষমতা তাঁদেরও নেই। যেটি পৌঁছেছে সেটি হল গান। চিন্ময় লাহিড়ী সুরারোপিত গানগুলি শুনতে সত্যিই ভাল লাগে। কিন্তু ছবি দেখতে বসে তো আর চোখ বুজে গান শোনা যায় না। হায়, সেটা যদি সম্ভব হত?

—রবি বসু

বোম্বাই থেকে

'চোমানা দুদি' ১৯৭৫ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়াতে সকলেরই খুশি হবার কথা। এই বছরের গোড়ার দিকে বোম্বাইয়ে যে চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল তাতে ছবিটি দেখানো হয়েছিল এবং প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হিসাবে 'মৌসম' ছবির নির্বাচনও অভিনন্দনযোগ্য। ওই ছবিটি বছরের শ্রেষ্ঠ হিন্দী ছবির সম্মানও পেয়েছে। এই ছবি দুটির নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী তারিফ পেতে পারেন। তবে নির্বাচকমণ্ডলীতে যে কজন সাংবাদিক ছিলেন তাঁদের স্থান পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এঁরা হলেন : শ্রীমতী অমিতা মালিক, অনিল সারি, বরুন শ্রীবাস্তব এবং কে এল আমরা। এঁরা সকলেই দিল্লির সাংবাদিক। এঁদের যোগ্যতা নিয়ে কোন
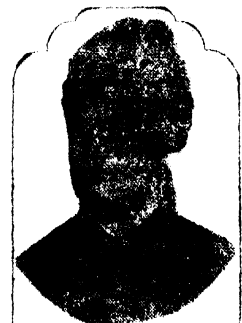
প্রশ্ন উঠছে না। প্রশ্নটা হচ্ছে বছরের পর বছর কেবল দিল্লির সাংবাদিকরাই নির্বাচক-মণ্ডলীতে স্থান পেয়ে যাবেন কেন? কলকাতা, বোম্বাই কিংবা মাদ্রাজে কি এই কাজের যোগ্য সাংবাদিকের অভাব? একমাত্র কারণ হতে পারে যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাংবাদিকদের আনতে গেলে তাঁদের ভ্রমণব্যয় এবং থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে কিছু খরচ হবে। তা এরকম একটা বৃহৎ এবং মহৎ ব্যাপারে এই খরচ-টুকু কি খুবই অযৌক্তিক। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ব্যাপারটি একটু ভেবে দেখতে পারেন।

—সুরঞ্জন

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

"ফটোগ্রাফিটা তুমি-ই কর না।" কথাটা বললেন সত্যজিৎ রায় সুব্রত মিত্র নামের একটি বছর কুড়ি বয়সের নাবালক, কিন্তু-কিন্তু করা ছেলেকে। "আমি? তা কি করে হবে? আমি তো কিছু-ই জানি না," ছেলেটি প্রায় আতঙ্কিতভাবে উত্তর দিল। সত্যজিৎ নির্দ্ধিধায় বললেন, "এতে আবার জানার কি আছে? তুমি তো স্টিল ফটোগ্রাফি কর-ই। ব্যাপারটা তো একই। শুধু এখানে সুইচ টিপলেই ক্যামেরা চলে।"

এইভাবে শুরু—একই সঙ্গে 'পথের পাঁচালী', সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্রর। ছবিটা যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এমন একটা কাণ্ড করবে, তাকি তাঁরা জানতেন!

সুব্রতর মুখ থেকে সরাসরি শুনতেই

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, দীপংকর দে/**পরিচয়**/পরিচালনা : নির্মল মিত্র

আপনাদের ভাল লাগবে : "কলেজে বি এসসি পড়তে-পড়তে আমি তখন চূড়ান্তভাবে ঠিক করেছি যে ক্যামেরাম্যান হব। এর আগে আরকিটেক্ট কিংবা মিউজিশিয়ান হব, এ-কথাও মনে-মনে নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু মিউজিকটাকে জীবিকা করার সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম না। (এখানে স্মর্তব্য যে 'পথের পাঁচালী'র একটি গভীরস্পর্শী সিকোয়েন্স-এ, যেখানে সেই মিষ্টিওলার পিছন-পিছন অপু, দুর্গা আর একটি কুকুর সারিবদ্ধভাবে চলেছে, সেখানকার আবহ-সংগীতে সেতার বাজিয়েছেন সুব্রত। এ-ছাড়া রেনোয়ার পৃথিবী-বিখ্যাত ছবি 'দি রিভার'-এর টাইটেল মিউজিকেও সুব্রতর বাজনা শোনা যায়।) আবার, সিনেমাটোগ্রাফি শেখার চেষ্টা করেও বিফল হলাম। কেননা কলকাতার নামকরা ক্যামেরাম্যানেরা আমায় তাঁদের সহকারী করে নিতে সক্ষম হলেন না। তাই মা-বাবার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে বাধ্য হলাম যে যতদিন না কাজ শেখার কোনো সুযোগ পাচ্ছি, ততদিন বি এসসি পড়ব। আশাতীতভাবে আমার কলেজ ছাড়ার সুযোগ করে দিলেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী পরিচালক জাঁ রেনোয়া এবং ফটোগ্রাফার ক্লড রেনোয়া। এঁরা তখন কলকাতায় তাঁদের 'দি রিভার' ছবিটা তুলছেন। এ-ছবিতে ফটোগ্রাফার হিসেবে আমি কাজ করার কোনো সুযোগ পাইনি ঠিক, কিন্তু সিনেমায় আমার প্রথম হাতেখড়ি হয় এই দুজন বিখ্যাত শিল্পীকে কাজ করতে দেখে। অবশ্য এ-ছবির শুটিং দেখে আমি কতটা কি শিখতে পেরেছিলাম জানি না। তবে এটুকু বুঝেছিলাম, প্রকৃত চলচ্চিত্রকারের কাছে সিনেমাটাই তার একমাত্র ধর্ম।

"ক্যামেরাম্যান হতে চেয়েছিলাম ঠিক-ই, কিন্তু সে সুযোগ যে 'দি রিভার'-এর কাজ দেখার কিছুদিন পরেই আমার জীবনে একেবারে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে আসবে, সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। স্টিল ফটোগ্রাফির সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফির তফাৎটা যে শুধু সুইচ টেপাতেই নয়, সেটা 'পথের পাঁচালী' তুলতে-তুলতে প্রতি মুহূর্তে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। বলতে পারেন, 'পথের পাঁচালী' ছবিটা শুরু করার সময়ে আমি একেবারে আনাড়ী ছিলাম, এবং ঐ ছবিটা করতে-করতেই আমি কাজ শিখি। এবং এর জন্যে আমি একমাত্র মানিকদার কাছেই বিশেষভাবে ঋণী। কেননা, মানিকদা সেদিন আমাকে হাত-পা বেঁধে ঐভাবে জলে না ফেললে, আমি শেষ পর্যন্ত ক্যামেরাম্যান হতাম কিনা জানি না।

"এত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং তখনকার টালিগঞ্জের হিতৈষীদের অনেক বাধা ও উপদেশ অতিক্রম করে তিনি যে আমাকে দিয়ে তাঁর প্রথম ছবিটার ফটোগ্রাফি করালেন, তার একটা মূল কারণ বোধহয় যে তিনিও তখন একেবারে আনকোরা নতুন। এবং বুঝেছিলেন যে তিনি যে-সব নতুন জিনিস করতে চান সেই অ্যাডভেনচারে একজন এস্টাবলিস্ট, একসপিরিয়ানসড ক্যামেরাম্যানকে নিলে তাতে অনেক অসুবিধের সৃষ্টি হতে পারে। তবে, আমার মত একজন আনাড়ির হাতে এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে তিনি বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, না আমি রাজী হয়ে বেশি সাহস দেখিয়েছিলাম, তা জানি না।"

সুব্রত মিত্র কিন্তু আজ প্রায় বছর পঁচিশ চলচ্চিত্র-ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত থেকেও খুব বেশী ছবি করেননি। এবং বাংলা ছবিতে একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেই তিনি কাজ করেছেন। তাঁর ছবির তালিকা থেকে বোঝা

বিমল মুখোপাধ্যায় : ক্রমাগত পেছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। ফটো : দেশ

সুব্রত মিত্র : আরো খুঁতখুঁতে হয়ে বদনাম কিনতে আপত্তি নেই। ফটো : দেশ

বিজয় ঘোষ : গ্ল্যামার লাইটিং-এ কাজ করতে ভালবাসি। ফটো : দেশ

যায় যে, তিনি একেবারে প্রথম শ্রেণীর কাজ ছাড়া করেনই নি। যেমন, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' 'পরশপাথর' 'জলসাঘর' 'অপুর সংসার' 'দেবী' 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' 'মহানগর' 'চারুলতা' 'নায়ক'। এছাড়া বাসু ভট্টাচার্যের 'তিসরি কসম' জেমস আইভরির 'হাউসহোলডার' 'শেকসপীয়রওয়ালা' শিদ গুরু 'বমবে টকী' এবং হংকং-এ তোলা আচ' বলে একটা চীনে ছবি।

বাজারে একটা কথা চালু আছে যে সুব্রত খুব খুঁতখুঁতে। এই প্রসঙ্গে সুব্রত বললেন, "সেটা কি কোনো শিল্পীর পক্ষে দোষের ? আমার তো মনে হয়, খুঁতখুঁতেমি চলে গেলে শিল্পীর মৃত্যু। যদি সিনেমার অর্থনৈতিক দিকটা বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে আমার আরও খুঁতখুঁতে হয়ে আরো বদনাম কিনতে কোনো আপত্তি নেই।"

সুব্রতর দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত' থেকে উনি 'বাউনস্' লাইটিং নিয়ে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, এবং যে ধরনের লাইটিং আজ সমস্ত ভারতবর্ষে চালু হয়ে গেছে, সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "সহজ করে বলতে গেলে, আমরা মোটামুটি দু ধরনের আলো দেখে থাকি। একটা হল ডিরেকট লাইট। যেমন বাইরে, সূর্যের আলো; রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্ব-এর আলো, অথবা দিনে ঘরের মধ্যে জানলা দিয়ে রোদ ঢুকেছে ইত্যাদি। এই ধরনের আলো খুব কড়া, এবং এই আলো কোনো বস্তুতে পড়লে ন্যাচারেলি তার শ্যাডোটাও খুব হার্ড বা কড়া হয়। অন্য ধরনটা হল, এক ধরনের ডিফিউজড, সফট, শ্যাডোলেস আলো, যা আমরা বাইরে মেঘলা দিনে, কিংবা সূর্য ওঠার আগে বা সূর্যাস্তের পর পেয়ে থাকি। অথবা, দিনে ঘরের মধ্যে রোদ ছাড়া যে সাধারণ ডিফিউজড দিনের আলো ঢোকে। কেন জানি না, সিনেমায় শুধু প্রথম ধরনের আলো দিয়েই ছবি তোলা হতো। দ্বিতীয় ধরনের আলোর সঙ্গে যদিও আমরা দৈনন্দিন জীবনে খুবই পরিচিত, কিন্তু সিনেমায় সে ধরনের লাইটিং-এর কোনো চেষ্টা হয়নি। বলা বাহুল্য, এ ধরনের আলোর মুড সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেঘলা দিনের স্যাটেলাইট কটকটে রোদ্দুরে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তেমনি, ঘরের মধ্যে দিনের বেলায়, কিংবা সন্ধ্যায় যে আলো আমরা দেখি, তা ডিরেকট লাইট ব্যবহার করে পাওয়া যায় না। সব সময়ে ঘরের মধ্যে ডিরেকট লাইট ব্যবহার করাটা যেন সব সময়ে বহির্দৃশ্য কটকটে রোদ্দুরে তোলার মত। তা হলে কি সিনেমা থেকে ভোরবেলা, সন্ধ্যে অথবা মেঘলাদিনের সেই বিশেষ বিশেষ মুডগুলো বাদ পড়বে? বাউনস্-লাইটিং ব্যবহারের রিয়েলিজম-এর দিকটা ছাড়াও একটা বিশেষ আর্টিস্টিক দিক আছে। 'অপরাজিত'র সময়ে বাউনস লাইটিং প্রথম শুরু করতে বোধহয় এখানকার অন্যান্য ফটোগ্রাফাররা জিনিসটা খুব ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু পরে প্রায় সবাই এই ধরনের লাইটিং করতে শুরু করেন। একচ্ছায়ালি আলো বাউনস না করে অথচ যাতে সেই একই এফেক্ট পাওয়া যায়, তার জন্যে আমি ঠিক 'চারুলতা'র আগে কতকগুলো বিশেষ ধরনের আলো তৈরি করেছিলাম। আলোগুলো খুবই সফল হয়েছিল। কলকাতার সব স্টুডিওতেই এখন সে আলো আপনি দেখতে পাবেন। এবং প্রায় সকলেই সেগুলো ব্যবহার করেন। এটা ভাবতে খুব ভাল লাগে।"

টালিগঞ্জের আর একজন খুব উঁচুমানের অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান হলেন বিমল মুখোপাধ্যায়। এই লম্বা, রোগা, হাসিখুশি, নম্র মানুষটি তপন সিংহর বেশির ভাগ ছবিতেই ক্যামেরার পিছনে থাকেন। ছেলেবেলায় পাঁচ টাকা দামের একটা বক্স ক্যামেরা দিয়ে বিমল মুখোপাধ্যায় ছবি তোলা শুরু করেন। ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে অজয় করের সহযোগী হয়ে তিনি প্রথম সিনেমাটোগ্রাফি আরম্ভ করেন দেবকী বসুর 'কৃষ্ণলীলা' এবং নীরেন লাহিড়ীর 'অ্যারেবিয়ান নাইটস' ছবিতে। এ পর্যন্ত যে সব উল্লেখযোগ্য ছবিতে তিনি ক্যামেরার কাজ করেছেন সেগুলি হল, 'গৃহপ্রবেশ', 'দৃষ্টি', 'মণিহার', 'সাগর সঙ্গমে' (প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল পেয়েছিল), 'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'খাদিপসীর বাক্স' বাকস', 'লৌহকপাট', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'ঝিন্দের বন্দী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (প্রেস ফটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন থেকে পুরস্কার পেয়েছিল ফটোগ্রাফির জন্য), 'জতুগৃহ', 'নির্জন সৈকতে' (ফটোগ্রাফিতে বি এফ জে এ পুরস্কার), 'আরোহী', 'আপনজন' (বি এফ জে এ পুরস্কার), 'আঁধার পেরিয়ে' 'সাগিনা মাহাতো' (হিন্দী এবং বাংলা), 'রাজা' (ফটোগ্রাফিতে স্টেট অ্যাওয়ার্ড), 'হারমোনিয়াম' এবং 'এক যে ছিল দেশ'।

জানতে চাইলাম, 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথায়' আপনার ছবিতে যে টোন, যে ডেনসিটি পেয়েছি, তা আর ইদানীং দেখি না কেন? উত্তরে বিমল মুখোপাধ্যায় : "আমার মনে হয়, [illegible] পর বছর ফটোগ্রাফার হিসেবে আমি ক্রমাগত পেছিয়ে

যেতে বাধ্য হচ্ছি। এর কারণ একাধিক। প্রথমত, টালিগঞ্জে যে ক'টা ক্যামেরা আছে, সেগুলো ব্যবহার করতে করতে ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার কোনো রিপ্লেসমেণ্ট নেই। দ্বিতীয়ত, 'হাঁসুলি বাঁকে' কোডাক ফিলম-এ কাজ করেছি। সে জাতের ফিলম এখন আর আসে না। তৃতীয়ত, তখন ল্যাবরেটারিতে ফরেন কেমিকেলস দিয়ে প্রসেসিং হত। দিশী কেমিকেলস-এ সে রেসপনস পাওয়া যায় না। চতুর্থত, আলোর ভোলটেজ কমাবাড়ার জন্যে প্রয়োজনমত স্টুডিও লাইটিং করা যায় না। এবং টালিগঞ্জে কোনো ভোলটেজ স্টেবিলাইজার নেই। তা ছাড়া, টেকনিশিয়ানদের মাইনে এত কম যে, এর চেয়ে ভাল কাজ তাদের কাছ থেকে আশা করাও যায় না। একটা কথা উঠেছে, টালিগঞ্জে আরো বেশী বাংলা ছবি করতে হবে। যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি না করলে সে সব ছবির টেকনিকাল দিকটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় যে 'জন-অরণ্যে'র মত ছবি তৈরি হতে পারে, সেটা কিন্তু মিরাকেল!"

বিমল মুখোপাধ্যায়ের ঠিক এক বছর পরে বিভূতি লাহার সহকারী হয়ে যে নতুন ক্যামেরাম্যানটি টালিগঞ্জে ছেচল্লিশ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর ঢুকে পড়েন তাঁর নাম বিজয় ঘোষ। যে সব উল্লেখযোগ্য ছবিতে বিজয় এ পর্যন্ত কাজ করেছেন সেগুলি হল : পুত্রবধূ, অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে সাগরিকা, একটি রাত, সূর্যতোরণ, পথে হল দেরি (রঙিন), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, যদুভট্ট, বিপাশা, কিছুক্ষণ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, শুধু একটি বছর, রাজদ্রোহী, সব্যসাচী, ব্রজবুলি, সেই চোখ, রাজবংশ বাবুমশাই, বহ্নিশিখা, সিসটার এবং প্রণয়পাশা। দেখা যাচ্ছে, উত্তম-সুচিত্রার ছবি হলেই ইদানীং বিজয় ঘোষের ডাক পড়ছে। এর কারণ কি জানতে চাইলে, বিজয় বললেন, "উত্তমবাবু এবং সুচিত্রা দেবী আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। আমি গ্ল্যামার লাইটিং-এ কাজ করতে ভালবাসি। এতে আর্টিস্টকে সব সময়ে সুন্দর দেখায়, মুখের খাঁজটাজ বয়েসটয়েস ধরা পড়ে না। রোম্যাণ্টিক নায়ক-নায়িকার পক্ষে এ ধরনের লাইটিং খুব উপযোগী। বিশেষ করে শিল্পীর যখন বয়স হয়ে যাচ্ছে।"

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্য ও নাট্যে সফল

এক সময়ে মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা রঙ্গমঞ্চে লোভনীয় নাটক হিসেবে হাজির হয়েছিল। তার কারণ, মধুসূদন কবিতায় নাট্যরসকে নিয়ে এসেছিলেন। এখন বলা হয়, মেঘনাদবধ আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের পূর্বসূরী। প্রয়াস সত্ত্বেও বীররসাস্পদ মহাকাব্য নয়, করুণ রোমান্স এই কাব্যের স্বভাব। রবীন্দ্র সদনে পনেরো জুলাই নব-নালন্দার "মেঘনাদবধ" নৃত্যনাট্যে সেই স্বভাবটি ধরা পড়েছে। প্রযোজনা সে-কারণেই সার্থক।

এই নৃত্যনাট্যে নৃত্যের চেয়ে অভিনয়ই অনেকখানি জায়গা জুড়েছে। সেটা অবাঞ্ছিত হয়নি। কথাকলি এবং কিছুটা কত্থকের উপর ভর করে নাট্যের নৃত্যাংশ। স্বভাবতই এখানে উদয়শঙ্করের টেকনিক মনে পড়ে। আবহসংগীতে পারকাশন যথেষ্ট এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছে।

মূল কাব্যের রসকে এখানে বিচিত্র বর্ণ ব্যবহারে আর আলোক-সম্পাতে রূপায়িত করা হয়েছে। অবশ্যই কঠিন প্রয়াস। কিন্তু রূপসজ্জা থেকে মঞ্চসজ্জা পর্যন্ত বর্ণের ভারসাম্য নৃত্যনাট্যের চমকপ্রদ সহযোগী হয়ে উঠেছে। প্রতিটি কুশীলবের প্রবেশ-প্রস্থান সেখানে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুদৃশ্য।

আগেই বলা হল, রোমান্স এই কাব্যের বারো আনা অংশভাগী। নৃত্যনাট্যের সুন্দরতম মুহূর্তগুলিও মেঘনাদ-প্রমীলাকে ঘিরে রয়েছে। মেঘনাদের ভূমিকায় নরেশ-কুমারের নৃত্যাভিনয় দৃপ্ত ব্যক্তিত্বকে মঞ্চস্থ করেছে; তাঁর সঙ্গে সুঠাম সমতা রেখেছেন প্রমীলার ভূমিকায় সুমিত্রা মিত্র। এই যুগ্ম-জনের অভিনয়ও সাধুবাদযোগ্য। অন্য দিকে, রাবণের ভূমিকায় অনাদিপ্রসাদ নৃত্যে যেমন স্বচ্ছন্দ, অভিনয়ে অবাধ তত নন। এই নাটকের ট্রাজিক সমাপ্তি তাই ফুটে যায় প্রমীলার অগ্নিপ্রবেশের সঙ্গে। রাবণের হার্দ্য বিলাপও সেখানে বাহুল্য মনে হয়। অনাদিপ্রসাদের কৃতিত্ব অবশ্য নৃত্য পরি-কল্পনায়, বিশেষত তাঁর কোরিওগ্রাফিতে। আর, অন্য ভূমিকায় গন্ধর্বদ্বয়ের (সুনীত বসু ও ধূর্জটি সেন) নৃত্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এবং হনুমানের ভূমিকায় তিমির রায় আর তাঁর সেনাবৃন্দ সংযত নৃত্যাভিনয়ে অন্তত এখানে কবির কথামত জোক স্পয়েল করেনি। আপত্তি উঠতে পারে রাম ও লক্ষ্মণের ভূমিকা সম্পর্কে। রাম কৃশ দুর্বল এবং লক্ষ্মণের তনু বা ভঙ্গী 'দেবাকৃতি কেশরী'সুলভ নয়। রাম লক্ষ্মণ সম্বন্ধে মধুসূদনের অনীহা ছিল—নির্দেশিকা ভারতী মিত্র কি তাকেই অনুসরণ করেছেন? কিন্তু কাব্যটির চতুর্থ সর্গ রাবণের ট্র্যাজেডিকে ডেকে আনে। সীতার স্মৃতিচারণা সংক্ষেপেও এখানে যদি যুক্ত হত! বৈদেহীর দীর্ঘশ্বাস নয়, নৃত্য-নাট্যে মেঘনাদের পরাজয় দেবকুলের ষড়যন্ত্রে ঘটেছে। প্রযোজনায় এখানেই মানবিকবোধের কিঞ্চিৎ অভাব রয়ে গেল।

মেঘনাদবধ কাব্যের যা প্রাণের পদার্থ সেই শব্দসম্ভার এই নৃত্যনাট্যেরও প্রাণ-সম্পদ। কাজী সব্যসাচীর পাঠ, সুচিত্রা মিত্র কল্যাণ রায় বিপ্লব দাশগুপ্তের বিভিন্ন ভূমিকায় আবৃত্তি নাটকটিতে অন্য মাত্রা যোজনা করেছে। সংলাপে মধুসূদন কত প্রখর ছিলেন, এই আবৃত্তি শুনে বাড়ি ফিরে মেঘনাদবধ কাব্য আবার খুলে দেখতে ইচ্ছে করে। শব্দ এখানে বহুমানিত একটি ভূমিকা নিয়েছে।

নৃত্যাংশে কিছু পুনরাবৃত্তি রয়েছে; লক্ষ্মী, মায়া বা ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর অংশটুকুতে সম্পাদনার অবকাশ থেকে গিয়েছে। আর বর্ণ ও শব্দের এই সমারোহের মাঝে একটা বিরতিও প্রয়োজন।

—অপ্রতিম বসু

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

মোদী সুতা
নীডলওয়ার্ক
প্রতিযোগিতা
প্রথম পুরস্কার ১০,০০০/- টাকা
৫০,০০০ টাকা মূল্যের অন্যান্য লোভনীয় পুরস্কার
২ দ্বিতীয় পুরস্কার
৪ টি তৃতীয় পুরস্কার
৮ টি চতুর্থ পুরস্কার
১০ টি পঞ্চম পুরস্কার
১০০ টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ভেবে দেখুন ! ১০,০০০ হাজার টাকা নগদ ! এটা দিয়ে আপনি কি না করতে পারেন ?
ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাইতে পারিবেন। অথবা জমা রাখিতে পারিবেন। এ টাকা আপনারই হইতে পারে।
একদম অযথা সময় নষ্ট করবেন না। এখুনি আপনি নীডল ওয়ার্ক আরম্ভ করে দিন।
নিয়ম কানুন খুবই সহজ !
স্বাধীন বিচারপতির একটি দল এই প্রতিযোগিতার বিচার করিবেন এবং এদের সিদ্ধান্তই হইবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। ইচ্ছামত আপনি প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারিবেন। একটি পৃথক কুপনের সাথে প্রতিটি প্রবেশপত্র পাঠাইতে হইবে আর এর সঙ্গে থাকিবে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা আপনার নাম ঠিকানার একখানা অতিরিক্ত কাগজ।
পুরস্কার বিজয়ী সব প্রবেশপত্রই মোদী সুতা কারখানার সম্পত্তি হইবে এবং এদের অধিকার কারখানার হাতে সংরক্ষিত হইবে। প্রতিযোগিতার পর বাকি জিনিষগুলি অংশগ্রহণকারীদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। প্রবেশপত্র হারানোর জন্য মোদী সুতা কারখানা দায়িত্ব নেবে না। প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য আপনার সমীপের মোদী সুতা ডীলারের কাছ থেকে একটি প্রবেশপত্র চেয়ে নিন।
তাড়াতাড়ি করুণ ! পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে আগষ্ট ১৯৭৬।
আপনাকে কি করিতে হইবে !
মোদী সুতার 'এম টি এম' স্ট্রেণ্ড এমব্রয়ডারী সুতা, ক্রুশেট সুতা, অথবা নিটিং কার্পাস দিয়ে আপনার পছন্দমত কিছু একটি সৃষ্টি করুন। এমব্রয়ডারী, নিটিং, জাল সেলাই অথবা ক্রুশেট সেলাই আদি যে কোন সেলাই আপনি করতে পারেন। এ যে কোন আকার, আয়তন কিম্বা পরিধির হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবেন যে ইহা মৌলিক হওয়া দরকার।
মৌলিকত্ব, রং এবং সেলাই-এ আপনার পছন্দের ওপরে নির্ভর করিয়া আপনার নীডল ওয়ার্কের গুণাগুণ নির্ণয় করা হইবে। অধিকন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর সেলাই-এর শিল্পনৈপুণ্যের ওপরেও নির্ভর করিবে। আপনার নীডল ওয়ার্কে ব্যবহৃত এম টি এম সুতোর লেবেল এবং ক্রয়ের রসিদ সংরক্ষণ করিবেন। এগুলি আপনার প্রবেশপত্র/পত্রাদির সাথে রেজিস্টার্ড এ ডি করিয়া নীচের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিন।
প্রাপক :
MODITHREAD NEEDLEWORK CONTEST
Modi Thread Mills,
Modinagar U P
মোদী সুতা নীডল ওয়ার্ক প্রতিযোগিতার প্রবেশপত্রের কুপন
নাম
ঠিকানা
প্রাপক: MODITHREAD NEEDLEWORK CONTEST
Modi Thread Mills, Modinagar, U.P.
মোদী সুতো
৩০ টার চেয়েও অধিক দেশে বিক্রী হয়
OBM/3150 Ben

নিউ
গ্রেট
মিল্‌স

দেশ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

EVEREADY®
DOUBLE ACTION
সর্বোচ্চ দাম
টা ১.৮০, কর আলাদা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি : (১৬½"×১০") নেপালী তুলোট কাগজের উপর কালি-কলমের রেখাচিত্র—বারাণসীর ঘাটের দৃশ্য সুন্দর টানে এঁকেছেন। মানুষজন বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে ভারসাম্য এনেছেন। রচনাসৌকর্য লক্ষণীয়। আরতি ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অমিয় চক্রবর্তীর

সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ

অনিঃশেষ

দাম ৪·০০

রবীন্দ্রপরবর্তী কালের অগ্রণী কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিন্তা এখনও সতেজ, দৃষ্টি এখনও ভোরবেলার আলোর মতো অন্ধকারকে ছিন্ন করে। প্রবীণ, প্রাজ্ঞ এই কবির রচনায় মৌলিক নানা প্রশ্ন এসে উত্তরের কাছে নতজানু হয়, এবং
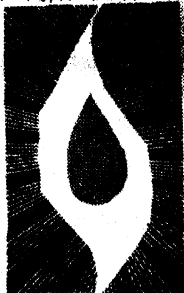
প্রকাশিত হল

মৌলিক নানা বিরোধ এগিয়ে যায় মীমাংসার দিকে। ফলত, তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের এমন একটি আলেখ্যের আমরা সন্ধান পাই, যা অন্যত্র লভ্য নয়। সংঘাতকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু শান্তিকেই তিনি সত্য বলে জানেন ; বিনাশ-সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েই উচ্চারণ করেন সেই অমৃতমন্ত্র, মর্ত্যলোকে যা আজও অমর্ত্য আনন্দের আশ্বাস এনে দেয়। যাঁর কবিতা আমাদের বারেবারে জানিয়ে দেয় যে, মৃত্যুই শেষ কথা নয়, তাঁরই সাম্প্রতিক কবিতাবলীর সংকলন এই গ্রন্থ—'অনিঃশেষ'।

রূপদর্শীর ব্যঙ্গগল্প-সংকলন

ব্রজদার গল্পসমগ্র ৬.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

যাও পাখি ২৫.০০

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস

দৌড় ৬.০০

গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস

লোকটা ৩.০০

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-উপন্যাস

বাক্সরহস্য ৫.০০

মৌমাছি-র চিত্রে জীবনী

রাজার রাজা ৭.০০

আনন্দ বাগচীর কিশোর-উপন্যাস

বনের খাঁচায় ৫.০০

লীলা মজুমদারের ছোটদের

বাতাসবাড়ি ৪.০০

শৈলেন ঘোষের রূপকথা

বাজনা ৫.০০

হীরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-গল্প

পাথরের চোখ ৬.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত

অষ্টম মুদ্রণ
প্রকাশিত হল

উলঙ্গ রাজা ৪.০০

প্র কা শি ত হ ল

বন্ধু মোহনের প্ররোচনায় গিরিজাপতি একটি লোহার টুকরো চুরি করেছিল গ্যারাজ থেকে, এক দুপুরে শুয়েছিল রুনুর মায়ের সঙ্গে। এই ব্যাপার দুটো সে কখনো ভুলতে পারেনি। গ্যারাজে লিফটের নীচে একটি পা গুঁড়িয়ে যাবার পর আজীবনের জন্য গৃহবাসের দণ্ড পাওয়া গিরিজাপতি প্রতি দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে রুনুর অফিসে যাওয়া ফেরার সময়টিতে। মনে ভয়, হয়তো রুনু অফিস থেকে আর ফিরবে না; মনে সন্দেহ, পাশের ঘরের ফুটবলার ভাইয়ের সঙ্গে রুনুর হয়তো দেহ-সম্পর্ক আছে। ঈর্ষা এবং সন্দেহ যখন কুরে কুরে তার মধ্যে একটা গর্ত তৈরি করে তাকে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছে তখনই সে উদ্ধারের আশায় মোহনের রুক্ষতা, জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, কলেজে পড়া, চোখকানা, কুৎসিত চেহারার বুলিকে আঁকড়ে ধরতে গেল। এই লোকটিকে মতি নন্দী অবশেষে এমন এক ভয়ংকর অমোঘ জায়গায় এনে দাঁড় করালেন যেখান থেকে আরো গভীরতর গর্তে লাফিয়ে পড়া ছাড়া গিরিজাপতির আর কোন উপায় নেই ॥ দাম ৬·০০ ॥

মতি নন্দীর

নতুন উপন্যাস

বারান্দা

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪১ সংখ্যা
শনিবার ২২ শ্রাবণ ১৩৮৩

এশিয়াটিক সোসাইটি

বিখ্যাত ভারতীয় পুষ্পতরু 'অশোক' যে নতুন বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত হয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিখ্যাত বান্ধবের নাম-পরিচয় নিহিত করা হয়েছে। এই ঘটনাকে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিখ্যাত বান্ধবের এবং ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের এক পথিকৃৎ গবেষকের স্মৃতির প্রতি ভারতীয় কৃতজ্ঞতার প্রকাশ চিরায়ত করবার একটি আন্তরিক কর্তব্যের উদযাপনা বলে মনে করা চলে। স্যার উইলিয়ম জোন্স, যিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরই স্মৃতির সৌরভ নিয়ে অশোক পুষ্প জোন্সিয়া নামে চিহ্নিত হয়েছে। সেই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এখন 'রয়াল' বিশেষণ বর্জন করে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে অভিহিত ও পরিচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, জোন্সের স্মৃতির প্রতি ভারতীয় জাতির আন্তরিক সম্মান চিরায়ত করতে হলে যেটা হবে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সব চেয়ে বড় সার্থকতার অভিব্যক্তি, সেটা এই এসিয়াটিক সোসাইটির যথোচিত সুরক্ষার সংকল্প। অধিকন্তু জাতীয় স্বার্থের এই বাস্তবতার সত্যটিকেও স্মরণ করতে হয় যে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক তত্ত্বের এবং সেই সঙ্গে এশিয়ার বৃহত্তর মহাদেশিক জনজীবনের ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্তের নানা তথ্যের সংগ্রহ সংকলন ও বিচারের সারস্বত প্রয়াস সুপরিচালিত করবার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির মতো সংস্থার সুরক্ষা এবং সুপরিচালনা চাই। দুঃখের বিষয়, এবং ভারতীয় জনজীবনের সাংস্কৃতিক সচেতনতার বর্তমান দীনতারও একটি প্রামাণ্য নিদর্শন এই যে, এসিয়াটিক সোসাইটি বহুবিধ ক্লেশ ও সমস্যায় অভিভূত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো যথোচিত অর্থাৎ প্রয়োজনোচিত আর্থিক সঙ্গতির অভাব। বিভিন্ন সূত্রে প্রচারিত সংবাদের বক্তব্য হতে এমন ধারণা স্বতঃউদ্ভূত হয় যে, সোসাইটির ভাগ্য বর্তমানে বস্তুত একটি আতঙ্কিত সংকটের গহ্বরপূর্ণ অবস্থার প্রান্তে এসে ঠেকে রয়েছে, আরও কিছু অবহেলা ঔদাসীন্য এবং অযোগ্য পরিচালনার সামান্য আঘাতের ঠেলা পেলেই চরম পতনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এতটা আশঙ্কিত হবার মতো যুক্তি সত্যই আছে কিনা, সেটা সোসাইটির প্রকৃত অবস্থার তথ্য নির্ণীত ও বিচারিত হলে তবেই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারা যাবে। অবস্থার পরিচয় জানবার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গত ব্যবস্থা। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও চাই যে, তদন্ত যেন অযথা কোন ঔদাসীন্যে কিংবা কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকোপে বিকৃত অথবা দুর্বল হয়ে না যায়। তদন্ত কমিটির সভাপতি ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন। এই ঘটনাও একটি দুঃখকর অবস্থার সত্যতা প্রমাণিত করে। সোসাইটির বর্তমান অবস্থার শোচনীয় করুণতা যেন ধৈর্যের সীমা হারিয়ে একটা সাধারণ উদ্বেগের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। লোকে প্রশ্ন করতে পারে, ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী মানুষ, যিনি সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত, তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনের ক্ষণে কেন তদন্তের কর্তব্য ও দায়িত্বের সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিযুক্ত করলেন?

সোসাইটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির যথার্থতা সম্পর্কে কারও বিচারবুদ্ধিতে আপত্তির যুক্তি যদি থেকেও থাকে, তবু অবস্থার শোচনীয়তা সম্বন্ধে কোন আপত্তি চলে না বলেই ধারণা করতে হয়। 'ছিঁড়িয়ে গেছে সব সোনার দুইটি তার, জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।' কবির উক্তিতে সমস্যার যে প্রকৃতি বিবৃত হয়েছে, এসিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান অবস্থাও যেন অনুরূপ প্রকৃতির একটি সমস্যার সৃষ্টি। সোসাইটির সুপরিচালনার কর্তব্য নানারকমের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপঘাতে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে অনুমান করতে হয়। আর্থিক সঙ্গতির অভাব যেমন যে-কোন সংস্থার স্বচ্ছন্দ অধ্যবসায়ের পথে একটি কঠোর সমস্যা, অর্থ-সঙ্গতির অসঙ্গত তথা অসতর্ক ব্যবহারও তেমনই চরম অধঃপতন ঘটিয়ে তোলবার মতো একটি ভয়ানক সমস্যা। আশা করা যায়, এবং দেশের সুধী ও শিক্ষিত সাংস্কৃতিক জনসমাজও নিশ্চয় আশা করে যে, সোসাইটির ভাগ্যের এই সমস্যাক্রান্ত অবস্থার প্রতিকার সাধিত হবে। কিন্তু কী ভাবে? স্বয়ং সরকার কি এখন এই সোসাইটির সুরক্ষা সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? আপাততঃ প্রতিকারের উপায় হিসাবে এই উপায় সবচেয়ে যুক্তিসিদ্ধ ও বাস্তবতাসম্মত বলে মনে হয়। আরও মনে হয়, সোসাইটির সুরক্ষা সম্ভব করবার দায়িত্ব কতকটা প্রত্যক্ষভাবেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের উপর আরোপিত হবার মতো যুক্তি লাভ করেছে। দেশের একটি বনিয়াদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, তথা গবেষণা-সংস্থা, তথা প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসার বিপুল ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত সংস্থা এই এসিয়াটিক সোসাইটিকে জাতির বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার কারণে সুপরিচালিত করবার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হলে রাজ্য সরকারের একটি বৃহৎ নৈতিক দায়িত্ব প্রতিপালিত হতে পারবে। এটা দেশের সাংস্কৃতিক জনসমাজের সাধারণ অভিমতের কথা। অবশ্য এই প্রস্তাবের দ্বারা এমন কোন পরিবর্তনের দাবি সংকেতিত হয় না, যার ফলে সোসাইটির আত্মকর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বের নির্বাচন একেবারে অবিহিত ও নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। নির্বাচিত উপদেষ্টা কমিটির সহযোগিতায় সরকার অবশ্যই সোসাইটির পরিচালনার কার্যকর ক্ষমতা সুপ্রযুক্ত করতে পারেন।

এক নজরে

ঘোড়ার কামড়

তিনটি পার্ট ওয়ানের ছাত্রী এসেছিল তাদের হাতে লেখা পত্রিকার জন্যে আশীর্বাণী নিতে।

তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললাম, আচ্ছা বল ত আজকের কাগজে সবচেয়ে বড় খবর কোনটা? একজন বলল, মঙ্গল গ্রহে ভাইকিং ১-এর নামা এবং সেখান থেকে সংকেত পাঠান। আর একজন বলল, পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়া এবং আশার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ হওয়া। তৃতীয়জন বলল, ঘোড়ার কামড়ে মানুষের মৃত্যু হওয়া।

অন্য দুটি খবরের বড়ত্ব নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু তৃতীয়টি, বলাই বাহুল্য, অবাক করে দিল আমাকে বেশ কিছুটা। বললাম, কোথায় মৃত্যু হল মানুষের-ঘোড়ার কামড়ে? এক পাশে গোছা করে রাখা সংবাদপত্রগুলোর ভেতর থেকে একখানা টেনে নিয়ে দেখাল সে ছোট্ট খবরটি। সত্যিই মহেশতলা কুঠিঘাটে নরোত্তম নামে এক পেয়ারা বিক্রেতার কাঁধে কোন সাধুর ঘোড়া কামড়ে দেয়। জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যায় নরোত্তম এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা বড় খবর কি কারণে? সে উত্তর দিল, ঘোড়ার মত একটা

ভাল ও ভদ্র জানোয়ার মানুষকে রেগে গিয়ে কামড়েছে এবং মানুষটা তাতে মারা গেছে, এ কি সোজা ঘটনা? বিষাক্ত সাপে ছোবল মারে, খ্যাপা কুকুরে কামড়ায়, বুনো মহিষে শিং বেঁকিয়ে তেড়ে আসে। কিন্তু ঘোড়া?

আবার উচ্চারণ করল সে ঘোড়ার গুণপনা ব্যাখ্যা করতে ঐ ভাল ও ভদ্র বিশেষণ দুটি। মনে পড়ল ইংরেজি শিক্ষার বিপত্তি বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, দ্য হর্স ইজ এ নোবল এনিম্যাল, এর কি বাংলা হবে? ঘোড়া মহৎ জন্তু? ঘোড়া অতি সদাশয় প্রাণী? কোনটাই লাগসই হচ্ছে না দেখে বলেছেন, এই ধরুন, ঘোড়া একটা উঁচুদরের প্রাণী-ট্রাণী গোছের কিছু হবে আর কি!

সেই উঁচুদরের প্রাণীর সঙ্গে কামড়ান ব্যাপারটা যেন ঠিক খাপ খায় না। আঁচড়ান, কামড়ান, ঢু মারা, গায়ে থুথু দেওয়া ইত্যাদি যেন বড্ড তামসিক মেজাজের কাজ। ওসব বিড়াল কুকুর সাপ গোসাপ ও ষাঁড়দেরই মানায়। ঘোড়াকে মানায় না। ঘোড়ার চরিত্র ও চাল-চলন হল ষোল আনা রাজসিক। তাছাড়া ঘোড়া ত কোনদিন কারোকে সামনাসামনি আক্রমণ করে না। যার ওপর চটে, তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে লাগায় জোড়া পায়ের চাট। আক্রান্তের মুখটা পর্যন্ত দেখে না! কামড়াবে কি করে?

তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় ঘোড়ার কামড়ান নিয়ে একটা লোকপ্রসিদ্ধি আছে। শুধু ঘোড়ার নয়, কচ্ছপেরও। একগুঁয়ে লোকের কান্ডকারখানা বোঝাতে ঐ কথা দুটো ব্যবহার করি আমরা। বলি, মেঘ না ডাকলে দাঁতের পাটি আলগা করে না ওরা। কিন্তু কোন জন্মে ঘোড়ার বা কচ্ছপের কামড়ে মানুষ ঘায়েল হয়েছে, তা শুনিনি। বাজারে দোকানিরা যখন কাছিম কাটে, তখন মুমূর্ষু বেচারীকে দেখেছি প্রাণের দায়ে এক একবার ছুরির ফলা কামড়ে ধরতে। কিন্তু সে হল মরণ কামড়, তার আর কতটুকু জোর? জীবনে ঘোড়ার কামড়ের খবর অবশ্য এই প্রথম দেখলাম ছাপার হরফে।

কিন্তু শুধু কামড়ে নয় আরো অনেক কিছুর সমাচারই আছে খবরটিতে। প্রথমত, দেখুন, আক্রান্ত লোকটির নাম নরোত্তম হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য প্রাণ বাঁচাতে পারল না ঘোড়ার দাঁত থেকে। অথচ কত নরাধমই তো রোজ লাগাম মুখে পরিয়ে পিঠে চেপে বসছে ঘোড়ার, নয়ত চাবুক হাঁকিয়ে গাড়ি টানাচ্ছে তাকে দিয়ে। তাহলে কি পেয়ারাই কাল হল? হয়ত লোভ হয়েছিল ঘোড়ার সেজন্যে এবং নরোত্তম তাকে বিমুখ করেছিল বলেই দাঁতের শিকার হয়েছে।

দ্বিতীয়ত দেখুন, খবর বলছে, ঘোড়াটি কুঠিঘাটের জনৈক সাধুর। গাড়ি ঘোড়া ছিল ধনী গৃহস্থের, নয়ত তাঁদের সিপাই সান্ত্রী ও নায়েব গোমস্তার বাহন। মোটর গাড়ির যুগে এখন ঘোড়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন ঘোড়ার আশ্রয় হল রেসের মাঠ, আর ময়দানে চক্কর দেওয়া ঘোড়-সওয়ার পুলিস। অশ্বজাতির এই দুর্দিনে ভিক্ষাজীবী সাধুর একটা ঘোড়া আছে এবং যে-সে ঘোড়া নয়, রাগে পেলে মানুষের কাঁধে কামড়ায় এমন ঘোড়া এ কি কম কথা?

অবশ্য ঘোড়াটা কোন জাতের, ওয়েলার না আরবী টাট্টু, না শেটল্যান্ড পনি, সংক্ষিপ্ত খবরে তার উল্লেখ নেই। তবে অনুমান করছি পশ্চিমবাংলায় মাঠে ঘাটে খর্বাকৃতি নাদাপেটা যে ঘোড়াদের সামনের দু-পায়ে ছাঁদন দড়ি নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাস খেতে দেখা যায়, নরোত্তমের সংহারক এই ঘোড়া নির্ঘাৎ সেই গোষ্ঠীরই বিশিষ্ট সন্তান। দেখেছি এদেরই পিঠে বাসন বোঝাই দিয়ে কাঁসারিরা গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। গোরুর গাড়িতে জোয়াল চড়িয়ে, তাতে এক জোড়া এই ঘোড়া যুতে চালানো গাড়িকে কৃষ্ণনগরে বলে ঘোগের গাড়ি। এ ঘোগ সুন্দরবনী ঘোগ নয়, ঘোড়া ও গোরু দুইয়ের আদ্য অক্ষর নিয়ে তৈরি হয়েছে শব্দটি।

এই ঘোড়াকে বাঙালী ঘোড়া নাম দিতে পারেন। কিন্তু ঘোড়া কি আদিতে বাংলার, তথা ভারতের প্রাণী? আজ্ঞে না। এক দিকে আরবের মরু মুল্লুক, অন্য দিকে পামিরের

সমতল হল ঘোড়ার আদি জন্মভূমি এশিয়ার। দূরে থেকে ঘোড়ায় চাপা মানুষদের দেখেই গ্রীকরা স্যান্টুরের কল্পনা করেন বোধ হয়। স্যান্টুর হল মানুষের মুখাবয়ব বিশিষ্ট ঘোড়া, যা ইউনিকর্নের মতই কল্পিত জীব। মোটের ওপর ঘোড়ায় চেপে লোহার হাতিয়ার হাতে ভারতে হানা দিয়েই আর্যেরা মহেঞ্জোদাড়ো ধ্বংস করেছিলেন, এই কথা বলেন বিদেশী ভারততত্ত্ববিদরা। তার মানে ঘোড়া বাইরে থেকে এসে ভারতে বংশ বিস্তার করেছে, এই হল তাদের বক্তব্য।

পন্ডিতদের কথা পন্ডিতরাই বুঝুন। অবিদগ্ধ মানুষ আমরা তো দেখছি, বেদে পুরাণে ঘোড়ার ছড়াছড়ি। সাত রঙের সাত ঘোড়ায় টানা রথে সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন বলা হয়েছে বেদে। সমুদ্র মন্থন থেকে উঠেছিল উচ্চৈঃশ্রবা, যা ইন্দ্র দেবতার ঘোড়া। রাজচক্রবর্তী হতে হত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে। পুরাণে কাহিনী আছে শয্যাগ্রস্ত হয়ে স্বয়ং উর্বশী ঠাকরুণ এক কিম্ভূত ঘোড়ার জীবন যাপন করেছিলেন। এছাড়া কিন্নর নামে যে দিব্যকণ্ঠ গায়কদের কথা আছে প্রাচীন সাহিত্যে তারা হল অশ্ব মুখাকৃতি বিশিষ্ট মানুষ। অর্থাৎ কিনা স্যান্টুরদেরই উল্টো।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, খৃষ্ট জন্মের অন্তত হাজার দুই বছর আগে ঘোড়া এসেছিল ভারতবর্ষে এবং আজও বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে। তবে হ্যাঁ, আজ তার ধর্মীয় বা রাজকীয় সম্ভ্রম নেই বটে, কিন্তু তার ক্ষুরের সঙ্গে যেহেতু লক্ষ লক্ষ টাকা হারজিতের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে, তাই তার দর ও কদর বেড়েছে ছাড়া কমেনি। খোঁজ করলে দেখবেন কত সমারোহময় নামেই ভূষিত করা হয়েছে এই সব রেসের ঘোড়াকে! ব্ল্যাক প্রিন্স, রেনবো হিউ, মো ফ্লাউয়ার ঘোড়ার নাম—ভাবতে পারেন?

না হবে কেন? ভাল এবং ভদ্র জন্তু যে সত্যিই ঘোড়া। প্রতাপ সিংহের চৈতক থেকে ছত্রপতি শিবাজীর রোহিত পর্যন্ত তাদের সমুজ্জ্বল নামে কত ধন্য ধন্যই না দেখেছি ইতিহাসে। সেই বাজীকুলের কলঙ্ক একটি পাজি ঘোড়া হঠাৎ মহেশতলায় পেয়ারাওয়ালা নরোত্তমকে কামড়ে শেষ করেছে, এরকম রোমাঞ্চকর ব্যাপারকে বড় খবর বলে চিহ্নিত না করবে কেন পার্ট ওয়ানের পড়ুয়া মেয়েটি। পশ্চিমবাংলার এক মফস্বল শহরে কোন কারখানা সংলগ্ন পুকুর পাড়ে চাঁদোয়ার নীচে গাঁট্টা-গোঁট্টা লোমশ ঘোড়া দেখেছিলাম একটা। সবাই বললেন, পীর বাবার ঘোড়া। জানি না কে এই পীর বাবা, যেমন জানি না মহেশতলার এই ঘোড়া সেই ঘোড়া ঠাকুরেরই বংশাবতংস কেউ কিনা! কারণ ইনিও তো দেখছি জনৈক সাধুবাবার বাহন! এ-ভাগ্য ক'টা ঘোড়ার?

সুদর্শন গুপ্ত

বৈদেশিকী

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

কম্যুনিজমের ঈশা-মুসা যদি হন মার্কস আর এঙ্গেলস্, সেন্ট পিটার তা হলে লেনিন। সেই সুবাদে মস্কো হচ্ছে কম্যুনিজমের রোম। দুনিয়ার পয়লা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের আদি থেকেই এ তত্ত্ব মেনে নিয়েছিল দেশে দেশে কম্যুনিস্ট দল। মস্কো চেয়েছিল তার ছাতার তলায় দুনিয়ার সব কম্যুনিস্টদের জড়ো করতে। তারাও তাতে রাজী ছিল। গোঁড়া ক্যাথলিকরা যেমন রোমে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে তেমনই করতে শুরু করেছিল গোঁড়া কম্যুনিস্টরা। দূর দূরান্তরে যেখানে কম্যুনিস্ট ছিল তাদের ফতোয়া দিত মস্কো আর তারাও তা নির্বিচারে মেনে নিত যেমন পোপের ফতোয়া মেনে নেয় গোঁড়া খ্রীস্টানরা। একে একে যখন কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে লাগলো ইউরোপের দেশে দেশে তারাও তখন হয়ে দাঁড়ালো মস্কোর তাঁবেদার। রুশিয়া তাদের যেমন ভাবে চলতে বলেছে তারাও ঠিক তেমনই ভাবে চলেছে। তার কারণও ছিল। রুশীরাই ক্ষমতা কব্জা করে তা তুলে দিয়েছে সে সব দেশে কম্যুনিস্টদের হাতে। মস্কোর হুকুমে তারা উঠবে বসবে এ আর আশ্চর্য কী?

রোমের যা খুশি তাই করা যেমন চিরকাল খ্রীস্টানরা বরদাস্ত করতে পারেনি তেমনই কম্যুনিস্টরাও পারেনি মস্কোর কাছে দাসখত লিখে দিতে। কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় মার্টিন লুথার হচ্ছেন যুগোস্লাভিয়ার ভাগ্যবিধাতা মার্শাল টিটো। মস্কোর সর্দারির বিপক্ষে সব প্রথম রুখে দাঁড়ান তিনি ১৯৪৮ সনে। তাঁর কথায় তখন অবিশ্যি কোনো কম্যুনিস্ট দল কী দেশ সায় দেয়নি। টিটো রেগেমেগে ধর্মত্যাগ করে জাত খোয়াননি। কম্যুনিস্টরা একঘরে করেছিল তাঁকে। তিনি তাতে ঘাবড়াননি, কম্যুনিজম ছেড়েও দেননি। তবে বাঁচার তাগিদে পুঁজিবাদীদের খপ্পরে না পড়ে তিনি স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে নেহরু-নাসের-সুকর্ণর সঙ্গে মিশে গড়ে তুলেছিলেন জোটছাড়াদের জোট। সে জোট এখন বেশ পোক্ত। ইউরোপের বাইরে মস্কোর মাতব্বরি মেনে চলতে অস্বীকার করলে প্রজাতন্ত্রী চীন ১৯৬০ সনে। মস্কোকে সে এখন আর পরোয়া করে না। গোটা কয়েক সাকরেদ দেশ নিয়ে সে গড়ে তুলেছে আর এক কম্যুনিস্ট জোট।

এরা ছাড়া আর সবাই যে মুখ বুজে মস্কোর হুকুম তামিল করে এসেছে তা কিন্তু নয়। ভিন্ন চালে চলতে অনেক কম্যুনিস্ট দেশ আর অকম্যুনিস্ট দেশের কম্যুনিস্ট দল চেয়েছে। যখনই কিন্তু বেচাল দেখিয়েছে কোনো কম্যুনিস্ট দেশ তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে মস্কো। দরকার হলে ডাণ্ডা চালাতে পেছপাও হয়নি। স্টালিনের আমলে স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়াতে বিশেষ কোনো কম্যুনিস্ট দল সাহস পায় নি। দেখা গেল ক্রুশ্চফের আমলে অনেকেই ভিন্ন সুর গাইতে শুরু করেছে। তাদের রেয়াত করেননি ক্রুশ্চফ কিংবা তাঁর পরে ব্রেজনেভ। ১৯৫৬ সনে হাঙ্গেরির নাজকে কড়া শিক্ষা দিয়েছিলেন ক্রুশ্চফ—তচনচ করে দিয়েছিল হাঙ্গেরির স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন রুশী ফৌজ। ওই একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন ব্রেজনেভ চেকোস্লোভাকিয়াতে। নতুন ধাঁচে কম্যুনিজমকে ঢালাই করার যে উদ্যোগ করেছিলেন ডুবচেক তাকে জোরজবরদস্তি করে পিষে মেরেছিলেন সোভিয়েট সরকার। মস্কোকে মেনে না চললে সব কম্যুনিস্ট নেতারই একই দুর্দশা হবে এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন সেদিন ব্রেজনেভ। কম্যুনিস্টরা যেমন মার্কস লেনিনকে মেনে চলবে তেমনই তারা মাথা নোওয়াবে মস্কোর দরবারে এই ছিল তাঁর সাফ কথা।

মুখে না বলবার মুরোদ কারুর না হলেও চটে ছিলেন অনেক কম্যুনিস্ট দিকপালই। টিটোর হাওয়া গায়ে লাগলো অনেকেরই। মস্কোর আওতা থেকে বেরিয়ে এলেন রুমানিয়ার চৌসেস্কু। বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রুশ জোট থেকে আলাদা রুমানিয়া হয়ে যায়নি বটে কিন্তু কাজে সে এখন চলছে স্বাধীনভাবে মস্কোর তোয়াক্কা না করে। সাচ্চা কম্যুনিস্টদের চীনেদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয় মস্কোর এ বিধান অমান্য করেছে রুমানিয়া। একঘরে যুগোস্লাভিয়াকে জাতে তুলেছিলেন ক্রুশ্চফই ১৯৬৩ সনে। তাঁর প্রতিপত্তিও ক্রমেই বাড়ছে কম্যুনিস্ট দুনিয়াতে। বিশেষ করে অকম্যুনিস্ট দেশের অনেক কম্যুনিস্ট দলই নামে না হলেও কাজে টিটোপন্থী। মস্কোকে তারা হেনস্থা করতে চায় না কিন্তু মস্কোর হুকুম তামিল করতে তারা নারাজ। ব্রেজনেভ কম্যুনিস্ট দলগুলোর বৈঠকে দুনিয়ার কম্যুনিজমের কেন্দ্র হচ্ছে মস্কো এ নীতি চাপ দিয়ে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু মন থেকে সে বিধানে সায় দিতে পারেনি অধিকাংশ কম্যুনিস্ট দলই—বিশেষ করে তাদের তরুণ নেতারা।

রকম দেখে প্রমাদ গণেছেন রুশী কম্যুনিস্ট দিকপালরা। দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের লাগাম তাঁরা ধরে থাকবেন চিরদিন তা যে হতে পারে না সে কথাটা তাঁরা এতকাল পরে বুঝতে পেরেছেন। তবে তাঁরা বিষয়ী লোক, ঘোর বাস্তববাদী গোঁয়ার্তুমি করে সব খোয়ানোর থেকে আপস করে আধখানা উদ্ধার করা যে বুদ্ধিমানের কাজ এ জ্ঞান বোধ হয় তাঁদের হয়েছে। জুন মাসের শেষ দুদিন ইউরোপের কম্যুনিস্ট দলগুলোর যে বৈঠক ব্রেজনেভ ডেকেছিলেন তাতে তিনি রফা করেছেন টিটোর সঙ্গে। না করে উপায় ছিল না। নইলে মস্কোর ভরাডুবি হতো—খোলাখুলি তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটতে পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিস্ট দলগুলোর। বৈঠক ডাকা হয়েছিল পূব বার্লিনে জুনের ২৯ আর ৩০ তারিখে। হাজির ছিলেন বাছা বাছা ২৯টা পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিস্ট চাঁই। তাঁদের প্রধান ছিলেন ফ্রান্সের জর্জেস মার্সের, ইতালির এনারিকো বেরলিংগুয়ের আর স্পেনের সান্তিয়াগো কারিল্লো। এঁরা সবাই টিটোকে গুরু মেনেছেন অন্তরে আর আচরণে।

পূব বার্লিন বৈঠকে খোলাখুলি বলেছেন স্পেনের কারিল্লো অক্টোবর বিপ্লব আজ আর আমাদের কাছে বড়দিনের সামিল নয়, মস্কোও রোম নয়। ওই একই মত ফরাসী আর ইতালিয়ান কম্যুনিস্ট নেতাদের। যুগোস্লাভিয়া আর রুমানিয়া তো বটেই। বৈঠকে যোগ দেবার আগে টিটো কড়ার করিয়ে নিয়েছিলেন মস্কোর বেড়ি সবায়ের পায়ে পরানোর চেষ্টা করা পূব বার্লিনে চলবে না, চীনের বিরুদ্ধে জেহাদও নয়। আগাম তাতে রাজী হয়েছিলেন ব্রেজনেভ। দুদিন বৈঠকে বসে এমন অনেক রুশীদের সমালোচনা তাঁকে শুনতে হয়েছে যা আগে ভাবাই যেত না—কেউ বললে কম্যুনিস্ট সমাজে তার জাত যেত কম্যুনিস্ট দেশের নেতা কেউ এরকম বেসুরো গাইলে তাঁর গর্দান থাকতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেকাল আর নেই। ইউরো কম্যুনিজম বলে নতুন একটা ধুয়ো উঠেছে ধনী সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে। সেখানকার কম্যুনিস্ট নেতাদের ধারণা মস্কোর নীতি এ যুগে অচল—সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রেখেও কম্যুনিস্ট আন্দোলন সফল করা যায়। তাই তাঁরা চান স্বাধীনভাবে নিজের নিজের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে যার পথে চলতে। বৈঠকের পর যে ৪৭ পাতার ইস্তাহার বেরিয়েছে তাতে ওই কথাই বলা হয়েছে, মস্কোর বন্দনা তাতে নেই। তা নিয়ে ভোটাভুটি হয়নি, তবে তাতে সবাইয়ের মত আছে।

দেবরাজ

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ দিন : স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রতিদিনের বিবরণ

গৌরচন্দ্র সাহা

শ্রাবণ ৯, ১৩৪৮। বিশেষ ট্রেনে করে অসুস্থ কবিকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। স্থির হয়েছে ১৪ই শ্রাবণ তাঁর অপারেশন হবে। অপারেশন করবেন বিখ্যাত সার্জন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে পরামর্শ ও উপদেশ দেবার জন্য আরও কয়েকজন ডাক্তারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে যাতে আছেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার অমিয় সেন, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা। যথানির্দিষ্ট দিনে অস্ত্রোপচার হল। কিন্তু অসুস্থ কবি আর সুস্থ হলেন না। দেখা দিল নানা উপসর্গ। অপারেশনের ৮ দিন পরে, ২২শে শ্রাবণ তাঁর তিরোধান ঘটলো।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে নানা কাগজপত্রের মধ্যে একখানি মূল্যবান খাতার সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই খাতাতে কবির জীবনের শেষ দশটি দিনের শারীরিক অবস্থার, যেমন কবির জ্বর কত, নাড়ির গতি কিরকম, কি কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, কি কি খাদ্য গ্রহণ করছেন, কতক্ষণ ঘুমুচ্ছেন, শরীরের অস্বস্তিবোধ কিরকম —এসব তথ্য প্রতি দিন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় অতি সযত্নে লিখে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্র-ভবনে সেই খাতাটির পরিগ্রহণ সংখ্যা ৪৯১। এই দুর্লভ খাতাটি থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ দশটি দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিবরণ এখানে সংকলিত হল।

১৩ শ্রাবণ ১৩৪৮, অপারেশনের পূর্বদিন

সকাল ছ'টার সময় থার্মোমিটারে জ্বরের পরিমাণ ৯৯ ডিগ্রি। সাতটা পনেরোতে নাড়ির গতি মিনিটে ১০০ বার। দুপুর একটা পাঁচ-এ জ্বর বেড়ে দাঁড়ালো ৯৯·৪, দুটো পঞ্চান্নতে ৯৯·৬, আট-টা চল্লিশ-এ ৯৯·৭, নাড়ির গতি ১০০। এদিন সকালে দুবারে কবি খেয়েছেন কফি, দু' টুকরো রুটি, খই, দুধ। দুপুরে আঙ্গুরের রস, ভেজেটেবিল স্যুপ, ২টি ডিম, ১ খানা রুটি, তরকারি, ২ চামচ পায়েস। বিকেলে ও রাত্রি খেয়েছেন যবের মণ্ড, দুধ, বাদাম যবা, মনাক্কার রস, শুষনির রস, গ্লুকোজ। ওষুধ প্রযুক্ত হয়েছে—সিস্টোপিউরিন, সাইট্রোকার্ব, সবলা [সম্ভবত কবিরাজী টনিক], সোডিবাই কার্ব ও পটাসিয়াম সাইট্রেট। একটি ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছিল। শারীরিক কষ্টের মধ্যে আছে প্রস্রাবের জ্বালা।

১৪ শ্রাবণ। আজ অপারেশন

সকাল ন'টার সময় কবির গায়ের তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রি। নাড়ির গতি মিনিটে ৯২ বার। অপারেশন আরম্ভ হল এগারোটা কুড়িতে, শেষ হল এগারোটা পঁয়তাল্লিশে। এর পর প্রায় টানা দু' ঘণ্টা ঘুমলেন কবি। বেলা একটা পঞ্চাশে জ্বর দেখা হল— ৯৮·২ ডিগ্রি, নাড়ির গতি ৯৬। চারটে দশ—জ্বর ৯৮·৮, নাড়ি ১০০। রাত্রি আটটা পনেরো—জ্বর ৯৯·৩, নাড়ি ১০০। ভোর চারটে চল্লিশ—জ্বর একটু কমে ৯৯, নাড়ি ১০৮। অপারেশনের পূর্বে কবি খেয়েছিলেন একটু কফি ও পেঁপে। পরে গ্লুকোজ। সন্ধ্যার দিকে একটু যবের মণ্ড বার্লি-জল। ওষুধপত্রের মধ্যে দেওয়া হয়েছে সিস্টোপিউরিন, কার্ডিয়াজল আর ঘুমের জন্য ব্রোমাইড।

১৫ শ্রাবণ। অপারেশনের দ্বিতীয় দিন

সকাল ছ'টা তিরিশ-এ জ্বর ১০০·২ ডিগ্রি। আটটা পনেরোতে ১০০·৬, নাড়ির গতি মিনিটে ১১২। দশটা পঞ্চাশ নাগাদ জ্বর কমেছে ৪ পয়েন্ট, কিন্তু নাড়ির গতি বেড়ে হল ১১৬। বেলা চারটা তিরিশে জ্বর এবং নাড়ির গতি দুটোই বেড়ে যথাক্রমে দাঁড়ালো ১০১·৮ ডিগ্রি ও ১২২ বার। রাত দুটো পঞ্চান্নতে জ্বর ১০১ এবং নাড়ি ১১০। সারা দিনে কবি খেয়েছেন কফি, আঙ্গুরের রস, হর্লিকস, গ্লুকোজ, চিকেন ব্রোথ, মনাক্কার রস। ওষুধ—এম বি

৬৯৩, সিস্টোপিউরিন, ক্যালসিয়াম স্যান্ডোজ। আর দেওয়া হয়েছিল ১০০ সি সি গ্লুকোজ ইনজেকশন। প্রস্রাবের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নি এদিন। সারা রাত, ছটফট করেছেন কবি, ঘুমতে পারেন নি ভালমত।

১৬ শ্রাবণ। অপারেশনের তৃতীয় দিন

সকাল ছ'টা তিরিশ মিনিটে জ্বর মাপা হল ৯৯·৪ ডিগ্রি, নাড়ির গতি মিনিটে ১০২। এগারোটা কুড়িতে জ্বর একটু বেড়ে ৯৯·৮, নাড়ি ১০৪। জ্বর সারা দিনই অপরিবর্তিত রইল, কেবল বেলা তিনটে পঞ্চাশে একটু কমে হল ৯৯·২। এদিন সকালে শুধু কফি খেয়েছেন কবি। দশটা তিরিশে গ্লুকোজ-জল, চিকেন ব্রোথ, বেলা দেড়টায় যবের মণ্ড ও দুধ, সাড়ে তিনটায় মনক্কার রস। রাত্রে হরলিকস, আঙ্গুরের রস, শশানির রস। ওষুধপত্র পূর্বদিনের মতই এম বি ৬৯৩, সিস্টোপিউরিন, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, সাইট্রো কার্বনেট। ৫০ সি সি গ্লুকোজও শিরার ভিতর দিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। সারা দিনে প্রস্রাবের পরিমাণ আশংকাজনক রকমের কম বলে রাত দশটার সময় একবার ক্যাথিটারও দেওয়া হল। কবির জিভও এদিনে অপরিষ্কার বলে লক্ষ্য করলেন চিকিৎসকেরা।

১৭ শ্রাবণ। অপারেশনের চতুর্থ দিন

ভোর পাঁচটা তিরিশে মুখে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পাওয়া গেল ৯৯ ডিগ্রি। ন'টা পনেরোতে জ্বর ৯৯·২, নাড়ির গতি মিনিটে ১০০ বার, শ্বাস-প্রশ্বাস ২০ বার। রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশে বগলে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পাওয়া গেল ১০০·৫। নাড়ি ১১২, শ্বাস-প্রশ্বাস ২২ বার। রাত দুটো পঁয়তাল্লিশ নাগাদ জ্বর একটু কমে হল ১০০·২, নাড়ি ১১২। এদিন সকালে কবিকে দেওয়া হয়েছে কফি, আঙ্গুরের রস, হরলিকস, বার্লি-জল। দুপুরে যবের মণ্ড, দুধ, বার্লি। সন্ধ্যায় মাছের স্যুপ, প্ল্যাকসো গ্লুকোজ। ওষুধপত্র পূর্বদিনের মতই, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাইড্রাগ, অ্যাড্রেনালিন, বেলারগল। ১০০ সি সি গ্লুকোজও ইনজেকশন করে দেওয়া হয়েছে। এদিন মাঝ-রাত থেকে প্রায় ভোর পর্যন্ত হিক্কাতে খুবই কষ্ট পেয়েছেন কবি।

১৮ শ্রাবণ। অপারেশনের পঞ্চম দিন

সকাল ন'টা পঁয়ত্রিশে মুখে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর উঠল ৯৯ ডিগ্রি, নাড়ি মিনিটে ১০০ বার। বেলা তিনটের সময় জ্বর ৯৯·২, নাড়ি ৯৬। এরপর আর উত্তাপের বিশেষ কোনো হ্রাস বৃদ্ধি হয় নি। এদিন কবি যা কিছু খেয়েছেন তার মধ্যে শক্ত কিছুই নেই—সবই তরল—কফি, হরলিকস, বেদানার রস, মাছের স্যুপ। জিভের উপর সাদা আস্তরণ পড়ায় ওষুধ দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ওষুধপত্র পূর্বের মতই—এম বি ৬৯৩, সিস্টোপিউরিন, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, হাইড্রাগ, আর নতুন যুক্ত হয়েছে ম্যাগনেশিয়া সাইট্রেট অক্জালেট সিরিয়াম, ক্লোরোট অ্যালকালি মিকশ্চার। গ্লুকোজ ইনজেকশ দু'বার দেওয়া হয়েছে ৫০ সি সি করে গত দিনে যে হিক্কা আরম্ভ হয়েছিল এদিন প্রায় সর্বক্ষণ ধরেই তা কবিকে দ দিয়েছে। কেবল ভোর রাতের দিকে এক ঘুমতে পেরেছেন। প্রস্রাবের পরিমাণও এদি রীতিমত কম।

১৯ শ্রাবণ। অপারেশনের ষষ্ঠ দিন

সকাল ছ'টা চল্লিশে জ্বর ৯৮ ডিগ্রি আটটা চল্লিশে নাড়ির গতি মিনিটে ১০ বার, বেলা ন'টা দশে উত্তাপ বেড়ে হ ৯৯·২, নাড়ি ১০৮। বেলা দুটোতে জ ৯৯, দুটো পঞ্চাশে ৯৯·৬, সন্ধ্যা ছ'টা পাঁ ১০০·২, নাড়ি ১১৬। রাত ন'টা নাগাদ জ একটু কমে ৯৯। রাত তিনটেতে জ্বর আব একটু বেড়ে ৯৯·৮। কবিকে খেতে দেও হয়েছে কফি, হরলিকস, মুড়ির ভ বেদানার রস, সন্ধ্যার দিকে একটু স্য যবের মণ্ড, মৌরির জল। অন্যান্য দিনে সব ওষুধ দেওয়া হয় তা তো আছেই, সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে অ্যাট্রোপি ভ্যালিডল, বেনজিন বেনজয়েট ইত্যাদি এদিন সকালে একবার এবং মাঝর একবার—মোট দু'বার এম বি ৬৯৩ দে হয়েছে। দু'বার গ্লুকোজ ইনজেকশ প্রয়োগ করা হয়েছে। শারীরিক উপসর্গ মধ্যে কাশিটা বেড়েছে, হিক্কার ক হয়েছে প্রবলতর।

২০ শ্রাবণ। অপারেশনের সপ্তম দিন

সকাল ছ'টা তিরিশে জ্বর ৯৯ ডিগ্রি, নাড়ি মিনিটে ১০০ বার, শ্বাস প্রশ্বাস ২০ বার। সারা দিন প্রায় একইভাবে কেটেছে, উত্তাপ কখনো কখনো এক-আধ ডিগ্রি কমবেশী। সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে জ্বর এক ডিগ্রি বেড়ে হল ১০০। বাকি রাতটা ওই রকমই রইল। রাত ন'টা পাঁচ-এ নাড়ির গতি ১১৮, শ্বাস-প্রশ্বাস ২৩। এদিনও কবিকে সকালে দেওয়া হল কফি, বেদানার রস, হর্লিকস, দুপুরে একটু যবের মণ্ড, আপেলের রস, মুড়ির জল। সন্ধ্যায় একটু স্যুপ। ওষুধপত্র পূর্ববৎ। শিরার ভিতর দিয়ে দুবারে মোট ১২৫ সি সি গ্লুকোজও দেওয়া হল। এদিনও প্রায় সর্বক্ষণ হিক্কার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কবিকে।

২১শে শ্রাবণ। অপারেশনের অষ্টম দিন

গায়ে জ্বর রয়েছে একইভাবে। সকাল ন'টা পনেরোতে থার্মোমিটারে পাওয়া গেল ৯৯ ডিগ্রি। নাড়ির গতি মিনিটে ১০৪ বার, শ্বাস প্রশ্বাস ১৮ বার। বেলা দুটোর সময় জ্বর একটু বেড়ে হল ১০০·৬, বেলা চারটেতে ১০১·৪। সন্ধ্যা ছ'টা পঁতাল্লিশে জ্বর ১০২, নাড়ি ১১৬, শ্বাস প্রশ্বাস ২২। রাত এগারোটা পঁচিশে জ্বর ১০২·৮, নাড়ি ১২৪, শ্বাস প্রশ্বাস ৩৬। এদিন কবিকে দেওয়া হয়েছে কফি, বেদানার রস, শশার রস, গ্ল্যাক্সো, গ্লুকোজ, আখের রস। এদিন ওষুধ দেওয়া হয়েছে এম বি ৬৯৩—তিনবার, বেনজয়েল বেনজিন, অ্যাড্রেনালিন, কার্ডিয়াজল, অ্যাট্রোপিন। অন্য দিনের মত শিরার ভিতর দিয়ে গ্লুকোজও দেওয়া হয়েছে। কবির শরীরের ক্রমাবনতি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেলা দুটোর সময় লেখা হয়েছে Difficult in Swallowing. জল বা ওষুধ পড়ে যাচ্ছে। শরীরও মাঝে মধ্যে শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

২২ শ্রাবণ। সেই অন্তিম নির্দেশ

এদিন আর গায়ের উত্তাপের রেকর্ড রাখা হয়নি। সকাল ছ'টা পনেরো : নাড়ির গতি মিনিটে ১৪০ বার, শ্বাস প্রশ্বাস ৪৬ বার। বেলা আটটা পঁয়তাল্লিশ : নাড়ি ১৩০, শ্বাস প্রশ্বাস ৪৪। বেলা দশটা তিরিশ, মৃত্যুর ঠিক এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পূর্বে : নাড়ি ৭৮, শ্বাস প্রশ্বাস ৪৪। ওষুধের মধ্যে শুধু দেওয়া হয়েছিল কোরামিন ইনজেকশন। এর পর চিকিৎসকদের আর কিছুই করবার ছিল না, খাতার পাতাতেও আর কোনো নোট নেই।

[বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের সানুগ্রহ অনুমোদনে কবির-চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট খাতাটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে]

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে
ছেলেবেলার দিন—
হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে
ওঠার দিন। এই সময়ে ওকে
ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই
দেবেন। তারপর দেখবেন ওর
খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে ঝামেলা
তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন
খুশি হয়ে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে!
ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে
ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা—
এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড,
লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে
আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
ওরে বাবা... দেখেছো! টপাটপ খাচ্ছে ঝপাঝপ বাড়ছে
Incremin Syrup

॥ ১০ ॥

সন্ধ্যার সক্রিয় মদনা ও সাহিত্যিক থ্যাকারের সম্পর্কটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বরদাপ্রসন্ন প্রথমে একটু সংকোচ বোধ করলেন। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন, "এ-পাড়ায় যখন চাকরি করতে এসেছেন, তখন ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, চৌরঙ্গী লেন, সাডার স্ট্রীট মাহাত্ম্য আপনার অজানা থাকবে না। একদিকে এই থ্যাকারের মতো মহাপুরুষের জন্মস্থান অন্যদিকে আবার এই হতভাগা মদনাদের লীলাক্ষেত্র।"

বরদাপ্রসন্ন এবার সোজাসুজি বলে ফেললেন, "আপনার কাছে চেপে রেখে লাভ নেই, মদনা ঐখানে দাঁড়িয়ে পার্ট-টাইম ব্যবসা করে—বাবু ধরার ব্যবসা!"

আমি বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে তাকালাম। বরদাপ্রসন্ন ঠোঁট বেঁকিয়ে দুঃখ করলেন, "ঘোর কলি যে। মদনার বাপ সুইপার। বুড়ো হয়েছে। সারাজন্ম জঞ্জাল সাফাই করে শরীরটা ভেঙেছে, ইচ্ছে ছেলেটাকে এবার কাজে ঢোকায়। আমার কাছে এক আধবার পিটিশনও করেছে। কিন্তু ছোঁড়ার মতিভ্রম হয়েছে—ঝাড়ু ধরতে, কমোডে হাত লাগাতে মোটেই ইচ্ছে নেই তার। বাপের সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই আছে। এখন আবার সোনায় সোহাগা—সন্ধ্যেবেলায় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মদনা দালালির কাজ শুরু করেছে। বাপ বেচারা এখনও বোধহয় খবর পায়নি।"

বরদাপ্রসন্ন খবর দিলেন, "ছোকরাকে সেদিন ওই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমি সন্দেহ করেছি। তা হতভাগা, কোম্পানির রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুই যা খুশি কর—এতো আমার প্রাইভেট বাগান নয় যে কর্তার অর্ডার মতো কাজকর্ম হবে। কিন্তু তা বলে একেবারে ওই থ্যাকারে মহাপুরুষের জন্ম ফলকের সামনে দাঁড়াবি তুই?"

বরদাপ্রসন্ন আবার ঠোঁট বেঁকালেন। জানালেন, তিনি মদনাকে বকুনি লাগিয়েছিলেন। কিন্তু মদনা কিছুই বুঝতে পারলো না। কে থ্যাকারে, কী করেছেন তিনি, কিছুই জানে না সে। আর জানবার মাথাব্যথাও নেই তার। যদি তিনি মহাপুরুষই হন—কবে কোন্‌কালে তিনি এখানে জন্মেছিলেন বলে এই গেটের সামনে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না?

মর্মাহত বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ছোঁড়াটার অসুবিধের কথা তারপর জানতে পারলাম। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে ফেন্সার এবং ডানলপের আপিস পেরিয়ে কারনানি ম্যানসনের কাছে যাবার উপায় নেই। ওখানে অন্য একটা দল অনেকদিন ধরে একই বিজনেস করছে—তারা নতুন কাউকে ওখানে দাঁড়াতে দেবে না। মদনা ছোকরা আমার বকুনি খেয়ে, দু একদিন ওখানে সরে যাবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসবার পথ পায় নি।"

বুঝলাম, মদনা নামক বিপথগামী যুবকের সঙ্গে যথাসময়ে আমার মুলাকাত হবে। বরদাপ্রসন্নর ইচ্ছা, থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজার হিসেবে আমি তার সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলি।

বরদাপ্রসন্ন এরপর শুরু করলেন, থ্যাকারে ম্যানসনের ইতিবৃত্ত। বললেন, "অনেকখানি জমি আছে এই বাড়ির। জমিতে জমিতে ছয়লাপ বলতে পারেন। সেকালে এ-পাড়ায় জমির দাম কীই বা ছিল! জমির দাম বাড়তে-বাড়তে এখনকার অবস্থায় আসবে তাও কেউ স্বপ্নে ভাবতে পারেনি।"

"বুঝতে পারলে কি, এরকম জমি ফেলে-ছড়িয়ে বাড়ি তুলতো?" বরদাপ্রসন্ন মন্তব্য করলেন। আরও শুনলাম, এই বাড়ির আদি মালিকদের তালিকায় অনেক থ্যাকারের নাম লেখা রয়েছে। থাকা অস্বাভাবিক নয়—বরদাপ্রসন্নর মতে, "ব্রাউন মেমসাহেবের মুখে শুনেছি, কলকাতায় ওঁদের বিষয়সম্পত্তি অনেক ছিল। আলিপুর, একবালপুর, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট কোথায় থ্যাকারেদের জমি ছিল না? আলিপুরের জেলা ম্যাজিসট্রেটের বাড়ির নাম তো এখনও থ্যাকারে হউস।"

থ্যাকারে ম্যানসনের জমির মালিক ছিলেন সাহিত্যিক থ্যাকারের বাবা। অল্প-বয়সে বেঘোরে মারা না-গেলে হয়তো এই সম্পত্তি তাঁরা হাতছাড়া করতেন না। রিচমণ্ড থ্যাকারে কলকাতায় যখন

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন ইংরেজদের বড় দুর্দিন। নেপোলিয়নের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা ক্ষত বিক্ষত।

বরদাপ্রসন্ন না-জানলেও, সাহিত্যিক থ্যাকারের পিতৃদেবের মৃত্যু তারিখ আমার অজানা নয়—এই পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে নিতান্ত খেয়ালের বশেই এক সময় কিছু খোঁজখবর করেছিলাম। সে বোধ হয় ১৮১৫ সালের কথা—ভাবীকালের ঔপন্যাসিক থ্যাকারে তখন চার বছরের শিশু। কলকাতার দুরন্ত ইংরেজ শিশুদের তখন ঘুম পাড়াবার জন্যে সুর করে ভয় দেখানো হত—Hush, hush! Napo comes! চুপ চুপ—ওই আসছে নেপো, অর্থাৎ নেপোলিয়ন। বাংলা ছড়া, ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশের, বিলিতী সংস্করণ আর কি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "রিচমণ্ড সায়েব তো মারা গেলেন, কিন্তু বউটি নাকি বিধবা হবার আগে থেকেই অন্য কার সঙ্গে প্রেম-টেম করছিলেন। কতদূর সত্যি জানি না, ব্রাউন মেমসায়েব আমাকে এইসব গপ্পো শুনিয়েছিলেন।"

বরদাপ্রসন্নর মুখ থেকে আমি শুনলাম থ্যাকারে পরিবারের এই জমি কেনেন একজন আর্মেনিয়ান ক্রিশ্চান জন এরাটুন। বছরেক বছর পরে এরাটুন এই সম্পত্তি বিক্রি করেন এক ইহুদিকে। তিনি সম্পত্তি বদল করেন গোলস্টন নামে এক ধন-কুবেরকে। তাঁর কাছ থেকেই সম্পত্তি বিক্রি হয় মার্টিন সায়েবের কাছে। কলকাতায় জন্ম, কর্ম এবং মৃত্যু এই মার্টিন সাহেবের।

থ্যাকারে সায়েবের মস্ত ভক্ত ছিলেন এই ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন। রেসের ঘোড়া এবং বিষয় সম্পত্তির কেনা-বেচা থেকে সে যুগে বহু লক্ষ টাকা কামিয়েছিলেন ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন।

কলকাতায় তখন সবাই আলাদা-আলাদা বাড়িতে থাকা পছন্দ করে। ম্যানসন বা ফ্ল্যাট বাড়ির কথা তখনও কেউ শোনেনি। নতুন ঘোড়ার সন্ধানে ডেভিড মার্টিন সেবার বিলেত গিয়েছিলেন। ঘোড়ার সঙ্গে নিয়ে এলেন নতুন ব্যবসার মতলব। তৈরি করবেন ঠিক করলেন এই নতুন ধরনের বাড়ির-মধ্যে-বাড়ি—যার নাম আগে থেকেই পছন্দ করা ছিল 'থ্যাকারে ম্যানসন'।

এসব কতদিন আগেকার কথা। পড়াশোনা তেমন না করলেও এই বাড়ি গোড়াপত্তনের অনেক কাহিনী বরদাপ্রসন্নর কাছে জমা হয়ে আছে। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যখন এ-বাড়িতে থাকতেই এসেছেন তখন আস্তে আস্তে শুনবেন সেই সব গপ্পো। বুঝলেন, ঠাকরে ম্যানসন সম্বন্ধে কেন আমার দুশ্চিন্তা! কেন আমি ভবিষ্যৎ ভেবে কূলকিনারা পাই না।"

মানুষের মতো বাড়িরও যে একটা দুশ্চিন্তার দিক থাকতে পারে তা এর আগে কখনও খেয়াল হয়নি।

বরদাপ্রসন্নবাবু আমার কথা শুনে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, "বলছেন কী মশাই? ইঁট-কাঠে তৈরি বলে এদের সুখ-দুঃখ নেই? মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে না বলে এদের কিছু বলবার নেই।"

বরদাপ্রসন্ন এই মুহূর্তে যেন অন্য এক মানুষ। ও'র চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। বাড়ির তদারকি করতে করতে ভদ্রলোক যে কখন বাড়ি-ঘর-দোরের সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে গিয়েছেন তা বোধ হয় নিজেও জানেন না।

বরদাপ্রসন্ন পকেট থেকে কৌটো বার করে এক খণ্ড কবিরাজী আদ্রক মুখে পুরলেন। জানতে চাইলেন, অম্ল-পিত্ত নাশক রৌদ্রজারিত আদ্রক আমিও আস্বাদন করবো কি না। লোহা পর্যন্ত এই কবিরাজি ওষুধের গুণে কয়েক মুহূর্তে জঠরানলে বিগলিত হবে তাও ও'র কাছ থেকে জানলাম।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "গরু ছাগল কুকুর—মানুষের ভাষায় কথা বলতে না পারলেও যেমন অনেক কিছু বোঝে, তেমনি প্রত্যেকটি বাড়িও অন্তর্যামী। বোবা কিন্তু বোকা নয়!"

আমার মুখে অবিশ্বাসের কী ছায়া দেখলেন বরদাপ্রসন্নই জানেন। আদা-কুচি আলটাকরায় ঘষে বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? থাকুন এখানে—ক্রমে ক্রমে সব বিশ্বাস করবেন। এই গরীবের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগবে।"

এসব কথার উত্তর দিয়ে কখনও লাভ হয় না। গাছের মতো বাড়িরও প্রাণ আছে এমন ভাববার মতো কল্পনা-শক্তি অথবা আধ্যাত্মিক অনুভূতি এখনও আমার হয়নি।

বরদাপ্রসন্ন শুনিয়ে দিলেন, "আজ আপনার ওপনিং-ডে। এই শুভদিনে এই পুওর-ম্যানের দু' একটা কথা শুনে রাখুন—কোনো একদিন কাজে লেগে যেতে পারে। মানুষের মতো বাড়িরও জন্ম-লগ্ন আছে—গ্রহ নক্ষত্রের শুভ-অশুভ দৃষ্টি আছে। বাড়ির কুষ্ঠি-বিচার খুব শক্ত কাজ—কিন্তু তেমনভাবে বিচার করাতে পারলে সব ঘটনা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়; শুরুতে দাঁড়িয়েই আপনি সিনেমা ছবির শেষ বুঝতে পারবেন!"

গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে এই মুহূর্তে আমি মোটেই কৌতূহলী নই। অনেক কষ্টে অনেক ঘোরাঘুরির পরে আমি কোনোরকমে একটা চাকরির জোগাড় করেছি। আমার পুরুষকারে এবং পরিশ্রমে এই চাকরিটা আমি এখন নিরাপদ করতে চাই। দূর আকাশের কুটিল গ্রহ-নক্ষত্রের কপট সন্তুষ্টিবিধানের কোনো ইচ্ছা নেই আমার।

কিন্তু বরদাপ্রসন্ন অন্য জগতের মানুষ। ও'কে এড়িয়ে যাবার জন্য বললুম, "শুরুতেই যদি শেষের সব কথা জানা হয়ে গেল, তাহলে আমাদের আর কী করবার থাকবে বলুন?"

কবিরাজী আদা চুষতে-চুষতে সন্তুষ্ট বরদাপ্রসন্ন নিজের মনেই বললেন, "আঃ! মুখখানা যেন এয়ার কন্ডিশন হয়ে গেল—একেই বলে দ্রব্যগুণ!"

বরদাপ্রসন্ন তারপর আমার মুখের দিকে তাকালেন। "কিছু মনে করবেন না স্যার,—আপনার বয়স কম, মুখে যা আসে, বলে ফেলতে পারেন। আমরা যারা ভুক্তভোগী তারা বুঝি—শুরুতেই শেষটা জানা থাকলে অনেক সুবিধে। এই সিনেমা-থিয়েটারের কথা ধরুন। মেট্রো, লাইট-হাউস, গ্লোবে কত লোক তো পুরো গপ্পোটা পরের মুখে শুনে তবে সিনেমা দেখতে আসে। কিন্তু অসুবিধে হয় তাতে? মোটেই না। বরং কী-হবে কী-হবে দুশ্চিন্তা না-থাকার ধীরে সুস্থে বাইস্কোপটা দেখা যায়।"

বরদাপ্রসন্ন তুলনাখানা মন্দ দেননি। আমি ও'র কথার তারিফ করতে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগেই উনি আবার কথা বলা শুরু করলেন। আদার কুচির শেষ অংশটা মুখ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, "এক সময় আমারও রক্ত গরম ছিল। আপনার মতোই ভবিতব্যকে অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন করি না।"

মনে হলো বরদাপ্রসন্ন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। বুকের অন্ধকারে, হয়তো কোনো গভীর দুঃখ লুকিয়ে আছে।

আমরা আবার কথাপ্রসঙ্গে থ্যাকারে হাউসের আদি-পর্বে চলে এলাম। ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন থ্যাকারে পরিবারের জমিতেই নতুন ধরনের ইমারতের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। রাজা-মহারাজা বা সওদাগরী অফিসের বড়সায়েব মেজসায়েবদের জন্যে ভাড়া বাড়ি তৈরি করবার কোনো-ইচ্ছে নেই সদ্য বিলেতপ্রত্যাগত ডেভিড মার্টিনের। মার্টিন স্বপ্ন দেখছেন ঘরের মধ্যে ঘরের। মার্টিনের সরকার করুণাপ্রসন্ন মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। বিলেত বেড়িয়ে এসে সাহেবের কি মাথা খারাপ হলো!

নতুন বাড়ির নকশা দেখে করুণাপ্রসন্ন ভবিষ্যম্বাণী করলেন, সাহেব এবার ডুববেন। লিন্ডসে স্ট্রিটের দক্ষিণে এই পাণ্ডব বর্জিত পাড়ায় পায়রার খোপগুলো কে ভাড়া নেবে?

ভগবানের ইচ্ছেয় কলকাতা শহরে গাঁটের কড়ি ফেললে বাড়ি ভাড়ার অভাব নেই।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ভাড়া বাড়িতে থাকাটা বাঙালী ভদ্দরলোকেরা অবশ্য মোটেই পছন্দ করতেন না। নিজস্ব বাটী যাঁর নেই তিনি আবার কীসের ভদ্দরলোক? 'বাসাড়ে' বাবুদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতেও অসুবিধে হতো। যার নিজস্ব চাল-চুলো নেই তাঁর ঘর থেকে মেয়ে আনলে লক্ষ্মী কুপিতা হবেন, এমন কথাও বলতো তখন।"

ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন কিন্তু বাবুর বুদ্ধিতে মত পাল্টালেন না। হুইস্কির হোঁচটে সায়েব বোধ হয় ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। প্রিয় কর্মচারী করুণাপ্রসন্নকে তিনি বলেছিলেন, "ডোণ্ট ঘাবড়াও, কারুণো!"

পুরনো দিনের কথা বলতে গিয়ে বরদা-প্রসন্নর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, 'গোরু-খেগো স্লেচ্ছ হলে কী হয়, মশাই —একেবারে ঋষিবাক্য! 'কারুণো, মার্ক মাই ওয়ার্ড" এই বলে সায়েব নিবেদন করলেন, একদিন নাকি এই কলকাতা শহরে সো-কল্ড পিজিয়ন হোল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না— সমস্ত লোক তখন ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকবে। ফ্ল্যাট বাড়িতে না থাকাটাই তখন আশ্চর্য ব্যাপার হবে।"

একটু থামলেন বরদাপ্রসন্ন। "বুঝুন মশাই। নাইনটিন ফিফটি-ফাইভ নয়, ইন দি ইয়ার নাইনটিন হানড্রেড টুয়েলভ সায়েব বাচ্চা ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ফোরকাস্ট করছে একদিন বড় বড় সব শহর পায়রার খোপে বোঝাই হয়ে যাবে।"

বরদাপ্রসন্নর মুখে এবার অন্ধকার মেঘ নেমে এল। গম্ভীরভাবে মার্টিন সাহেবের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন দৃষ্টি, এত জ্ঞান— কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। শুভ কাজ শুরুর আগে যে দিন-ক্ষণ দেখার ব্যাপার আছে তা রক্ত গরম সায়েব বুঝলেন না।"

মার্টিন সায়েবের সরকার করুণাপ্রসন্ন ধর্মপ্রাণ বিচক্ষণ মানুষ। করুণাপ্রসন্ন চেয়ে-ছিলেন, "এতোই যখন হচ্ছে, তখন দিনক্ষণ দেখে একটু ভূমিপুজোর ব্যবস্থা করি।"

গো-খেগো মার্টিন সায়েব জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হোয়াট?"

"বাস্তুপুজো সায়েব", করুণাপ্রসন্ন বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, "ওয়ারশিপ অফ লর্ড বাস্তু।"

"তোমাদের কী বিল্ডিং-এর জন্যেও সেপারেট গড আছেন?" জিজ্ঞেস করে-ছিলেন ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন।

সায়েবের প্রিয় সরকার করুণাপ্রসন্ন তখন উপদেশ দিয়েছিলেন, "আন-নেসেসারি রিস্ক নিয়ে কী লাভ? দিজ বাস্তু গডস অ্যান্ড গডেসেস—এঁরা খুবই পাওয়ারফুল। বিশেষ

করে, নেগলেকটেড হলে এ'দের "হিংসা-দীর্ঘি" জ্ঞান থাকে না, সায়েব।"

করুণাপ্রসন্ন মনিবের মুখ-চোখ দেখে ভাবলেন, মার্টিন সায়েব এবার গরম হয়েছেন। তখন তিনি বোঝালেন, "খুবেই মাইনর পুজো—নো হাঙ্গামা। জমিতে প্রথম কোদাল ফেলবার আগে ভিত-পুজো।"

"হোয়াট?" পাইপ টানতে টানতে সায়েব জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"ওয়ারশিপ অফ দি প্লিনথ।" করুণা-প্রসন্ন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

"বাই জোভ!" মার্টিন সায়েব বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। "বাড়ির জন্য একজন গড্—আবার প্লিনথের জন্যে সেপারেট গড্!" সায়েব এবার বুঝতে পারছেন, হিন্দুদের কেন থ্রি-হানড্রেড-থার্টি-মিলিয়ন গডস এবং গডেস প্রয়োজন।

মার্টিন সায়েব এবার তাঁর প্রিয় সরকারের ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিলেন, "কারুণা, আমরা সেদিক থেকে অনেক লাকি। উই হ্যাভ ওয়ান গড এবং তিনি ভিত থেকে বাড়ি পর্যন্ত সব ডিপার্ট-মেন্টের ইন-চার্জ।"

করুণাপ্রসন্ন অত সহজে দমবার পাত্র নন। সায়েবকে এই সব বিষয়ে অধৈর্য হতে বারণ করে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ফর দি সেক অফ গডেস কালী তুমি দেব-দেবী সম্বন্ধে এই সব লুজ রিমার্ক কোরো না। তোমাদের নিজেদের দেশে গোরু খেয়ে যা-খুশী করতে পারো। কিন্তু দিস ইজ স্পেশাল জমিনদারী অফ মাদার কালী—যাঁর জন্যে এই শহরের নাম কলিকাতা।"

সায়েব এবার হেসে উঠলেন। "তুমি বলছো "রোম শহরেই যখন বসবাস করছো তখন রোমানদের মতো আচরণ করো।"

সায়েব নরম হচ্ছেন মনে করে করুণা-প্রসন্ন বুঝিয়েছিলেন, "খুবেই সিম্পল সেরি-মনি! মোর দ্যান দু-তিন টাকা আপনার খরচ হবে না। আমি কালিঘাট থেকে স্পেশাল পুরুত আনবো।"

খেয়ালী সায়েব হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন, এইসব প্রেয়ারে অনেক সময় লেগে যাবে নাকি?

করুণাপ্রসন্ন সায়েবকে সঙ্গে সঙ্গে ভরসা দিয়েছিলেন, সময় মোটেই লাগবে না।

করুণাপ্রসন্নর পুরনো কাহিনী বলতে বলতে বরদাপ্রসন্ন একবার থামলেন। তার পর শুরু করলেন, "হাজার হোক হালদার-বাড়ির ছেলে—পুজো-আচ্চার মন্তর-টন্তর মুখস্ত। উনি সঙ্গে সঙ্গে বাস্তু-সাপের পৃথিবী প্রণামের মন্তরটা গড় গড় করে সায়েবকে শুনিয়ে দিলেন : ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম।...... ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ।"

সায়েব মিটি মিটি হেসে জানতে চাইলেন একখানা বাড়ির পুজোর জন্যে কত-জন গডের গুড উইশেস ভিক্ষা করতে হবে?

করুণাপ্রসন্ন প্রথমেই নাগরাজের কথা তুললেন। মাটি খোঁড়া মানেই নাগের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানো। ভাদ্রাদি তিন-তিন মাস যথা-ক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মুখ রেখে নাগ বাম পাশে শুয়ে থাকেন—নাগের কোলে গৃহারম্ভই শুভ।

নিষ্ঠাবান করুণাপ্রসন্ন এরপর বোঝবার চেষ্টা করলেন, "সায়েব, এই বাড়ি জিনিসটা সামান্য ব্যাপার নয়। মানুষ যেখানে মাথা গুঁজবে সেখানে দেবতাদের বিরক্তি থাকলে বড়ই মুশকিল।"

মার্টিন সায়েবের অবগতির জন্যে করুণাপ্রসন্ন ব্যাখ্যা করলেন, "শুধু দেব-দেবী নন, যাঁরাই মানুষের সুখ শান্তিতে বিপত্তি ঘটাতে পারেন তাঁদের সকলকেই গৃহারম্ভের সময় নমস্কার জানানো হয় যেমন—অসুরায়, পাপায়, রোগায়, অগ্নেয় সর্পায়, জ্বরায় পাপ-রাক্ষস্যৈ।"

সায়েবের আগ্রহ দেখে করুণাপ্রসন্ন তালিকা দীর্ঘতর করেছিলেন : "ওঁ শিখিনে নমঃ। জয়ন্তায়, সূর্যায়, যমায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায় বরুণায় নমঃ।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "করুণাপ্রসন্নে

কথায় সায়েব মজে গেলেন। বললেন, "নো হাম্। তুমি যখন বলছো—ব্রিং ইওর পুরোহিত। উই উইল হ্যাভ দি সেফটি পুজো।"

"কিন্তু ভবিতব্য!" আফশোস করলেন বরদাপ্রসন্ন।

সায়েবের কথা মতো করুণাপ্রসন্ন পরের দিন কালিঘাটে পুরোহিতের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে বললেন, মস্ত বাড়ি হবে, অনেক লোক থাকবে—নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো আচ্চা করাতে চাই আমরা।

পুরুতমশায় ফর্দ করে দিলেন। করুণাপ্রসন্ন নিজে ভবানীপুরের বাজার থেকে ফর্দ অনুযায়ী পুজোর সমস্ত জিনিস-পত্তর যোগাড় করলেন। সকাল বেলায় স্নান সেরে করুণাপ্রসন্ন আবার পুরুতের বাড়ি গেলেন।

পুরুতমশায় ইতিমধ্যে পাঁজি দেখে বসে আছেন। বললেন, "করুণাপ্রসন্ন, আজ তো কোনোরকমেই পুজো করা চলে না। গৃহারম্ভের পক্ষে মোটেই শুভদিন নয়। তুমি অন্তত একদিন শুভকাজটা পিছিয়ে দাও।"

করুণাপ্রসন্ন সায়েবকে খুব ভালবাসতেন। সায়েবের যাতে মঙ্গল হয় তাই প্রার্থনা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মার্টিন সায়েবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটলেন। কিন্তু বেপরোয়া সায়েব সেদিন করুণাপ্রসন্নর অনুরোধ রাখতে রাজী হলেন না। মাথায় খাকি রঙের সোলা-হ্যাট পরে জমির কাছে দাঁড়িয়ে মার্টিন সায়েব কুলিদের হুকুম করলেন: মাটি খোঁড়া আরম্ভ করো।

পুরনো দিনের গল্প বলতে বলতে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আস্পর্ধাটা বুঝুন। সায়েব হুকুম করছেন : স্টার্ট ডিগিং—গডস উইল টেক কেয়ার অফ দেমসেলভস।"

করুণাপ্রসন্ন তখন মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছেন। মার্টিন সায়েব বললেন, "কারুণা, আই অ্যাম স্যরি। আমি আমার কাজ করি, তুমি দেবতাদের ফর্মালিটি সামলাও।"

অজানা ভয়ে করুণাপ্রসন্ন সেদিনই শিউরে উঠেছিলেন। আবার ছুটেছিলেন কালিঘাটে পুরোহিতের বাড়ি। জিজ্ঞেস করলেন, কোনোরকমে দোষ শোধন করানো যায় কিনা।

"পণ্ডিতমশায় বই খুলে সেদিন কী বলেছিলেন জানেন?" বরদাপ্রসন্ন আমাকে এবার প্রশ্ন করলেন।

এসব ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ বা কৌতূহল নেই।

কিন্তু বরদাপ্রসন্ন জোর করলেন, "শুনুন, মশাই, শুনুন। যে-বাড়ির দায়িত্ব নেবেন, তার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিন। পণ্ডিতমশায়ের পুরনো কথা এখনও মিথ্যে হয়নি।"

বরদাপ্রসন্ন আবার শুরু করলেন :

"গম্ভীর মুখে পুরুতমশায় সেদিন করুণাপ্রসন্নকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়ির মুখ কোন্ দিকে হচ্ছে? কলকাতার সব ভাল বাড়িই তো দক্ষিণ মুখো হয়, উত্তর দিয়েছিলেন করুণাপ্রসন্ন। 'নিষিদ্ধকালে গৃহনির্মাণ তাও আবার দক্ষিণমুখে,' মুখ কুঞ্চিত করেছিলেন পুরুতমশায়। আর কোন মন্তব্য না করে তিনি শাস্ত্রীয় বইখানাই করুণাপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। 'কর্কট, কুম্ভ, সিংহ ও মকর রাশিতে সূর্যের অবস্থান সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমমুখ গৃহ কর্তব্য। যে দুর্মতিবিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার অন্যথা করে তার সর্বনাশ হয়'।

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম বরদাপ্রসন্নকে।

বিষণ্ণ বদনে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সামান্য সরকারের কথা সায়েব শুনলেন না। গরীবের কথা তো! বাসী না হলে মিষ্টি লাগে না।"

(ক্রমশ)

ঘরে বাইরে

মার্থা আন্দোলন

বাইবেলে আছে মেরির ভগিনী মার্থা ঘরের কাজে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকতেন। যীশুর পদতলে বসে মেরিমাতা শুনতেন তাঁর মুখের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আর জ্ঞানের কথা। মার্থা যোগাতেন সংসারের সচলতা। দু হাজার বছর কেটে গেছে, পৃথিবী জুড়ে মার্থারা তাই আছে। অথচ ঘরের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার যে দায়িত্ব তা কম নয়। সেই দায়িত্বের সম্মান কোথায়? সেই কর্তব্য যে আর কোন কর্তব্যের চেয়ে কম নয় তাই প্রতিষ্ঠা করার জন্য মার্কিন দেশে মেয়েরা উঠেপড়ে লেগেছে। সংবাদপত্রে সে খবর পড়ে ভালই লাগলো।

মায়ের ভূমিকা, গৃহিণীর ভূমিকার প্রতিষ্ঠা চাই। চাই মর্যাদার আসন। নারী আন্দোলনের এই দিক তুচ্ছ নয়। শ্রীমতী মিলিয়া নামে একটি ঘরনী বার্ষিক ১৫,০০০ ডলার উপার্জনের পর সংসার পাতলেন শহরতলিতে। ছোট্ট জায়গা। বাচ্চা ছেলে মানুষ করা, স্বামীর সুখসুবিধা দেখা, ঘরের কাজ, পাঁচরকম রান্নাবান্না সব মিলে দিনে অবসর ছিল না এতটুকুও। বছর খানেক কেটে গেল। তারপর মিলিয়া মেমসাহেব চাকরির দরখাস্ত করলেন। দরখাস্ত করতে গিয়ে দেখলেন, যে বেতন তিনি আগে পেতেন তার প্রায় অর্ধেক বেতনের চাকরির জন্য দরখাস্ত যাচ্ছে। কেন? মনে মনে ভাবলেন নিজেকে 'ডি-ভ্যালু' করলেন কি করে? গৃহিণী-পনার ফলস্বরূপ তাঁর দাম বাজারে কমে গেছে।

এই উপলব্ধি থেকেই নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত। শ্রীমতী মিলিয়ার সঙ্গে মিলে গেলেন আরও পাঁচজন মহিলা। ঘরনীদের কদর কম। তার বিরুদ্ধে শুরু হল আন্দোলন। নারী প্রগতি ও নারীর গৃহিণীমূর্তির মধ্যে যে তফাত তা মিটিয়ে দিতে হবে। দলে পঞ্চাশটি সভা হলেন। বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত হলো। ভবিষ্যতে ছয় কোটির উপর হবে দলটি—এ ধারণা এঁরা পোষণ করেন। রীতিমত বিরাট এক জনমত, মস্ত নির্বাচকমণ্ডলী। ১০০,০০০ ডলারের রাজনীতিভিত্তিক সভা সংগ্রহ অভিযান চলছে মার্কিন দেশের সর্বত্র। বহু বৃহৎ সংস্থার কাছ থেকে ওঁরা দান আশা করছেন।

মিলিয়া বলেন, তাঁরা ধার্মিক সংস্থা নন, প্রগতিবাদিনীও নন, তার বিরোধীও নন। যুগের দাবি আমরা চাই না, আমাদের দাবি চিরদিনের। গৃহিণীদের করণীয় কম নয়। সারাক্ষণ মিটিং-এ যাবার ছুটোছুটির তাঁদের অবসর কই? ওঁরা যে উন্মুক্ত মঞ্চে বক্তৃতা করতে চান না তা নয়, অথবা নানা কমিশন বা স্থানীয় সংস্থায় অংশ নেবেন না মনে করেন তাও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সরকার ঘরনীদের উপেক্ষা করে চলছেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঘরনীদের স্থান থাকে না। সমাজের সকল সমস্যার সমাধান হয় তাঁদের বেমালুম বাদ দিয়ে। পরিবার যদি সমাজের একক হয় তবে সেই এককের মধ্যমণি হলেন গৃহিণী। প্রত্যেক দেশের উত্তরকাল তৈরী হয় মায়ের হাতে। সেখানে গুরুত্ব না দিলে চলবে কি করে?

মার্থা আন্দোলনের মুখ্য নেত্রী মিলিয়া বলেন, সমাজের বহু সমস্যা, যেমন বিবাহবিচ্ছেদ, শিশুদের অবহেলা, জাতিভেদ, বালকবালিকার অপরাধ, দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি, মাত্রাহীন মদ্যপান, ড্রাগ-এর নেশা সবই ঘরনীরা বেশী ভাল বোঝেন। তাই মার্থা আন্দোলন চান প্রকৃত গুরুত্ব গৃহিণীদের দিতে।

যে মেয়েরা ঘরের আওতায় থাকতে নারাজ তাদের জন্য যে ঘরই খুঁজতে হবে তাও মার্থারা বলেন না। তবে প্রত্যেক মেয়ে স্বাধীন পথের সুযোগ পান না। তারা গৃহিণীজীবনকে যাতে সুখের ও সুন্দর করতে পারেন তাই মার্থাদের দেখার দায়িত্ব। প্রত্যেক মেয়ে সুগৃহিণী হন না। কারণ গৃহিণীপনার মান নেই। যাঁরা সে মান পান তাঁদের ঘরের দায়িত্ব পূর্ণতায় পরিণত হয়।

মার্থা আন্দোলনের বিরোধ সবচেয়ে বেশী করছেন নারী প্রগতিবাদিনীরা। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে তথাকথিত প্রগতিবাদিনীরা সবাই আইন পড়েন না, ডাক্তার হন না বা রাজনীতি করেন না। শতকরা ৬৩ জন মেয়ে কাজ করেন বাধ্য হয়ে। মনে তাঁদের বাসনা থাকে সাজানো সংসারের সার্থক গৃহিণী হবার। তাঁরা দায়ে পড়ে চাকরি করেন। দু পয়সা দরকার অথবা সংসার করার সুযোগ আসছে না। ঘরনীদের মান না দিলে সংসার বিষময়

হবে। দূরের ডাক সংসারের বাইরে হাত-ছানি দিতে থাকলে কি আর সকলে ঘরের বাইরে সার্থকতা লাভ করবে? বরং অবসাদ আর ব্যর্থতা ব্যাহিত করে দেবে দৈনন্দিন জীবন।

খবরের টুকরো

অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে আগুন ধরে যায় হঠাৎ। বুশ ফায়ার বা জঙ্গলের আগুন বড় সাংঘাতিক। এখন মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা জঙ্গলের আগুন নেবানোর কাজে লেগেছেন। যখনই আগুন লাগার সতর্কতা সাইরেন কেম্পস ক্রীক এলাকায় তীব্র ধ্বনিতে আর্তনাদ করে তখনই আশেপাশে সবাই বুঝতে পারে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা দায়িত্ব পালন করছেন। দূরে দূরে ছোট ছোট বসতি। তাদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবী ফায়ার ফাইটারদের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সিডনি থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে কেম্পস ক্রীক। জয় মিলার নামে একটি মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের নেত্রী। তাঁর স্বামী রন স্বেচ্ছাসেবী ফায়ার ফাইটার দলের ক্যাপ্টেন। তাঁরা রাতে কিংবা সপ্তাহের শনি-রবিবারে ডিউটি করেন। সপ্তাহের বাকি

দিনের অর্পায়ত্ব মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের।

বছরখানেক আগে একটি ঘটনা ঘটে। হঠাৎ খবর এলো দারুণ সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ডের। মিলার সাহেব বাইরে। শ্রীমতী মিলার গাড়ি চালিয়ে ফায়ার স্টেশনে এসে বিপদ-সংকেতধ্বনি চালিয়ে দিলেন। মাত্র দুটি লোক সে ধ্বনি শুনে এসে পৌঁছলেন। তাও আবার তাঁরা ফায়ার এঞ্জিন চালাতে জানেন না। জয় মিলার জানতেন। টপ করে উঠে বসে চালিয়ে চলে গেলেন যেখানে আগুন ধরেছে সেখানে। তারপর থেকে আগুন লাগলে জয় মিলার ফায়ার স্টেশনে বিপদ-সংকেত বাজিয়ে দেন। তাঁর সহকারী লিন্ডা ইস্টন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। কোথায় আগুন লেগেছে তা ভাল করে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে, এঁকে জয় ও লিন্ডা চলে যান। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা এসে সেই পথ অনুসরণ করেন। যাদের ছোট ছেলেমেয়ে রেখে যেতে হয় তারা সে ভার অন্য মহিলাদের উপর দিয়ে যান। যদি প্রয়োজন হয় তবে পাশের বড় শহর থেকে পেশাদারী ফায়ার ফাইটার রেডিও যোগে ডেকে নেন।

কাজটা অবশ্য কঠিন। পাম্প কাঁধে করা শক্ত কাজ। জলে ভরা হলে সীসার মত ভারী হয়ে যায়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলজীবনের (বুশ লাইফ) অঙ্গ এটি। বরং তাঁরা মনে করেন বাড়াবাড়ি যাঁদের ভদারকে থাকেন তাঁদের কাজ অনেক বেশী কঠিন।

টুকিটাকি

শুনেছিলাম গল্প। হয়তো বা সত্য ঘটনা। বিলেত বাস করে স্যার 'প' একেবারে দুরন্ত পরিপাটি সাহেব ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী সাধারণ বঙ্গললনা। পরিবর্তন কিছু হয়েছিল স্বামীর শাসনে। কিন্তু তা ছিল উপর উপর। কঠিন অসুখে শয্যা নিলেন যখন তখন যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো, 'মা গো'। শ্বেতাঙ্গিনী নার্স ছুটে গিয়ে সাহেব স্বামীকে জানালেন রোগিনী কিরকম যেন অদ্ভুত আওয়াজ করছেন 'ম্যাগো'। লজ্জায় মুখ লাল করে স্যার 'প' স্ত্রীর ঘরে পৌঁছে নিজের ঘোরতর আপত্তি পেশ করলেন। 'মাগো' বলাতে তাঁর মান যে তলিয়ে গেল কোন অতলে। শারীরিক যাতনায় মানসিক ক্লেশে পীড়িত মহিলা বলে উঠলেন, 'কি বলবো বলে দাও না গো। আমি তো আর ভাবতেও পারছি না।' স্বামী বললেন, 'বলবে ও ডিয়ার হার্ট বিটার!' পরের ঘটনা সম্বন্ধে আর কিছু জানি না। তিক্ততার এই প্রকাশ তাঁকে বেদনায় শান্তি দিয়েছিল কিনা কে জানে।

অনেক দিন পরে জানলাম এখন মানসিক রোগের চিকিৎসকরা কেউ কেউ রায় দিয়েছেন যে, মা গো বাবা গো বলে ছোট শিশু যেমন কাঁদে, জীবনের কঠিন সংকটে মা গো বাবা গো বললে মানসিক, এমন কি শারীরিক ক্লেশের উপশম শৈশবোত্তর জীবনেও হয়। তাই মা গো বলা বৃথা নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা জগৎ স্নায়বিক বিকারে ভুগে চলেছে। সাধারণ মানুষ তার দুঃখকষ্ট শত চেষ্টাতেও মুছে ফেলতে পারছে না। বছর সাতেক আগে মানুষের জীবনের আদিম আকুলিবিকুলির পুনরাবৃত্তি নিয়ে চর্চাকে অনেকেই খেপামিসঞ্জাত খেয়াল মনে করতো। কিন্তু তার পরে অনেক দিন কেটে গেছে। বহু দেশের বিজ্ঞ মানুষ মা বাবা বলে আর্তনাদ করাকে বেদনাহর বলে মনে করেন। দেখা গেছে এমন নারী যে উপেক্ষার দোহাই দিয়ে কেঁদে-কেটে কাল কাটান, কেউ তাঁকে ভালবাসে না এই তাঁর অনুযোগ। দুনিয়ার দুঃখ পেয়েই দিন চলে যাচ্ছে। নালিশ শুনবার কেউ নেই। তাই মনোবৈজ্ঞানিক তার আদিম কান্নার পুনরুদ্ধার করলেন। মহিলার মনের টেনশান বা কঠিন চাপ আর উত্তেজনা যেন হঠাৎ বাঁধন খুলে দিল। মুক্তির আনন্দে তিনি নতুন জীবন পেলেন। এই ক্রিয়াপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের দেশে এখনও চালু হয়নি কিন্তু বাবা গো মা গো ডাক আমরা ডাকি বইকি!

শ্রীমতী

ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম
শুভ্রা স্নিগ্ধা
মনলোভা
সবে ফিরে
দেখে তব শোভা
Lakmé
VANISHING CREAM
বারবার সবার দৃষ্টি যদি আপনার ওপর
গিয়ে পড়ে --দোষ দিতে পারেন কি?
ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে আপনাকে
যে আরো ফর্সা, আরো তরতাজা দেখাচ্ছে!
ঠান্ডা। স্বাভাবিক। মেক-আপের
আদর্শ আধার...
ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম।
সৌন্দর্য্য সাধনায়
ল্যাক্‌মে
ল্যাক্‌মে
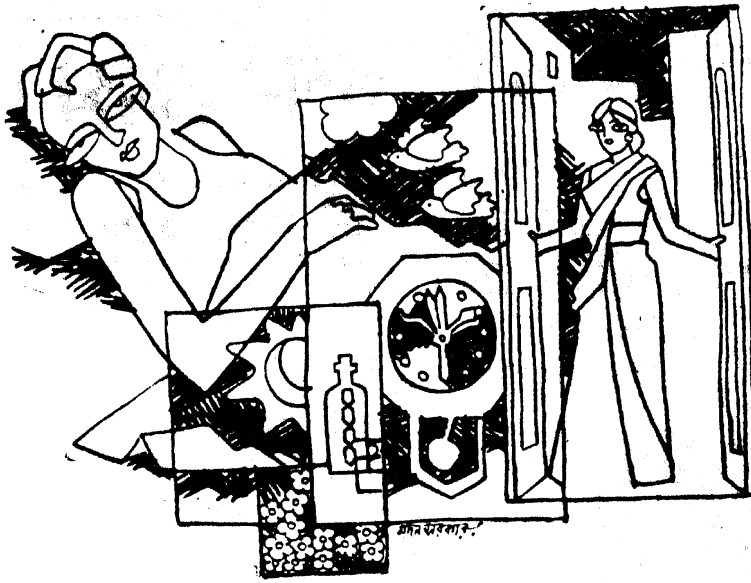
অমলের দুপুর

কল্যাণ সেন

অমল শুয়ে আছে বিছানায়। পা দুটো টান করে মেলে দেওয়া তাই পেটটা নিচু লাগছে। খালি পেট। সেই কখন ঘণ্টা চারপাঁচ আগে খেয়েছিল আধ-কাপ মতন লেবু জল. তারপর বমি করেছে দু'তিনবার; এখন অমলের বুকের খাঁচাটা খুব বড় আর পেটটা একদম মরা লাগছে। হাত দুটোয় কোনো ভঙ্গি নেই, বাঁ হাত ভাঁজ করে কপালে রেখেছে, ডান হাতটা বিছানার চাদরের ওপর ঢিলে হয়ে পড়ে আছে। লম্বা আঙুলগুলো শক্ত. ফাঁকগুলোর ভেতর দাগ, নখ কেমন সাদাটে, হাতের শিরার সঙ্গে বোধহয় বেশ ময়লা মিশে আছে. গোড়ালিতে শুকনো সাদা চামড়া উঠছে, গলার দুদিকের কণ্ঠার হাড় প্রায় জামা-প্যান্ট ঝোলানোর হ্যাঙ্গার হয়ে বেরিয়ে এসেছে, শিরাগুলো একটু ফোলা. ঠাণ্ডা নীলাচে ভাব, ঠেলে বেরিয়ে আসার জন্য ঝুলে পড়বে. তাকালে এরকম ভয় হয়। গালে বেশ কিছুদিনের গোঁফ-দাড়ির জঞ্জাল; খোঁচা মারছে, মনে হয় পিঁপড়ে জ্বালাতন করছে ভেতরে ঢুকে; চোখ!... চোখ কেমন অমন দেখতে না পেলেও বলে দিতে পারে পচা আলুর ভেতরটার মতন চোখের জমি, দু'একটা খুব সূক্ষ্ম, রক্ত-মুখ শিরায় যেন জট পাকিয়ে আছে, মণিটা কী ঘোলাটে যেমন জণ্ডিস হলে হয়? অমলের বেশ বড় চুল ছিল, ছেঁটে দেওয়া হয়েছে দেহাতি নাপিত ডেকে, তাই কান দুটো বেখাপ্পা লাগছে। সবটা মিলিয়ে অমল যেন আর একজনের মুখ ধার করে একদম এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। তলপেটে মাঝে মাঝে মোচড় দিচ্ছে যন্ত্রণা, জিভ তেতো, শুকনো, তবু যে কোনো মুহূর্তেই আবার ভেতরের কষ্টটা গলগল করে বেরিয়ে আসতে পারে মুখ দিয়ে। পাশ ফিরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শরীরটা কয়েক টুকরো হয়ে যাবে, এরকম একটা ভয় না কষ্ট বেঁধে রাখে তাকে।

অমলের বিছানার চাদরটা খয়েরি-নীল ডোরা কাটা. অনেকটা লুডো খেলার চৌকো ঘরের মতন লাগে; দেয়ালের রঙ কিচ্ছোর সবুজ, একটু দূরে টেবিলের ওপর কালো ডায়ালের টাইমপিস; শব্দ... শব্দ...দুটো বাজতে আট না দশ না বারো মিনিট বাকি এখন? ঘড়ির পাশে শিশিতে হলুদ-সবুজ ক্যাপসুল, একটা ছাই ছাই রঙের সিরাপ জাতীয় ওষুধ এক ফাইল, তার ওপর চামচ একটা উলটো করে রেখে দেওয়া, চামচের মাথায় কী পিঁপড়ের ঝাঁক? এক স্ট্রিপ বড়ি, তিনটে ছিঁড়ে খাওয়া হয়েছে, বোধহয় গোটা সাতেক আছে এখন। টেবিলের ঢাকনাটার ঝুলে থাকা একটা কোণে বেশ বড় ফুটো, হঠাৎ চোখ পড়লে মনে হয় একটা বিচ্ছিরি পোকা সোজা তাকিয়ে আছে অমলের দিকে।

জানলার পর্দার রঙটা চটে গেছে. ধুলো উড়বে নাড়া দিলে. কিন্তু তার পেছনে দুপুরের রাগী রোদ্দুর; ছিটকে এসে টেবিলের পায়া ছুঁয়ে আছে কিছুটা রোদ; দেয়ালে একটা দুটো তিনটে ক্যালেন্ডার। একটায় কোনো ছবি নেই, বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ, নীল কালীমার বাংলা ক্যালেন্ডার আর একটা. ঠিক চোখের সোজাসুজিটায় সুন্দর একটা ছবি: চার-দিকে সবুজ মাঠ, তার মধ্যে একপাল হরিণ; এত জীবন্ত যে অমলের মনে হয় এখুনি ভয় মুখ ফিরিয়ে দেখবে তাকে, একবার ওদের আদর করে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। অমল জানে না, কতদূরের মাঠে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

পা ভাঁজ করলো অমল. টকাস হাঁটু ভাঙার শব্দ শুনতে পেল সে. নিঃশ্বাস ফেলবার সময় বুকের খাঁচাটা আর একটু বড় লাগলো, ঘাড়টা বালিশে একটানা রেখে ব্যথা করছে বেশ। উবুড় হবে নাকি?... হাতের তালুটা টেনে আনলো চোখের ওপর; মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলো রেখাগুলো: কোনটার কী মানে? অসংখ্য কাটাকুটি, বৃহস্পতিতে ক্রস একটা, একটা ত্রিভুজ রয়েছে নিচে বাঁ দিকে; আয়ু রেখাটা কী রবার দিয়ে ঘসে দিয়েছে কেউ? অমল দাঁত বসিয়ে দেয় ঠোঁটে, সবটা মনে হয় কোনো আর্টিস্টের উদ্ভট একটা চিন্তা তার হাতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জীবন কী চাকায় হাতের এই ফালতু কতগুলো দাগ? তাহলে আয়ু রেখাটা...ভেঙে... ঝাপসা হয়ে...ঠিক তখন ছাদ থেকে নেমে আসা একটা টিকটিকির ধূর্ত চোখ এগিয়ে এল কিছুটা, অমলকেই শিকার করবার আগে ভাল করে দেখে নিচ্ছে একবার?

টকটক টকটক ডাকটা মাথা ফুটো করে চলে যাচ্ছে ভেতরে?...

মুখের ভেতর আবার জমা হচ্ছে নোনা জল, পর পর অনেকগুলো ঢেঁকুর উঠলো; ঠিক গলার নিচেই যেন একটা আধুলি আটকে থাকার কষ্ট; নেমেও যাচ্ছে না, সে বার করেও দিতে পারছে না, তার মানে আবার খানিকটা বমি উঠে গেল... কষ্টটায় দম বন্ধ করে দিতে চায়, মাথাটা উঁচু করলে একটু আরাম লাগবে? চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসছে, বুকটা যেন এখন শরীর থেকে কার হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে যাবে, পাঁজরায় টের পাচ্ছে দারুণ চাপ, কে একটা আলপিন টেনে যাচ্ছে সমস্ত তলপেটে; উহ্! একবার কী খামচে টেনে নেবে একটা বালিশ। আঙুলে তুলে রাখলো বুকের বাঁ দিকে। শব্দ; আর! এখনো জীবন ওই ছোট্ট শব্দটায় অনবরত বলে যাচ্ছে—আছি। আছি। আছি! অনেকক্ষণ আঙুল ছুঁয়ে রইলো সেই শব্দে। টালমাটাল শরীরটা ক্রমশ ফিরে পেল অমল।
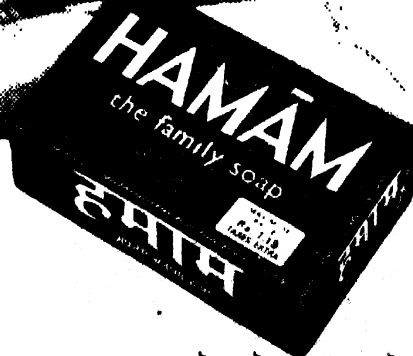
দেয়ালের বিচ্ছিরি সবুজের ওপর দিয়ে কী কিম্ভূত আকৃতির কালো কালো পোকারা ওঠানামা করছে? ছাদট দুলছে, উঠে যাচ্ছে, নাকি নেমে আসবে বুকের ওপর? ঘরে কী হঠাৎ দমকা হাওয়া এল একটা? ওষুধের ফাইলটা পড়ে গেল নাকি! ক্যালেণ্ডারের পাতায় শব্দ, ওই সুন্দর হরিণেরা কোথায় চলে গেছে এখন?

বড় ওলটপালট হয়ে গেছে ভেতরের সব কলকব্জা; কোনোটা হয়তো ভেঙেগ গেছে, কোনোটায় হয়তো ধুলো পড়েছে খুব, কোনোটা একদম নষ্ট করে দিয়েছে অদৃশ্য জীবাণু; অমল কী জলের মতন ঘুরে ঘুরে কথা বলে যাচ্ছে নিজেরই সঙ্গে? তবু টান করা পা, গোড়ালিতে শুকনো সাদা চামড়া, বিছানার চাদর খামচে ধরা আঙুল, দাড়ির খচরামি, তেতো জিভ, গলার নিচের বিশ্রী কষ্ট, মাথার ভেতর কাঠ-ঠোকরার ফুটো করে যাওয়ার শব্দ অবিরাম, পাঁচ ফুট পাঁচ ওজন সাড়ে ছত্রিশ কে জি (এখন নিশ্চয়ই আরও কম) বাঁ হাতে টিকের গোল দাগ, অমল শুয়ে আছে বিছানায়, ঘড়ির শব্দ: ঘুরছে টিকটিক...টিকটিক..দুটো বেজে কুড়ি বাইশ হল প্রায়

—একটু উঠে বসবো? কার কাছে জানতে চাইছে অমল?

কোমরের নিচের অংশটা যেন আর তার নয়, ভারি হয়ে বিছানায় পড়ে আছে সেটা, কোনোরকমে কিছু খাওয়ার সময় বুক মাথা যেমন টেনে তোলে, তেমনি জানলার কাছটায় কিছুটা সরে এসে উঁচু করে ধরলো নিজেকে। হাত কাঁপে; শিক চেপে ধরে সামলে নেবার চেষ্টা করলো সে। দুপুরের রাস্তা লম্বা হয়ে পড়ে আছে; ওদিকে কলের মুখ দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে তোড়ে; নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অকারণ, মন খারাপ হয়ে যায়; কোথায় চলে যাচ্ছে এই জল? ঠিক এরকমই উদ্দেশ্যহীন, প্রয়োজনহীন, ক্রমশ ঢালুর দিকেই গড়িয়ে যাচ্ছে তার জীবন! হঠাৎ শীত যেন ছুটে আসে রক্তের ভেতরে, গায়ে কাঁটা দেয়; তারপর বোঝে বড় কাহিল হয়ে যাচ্ছে মন, মানে হয় না এ সবের; তবু দুএকটা কাক, কী শালিখ যদি এখন গা ভেজাতো ওই জলে বা ওদিকের ব্যারাকের দুটো একটা বাচ্চা খুব জল ছিটিয়ে চানটান করতো, বোধহয় ভাল লাগতো তার। একটা হলুদ ট্যাকসি দাঁড়িয়ে দুপুরের রোদে; খুব সম্ভব ম্যাটিনী শো-এর খদ্দেরের আশায়; রোদের তেজ হঠাৎ নিভিয়ে দিয়ে আকাশে কী মেঘ এল! একটা লরি চলে যাচ্ছে সি এম ডি এ লেখা বোর্ড ঝুলিয়ে; কেমন ধুলো মাখা হয়ে গেল চারদিক; আবার মেঘ ভেঙেগ তেজী রোদ চারধারে, গাছের পাতায়; তার জানলায়।

—চাই—ই...ই...স্টেনলেস স্টীলের থালা ...আ...আ...বা...স...ন্...ন্...ন...

ঝিম মেরে থাকা দুপুরের গায়ে যেন পেরেক বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে একটা খ্যানখ্যানে মেয়েলি গলা। অমলের চোখে পড়ে, রোদ ঝলকাচ্ছে চমৎকার ওই বাসন-গুলোর গায়ে; চালতে গাছটার পাতা থেমে আছে একদম, তার পেছনে পুরনো স্টুডিওর ভাঙা বাড়ির মাথায় বসে আছে দু তিনটে কাক; আশ্চর্য! কোনোদিকে ছায়া নেই, কাকগুলো কী তবে শরীরের ভেতরেই গুটিয়ে রেখেছে ছায়া? সবুজ ছাতি মাথায় চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে। তার খোলা পিঠের অনেকটায় এখন আবছা সবুজ রোদ্দুর, মেয়েটির চমৎকার শাড়ির কারুকার্য রোদ্দুরকে যেন রঙ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে এখন।

যদি জানলার দিকে মুখটা তুলতো একবার! কিন্তু ওই সুগঠিত শরীর বড় তাড়াতাড়ি চোখের ফ্রেম থেকে সরে যায়। আবার শুয়ে পড়ার কথা ভাবছে অমল, কিন্তু শুয়ে শুয়ে তো চামড়া একদম ঘসে গেল বিছানায়; জানলার পর্দাটা একদম তুলে দিয়ে রোদ টেনে আনতে ইচ্ছে করে; কতদিন রাস্তায় বেরনো বন্ধ তার? শূন্যে একটা পাখিও চোখে পড়ছে না এখন, চোখ শক্ত হয়ে যায় এরকম নীল শূন্যতায়, না, খেয়াল করেনি সে, ওইতো ইলেকট্রিক তারে ঝুলছে একটা ঘুড়ি, একদম ফেটে গেছে, বোধহয় হাওয়ার টানে, তবু ঘুড়িটার দুটো রঙ অনেকক্ষণ চোখে লেগে থাকে তার। তবু একটা যা হোক কিছু চোখের সামনে...ঘরের ভেতরটা কেমন আবছা অন্ধকার হয়ে এল, তাহলে মেঘ কোথাও আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে! জলের গ্লাসের ওপর পিঁপড়ে: পিঠটা ক্রমশ ঢিলে করে দিয়ে শরীরটা আবার নামিয়ে আনলো অমল। কোনো বাড়িতে কী গীটার বাজছে রেডিওতে? হাত দিয়ে আবার চোখ, কপাল আড়াল করে রাখে সে, ঠোঁট ভেজায় জিভের ডগা দিয়ে, একটু জল খেলে হতো; খবরের কাগজটা দিতে বলবো মাকে? কী পড়বো? কী আছে কাগজে?... মধ্যমগ্রামে ডাকাত ধৃত...বাস উলটাইয়া বরসহ সাতচল্লিশজন বরযাত্রী নিহত, সগৌরবে চলিতেছে আটাশ সপ্তাহ...

ধ্যাৎ! মাথার ভেতরটা যেন উলটো পালটা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে লাঙলের ফলা; শরীরটা হঠাৎ অবশ হয়ে আসছে, এরকম মনে হয়, চোখের ওপর উড়ছে অসংখ্য কালো ফুটকি; তার মানে...তার মানে...এখন যদি হঠাৎ বিজনটা আসতো বা আর যে হোক কেউ, খানিকটা সময় তাহলে

কেটে যেতো তালগোলে; বা ওপরতলার ফ্ল্যাটের ফুটফুটে পাঁচ ছ' বছরের মেয়েটা; ব'ড়শির মতন গলায় গেঁথে থাকা এই এতটা দুপুর তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতো সে।

বালিশের পাশ থেকে টেনে নিল একটা বই। যে পাতাটা বেরলো, সেটাই পড়ার চেষ্টা করল অমল; লাইনগুলো ওঠানামা করছে যেন, অক্ষরগুলো সব 'ছাত্রিশ পয়েণ্ট' হয়ে চোখ ঢেকে ফেলবে তার? মা মেয়েকে দেড়পাতা ধরে মেয়েলি-ব্যথার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছে; টমাস মান সুযোগ পেয়ে একেবারে ডাক্তারের বাবা সেজে বসেছেন; ধ্যাত্তেরি কা!...একটা সিনেমার পত্রিকা পেলে কিছুক্ষণ দেখে মন্দ কাটতো না সময়, কিছুক্ষণ চোখে চোখ লাগিয়ে রাখতো হেমা মালিনীর সঙ্গে; সঞ্জীবকুমারকে বলতো, ভাই, ভুঁড়ি না কমালে যে এবার তোমাকে গোঁফ লাগিয়ে পুলিস অফিসার সাজতে হবে শুধু। না নেই। শুধু দেয়ালের কোণে কোথায় এখন ঘাপটি মেরে বসে আছে টিকটিকিটা, অমল খুঁজে দেখার চেষ্টা করলো।

লম্বা এই দুপুরটাও যেন ক্যাপসুলে গিলে গিলে হলদেটে মেরে গেছে। চোখ ধরে যায় তাকিয়ে থাকলে, হঠাৎ কী একটা কুকুরটুকুর চাপা পড়লো রাস্তায়? ভীষণ একটা কাণ্ড বাধাতে ইচ্ছে করে হঠাৎ, আঙুল কাঁপে, বুকের শব্দটা পাগলা ঘোড়া হয়ে ছুটে যায়; এই বিছানা, এই ঘ[illegible] শালার গুষ্টির ওই ওষুধগুলো সব [illegible] মেরে এখন যদি আবার বাইরে যেতে পারতো; ভিড়ের বাসে ঝগড়া অন্য প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে; দোকানের বিশ্রী আয়নায় নিজের মুখ দেখার মজা, তারপর সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে কাউকে ফোন করা—কীরে, একদম পাত্তা নেই, কেমন আছিস সব; অসুখ টসুখ করেনি তো? এরকম একটা ছবি জলের ওপর মুখ ভাসিয়েই আবার ডুবে যায়; আবার পাশ ফেরার সময় ঠকাস শব্দ হয় হাঁটুর ভাঁজে, একটা মাছি প্রথমে নামে তারপর চোখের ওপর ঘুরে ঘুরে তার খাদ্য খোঁজে; আর অমল তখন ভাবে যদি কোনো ম্যাজিকের আশ্চর্য খেলাটেলা সে জানতো তবে এক সেকেণ্ডেই একটা হাততালিতে সে বানিয়ে ফেলতে পারতো একটা চমৎকার শীতের দুপুর। দারুণ! আর সেই রোদের আরামটুকুর মধ্যে বাড়ি, গাছ, মানুষ, দোতলা বাস কার্ডিগ্যান গায়ে মেয়ে পথের মোড়ে লাল ডাক-বাকসো, পড়ে থাকা একটা সিগারেটের প্যাকেট সব কিছু বড় সুখী আর নিজের মনে হতো তার। আর অমল
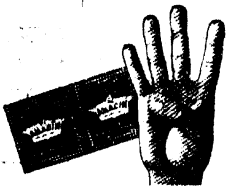
নিজেও কী এরকম পড়ে থাকতো বিছানায়? হয়তো হেঁটে যেতো পার্কসার্কাস ময়দানের পাশ দিয়ে, হঠাৎ পেছন থেকে এসে হয়তো তাকে চমকে দিত সুব্রতর স্কুটার;

—আরে অমল, তুই এদিকে? ওঠ পেছনে বোস। তারপর মশলা দেওয়া পান খাওয়া দুজনের; কখন এক সময় ঢুকে যাওয়া গেলাব বা এলিটের অভিজাত অন্ধকারে।

—নে, বড়িটা খেয়ে নে। মার হাতে জলের গেলাস।

মাথা তুলে বড়িটা ভেতরে চালান করে দিতে দিতে অমলের মনে হ'ল রামধনুর সাতটা রঙ একটা কথাতেই গেলাসের জলে সাদা হয়ে মিলিয়ে গেল। ওয়াক শব্দে বেঁকে যাচ্ছে শরীর।

—বমিটমি হবে নাকি আবার? গামলাটা রেখে যাব?

—না;

—বসে থাকিস না, মাথা ঘুরবে; শুয়ে পড়।

—চশমাটা কোথায়?

—তুলে রেখেছি আলমারির মাথায়; দেব?

—থাক;

—মোসাম্বি কেটে দেব একটু; খাবি?

—না;

এই বড়িটা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার অস্থির শিরাগুলোকে ঘুমের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। ঠিক ঘুম নয়; অথচ মাথা যেন ভরে যায় জলের ছোট ছোট শব্দে; হাত, পা বুক, পেট সব কিছু যেন মাধ্যাকর্ষণ ছিঁড়ে হালকা মেঘ হয়ে ঘুরে বেড়াবে অন্য কোনো গ্রহে। বড় ভাল লাগে অমলের। মিষ্টি একটা ঘণ্টা বাজতে থাকে তার রক্তের ভেতরে; আহ! জেগে থাকে সে, অথচ জেগে থাকাটার ওপর কে যেন ঢেলে দেয় পাহাড়ী কুয়াশা; বারে! কুকুরের লেজে ঝুলে থাকা দুপুর; ছায়াহীন বসে থাকা দুতিনটে কাক; রবারের ঘসায় ঘসায় সব মুছে যেতে থাকে, পিঠে আবছা রোদ, সবুজ ছাতির সেই মেয়েটি তখন কী মুখ ঘোরায়—কেমন আছ অমল!...তারপর কী রকম তালগোল পাকিয়ে যেতে চায় সব; তিনশ' হাত লম্বা একটা ছায়া-শরীর সাঁড়াশির চাপ দিয়ে তুলে নেয় তাকে; দরজা বন্ধ হয়ে যায়, জানলা বন্ধ হয়ে যায়, বিছানাটা আর খুঁজে পায় না অমল। পরিষ্কার দেখতে পায় রেললাইনের ওপর ছিটিয়ে পড়ে আছে তার টুকরো টুকরো শরীর; বাতাসা রঙের ভেজা ভেজা আলো শীত টেনে আনে; এই আলো কী জ্যোৎস্নায়?...তখন বিজন ক্যামেরার বালব লাগিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—রেডি; একটা দুর্দান্ত ইঞ্জিন খ্যাপার মতন হুইসিলে মাটি কাঁপিয়ে আসছে; এগিয়ে আসছে...

—বি-জ...ন!!

—চেঁচিয়ে উঠলি কেন! ডাক্তারের স্বপ্ন দেখেছিস নাকি!

—জানলাটা খুলে দাও;

—কটা বাজে?...

—প্রায় তিনটে; একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

মার হাত টেনে চোখের ওপর চেপে রাখে অমল। চাদরটা পেঁচিয়ে যায় গায়ে; মশারির বাইরে তিনশ' হাত লম্বা ছায়া-শরীর!...ব্যারাকের বাচ্চা একটানা কাঁদতে থাকে; পাহারাওয়ালার লাঠির শব্দটা যেন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ফেটে পড়ে—হ্যান্ডস আপ!

এই বড়িটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সময় ভেঙে দিয়ে তাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে থাকে; বড় ভাল লাগে অমলের।

—ওয়াক ...ই ... ক্... ক্... ওয়াক... ক...ক্...

খানিকটা হলুদ জল ছিটকে পড়লো খাটের পাশে; ঝুলে পড়ল মাথা; ওষুধের গুঁড়ো মিশে আছে ওই জলে; তার আরামটুকু, সুখের ঝিমুনিটুকু কী এখন একটা আরসোলার পেটে যাবে? হাত বাড়িয়ে গেলাসের জল এক ঢোঁক খেল অমল।

অমল দেখতে পেল, 'মোবাইল পোস্ট অফিস'-এর চমৎকার লাল গাড়িটা এসে থামলো। লালের গায়ে বড় বড় হলুদ অক্ষরগুলো রোদে দারুণ লাগছে এখন, চোখে পড়লো খামপোস্টকার্ডের একটা ছোট্ট লাইন, চিঠি ফেলছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক; পাড়ার এই ভদ্রলোক অনবরত খবরের কাগজে চিঠি লেখেন, আজকের চিঠিটা কী মিনি-বাসের বাড়াবাড়ি নিয়ে? বেঁচে আছেন, তবু একটা কিছু নিয়ে জীবনভাবে বেঁচে আছেন ভদ্রলোক; আর আর সে নিজে? ভাবলে যেন দম ফুরিয়ে আসে; চোখ ভার হয়ে ওঠে। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে থাকা হাতের পিঠে ভাঙা রোদ্দুর; সমস্ত দৃশ্যটা টেনে নিতে ইচ্ছে হয় নিজের কাছে, মনে হয় এখনই কেউ তোমার চিঠি বলে একটা সুন্দর ইনল্যান্ডলেটার দিয়ে যাবে তাকে, আঙুল দিয়ে চিঠির মাথা ছিঁড়ে ফেলার সুখ, তারপর কিছুটা সময় গড়িয়ে যাওয়া আর একজনের সুখদুঃখের সঙ্গে। কিন্তু এখন কে তাকে চিঠি লিখবে! কে লিখতে পারে? সুতপা? অসম্ভব। মনে হ'ল দেয়ালে ক্যালেন্ডারের পাতাও হাওয়ায় কেঁপে উঠলো প্রতিবাদের ভঙ্গিতে; অমল, ছিপ ফেলছো কেন আকাশে! তবু অসংখ্য বুদবুদ ভেসে ওঠে তার চোখের ওপর। মুহূর্তে এই ছাদ, বিচ্ছিরি সবুজ দেয়াল, টেবিলে ক্যাপসুল, তার এই হলদেটে জীবন, পিঠে শক্ত তোষকের চাপ, তেতো জিভ—সব কিছু যেন আষাঢ় সন্ধ্যার অলৌকিক রঙে বদলে যেতে থাকে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অমল শুধুই দর্শক, হাত তুললেই ভেঙে যাবে, সে ঢাকা পড়ে যাবে অন্ধকারে। কিন্তু কেন...

সত্যিই একটা বিশাল লাল রঙের মেঘ ক্রমশ ভেঙে গিয়ে যেন পরিচিত কয়েকটা মুখ হয়ে গেল। আশুতোষ বিলডিং-এর দোতলার বারান্দায় অনেক-গুলো চেনা মানুষ; কিন্তু ক্যামেরার লেংশটে স্পষ্ট করে, আলাদা করে চিনতে পারছে কী অমল! তেরো বছরের পুরনো ধুলোবালি কী হঠাৎ তার চোখের ভেতর উড়ে আসে; দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে সে? এত বছর পরেও সেদিকে তাকাতে পারছে না কেন, কিছু চোখের বিদ্রূপ কি গায়ে ফুটে আছে বাবলা কাঁটা হয়ে? পালাতে পারছে না সে, কোনদিকে, কেনদিকে একটু আড়াল আছে তার জন্যে?...

মনে পড়ছে ফিফথ ইয়ারের পুরো চার মাসও হয়নি তখন। টিউটোরিয়াল ক্লাশের ছিন্নপত্রের ওপর কী একটা প্রশ্নের উত্তর টুকে নেবার জন্যে তার খাতাটা নিয়েছিল গ্রুপেরই মেয়ে মীনা; অমল কী বুঝতে পেরেছিল যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে জলের টান সেই মাটি কেড়ে নিয়ে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে তাকে? পরদিন খাতাটা ফেরৎ দিতে এসেছিল মীনা নয়, কাজল উৎপলা; ওরা কী দল বেঁধেই এসেছিল? অমল পরিষ্কার দেখতে পেল য়ুনিভার্সিটিরই ডিপ-স্টোর থেকে কেনা হলুদ মলাটের বাঁধানো খাতার সাদা একটা পাতা জুড়ে লেখা রোল নম্বর ওয়ান এইট ফাইভ। সুতপার রোল ওটা:

শুধু তাই নয়, ডানদিকের পাতায় লাল কালিতে পদ্য :

তোমাকে ভাল লাগে তোমাকে বাসি ভালো
এ কথা দিয়ে যদি হৃদয়ে জ্বালি আলো
বলো গো বলো তবে কার কি ক্ষতি হবে
কার কি ক্ষতি হবে কৃপণ পৃথিবীতে।

আরও মুখরোচক কিছু ছিল, কিন্তু উৎপলা সোজা চোখে জিজ্ঞেস করলো—কবে থেকে?

—কী? জিভ শুকিয়ে গেছে অমলের :

—এই হৃদয়ে আলো জ্বালানো; মীনা কী হঠাৎ গলাটা পালটে নিয়েছে মজা করার জন্য? তাড়াতাড়ি খাতাটা হাতে নিয়ে ব্যাপারটা ধরার চেষ্টা করলো সে : কিন্তু মাথার ভেতর ততক্ষণে ওই লাল অক্ষরগুলো সত্যিই যেন আগুনের ফুলকি হয়ে উড়ছে, পুড়ে যাচ্ছে তার ভেতরটা : চিনলো অমল, হাতের লেখাটা সুবীরের। কিন্তু খাতা তো তার; আর সেটা গিয়ে পড়েছে উৎপলার মতন মেয়েদের হাতে; মাছ জালে ধরা পড়ার পর কেউ তার কাছে জানতে চায় ধরা পড়লে কেন? আচ্ছা, সুতপা জানে? সেই কী ওদের পাঠিয়েছে?...

সেই শুরু। মেয়েদের আলাদা ক্যান্টিনে, দোতলার করিডোরে, ওপরে লাইব্রেরির সিঁড়ির সামনে চাটনির আলনুন হয়ে উঠলো সে। ক্লাশে পারলে সে চাদর মুড়ি দিয়ে আত্মরক্ষা করতো! নিরুপায় সে। ওয়ান এইট্টি ফাইভ—রোলটা এলেই ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ যেন মাছের আঁশ হয়ে লেগে যেত তার গায়ে। ভয়ে বুকের শব্দ বড় হতো তার, হাত ঘেমে যাচ্ছে ভীষণ, নিড্‌ল দিয়ে যেন কেউ নর্ভাসনেস ঢুকিয়ে দিয়েছে তার ভেতরে; অবশ হয়ে আসতে চায় শরীর; যতীন সেনগুপ্তের কবিতা পড়াচ্ছেন নারায়ণবাবু; সমস্ত ক্লাশ যেন শুষে নিচ্ছে নারায়ণবাবুর ভরাট গলার প্রতিটি শব্দ, শুধু সে তাকিয়ে দেখেছে চিতাবাঘের চামড়ার মতন স্পটেড সুতপার শাড়িতে উলের বলের মতন পড়ে আছে নভেম্বরের আদুরে রোদ, স্বাতী নক্ষত্র থেকে কয়েক ফোঁটা বল কী চুরি করে নিয়েছে ওর চোখ? অথচ নির্বোধ সে বুঝতে পারতো না তাকে সুতপার মতন মেয়ে কোনোদিন গোড়ালি দিয়েও ছুঁয়ে দেখবে না, সে স্মার্ট নয়, ময়লা পাজামা আর ফুলশার্টে তার সমস্ত শরীরে মফঃস্বলী গন্ধ, সে সুবীর বা অর্ণবের মতন মেয়েদের হীরো নয়, ভাল কথা বলতে জানে না সে, সে অসীমের মতন পয়সা উড়িয়ে মেয়েদের কাছে পৌঁছতে পারবে না, বড় দলের অভিনেতা হিসেবে পার্থর মতন কোনো অহংকারও পকেটে নেই তার; সে ধরতে শেখেনি চোখে চোখে পাঠানো টেলিগ্রাফের সাংকেতিক সব শব্দ, তার হেঁটে যাওয়ায় ফুটে ওঠে না কার্ক ডগলাসের পৌরুষ। কোনো অ্যাফেয়ার তার সাধ্যের বাইরে। চিঠিতে হৃদয় ছুঁড়ে দেওয়ার খেলা সে কী জানতো? শুধু কখনো কখনো মধ্য রাতে একটা প্লেন দুর্দান্ত শব্দে তার ঘুম ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলে কেন মনে হতো বরানগরে টবিন রোডের কোনো বাড়িতে ঘুম ভেঙে আর একজনও এই একই শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন? কে তাকে ভাসিয়ে রাখে সোনার মতন রাতের অজস্র অন্ধকার ঢেউয়ের ওপর। তার এই অনুভূতি ক্রমশ বালিশের নিচে চাপা পড়ে ছোট আর ময়লা হয়ে যায়।

ইণ্টারভ্যালের পর যেমন কোনো কোনো ছবিতে জমে ওঠে আসল মজা, তেমনি আরও কিছু পাওনা ছিল তার সিকসথ ইয়ারে।

—জানিস সুতপার মাথা ফাটছে এবার, ছেলেটা নাকি ইঞ্জিনিয়র, ফরেনে থাকে;

সুবীর মুখে আধখানা ভেজিটেবল্ চপ রেখে কথাটা ছুড়ে দেয়?

—কী অ্যাটাকিং বয়: জিততে চাও তো আক্রমণ কর: অরুণি সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে ঢেকে দেয় তার মুখ।

—যাও, এখন কৃষ্ণকীর্তন মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে গানটা নিজেকে গিয়ে শোনাও, শালা, নিজে না পারবি তো আমাদের বলতে কী প্রেস্টিজ ফুটো হয়ে যাচ্ছিল চাঁদ? আমি অসীম দত্ত চৌধুরী: চাইলে ও রকম সাতাশটা সুতপা এনে তোর পায়ে ফেলে দিতে পারি।

—দেখিস, তোকে তো বিশ্বাস নেই: হুট্ করে আবার একগাদা স্লিপিং পিল-টিল খেয়ে শহীদ বনে যাস না আবার।

ছুটির পর লাইব্রেরিতে বলেন্দ্রনাথের ওপর একটা বইয়ের স্লিপ্ দিয়ে একা দাঁড়িয়েছিল অমল। হঠাৎ তাকে যেন আবিষ্কার করেছে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল মীনা। দুখানা কাগজ পিন্ আপ করা।
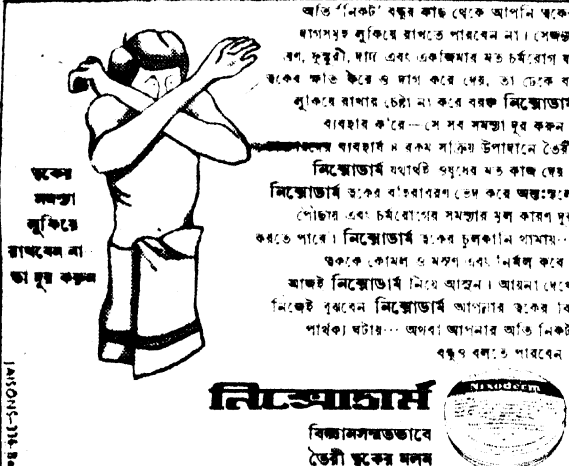
রথীনবাবু গিরিশচন্দ্র আর দ্বিজেন্দ্র-লালের ওপর কাল এই কোশ্চেনগুলো দিয়েছেন, তুমি তো ক্লাশ করোনি কাল, টুকে নিও তাড়াতাড়ি এখনই দিয়ে দিচ্ছি টুকে নিয়ে।

—ঠিক আছে, কাল পরশু দিলেও হবে।

অমল দেখলো, হঠাৎ একটা গোত্তা খেয়ে কোনো পোকা যেমন জানলা দিয়ে পালিয়ে যায়, মীনা প্রায় সেরকমই ছুটলো।

তাড়াতাড়ি হাতের কাগজটা খুললো সে।

কোশ্চেনটোশ্চেন কিছু নয়: দুটো পাতা জুড়ে পেনের কালিতে আঁকা একটা বিশাল কার্টুন, ছবিটার মাথায় টোপর, আর সারা গায়ে অসংখ্যবার লেখা অমল, অমল অমল...অমল...নিচে সুন্দর মেয়েলী হাতের লেখা: সামনের সাতাশে সুতপার বিয়ে অমল, যাচ্ছো তো? পেট খালি রেখো কিন্তু, রসগোল্লা খেতে হবে না?

জানলা দিয়ে সন্ধ্যার আকাশ লাই-ব্রেরির বিশাল হলঘরটায় দেয়ালে দেয়ালে তখন মাখিয়ে দিচ্ছে অদ্ভুত দুঃখী এক আলো: কাউন্টারটা ক্রমশ কী ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে? নড়ে উঠলো ফ্রেসকোর নানা রঙের সব মুখগুলো? অমলের মাথাটাও ক্রমশ ভরে যায় এক ধরনের দুঃখী হাওয়ায়: হাটু কাঁপে, চশমাটা নাক থেকে পড়ে যেতে চায় মনে হয় তার, সে সাঁতার জানে না, অথচ তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ডুবে যাবার ভয়ে ছটফট করছে সে, আর পারে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে মীনা, উৎপলা, সুবীর, অসীম অরুণিরা: ওদের পেছনে কী সুতপাও দাঁড়িয়ে? তখন অমল টের পেয়েছিল সে কাঁদছে: অপমান, দুঃখ আরও কিছু যেন মিশে ছিল সেই লোনা জলে: তারপর কেন কে বলবে, হঠাৎ হাত তুলে, যেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে সে, এ রকম ভঙ্গিতে, মুঠোর ভেতরের দলাপাকানো কাগজটাকেই বলেছিল, রূপকথার সেই বামন-দৈত্য হয়ে যাও তুমি, তারপর আমি বললেই, মুহূর্তে বানিয়ে ফেল এক আশ্চর্য রাজপ্রাসাদ, সিংহাসনে বসে আছি আমি রত্ন-মুকুট মাথায়, পায়ের কাছে বন্দী অবস্থায় জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে মীনারা সবাই: ওদের চোখে ভয়, আমি করুণা করে মুক্তি দেব ওদের, তারপর সুতপার মুখের ওপর থেকে আগুন রঙের মেখলা সরিয়ে দিয়ে বলবো—তোমাকেও ক্ষমা করলাম।

—এই যে স্লিপটা আপনারা; বইটা পাওয়া গেল না, ইস্যু করা আছে।

হঠাৎ একটা পিনের মতন কথাটা খোঁচা মারলো তাকে; অমল দেখলো প্রায় ফাঁকা লাইব্রেরির একপাশে সে দাঁড়িয়ে, দেয়ালে আলোছায়া, চারদিকে বইয়ের পাহাড়, কিন্তু চশমায় কী জল লেগে আছে? ভীষণ জ্বরে কোনদিকে ভেসে যাচ্ছে তার হাত, পা, বুক, পেট আর বেঁচে থাকার চেষ্টা...

কিন্তু কয়েকটা দিন পরে, একটা ঘোলাটে, মন খারাপ করা বিরক্তিকর টিপ-টিপ বৃষ্টির দুপুরের শুরুতে সিঁড়ির কোন একটা ধাপে সুতপা পেছন থেকে হঠাৎ তার নাম ধরে ডেকে উঠেছিল একে-বারে তাকে প্রায় যেন বোকা বানিয়ে দিতেই। ঘুরে দেখেছিল অমল, হালকা-নীল বর্ষাতিতে খুব অচেনা অথচ ভাল লাগছে সুতপাকে; ওর ঠোঁট ভিজে আছে; আঙুল?

—একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে; ফ্রি আছেন?

—সোয়া একটা পর্যন্ত তো অফ; ক্লাশ নেই।

—তাহলে চলুন।

—কোথায় কফি হাউসে?

না, ওখানে অসীমরা গুলজার করছে এখন; অন্য কোথাও।

চটিতে লেগে যাচ্ছে ভিজে রাস্তার কাদা জল; প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে হলদে বুশ-শার্টের হাত থেকে একটা লম্বা খাতা নিচ্ছে সবুজ শাড়ি; হ্যারিসন রোডের মুখে লাল আলোতে দাঁড়ানো বুড়ো ট্রাম, ওয়াই এম সি এ-এর দোকানটাও এই ভিজে দুপুরেও একদম হাউসফুল।

—কোথায় বসবেন?

—চলুন মার্কেটের ভেতরে কোন জায়গা পাওয়া যাবে ঠিক।

দোকানটা ছোট; কোঁচনে নীল ছাপ পর্দা; দুটো টিউব জ্বলছে বলে সমস্ত ঘরটা মনে হয় রক্তশূন্য রুগী।

—বসুন।

অমল ওর খুলে রাখা বর্ষাতিটা থেকে মেঝেতে গড়িয়ে যাওয়া জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে, নিজের বুকের শব্দটাও কী এখন মিশে যাচ্ছে ওই কয়েক ফোঁটা জলের সঙ্গে? বাইরে কী গা ছাড়া বৃষ্টি নামলো?

দেখুন, মীনারা যা করেছে, তারপর ক্ষমা চাইছি এটা বলাও খুব বানানো মনে হবে আপনার; কিন্তু বিশ্বাস করুন, বিন্দুবিসর্গ আমিও টের পাইনি, তুষার ক্ষেপে গিয়ে আমাকে প্রায় চ্যালেঞ্জ করায় ব্যাপারটা সব আমি জানলাম; ওরা যে সত্যিই এত নিচে নামতে পারে...

অমল ওর নিশ্বাস টের পাচ্ছে আঙুলে, ওর গলায় শব্দ হালকা ঘুমের মতন কী ঢেকে দিচ্ছে তাকে?

সাতাশে আমার বিয়ে; আপনাকে একা বলবো বলেই এখানে ডেকে আনলাম, যদি আসেন; বুঝবো আমাকে অন্তত আপনি ওদের দলে ফেলেননি; আমি খুব এক্সপেক্ট করবো আপনাকে।

অমলের মনে হয়েছিল স্বপ্নের ভেতর হেঁটে যাচ্ছে সে, এখুনি হয়তো একটা নাটকীয় হাসি হাসবে সুতপা; আর সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসবে অসীম, উৎপলা আরও অনেকে; আবার তাকে বেঁধে ফেলে জলে ছুঁড়ে দেবে ওরা; কেমন মাথা ঘুরে যায় তার, ছাদটা কী নেমে আসছে নাকি? হঠাৎ কী আলোর ভোল্টেজ বেড়ে গিয়ে একদম সাদা করে দিচ্ছে তার হাত? তাকালো সুতপার দিকে; কপালের ওপরে সামান্য ভেজা চুল, ঠাণ্ডা, ভেজা গভীর চোখে যেন লেগে

আছে তার সমস্ত জীবনের বিশ্রাম; ঠোঁটে কী জলের দাগ; দু হাতের ভ জে চেপে আছে মুখ; অমল তাকিয়ে রইলো, কনুই থেকে কব্জির দিকে এগিয়ে এসেছে বট-পাতার পুরনো ধুলোর মতন একটা লোমের রেখা, তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন আঙুল হয়ে দারুণ লোভে একবার ছুঁয়ে দেখতে চাইলো জায়গাটুকু।

—আর একটা কথা : শেখরদের কাগজে আপনার 'অন্ধকার মুখ' গল্পটা পড়েছি আমি, ও গল্পের সুলেখাকে আমি খুব ভাল ভাবেই চিনি, তাই একটা কথা বলা দরকার আপনাকে, জীবনে যার নাম ঘটনা, যাকে সত্যি বলে জানি আমরা, তার আড়ালেও এমন কিছু থেকে যায় অনেক সময়, যা হয়তো সো-কলড্ সত্যের চেয়ে অনেক বড়, অনেক দামী; সুলেখা রেবন্তকে রিফিউজ করেছি বলেইতো যে সে একটা হালকা বাজে মেয়ে, আর তাই পরে এফ আর সি এস এক ডাক্তারকে বিয়ে করে, ওয়ার্ড্রোব ভর্তি গোল গোল সুখ নিয়ে সে দিব্যি ছিল, এটা কে বলেছে আপনাকে? ওটা বানানো, অবিচার করে চাপিয়ে দেওয়া ওর ওপরে; জীবনটাকে গল্পের ভেতর

টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিশোধ নেবার একটা সস্তা কায়দা ওটা।

খয়ার পড়ে যাওয়া মাটিতে নামছে প্রথম বৃষ্টির অজস্র জলকণা; তার রোম-কূপে রোমকূপে বৃষ্টির শান্তি ; চোখ বুজে থাকে অমল, হাস্নুহানার গন্ধে ভরে যাচ্ছে পৃথিবী; আহ!......

তুমি কেমন আছ সুতপা?... তেরো বছর পর আবার ঠোঁট কেঁপে উঠলো অমলের। কতদূরে? দেখতে পাচ্ছ না আমাকে? হয়তো আশি থেকে একশো মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছো কোথাও, মেঘ-রঙ পাহাড়, চাঁপা ফুল রঙের রোদ গাছের শরীরে, নাকি ছুটির সকাল বা দুপুর আজ, গোলাপী স্কার্ট পরেছ তুমি, মাথায় নীল টুপি, এখন কী বব্ করে নিয়েছো চুল! আজ মাছ ধরতে যাওয়ার, প্রোগ্রাম করেছো বুঝি? মনে পড়ছে এখন তেরো বছর আগের একটা ঘোলাটে, বিরক্তিকর দুপুরের শুরু?...সেই চিতা বাঘের চামড়ার মতন স্পটেড্ শাড়িটার কথা কখনো মনে পড়ে তোমার? কেন একটা চিঠির কথা হঠাৎ মনে হল আমার? চিঠি লিখতে নাকি, যদি জানতে, এখন আর ঠিকঠাক বেঁচে নেই অমল; ক্যাপসুলে ক্রমশ হলদে করে দিচ্ছে জীবন, বড় বেশি পুরনো হয়ে গেছে ভেতরের সব কলকব্জা, পাঁজরা যেন ফুটো হয়ে যাবে এমন যন্ত্রণা, দেয়ালের বিচ্ছিরি সবুজ বসে যাচ্ছে বুকে, পিঠে, চাদরে ময়লার দাগ, টেবিলে ঘড়ির কাঁটা দুটো ঠোঁটে সময় নিয়ে ফালতু ঘুরে মরছে সকাল-দুপুর-বিকেল রাত, সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত...অনবরত...অসহ্য।......

এই, শুনছিস! ক্যাপসুলটা খেয়ে নে; অনেক দেরি হয়ে গেছে;

টের পেল অমল, গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঠেলা দিচ্ছে মা; মার হাতে জলের গ্লাস, ক্যাপসুল।

—এই বড়িটায় বেশ ঘুম হয় তোর; আগেও একবার ডেকে গিয়েছি, ঘুমোচ্ছিস তখন; বেশ বৃষ্টি হল একপশলা, টের পেয়েছিলি?

অমল তাকালো, ঘর কেমন ঘোলাটে অন্ধকার; জানলার বাইরে মরচে-ধরা বিকেল, ভেজা রাস্তায় বেরিয়ে গেল একটা সাইকেল-রিকশা; ওদিকের তিনতলার ফ্ল্যাটের দরজায় কেউ কী খুব জোরে কড়া নাড়ছে এখন? বিছনার চাদরটা জড়িয়ে যাচ্ছে হাঁটুর কাছে, ঘরটা ভরে যাচ্ছে বিচ্ছিরি সবুজে, টেবিলটা সবুজ হয়ে যাচ্ছে, মার মুখ, ঘড়ির কাঁটা উলটে রাখা বই সব ঝাপসা কুয়াশা মাখানো সবুজ; এই তো পরিষ্কার দেখছে সবুজ প্রান্তর চোখের সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে, বড় সুন্দর হাওয়া, বড় সুন্দর; ক্রমশ জল হয়ে এল তার শরীর; আর সেই জলে মুখ নামিয়েছে আর জল খাচ্ছে তারা; ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে সে। বাহ্!

পর্দাটা সরিয়ে দিল অমল; কোথায় পেটা-ঘড়িতে বেজে গেল পাঁচটা, ভেজা গাছ, ভেজা আকাশ ডিঙিয়ে কোনদিকে চলে যাচ্ছে পাখিরা এখন? আজ হয়তো কেউ আসবে, চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার কাছে বসে সাতশো বছরের পুরনো কথা চালিয়ে যাবে;

—আগের চেয়ে অনেক ভাল আছিস; ভয় কী;

—আর কয়েকটা দিন; তারপরেই...

তখন হয়তো মুখ ভরে যাচ্ছে জলে, বেঁকে যাচ্ছে পিঠ, তলপেটের ব্যথাটা গুঁতো মারছে বুকের দিকে, চাদর খামচে ধরেও তখন মনে হবে এখুনি কেউ শূন্যে তুলে নিয়ে আছাড় মারবে তাকে; চোখ ভরে গেল জলে।

—এবার খা একটু মার হাতে হর্লিকস।

ট্যাকসি থেকে নেমে আমাদের ফ্ল্যাটের নাম্বারটা এখন খুঁজছো সুতপা?

অসুখ বড় নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে আমাকে, ঘুণপোকায় ভরে যাচ্ছে মাথা;

ওদিকের বাড়িটা আবছা, জল-ধোয়া বলে মনে হ'ল তার, রাস্তায় কোনো গাড়িতে হঠাৎ হর্ন বাজলো! পিলপিল করে মশা উড়ে এল হাতের ওপর; অমল দেখলো ক্যালেণ্ডারের হরিণরা এবার ফিরে যাচ্ছে।

ঘর, বিচ্ছিরি সবুজ দেয়াল, টেবিলে ওষুধ, ওষুধ, ওষুধ, সাত হাজার মাইল লম্বা ঠ্যাঙাড়ে রাত বুক খুলে সামনে।

—কেমন আছো তুমি? আহ! সুতপা একটুও বদলায়নি তোমার গলা! ক্যাঁচ শব্দ করে হঠাৎ জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকার; ঘড়ির দুটো কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে টিকটিক...টিকটিক।

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
NESCAFÉ
instant coffee
নেস্‌কাফে
শতকরা ১০০ ভাগ
খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

আলোচনা

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি বিভ্রাট

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি বিভ্রাট' শীর্ষক আমার প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে কিছু উদ্ধৃতি এবং তারিখের মুদ্রণপ্রমাদ ঘটায় প্রকৃত ঘটনাটি বুঝতে অসুবিধা ঘটেছে অনেকেরই। সেই কারণে এবারে আমি কেবল স্বরলিপি-সম্পাদনা বিষয়ের কিছু ভ্রান্তি অপসারণের আশায় কয়েকটি চিঠির অংশ এবং স্বরলিপি সমিতির অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব, সঠিক তারিখ সহ প্রকাশ করছি। এর দ্বারা, উদ্ধৃতি ও তারিখের যেখানে যা ভ্রান্তি ঘটেছে তার সংশোধন করে নিতে পাঠকদের অসুবিধা হবে না। এছাড়া সম্পাদনা বিষয়ে গ্রন্থন বিভাগের প্রকৃত মত যে কি তাও জানা যাবে।

২২।৪।৬৭ তারিখের স্বরলিপি-সমিতির অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব :—

"In case of variations in notations formerly printed versions should be indicated and reasons thereof defined in the appendix of respective volumes of Swarabitan"

২২।৯।৬৭ তারিখে, গ্রন্থন বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীগোপেশচন্দ্র সেনের চিঠি, বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্যকে লেখা :—

"রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত—স্বরলিপি-গ্রন্থের যে-সকল পাঠ পূর্বতন স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত ও অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকাদিতে এবং অল্পবিস্তর ব্যক্তিগত ভাবেও আলোচনার পর স্থির হয় যে, অতঃপর স্বরলিপি গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণকালে পূর্ব-প্রকাশিত সুর ও পাঠ, সুরান্তর ও পাঠান্তর রূপে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হবে।"

শ্রীগোপেশচন্দ্র সেনের এই চিঠিটি আমার মতামতের জন্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁকে জানাই :—

"গত মে মাসে মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন স্বরলিপি সমিতিতে স্থির হয় যে, সময়াভাবে এবং ছাপা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে কেবল মাত্র '১০ম খণ্ড স্বরবিতানের পরিশিষ্টে মূল সুর অবিকৃত থাকবে এবং নতুন সুর ও সুরান্তর পরিশিষ্টে প্রকাশিত হবে প্রামাণ্য তথ্যাদি সহ। কিন্তু গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ ২২।৯।৬৭ তারিখের চিঠিতে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে যাচ্ছেন বলে জানাচ্ছেন। তিনি সমিতির প্রস্তাবে রাজি নন।"

এ চিঠির কোন উত্তর পাইনি। সমিতির মে মাসের অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবেদনও আমার কাছে আর আসেনি।

১৩।৩।১৯৬৮ তারিখে সমিতির অধিবেশনের পর শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরণজিৎ রায়কে ৮।৪।১৯৬৮ তারিখে লেখা তাঁর এক চিঠিতে জানাচ্ছেন :—

"(২) স্বরবিতানের মূল পাঠ॥ রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত স্বরলিপি গ্রন্থের যে-সব স্বরলিপি সম্পাদনার ফলে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রকাশিত পাঠই মূল-পাঠরূপে স্বরবিতানে মুদ্রিত হবে এবং সম্পাদিত পাঠ নির্দিষ্ট স্বরবিতানের শেষে যাবে, উক্ত অধিবেশনে এরূপ আলোচিত হয়।"

"দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকবার পর সম্পাদিত ও অল্পবিস্তর পরিবর্তিত

স্বরলিপির ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রকাশিত পাঠ মূল-পাঠরূপে মুদ্রিত হলে স্বরলিপির-পাঠক পাঠিকা ও গায়ক গায়িকাগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন। এবং এজন্য গ্রন্থন বিভাগকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে।"

"স্বরলিপি প্রকাশনের পূর্ব-পর নীতির সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানের দিক থেকে সম্পাদিত ও অল্পবিস্তর পরিবর্তিত স্বরলিপির ক্ষেত্রে রিভাইসড পাঠই মূল-পাঠরূপে এবং পূর্ব-প্রকাশিত পাঠ স্বরবিতান গ্রন্থ-শেষে মুদ্রিত হওয়াই সমীচীন।"

১২।২।১৯৭৩ তারিখের স্বরলিপি সমিতির অধিবেশনে নিম্নে উদ্ধৃত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ বর্তমানে যে-ভাবে সাজিয়ে স্বরলিপির বই প্রকাশ করেছেন তাই করা হোক, তবে সুরান্তর বা ছন্দান্তরের ক্ষেত্রে কবে বদল হয়েছে, কেন বদল হয়েছে এবং কে বদল করেছেন সেই সব তথ্য যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে দিতে হবে।"

গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রস্তাবের শেষ অংশটুকুও কার্যকরী করা হচ্ছে না বলে সকলের ধারণা।

১২ আষাঢ়, ১৩৮৩ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ তাঁর পত্রে জানিয়েছেন :—

"সম্পাদনার ফলে যে-ক্ষেত্রে স্বরলিপির অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছে সে ক্ষেত্রে সম্পাদিত পাঠই মূলগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সম্পাদিত পাঠ মূলগ্রন্থে মুদ্রিত হয়—এই রীতি।"

শান্তিদেব ঘোষ
২৫।৭।৭৬

"চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে"

"চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে" কিছু চিন্তাশীল আলোচনা পেয়ে প্রথমেই এই সুস্থ ও সৎ প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই। তারকা-জীবনের সস্তা, মুখরোচক খবরই যে সিনেমা আলোচনার শেষ কথা নয়—এই প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে।

অভিনন্দন জানিয়েছি 'প্রয়াসকে'। কিন্তু সাথে সাথে অভিযোগও আছে. বেশীরভাগ প্রবন্ধই দুর্বোধ্যতার শিকার। অদ্ভুত শব্দ, উদ্ভট উপমা, বাক্যগঠনে তাক-লাগানো কসরতের চেষ্টা, থেকে-থেকেই অচেনা কিছু বিদেশী নামের ফুলঝুরি—এগুলি, বাদ দিয়ে একটু সহজ কথায়, সরল ভাষায় চিন্তাশীল প্রবন্ধ কি একদমই লেখা যায় না? ভাষার কলাকৌশলের মধ্যে মূল বক্তব্যকে প্রতিবারই চেষ্টা করে খুঁজে বার করতে হয়। লেখক শক্তিমান; ভাষার উপর দখল আছে। সিনেমা সম্পর্কেও নিশ্চয়ই তিনি বিদ্বান। তবু সাধারণ পাঠকের চলচ্চিত্র জ্ঞান বোধহয় সত্যজিৎ রায় ও তাঁর ছবির নামেই শেষ। আমিও তাদের দলেরই একজন। তাই বলছি, ক'দিন বাদে দুর্বোধ্যতার অজুহাতেই (?) যদি এই প্রবন্ধ পড়া বন্ধ করি তা'হলে যে প্রয়াসকে প্রথমেই অভিনন্দন জানিয়েছি তা ব্যর্থ হবে না কি?

পিনাকী দাশগুপ্ত
কলকাতা-৬৮

রবীন্দ্রসংগীতের ইংরাজী অনুবাদ

১২ই জুনের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্রপক্ষের সঙ্গীতানুষ্ঠানের সমালোচনাটি পড়লাম।

কবিগুরুর গানের ইংরাজী অনুবাদ করতে আমি সচেষ্ট হয়েছি। আমার পূজ্যপাদ শিক্ষক 'জর্জ বিশ্বাস' এই পথের পথিকৃৎ, তবে আমার প্রচেষ্টা স্বতন্ত্র এবং কতটা সফল হয়েছি তার বিচারের ভার শ্রোতাদের উপর। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমার অনুবাদ করা গানগুলি যথা—আমি চিনি গো (You're known, known to me) তোমার হ'ল শুরু (It is for you a begining), পুরানো সেই দিনের (The memories of those olden days), আকাশভরা সূর্যতারা (All the sky over, the sun & the star) গানগুলি বহু অনুষ্ঠানে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় (এ-দেশে ও বিদেশে) গেয়ে শোনাবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। সুতরাং রবীন্দ্রসদনের 'পবিত্র আসর' আমার আবির্ভাবে কতটা কলুষিত হয়েছে এবং 'বাংলা-ইংরাজী জানা লোকদের কাছে লজ্জাকর' কিনা তা জানতে গেলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেখানে যেখানে আমার ডাক পড়েছে সেখানেই খোঁজ নিতে হয়। প্রত্যেক শ্রোতাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবে তাঁদের মিলিত কলোচ্ছ্বাস দেখে স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসধ্বনি বলেই মনে হয়েছে —কোন বিতর্কের ঝড় ওঠার লক্ষণ পাই নি। উপযুক্ত ও পরিণত সমালোচনাকে আমি সব সময়েই স্বাগত জানাবার মতো উদার মনোভাব রাখি—কিন্তু ভয় পাই সেই সমালোচনার অসুস্থ ও বিকৃত রূপ দেখলে, যা নাকি সংস্কৃতিদরদী মানসিকতার কণ্ঠরোধ করে। আমি রবীন্দ্রগীতির বাংলার মৌলিক শব্দগত, ভাবগত, ছন্দোগত, সুরগত ও কাব্যিক রূপ অবিকৃতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি আমার ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে। অবাঙালী ভারতীয় এবং বিদেশী সঙ্গীতরসিকদের অন্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৌলিক রস পৌঁছে-দেবার জনাই আমার এই প্রচেষ্টা, সুতরাং আমার ইংরাজী অনুবাদের যাথাযথ্যের

নিরপেক্ষ ও প্রকৃত বিচারক হবেন সেইসব বিদেশী ও অবাঙালী সংগীতরসপিপাসু, কেননা তাঁদের জন্যই আমার এই একনিষ্ঠ প্রয়াস এবং সেই কারণেই আমি রবীন্দ্র-সদনের মতো বৈচিত্র্যময় আসরে যেখানে সর্ব স্তরের ও সর্ব শ্রেণীর শ্রোতাদের সামনে আমার এই বলিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে তুলে ধরেছি শুধুমাত্র তার সার্বিক প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার জন্য। অতএব সেই বিশিষ্ট শ্রোতৃ-মণ্ডলী বিচার করবেন আমার এই প্রয়াস সর্বসমক্ষে উপস্থাপন পরিহাসাস্পদ ও নিন্দনীয় কিনা এবং তার মধ্যে কতখানি ত্রুটি আছে। সর্বোপরি আমার কণ্ঠে রবীন্দ্রগীতি পরিবেশন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কিনা?

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া

মুনিদের মতিভ্রম

সম্প্রতি রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে যে বিতর্কের বন্যা বয়ে চলেছে তাতে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের 'মুনিদের মতিভ্রম' শীর্ষক আলোচনাটি চমৎকার। দৌড় প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত প্রতিযোগী না থাকলে একজন খোঁড়াকে লাঠির উপর ভর করে ট্র্যাক পেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে তার গলায় প্রতিযোগিতা জয়ের মেডেল ঝুলিয়ে দেওয়ার যুক্তির যুক্তিতে ব্যাখ্যা মেলে না। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে সুতরাং, বিচারক-দের মধ্যে বিশ্লেষণমূলক বিতর্ক স্বাভাবিক, এ নিয়ে প্রশ্ন করাও অবান্তর কিন্তু বিচারে 'ওপেন মাইণ্ড' নিয়ে আসতে বলা বা 'কচকচ করে নাকচ' করে দেওয়ার ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়। তা ছাড়া বিচারকদের খোলাখুলি বিবৃতি এবং প্রতি-বিবৃতি আসল ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সহযোগিতা করলেও বিচার ব্যবস্থার পরিপন্থী। ব্যক্তিগত 'সাফাই'য়ের পরিবর্তে যদি 'প্রতিযোগিতার জন্য প্রাপ্ত' পুস্তকগুলির আলোচনা এবং নির্দিষ্ট বইয়ের জন্য কারুর আগ্রহ-অনাগ্রহের কারণগুলো জানতে পারতাম তবে খুশী হতাম।

হরিপদ মাইতি
মহিষাদল, মেদিনীপুর

প্রচ্ছদ পরিচিতি

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ তারিখের দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদে শিল্পী মীরা মুখো-পাধ্যায়ের ধাতু মূর্তি অশোকের প্রতিলিপি ও সূচীপত্রের শেষে এই শিল্পকৃতিটি সম্বন্ধে প্রকাশিত টীকা প্রসঙ্গে দু'-একটি তথ্য জানানো প্রয়োজন মনে করছি।

'অশোকে'র এই মূর্তি এদেশের ঢোকরা কামারদের মোম ঢালাই পদ্ধতিতে করা। সাহেব শিল্প-বিশেষজ্ঞদের লেখায় এই ঢোকরা কামারদের Folkmetal smith বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢোকরা কামারদের ধাতু ঢালাই-এর পদ্ধতির নাম lost wax পদ্ধতি। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ধাতু ঢালাই পদ্ধতি। মোহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত বিখ্যাত dancing girl বা আফ্রিকার বেনিনব্রোঞ্জ এই রীতিতে করা।

বিবরণে লেখা হয়েছে, "কলিঙ্গ যুদ্ধের শেষে অশোক বিষণ্ণ ও বিমূঢ়।" আমরা অবশ্য দেখতে পাই মূর্তিটির মুখের এক পাশে রয়েছে একটি চাপা ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা, অপর দিকে আছে এক আশ্চর্য করুণা। সম্রাট অশোকের জীবনে যা ঘটেছিল সেই উত্তরণকে, চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটাকে মূর্তির মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এটা অবশ্য মীরা মুখোপাধ্যায়ই আমাদের দেখিয়ে

দিয়েছেন। শিল্পবস্তুর রসগ্রহণ করতে গেলে শুধুমাত্র সাংবাদিক হওয়ার যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়। রসের বস্তুকে নিজের মত করে গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে এই সত্যকে মনে রেখেই কথাটি বলছি।

ভারতবর্ষের উচ্চ বর্ণের শিল্পীদের মধ্যে মীরা মুখোপাধ্যায়ই সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঢোকরা পদ্ধতি শিখেছেন এবং এই পদ্ধতিতে আশ্চর্য সব শিল্পকৃতি সৃষ্টি করে চলেছেন।

শিল্পী হিসাবে নিজের স্বতন্ত্রতা বিসর্জন না দিয়ে, নব্যতাকে বিসর্জন না দিয়ে এই দেশের মাটিতে উদ্ভূত এই লোক-শিল্পের ট্র্যাডিশানকে কতখানি সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে মীরা মুখোপাধ্যায় তার বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়ালে উপলব্ধি করা যায় যে তিনি ঢোকরা ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেও নিরন্তর কিভাবে তাকে অতিক্রম করে চলেছেন।

ঢোকরা কামারেরা বড় মাপের কাজ করতে পারে না। এদেশে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও 'অশোকে'র মত ঢোকরা পদ্ধতিতে করা এত বড় শিল্পকৃতি আছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ দেশের টীকাকার মূর্তিটি সম্বন্ধে এ কথাটা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র স্টুডিয়োতে (যেটি আবার তাঁর বাসস্থানও বটে) গেলে সব সময়ই মনে হয় বিরল শক্তির অধিকারিণী এই শিল্পী তাঁর ছোটবড়, বয়ঃপ্রাপ্ত, সদ্য ভূমিষ্ঠ, ভ্রূণস্থ সব শিল্পকর্মগুলিকেই সব সময়ই যেন তাঁর অঞ্চলের তলায় ঢেকে রাখতেই ভালবাসেন। কিন্তু 'অশোক' ধাতুপুত্তলীটি সব দিক থেকে এতই বড় মাপের যে শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায় একে তার অঞ্চল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেননি। একটা বড় জায়গার খোঁজ তাঁকে করতে হয়েছে।

কিছুদিন আগেও এই মূর্তিটি দক্ষিণ কলকাতার এক বসতবাড়ির বাগানে অনেক দিন রাখা ছিল। মাঝখানে শুনেছিলাম শিল্পী মূর্তিটির সুরক্ষা নিয়ে খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য করার জন্য নাকি বহু সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কুমোরটুলির ব্র্যান্ড কালো রঙের রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন মহাপুরুষদের মূর্তির ব্যাপারে অনেকের আগ্রহ অনেক বেশি থাকার ফলে 'অশোকের'

কোথাও জায়গা হয়নি। তারপর শুনতে পাই ভারত সরকারের পর্যটন উন্নয়ন বিভাগ থেকে মূর্তিটি কেনার উদ্যোগ হচ্ছে। আপাতত এই বিশাল মূর্তিটি দমদম এয়ার-পোর্ট হোটেলের দ্বারদেশে দ্বারপালের মত দণ্ডায়মান। সম্ভবত মালিকানা এখনও ঠিক হয়নি। আমরা ইচ্ছা করলে এয়ার পোর্ট হোটেলের দেউড়িতে গিয়ে বিস্ময়কর এই ধাতব সৌন্দর্যের সামনে নতজানু হয়ে উপলব্ধি করতে পারি অশোকের মত এ-যুগের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির মহিমা।

রঘুনাথ গোস্বামী
কলকাতা-১

২

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সূচীপত্রের নিম্নে প্রদত্ত 'প্রচ্ছদ পরিচিতি' নিঃসন্দেহে এক অভিনব সংযোজন। বেশ কিছু সংখ্যা থেকেই এটা শুরু হয়েছে। লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত এই সাহিত্য পত্রিকার প্রচ্ছদ বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্ন বর্ণের ও ছন্দের চারু-কলা চিত্র-ভাস্কর্য দ্বারা ভরিয়ে তোলা হয় এই প্রচ্ছদখানি। সংক্ষিপ্ত এই প্রচ্ছদ-পরিচিতির মাধ্যমে বহু চিত্ররসিক ও শিল্প-কলা প্রেমিক, প্রচ্ছদের চিত্রটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ওজন কত, মাটি, পাথর বা কি কাঠের তৈরী অথবা তৈলচিত্রে বিচিত্র রঙের ব্যবহার সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ ও চিত্রটির মধ্যে নিহিত গূঢ় অর্থ বা চিত্রকরের মূল বক্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

তরুণতপন বিশ্বাস
বসিরহাট

সাহিত্য বনাম সাংবাদিকতা

বর্তমান সংখ্যার (১২।৬।৭৬) সাহিত্য প্রসঙ্গ বিভাগে 'সাহিত্য বনাম সাংবাদিকতা' পড়ে বেশ ভাল লাগলো। যদিও দ্বিমত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অভিনন্দজী শেষের দিকে এক জায়গায় বলেছেন, 'আজ-কাল নব্য সাংবাদিকতা কথায় কথায় সাহিত্য হয়ে ওঠার যে অকারণ চেষ্টা করছে তাতে কোন লাভ নেই।' আমার বক্তব্য, এমন আন্তরিক প্রয়াসকে তিনি অকারণ ভাবছেন কেন এবং এই প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারলে ক্ষতিই বা কী। প্রকৃতপক্ষে, শৈল্পিক চেতনার অভাব হলে মানুষ নিষ্প্রাণ জড় হয়ে পড়ে, সেজন্য মানুষের প্রতিটি কাজে—হাটাচলা খাওয়াপরা থেকে শুরু করে অর্থোপার্জন যশোলাভ, এমন কি আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত সব কিছুই একান্তভাবে শিল্প-নির্ভর। যে-কোন শিল্প-কর্মেই একটা ছন্দ থাকে, যা মানুষকে আকর্ষণ করে এবং নাড়া দেয়, যেমন সাহিত্য। সাংবাদিকতাও সেইরকম একটি শিল্প, ঘটনার বিবরণে সংগৃহীত তথ্যাগুলিকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে না পারলে তা কখনোই সজীব হয়ে উঠতে পারে না এবং এখানেই কবিতা ও গদ্য যেমন ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসছে, সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতাও তেমনি কাছাকাছি চলে আসতে বাধ্য।

তপন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৬।

আন্তর্গ্রহযান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেরিনার-৯।

*

ভাইকিং-১ ল্যান্ডার যেখানে অবতরণ করেছে সে জায়গাটি মঙ্গল গ্রহের ক্রাইস অববাহিকা অঞ্চল থেকে বেশ কিছু দূরে। অবশ্য নামেই অববাহিকা। সেখানে স্রোতস্বিনীর কোন চিহ্ন নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই গ্রহটির আদিম কোন যুগে জলের প্রবাহ এই অববাহিকার মত অঞ্চলটি সৃষ্টি করেছিল। মঙ্গল গ্রহের উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এই অঞ্চলের যে সব ছবি ১৯৭২ সালে মেরিনার-৯ দূরে থেকে তুলে পৃথিবীর মানমন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে সব ছবি দেখে প্যাসাডেনার ভূ-তাত্ত্বিক ডঃ হ্যারল্ড মাসুরস্কি মন্তব্য করেছেন : ওই অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিশেষ করে সেই সব অঞ্চল যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সোনা, প্ল্যাটিনাম এবং হীরে পাওয়া যায়।

ভাইকিং-১-এর অবতরণস্থল থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ৪,৮০০ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে অতিকায় আগ্নেয়গিরি অলিম্পাস মোনস। আগ্নেয়গিরিটি হয়ত এখন মৃত। এটির ব্যাস প্রায় ৮৬০ কিলোমিটার। সমতল থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২৪০০০ মিটার। এত বড় আগ্নেয়গিরির সন্ধান পৃথিবীতে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, আমাদের হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ৮৭০০ মিটার। অতএব সে তুলনায় অলিম্পাস মোনসের উচ্চতা কত বেশি সহজেই অনুমান করা যায়।

না। এতটুকু সময় অপচয় করেনি ভাইকিং ল্যান্ডার। মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করার পর মুহূর্তে পৃথিবীর উদ্দেশে তার নিকটতম পরিমণ্ডলের ছবি তুলে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলা হয়েছে, এক একটি ছবি তুলতে তার টেলিভিশন ক্যামেরার সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ মিনিটের মত। পরে সেই ছবি বেতার সংকেতের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসতে সময় লেগেছে প্রায় কুড়ি মিনিট।

ছবি পরীক্ষা করে মাসুরস্কি জানিয়েছেন, ভাইকিং ল্যান্ডার যেখানে দাঁড়িয়ে তার আশপাশে প্রচুর ধুলো। নামার সময় তার পাগুলির প্যাড যে ধূলিধূসরিত হয়েছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে নুড়ি পাথর। তাদের কারোর কারোর ব্যাস ১৫ সেন্টিমিটারের মত। তবে দূরে, দিগন্ত রেখার কাছ বরাবর বেশ বড়সড় পাথরের চাঁইও দেখা গেছে। প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে।

অবতরণের অব্যবহিত পর যন্ত্রগণক যে সব তথ্য পাঠিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে অবতরণের তাৎক্ষণিক মুহূর্তে সেখানকার পরিবেশে জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিবর্তে সন্ধান মিলেছে প্রচুর কার্বন ডাই-অকসাইড এবং আর্গন গ্যাসের। সেই সঙ্গে কিছুটা নাইট্রোজেনও। এ থেকে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন ওই গ্রহে জীবনের সন্ধানও হয়ত পাওয়া যাবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে সপ্রশ্নও হয়েছেন কেউ কেউ। তাঁদের বক্তব্য, হতে পারে বহু যুগ আগে পৃথিবীর মত মঙ্গলের বুকেও হয়ত বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদের সমাবেশ ছিল। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল তার জীবজগৎ বাস করার মত পরিবেশটি হারিয়েছে। তাই এখন তারা অবলুপ্ত।

এ কথা বলার অর্থ, ভাইকিং ল্যান্ডার স্বয়ং মঙ্গলের বুকে দাঁড়িয়ে এবং তারও আগে ভাইকিং অরবিটার ঊর্ধ্বাকাশ থেকে যে সব ছবি পাঠিয়েছে সে সব ছবিতে কোন রকম গাছপালা অথবা প্রাণীর চিহ্নই পাওয়া যায়নি।

তবু আশাবাদীর মত হাল ছাড়েননি ভাইকিং প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা। তাঁদেরও পাল্টা বক্তব্য, দেখাই যাক না। বড়সড় প্রাণী বা উদ্ভিদ সেখানে না থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্রতম প্রাণের চিহ্ন, যেমন ব্যাকটেরিয়া বা অনুরূপ কিছু তারও তো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে?

আর এর জন্যেই ভাইকিং ল্যান্ডারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কয়েকটি বিশেষ ধরনের আধার। ঠিক হয়েছে পৃথিবীর নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং ল্যান্ডারের রবটের হাত এগিয়ে যাবে সেখানকার ধুলোমাটি সংগ্রহের জন্যে। এই হাত সেখানকার ভূস্তরের ওপর ছড়িয়ে থাকা ধুলোমাটি খুঁটে নেবে। দরকার মত ভূস্তরের মধ্যে খানিকটা গর্ত করে সেই গর্তের ভেতর থেকে মাটি তুলে আনবে।

সেই সব মাটির নমুনা তুলে এনে রাখবে ওই সব থলের মধ্যে। অতঃপর চলবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা। যেমন, কোন কোন মাটির নমুনা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা চালিয়ে সেখানকার ভূস্তরের রাসায়নিক উপাদান কি কি তা নির্ণয় করা হবে। কয়েকটি মাটির থলের মধ্যে সন্তর্পণে ঢেলে দেয়া হবে জল এবং কিছুটা পুষ্টিকর উপাদান। উদ্দেশ্য, সুপ্ত অবস্থায় যদি কোন জীবাণু বা অনুরূপ কিছু থাকে, জল, এবং পুষ্টিকর উপাদান জুগিয়ে তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে প্রাণের সঞ্চার। ব্যাপারটা পৃথিবীতে বীজকে যেভাবে অঙ্কুরিত করা হয় হয়ত কতকটা সেই রকম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হয়ত এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু প্রাণীর সন্ধান সেখানে পাওয়াও যেতে পারে। এ ছাড়া ভাইকিং ল্যান্ডারের আর একটি দায়িত্ব, মঙ্গলের আবহাওয়া সম্পর্কিত নিখুঁত তথ্য জোগান। ও সব তথ্য জানার পর মঙ্গলের বুকে ভাইকিং-২ ল্যান্ডারকে কোথায় অবতরণ করান হবে সেটা ঠিক করে নেয়া হবে। উল্লেখ্য, ভাইকিং-১কে মঙ্গলের উদ্দেশে যাত্রা করিয়ে দেবার কয়েক দিন পর ভাইকিং-২ নামে আর একটি মঙ্গলযানকে উৎক্ষেপ করা হয়েছিল। আগামী ৭ অগাস্ট এই আন্তগ্রহযানটি ওই গ্রহের পরিমণ্ডলে গিয়ে উপস্থিত হবে। পরে সেপ্টেম্বরের কোন এক সময়ে সেটিকে অবতরণ করান হবে বিশেষভাবে নির্বাচিত কোন একটি স্থানে।

জেট প্রোপালসন গবেষণাগার থেকে ইতিমধ্যে জানান হয়েছে, মঙ্গলের বুকে নামার পর থেকে ভাইকিং-১ ল্যান্ডারে এখনও পর্যন্ত কোন রকম গোলমাল দেখা যায়নি। ভাইকিং-১ অরবিটারও মঙ্গলের ঊর্ধ্বাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করে চলেছে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলের যোগাযোগের ব্যাপারে এই অরবিটারটিই এখন একমাত্র সম্বল। কারণ ভাইকিং-১ ল্যান্ডার যেখানে অবতরণ করেছে, সে জায়গাটি পৃথিবীর দৃষ্টিপথের বিপরীত দিকে অবস্থিত। অতএব সেখান থেকে সরাসরি পৃথিবীতে কোন বেতার সংকেত পাঠান সম্ভব নয়। এর জন্যে ঠিক করা হয়েছে ভাইকিং-১ ল্যান্ডার সমস্ত রকম বেতার সংকেত পাঠাবে প্রথমে অরবিটারে। কারণ অরবিটার যে কক্ষ পথে ঘুরে চলেছে সেখান থেকে ভাইকিং-১ ল্যান্ডার এবং পৃথিবী উভয়কেই দেখা যায়। অতএব ল্যান্ডার থেকে পাওয়া সংবাদ রিলে করে পৃথিবীতে পাঠান মোটেই অসুবিধে হবে না।

*

জিজ্ঞাসা এখন অনেক। প্রাণের সন্ধান তো বটেই, তা ছাড়াও অনেক কিছু। যেমন এর আগে মেরিনার গোষ্ঠীর মহাকাশযান থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে বলা হয়েছিল, মঙ্গলে পৃথিবীর মত ভ্যান-অ্যালেন বেল্ট নেই। এটা কতখানি সত্যি, এবারকার অভিযানে তা প্রমাণিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবীকে বেষ্টন করে ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে চুম্বকের আস্তরণ। এই আস্তরণকেই বলা হয়, ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। এই চৌম্বক আস্তরণ প্রাণঘাতী বিকিরণ এবং মহাজাগতিক কণার হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে।

এর আগে বলা হয়েছে মঙ্গল গ্রহের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ৭০ শতাংশ মাত্র। এর ভূস্তরের মধ্যে আছে ম্যাগনেসিয়াম সিলিকন, লোহা এবং লোহার অকসাইড। জল ধারণ করে রয়েছে এমন সিলিকেটও নাকি সেখানে আছে। সেখানকার বায়ুচাপ পৃথিবীর বায়ুচাপের দু'শ ভাগের এক

ভাগ মাত্র। বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান কার্বন ডাই-অকসাইড, আর্গন আছে ৩০ শতাংশ, কার্বন মনোকসাইড এবং অকসিজেন দশমিক এক শতাংশ, জলীয় বাষ্প দশমিক শূন্যে এক শতাংশ, ওজন গ্যাসের পরিমাণ প্রতি দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ এবং যৎকিঞ্চিত আণবিক এবং পারমাণবিক হাইড্রোজেন।

কেউ কেউ মনে করেন, মঙ্গল গ্রহের মেরু অঞ্চলে যে জমাট বরফের আস্তরণ দেখা যায় তার বেশির ভাগ অংশ কার্বন ডাই-অকসাইডের বরফ হলেও তার মধ্যে হয়ত জলের বরফও পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে পৃথিবীর মত ভ্যান-অ্যালেন বেল্ট না থাকলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে, পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও অয়নমণ্ডল রয়েছে। এই অয়নমণ্ডল সেখানে বিরাজ করছে ১০০ থেকে ১৫০ মাইল ঊর্ধ্বাকাশে। যেখানে প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে ইলেকট্রন রয়েছে প্রায় ৯০০০০-এর মত। অতএব প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, এত জোরাল অয়নমণ্ডল সেখানে কিভাবে গড়ে উঠল? বিশেষ করে মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ যেখানে পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম এবং যার ফলে বেশীর ভাগ গ্যাসীয় পদার্থের যেখানে মঙ্গলের পরিমণ্ডল থেকে দূরে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ার কথা, সেখানে এমন ধরনের একটি অয়নমণ্ডলের উপস্থিতি খুবই বিস্ময়কর।

কিংবা সেই ধূলি ঝড়। যা কখনও বা স্থানিকভাবে পুঞ্জীভূত হয় সেখানে। কখনও বা ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে—তারই বা উৎপত্তির কারণ কি? এই ধরনের ঝড় সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ শক্তি। ওই ঝড়ের মধ্যে কঠিন বস্তুকণাও ভেসে থাকতে দেখা গেছে। ওই ধরনের কণা ভাসাতে গেলে বাতাসের গতি হওয়া দরকার কম করেও ঘণ্টায় ১০০ মাইল। পৃথিবীতে এ ধরনের ঝড় সৃষ্টির মূলে কাজ করে সৌরশক্তি। মঙ্গল সূর্য থেকে অনেক দূরে। অতএব সেখানে সৌরশক্তির প্রাবল্যও কম। তা যদি হয়, অমন প্রচণ্ড ঝড়ের উৎপত্তির কারণ কি?

ভূ-তাত্ত্বিকদের বক্তব্য, পৃথিবীর মহাদেশগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে—ভূস্তর হিসেবে ভেসে বেড়ায়। ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে কন্টিনেণ্টাল ড্রিফট। মঙ্গলে সে ধরনের ঘটনা নাকি ঘটে না। যার অর্থ সৃষ্টির আদিকাল থেকে ওই গ্রহের ভূ-স্তরে পরিবর্তন এসেছে কম। প্রশ্ন এই, সত্যিই কি তাই?

হ্যাঁ। এমন অনেক প্রশ্ন এখন মঙ্গল বিজ্ঞানীদের মাথায় ভিড় করে রয়েছে। ভাইকিং কি এ সব প্রশ্নের উত্তর জোগাতে সমর্থ হবে?

সমরজিৎ কর

"লিওর শ্যাম্পুর
মনমাতানো সুরভির রেশ...
তাজা হয়ে থাকবে
আপনার তাঁর মনে."
বলেন, অ্যানিটা রবিন্স্, এক্সপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
লিওরের রকমারি নতুন শ্যাম্পুর প্রত্যেকটিতে আছে নিজস্ব বিশিষ্ট সৌরভ। আর, এই শ্যাম্পুগুলি সবরকম যত্ন নিয়ে আপনার চুল করে তোলে পরিষ্কার, সুন্দর, আকর্ষণীয় সৌরভে ভরপুর...যাতে আপনার তাঁর মন মেতে ওঠে।
লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয় সৌন্দর্য্য, লিওর শ্যাম্পুর যত্নে হয়—নির্মল, সুন্দর, সুরভিত অনিবার্য্য!
Lure
Lure
Lure
Lure
Creative Unit-A 2381-Ben.

॥ ৩২ ॥

'ও, এই সব বুঝি? এই সব ধরকমারি বুঝি?'

'এই হচ্ছে একরকম—'

'তা, এর চেয়েও ভালো হবে। সবুর কর না তুমি।'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'এই যা হচ্ছে একেবারে তটের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিতে পারবে।'

'আমি নিজে সিনেমা থিয়েটারে যাই না, ও যায়, আমি টিকিটের পয়সা দিই; সীজন টিকিট কিনে দিই ওকে নাচগান জলসা আসরে মজলিস দেখবার জন্যে—'

সুতীর্থ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'যেখানে তোমার অন্তত একটা নাইট স্কুল খোলা উচিত তোমার বাড়িতে, সেখানে তুমি এই সব করছ, ক্ষেমেশ—রঞ্জনকে নিয়ে। সেকালে কলকাতার বনেদী ঘরের বাবুরা বেড়ালের সঙ্গে বেড়ালের বিয়ে দিত খুব ঘটা করে। তুমিও তাই-ই করছ দেখছি। রক্তটা রয়ে গেছে এখনও তোমার নাড়ে—'

সুতীর্থের বুদ্ধিবিবেকের দৌড়ে কেমন যেন তামাশা অনুভব করছিল ক্ষেমেশ, ক্লান্ত লাগছিল, করুণা বোধ করে বললে, 'মিছেই তুমি কথা বলছ সুতীর্থ। রঞ্জন তুচ্ছ, ছোটলোক মানুষ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শখ থাকবে না তার?'

'থাকবে বই কি। শখ না থাকলে বেঁচে থেকে লাভ কি। আমার তো মাঝে মাঝে শখ হয় রাশিয়ায় আবার জারের এলেম ফিরিয়ে আনি—'

'স্টালিনই তো জার—'

'খাঁটি জার নয়। ইচ্ছে করে আমি জার হই, রাসপুটিন হয়ে মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করি, এদের সকলকে রুখবার জন্যে হয়ে দাঁড়াই লেনিন, চার্চিল হয়ে বলশেভিক শায়েস্তা করি, রুজভেল্ট ট্রুম্যান হয়ে শখের করাতে কেটে ফেলি চার্চিলকে ইংরেজদের—এই সবই তো শখ, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না;—কিন্তু এইবার হবে, শখের খিদমত-দারদের সঙ্গে আমার বেশ লটকাচ্ছে—'

জয়তী কখন ঘরের ভেতর ঢুকেছিল সুতীর্থ দেখেনি। ঘরের ভেতরে সোফা সেটি কোচ কুশনের ঠাসাঠাসি; এরই একটায় গিয়ে বসেছিল জয়তী। সুতীর্থ ঘাড় কাত করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল, জয়তীকে দেখল না; সুতীর্থের থেকে খানিকটা দূরে—আড়াআড়িভাবে—একটু পিছিয়ে বসেছিল জয়তী।

'খুব বেশি কথা বলা অভ্যেস নয় তোমার—' জয়তী বললে। ঘরে যে আরেকজন লোক এসেছে বুঝল সুতীর্থ। কিন্তু জয়তীর দিকে মুখ না ফিরিয়ে যেমনিভাবে জানালার ভিতর দিয়ে আকাশ পাতা পালক আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনিভাবে চেয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'বেশি কথা বলছি আজকাল। কম কাজ করছি—।'

'বাটখারাটাকে টায়টোয় রাখতে পেরেছ তাই!'

'হ্যাঁ। তুমি বেশি কাজের বহর দেখতে চাও জয়তী?'

'তোমার তরফ থেকে? আমাকে দেখিয়ে লাভ কি?'

জয়তী বললে, 'কি কাজ করছ তুমি আজকাল?'

'কিছু না।'

'দেশের কাজ করছ?'

'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে।'

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি—আমি—খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে।' জয়তী একটু হেসে বললে। গালে টোল পড়তে না পড়তেই হাসি ফুরিয়ে গেল তার।

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি আমি আমরা ডেস্ক লাগাতে পেরেছি বলে এল না। এল কতকগুলো লোক প্রাণপাত করেছে বলে। স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়েছে তারা অনেকেই আজ মৃত। দেশ দু ভাগ হয়ে

যাবে খুব সম্ভব। স্বাধীন গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে মুনাফা পাবে—আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে ও বড় বড় খেতাব পাচ্ছে। দেশ যতদিন অধীন ছিল এরা ব্রিটিশদের যেমন রাজভক্তি দেখিয়ে এসেছে—দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনতা নিয়ে এরা ঠিক তেমনই মাতামাতি করবে। স্বাধীনতা ও তার নিয়মানুগত্য নিয়ে এদের মাতামাতির কেলেংকারিতে কোনো ভদ্রলোক রাস্তায় মুখ দেখাতে পারবে না আর।'

'এই সব হবে?' জয়ন্তী বললে।

'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি।'

'স্বাধীনতা তো উনিশ শো আটচল্লিশের জুনে আসবে।'

'শুনেছি আগেই আসবে—সাতচল্লিশের আগস্টেই', ক্ষেমেশ বললে।

'কে বলেছে তোমাকে ক্ষেমেশ?'

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না, তবুও আমার কানে আসে।'

'তাহলে এ বছরই আসছে স্বাধীনতা? সুতীর্থ?'

'আসছে। জওয়ার ক্ষেতের থেকে পাখি তাড়িয়ে দিচ্ছে নাকি নেতারা।'

'তোমার নিরাশার একটা কারণ হচ্ছে এ স্বাধীনতায় তোমার কোনো লেনদেন নেই; পাচ্ছ অথচ দাওনি কিছু; এই তো বলতে চাও তুমি? কিন্তু আমাদের কারুরই কোনো দান নেই। ক্ষেমেশের আছে? নেই। আমার নেই। কোটি কোটি লোকের নেই। তাই বলে যারা এ জিনিস সম্ভব করে তুলেছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খুব কৃতার্থ তো আমরা।'

জয়ন্তী সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, স্বাধীনতায় তোমার কোনো দান নেই? কিন্তু তুমি তো কয়েকবার জেলে গিয়েছ সুতীর্থ?'

'শখের জেলে যাওয়া। কোনোদিন পিস্তল না ধরেই জেলে গিয়েছি আমি।'

'গিয়েছ তো। উদ্দেশ্যও মারাত্মক ছিল তো?'

'শুধু উদ্দেশ্য দিয়েই কি আমাদের যাচাই হবে ক্ষেমেশ?' সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ওরকমভাবে যাচাই করত, তা হলে মুনিদের মধ্যে বেছে বেছে জরৎকারু মুনি আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এরকম ঢুকে পড়তে পারত কি আজ?' ক্ষেমেশ বললে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে; 'পনেরো কুড়ি বছর আগে খতম হয়ে যেতে।'

'দিশী সরকারও অগাধ জলের মীন নিয়ে মাথা ঘামাবে না—তাদের অনেক সরকারী শহীদ আছে।'

'শহীদ হতে চায়নি কোনোদিন,' জয়ন্তী বললে, 'হতেও পারল না, সেইজন্যেই তো ক্ষেমেশ খুব স্বাধীনতা বোধ করছে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমি বিরূপাক্ষ—আমাদের এইরকম ধাত জয়ন্তী। আমরা গোড়ার থেকেই স্বাধীন—সবরকম ফসকা গেরোর পায়-জামায়ঃ—পাঁচ দর্জিতে মিলে আমাদের কি আর নতুন স্বাধীনতা দেবে।'

'সাতচল্লিশের আগস্টে স্বাধীনতা আসছে তুমি তো বললে ক্ষেমেশ।'

'সেইরকমই শুনেছি আমি।'

সুতীর্থ বললে, 'প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন কানাইলালের মত শহীদ হতে চেয়েছিলুম আমি, কে তোমাকে বলেছে জয়ন্তী? ঘোষ কতবার আমাকে পিস্তল দিতে চেয়েছিল—সেই বারীন-অরবিন্দদের সময়ের কথা—মহাত্মা গান্ধীর নামও শোনেনি কেউ তখন—কিন্তু আমি কিছুতেই পিস্তল নিলুম না। কিছুতেই মন উঠল না আমার। ওরকম ধরনের বিপ্লবের জন্য কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতে পারিনি। আশ্চর্য, পিস্তল না ছুঁড়ে দু-চারটে সাহেব না মেরে দেশ কি করে স্বাধীন করতে পারা যায় সে কথা ভাবতেই পারত না কেউ তখন। এমনই একটা দুর্বার সন্তাপ ছিল—এত মুখিয়ে চলছিল সব যে, কেউই না ভেবেই পারত না যে, দু-চারশটা পুলিস জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের (চা-বাগানের ক্লাইভ স্ট্রীটের বা মিলিটারির সাহেবদের কে চায় কে পায় এই-রকম ভাব) খুনের সরগরম পথেই স্বাধীনতার রণপায়ে ছুটে আসবার কথা। কিন্তু তবুও আমি পিস্তলের—অপূর্ব—কেল্লা—স্বীকার করতে পারিনি সেই দিনও।'

'তারপরে পেরেছ?'

'না।'

'কোনোদিন পারবে না আর?'

'সে কথা বলতে পারছি না এখন।'

'তখন তোমার বয়স কত?'

'সাত আট।'

'এত অল্প বয়সে এসবের ভেতর জড়িয়ে পড়েছিলে?'

'আমার বাড়ন্ত গড়ন ছিল; তেরো চোদ্দ বছরের ছেলের মত দেখাত আমাকে। বারীন ঘোষ তো তাই মনে করেছিল। আমি পিস্তল

সরবরাহ করতুম। নানারকম জায়গা থেকে চুরি বাটপাড়ি, মাঝে মাঝে জবরদস্তি করেও পিস্তল যোগাড় করতে হয়েছে। ভারী জিনিস তো পিস্তল। বেশ গায়ে জোর ছিল তখন আমার। এক একটা ধু-ধু ফাঁকা জায়গার চখাচখীর ধানী জমিতে গলায় দড়ির মাঠে বোবাতাসির চরে গাছগাছালি চাঁদমারি তাক করে পিস্তল ছু'ড়ে ছু'ড়ে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তবুও কোনো প্রাণী মারিনি, মানুষ খুন করিনি। যেসব ইংরেজরা তখন আমাদের দেশ শাসন করতে আসত, তাদের দু-চারজনকে মেরে গভর্নমেণ্টকে তরাসে বানিয়ে দিয়ে কিছু ধকল হয় বটে—কিন্তু যুদ্ধ না করে, স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব এই আমার ধারণা ছিল—'

'এই ধারণার জোরে সুতীর্থ শহীদ হতে পারল না আর,' ক্ষেমেশ সরতে সরতে লম্বা সোফাটার কিনারে সরে গিয়ে বললে, 'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু সরকারী শহীদদের ভেতর সুতীর্থের নাম নেই।'

'কাদের নাম আছে সেখানে?'

'প্রায় সবারই আছে—অনেক পর্ব—অনেক পর্যায়—তোমাকে দেখাব জয়তী একদিন।' ক্ষেমেশ বললে।

'শহীদদের অনেকেই তো মরে গেছে—' জয়তী বললে।

'সকলেই', একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'মেরে, মরা চাই, না হলে শহীদ হয় না কখনো—'

'কেন, বারীন ঘোষ তো বে'চে আছেন, উল্লাসকর আছেন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী আছেন। শহীদ কাকে বলে সুতীর্থ?' জিজ্ঞেস করল জয়তী।

'খুব সম্ভব অধীন দেশে যারা দেশের প্রভুভক্তদের নষ্ট করবার জন্যে লড়াই করে মরে, কিংবা বে'চে থাকে, মরে বে'চে থাকে—তাদের শহীদ বলে। যেসব শহীদ মরো গেছে দেশ স্বাধীন হলে তাদের লিস্টি তৈরি করা হয়—খুব ভালো করে চেক করা হয় যাতে কারুর নাম বাদ না পড়ে; পুরোপুরি তালিকা তৈরি হলে তাদের ফোটো, ছবি, অস্থি পাওয়া গেলে অস্থি চিতের ছাই এটা-ওটা সংগ্রহ করা হয়। সভাসমিতি মিছিল-টিছিল বেশ জাঁকিয়ে তুলতে পারা যায় শহীদদের নিয়ে। স্বাধীনতা পেলে আমাদের দিশী সরকার তাই করবে মনে হচ্ছে।

'বেশ আটঘাট বে'ধে করবে সব; দেখে আমাদের খুব ভালো লাগবে।' ক্ষেমেশ বললে।

'কিন্তু যেসব শহীদ বে'চে আছে তাদের সম্বন্ধে কি হয়?' জয়তী বললে, 'তাদের নাম লিস্টিতে থাকে খুব সম্ভব। থাকে না ক্ষেমেশ?'

'তা তো তুমি জানো সুতীর্থ। নেই তোমার নাম লিস্টিতে?'

সুতীর্থ জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাদের নামও থাকে, কিন্তু তারা বে'চে আছে বলে দেশ তাদের সম্বন্ধে খানিকটা চক্ষুলজ্জা বোধ করে—দেশের জন্য রিভলবার হাতে লড়েছিল এইসব শহীদরা; দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে: এসব শহীদরাও বে'চে আছে। বে'চে থেকে কি করছে? ঘিয়ের ব্যবসা করছে; কিংবা পুরোনো ক্যানেস্তারা বিক্রির কাজ; করুক; মরে যাবে তো একদিন। তারপর সব হবে।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'শহীদ কাকে বলে জিজ্ঞেস করছিলে জয়তী। এইসব লোকদের শহীদ বলে।'

'তা হলে ভারী বিচিত্র তো।'

জয়তীর কথা কানে গেল না সুতীর্থের। চুরুট টানতে টানতে নিজের কথার জের টেনে সুতীর্থ বললে, 'এরা

শহীদ।'

'শহীদের লিস্টিতে তোমার নাম নেই সুতীর্থ?'

'না।' সুতীর্থ বললে।

জয়ন্তী বললে, 'নেই কেন? তুমি তো পুরো পঁচিশ বছর ধরে লড়াই করছ। কয়েকবার জেলে গেলে—দমদম সেন্ট্রাল জেলে ছিলে—প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলে—হিজলী ক্যাম্পে ছিলে—বক্সার ক্যাম্পে ছিলে—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'আমি নিজের মনের খুশিতে লড়াই করেছি, ওরা ভালো বুঝে আমাকে জেলে দিয়েছে। রিভলভার চুরি করেছি, পৌঁছে দিয়েছি দেশ, কিন্তু রিভলভার উঁচিয়ে মানুষ মারিনি, চেষ্টাও করিনি। তখনকার সেসব দিনে যে কিরকম দিনকাল ছিল তা তুমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। পিপাসা পেলে আমরা জল খাই, ঠিক সেরকমভাবে চোঁ চাঁ বোমা পিস্তল ছুটত তখন। পিপাসায় ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হত, অথচ আমার কোনো তেষ্টা নেই—এক ফোঁটা জল খাওয়া নেই তখন। বোমা চালান দিচ্ছি, রিভলভার যোগান দিচ্ছি খুব সাত্ত্বিকভাবে, কাউকে মারছি না দেখেশুনে ষড়যন্ত্রীদের ভেতরে কেউ কেউ আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিনি বিশেষ কিছু, কিন্তু তবুও তো বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত—'

সুতীর্থ চুরুটের দিকে মন দিল, বার কয়েক টেনে জয়ন্তীকে বললে, 'কেন মারিনি—কেন মরিনি—এতগুলো বছর নিশির ডাকের ভেতর দিয়ে বারীন ঘোষের আমল থেকে বিনয় বোস দীনেশ গুপ্তদের চাটগাঁ আর্মারি রেড—তারপর গান্ধীজীর—তোমরা তো সোদপুর নোয়াখালির কথা বলবে—আমি বলছি সেই অদ্ভুত ডাণ্ডি-চোরি-চৌরার ভেতর দিয়ে কোথায় থেকে কোথায় চলে এলুম—কিসে বিশ্বাস ছিল আমার—কিসে অবিশ্বাস ছিল—ভালো করে বুঝবারও সময় পাইনি।'

বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল সুতীর্থের বেশী কথা বলে চলেছে সে, এটা তার স্বভাব নয়: অনেকদিন পরে জয়ন্তীকে দেখে এই-রকম হচ্ছে; সুতীর্থ নিজেকে থামিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'এইবারে বুঝে দেখতে হবে সব।' তারপর চুপ করল।

'কি বুঝে দেখবে?'

'এক বছর আমি বিদায় নেব সব কিছুর থেকে।'

'তার মানে?'

'আমার গত তিরিশ বছরের বৃত্তান্ত তুমি তো জান।'

'এইবারে ভালো করে শুনতে হবে সব।' জয়ন্তী বললে।

'সুতীর্থের বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশী জানা ছিল তোমার জয়ন্তী। আমি বিশেষ কিছু জানি না। তুমি?' ক্ষেমেশ চশমা খুলে নিয়ে জয়ন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে।

'কিছু কিছু জানি।'

(ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

তরুণ লেখকদের মিলন ভবন

খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি, কলকাতাকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা চলছে। যদি বলেন, কেন—সেটা কি চোখে দেখি না? তাও যে একেবারেই চোখে না পড়ে এমন নয়, যেমন কোনো কোনো রাস্তাঘাট, পথের আলো এসব ছাড়াও আমাদের যেখানে নিয়মিত আসা-যাওয়া সেই কার্জন পার্কও ইদানীং যেন কিছুটা পরিচ্ছন্ন, ঘাসগুলো সুন্দর করে ছাঁটা, ফুলে পাতাও চোখে পড়ে। কে, কোন দপ্তর, কিসের দায়িত্ব নিয়েছেন বা নেবেন তা আমি জানি না। যে দপ্তরই করুন—কলকাতা যদি সুন্দর হয়ে ওঠে তাতে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। সেদিন একটা ট্রাম দেখলাম—একেবারে নতুন—তার রঙটি বেশ পছন্দ হল। দু একটি নতুন স্টেটবাসের রঙের বাহার ভালই লাগে। এরকম আরও কত বলা যায়। ভি আই পি রোড দিয়ে গেলে চোখ জুড়োবার মতন দৃশ্যও দেখা যেতে পারে। কাজেই স্বীকার করছি, কলকাতাকে সাজানো গোছানোর চেষ্টা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে বলি, এই শহরের ভেতরে বাইরে যে জীর্ণতা এসেছে তাকে সহজে উদ্ধার করা যাবে না। সময় তো লাগবেই, সেই সঙ্গে এমন কিছু কিছু সমস্যা আছে যা সমাধান করাও মুশকিল। ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ দেখা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু চিৎপুরের রাস্তায় কোনোদিন একটা বকুল গাছ দেখতে পাব—কিংবা কৃষ্ণচূড়া এ যেন ভাবতেই পারি না।

কলকাতা সুন্দর হোক এটা যেমন সর্বজনের কাম্য সেই রকম কিছু লোক আছেন যাঁরা আবার এই সময় অন্য কিছুও চাইছেন। এঁরা প্রধানত লেখক ও শিল্পী। শুনেছি এঁদের মধ্যে নাকি কেউ কেউ কলকাতা ময়দানে তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র তাঁবু চেয়েছিলেন সরকারের কাছে। হয়ত ছেলেমানুষি। তবে একেবারে হালে দেখছি—বেশ কিছু তরুণ সাহিত্যিক সদর স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়িটির জন্যে আবেদন নিবেদন শুরু করেছেন।

সদর স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়িটি রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত। কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল এই বাড়িটিতে। জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ আছে বাড়িটির। এখানে বসে কবি বিষাদের আচ্ছাদন দূর করতে পেরেছিলেন। আনন্দ ও সৌন্দর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল একদা, আকস্মিকভাবেই।

কোনো সন্দেহ নেই, সদর স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়িটির একটা গুরুত্ব রয়েছে। তবে কাব্যের জন্যে বাড়িটিকে নিতান্তই উপলক্ষ বলা যায়। কবির হৃদয় অন্যত্রও খুলে যেতে পারত। তবু প্রচলিত নিয়মে আমরা মনীষীদের স্মৃতিজড়িত গৃহকে মূল্য দিয়ে থাকি। ঠিক সেইভাবেই কিছু তরুণ লেখক প্রস্তাব করেছেন—বাড়িটি সরকার হাতে নিন। নিয়ে তরুণ লেখকদের একটি মিলন ভবন করে দিন।

এঁরা প্রস্তাব করছেন: 'রবীন্দ্র স্মৃতিশালা অনেক আছে। সেগুলি সমৃদ্ধিতর হোক। এই বাড়িটির (দশ নম্বর সদর স্ট্রীট) জন্যে আমাদের প্রস্তাব ভিন্ন। আমরা মনে করি, বাড়িটি হয়ে উঠুক তরুণ লেখক ভবন। তরুণ কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকারের মিলন স্থান হোক। সেখানে যাতে তাঁরা মিলিত হতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন, আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। সাহিত্য পাঠের আসর, গ্রন্থাগার সব কিছুই এই তরুণ লেখক ভবনে স্থান করে নিক।'

তরুণ লেখকরা আমায় মার্জনা করবেন। কোনো বাড়ি সরকারের পক্ষে হাতে তুলে নেওয়ার কিছু আইনগত ঝঞ্ঝাট থাকে। মধুসূদনের স্মৃতিজড়িত লালবাজার এলাকায় একটি বাড়ির বেলায় এরকম প্রস্তাব অনেককাল আগে আমাদের বন্ধুরা করেছিলেন বেসরকারীভাবে। কিছু হয়নি। আমার মনে হয়, আইনগত কারণে লেখকরা যা চান তা হয়ত নাও পেতে পারে। যদি পান—ভাল কথা। যদি না পান তাহলে তরুণ লেখকদের মিলন কেন্দ্র হিসেবে একটি অন্য ব্যবস্থা কী করা যায় না? বোধ হয় তাও যায়। তবে সরকারী অর্থের ওপর পুরোপুরি ভরসা করে নয়। নিজেদের জিনিস গড়তে হলে নিজেরাই কোমর বাঁধতে হবে, সরকার কিছু সাহায্য করতে পারেন। তাছাড়া আজকাল যখন কলকাতার নানা খাতে অর্থ সাহায্য হচ্ছে তখন তরুণ লেখকরা যদি কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের কাছে যান তাঁদের আশা পূরণ হতেও পারে। তবে কথা হল, প্রস্তাব এক জিনিস আর পরিকল্পনা করে কাজ করা অন্য জিনিস। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তা ছাড়া আজকাল সাহিত্যে শিল্পে আমরা বড় পরমত-অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি। ওটি বর্জনীয়।

দশ নম্বর সদর স্ট্রীট লেখকরা পান অথবা না পান, স্বীকার করব লেখকদের একটা মিলন ভবন সত্যিই ভাল জিনিস। যদি এটি গড়ে ওঠে খুশী হব।

মধুসূদনের কাব্য ও নাটকের অনুষ্ঠান

মাইকেল মধুসূদন মহামেলার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় জানাচ্ছেন যে, আগামী ১১ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় রবীন্দ্র সদনে তাঁরা একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। কবির রচিত গান, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ নাটক এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য নৃত্যগীতে পরিবেশন করা হবে। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এরকম পরিবেশনা আগে হয়নি। শ্রীমতী লীলা রায় এর পরিচালনা করবেন। মধুসূদনের কাব্য পাঠ করবেন সাহিত্যিকরা। নাটকটি অভিনয় করবেন অনুষ্টুপ গোষ্ঠী।

অভিনন্দ

পুস্তক পরিচয়

বাংলা পীর সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস। শহিদ লাইব্রেরী। কাজিপাড়া, বারাসত। চব্বিশ পরগনা। মূল্য তিরিশ টাকা।

পীর শব্দটির আভিধানিক অর্থ ঈশ্বর-জ্ঞানিত পুরুষ। মূল শব্দটি ফারসী, সেখানে পীর বৃদ্ধ বা আধ্যাত্মিক গুরু অর্থেও ব্যবহৃত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইসলাম সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পীররাও এদেশে ছড়িয়ে পড়েন। প্রধানত এঁদের লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রচার, পরে কোথাও কোথাও এঁরা স্থানীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়ে যান। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তখন শুরু হয় পীর-পূজো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে পূজো প্রকরণে থাকতো না কোনো বিশেষ ধর্মরীতির পদ্ধতি। থাকতো পীরদের অলৌকিক অতিমর্ত্য ক্ষমতার প্রতি এক অপরিশীলিত ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস। অপরিশীলিত শব্দটি এখানে সচেতনভাবেই ব্যবহৃত হলো। কেননা প্রধানত গ্রামে গঞ্জে মাটির কাছাকাছি শিক্ষারহিত সরল মানুষদের মধ্যেই পীররা হয়ে উঠেছিলেন শ্রুতকীর্তি।

বাংলাদেশে পীরসাহিত্যের সূচনা পীর-কাব্যের সহজ সমিল কবিতা ও ছড়ায়। যে পীরকে নিয়ে বাঙালীর পীর ভজনা শুরু, তিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ খুব অল্পে তুষ্ট শিবপ্রতিম পীর, যার নাম সত্যপীর। সত্যপীর সম্পর্কীয় প্রথম পাঁচালিটির রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪৫। দীনেশচন্দ্র সেন অবশ্য লিখেছেন, "সত্যপীর কোনো মুসলমান পীর ছিলেন। পরে হিন্দুর নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সত্যনারায়ণ রূপে পরিচিত হন। তাঁর সম্পাদিত (বসন্তরঞ্জন রায়ের সঙ্গে) "হরিলীলায়" দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, সত্য-পীর বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন এক কন্যার গর্ভজাত ছিলেন। কিন্তু সত্যপীরের এই পরিচয় চিরকাল কিংবদন্তির পর্যায়েই থেকে গেছে। নিঃসংশয়ে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। যাই হোক, এই সত্যপীর ছিলেন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্থির, স্থায়ী পারাপারের সেতু। পরবর্তী পীরদের পূজায়ও মূলত সত্যপীরের শিন্নি-নিবেদনের পদ্ধতিই প্রচলিত হয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষিত-সমাজে প্রায় ব্রাত্য, সাহিত্যের এই অবর্জনীয় মূল্যবান শাখাটির প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাসই বোধ হয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করলেন। ভাবতে অবাক লাগে কি অপরিসীম প্রযত্ন ও পরিশ্রমে তিনি গড়ে তুলেছেন এর প্রতিটি পাতা! এক দিকে যেমন আদম পীর, গোরাচাঁদ, চন্দ্রাবতী, বদরপীর, বড়খাঁ গাজী, হাসান পীর ও মানিক পীররা এসেছেন, অন্য দিকে বিদ্রোহী কৃষাণপ্রেমিক যোদ্ধা তিতুমীর বা বাউলগুরু লালন শাহও অনুপস্থিত থাকেননি। এক-একটি পীরের আবার অসংখ্য নজরগাহ বা থান গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে। লেখক প্রায় প্রতিটি নজরগাহে যাবার চেষ্টা করেছেন, সম্ভাব্য সর্বপ্রকার অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন, তুলে এনেছেন ছবি। বস্তুত এমন তথ্যসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমকুশল রচনা আজকাল খুব কমই চোখে পড়ে।

তবু কিছু কিছু কথা বলার থেকেই যায়। প্রতিটি পীরের কাহিনী উপকাহিনী বা প্রবাদের উৎস যে সব অলৌকিক সংঘটন; তাদের সবিস্তার বর্ণনায় গ্রন্থকার যে উৎসাহ দেখিয়েছেন, যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের পরে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত উপস্থাপনে অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছেন অনর্থক সংকুচিত। তথ্য ও তত্ত্বের পরেও যা থাকে তা হলো উপলব্ধি। এই উপলব্ধিতে সিদ্ধি না

এতে গ্রহণ-বর্জনে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়ে ওঠে দুষ্কর। এ কারণেই লালন শাহকে পীর স্বীকার করতে অনেকের বাধবে। লালন মূলত বাউল। বাউলসম্রাট। তার জন্ম ধর্ম সম্পর্কিত সংশয়ের কথা বাদ দিলে এবং লালন যে পীর সিরাজ সাঁই-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য (সিরাজ সাঁই ভারতবিখ্যাত পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন) এ কথা স্মরণ রেখেও বলা চলে যে, লালন কখনই অতিলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ছিলেন না; মানুষের যুক্তিহীন অন্ধ ভক্তিকে তাঁর খ্যাতিতে ব্যবহার করেননি। তিতুমীর সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। গ্রন্থকার নিজেই যখন লেখেন, "সুফী আদর্শের ন্যায় লৌকিক ইসলাম আদর্শ অনুসারী তিতুমীর বর্তমানে পীরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন"—তখন এই সংখ্যালঘু মতবাদ মেনে নিয়ে তিতুমীরের কাহিনী গ্রন্থের অন্তর্গত করায় লেখকের ভালবাসাই শুধুমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিতুমীরের আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে অনেক যোগবিয়োগ হয়েছে। কিন্তু হাণ্টার সাহেব ও কাটোয়েল স্মিথকে কিছুটা নিরপেক্ষ মানলে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, তিতুমীরের নেতৃত্বে যে কিষাণ বিদ্রোহ হয়েছিল তা মূলত ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বিদ্রোহ। সিপাহী-বিদ্রোহের গুরুত্ব যেমন সর্বভারতীয়, বাংলাদেশের মাটিতে তিতুমীরের কিষাণ বিদ্রোহ বাঙালীজীবনের এক অনতিক্রমণীয় স্মৃতি। মনে হয় এ গ্রন্থে পীর হিসাবে তিতুমীরের উপস্থিতি অনিবার্য ছিল না।

এসবই রচনাটিকে অধিকতর আলোচনা-যোগ্য ও পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে বর্তমান সমালোচকের বিশ্বাস। এমন একটি বই যিনি তিল তিল পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। লেখকের প্রধান ত্রুটি তাঁর ভাষা। ভাষার অমনোযোগে কোনো কোনো পরিচ্ছেদে রচনাশৈলীর বিশেষ তারতম্য ঘটে গেছে, যার মধ্যে মাঝে-মাঝে উঁকি মেরেছে বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিপ্লব কথা

সিন্ধু থেকে বিন্দু। রমেন দাস। সাহিত্য সংস্থা, ৯ নবীন পালন লেন, কলকাতা ৯। মূল্য বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিশ দশকের গোড়ায় সারা দেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল, ঋষি অরবিন্দ ছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু। সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি বিপ্লবের বহ্নি। বিপ্লব এবং বিপ্লবীদের সেই সব নেপথ্য-

কাহিনী নানারকম প্রামাণ্য তথ্য সহ এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই প্রথম পর্যায়ের কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি আজকের মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার পক্ষেও সহায়ক। আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক সেই মহাসিন্ধুর জীবনের অগ্নিসম দিনগুলিকে এমন রমণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন যে, পড়তে গিয়ে গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। অনেক তথ্য ও ঘটনা বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ যে কি গভীর ছিল বইটিতে তার প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অরবিন্দের চিন্তাধারা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তারও বিবরণ রয়েছে। গ্রন্থটিতে অরবিন্দের বিপ্লবীজীবনের আলেখ্যই তুলে ধরা হয়েছে। যোগীপর্বের প্রারম্ভেই এই গ্রন্থের সমাপ্তি। লেখক যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গেই সেই মহাজীবনের কথা আমাদের নতুন করে ভাবাতে চেষ্টা করেছেন, এজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

শ্যামল চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পটভূমি (অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা আট টাকা। উপন্যাসে তরুণ গল্পকার কালিদাস রক্ষিত যে পটভূমি নির্বাচন করেছেন তা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখময় জীবনের এক বাইরের জগৎ। এখানে নায়িকা গাড়িতে লিফট দেয় নায়ককে, বিলিয়ার্ড খেলায় হেরে গিয়ে বাবা বিদেশী গাড়ি উপহার দেন মেয়েকে, সে মেয়ে আদর্শবাদী নায়ককে অগ্রাহ্য করে বেছে নেয় এক কেরিয়ারিস্ট ছেলেকে, অন্তঃসারশূন্য বিলাসবহুল ব্যভিচারী সমাজজীবনের ভিতরে ঢুকে, পার্টি-মদ-হুল্লোড় আর হাই সোসাইটি-সুলভ প্রেমহীন জীবনের ফাঁপা গহ্বরের মুখোমুখি হয়ে রাতারাতি পালিয়ে যায় (তার নিজস্ব গাড়িটি অবলম্বন করে) পুরনো প্রেমিকের কাছে, সেখানে অনায়াসে রাত কাটায় মদের গ্লাস সামনে রেখে বাক্য-বিনিময় করে. অবশেষে ঘুমন্ত প্রেমিকের ডায়েরি পড়ে পুনর্বার মোহভঙ্গের যন্ত্রণায় অধঃপতিত হয়ে ফিরে যায় উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিকে। বুঝতে পারে, একদা-আদর্শবাদী প্রেমিক আর বিন্দুমাত্র আদর্শে বিশ্বাসী নয়, নায়িকার প্রত্যাখ্যানের প্রবঞ্চনা তাকেও ঠেলে দিয়েছে আত্ম-অবক্ষয়ের এক ভয়ংকর খাদের দিকে, কোম্পানির সর্বোচ্চ পদের দিকে তার লোভ তাকে মরিয়া করে তুলেছে,

প্রেমহীন জীবনের আস্বাদ তাকে করে তুলেছে এক বিকৃত রুচির আধার।

কালিদাস রক্ষিত কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন চলচ্চিত্রের মতো, টুকরো টুকরো ঘটনাকে ফ্ল্যাশব্যাকে রেখে, বর্তমানকে টেনে নিয়ে গেছেন একটি অবিচ্ছিন্ন গল্পের ধারা-বাহিকতায়। তাঁর লেখার ভঙ্গি সহজ, স্বচ্ছন্দ। তাই তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে গল্প। কিন্তু যে যন্ত্রণা-দুঃখ ও অবক্ষয়ের কথা তিনি লিখতে চেয়েছেন তা তেমন স্পর্শযোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। বইটি দেখতে খুব মনোরম। কিন্তু অজস্র বানান ভুলে ভরতি।

✻

মাত্রই আঠাশ বছরের পরমায়ু, আর কিশোরমন ভোলাবার এক উজ্জ্বল দক্ষতা নিয়ে এসেছিলেন মনীষ বসু। ছোটদের নানান পত্র-পত্রিকায় কয়েক বছর আগে নিয়মিত দেখা যেত তাঁর নাম, স্নিগ্ধ ও সহজ রসের ছড়া ও কবিতার শীর্ষে। আর দেখা যাবে না। ইতস্তত ছড়িয়ে-থাকা তার ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলিকে একত্র করে প্রকাশিত হয়েছে অপরূপ উপহার **ঝিলমিল** (সিদ্ধার্থ প্রকাশন, কলকাতা ২০, তিন টাকা)।

কি নিয়ে লেখেননি মনীষ বসু? ছোটদের চোখের যাবতীয় বিস্ময় ও মুগ্ধতার ছবি তিনি ছোটদের চোখ ও মন নিয়েই দেখেছেন। কেবল কথার কারি-কুরিতে, ছন্দের লাবণ্যে তাঁর আলাদা ব্যক্তিত্ব বিধৃত। 'ফাল্গুনে' এক সজীব কিশোরী চোখে—"এই বাগানটা পরেছে কানে ঝুমকোলতার দুল/চুল বেঁধেছে খোঁপায় গুঁজে অপরাজিতা ফুল!" "...লা আলো-র কাধ?/কাশের ঝালর কার?/" প্রশ্নের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলে সেই সব শরতের ছবি. 'চড়ুই পাখিকে' দেখে কলকল করে ওঠে : "চড়ুই...চড়ুই...চড়ুই পাখি/এক-দুই-তিন পড়বি নাকি?/তুত্তুর মতো নামতা পড়ে/প্রাইজ নিবি দু' হাত ভরে?" আবার খাঁচার বন্দী-টিয়ার দুঃখ দেখে আশ্বাস জানায়—"কাল ভোরে খুলে দেব এ খাঁচার দ্বার—/তারপর স্বাদ নিস মুক্ত পাখার।"

দুঃখ এই যে, মুক্ত পাখার স্বাদ নিতে মনীষ নিজেই চলে গেলেন।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

দেশ পত্রিকার ২৪ জুলাই সংখ্যায় আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত "পথের শেষ কোথায়" প্রবন্ধের বিভাগীয় শিরোনামে ছাপার ভুল আছে। সংশোধিত শিরোনাম : "বিষাদের ঘনায়মান ছায়া"।

মোহনবাগানের জয় — লীগে পালা বদল

ইডেনে লীগ ফুটবলের মহারণে মোহনবাগানের কাছে ১—০ গোলে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের পরাজয়ের পর বিজয়ী ও পরাজিত খেলোয়াড়দের প্রায় সমানভাবে কাঁদতে দেখা আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। কেন এমন সার্বজনীন কান্না? বোধ করি যে খেলা দেখার একখানা টিকিট হাতে পেলে সাত রাজার ধন প্রাপ্তি ভেবে সবাই হেসে ওঠে—যে খেলা দেখার জন্য সবাই পাগল হয় সে খেলায় হারজিতের এই পরিণতি। আজ ভাবছি ধীরে ধীরে উত্তেজনা কীভাবে তুঙ্গে উঠেছিল।

মহানায়ক যেভাবে বলেছিলেন তুম হামকো খুন দেও, হাম তুমকো আজাদী দেঙ্গে—এইভাবেই নাকি মহানায়কের নামধারী খেলোয়াড়টি বলেছিল—তুম হামকো বল দেও, হাম তুমকো গোল দেঙ্গে! অন্য শিবিরে বলতে শুনেছি : ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা, আমাদের শ্যাম থাপা।

না, সুভাষ, শ্যাম কেউই কিছু করতে পারেনি। খেলার একমাত্র গোলটি করেছে আকবর ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে। এও এক নতুন নাটকীয় কাণ্ড। বড় খেলায় প্রথম মিনিটে গোলের নজির অবশ্য অনেক আছে। কিন্তু ফুটবলেও আছে প্রথম মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে গোল করার নজির। মোহন-বাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের লীগ খেলাতেও কি নেই? আছে। ১৯৫৮ সালে ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক সনৎ শেঠ ভাল করে প্রস্তুত হবার আগেই ৪০ সেকেণ্ডের মাথায় মোহন-বাগানের ভেঙ্কটেশ গোল করে বসে। সে খেলায় মোহনবাগান ২—১ গোলে জয়ী হয়। তারিখটা—যতদূর মনে পড়ে ৩১ জুলাই। এ বছর ২৪ জুলাই তারিখে আকবরের গোলটি সম্ভবত কলকাতার ফুটবল মাঠের দ্রুততম গোল।

রেফারিদের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে—আর কোন খেলোয়াড়ের স্পর্শ ব্যাতিরেকে এক-জন খেলোয়াড় পর পর দুটি কিংবা তিনটি গোল করতে পারে কিনা। খুবই কঠিন প্রশ্ন। সহজ প্রশ্নও থাকে—প্রতিপক্ষের স্পর্শ ব্যাতিরেকে কি গোল করা যায়? হাতেনাতেই সে প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। এর পরে—বহু পরে বৈঠকখানায় এবং পাড়ার রকে তর্ক বাধলে, বাজী ধরা হবে দ্রুততম গোলটি সম্পর্কে এখন যেমন বহু অতীত ঘটনা নিয়ে বাজী ধরা হয়।

পরাজয়ের পর কান্নায় ভেঙে পড়েছে সুরজিৎ সেনগুপ্ত —ফটো : অলোক মিত্র

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান খেলাটিকে সবাই লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল বলেই ধরে নিয়েছিল। এখন ধরে নিয়েছে দীর্ঘ ছয় বছর পরে মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, টানা ৬ বছর লীগ জয়ের রেকর্ড সৃষ্টির পর ইস্টবেঙ্গলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে সাময়িক যতি পড়ছে। বাকি খেলাগুলি নিয়ম রক্ষার খেলাতেই পরিণত হবে। যদি কোন অঘটন ঘটে পৃথক কথা। কলকাতা ময়দানের হালচাল যাদের নখদর্পণে তাদের কথা : কিছু ঘটবে না, লিখে দিতে পারেন ১৯৭৬-এর অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান।

তবে লীগের এই ফল স্বাভাবিকভাবেই শীল্ডের আকর্ষণ শতগুণ বাড়িয়ে তুলবে। ইস্টবেঙ্গল শিবিরের কথা, শীল্ডে মোহন-বাগানকে হারাবই। মোহনবাগান শিবির বলছে, গতবার শীল্ড ফাইনালের পাঁচটি গোলের একটি শোধ হয়েছে, চারটি শোধ হবে শীল্ডে। এই ভাবেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বড় ম্যাচের আবহাওয়া।

গত বছর এই ইডেনেই মোহনবাগান ভাল খেলেও শ্যাম থাপার এক অসাধারণ গোলে হেরে গিয়েছিল। এবার ইস্টবেঙ্গল ভাল খেলেও হেরে গেছে শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কেতাবী প্রথায় রচিত নির্ভুল ও নিখুঁৎ আক্রমণের গোলে।

ভাল খেলে হেরে যাওয়া আর ভাল পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা কথাটি রসিকতার জন্যই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খেলার ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবেই মিলে যায়। এমনও দেখা গেছে, একটি দল আক্রমণের উপর আক্রমণ চালিয়েও গোল করতে পারল না, বিপক্ষ দল দুই একবার আক্রমণের মধ্যে একটি গোল করে বসল।

এই খেলাটিতেই তো মোহনবাগান ২—০ গোলে জিতত, যদি ৫ মিনিটের মাথায় উলাগানাথনের তীব্র শট ক্রসবারে প্রতিহত না হত। অথচ প্রথম পাঁচ সাত মিনিট বাদে বাকি সময় খেলার উপর ইস্টবেঙ্গলের ছিল পর্যাপ্ত প্রাধান্য।

ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা অনেক কিছু বলেছেন। কেউ গোলটির জন্য গোলরক্ষক তরুণ বসুকে আংশিক দায়ী করেছেন। কেউ দায়ী করে-ছেন ব্যাক সুধীর কর্মকারকে বল এবং উলগাকে ছেড়ে দেবার জন্য। গোলটির ক্ষেত্রে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের ভুল ত্রুটি আছে। কিন্তু গোল না করতে পারার কারণ কি? মোহনবাগান ডিফেন্সের, বিশেষ করে প্রদীপ চৌধুরী ও সুব্রত ভট্টাচার্যের মরীয়া খেলা। দুজনের উপরই বোধ হয় সেদিন দৈবশক্তি ভর করেছিল। ইস্টবেঙ্গলের দুই মারাত্মক ফরোয়ার্ড শ্যাম ও সুরজিৎকে অকেজো করে রাখাই মোহনবাগানের জয়ের মূল কারণ।

একলব্য

"ও পাঁচটা দিন আমি সকলকে এড়িয়ে চলতাম
এখন পেয়েছি 'কেয়ারফ্রী'– মাসে
গোটা ৩০ দিনই এখন আমি নিশ্চিন্ত।"
নতুন "কেয়ারফ্রী" স্যানিটারী ন্যাপকিন আর সেই সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ স্ত্রীলোকদের শরীর পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে।
মাসে পাঁচ দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি এখন পাচ্ছেন "কেয়ারফ্রী"।
অদ্ভুত ওয়াটারপ্রুফ সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় নিয়েছে। তাই আপনার গায়ের ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে আর কোন অস্বস্তি বোধ হয় না।
একমাত্র "কেয়ারফ্রী" এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। তাই ন্যাপকিনের এক জায়গায় সব জমে থাকে না। নীল রঙের একটি রক্ষা কবচ এর পুরো তলা আর দু'পাশ ঘিরে থাকে। তাই আপনার কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।
"কেয়ারফ্রী" ফেলে দিতেও কোন অসুবিধা নেই— বাথরুমে ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেই সব অদৃশ্য। বাইরে কাজে বেরুলে কিম্বা বেড়াতে গেলে আর কোন চিন্তার কারণ নেই আপনার।
তাছাড়া "কেয়ারফ্রী" আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিক ক'রে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারবেন। এই সঙ্গে প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি "কেয়ারফ্রী" বেল্ট।
এখন আপনি মাসে গোটা ৩০ দিনই নিশ্চিন্ত
Carefree
জনসন অ্যাণ্ড জনসন
® Trade Mark © Johnson & Johnson India Ltd

আকবর সেদিন বাদশাহ হয়েছিল

জয়ের নায়ক আকবর সেদিন সত্যিই বাদশাহ বনে গিয়েছিল। যার গোলে দীর্ঘ ছ বছর পরে কলকাতার মাঠে মোহনবাগান হারাল ইস্টবেঙ্গলকে—মুখ্যত যার জন্য এ বছর মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছে তার সেদিন কী রাজকীয় সম্মান। কিন্তু আকবরকে মুখ বিকৃত করে কাঁদতে দেখে ইডেনে আমার সামনে বসা ছোট ছেলেটি তার বাবাকে প্রশ্ন করল: ও কাঁদছে কেন? বাবার সংক্ষিপ্ত উত্তর : জয়ের আনন্দে। বুঝলি না, অতি দুঃখে মানুষের যেমন চোখ ফেটে জল আসে, তেমন অতি আনন্দের আবেগেও মানুষের কান্না পায়।

কেঁদেছে সেদিন অনেকেই। কেউ দুঃখে, কেউ আনন্দে। আকবরের মত অমন মিষ্টি কান্না বোধহয় আর কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কাঁদতে কাঁদতে মাঠ থেকে বের হয়ে জলকাদামাখা বুট-জার্সি সমেত প্যাভিলিয়নের সোফায় সটান শুয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—'ওভাবে কাঁদলে কেন?' আকবর হিন্দি-উর্দু-বাংলা মিশিয়ে যা বলল, তার অর্থ।

—কেঁদেছি? কই না তো। গোল তো অনেক করেছি। ইস্টবেঙ্গলে থাকতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও ১৯৭২ এবং ১৯৭৪-এ তো শ্রেষ্ঠ গোলদাতার সম্মান পেয়েছি মরসুমে সবচেয়ে বেশি গোল করে। ১৯৭২-এ মরসুমের প্রথম হ্যাট্রিকও করেছিলাম ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। যে মোহনবাগান আজ আমাকে মাথায় তুলেছে এই মোহনবাগানের বিরুদ্ধেই ১৯৭১-এর রোভার্স সেমিফাইনালে প্রথম গোল করে মহমেডান স্পোর্টিংকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। আরও কত স্মরণীয় খেলায় কত গোলই তো করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আজকের গোলটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গোল। আর কোন গোলের জন্য এত গর্ব অনুভব করিনি। কাঁদতে আমি চাইনি। হেসে লুটোপুটি খাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল।

আকবরের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় কত সরল। পাঁচপয়জারের ধার ধারে না। কদিন আগেও ও কেঁদেছে। সেও বড় খেলার পর পর প্রথম দুটি গোল করে। ওর ছেড়ে আসা ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে দুটি গোল করার কথাই আমি বলছি। কেঁদেছিল বোধহয় অন্য কারণে। সেদিন ওর শরীরটা ভাল ছিল না। অত্যধিক শ্রম-কাতরতায় খেলার শেষে লুটিয়ে পড়েছিল। মুখ দিয়ে গ্যাজা বের হচ্ছিল, চোখ দিয়ে জল।

এ বছরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গোল করার কৃতিত্বের সঙ্গে অনেক কৃতিত্বই যোগ করা যেতে পারে। ধরা যাক ১৯৬৮ সালের কথা। অন্ধ্রপ্রদেশ ফুটবলে গোলদাতাদের তালিকায় আকবরের নাম ছিল সবার উপরে। '৬৯এ নওগাঁয় জাতীয় ফুটবল আসরে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে করেছিল হ্যাট্রিক। কলকাতায় এসে প্রথম বছরে (১৯৭১) মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গোল করেছে। ওই বছর আই এফ এ শীল্ড
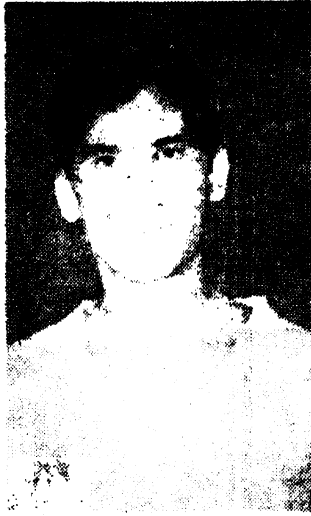
ফাইনালে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে ওর গোলটি জীবনের বড় জয়ের স্মারক হিসাবে স্মৃতিপটে আঁকা রয়েছে। তবু ওর নিজের কথায়, ১৯৭৬-এর ২৪ জুলাই তারিখে ওর ইডেনের গোলটি পারিবারিক গরিমায় যুক্ত হয়ে থাকবে।

খেলার বহু লেখায় আমি ভ্রাতৃযুগলের কথা উল্লেখ করেছি। যুক্ত চিহ্ন দিয়ে হাবিব-আকবর জোড় নাম ব্যবহার করেছি, চোখের সামনে দেখছি বলে। কিন্তু ওদের কথায় কি শুধু জোড় প্রযোজ্য? ছয় ভাইয়ের নামই তো এক সঙ্গে লেখা উচিত। এবং শুধু এক পুরুষেরও নয়, দুই পুরুষের কথাই এসে পড়ে।

ম স্ত ব ড় পেডিগ্রি আকবরের। হায়দরাবাদ মহম্মদ ঘরানার খেলোয়াড়। বাবা মহম্মদ ইব্রাহিম ছিলেন অলরাউন্ড স্পোর্টসম্যান। সবরকমের খেলায় বেশ নাম করেছিলেন। হায়দরাবাদ সিটি কলেজের ফিজিক্যাল ডিরেকটরের পদ ত্যাগ করে অবসর নেবার পরও খেলার মধ্যে জড়িয়ে ছিলেন। তিনিই ছেলেদের ক্রীড়াজীবনে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন।

ছয় ভাই। আজম-মইন-সিদ্দিক-হাবিব-আকবর-জাফর। ফুটবল ক্ষেত্রে সবাই কম-বেশি প্রতিষ্ঠিত। বড় ভাই আজম দীর্ঘ ১০ বছর ধরে খেলেছেন হায়দরাবাদ সিটি পুলিস দলে। মেজো মইনকে এই কলকাতাতেই দেখেছি সাত-আট বছর ধরে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ব্যাকে ও হাফব্যাকে খেলতে। সেজো সিদ্দিক অন্ধ্র পুলিসের রাইট ইনে খেলে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। চতুর্থ হাবিব তো গত ১০ বছর ধরে কলকাতা ময়দানের শীর্ষ তারকা। আকবর পঞ্চম। ষষ্ঠ জাফরকে হয়তো দুই-এক বছরের মধ্যে আমরা কলকাতাতেই দেখতে পাব। এখন খেলছে হায়দরাবাদ সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ দলে।

হায়দরাবাদে একটি নিয়ম আছে। কলেজের ছাত্র না হয়েও সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ দলে বালক খেলোয়াড়রা খেলতে পারে। চাকরির বয়সে না পৌঁছেও পারে হায়দরাবাদ পুলিস দলে খেলতে। প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়দের প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে বড় ফুটবলে অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

মহম্মদের অন্যান্য ছেলেরা এই সুযোগ পেলেও আকবর কিন্তু তালিম পেয়েছে হায়দরাবাদ স্পোর্টিং ক্লাবে এবং বাবা ও দাদাদের কাছে। যেহেতু রাইট এবং লেফট্ দু পায়েই সমান জোর ছিল এবং দুই ইনে খেলতে পারত আর হেড করত মাথার বুদ্ধি মিশিয়ে সেহেতু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের ছাপ পেয়েছিল প্রায় খেলা শুরু করা থেকে। '৬৯-এ নওগাঁর জাতীয় ফুটবল আসরে আকবর ছিল সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। বিশেষজ্ঞদের চোখে কিন্তু ক্রীড়াভূমিকা বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল।

অগ্রজ হাবিব সব সময় ছায়ার মত সঙ্গে করে রাখে অনুজ আকবরকে। খেলোয়াড় আবাসে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র। ৭১এ ১৯ বছরের ভাইটি যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিল তখনো যেমন, পাঁচ বছর পরে এখনো তেমন। আকবরও ভাই ছাড়া জানে না। কুকথায় যারা পঞ্চমুখ তারা বলে থাকেন খেলার মাঠে হাবিব ছাড়া আকবর অচল। মিথ্যে নয়, হাবিব আকবরকে বেশি বল সরবরাহ করে। কিন্তু হাবিব কি বেশি বল সরবরাহ করবে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে? সে কথা থাক। বহু খেলায় কিন্তু আকবরের ভূমিকা হাবিবের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে এবং আস্তে আস্তে আকবরই ময়দানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

কিলাউইয়ির সোনা লুট করবার জন্যে স্যামরড এই খুনেদের নিয়ে এসেছিল।
স্যামরড?
বিশ্বাসঘাতক!

স্যামরড কিন্তু আমাকে মারেনি। তাই বলে ছেড়ে দিয়েছিল।
বিচারের সময় সে কথা বলো।
বিচার?

ওরা আট শো বস্তা সোনা চুরি করেছিল। তবে ফিরিয়ে দেবে।
...না দিলে ওদের ছাড়ছে কে?
!!!
১৪/২১

অর্থাৎ আবার বয়ে আনতে হবে?
তোর চোয়ালে ওটা কিসের দাগ?
তোর নিজের চোয়াল দেখেছিস?

এক-এক ট্রিপে আট বস্তা। একশোটা ট্রিপের দরকার হবে।
কেমন লাগছে এখন?
যেমন কর্ম তেমন ফল।

খুন, জখম, লুট... তিনটে অপরাধের শাস্তি চাই!
দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড!

অরণ্যের বিচার চটপট শেষ হয়।
জাহাজটা কোথায়?
হেলিকপ্টারটা?
দশ বছর বাদে ফেরত পাবে।
...এখন খাটো!

কিলাউইয়ির সোনা-বেলা আবার শান্ত.....
এরপর: নতুন কাহিনী

সমিত ভঞ্জ/এরা এক যুগ/পরিচালনা : অর্চন চক্রবর্তী

কলামন্দিরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর

ক্যালকাটা মিউজিক সারকেলের এ বছরের কলামন্দিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের (১৪—১৮ জুলাই) বৈশিষ্ট্য ছিলো দুই তরুণ শিল্পীর বাজনা।

প্রথমেই বলতে হয় সেতারশিল্পী বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের কথা। যদিও শিল্পীর বয়স মাত্র ২০, তার শুদ্ধকল্যাণ রাগে আলাপ জোড়, ঝালা ও বিলম্বিত্ গত, ইমন রাগে দ্রুত্ গত ও খাম্বাজ টপ্পা (১৭ই, সন্ধ্যা) শুনে বোঝা গেল যে তিনি ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ বা রইস খাঁর চেয়ে দ্রুত তানকারিতে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। রাগ রূপায়ণের ব্যাপারেও তিনি বেশ সড়গড়, কারণ শুদ্ধ কল্যাণের মত কঠিন রাগেও তাঁর বিশেষ কোন খুঁত পাওয়া গেল না। বরঞ্চ পাওয়া গেলো পঞ্চম থেকে ষড়জে যাওয়া প্রাচীন কায়দা—প ধ প স (তার)।

বাদন শৈলী ও গতকারির ঢং পুরোপুরি বিলায়েৎ খাঁর ছাঁচে ঢালা। তবে ব্যাপারটা কোন রকমেই অনুকরণের পর্যায়ে ফেলা যায় না—কারণ এ জাতীয় তানকারির জন্য যথেষ্ট নিজস্ব প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন।

আসরের দ্বিতীয় তরুণ শিল্পী সরোদিয়া ব্রিজ নারায়ণ, প্রখ্যাত সারেঙ্গী বাদক রামনারায়ণের পুত্র, যথেষ্ট প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর মিঁয়াকি টোড়ী আলাপ, জোড় ও গৎকারিতে (১৮ই সকাল)। বাদন শৈলী আলী আকবরী, স্বর বিস্তারে উন্নত চিন্তাধারার ছাপ, ডান ও বাঁ হাতের কাজের সমান দক্ষতা ও ঘন মীড়, আশ, গমক, বোল, তান, জোড়া ও ঝালায় নিপুণতা দেখা গেলো। রাগ রূপায়ণেও মোটামুটি ভালো তবে দ স মীড় দিয়ে অন্তরার স-তে যাওয়া ঠিক নয়। মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চমও অবহেলিত। দ্রুত একতাল বন্দীশে পরজ্ বসন্তের অঙ্গও শ্রুতিকটু।

খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভীমসেন যোশী, লতাফৎ হুসেন খাঁ, নিভ্রুতি বুয়া সরনায়েক, ইমরৎ খাঁ ও হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া।

ভীমসেন যোশী (১৭ই রাত্রি) গেয়েছিলেন শুদ্ধ কল্যাণ, সুরদাসী মল্লার, সাহানা ও ভৈরবী ভজন। শুদ্ধ কল্যাণের বিস্তারে শিল্পীর স্বাভাবিক স্বরমাধুর্যের সঙ্গে মিশেছিলো উন্নত চিন্তাশীলতা। তাঁর স্পষ্ট গমক তানকারির সঙ্গে ছিলো কিছু অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সপট তান। দ্রুত খেয়ালে ছিলো কিছু অসাধারণ ৮ থেকে ১৬ মাত্রা লম্বা পুরোনো কায়দার তান। তবলিয়া মহাপুরুষ মিশ্র নিপুণতার সঙ্গে এর জবাব দিয়েছিলেন। সুরদাসী মল্লারের আওচার ছিলো আবেগপূর্ণ এবং মধ্যলয়ে খেয়াল ছিলো কিছু চমৎকার পুকার ও লম্বা, ছন্দ যুক্ত গমক তান। সাহানা খেয়ালটির বৈশিষ্ট্য ছিলো প্রবল মধ্যম প্রধান তানকারি।

লতাফৎ হুসেন খাঁ (১৮ই সকাল) গেয়েছিলেন জৌনপুরী মিঁয়াকি সারং ও সুরদাসী খানী স্বরক্ষেপণ, ঝোঁক, ঝটকা ও পুকারে জমজমাট হয়ে উঠেছিল। ছোট ঝাঁপতাল খেয়ালটিতে কিছু চমৎকার ধ্রুপদী বাঁট, লয়কারি, গমক ও

তানকারি ছিলো। কিন্তু মধ্যলয় তিনতাল খেয়ালে আবেগপূর্ণ অন্তরা-বিস্তারে ও দক্ষ তানকারি শুদ্ধ ধৈবতের অশাস্ত্রীয় প্রয়োগের দোষকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। মিঁয়াকি সারং খেয়ালে বিস্তার ছিলো ধীর, স্থির ও সুপরিকল্পিত। সুরদাসী মল্লারে ছিলো ঘন গমক তানকারির মেঘ গর্জন।

নিভ্রুতি বুয়া সরনায়েক (১৬ই সন্ধ্যা) গেয়েছিলেন শুদ্ধ কল্যাণ, হরিদাসী মল্লার ও মালবী। তাঁর মীড় ও ছোট গমক মিশ্রিত বিস্তারের সাবলীলতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তানের অফুরন্ত ভান্ডার লক্ষণীয়। আরো লক্ষণীয় লয়কারিতে তান ও ছন্দের অপূর্ব মিলন।

বাঁশীবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার বাগেশ্রী আওচার ও জোড় (১৬ই সন্ধ্যা) সুপরিকল্পিত। হঠাৎ তার সপ্তকে উঠে গিয়ে সুরের মায়াজাল বোনার ঢং প্রশংসনীয়। পাহাড়ী ঠুমরীর বিষয়ে একই মন্তব্য

বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়

প্রযোজ্য। তবে বাগেশ্রীর ঝাঁপতাল গৎকারি তুলনামূলকভাবে একই শ্রেণীর নয়। ইমরাৎ খাঁর সুরবাহারে টোড়ী আলাপ ও জোড় (১৮ই দুপুরে) পঞ্চমের অভাব ও অপ-প্রয়োগের জন্য সুখশ্রাব্য হতে পারেনি। সেতারে বাজানো শুদ্ধ সারংও ধৈবতের অতিপ্রয়োগে দূষিত। এন রাজম-এর বেহালায় মিয়াঁ মল্লার ও দেশ দাদরা (১৭ই সন্ধ্যা) নিষ্প্রাণ ও কর্কশ। হাফিজ আহমেদের গলা তারার দিকে কম-সুরো হয়ে পড়ায় [illegible] বেহাগের তানকারি জমেনি (১৬ই সন্ধ্যা)। বিস্তার মোটামুটি ভাল এবং মিয়াঁমল্লার তারানা ও ঝিঁঝোটি টপ্পা আনন্দদায়ক।

ঠুমরী মাইফেলের প্রথম দিনে (১৪ই সন্ধ্যা) শোভা গুরটু তাঁর ঠুমরী, কাজরী

দাদরা ও গজলে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে মাইফেলের অন্যান্য শিল্পীরা—পূর্ণদাস বাউল, মহম্মদ হুসেন ও আহমেদ হুসেন (গজল) ও শোভা কোসের (কথক নৃত্য)—কেউ বিশেষ কোন পারদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেননি। তবে গজল গায়ক দুজনই এঁদের মধ্যে কিছুটা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

—মীনাক্ষ গুপ্ত

মধ্যযুগের বাংলা নাট্যগীতি

উদ্গাতার শিল্পীগণ একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের নির্বাচিত কয়েকটি অংশ দর্শকদের কাছে নির্ভর যোগ্যভাবে উপস্থাপিত করে। ২১ জুলাই রবীন্দ্রসদনে শ্রীদীপ্তপ্রকাশ মজুমদারের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানটি সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকে পুলকিত করেছে অভিনয়ের দুর্বলতা ও কয়েকটি ত্রুটি সত্ত্বেও এবং এতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রুচিশীল দর্শকবৃন্দ এখনও মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী প্রবন্ধের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ও যথেষ্ট আগ্রহও পোষণ করে থাকেন। প্রত্যেকটি অংশই—যথা হরগৌরী-সংসার বা তরণীসেন বধ—এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে এই কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য নাট্যগত উৎকর্ষ এবং কাব্যধর্মিতা দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও একটি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা হচ্ছে অবান্তর কথাকে বাদ দিয়ে মুখ্যত মূল পাঠগুলিকে তুলে ধরা যাতে এই গেয় ও পাঠ্যকাব্যগুলির স্বরূপ সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সুর অবশ্য কিছুটা আধুনিকের প্রান্তছোঁয়া, কারণ তা না হলে সরসতা বা চিত্তাকর্ষকতা কিছুটা কমে যেতে পারে আধুনিক শ্রোতার কাছে। তবে এইসব কাব্যপঠনের কতকগুলি প্রাচীন ধারা আছে যা বিশিষ্ট এবং প্রবীণ কথকবৃন্দ অবগত আছেন। তার কিছুটা পেলে সেই পুরাতন রীতির একটা নবতর আস্বাদন লাভ করা যেত, পরিচালক বিভিন্ন তাল প্রয়োগ করে একঘেয়েমি কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, কেবলমাত্র অন্তরালে আচরিত সঙ্গীতকে মূল অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এইখানেই অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট দুর্বল। আরও পটু ও সুযোগ্য শিল্পীদের এই কার্যে নিয়োগ না করলে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য অর্জিত হবার সম্ভাবনা অল্প। সঙ্গীত এবং যন্ত্র-সঙ্গীত মনোরম। জানা গেল যাঁরা কণ্ঠ-সঙ্গীতে যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅংশুমান রায়, শ্রীজটীলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় রয়েছেন। আরও অনেকেই আছেন যাঁদের নাম না দিতে পারলেও প্রশংসাজ্ঞাপনে কার্পণ্য করব না। এই উদ্যম আমাদের বেশ ভাল লাগলেও একথা স্বীকার না করে পারছি না যে, ঠিক প্রথম শ্রেণীর অনুষ্ঠান হিসাবে এটি এখনও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, যদিচ প্রতিশ্রুতির আভাস রয়েছে। আরও, একটি কথা, পিছনে সাদা পটভূমিকায় ছায়াচিত্রগুলির কোনও তাৎপর্য ছিল না। বরঞ্চ এতে পাত্র-পাত্রীদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণগুলি বিসদৃশভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কেবলমাত্র একটি কালো পর্দা থাকলে এই কর্তব্যগুলি দৃষ্টিকটু হয়ে উঠত না। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত ভাষণ যুক্তিপূর্ণ এবং সুচিন্তিত। যাই হোক, একাডেমিক আদর্শের দিক থেকে এই প্রচেষ্টা একটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে।

—রাজেশ্বর মিত্র

সকালবেলার বাদল-আঁধারে

আগের দিন বিকেলে কলকাতা ভেসে গিয়েছিল বাঁধনহারা বৃষ্টিধারায়, সেদিন ১১ জুলাই সকাল থেকে মেঘে অন্ধকার ছিল দিনের আকাশ, ঝরোঝরো বৃষ্টি কলরোল মাথায় করে রবীন্দ্রসদনে যখন পৌঁছলাম, ভোরেমি আয়োজিত রবীন্দ্র সংগীতের আসর তখনো শুরু হয়নি, নির্ধারিত সময়কে আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তখনই মনে প্রত্যাশা জেগেছিল, আজকের প্রভাতী আসর বর্ষার গানে গানে সম্পূর্ণ জমে উঠবে। মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে যাঁর গানের নির্বাচন এলোমেলো হয়ে যেত, উত্তরকালের জন্য তিনিই রেখে গিয়েছেন সর্বাধিক সংখ্যক সজল ঋতুর গান। শুধু সংখ্যার গণনাতেই ধরা পড়ে, এই ঋতুর প্রতি তাঁর নিজস্ব পক্ষপাত কত বেশী। সুতরাং শিল্পীরা নিশ্চয়ই এটুকু সম্মান তাঁকে দেবেন।

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হল না। আসরের প্রথম শিল্পী ধীরেন বসু পাঁচখানি গান গাইলেন। এর মধ্যে একটি মাত্র বর্ষার গান। তিনটি এই সেদিন রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের প্রভাতী আসরে গেয়ে-যাওয়া। এবং যান্ত্রিক পরিবেশন। পরের শিল্পী বাণী ঠাকুরও তাই। নিয়ম রক্ষার মতো শোনালেন 'আমার দিন ফুরালো।' কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য সেদিনও ছিল এই শিল্পীর। বাকী চারখানি গান তাই প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগেই মিলিয়ে গেল। আসরে এলেন নবীন শিল্পী হীরক চৌধুরী। সবল, সতেজ গলা। কিন্তু গাইবার ভঙ্গি কেমন কাটাকাটা, রেশ থাকে না। 'সব দিতে চাই' একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

গানের আসরে মধ্যবর্তী বিরতির অবসরে পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ আবৃত্তি করলেন 'কর্ণকুন্তী সংবাদ।' সহজ, সুন্দর ভঙ্গি; মার্জিত উচ্চারণ। অতি-নাটকীয় না করেও অন্তর্নিহিত নাটক নিপুণভাবে তুলে ধরলেন মায়াময় দুই কণ্ঠের উত্থানে-পতনে।

বিরতির পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আধুনিক গানে ব্যস্ত থেকেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ একটুও কমেনি। মাধুর্যময় দেবদত্ত কণ্ঠে শোনালেন তাঁরই কণ্ঠে বহুশ্রুত তবু পুরনো-না-হওয়া কয়েকটি গান। কিন্তু পৌঁছে দিলেন না কোথাও। অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে গীতবিতান-বহির্ভূত গানটিও (দিনের শেষে ঘুমের দেশে) তিনি গেয়ে উঠলেন।

সেদিনের আসর পূর্ণ করে দিলেন শেষ শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। তিনি এলেন, বসলেন, জয় করলেন। সকাল বেলার বাদল আঁধারে যে গানের প্রত্যাশায় বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি এসেই শুরু করলেন সেই গান, বর্ষা-সঙ্গীত, একটির পর একটি। মোট আটটি গান গাইলেন তিনি। স্বচ্ছন্দ দরাজ তীক্ষ্ণ গলায় প্রথমেই জানিয়ে দিলেন, আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে। সেই সজল-ঘনকে আহ্বান জানালেন পরের গানে। গান-নির্বাচনের বিহ্বলতা ব্যক্ত হলো তৃতীয়তে —কী গান গাব যে ভেবে না পাই। মেঘের পরে মেঘ জমা আঁধার-করা পরিবেশ গড়ে তুলে পঞ্চম গানে যখন 'ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার' ধরলেন সুচিত্রা মিত্র, তখনই বেশী করে মনে করিয়ে দিলেন তিনি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুধু কথা-সুরের পরিবেশন নয় তাঁর কাছে, এ তাঁর জীবন। নইলে এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া তাঁর মতো বাস্তব শিল্পীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেদিন যে সত্যিই আষাঢ় পূর্ণিমার দিন, সে কথা কি তাঁর মতো করে কেউ মনে রেখেছিল? রবীন্দ্রসদন থেকে বেরিয়ে আসার সময় বার বার মনে হচ্ছিল তিনিই একমাত্র, যিনি গান গাইতে চেয়েছিলেন সেদিন, অন্যরা চেয়েছিলেন শোনাতে।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

জ্যাঠামশাই এ-ছবির একটি কেন্দ্র-চরিত্র। ওই চরিত্রের মানসিকতা সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে অসাধারণ অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। সুহাসের চরিত্রে কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, তপুর চরিত্রে পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং আয়নার চরিত্রে মহুয়া রায়চৌধুরী তাঁদের চরিত্রের প্রতি যেমনই বিশ্বস্ত তেমনই জীবন্ত। মোহিনীর পাষণ্ড স্বামীর চরিত্রে নিমু ভৌমিক দুটি দৃশ্যেই দর্শকের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেন। অন্যান্য ছোট ছোট ভূমিকায় চিন্ময় রায়, দেবিকা দাস, কণিকা মজুমদার, অশোক মিত্র ও পদ্মা দেবী চরিত্রানুগ। কিন্তু চরিত্রানুগ নয় এ-ছবির আবহসংগীত (আনন্দশংকর-কৃত)। সারা ছবি জুড়ে আবহ কেবল বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে। মাত্র দুটি জায়গায় আবহের তারিফ করতে হয়। একবার এক করুণ মুহূর্ত থেকে জ্যাঠামশাইয়ের এসরাজের সঙ্গে আবহ মিলিয়ে দেওয়া এবং একেবারে শেষে মোহিনীর আত্মসমর্পণের মুহূর্তে। ছবির গানগুলি অবশ্য শুনতে খুবই ভাল লাগে। "ভুলি কেমনে আজো যে মনে" গানটির ব্যবহারও সুন্দর। ছবির ফটোগ্রাফি চমৎকার। কৃষ্ণ চক্রবর্তী এজন্য তারিফ পাবেন প্রচুর। অরবিন্দ ভট্টাচার্যের সম্পাদনাও ভাল। কোন কোন জায়গায় তিনি আর একটু নির্মম হতে পারতেন। ছবির দু-একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত তা হলে উজ্জ্বলতর হতে পারত। "অসময়"-কে সেখানে পৌঁছে দেবার মত সময় কিন্তু এখনও আছে।

—রবি বসু

মানুষ রতন/নাট্যায়ণ

ওদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই অথচ বিতৃষ্ণা আছে। ওদের সম্পর্কে জানি আরও কম কিন্তু ঘেন্না আছে। ওদের অশালীন ব্যবহার, অনর্গল খিস্তিটাই প্রাত্যহিক ঘটনা, কদাচিৎ কোনো সদাচার হয়তো সংবাদ। আমরা ভদ্রলোক, আর ওদের আমরা ছোটলোক ভাবতেই অভ্যস্ত। কিন্তু মানুষের জীবনে অনুকূল লগ্ন তো প্রতি-নিয়ত আসে না, অভাবিতভাবে আসতে পারে রাজদ্বারে অথবা শ্মশানে। যখন সেই লগ্ন এসে ধীর পায়ে ওই ঘৃণিত রিকশা-ওয়ালাদের এক পবিত্র জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন সাইকেল রিকশার তীক্ষ্ণ ঘণ্টা মন্দিরের ঘণ্টায় রূপান্তরিত। আমরা আবিষ্কার করি নিছক মানুষের আড়ালে মানুষ রতনকে।

মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে নাট্যায়ণের 'মানুষ রতন' নাটক সমকালীন থিয়েটারে একটি ভিন্ন স্বাদের প্রযোজনা। নাট্যায়ণ সমরেশ বসুর এমন একটি জাত গল্পকে বেছে নিয়েছেন, যা হয়ত লোকলক্ষ্মীর কৃপাধন্য হবে না, কিন্তু কিছু লোককে ভাবাবে নিঃসন্দেহে। সেখানেই তাঁদের শিল্প সাফল্য।

নাট্যকার-নির্দেশক অনিল দে-র সযত্ন নিষ্ঠায় এ-নাটকের অভিনয় ও আঙ্গিক পরমাত্মীয় (আলো : শান্তি দে, আবহ : দেবাশিস দাশগুপ্ত)। ঘটনাক্রমের সঙ্গেই কোন সময় প্রেক্ষাগৃহে হাসির উচ্ছ্বাস, কখনও ক্লান্ত সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের সঙ্গে স্তিমিত আলোয় ছায়াস্তূপের মত অবসন্ন মানুষগুলির জন্য অজান্তে দীর্ঘশ্বাস, আবার কখনও বা উত্তেজিত চরিত্রের রুদ্র-রূপে দর্শকও অংশীদার। সব কিছুই স্বাভাবিক—স্টেশনের গোলমালে চাঁদা চাওয়া থেকে গণেশের প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন পর্যন্ত।

অভিনয়ে প্রত্যেকেই চরিত্রানুগ। যদিও রিকশাওয়ালাদের মধ্যে সুপান্থ ভট্টাচার্যের দাপট, অনিল দের স্বাভাবিক নৈপুণ্য, সোম দাশগুপ্তের অনবদ্য চরিত্রায়ণের পাশাপাশি সন্দীপ দে ও অরুণ দাস কিছুটা নিষ্প্রভ। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সুব্রত ঘোষ, গীতেশ চক্রবর্তী, রথীন ভট্টাচার্য যতটা স্বচ্ছন্দ অরূপ ঘোষ, বরুণ মুখার্জী ততটা ব্যালান্সড নন। নাটকে স্ত্রী চরিত্র একটাই। মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তা সেই অনন্য সৃষ্টিকে সজীব করে তুলেছেন। এই গোষ্ঠীর সকলেই তারস্বরে কথা বলেন, ফলে অনেক সময় সংলাপ অস্পষ্ট হয়, যথার্থ মেজাজও আনতে পারে না। নাটকের প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধ বেশ কিছুটা শ্লথ। দ্বিতীয়ার্ধে গল্পের সংঘাত না থাকলেও একই দুঃখের পুনরাবৃত্তি নাটকের গতি ব্যাহত করে। তাই যথেষ্ট পরিশ্রম সত্ত্বেও, গঙ্গার ছলছল ঢেউ যখন স্টীমারের ভোঁ-এর সঙ্গে উত্তাল হয়, তখন দর্শক কিছুটা ক্লান্ত, প্রথমার্ধের মত ততটা অংশীদার নয়। শব্দপ্রক্ষেপণ অনেক জায়গায় শ্রুতিকটু। শ্মশানের গাছগুলি বড় সাজানো, প্ল্যাটফর্মের বাইরে যে অংশে ঘটনা ঘটছে সেখান থেকে একই সঙ্গে রেলওয়ে বিজ্ঞাপন, ঘুঁটে মারা দেওয়াল, রেলিং, সিগন্যাল সব কিছু দেখা সম্ভব কি? এ সব ত্রুটিগুলির উল্লেখ শুধুমাত্র একটি সুপ্রযোজিত নাটক আরও উজ্জ্বল-তর দেখবার জন্য কিংবা এ হয়তো সেই বহুশ্রুত বিদগ্ধ ভনিতা 'ভালো হতো আরো ভাল হলে'। নাটকের শেষ দিকে, চিতার আগুনের সঙ্গে, নৌকার মাঝির ডাক প্রতিধ্বনিত হয় 'তিন বাও মেলে না, চার বাও মেলে না'। মানুষের অতলান্ত মনের হদিশ কখনও কোন দিন মিলবে কি? এই অনুভবটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে সত্য হয়ে থাকে।

সংশোধন—৩১ জুলাই সংখ্যায় 'মেরা জীবন'এর সমালোচনায় ভুলবশত নায়কের নাম অম্বিকা জোহর ছাপা হয়েছে। নায়ক চরিত্রাভিনেতার নাম দুষ্মন্ত।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাপ্পাদিত্য রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩
২৩-৮৫৪৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

১৯৩১ পর্যন্ত ভারতীয় বাল্ব শিল্পের অন্ধকারময় যুগ।

১৯৩২ এ বেঙ্গল ল্যাম্প প্রথম দিশী বাল্ব তৈরী করে। অন্ধকারে আলো-জ্বলে। একটি নোতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষে।

১৯৩২ সাল পর্যন্ত আমরা যত বাল্ব ব্যবহার করেছি তার প্রত্যেকটি বিদেশে তৈরী, আমদানি করা। তখনকার দিনে পৃথিবীর বড় বড় বাল্ব প্রস্তুতকারকদের জাঁকিয়ে-বসা বাজারে কোন একটি নোতুন দেশী উৎসাহী সংস্থার অনুপ্রবেশ প্রায় আত্মহননেরই সামিল ছিল।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বেঙ্গল ল্যাম্পের পত্তন। পরিমিতভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু হল জি.এল.এস.বাল্ব তৈরী করা। এবং সেই হল ভারতীয় বালব শিল্পের উদয় লগ্ন।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে বেঙ্গল ল্যাম্প আজ তার সর্বাধুনিক ও সুসজ্জিত দুটি কারখানায় সুদূর প্রসারিত প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাপক হারে উৎপাদন করে চলেছে বাল্ব, ফ্লুওরেসেন্ট টিউব এবং আনুসঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম।

এই বায়। সবচেয়ে উৎসাহজনক ঘটনা হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রযুক্তি কৌশল নিয়ে বেঙ্গল ল্যাম্প বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যমে কাজে নেমেছে।

ভারতে প্রথম বাল্ব প্রস্তুতকারক সংস্থা বেঙ্গল ল্যাম্প তার সমগ্র কর্মশক্তি নিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধিকে জোরদার করতে আজ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। মূলমন্ত্র তার আত্মপ্রত্যয়।

দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা ● বাঙ্গালোর

REGD. NO. WB/CC/1**/74

মশলা
প নতুন সাজে
সানরাইজ
সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬, পাথুরীয়াঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মজয়ন্তী

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভূতিভূষণের জন্মদিন উপলক্ষে বিভূতিভূষণের নিম্নলিখিত বইগুলি ও বিভূতি রচনাবলী খুচরা বা সম্পূর্ণ সেট সাধারণ ক্রেতাদের বিশেষ কমিশনে দেওয়া যাইবে। ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ খণ্ড এখন ছাপা আছে—মোট মূল্য ২৩৫্। এই কয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সেট লইলে সাধারণ ক্রেতারা ১৮৮্ টাকায় পাইবেন। এজেণ্ট বন্ধুগণ কাউণ্টার হইতে লইলে প্রাপ্য কমিশনের উপর অতিরিক্ত ৫% কমিশন পাইবেন।

পথের পাঁচালী ১২্ ঐ (পেপার ব্যাক) ৭্ অপরাজিত ১৫্ আরণ্যক ১৫্ ঐ (পেপার ব্যাক) ৭্ কুশল পাহাড়ী ৫্ দেবযান ১০্ দুই বাড়ি ৭্ মেঘমল্লার ৭্ শ্রেষ্ঠ গল্প ১২্ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪্ দৃষ্টি প্রদীপ ৮্ অনুবর্তন ১২্ ইছামতী ১৮্ ঐ (পেপার ব্যাক) ৮্ অশনি সংকেত ১০্ অথৈজল ৯্ অরণ্য মর্মর ৭॥ হীরা মাণিক জ্বলে ৫্ আরো একটি ২্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সাহিত্যজীবনের মহত্তম গ্রন্থ

গ্রাম কীর্তিহাটের পটভূমিকায় কর্ণওয়ালিসের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আমল থেকে একালের জমিদারী উচ্ছেদ বিলের কাল পর্যন্ত এক জমিদার বংশের উত্থানপতন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কামনা-বিলাসের ইতিহাস এই গ্রন্থ। ইতিহাস বললেও সব বলা হয় না, কারণ চরিত্রগুলি লেখনীর ক্ষমতাগুণে যেন সজীব রক্তমাংসের নর-নারী। ছ-সাত পুরুষের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। সেই দিক দিয়ে দেখলেও এই গ্রন্থটির মূল্য অনেকখানি।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে-৩০্

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নতুন উপন্যাস

রজনীশেষের শেষ তারা ৭্

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন উপন্যাস

রেসকোর্স ৯্

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০্

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

হরি যাকে রাখেন ৬্

সন্ন্যাসিনী আশাপুরী লিখিত শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবন কথা

অমর জীবন ১২॥

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ বেরোল। ২০্

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ | ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১ | ৩৪-৮৭৯১

(সি ৩৭৬৩৩)

সূচীপত্র

আপনার যখন ঘাম হয়, ঘামাচি চিড়বিড়িয়ে ওঠে–

দারুণ কাজ করে, আপনাকে চটপট আরাম দেয়

অতিরিক্ত ঘাম হওয়া নিবারণ করে
অতিরিক্ত ঘাম থেকে ঘামাচি হয়। নাইসিল শুরু থেকেই তা বন্ধ করে।

সাধারণ ঘাম শুষে নেয়
ঘামে ময়লা জমে জীবাণু জন্মায়। কোনো ক্ষতি হবার আগেই নাইসিল ঘাম শুষে নেয়।

জীবাণু নষ্ট করে
নাইসিল হল ঘামাচি মারবার একমাত্র পাউডার যাতে আছে ক্লোরফেনেসিন–জীবাণু আর ছত্রাক নাশ করবার সবচেয়ে কার্য্যকরী উপাদান! আপনাকে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণু আর ঘামাচির কবল থেকে রক্ষা করে।

জ্বালা থেকে আরাম দেয়
নাইসিল আপনাকে চুলকানি, জ্বালা আর অস্বস্তি থেকে সত্যি চট করে ঠাণ্ডা আরাম দেয়। আপনি ঘামাচি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষার সঙ্গে পান—এতো সব!

একমাত্র নাইসিলই ঘামাচির সঙ্গে লড়তে পারে সক্রিয়ভাবে, প্রতিপদে! হাতের কাছে নাইসিল রাখুন। সবচেয়ে সেরা জিনিষ বলেই এর বিক্রী সবচেয়ে বেশী!

নাইসিল* [illegible]র তৈরী

*ট্রেডমার্ক

নাইসিল-ভারতের ১লা নম্বরের ঘামাচি মারবার পাউডার

GN-76-413-BN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

স্যাটিন চিকন
রেশম কোমল
অনুভূতি
আপনাকে দেয়
স্যাটিন ডল
শ্যাম্পু
আপনার চুলকে মৃদু অথচ পুরোপুরিভাবে পরিষ্কার করবে
এর ঘন কোমল উপকারী ফেনা দিয়ে আপনি চট করে চুলের সমস্ত ময়লা আর অতিরিক্ত তেল
বার করে দিতে পারবেন,—চুলের কোনো ক্ষতি না করেই। কারণ, চুলের একান্ত প্রয়োজনীয়
স্বাভাবিক তেল বজায় রেখে চুল পরিষ্কার আর সুন্দর করে তোলার জন্যে স্যাটিন ডল বিশেষ ফর্মুলায়
তৈরী। আপনার চুলে জাগাবে অপূর্ব অনুভূতি ...স্পর্শে কোমল, ঘ্রাণে সুরভিময়ী, দর্শনে চিকন...
স্বাস্থ্যে ঝলমল! আপনার রূপ হবে অপরূপ...যা দেখে আপনার তিনি চঞ্চল হয়ে উঠবেন!
স্যাটিন ডল
চিকন নির্মল চুলের জন্যে বহুগুণের শ্যাম্পু!
satin doll
SHAMPOO
FOR LOVELY HAIR
everest/425/ACW-bn

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ মীরা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "হিংসা" (ধাতু নির্মিত ১৮"×২৪" মূর্তি ওজন ১০ কেজী)। বৃহৎ যুদ্ধ থেকে খুনখারাপী পর্যন্ত সবই অমানুষী—এই কথা বলতে চেয়েছেন। একজনকে পেড়ে ফেলে খুন করা হচ্ছে। কারো মুখ বা ব্যক্তিত্ব নেই। সমস্তটাই যান্ত্রিক ব্যাপার। চেপ্টে, দুমড়ে, লম্বা করে সমস্ত ব্যাপারটার পৈশাচিক দিকটা দেখিয়েছেন। ঢালাইয়ের পদ্ধতি লোক প্রচল ও গ্রামীণ কিন্তু এর নবায়ণ ও প্রয়োগ এবং মানসিকতা যে সমসাময়িক একজন শিল্পীর এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪৩ সংখ্যা
শনিবার ৫ ভাদ্র ১৩৮৩

সাংস্কৃতিক সম্বল, গ্রন্থাগার

সার্থক গ্রন্থাগার অবশ্যই গ্রন্থসমূহের নিতান্ত একটি আগার নয়। গ্রন্থাগার বস্তুত সাংস্কৃতিক জীবনের নানান অনুশীলনের একটি সার্থক আশ্রয়। স্থানীয় জনজীবনের সাংস্কৃতিক প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিস্ফূর্তি সহজে সম্ভব করতে পারে যে, সে হলো স্থানীয় একটি গ্রন্থাগার। সদ্‌গ্রন্থ যদি জনসমাজের অভ্যর্থনা না পায়, তবে বুঝতে হয় যে সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বস্তুত নিরর্থক অথচ চমৎকার জঞ্জাল ছাড়া আর-কিছু নয়। অনুরূপ যুক্তির অন্য একটি বাস্তব সত্যের কথাও এই যে, অজস্র নিকৃষ্ট গ্রন্থের সমাবেশ আর-এক রকমের জঞ্জাল।

এরপর প্রশ্ন এসে পড়ে: আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের ভাগ্যগত অবস্থার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কি সরকারের পক্ষে একবার সম্যক অনুসন্ধান করে দেখবার ও বুঝবার কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়ে সম্মুখে এসে পড়েনি? যেক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করবার কথা, সেক্ষেত্রে এই দুঃখকর দৃশ্য দেখে বিষণ্ণ হতে হয় যে, গ্রন্থাগারগুলির প্রাণশক্তি যেন স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। একটি সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যের পাঁচ হাজার গ্রন্থাগারের প্রায় অর্ধেক ভাগের সকলেই বস্তুত নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। খাস সরকারী উদ্যোগের সৃষ্টি সাত শত গ্রন্থাগারের অবস্থাও খুব সুস্থ এবং প্রাণ খুব সজীব নয়। স্কুল এবং কলেজগুলির গ্রন্থাগারও মোটেই সুপরিচালিত নয় বলে যে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে; সেটা নতুনতর কোন অভিযোগ অবশ্য নয়।

অথচ গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করবার কর্তব্যে সরকারের নীতিতে ও আচরণে কোন কৃপণতা আছে বলে অভিযোগের মুখরতা যেমন-কিছু প্রবল নয়। মোটের উপর সব দিকের তথ্য লক্ষ্য করে এমন সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, গ্রন্থাগারের সাহায্যের জন্য সরকার যে-পরিমাণের অর্থব্যয় করছেন, সেটা যথোচিত সুফলপ্রসূ হয়নি, হচ্ছেও না। এর কারণ কী? একটি কারণ নয়, এক-দুটি কারণও নয়। অনেক কারণ সমন্বিত ও সম্মিলিত হয়ে দেশের গ্রন্থাগারগুলির ভাগ্যসংকট ঘনিয়ে তুলেছে। কোন-কোন গ্রন্থাগার যেমন যথোচিত প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণ সাহায্যের কারণে শীর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য হয়, তেমনই আবার যথোচিত সাহায্যিক অর্থের অসার্থক ব্যয়ের কারণে কোন-কোন গ্রন্থাগার কার্যত নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। দুই অবস্থাই খুব করুণ এক অসতর্কতার সত্যতা বিজ্ঞাপিত করছে। অনেক গ্রন্থাগার নিজের দোষের অথবা ভুলের প্রকোপে পড়ে; কেউ-কেউ আবার বিনা দোষে পীড়িত হয়।

মরুভূমির নিভৃতে প্রাচীন আসিরীয় সভ্যতার এক ধ্বংসস্তূপ থেকে সন্ধিৎসু পুরাতাত্ত্বিক তিনহাজার বছর আগের যে গ্রন্থাগার আবিষ্কার করেন, নৃপতি আসুরবানিপালের সেই গ্রন্থাগারে হাজার-হাজার মৃৎফলকের উপর উৎকীর্ণ প্রাচীন আসিরীয় জীবনের শত-শত বিচিত্র তথ্য ও ইতিবৃত্ত তিনহাজার বৎসরের মৌন ভঙ্গ করে আবার মুখর হতে পেরেছে, এবং মানুষের সাংস্কৃতিক আগ্রহের একটি মৌল অনুশীলনের পরিচয় প্রকাশ করেছে। সেই অনুশীলন হলো, গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা। বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা এই যে, গ্রন্থাগার না থাকলে জ্ঞান বিদ্যা ও আনন্দ সাধারণ জনজীবনের অধিগত হতে পারে না। সুতরাং বলা চলে যে, গ্রন্থেরও সার্থক সৌভাগ্য হলো গ্রন্থাগারে আশ্রিত হওয়া।

সমালোচনা ও অভিযোগের অভাব নেই যেটা সঙ্গত প্রতিবাদেরই একটি সরব অভিব্যক্তি। রামমোহন ফাউণ্ডেশন নাম নিয়ে যে সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে, তার গৃহীত বিহিত ও প্রস্তাবিত সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তার ব্যবহারিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখা যাচ্ছে। যে বইয়ের দাম চার টাকার বেশি হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়; সেই বই এই ফাউণ্ডেশনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ষোল টাকা দামে চিহ্নিত হয়ে গ্রন্থাগারের কাছে এসে পৌঁছেছে, এহেন অভিযোগের গূঢ়ার্থ বেশ বড় রকমের কোন গর্হিত রীতির সত্যতা ব্যক্ত করে কি না, সেটা অনুসন্ধান করে দেখবার কর্তব্য সরকারের পক্ষে অস্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগারগুলির জন্য বই কেনবার এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সেই বই প্রেরণ করবার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে জেলা অফিসার নিযুক্ত আছেন। ক্রয়ের জন্য বই নির্বাচন করবার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবার যোগ্যতা জেলা অফিসারদের আছে কি না, এবং অনুরূপ সাংস্কৃতিক বিচার-বিবেচনার সম্বল তাঁদের আছে কি না, ইত্যাকার প্রশ্নও প্রচলিত অভিযোগের মধ্যে নিহিত আছে। সরকারের পক্ষে একবার অনুসন্ধান করে নিশ্চিন্ত তথা নিঃসংশয় হবার প্রয়োজন আছে যে, প্রচলিত রীতি-নীতি ব্যবস্থার মধ্যে কোন কায়েমী স্বার্থের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে কিংবা হতে চলেছে কি না। এমন অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট তথ্যসম্মত প্রমাণ আছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, বই কেনবার ব্যাপারে জেলা অফিসারদের এবং তথাকথিত কমিটীর বিচার-বিবেচনার মধ্যে নানা রকমের অপরিচ্ছন্নতার প্রকোপ দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের বিচারে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের বই বলে বিবেচিত হবে, এমন বই যদি বেশী করে ক্রীত ও গ্রন্থাগারের কাছে প্রেরিত হতে থাকে, তবে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থপাঠক উভয়েরই ক্ষতি করা হয়। গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক মর্যাদাও অবনত করা হয়। বিভিন্ন অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে জনমতের বিভিন্ন মহলের ধারণার কথা সরকারের শ্রুতিগোচর অবশ্যই হয়েছে বলে মনে করা যায়। পুস্তক ক্রয়ের ও বিতরণের কর্তব্যে সরকারকে যেমন সতর্ক হতে হবে, তেমনই সুবিচারকও হতে হবে, যেন উৎকৃষ্ট মানের বই প্রত্যাখ্যাত হবার এবং নিকৃষ্ট মানের বই সমাদৃত হবার কোন সুযোগ না পায়। জেলা অফিসারদের একক বিচার-বিবেচনার উপর কর্তব্যের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ রকমে ছেড়ে দেওয়া উচিত তো নয়ই অধিকন্তু তথাকথিত কমিটীগুলির সংগঠনও পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে যদি কমিটী গঠিত হয় তবে বিশিষ্ট গুণী শিল্পী সাহিত্যিক এবং শিক্ষকদের নিয়ে সংগঠিত হওয়া উচিত। এ হেন যোগ্য কমিটীর অভিমত অনুযায়ী জেলা অফিসারেরা বই কেনবার কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারেন। এই ব্যবস্থাই শুভদায়ক হবে বলে মনে হয়।

শার্দুল বিক্রীড়িত

বাঘকে আমি শিশুকাল থেকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করেছি। সেই সন্তান খেলা দেখাতে উঠে আমার কথা তো শুনলই না, উপরন্তু আমাকে আক্রমণ করতে ছুটে এল! সকলের সামনে এতখানি বেইজ্জত হবার পর আর কি করে বেঁচে থাকি আমি?

এই কথাগুলি এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে একজন ভারতীয় খেলোয়াড় (রামচন্দ্রন?) আত্মহত্যা করেছেন। তিনি গিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ায় সার্কাস দেখাতে। চিরকুটটুকু ইন্দোনেশীয় পুলিস উদ্ধার করেছে তাঁর পকেট থেকে। আপনারা হয়তো ভাবছেন, বাঘ তাঁর ছেলের নাম এবং ক্রীড়ামঞ্চে ছেলের অবাধ্যতায় হতমান হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু না, এ বাঘ সত্যিই বাঘ, অর্থাৎ টাইগার।

প্রভূত কোশিস কসরত করে ভদ্রলোক শিশু বাঘকে মানুষ, তার মানে সাবালক করেছিলেন, শিখিয়েছিলেন রকমারি খেলার কায়দা কৌশল। অপত্যস্নেহে প্রতিপালিত সেই বাঘের ওপর ভরসা করেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি, মোটা রকম কিছু কামানোর আশায়। কিন্তু তাঁর সাধে বাদ সাধল বাঘ, যথাকালে অনিচ্ছুক একগুঁয়েমি করে। অনিবার্যভাবেই তাঁর হল অভিমান এবং অভিমানে মানুষ অনেক কিছুই করে। তিনি করেছেন আত্মনাশ।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, খাইয়ে পরিয়ে এবং লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা মানবপুত্রই যেখানে বাপের কথা গেরাহ্যি করে না, বাবা ডাক্তারি পড়তে বললে পড়ে ওকালতি, কমলাকে বিয়ে করতে বললে করে রমলাকে, সেখানে বাঘপুত্র নতশিরে পিতৃ আজ্ঞা পালন করবে, ভদ্রলোক এটা আশা করেছিলেন কি করে? নিজের নাম রামচন্দ্র বলেই বোধ হয় পিতৃসত্য পালনটা অলঙ্ঘ্য মনে হয়েছিল তাঁর!

অবশ্য তাঁর নাম সত্যিই রামচন্দ্র কি না খবরে তার সঠিক নির্দেশ নেই। না থাকুক, আমি তাঁর অভিমানে কিন্তু অবাক হইনি। ভালবাসার গভীরতায় যেখানে চেতন-অচেতনেরই ভেদ থাকে না (মেঘদূত দ্রষ্টব্য) সেখানে বাঘে-মানুষে তফাত থাকবে কেন? দিনের পর দিন কোলে-পিঠে করে লালন করতে করতে বাঘের বাঘত্ব কবেই মুছে গেছে তাঁর মন থেকে। সে হয়ে গেছে প্রতিদিনের দোসর, অতএব তাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রভূত প্রত্যাশা এবং সেটাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে দুঃখের কারণ।

কেন জানেন? ভদ্রলোক তাকে অজ্ঞাতসারেই মানুষ বানিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু বাঘের বক্তব্যটা কি, তা তো শোনা হয়নি। সে হয়তো অসহায় শৈশবে মায়ের কোলছাড়া হয়ে মানুষের হস্তদত্ত বোতলের দুধ ও মাংসের সুরুয়া খেয়ে বড় হয়েছে এবং রিং মাস্টারের বৈদ্যুতিক চাবুকে কাবু হয়ে ট্রাপিজের ফিগারও রপ্ত করেছে। কিন্তু সত্তার গভীরে হয়তো তার ব্যাঘ্রত্ব অনড়ই আছে। হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে হয়তো তা, ইন্দোনেশিয়ার এরিনায় দাঁড়িয়ে।

মানুষের যে এমনটা হয় এ তো আমরা হামেশাই দেখি। যেমন ধরুন, ভৃত্যকে পাঁচবার চোখ রাঙালে সে তা নীরবে পরিপাক করে, কিন্তু ছ'বারের বার রুখে দাঁড়ায়, নয়তো চোখা উত্তর দেয়। এটা হয় কিন্তু জীবজন্তুরও। একবার রাত্রির ট্রামে দক্ষিণ কলকাতায় ফিরছি। সঙ্গে আছেন প্রথিত বন্ধু অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী। দুজনে গল্পগুজব করছি। হঠাৎ ট্রামের গতি রুদ্ধ হল চৌরঙ্গী-সার্কুলার রোডের মুখে এসে।

ব্যাপাব কি? একটা ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপেছে। গাড়িসুদ্ধ কোচম্যানকে সে উল্টে ফেলে দেবার উপক্রম করেছে। আসলে রাত্রি দশটায় তার আস্তাবলে ফেরার সময়। আস্তাবল ভবানীপুর জগুবাজার পেরিয়ে। কিন্তু তখনো তাকে ফের ধর্মতলার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে, যা সে কিছুতেই যাবে না। প্রচণ্ড চাবকাচ্ছেন তাকে কোচম্যান, কিন্তু না, সে যাবেই না!

অধ্যাপক চক্রবর্তী ট্রাম থেকে নেমে এসে ঘোড়ার মালিককে বললেন, কাহে মারতা হ্যায় ভাই? বুঝতে পারতা নেই, ঘোড়া একঠো মেশিন নেহি, জ্যান্ত জানোয়ার হ্যায়, উসকা পার্সন্যালিটি হ্যায়। কোচম্যান কি বুঝলেন তা তিনিই জানেন। চৌরঙ্গীর আশা ছেড়ে তিনি চক্রবেড়ের দিকেই গাড়ি হাঁকালেন। বিদ্রোহী ঘোড়াও লাফ ঝাঁপ বন্ধ করে আস্তানার দিকে দৌড় লাগাল!

এই যে পার্সন্যালিটি অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব-বোধ, এ শুধু ঘোড়ার নয়, আছে ছোট বড় সব জন্তুরই। বিশেষ করে আছে বাঘের, কুকুরের, হাতীর। সেই পার্সন্যালিটির আকস্মিক জাগরণ বাঘটির হয়েছিল হয়তো রামচন্দ্রন বলে বিবেচিত ঐ খেলোয়াড়ের চাবুক পিঠে পড়ামাত্র। তার মনে হয়েছিল, না, কিছুতেই আমি আর এই চাকরের ভাত খাব না! ভারতবর্ষে সিংহকে গদীচ্যুত করে সিংহাসনারূঢ় হয়েছে যে বাঘ, আমি সেই রাজকুলের সন্তান। ক্ষুদ্র মানুষ, যে আমার খাদ্য ছাড়া কিছু নয়, তার নির্দেশে ওঠবস করব আমি!? নেভার, নেভার!

ফলে হয়েছে দু তরফেই ব্যক্তিত্বের সংঘাত। রামচন্দ্রন যেহেতু মানুষ, তাই তিনি আত্মহত্যার রাস্তাটা বেছে নিয়েছেন। ওটা তো জানা নেই জন্তুদের। কিন্তু না, তাও তো আছে। হরিণ ও হনুমান দু-একটা এক এক সময় দল থেকে আলাদা হয়ে একা থাকে এবং না খেয়ে না খেয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুবরণ করে কেন? কেন খাদের মুখে এসে পিছু হটতে হটতে হাতী বা গণ্ডার স্বেচ্ছায় অতলে পড়ে আত্মনাশ করে? চড়ায় ঝাঁক বেঁধে এসে তিমিরা খাবি খায়, বেশী জলে ঠেলে দিলে আবার চলে আসে এবং শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস হয়ে মারা পড়ে? প্রাণীবিজ্ঞান বলে, এটা নাকি সহজাত মৃত্যুপ্রবণতা এবং এটা আছে সব প্রাণীরই।

মানুষের তো আছেই। সেইজন্যেই হরিবিষ্ণু কামাথ গণপরিষদে মৌলিক অধিকারগুলির অন্যতম হিসাবে আত্মহত্যার অধিকার দাবি করেছিলেন। অবশ্য টেকেনি দাবিটা বিতর্কের মুখে। কিন্তু প্রস্তাবটা তাঁর প্রণিধানের অযোগ্য ছিল না। মৃত ভদ্রলোকটিকে তাই আপনারা ভাবপ্রবণ বা অস্থিরমতি যা খুশি ভাবুন, আমি কিন্তু ষোল আনা স্বাভাবিক মানুষ মনে করছি। দার্শনিক কেদার বসু বলতেন, প্রভু মোহম্মদকে প্রণাম, তাঁর পুণ্য নাম নিয়ে কৌতুক করছি না। কিন্তু দেখলাম, মোহ আর মদ মানুষের চিরসঙ্গী। এ দুইয়ের কোনটার একটু এদিক ওদিক হলেই কে কখন কি করে বসবেন, তার কি ঠিকঠিকানা আছে?

কথাটা যে কত সত্যি, তার প্রমাণ রেখে গেছেন স্বয়ং কেদারবাবুই। অধ্যাপনা থেকে অবসর পাবার পর তাঁর কাছে এক তরুণী আসেন অস্তিত্ববাদ নিয়ে গবেষণা করতে। গবেষণা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল জানি না, কিন্তু উনষাট বছরের বিপত্নীক কেদারবাবু এই তরুণীকে বিবাহ করে বসলেন এক দিন। তারপরই আগে জ্যেষ্ঠ তারপর কনিষ্ঠ পুত্র বাড়ি ছাড়লেন। শেষে ছাড়লেন খোদ কেদারবাবুই। বোধ হয় ছাড়ার মত ব্যাপার ঘটেছিল কিছু। তারপর? তারপর আর হদিস মেলে নি তাঁর। জানি না নিরুদ্দেশ হলেন, না রামচন্দ্রনের রাস্তা ধরলেন!

সুদর্শন গুপ্ত

বৈদেশিকী

সঙ্গী বিহীন

এ বছরের নির্বাচনে কোনো দলের হাতেই ক্ষমতার চাবিকাঠি তুলে দেয়নি ইতালির ভোটাররা। তাতে অবিশ্যি নতুনত্ব কিছু নেই। ও দেশে ও রকম হওয়াই রেওয়াজ। নিজের দলের ভোটের জোরে সরকার গড়ার আশা জিইয়ে রাখার সাধ্যি কারুরই হয় না। আবার এও রেওয়াজ যে শেষ পর্যন্ত গুটি গুটি প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসেন গিয়ে খৃীস্টান ডেমোক্র্যাট দলের কেউ। আরও গোটাকতক দলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটরা মন্ত্রিসভা গড়ে। যখনই শরিকদের কারুর সঙ্গে ভাব চটে যায় সে তখনই জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মন্ত্রিসভা-প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা দেন। খোঁজ চলে নতুন জুটির। তার পাত্তা মিললে আবার মন্ত্রিসভা গড়া হয় নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়ে। পুরোনোর ফিরে আসতেও বাধা নেই। একই লোকের মন্ত্রিসভা ভেঙে নতুন করে গড়ার বিস্তর নজির আছে ইতালিতে। একই তাস বারবার ভাঁজা ইতালির রাজনীতিতে এক মজার খেলা।

তবে এবারও সব ঠিক আগের মতোই আছে এমন কথা বলা যাচ্ছে না। যে অনিশ্চিত অবস্থা দূর করার জন্যে অকালে নির্বাচন হয়েছিল তা যেমন ছিল তেমনই আছে। খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার সাধ্য কোনও দলের হয় নি। এবারও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সাবেক রেওয়াজ বজায় রেখে খৃীস্টান ডেমোক্র্যাট দলের গিউলিও আন্দ্রেওত্তি। সংসদে ভোটাভুটির পয়লা বেড়াও তিনি ডিঙিয়েছেন। সেনেট কিংবা চেম্বার অব ডেপুটিজ কোথাও তাঁর মন্ত্রিসভার ওপর আস্থা জানাবার দাবি নামঞ্জুর হয় নি। যদ্দিন না সংসদের অধিকাংশ সদস্য জোট বেঁধে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন তদ্দিন তিনি আর তাঁর মন্ত্রিসভা টিঁকে যাবেন। খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটরা সংসদের দুটো সভাতেই পয়লা দল হলেও কোনোটাতেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাতে অবিশ্যি কিছু এসে যাচ্ছে না। তাদের চেয়ে বেশী ভোট কিংবা আসন তো এবার কোনো দল পায় নি কম্যুনিস্টরাও নয়। দুই কাতলা বলতে এই দুটো দল। বাদবাকী সব চুনোপুঁটি।

বেশ একটু তফাত কিন্তু এবার হয়েছে। মন্ত্রিসভায় একটি মাত্তর দল ঠাঁই পেয়েছে, অন্য কোনও দলের সঙ্গে হাত মেলায় নি খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটরা। তবুও যে সংসদে ভোটাভুটিতে তারা হারে নি তার কারণ হচ্ছে বিরোধীরা এক কাট্টা হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নি। সেনেটে কিংবা চেম্বার অব ডেপুটিজে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে তাকে পুরোপুরি আস্থা প্রস্তাব বলা চলে না। তোমাদেরই চাই বিরোধীরা এ কথা না বললেও তোমাদের চাই না এ কথাও স্পষ্ট করে বলে নি। বললে কিন্তু খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের সাজানো বাগান এক লহমায় শুকিয়ে যাবে। তারা সে কথা বলবে কিনা তা নির্ভর করছে কম্যুনিস্টদের মর্জির ওপর। তারা যাও বললেই খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের দিন ঘনিয়ে আসবে। তারা একা বললেই অবিশ্যি মন্ত্রিসভায় মেয়াদ ফুরবে না। অন্য সব দল যদি খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের মদত দেয় তা হলে কম্যুনিস্টরা বেঁকে বসলেও সরকার টিঁকে যাবে, তাকে হটানো যাবে না। তা হওয়া একরকম অসম্ভব।

সাধ করে প্রধানমন্ত্রী একলা চলতে রাজী হননি। খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটরা ঘোর কম্যুনিস্ট বিরোধী—কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়েই এদ্দিন তারা নিজেদের পশার বজায় রেখেছে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত সে জুজুর ভয় ইতালিতে কেটে যাচ্ছে। কম্যুনিস্টদের দলীয় সংগঠন খুবই মজবুত। কোনো দলাদলির বালাই তাদের মধ্যে নেই। ওদিকে খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অন্তত গোটা পাঁচেক উপদল। দল যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি এই তাদের ভাগ্যি। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের সব দেশেই চাল পালটেছে কম্যুনিস্টরা। তারা সাফ বুঝেছে দেশে দেশে বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখার কোনো মানে নেই। দশ মণ তেল পুড়বে না রাধাও নাচবে না। কস্মিনকালেও তাদের ক্ষমতা পাবার আশা নেই। বরঞ্চ অন্যদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারলে একটা প্রগতিশীল বামপন্থী পাঁচমেশেলী মন্ত্রিসভা গড়ে তোলা সম্ভব। সেই চেষ্টাই করছে কম্যুনিস্টরা পশ্চিম ইউরোপে মস্কোর তাঁবেদারি ছেড়ে দিয়ে। তারা যে কী চায় তা খোলসা করেই বলেছে পূর্ব বার্লিনে কম্যুনিস্টদের জমায়েতে।

ইতালির কম্যুনিস্ট দলের প্রাণপুরুষ এনরিকো বেরলিংগুয়েরে অনেক দিন ধরেই বলে আসছেন ইতালিতে একদলীয় শাসন কম্যুনিস্টরা চায় না—তারা চায় অনেক দলের শাসন যা হয়ে থাকে সব গণতন্ত্রী দেশে। ইতালি ইউরোপের বারোয়ারি বাজার ছেড়ে দিক কিংবা নাটো থেকে বেরিয়ে আসুক এ দাবি তারা তোলেনি। তারা চাইছে দেশের স্বার্থে নাটো আর ইউরোপের বারোয়ারি বাজারের সঙ্গে ইতালির সম্পর্ক অটুট থাকুক। শুধু তাই নয় তারা এও বলেছে খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটরা অচ্ছুৎ নয়, বুর্জোয়া পার্টি বলে ওদের তারা আর ঘেন্না করে না যদিও ওদের দুর্নীতিবাজ নেতাদের হটিয়ে দেবার জন্যে কম্যুনিস্টরা জোর প্রচার চালাচ্ছে। তাদের রকমসকম দেখে খানিকটা নরম হয়েছেন খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের নেতারাও। কিন্তু আপস করতে তাঁরা এখনও নারাজ। তার ওপর জট পাকিয়েছে পশ্চিমী দেশগুলো যারা নাটোর চাঁই। নির্বাচনের আগেই হুমকি দিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্র সচিব ডঃ কিসিংগার এই বলে যে, কম্যুনিস্টরা জিতলে পশ্চিমীরা একঘরে করবে ইতালিকে—এক পয়সা তাকে সাহায্য দেবে না তা হলে। সে কথা অবিশ্যি কানে তোলেনি ইতালির মানুষ।

ভোটারদের রায় দেখে আরও চটেছেন পশ্চিমী দিকপালরা। জুনের শেষ হপ্তায় পুয়েরটো রিকোতে তাঁদের যে গোপন সলাপরামর্শ হয়েছিল তাতে তাঁরা ঠিক করেছেন কম্যুনিস্টদের যদি ঠাঁই দেওয়া হয় ইতালির নতুন মন্ত্রিসভায় তা হলে তাঁরা টাকাকড়ি দিয়ে আর সাহায্য করবেন না ইতালিকে। সে বৈঠকে ইতালির তখনকার প্রধান মন্ত্রী মোরোও ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পান নি। কেউ জানতেও পারতো না কিছু যদি না হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতেন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট স্মিডট। তা শুনে গোটা ইতালিই ক্ষেপে [illegible]— কম্যুনিস্টরা তো বটেই, খৃীস্টান ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানোর বিরুদ্ধে। তাদের হয়েছে উভয় সংকট—কম্যুনিস্টদের মন্ত্রিসভায় নিলে জাত যায়, না নিলে যায় মান। পশ্চিমী বন্ধুদের আর্থিক সাহায্য না পেলে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবে না ইতালি। আর্থিক অবস্থা দেশের বেজায় খারাপ। তাই সাহস করে নতুন প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেওত্তি তাঁর মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিতে পারেন নি কম্যুনিস্টদের। আর তাদের না নিলে সোস্যালিস্টরাও তাঁর জোটে ভিড়তে রাজী নয়। তারা পণ করেছে যে মন্ত্রিসভায় কম্যুনিস্টদের ঠাঁই নেই তাতে তারা ঢুকবে না। তাই তিনি একলা বাইছেন তাঁর নৌকো। কম্যুনিস্টরাও তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে না গিয়ে। তারা যে দেশের ভালোই চায় নিজেদের ক্ষমতা নয়, এটাই তারা প্রমাণ করতে চাইছে।

দেবরাজ

ওপারের লোকের এপারে আসতে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাড়ি করবো বলে আমি একটুকরো ইট কুড়িয়ে এনে কেনা বিঘৎখানেক
ঘাসজমির উপরে রেখে চিৎকার করে উঠলাম, এই দ্যাখো বাড়ি হলো
তৎক্ষণাৎ বাড়ি মানে আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই দাঁড়িয়ে পড়লো
বারান্দায় ডোরাকাটা রোদ্দুর বা বিকেলের মুখটায় মায়ের সেই গরদের কাপড়
ছড়িয়ে গুটিয়ে যেতে লাগলো মধুর আর নিজের বাড়ির ওপর ঝামরে-পড়া হাওয়া-বাতাসে
রোদ, চাল দেওয়া হলো ছড়িয়ে, বাড়ির কোটো বের হলো সারবন্দী দেবদারুর মতন
অন্যবাড়িতে থাকা রেশম-পশম 'আছে আছে অনেক কিছু আছে' এইরকম দাম্ভিক শব্দে
পতপত করে উড়তে লাগলো। বাসাবাড়িতে ছিলাম বলে পাখি নই আমরা,
মানুষ বটে! মানুষ বলেই ইট পেতেছি ঘাসের ওপর—পা রাখবো বলে, রাখবো বলে
স্থায়ী জয়স্তম্ভ, ছেলেপুলে, স্নাতকশামলায় আলুবকরা ছবি ফোটোগ্রাফ আমার বাঁধিয়ে
আগে থেকে পেরেক কাঁচা দেয়ালে বসবে হিসেবনিকেশ, পরে বসবে না, পরে বসবে
একটিমাত্র, আমি চলে গেলে মেজের ওপর—কাঁটাপেরেকই ভালো, নয়তো বুক
ফেটে যাবে আমার, মরতে-মরতেও একবার চেয়ে দেখবো হয়তো ওই আইন অমান্যকারী হাত
ও কার?
এইভাবে একটি-আধটি করে শব্দের হিম আর তীব্রতাকে জঞ্জালের বাক্সে বন্দী করে
গ্রন্থ একটি, পাতার পর পাতা মিলিয়ে যেন দরজা জানালা কানাকড়ি দক্ষিণপুব হিসেব করতে-করতে
আমি মরতে-মরতে কোনোদিন বেঁচে উঠে এখনো তরুণ কবি, মাইরি, মাথায় শনের নুড়ি
ভাঙা গাল তোবড়া চোয়াল বোয়াল মাছের মতন হাঁ—সামনে টাকার থলি রঙে রঙীন কাগজ
ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এ-দরজা ও-দরজায়—তেষ্টায় ফাটছে ছাতি, যাতে যাতি পারি তার ব্যবস্থা দ্যাকো
কই গো, কে কোথা আছো? দয়া করো—দুপুর থেকেই এই অবশ্য জ্বালাতনে জ্বলেপুড়ে
অদ্ভুত প্রাসাদ বানাবো বলে সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে, রাস্তার ধুলোকালি সর্বাঙ্গে মেখে
মহাদেব আমি ষাঁড়ে চড়ে এদিক-ওদিক, যেদিকে যাবার নয় সেদিকেই...তাকে
মানুষ বলে ভুল করে, ভালোবেসে, মানুষের ভাষায় দুকথা চারকথা শুনিয়ে, তৎক্ষণাৎ
বলে উঠি, আমার একটা বাড়ি আছে, বাড়ি মানে গ্রন্থ, গ্রন্থ মানে পাতার পর পাতা সূক্ষ্ম অংক
মাইরি বলছি, অংকে গোল্লা পেলেও ইংরিজিতে ভালো—আচ্ছা হয়ে যাক কুস্তি
সুস্থির থাকার উপায় নেই, একটা লাইব্রেরির ভেতরে কতো বাড়ি, কতো প্রাসাদ! ভাবতে-ভাবতে
ভাবতে-ভাবতে নেশাটা জল হয়ে কলকল করে বেরিয়ে গেলো...বৃষ্টিতে জুড়োলো কলকাতা
আর অন্ধকারে মদের দোকানের সিঁড়িতে বসে কাদের বাড়ির একটা পাগল ভাগলপুর থেকে আনা
ছাপা বাঁধাই ভালো প্রচ্ছদপট চমৎকার এমনতরো গ্রন্থের পাতাগুলো পানসি করে ভাসাতে থাকলো...
গঙ্গার শহর, ওপারের লোকের এপারে আসতে বড়ই অসুবিধে ॥

তবু — তোমারই স্বপক্ষে

মৃণাল বসুচৌধুরী

প্রচ্ছন্ন উল্লাসে
এতদিন ভারসাম্যহীন সমস্ত ভেঙেছো
খুশিমতো কবিতায়
বদল করেছো শব্দ
অসমসাহসে
বিশ্বাসী জিভের নীচে ফুটিয়ে দিয়েছো কাঁটা
খেলাচ্ছলে তুলেছো শিকড় মাটি

তবু
নির্যাতনে ফুলে ওঠা ঘাড়
ভাঙা হাড় [illegible] ঘা নিয়ে
সর্বত্রক তোমারই স্বপক্ষে আছি

কেননা [illegible] বেশী একাকিত্ব
সারাক্ষণ সক্রিয় বিষাদ

পলাশপুরে পিকনিক

অজিত বাইরী

বাসা-বাড়ি ছেড়ে একদিন উঠে যাবো স্থায়ীভাবে।
নিজস্ব আমাদের ঘর-দোর থাকবে : দক্ষিণে খোলা বারান্দা।
উঠোনের এক কোণে গৃহস্থ নিম কিংবা আমলকি ;
আর বাড়ির সীমানা সংলগ্ন ছোট্ট কিচেন-গার্ডেন।

আমাদের ভালবাসার গৃহে আসবে নতুন আলো বাতাস।
জানলায় রঙিন পর্দা—
চাদ্দিকে ছড়ানো রোদ, চাদ্দিকে ছড়ানো ছায়া।

এবার শীতে সবাই মিলে একদিন, স্থায়ী বাড়ির ঠিকানায়
আমন্ত্রণ জানিয়ে, একসঙ্গে অনেক দূরে পলাশপুরে
পিকনিকে যাবো।

শ্বেতপাথরের টেবিল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
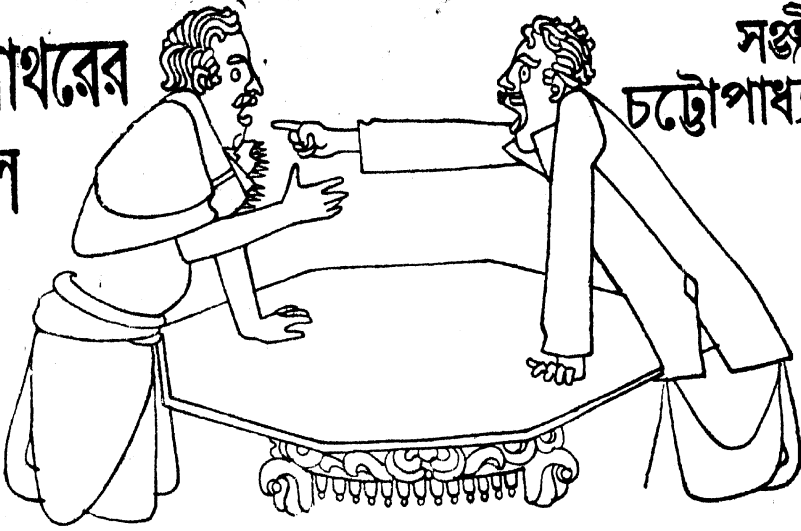
শ্বেতপাথরের টেবিলটা ছিল দোতলায়, দক্ষিণে রাস্তার ধারের জানলার পাশে। ঠিক চৌকোও নয়, গোলও নয়। চারপাশ বেশ ঢেউ খেলানো। অনেকটা আলপনার মত। বেশ বাহারি একটা ফ্রেমের উপর আলগা বসানো। নিজের ভারেই বেশ চেপে বসে থাকত। পাথরটা প্রায় মন দুয়েক ভারি। ফ্রেমের চারদিকে জাফ্রির কাজ করা কাঠের ঝালর লাগানো ছিল। সারা ফ্রেম ঘিরে ছিল অসংখ্য কাঠের গুলি। গোল গোল ডাম্বলের মত। দুদিক সরু। অনেকটা পালিশ করা পটলের মত। ঘোরালে সেগুলো বন বন করে ঘুরত। পায়া চারটে ছিল কারুকার্য করা থামের মত। তলায় ছিল ভরাট পাদানি।

যে বয়সে আমার বাবার যৌবন ছিল, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল ছিল সামনে চেরা সিঁথি ছিল, ঠোঁটের উপর বাটার-ফ্লাই গোঁফ ছিল, যে বয়সে তিনি বিকেলে পায়ে বার্নিশ করা জুতো পরে, ইয়ং সাহেবের উপহার দেওয়া গ্রেহাউন্ড চেনে বেঁধে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, সেই সময় টেবিলটারও যৌবন ছিল। বাবাই কিনেছিলেন নিলাম থেকে। টেবিল আর কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো যায় এমন একটা দোলনা একই সময় বাড়িতে এসেছিল।

বড় হতে হতে আমার চিবুকটা যখন শীতল পাথরে রাখার মত অবস্থায় এল তখন দেখতাম রোজ সকালে চেয়ারে উবু হয়ে সামনে একটা ডিমের মত আয়না রেখে বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বাবা দাড়ি কামাচ্ছেন। দাড়ি কামাবার সময় পাশে দাঁড়ালে বাবা খুব রেগে যেতেন। এমনিই বাবার খুব দাপট ছিল। সে যুগটাই ছিল বাঙালীর দাপটের যুগ। রাগী ছিলেন তেমনি। রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে, বাড়িতে দুজন যুবক কাজের লোক ছিল, পালা করে এক একদিন এক একজনকে জুতো পেটা করে একটা লুঙ্গি পরে এই টেবিলে বসেই রাগ রাগ মুখ করে চা খেতেন। আর ঠিক সেই সময় আমার শান্তশিষ্ট মজলিশী মেজ জ্যাঠামশাই বাঁ পাশের হাতলহীন খালি চেয়ারে এসে বসতেন। গায়ে একটা খড়খড়ে তোয়ালে। চুলে কলপ লাগাতেন। খানিকটা অংশ কালো খানিকটা লাল, জায়গায় জায়গায় সাদার ছিট।

জ্যাঠামশাই বোঝাতেন, রাগ জিনিসটা ভাল নয়। বিশেষ করে দিনের শেষে অফিস থেকে ফিরেই এই ধরনের জুতোজুতি শরীরের বাড়তি এনার্জি টেনে নেয়। চাকরবাকররা একটু আডাম্যান্ট হয়েই থাকে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃদু স্বভাবের জন্যে বাবা খুব একটা পাত্তা দিতেন না। কে বড়, কে ছোটো বোঝাই যেত না। চায়ের কাপটা খটাং করে টেবলে রেখে বাবা বলতেন, 'তুমি আর এর মধ্যে নাক গলাতে এস না। ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট থিং ডিসিপ্লিন। ছেলেটার দিকে তাকাতে হবে। ওরা দুপুর বেলা নিজেদের মধ্যে খেস্তখিস্তি করেছে। অশ্বতর বলেছে'। বাবা খুব পিউরিটান ছিলেন, খচ্চর শব্দটা উচ্চারণ করলেন না। অফিস থেকে এসে দাঁড়ানো মাত্রই রিপোর্টটা আমারই পেশ করা। আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান। লম্বা বারান্দার এধার থেকে ওধার, বাবা আর নিরঞ্জনের ছুটোছুটি। পূর্বদিকের প্রান্ত থেকে পেটাতে পেটাতে পশ্চিমের সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত এসে জুতো ফেলে দিলেন।

জ্যাঠামশাই নিরঞ্জনকে ভালবাসতেন, কারণ নিরঞ্জন রবিবার সকালে পচা পাঁউরুটি কুঁড়ো পনীর আর পিঁপড়ের ডিম দিয়ে

ভর্তিমত করে জ্যাঠামশাইকে মাছের চার মেখে দিত। সেই কারণেই বোধ হয় নিরঞ্জনের হয়ে সালিশি করতে এসেছিলেন। কিছু আর বলার রইল না। আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে চলে গেলেন। অশালীন কথা বাবা কোনো সময়েই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একদিন ছুটির সকালে এই পাথরের টেবিলে দাদু আর বাবা মুখোমুখি বসে মুড়ি তেলে ভাজা খাচ্ছিলেন। শ্বশুর আর জামাইয়ে গল্প বেশ জমে উঠেছে। দাদু বার কয়েক 'শালা' বলেছেন। শালা পর্যন্ত অ্যালাউড। হঠাৎ দাদু বলে উঠলেন কি একটা কথা প্রসঙ্গে—'পাছার কাপড়'। বাবা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে একটা ঠোঙা নিয়ে এলেন। দাদুর মুড়ি আর তেলে ভাজার বাটিটা টেনে নিয়ে ঠোঙায় ঢেলে ফেললেন। ঠোঙাটা দাদুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে কিম্বা রকে বসে খান। টেবিলে বসে খাবার মত সিভিলাইজড আপনি নন। আপনার স্ফিয়ার আলাদা'। বৃদ্ধ মানুষ। টকটকে গায়ের রঙ। লম্বা চওড়া পালোয়ানের মত চেহারা। বাবার কথায় মুখটা আরো টকটকে হয়ে উঠল। ছেলেমানুষের মত অবাক হয়ে বললেন, 'কেন বল তো? হঠাৎ কি হল তোমার'। দাদু তখনো অপরাধটা বুঝতে পারেননি। বাবা বললেন, 'আপনি-ভীষণ স্ল্যাং'। দাদু অপরাধীর মত মুখ করে বললেন, 'ওহো, ওই পা—'

বাবা হাত তুলে বললেন, 'ডোন্ট রিপিট'। দাদু এবার ভয় পেয়ে গেলেন, 'কি বলব তা হলে'? বাবা বললেন, 'কেন পেছনের কাপড়, কি পরনের কাপড় বলা যায় না!' দাদু তখনও হাল ছাড়লেন না। নিজের স্বপক্ষে একটু ক্ষীণ ওকালতি করতে গেলেন। বললেন, 'সেকেলে মানুষ তো, আমাদের সময় বুঝলে পরমেশ্বর, ওই সব কথারই চল ছিল'। বাবা দাদুকে কোনো রকম ডিফেনসের সুযোগ না দিয়েই শ্বেত-পাথরের টেবিল ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দাদু সেই মুড়ির ঠোঙাটা হাতে ধরে উদাস হয়ে বসে রইলেন। কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এক সময় করুণ হেসে বললেন, 'নাঃ, পরমেশ্বর দেখছি খুবই রেগে গেছে।'

বাবার দাপটে সংসারে মা ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। ছুটির দিনে মাকে জীবিত কোনো প্রাণী বলে মনে হত না। অনেকটা ছায়ার মত নিজের কাজে ঘুরে বেড়াতেন। সারাদিনে বাবাকে বার চব্বিশ চা করে দিতেন। বাবাকে চা দেবারও একটা কঠিন কায়দা ছিল। কাপ থেকে ছলকে ডিশে এক ফোঁটা চা পড়লেই চা খাওয়া মাটি। কাপের কানায় চা ভরে ডিশের উপর ব্যালেনস করে আনতে হবে।

আমার মার একটা পা আর একটার চেয়ে বোধ হয় একটু ছোটো ছিল। সাবেক আমলের বাড়িতে ঘরে ঘরেই উঁচু চৌকাঠ, ফলে মার খুব অসুবিধে হত। চা হাতে যখন আসতেন মনে হত তরল বোমা নিয়ে আসছেন, একটু কেঁপে গেলেই বিস্ফোরণ।

মা যখন চা নিয়ে এলেন, দাদু তখনও ঠোঙাটি হাতে ধরে বসে আছেন। বাইরে তেলে ভাজার তেল ফুটে উঠেছে। দাদু বললেন, 'চা আর খাবো না তুলসী, জামাই খুব রেগে গেছে।' মা ব্যাপারটা জানতেন, রান্না ঘরে গিয়ে আগেই আমি রিপোর্ট করে এসেছিলুম। মা ফিসফিস করে বললেন, 'চা খেয়ে আপনি চলে যান'। দাদু বললেন, 'আমি তো চলেই যেতুম রে, কিন্তু আটকে গেছি।' মা একটু অবাক হলেন, 'কিসে আটকে গেছেন' দাদু বললেন, 'সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার'। মা একটু ভয় পেলেন। দাদু খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু বোহিসেবী ছিলেন, পাঁচপো দুধের সঙ্গে একটু কাঁঠালের রস, ডালের সঙ্গে আধ শিশি কাঁচা ঘি, এই সব ছিল তাঁর বিপর্যয় খাওয়া। মা ভাবলেন দাদু হয় তো কাপড়ে করে ফেলেছেন। আগে একবার দুবার এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে। মা বললেন, 'করে ফেলেছেন।' দাদু খুব বুক ঠুকে উত্তর দিলেন, 'না না সেরকম বিচ্ছিরি নয়।' সেই কাজটি করে ফেলেন নি বলে যেন বেশ গর্বিত। 'তবে কি করেছেন?' মা যেন বেশ ধাঁধায় পড়লেন। দাদুর মুখটা যেন দুষ্টু ছেলের মত হয়ে উঠল। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, 'ডান হাতের আঙুলটা টেবিলে আটকে গেছে।' মা নীচু হয়ে বললেন, 'কই দেখি?' টেবিলের পাশে যে কাঠে, হরতন, চিঁড়েতন, ইস্কাবন কাটা ডিজাইন ছিল তারই একটায় দাদুর ডান হাতের তর্জনীটা আটকে গেছে। মা বললেন, 'টেনে বের করে নিন না'। দাদু অসহায়ের

মত বললেন, 'বেরোচ্ছে না।' 'ঢুকলো কি করে?' দাদু তখন ঢোকার বিবরণ দিলেন, 'পরমেশ্বর রাগ করে উঠে গেল তো, আমি একলা বসে আছি। অন্যমনস্ক আঙুলটাকে এই গর্ত সেই গর্ত এমনি করতে করতে হঠাৎ একটায় ফস করে ঢুকে গেল। হাতে তেল ছিল। ওমা, তারপর আর বেরোচ্ছে না কিছুতেই। জামাই মুড়ি আর তেলে ভাজা যত্ন করে ঠোঙায় ঢেলে দিয়ে গেল। এখনো দুটো চপ খাওয়া হয়নি। ডান হাতটা আটকে গেছে।'

ভয়ে মার মুখ শুকিয়ে গেল। 'কি হবে এখন'?

দাদু ছেলেমানুষের মত বললেন, 'কাঠটা ভেঙে আঙুলটা বের করে নিতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর যদি রেগে যায়'। মা বললেন, না না কাঠ ভাঙ্গা চলবে না। কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। আপনি বরং আর একবার চেষ্টা করুন।' 'হচ্ছে না রে তুলসী। তখন থেকে ঘোরাতে ঘোরাতে ছাল উঠে গেল।' মা চায়ের কাপটা শ্বেত পাথরের টেবলের উপর রেখে উত্তরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই দিকে এক ফালি জমিতে বাবার কিচেন গার্ডেন। ভাল রোদ পড়ে না। তবু বাবার সাধনার শেষ নেই। একটুকরো জমিতে খুঁজলে সব গাছ পাওয়া যাবে। রোদের অভাবে সমস্ত গাছই উচ্চতায় বিশাল। গোটা কতক পেঁপে গাছ তিন তলার ছাদের কার্নিস ছুঁতে চলেছে। বাবা তখন বাগানে। সঙ্গে সহকারী নিরঞ্জন। সকালে নিরঞ্জনের মত লোক হয় না। সন্ধ্যেবেলা সেই নিরঞ্জনকেই জুতো পেটা। গাছের গোড়ায় গোড়ায় পচা খোলের জল দেওয়া চলেছে। একটু বেসামাল হলেই নিরঞ্জন চারাগাছ মাড়িয়ে ফেলবে। বাবা মাকে মাঝেই হাঁ হাঁ করে উঠছেন, 'যাঃ সর্বনাশ করে ফেললি, ডাফোডিলটা গেল।' নিরঞ্জনের দৃকপাত নেই, 'না না ছোটোবাবু'। বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'ব্লাডি বাগার পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছিস, ক্রিস্টালাইজড ইডিয়েট। ওই জন্যে বলে মিনিমাম এডুকেশান দরকার।' নিরঞ্জন বলছে, 'সব জায়গাতেই তো গাছ। না মাড়িয়ে যাবো কি করে?' 'কেন তোর বুড়ো আঙুলে কি পক্ষাঘাত হয়েছে, এইভাবে যাবি, টিপ টো কাকে বলে জানিস, এই দেখ।' বাবা দেখাতে গেলেন, 'যাঃ, গেল নিজেই শেষে মাড়িয়ে ফেললাম, ক্রসটা গেল, দূর বাবু'। নিরঞ্জন ভরসা দিল, 'ও একটা দুটো যাবেই বাবু। পেটের সবকটা ছেলেই কি আর বাঁচে! একটা দুটো মরেই'। বাবা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। লগা, তুই দিয়ে যা। গোড়া থেকে ছ ইঞ্চি দূরত্ব থাকবে মনে থাকে যেন।' মা জানতেন এই ব্যাপার চলবে বেলা বারোটা অবধি। ওইখানে দাঁড়িয়েই মশার কামড় ও বার কয়েক চা খাওয়া চলবে। তারপর গাছের বাড়তি ডাল কাটতে গিয়ে হাত কেটে, ওপরে উঠে আসবেন গেল গেল করতে করতে। আয়োডিন আর ব্যাণ্ডেজ তৈরিই রাখা আছে।

মা উত্তরের বারান্দা থেকে দক্ষিণে টেবলের সঙ্গে আটকে থাকা দাদুর কাছে চলে এলেন। সামনেই রাস্তার ওপারে সনাতনের ছোট্ট ছবি বাঁধাইয়ের দোকান। সারাদিন ছোট্ট হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠুক করে কাজ করে। লম্বা, কালো পাকানো চেহারা। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে খুলে বিড়ি মুখে দিয়ে দিয়ে যখন এ বাড়ির জানালার দিকে তাকায় তখন দেখেছি চোখ দুটো ঘোলাটে হলুদ। মা বললেন, 'সনাতনকে একবার চুপি চুপি ডেকে আনতে পারিস'। সনাতন এসে হাজির, 'কি বলছেন মা!' রোগা

হলে কি হয়, বাজখাই গলা। মা ফিস ফিস করে বললেন, আস্তে আস্তে। সনাতন গলাটাকে যথাসম্ভব খাটো করে বললে, 'কি হয়েছে মা?' মা তখন সনাতনকে ব্যাপারটা দেখালেন। হাঁটু মুড়ে দাদুর চেয়ারের পাশে বসে সনাতন টেক্কাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, 'দুটো স্ক্রু দিয়ে কাঠটা লাগানো আছে। স্ক্রু দুটো খুলে নিলেই কাঠটা আঙুলের সঙ্গে টেবল ছেড়ে চলে আসবে লম্বা আংটির মত'। মা বললেন, 'তাহলে খুলে ফেলুন। খুব তাড়াতাড়ি। একটুও শব্দ করবেন না।' সনাতন খড়ম পায়ে সিঁড়ি দিয়ে খটাং খটাং করে নামছিলেন। মার কাঁচুমাচু অনুরোধে শুধু পায়ে হাতে খড়ম নিয়ে দোকানে চললেন যন্ত্র আনতে।

স্ক্রু দুটো অনেকদিনের। মরচে পড়ে মাথার খাঁজ বোধ হয় বুজে এসেছিল। সনাতনকে বেশ কসরত করতে হল। টেবল-টাকে ঠেলে সরাবারও উপায় নেই। দাদু আঙুলে আটকে বসে আছেন। ঘুপচি মত জায়গায় কোনো রকমে বসে সনাতন অসাধ্য সাধনে ব্যস্ত। দাদুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বেশ মজা হয়েছে এমনি ভাব। মার মুখে চাপা উৎকণ্ঠা। একটা কান বাগানের দিকে পড়ে আছে। বাবার গলা শুনতে না পেলেই পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আসছেন।

হঠাৎ ঝর ঝর করে এক গাদা পটলের মত গোল গোল কাঠ মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল। 'এই রে, কি হল' বলে মা এগিয়ে গেলেন। সনাতন টেবলের পাশ থেকে হাসি হাসি মুখ তুলে বললেন, 'একটা পাশ খুলে ফেলেছি।' 'এগুলো খুললেন কেন?' মার প্রশ্ন। 'কাঠটা খুললেই তো এগুলোও খুলবে মা। উপরের কাঠের চাপে এই চুকিয়ারীগুলো ঠাস হয়েছিল।' সনাতন অন্য দিকটা খোলার কাজে মন দিলেন। দাদু দেখলেন চুপ করে থাকা ঠিক নয়। সনাতনকে তারিফ করে বললেন, 'বেশ কাজের লোক হে তুমি। ঠিক খুলেছো তা দেখছি।' মা তখন গোল কাঠগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে ঢাকছেন বামাল ধরা পড়ে বাবার ভয়ে।

কাঠের টুকরোটা অবশেষে টেবলের মায়া ছেড়ে দাদুর পুরুষ্টু তর্জনীর সঙ্গে খুলে এল। দাদুর সে কি মুক্তির আনন্দ। মনে হল যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কাঠটা আঙুল সমেত দুবার ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'বেশ ফিট করেছে রে তুলসী!' দাদুর উল্লাসে মা ঠিক যোগ দিতে পারলেন না। জানি মার মনে তখন কি খেলা করছে। একটু পরেই ওই রুমাল আকৃতির একটুকরো বাগান থেকে বাবা ঘর্মাক্ত চেহারা নিয়ে ওপরে উঠে আসবেন। মুখে নানারকমের অদ্ভুত শব্দ। খুব পরিশ্রম হলে বাবা জোরে জোরে মুখ দিয়ে হাওয়া ছাড়েন। ফুস...স! ফু...সস। অনেকটা এখনকার প্রেসার কুকারের মত।

রবিবার দ্বিতীয় বিশাল কাজ ছিল, টেবিলের শ্বেত পাথর পটি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিস্কার করা। আগের রবিবার ইচ্ছে করেই পরিষ্কার করেনি। সেও এক ঘটনা। আমার বন্ধু বিপুল, কপিং পেনসিল দিয়ে পাথরের উপর নাম লিখে-ছিল—বিপুল রায়। গোটা গোটা হাতের লেখা। যেদিন লিখে গেল তার পরের দিন বাবার চোখে পড়ল। বাবা পাশে 'অ্যারো' দিয়ে আরো বড় বড় করে লিখলেন বাড়ি বাগান। দরজায় খাঁড়ি দিয়ে লেখা কি ছবি আঁকা, বইয়ের পাতায় নাম সই, শ্বেত পাথরের টেবিলে নিজের নাম জাহির করা, খাতায় হিজি বিজি কিছু আঁকা দেখলেই বাবা উত্তেজিত হয়ে

উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের জন্যে শুরু হত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। আমাদের বাইরের সদর দরজায় এইরকম লেখার লড়াই কার বিরুদ্ধে জানি না বেশ কিছু দিন চলছে। ঢোকার মুখে কোনো অতিথি একটু লক্ষ করলেই অবাক হবেন। প্রথম লেখা, বাঘের বাসা। লেখক বোধ হয় আমাদের বাড়িকে 'বাঘের বাসা'—নাম দেবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বাবা লিখলেন 'স্কাউন্ড্রেল'। অদৃশ্য লেখক লিখলেন—'পাগলের আখড়া'। বাবা উত্তরে লিখলেন—'সোয়াইন'। উত্তর এল—'বাটার ফ্লাই'। লেখক বোধ হয় বাবার গোঁফ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। বাবা লিখলেন—'স্টুপিড'। বিশাল সদর দরজায় লেখার জায়গার অভাব নেই। সপ্তাহে সপ্তাহে উতোর-চাপানের খেলা বেশ জমে উঠেছে।

শ্বেত পাথরের টেবিলে বিপুলের লেখা আর এগোবে না। কারণ বিপুল যে ব্লাডি বাগার নিজে এসে দেখে গেছে এবং মনে হয় এ বাড়ির ত্রিসীমানা সে আর মাড়াবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ব্লাডি বাগার মানে কি রে। মানেটা আমি ঠিক জানতুম না। বিপুল মুখ চুন করে চলে গিয়েছিল।

মা দাদুকে তাড়াতাড়ি টেবিল ছাড়া করলেন। ঠিক হল দাদু সনাতনের দোকানে গিয়ে বসবেন। সনাতন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে, কাঠটা অক্ষত আঙুল থেকে খোলা যায় কিনা। 'দাঁড়া তুলসী, চপ দুটো বাঁ হাতে চট করে খেয়ে নি।' মা আঁতকে উঠলেন, 'না না ওপরে আসার সময় হয়ে গেছে, আপনি এখুনি পালান'। এক হাতে ঠোঙা, অন্য হাতে আঙুলে গলান কাঠের টুকরো, পায়ে কালো ক্যাম্বিসের জুতো, দাদু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, পেছনে সনাতন, হাতে যন্ত্রপাতি। অন্যদিকে বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাবা উঠে আসছেন। মুখে প্রেসার কুকারের শব্দ। পেছনে নিরঞ্জন, হাতে খুরপী, সারের কলসি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে বোঝার উপায় নেই, পাথরের তলার এক পাশের কেরামতি ঝরে গেছে। মা আশা করেছিলেন, দুর্ঘটনাটা তক্ষুনি ধরা পড়বে না। কিছু দিন হয়তো চাপা থাকবে। বলা যায় না সনাতনের অদ্ভুত কেরামতিতে কাঠের টুকরোটা দাদুর চাঁপা কলার মত আঙুল থেকে হয়ত খুস করে খুলে আসবে। তারপর অফিস বারে বাবার অনুপস্থিতিতে, আবার যথাস্থানে বহাল হয়ে যাবে। বাবা ওপরে এসেই এক গেলাস জল চাইলেন। বেশ মোটা কাচের একটা বড় গেলাস ছিল। প্রায় সেরখানেক জল ধরত। জলের গেলাসটা হাতে নিয়ে টেবল থেকে কিছু দূরে মেঝেতে উবু হয়ে বসলেন। জল খাবার এইটাই ছিল তাঁর ধরণ। একটু একটু করে জল খাচ্ছেন আর সামনের জানালা দিয়ে রোদঝলসানো দ্বিপ্রহরের সুনীল আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। জল খেতে খেতে মাঝে মাঝে আঃ আঃ করে অদ্ভুত শব্দ করছেন। কিছু দূরে মা উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জানালার সামনে টেবিল। শ্বেত পাথর, সমাধি ফলকের মত শুভ্র। রবিবারের সমস্ত শান্তি যেন সেই মুহূর্তে ওই পাথরের তলায় সমাহিত। শেষ চুমুকে জলটা সমস্তই খেয়ে ফেলে বাবা একটা ফাইনাল শব্দ করলেন। ভেন্টিলেটার থেকে একটা চড়ুই পাখি উড়ে গেল। ঘুলঘুলিটার দিকে একবার তাকালেন। গত কয়েক রবিবার ধরে শুনছি ওই গর্তটা টিন মেরে বন্ধ করা হবে। গেলাসের তলানি শেষ বিন্দু জলটা ঝেড়ে ফেলে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। ঘাক দেখতে পাননি। দেখে ফেলতেও পারতেন। যে জায়গায় বসে-ছিলেন সেখান থেকে টেবিলের তলা ও পাশ সহজেই নজরে পড়ে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে দুম দুম করে হেঁটে বাবা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। সব কিছুতেই স্পিড- এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কেবল একটা জিনিসে স্পিড ছিল না সেটা হল ইভ্যাকুয়েশান। কনস্টিপেসানের ব্যাপার। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন, এমন একটা উপায় থাকত ব্লাডারটা খুলে ফেলে ঝেড়ে ফেলা যেত! নিরঞ্জন সময় সময় আদেশ মত পেটটা প্যাঁক প্যাঁক করে দিত। একমাত্র বেলের সিজনে খুঁতখুঁতুনিটা একটু কম থাকত।

আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত সময় পাওয়া গেল। তার আগে বাথরুম থেকে বাবার বেরোবার সম্ভাবনা নেই। মা আর আমি দৌড়ে রাস্তার দিকে জানালার ধারে গেলুম। সনাতনের দোকানে দাদুর আঙুল থেকে কাঠ খোলার কসরত চলেছে। সনাতন একা দোকানে বসে আছে, দাদু নেই। অন্য সময় সনাতন হামেশাই জানালার দিকে মিটমিট করে তাকায়। সেই মুহূর্তে সনাতন তন্ময়। কি যে করছে! অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর সনাতন হলেদেটে চোখ তুলে তাকাল। মা হাতের ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন—কি হল? সনাতন ফিক্

করে এনে দু খণ্ড কাঠ তুলে দেখালেন। দাদু... চুকিয়েছিলেন একটা চিড়িতনে। সেই জায়গা, থেকেই কাঠটা দু টুকরো হয়ে গেছে। আর মুখের মন্দু হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠল।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই বাবা সেদিনের বুলেটিন ঘোষণা করলেন—অ্যাবসোলিউটলি নো ইভাকুয়েশান। নিরঞ্জন সামনে দাঁড়িয়েছিল। মানে না বুঝলেও ইংরেজিটা তার চেনা। সঙ্গে সঙ্গে বললে—'একটু প্যাঁক প্যাঁক!' বাবা বললেন—'এখন না। দাঁড়া একটু চা খেয়ে দেখি।' মা খুব দরদ দিয়ে চা করে দিলেন। এর কোষ্ঠ সাফ হয়নি, তার ওপর টেবিল ভেঙেছে। ভেঙেছেন আবার মার বাবা। ভাল চায়ে মেজাজটা যদি একটু নরম হয়।

বেলা দেড়টার সময় শুরু হল পুটি দিয়ে টেবিলের পায়ার পরিষ্কার করার কাজ। মা আশ্রয় নিলেন মেজ জ্যাঠা-

মশায়ের ঘরে। জ্যাঠামশায় একটা পুরোনো টুথ ব্রাশ দিয়ে ঘাড়ের কাছের চুলে কলপ লাগাচ্ছিলেন। গায়ে একটা খড়খড়ে তোয়ালে। এই বাড়ির সমস্ত অপরাধীর আশ্রয়দাতা মেজ জ্যাঠামশায়। উদারপন্থী, সদা হাস্যময়। মন্থ্যাল ফর্যালের ধার ধারেন না। আবেগের নির্দেশে কাজ করেন।

আমি বহুবার জ্যাঠামশায়ের শরণাপন্ন হয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। মার বরাতে কি হবে বলা শক্ত। সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরেই ওই শ্বেত পাথরের টেবিলে বাবা যখন আমাকে পড়াতে বসতেন, বাড়ির সকলেরই অবস্থা তখন ছিলে-টান ধনুকের মত। কখন কি হয়। প্রথমেই হোমটাস্ক। টাস্কের চৌকাঠেই প্রথম হোঁচট। একটা ভুল, দুটো ভুল। মেজাজের পারা চড়ছে ব্যারোমিটারের মত। আবহাওয়ার পূর্বাভাস। ঝড় এলো বলে। মেঘ ডেকে উঠলো—'সারাদিন কি করা হয়েছে? গুলি, ঘুড়ি, গল্পের বই?' অপরাধ চাপা থাকে না। বাবা উঠে পড়লেন। জয়েন্ট ফ্যামিলির মুখ ফাঁদালো উনুনে প্রথম আহুতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী থেকে আনা 'আবার যকের ধন'। শ্বেতপাথরের টেবিলের তলার পাদানিতে লুকোনো ছিল। যে কোনো গুপ্ত জিনিস গুপ্ত চিন্তা টেনে বের করার অপারসীম ক্ষমতা ছিল বাবার। তারপরই উনুনে পড়ল সিন্দুকের পাশে লুকোনো সুতো ভর্তি লাটাই। সবে চ্যাঁভো মাঞ্জা দিয়ে রাখা। তারপরই ঘুড়ি কাঁপকাঠি, বুককাঠি ভাঙার পটাপট আওয়াজ। মনে হচ্ছে বুকের এক-একটা পাঁজর ভাঙছে। সেই সঙ্গে বাবার সিংহ বিক্রমে দাপাদাপি আর চিৎকার—'শয়তান শয়তান, সেটান, সেটান।' মা কিছুটা দূরে থেকে গরাদের ওপাশে থাকা ফাঁসির আসামীর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে করুণ কণ্ঠে আমাকে বলতেন—'কেন বাবা ঠিক করে অংকগুলো কর্বালনা'! সব শেষ করে, সব শ্মশান করে দিয়ে বাবা আবার টেবিলে এসে বসতেন। বুক ভর্তি কাঁচা পাকা চুল। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে। এদিকে এত কাণ্ডের পরও ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে। মাথা ঝুঁকে আসছে টেবিলের পাথরের দিকে। বাবা তাক করে থাকতেন। মুখাটা প্রায় কাছাকাছি এলেই পিছনে এক ভূঁই থাপ্পড়। ঠাঁই করে কপালটা পাথরে ঠেকে ঘুম ছুটে যেত আপনি। চোখের সামনে সাদা শ্বেতপাথর, কপালে ঠিকার আলুর যন্ত্রণা, পাথরে কোঁদা চুলওলা বাবা, খোলা বইয়ের পাতা নৃত্যশীল কাল কাল অক্ষর। জীবনের অন্ধকারতম দিনে আলোর বীজংস সাধনা। জ্যাঠামশায়ের কাতর প্রার্থনা—'ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দে' যেন বাঘে ধরেছে। বাঘের সংক্ষিপ্ত গর্জন—'ডোণ্ট পোক ইওর ফাইন নোজ। কর্তা সিংগুলার হলে ভার্ব সিংগুলার হবে, ক-তো বা-আর বলতে হবে, কনডেনসড ইডিয়েট। লেখো। বড়ো বড়ো করে'। সামনের রাস্তায় গভীর রাতের এক আধটা পথিক, অজস্র কুকুরের লুটোপুটি ঝগড়া। সেই মেজজ্যাঠামশায়ের কাছে শেলটার নিয়েছেন মা। কত দূর কি হবে বলা শক্ত। চুলে কলপ লাগান বন্ধ। দরজার পাশ থেকে গুপ্তচরের মত একটা মাত্র চোখ বের করে আমি ওয়াচ করছি। মেজ জ্যাঠামশাই আশা দিচ্ছেন মাকে—'কোনো ভয় নেই বউমা, আমি ফেস করব। আজ আমি তোমার জন্যে জান দিয়ে দেবো'। পাথরে পটি পড়ল। চারপাশে ঘুরে ঘুরে কাপড় দিয়ে পাথর ঘষছেন। জানালার দিকের অংশে গিয়ে বাবা হঠাৎ উঃ করে লাফিয়ে উঠলেন। নীচু হয়ে মেঝে থেকে কি একটা তুলে নিলেন। স্ক্রু। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি হল? কোত্থেকে এল? কোন শয়তানের কাজ। মার মুখ বিবর্ণ। মেজ জ্যাঠামশাই প্রস্তুত। মুখ দেখে মনে হল—তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে, 'চিত্রে সমর' বলে একটা বই বেরোতো, সেই বইয়ের পাতায় দেখা যুদ্ধ বন্দীদের মুখের মত করুণ।

স্ক্রুটা দু আঙুলে ধরে বাবা নীচু হয়ে টেবিলের পাশটা দেখতে লাগলেন, কোথা থেকে খুলে পড়েছে! ব্যাস ধরে ফেলেছেন। একবার দেখলেন। দুবার দেখলেন। সোজা উঠে দাঁড়ালেন। স্বগতোক্তি—'এ কি হল?' 'নিরঞ্জন'। দুবার ডাকলেন। 'ভেগেছে। হাওয়া হয়ে গেছে।' জানালার দিক থেকে সরে এসে দরজার দিকে মুখ করে চিৎকার করে বললেন, 'নিরঞ্জন কি মরে গেছে?'

জ্যাঠামশাই বেরিয়ে এলেন। ঘাড়ের কাছে কিছু চুল কালো, কিছু তামাটে। জ্যাঠামশাই বাবার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে মোলায়েম করে বললেন, 'চল একটু বসি, উত্তেজিত হসনি'। বাবা খুব অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'চল না একটু বসি। একটু বসি'। একটু বসিটাকেই ঠুংরী গানের মত জ্যাঠামশাই বার কতক বললেন। কোয়েলিয়া গান থামা এবার, গান থামা এবার, গান থামা এবার। 'কিন্তু আমার তো বসার সময় নেই।' মুখ বিকৃত করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে বাবা তাঁর সময়ের অভাবটা জ্যাঠামশাইকে জানিয়ে দিলেন। এই

জানানোর মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। কারণ জ্যাঠামশাই চুল রঙ করছিলেন আর বাবা টেবিল সাফ্ করছিলেন। একটা অকাজ। অন্যটা কাজ। কাঁচুমাচু মুখে জ্যাঠামশাই বললেন, 'কথা আছে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় তোর নেবো না।'

দুজনে দুটো চেয়ারে বসলেন। বাবা কোনো রকমে পেছনটা চেয়ারের ডগায় ঠেকিয়ে রাখলেন। শরীরের পুরো ভারটা রইল পায়ের উপর। হাত দুটো হাঁটুর উপর টান টান। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো খোলা আকাশে লটকানো। এই রকম একটা ভঙ্গি, এই রকম একটা মুখের সামনে বসার শক্তি চাই। জ্যাঠামশাই ঘটনাটা বলে চলেছেন। মুখটাকে ঈষৎ বাঁকিয়ে বাবা শুনছেন। কোনো সময় জ্যাঠামশায়ের দিকে তাকাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে নাকের ওপর কপালের কিছুটা অংশ কুঁচকে যাচ্ছে। ঘটনার বর্ণনা শেষ করে জ্যাঠামশাই বাবার হাত দুটো স্পর্শ করে বললেন—'তুই আর এই নিয়ে রাগারাগি করিসনি। বউমা ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপরই অ্যাকশান। হাঁটুতে চটাস চটাস করে চারটে চাপড় মেরে বাবা বললেন, 'হোয়াই সনাতন, হোয়াই সনাতন! আমি কি মরে গিয়েছিলুম?'

'না না মরে যাবার কথা আসছে কি করে? তুই ব্যাপারটা অন্যভাবে নিচ্ছিস। মুকুজ্জে মশায়ের আঙুলে তুই খুলবি সেটা ভাল দেখায় না বলেই—'

'ভাল দেখায় না বলেই একটা উটকো বাইরের লোককে ডেকে টেবিলটার সর্বনাশ করতে হবে! আমি হয়তো কাঠটা ইনট্যাক্ট রেখেই খুলতে পারতুম। আমাকে একবার চান্সই দেওয়া হল না! কেন হল না? বলতে পার কেন হল না এক্সপ্লেন।'

'একটা সামান্য ব্যাপার তোকে বিরক্ত না করে যদি হয়ে যায় তাই আরকি। সনাতন পুরোনো লোক। যন্ত্রপাতি রয়েছে। টুক করে খুলে দিলে।'

'সেই কাঠ আর কেয়ারীগুলো কোথায়?'

জ্যাঠামশায় ঘটনার সেকেণ্ড পার্টটা জানতেন না। অসহায়ের মত মুখ করে দরজার দিকে তাকালেন—'বউমা'।

'ও তুমিও জান না। সনাতনকে তুমি ডেকেছিলে?'

'আমি, আমি পাশের ঘরেই ছিলুম। সনাতন তো চোখের সামনেই থাকে। ওই তো কাজ করছে। চোখাচোখি হতেই চলে এল আর কি! ডাকতেও হয় না। ইশারাতেই কাজ হয়।'

আর ইশারা!

জ্যাঠামশায় খুব বিপদে পড়লেন। বাবা ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন।

'দেখেছো বাড়ির ডিসিপ্লিন কোথায় নেমে গেছে? বাড়ির বউ কাউকে কিছু না বলে জানালা দিয়ে ইশারা করে একটা লোফার মিস্ত্রীকে হুট্ করে ডেকে নিয়ে এল। টেবিলটা বড় কথা নয় মেজদা, বড় কথা হল ডিসিপ্লিন। তুমি পাশে রয়েছো জানলে না, আমি নীচে রয়েছি জানলুম না। এই হাইড অ্যান্ড সিক গেম। নিপ ইন দি বাড।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। জ্যাঠামশায়ের শেষ চেষ্টা—'শোন্, আমার অনুরোধ, আমি তোর চেয়ে বয়সে বড় তো, একটা রিকোয়েস্ট, এই নিয়ে তুই আর গোলমাল করিসনি। ব্যাপারটা বড্ড ডেলিকেট বুঝলি। আমি তোর পয়েন্টটা বুঝেছি।'

হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে বাবা বললেন—'নো কমপ্রোমাইজ'।

জ্যাঠামশায়ের মুখটা একটু কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। বউমাকে আশা দিয়েছিলেন শেলটার দেবেন কিন্তু দাদার চালে বাবা কিস্তি মাৎ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জ্যাঠামশাইও উঠে দাঁড়ালেন। বাবার চেয়ে লম্বা, একটু কৃশ, অল্প কোলকুঁজো। বাবার চেতানো বুকের সামনে বড় বেশি দুর্বল।

আমরা সকলে ভেবেছিলাম বাবা ঘরের দিকে যাবেন। তিনি ঘুরে রাস্তার দিকে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। গরাদহীন ফরাসী জানালা দিয়ে বুকের আধখানা রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। কি করতে চাইছেন বোঝা গেল না। জ্যাঠামশায় কিছু দূরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। আমার মনে হল, মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাচ্ছেন বোধ হয়। কিংবা সনাতনকে ডাকবেন। হঠাৎ জানালার বাইরে হাত বের করে কটকট করে বার কতক তালি বাজালেন। কাকে ডাকছেন? চিৎকার করে ডাকাটা, 'আউট অব ইংলিশ এটিকেট'। তালিতে কাজ হল না। যতদূর সম্ভব চাপা গলায় ডাকলেন—'শরৎ, শরৎ, এ...এই শরৎ'। শরৎ কি করবে? শরৎ বোধ হয় সামনের রাস্তা দিয়ে সেই সময় যাচ্ছিল। বাবার ডাকে মুখ তুলে তাকাল মনে হয়।

'তোমার গাড়িটা নিয়ে এখুনি একবার এস'। রাস্তা থেকে শরতের গলা শোনা গেল, 'আমি এইমাত্র গ্যারেজ বন্ধ করে খেতে যাচ্ছি।'

'আধ ঘণ্টা পরে খেতে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'আমি খেয়ে আসি না ছোটোবাবু'

'দশ টাকা দেব, কুড়ি টাকা দেব, এখুনি গাড়ি বের কর।'

তেরপলের হুড লাগানো শরতের একটা প্রাচীন গাড়ি ছিল। চারদিক খোলা। আধকাটা দরজা। দরজার সব কটা লক ভাঙা। আরোহীরা উঠে বসলে নারকেল দাঁড় দিয়ে দরজা বেঁধে দেওয়া হত। পিছনের সিটে গদীর বদলে কয়েকটা মাথার বালিশ পাতা। এই গাড়িটাই আমাদের পারিবারিক ভ্রমণে, উৎসবে, নানা সময়ে ভাড়া খাটত। শরতের গাড়ি দুঃখের দিনে, আনন্দের দিনে।

বাবা জানালা থেকে সরে এলেন। বোঝা গেল শরৎ আবার বাধ্য হয়েই গ্যারেজের দিকে ফিরে গেল। সেই গোড়ালির উপর ভর দিয়ে যেমন দুমদুম করে হাঁটেন সেই ভাবেই হেঁটে বাবা ঘরে ঢুকলেন। জ্যাঠামশায় বাবাকে অনুসরণ করছিলেন। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাবাকে কাপড় নিতে দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি কি হবে রে? এই এত বেলায়'। বাবা কোনো উত্তর দিলেন না। প্রায় ছিটকে আর একদিকে চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, বাবা মালকোঁচা মেরে কাপড় পরলেন, তার উপর চাপালেন সাদা টেনিস শার্ট। ছুটির দিন, দাড়ি কামাননি, এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। 'চল্লে কোথায়?' জ্যাঠামশায় এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব পেলেন না। সব কিছুই ঘটে চলেছে 'স্পেকটাকুলার স্পিডে'।

গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবা হাঁকলেন—'নিরঞ্জন'। নিমেষে নিরঞ্জন সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের কোণের দিকে মার চকোলেট রঙের ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে বললেন—'তুলে দে গাড়িতে'। এমন ভাবে বললেন যেন ওই ট্রাঙ্কটার মধ্যে মার অনেক দিনের গলিত মৃতদেহ রয়েছে। বাবা এগিয়ে গেলেন জ্যাঠামশায়ের ঘরের দিকে। মা তখন খাটের একপাশে পা ঝুলিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন। অসম্ভব ফর্সা রঙ। রক্তশূন্যতায় জন্যে আরো সাদা দেখাচ্ছে। আমার আবির্ভাবের পর থেকেই মার শরীর ভীষণ ভেঙে গেছে।

আমার নাকি ভূমিষ্ঠ হবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। জঠরের ঈশান কোণে ঘাপটি মেরে বসেছিলুম, বোধ হয় বাবার ভয়ে। তারপরে এক সময় উপায় না দেখে হেলানো পাটাতন বেয়ে লোকে যেমন হড়কে নামে সেইভাবে সড়াৎ করে নেমে এলুম। আসার সময় মার একটা ভাইটাল নাড়ি উপবীতের মত গলায় জড়িয়ে এনেছিলুম। বাপকো বেটারা বোধ হয় এই কায়দায় জন্মায়। আগে মাথাটা বের করে হালচাল দেখে নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। তাতেও মার কি আনন্দ। অসংখ্য সন্তানের জননী হবার ইচ্ছে ছিল মার। গিনিপিগের মত ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। বাবার ঠিক উল্টো। 'ওয়ান ইজ এনাফ। সেকেণ্ড ইজ অ্যাকসেপটেবল উইথ এ পিকচার।

বিছানার উপর হাতের চেটোটাকে উল্টো রেখে মা আপন মনে আঙুল ছিলেন। লম্বা লম্বা আঙুল। একটা া পোখরাজের আংটি জ্বলজ্বল করছে ামিকায়। বাবা একেবারে মার সামনে য়ে দাঁড়ালেন—'ওঠো'। মা ভয়ে ভয়ে উঠে ড়ালেন। 'চলো'। বাবা চলতে শুরু রলেন। জানেন এ আদেশ অমান্য করার মতো কারুর নেই। মার পরনে একটা নীল টাঁদার শাড়ি। জ্যাঠামশায়ের এইটা লাস্ট ন্‌স। নিজের কোর্টে প্রতিপক্ষকে য়েছেন। দরজা আগলে দাঁড়ালেন। 'এই পুর বেলা বউমাকে নিয়ে কোথায় যাবি?'

'তুমি পঞ্চতন্ত্র পড়েছ?' দরজা থেকে কটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে বাবা প্রশ্ন রলেন। জ্যাঠামশায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা য়ে গেলেন। বুঝেছি পড়নি। পড়বে নে? জীবনে দুটি জিনিস।' দুটো ঙুল তুলে হাতের একটা ভঙ্গি করলেন. ন আর মাছ। শুনে রাখ শরীরের জন্যে য়াজন হলে একটা অঙ্গ ত্যাগ করবে। মের জন্যে একটি পাড়া, শহরের জন্যে ম, দেশের জন্যে শহর। ফর দি স্যাংটিটি । দি ফ্যামিলি লেট দেম বি রিমুভড্‌'। ট শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দরজাব্যূহ দ করার জন্যে এগিয়ে এলেন। জ্যাঠামশায় ন্তু প্রকৃত বীরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ন স্বদেশী আমলে একটা কথা প্রায়ই মাদের কানে আসত—ডু অর ডাই। ঠামশায়ের সাহস দেখে মনে হল এই কটপূর্ণ দিনে তাঁর ব্রত হল—ডু অর ই। 'তোর স্বেচ্ছাচারিতা দিন দিন বেড়েই লছে। হিটলারের মত একটা ডিক্‌টেটার য় উঠছিস। বউমাকে তুই কোথাও নিয়ে তে পারবি না। আই ওণ্ট অ্যালাও।' ঠামশায়ের মুখে ইংরেজী মানে তিনি ব রেগে গেছেন। শুকনো তোয়ালেটা ওরায় উড়ে যাচ্ছিল দু হাতে তাড়াতাড়ি পে ধরলেন আর 'গাদি' খেলার লোয়াড়ের মত বাবা সট্‌ করে দরজা গলে রিয়ে গেলেন। মা দাঁড়িয়ে রইলেন, কি াবেন ভেবে পেলেন না। শেষে বললেন, মি তবে আসি'।

'কোথায় আসবে তুমি মা? তুমি খানে গ্যাট হয়ে বসে থাকবে। হু ইজ ? এ টাইরাণ্ট! আই উইল সি হিম।'

জ্যাঠামশায় হাঁকলেন—'নিরঞ্জন।'

রাস্তা থেকে উত্তর এল—'যাই মেজ বু।'

'নামিয়ে নিয়ে আয়'।

'বাক্‌সটা?'

'হ্যাঁ বাক্‌স'। নিরঞ্জন চলে গেল বাকস নিতে।

বাবা পাল্টা নির্দেশ দিলেন, 'খবরদার যাবি না।' নিরঞ্জন সিঁড়ির বাঁকে থেবড়ে বসে পড়ল। জ্যাঠামশাই টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে ঘোষণা করলেন, 'এই বাড়ি থেকে কারুর একপা বেরোনো চলবে না। এটা জয়েণ্ট ফ্যামিলি। কারুর একার মতে সংসার চলবে না।'

বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'অবিশ্বাসী, ষড়যন্ত্রকারী স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চলে?'

'বউমা এর কোনটাই নয়। তোমার চিরকালের স্বভাব তিলকে তাল করা। আই ডোণ্ট এগ্রি উইথ ইউ।'

'আমার ফ্যামিলি আমার মতে চলবে। এ সব ব্যাপারে নো লিনিয়েনসি।'

শরৎ রাস্তা থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কি হল রে বাবা!'

জ্যাঠামশাই চিৎকার করলেন, 'নিরঞ্জন, রাসকেল, বাক্‌স নামিয়ে আন আর শরৎকে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় কর।'

'আমাকে ছোটোবাবু জুতো পেটা করবেন।'

'আমি তোকে ডাণ্ডা পেটা করব রাসকেল। তোমার ফ্যামিলি কি? আমরা তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম। বউমা তোমার একার নয়। এই বাড়ির বউ।'

নিরঞ্জন বাক্‌সটা ঘাড়ে করে ওপরে উঠে এল। শরতের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

'তুমি জামা কাপড় খুলবে কি না?'

'মেজদা তোমার প্রশ্রয়ে সংসার উচ্ছন্নে যাবে'

'যায় যাবে। ডোণ্ট ফরগেট, সংসারটা তোমার অফিস নয়। কথায় কথায় ডিসচার্জ আর চার্জশিট করবে'।

'স্বীকার করুক অন্যায় হয়েছে। আই উইল পার্ডন হার।'

'বউমা।'

মা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন. দরজার পাশেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ একেবারে বিবর্ণ।

'বল অন্যায় হয়ে গেছে।'

বাবা বুক চিতিয়ে চিবুক উঁচু করে দাঁড়ালেন। মা গলায় আঁচল দিয়ে খুব মৃদু সুরে বললেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

বাবা মুখ উঁচু রেখেই বললেন, 'আর কখন এরকম কোরো না। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। পানিশেবল অফেন্‌স। কক্ষনো নিজে কোনো ডিসিসান নেবে না। মেয়েছেলে, মেয়েছেলের মত থাকবে।'

মা পিছন ফিরে ধীরে ধীরে চলে যেতে যেতে নারীর অধিকার সংক্রান্ত শেষ উপদেশ শুনে নিলেন।

সেই শ্বেতপাথর। সেই শ্বেতপাথর দাঁড় করানো রয়েছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। সেই নক্‌শা ক্রেম চলে গেছে উইয়ের পেটে। আর শ্বেত বলা চলে না, অব্যবহারে ধূসর। জীবন থেকে চল্লিশটা উত্তপ্ত বছর বাষ্পের মত বের করে দিয়ে বরং বাবার চুল এখন প্রকৃত দুগ্ধশুভ্র। মা এখন অয়েল পেণ্টিংয়ে অস্পষ্ট স্মৃতি। জ্যাঠামশায় একটি ধূসর ছবি। শুকনো মালায় মাকড়সার লালা। দাদুর লাউফাটা তানপুরা গলায় দাঁড় দিয়ে হুক থেকে ঝুলছে। চিবুক উঁচু করে বাবা এখনো দাঁড়াতে পারেন কিন্তু পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসার মত কেউ এ পরিবারে আর অবশিষ্ট নেই।

এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর স্মৃতী কাপড় এত মজবুত ও টেকসই যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই সুতী কাপড়
BCCM-32-75 BEN

ঘরে বাইরে

বোম্বাই থেকে সুন্দরবন

দিন কয়েক আগে বোম্বাই থেকে সুন্দরবন বেড়াতে এসেছিলেন বকুল প্যাটেল। বললেন, 'বুকভরা মধু, বঙ্গের বধু' কথাটি কত যে খাঁটি! নদী, নালা, খাঁড়ি পার হয়ে লাল পেড়ে শাড়ি পরনে, কপালে সিঁদুরের টিপ, অল্প ঘোমটা টানা মেয়েরা এসেছিলেন বোম্বাই থেকে আগত অতিথিকে স্বাগত জানাতে। যেমন তাদের মধুর ব্যবহার, তেমনই মধুর তাদের হাবভাব। স্বামী রজনীভাই প্যাটেলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নিমন্ত্রণে সুন্দরী সুন্দরবনের সফরে এসেছিলেন ওঁরা। বলছিলেন পর্যটকের তীর্থে পরিণত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাময় সুন্দরবন এক রোমাঞ্চময় স্থান। প্রকৃতির বিচিত্রতায় ভরা।

বকুল প্যাটেলের দারুণ আপত্তি যে তাঁকে সবাই বকুল না বলে, বলে বকুলা। এমনকি অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের মহিলাদের যে ডাইরেক্টরী তৈরী হচ্ছে তাতে ওঁর সম্বন্ধে লিখবার ব্যবস্থার কথা জানিয়ে যে চিঠিখানা এসেছে তাতেও তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে 'বকুলা' বলে। বাংলার মানুষ কিন্তু তাঁকে বকুল বলেই ডেকেছে। আমি বললাম বকুল আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সুগন্ধ আর সুরভি নিয়ে। আমরা বকুলকে বকুল বলে সাহিত্যে, রচনায়, কবিতায় জানি।

বকুল প্যাটেলের চারদিকে রাজনীতির পরিবেশ কিন্তু নিজে রাজনীতির বাইরে। সমাজকল্যাণ আর রাজনীতি যেখানে মিশেছে সেখানে তাঁর আনাগোনা। বোম্বাইতে দেখেছি সপ্তাহের খাটুনি, পরিশ্রম আর মেহনতের শেষে রবিবার ভোর হতেই চলে যান বস্তিতে। জল ঝড় রোদ্দুর কিছুতেই দমবার পাত্রী নন তিনি। রাস্তায় জল জমে পথ বন্ধ। তাতেও তিনি এগিয়ে যেতে পারেন, মুষলধারে বৃষ্টি, ভ্রুক্ষেপ নেই। তাই সুন্দরবনের মথুরাপুরে বৃদ্ধা বালক-বালিকা ধনী দরিদ্র সবাই এগিয়ে এসেছে। দেখে বকুল আনন্দে আত্মহারা। জনসমাবেশ যেন বলছে স্বাগতম। তাঁর মনে হয়েছে বাঙালী অনুভবনশীল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সচেতন, নতুন যুগের ইঙ্গিতে তারা এগিয়ে চলেছে।

বকুল শিক্ষিত মেয়ে। মাইক্রোবায়োলজিতে বি এস সি পাশ করেছেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষা হয়েছে বোম্বাইএর বিখ্যাত টাটা ইনস্টিটিউটে। সংশোধন কাজের বিভাগে পড়াতেন। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আজও সে আগ্রহ তাঁর সমান রয়েছে। এরপর লন্ডনস্থ চাটার্ড ইনস্টিট্যুট অব কম্পানি সেক্রেটারী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ শিক্ষা বেশ কঠিন। তাতে আইন থেকে নিয়ে হিসাব নিকাশ, অর্থনীতি কোনটাই বাদ থাকে না। শিক্ষান্তে বোম্বাইতে মস্ত বড় এক কম্পানীর ডিরেক্টর হয়েছেন। আমার যা সবচেয়ে বেশী চোখে ঠেকেছিল তা হচ্ছে মস্ত বড় অফিসের অফিস-কামরায় তিনি যেমন তৎপর ও সুন্দর, ঘরের চায়ের আসরে ঠিক ততটাই গৃহিণীসুলভ সৌজন্য ও সমাদরের আয়োজনে অনন্য। ভারতবর্ষের প্রতি কোণে মহিলা সমাজের একটু ঝলক আমরা যখন দেখি, মনটা যেন ভরে যায়।

[প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, "লেট ফুড বি দাই মেডিসিন"—খাদ্যই আপনার ঔষধ ও চিকিৎসা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন শরীর অসুস্থ হলে অসুস্থতার কারণ প্রথম দূর করা দরকার। ক্ষতি যা হয়ে যায় তা পূরণ করতে প্রকৃতিকে প্রস্তুত করতে হবে। উপবাস, কাঁচা ফল ও শাকসবজি, জল প্রয়োগ, মালিশ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, ভয়-হীনতা, নির্মল জল পান সবই প্রকৃতি মায়ের প্রধান সঞ্জীবনী। প্রকৃতির নিয়মে যে নিরাময় হয় সেই সেরা নিরাময়, তাতে বিপত্তির আশঙ্কা নেই।]

জলের আর এক নাম জীবন

প্রাচীন ফ্রান্সে মার্সে শহরে একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল চার্মিস। রোগ নির্ণয় করতে অনেক পারিশ্রমিক নিতেন কিন্তু চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল জলের নানা ব্যবহার। সভ্যতার প্রথম উদয়ক্ষণে সাধারণ মানুষ জলের উপকারিতা বুঝে তার বিভিন্ন প্রয়োগ দিয়ে অসুস্থ শরীর সুস্থ করতেন। ক্রমে বিজ্ঞান তার অনেকটা ভুলে গেল, হারিয়ে গেল অকৃত্রিম জীবনধারা সর্বগ্রাসী সভ্যতার নিষ্ঠুরতায়।

জল সম্বন্ধে আর একটু কিছু বলবার আগে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার একটি গল্প বলছি। সম্প্রতি হরিদ্বার গিয়েছিলাম। পৌঁছোবার আগেই কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা। গাড়িতে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠলো। তবু হর-কি-পৌরিতে জাহ্নবীজল মাথায় না দিয়ে ফিরে আসতে মন চাইছিল না। হাত

বামে অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের সেক্রেটারী দীপালি সেনগুপ্ত, মাঝে প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মী রঘুরামাইয়া ও [illegible]

[illegible] ধরে একটু একটু করে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। বরফগলা হিমশীতল জহ্নুকন্যার স্পর্শ। তবু সেই বিগলিত করুণার কোলে একটু একটু করে অবগাহন করে উঠে দেখি কোথায় সেই যাতনা? শারীরিক ক্লেশের চিহ্নমাত্র নেই। অনেককেই প্রশ্ন করেছি কি করে এরকম হলো। এও কি জলশুশ্রূষা না আর কিছু?

গল্প আমার এখানেই শেষ হয় নি। আমার কোমরের ব্যথার মত আমার স্বামীরও পায়ের পাতা ও গাঁট ফুলে উঠেছিল। কথা ছিল ফিরে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। হরিদ্বার ছেড়ে এলাম। এসেই পরীক্ষা করে রোগ-নিদানের ব্যবস্থার জন্য হাসপাতালে যাবো। জুতো পরতে গিয়ে দেখা গেল কোথায় ফোলা। একেবারে বেমালুম সেরে গেছে। চিহ্নমাত্র নেই। চিকিৎসককে বোঝাতে বেগ পেতে হলো। তিনি ভাবলেন পাগলামির কোনো লক্ষণ বোধ হয় বা।

এবার তৃতীয় গল্পটি বলে আমার কথা শেষ করে জল সম্বন্ধে দু'চারটি সহজ প্রয়োগের উল্লেখ করবো। অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছিলাম তালোয়ার সাহেবকে। তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার চেয়ারম্যান। আমার কথা শুনে নিজের কলেজ জীবনের একটি ঘটনা বললেন। তখন তাঁর বয়স ষোল কি সতেরো। দল বেঁধে অমরনাথ দর্শনে যাচ্ছেন। শেষনাগে পৌঁছে দারুণ জ্বর। সঙ্গীদের বললেন না। তারা যদি আর আগে যেতে না দেয়। অমরনাথের পাশেই অমর গঙ্গা। অমর গঙ্গায় ডুব দিলে তবে দর্শন করা সার্থক। জ্বরের ঘোরে যুবক ভাবলেন এত দূরে এসে পুণ্য না নিয়ে ফিরবো? নামলেন, অমর গঙ্গায়। উঠে এলেন। জ্বর কোথায়। ব্যাধি নিরাময়ের কারণ কি রোগহর [illegible] না অন্য কিছু? কে জানে!

গত শতাব্দীতে তিনজন জার্মান ডাক্তার 'ওয়াটার কিওর' চর্চাকে প্রচলিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে ফাদার নীপ প্রমাণ করেছিলেন যে, সাধারণ জল সর্ব রোগহর। ঠান্ডা এবং গরম দুইই। তিনিই প্রচার করেছিলেন ভোরের শিশির ভেজা ঘাসের উপর হাঁটলে শরীর ভাল হয়। পায়ের তলায় বড় বড় রন্ধ্রপথ খুলে যায় এবং শরীরের আবর্জনা বের হয়ে যায়। ধরিত্রীর শত সদ্গুণপূর্ণ নানা প্রবহণ শরীরকে তখন শক্তি ও স্বাস্থ্য দিতে পারে। শরীরের তাপের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে প্রচুর জল পান করলে শরীরের কোষ সমূহ সতেজ হয়। পেটে ব্যথা হলে গরম জলে তোয়ালে ডুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে চেপে ধরলে উপশম হয়। উষ্ণ জলে স্নান করলে শরীর ও মনের শক্তি নতুন জীবন পায়। দিনের ক্লান্তি, জীবনধারার গতিবেগের অবসাদ দূর করে দিতে পারে উষ্ণ জলে সর্বাঙ্গ প্রক্ষালন। তারপর আসে কাজে আগ্রহ, উদ্যম আর প্রেরণা। এমনকি হাত মুখ ধুলেও কত সতেজ মনে হয় নিজেকে। শরীরে কোথাও ব্যথা হলে বা আঘাতজনিত বেদনা হলে ধরে নেওয়া যায় যে রক্ত জমা হয়েছে। বেদনাস্থানে বা তার আশেপাশে রক্তাধিক্যের চিকিৎসায় গরম জলে [illegible] তোয়ালে ভিজিয়ে সেঁক দিতে পারেন। যে ব্যথার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এমন ব্যথা বেদনা এরকম সেঁকতাপে অদ্ভুতভাবে সেরে যেতে দেখা গেছে। কখনও বা ঠান্ডা জলের পটিতেও খুব উপকার পাওয়া যায়। ক্ষত ইত্যাদিতে গরম জলে বস্ত্রখন্ড ডুবিয়ে পটি দিলে উপশম হয়। সারতে সময় লাগে কম।

মাথা ধরলে গরম জলে, বেশ বেশী গরম জল যতটা গায়ে সয়, তাতে স্নান করলে উপকার হয়। স্নায়ুকে সতেজ করে রক্ত সঞ্চালন সহজ করে। ঘুমের আগে গরম জলে স্নান করলে ভাল ঘুম হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হজমক্রিয়া ভাল হয়। স্নানের সময় হাত দিয়ে, ব্রাশ দিয়ে বা ঘষনি দিয়ে জোরে ঘষবেন। পায়ের তলা পর্যন্ত বাদ দেবেন না। পায়ের তলা পরিষ্কার রাখা শরীরের পক্ষে বিশেষ দরকার। বাথটবে পেটের তলার দিক ডুবে যায় এতটা জল নিয়ে বসে স্নান করলে মাথা থেকে রক্ত নীচে সরে আসে। অন্ততঃ পাঁচ মিনিট এভাবে বসে থাকা দরকার।

শ্রীমতী

ঘরের মধ্যে ঘর

শংকর
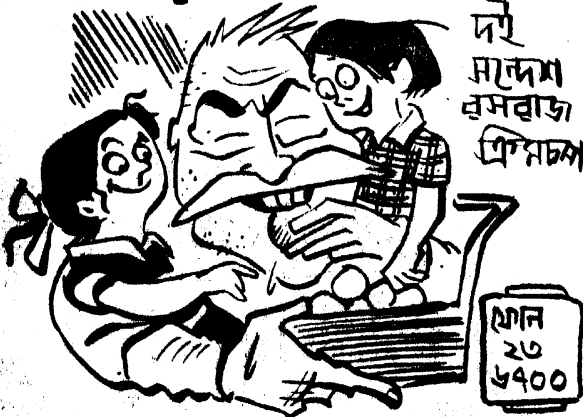
॥ ১২ ॥

হাজত থেকে যে-মার্টিন সায়েব বেরিয়ে এলেন তিনি যেন অন্য লোক। আটচল্লিশ ঘণ্টার ঝড়ে তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছেন।

নতুন বাড়ির দিকে সায়েব আসেনই না। করুণাপ্রসন্ন ততদিন নতুন বাড়ির ম্যানেজার হয়েছেন। ভাড়াটের জন্যেও নানাদিকে চেষ্টা-চরিত্র লাগিয়েছেন। কিন্তু এ-পাড়ায় তখন থ্যাকারে ম্যানসন সম্বন্ধে গোপনে কী সব গুজব ছড়িয়েছে—কেউ এখানে সাহস করে ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চায় না।

সায়েবের অনুমতি নিয়ে ভাড়ার রেট কমানো হলো। তিন মাসের ভাড়া জামানত নেবার যে-পরিকল্পনা কোহেন সায়েব দিয়েছিলেন তাও মকুব করা হলো। একটি পয়সা খরচ না করেও যে কোনো লোক সোজা এই থ্যাকারে ম্যানসনে সংসার তুলে আনতে পারে। তবু চারে মাছ নেই।

ওপনিং নাইটের গোলমালের পর কোহেন সায়েবের সঙ্গে মার্টিন সায়েবের মুখ দেখা পর্যন্ত বন্ধ। মার্টিনের ধারণা, কোহেনের গাফিলতির ফলেই কলকাতার হাই সোসাইটিতে তাঁর এই অপমান হলো।

মনের দুঃখে মার্টিন সায়েব একদিন প্রিয় করুণাপ্রসন্নকে বললেন, "ভাবছি, কলকাতা ছেড়ে হংকং চলে যাবো। আমার নতুন বাড়িখানা তুমিই কিনে নাও।"

করুণাপ্রসন্ন ভাবলেন মদের ঘোরে সায়েব তাঁর সরকারের সঙ্গে রসিকতা করছেন। এই বিরাট প্রাসাদ কিনবে কি না কালিঘাটের সামান্য একজন ক্লার্ক। সায়েব বলেছিলেন, "পেমেন্টের জন্যে কোনো চিন্তা নেই। ধীরে সুস্থে নেকসট পঁচিশ বছর ধরে বাড়িভাড়ার একটা অংশ পাঠিও—তাতেই দাম শোধ হয়ে যাবে।"

পুঁটিমাছের ছিপে আধমণি কাতলা তুলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না করুণাপ্রসন্ন হালদার।

সায়েবের প্রস্তাবটা তিনি অবাস্তব স্বপ্নের মতো হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তারপর মার্টিন সায়েব শ্যামলাল গুপ্তা নামে এক জাঁহাবাজ কালো-য়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শ্যামলালজী টুটা-ফাটা বাসনপত্তর কেনার ফেরিওয়ালা হয়ে কলকাতায় এসে-ছিলেন। ভাঙা শিশি-বোতল এবং ছেঁড়া কাগজ সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে যথাসময়ে তিনি টুপাইস কামিয়েছিলেন। শ্যামলালজী রদ্দি মালের ব্যবসা থেকে এই ব্র্যান্ড নিউ বাড়ির লাইনে আসতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু স্ক্র্যাপের দামেই বিরাট এই বাড়ি পাওয়ায় নিজের লোভ সামলাতে পারলেন না।

মার্টিন সায়েব অবশ্য করুণাপ্রসন্নর কথা একেবারে ভোলেননি। শ্যামলাল গুপ্তার সঙ্গে করুণাপ্রসন্নর আলাপ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন, করুণা-প্রসন্নকে চাকরিতে বাহাল রাখতে। সাহেব বলেছিলেন, "মিস্টার গুপ্টা, কিপ করুণা। এ-বাড়ির প্রতিটা ব্রিক সে চেনে। কারুণার জন্যে তোমাকে কোনোদিন ট্রাবল পেতে হবে না—ইউ উইল নেভার রিগ্রেট ইট।"

দূরদর্শী সাহেব বোধ হয় শ্যামলাল গুপ্তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেননি। বিক্রির আগে আর এক শর্ত দিয়েছিলেন। ওপরের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে করুণাপ্রসন্ন যত-দিন খুশি থাকতে পারবেন—শ্যামলাল গুপ্তার চাকরি না করলেও করুণাপ্রসন্নকে ভাড়া দিতে হবে না।

সায়েবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কায়েমোয়ার শ্যামলাল গুপ্তা সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন—কিন্তু সেই সুযোগে জলের দাম থেকেও হাজার খানেক টাকা কমিয়ে নিয়েছিলেন।

তারপর ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একদিন কলকাতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন। মনের দুঃখে সায়েব গেলেন হংকং-এ। বরদাপ্রসন্ন হালদারের স্মৃতি ছাড়া কলকাতার আর কোথাও তিনি আজ বেঁচে নেই।

মার্টিন সায়েবের দুঃখে এই এতোদিন পরেও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার। বললেন, "গৃহ করতে গিয়ে গৃহ-হারা হলেন ভদ্রলোক—গ্রহনক্ষত্রের এমনই লীলাখেলা।"

"তবে শুনেছি, কলকাতা ত্যাগ করে হংকং গিয়ে সায়েবের সপ্তম শনিটা আবার ঠিক হয়ে গেল। মার্টিন মেমসায়েব বজবজের পাটকল সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে আবার একদিন ফিরে গিয়েছিলেন স্বামীর কাছে। সায়েব ততদিনে প্রায় সর্ব-স্বান্ত হয়েছেন—তবু শেষ জীবনে দাম্পত্য সুখ ফিরে পেয়েছিলেন ভাবতে আনন্দ হয়।"

"শ্যামলাল গুপ্তের কী হলো?" আমি জানবার কৌতূহল প্রকাশ করি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যে-কপালে ডাস্ট-বিনের ছেঁড়া কাগজ থেকে লাখ-লাখ টাকা রোজগার হয় সে কি যা-তা কপাল! তার ওপর ভদ্রলোকের দেবদ্বিজে অগাধ বিশ্বাস। টাকা

থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যেখানে যত দেবদেবীর মন্দির আছে সেখানে পুজো আর প্রণামী দিয়ে সবাইকে হাত করে রেখেছেন।"

শ্যামলালজী প্রথমেই করুণাপ্রসন্নর সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। বললেন, "কাগজে কলমে মালিক আমি, কিন্তু কাজেকর্মে এই থ্যাকারে ম্যানসনের কর্তা তুমিই।"

ভাল করে পুজো-আচ্ছা করালেন শ্যামলালজী। বেনারস থেকে আদর্শাট পুরুত আনালেন সেই জন্যে। দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্যে একবার ভাবলেন, বাড়ির নাম পাল্টে করবেন: বাসুকী ম্যানসন। কিন্তু করুণাপ্রসন্ন উৎসাহিত হলেন না—ম্লেচ্ছ নামে যে-বাড়ি একবার এঁটো হয়ে গিয়েছে তা আবার নাগ দেবতাকে নিবেদন করাটা বোধ হয় নিরাপদ হবে না। বুদ্ধিমান শ্যামলাল গুপ্ত সরকার-মশায়ের কথা শুনেলেন। কিন্তু সরকার-মশায়ের সঙ্গে তিনি বালিয়া জেলার যে দারোয়ান রাখলেন, তার মুখে-মুখে ম্লেচ্ছ 'থ্যাকারে ম্যানসন' হয়ে উঠলো 'ঠাকরে ম্যানসন'।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এতো পুজো-আচ্ছা করেও প্রথম কয়েক মাস কিছুই হলো না। শুধু একতলায় রাস্তার ধারে কিছু চীনে দোকানদার জুটলো। ওদের খাদ্য অখাদ্য, ধর্ম-অধর্ম, শুভ-অশুভ জ্ঞান নেই। কেনা-বেচার পছন্দমতো জায়গা পেলেই ওরা দোকানপত্তর খুলে বসে।"

দু' মাস পরে অধৈর্য শ্যামলাল গুপ্তা করুণাপ্রসন্নকে ডেকে পাঠালেন। করুণা-প্রসন্ন বললেন, "আরও কয়েকটা মাস দেখুন, তারপর যা-হয় করবেন। বদনাম যা ছড়িয়েছে তা মুছতে সময় একটু লাগবেই।"

তারপরেই দুম করে শ্যামলালজীর ভাগ্যের ঢাকনা খুলে গেল। ১৯১৪ সালে ইউরোপে ইংরেজ-জার্মানের মধ্যে রাম-রাবণের লড়াই শুরু হলো এবং বেশ কিছু নতুন সায়েবকে মাথা গোঁজবার ঠাঁই দেবার জন্যে সরকার বাহাদুর হঠাৎ সমস্ত থ্যাকারে ম্যানসন রাতারাতি দখল করে বসলেন।

"বুঝুন মশাই! একখানা ঘরের ভাড়া জুটছিল না; হঠাৎ গোটা বাড়িখানাই ভাড়াটেতে বোঝাই," বললেন বরদাপ্রসন্ন।

"আধা-পল্টনী [illegible] আজব কাণ্ডকারখানা দেখে করুণাপ্রসন্ন তো থ্যাকারে ম্যানসনে নিজের কোয়া-টারে চাবি মেরে সস্ত্রীক আবার কালীঘাটের সদানন্দ রোডে বাসা ভাড়া নিলেন। আর ধুরন্ধর শ্যামলাল গুপ্তা সুযোগ বুঝে গরমেন্টের বড় বড় অফিসারের কাছে গিয়ে এমন প্রিটিশন করতে লাগলেন যেন আচমকা পুরো বাড়িখানা দখল করে নিয়ে সরকার ওঁকে পথে বসিয়েছেন।"

শ্যামলালজী কেন এরকম করলেন আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম না। বরদা-প্রসন্ন ব্যাখ্যা করলেন, "টুটা-ভাঙা বাসন বেচা বুদ্ধি! কোথায় লাগে ব্যারি-স্টাররা। এই কায়দায় শ্যামলালজী বাড়ি ভাড়ার অ্যামাউন্ট যতখানি পারলেন বাড়িয়ে নিলেন। বাড়ির মেরামতির দায়িত্বও নিজের ওপর রাখলেন না গরমেন্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বললেন, আধা-মিলিটারির ব্যাপার, ওখানে প্রাইভেট মিস্ত্রি কুলি ঢুকতে না-দেওয়াই ভাল।"

"কপাল মশাই কপাল!" মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন। "কপাল না থাকলে, পাঁচ সিকের মালের জন্যে কেন আপনি পাঁচ টাকা [illegible] পাবেন, বলুন? এর পরেও যখনকে এসে দেবদ্বিজে ভক্তি করে লাভ নেই, তখন মশাই রাগে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।"

বার্ধক্যে করুণাপ্রসন্ন নাকি আফ-সোস করেছেন। হিসেব করে দেখেছেন যে, সাহস করে মার্টিন সায়েবের কাছে বাড়িটা নিলে মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়ে যেতো—সরকারী ভাড়াতেই কয়েক বছরের মধ্যে মার্টিন সায়েবের পাওনা টাকা শোধ হয়ে যেতো। সায়েব তো ক্যাশ টাকাও চাননি—বলেছিলেন যতদিন ধরে খুশি শোধ কোর।

এরকম ঘটনা কলকাতায় এই শেষ নয়। বরদাপ্রসন্ন নিউ মার্কেটের পিছনে একটা পুরনো ম্যানসনের সরকারগিরি করলেও খবরাখবর মন্দ রাখেন না। বললেন, "এ-রকম [illegible] হয়েছে [illegible] কত হচ্ছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে হিল স্টেশনের এক ছোট্ট হোটেলের সায়েব মালিকের শরীর খারাপ করলো। কিস্তিবন্দীতে হোটেলটা সায়েব বিক্রি করে গেলেন তাঁর কেশিয়ারকে। হিল স্টেশনের সেই কেশিয়ারের ভাগ্য খুললো

"কিন্তু আমাদের এই কলকাতায়।"

"আপনি তো হোটেলে চাকরি করেছেন?" বরাদাপ্রসন্ন আমার সম্বন্ধেও কিছু খবরাখবর জোগাড় করে ফেলেছেন। "তা হলে ওমুক হোটেলের গপ্পো নিশ্চয় শুনেছেন—এই বলে মস্ত এক হোটেলের নাম করলেন তিনি। কেউ মরে বিল ছে'চে কেউ খায় কই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক খরচাপাতি করে অমন রাজপ্রাসাদের মতো হোটেল তৈরি করলেন এক সায়েব। কিন্তু এমনই কপালদোষ জলের ট্যাঙ্কের কোনো গোলমালে নতুন হোটেলে শত-খানেক বাসিন্দার রাতারাতি জন্ডিস রোগ ধরলো। এপিডেমিক বলতে যা বোঝায়! খাপ্পা হয়ে কর্পোরেশন হোটেল বন্ধ করলো—চারদিকে বদনামের ঢিঢি পড়ে গেল।"

বরদাপ্রসন্ন শোনালেন, "তারপর তো জানেনই। ইটের দামে হোটেল বাড়িখানা বেচে দেবার জন্যে ভদ্দরলোক কত চেষ্টা করলেন। বাঙালী ধনী রায়, দত্ত, মল্লিক-মশায়রা এটর্নির সঙ্গে শলাপরামর্শও করলেন। কিন্তু ওই বাঙালীর যা দোষ—নরম মাটি দেখলে আরও দরদস্তুর করতে চায়। সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্যে লেবু তেতো করে ফেললো। ইতিমধ্যে হিল স্টেশনের ছোট হোটেলের নতুন মালিক মায়ের নাম করে কলকাতায় হাজির হলেন এবং বড় ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।"

"তারপর?" আমার প্রশ্নের উত্তরে বরদাপ্রসন্ন হেসে ফেললেন। "গডই বলুন, আল্লাই বলুন আর মা-লক্ষ্মীই বলুন এ'রা যাঁকে দেন তাঁকে ছপ্পর ফু'ড়েই দেন। ভগবানের নাম করে বুক ঠুকে বন্ধ হোটেল-বাড়ি কেনবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল এবং বিরাট এই হোটেলবাড়ি পুরোপুরি রিকুইজিশন করলো সাদা চামড়ার মিলিটারিরা। পাঁচটি বছরের জন্যে হাউস ফুল—মদ মাংসর মোচ্ছব লেগে রইলো ডে অ্যান্ড নাইট, পুরো ফাইভ ইয়ারস। যে বাড়ির খদ্দের জুটছিলো না তাই হয়ে গেল জেনুইন হীরে। ভাবা যায় না!"

"আপনি এসব খবর জানলেন কী করে?" আমি প্রশ্ন করি।

"কলকাতার অর্ধেক লোক এই গপ্পো জানে, মশাই। আপনি কী বলছেন!" তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন বরদাপ্রসন্ন।

"সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো, ওই মল্লিক ফ্যামিলির লোকরা করুণাপ্রসন্নর ঘটনাটা জানতেন।" করুণাপ্রসন্নর ছোট ভাই ও'দের বাড়িতে কুলপুরোহিত ছিলেন। আর ঠাকুরে ম্যানসন হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখটা করুণাপ্রসন্নর মনে এতোই লেগেছিল যে শেষ জীবনে ডেকে ডেকে আত্মীয়বন্ধুদের কাছে দুঃখ করতেন 'স্বয়ং লক্ষ্মী রিকশ চেপে এসে আমার ঘরে কড়া নাড়লেন—আমি বুঝতে পারলাম না, ও'কে ঘরে ঢুকতে দিলাম না'।

করুণাপ্রসন্নর সঙ্গে বরদাপ্রসন্নর সম্পর্ক কী তা জানবার জন্যে আমি ক্রমশ আরও বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠছি। কিন্তু কোনো কারণে বরদাপ্রসন্ন ও-ব্যাপারে আলোকপাত করতে উৎসাহী হলেন না। এতো কথা হচ্ছে, কিন্তু ওই ব্যাপারে যখন বরদাপ্রসন্ন নির্বাক তখন নিশ্চয় কোনো বিশেষ যুক্তি আছে। এ বিষয়ে আমি আপাতত কৌতূহল নিবারণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

ওদিকে কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তের কপালে কী হলো তা বরদাপ্রসন্ন চেপে রাখলেন না। বললেন, "টুটা-ফাটা বিক্রি করা কপালের সব ফুটো ঈশ্বর এবার মেরামত করে দিলেন। রমরমা হয়ে উঠলো এই ঝিমিয়ে-পড়া সাডার স্ট্রীট। গোরা অফিসারদের দয়ায় ঠাকুরে ম্যানসনের চীনে দোকানগুলোও টু-পাইস কামাতে লাগলো। একজন লোকাল চাইনীজ ছোকরা বেণ্টিক স্ট্রীটে জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে এখানে চাইনীজ খাবারের দোকান করেছিল। গোরা অফিসার তো মুচির দোকানের চাকরের চাইনীজ রান্না খেয়েই তোবা-তোবা করতে লাগলো। আসলে মদের নেশায়, সয়াবীন সসে চামড়া ডুবিয়ে দিলেও ওরা বুঝতে পারে না।

বুড়ো চাইনীজ প্রথমে দোকানের নাম দিয়েছিল হোয়াং-হো। কিন্তু গোরাদের সাপোর্ট পেয়ে চীনে সায়েব মদের লাইসেন্স নিলো। নাম পাল্টে রাখলো সিলভার ড্রাগন।

বরদাপ্রসন্নকে চীনাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট মনে হলো না। বললেন, "এ-জাতের কাজ-কর্মের কিছুই মানে বুঝি না, মশাই। মুখ দেখে বুঝতেই পারি না হাসছে না রেগে আছে।"

শাজাহান হোটেলের আমল থেকেই আমি চীনা ভক্ত। ওই হোটেলে একটা বড় চীনা সেকশন খোলবার জন্যে সত্য-সুন্দরদা অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তেমন সুবিধে হয়নি।

বরদাপ্রসন্নকে আমার মতামত

জানালাম। "কিন্তু যাই বলুন, চীনা রান্নাটা খুব ভাল। শত শত বছরের সাধনায় ঐ বিদ্যেটা ওরা আয়ত্ত করেছে।

মুখ বিকৃত করলেন বরদাপ্রসন্ন। "কী জানি মশাই, আমার তো মোটেই ভাল লাগে না। আমার এখানে এক চাইনীজ ছুতোর কাজ করতো। সেএকবার ট্যাংরায় তার বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। যাবার আগে বেটাকে দিয়ে মা-কালীর নামে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলুম, যে আমার খাবারে গোরু শুয়োর পাখীর বাসা কিছু মেশাবে না। কিন্তু মশাই, মাছের রান্না মুখে দিয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে আর কি! যারা ভাজা কাকে বলে জানে না, তাদের আবার রান্না কী মশাই! তাছাড়া মশলাপাতি সব আলাদা আলাদা করে আমার সামনে বসিয়ে দিল, বললে তোমার পছন্দ মতন এইসব মিশিয়ে নাও। আরে বাপু, আমিই যদি সব মিশিয়ে নেবো, তাহলে তুমি রান্না কী করলে?"

বরদাপ্রসন্ন নিতান্ত অবুঝ লোক নন—চাইনীজ রান্না সম্বন্ধে সবাই যে তাঁর সঙ্গে একমত হবে না সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ। একটু কেশে বরদাপ্রসন্ন বললেন, ঠিক হ্যায়, তোমার ছাগল তুমি যেভাবে খুশী কাটো—তোমার রান্না তুমি যেভাবে ইচ্ছে করো; কিন্তু তা বলে খাবার সময় ভূতপ্রেত দৈত্যদানার নাম করবে? খাবার আগে আমরা মশাই ঠাকুর দেবতাদের স্মরণ করি—যারা অভুক্ত তাদের কথা ভেবে ছিটেফোটা উৎসর্গ করি। আর এই চীনেরা দেখুন, খাবার টেবিলের সামনে একটা দাঁত বার করা ড্রাগন এঁকে রেখে দিয়েছে। রাক্ষসের থেকেও খারাপ জীব এই ড্রাগন—দেখলে দাঁতকপাটি লেগে যায়!"

মনে হলো, এ বিষয়ে বরদাপ্রসন্নর কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

সাধারণত ড্রাগন দেখে অনেকে মজা পেয়ে থাকে। বরদাপ্রসন্নকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, "ড্রাগন তো হয় সিলভার, না-হয় গোল্ডেন—সোনারুপোর পুতুলে ভয়ের কী থাকতে পারে?"

আমার কথায় বেশ বিরক্ত হলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার। "আপনিও এই কথা বলছেন! ড্রাগনের মুখোমুখি এখনও তো হননি। কিন্তু ঠাকুরে ম্যানসনে যখন এসেছেন তখন নিশ্চয় ড্রাগনকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তখন কিন্তু আমাকে দোষ দেবেন না।"

বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। পূর্বাঞ্চলের বস্তিপাড়া থেকে তোলা উনুনের কয়লা থেকে ঝাঁক-ঝাঁক ধোঁয়া পিতৃপরিচয়হীন মেঘের মতো ঠাকরে ম্যানসনের সন্ধ্যাকে ধূসরতর করে তুলেছে। বরদাপ্রসন্ন

ফিসফিস করে বললেন, "বাস্তুসাপ বোঝেন? যিনি বাড়িতে থেকেই সবাইকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষে করেন? এ-বাড়িতেও তিনি ছিলেন। করুণাপ্রসন্নর আমলেই তাঁকে কয়েকবার দেখা গিয়েছিল—দারোয়ানরা কিছুই বলতো না। বলবেই বা কেন? বাস্তু সাপ তো কারুর ক্ষতি করে না। কিন্তু ওই চীনে চামার—জুতোর দোকান ছেড়ে এসে যে বাউন-ঠাকুরের কাজ নিল—টংটাং না ওই ধরনের কী একটা নাম, এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না।"

বাক্য সমাপ্ত না করে বরদাপ্রসন্ন মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর বললেন, "না, ভুল হয়ে গিয়েছে টুং টাং না, পিন উটাং নাম ছিল ওই চীনে হোটেলের মালিকের। সে মশাই বলা নেই কওয়া নেই একদিন ওই বাস্তু সাপকে লাঠি দিয়ে সবার সামনে মেরে ফেললে! ওই যে রাম-সিংহাসন চৌরাসিয়া আমাদের দারোয়ান, ওর বাপ নীতিরাজ সিং তখনও এখানে কাজ করছে। চীনে সায়েবকে সে বারণ করেছিল—কিন্তু চীনে সায়েবের তখন টাকার মেজাজ, যুদ্ধের বাজারে গোরা-অফিসারদের কাছে আধেক হুইস্কি অর্ধেক জল বেচে অনেক টাকা কামিয়েছে। নীতিরাজের কথা সে শুনলোই না।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "তারপর মশাই, ওই পিন উটাং-এর ভাইপো, হংকং না কানটন কোথা থেকে আর এক চীনেকে ধরে নিয়ে এল। শুনেছি, তাকে দেখলে মনে হতো গুন্ডা- গুলি-গুলি চোখ, ঝুলে-পড়া গোঁফ, মাথায় হাফ টাক হাফ বেণী, অনেকটা অর্ধনারীশ্বর গুন্ডার মতন! অথচ চীনে সায়েবের ভাইপো বললে, ইনি নাকি চীনে সন্ন্যাসী। দু চারদিনের পুজো-আচ্ছার জন্যে এখানে এসেছেন।"

এই ঠাকুরে ম্যানসনে কত গল্প যে জমা হয়ে আছে তা আন্দাজ করতে পারছি না। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আসলে ওই চীনে সন্ন্যাসী মশাই, তুকতাক করে, মন্তর পড়ে আমাদের বাসুকীকে হটিয়ে ওই হোটেলের মধ্যে সিলভার ড্রাগন বসিয়ে গেল। দেড়-মাস ধরে কী সব স্পেশাল রং এবং আরও সব জিনিসপত্তর দিয়ে লোকটা নাকি দেওয়ালের গায়ে ওই ড্রাগনকে বসালো, তারপর তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলো।"

"প্রাণ প্রতিষ্ঠা কী জিনিস?"

"বাউনের ছেলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বোঝেন না!" বিরক্ত হলেন বরদাপ্রসন্ন। "মাটির মূর্তি তো গড়লেই হলো না—আসল পুজোর আগে পুরুতমশাই প্রথমে মন্তর ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ওঁ বাঙমনশ্চক্ষুস্ত্বকশ্রোত্র ঘ্রাণ-প্রাণা ইহা গত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।...ইহা গচ্ছ, ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।"

তেমনি বোধ হয় গোপন সব মন্তর বলিয়ে ওই আঁকা-ড্রাগনকে জাগ্রত করে ফেললো।"

"কোথায় এই ড্রাগন ঠাকুরকে বসালো জানেন? এক স্পেশাল ঘরে—মাটির তলায়। ঘরের মধ্যে ঘর শুধু নয় মশাই—এখানে ঘরের তলাতেও ঘর! বেসমেণ্টে সবাই ঢুকতে পেতো না। গোপন কোনো পুজো-আচ্ছার ব্যাপার হয়তো আছে। গভীর রাতে ধূপ টুপ জেলে কী সব যাগযজ্ঞও হতো। তেমনি এক গভীর রাতে আমি মশাই লাইফে একবার সেই রুপালী ড্রাগনকে দেখেছিলাম। ভাবলে আমার গা এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে!"

"কেন কী হলো" আমি জিজ্ঞেস করি।

বরদাপ্রসন্ন এবার ডান হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন। "আমাকে অবিশ্বাস করবেন না, আপনার গা-ছুঁয়ে বলছি—সে এক বীভৎস দৃশ্য। ঠিক যেন অমাবস্যার রাতে শ্মশানে তান্ত্রিক মতে কালীসাধনা হচ্ছে। দেওয়ালে আঁকা ড্রাগনখানা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙছে। রুপোলী রাক্ষসের লাল জিভখানা এমনভাবে লকলক করে উঠলো যে আমার মনে হলো কেউ এখানে আর জ্যান্ত থাকবে না।"

বরদাপ্রসন্ন এবার উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন। "এই এতোদিন পরেও ড্রাগন যে এ-বাড়িতে এখনও জাগ্রত হয়ে আছেন তা আমি জানতামই না। আমার মনে হলো সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসছে। আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ড্রাগনের গরম নিশ্বাস আমার মুখে-চোখে ছড়িয়ে পড়ছে আর সেই গরমে আমার শরীর গরম হওয়া তো দূরের কথা ক্রমশ বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আসছে।"

[ক্রমশ]

বিশ্ববিজ্ঞান

আবহাওয়া সম্পর্কে সাবধান

আগের তুলনায় পৃথিবীতে এখন বড় হরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এবং দেখা াচ্ছে ওই সব শহরের আবহাওয়া মণ্ডলের াপমাত্রা অবশিষ্ট অঞ্চল থেকে গড়ে প্রা ক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বেশি। শিল্প. ালানি সমৃদ্ধ যানবাহন প্রভৃতির দরুন াতাসে কার্বন ডাইঅকসাইড-এর পরিমাণ বাভাবিকের চেয়ে অনেক গুণ বেড়েছে। বড়েছে ধূলিকণার পরিমাণ। একে একে ারা পৃথিবী জুড়ে বসান হয়েছে কয়েক াজার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়েক ডজন ারমাণবিক চুল্লী, হাজার হাজার শিল্প তিষ্ঠান। এ সব জায়গা থেকে উদ্বৃত্ত ত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের পরিবেশে। র ফলে সারা পৃথিবীর আবহাওয়া আগের য়ে যথেষ্ট উষ্ণতর হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ই মন্তব্যটি করেছেন অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞান াকাদেমির বিজ্ঞানীরা। গত পনের মাস রে এগারজন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীর একটি ল পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে ব্যাপক র্যবেক্ষণ চালিয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ রেছেন সে সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ই মন্তব্য।

আকাদেমি তাঁদের এক প্রতিবেদনে লেছেন, বিমান এবং মহাকাশযানের চলা-লের দরুন পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশের বায়ু-ণ্ডলে যে সব গ্যাসীয় আবর্জনা জমে ঠেছে তার প্রভাবে ওজন-স্তর ক্রমেই পাতলা য়ে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর বুকে আগের লনায় অতিবেগুনী রশ্মির মাত্রাও বেড়েছে। ল্লেখ্য, পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে ১০ থেকে ৫ মাইলের মধ্যে যে বায়ুস্তরটি রয়েছে ার মূল উপাদান ওজন গ্যাস। দূরাকাশ থেকে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অতি-বেগুনী রশ্মির বেশির ভাগ এই স্তরে শোষিত হয় বলে তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীর জীবজগৎ রক্ষা পেয়ে থাকে। াকাদেমি সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তিমধ্যে মানুষ তার পৃথিবী নামক এই হটিকে অনেকখানি বাসের অনুপযুক্ত করে লেছে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে চলছে এক চিত্র ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই ক্রিয়ার স্বরূপটি উদ্ঘাটনের জন্য পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের একত্রি য়ে বছরের সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ চালান উচিত। তারপর যথাযথ প্রতিবিধানের পথটি হয়ত খুঁজে বের করা যেতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পৃথিবী আবার একটি বরফ-যুগের কাছাকাছি এসে পড়েছে বলে যাঁরা দাবি তুলেছেন, হয়ত তাঁরা ভুল করছেন। তেমন কিছু ঘটলে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ায় একটা বিপর্যয় ঘটবে, ঠিক কথা। অতীতের ভূ-তাত্ত্বিক যুগে এমন ঘটনা বার বার ঘটেওছে। তবে বর্তমানের ক্ষেত্রে সেটা ঘটতে এখনও অনেক দেরি। কারণ এ ধরনের ঘটনা ঘটে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। সে ব্যবধান কয়েক হাজার, কখনও বা কয়েক শ' হাজার বছরের, এটা কয়েক দশক বা শতাব্দীর ব্যাপার নয়।

তবে হ্যাঁ, আকাদেমি একটি ব্যাপার কিন্তু স্বীকার করেছেন। বলেছেন, মাঝে মাঝে অঞ্চলে অঞ্চলে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। এই পরি-বর্তনের ফলে ওই সব অঞ্চলে কখনও অতি-বৃষ্টি, কখনও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ঘটে প্রচণ্ড ঝড় অথবা বন্যা। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে এ ধরনের দুর্যোগ যে কতটা মারাত্মক হতে পারে ভুক্তভোগী মাত্রই তা অনুমান করতে পারেন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে ওই সব আঞ্চলিক আবহাওয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক জানার ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বলা হয়েছে, ১৯৪০ সালের পর থেকে উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা কমেছে গড়ে প্রায় ০·৩ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। তুলনায় অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের তাপমাত্রা খানিকটা বেড়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগের মত। তুলনায় উত্তর গোলার্ধে কমেছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের আবহাওয়া মণ্ডলের সংগে সম্পর্ক অতি নিকটের। পরস্পরের ওপর

এক নজরে

সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্যে এবার অভিনব পদ্ধতির কথা ভাবছেন কোন কোন বিজ্ঞানী। তার কল্পনার সেই উৎপাদন কেন্দ্রটি কৃত্রিম উপগ্রহের মত পৃথিবীকে বেষ্টন করে যখন পরিক্রমণ করবে তখন এই হবে তার চেহারাটি। এই উপগ্রহতে থাকবে চারটি অংশ। তাদের মোট দৈর্ঘ্য ১৮ কিলোমিটার। অতিকায় গামলার মত দর্পণের সাহায্যে সৌরতাপ কেন্দ্রীভূত করা হবে এক একটি অংশে। সেই উত্তাপে চালান হবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ডান পাশে উপরের দিকে বেতার তরঙ্গ প্রেরক অ্যান্টেনা—গোলাকার গামলার মত। বেতার তরঙ্গরূপে বিদ্যুৎ শক্তি পাঠিয়ে দেবার দায়িত্ব এই অ্যান্টেনার ওপর বর্তাবে।

নির্ভরশীল। যথাযথ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে হলে এই সম্পর্কটির স্বরূপটি জানা দরকার। এর জন্যে পৃথিবীর সব দেশের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

মস্তিষ্ক এবং চোখের তারা

কেউ যখন বলেন, দাঁড়ান মশায়, এখন গোলমাল করবেন না, এখন উনি ভাবছেন। অর্থাৎ সোজা কথায়, যে ব্যক্তিটি সম্পর্কে কথাটি বলা হল, তাঁর মগজ তখন কাজ করছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠবেন কেউ কেউ হয়ত। বলবেন, সে আবার কি! কারোর হাত পা কাজ করছে বললে তবু তার অর্থ হয়। হাত পা নড়াচড়া করলে আমরা বলি, হ্যাঁ, তারা কাজ করছে। কিন্তু মাথার খুলির মধ্যে ঢাকা মগজ নামক যে বস্তুটি থাকে, আমাদের চেতন এবং অবচেতন মনের যে আধার, আমাদের চিন্তাভাবনা, শারীরবৃত্তীয় দায়দায়িত্ব পালন করার দায়দায়িত্ব যার ওপর ন্যস্ত, কখন সে সক্রিয় হয়, কখন হয় না—বাইরের দৃষ্টিতে সেটা বুঝবেন কি করে?

'চেষ্টা করলেই বোঝা যায়।' সম্প্রতি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন সাদার্ন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন গবেষক, রিক গার্ডনার, জানেল বেলতান্তো এবং রিকার্ড ক্রিনসকি। (পার্সেপচুয়াল অ্যান্ড মোটোর স্কিলস, ৪১ খণ্ড, ৯৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তাঁদের পদ্ধতিটি এই রকম ঃ এমন একজনকে বেছে নিন যাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটি যথেষ্ট সহজ। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে সরাসরি চোখের দিকে চেয়ে থাকেন, তাতে তিনি কিছু মনে করবেন না।

এবার সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা মনে মনে ভেবে নিন। যে কোন সংখ্যা। আপনার খুশিমত। শুধু সাত অঙ্কের হলেই হল। এর পর ওই সংখ্যাটি বার বার তাঁর সামনে আওড়ে যান এবং তাঁকে মুখস্ত করতে বলুন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সংখ্যাটি শেষবারের মত একবার উচ্চারণ করে দশ সেকেণ্ড থামুন। তারপর ভদ্রলোককে সংখ্যাটি বলতে দিন। আর যতক্ষণ এইভাবে চলতে লাগল, আপনি তাঁর চোখের তারাটি লক্ষ করুন।

যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে, তা হলে দেখবেন, যে মুহূর্তে সংখ্যাটি আপনি উচ্চারণ করতে শুরু করলেন, সেই ভদ্রলোকটির চোখের তারা সম্প্রসারিত হল। যখন আপনি সংখ্যাটি উচ্চারণ করা থেকে বিরত হলেন, তাঁর চোখের তারা সঙ্কুচিত হল। তারপর স্মৃতি থেকে আপনার বলা সংখ্যাটি যখন পুনরাবৃত্তি করলেন তখন আবার তাঁর চোখের তারা সংকুচিত হল।

তা হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?

গবেষকদের বক্তব্য, মনে হয় একটা ব্যাপার মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্ভবত চোখের তারার মিল রয়েছে। যখন কেউ কোন কিছু মুখস্ত করতে চান, তখন তাঁর মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা হয় সঙ্কুচিত। সম্ভবত ওই সময় তাঁর স্মৃতি-রক্ষাকারী মস্তিষ্ক কোষগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যখন তিনি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে সেই অনুভূতি ব্যক্ত করতে চান। এ দুই-এর কোন কিছু না ঘটলে চোখের তারা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্প্রসারিত থাকে। বলা বাহুল্য, চোখের ওপর আলো পড়লে অথবা কানের পাশে জোর শব্দ হলেও কিন্তু চোখের মণি সঙ্কুচিত হতে দেখা যায়। তবে আপাতত সে প্রসঙ্গে না গিয়ে গার্ডনার এবং তাঁর সতীর্থদের পরীক্ষা থেকে একটা কথা

হয়ত বলা যায়, এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে কে আপনার বক্তব্য মন দিয়ে শুনছেন সেটা আপনি ধরতে পারবেন। কোন কিছু শুনে স্মৃতিপটে রাখা এবং স্মৃতি থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কে কতটা সক্ষম সেটাও।

বৃহত্তম উল্কাপিন্ড

৮ মার্চ চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা বড় রকমের উল্কাবৃষ্টি হয়ে গেল। খবরটি উদ্ধৃত করে চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান সিনহুয়া মন্তব্য করেছে, মানব ইতিহাসে এমন প্রচন্ড উল্কা-ঝড় এই প্রথম ঘটল। ছোট বড় টুকরোয় উল্কাপিন্ডগুলি একটি ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে বৃহত্তম উল্কাপিন্ডটির ওজন ১৭৭০ কিলোগ্রাম। উল্লেখ্য, এর আগে পৃথিবীতে বৃহত্তম উল্কাপিন্ড বলতে যেটিকে বোঝাত সেটি পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার ওজন ১০৭৮ কিলোগ্রাম। অতএব বলা চলে চীনের এই উল্কাপিন্ডটি পৃথিবীর এখন বৃহত্তম উল্কাপিন্ড।

সিনহুয়ার খবর, ৮ মার্চের উল্কাবর্ষণ ঘটে প্রায় ৫০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে। এবং সবগুলিই স্টোন মিটিয়েরাইটস বা পাথুরে-উল্কা। যাদের মূল উপাদান সিলিকেটস এবং নানা রকমের অকসাইড। প্রসঙ্গত বলা চলে আকাশ থেকে আর এক শ্রেণীর উল্কাপিন্ড-ঝরে পড়তে দেখা যায়। এদের বলা হয় আইরন মিটিয়েরাইটস বা লোহ-উল্কা। এই সব উল্কার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ লোহা এবং নিকেল-সংকর পাওয়া যায়।

উল্কাপিন্ডগুলি পৃথিবীর ভূস্তরের কাছাকাছি পেঁছনর পর তাদের গতি গিয়ে দাঁড়ায় সেকেন্ডে ১২ কিলোমিটার। এবং তাদের গতিমুখ দেখে মনে হয়েছে, পৃথিবীর পরিমন্ডলে প্রবেশের আগে যে কক্ষপথ ধরে সূর্যের চারপাশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই কক্ষপথ পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথের সমতলীয়। এদের মধ্যে একটি উল্কা এসে পড়ে বরফ ঢাকা একটি জায়গায়। সেটি সরাসরি ভূ-স্তরের ১·৭ মিটার গভীরে ঢুকে যায় এবং সেই অবস্থায় বিচূর্ণ হয়। যা শেষ পর্যন্ত সেখানে একটি গহ্বর সৃষ্টি করে। গহ্বরটি তিন মিটার গভীর, তার ব্যাস দুই মিটারের কিছু বেশি।

প্রায় ১০০টি উল্কা পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে, ওদের রঙ কতকটা কাজলের সঙ্গে কিছুটা বাদামী। ওদের মধ্যে যৎসামান্য ম্যাগনেটাইট পাওয়া গেছে। ম্যাগনেটাইট লোহার এক ধরনের অকসাইড। প্রাকৃতিক চুম্বক হিসেবে এই বস্তুটি পৃথিবীতে পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিক অর্থে যে উল্কাগুলি চীনে পাওয়া গেছে (৮ মার্চ ঘটনার সময়) তারা মূলত অলিভাইন ব্রোঞ্জাইট কনড্রাইট। এদের

মূলে উপাদান সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, গন্ধক, ক্যালসিয়াম, নিকেল এবং অ্যালুমিনিয়াম। উল্কাবর্ষণ ঘটেছিল প্রায় ৩৭ সেকেন্ড। ওই সময় আশপাশে যাঁরা শৌখিন ভূ-কম্পন বিশারদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন, ঘটনাটির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তাঁরাই। এই সব বিবরণের মধ্যে আছে, যে পথ দিয়ে আকাশপথে উল্কারা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছিল তার বিবরণ, উজ্জ্বল অবস্থায় প্রথম যে উচ্চতায় তাদের দেখা যায়, তাদের ঔজ্জ্বল্য, বাতাসের স্তর ভেদ করে ছুটে আসার সময় কতটা শব্দ সৃষ্টি করে এবং কত ডিগ্রি কোণ বরাবর ছুটে এসে পৃথিবীর বুকে আঘাত করে, এমন অনেক মূল্যবান তথ্য।

চীনের এই সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা হয়ত বলা যায়। অনেকের ধারণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপারটা বুঝি একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পেরিয়ে যাঁরা বিজ্ঞানী হয়েছেন, তাঁদের। যাঁরা সাধারণ মানুষ, তথাকথিত স্কুল-কলেজের শিক্ষা যাঁদের কম, এ কাজ তাঁদের নয়। অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে শুধু আজই নয়,

অনেক কাল ধরে, অনেক বড় বড় আবিষ্কারক বেরিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই। ওদের কেউ প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞানী ছিলেন না। উদাহরণ ইকায়ে এবং সেকি। ষাটের দশকের শেষে, আপনাদের হয়ত মনে আছে, নতুন একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই ধূমকেতুটির আবিষ্কর্তা দুজন। দুজনই জাপানী। একজনের নাম ইকায়ে। পেশায় সাইকেল মিস্তিরি। নেশা, অবসর সময়ে নিজের বাড়ির ছাদে বসে নিজের তৈরি দূরবীন দিয়ে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে থাকা। অপরজনের নাম সেকি। তিনিও একজন মিস্তিরি। নেশায় ইকায়ের সতীর্থ। ছাদের ওপর থেকে আকাশ দেখতে দেখতে ও'রা একই সময়ে আবিষ্কার করলেন নতুন এবং অজানা ধরনের একটি ধূমকেতু। ও'দের নাম অনুযায়ী ধূমকেতুটির নাম রাখা হয় ইকায়ে-সেকি।

উদাহরণ অনেক আছে। কথাটা তা নয়। যা বলছিলাম সেটা হল, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ জন্মেছে।। বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞান ক্লাবও তৈরি হয়েছে। এই সব বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা তো কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্যসূচী নিয়ে কাজ করতে পারেন। যাদের মধ্যে একটি, আকাশ দেখা। এই আকাশ দেখতে গিয়ে তাঁদের দূরবীন তৈরি করতে হবে, যা আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের দেবে সম্যক জ্ঞান। কোণ, দূরত্ব, গতি, বিশেষ করে উল্কা প্রভৃতির ক্ষেত্রে, মাপতে গিয়ে শিখবেন গতিবিদ্যা, হাতে কলমে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও গ্রামে বসে কাজ করা যায়। এর ফলে চাষ-বাস, বন্যার অবস্থা, অনেক কিছু জানা যেতে পারে। যা আঞ্চলিক প্রয়োজনে কাজে লাগবে। কিভাবে ভূ-কম্পন মাপা যায়, সারা বছর ধরে কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ, যাদের অনেকেই ফসল ধ্বংসের পেছনে কাজ করে। বর্ষার সময় কোথায় বেশি জল জমে, অতি-বর্ষণের সময় কোন্ পথে জলের প্রবাহ দুর্বার হয়, কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে এই প্রবাহ ক্ষতি করতে পারে না, এমন অনেক কিছুর ওপর নিয়মিত অনুসন্ধান চালানর ব্যাপারে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলি পরি-কল্পনা নিতে পারেন। স্কুল কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও এ ধরনের যে কাজ করা যায় তার উদাহরণ ইকায়ে-সেকি। এ সব কাজ যে সব সময় ব্যয়বহুল তাও নয়। দরকার আগ্রহ এবং যথাযথ পরিকল্পনা।

কিশোর বিজ্ঞান

আসামের পাণ্ডু থেকে স্টুডেন্টস সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি বিজ্ঞান সংস্থা সম্প্রতি দ্বি-ভাষায় একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করেছে। নাম 'কিশোর বিজ্ঞান'। পত্রিকাটির যুগ্ম সম্পাদক সুশান্ত ভট্টাচার্য এবং অনুপ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'অসমীয়া ভাষায় বিজ্ঞান জেউতি নামে আসাম বিজ্ঞান পরিষদ একখান৷ উৎকৃষ্ট পত্রিকা বের করেছেন। সে কথা মনে রেখে আমরা আপাতত আমাদের প্রথম সংখ্যাটি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষাতে প্রকাশ করছি।' এই সংখ্যায় সুশান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'বেল টেলিফোনের ১০০ বছর', অনুপ চক্রবর্তীর 'আর্যভট্ট—১৫০০ বছর', পরিমল ভট্টাচার্যের 'শারীরিক গঠন ও জেনেটিক কোড', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম কণা', ডঃ মৈত্রেয়ী দাশের 'ক্যানসার অ্যান্ড দ্য কারসিনোজেন', বি সি দাস পুরকায়স্থের 'পলুশন-এ মিনেস টু ম্যানকাইন্ড' এবং তপনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সায়ান্স, সায়ন্টি-ফিক মেথড অ্যান্ড ইকনোমেট্রিকস' যথেষ্ট সুখপাঠ্য এবং তথ্যবহুল। জনৈক উৎসাহ-দাতা কলকাতায় বর্তমান লেখককে বলেন পত্রিকাটি পরিচালনা করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। আমরা চাই প্রতি মাসে পৃথিবীর উল্লেখ-যোগ্য কিছু আবিষ্কারের কথা এতে লিখব। সেই সঙ্গে থাকবে দেশের বিজ্ঞান উদ্ভাবনার কথা। আসামে এ ধরনের পত্রিকার প্রকাশ খুবই অভিনব ঘটনা। পত্রিকাটি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিদগ্ধজনেরও ভাল লাগবে।

সমরজিৎ কর

ড্রিমফ্লাওয়ারের স্নিগ্ধ, সতেজ সুরভি সারাদিন... সারা অঙ্গ ঘিরে

পণ্ড্‌স-এর ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক্‌ মাখুন,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুভব করবেন সদ্যস্নানের
স্নিগ্ধতা। সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিন পণ্ড্‌স্‌ ট্যাল্‌কের
পরশ, উপভোগ করুন এর শুচিশুভ্র ঠাণ্ডা
আমেজ। এর হালকা মিষ্টি মনমাতানো
গন্ধ কখনো মিলিয়ে যায় না। ঘাম
শুষে নিয়ে আপনার শরীর ঝরঝরে রাখে।
ভ্যাপসা গরমের দিনেও অস্বস্তিকর
চটচটে ভাব আর গায়ের গন্ধ দূর হয়ে যায়।
এটি এত রেশমচিকন
যে মুখেও মাখতে
পারেন।
পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার
আপনার
পরিবারের
সকলের ট্যাল্‌ক্‌।

পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক্‌

**বিলাসী ট্যাল্‌ক্‌
অথচ পরিবারের
মনোমত দামে**

CP 1171

Pond's

চীজব্রো-পণ্ড্‌স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত দায়সহ সমিতিবদ্ধ

আলোচনা
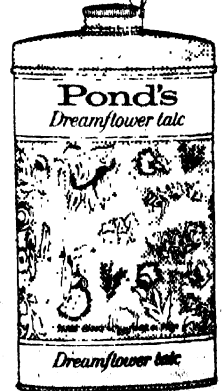
এশিয়াটিক সোসাইটি

এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্য (দেশ, ২২শে শ্রাবণ ১৩৮৩) পাঠাতে কয়েকটি কথা মনে আসছে।

নিবন্ধটির অন্যান্য যুক্তি মেনে নিলেও "...স্বয়ং সরকার কি এখন এই সোসাইটির সুরক্ষা সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন?" এবং আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে "রাজ্য সরকারের একটি বৃহৎ নৈতিক দায়িত্ব প্রতিপালিত হতে পারবে।"...

এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী মনে হচ্ছে না। যদিও বিষয়ী বুদ্ধিতে এই ব্যবস্থাপত্র মনোরম আশু ফলপ্রদ বা 'ইনস্ট্যাণ্ট সল্যুশান'।

এই উপায় নির্দেশের একটি অন্ধকার দিক রয়ে যাচ্ছে। সামাজিক কর্তব্য ও দায়ের দিক। ঐ যুক্তিতে সামাজিক দায় এড়ানো যাচ্ছে না।

সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের যে কোনো উদ্যোগে প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীরই অগ্রণী হওয়া উচিত। দেশের যে কোনো সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগে আমাদের প্রথমেই সরকারের ভিক্ষা-তহবিলের উপর নজর থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষটাই বর্ধিত কলেবরে দেখা দেয়। প্রাচীনকাল থেকে তাই একথা অনেক বেশী সত্য বলেই মনে হয় যে: আমাদের সর্ব অমংগলের মূল সেখানেই—"যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন।" যদিও ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের মর্মকথা বিস্মৃত হওয়ার মতো কালগত পরিমাণ দেখা দেয়নি।

এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির মুমূর্ষু অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লম্বা চওড়া আবেদন প্রতিবেদন প্রায়ই কাগজপত্রে দেখা যায়। সবেরই মর্ম কথা এক। সরকারী ব্ল্যাঙ্ক চেক।

ওয়েলফেয়ার স্টেটের ওয়েলফেয়ারেই আমাদের সর্বসিদ্ধির রক্ষাকবচ। এ যেন পুণ্যার্থীর পুণ্যলাভের পাথেয় যোগাড় করে দিয়ে আমরা কৃতার্থ। যেখানে আমাদের উঞ্ছবৃত্তির জন্য আমরা মোটেই লজ্জিত নই। যদিও স্টেট ওয়েলফেয়ার স্টেট এসবের ধারণা বিদেশেরই করুণা।

বক্তব্য এই যে, স্বদেশ স্বদেশ করে শ্লোগানমুখর রাজপথের শোভাযাত্রায় স্বদেশকে পাওয়া যাবে না। স্বদেশবাসীর মধ্যেই স্বদেশকে পাওয়া সম্ভব। আবেদন-নিবেদন তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের শ্রম, তাঁদের সাধ্য, তাঁদের কর্তব্য ও দায়কে উদ্বুদ্ধ করাই সর্বাগ্রে সমীচীন মনে হয়।

সরকারী আনুকূল্য থাকে থাক। কিন্তু যা একান্ত আমাদের নিজস্ব সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা ও শ্রম, ধ্যান ও কর্ম মিলিত হয়ে তা পূর্ণ হয়ে উঠুক। দেশবাসীর এই দান ও দাক্ষিণ্যে দেশবাসী নিজেই তো ধন্য হয়। এ সম্পর্কে আপনাদের উদ্যোগেও "একটি বৃহৎ নৈতিক দায়িত্ব প্রতিপালিত হতে পারবে।"

দেবপ্রসাদ ঘোষ
সাউথ রামনগর

'সংগীতে ভাবনাট্য'

গত ২৪।৭।৭৬ তারিখে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় 'সংগীতে ভাবনাট্য' শীর্ষক সমালোচনাটি পড়লাম। বর্তমান পত্রলেখকের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। সমালোচনাটির কয়েকটি অংশ কিছু বাদানুবাদের অপেক্ষা রাখে। প্রথমত, 'ভাবনাট্য'কে 'অলীক' নামে অভিহিত করার কোনো সংগত যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ শিল্পী-বিশেষের যোগ্যতা কিংবা ব্যর্থতাই সকল ক্ষেত্রে শিল্পগত আদর্শের বৈশিষ্ট্য বিচারের মানদণ্ড নয়। যদিও রাবীন্দ্রিক চর্চার জগতে বস্তুটি নতুন, তথাপি প্রয়োগনৈপুণ্য ও সুরসমৃদ্ধ পরিবেশনের সাহায্যে সহৃদয় শ্রোতার ভাবনালোকে তা যথার্থ ভাবেই নাট্যরসাস্বাদন ঘটাতে সক্ষম। উক্ত অনুষ্ঠানে এবং শিল্পীর পূর্ববর্তী কয়েকটি (ভাবনাট্যের) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্তত এই সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেছে। সেই দিক দিয়ে বিষয়গতভাবেও 'ভাবনাট্য' সার্থক নামকরণের এবং স্বকীয়তার দাবি রাখে। কারণ, পরিবেশনকালে যদি 'ভৈরো রাগে প্রভাত-রবি রাগে মুখ আঁধার' করে তবেই যেমন উল্লিখিত রাগটি অলীক পদবাচ্য হয় না, তেমনি শিল্পীর পরিবেশনের ত্রুটির দরুন ভাবনাট্যকে দায়ী করা চলে না। তাই শ্রীসনাতন সিংহের সেদিনের কণ্ঠের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিলেও তাঁর সেই অযোগ্যতাকে আড়াল করতে তিনি ভাবনাট্য নামে অলীক একক অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছেন—এ কথা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বোধ করি সমালোচক ভাবনাট্যের গূঢ় অর্থটিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত তিনি 'ভাবনা বর্ণনাকে 'প্যারাফ্রেজিং' বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'প্যারাফ্রেজিং' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—একই বিষয়ের অন্যতর কথায় প্রকাশ। কিন্তু বর্ণনাটিতে গানের বাণীর আধিক্য থাকলেও তাদের ব্যবহার করা হয়েছে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান পরিচিতি হিসাবে। এটি ভাবনাট্যের সাফল্যের কোনো অবশ্যপ্রয়োজনীয় অংগ নয়। যেহেতু 'রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে ভাবনাট্য' তাই স্বভাবতই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গমে সহায়তার জন্য উপাত্ত হিসাবে গানের বাণীকে ব্যবহার করা হয়েছে। 'নিঃসংগ নায়ক' ও 'বসে আছি হে' ভাবনাট্যে
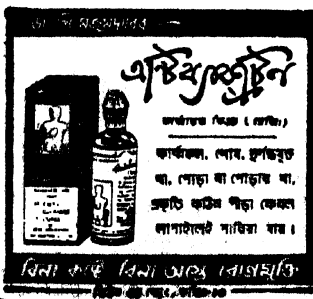
দুটিতে পরিবেশিত গানগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সুনির্বাচিত করে তার আড়ালে এই ধরনের কোন নাট্য গঠন করে যান নি। তা ছাড়া—পুষ্পচয়ন এবং মালা গাঁথা নিশ্চয়ই সমপর্যায়গত শিল্প নয়। দুইয়ের মাঝখানে যে সৃজনশৈলী ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন আছে তা নিশ্চয়ই সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করবেন।

রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
সোদপুর

প্রচ্ছদ

২২ শ্রাবণ ১৩৮৩ তারিখের দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী লিখিত শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ সম্পর্কিত চিঠি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করলাম। উক্ত প্রচ্ছদচিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণের জন্যে শ্রীগোস্বামীকে অজস্র ধন্যবাদ। তবে, আমার মনে হয় তিনি কিছু ভুল তথ্যও পরিবেশন করেছেন।

প্রথমত, তিনি বলেছেন, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়কৃত অশোক মূর্তিটি আপাততঃ দমদম এয়ারপোর্ট হোটেলের দ্বারদেশে দ্বারপালের মত দণ্ডায়মান। কিন্তু পাঠকসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাই, উক্ত মূর্তিটি সম্প্রতি আমি শিল্পীর বাসভবনেই দেখে এসেছি। দ্বিতীয়ত, শ্রীগোস্বামী বলেছেন শিল্পী এটি ঢোকরা কামারদের অনুসরণ lost wax পদ্ধতিতে গড়েছেন, কিন্তু আমার ধারণা; এ ব্যাপারে দেশের টীকাকারের মন্তব্যই নির্ভুল। শিল্পী মাটি দিয়ে আগে মূর্তি তৈরি করেছেন পরে সেটার টুকরো অংশ কেটে কেটে ধাতু দিয়ে ঢালাই করে জুড়ে ঝেলে দাঁড় করিয়েছেন। কারণ, শিল্পীর কর্মশালায় অসমাপ্ত অবস্থায় এ জাতীয় অপর একটি বড় কাজের নমুনা দেখলে তাই মনে হয়। এবং শুনেছি শিল্পী ঢোকরাদের চেয়েও নেপাল, দক্ষিণ ভারতীয় লোকশিল্পীদের মধ্যেই তাঁর অনুসন্ধান চালিয়েছেন অধিক। তবে ঐ ব্যাপারে দেশের পাতায় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় নিজের বক্তব্য রেখে আমাদের কৌতূহল নিরসন করবেন আশা করি।

মানব বড়ুয়া
কলকাতা-৫০

দুই লোকশিল্পী

আপনাদের ১৯।৬।৭৬ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "দুই লোকশিল্পী ও তাঁদের শোলার কাজ" রচনাটি পড়লাম। এই রচনাটিতে কিছু কিছু তথ্য অপ্রকাশিত থেকে গেছে। আমি দীর্ঘদিন থেকে শ্রীঅনন্ত মালাকারকে চিনি এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। এই রচনাটি লেখবার আগে পূর্ণানন্দবাবুর উচিত ছিল মূল তথ্য ভালোভাবে সংগ্রহ করা। যেমন কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রের আলোকচিত্রশিল্পীরা, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং কলকাতার বেতার-কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগ তাঁকে যেভাবে সাহায্য করেছেন সে সাহায্য না পেলে আজ অনন্ত মালাকারের এই উন্নতি সম্ভব হতো না। এ ছাড়া প্রখ্যাত মূর্তিশিল্পী শ্রীশ্রীশচন্দ্র

চিত্রকর মহাশয় ও শ্রীপ্রফুল্ল পাল তাঁকে যেভাবে সাহায্য করেছেন সে তথ্যও এই রচনার মধ্যে নেই। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের রচনার এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, ১৯70 সালে অনন্ত মালাকারের শোলার কাজ নিয়ে ভারত সরকার একটি তথ্যচিত্র করেছেন। কিন্তু এই তথ্যটি ঠিক নয়। এই তথ্যচিত্রটি শ্রীবিভূতি রায় মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে শ্রীঅঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষের সহযোগিতায় তুলেছেন। এই নিবন্ধটির আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, অনন্ত মালাকার শোলাশিল্পের জন্য কোন সরকারী সাহায্য পাননি। কিন্তু এই তথ্যটিও ঠিক নয়। ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বর্ধমানের ডি আই ও-এর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করেন।

সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা ২৭

নারী ও প্রগতি

'দেশ' পত্রিকায় 'নারী ও প্রগতি' পড়লাম।

সত্যি বলতে কি, বাস্তবিক নারী প্রগতি কতখানি হচ্ছে তা প্রতিটি মেয়েরই ভেবে দেখার বিষয়। কবে সেই নারী-জাগরণ সত্যি অর্থে সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে ক্রিয়াশীল হবে জানি না। স্কুলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং শহরের রাস্তায় আধুনিক কিছু নারীর চলাফেরা দেখে প্রগতির মর্মোদ্ধার করা যাবে না।

ভারতের মাটিতে এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মেয়েদের প্রগতি প্রতি পদে পদে ব্যাহত হয়। পুরুষ-প্রধান এই সমাজে পুরুষরাই একমাত্র বাধার কারণ নয়, অনেক নারীও প্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়-স্বরূপ কাজ করে যায়। শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত নারীরা যদি গতানুগতিক অন্ধকারে থেকে পেছনে টেনে রাখে তা হলে ব্যাপারটা অন্যরকম, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সমাজে এমন অনেক শিক্ষিতা নারী আছেন আর্থিক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক যাদের বিয়ের সম্ভাবনা অনেকখানি কম তারা যদি একবার গোত্রান্তরিত হবার সুযোগ পায় তা হলে তারা সংসারে সবচেয়ে বেশী আদর্শের মুখোশ পরে থাকে এবং পরিবারের অন্য নারীরা প্রগতির পথে সবচেয়ে বাধা পায় বেশী তাদের কাছ থেকেই।

আর্থিক বিপর্যয়ে আজ বহু নারীকে ঘরের বাইরে আসতে হয়েছে। যদিও সমগ্র নারীর তুলনায় তা নেহাতই কম। যাদের প্রতিদিন ঘরের বাইরে কাজে বেরোতে হয় তারা ঘরে-বাইরে সমানভাবে কর্তব্য পালন করতে পারে না, তাই মানসিক চাপ থাকে খুবই বেশী। এই চাপ নিয়ে তাকে নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করাকালীন কিছু না কিছু বিরূপ মন্তব্য শুনতেই হয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় নারী আলোচনা অত্যন্ত মুখরোচক। এ তো গেল পুরুষের কথা। এছাড়াও সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই এমন কিছু কিছু নারী আছে যারা অন্য নারীর প্রতি একটা কমপ্লেক্সে ভোগে। কর্মক্ষেত্র সাবিত্র হলে এই নারীদের উপেক্ষা করে অন নারীরা এগিয়ে চলে। কিন্তু যেখানে

কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ সেখানে এক নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কর্মক্ষেত্রে নারীকে কত শত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সে সব ব্যাপারে একত্র হয়ে সংগঠনমূলক কত কাজ করা যায়। কতগুলো অসুবিধা একান্তভাবেই মেয়েদের—সে সম্বন্ধে সাধারণ নারীদের মধ্যে চেতনার উদ্ভব করা, নিজেদের অস্তিত্ব সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য জাগরণ কতভাবেই না দরকার।

কমলা ঘোষ
রাঁচী ১

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

২৪শে জুলাই-এর 'প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র' পর্যায়ে বাংলা ছবিতে গানের ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনাটি একান্ত সময়োপযোগী। একটু ক্ষুধসুরে বললেও রঞ্জনবাবুর তৃতীয় যুক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সমগ্র অভিনয়-শিল্পের সঙ্গে গান এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে যে সেটা ঐতিহ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবতার ধুয়ো তুলে সমজাতীয় বিদেশী শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা পণ্ডশ্রম হবে। সমগ্র বারো মাসের তের পার্বণেই ত গানের সুরের আসন পাতা। সুতরাং উৎসব অনুষ্ঠানের সেই সাংগীতিক কাঠামো কখন যাত্রার মুক্তাঙ্গন পার হয়ে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ ছুঁয়ে চলচ্চিত্রের পর্দায় গড়িয়ে গেছে সাধারণ দর্শক তার হিসাবও রাখে না। ফলত সঙ্গীত যে বেশেই আসুক না কেন আমাদের মধ্যেকার কোন সমালোচক-প্রহরী তার প্রবেশ-পত্র দেখতে চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। এই কারণেই বোধহয় ১৩৪২ সালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "তাই আজও দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে গান যখন-তখন যেখানে-সেখানে অনাহূত অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্য দেশীয় অলংকার-শাস্ত্রসম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাব-সঙ্গত। তাকে ভর্ৎসনা করি কোন প্রাণে? সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুড়ি মশায় কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফর্মাশ করে বসলেন। কোনো বিলাতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অভ্রাৎপাত ...আমি তা করিনে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। সেই সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কিন্তু তার চেহারা যদি সাহেবী ছাঁচের না হয় তবে তাকে পিটিয়ে বদল করতেই হবে একথা বলতে পারব না।"

সুতরাং আমাদের এখানে যত্রতত্র সঙ্গীত প্রয়োগের স্বাধীনতা থাকার ফলেই পরিচালক এবং গীতিকারের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়, বিশেষত কলাতত্ত্বের সংযম রক্ষার ব্যাপারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সত্যজিৎ-প্রমুখ কয়েকজন সচেতন পরিচালককে বাদ দিলে অনেক নাম করা পরিচালকও কি হাস্যকরভাবে গানের ব্যবহার করেছেন, এমন কি সেই সব পরিস্থিতিতে যেখানে যথাযথ গানের প্রয়োগ দর্শককে সহজেই আরো গভীরে নিয়ে যেতে পারত। রঞ্জনবাবু হিন্দী-ছবিকে এই প্রসঙ্গে ধরতে চাননি। কিন্তু হিন্দী-ফিল্ম দেখে এটুকু বোঝা যায় ওখানকার গীতিকাররা চলচ্চিত্রের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝেই গান লিখতে আসেন—তা সে হালকাই হোক বা গভীর। এবং অন্তত তাদের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকে না। পাশাপাশি বাংলা ছায়াছবির সাম্প্রতিক গীতিকারদের চেহারা কি বিবর্ণ। জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে আধুনিক কবিদের সম্পর্কটা এক অস্বস্তিকর দূরত্বে আটকে আছে। ফলত আমরা যা পাচ্ছি তা রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের অক্ষম অনুকরণে সিনেমার পদ্য।

অতএব সমস্যাটা গানের পরিমাণ নিয়ে ততটা নয়, যতটা পরিনতির। আমাদের চলচ্চিত্রের গানের সংখ্যা ভবিষ্যৎ কোন 'বিলিভ ইট অর নট'-এ স্থান পাক—তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেগুলোর কাব্যগুণ যেন থাকে এবং অন্তত তাদের প্রতিক্রিয়া যেন সিচুয়েশন তৈরীতে বিরূপ না হয়।

দীপক গোস্বামী
নৈহাটি

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে পিনাকী দাশগুপ্তের চিঠিটি পড়লাম। তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন যে, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে লেখাগুলি দুর্বোধ্য। আমি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সব লেখাগুলো পড়িনি, কিন্তু যে কটা পড়েছি তাতে আমার তাঁর লেখাকে কখনই কঠিন বলে মনে হয়নি।

শ্রীদাশগুপ্তের দ্বিতীয় অভিযোগ হল : শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে খুব বেশী বিদেশী নাম ব্যবহার করেন। এ কথা সত্যি যে, কিছু কিছু বিদেশী নাম শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে দেখা যায়। কিন্তু সেগুলো কখনই অপ্রাসঙ্গিকভাবে আসে না। পিনাকী দাশগুপ্ত বলেছেন যে, "সাধারণ পাঠকের চলচ্চিত্রজ্ঞান বোধ হয় সত্যজিৎ রায় ও তাঁর ছবির নামেই শেষ।" আমার শুধু একটাই প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায়কে কি বিদেশী ছবির সঙ্গে পরিচয় ছাড়া বোঝা যাবে? শ্রীদাশগুপ্ত যদি বিদেশী ছবি দেখতে আরম্ভ করেন এবং সিনেমাটাকে আরও একটু সিরিয়াসলি নেন তবে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গের চিন্তাশীল প্রবন্ধগুলি তাঁর বুঝতে অসুবিধে হবে না।

শ্যামশ্রী মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৪

॥ ৩৪ ॥

'আমি হা লি শ হ র, সোনারপুরে, মজিলপুরে, লক্ষ্মীকান্তপুর—গিয়েছি তো অনেক জায়গায়।'

ক্ষেমেশ—চা আসছে না রঞ্জন আসছে না, দাড়ি কামাবার ক্ষুরটুর আসছে না, একটু বিরক্ত হয়ে, 'এই রঞ্জন—এ—ই—এ—ই—ই—' বলে গলাজলে দাঁড়িয়ে গানের গলা সাধবার মত চীৎকার করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, 'বালিগঞ্জ গিয়েছি, টালিগঞ্জ গিয়েছি, ঢাকুরিয়া গিয়েছি, চেতলা গিয়েছি, বেহালা গিয়েছি—তুমি কার গাড়ি হে বুইক? আমি আগে ছিলাম মহারাজ বিক্রমাদিত্যের; এখন কার? এখন বিরূপাক্ষ রাজবংশীর; আরে, কার গোরুবাটা! কার? আজ্ঞে জয়তী দেবীর। তবে চল, চল, আমাকে গ্রামে নিয়ে চল—চল আমাকে খিদিরপুরে, মেটেবুরুজ, আলিপুরে, পাকপাড়া নিয়ে চল—আমি বাংলাদেশের গ্রামগ্রামালি দেখব—আমি গাঁয়ের ডাক শুনেছি—আমার হিলম্যান মিংকস্-এর ডাক—দশ গ্যালন পেট্রলে হবে?—না বেশী লাগবে ধনদা ঠাকুর? —বেশী লাগবে?—আবার কালোবাজারের শেয়ারের ডাক শুনিয়ে ছাড়বে দেখছি—'

ক্ষেমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু ওপরের থেকে আসছি জয়তী।'

'কেন?'

'আমার ভোরাইটা সেরে আসি।'

'তোমার ঘড়িতে কটা ক্ষেমেশ?'

'সাড়ে আটটা, এইবারে মুখ ধোব, দাড়ি কামাব, বাথরুমে যাব, রঞ্জনকে ওঠাব ঘুমের থেকে, চায়ের বাবস্থা হবে—'

'ক্ষেমেশ, কাল রাত চারটা অবধি বাইরে ছিল রঞ্জন?' জয়তী জিজ্ঞেস করল।

'কড়া নাড়ার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি? তখন পাঁচটা। এই তো সবে বারান্দার শান চেলে সাত পাক খেয়ে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে—চলো জয়তী আমার সঙ্গে ওপরে—'

'কেন?'

'বারোটার আগে রঞ্জন ঘুম থেকে জাগবে বলে মনে হয় না—হিটারে চা করে নেবে চল।'

'আমি চা খেয়ে এসেছি।' সুতীর্থ বললে।

'তোমাকে তো ভোর পাঁচটায় চা করে দিলুম—তুমিও এসো ক্ষেমেশ, আমি যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে ঠিক হয়ে নিতে তোমার ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবে—তারপরে নিচে এসো—আমি চা ঠিক করে রাখব।'

ক্ষেমেশ চলে গেল।

'বিরূপাক্ষের সঙ্গে কয়েক দিন আগে আমার দেখা হয়েছিল।'

'কোথায়?'

'তার বাড়িতে—সে যে তোমাকে বিয়ে করেছে তা তো আমি জানতুম না। কবে বিয়ে হল?'

'বছর তিনেক আগে।'

খানিকটা চুরুটের ছাই সুতীর্থের শার্টের ওপর ঝরে পড়ল; আমার ছাইটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা না করে, চুরুট না টেনে—কথা ভাবছিল সুতীর্থ—কি কথা সে নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। অনেক দূরে একটা বটগাছের ডালপালার ভেতর একটা কালো পাখিকে আবিষ্কার করল তার চোখ। সুতীর্থ ভাবছিল, আমার চোখের বাহাদুরি আছে বটে; কিন্তু তবুও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে, কেমন একটা ব্যথা : স্নায়ুর ভেতরে না মনোময়তায় রক্তে না হিরণ্ময় কোষে? জয়তী তাকিয়ে আছে সুতীর্থের দিকে। চোখ জয়তীর দিকে ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করে তবুও কালো পাখিটার দিকে তাকিয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশ এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'না।'

'তবে?'

'আমি বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি। আইন আদালতে তো যেতে হবে এ জন্যে।' জয়তী বললে।

'কেন?'

'বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি—বললাম তোমাকে—শোননি?'

'শুনেছি।'

'আমি আলাদা থাকতে চাই এখন থেকে। সেটা আইন দিয়ে ঠিক করিয়ে নিতে হবে না?'

'তা হলে তো ক্রিশ্চান হয়ে নিতে হয়; ক্রিশ্চান—মুসলমান—'

'হতে রাজি আছি আমি।'

'কি জানি, আইনের মারপ্যাঁচ আমার জানা নেই। খুব কঠিন হবে', সুতীর্থ বললে; ডান হাতটা খানিকটা তুলে নিয়ে দেখল চুরুট নিবে গিয়েছে, জ্বালাতে গেল না, চোখ দিয়ে দেশলাই খুঁজল দুচারবার; চোখে পড়ল দেশলাই সুতীর্থের, কিন্তু চোখে যে পড়েছে সেটা টের পেয়ে দেশলাইটা কুড়িয়ে নেবার আগে অন্য বিষয়ের দিকে চলে গেল চোখ—জয়তীর দিকে নয়; স্ট্রাইক, মণিকা, মল্লিক, মুখার্জির কথা ভাবতে ভাবতে জয়তীর কথা মনে পড়ল আবার। সুতীর্থ বললে, 'মন যখন তোমার বিরূপাক্ষের দিকে নেই, আইন ওর দিকে থাকলেও কি আর হবে।'

'কিছু করতে পারবে না?'

'কিছু করতে চাইবে না।'

'আমার ওপর সব সত্ত্ব ছেড়ে দেবে ও?'

চুরুট নিবে গিয়েছে টের পেল সুতীর্থ।

সোফাগুলোর আনাচে কানাচে কি যেন খুঁজে তাকাতেই দেশলাইটা চোখে পড়ল তার; জ্বালিয়ে নিল চুরুট।

'পাঁচ লাখ টাকা আমি নিয়ে এসেছি। বালিগঞ্জের বাড়িটাও আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আইনে পাকাপাকি করে নিয়েছি।'

'ভালোই তো।' সুতীর্থ বললে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগল সে। পাতা—অনেক ঘন পাতা ছায়ার আড়ালের কালো পাখিটাকে কোনো অনুমান বলে ঠিক করে নিতে পারছে না, বুঝতে পারছে না ওটা কি পাখি : কোকিল না নীলকণ্ঠ না কি; কোকিল যদি হয় মকর সংক্রান্তি কেটে গেলেও এমন চুপ করে আছে কেন? ওটা পাখি তো? একটা ছোট কালো মেরজাই নয় তো দেশোয়ালীদের? পাখি না হয়ে মেরজাই? পাখি হোক।

'আমি এখন কি করব?'

কে—জয়তী কথা বলছে? সুতীর্থ চুরুট ফুঁকছিল। ঘাড় ফিরিয়ে জয়তীর দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলুম তুমি ওপরে চলে গেছ স্টোভ জ্বালতে।' স্টোভ তো নিচেও জ্বালানো যায়; সুতীর্থ ঘরের চারদিকের প্লাগের ছাদাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'চলো তুমি আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'গ্রামে যাবে চলো।'

গ্রামে কোনোদিন যায়নি জয়তী; গ্রামের নিমিত্ত নিধান কাকে বলে জানে না। গ্রামগুলো মরছে; তুইয়ে বুইয়ে নতুন গ্রাম নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দেখতে যায় নি। গ্রাম কোথায়—কি রকম—কি করতে হবে এই সব গ্রাম নিয়ে—এ সম্বন্ধে কোনো স্বভাব-কৌতূহল কোনোদিন ছিল না তার। কিন্তু সুতীর্থ তাকে গ্রামে যেতে বলেছে। হঠাৎ যেন অনেক চাপা জলোচ্ছ্বাসে শুকনো ফাঁকা একটা প্রান্তর ভরে উঠল। এটা কি প্রান্তর? না সমুদ্র?

'কোন গ্রামে যাবে সুতীর্থ?'

'ঠিক করিনি এখনো।—তবে কোনো একটা গাঁয়ে নয়—অনেক গ্রামে যাব।'

'ভারতবর্ষকে তো এখনও দুভাগ করা

হয়নি। কিন্তু হয়ে পড়েনি। ওদের ভাগে যে অংশ পড়বে সে সব গ্রামেও যাবে?'

জয়ন্তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'শুধু বেড়াতে যাওয়া নয়, অনেক কঠিন কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। শহরে তো অনেক বোকা লোক আছে; তার চেয়ে ঢের বেশি বোকা মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু বোকা বলে বজ্জাতির কসুর নেই। তাদের ওপরওয়ালা আছে, আরো খারাপ। আরো ওপরে—সমস্ত দেশ জুড়েই কেমন একটা নিরেস অর্থহীন বিশৃংখলা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখবে এরা সকলে মিলে আমাদের দুজনকে পায়ে চাপা দিয়ে লাট করে ফেলতে চেষ্টা করছে—'

'এরা সকলে মিলে নয় এদের অনেকে—'

'কলকাতা দিল্লিরও চাঁই লোক আছে ওদের মধ্যে।'

আমরা তো কোনো খারাপ কিছু করতে যাচ্ছি না—ভালো কাজ করব। আমাদের দিকেও লোক থাকবে। আমি যাব গ্রামে।'

'কদিন থাকবে?'

'যতদিন তুমি থাকতে বল।'

সুতীর্থ চুরুটে টান দিয়ে শেষে বললে, 'এতদিন তুমি থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'গ্রামে গ্রামেই থেকে যাব—কলকাতায় ফিরব না আর।' যেন সর্বসুপেয় মত বিরাট পাথরের গায়ে আঘাত করে জল নিজের জলের দেশে ফিরে যাচ্ছে এমনই একটা আশ্চর্য আদি পৃথিবীরই নাদ যেন বেজে উঠল সুতীর্থের কথায়।

সেই জলের শব্দ শুনল জয়ন্তী।

'কলকাতায় তোমার বাড়ি আছে, টাকা আছে, মানুষ আছে, যারা তোমাকে টানে;' সুতীর্থ বললে, 'গ্রামে গিয়ে বরাবর তুমি থাকতে পারবে না।'

সুতীর্থ চুরুটের মুখের আগুনের দিকে তাকিয়ে নিল একবার—টানবার আগে। আস্তে আস্তে টানছিল।

'মাঝে মাঝে এক-আধ মাসের জন্যে যদি আমি কলকাতায় আসি তাতে তোমার আপত্তি আছে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বললে।

'ঠিক করেছ গ্রামে যাবে?'

'আমি কিছু ভেবে দেখে বলেছি সুতীর্থ?'

'আমার সুখে গেলে দু-চারটে শর্ত আছে।'

'বললেই তো।'

সব শর্তগুলোর কথা কি বলেছি তোমাকে?'

'কেন? বলবার কি দরকার? এটা কি দুপক্ষের ব্যাপার।'

'তাহলে বুঝেছ তুমি সব।' খুব বিশ্বাসভরে বললে সুতীর্থ। মানুষের গণ্ডি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপরেদ ভেতর বুনো হাঁস-দম্পতির মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়ন্তীর বুকের ভেতর থেকে।

'গ্রামে গিয়ে আমি বিয়ে করব তো জয়ন্তী'—সুতীর্থ চুরুটের আগুনের দিকে তাকাল আবার, চুরুটটা অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে; জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কেন বিয়ে করবে কেন এত বয়সে?'

মাথার ওপরে দোতলার ঘরে খুরর-ঠট্টক ঠক ঠক ঠট্টাক ঠাক—শব্দ হচ্ছিল; কেউ চেয়ার টেবিল টানাটানি করছে মনে হল।

জয়ন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে কোনো কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে না তুমি। সেরকম বিশ্বাস না থাকলে, সুতীর্থ, এ যুগকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। খুব বিপন্ন আমাদের এই যুগ, তোমার মতন লোকের সাহায্য চায়।'

'তা চাইতে পারে, কিন্তু আত্ম বিশ্বাস আমার নেই।'

'আমি, বলবে তুমি কোনো রকম বিশ্বাসই নেই তো?'

সুতীর্থ হাল্কা চোখে আলো রোদের দিকে তাকিয়েছিল, চোখে গভীরতা আসছিল তার ক্রমে ক্রমে। জয়ন্তী দেখছিল মস্ত বড় ঝাড়নটা পুব দিকের দেয়ালে কাঠ হয়ে আছে; আনাচে কানাচে ময়লা আছে; অনেকদিন ঝাড় সাফ করা হয়নি।

ক্রমশ

"লিওর শ্যাম্পুর
মনমাতানো সুরভির রেশ...
তাজা হয়ে থাকবে
আপনার তাঁর মনে."
বলেন, অ্যানিটা রবিন্‌স্‌, এক্সপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
লিওরের রকমারি নতুন শ্যাম্পুর প্রত্যেকটিতে আছে নিজস্ব বিশিষ্ট সৌরভ। আর, এই শ্যাম্পুগুলি সবরকম যত্ন নিয়ে আপনার চুল করে তোলে পরিষ্কার, সুন্দর, আকর্ষণীয় সৌরভে ভরপুর...যাতে আপনার তাঁর মন মেতে ওঠে।
লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয় সৌন্দর্য্য, লিওর শ্যাম্পুর যত্নে হয়—নির্মল, সুন্দর, সুরভিত অনিবার্য্য।
Lure
Lure
Lure
Lure
Creative Unit-A 2281-Ben.

নীললোহিতের চোখের সামনে

কলকাতা শহরে সারা রাত কোথায় সিগারেটের দোকান খোলা থাকে? কিংবা, রাত তিনটের সময় হঠাৎ নিজের ছবি তোলাবার ইচ্ছে হলে কোথায় চটপট ক্যামেরা-ম্যান পাওয়া যায়? দুটোরই উত্তর, শ্মশানে।

আমি মাঝে মাঝে শ্মশানে বেড়াতে যাই, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। বেড়াবার পক্ষে কলকাতার যে-কোনো শ্মশানই খুব চমৎকার জায়গা, বিশেষত মাঝ রাত্রে। রাত্তিরবেলায় কোনো কিছুই কুশ্রী থাকে না, কলকাতার রাস্তাঘাট, সমস্ত বাড়িই সুন্দর দেখায়, এমনকি শ্মশানও।

শ্মশানে গিয়ে আমি অনেকবার ঘুমিয়েও পড়েছি, চিরনিদ্রায় নয় অবশ্য। আর ভোরের দিকে গরম গরম রাধাবল্লভী, জিলিপি আর চা-এর স্বাদ পেলে মরা মানুষও জেগে ওঠে।

ভাস্করের দাদার খালি ফ্ল্যাটে আমরা সারা রাত্তিরের আড্ডায় বসেছিলাম। খাদ্য, পানীয় এবং তাস সবই ছিল, শুধু সিগারেট ফুরিয়ে গেল হঠাৎ এক সময়। তখন রাত মাত্র আড়াইটে। সিগারেট সঙ্গে থাকলে অনেক সময় না খেলেও চলে কিন্তু সিগারেট যদি না থাকে, তাহলে মনে হয় এক্ষুনি একটা সিগারেট না পেলে বেঁচে থাকার আর কোনো মানেই হয় না।

মেডিক্যাল কলেজের উল্টো দিকে একটা পানওয়ালা মাটির নীচে ঘুমোয়, তার কাছে রাত দুটোতেই সিগারেট পেয়েছি এক এক দিন। তার দোকানটা ওপরে, কিন্তু যেখানে সে ঘুমোয় সে জায়গাটা প্রায় মাটির নীচে। তার দোকানের টিনের ঝাঁপে কয়েকবার চাপড় মারলেই সে জেগে ওঠে। সেখানেই একবার চেষ্টা করা যাক।

সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। এই সময় মাঝ রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও কোনো অসুবিধে নেই। আমরা কয়েকজন বন্ধু পথের রাজার মতন সদর্পে হেঁটে হেঁটে পৌঁছোলাম মেডিক্যাল কলেজের সামনে। লোকটিকে ডেকে তোলাও হলো, কিন্তু সে ভেতর থেকেই উত্তর দিল, সিগারেট নেই।

তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে দিয়ে দোকান খোলালাম। সত্যিই, আমরা যা সিগারেট খাই, চার্মিনার বা ভাজির, তা ওর নেই, আমি সিগারেটের ব্যাপারে চট করে আনুগত্য বদলাই না। তাই বন্ধুদের বললাম, চল, শ্মশানে যাই।

চমৎকার ঠান্ডা হাওয়ার রাত। হাঁটতে বেশ ভালই লাগে। রাস্তার দু' পাশের ফুটপাথে অনেক লোকজন ঘুমুচ্ছে, এরা সকলেই দীন দুঃখী নয় জানি, তবু তাদের
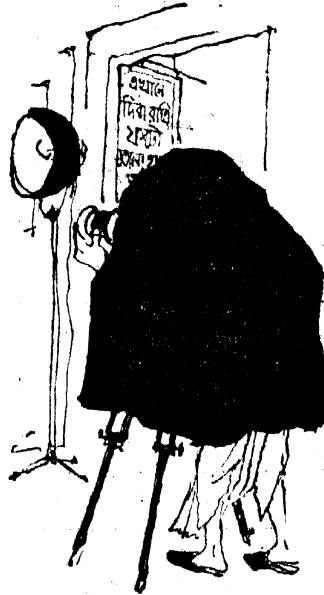
রেডি ওয়ান, টু, থ্রি!

ঘুমন্ত মুখগুলি দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে কোনো অশান্তি নেই।

নিমতলা শ্মশানে এসে দেখি বেশ জম-জমাট ব্যাপার, প্রচুর লোকজন, আলো, এবং মাত্র সাতজন ছাড়া আর সকলেই জেগে আছে। সেই সাতজন আর কখনো জাগবে না। ভাস্কর বললো, এবার মরার সীজন বেশ ভালোই পড়েছে মনে হচ্ছে। এত রাত্তিরেও সাতটা মড়া।

আমরাও স্বীকার করলুম, মড়ার ব্যবসাটা এখানে ভালোই চলছে। এখানকার লোকজন নিশ্চয়ই তাদের পেশায় সংকট বিষয়ে খবরের কাগজে চিঠি লিখবে না।

সিগারেট পাওয়া গেল, কিন্তু তক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছে করলো না। এবার অনেকদিন বাদে আসা হলো, চেনাশুনো অনেককে দেখতে পেলুম না। সেই বাচ্চু সাধুটা নেই। তার বয়েস ছিল মাত্র বারো তেরো, দারুণ রাগী সাধু, সকলের সঙ্গে খুব ধমকে ধমকে কথা বলতো। আর গাঁজা টানতো কী, তিন টানে কল্কে ফাঁক। তবে তার ছিল মিষ্টি খাওয়ার খুব লোভ। একদিন আমরা এক ঠোঙা জিলিপি খেতে খেতে ওকেও একটা দিয়েছিলাম। ও চকচকে চোখে তাকিয়ে ছিল ঠোঙাটার দিকে। সেই জন্য ওকে আর একটা জিলিপি দিতেই ও আস্ত সেটাকে কপাৎ করে মুখে পুরে ফেললো। তারপর তাকে পুরো ঠোঙাটাই দিয়ে দিলাম। ছেলেটি বিহারী, আরা জেলায় বাড়ি। বারো বছরের একটি ছেলে সাধু হয়ে গঙ্গার ধারে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে, এই দৃশ্যটা দারুণ মজার। তাকে নিয়ে আমাদের বেশ সময় কেটে যেত।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সেই পিওনটিকেও দেখলাম না। ছোট্টখাট্টো চেহারা ধুতির ওপর নীল শার্ট, হাতে একটা ছাতা—এই ভাবেই তাকে বরাবর দেখেছি। তার কাজ ছিল বিভিন্ন সাধুর আখড়ায় গাঁজার ছিলিম সেজে দেওয়া। সে যে নিজে খুব একটা গাঁজাখোর ছিল তা নয়, দু'এক টান দিত মাত্র, কিন্তু সাধু-সেবার দিকেই ছিল তার ঝোঁক। তার সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম, সে রাইটার্স বিল্ডিংসের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের পিওনের কাজ করে। তবে, প্রত্যেক রাত শ্মশানে কাটিয়েও যে সে কি করে আবার দিনের বেলায় অফিস করে, সেটাই ছিল এক রহস্য। এক একদিন সে গান ধরতো, তার গানের গলাটি চমৎকার। মধ্য রাত্রিতে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে তার সেই গান গাওয়ার দৃশ্য দেখে মনে হতো, সে তখন আর সামান্য একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নয়, সে একজন শিল্পী, একজন মহান মানুষ।

তার বদলে এখন নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন সাধু আসে। শ্মশানে কিছুই থেমে থাকে না। আমরা ঘুরে ঘুরে কয়েকটা আখড়ায় বসলাম একটু করে। আমরা একদল নাস্তিক, কিন্তু সাধু সঙ্গ আমাদের ভালো লাগে।

কাঠগোলার পাশে একটা বস্তি ঘরে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, "এখানে দিবারাত্রি ফটো তোলা হয়।" এই সেই মড়ার ক্যামেরা-ম্যান। একেও আমরা চিনি। অনেকের শখ

হয় শ্মশানে এসে মৃতদেহের ছবি তোলবার। সেই উদ্ভট শখ মেটাবার জন্য এই লোকটিকে চব্বিশ ঘণ্টা ঝাড়িতে থাকতে হয়।

ভাস্কর সেই সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে বললো, একটা ছবি তোলালে মন্দ হয় না। লোকটাকে ডাকবি নাকি? আমাদের একটা গ্রুপ ফটো তুলে দেবে—কে কবে মরে যাই ঠিক তো নেই!

আমরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলাম। একটা কিছু মজা তো হবেই! লোকটার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেতর থেকে ঘঙর ঘঙর কাশির শব্দ ভেসে এলো।

আমরা আবার ডাকলুম, ও দাদু, দরজা খুলুন।

—ক্যা?

—ছবি তোলাবো, উঠুন!

খাটের মচ্ মচ্ শব্দ, আবার ঘঙর ঘঙর কাশি। তারপর দরজা খুলে যিনি উঁকি মারলেন, তাঁর বয়েস ষাট থেকে নব্বইয়ের মধ্যে যে-কোনো একটা কিছু হবে। খালি গা, বুকের সবক'টা পাঁজরা গোনা যায়, গালটা এমন তোবড়ানো যেন মনে হয় দু' দিকে দুটো গর্ত। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ডেডবডি কোথায়? কোন্ ঘাটে!

ভাস্কর বলল, ডেডবডি নেই। এই তো আমরাই কজন আছি।

তিনি বললেন, ঠাট্টা! রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে এরকম ঠাট্টা কারই বা ভালো লাগে। তিনি একটা অতি অসভ্য গালাগালি দিলেন।

ভাস্কর বললো, রাগ করছেন কেন? আমরা ঠাট্টা করছি না, অ্যাডভান্স পয়সা দেবো, বুঝলেন না কাজ সেরে রাখছি!

—তার মানেটা কী হলো?

—মানে, মরার পর ছবি তোলার চেয়ে আগেই কাজটা সেরে রাখা ভালো নয়?

—এক কপি সাড়ে সাত টাকা পড়বে!

—তাই দেবো।

বুড়ো লোকটি ক্যামেরা বার করলেন। সেটা একটা দেখবার মতন জিনিস। এরকম ক্যামেরা আজকাল কচিৎ চোখে পড়ে। আগেকার সেই ফোল্ডিং ক্যামেরা, স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করানো, ছবি তোলা হয় প্লেটে, ক্যামেরাম্যান নিজের মাথা ও ক্যামেরা একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে বলে, রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি!

ভদ্রলোক ক্যামেরা সাজাচ্ছেন, এমন সময় ঠুং করে একটা শব্দ হলো। ক্যামেরার লেন্সের ঢাকনাটা পড়ে গেল মাটিতে। তিনি সেটা খুঁজতে লাগলেন। জিনিসটা কিন্তু তাঁর পায়ের কাছেই পড়ে আছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন। লোকটি নিশ্চয়ই রাতকানা। এই লোক আমাদের ছবি তুলবে!

ভাস্কর বললো, দাদা, আমরা কী দাঁড়িয়ে থাকবো, না শুয়ে পড়বো?

—সে তোমাদের ইচ্ছে।

—না, ভাবছিলাম যে আপনার তো মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছবি তোলার অভ্যেস নেই, সবাই শুয়ে শুয়ে ছবি তোলায়...তাই, বলেন তো আমরা চারজন পাশাপাশি শুয়ে পড়তে পারি!

—দেখো, মিত্যু নিয়ে অমন মস্করা করো না। যেদিন আসবে, টেরটিও পাবে না। কত দেখলাম...আঃ, সে ব্যাটাচ্ছেলে আবার কোথায় গেল?

—কে?

—লেন্সের ঢাকনাটা!

ছবি তোলা শেষ হয়ে যাবার পর নাম ঠিকানা ও টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ভাস্কর বললো, দাদু, আপনার নিজের ছবি তোলা আছে তো? একটা কিছু হয়ে গেলে তখন আপনার ছবিটা কে তুলবে?

ভদ্রলোক ভীষণ রেগে গেলেন এ কথায়। দাঁত খিঁচুন দিয়ে বললেন, ফকড়ামি হচ্ছে? অ্যাঁ, আমার সঙ্গে ফকড়ামি?

আমরা চোঁচা দৌড় মারলাম।

ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ফিরলে হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো গঙ্গায় একটু সাঁতার কেটে যেতে। অন্যদেরও আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ বাকি আছে। তীর্থস্থানে এলে যেমন মূর্তি দর্শন না করে কেউ ফেরে না, তেমনি শ্মশানে এসে মৃতদেহগুলি একবার দেখে যেতে হয়।

চারটি চিতা জ্বলতে শুরু করেছে, তিনটি মৃতদেহ তখনো অপেক্ষমান। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে আমরা থমকে গেলাম। খাটিয়ার ওপর একজন শুয়ে আছে, ঠিক যেন আমারই কৈশোরের চেহারা। ষোলো কিংবা সতেরো বছর বয়েস, কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে এসেছে। তার চোখ বোজা, মুখে কোনো বিকৃতি নেই, মৃত্যুর কোনো চিহ্নই নেই। ছেলেটি সুশ্রী কিনা সে প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ঐ বয়েসের একটা আলাদা রূপ থাকে।

আমি ভাস্করের হাত চেপে ধরে বললাম, ঠিক ঐ বয়েসে আমি একবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। তাই হঠাৎ মনে হলো, বুঝলি, যেন আমিই শুয়ে আছি ওখানে।

ভাস্কর বললো, এ ছেলেটিও বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে। অসুখে ভুগেছে বলে তো মনে হয় না।

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। ছেলেটির খাটিয়া ঘিরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত চেহারার নারী পুরুষ বসে আছেন, নিঃশব্দ। শোকের একটা গাম্ভীর্য আছে, তাতে বিঘ্ন ঘটানো যায় না।

শরৎ বললো, ঐ বয়েসে আমি প্রথম একা লক্ষ্ণৌতে দিদির কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেরকম আনন্দ আর জীবনে কখনো পাইনি।

ছেলেটি এই সদ্য যৌবনে কেন চলে গেল? সে কথা জানবার জন্য বুকের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারছি না কারুকে। তার মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতেও পারছি না। সে অসম্ভব রূপবান হয়ে রাজকুমারের মতন শুয়ে আছে।

এবার বোধ হয় ছেলেটিকে তোলা হবে, তার খাটের পাশে কয়েকজন নারী পুরুষ হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি দেখলাম ভাস্করও কাঁদছে। তার হাত ধরে বললাম, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? চল্।

ভাস্কর উত্তর দিল না। শরৎ বললো, আর একটু দাঁড়া। শরৎ আর আশুও রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরলো। তখন আমিও আর থাকতে পারলাম না। দারুণ কান্না এসে গেল।

একটা অচেনা ছেলের মৃত্যুর জন্য আমরা কাঁদছি কেন? আমাদের মতন কঠিন-হৃদয় পুরুষের চোখে জল? পরে বুঝলাম, আমরা কাঁদছিলাম আমাদের প্রত্যেকের কৈশোরের কথা ভেবে। যে-কৈশোর আমরা আর কখনো ফিরে পাবো না!
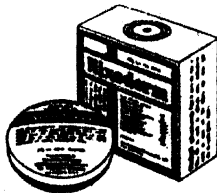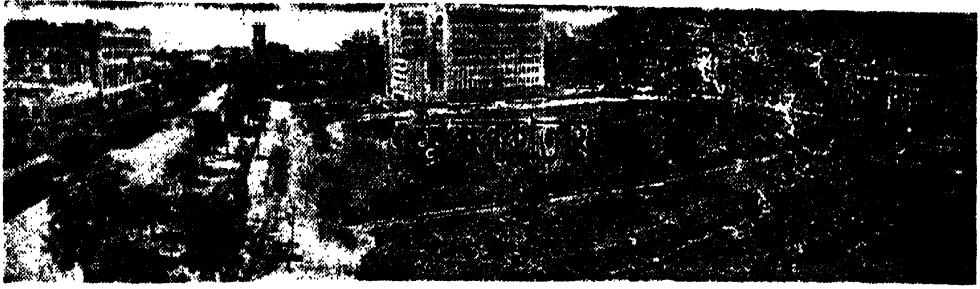
নির্বাক ছবির উৎসব

পর্দায় ছবিকে নড়াচড়া করতে দেখা গিয়েছিলো ১৮৮৯-এ, যখন টমাস এডিসন আমেরিকায় আজকের 'মুভির' জন্ম দিলেন। যা ছিল কেবলই ছবি, শুধু পটে লেখা, তো যখন পর্দার বুকে হাঁটাচলা শুরু করলো, উত্তেজনা দেখা দিল চারদিকে। কিন্তু এডিসন বলেছিলেন, এ ছবি সাধারণ্যে বেশী দেখিও না, তাহলে এর আকর্ষণ আর নতুনত্ব নষ্ট হয়ে যাবে! কিন্তু এডিসনের নিষেধবাক্য শিরোধার্য করলে কি আর আজকের জনপ্রিয়তম শিল্প চলচ্চিত্রের জন্ম

চার্লি চ্যাপলিন, দা ভ্যাগাবন্ড, ১৯১৬

হতো! আমরা কি পেতাম গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, বাস্টার কীটন কিংবা ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কদের? আমেরিকার বিপ্লবের দ্বিশত-বার্ষিকী উপলক্ষে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস আয়োজিত (ফেডারেশন অফ ফিলম্ সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়ার সহ-যোগিতায়) তাঁদের চৌরঙ্গীস্থিত অডি-টোরিয়ামে নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রোৎসব দেখতে গিয়ে একথাই ভাবছিলাম। শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে ধন্যবাদ, তাঁদের প্রচেষ্টায় এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনায় ওই ঐতিহাসিক ছবি-গুলোকে আমরা, এখনকার দর্শকরা নতুন চোখে, নতুন করে পেলাম।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, আমেরিকান য়ুনিভার্সিটি সেন্টার প্রভৃতি স্থানেও প্রায় সারা জুলাই মাস ধরে চলেছিলো এই দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ছবি-গুলোর প্রদর্শনী। বহু বিখ্যাত ছবি এসে-ছিলো, দেখলাম। যেমন ধরুন এডুইন এস পোর্টারের 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' ছবিটি। আজকের দর্শক যাঁরা রগরগে স্নায়ু-উৎপীড়ক সাসপেন্স ও ক্রাইম ছবি দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে বইটি অবশ্য হাসিরই খোরাক যোগাবে। কিন্তু এক সময়ের দর্শক তো ট্রেন ডাকাতির ঐ মামুলি ছবি দেখেই চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন? আমরা কি জানি সেদিন পুরো বইটি করতে খরচ হয়েছিলো সর্বসাকুল্যে মাত্র ৩৫০ ডলার? সম্পাদনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, স্টুডিওর বাইরে রৌদ্র-প্লাবিত গ্রামাঞ্চলে ছবির শুটিং করার ব্যাপারটিও ছিলো অভিনব! উৎসবে এসেছিলো গ্রীফিথের 'লোনলি ভিলা' ছবিটি। আজকাল তো আমরা সবাই সিনেমায়, পত্রিকায় আশেপাশে বিভিন্ন ফটোগ্রাফির দোকানে ক্লোজ-আপ ছবি দেখে থাকি। কিন্তু কজন জানি যে গ্রীফিথ প্রথম এই ছবিটিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খুব কাছাকাছি নিয়ে ক্যামেরার সতর্ক, সূক্ষ্ম, অনুভূতি-প্রবণ চোখটিকে সেঁটে ধরেছিলেন। তার আগে পর্যন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন সবাই। কিন্তু বিপ্লবী গ্রীফিথের কথাই আলাদা। আধুনিক চলচ্চিত্র অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, আলো ও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ব্যাপারে তাঁর কাছে ঋণী। গল্পের চরিত্রদের অর্ধেক বা আংশিক ছবি ফ্রেমে দেখিয়েছিলেন গ্রীফিথ সুদূর সেই ১৯০৯-এ যখন ছবির নির্মাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মচারী তাঁর কাজ পাগলামি ভেবে প্রতিবাদ করেছিলেন! থিয়েটারে যেমন যবনিকা উঠলে পাত্রপাত্রীরা অভিনয় শুরু করেন এবং এক সময় যবনিকা পড়ে যায়, শেষ হয় অভিনয়, চলচ্চিত্রেও ঠিক সোজা-সুজি সেইভাবে শুটিং করা হতো। এক একটা দৃশ্য থিয়েটারী ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হতো সিনেমায়। ক্যামেরা এক জায়গায় স্থির থেকে ছবি তুলতো। চলচ্চিত্রকল্পনার এই দারিদ্র্য ঘোচাতে এগিয়ে এলেন গ্রীফিথ। ১৯০৮-এ 'ফর লাভ অফ গোল্ড'-এ তিনি দৃশ্যকে ভেঙে, ক্যামেরা এগিয়ে পিছিয়ে শুটিং

পরিচালনারত গ্রীফিথ : একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে

করেন। অভিনয়ের কায়দাকানুনও তিনি বদলে দেন। আগে সবটাই ছিলো থিয়েটার দ্বারা প্রভাবিত। মঞ্চে গ্যাসের আলোয় তখন অভিনেতারা এমনভাবে ভুরু কুঁচকাতেন, কিংবা ঠোঁটিয়ে তুলতেন মুখে এমন কোনো রেখা যা প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারিতে উপবিষ্ট অন্যমনস্ক বা উদাসীন দর্শকেরও চোখ এড়িয়ে যেতো না। এই

ভঙ্গিসর্বস্ব অভিনয়কলাকে ভাঙতে গ্রীফিতেরই প্রয়োজন ছিলো। মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কদাচ তিনি গ্রহণ করতেন। নিজেও যে তিনি ভালো অভিনেতা ছিলেন দেখা গেলো পোর্টারের 'রেসকুড ফ্রম অ্যান ঈগলস নেস্ট' ছবিটিতে। আশ্চর্য, তখন অভিনেতারা নাম দিতেন না নিজেদের। দর্শক নাকি পছন্দ করতেন না! প্রযোজকরাও আশঙ্কা করতেন জনপ্রিয় হয়ে গেলে অভিনেতার রেট বেড়ে যাবে। নামহীনতার আড়ালে আত্মগোপন করে প্রতিভার রশ্মির বিচ্ছুরণে কিন্তু কোনো অসুবিধা হয়নি! দৈনিক তিন বা পাঁচ ডলার দক্ষিণায় কী অসাধারণ অভিনয়ই না তাঁরা করেছেন! গ্রীফিথের ছবি দেখার সময় মনে পড়ল আরেকটি ঘটনার কথা, যা আমি আমার চলচ্চিত্রানুরাগী এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। গ্রীফিথ টেনিসনের একটি বড় কবিতাকে দু' রীল সেলুলয়েডে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। নিউইয়র্ক সিটির বিখ্যাত প্রযোজক ও স্টুডিও মালিক 'বায়োগ্রাফ' চেয়েছিলেন দুইটি দু'টি রীলে আলাদা আলাদা রিলিজ করুক। বাদ সাধলেন অনমনীয় গ্রীফিথ। 'বায়োগ্রাফ' অগত্যা আর কোনোভাবে গ্রীফিথকে জব্দ করতে না পেরে এরপর থেকে সব ছবিরই দৈর্ঘ্য হবে দু' রীল এরকম একটা ফতোয়া দিলেন। পরে গ্রীফিথ চার রীলের একটি ছবি করলে তা সেলফে ধুলোর আদর উপভোগ করতে পড়ে থাকে পুরো দু'টি বছর। পরে অবশ্য ৫ রীল স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য হিসেবে স্থির হয়। কিন্তু কমেডির ভাগে পড়েছিলো ২ রীল আর ভ্রমণ ও তথ্যচিত্রের কপালে জুটেছিলো ১ রীল! পুরনো

'দি গ্রেট ট্রেন রবারির' একটি অ্যাকশন দৃশ্য

আমলের সেন্সর হওয়া নর্তকীর ছবিও দেখলাম উৎসবের একটি তথ্যচিত্রে। নর্তকীর শরীরের আবরণীয় বিশেষ প্রত্যঙ্গগুলির কোনোটিই অনাবৃত বা অনাবৃত ছিলো না। এমন কি কোনো উত্তেজক পোশাকও ছিলো না তাঁর শরীরে। নাচটিও ছিলো নিরামিষ। কোনোমতেই আজকের ইঙ্গিতপূর্ণ লাস্যময় 'ক্যাবারে' বা 'বেলি ডান্স' নয়। কিন্তু এই নাচই ছিলো তখনকার সমাজের পক্ষে বাড়াবাড়ি। মজার কথা যে, সেন্সর কিন্তু পুরো ছবিটি কাঁচি-কাটা করেননি। তেমন প্রথাও হয়ত তখন ছিলো না। নর্তকীর বুক ও কোমরের নিম্নাঙ্গ সাদা একটি ফিতে দিয়ে শুধু ঢেকে দেওয়া হয়েছিলো, যাতে দর্শক তা দেখতে না পান। নাচের দৃশ্যটি ছিলো অটুট! উৎসবে ছিলো বহু হাসির ছবি যার প্রধান নায়ক ছিলেন স্বয়ং চ্যাপলিন ও বাস্টার কীটন। ক্লাউন যেমন লোক হাসায়, তেমনিই তার দুঃখ ও নিঃসঙ্গতার ছবি আমাদের স্পর্শ করে। চ্যাপলিনের ভবঘুরে, বোকা—কিন্তু আসলে সাচ্চা চরিত্রটি আমাদের শুধু হাসির জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়নি, কাঁদিয়েও ছিলো। ওই হাসি ও কান্নার জোয়ারে ভাসবার জন্য আমরা বারবার ছবিগুলো দেখতে চাইব।

সাহিত্য সমাবেশ ১৩৮৩

ছোটবেলায় স্কুলে প্রতি বছর একটা মজার অনুষ্ঠান হতো প্রাইজ গিভিং সেরিমনি। বার্ষিক পরীক্ষায় যারা স্ট্যান্ড করত, তারা পেতো পুরস্কার আর সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো আবৃত্তি কিংবা নাটকের আসর। কিছু স্টক নাটক ছিলো অনুষ্ঠানের জন্যে। প্রাইজ পাই বা না পাই, আমরা সবাই ঝলমলে পোশাক পরে যেতাম, যেতেন অনেকের অভিভাবককুল সপরিবারে, যারা প্রাইজ পেতো বিশেষ করে তাদের বাবা-মাদেরই বেশী ভিড় দেখা যেতো সেখানে। অনুষ্ঠানে প্রতি বছর পৌরোহিত্য করতে আসতেন এক-একজন মহাত্মা। ভালো লাগতো যে তাঁদের সম্মানে প্রতি বছর আমরা একদিন করে ছুটি পেতাম। অন্তত আমার কাছে সেরিমনির এটাই ছিলো একমাত্র লাভের দিক। আজ খুব হাসি পায় যখন মনে পড়ে ছোটবেলায় কী হাস্যকরই না ছিলো সেই নড়বড়ে কাঁচ গলার আবৃত্তি, রঙিন রিবন আর তরল কাঁচা উৎসাহ ও প্রগল্‌ভতার দিন। অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্য ও মর্যাদা নিয়ে আমাদের মাথা এতটাই ঘোলাই

আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ফটো : অলোক মিত্র

হয়েছিলো যে স্কুলের পরীক্ষার খাতায় রচনা পর্যন্ত লিখতাম সেই অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য নিয়ে!

তারপর বয়স অনেক বেড়ে গেছে আমাদের। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অভিজ্ঞতা। পরিণত হয়েছে মন ও দেখার চোখ। এখন আমরা সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে সীমারেখা টানতে পারি, পারি রুচির সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগকে সনাক্ত করতে। ৩১শে জুলাই রবীন্দ্র সদনে দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা ও উল্টোরথ আয়োজিত সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সুরুচিপূর্ণ অসাধারণ অনুষ্ঠানটিকে তাই স্বাগত জানাতে আমাদের একটুও দেরি হয়নি, দেরি হয়নি অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে চিনে নিতে। এদিন দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে এবারের সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার ও প্রফুল্ল-কুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হলো প্রখ্যাত দার্শনিক, গবেষক ও রবীন্দ্র সাহিত্যের একনিষ্ঠ ব্যাখ্যাতা শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব ও কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। উল্টোরথ পুরস্কার পেলেন কবি আনন্দ বাগচী, যিনি বাঁকুড়া থেকে এসে উপস্থিত ছিলেন সেদিনের অনুষ্ঠানে। শ্রীআইয়ুব দীর্ঘকাল যাবৎ রোগে শয্যাশায়ী। তাঁর পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না, জানতাম। পুত্র পুষণ তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণে আসতে পারেননি উপাচার্য শ্রীসুরজিতচন্দ্র সিংহ মহাশয়। অনুষ্ঠানপ্রধান হিসেবে বরণ করা হয়েছিলো সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ মহাশয়কে। অনুষ্ঠান প্রধানকে বরণ করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রেখেছিলেন শ্রীঅশোক-কুমার সরকার।

বলা হয়েছিলো সাহিত্য সমাবেশ ১৩৮৩—মামুলি পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান তো নয়, সত্যিই সমাবেশ। জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, লেখক-কবি ও বুদ্ধিজীবী-দের চোখজুড়ানো সমাবেশ। অনুষ্ঠান শুরুর আগে রবীন্দ্র সদনের প্রশস্ত বারান্দায় হয়েছিলো ইনফরমাল গেট-টুগেদার।

সভায় বক্তৃতা ব্যাপারটিই ছিলো গৌণ। তবু শ্রীঅশোককুমার সরকার ও শ্রীসুবোধ ঘোষের ভাষণ সংক্ষেপে জরুরী প্রয়োজনীয় কিছু কথা আমাদের জানাতে পেরেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে রাজনীতির চেয়েও আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে দুটি মহাকাব্য—রামায়ণ আর মহাভারত। শ্রীঘোষের এ-উক্তি থেকেই আমরা নতুন করে জানতে পারি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাব্য ও সাহিত্য সুদূরপ্রসারী কী প্রভাবই না বিস্তার করতে পারে! "বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, যে জাতির সাহিত্য বড় হয় সেই জাতিও বড় হয়; তাই দেখি যখন গ্রীক সাহিত্য অবনমিত হলো, তখনই গ্রীক জাতির পতন ও নৈতিক অধঃ-পতন হলো।"—তাঁর এই সিদ্ধান্তও আমাদের অলস মস্তিষ্ককে ভাবিয়ে তুলবে। সুন্দর সহজ ভাষায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নন্দনতত্ত্বের কথা। সে তার বাজেনি আজো আমার সেতারে—কে বলেছিলেন? রবিশংকর কি? সেদিন অনেকটা এই উক্তিরই প্রতি-ধ্বনি তুললেন কবি নীরেন্দ্রনাথ—লেখা শুরু করার আগেই পুরস্কার পেলাম। সে লেখা আজো লিখতে পারিনি যার থেকে মানুষ পাবে তার আনন্দিত মুহূর্তের সমর্থন, শোকার্ত মুহূর্তের সান্ত্বনা আর পরাজিত মুহূর্তের সাহস। কবির অভিভাষণের আগে ছিলো অভিজ্ঞানপত্র পাঠ। পুরস্কৃতদের সেগুলি যথার্থই সম্মানিত করেছিলো।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শ্রোতাদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনে শান্তিদেব ঘোষ ফটো : অলোক মিত্র

শ্রাবণ সন্ধ্যায় শান্তিদেবের বর্ষাসঙ্গীত সুন্দর একটি আবহ সৃষ্টি করেছিলো। ভালো লেগেছিলো তাঁর 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে'—এই গান, যা সেদিন সংবেদনশীল মানুষের হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনাকে সঙ্গীতরূপ দিয়েছিলো। একটা দরজা খুলে গিয়েছিলো আমার মধ্যে। ভিজে বাতাসে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম। সুচিত্রা মিত্রের প্রথম গানের সুরে ও ভাষায় পেয়েছিলাম একাকিত্বের বেদনা। ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়/সে বাতাসে *তরী ভাসাব না যাহা তোমা পানে নাহি বয়* —*তাঁর এই গান কোঁথায় যেন পেঁ'ছে দিলো* আমাদের, সেদিন সেই সন্ধ্যেবেলা। তাঁর গান শুনে আমার পাশের আসনের ভদ্রলোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিড় বিড় করে বলছিলেন —'আশ্চর্য গলা, টেলিফোন ডাইরেক্টরি পড়লেও তা গান হয়ে ঝরে পড়বে!' ফিরে তাকাবো যে তাঁর দিকে সে-অবকাশ ছিলো না। আমি তখন স্থির জেনে ফেলেছি যে, তিনি আবার গানের রাজ্যে হারিয়ে গেছেন—রবীন্দ্রনাথের গানের সাম্রাজ্যে। একটার পর একটা দরজা খুলে যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছি তখন, বিশাল বিস্তৃত নন্দনকানন, হাজার হাজার পথঘাট সেখানে, সোনার গাছে হীরার ফুল, রঙ-বেরঙের আলোর ফোয়ারা,—মুগ্ধ সম্মোহিত মানুষকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না—পাগলের মতো তাঁরা শুধু হারিয়েই যান। সেদিন আমি কীভাবে যে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম আজ আর তা স্পষ্ট করে মনেও পড়ে না!

রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন

'সকাল সকাল গান হয়ে গেলো ব্যাপারটা কি?'—বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সহযোগিতায় শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সুবিনয় রায় প্রমুখ কবিগুরুর গানের কান্ডারী ও পরিমল চন্দ্রের মতো হৃদয়বান, সুযোগ্য সংগঠককে নিয়ে গঠিত, ছ'জন সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পর্ষদ আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের তৃতীয় দিনের মধ্য সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের চওড়া, টানা করিডরে খ্যাতনামা এক শিল্পীকে (যিনি গান পরিবেশন করে বাড়ি ফিরছিলেন) উদ্দেশ্য করে বললেন আরেক প্রখ্যাত শিল্পী, যিনি মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন সংগীত পরিবেশন করতে। রবীন্দ্র সদন ও কলামন্দির—এই দুই প্রেক্ষাগৃহে ছ' দিনের গান শুনিয়েছেন প্রায় ১৪০ জন শিল্পী, যাঁদের মধ্যে অন্তত ৮০ জনই একেবারে আনকোরা। ফলে সকলকে সমানভাবে সুযোগ দিতে গিয়ে খ্যাতনামা শিল্পীদেরও গান সন্ধ্যার 'সকালে' অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা গাইতেন মধ্যযামিনীতে, যাঁদের গান শোনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন শ্রোতৃবর্গ, তাঁরাও সানন্দে গান

পরিবেশন করেছেন সন্ধ্যার প্রথম ভাগেই সময়ের বাছ-বিচার নিয়ে এতটুকুও দ্বিধা রাখেন নি মনে। এখানেই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের কৃতিত্ব যে এ বছর ২৫শে বৈশাখের বাংলা সংবাদপত্রে প্রবীণ ও নবীন সমস্ত বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীদের নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনের ধাঁচে অনুষ্ঠানের আবেদন প্রকাশ করা মাত্রই আহ্বায়ক পরিমল চন্দ্রের সঙ্গে টেলিফোনে, চিঠিতে ও ব্যক্তিগতভাবে খ্যাত অখ্যাত বহু শিল্পী যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে চান। দুটি প্রেক্ষাগৃহে দু দফায় অনুষ্ঠান চলেছে ২৫শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত। একই সঙ্গে ১লা আগস্ট পর্যন্ত ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন ও পুরোনো দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডের প্রদর্শনী। রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ক বহু গ্রন্থও আমরা নেড়েচেড়ে দেখলাম সেখানে।

ছ'দিনব্যাপী রবীন্দ্র-সংগীতের এত বড় অনুষ্ঠান এর আগে কখনো হয়নি। এমন ব্যাপকভাবে পরিকল্পনাও নেওয়া হয়নি কখনো। সুযোগের অভাবে বহু নবীন প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী যখন আস্তে আস্তে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন ও হাই তুলছিলেন ঘরের কোণে, তখনই তাঁরা পেলেন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের ডাক। নতুন এক সম্ভাবনার দরজা খুলে গেলো তাঁদের সামনে। সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম হতাশা ও অবক্ষয়ের অন্ধকার থেকে তাঁদের সরাসরি মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার অপার প্রতিশ্রুতি। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হয়েছেন একথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি। অতঃপর রেডিও, টেলিভিশন ও গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠার মসৃণ চওড়া [illegible] আনবেন কিনা জানতে [illegible] আরো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এত বড় একটা অনুষ্ঠানে কোনো শিল্পীই পারিশ্রমিক নেন নি। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ শিল্পীদের দিয়েছিলেন আসা-যাওয়ার ভাড়া ও রাহা খরচ। বাংলাদেশ ও শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা পেয়েছিলেন যথাক্রমে প্লেন ও ট্রেন ভাড়া। এতে সবাই খুশী। খুশী কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা দেখে।

আমি এখন যেখানে বসে লিখছি, তার দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে সংগীতের নির্ঘোষ। জনৈক ভাড়াটে তাঁর ড্রয়িং রুমে খুলেছেন একটি গানের ইস্কুল, গানের ম্যারাথন ইনিংস বলে দেয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনে শিক্ষক-শিক্ষিকা, তাঁদের কণ্ঠ এতদিনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে! দফায় দফায় নতুন নতুন কণ্ঠের সংযোজনে বুঝতে পারি কখন কোন্ ছাত্র বা ছাত্রীর গানের ক্লাস শুরু হলো! বাঙালীর ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম হয়ত নেই, কিন্তু বিয়ের বৈতরণী পেরোতে উঠতি বয়সের মেয়েদের কম করে তিনটি রবীন্দ্র-সংগীত যার একটি অনিবার্যভাবে থর বায়ু বয় বেগে কিংবা সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে) এবং মীরার গীত ও ভজন শিখতে হয়। সংক্ষিপ্ত দলবলসহ পাত্রের বাবা, মা, জ্যাঠামশাই কিংবা পাত্র স্বয়ং কনে দেখতে এসে দু' চারটি প্রাথমিক কথার অবতারণা করেই শুনতে চান গান এবং তা ডি এল রায় বা নজরুল না হয়ে, হয় রবিবাবুর রচনা। ফলে, আমরা বাঙালীরা, পাড়ায় পাড়ায় স্টেনোগ্রাফি আর টাইপিং শেখানোর নাম করে সার্থক

কেরানী তৈরীর কলকারখানাই শুধু স্থাপন করিনি, বসিয়েছি কিছু অমোঘ গানের স্কুল, সম্ভাব্য পাত্রীর হাতে যা একটি রঙচঙে সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়ে দুশ্চিন্তিত পিতার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে আসছে এ যাবৎ। কিন্তু এর ফলে ভুগছে বাংলা গান। রবীন্দ্র-সংগীত, নজরুল, অতুলপ্রসাদ বা ডি এল রায়ের গান এদিক থেকে 'জনপ্রিয়' হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গানের শুদ্ধতা রক্ষার প্রতি কারো ততটা মনোযোগ নেই। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন এই দিক থেকে ভালো করেছেন যে, তাঁরা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বভারতী, গীত-বিতান, গান্ধর্বী, রবীন্দ্র-ভারতী, রবিতীর্থ প্রভৃতির কাছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ তিনজন ছাত্র-ছাত্রীকে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে থেকে আবার বাছাই করে নিয়ে শিল্পীদের তাঁরা সুযোগ দিয়েছিলেন মঞ্চে। সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক একটি প্রচেষ্টা। পরিমলবাবু জানালেন ৩০,০০০ টাকার মতো খরচ হয়েছে। স্যুভেনিরে বিজ্ঞাপন ও টিকিটের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ মাত্র ২৪,০০০ হাজার টাকা। ৬০০০ হাজরে টাকার এই আর্থিক ক্ষতি বহন করবে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সংস্কৃতি ও গবেষণার জন্যে সঞ্চিত ব্যাঙ্কের ফান্ড। আর্থিক ক্ষতি বেশী হবে না জেনেই শুধুমাত্র নবীন ও তরুণ শিল্পীদের স্বার্থে তাঁরা এই ঝুঁকি নিয়েছেন। ইচ্ছে আছে, তাঁরা প্রতি তিন বছরে এরকম এক একটি সম্মেলন করবেন। প্রতি বছর করলে তা জলসার মতো হয়ে যাবে এবং তার গুরুত্বও যাবে কমে। তাঁরা তাই এই ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়েছেন। তিন বছরে কোন্ নতুন শিল্পী উঠছেন, কেমন তাঁর সম্ভাবনা এ বিষয়েও যাচাই করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে। অদূর ভবিষ্যতে নজরুল, অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায়ের গান নিয়েও এ রকম অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন।

১৯৫৪ থেকে মধ্য কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সূচনা। সেই থেকে মার্কাস স্কোয়ার, মহাজাতি সদন, ময়দান প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বসেছে অনুষ্ঠানের আসর। কমিটি যাই থাক না কেন, পরিমলবাবুই এর কর্ণধার। একবার অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন মূল মণ্ডপ আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এতটুকুও বিচলিত না হয়ে তিনি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী অনুষ্ঠান করে যান। মহাজাতি সদনে এমন এক সময়ে অনুষ্ঠান করেছেন, যখন তার ছাদ ও মেঝে কিছুই ছিলো না। মহাজাতি সদনের চার দেয়ালের মাঝখানে খোলা ছাদের নিচে ত্রিপল টাঙিয়ে তিনি করেছেন বঙ্গ সংস্কৃতির সেবা। ১৯৭০-এ অনিবার্যকারণে সম্মেলন বন্ধ ছিলো। ১৯৭১-এ মহাজাতি সদনে হয়েছিলো ছোট অনুষ্ঠান। পরের বছরই ময়দানে বসে মহা-সমারোহময় পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি মিলন মেলা। বাঙালী যেখানেই থাকুক না কেন—মণিপুর বা দ্বারভাঙায় কিংবা দক্ষিণের কোনো প্রাদেশিক গণ্ডগ্রামে, সময় হলে তিনি ঠিকই শুনতে পান বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বান। শিরায়, রক্তে অনুভব করেন কলকাতার কোলে ছুটে আসার টান। আহ্বান শুনে প্রাণের টানেই এবার ছুটে এসেছেন বাংলা-দেশের শিল্পীবৃন্দ। ঢাকার ভারতীয় হাই-কমিশন এবার সম্মেলনকে অঢেল সাহায্য করেছেন। সম্মেলনের চিঠি পেয়ে হাই-কমিশনের সংস্কৃতি বিষয়ক অফিসার মিঃ এ কে জালালউদ্দীন শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং নিজে এয়ারপোর্টে এসে তাঁদের কলকাতার প্লেনে চাপিয়ে দিয়ে যান। 'বাংলাদেশের স্টেট ডেলিগেশন না হলেও, এবারের শিল্পীরা প্রায় স্টেট ডেলিগেশনেরই পর্যায়ে পড়ে-ছিলেন'—পরিমলবাবু জানালেন। শিল্পী-দের এখানে আসা সার্থক হয়েছে। ফাহমিদা খাতুন, হামিদা আতিকের গানে এপারের শ্রোতারা পেয়েছেন অমল আনন্দ।

সম্মেলন কেমন লাগল জিজ্ঞেস করে-ছিলাম বাংলাদেশের শিল্পীদের। সবাই একবাক্যে জানালেন, এক সঙ্গে এত শিল্পীর গান শোনার সুযোগ তাঁরা আগে কখনো পান নি। এত শিল্পীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগও তাঁদের জীবনে আগে কখনো আসেনি। এখানে রসবোদ্ধা শ্রোতার সংখ্যা অগণ্য। তাঁদের গান শোনাতে শিল্পীর উৎসাহই বেড়ে যায়। হামিদা আতিক এই প্রথম গাইলেন কলকাতার অডিয়েন্সের সামনে। তিনি বিলক্ষণ টের পেয়েছিলেন শ্রোতারা মন দিয়ে সবাই তাঁর গান শুনছে। ফলে নিজেকে উজাড় করে দিতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। ছ'দিন ধরে এত লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে চুপচাপ গান শুনছে—এই অভিজ্ঞতা তাঁকে বিস্ময় ও সম্ভ্রমে অভিভূত করেছে। মৈমনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজির অধ্যাপিকা ফাহমিদা খাতুন জানালেন, এখানের যন্ত্রীরা খুব সুন্দর বাজান। তাঁদের কোনো নির্দেশ দিতে হয় না। যন্ত্র যে কণ্ঠকে সাহায্য করার জন্যেই নিয়োজিত এখানে এসে তা বোঝা গেলো। 'আমার গানের যে সৌন্দর্য ফুটেছে, তার ৬০ ভাগ কৃতিত্বই যন্ত্রীদের—অকপটে তিনি স্বীকার করলেন।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষার হেরফের

অমল মুখোপাধ্যায়

আবার শিক্ষা নিয়ে নাড়াচাড়া পড়েছে। স্কুলে এগার ক্লাশ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার আগে কতকটা এমন হয়েছিল। এবার নাড়াচাড়াটা একটু বেশী পরিমাণেই পড়েছে। দেশের সবচাইতে উপরের দিকের নেতারা শিক্ষা নিয়ে তাঁদের উদ্বেজনা অকপট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এবং কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

আত্মশ্লাঘা নয়, এটা ঘটনা যে এ-ধরনের কথা ও প্রস্তাব 'দেশ' পত্রিকার পাতায় দু'তিন বছর আগে আমরাও ব্যক্ত করেছিলাম। অবশ্য কবুল করতে কসুর করবো না যে আমাদের ব্যক্ত করা আর নেতাদের চিন্তা করার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। স্বীকার করতেই হবে সাধারণ লোক তথা লেখকদের চিন্তা, কথা ও প্রস্তাবের মধ্যে একটু বিলাসের ব্যাপার থাকে। আপৎকালীন-বিপন্ন বোধ বা দুর্বহিত দায়িত্ব সচেতনতা—এসব লেখার উৎস নয়। কতকটা যা মনে এল লিখে দিলাম ধরনের কাজ। তাতে দশজন পাঠকের হয়তো বা ভাল লাগলো। হয়তো বা কিছু বাহবাও পেলাম।

কিন্তু নেতাদের? সামনের দিকটা ভেবে দেখতে হয়। আবার পেছনের কথাটাও ভুললে চলে না। দেশের কথা ভাবতে হয়। দশের কথা ভাবতে হয়। জাতির কথা চোখের সামনে রাখতে হয়। তারপর ইম্প্লিমেন্টেশনের কথা আসে। প্রয়োগের কথা এলেই, টাকার কথা এসে পড়ে। টাকা পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। অতএব রাম শ্যামের মত মনে এলো তো বলে দিলাম রকমে নেতাদের কাজ চলে না।

যাই হোক, যে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সার্থকতাও হবে অতি দূরপ্রসারী। একটি হল, শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিয়ে আসা। অর্থাৎ concurrent list-এর অন্তর্ভুক্ত করা। আর দ্বিতীয়টি হল, সারা ভারতে Uniform Education Pattern প্রবর্তন করা। দুটোই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলতে গেলে শিক্ষা সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ। শিক্ষার ইমারৎ গড়ার প্রধান দুটি স্তম্ভ। এ বিষয়ে ১৩৮০ সনের 'দেশ' ৫ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা' প্রবন্ধে আমরা বলেছিলাম ঃ

'শিক্ষাকে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভারতমুখী এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখী করে তুলতে হয় তাহলে সমগ্র দেশে একটি Uniform Education Policy প্রবর্তন করা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। এবং শুধুমাত্র এইজন্য শিক্ষাকে রাজ্য সরকারগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় না-হতে দিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের দায়িত্বে নিয়ে আসা উচিত। অর্থাভাবে শিক্ষার জন্য কিছু করা যাচ্ছে না, কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছে না—রাজ্য সরকারগুলোর এই চীৎকার এবং নির্ধারিত নীতি প্রয়োগে রাজ্য সরকারগুলো যথেষ্ট সহযোগিতা করছে না—কেন্দ্রীয় সরকারের পাল্টা অভিযোগের খেলা এইবার বন্ধ করার সময় হয়েছে। শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও তার আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে—ভারতের শিক্ষা সংস্কারের এটি হল প্রথম ও নিম্নতম শর্ত।' আজ যখন মোটামুটি এই লাইনেই চিন্তা করা হচ্ছে এবং কাজও আরম্ভ হয়েছে তখন আমাদের আনন্দিত ও গর্বিত হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু এগুলো হলেই কি শিক্ষার সমস্যা মিটে যাবে? না তা হবে না। কারণ কোনো বড় ইমারতই মাত্র দু'একটি স্তম্ভের উপর দাঁড়াতে পারে না। সুপ্রসারিত ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধানে অনেক সংখ্যক স্তম্ভ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা আগেও বলেছি, পুনরাবৃত্তি করে আবারও বলছি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি অখন্ড ব্যবস্থা হিসাবে না-দেখলে, শিক্ষা ব্যবস্থার সুরাহা এবং সমস্যার সমাধান কোনো রকমেই হতে পারে না। এখন যে-ভাবে সমস্যাকে দেখা হচ্ছে তাকে তালি ও রিপু কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আজ প্রাইমারী কাল উচ্চ প্রাইমারী পরশুদিন সেকেন্ডারী তার পরদিন হায়ার সেকেন্ডারী—এমন করে কাজ চলে না। ভাবতে হলে গোটাটাকে এক করে ভাবতে হবে। একটি অখন্ড ও সর্বাবয়ব ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে।

এক সময় অনেক ভেবে বলা হয়েছিল Job oriented Education-এর কথা। অর্থাৎ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক তৈরী করে তোলা। অর্থাৎ কারিগরী ডাক্তারী মাস্টারী বিজ্ঞানী ইত্যাদি কাজের জন্য লোক তৈরী করে তোলা। এক পর্যায়ে কথাটাকে বেশ মুখরোচক গালভরা এবং বৈপ্লবিক মনে করেছিলেন অনেকেই। তারপর হঠাৎ কিছু সময় যেতে না যেতেই দেখা গেল কারিগর আছে, ডাক্তার আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, মাস্টার আছে, বৈজ্ঞানিক আছে কিন্তু তাদের জন্য যথেষ্ট Job নেই।

সেই পর্যায়ে দেশে হৈ-হৈ লেগে গেল। ডিগ্রিধারী ডিপ্লোমাধারী বেকাররা ডিগ্রি ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, ডিগ্রি চাই না, চাকরী চাই।

শিক্ষা নীতির নির্ধারক, পদাধিকার বলে এডুকেশানিস্ট, আমলারা সেই থেকে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। এবার তাদের মস্তিষ্ক থেকে যেটা উদ্ভূত হয়েছে তার নাম Work Education। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'কাজ শেখা'। হঠাৎ এই কাজ শেখার কথা উঠলো কেন? এগার-ক্লাশ প্রবর্তনের প্রযায়ে এ-সব কথা তো ওঠেনি। উত্তর হল এত লক্ষ লক্ষ লোককে চাকরী দেবার দায়িত্ব সরকারের হতে পারে না। সরকার যেটা করতে পারেন সেটা হল জীবিকা অর্জনে সাহায্যকারী কিছু কাজ শিখিয়ে দিতে পারেন। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই আয়োজনই করা হয়েছে। তার মানে হল, ছেলেরা পাশ করে যদি চাকরী জোটাতে না-পারে তাহলে ঐ Work Education এর মাহাত্ম্যে করে খাবে। কি ভাবে? মাটির কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, উলের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কাজ করে, বিক্রি করে পেট চালাবে।

কথাটা এমন হল, যেন, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক যারা পুরুষ-পরম্পরা এসব কাজ করে আসছে এবং পেশাগত নৈপুণ্য অর্জন করেছে তারা সব বড় লোক হয়ে গেছে—কেনার লোক গিজ গিজ করছে—বানানোর লোক নেই। একেই বলে বাস্তব সত্যের সঙ্গে পরিকল্পিত সত্যের ফারাক। কল্পনার ফানুস ওড়ানো। রসিকতা করে বললে বলা চলে, গল্পের ভক্তের মত শিক্ষিত ছেলেদেরও অপ্রত্যক্ষে 'ধরে খেতে' বলা হল। এই সুচতুর পরিকল্পনার জন্য মাস-মাহিনার বিশেষজ্ঞদের চাকরীর উন্নতি হতে পারে, কিন্তু সরকারের দায়িত্ব কিন্তু আগের মত থেকেই যাচ্ছে। দশ ক্লাশ পাশ করুক আর বার-ক্লাশ পাশ করুক, বি এ অথবা বি এসসি—কাজে লাগতে পারে এমন একটা যায়গা ছেলেদের দেখাতেই হবে।

আসলে সমস্যার ডালপালায় ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। একেবারে গোড়ায় যেতে হবে। গোড়ায় এলে দেখা যাবে, শিক্ষা মূলত দুটি কাজ করে। একটা— বর্তমান বা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থায়িত্ব দিতে পারে। দ্বিতীয়টাতে—চাইলে সামাজিক রূপান্তরের দুর্দান্ত হাতিয়ার হতে পারে। আমরা প্রকৃতপক্ষে কোনটা চাই সেটা সরল ও অকপট আকারে সরকার যদি না-বলেন, তাহলে যাঁরা শিক্ষার আকার ও প্রকার বানাবেন তাঁরা ভুল বুঝে একটা কিছু বানাতে পারেন অথবা এমন কিছু বানাতে পারেন যাতে কিনা এ-ও হয় অ-ও হয়। এতে করে জনা কয়েকের চালাকি ও চাতুরীর পরিচর্যা হতে পারে কিন্তু শিক্ষার মত দেশ-দেহের মেরুদণ্ডটা শক্ত বা মজবুত হয় না।

কথা উঠতে পারে আমরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে কি হয়ে উঠতে চাই সেই ব্যাপারে আমাদের দেশে তো কোন অস্পষ্টতা নেই। অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ তা তো সংবিধানে পরিষ্কার ভাষায়ই লেখা আছে। এ নিয়ে সংশয় থাকার কোন কথা নয়। প্রকৃতই সংশয় থাকার কোন কথা নয়। তবু যে কিছু সংশয় থেকে গেছে তার কারণ সম্ভবত গত ২৬ বছরে একটা সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গেল না। The state shall endeavour to provide, within a period of ten years of the commencement of this constitntion, for free and compulsory education for all children untill they complete the age of fourteen years. এটা সংবিধানের ভাষা, লিখিত আছে ৪৫ অনুচ্ছেদে।

সংবিধান সংশোধনাতীতও নয়। তবু অনেক যায়গায় বাধা পাওয়া যায়, অনেক স্থলে বিপরীত মত থাকে। সেইজন্য সংশোধনের কাজ পড়ে থাকেনি। যেটা জরুরী বোঝা গেছে সেটা সংশোধন হয়েছে। কিন্তু সংবিধান মানার ব্যাপারে কোনো একটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে দল মত ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের জনতা ও জননেতা যদি একমত হয়ে থাকেন তা হল সংবিধানের ঐ ৪৫নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে। তবু কিছু করা গেল না, এ বড় বিস্ময়।

১৯৫১তে একটি আদম সুমারী হয়েছে তারপর একষট্টিতে একটি একাত্তরে একটি। শিক্ষিত লোকের হার প্রতি আদম সুমারী অর্থাৎ প্রতি দশ বছরে বেড়েছে শতকরা পাঁচ ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনা করে একজন আঙ্কিক বলতে পারবেন, শিক্ষিত লোকবৃদ্ধির এই হারটি যদি বজায় থাকে তবে সুদূরে কোন এক শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সব লোকই শিক্ষিত তথা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হবেন।

আলোচনা জটিল করলে জটিল করা যায়। সহজ করলে সহজ। অতিরিক্ত সরলীকরণের দায়ে অভিযুক্ত হতে পারি জেনেও বলছি আমাদের মত গরীব, ভগ্নস্বাস্থ্য, সংস্কার জর্জর উপচে পড়া মানুষের দেশে মূলত শহরাঞ্চলের কিছু মানুষের মুখ চেয়ে দশ ক্লাশ ভেঙে এগার ক্লাশ, এগার ক্লাশ ভেঙে এগার-বার ক্লাশ ইত্যাকার নানা ধরনের কোটি কোটি টাকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো-বিলাসিতা ও অপরাধ।

আমাদের সমস্যা এখনো 'প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা'। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে না তাদের সমস্যা তো বটেই এমন কি যারা পাচ্ছে তাদেরও সমস্যা। যারা পাচ্ছে না এই তীব্র আলোর দিনেও তারা অন্ধকারে পড়ে থাকছে। আর যারা পাচ্ছে তারাও অধিকাংশই ভুল ও অনৈকান্তিক শিক্ষার শিকার হয়ে পড়ছে। এখনও শিক্ষার মূল সমস্যা (১) সুবোধ্য হস্তাক্ষরের সমস্যা (২) বানানের সমস্যা (৩) শুদ্ধ বাক্য রচনার সমস্যা (৪) মনের ভাব প্রকাশ করতে পারার সমস্যা (৫) দেশ, দেশের মানুষ ও জাতিগত লক্ষ্যের কথা জানিয়ে—আপন আপন স্থান নির্ণয়ে সাহায্য করার সমস্যা।

এবং এই সবগুলিই মূলত প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা। কলকাতা কি দিল্লী, বোম্বাই কি মাদ্রাজের কিছু কিছু নামকরা স্কুল কলেজের ব্যবস্থা দিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রকম যাচাই হতে পারে না—তার সার্থকতাও বিচার হবে না। আসলে শালবনী বংশীহারী এবং মানে ভজানের স্কুলগুলোতে কি হচ্ছে তা দিয়ে আগামী দিনের ভারতবর্ষের শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকার শক্তি বিচার হবে।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

তরুণ শিল্পীর বিদেশযাত্রা

তরুণ অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের কাজের মধ্যে প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া যায়। শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাড়তি গুণ হলো তাঁর গৃহিনীপনা। অধিকাংশ শিল্পী যেখানে আঁকার পর আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে লাজুক, সেখানে শুভাপ্রসন্নের আচরণের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শিল্প তাঁর পেশা। শৌখিন শিল্পীদের মতো আচরণ করা হয়তো কাজের কথাও নয়।

সেপটেম্বর মাসে শুভাপ্রসন্ন জেনিভার সুপ্রসিদ্ধ গ্যালারী ডেনবার্গে প্রদর্শনী করার জন্যে বিদেশ যাচ্ছেন। সুইৎসারল্যান্ডে এই নিয়ে তিনি দুবার যাচ্ছেন। প্রথমবার এক বন্ধুর আমন্ত্রণে গিয়ে তিনি ছোট্ট একটি গ্যালারীতে প্রদর্শনী করেছিলেন। তারপর ফ্রান্স, জার্মানী আর বেলজিয়াম ঘুরে ছিলেন।

সেই প্রদর্শনী ভাল লেগেছিল নিশ্চয়ই গ্যালারী ডেনবার্গের মালিকের। তাই শুভাপ্রসন্ন আমন্ত্রণ পেলেন ও'দের কাছ থেকে। গ্যালারীটা রু দা লুসানে ইউ এন বিল্ডিংয়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত। সেপটেম্বরের গোড়ায় প্রদর্শনী সুতরাং দিল্লি থেকে উনি জেনিভা রওনা হচ্ছেন এই মাসেই।

কথা ছিল তিনি কলকাতায় যাবার আগে একটা প্রদর্শনী করবেন। কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে হল ভাড়া ক'রে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলবশত আমি ও'র স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম।

মোট কুড়িটা কাজ নিয়ে যাচ্ছেন। বেশির ভাগ মাঝারী আকারের ক্যানভাসে করা তৈলচিত্র, দু একটা কাগজের ওপর করা তৈলচিত্রও আছে। আর আছে গোটা পাঁচেক ইন্টিগ্লিও ছবির প্রিন্ট। ছাপা ছবির বিষয় শুভাপ্রসন্নর উৎসাহ খুব সাম্প্রতিক ব্যাপার। সেই হিসাবে কাজ নেহাৎ মন্দ নয়। আমার যেটা ভাল লেগেছে সেটা হলো তাঁর কাজের সঙ্গে তাঁর ছাপা ছবির বেশ একটা মিল আছে।

ইউরোপ থেকে ঘুরে আসার ফলে তেল রঙ ব্যবহার করার দক্ষতা বেড়েছে। বিশেষত জলরঙের ধরনে পাতলা ক'রে রঙ চাপানোর যে প্রবণতা তা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। ভূমি বিভাজন সম্বন্ধে একটা পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী দেখলাম। পটের একটা বিরাট অংশ সমানভাবে একটা রঙ দিয়ে ভরাট করা। এইটাই প্রধান রঙ এবং এর মধ্যে তুলির কাজ বেশ স্পষ্ট। তরুণতর শিল্পীরা এখন দেখি ছবিকে অতিরিক্ত মিষ্টি করার দিকে ঝুঁকেছেন। অথচ তাঁদের চিত্রকল্পের ভয়ংকরতার সংগে এর কোন মিল খুঁজে পাই না।

বিলাপ : শুভাপ্রসন্ন

আসলে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা দেশবিভাগের অনিশ্চয়তার মধ্যে যাঁরা বড় হয়েছিলেন, তাঁদের শিল্পচর্চার মধ্যে স্বভাবত এসবের ছাপ পড়েছিল। এ'দের পরবর্তীরা এই অভিজ্ঞতাকে দেখলেন অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে—স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের প্রতীক রূপে। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর যুগে যাঁদের জন্ম—শুভাপ্রসন্নের জন্ম ১৯৪৮—তাঁরা বোধ হয় কোনো নতুন রাস্তা খুঁজে পাননি। তাই সুনির্দিষ্ট ধরনের চিত্রকল্প এ'রা অগ্রজ পূর্বসূরীদের কাছে পেলেও, উভয় দল একটু ভিন্ন আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। যে প্রলয়চেতনা অগ্রজদের সম্বল তা তাঁরা অঙ্গীকার করেছেন অনেকটা দায়ে পড়ে। অর্থাৎ এখনও এ'রা পূর্বসূরীদের জগতটা পেছনে ফেলে আসতে পারেননি। ডিমের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে পাখি কিন্ত এখনও দূর আকাশে ডানা মেলে ওড়া বাকি।

শুভাপ্রসন্নের ছবিতে এক সময় একটা সদ্‌বাস্তব ভয়ংকরতা ছিল। ভিখারী, দুঃস্থ মানুষ তাঁর ছবিতে অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপ মাথায় নিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু পরে তাঁর ছবি একধরনের মরমী মায়ায় আচ্ছন্ন হলো। হয়তো প্রান্তরে বিস্তৃত আকাশের নীচে বিরাট পাথরের ওপর একটা কী দুটো হাত। কিংবা ঝরাফুল, মৃত প্রজাপতি—জীবনের রহস্যময় অনিত্যতা। এডগার অ্যালেন পোর

[illegible] জগত। ছবির ফ্রেমে কাপড় জামা রয়েছে, কিন্তু যে সুন্দরীর প্রতিকৃতি তিনি উধাও।

বর্তমান চিত্রাবলী কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের। এখনকার চিত্রের পাত্রপাত্রী পাখি ছেড় বেশী শরীরী—রঙেরও ওজন আছে। ইউরোপ ঘুরে তিনি তেলরঙের চরিত্রটা ধরতে পেরেছেন। শুভাপ্রসন্নের এখনকার ছবিতে একটা জায়গায় মূল বিষয়টা বিন্দুতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা অমঙ্গলের অমোঘ দ্যোতনা হিসাবে একটা কাক বা শকুন। আর মৃত্যুর প্রতীক হিসাবে ষাঁড়ের মুন্ডুর বা মাছের কঙ্কালের জীবাশ্ম। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী জগত। কিংবা ময়দানে কোনো আবক্ষ মূর্তি যার মাথায় ডানা ঝাড়ে কুচকুচে কালো কাক। কিছু পর্দা, জানালা, ইতস্তত ছড়ানো আসবাবে স্তূপীকৃত জামাকাপড় ডাঁই করা, মেয়েমানুষের খোলা স্তনে চম্পক আঙুল।

এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন শুভাপ্রসন্নর ছবিতে খুবই মনোজ্ঞ। স্নিগ্ধ। আমরা অবশ্য তাঁর কাছে আরও তীব্র কিছু আশা করি।

—সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়
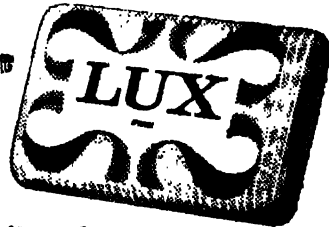
আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস

কম বয়সের আমি। মানসী দাশগুপ্ত। রামায়ণী প্রকাশ ভবন। ১০৬।১ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা ৯। দশ টাকা।

জীবনস্মৃতি যে জীবনেতিহাস নয়, কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের—যার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়—স্বহস্তের রচনা, অনেককাল আগে আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন এক ক্রান্তদর্শী কবি। স্মৃতির মধ্যে যা ফুটে উঠেছে চিত্ররূপে, তাকে কথার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তা সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য— তাঁর এই উক্তিই, বোধ করি, মানসী দাশগুপ্তের 'কম বয়সের আমি'র প্রেরণা। না হলে তিনি এমন 'কার্কাল'র সঙ্গে 'কাহিনী' মিশিয়ে উপহার দিতেন না এক অসামান্য সঞ্জীব রচনা— আত্মস্মৃতি হয়েও যা আত্ম-ইতিহাস নয়, 'আমি'-র কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও আমিত্বের ভার থেকে সম্পূর্ণভাবে যা মুক্ত।

'কম বয়সের আমি'-কে এক কথায় কি বলব? আত্মস্মৃতি, না উপন্যাস? উপকরণ অবশ্যই আত্মস্মৃতি, কিন্তু সব মিলিয়ে, স্বাদে ও পরিবেশনে, উপন্যাস। এবং ভিন্ন গোত্রের। 'কম বয়সের আমি' একটি বালিকার বড়ো হয়ে ওঠার ধারাবাহিক বর্ণনা, পশ্চাৎপটে রয়েছে তিরিশ ও চল্লিশের শান্ত-উত্তাল নানা রঙের দিন, ভূমিকম্প, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পুণ্য মুহূর্ত। আর রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের ধীরগতি পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট এবং মূল্যবান চিত্র।

এ কাহিনীর আরম্ভ তখন, যখন দৈনিক পত্রিকার অন্যতম প্রধান অংশ জুড়ে থাকত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর গল্প, কলকাতার বসতি বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতার পাড়া, যখন বাড়ির মেয়েরা কাছের পথটুকু পার হতেন রিকশায়, দূর পথের প্রশস্ত যান ছিল ঘোড়ায় টানা গাড়ি, পুরুষ-সঙ্গী নিয়েও ট্রামে-বাসে 'হুট হাট' করে বেড়ানোকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করা হত না, অন্যদিকে আবার একটু একটু আলো ঢুকতে শুরু করেছে, শিথিল হয়ে আসছে বহু সামাজিক অনুশাসন, পরদা টানা বাস ছাড়াও মেয়েদের স্কুলে কলেজে যাওয়া চলতে পারে—এমন সাংঘাতিক বিশ্বাসও সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, সেই সময়ের পটভূমিতে এ কাহিনীর সূত্রপাত। হালসীবাগান রোডের এক অনতিকিশোরী মেয়ে তার স্মৃতির ঝাঁপি উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছে সেই আলো-আঁধারি সময়ের এক চলমান জীবনের আক্ষরিক প্রতিচিত্র।

হালসীবাগানের বাড়ি থেকে সেই মেয়ে উঠে এল আতাবাগানে। চাপা রাস্তা থেকে চওড়া রাস্তায়। অভিজ্ঞতার সরু গলি থেকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে। তার একটু একটু করে বড়ো হওয়া, চোখে দেখা ও চেখে দেখা জীবন ও পারিপার্শ্বিক, অনেক আপাত-তুচ্ছ অনুভব, বিস্ময়-রহস্য, কৌতূহল-কৌতুক, আনন্দ-বেদনা, রোমাঞ্চ ও অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে বাড়তে উত্তীর্ণ হবার উপাখ্যান এমন সুন্দর করে নিখুঁত করে বর্ণনা করেছেন মানসী দাশগুপ্ত যে, মনেই পড়ে না এ কোনো পরিণত বয়সের লেখিকার পিছন ফিরে তাকানো কাহিনী, ধূসর স্মৃতির জগৎ থেকে উদ্ধার করে আনা কিছু ছবি। মনে হয় সদ্য সদ্য ঘটে গিয়েছে এই সব ঘটনা, কিংবা আলাদা একটি রহস্যময় বাক্সে জমানো ছিল দিন-রাত্রির এই পরম্পরা, উৎসুক দর্শকের হাতে তিনি তুলে দিচ্ছেন এই অজর সজীব অনুভবগুলি। এ বই পড়তে পড়তে একটু পরিণতবয়স্ক পাঠক ফিরে পাবেন তাঁর কৈশোর-যৌবনের কলকাতা শহর, নতুন পাঠক চোখের সামনে দেখবেন এক চলমান সময়ের প্রামাণিক চলচ্চিত্র, নিছক কাহিনী-চিত্রের থেকেও যার স্বাদ মধুরতর।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

রহস্য গল্প সংকলন

রহস্য অমনিবাস। সম্পাদক ঃ রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। রোমাঞ্চ, ১২ হরিতকি বাগান লেন। কলকাতা-৬। মূল্য কুড়ি টাকা।

'রহস্য অমনিবাস' একটি মন ডুবিয়ে পড়বার মত বই। হাতে সময় থাকলে এবং সাহিত্যপাঠের গুরুগম্ভীর বিষয়ে মন ক্লান্তি অনুভব করলে এই ধরনের একখানি বই পাঠককে নিশ্চয় খুশী করবে এই কারণে যে ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তি-তর্কের ধার ধারতে হয় না,—বা বুদ্ধির সজাগ অস্ত্র দিয়ে তার বিচার-ব্যাখ্যায়ও প্রবৃত্ত হতে হয় না। বরং এই ধরনের একটি বইয়ের সঙ্গে পরিবেশের যদি কিছুটা সাযুজ্য ঘটে তা হলে তো কথাই নেই। বাংলা সাহিত্যে ভূতের নিবিড় গল্পের কোনো অপ্রতুলতা নেই, এবং এমন কোনো প্রতিভাধর সাহিত্যিক প্রায় নেই-ই বললে

চলে যিনি প্রেতলোক নিয়ে তাঁর অনুগত লেখনীকে একবারও ব্যাপৃত করেননি। রবীন্দ্রনাথ তো এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয়। তাঁর সমসাময়িক এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী-কালের লেখকরাও এ বিষয়ে তাঁদের স্মরণীয় চিহ্ন রেখে গিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি একেবারে আধুনিককালের লেখকদের লেখা ভূতের গল্পের একটি নির্ভরযোগ্য লোভনীয় সঞ্চয়। 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় সে-সব লেখা পাঠকদের কোন-না-কোন সময় চিত্ত জয় করেছিল সম্পাদক সেগুলিকেই সযত্নে বাছাই করে এই ভূতের কাহিনীর মনোরম সংগ্রহটিকে সাজিয়েছেন। বহুদিন ধরে জড়ো হয়েছে বলেই একদিকে বইটি যেমন আয়তনে বড়ো তেমনি এতে স্থান পেয়েছেন এখনকার অধিকাংশ খ্যাতিমানরা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব রায়, সমরেশ বসু, বিমল কর, চিরঞ্জীব সেন প্রমুখ যেমন ইতস্তত ব য়ো জ্যে ষ্ঠ রা তালিকাভুক্ত তেমনি ব য়ো ক নি ষ্ঠ দে র মধ্যে আছেন কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, অদ্রীশ বর্ধন, অমিত এবং রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই ধরনের একটি গ্রন্থে বৈচিত্র্যবিলাসী পাঠকদের রীতিমত লাভ। বাংলাভাষার সাহিত্য-সম্পাদকরা পাঠক সাধারণের জন্যে চাহিদার ভিন্নতা অনুসারে হার্গফল এই ধরনের সংগ্রহ প্রস্তুতে যত্ন নিচ্ছেন। 'রহস্য অমনিবাস' সেদিক দিয়ে একটি সত্যকার অভাব মোচন করেছে। গল্পগুলিতে শিহরিত, রোমাঞ্চিত এবং ভূতগ্রস্থ হওয়ার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা। দুর্বল-চিত্তদের কথা থাক সবল-চিত্তরা বইটি চ্যালেঞ্জ হিসাবেও পড়তে পারেন এবং হ্যামলেটের উক্তির রহস্যজালে বেচারী হোরেসিওর ভূমিকায় তাঁরাও অবতীর্ণ হবেন বলেই বিশ্বাস।

সুনীল বসু

সংকলন

সোনার বাংলা। সম্পাদনা : হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। পরিবেশক—মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২। দশ টাকা।

'সোনার বাংলা' দুই বাংলার লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ও বাংলা ভাষার শহীদদের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত একটি গ্রন্থ। ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত 'সাগরপারে' পত্রিকা এবং বেঙ্গলী নিউজ লেটার সংস্থার যৌ[illegible] উদ্যোগে প্রকাশিত এই বইটি প্র[illegible] বাঙালীদের বাংলাভাষা প্রীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই সংকলন গ্রন্থে আছে একটি উপন্যাস, দুটি প্রবন্ধ ও দুই বাংলার সুযোগ্য আঠারোজন কবির কবিতা। হিরণ্ময় ভট্টাচার্য-রচিত ক্রন্দসী নামক উপন্যাসটিতে আছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পশ্চাৎপটে রচিত একটি মর্মন্তুদ কাহিনী। প্রবন্ধ ও কবিতাগুলিতেও পাওয়া যায়, যুক্ত বাংলার নিটোল ও বিশিষ্ট আবহাওয়া। সর্বোপরি সৈয়দ মুজতবা আলির আঁকা চিত্রটি প্রচ্ছদপটে থাকায় বইটির মর্যাদা নিঃসন্দেহে বেড়েছে। সোনার বাংলা সচেতন বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করবে, আশা করি।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রদীপ রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **নিজস্ব সংলাপ** (মণি প্রকাশনী, কলকাতা ২৩, চার টাকা)। প্রথম বইটি দেখিনি,

ফলে তিনি কতটা বদলেছেন অথবা আদৌ বদলেছেন কিনা—বলা যাবে না। বস্তুত, পত্র-পত্রিকাতেও প্রদীপকে খুব উচ্চকণ্ঠ মনে হয়নি কখনো। বহু পত্রিকারই লেখক তিনি, তবু তাঁর নিমগ্ন সংলাপ এত মৃদু ও স্নিগ্ধ যে, গ্রন্থাকারেই নতুন করে আবিষ্কার করতে হয় তাঁকে।

প্রদীপ রায়চৌধুরীর রচনার প্রধান গুণ সরলতা। অনুভবকে অত্যন্ত সরল ও আন্তরিকভাবে প্রকাশ করেন তিনি। "এক একটা দিন চিমনির ধোঁয়ার মতো যন্ত্রণা/ মুচড়ে ওঠে কণ্ঠনালী ফুঁড়ে/ঝিঁঝি পোকার কান্নার মতো শ্বাসকষ্ট বেড়ে ওঠে/ অভিমান জমাট মেঘের মতো/সারা রাত জমে থাকে নিজস্ব আকাশে।" ইতস্তত বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি রচনা না করে একটি নির্দিষ্ট অনুভবকে সম্পূর্ণ কবিতায় ছড়িয়ে দেন প্রদীপ, এই প্রবণতার জন্য তাঁকে অনুসরণ করা দুরূহ ব্যায়াম বলে মনে হয় না পাঠকের. বরং যন্ত্রণাজর্জর স্মৃতিপীড়িত এক প্রেমিকের দুঃখ-বিষণ্ণতার ছবি স্তরে স্তরে খুলে যেতে থাকে চোখের সামনে। প্রদীপ এই বইতে বহু উপমাও বেশ উল্লেখ-যোগ্যভাবে ব্যবহার করেছেন।

*

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর আশ্রয়িকা (পরিবেশনা—পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা ৯, সাড়ে আট টাকা) উপন্যাসে একটি এমন কাহিনী পরিবেশিত যা বিশ্বাসযোগ্যতার স্তর প্রায় অতিক্রম করে যায়। তা সত্ত্বেও পড়তে ভালো লাগে। তার প্রধান কারণ, তাঁর বর্ণনাভঙ্গি। খুবই স্বচ্ছন্দ এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে পুরো কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন বিশ্বজিৎবাবু। দু-এক ক্ষেত্রে অবশ্য রম্যরচনার গন্ধ ফুটে উঠেছে, মূল বিষয় থেকে একটু সরে এসে প্রাসঙ্গিক সরস টিপ্পনী জুড়ে দেবার প্রবণতা দেখা গিয়েছে, কিন্তু তা মাত্রই দু-এক জায়গায়।

কাহিনীটি আপাতভাবে পরিচ্ছন্ন। কিন্তু চরিত্রের বিশ্লেষণ বা অন্তর্চিন্তার কোনো আভাস না থাকায় ছায়া সান্যালের ক্রিয়াকলাপ আদ্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হয়। বিবাহিত নায়কের পক্ষে তার সঙ্গে নিঃসংকোচ মেলামেশাও খুব সহজ মনে হয়নি। ছায়া সান্যালের সঙ্গে বিবাহ না হবার কারণও যুক্তিগ্রাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। ছায়া সান্যাল কেন নিজেকে সরিয়ে নিল হঠাৎ, কেন আজীবন নিজেকে দ্বিতীয়া স্ত্রীরূপে পরিচয় দিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াল, কেনই বা শেষ জীবনের সঞ্চিত অর্থ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পাঠাল রামসুন্দর লাহিড়ীর নামে—এ সমস্ত প্রশ্ন তাই সঙ্গতভাবেই বইটি পড়ার পর জেগে ওঠে।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবিধ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সম্পাদক সঞ্জীব-কুমার বসু। ১০, কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১। রবীন্দ্র সংখ্যা। মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। এই বর্ষের প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্র সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে অনেক খ্যাতনামা লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, যথা—রবীন্দ্রনাথ ও শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে, রবীন্দ্র-নাথ ও ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ ও য়েটস, রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও অচিন্ত্যকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও এই শহর—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সকলের সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়া সবসমেত ১৫টি আর্টপ্লেটে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের চিত্র এবং বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাট্য পরিবেশনের দৃশ্যাবলী মুদ্রিত হওয়ায় সংখ্যাটি মূল্যবান ও সংরক্ষণযোগ্য হয়েছে।

অরণ্যদেব লী ফক

বাতাস; জল, মাধ্যাকর্ষণ-
সবই ভাল..
এই গ্রহে থাকা
যেতে পারে, যদি...

এখানকার
বাসিন্দারা ভাল হয়।
যদি না-হয়?
অবতরণের আগে
আরও পরীক্ষা চালাতে
হবে।

পৃথিবীর আকাশে ভিন্ন গ্রহের মহাকাশযান
এখানে আছে শহর,
সমুদ্র, জঙ্গল...
জঙ্গলে নামাই ভাল..

এখানকার বাসিন্দারা নানা
রকম...

এক-একজন..
এক-এক রকম! সবাই মানুষ তো?

জঙ্গলের বাসিন্দারা
এই রকম দেখতে..
ওদের চেহারা
নকল করা যাবে?
নিশ্চয়ই!
তাহলে
নকল করো।

নকল করে অগ্রবর্তী
জাহাজে পাঠানো হল।
বাসিন্দারা যদি ভাল হয়,
তাহলে আমাদের
শাসন মেনে নেবে...
1/4
না-মানলে ওদের ধ্বংস করো।

শোঁ-ও-ও-ও
শুরু হল : নীল দৈত্য

খেলার জাতীয় পরিকল্পনা রচনা ছাড়া গতি নেই

সরকারীভাবে ভারত অলিম্পিকে যোগ দিচ্ছে ১৯২০ সাল থেকে। ১৯২০-র অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিক ও ১৯২৪-এর প্যারী অলিম্পিক থেকে ভারতকে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছিল। তারপর আমস্টার্ডাম অলিম্পিক থেকে ১৯৭২-এর মিউনিখ অলিম্পিক পর্যন্ত ১০টি অলিম্পিকে ভারতের সংগ্রহ কি? হকির ৭টি সোনা, একটি রুপো ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। আর মাত্র একটি ব্রোঞ্জ পদক কুস্তির। মণ্ট্রিল থেকে ভারতকে আবার শূন্য হাতে ফিরতে হল।

বলা হচ্ছে, মণ্ট্রিলে আমাদের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে গেছে। নানা দিক থেকে তদন্তের দাবি উঠেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী নুরুল হাসান বলেছেন সব কিছু খতিয়ে দেখা হবে। অন্ধ্র প্রদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি পার্লামেন্ট সদস্য এম আর কৃষ্ণ পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা মণ্ট্রিল বিপর্যয়ের তদন্ত দাবি করেছেন। খেলাধুলো সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা এবং কেন্দ্রে পৃথক ক্রীড়ামন্ত্রক স্থাপনেরও তিনি দাবি জানিয়েছেন। সংসদীয় পরামর্শ কমিটিতেও মণ্ট্রিল ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং যুবক যুবতীর শারীরিক পটুতা অর্জনের দিকে লক্ষ রেখে আমাদের জাতীয় ক্রীড়া পরিকল্পনা রচনা করা উচিত।

মণ্ট্রিল বিপর্যয় সম্পর্কে হয়তো পর্যালোচনা হবে। লোকসভার অধিবেশন বসলে সেখানেও হয়তো সদস্যরা সমালোচনায় মুখর হবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের নীচু ক্রীড়ামান সম্পর্কে সদস্যরা কি অবগত ছিলেন না? আজ মণ্ট্রিল থেকে হকি দল যদি সোনা বা রুপো নিয়ে ফিরত তাহলেই কি ব্যর্থতা ঢেকে যেত? কিংবা অ্যাথলীট শ্রীরাম সিং বা শিবনাথ একটি পদক পেলে সব দোষ খণ্ডে যেত?

৬০ কোটি মানুষের দেশ ভারত মণ্ট্রিল অলিম্পিকে একটি পদক পেল না আর এক কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের দেশ পূর্ব জার্মানী পেল ৪০টি সোনা, ২৫টি রুপো, ২৫টি ব্রোঞ্জ—মোট ৯০টি পদক! কি বিরাট ব্যবধান!

শুধু পূর্ব জার্মানী কেন, ছোট ছোট অনেক দেশের প্রতিযোগীরাই তো দুহাত ভরে সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ দেশে নিয়ে গিয়েছে। অতীতেও নিয়েছে। তা দেখেও আমরা এতকাল আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি হকির একটি মাত্র সোনা প্রাপ্তিতে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ খেলাধুলোয় কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে খেয়াল করিনি। উঁচু মানের প্রতিযোগিতার আসরে জয়ের মালা গলায় পরতে হলে যে অনলস প্রয়াস, অদম্য মনোবল ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রয়োজন আমাদের খেলোয়াড়দের তা নেই। আবার এই বিরাট দেশে খেলাধুলোর উপযুক্ত সুযোগেরও অভাব রয়েছে। নেই যথেষ্ট পরিমাণে খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল, কুস্তির আখড়া, অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক। নেই খেলাধুলোর বিজ্ঞানসম্মত উপকরণ। তার চেয়েও বড় কথা, সামগ্রিকভাবে দেশের ক্রীড়া উন্নয়নের দিকে সরকারেরও নেই প্রখর দৃষ্টি।

সরকার অবশ্য ক্রীড়াবিদদের সম্প্রতি নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন, অর্জুন পুরস্কার বা পদ্মশ্রী খেতাব দিয়ে। স্পোর্টস স্কলারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু খেলাধুলোর সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা হয়নি। যদি কিছুটা হয়েও থাকে এই বিশাল দেশের পক্ষে সেটা সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত।

দেখতে পাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই মূলে হাত দিয়েছেন। দেশের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিকভাবে যুবক-যুবতীর শারীরিক পটুতা অর্জন ছাড়া ক্রীড়ামান বাড়তে পারে না। এবং শারীরিক দক্ষতা অর্জনের একমাত্র উপায় ব্যায়াম ও খেলাধুলো। তার জন্য প্রয়োজন হাজার হাজার জিমন্যাসিয়াম ও হাজার হাজার খেলার মাঠ ও নানা খেলার কয়েক লক্ষ ক্রীড়াঙ্গন। সেইভাবে যদি খেলার জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয় তাহলেই আন্তর্জাতিক আসরে আমরা ঠাঁই পাব। অন্যথায় নয়।

উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনে। জার আমলে রাশিয়া ১৯০০ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত চারটি অলিম্পিকে যোগ দিয়ে কটি পদক পেয়েছিল? একটি সোনা, চারটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ—মাত্র আটটি। এরপর ৪০ বছর সোভিয়েট রাশিয়া অলিম্পিকে অংশ নেয়নি। ১৯৫২-য় হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে আবার যোগ দিয়ে বিশ্বকে অবাক করে দিল ২২টি সোনা ৩০টি রুপো ও ১৯টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। যুক্তরাষ্ট্রের পর পদক তালিকায় পেয়েছিল দ্বিতীয় স্থান। তারপর মেলবোর্ন থেকে মণ্ট্রিল পর্যন্ত পরপর ছয়টি অলিম্পিকে সোভিয়েটকে পদক তালিকায় শীর্ষস্থান থেকে কোন দেশ নড়াতে পারেনি।

যে ৪০ বছর সোভিয়েট ইউনিয়ন অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করেনি সেই ৪০ বছর ধরে নিজেদের প্রস্তুত করেছে। ওই সময়ে তারা অলিম্পিকে যোগ দিলে নিশ্চয়ই প্রতি অনুষ্ঠানে কিছু কিছু পদক সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু সোভিয়েটের প্রতিজ্ঞা ছিল যথেষ্ট প্রস্তুত না হয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না। প্রতিযোগীদের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রের আনুকূল্য, খেলাধুলোর অঢেল আয়োজন ও সুযোগ সুবিধা। এই সুযোগ সুবিধা এবং অঢেল আয়োজনের জন্য পূর্ব জার্মানিরও আজ অসাধারণ অগ্রগতি। সুতরাং খেলার জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মূলে হাত দিতে হবে। প্রয়োজন হলে কয়েকটি অলিম্পিকে অংশগ্রহণ বন্ধ রেখে নিজেদের প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে হবে বিরামহীন অনুশীলন, কঠোর অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার মাধ্যমে। খেলাধুলোর প্রতি বিষয়ে বিশ্বের মান এত এগিয়ে গেছে যে, মাঝারিয়ানাদের কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও অনুশীলন এবং স্পোর্টস মেডিসিনের সাহায্য ছাড়া শীর্ষে ওঠাও সম্ভব নয়। সুতরাং এসব বিষয়ও জাতীয় ক্রীড়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

হকির আরও কথা

মণ্ট্রিলের হকির কথায় আবার ফিরে আসি। বিশ্ব কাপ জয়ী ভারতের সপ্তম স্থান লাভ যেমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত মিউনিখ অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানির গ্রুপ লীগ থেকে বিদায় এবং মিউনিখের রানার্স পাকিস্তানের ব্রোঞ্জ পদক লাভ। এর চেয়েও বিস্ময়জনক ঘটনা নিউজিল্যান্ডের সোনা জেতা। যে নিউজিল্যান্ড গ্রুপ লীগের চারটি খেলার মধ্যে মাত্র একটি খেলায় জিতেছিল বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের কাছে হেরেছিল ২-৫ গোলে।

গত ৮ বছরে আন্তর্জাতিক হকিতেই বা নিউজিল্যান্ডের ভূমিকা কি? মেক্সিকো অলিম্পিকে সপ্তম স্থান, বার্সিলোনা বিশ্ব কাপে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, মিউনিখ অলিম্পিকে নবম স্থান, আমস্টার্ডাম বিশ্ব কাপে সপ্তম এবং কুয়ালালামপুর বিশ্ব কাপেও সপ্তম স্থান।
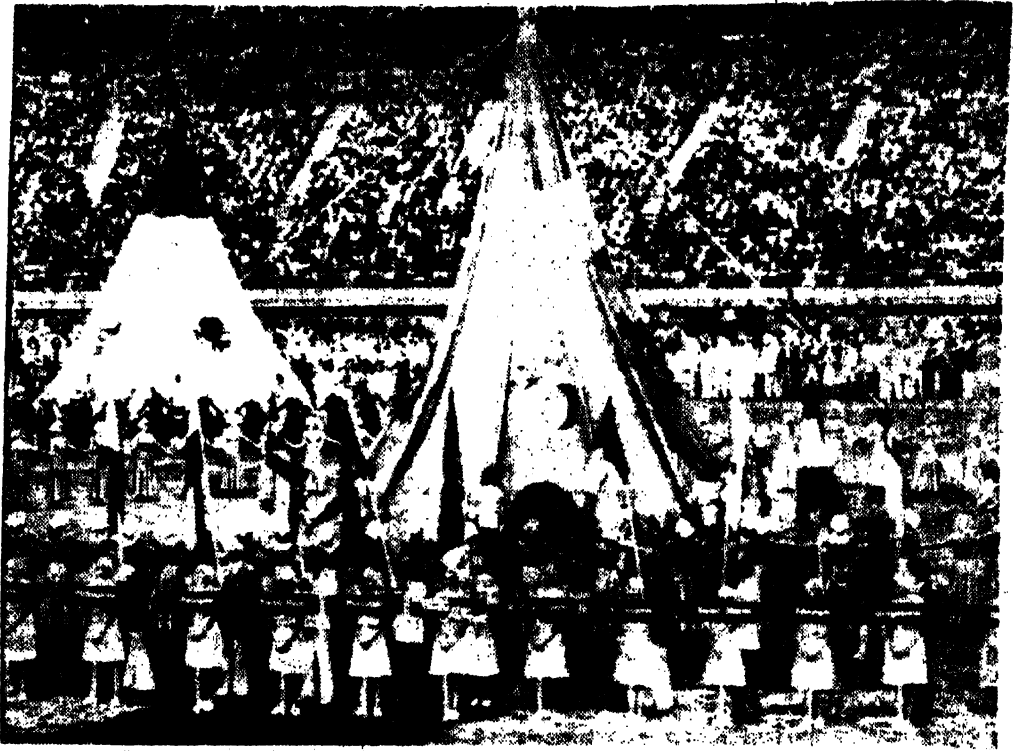
মন্ট্রিল অলিম্পিকের সমাপ্তি উৎসবে ব্যান্ডবাদের তালে তালে দর্শকদের উল্লাস

সেই নিউজিল্যান্ড পশ্চিম জার্মানী, পাকিস্তান, ভারত, স্পেন, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের উপর টেক্কা দিয়ে মন্ট্রিলে পেল প্রথম স্থান।

আগের সপ্তাহেই লিখেছি, মন্ট্রিলের হকি প্রতিযোগিতার মত এমন ওলট-পালট ফল পৃথিবীর কোন প্রতিযোগিতায় কোনকালে ঘটেনি। গ্রুপ লীগে ভারতকে ৬-১ গোলে হারাবার পর শক্তিহীন আর্জেন্টিনার কাছে অস্ট্রেলিয়ার ২-৩ গোলে পরাজয়ের কি যুক্তি আছে, যে আর্জেন্টিনা ভারতের কাছে ৪-০ গোলে হেরেছিল? মন্ট্রিলের যে জার্মানীকে সেই স্পেনই স্থান নির্ণয়ের স্পেন-পশ্চিম জার্মানীর খেলায়। গ্রুপ লীগে স্পেন ৪-১ গোলে হারিয়েছিল জার্মানকে সেই স্পেনই স্থান নির্ণয়ের খেলায় জার্মানদের কাছে হেরেছে ১-৯ গোলে। বুদ্ধিতে এসব ফলের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং মন্ট্রিলে ভারতের চারটি খেলায় পরাজয়েরও ব্যাখ্যা খুঁজে পাব না। কিছু কিছু ব্যাখ্যা অবশ্য অনেকেই করেছেন। যেমন আহত গোবিন্দকে দলে রাখা উচিত হয়নি। সেমিফাইনালে যাবার প্লে-অফ ম্যাচে ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাকে মাঠে নামানোও হয়েছে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। অস্ট্রেলিয়ার সংগে গ্রুপ লীগের ম্যাচে যে সুরজিৎ সিং রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল তাকে দলে রেখে পরবর্তী ম্যাচগুলিতে পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাক আসলাম শের খাঁকে বসিয়ে রাখার কারণও দুর্বোধ্য। গোল কিপার অশোক দেওয়ান কোন সময়ই আত্মবিশ্বাসী ছিল না। হল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একেবারেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নির্ভরযোগ্য ব্যাক মাইকেল কিণ্ডো তো আহত থাকায় এবার দলভুক্তই হয়নি।

বিপর্যয়ের এসব কারণের সংগে আর একটি কারণও যোগ করা যেতে পারে। কুয়ালালামপুরে বিশ্ব কাপ জয়ী দলের কোচ গুরুচরণ সিং বোধিকে কি কারণে বাদ দেওয়া হল? কেন নতুন কোচ নির্বাচিত করা হল গুরুবক্স সিংকে। গুরুবক্সের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু যার কোচিংয়ে একটি দল বিশ্ব কাপ জয় করল তাকে বাদ দেওয়ার পেছনে কোন যুক্তি নেই।

সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান পৃথিপাল সিং বলেছেন, কুয়ালালামপুরে যারা খেলেছিল মন্ট্রিলে প্রায় তারাই খেলেছে। তাই কি? এক দুইজন খেলোয়াড়ের অভাবে দলের শক্তি অনেক কমে যায়। অদল-বদলে সুসংহত দলের মনোবলে চিড় ধরে। কোচের পরিবর্তনে ক্রীড়াধারাও বদলে যায়।

পৃথিপাল অবশ্য একটি দারুণ অভিযোগ এনেছেন মন্ট্রিলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। বলেছেন, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে খেলোয়াড়রা তার কাছে মন্ট্রিল থেকে যে চিঠি লিখেছিল—১৬ জন খেলোয়াড়ের স্বাক্ষরিত সেই চিঠি প্রমাণ হিসাবে তিনি দাখিল করতে পারেন।

এখানে প্রশ্ন আসে : ১৬ জন খেলোয়াড় তো তা হলে একমন একপ্রাণ ছিল। তাহলে এমন বিপর্যয় ঘটল কেন? কর্মকর্তাদের মধ্যে তো চরম কোন্দল ছিল কুয়ালালামপুরে বিশ্ব কাপের সময়। কই তখন তো ক্রীড়া ভূমিকায় ঘাটতি দেখা যায়নি। অস্বীকার করি না, পরাজয়ের কিছু কিছু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আসল কথা আমাদের খেলোয়াড়রা ভাল খেলতে পারেনি। তাল রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি জয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দলের সংগে।

একলব্য

পূর্ব-জারমানীর জলকন্যা কর্নেলিয়া

নিতম্বের উপরে অবিরত যন্ত্রণায় মেয়েটি ছটফট করত। মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তুলত কিনডারগারটেনের কর্মকর্তাদের। তখন বয়স মাত্র সাত। কিনডারগারটেনের ডাক্তার ওর হিপ-জয়েন্ট ভাল করে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

মেয়েটির বাবা পূর্ব জার্মান ন্যাশনাল পিপলস আর্মির এক কর্নেল। প্রেসক্রিপশন হাতে পেয়ে অবাক। মামুলি দুই একটা ওষুধ। তার সঙ্গে জোরালো উপদেশঃ রোজ নিয়মিত সাঁতার কাটতে হবে। ডাক্তারের উপদেশ উপেক্ষা করতে পারলেন না কর্নেল। মেয়ে কর্নেলিয়াকে ভর্তি করে দিলেন সাঁতার ক্লাবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে : বিশ্ব সাঁতারের বিস্ময় বালিকা কর্নেলিয়া এণ্ডার কার আবিষ্কার? কিণ্ডারগারটেনের ওই ডাক্তারের? না, পূর্ব জার্মানীর জাতীয় কোচ প্রোফেসর রুডল্‌ফ স্ক্রাম-এর?

আমি বলব, দুজনেরই। ডাক্তার কর্নেলিয়াকে সাঁতার কাটতে বাধ্য না করলে পূর্ব জার্মানী পেত না ওই অসাধারণ মেয়েটিকে। রুডলফ স্ক্রাম বৈজ্ঞানিক প্রথায় এবং নিরলস সাধনায় সুপটু করে গড়ে না তুললে পৃথিবী পেত না এক অবিশ্বাস্য রেকর্ডের অধিকারিণীকে।

অলিম্পিক থেকে সাঁতারে চারটি পাঁচটি সোনার পদক জয়ের আরও নজির আছে। মিউনিখ অলিম্পিকে মার্কিন সাঁতারু মার্ক স্পিজই তো পেয়েছিল সাতটি সোনা, ওখানে অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে শেন গোল্ডও সোনার মেয়ে আখ্যা পেয়েছিল তিনটি সোনা একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে চারটি সোনা জয়ে কর্নেলিয়া এণ্ডারই প্রথম। তার সঙ্গে ফাউ হিসাবে একটি রুপোও রয়েছে।

মন্ট্রিল অলিম্পিকে কর্নেলিয়া সোনা পেয়েছে ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে এবং ৪×১০০ মিটার মেডলি রিলেতে। রুপো জিতেছে ৪×১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলে রেসে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি বিষয়েই আগের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

তার চেয়েও বোধ হয় বড় কৃতিত্ব, মন্ট্রিলে মাত্র ২৬ মিনিটের ব্যবধানে উপর্যুপরি দুটি ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডের কৃতিত্বে দুটি সোনা জিতে বিজয় মঞ্চে আরোহণ। প্রথমে ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে, পরে ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে। অলিম্পিক ইতিহাসে কোন প্রতিযোগীর এভাবে উপর্যুপরি দুটি প্রতিযোগিতা জয়ের নজির নেই।

পর পর প্রতিযোগিতা থাকায় কর্নেলিয়াকে ব্যাক স্ট্রোকের ইভেণ্ট ছেড়ে দিতে হয়, বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও। কে জানে ব্যাকে নামলেও সে সোনা পেত কিনা।

আগেই লিখেছি, ডাক্তারের পরামর্শে সাঁতার শুরু হয়েছিল সাত বছর বয়সে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ নয় বছরে। এগারো বছর বয়সে জাতীয় যুব প্রতিযোগিতায় ছয়টি বিষয়ে প্রথম। বারো বছরে প্রথম জাতীয় খেতাব। তেরো বছরে পূর্ব জার্মান দলের সর্বকনিষ্ঠা অলিম্পিক প্রতিযোগী। মিউনিখে পেয়েছিল তিনটি রুপো, ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে এবং দুটি দলগত রিলে রেসে।

মিউনিখ অলিম্পিকের সময় অবশ্যই সাঁতার সম্পর্কে কিছুটা সিরিয়াস ছিল। কিন্তু তেরো বছরের মেয়েটির পুতুল খেলা তখনো শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে ২০০ মিটার মেডলিতে শেন গোল্ডের বিশ্ব রিকর্ড ভেঙে প্রথম বিশ্ব রেকর্ড করার পর ওকে রেকর্ডের নেশায় পেয়ে বসে। মন্ট্রিল অলিম্পিক পর্যন্ত ফ্রি-স্টাইল, বাটারফ্লাই ও ব্যাক স্ট্রোকের বিভিন্ন ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙে-গড়ে ২৮ বার।

১৯৭৩-এ বেলগ্রেড বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পায় চারটি সোনা। পরের বছর ভিয়েনায় ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আরও চারটি। আবার চারটি ৭৫-এ কলম্বিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। পূর্ব জার্মানীর এই জলকন্যাটি জল থেকে দু হাত ভরে সোনা তুলতে তুলতে সাঁতার বিশ্বে চমক জাগিয়েছে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিতে। কর্নেলিয়াই পৃথিবীর প্রথম মেয়ে যে ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে দু মিনিটের বাধা ভেঙেছে। গত বছর ইস্ট বার্লিনের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পূর্ব জার্মানীর ছেলেমেয়েরা ১৭টি বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। সপ্তদশী কর্নেলিয়া একা করেছিল পাঁচদিনে পাঁচটি বিশ্ব রেকর্ড। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে বিশ্ব রেকর্ড করেই বলে, মন্ট্রিলে আমি ব্যাক স্ট্রোকে নামব না। কারণ, আমার সতীর্থরা ওই ইভেন্টে পৃথিবীর অন্য মেয়েদের উপর টেক্কা দিতে পারবে।

জলে পৃথিবীর ক্ষিপ্রতমা মেয়েটির সাফল্যের চাবিকাঠি কঠিন অনুশীলন এবং সাঁতারকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা। সকাল ৬টায় পুলে নামে। টানা দুই অনুশীলনের পর পড়তে বসে। স্কুলের ছুটির পর আবার জলে নামে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলন। সপ্তাহের প্রতিদিন প্রায় একই রুটিন। কর্নেলিয়ার মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিনী শার্লি বাবাশফ মন্ট্রিলে বলেছে, পূর্ব জার্মান মেয়েরা—মনে হয়, সাঁতার উপভোগ করতে পারে না। তারা সাঁতার শেখে সামরিক অনুশাসনে। উত্তরে কর্নেলিয়া বলেছে, সাঁতার আমার হবি, সাঁতার আমার ধ্যানধারণা।

হিপ-জয়েন্টের ব্যথা উপশমের জন্য যখন সাঁতার শুরু করেছিল তখন ছিল ক্ষীণাঙ্গী। এখন ৫ ফুট ১১' ইঞ্চি মাথায় উঁচু, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী স্বর্ণকান্তি স্বর্ণ-কেশী মেয়েটির বিরাট স্কন্ধ। বুঝতে কষ্ট হয় না শরীরে ও বাহুতে শক্তি আছে। কিন্তু নারীত্বের কমনীয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ইভেন্টের শুরুতে মেয়েটির গতি অকল্পনীয়। স্টার্টের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়েকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। তারপর যেন জলপরীর মত পাখনা মেলে উড়ে যায় জলের উপর দিয়ে।

সম্ভবত রক্তের টানে জলপরীকে দেখতে কানসাসের সালিনা শহর থেকে মন্ট্রিল উড়ে এসেছিলেন কর্নেলিয়ার ৬৬ বছরের ঠাকুমা রোজালি লেহম্যান, দু বছরে তিনবার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও। কর্নেলিয়া যখন মাত্র এক বছরের মেয়ে তখন লেহম্যান দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় চলে যান পূর্ব জার্মানী ছেড়ে। তারপর আর নাতনীটিকে দেখেননি। মন্ট্রিলে যখন দেখা হল কর্নেলিয়া 'ওমি' (ঠাম্মা) বলে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধাও 'কোনিকে'। দুজনেরই তখন চোখে জল।

কর্নেলিয়া এখন মেকসিকো ও মিউনিখ অলিম্পিকে ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে সোনাজয়ী রোনাল্ড ম্যাগাসের বাগদত্তা। সাঁতারুকেই বর হিসাবে বেছে নিয়েছে। সাঁতারও আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু হতে চায় শিশু চিকিৎসক। কেননা, চিকিৎসকের জন্যই আজ ওর বিশ্বজোড়া নামডাক ও প্রতিষ্ঠা।

মুকুল

বীরেশ মুখোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়/**বর্ণ বিবর্ণ**/পরিচালনা : বিপ্লব রায়চৌধুরী

নহবত/তপন থিয়েটার

উপভোগ্যতা যদি নাটকের একটি বড় গুণ হয় তাহলে "নহবত" সেদিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু ওই একটি শব্দই এ-নাটকের একমাত্র বিশেষণ নয়। যে-নাটক হালকা সুরে শুরু হয়ে প্রচুর পরিমাণে হাসিয়ে অবশেষে বেদনার রেশ নিয়ে শেষ হল সে-নাটকের অনেক দোষ-ত্রুটিই দর্শক অনায়াসে ক্ষমা করে দিতে পারেন হয়তো। আসলে নহবতের সানাই দুই সুরেই বাজতে পারে। কখনো আনন্দে কখনো বেদনায়। নাট্যকার-নির্দেশক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নহবতকে ওই দুই সুরেই বাজিয়েছেন। তবে তিনি হয়তো গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শকের চিত্তবিনোদনের কথাই বেশি করে

নাটক

ভেবেছেন। যে-কারণে এ-নাটকের হাস্যরস সূক্ষ্ম উইটকে পাশ কাটিয়ে স্থূল হিউমারকেই বেশি আশ্রয় করেছে। যে-কারণে এ-নাটকের করুণ রস ফল্গুধারার মত প্রবাহিত না হয়ে একটু বেশি আবেগ-আশ্রিত হয়ে পড়েছে। বড় জামাইয়ের ভাঁড়ামো হয়তো ওই একই কারণে মূল নাটককে কিছু সময় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছে। নাটকের উপভোগ্যতা তাতে কমেনি কিন্তু যে দ্রুতগতির সঙ্গে দর্শকের মনের গতি একাত্ম হয়ে গিয়েছিল সেটা ব্যাহত হয়েছে।

নাটকের উপস্থাপনা খুবই সুন্দর। বিয়েবাড়ির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে চমৎকার। দর্শক-আসনের মধ্য দিয়ে আমন্ত্রিত এবং বরযাত্রীদের আসা-যাওয়া কিছুটা চমকও দিয়েছে। অনেক চরিত্রেরই হয়তো ওই সুযোগে বাড়াবাড়ি করে ফেলার অবকাশ ছিল কিন্তু নির্দেশক সেখানে শক্ত হাতে লাগাম ধরে রেখেছেন। মধ্যবিত্ত অক্ষয়-বাবুর (রবীন দাস) মেয়ে রমার (কল্যাণী মণ্ডল) বিয়ে হয়তো তরুণ সংগীতজ্ঞ সব্যসাচীর (প্রদীপ মুখারজি) সঙ্গে হতে পারতো, কিন্তু ক্যানসার-আক্রান্ত সব্যসাচী রমাকে সুখী করার জন্যই আত্মত্যাগ করেছে। নতুন বর কল্যাণ (সুনীল চট্টোপাধ্যায়) উদার হৃদয়ে রমা ও সব্যসাচীর এই বেদনাময় ভালবাসাকে সম্মান জানিয়েছে। নাটকের ওই মুহূর্তে একটি স্নিগ্ধ করুণ রসের জন্ম দিয়েছে। সব্যসাচীর কাকা জ্ঞানবাবুর (বিকাশ রায়) জীবনের হাহাকার সব্যসাচীকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। সব্যসাচীর ফেলে যাওয়া বেহালার বাক্সটিকে বুকে তুলে তাঁর বেদনার্ত অভিব্যক্তি দর্শকের মন দুঃখে ভরিয়ে দেয়। নাটকের বড় বেদনা কিন্তু রমার জাঠতুতো বোন কেয়াকে (রত্না ঘোষাল) কেন্দ্র করে। এই বাল-বিধবা মেয়েটি যে কেবলমাত্র এই বিয়ের দিনটির জন্য কুমারী সাজে সেজেছিল তার মধ্যে হয়তো সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি উঁকি দিতে পারে, কিন্তু সারা নাটক জুড়ে তার হইচই, প্রেম-প্রেম খেলা, অন্যায়ের প্রতিবিধানে এগিয়ে আসা, করুণাময়ী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ এবং শেষ পর্যন্ত শুভ্রবেশ সম্বল করে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়া—এই সব কিছুর মধ্যে নাটকীয়তা যত গভীরতাও তত। বরকর্তা জেঠামশাই (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন শেষ পর্যন্ত তাকে বুকে টেনে নিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন তখন দর্শকের
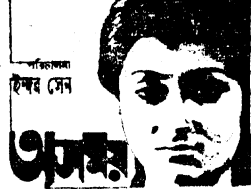
প্রদীপ মুখার্জী, বিকাশ রায়/নহবত

চোখও শুকনো থাকে না।

নাটকের কোন চরিত্রের বিশ্বাসাত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে. যেমন চাকর রামু (গিরীশ চক্রবর্তী) কিংবা বরের বাড়ির পুরুত (শংকর ঘোষাল)। কিন্তু ওই চরিত্রের শিল্পীরা যে অনাবিল হাস্যরসের অবতারণা করেছেন তার জুড়ি মেলা ভার। নাটকের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য রেণুনের পিসেমশাই। চরিত্রটি একবারও মঞ্চে এল না. কিন্তু সর্বক্ষণ নাটক জুড়ে রইল. তার প্রভাব বিস্তার করল নাটকের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে। নাট্যকার দুর্দান্ত সাহস দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। সব্যসাচীর আবির্ভাব নাটকে কয়েক মুহূর্তের জন্য, কিন্তু তার আসার আগেই ওই চরিত্রের একটা ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে নাটকে। সূক্ষ্ম রসের এই সৌন্দর্যের জন্য নাট্যকার অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন।

অভিনয় সকলেরই ভাল। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা সর্বাগ্রে। চরিত্রটি জটিল। কড়া মিলিটারী মেজাজ, চড়া সুরে কথাবার্তা, ভেতরে একটি কুসুমকোমল মন —বড় সুন্দর করে ফুটিয়েছেন শিল্পী। কড়া মেজাজের মধ্যেও হাস্যরসের সন্ধান তাঁর মত শিল্পীই দিতে পারেন। বিকাশ রায়ের জ্ঞানবাবু এবং তরুণকুমারের বড় জামাইয়ের অভিনয় দর্শককে খুশি করে। শেষোক্ত শিল্পী স্বকণ্ঠে কয়েক কলি গান শোনাতে চেয়েছেন দর্শককে। ওটার কি দরকার। রত্না ঘোষালের কেয়া আদ্যন্ত উত্তম অভিনয়ে সমৃদ্ধ। ওর দুই প্রণয়প্রার্থীর চরিত্রে নিখিল ভট্টাচার্য ও মিহির দাশগুপ্ত বেশ সাবলীল। ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন অক্ষয়বাবুর চরিত্রে রবীন দাস। বড় বোন নেলীর চরিত্রে ইরা মিত্র চরিত্রোচিত। সব্যসাচী যে সংগীতজ্ঞ, ক্যানসার-আক্রান্ত এবং প্রেমে ব্যর্থ সেটা প্রদীপ মুখারজি সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। ছোট ছোট কয়েকটি চরিত্রে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাশ ঘোষ, শৈলেন কর এবং হ্রস্বদেহী নিখিল দত্ত চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। এ-নাটকে সানাইয়ের ব্যবহার আরও দুর্দান্তভাবে করা যেতে পারতো এবং সব্যসাচীর বেহালা আরও করুণ সুরে কাঁদতে পারতো। উপস্থাপনার এই ত্রুটি কানে এবং মনে উভয়তই বেজেছে।

—রবি বসু

চলচ্চিত্র

সন্তান/ডি-লুক্স ফিল্মস

দরিদ্রকে ঘৃণা করা অপরাধ এবং কৃত-কর্মের প্রতিফল ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না—এই নীতিবাক্যের রূপায়ণ 'সন্তান'। কিশোর (সত্যেন কাপপু) দরিদ্রের পুত্র। ডাক্তারি পড়তে শহরে গিয়ে নিজেকে জমিদার তনয় পরিচয় দিয়ে সহ-পাঠিনী ধনী কন্যা লতাকে (বিন্দু) বিবাহ করে। পিতা-মাতাকে অশ্রদ্ধা ও অস্বীকার করার প্রতিফল কিশোরকে ভোগ করতে হয় প্রৌঢ় বয়সে তার পুত্র রবি (জিতেন্দ্র) ও পুত্রবধূ বিজলীর (রেখা) হাতে। যে ধরনের ঘটনার সমাবেশে আখ্যানভাগ (রচয়িতা দাসারি নারায়ণ রাও) গঠিত তাতে নতুনত্বের চমক বা মৌলিকত্ব নেই। তবে দর্শককে আকৌতূহলিত করে [illegible]কার মত বিন্যাসদক্ষতার পরিচয় [illegible]য়েছেন পরিচালক মোহন সেগল। অতিশয্য বা অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যের (যথা প্রাক-বিবাহ-কালে লতার একটি দীর্ঘ লাস্যময় বুক-নৃত্য) অভাব অবশ্য নেই। তবে সাধারণ হিন্দী ছবির প্রধান উপজীব্য অবিশ্বাস্য প্রকৃতির মারপিটের সহায়তায় অনুভূতিকে উত্তেজিত করার দৃশ্য না থাকায় স্বস্তি বোধ করা যায়। কিশোর ও লতার কৃতকর্মের জন্য রবি ও বিজলীর হাতে দুর্ভোগের পর্ব নিছক প্রহসনের ধাঁচে বিন্যস্ত। এই অংশে বিজলীরূপী রেখা এবং তার পিতা ব্যারিস্টার বলদেব রাজের চরিত্রে উৎপল দত্তের অভিনয় সারা প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে রাখে। আরাম যে হারাম রংগচ্ছলে সেটাও এই অংশে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে চেতনা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত একটি গান উপভোগ্য।

কিশোরের পিতা ও মাতার ভূমিকায় অশোককুমার ও নিরুপা রায় চরিত্রোপযোগী আবেগময় অভিনয়ে দর্শকমন অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।

—শৌভিক

কত ভঙ্গায়, অপলকা অভিনয়ে কখনো কখনো কেউ-কেউ কত বিশাল উপত্যকা লুট করে নেন, অতিক্রান্ত হন সমস্ত প্রাথমিক পিচ্ছিল ভূমি এমন এক বুদবুদ-বিস্ফোরণে উৎক্ষিপ্ত হতে যার অভিঘাত কোনো নিছক মেঠো টিমটিমে বক্স-অফিসেরও রেড়ির তেলের প্রদীপটুকু উসকে দেয়। নাম করব না, আর তার প্রয়োজনও নেই, কেননা আপনারা তো জানেনই সেই সব আকস্মিক, ক্ষণিক মুখ আর নাম, প্রচারের স্বচ্ছ স্রোতে বিম্বিত সেই সব অলীক ছায়া-ছায়া মোহিনীদের, যাঁদের জন্যে স্কুলপালানো উদ্‌ভ্রান্ত কিশোরেরা, কলেজ-রঙিন যুবক আর যুবতীরা, অফিস-দীর্ণ কাঁচাপাকা কিছু মানুষ আর ঠাণ্ডা অন্ধকার-লিপ্সু প্রেমিকেরা কলকাতার রাস্তায়, গ্রীষ্মে শীতে বর্ষায়, এঁকেবেঁকে স্পন্দমান, উৎসুক, ধৈর্যপরায়ণ সরীসৃপ হয়ে যায়। এঁদের অবিরল ক্লান্তি-হীন সম্মোহন অনস্বীকার্য। এঁরা হয়তো নিজেরাও জানেন না কেন এমন হয়—হয়তো কোনো মুদ্রাদোষও কাজে লেগে যেতে পারে, কিংবা কোনো মনোমুগ্ধকর বিভঙ্গ যা অতিব্যবহারে নির্জিত হয়ে মুদ্রাদোষ হয়ে ওঠে, যেমন ঠোঁট-বেঁকানো এক ধরনের উঁচু-ভুরু হাসি, আধ ইঞ্চি ঠোঁট ফাঁক করে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকানো, মিড-শট থেকে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে নায়িকাকে অবশ করে দেওয়া—আর এমনি অনেক!

কিন্তু চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা বিশাল, যা দলছুট একক ঘটনাকে প্রশ্রয় দেয়। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ইঁদুরের দৌড়ের বাইরেও অন্য চালে, অন্য নিয়মে, এক অন্য মাপের খেলা চলে। চেনা পুকুরে সবাই যখন নিশ্চিত মাছগুলি ক্লান্তিহীনভাবে ছিপে গাঁথছেন ঠিক তখনই তো সঙ্গীহীন বিপজ্জনক সমুদ্রে জাল ফেললেন সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল। আবার দেখুন, কত অনায়াসে হিন্দি ছবির বিস্তারিত রামধনু-ফাঁদে ধরা পড়ছে কত অসংখ্য উদ্দীপক স্বর্ণমুদ্রা, কিন্তু তবু মণি-শ্যাম-শাত্যুর মতো বিপ্রতীপ ত্রয়ী স্রোতও তো পায়ের নিচে ঠেকে বলেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্তত কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারি এই ভেবে যে এইখানেই শেষ নয়, সামনে আরো অনেক শৈল্পিক সম্ভাবনা আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে।

যেমন চলচ্চিত্র-পরিচালনায়, তেমনি চলচ্চিত্রের অভিনয়েও একেবারে সংজ্ঞাহীন একক ঘটনা ঘটে, যাকে প্রক্ষিপ্তভাবেই বুঝতে হবে। হই-চই করা ব্যবসায়িক সাফল্য যে এই আকস্মিক পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত-বাহক এমন নয়। কিন্তু এই নতুন মাপের অভিনয় এবং সেই সব আকস্মিক অচেনা ইশারা আর উদ্ভাস যা অনিবার্যভাবে সঙ্গে

মাধবী : যিনি ক্যামেরার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সেখানে পৌঁছে দিতে পারেন অনুচ্চারিত আনন্দ, বেদনা, অনুরাগ—কর্মহীন ভাবনার মুহূর্তগুলি ধরতে পারেন।

আসে, তা কোনো-কোনো সংবেদনায় শুধু যে তড়িৎগতিতে গৃহীত হয় তাই না, সেখানে চিরকালের দাগ কেটে যায় এবং যা আমাদের প্রথমেই ধাক্কা দেয় তা হল সব পরিচিত হিসেবনিকেশকে এক ঝোড়ো দাপটে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা। সেই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠি যে অভিমান-লজ্জা-ভয়-হতাশা সার সব সুবর্ণরেখার চিরন্তন বিলুপ্তি অতি-অভিনীত কান্না হয়ে উপচে না পড়ে এক কণ্ঠহীন আশ্বাহননে বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু ঠিক তার আগের মুহূর্তে মাধবীর মুখ আপনাদের মনে পড়ে কি? (সুবর্ণরেখা, ঋত্বিক ঘটক)। আজও কি কখনো-কখনো নির্জন অন্ধকার আলোড়িত করে জেগে ওঠে না সেই ছায়া-ছায়া ব্যথা-ঘন চোখ? বলুন, সেই মুহূর্তের অভিনয় সম্ভব ছিল কি চেনা নিয়মের কাঠামোয় পরিচিত গাণিতিক বন্ধনে? কিংবা ধরুন, 'বাইশে শ্রাবণ'এর সেই সতেরো বছরের মেয়েটিকে। সেই তো প্রথম কিছু জোনাকি-মুহূর্তে ধরা পড়লো যার ফলে মাধবী প্রসঙ্গে আমরা কেউ কেউ কিছুটা উৎসুক হলাম। কিন্তু কুসুম-কুসুম ঔৎসুক্য। তার বেশি কিছু নয়। তবু সেই প্রথম—অনেক দিন পরে—দেখলাম একজন অভিনেত্রীকে যিনি ক্যামেরার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সেখানে পৌঁছে দিতে পারেন অনুচ্চারিত আনন্দ, বেদনা, অনুরাগ, কর্ম-হীন ভাবনার মুহূর্তগুলি ধরতে পারেন। বুদ্ধদেব বসুর সেই অমোঘ উক্তি যে চলচ্চিত্র আর যাই পারুক, মানুষ যে ভাবছে এটা দেখাতে সে আজও অপারগ, তা প্রায় ম্লান হয়ে আসে মাধবীর এই নতুন মাপের অভিনয়ের সামনে। এতদিন আমাদের নায়কেরা ভাবতেন না এমন নয়, বরঞ্চ তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে নাটকীয়তার পরিমাণ একটু বেশি-ই ছিল, এবং এখনো আছে। কিন্তু সেই সব মন-

সর্বস্ব ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি এমন এক ভাষায় অনূদিত হত কিংবা আজও হয়—গানে, গ্লিসারিন-কান্নায়, টেবিল-ফ্যানে আঁচল-ওড়ানো ঔদাসীন্যে—যার বহু-নির্জিত ক্লিশেগুলো আমাদের অনেককেই আর স্পর্শ করতো না। 'বাইশে শ্রাবণ'এর মাধবী মুখোপাধ্যায় এই চলতি-পন্থার সেই প্রথম অস্ফুট ব্যতিক্রম যা আমাদের বুঝে নিতে বেশ কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু একবার চোখ খুলে বুঝে নেবার পর আমরা মনে-মনে আমাদের মুগ্ধতার পাশে একটি 'আশ্চর্য-চিহ্ন' বসিয়ে দিই।

কিন্তু মাধবীকেও যে রাংতার ডিঙি অন্য স্রোতে একমুঠো রৌপ্যমুদ্রার জন্যে ভাসাতে হয়নি এমন তো নয়। একবার তাঁকে

আরতি ভট্টাচার্য/ময়না/পরিচালনা ঃ অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর প্রতিভার উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটতে-কাটতে তাঁর চেতনা অবশ হয়ে আসে কি না, বিশেষ করে যখন তিনি জানেন এই সাঁতার তাঁকে কোথাও পৌঁছে দেবে না শেষ পর্যন্ত। উত্তরে বলেছিলেন, "গাছের ডাল ধরে গানও তো গাইতে হয়েছে। কি জন্যে আর পয়সার জন্যে ছাড়া?" অর্থাৎ টালিগঞ্জের ফুটো বালতিতে জল ঢালার অপচয়টাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আজ যখন আমরা পিছন ফিরে তাকাই, দেখতে পাই তাঁর এই বিরামহীন মেনে-নেওয়া অপচয় সম্পূর্ণ মূল্যহীন নয়। এখানে-সেখানে কিছু-কিছু আশাতীত আশ্চর্য জল জমে আছে!

যেমন ধরুন, 'শঙ্খবেলার' হালকা-চালের রোম্যান্টিক রোলে মাধবী, উত্তমকুমারের বিপরীতে। ছবিটি দেখতে দেখতে আমরা ক্রমাগত কষ্ট পাই এই ভেবে যে মাধবী কি সযত্ন প্রচেষ্টায় নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন উত্তমকুমারকে পরিচালকের পছন্দমত জায়গা ছেড়ে দিতে। আমাদের চোখের সামনে সব সম্ভাব্য মুহূর্ত নষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত প্রত্যাশিত মুদ্রা যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। এবং কখনো-কখনো কিছু বিবিক্ত মুহূর্তের খুব কাছাকাছি তাঁকে আসতে দিয়েও পরিচালক তাঁকে প্রায় জোর করেই সরিয়ে নেন, পাছে তাঁর প্রতিভা সব চেনা নিয়মকানুন লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে কিছু অপ্রাপণীয় ভূমি ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু একবার—এবং যতদূর মনে পড়ে সমস্ত ছবিটিতে মাত্রই একবার—মাধবী প্রায় হাওয়ার মধ্যে থেকে ধরে ফেলেন কয়েকটি ঘনবদ্ধ মুহূর্ত এবং নিমেষে তিনি সব চেনাশোনা ঘরোয়া তুলনার বাইরে চলে যান। মনে আছে আপনাদের খোলা-আকাশের তলায় নিচুমুখ ক্যামেরায় ধৃত উত্তমকুমারের সঙ্গে সেই নিবিড় আদরের দৃশ্যটি? বাংলা সিনেমায় অমন স্বাভাবিক, উজ্জ্বল, অচেষ্টিত প্রেমের দৃশ্য আমি অন্তত খুব কম দেখেছি।

আর এমনিই চলে এক বিস্তৃত অপচয়ের খেলার মধ্যে নিজেকে লুণ্ঠিত হতে দেয়া ছবির পর ছবিতে, কিন্তু কখনো-কখনো মাধবী প্রায় চুরি করে আনেন কিছু ক্ষণিক বিচ্ছুরণ যেমন 'আঁধার পেরিয়ে'তে একাধিকবার, 'স্বর্ণ-শিখর প্রাঙ্গণে' মাত্র দু-একবার, 'জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবারে' সব দুর্বলতা পেরিয়ে বারকয়েক। আর 'দিবা-রাত্রির কাব্যে'—ছবিটির সমস্ত ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও—মাধবী দেখিয়ে দেন কি অনায়াসে তিনি জিতে নেন এমন সব তুঙ্গ শিখর যা অন্যদের সযত্ন প্রচেষ্টাকে বার বার হারিয়ে দেয়। এবং তারপরে, আরও অনেক দিন পরে, মাধবীর অভিনয় আমাদের আরো একবার চমকে দেয় পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্রে'। আমরা বুঝতে পারি এবং বুঝতে পেরে আমাদের কষ্ট হয় যে বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক স্রোতে ভাসতে ভাসতে আজও তিনি নিঃশেষ হয়ে যাননি. ...১৯৬৪-তে 'চারুলতা'য় যা প্লাবনের মত এসে আমাদের পাগলের মত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই একটি ক্লান্ত স্রোত দীর্ঘ বছরের বৃষ্টিহীন খরা পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছলো।

এবং ১৯৭৬-এ এই ক্লান্ত স্রোতের কতটুকু অবশিষ্ট আছে আমরা জানি না, টালিগঞ্জে বোধ হয় কেউ এই মুহূর্তে জানবার জন্যে উৎসুকও নন। আর যে-প্রতিভা দিয়ে আর একটি প্রতিভাকে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, তারও হয়তো অভাব। কিন্তু যখন, হয়তো গ্রহ-নক্ষত্রের অপূর্ব সন্নিপাতে ঘটে এই তুমুল প্রোজ্জ্বলন, আমরা পেয়ে যাই 'মহানগর', 'চারুলতা' আর 'কাপুরুষ'-এর মত ছবি। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের নতুন মান প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা যেতে পারে যে-মাধবী মুখোপাধ্যায়কে চলচ্চিত্রের ইতিহাস চিরদিন কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে। তিনি প্রথম আবিষ্কৃত হলেন সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবিতে (১৯৬৩) আরতির ভূমিকায়, এমন এক নায়িকা যে চেনাশোনা সব অলঙ্কার খুলে ফেলে নারীত্বের অকুণ্ঠিত গৌরবে আমাদের কাছে দাঁড়াতে পারলো। মাধবী যে পটে আঁকা সুন্দরী, এমন তো নন। গুনে গুনে বার করলে তাঁর চেহারার একাধিক খুঁত চোখে পড়বে আমাদের। কিন্তু

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিতে এই খুঁতগুলিই হয়ে দাঁড়ালো মাধবীর ব্যক্তিত্বের অনস্বীকার্য অভিজ্ঞান।

আর 'চারুলতায়' যা ঘটলো—শুধুমাত্র অভিনয়ের দিক থেকেই—সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার তুলনা খুব বেশি আছে কি? সমগ্র ছবিটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাধবী অপর্যাপ্ত, অনন্যা, বিস্ময়কর! শুধু পাশাপাশি কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ রাখছি—(১) দীর্ঘ বারান্দায় মাধবীর চলে যাওয়ার মৃদু, সুকুমার ভঙ্গি; (২) খাটের কোণায় বসে সেলাই করতে-করতে দাঁত দিয়ে সুতো ছিঁড়ে ফেলা; (৩) মন্দার সঙ্গে তাস খেলতে-খেলতে চোখে-মুখে ক্লান্তির ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলা; (৪) ঝড়ের দৃশ্যে মাধবীর স্বাভাবিক তৎপরতা; (৫) বাগানের দোলনায় বসে একটি আশ্চর্য ক্লোজ-আপের জন্যে নিজেকে সংহত করে আনা; (৬) একেবারে শেষের দিকে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে তোলপাড় করা কান্না; (৭) এবং শেষ দৃশ্যের নৈঃশব্দকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে নিয়ে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

কিন্তু 'চারুলতা'র মত ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক বারো বছর আগে। আর তারপর এই দীর্ঘ বছর ধরে মাধবী আমাদের সামনে একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছেন এবং জানি না কেন নিশ্চিন্ত টালিগঞ্জ হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ

শম্ভু মিত্র ম্যাগসেসে বিজয়ী

১৯৭৬ সালের ম্যাগসেসে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন শম্ভু মিত্র। ভারতবর্ষে সর্বপ্রযত্নে নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর এই স্বীকৃতি। এ দেশ থেকে ইতিপূর্বে চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিৎ রায়, সাংবাদিক হিসেবে অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ) এবং সমাজসেবী হিসেবে মাদার টেরেসা এই পুরস্কার পেয়েছেন। দশ হাজার মার্কিন ডলারের এই পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেয়ে সম্মানমূল্য অনেক বেশী। শম্ভু মিত্রের এই পুরস্কার-প্রাপ্তি আরও বেশী গৌরবের, কারণ যে নাট্য-আন্দোলন কেবলমাত্র একটি দেশের ভৌগোলিক রেখায় সীমাবদ্ধ সেই আন্দোলনের খবর তাঁরই প্রযত্নে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গিয়ে পৌঁছেছে। এ সম্মান তাই শ্রীমিত্রের সঙ্গে দেশের সমস্ত নাট্যকর্মীই ভাগ করে নিতে পারেন।

বাংলার নাট্য-অগ্রগতিতে গিরিশ-যুগ এবং শিশির-যুগের মতই শম্ভু মিত্রও একটি যুগের প্রবর্তক। তাঁর নাট্যচিন্তা

আলাপচারী শম্ভু মিত্র ফটো: অলক মিত্র

কেবল নাটক রচনা, নাট্য-নির্দেশনা কিংবা নাট্যাভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নাট্যচর্যাকে তিনি বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন। একটি বিক্ষিপ্ত আন্দোলন তাঁর ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে সংহত হবার প্রয়াস পেয়েছে। আর অভিনয়? ষাট বছর বয়সের জরাজীর্ণতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাজা অয়দিপাউসের যুবক চরিত্রে তাঁর অভিনয় তো সর্বকালের ইতিহাস হয়েই রইল।

অতি সঙ্গত কারণেই এ সম্মান শম্ভু মিত্রকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। অর্থ আর সম্মানের চেয়েও বেশী করে তিনি চেয়েছিলেন নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য একখণ্ড জমি। যেখানে এ দেশের নাট্যকর্মীরা পায়ের নীচে এক টুকরো মাটি খুঁজে পাবে। দেশের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য এই সুযোগ দিয়ে তাঁকে কি আরও বড় করে সম্মানিত করা যায় না?

বোম্বাই থেকে

৪ঠা আগস্ট বুধবার বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ইতিহাসে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা করুণতম দিন। এত কম টাকার টিকিট বিক্রি বোধ হয় আর কোনদিন হয়নি। সেদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছিল আকাশ ভেঙে বৃষ্টি, সন্ধ্যে নাগাদ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ৯ ইঞ্চির মত। রাস্তা ছাপিয়ে জল গিয়ে পৌঁছল বেশ কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহের আসনতলে। না, তার জন্য অবশ্য প্রদর্শনী বাতিল করা হয়নি, কারণ শো তার অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। যদিও প্রেক্ষাগৃহগুলির অধিকাংশ আসনই তখন শূন্য। এটি হল সেদিনকার পয়লা নম্বর আঘাত। এবং দোসরা নম্বর আঘাতের নাম কি জানেন? কিশোরকুমার। দূরদর্শনের (টি-ভি) পর্দায় কিশোরকুমার।

যেহেতু কিশোরকুমার এখন ভারতের পয়লা নম্বরের প্রমোদপুরুষ সেহেতু তাঁর স্টেজ-শোগুলি বারংবার প্রদর্শিত হয়। গত মাসে কালো-তালিকা থেকে মুক্ত হবার পর দূরদর্শন এবং আকাশবাণী এখন আবার কিশোরকুমার প্রচারে মুখর। বেসরকারী তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে বোম্বাইতে এক লক্ষ ষাট হাজার টি-ভি সেট এখন চালু অবস্থায়। সেট পিছু দশজন হিসেবে ধরলে দূরদর্শনের দর্শক সংখ্যা প্রায় ষোল লক্ষের মত। অর্থাৎ অতগুলি সিনেমারসিক মানুষ এখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় গৃহবন্দী। অতএব ওই ৪ঠা আগস্টে সিনেমা হলগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ওই সন্ধ্যায় কিশোরকুমারের অনুষ্ঠানের সংযোজক ছিলেন সংগীত পরিচালক জুটি কল্যাণজী-আনন্দজী। ওঁদের সুর দেওয়া গানই ছিল অনুষ্ঠানে এবং বলতে দ্বিধা নেই এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের অনুষ্ঠানটি দূরদর্শনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। খুশি হওয়ার মত সংবাদ—এই জাতীয় আরও দুটি অনুষ্ঠান খুব শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে। এর একটির সংযোজক রাহুল দেব বর্মণ, অপরটির লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল। জানা গেছে, এইসব অনুষ্ঠানগুলি দূরদর্শনের অন্যান্য কেন্দ্রেও প্রদর্শিত হবে।

• • •

স্থানীয় এক পত্রিকায় নীতু সিং রাজেশ খান্না সম্পর্কে যে-সব অসমসাহসিক মন্তব্য করেছেন তাতে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নীতু বলেছেন, তিনি রাজেশের সঙ্গে আর কোনও ছবিতে অভিনয় করবেন না একমাত্র 'চক্রব্যূহ' ছাড়া—যেহেতু ছবিটি তুলছেন বাসু চ্যাটার্জী। বহু বিজ্ঞাপিত পাঞ্জাবী ছবি 'সোনী মোহিওয়াল' হয়তো ততদিন পর্যন্ত ফ্লোরে গিয়ে পৌঁছবে না যতদিন না রাজেশের বিপরীতে অন্য কোন নায়িকা নির্বাচন করছেন প্রযোজকরা।

ঘটনার উৎস 'মহাচোর' ছবির সেট। ছবির নায়িকা নীতু সিং এবং অন্যান্যরা দীর্ঘ ছয়দিন অপেক্ষা করে কাটালেন কিন্তু রাজেশ খান্না আর ফ্লোরে এলেন না। সপ্তম দিনে রাজেশ এলেন শুটিংয়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নীতু সেদিন আধ ঘণ্টার মত লেট। ফলে রাজেশ কুপিত এবং সেট থেকে নিষ্ক্রান্ত। এখন সকলেই আর একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় কারণ রাজেশ খান্না তো কোন কিছুই সহজভাবে মেনে নেন না।

সুরঞ্জন

গত মরসুম শুরু হওয়ার মাসখানেক কাটলো না তারই মধ্যে যাত্রাপাড়ার গদীতে গদীতে শলা-পরামর্শ শুরু। আগামী বৎসর, অর্থাৎ ৭৬-৭৭ সালের মরসুমে দলের চেহারা কী হবে, গঠনপর্ব, পালা নির্বাচন নিয়ে গোপন আলোচনা। **আনন্দলোকের** চন্দন মিত্র সবচেয়ে তৎপর ছিলেন। আগে যোগাযোগ করলেন অসিত বসুর সঙ্গে। ঠিক হলো যাত্রায় করা হবে 'হেলেন অব ট্রয়'। লেখার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে শিল্পী নির্বাচনপর্ব শুরু হলো। গোপনে গোপনে। ওই পালা এখন নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে। বলা হয়েছে, ইসটম্যান কালারে রঞ্জিত। অর্থাৎ পোশাক-আশাকে অভাবিত এক বর্ণাঢ্যতা আনা হয়েছে। **লোকনাট্য** দলের ইতিহাসে খুব একটা ভাঙনের দৃষ্টান্ত নেই। একটি ব্যাপারে নীলমণি দে নিশ্চিত যে, উৎপল দত্ত তাঁর রচিত একটি পালা দলে দেবেনই। পরিচালনাও করবেন তিনিই। নতুন পালাকার হিসাবে শ্রীদে সমীর মজুমদারের 'মেহেরবান' নিয়েছেন। তারও নিয়মিত অভিনয় চলছে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে। **তরুণ অপেরা** দলের দিক থেকে একাই অনন্ত। শান্তিগোপাল আছেন দলে। তিনি নতুন কিছু করার জন্য বদ্ধপরিকর। হিটলার থেকে শুরু করে আজ তক আমরা তাঁকে বিভিন্ন পালায় বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করেছি। শান্তি এবার আসরে আসবেন বিবেকানন্দ রূপে। পালার নাম 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী'। চিলির স্বাধীনতার পটে লেখা 'বিপন্ন বসুধা' দ্বিতীয় পালা। যাত্রায় নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে শান্তিগোপাল চিহ্নিত। **জনতা অপেরায়** থাকছেন স্বপনকুমার, স্বপ্নাকুমারী। গত মরসুমে বিমল মিত্রের 'স্ত্রী'র অসামান্য সাফল্যের পর ও'রা হাত দিয়েছেন তিনটি নতুন পালায়। স্বপন-স্বপ্না কাশ্মীর থেকে সবে ফিরলেন। এখন চলছে ও'দের মহলাপর্ব। ওদিকে নাট্যসম্রাজ্ঞী অপ্সরা পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্যোৎস্না দত্ত অভিনীত চারটি পালা নিয়ে জ্যোৎস্না দত্ত নাইট হয়ে গেল মহাজাতি সদনে। **শিল্পীতীর্থ** এবার জ্যোৎস্নাকে শীর্ষে রেখেই দল গঠন করেছেন। 'জয় সন্তোষী মা'র জোর মহলা চলছে এখন।

থিয়েটারকে হুবহু চলচ্চিত্রের রজতপটে আমরা দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'ও চিত্রায়িত হয়েছিলো। এবার শম্ভু ঘোষ প্রযোজিত **নবরঞ্জন অপেরার** 'লায়লা মজনু' চলচ্চিত্রে তোলা হলো হুবহু। আজ পর্যন্ত বোধ হয় কোনো অপেরাকে চলচ্চিত্র তার পর্দায় তুলে আনতে পারে নি। দুটি ক্যামেরা নিয়ে সাতদিনে গোটা পালাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। প্রতিমা পিকচারস এই ছবির প্রযোজক। নির্দেশক শচীন অধিকারী। চিৎপুর নিয়ে যে ছবি হয়নি তা নয়, সেটা ডকুমেণ্টারি। এবার চিৎপুর পর্দায় স্থান পেয়েছে। শোনা যাচ্ছে আরও কয়েকটি পালাকে চলচ্চিত্রে তোলার চেষ্টা চলছে।

—সূত্রধার

নাটক

নূতন সূর্য/নান্দনিক

কিছু কিছু নাটক নামেই স্বপ্রকাশ। 'সূর্য' দিয়ে নাম হলেই বুঝতে পারি কোন আদর্শ অথবা কোন সংগ্রাম-কাহিনী সোজা-সুজি বলতে চাওয়াই নাট্যকারের অভিপ্রেত। কিন্তু সহজভাবে বলার দিন বিগতপ্রায়। এখন কি বলব সেটা নয়, কি ভাবে বলব এই চিন্তাটাই নাট্যকার এবং প্রয়োগপ্রধানকে সজাগ রাখে। মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে নান্দনিক তাঁদের 'নূতন সূর্য' নাটকে (নাটক : পার্থ ভট্টাচার্য) একটি গভীর বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন, যা সার্থক হলে অবশ্যই অনুপ্রাণিত হতে পারতাম। নির্দেশক সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য কোন রকম আঙ্গিক বিড়ম্বিত না হয়েই মোটামুটি সহজভাবেই নাটকটি উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন এবং কিরীতিবিহীন নাটকটি শেষ হয় মাত্র পাঁচটি চরিত্রের মাধ্যমে—এটা কম কথা নয়।

কিন্তু যে জটিলতা প্রয়োগ চিন্তায় নেই সে জট নাটকে থেকে একটি সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত হতে দিল না। নাটকটি এলোমেলো, প্রয়োগরীতি অনাড়ম্বর, অভিনয়রীতি কখনও একান্ত ঘরোয়া, মনে হয় স্টেজে দাঁড়িয়েই সংলাপ তৈরী হচ্ছে, কখনও কাঁচা অবেগবাহুল্যে অতিনাটকীয়—এরকম কিছু বিরুদ্ধচিন্তা একই বৃন্তে ফুল ফোটাতে পারে কি?

অভিনয়াংশে সমর সেনের আশ্চর্য অভিনয় দর্শককে একাগ্র করে রাখে। 'অভিনয়' শব্দটি বোধ হয় ও'র সম্পর্কে সঠিক প্রযুক্ত হল না। বেশ কিছু সময় উনি অভিনয় করছেন বলে মনেই হয়নি। পাশাপাশি সুধীর মুখার্জি, দীনেন মুখার্জি ও বেণী মুখার্জি নাটককে সচল রাখতে তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। কিন্তু দেবব্রতর ভূমিকায় অমল ভট্টাচার্যের সুরেলা অভিনয় এদের পাশে বিবাদী স্বর। নাটকের যে কোন চরিত্র যখন কোন গভীর কথা বলতে গেছেন তখনই মেলোড্রামা, 'নাটুকে' সংলাপ সমস্ত স্বাভাবিকত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এমনকি যে পার্থ ভট্টাচার্য দর্শককে অন্যমনস্ক হতে দেন না, তিনিও যখন শেষ দিকে সিরিয়াস হয়ে কথা বলেন, সেই প্রথম তাঁর 'অভিনয়' প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং মূল উদ্দেশ্যে কথা বললেই যদি অস্বাভাবিক ঝোঁক, থিয়েটারি বলে মনে হয়, তখন আদর্শ কোন রেখাপাতই করে না। উপরন্তু নাটক শেষ হওয়ার পর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রই মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়, আদর্শবাদীদের বড় করুণার পাত্র মনে হয়। আর দুঃখের কি কষ্টকল্পনা। 'ভাঙ্গা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাংলা গড়বার' শপথ নিয়ে যদি আধুনিক যুবমানস প্রতিবাদে দৃপ্ত না হয়ে ধূপ বিক্রিতেই মহীয়ান হতে চায় তবে নূতন সূর্যোদয় বিলম্বিত হবেই। নাটকে সলিল চৌধুরীর বিখ্যাত 'গাঁয়ের বধূ' গান ভেঙে কতকগুলি নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে, গায়ক গানটি শেষ করলেন 'আশা ভরা স্বপনের সমাধি' দিয়ে। কথাটি ভুল—সঠিক কথাটি হল, যেটা এ নাটক প্রসঙ্গে দর্শকের মনের কথা—'আশা স্বপনের সমাধি'।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে বাদলদিত্য রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৬১·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

কোমল সোহাগ...
ঝুরঝুরে, ফুরফুরে পাউডার। কিম্বা নিরেট,
ঠাসা সৌখিন কমপ্যাক্ট। এদের কোমল সোহাগ—
আপনার মুখখানিতে ফুটিয়ে তোলে অনুক্ষণ
যৌবনের মৃদু আভা...জাগিয়ে রাখে নিখুঁত সুন্দর,
স্বাভাবিক কপোল-রাগ...দীর্ঘ সময় ধরে...
ল্যাকমে
আল্ট্রা-সিল্ক ফেস পাউডার
আর কমপ্যাক্ট
সৌন্দর্য্য সাধনায়
ল্যাকমে
daCunha/LFP/2 E BEN

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : প্রকাশ কর্মকার

প্রচ্ছদ পরিচিতি : (ক্যানভাসের ওপর তৈলচিত্র 'কালো আলো'—২৪"×১৮") এঁর ছবিতে বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ও আর্তির প্রাধান্য। একটি ভাঙ্গা ভয়ার্ত নারীমুখ চীৎকার করছে। ছবির একপাশে মোমবাতি ও দ্বিখণ্ডিত জিহ্বার মতো অগ্নিশিখা। হলুদ, লাল, সবুজ এবং ধূসর বর্ণ স্নিগ্ধ ও মোটা করে লেপন করে রঙের ঐকতান তৈরী করেছেন। মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

নীললোহিতের

মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস

সুদূর ঝর্নার জলে

দাম ৮·০০

ফরাসী মেয়ে মার্গারিট। এক মাথা অগোছালো চুল। অতি সাধারণ সাজ-পোশাক। নীল চোখে শিশুর মতো অদ্ভুত কৌতূহলী সরল দৃষ্টি। আমেরিকায় এসেছিল পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ করতে। তার বান্ধবী মোনিক চাকরি করে প্যারিসে। একা থাকে নিজস্ব এক অ্যাপার্টমেন্টে। আজ জার্মান, কাল ইটালিয়ান ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তার সঙ্গে গল্প করে, মদ্যপান করে, এবং একসময় তাকে

প্রকাশিত হল

নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দেয়। মার্গারিটের আমেরিকান বান্ধবী ডোরিরও স্বভাব—অ্যালবামে স্ট্যাম্প জমাবার মতো আন্তর্জাতিক প্রেমিক সংগ্রহ করে বেড়ানো। আর, আমেরিকায় প্রেম শব্দের একটিই মানে—দেহ। অথচ, মার্গারিটের বিশ্বাস—সত্যিকারের আনন্দ ভালোবাসায়, শরীরে নয়। কিন্তু ভালোবাসা কি? ভালোবাসা কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিল মার্গারিট তার সমস্ত সত্তা দিয়ে। পাশ্চাত্যের সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর মোচ্ছবের মধ্যে দাঁড়িয়ে মার্গারিটের চোখে নীললোহিত বয়ে যেতে দেখেছিল পবিত্র এক সুদূর ঝর্না—যার স্বচ্ছ নির্মল জলে ধুয়ে যায় কামনার সকল কলুষ, জেগে ওঠে সমগ্র-অস্তিত্ব-জোড়া অসহ্য অজানা এক টনটনে অনুভূতি। সেই সুদূর ঝর্নার জলে দুটি ভিনদেশী ভিনভাষী তরুণতরুণীর আ-সত্তা অবগাহনের এক স্নিগ্ধমধুর পবিত্র কাহিনী নীললোহিতের এই অতুলনীয় উপন্যাস।

মতি নন্দীর ক্রীড়াভিত্তিক উপন্যাস | তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

ননীদা নট আউট ৪·০০

বুদ্ধদেব গুহর বিশিষ্ট উপন্যাস | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

খেলা যখন ৬·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রে গোয়েন্দা-কাহিনী

নিশীথ রাতের আহ্বান ৩·০০

আশাপূর্ণা দেবীর কিশোর-উপন্যাস

রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০

সুরজিৎ দাশগুপ্তের

নতুন উপন্যাস

বিদ্ধ করো

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্র কা শি ত হ ল

দশ-বারো বছরের অনাথ কুন্তলকে একরকম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেই নিজের ছোট ভাইয়ের মতো মানুষ করেছিল স্বাতী। তিন কুলে স্বাতীরও কেউ ছিল না; ছোট্ট একটি ভাই পেয়ে তাই সে কৃতজ্ঞ হয়েছিল বিধাতার প্রতি। ধন্য হয়েছিল কুন্তলও।

অযাচিতভাবে একই সঙ্গে সে পেয়েছিল নিরাপদ আশ্রয় এবং অকৃপণ স্নেহ। কিন্তু সব সুখ সব সময় সকলের ভাগ্যে সম্ভবত বেশী দিন সয় না। কুন্তলেরও সয়নি। হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনায় একটি পা হারাল সে—পঙ্গু হয়ে গেল চিরদিনের মতো। একটি কিশোরের সকল স্বপ্ন-সাধ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল রাতারাতি। সমাজের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার স্বপ্ন দেখত যে আদর্শবাদী ক্ষুদ্র প্রাণটি, সেবকের পরিবর্তে সে হয়ে উঠল সমাজের ভার। অদৃষ্টের ফেরে বিকলাঙ্গ একটি আদর্শবাদী তরুণ প্রাণের ব্যথাবেদনা এবং উজ্জ্বল আত্মদানের এক অনবদ্য কাহিনী 'কুন্তলায়ন' গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা একটি বিশিষ্ট উপন্যাস—নিছক রসসৃষ্টি ব্যতিরেকেও সমাজের প্রতি শিল্পের দায়িত্ববোধের স্বীকৃতিও যাতে বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত ॥ দাম ৭·০০ ॥

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের

গঠনমূলক উপন্যাস

কুন্তলায়ন

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৩০৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪৪ সংখ্যা
শনিবার ১২ ভাদ্র ১৩৮৩

স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি

ভারতীয় স্বাধীনতার উনত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশী ও বিদেশী সমালোচক, যাদের নিঃশ্বাসের বাতাস আজও ভারতীয় জীবনের প্রতি অদ্ভুত একরকমের বিদ্বিষ্ট মনোভাবের বাষ্পে অভিভূত হয়ে রয়েছে, তাঁদেরও কণ্ঠে ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিন্দা ও নৈরাশ্যের উগ্র ভাষণ যেন একটু ম্রিয়মাণ হয়েছে।

কিন্তু ভারতজীবনের বিরাট এক ঐতিহাসিক আশীর্বাদের ক্রিয়াফল বলে ধারণা করতে হয় যে, উনত্রিশটি বৎসরের নানা সংকটের বাধায় বিব্রত হলেও ভারতীয় জীবনের অগ্রগতি নতুন সার্থকতার এক-একটি চিহ্নফলক পার হয়ে চলেছে। পনরই আগস্টে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা দিবসের বার্ষিকী যে আনুষ্ঠানিক রূপে ও প্রকারে উদ্‌যাপিত হয়েছে, সেটা আগের বছরের কিংবা তার আগের কোন বছরের তুলনায় অভিনব কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু সারা জাতির মন-প্রাণ ও চেতনার সাড়া যদি সমীক্ষিত কিংবা বীক্ষিত হয়, তবে এই বাস্তব সত্যের ছবিটিকেই স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাবে যে, দেশের জনসাধারণ এতদিনে স্বাধীনতার যথার্থ উপলব্ধি ও অনুভূতির পূর্ণতা লাভ করেছে। সংশয় ও নৈরাশ্যের অনেক অন্ধকারের অধ্যায় পার হয়ে জাতির বিশ্বাসের হৃদয়টি এখন আশাময় এক সূর্যকরের উজ্জ্বল প্রসন্নতার দীক্ষা পেয়ে গিয়েছে।

ইতিবৃত্তে ঘটনার উল্লেখ আছে যে, আজ থেকে উনত্রিশ বছর আগে স্বাধীন ভারতের প্রথম পনরই আগস্টের প্রভাত খুবই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাজধানীর আঙিনাতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলিত হবার মুহূর্তে দেখা গেল যে, সেই মেঘাচ্ছন্নতার ঘোর সহসা কেটে গিয়েছে এবং আকাশজোড়া একটি রামধনু ফুটে উঠেছে। মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত সচিব ক্যাম্বেল জনসন তাঁর স্মৃতিকথার পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নিহিত ছিল, এমনতর সংস্কারের মোহ থেকে মুক্ত হয়েও বলা যায় যে, সেদিন যা ছিল নিসর্গের একটি প্রসন্নতার সংকেত, তাকে ভারতজীবনেরই ভবিষ্যতের একটি শুভসংকেত বলে আজ মেনে নিলে যুক্তিতত্ত্বের হিসাবেও কোন ভুল হবে না।

বিশেষজ্ঞ আছেন, যিনি স্বচ্ছ দৃষ্টির মানুষ হলে অনায়াসে বলে দিতে পারবেন যে, ভারতের অর্থনীতিক অদৃষ্টের কল্যাণ এখন সমস্যার মধ্যে থেকেও সমস্যার দ্বারা ঠিক অভিভূত নয়। অর্থনীতিক বিশ্বে ভারতীয় শিল্পযোগ্যতার নানা সার্থক নিদর্শনের পণ্য যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করে চলেছে। রাজনীতিক বিশ্বে ভারত আর নগণ্য-সামান্য একটা প্রভাব নয়। ভারতীয় সমুন্নতির সম্পর্কে একাধিক অসহিষ্ণু বলবান রাষ্ট্রও বিশ্বজীবনে ভারতের রাজনীতিক প্রভাবের সত্যতাকে আজ আর তুচ্ছ করতে কিংবা ছোট করে দেখাতে পারছেন না। এর পর যে প্রশ্ন আজ এই উনত্রিশ বছরের স্বাধীনতার অন্তে ভারতজীবনের ভাবনার সম্মুখে এসে দেখা দিতে পারে, সেটা হলো সাংস্কৃতিক সমুন্নতির প্রশ্ন। স্বাধীন ভারতের জীবনে সাংস্কৃতিক আদর্শের কি কোন সমুন্নতি সংকেতিত হয়েছে? বিশ্বের চোখে ও জনমতে বিস্ময় সৃষ্টি করতে না পারুক, একটি শ্রদ্ধান্বিত কৌতূহল জাগ্রত করতে পারে, এমন কোন নবতর সাংস্কৃতিক রম্যতা কি স্বাধীন ভারতের জীবনে রূপায়িত হয়েছে?

পরাধীন কালের তুলনায় স্বাধীন কালের ভারতীয় সাহিত্য সঙ্গীত ও অন্যান্য রম্যকলায় ব্যাপকতর জনসমাদরের কলরব শুনতে পাওয়া গেলেও উৎকর্ষের বিচারে সে-সবের কোন অভিনব মর্যাদার কিংবা গরিমার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন অভিযোগের হেতুসংগত ভিত্তি আছে যে, জাতির সাংস্কৃতিক হৃদয়ের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা যথোচিত উৎফুল্লতা নিয়ে আজও শোভায়িত হতে পারে নি। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমের রীতি-নীতি ও প্রথা এবং ঐতিহ্যের অনুকরণ যেন যান্ত্রিক দক্ষতার প্রকার নিয়ে এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, সেটা জাতির স্বাভাবিক প্রতিভা এবং মর্যাদারই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য রুচি ও রীতির একটা অনুকৃত কৃতিত্ব অনেক ভারতীয় শিক্ষিতের কাছে প্রগতির নিদর্শন বলে বোধ হয়ে থাকে। ওয়াল্টার-পেটার-এর বিখ্যাত সমালোচনার গ্রন্থ রেনেসাঁস-এ বিশেষ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে, যেটা সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের একটি ঐতিহাসিক নিয়মের পরিচয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে; ভারতের মনস্বী দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণনও তাই মনে করতেন। ইতালীর পিসা সহরের এক গির্জার প্রাঙ্গনের এক জায়গায় আগন্তুক নাবিকেরা তাদের জাহাজে নিয়ে আসা জেরুসালেমের কিছু মাটি ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, সেই জায়গাতে একটি নতুন গাছের গায়ে একেবারে নতুন রূপের একটি ফুল ফুটেছে, এই ফুল ইতালীতে তথা পিসাতে কোনদিনও কেউ দেখতে পায়নি। সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের নিয়মটা এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়ে এই শিক্ষাই প্রদান করেছে যে, যদি খাঁটি স্বদেশিক মনের মাটির সঙ্গে বিদেশীর মাটি স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার ক্রিয়ায় মিলে-মিশে যেতে পারে, তবে অনুশীলিত সাংস্কৃতিক মাটিতে স্বাভাবিক ক্রমে নতুন গাছে নতুন ফুল অবশ্যই দেখা দেবে। ভারতে ব্রিটিশের রাজনীতিক কর্তৃত্বের সূচনাকালের পর এই নিয়মে ভারতীয় সংস্কৃতির নবোন্মেষ সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ মনের মাটি ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশিক, ঐতিহ্যের বনিয়াদ বিনষ্ট না করে তারই সঙ্গে আগন্তুক পাশ্চাত্ত্য ভাবনা-কল্পনার মিশ্রণ সাধিত হয়েছিল। সেদিন ভারতীয় সাংস্কৃতিকের চিত্ত দাসত্বে বিনত হয়ে পশ্চিমের চিন্তা ও অভিরুচিকে অভ্যর্থনা করেনি। সন্ত কবীরের উক্তি অনুযায়ী বলা চলে—আসনসে মত ডোল রে! স্বাধীন ভারত যেন তার নিজস্ব অভিরুচিত ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করে স্বাধীন চিন্তা ও অভিনবত্বকে সৃষ্টিশীল করে। তবেই স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনকে পাশ্চাত্ত্যের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকৃত একটা প্রকার লাভ করবার দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে না। অথচ পশ্চিমের সাংস্কৃতিক অভিরুচির সুরভিত বসন্ত-বাতাসকে সাগ্রহে আহ্বান করা সম্ভব হবে।

এক নজরে

পণপ্রথা ও পানুদা

পানুদা, ওরফে পান্নালাল দত্ত। পাড়ার প্রবীণ উকিল। সকালবেলা এসেছিলেন একখানা বইয়ের খোঁজে। কথায় কথায় উঠল বড় মেয়ে বেলার বিয়ের প্রসঙ্গ। পাত্র ঠিক হয়েছে এবং বেশ ভাল পাত্র, ইঞ্জিনীয়ার, জানালেন পানুদা। অগত্যা ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করতে হল দেনা-পাওনার কথা। নগদ কিছু দিতে হচ্ছে টচ্ছে কিনা পণ হিসাবে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিগর্ভ বোমার মত ফেটে পড়লেন শান্ত স্বভাব পানুদা। হচ্ছে না আবার? কি বলব তোমাকে সুদর্শন, বেয়াই ব্যাটা আস্ত কসাই। গয়না-গাটি, ঘড়ি আংটি, খাট বিছানা, ডানলোপিলোর গদী ফ্রিজ, রেকর্ড প্লেয়ার, রুপোর বাসন, স্টেনলেস স্টীলের বাসন, সব দিচ্ছি। তার ওপর দাবী তুলেছেন ক্যাশ পাঁচ হাজার দিতে হবে। বোঝ ত ভাই ব্যাপারখানা কি দাঁড়াচ্ছে!

টাকাটা কি চাইছেন ঘর-খরচা বলে, প্রশ্ন করলাম। টেবিলে ঘুষি মেরে উদ্বৃত্ত উত্তেজনাটুকু নিঃশেষ করে পানুদা বললেন, আরে না। ছেলে আমেরিকায় যাবে, তার অর্ধেক প্যাসেজ মানি আমাকে দিতে হবে। বাকিটা কি নিজে দেবেন? উঁহু, সেটা দেবে তার অফিস। তাহলে এখানে বিয়ে দিচ্ছেন কেন? পানুদা বললেন, দিচ্ছি কি সাধে? ছেলে মেয়ে দুজনেরই যে দুজনকে পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া ছেলেটা ভাল।

হয়ে গেল বিয়ে। মাস দুই পরেই দেখা হলেই পানুদা বেয়াইয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ ও পিন্ডদান করেন এবং শতমুখে গুণগান করেন জামাইয়ের। মেয়ে মাসে মাসে মায়ের হাত খরচ বলে পাঁচ-সাতশো টাকা পাঠায়। হয়ত পণের টাকাটা বাবা জোর করে আদায় করেছিলেন বলে জামাই মনে মনে লজ্জা পেয়েছে। আর এই ভাবেই সেটা শোধ করে দিতে চাইছে বেচারা, হাসি হাসি মুখ করে বলেন পানুদা।

মোটের ওপর মেয়ের বিয়েতে পণ দিয়ে পান্নালালবাবু এতই আহত হয়েছিলেন যে তার ধাক্কায় পণপ্রথা ও বাঙালীর কন্যাদায় নামে একখানি পুস্তিকাই লিখে ফেললেন এবং মজার কথা যে এই অভাজনকে তিনি তা উৎসর্গ করে বসলেন। আমি বললাম ভুল জায়গায় বন্দুক তাক করেছেন পানুদা। উৎসর্গ করা উচিত ছিল বেয়াই শতদ্রুবাবুকে। পানুদা বললেন, ঐ নরাধমের নাম ছাপার অক্ষরে লিখব, তুমি এ বলছ কি সুদর্শন? কালি কলমই যে অপবিত্র হবে!

বছর দুই পরে আবার এক সকালে এসে হাজির হলেন পানুদা। বললেন, কাল বিকেলে একটু সময় করে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে ভাই বাদুড়বাগানে। সেখানে কি? ধনুর বিয়ে। মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাব। তোমার চেনা পার্টি। অ্যাডভোকেট জয়ন্তীবাবুর মেয়ে। বললাম, হ্যাঁ, জয়ন্তী ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন আমার সঙ্গে। শুনেছি মেয়ে নাকি তাঁর খুবই ভাল।

উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন পানুদা। বললেন, শুধু ভাল নয় সুদর্শন, সুপারব! ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। এম-এ পড়ছে। ক্লাসিকাল ও রবীন্দ্র দুরকম সঙ্গীতেই ডিপ্লোমা আছে। তাছাড়া ঐ যে ওড়িশী না কি যেন বলে, সেই নৃত্যেও এক্সপার্ট। আর রূপ? পারফেক্টলি পয়িজড্ ফর্ম, উইথ এ চিজেলড্ ফেস [illegible] এ ভেরিটেবল মিনার্ভা!

আবেগে [illegible] চোখই বুজে ফেললেন পানুদা। বললাম, ভাবের বিয়ে নাকি? অনেকটা তাই, তবে আমি ঘরগোত্র মিলিয়ে তবে অনুমতি দিয়েছি। আমি ত আবার একটু জ্যোতিষটোতিষ মানি, বুঝলে সুদর্শন। এই পর্যন্ত বলেই বললেন, দিচ্ছে থুচ্ছে ভালই। আসবাবপত্র, গয়নাগাটা এখনকার যা দেয়, সবই দিচ্ছে। তাছাড়া আমি হাজার ছয়েক ক্যাশ চেয়েছি, নাহু নাহু করে রাজিও হয়েছেন।

ক্যাশ? আপনি পণ নেবেন পানুদা? কেন নোব না, দুহাতে তালি বাজিয়ে বললেন ভদ্রলোক। আমার গলায় গামছা দিয়ে আদায় করতে ছেড়েছিল আমার বেয়াই? প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, জানই ত ভাই। আসলে কি জান? ধ্যানেশকেও আমেরিকায় পাঠাচ্ছি। সেখানে ওর ভগিনীপতি আছে [illegible] তবে হ্যাঁ, আমি স্কুইজ করিনি, প্রায় নিজে থেকেই দিতে সম্মত হয়েছেন জয়ন্তীবাবু।

আর কথা বাড়ালাম না। পানুদা তখন মৌজে আছেন। বললে লাভও হত না কিছু। আসলে বরাবরের মত এবারও বুঝলাম, [illegible] দুদিকে [illegible] বাঙালী তলোয়ারের মত। তা যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। নিজেরা যখন আমরা ফাঁদে পড়ি, তখন সাবেকী ছাঁচ ভাঙার জন্যে কোমর বাঁধি, আবার অন্যকে যখন কায়দায় পাই, তখন পুরান প্যাঁচেই ঘায়েল করি তাঁকে। পানুদা এই সনাতন বাঙালী স্বভাবেরই প্রতীক। তার বেশীও নন, কমও নন।

মাস সাতেক পরে নাতনীর জন্মদিনে এসে পানুদা বললেন, তোমার অমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে তুমি বিদেশে পাঠালে না সুদর্শন? টাকার আন্ডিলে বসে থাকতে পারতে তাহলে! এই দেখ, ধনু হাজার টাকা করে পাঠাচ্ছে প্রতি মাসে। বললাম, ভালই ত তাহলে হচ্ছে পানুদা। জামাইয়ের পাঁচ সাত শো, আর ধনুর হাজার, মেলা টাকা হাতে পড়ছে। একখানা গাড়ি করে ফেলুন এবার।

পানুদা মুখ বিকৃত করে বললেন, শতদ্রু ঘোষের ছেলে টাকা দেবে? দুমাস পরেই হাত গুটিয়েছে ব্যাটা। এখন আর চিঠি পর্যন্ত দেয় না! কিন্তু জামাইকে কি বলব, সে ত পরের ছেলে। আপন মেয়েই দেখ মা বাপকে ভুলে গেছে সুখ সৌভাগ্যের স্বাদ পেয়ে! হ্যাঁ, ছেলে বটে ধনু। মা বাবা অন্ত প্রাণ! টাকা ত পাঠায়ই। তাছাড়া জামা, কাপড়, ওষুধ, ফুড, [illegible] না পাঠায়?

অভিজ্ঞতার কিছু বাকি ছিল তখনো পানুদার। আরো কয়েক মাস পরে একখানি চিরকুট পেয়ে দেখতে গেলাম পানুদাকে। স্ত্রী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী, নিজের দুই চোখে গ্লুকোমা হয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন পানুদা। বললেন, আজ দুটি বছর কোন রোজগার নেই। ছেলে জামাই কেউ আর একটি পাইপয়সা পাঠায় না। খোঁজ-খবরটুকুও নেয় না। এদিকে যা ছিল সব মেয়ের বিয়ে আর ছেলের বিদেশ যাত্রায় ফুঁকে দিয়ে আজ অচিকিৎসায় মরতে বসেছি। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল সুদর্শন। মাটির দখলটা পোক্ত রেখে তবে আকাশে হাত বাড়াতে হয়!

কি আর বলব? এখানেও পানুদা সনাতন বাঙালী স্বভাবের ব্যতিক্রম করেন নি। একরত্তি! আশাই করেছেন, আবহাওয়া বুঝে চেক কাটেন নি।

সুদর্শন গুপ্ত

বৈদেশিকী

বিশ বাঁও জলে

আমেরিকার লকহীড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন দুনিয়া জুড়ে যে ঘুষের জাল পেতেছিল তাতে যাঁরা ধরা পড়েছেন চুনো-পুঁটি তাঁরা কেউ নন। তাঁদের বেশীর ভাগই রুই কাতলা তো বটেই কেউ কেউ আবার রাঘববোয়ালও। তাঁদের নিয়ে ঢিঢি পড়ে গেছে দেশে দেশে। যাঁরই নাম উঠেছে এ ব্যাপারে তিনি যে দেশের লোকই হোন না কেন সে দেশেই তিনি কী করেছেন আর না করেছেন তাই নিয়ে তদন্ত চলছে। সবচেয়ে বড় তদন্ত চলছে খোদ আমেরিকায় যেখানে লকহীডের দপ্তর আর কারখানা। জেরায় বিস্তর দেশী বিদেশী নাম বেরিয়ে পড়ছে। নাম উঠেছে অনেক জাপানী কোম্পানির বড় কর্তার, জবরদস্ত সরকারী আমলার, নামজাদা রাজনীতিক আর মন্ত্রীর। এ নিয়ে হইচই পড়ে গেছে তামাম জাপানে। লোকে চাইছে সব ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হোক—কে দোষী আর কে দোষী নয় তা ধরা পড়ুক, নইলে যে কলঙ্কের পাঁক চারদিকে ছড়িয়েছে তার ছিটে যাঁরাই লকহীড কোম্পানির সঙ্গে কাজ কারবার কিছু না কিছু করেছেন তাঁদেরই গায়ে লাগবে। ঘুষ তাঁরা সবাই তো আর খাননি।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ঠক বাছতে গাঁ ওজোড় না হয়ে যায়। গোড়াতেই আটক হন জাপানে লকহীড কোম্পানির গোপন দালাল ইয়োশিও কোদামা। দু' হাতে টাকা তিনিই ছড়িয়েছেন কোম্পানির বড়-কর্তা, সরকারী আমলা আর রাজনীতিকদের মধ্যে। জাপানে লকহীড কর্পোরেশনের তৈরি মাল বেচার দায়িত্ব পেয়েছিল মারুবেনি কর্পোরেশন। ঘুষ দেওয়া নেওয়ার দায়ে আটক হয়েছেন সে কর্পোরেশনের এককালের দুই বড়কর্তা—হুয়ো ইতুইয়ানা আর হিরো শি ইতো। তাঁদের জবানবন্দির সূত্র ধরে জাপানী পুলিস জেরাও করেছে অনেককে, ধরছেও। সন্দেহ হচ্ছে লকহীডের তৈরি বিমান কেনার ব্যাপারে যাঁদেরই যোগ ছিল তাঁদের সকলেরই হাত ময়লা। কারুর বেশী, কারুর কম। কানাঘুষো চলছে অনেককে নিয়েই, কিন্তু প্রমাণ না পেলে তো আন্দাজে কাউকে ধরা যায় না। আদালতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তা হলে টিকবে না। আবার দেরি করলে প্রমাণপত্রের সব লোপাট হয়ে যাবে, সাক্ষীসাবুদের পাত্তা মিলবে না। তাই জাপানী গোয়েন্দা পুলিসকে চলতে হচ্ছে খুব সাবধানে। সামান্য একটু ভুল করলে হয়তো গোটা তদন্তই ভেস্তে যাবে—পার পেয়ে যাবে দোষীরা।

সাতাশে জুলাই জাপানী পুলিস আঁকশি দিয়েছে একেবারে মগডালে—টেনে মাটিতে নামিয়েছে দেশের পয়লা সারির নেতাদের একজনকে। তিনি হচ্ছেন কাকুই তানাকা। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত তিনি ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। এখনও তাঁরই প্রধানমন্ত্রী থাকার কথা। কিন্তু তিনি অসময়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ১৯৭৪-এর নভেম্বরে টাকা পয়সা নিয়ে কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ার দরুন। তবুও কিন্তু দেশে আর দলে তাঁর দাপট খুব। জাপানে দেশ শাসন করছে লিবারেল ডেমো-ক্র্যাটিক অর্থাৎ উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল। সে দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৯৪ জনই তাঁর চেলা। এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী সেই তাকেও মিকির দলে তেমন একটা প্রতিপত্তি নেই। তবুও তিনি যে প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন আর দিব্যি বহাল তবিয়তে গদিতে বসে আছেন তার কারণ তাঁর সং লোক বলে সুনাম আছে। তাঁর আর যাই দোষ থাকুক দুর্নীতিবাজ তিনি নন, জেনে-শুনে কখনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি। জাপানীরা চায় তাদের প্রশাসন যেন বাস্তু-ঘুঘুর আড্ডা হয়ে না দাঁড়ায়, ঘুষখোর হাঙর কুমির যেন প্রশাসনে পাত্তা না পায়।

সে দিক থেকে দেখতে গেলে তানাকার প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসার কোনো অধিকারই ছিল না। ১৯৪৮ সনে তিনি যখন ছিলেন বিচার বিভাগের উপমন্ত্রী তখন তাঁর ছ মাসের জেল হয়েছিল দশ লাখ ইয়েন ঘুষ নেবার অভিযোগে। পরে অবিশ্যি তিনি ছাড়া পান, কিন্তু সুনাম তিনি আর ফিরে পাননি। দুর্জনে বলে টাকার জোরেই তিনি দলের সেক্রেটারি জেনারেল হন ১৯৬১ সনে, সংসদীয় দলের নেতা আর প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৭২ সনে সাতো ইস্তফা দেওয়ার পর। কিন্তু বছর দুইয়ের বেশী তাঁর সৌভাগ্য টেঁকেনি—তাঁকে মেয়াদ ফুরোবার আগেই যেতে হয়েছে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগে। তিনি সত্যিই লকহীডের কাছ থেকে টাকা খেয়েছেন কি না তা এখনও প্রমাণ হয়নি। কিন্তু সে কাজ করা তাঁর পক্ষে যে অসম্ভব নয় এটাই লোকের বিশ্বাস। তাঁকে আটক করা হয়েছে দেশের বিদেশী মুদ্রা আইন ভঙ্গ করে তিনি লকহীডের জাপানী এজেন্ট মারুবেনি কোম্পানির কাছ থেকে এক কোটি ষাট লক্ষ ডলার নিয়েছেন এই অভিযোগে। টাকাটা অবিশ্যি ঘুষ ছাড়া আর কিছু নয়। এর আগে আরও তেরো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে লকহীডের কাছ থেকে পান খেতে টাকা নেওয়ার দায়ে।

জাপানের অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ ১৯৭২ সনে লকহীড কোম্পানির তৈরি ২১টা ট্রাইস্টার যাত্রীবিমান কেনার বরাত দেয়। অথচ বরাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত জানা ছিল তারা ডগলাস ডি সি ১০ বিমান কিনবে। শেষ মুহূর্তে এ ধরনের পালটে গেল মতটা দেখে লোকে সন্দেহ করেছিল এর ভেতরে কোনো গণ্ডগোল আছে। নানান গুজবও তখন রটেছিল এ নিয়ে। তারপর দেখা গেল লকহীড কোম্পানির জাপানে জোর বরাত। ৯ অক্টোবর ১৯৭২ সনে জাপানী সরকার ঠিক করলেন দেশে ডুবো জাহাজ ধ্বংস করার বিমান তৈরি করার যে সঙ্কল্প তাঁরা আগে করেছিলেন তা বাতিল করে দেবেন। তাতে লোকসান হলো জাপানী শিল্পের আর লাভ হলো লকহীডের। তাদের তৈরি পি এ সি ওরাইন কেনার ব্যবস্থা এর ফলে পাকা হয়ে গেল। এ নিয়েও জাপানে তর্কের ঝড় বয়ে চললো। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যার সহায় তাকে ঠেকাবে কে? লকহীড যা চেয়েছিল তা পেলো। দিন কতক গুজগুজ ফুসফুসের পর সব ধামা চাপা পড়ে গেল। খোদ মার্কিন মুলুকে লকহীডের কাণ্ডকারখানা নিয়ে তদন্ত না শুরু হলে সবই চাপা পড়ে যেত।

মার্কিন তদন্ত কমিটীকে লকহীডের তরফ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বলা হয়েছিল ১২ কোটি ৬০ লাখ ডলার তারা জাপানে খরচ করেছে তাদের বিমান বিক্রী করার জন্যে। এর মধ্যে বেশ কিছু টাকা গেছে আমলা আর রাজনীতিকদের পকেটে। তাঁদের নাম লকহীড কোম্পানির তরফ থেকে ফাঁস করে দেওয়া হয়নি তা বের করেছে জাপানী পুলিস। তানাকা অবিশ্যি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন লকহীডের যিনি আগে চেয়ারম্যান ছিলেন সেই কোচিয়ানের সঙ্গে তাঁর মোটে একবার দেখা হয়েছে—সেটাও নিছক ভদ্রতার ব্যাপার। কিন্তু অন্তত তিনবার তাঁদের যে দেখা হয়েছিল তা ধরা পড়েছে। সব ব্যাপারটার ফয়শালা না হলে ঠিক যে কী হয়েছিল তা জানা যাবে না। আদালতে তাঁর মামলা উঠেছে ১৬ আগস্ট। তানাকার বন্ধুরা কিন্তু বলেছেন তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রধানমন্ত্রী একটা কূটনৈতিক চাল চেলেছেন—তিনি চান দলে নিষ্কণ্টক হয়ে প্রভুত্ব করতে। মিকির পথের কাঁটা অবিশ্যি একা তানাকা নন—নকোর আর দুই চাই ফুকুদা আর ওহিরা কিছু কমজোর নন। প্রধানমন্ত্রী পদের তাঁরা দুজনও উমেদার। তবে তানাকা বিশ বাঁও জলে ডুবেছেন—ভেসে ওঠার আশা তাঁর নেই বললেই হয়।

দেবরাজ

পরিমল গোস্বামী

মনীশ ঘটক

মহাসমুদ্রে ঢেউ নেই মূক নীল আকাশ
সাথী নেই স্থির নৌকোয় নেই জোর বাতাস
তবুও তরুণী ডুবে গেল, কাল অচঞ্চল
বেলাভূমে শুধু কেঁপে গেল জল ছলাৎছল।

ভালো বেসেছিলে হাসি পরিহাস সুনির্মল
আঘাত কাউকে দিতে চাইতে না সখা আমার
প্রেমভরা বাণে ভরা ছিল তূণ, ছিলো না ধার
তারো মুখে তুমি ফুটিয়েছো হাসি যে দুর্বল।

শরশয্যায় ভীষ্মের মতো থেকেছো শুয়ে
শত্রুমিত্র ধন্য হয়েছে চরণ ছুঁয়ে
পুরুষপ্রধান কৃষ্ণই ছিলো আপন জন
নিষ্কাম গীতানায়ক রইলে সারাজীবন।

কাজ, শুধু কাজে অধিকার আছে মানতে চাই
ফলের আশায় কখনো বিপথ মাড়াও নাই॥

হারালেই হোলো

শান্তনু দাস

খসা পাতা উড়ে আসে পাতার মতোন
নাকি প্রজাপতি?
হারিয়েছে পথ।
হারালেই হোলো?
পথের তারালো কোনো পথে—
শপথ তো কিছু ছিল—পরাগের গায়ে,
রেণুর নিবিড়ে, কোনো মধ্যযামে
খবর দেবার:
মনে আছে?
পাপড়িরা ফুল হয়ে জেগে আছে শিরায় শিরায়,
পত্র দেবার কথা, মনে আছে?
নিবিড় সঙ্গমে তুমি সাপুড়ের মতো,
তুলে নেবে বাঁশি,
মনে আছে?
নীল স্বপ্ন, নরম মোমের মতো পাতার চামর
মনে আছে?

ঘরে চলো,
আলো নেবে, তবু চোখে দলমা পাহাড়
জেগে থাকে।
অতটা সহজ নয়, পড়ে আসা গৈরিক-বিকেল,
এই সব ওড়াউড়ি খেলা।
নিরালা শমন আসে হাওয়ায় হাওয়ায়
দিন যায়—
সময় আছড়ে ভাঙে শিলালিপি।
বলো—
হারিয়ে যাবার আগে শপথের কথা যা যা ছিল।
হারালেই হোলো?

দুঃখের বদলে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

দুঃখ আরো বড়ো হ'লে,
তাকে নিয়ে ঘর করা যায়।
কিন্তু এইসব ছোটো ছোটো যন্ত্রণার ছুঁচ
শুধুই বিরক্ত করে, তার বেশি নয়,
আমাকে কিছুই দেয় না, আমার শুধুই ক্ষতি করে—
পাঁচসাতদিন আর মানুষ, পৃথিবী নিয়ে
ভাবতে পারি না,
বাগান করতে গেলে, হাত থেকে খুরপি খ'সে যায়।

দুঃখ, আরো বড়ো হও,
আমাকে প্লাবিত করো, আমার সর্বস্ব ঢেকে দাও—
আমি ঠিক তোমার ভেতর থেকে
বৃষ্টির আকাশ খুঁজে নেবো,
মাঝরাত্রে জেগে উঠে, লেখার টেবিলে ঝুঁকে প'ড়ে
আমি যে তখনো তৈরী, সেইকথা তোমাকে জানাবো।

দুঃখের বদলে শুধু ছোটো ছোটো যন্ত্রণার ছুঁচ
শুধুই বিরক্ত করে, ক্লান্ত করে, তার বেশি নয়॥

বসতি

শান্তিকুমার ঘোষ

জায়গাটাকে বসবাসের উপযোগী ক'রে তুলতে
আমাদের বেশ ক'বছর কেটে গেল
সকলে হাত লাগিয়ে মাথার ওপর ছাদ-ও হ'ল তৈরি
পাহাড়ের ঢলে ফসল ফলানো যদি বা সম্ভব
মোটেই সহজ হয়নি বুনো জন্তুদের সঙ্গে
আমাদের সহাবস্থান

এরই মধ্যে গিরিনদীর মতো মেয়ে এসে রাঙিয়ে দিলো আকাশ
ঘোর লাগলো সকলের চোখে
আমাদের নিসর্গে সে-ই প্রথম প্রকৃতি

এক-একদিন টানা বৃষ্টি ও পাহাড়-ফাটানো বজ্রের ডাক
ধস্ নামতো অন্ধকারে
আমরা পাঠাতাম প্রার্থনা শিখরের চাইতে আরো উঁচুতে

ভূমি নিয়ে আমাদের বাধেনি লড়াই
কিন্তু উর্বর জমির টানে কতজন নেমে গেল উপত্যকায়
পাহাড় থেকে কেউ-কেউ দেখে ফেলেছিল
দূরস্থানে জ্বলে রোশনাই
সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত ক্ষান্তি মানেনি তারা

রইলাম আমরা পর্বত প্রদেশে
ঝরনা সেখানে নদী হয়নি
পাথরের ফলা থেকে বল্লম টাঙি
জন্তু মেরে গড়া হ'ল শিঙা
আর গুহার ভেতর মোম কিম্বা হৃদয় জ্বালিয়ে নিয়ে
প্রস্তর ভেঙে দেবমূর্তি

॥ ১০ ॥

বরদাপ্রসন্ন হালদার যথাসময়ে আমাকে ঠাকরে ম্যানসনের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারের কী কাজ তা ঠিক আমার জানা নেই। কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তা করছি না। আমার পিছনে ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েবের আদালতী অভিজ্ঞতা রয়েছে। শাজাহান হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে অসংখ্য মানুষকে দেখবার অভিজ্ঞতাও রয়েছে আমার। এই দুই মিলিয়ে মোটামুটি কাজ চালিয়ে দেবো এমন একটা মনোবল ইতিমধ্যেই আমার আয়ত্তে এসেছে।

বরদাপ্রসন্ন স্মৃতির বন্ধ দরজা খুলে অতীতের অনেক গল্প শোনালেন। কিন্তু কাজের ব্যাপারে কতখানি কী সহায় হবেন তা এখনও জানি না। লুকিয়ে কয়েকবার তিনি মালিকের বাড়ি ফোন করেছেন জেনে একটু চিন্তিত হয়ে আছি। আমি যে এই কাজে একেবারেই অনভিজ্ঞ তা বরদাপ্রসন্ন এখনও বোধ হয় আন্দাজ করতে পারেননি।

উকিল পাড়ার একটা চালু কথা মনে পড়ে গেল। 'ভাল উকিলকে যে দুনিয়ার সব আইন জানতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু তিনি জানেন কোথায় কোন্ বইতে কোন আইনের খোঁজ করতে হবে।' আশঙ্কিত মনকে আশ্বস্ত করলাম, "বিরাট বড় এই বাড়িটা চৌরঙ্গী থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; প্রত্যেক ফ্ল্যাটে ভাড়াটেও রয়েছে। ম্যানেজারের কী এমন রাজকার্য থাকতে পারে যা তোমার সাধ্যে কুলবে না?"

বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে গম্ভীর মুখে একতলার আপিস ঘরে নেমে এসেছি। ছোট্ট একখানা টেবিল, গোটা তিনেক চেয়ারের সঙ্গে একখানা দড়ির খাটিয়াকে আপিস ঘরে সহ-অবস্থান করতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। সবুজ রঙের দেওয়ালে দুখানা রঙীন রাম-সীতার ছবি সযত্নে টাঙানো রয়েছে। অন্য দেওয়ালে অবহেলা ও অযত্নে বিবর্ণ একখানা মাঝারি সাইজের অয়েল পেন্টিং নজরে পড়লো। ছবিটার ওপর জমে-ওঠা ধুলোর পরিমাণ দেখেই বলা যায় অনেকদিন কেউ ওটিকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু রাম-সীতার ছবির সামনে ইতিমধ্যে ধ্বারশটি সুগন্ধী ধূপ জেলে দেওয়া হয়েছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "প্রভুদয়াল গুপ্তজীর ছবি। আগে ওখানেও ধূপধুনো দেওয়া হতো। কিন্তু সম্পত্তি ওঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবার পরে এখানে কেউ আর ওই ছবি নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

আপিস ঘরে খাটিয়ার দিকে আমার নজরটা দ্বিতীয়বার পড়লো। বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললেন, "রামসিংহাসনের সিংহাসন। ওসব খাটিয়া-টাটিয়ার ব্যাপারে বা-জিজ্ঞেস করবার দারোয়ানদের করবেন। আমি তো এ-বাড়ির দারোয়ানদের মালিক নই।"

ওঁর কথায় আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এ-বাড়ির দারোয়ানরা কি ম্যানেজারের আওতায় নয়?

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "একটু ধৈর্য ধরুন। এসেছেন যখন, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন। লোকে দয়া করে আমাকে একটু খাতির করে, তাই যা। আমি তো এখানকার বিল সরকার। আমার কাজ বিল দেখা, মাসে-মাসে ভাড়াটেদের কাছে বিল পাঠানো এবং টাকার হিসেব রাখা।"

এই মুহূর্তে বরদাপ্রসন্নকে আর ঘাঁটানো নিরাপদ মনে করলাম না। ঘরের এক কোণে একটা খাঁকি রঙের স্টীলের আলমারী রয়েছে। বরদাবাবু কোমর থেকে চাবি বার করলেন একটা বিকট আর্তনাদ করে আলমারির দরজা খুলে গেল। গম্ভীর-ভাবে বরদা বললেন, "কীরকম আওয়াজ

শুনলেন তো! জন্মের পর থেকে একবারও তেল খায় নি। তেলকালিবাবুকে আমি অন্ততঃ দু' হাজারবার বলেছি—ও'র সময় আর হয় না! জোর করবারও উপায় নেই—সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন আলমারিকে তেল মাখানো আমার কাজ নয়।"

আলমারির ভিতর থেকে চামড়ায় বাঁধানো ডজন খানেক খাতা ঝটপট নামিয়ে ফেললেন বরাপ্রদসন্ন। আরও খাতা নামাতে যাচ্ছিলেন। এক একখানার ওজন বোধহয় আধমণ! বরদাপ্রসন্ন সগর্বে ঘোষণা করলেন, "সমস্ত রেকর্ড হাতের গোড়ায় রেখে দিয়েছি। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের ঠিকুজি-কুষ্ঠি পর্যন্ত এইখানে পেয়ে যাবেন। কোন ফ্ল্যাটের কোন্ ভাড়াটে কোন্ মাসের কত তারিখে ভাড়া দিয়েছে—সব এখানে লেখা আছে! তিরিশ বছর আগের খবরও তিরিশ সেকেণ্ডে পেয়ে যাবেন।"

বরদাপ্রসন্ন এবার কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করলেন। বললেন, "মস্ত বড় বাড়ি, মশাই। সবার সঙ্গে তাল রাখতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এক একখানা ভাড়াটে মশাই এক-একটি অবতার।"

এবার শুনলাম, এ-বাড়িতে ভাড়াটের সংখ্যা সাড়ে একাত্তর।

"সাড়ে চুয়াত্তর হতে-হতে বেঁচে গিয়েছে!" মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সব বুঝতে পারবেন। একটু সময় লাগবে, এই যা। এখানে অনেক সাড়ে-চুয়াত্তর ব্যাপার আছে। অনেক কারণে কেউ আরও কাছে মুখ খোলে না।'

"কিন্তু সাড়ে একাত্তর কেন?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কত্তার ইচ্ছেয় কর্ম! মার্টিন সায়েব ওসব হাঙ্গামা সৃষ্টি করেননি। কিন্তু তার পরে এই গুণ্ডা সায়েবের আমলেই একখানা ছোট ফ্ল্যাট খালি রাখা হয়েছিল। সেই থেকেই ব্যাপারটা চলে আসছে।"

সাড়ে রহস্য এখনও আমার কাছে সহজ হচ্ছে না। বরদাপ্রসন্ন বললেন "অনেকের ধারণা, মাসিক ভাড়া ছাড়া কলকাতায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। কিছু-কিছু বস্তিতে অবশ্য হপ্তায় ভাড়া আদায় করা হয়। কিন্তু একদিনের জন্যে ঘর ভাড়া নিতে হলে, হয় হোটেলে না-হয় ধর্মশালায় যেতে হয়। কিন্তু যাঁরা ভিতরের খবরাখবর রাখেন, তাঁরা জানেন, কিছু-কিছু বাড়িতে কম খরচে দু-তিনদিন ঘর ভাড়া নেবার ব্যবস্থা আছে।"

আমার মনে হলো, বরদাপ্রসন্ন বিশেষ ধরনের হোটেলের কথাই বলছেন। কিন্তু তিনি বললেন, "মোটেই নয়! হোটেল এবং বোর্ডিং হাউস চালানোর অনেক অনেক হাঙ্গামা, মশাই। তবে কিছু-কিছু

জানাশোনা লোক কলকাতায় এলে আমাদের এই হাফ-ফ্ল্যাটের খোঁজ করে। আমরাও বিল কেটে, রসিদ স্ট্যাম্প লাগিয়ে ভাড়া দিই। খাওয়া-দাওয়া, বালিশ-বিছানা পাল্টানোর কোনো হাঙ্গামেতেই যাই না আমরা। স্রেফ ঘর ভাড়া।"

এরকম ধরনের আশ্রয় যে কলকাতা শহরে এখনও পাওয়া যায় তা আমার জানা ছিল না।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এই হাফ-ফ্ল্যাটের একটা হিস্ট্রি আছে। কালোয়ার গুপ্তা সাহেব যখন প্রথম ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন মাথা গুঁজবার জায়গা পেতে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। শুনেছি প্রথম রাতটা তিনি হাওড়া স্টেশনে কাটিয়েছিলেন। তারপর কয়েক রাত বড়বাজারের এক ধর্মশালায়। তারপর আর জায়গা পান না। হোটেলেও অনেক খরচ--তখন আবার খাওয়া-দাওয়া না করলে দিশী হোটেলে জায়গাও পাওয়া যেতো না। গুপ্তাজী যথাসময়ে প্রচুর পয়সার মালিক হয়েও নিজের সেই দুঃখের কথা ভোলেননি। মার্টিন সায়েবের এই ম্যানসন বাড়িতে ছোট্ট এই হাফ-ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা রেখেছিলেন।"

বাকি একাত্তরখানাই যে ফ্ল্যাট নয় তা বরদাবাবুর লিস্টির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি। এর মধ্যে দোকান আছে, রেস্তোরাঁ আছে, চুল ছাঁটার সেলুন আছে—এবং আরও কত কী আছে ভগবান জানেন।

বরদাপ্রসন্ন এরপর আমাকে এ-বাড়ির কর্মচারিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তালিকায় এক নম্বর ব্যক্তিটি অবশ্যই রামসিংহাসন চৌরাসিয়া।

রামসিংহাসন আমাকে একটা মাঝামাঝি সাইজের নরম নমস্কার জানালেন। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আমি সামান্য ভাড়া-সরকার। রামসিংহাসনের ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। রামসিংহাসন আমার আণ্ডারেও নয়। মালিকদের সঙ্গে ওর সোজা যোগাযোগ থাকে। রামসিংহাসন আপনার আণ্ডারেও হচ্ছে কিনা জানেন কিছু?"

ব্যাপারটা যে একটু জটিল তা আন্দাজ করতে পারছি। কে কার আণ্ডারে, আমার কতখানি দায়িত্ব, এখন আমার কাজ কী তাও মালিকের কাছ থেকে জানবার সুযোগ হয়নি। প্রয়োজন হলে বিলাসিনী দেবীর কাছে গিয়ে ওসব ব্যাপারে খোঁজখবর করে আসতে হবে। গতকাল চাকরি পাওয়াটাই একটা বিরাট সংবাদ ছিল—তখন ছোটখাট ব্যাপারের উত্তর জানবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না আমার। এ-বাড়ির খাতা-লেখার কাজ পেলেও আমি দ্বিতীয়বার ভেবে দেখতাম না।

অভিজ্ঞ রামসিংহাসন বিনয় ও ঔদ্ধত্যের একটা বিচিত্র মিশ্রিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞেস করলো চা-পানি এসব কিছু পান করেছি কিনা।

এ-ব্যাপারে রামসিংহাসনকে ব্যস্ত না হতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু রামসিংহাসনের কথা শেষ হবার আগেই হাত-কাটা গেঞ্জি ও খাকি হাফ-প্যাণ্টপরা বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে কেটলী ও খুরি হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বালকের মৃত্তিকাভাণ্ডের দিকে তাকিয়ে রামসিংহাসন সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তার কণ্ঠে এবার বিরক্তির মেঘগর্জন হলো। নির্ভুল হিন্দিতে যে মন্তব্য বেরিয়ে এল তার অর্থ ওরে মূর্খ, মাটির খুরি কেন? তোর মালিকের দোকানে যত ভাল ভাল কাচের কাপ-ডিস ছিল তার সব কি তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে এসেছিস?

কেটলি ফেলে শশব্যস্ত ছোকরা অদৃশ্য হলো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাপডিশ সহ ফিরে এল। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে জানালো, একেবারে 'বিরাণ্ড নিউ' কাপ-ডিশ নিয়ে এসেছে।

রামসিংহাসন ঘরের কোণ থেকে একটা লাল রঙের কৌটো নিয়ে এল। ছোকরাকে হুকুম করলো, কাপের এবং ডিশের তলায় লাল নম্বরী দাগ বসাতে। এবং এই কাপ এখন থেকে নতুন এই সায়েবের জন্যে রিজার্ভ থাকবে।

ছেলেটি দ্রুত হুকুম তামিল করে কাপ-ডিশের পিছন দিকে লাল সাঙ্কেতিক নম্বর বসিয়ে দিল। তারপর কেটলি থেকে গরম চা ঢেলে আমার দিকে অতি সাবধানে এগিয়ে দিল। রামসিংহাসনজীর উপস্থিতিতে সে যে ভি-আই-পিকে চা পরিবেশন

অর্থাৎ এরা জোচ্চুরিটি ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে।

রামসিংহাসন এবার ছোকরাকে দ্বিতীয়বারের মতো সাবধান করে দিল। "সায়েবের এই ইস্পেশাল কাপে যদি কখনও অন্য কাউকে চা খেতে দেখি তাহলে কী হবে?"

ছেলেটি ভয়ে উত্তর দিল, "আমার মাথা ভেঙে দেবেন।"

গরম চায়ে মুখ দিয়ে বেশ আনন্দ হলো। কালোপাতার ছদ্মবেশী এই অমৃতটি কে যে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জানি না। কিন্তু মনে মনে সেই মহাপুরুষকে আর একবার কৃতজ্ঞ নমস্কার জানালাম। সোনালী চায়ের উষ্ণ অমৃত স্পর্শে কয়েক মুহূর্তে অবসন্ন শরীর তাজা হয়ে উঠলো।

রামসিংহাসন এবার জানতে চাইলো, আমার কোনো তকলিফ হচ্ছে কিনা। কোনোপ্রকার অসুবিধা হলে যেন সে অবশ্যই জানতে পারে।

বরদাপ্রসন্ন কিন্তু দ্বিতীয়বার পুরনো প্রশ্ন তুললেন। বললেন, "ঠিক করে জেনে নেবেন রামসিংহাসন আপনার আন্ডারে কিনা।"

রামসিংহাসনের মুখে-চোখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করলাম না। ব্যাপারটা নিয়ে সে তেমন ব্যস্ত নয়।

এই ব্যাপারে আমিও তেমন ব্যস্ত নই। কোনোরকমে কাজকর্ম ম্যানেজ হলেই হলো।

বুঝলাম, এ-বাড়িতে রামসিংহাসনের বিশেষ একটা পোজিশন আছে। মনে পড়লো, হাইকোর্ট পাড়ায় বারওয়েল সায়েবের কাছে ইন্ডিয়ার বড়লাট ও কম্যান্ডার-ইন-চীফের সম্পর্ক সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলাম। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, মহামান্য বড়লাট যতই পরাক্রমশালী হোন না কেন, সি-ইন-সিকে সব সময় আয়ত্তে আনতে পারতেন না। বড়লাটকে ডিঙিয়ে সমুদ্রের ওপারের অধীশ্বরদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবার স্বাধীনতা সি-ইন-সির ছিল। এ বিষয়ে অনেক বড়লাট খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। গুজব শুনেছি, কোনো কোনো প্রধান সেনাপতি বড়লাটের চেয়েও শক্তিমান ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শক্তির পাঞ্জা লড়তে গিয়ে কোনো কোনো বড়লাট অপমানিত ও পরাজিত হয়েছেন। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় একজন বড়লাটকে চাকরি ছেড়ে বিলেতে ফিরে যেতে হয়েছিল।

মনে মনে আমি বরদাপ্রসন্ন ও রামসিংহাসনকে যথাক্রমে ভাইসরয় ও সি-ইন-সির সিংহাসনে বসিয়ে দিলাম। সাডার স্ট্রীটের এই পরিবেশে প্রতিরক্ষার গুরুত্ব কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না!

বরদাপ্রসন্ন ঠিক এই সময় হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু ভাবছেন?"

কী ভাবছি বললে, ভদ্রলোক এখনই মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। সুতরাং মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

স্টীল আলমারির মাথায় যে-একটা বড় টাইমপিস ঘড়ি ছিল তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ ঘড়ির এলার্ম ঘণ্টা তারস্বরে বেজে উঠলো—ঠিক যেন দমকলের শব্দ। এরকম এলার্ম ঘণ্টাধ্বনি জীবনে শুনিনি।

এলার্ম শুনেই বরদাপ্রসন্ন তিড়িং করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। বললেন, "একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কেলেংকারি হচ্ছিল আর কী! ভাগ্যে কলকালি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছে।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

রামসিংহাসন বললে, "কালকালিবাবু!"

ঘোর কলিকাল চলছে জানি, কিন্তু কালকালিবাবুর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয়নি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কলকালির মতো মানুষ হয় না! কলকালি আমাদের এই বাড়ির জলের কল সারায়। তেলকালিবাবুর সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে—কলকালির সঙ্গেও দেখা হবে। রোববারের সন্ধ্যেবেলায় ওকে পাওয়া একটু মুশকিল। রোববারের সন্ধ্যাতে হুট করে পালায়, কিন্তু তখন নিজের কাজটি ঠিক করে গিয়েছে।
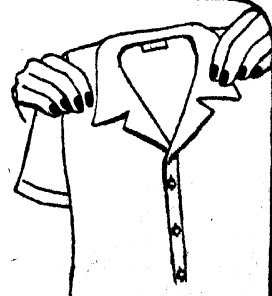
এতোক্ষণে আমার নিজের ঘরেও নিশ্চয়ই এলার্ম ঘড়ি বাজছে।'

হঠাৎ কেন এলার্ম বাজলো? এবং বাজলেও একই সঙ্গে দু' ঘরে কেন?

বরদাপ্রসন্ন ততক্ষণ নতুন রহস্য সৃষ্টি করছেন। "ঘড়ির এলার্মখানা কেমন শুনলেন? আপনার ঘুম গাঢ় না পাতলা?"

"ঘুমটা আমার গাঢ়ই বলা যেতে পারে।"

"ঘুমটা আমার গাঢ়ই বলা যেতে পারে।" এতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ঘুমের ব্যাপারে ঈশ্বর আজও আমার প্রতি কোনো কার্পণ্য করেননি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। কলকালিকে বলে দেবোখন এই ঘড়িটা আপনার ঘরে রেখে আসতে। আমার তো শুধু রবিবার সন্ধ্যায় দরকার।"

ঘড়ির বাজনাখানি যে মোক্ষম, তা বরদাপ্রসন্নকে জানিয়ে দিলাম। মরা মানুষও এই ঘড়ির বাজনায় জেগে বিছানায় উঠে বসবে।

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এমন জিনিস কোথাও পাবেন না। কালা কিটসন সায়েব বিলেত যাবার আগে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছেন।"

আন্দাজ করছি কিটসন সায়েব বরদাপ্রসন্নর বিশেষ পরিচিত—হয়তো এই থ্যাকারে ম্যানসনেরই বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "একে কানে কালা তায় ভীষণ ঘুমকাতুরে ছিলেন এই কিসটন সায়েব। সেবার, ওই ঠিক সময় ঘুম থেকে না-উঠতে পারার জন্যে সায়েবের জীবনে অমন কাণ্ড হয়ে গেল! সে এক বিরাট ব্যাপার, আপনাকে পরে একদিন সে গপ্পো বলবো'খন। তা সেবারের ওই ঘটনার পরে কিটসন সায়েব স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে এলার্ম ঘড়ি এনেছিলেন। যাবার সময় আমার কাছে জিম্মা রেখে গিয়েছেন।"

এই ঘড়ি যে বরদাপ্রসন্নর বেশ কাজে লাগছে তাও শুনলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, "আমিও ভুলো লোক। সেবার এই আপিসে বসে বাড়ি ভাড়ার হিসেব করতে করতে ভুলেই গিয়েছি রবিবারের সন্ধ্যে আটটায় আমার স্পেশাল পুজো আছে। নিয়মের পুজো—হুট করে বাদ হলেই হ'ল না। তিনদিন নিরম্বু উপবাস করে আমাকে অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। আমার সেই অবস্থা দেখে বেচারা কলকালির মনে দয়া হ'ল। বললো, 'সরকারবাবু আপনি ভাববেন না। রবিবারের পুজো আপনি আর কখনও ভুলবেন না। আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখবো।'"

আমি বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কলকালি জানে, আমি হয় নিজের ঘরে, না-হয় এই আপিসে রবিবার সন্ধ্যেবেলায় বসি। তাই দুটো ঘরে দু'খানা এলার্ম ঘড়ি বসিয়ে দিয়েছে। এ-ঘড়িটা তো ছিলই—আর একটা ঘড়ি কোথা থেকে ধার করে এনেছে।"

ধার কেন, বুঝতে পারছি না।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চিরকালের পুজো নয়। অনেকটা ব্রতর মতো—তের সপ্তাহ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা আটটার সময় আমাকে আসনে বসতে হয়। তা দেখুন তো, ভাগ্যে কলকালি চরতে বেরুবার আগে দয়া করে এলার্ম দিয়ে গিয়েছে—না-হলে আজ কী সর্বনাশেই যে পড়তাম। আমার ব্রতটাই বরবাদ হয়ে যেতো।"

বরদাপ্রসন্ন ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। পুজোয় যাবার আগে আমাকে নখ কাটতে এবং স্নান সেরে নিতে হবে।"

বরদাপ্রসন্ন এবার রামসিংহাসনের ওপর আমার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। বললেন, "রামসিংহাসন, তুমি সায়েবকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাও—আমি চলি।"

বরদাপ্রসন্ন এবার দ্রুত অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রামসিংহাসন প্রতিশ্রুতি দিল সে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমার সম্বন্ধে সরকারবাবুর কোনো চিন্তা নেই।

কিন্তু বরদাপ্রসন্নর দেহ থ্যাকারে ম্যানসনের অন্ধকার উঠানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্রই রামসিংহাসনের মুখ-চোখের ভাব পালটে গেল! সে আমাকে জানাতে দ্বিধা করলো না যে সরকারবাবুর হাবভাবের কিছুই সে বোঝে না। ইদানীং পুজো আচ্চার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। দেবদ্বিজে ভক্তি রামসিংহাসনেরও আছে, কিন্তু সরকারবাবুর মতো রামলীলা হনুমানজীর চরণে সে এতো জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়।

রামসিংহাসন এবার ড্রয়ার থেকে বিরাট একটা টর্চ বার করলো। এই সাইজের টর্চ সচরাচর নজরে পড়ে না। আলো-জ্বালানো এবং শত্রুর মাথা-ফাটা দু কাজেই জিনিসটাকে সমান সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রামসিংহাসন আমাকে নিয়ে বাড়িটা দেখতে বেরুবার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। আমার অবশ্যই আপত্তি নেই।

এই সময় চা-বালকটি এঁটো কাপের সন্ধানে ফিরে এল। আমি পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলাম। রামসিংহাসন হাঁ-হাঁ করে উঠলো—বললো, এই চায়ের দায়িত্ব সেই বহন করতে চায়। "সামান্য এক কাপ চা তো।"

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "চায়ের কাপের দামটা আমিই মিটিয়ে দিতে চাই।" প্রথম দিন থেকেই আমি রামসিংহাসনের আশ্রিত হতে চাই না।

রামসিংহাসন তখন বললো, নগদ পয়সা দেবার কিছু দরকার নেই। যখন খুশি ডাক দিয়ে চায়ের হুকুম করবেন।

গুরুগম্ভীর গলায় রামসিংহাসন এবার নির্দেশনামা জারি করলো, "নগদ লেনদেন বন্ধ! মালিককে বোলো, এই সায়েবের নামে খাতা-বানাতে। ঝটপট খাতা রেডি করে মালিক যেন আগামীকাল সকালে অবশ্যই দারোয়ানজীর সঙ্গে দেখা করে।"

এঁটো কাপ হাতে ছেলেটি এবার দ্রুতগামী হরিণের মতো অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। [ক্রমশ]

বিশ্ববিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে এখনও অপচয় কেন?

রোগটি যেহেতু সার্বজনীন, সেখানে কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান, বিশেষ কোন একটি বিষয়ের ওপর গবেষণার উদ্যোগ অথবা ব্যক্তিবিশেষ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। পরিবর্তে যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ দিলেই পরিস্থিতি কেমন সেটা অনেকেই হয়ত বুঝতে পারবেন।

যেমন ধরুন, সম্প্রতি কলকাতার কোন একটি গবেষণাগার কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানের গবেষককে পথ দেখতে বলেছেন। এঁরা সবাই তরুণ। পদার্থ-বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। পি এইচ ডি। এঁদের ভরণপোষণ করার মত গবেষণাগারের টাকা নেই।

প্রশ্নঃ এঁরা এখন যাবেন কোথায়?

বলা বাহুল্য, দেশের বেশির ভাগ গবেষণাগারের ক্ষেত্রেই এটা কোন নতুন সমস্যা নয়। দীর্ঘকাল এইভাবেই চলে আসছে। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর গবেষণা চালানর জন্যে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কর্তৃপক্ষরা স্কিম পাঠান। সরকারের এক্সপার্ট কমিটি স্কিমগুলি পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর যে সব স্কিম উপযুক্ত বলে মনে করেন, সেগুলি অনুমোদন করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার থেকে দেয়া হয় আর্থিক সাহায্য। গবেষণাগারগুলির কর্তৃপক্ষ ওই স্কিমের কাজ চালানর জন্যে তখন বাছাই করা ছাত্রদের গবেষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁদের সামনে থাকে মুখ্যত দুটি লক্ষ্য। এক, স্কিম অনুযায়ী গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া। এই সব স্কিমের কোন কোনটির উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের এক-একটি সমস্যার সমাধান করা, নতুন কোন মৌলিক তথ্য বা তত্ত্ব জুগিয়ে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা। এক কথায় যাকে বলা হয় মৌল গবেষণা। অথবা এমন কোন কোন বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান চালান, যা দেশের অর্থনৈতিক এবং জীবনের মান উন্নত করতে পারে। এসব বিষয়ের মধ্যে পড়ে কৃষি, সার, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, পরিবেশ-দূষণ, ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ, সেচ প্রভৃতি। সাধারণত এ ধরনের স্কিম এক-কালীন হিসেবে দুই থেকে পাঁচ বছরের মত হয়ে থাকে। যদি ভাল কাজ হয় এবং সরকারী এক্সপার্ট কমিটি যদি মনে করেন, স্কিমের কার্যকাল আরও বাড়ান দরকার, সেটা তাঁরা করেন। দুই, এই স্কিমগুলির গবেষণা চালানর জন্যে নেয়া হয় ছাত্রছাত্রী। এঁদের মুখ্য লক্ষ্য থাকে একটিই। স্কিম অনুযায়ী গবেষণা চালিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ। এটা দরকার। কারন এই ডিগ্রিটি না থাকলে পেশাগত বিজ্ঞানী হিসেবে মর্যাদা পাওয়া শক্ত হয় (অন্তত এদেশে এই নিয়ম এখনও চলছে)।

ডক্টরেট পাওয়ার পর স্কিমটির কার্যকাল যদি শেষ না হয়ে গিয়ে থাকে, অথবা স্কিমটির কার্যকাল বাড়ান হয় এবং সেই সঙ্গে গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ ওই সব ছাত্র-ছাত্রীর (যাঁদের অনেকেই তখন ডক্টরেট হয়েছেন) ওপর প্রীত থাকেন, এই প্রীতিভাব কাজের চেয়ে মন মেজাজের ওপরই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ভরশীল—তাহলে তাঁদের চাকরিটি বজায় থাকে। অন্যথায় বেকার।

এই বেকারদের তখন একমাত্র লক্ষ্য, একটি চাকরি। যে বিষয়ে গবেষণা করলেন, সেই বিষয়ের ওপর আরও ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করার মত যদি কোন কাজ পাওয়া যায়, ভাল। এমন সৌভাগ্য এক আধজনের ভাগ্যেই ঘটে। অবশিষ্ট যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তখন উঠে পড়ে লাগেন বিদেশী ভিসা সংগ্রহের জন্যে, অনেকে শুধু দিন যাপনের এবং প্রাণ ধারণের গ্লানি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কেউ হন কলেজের শিক্ষক, ব্যাঙ্কের কর্মী, অথবা অন্য কিছু। অধীত বিজ্ঞানের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ, এমন অপচয় এখনও নিয়মিত ঘটনা।

কিন্তু কেন?

অর্থনৈতিক কারণে?

গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ যাঁরা তাঁরা অবশ্য একথাই বলেন। তাঁরা বলেন কি করে কাজ হবে বলুন? টাকা কোথায়? সরকারী

এক নজরে

সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এই মহাকাশ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি। পৃথিবী থেকে স্পেস সাটলের সাহায্যে সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে গিয়ে উপগ্রহটি মহাকাশেই তৈরি করা হবে। ডান দিকে স্পেস-সাটলটি লক্ষ করুন। তারপর বড় বড় দর্পণের সাহায্যে সৌরতাপ কেন্দ্রীভূত করে তরল পদার্থকে (সম্ভবত পারদ), বাষ্পীভূত করে চালান হবে জেনারেটার। বাষ্পীভূত বস্তুকে আবার শীতল করে বাষ্প তৈরির কাজ করা যাবে। বিদ্যুৎ শক্তি বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে আসবে পৃথিবীর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। অবশেষে সেখান থেকে সরবরাহ করা হবে বাড়ি, কলকারখানা বা অন্যত্র।

অনুদান যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে আর্থিক সাহায্য পাই অনেক কম। যন্ত্রপাতি কেনা-কাটা আছে, আরও স্কলার দরকার, অত কম টাকায় চলে কি করে?

এ অভিযোগ যে মিথ্যে, সে কথা বলছি না। তবে আংশিক।

বরং সম্প্রতি কয়েকটি গবেষণাগারের কাজকর্ম দেখতে গিয়ে এটাই মনে হয়েছে, অর্থনৈতিক অনুদান দেবার ব্যাপারে সরকারী কার্পণ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যেমন ধরুন, বছর দুই আগে প্রচুর প্রচার এবং উৎসব করে পরলোকগত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিজ্ঞানীর নামে এ দেশে একটি ইনসটিটিউটের পত্তন হয়েছে। পত্তনের পর এই প্রতিষ্ঠানটি একাধিক জাতিক এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছেন, পোস্ট এম এস সি কোর্স পড়ানর একটি ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু সেখানে আসলে যে কি হচ্ছে, অনেক বিদগ্ধজনের কাছেও শুনেছি, তাঁরা নিজেরাও জানেন না। এখানে কয়েকজন বিদেশী ছাত্রও ভর্তি করা হয়েছিল। বর্তমান লেখকের কাছে তাঁদের একজন অভিযোগ করেছেন, অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, পরলোকগত সেই বৈজ্ঞানিকের নাম শুনে অনেক স্বপ্ন নিয়েই এসেছিলাম—এখন মনে হচ্ছে, আপনাদের দেশটা দেখা হল, এই যা লাভ। আর কিছু পেলাম না।

শুনেছি, ওই ইনসটিটিউট একজন প্রধান অধ্যাপকের দ্বারা পরিচালিত। অধ্যাপক যাঁরা তাঁরা সবাই অবৈতনিক। তা হোন, আপত্তি নেই। কিন্তু এ ধরনের পঠন-পাঠন চালানর জন্যে যে ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন, সে যোগ্যতা কারোর নেই। বলেছেন একজন বিশেষজ্ঞ।

'কাগজে ইনসটিটিউট।' বলেছেন আর একজন।

অথচ এই ইনসটিটিউটের পেছনে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে প্রাদেশিক সরকার, এমন কি কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাও ঢেলেছেন।

তা যদি হয়, যদি কেউ মনে করেন, এ অর্থ অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে না কেন?

ওঠে না, উঠলেও অন্তত সোচ্চার নয়। কারণ, এক ইনসটিটিউটটি একজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর নামে উৎসর্গীকৃত। এবং বিশেষ অঞ্চলের কাছে যাঁর আসন দেবতার মত। দুই, যৌক্তিকতার কথা ছেড়ে দিয়েও, এখানকার কার্যক্রম নিয়ে কেউ পর্যালোচনা করলেই, উদ্যোক্তারা (বরং বলি উদ্যোক্তা) হয়ত বলবেন, এ নিছক শত্রুতা করা হচ্ছে। জনমানসিকতাকে একসপ্লয়েট করে প্রাদেশিকতা অথবা রাজনৈতিক ধুয়া তোলাও অসম্ভব নয়। তিন, এসব ক্ষেত্রে সমালোচনার আঙুল তোলার সৎসাহসও বড় একটা দেখা যায় না।

ফলে এমন ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। সরকার গোলমাল এড়ানোর জন্যে আর্থিক সাহায্য দেন। আর সেই আর্থিক সাহায্যে যা চলে, এক কথায় তাকে বলা যায় 'পুরনো আমলের টোল চালান।' একেবারে খয়রাতি ব্যাপার।

তা হোক। কিছু প্রশ্ন এই, যেসব ছাত্র-ছাত্রী এখানে এক হিমালয় প্রমাণ উচ্চাশা নিয়ে হাজির হন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে কতটুকু লাভবান হন তাঁরা? বিষয়-বস্তুর উপর সম্যক উপলব্ধি এবং উদ্দীপনা যা তাঁদের পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর পর্যায়ে কর্মক্ষম করে তুলতে পারে—সে ব্যাপারে কতটা লাভবান হন?

একটি গবেষণাগারের ওয়ার্কশপে গিয়েছিলাম। এটি সারা দেশের অন্যতম বিশিষ্টতম ওয়ার্কশপ। এদেশে একাধিক আধুনিকতম যন্ত্রপাতি তৈরির প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এখানকার কর্মীরা।

একজনের হাতে একটি 'সেণ্ট্রিফিউজ' দেখলাম। অকেজো হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, কি বলব, বাইরের কোম্পানির তৈরি এই সেণ্ট্রিফিউজ। কয়েক হাজার টাকা দাম। অথচ কেনার কয়েকদিন পরই এটা বিগড়ে গেল। এখন আমাদের সারিয়ে দিতে হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের তো অনেক নামডাক শুনেছি। আপনারা সেণ্ট্রিফিউজ তৈরি করতে পারেন না?

ভদ্রলোক বললেন, পারি না মানে! তৈরি তো করেছি। দশ বছর কাজ চলছে! কমপ্লেইন নেই।

না, শুধু সেণ্ট্রিফিউজই নয়। অনেক কিছুই করেছেন তাঁরা। করার ক্ষমতাও রাখেন। কিন্তু কাজ দিচ্ছেন কে?

'যা শিখে এখানে এসেছিলাম, এখন ভুলে যাচ্ছি।' বললেন জনৈক টেকনিশিয়ান।

ব্যাপার এই, এই সব ওয়ার্কশপের

দায়িত্ব মুখ্যত দুটি। এক, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সারান। দুই, কোন গবেষক যদি কোন যন্ত্রের ব্লু প্রিণ্ট তৈরি করেন, তার প্রয়োজন মত সেই ব্লু-প্রিণ্ট অনুযায়ী যন্ত্র তৈরি করা।

জনৈক কুশলী বললেন, এতে লাভ হল এই, গবেষক তাঁর নিজস্ব স্পেসিফিকেশন মত যন্ত্র পান। বাইরে থেকে কিনতে গেলে সময় লাগে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, তাতে খরচ পড়ে অনেক বেশি।

যেমন ধরুন না প্রতি মিনিটে ১৬,০০০ বার ঘোরে এমন একটি সেণ্ট্রিফিউজ কিনতে গেলে দাম পড়ে ১০,০০০ টাকা। অথচ ওই একই কার্যক্ষমতার একটি সেণ্ট্রিফিউজ যদি আমরা তৈরি করে দিই তাহলে খরচ পড়বে ৫,০০০ টাকা।

অবাক কাণ্ড! টাকার দিক দিয়ে যদি এত সাশ্রয়, এবং আমাদের গবেষণাগার-গুলির ওয়ার্কশপে যখন উপযুক্ত কুশলীর অভাব নেই তখন সে সুযোগটি পুরোপুরি ব্যবহার করা হয় না কেন? কেন এমন অপচয়?

এই যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারেও অদ্ভুত কয়েকটি ঘটনা চোখে পড়েছে। যেমন দেখলাম, একটি গবেষণাগারে একটি লেজার কেনা হয়েছে। অথচ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কেনা সে ব্যাপারে কোন কাজেই লাগান হয়নি এই যন্ত্রটিকে। হাজার হাজার টাকায় কেনা এ ধরনের যন্ত্র কিনে অকাজে ব্যবহার না করে যদি ওই টাকায় অন্য কোন সতীর্থ বিজ্ঞানীর প্রয়োজনে লাগে এমন যন্ত্র কেনা হত, তাতে করে সেই ভদ্রলোক উপকৃত হতেন বেশি। গবেষণা ক্ষেত্রে টাকাটার সদ্ব্যবহারও হত?

এছাড়া অনেক সময় অনেক যন্ত্রপাতি কেনা হয় যথাযথ কোন পরিকল্পনা না নিয়েই। বলা হয়, মশায়, সরকারী গ্রাণ্ট আসছে, এখন কিনে তো নিই। তারপর দেখা যাবে কিভাবে তাকে কাজে লাগান যায়। এর ফলে অনেক যন্ত্র কেনাই হয় শুধু, কাজে আসে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। কিন্তু বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘকাল।

একজন বললেন, স্কলার নিতে হয় নেয়া, সেমিনার আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

প্রশ্ন এখানেও। সেমিনার আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হবে কেন? আমরা তো জানি, সেমিনারের উদ্দেশ্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পরিচালনা সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা। আলোচনার পর মূল বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার কাঠামো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।

'বেশির ভাগ আলোচনাই হয়, আর কিছু নয়।' এ বক্তব্য আর একজনের।

আমাদের প্রশ্ন, প্রত্যেক সেমিনারে সরকার যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞরা পরস্পর খোলা মনে কথা বলুন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবুন, বলুন বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণার কল্যাণে কি করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ফল লাভ হয় কম। এর জন্যেও কি সরকার দায়ী? আসলে, গবেষণার নামে যা চলছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা শুধু চাকরি করে যাওয়া, যথাযথ পরিকল্পনা নেই, সঠিক উদ্দেশ্য থাকে না কখনও কখনও। অনেক সময়, একটি প্রবলেম নিয়ে কাজে হাত দিয়েই, সেটাকে অসমাপ্ত রেখে আর একটি প্রবলেমে হাত দেয়া—আর খামখেয়ালিপনার জন্যে গুনতে হয় যে টাকা, সে টাকা যোগায় দেশবাসী, সরকার যার প্রতিভূস্বরূপ। যে কোন অনুদান যোগানোর ব্যাপারে তাঁদের সতর্ক হতেই হয়।

কয়েকটি গবেষণাগার ঘুরে আমাদের মনে হয়েছে দেশের গবেষণাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি বিষয়ের ওপর এখনই গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

যেমন, এক, কয়েকটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করে দেশের প্রতিটি গবেষণাগারে পাঠান। তাঁরা সেখানে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট সময় এবং ধৈর্য নিয়ে খতিয়ে দেখুন সেখানে কি কি যন্ত্রপাতি রয়েছে, কতখানি তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে, কতটা নয়। দুই, ব্যক্তিগতভাবে ওয়ার্কশপের কুশলীদের সঙ্গে কথা বলে জানুন, ব্লু-প্রিণ্ট অনুযায়ী কোন কোন যন্ত্র তাঁরা তৈরি করতে পারেন। যেগুলি তৈরি করতে পারেন, করতে দিন। এবং এ কাজ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং জাতীয় পর্যবেক্ষকদলের সুপারিশক্রমে কতটা হতে পারে দেখা দরকার। অর্থাৎ এ ধরনের কাজ যথেষ্ট দক্ষ এবং জাতীয় পর্যবেক্ষকদলের যাতে নজরে থাকে, তা দেখতে হবে। তিন, বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ-বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের কয়েকটি দল তৈরি করা দরকার। এই দল প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে যাবেন। প্রত্যেক গবেষণাগারের প্রতিটি বিভাগ প্রতি মাসে রিসার্চগাইড এবং স্কলারদের নিয়ে আলোচনা-চক্র বসাবেন। এই আলোচনা-চক্রে মাসের কার্যবিবরণী এবং সমস্যাদি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন বিজ্ঞানীরা বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে। তিনি সবার সঙ্গে বসে বুঝে নেবেন কাজ কতটা এগিয়েছে, কতটা এগোয় নি। সেই সঙ্গে সুবিধে-অসুবিধের ব্যাপারগুলিও। পরে জাতীয় কমিটি এ সব কাজ পর্যালোচনা করবেন। এবং যথাযথ ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত দেবেন। শুধু কাগুজে রিপোর্ট এবং তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের মাধ্যমে নয়। চার, পেশাগত পদোন্নতির ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যতা হওয়া উচিত কে কতটা ভাল কাজ করছেন তার ওপর, তথাকথিত চাকরির সময়কালের ওপর নির্ভর করে নয়। পাঁচ, যাঁরা উপযুক্ত গবেষক দেখতে হবে তাঁরা যেন বেকার হয়ে না পড়েন। ছয়, প্রতিটি বিজ্ঞানী, বিশেষ করে যাঁরা তরুণ, বড় কর্তাদের সামনাসামনি হয়ে কথা বলার মত সুযোগ যাঁদের কম, তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে জাতীয় কমিটি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলুন। দেখুন, তাঁরা কি ভাবছেন। কতটুকু সুষ্ঠু-ভাবে কাজ করছেন। কারোর খেয়ালিপনার শিকার হয়েছেন কি না। তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শুনুন। প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

আসলে যা বলছিলাম, তাই প্রতিধ্বনি। গবেষণাগারগুলি শুধু চাকরির আগার হিসেবে দেখতে কেউ চান না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীও নন। এবং সেই মত পরিবেশ তৈরি করা না গেলে শুধু অপচয়ই বাড়বে। সেই সঙ্গে হাজার হাজার বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য।

সমরজিৎ কর
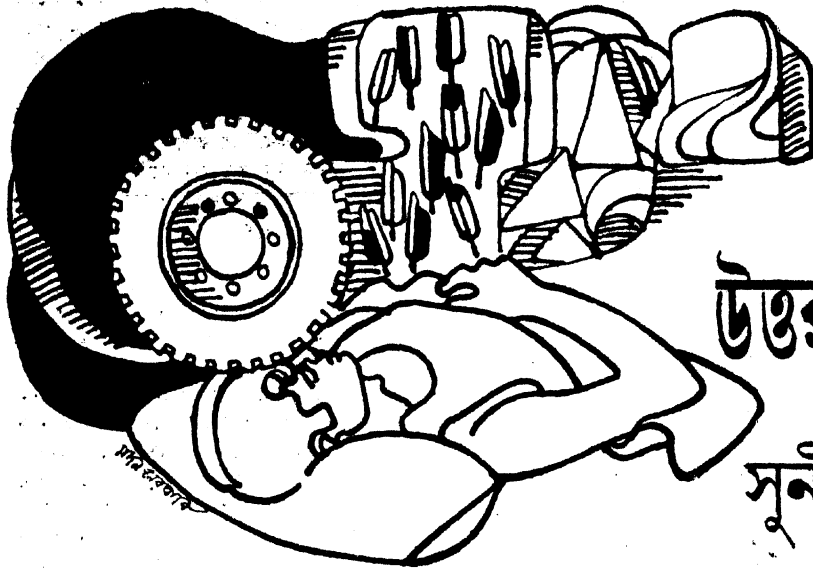
উত্তরতিরিশ

সুনীল দাস

আসলে, সে ভেবে দেখেছে, কেউ বোধ হয় বর্তমানের মধ্যে বেঁচে থাকে না। হয় বাঁচে ভবিষ্যতের বাঁচা ভাবতে ভাবতে; আর তা না হ'লে অতীতের স্তূপে। বর্তমানের মধ্যে বাঁচা বড় কঠিন।

ভারি রাত। শীত পড়েছে ঘন করে। এইসব রাতে তার গাঢ় ঘুম হওয়ার কথা। অথচ তার ঘুম আসছে না। পাশের বাড়ির ডাক্তারের টেলিফোনটা আবার বাজছে। ওটার শব্দেই তো ঘুম চটে গেল তার।

মৃত্যুর আগে বাঁচা ব্যাপারটা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়। তাকে যেমন দিচ্ছে। মাথার মধ্যে বাঁচার হিসেবপত্তর ঘোরাফেরা করে। যেমন তার তিরিশটা বছরের মধ্যে প্রথম বাইশটা বছর কেটেছে ছাত্র হ'য়ে আর বাকি আট কাটালো ছাত্র পড়িয়ে। এর বাইরে সে কখনো অন্যজীবনে পা দেয়নি।

আহ্, এখনো টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছে যে! রিসিভার তুলতে এতো দেরি হচ্ছে কেন? এক একদিন তার প্রচন্ড রাগ হয়। ডাক্তারের ওই টেলিফোনের আওয়াজ কত রাত যে ঘুম ভাঙিয়েছে তার কোন হিসেব নেই। একেবারে ঘরের লাগোয়া ঘর। তবে আজ-শেষ রাত বলে সব কিছু ক্ষমা। রাত ফুরোনোর আগেই আজ সবকিছু ফুরিয়ে যাবে যখন, তখন আর এই সামান্য বিরক্তি নিয়ে ভাবার কোন মানে হয় না। সকালে তার মৃতদেহ পুলিসের হাতে যাওয়ার আগে ওই ডাক্তারকেই প্রথমে দেখতে হবে। বেচারা ব্যস্তসমস্ত ডাক্তার মানুষ! খানিকটা সময় বাজে খরচ হবে বইকি!

অবশ্য খুব একটা বেশি সময় নষ্ট হওয়ার কথা নয়। এখন যে শিশিটা আছে তাকটার মাথায়, ঘরের এককোণে, সকাল-বেলায় সেটাই পড়ে থাকবে এই বিছানার পাশে। একটা চিঠিও লেখা থাকবে—তার এই আত্মহত্যা হঠাৎ কোন আঘাত বা উত্তেজনার ফল নয়। অনেক ভাবনাচিন্তা ক'রে খুব ঠান্ডা মাথায় সে নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

ডাক্তার নিজেই রিসিভারটা তুলেছে বোধ হয়! হ্যাঁ, ওই তো ডাক্তারের গলার স্বর, শোনা যাচ্ছে। রাতে প্রায়ই ঘুম ভেঙে গেলে ওই গলা শুনতে হয়েছে তাকে। শুনতে শুনতে চটেছে খুব। আজ তার কোন রাগ নেই। বরং শেষবারের মতো পড়শীর কণ্ঠস্বর শুনতে ভালই লাগছে। মাঝে কটা রাত ওই ধাতব কণ্ঠস্বর একেবারেই বন্ধ ছিল। টেলিফোনটা খারাপ ছিল দিন দুয়েক। ডাক্তারই গজ গজ করছিল, কাকে বলছিল যেন, কলের মিস্ত্রিরা পাইপ সারাতে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে—টেলি-ফোনের লাইনে কি যেন সব গন্ডগোল করে গেছিল।

কলকাতার ওপরটা যেমন জট পাকানো—এর নিচেটা—মাটির তলায় জট পাকিয়ে আছে—আরো জঘন্য রকম। ডাক্তার তখন ব'লছিল, 'এর নিচে দিয়ে কোথায় কিসের লাইন গেছে কি রকম ভাবে—তার কি নকশা আছে কোন কাগজপত্তরে? কিস্সু নেই। একমাত্র পুরোনো আমলের মিস্ত্রিরা—সেই কবে ব্রিটিশ আমল থেকে কলকাতা খুঁড়ে খুঁড়ে চুল পাকিয়েছে যারা—তারা শুধু বলতে পারে। তাদের মাথার মধ্যে ছক করা আছে নানান লাইনের নাড়ি-নক্ষত্র। নতুন লোক এলেই সব

ছটিকে পাউকে একসা করে দেয়। কি করে চলছে যে শহরটা এখনো ?'

ডাক্তারের কথাটা শুনে, তখন তার মনে হয়েছিল—শুধু এই শহরটা কেন—গোটা দুনিয়াটাই যে এখনো চলে যাচ্ছে কি ভাবে ভাবলে তাজ্জব লাগে বড়। মাঝে মাঝে রাতে তার ঘুম হয়না। আর ঘুম না হ'লেই একা একা চুপচাপ জেগে ভাবতে ভাবতে, তার নিজের এবং আর সকলের বেঁচে থাকার রগড়টা চিন্তা করে হাসি পায়। কোন মানে হয় না। রেগুলার এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস টেনেছেড়ে ফালতু টিকে থাকার ব্যাপারটাই কি নির্মম বোকামি! খুব ঠাণ্ডা মাথাতেই সে নিজের সরে যাবার সিদ্ধান্তটা নিয়েছে। অন্যরা চট্ করে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাদের অনেক পিছুটান থাকে। তার এসব কিছুই নেই। তার পক্ষে একেবারে মিটে যাওয়া অনেক সহজ।

আজ শীতের কামড়টা খুব বেশি। পাশ ফিরতে গিয়ে ডান পা থেকে লেপটা সরে গেল। পা দিয়ে টেনে টেনে আবার সে লেপটাকে ঠিক করে নেয়। উঠতে ইচ্ছে করে না। আলস্য আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। নিজেকে তার এখন একটা জড় স্তূপ মনে হয়। সেই জড় স্তূপের ওপর দিয়ে একটা জীপের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। যখন তখন, অনবরত গড়িয়ে যায় চাকাটা। তার ভেতরটাকে ভেঙে চুরে তছনছ করে দেয়।

দুপুর বেলায় সে একবার অলকাকে ফোন করেছিল। অলকা দীপার বন্ধু। দীপার অ্যাকসিডেণ্টের খবরটা অলকাই তাকে দিয়েছিল। অলকার বিয়ে হয়েছে বছর দুই।

'কি ব্যাপার, হঠাৎ যে!' ফোনের ওপার থেকে ভেসে এসেছিল অলকার গলা।

'এমনি!'

'এমনি?' অলকার গলায় বিস্ময় খুশি আনলো কিনা বোঝা গেল না।

'কাল চলে যাচ্ছি তো!'

'কোথায়?'

'অনেকদূর। পরে জানবে।'

'এখন জানা যাবে না?'

'একটু রহস্য থাক।'

'তোমার তো সব কিছুতেই রহস্য।'

'তাই কি?' —সে আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

'কতদিনের জন্যে যাচ্ছো?'

'বললাম, পরে শুনবে।'

'এটাও পরে? তার মানে তুমি ফিরে এসে ফোন করবে?'

সে মৃদু শব্দ তুলে হেসে ছিল, তারপর বলেছিল, 'রাখছি। কেমন।' বলেই নামিয়ে রেখেছিল রিসিভারটা।

এখন, এই ঘন শীতে, টেলিফোনের শব্দ পাশের বাড়িতে ডুবে গেল যখন, তার আর একবার কানে বাজল অলকার গলা। লেপ জড়িয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে, সে ভাবতে চাইলো। কাল অলকা যখন তার মৃত্যুর খবর পাবে, তখন ফোনের কথাগুলো কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আনবে অলকার মনে! 'কাল চলে যাচ্ছি তো!'—এই কথাটা কি বারবার মনে পড়বে না তখন? বেশ মিহি নাটক হয়ে গেল একটা। ভাবতে ভাবতে মনে মনে খুশি হলো সে। এইসব গুঁড়ো গুঁড়ো মজা তার খুব ভাল লাগে। এভাবে যদি সে অনেককে ফোন করে যেতে পারতো! কিন্তু তেমন লোকের সংখ্যা কজন! তবে এখনো সে ইচ্ছা করলে দু এক জনকে চিঠি লিখে যেতে পারে। সেটা করতে গেলে এখনই তাকে লেপ ছেড়ে উঠতে হয়,

আলোটা জ্বালাতে হয়, কাগজকলম নিয়ে শুরু করতে হয় আর দেরি না করে। কিন্তু অতটা পরিশ্রমের কথা ভাবতেই তার ইচ্ছে করে না। অবশ্য উঠতে তাকে একবার হবেই। তাকটার ওপর থেকে শিশিটা পাশে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

অথচ, এই বছর দুয়েক আগেও সবাই বলতো, তার মতো পরিশ্রমী মানুষ পাওয়া ভার। এখানে ওখানে ছোটাছুটি, উৎসব, এক্সকারসন—সবতাতেই সে আগ বাড়িয়ে থেকেছে। দীপাও হাসতে হাসতে বলতো, 'পারো বটে! একদিনও দেখলাম না কোন কিছুতে তোমার উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে!'

এখন থাকলে দীপা দেখতো, ভাঁটা নয়, চড়া নয়—একেবারে শূন্য ধু ধু করছে তার উৎসাহের নদী।

'কাল চলে যাচ্ছি তো'—ঠিক এই কথাটাই দীপা তাকে বলে ছিল চলে যাওয়ার আগের দিন। দীপা অবশ্যি কলকাতা ছেড়ে যাবার কথাই বলেছিল, তার মতো অন্যকিছু মনে রেখে বলেনি। অথচ সে যাওয়াটা, বরং সেই বলাটা যে এমন অর্থ পাবে তা কে জানতো! এর আগে পর্যন্ত সে 'নিয়তি' শব্দটাকে বরাবর তাচ্ছিল্য করেছে, আর এর পর থেকে শব্দটা থেকে দূরে দূরে থাকতে চেয়েছে সব সময়ে।

শেষরাতে শীতের ধারটা কি মারাত্মক হ'য়ে উঠতে চাইছে! একটা লেপই যেন যথেষ্ট নয়। সে আরো কুঁকড়ে যাচ্ছে ক্রমে। আগে তো সে এরকম শীতকাতুরে ছিল না। অলস মানুষের বোধ হয় শীত বেশি। তার ভাবনার মধ্যে 'অলস' শব্দটা ভেসে রইলো অনেকটা সময়। তাকে ধিক্কার দিল না, বরং পরিহাস করলো।

আজ রাতে বিছানায় যাওয়ার আগেই তো শিশিটা তার নিঃশেষ করার কথা। এই যে এতোটা সময় সে ঘুমিয়ে ছিল—সেটা তো তার হিসেবে ছিল না। কেমন এক আলস্য নিয়ে বিছানায় এসে গা ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। ঘুমের মধ্যেই কোন এক সময় উঠে সে যে আলোটা নিবিয়েছে তা আর মনে এলো না কিছুতেই। ঘুমের মধ্যে খানিক আগে দেখা স্বপ্নটাই এখন বারবার মনে এলো।

স্কুলবাড়িতে কিছু গোলা পায়রা আছে ঠিকই, কিন্তু এমন অগুনতি ঝাঁক ঝাঁক পায়রা তো কোনদিন দেখেনি সে! দেখতে দেখতে স্কুলের ভেতরকার মাঠটা ভরে গেল পায়রায় পায়রায়। থিকথিক করছে, এক-চিলতে মাঠ দেখা যায় না। গলা ফুলিয়ে একসঙ্গে ডাকতে শুরু করলো যখন, কানে তালা পড়ার উপক্রম। তারপর হঠাৎ একসঙ্গে পাখার শব্দ করে সেই ঝাঁক ঝাঁক পায়রা উড়তে শুরু করলো। মুহূর্তে কালোপাখার আড়ালে নিয়ে গেল আকাশটা। মাথার ওপরের আকাশটার বদলে কালোপাখনার চাঁদোয়া কাঁপতে থাকলো। এরপর একসময় ঝরঝর করে ঝরতে লাগলো পালক। প্রথমে একটা দুটো, তারপর অঝোরে ঝরতে শুরু করলো। থামে না আর। ভয়ে হিম হ'য়ে গেছিল তার ভেতরটা। সেই পালক-ঝরা আকাশটার তলায় তার দম আটকে আসছিল। সে ছুটে পালাতে গিয়ে দেখলো তার সামনে একটা মস্ত পাঁচিল! এ পাঁচিলটা এলো কোথা থেকে! এটা তো তার স্কুল-বাড়ির পাঁচিল নয়। তাহ'লে?

দেরি না করে সে পাঁচিলটা পেরোতে চাইলো। পাঁচিলটা ডিঙোতে গিয়ে অবাক হ'ল সে। দেখতে দেখতে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছিল পাঁচিলটা। সে যতবার চেষ্টা করছিল সেটা পেরিয়ে যেতে, ততবারই পড়ে যাচ্ছিল। পলেস্তরা খসে খসে পড়ছিল প্রথম প্রথম। শেষে একসময় হুড়মুড় করে পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছিল তার ওপর। স্বপ্নের পাঁচিলটার তলায় পড়ে সে মরে গেল।

এখন তার মনে হ'লো—সে বুঝিবা অনেককাল থেকে মরে পড়ে আছে। একটা করে দিন যায়, আর একটা করে ইঁটের ভার বাড়ে বুকের ওপর। তার ভাবনাকে আড়াল করে দাঁড়াল আকাশ-স্পর্শী পাঁচিলটি। মাথার মধ্যে স্কুলবাড়িটা দুলে ওঠে। সিঁড়ি, করিডোর, ক্লাসরুম। বিরতির ঘণ্টায় কে যেন তাকে বলেছিল, চোখের নজর ভাল রাখতে চাও যদি—যত পারো সবুজ দ্যাখো—ঘাসের সবুজ, গাছগাছালির সবুজ। সবুজ দেখলে চোখ তাজা থাকে।' স্কুলের মাঠে নিসর্গের সবুজ নেই, প্রাণের আর এক সবুজ ভরে থাকে সেখানে। সেই দিকে তাকিয়ে সেও কি দিনের পর দিন তাজা থাকতে চেয়েছে?

কাল সকালে প্রথমে কে দেখবে তার

মৃতদেহ? বসন্ত না রাধা, নাকি সন্তু কিংবা পীযূষ? ওদের মধ্যে সবার আগে কে আসবে পড়তে? কাল সকালে কি পড়ানোর কথা ছিল যেন।...তারপর সেই স্বার্থপর দৈত্য তার কুঠার দিয়ে ভেঙে দিল তার বাগানের পাঁচিলটা। দৈত্য বুঝলো শিশুদের চেয়ে সুন্দর ফুল আর হয় না।...

কে আসবে আগে, রাধা না বসন্ত?

সবাই পাঁচিল ভাঙতে পারে না। কেউ কেউ চাপা পড়ে যায়।

হয়তো বসন্তই আসবে আগে। দরজায় শব্দ করবে। দরজা খুলবে না। বন্ধ ঘরে শীতের লেপের তলা থেকে সে আর কোনদিন সেই শব্দ শুনতে পাবে না।

আসছে সকালের দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে সে আর আগের মতো নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। ভেতরটা কেমন একটু কেঁপে যায় যেন। একেই কি মায়া বলে? মায়া সম্ভবত দুঃখকে বেশি করে সইবার অন্য নাম।

তবু সবকিছু সওয়া যায় না। এইসব

ভাবনার আলো অন্ধকার-এর মধ্যে দিয়ে সেই জীপের চাকাটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে যখন তখন। অনবরত গড়িয়ে চলে চাকাটা। তার ভেতরটাকে গ‍ুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

'কাল চলে যাচ্ছি তো!' —এ কথাটা যদি সে আরো অনেকজনকে বলে যেতে সে পারতো! কিন্তু তাই বা হতে যাবে কেন! অনেকজনকে বলে যাবার কথা ভাবছেই বা কেন! মায়া? মনের আনাচে কানাচে এই ধরনের মায়া বিছিয়ে বসতে চাইলেই বুঝতে হবে বয়সের ভার বইতে গিয়ে মনে এবার ক্লান্তির ঢল নামতে শুরু করেছে। স্বপ্নের শূন্য জায়গা তখন মায়ার দখলে। ভবিষ্যৎ নিয়ে বেঁচে থাকা বদলে গেছে অতীত টেনে বেঁচে থাকায়।

মাথার থেকে লেপ সরিয়ে, এই অন্ধকার ঘরে সে চোখ মেলে। অন্ধকার আর শীত মাখামাখি হ'য়ে ভারি হ'য়ে ঝুলে থাকতে চায় চোখের ওপর। প্রায় একই সঙ্গে তার মাথার ভেতরে একটা মায়াবী সবুজ আলো ছড়িয়ে যায়। এ আলোয় সে মাঝে মাঝে চোখ ডুবিয়ে নেয়। এই আলো আঁচল ভরে কোমলতা দেয়।

টিচার্স রুমের দরজায় লাল পরদা ঝোলে। দরজার উল্টোদিকে সবুজ জানলা। জানলা ঘিরে পেয়ারা গাছের ডালপাতার জাফরি। পাতার ফাঁকফোকর পেরিয়ে মিহি আলো নামে সেখানে। জানলার নিচে জলের কলসির ওপর গড়িয়ে যায় সে আলো। গড়িয়ে যায় তার স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে।

গড়াতে গড়াতে দীপাদের জীপটা পাহাড় থেকে উল্টো যে খাদটার মধ্যে পড়ে গেছিল সেই দৃশ্যটায় এসে থামে।

গত শরতে সে একা একা গেছিল সেই জায়গাটায়। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দীপা আর ফেরেনি। জীপ উল্টে খাদের মধ্যে পড়ে তিনজন আহত হয়েছিল। নিহতর সংখ্যা দুই। একজন দীপা, অন্যজন অলকার ননদ। জায়গাটাতে পৌঁছে সে স্থির হ'য়ে বসেছিল সেখানে অনেকটা সময়। চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চাইছিল। জীপের একটা চাকা নাকি খুলে গেছিল কি ভাবে। সেই খুলে যাওয়া চাকাটা যখন তখন তার মাথার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। তার শিরা উপশিরা-স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে—সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে গড়িয়ে চলে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তাকে ভেঙেচুরে একশেষ করে দিতে থাকে।

আর সে ভাবতে চায় না একটা জীপের চাকা কেমন করে তার সর্বকিছু কেড়ে নিল। আর সে ভাবতে চায় না কেমন করে তার ভবিষ্যতের মধ্যে বাঁচা বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপর থেকে খালি অতীত। শুধু স্মৃতির মধ্যে বাঁচা। তিরিশ পেরোনোর আগে সে কোনদিন এমন করে অনুভব করেনি—রবীন্দ্রনাথ অলস আর মায়া শব্দ দুটো পাশাপাশি ব্যবহার করেছিলেন কেন।

আর অলস অনুভবে ভাসা নয়। রাত বেড়ে যাচ্ছে ক্রমে। এবার লেপ সরিয়ে উঠতে হবে একবারটি। শেষবারটি। তাকের ওপর থেকে শিশিটা আনতে হবে। এরপর অনন্ত শয্যা।

অথচ সেই জীপের চাকাটা গড়িয়ে গড়িয়ে তার সমস্ত ইচ্ছার জাগরণকে পিষে দিয়ে যাচ্ছে কেন! এই শীতের ভার সরিয়ে, লেপ সরিয়ে উঠতে এতো বেশি আলস্য ঠেলতে যাচ্ছে কেন! ঘন শীতের দীর্ঘ রাতটা বিশাল পাঁচিল হ'য়ে তার যা কিছু অনুভূতি আড়াল করে দাঁড়াতে চাইছে।

এবার উঠে পড়া দরকার। মাথার মধ্যে ওই চাকার ঘূর্ণন—সকাল হওয়ার আগেই শেষ করা দরকার। এই শুধু অলস মায়া... অবসাদের খাদ বেয়ে—তিরিশ পেরিয়ে—সে কোথায় চলেছে...

সে ওঠে।

ঘুম থেকে ওঠে। দরজায় শব্দ তার ঘুম ভাঙায়।

'যাই' বলে লেপ সরিয়ে উঠতে হয় তাকে। দরজা খুলতে হয়, যেমন করে প্রতিদিন খোলে। শীতের এক ঝলক বাতাস ভোরের কুয়াশা মেখে ছুটে এসে তার চোখের পাতায়, নাকের ডগায়, ঠোঁটে দংশন করে।

'স্যার, দেখেছেন বাইরে কেমন কুয়াশা পড়েছে! কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'আজ আমরা অনেকক্ষণ ডেকেছি আপনাকে। অনেক বার।'

সে তার মাথার মধ্যে প্রচণ্ডগতিতে গড়িয়ে আসা চাকাটার তলায় চুরমার হয়ে যেতে যেতে বলে, 'ঘুমটা বড় বেশি হয়ে গেছে। এতো অলস হয়ে গেছি না—কাল রাতে একটা মারাত্মক কাজ মিটিয়ে ফেলার কথা ছিল, হলো না।'

CHAITRA-C-29 BEN
আমার
5 স্টারে ভাগ বসাবে ?
কলা পাবে !
ক্যাডবেরীজ্ 5 স্টার
ক্রীমে ভরপুর মিল্ক চকলেটে
মোড়া মজাদার ক্যারামেল আর সুস্বাদু
নুগাটিনের পুরের ওপর পুর।
স্বাদে অতুলনীয়-কেউ ছাড়তে চায় না

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

শিল্পী রামকিংকর

কোনো শিল্পী যদি সম্বর্ধিত হন তাহলে ভীষণ আনন্দ হয়, আর তিনি যদি রামকিংকর হন তাহলে তো খুশিতে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করে। কিংকরদার জীবন-চরিত ও সৃজনকর্ম সম্বন্ধে ভাবতে গেলে খাঁচার মধ্যে পাখির মতো মনটা কেমন ডানা ঝাপটাতে থাকে। এক একসময় মনে হয় ওঁর মতো মহৎ শিল্পীর জন্যে আমরা কীইবা করতে পেরেছি।

সম্প্রতি ওঁকে ললিতকলা আকাদমীর ফেলো নির্বাচন করা হয়েছে। (প্রশ্ন উঠতে পারে, এতো দেরী হলো কেন?) সেই উপলক্ষে গত ৬ই অগাস্ট শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো।

কিংকরদার কথা মনে হলেই একটা খড়ের চালের বাড়ির কথা মনে আসে।

একটা রোঁয়া-ওঠা পাখির মতো হতশ্রী বাড়ি। সামনে এক চিলতে বাগান। অতি সাধারণ টেবিল চেয়ার। ছেঁড়া চটি। রঙ-ওঠা লুঙ্গি, কলাই করা মগ—একটা ছন্নছাড়া পরিবেশ। আর তিনি নিজে? কতো বড় মানুষ! বিশাল হৃদয়। চওড়া কাঁধ। বলিষ্ঠ কব্জি। আর তাঁর মুখে কী অমল সুন্দর একটা চরিত্র আছে। লোকের ধারণা শিল্পীদের আঙুল লম্বা, সরু এবং ফুলের মতো নরম হয়। কিংকরদার আঙুল মোটা মোটা, ছোট ছোট। তাঁর বজ্রমুষ্ঠি দেখলেই বোঝা যায় তিনি প্রকৃতই শক্তিমান।

কিংকরদার হাসি যেন হাওয়ার মতো, মনের মেঘ দমকা বাতাসে হালকা হয়ে উড়ে যায়। উনি কথা বলতে বলতে থেমে হঠাৎ গান গেয়ে ওঠেন—রবীন্দ্রনাথের গান, কিন্তু ওঁর নিজস্ব ঢঙে। সব মিলিয়ে একটা প্রাণবন্ত পুরুষ। মনের মধ্যে অগাধ ঐশ্বর্য। অফুরন্ত ভালবাসা। তাই ঈর্ষা, নিন্দা, দুর্নাম, দারিদ্র্যের রূঢ়তা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। সমুদ্রবক্ষে অজেয় কাণ্ডারীর মতো তিনি উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন জাহাজের পাটাতনে।

কিংকরদার দুই ছাত্রের একটা আলোচনা শুনেছিলাম আমি একদা। দুজনেই ভাস্কর ও স্বনামধন্য। প্রভাস সেন তখনও শ্রীনিকেতনে যোগদান করেননি। থাকেন দক্ষিণ কলকাতায় এক বাসাবাড়িতে। আমি প্রভাসদার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা মারতে গেছি। হঠাৎ শঙ্খ চৌধুরী এলেন। এইরকম দিনে আড্ডা কেমন জমে উঠতে পারে, পাঠক কল্পনা করবার চেষ্টা করুন। প্রভাসদা আর শঙ্খদা দুজন ভিন্ন ধাঁচের। প্রভাসদা মিষ্টভাষী। শঙ্খদা স্পষ্ট বক্তা। কথায় কথায় যথারীতি কিংকরদার কথা উঠল। শঙ্খদা বললেন রবীন্দ্রনাথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই না-কি কিংকরদা শান্তিনিকেতনে টিঁকতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর কিংকরদাকে সহ্য করতে হয় অবজ্ঞা ও উপেক্ষা। আসলে কিংকরদার বেগবান নদীর মতো দামাল জীবন নৈতিকভাবে শুচিবায়ুগ্রস্ত হিন্দু ও ব্রাহ্মরা সহ্য করতে পারেননি। কিংকরদা তাই অতো বড় শিল্পী হয়ে একা একটেরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে গেলেন। একঘরে। প্রভাসদা কিংকরদা বলতে অজ্ঞান। কিন্তু ভালবাসেন শান্তিনিকেতনের সবকিছু। প্রভাসদা বললেন, কিংকরদা মিশুকে কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ। সৃজনীশক্তি যাঁরই আছে সেই মূলত নিঃসঙ্গ। একক। এইদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে রবীন্দ্রনাথও ভয়ঙ্কর একা ছিলেন। এই দহন থাকে বুকের ভেতর তাই কোনো কোনো শিল্পী জ্বলতে থাকেন। আর সেই জ্বলা দেখে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝে যায়। কিংবা অবজ্ঞা বা অবহেলা পেয়ে এমন করতে পারেন শিল্পী।

এঁরা দুজন কিংকরদার প্রধান দুই শিষ্য এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু যেন বুঝতে চাইছিলেন। ওঁদের মতো আমি কিংকরদার জীবন জানি না, তবু একটা কথা মনে হয়। শান্তিনিকেতনের সবাই কিংকরদাকে এড়িয়ে যান না। অনেকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। বয়স্কদের মধ্যে অনেকে ওঁকে ভালবাসেন একথা জানি। আসলে ওঁর ঐ প্রবলভাবে জীবনযাপন ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, অন্যের সাধ্যাতীত। ওঁকে যে কেউ কেউ ভুল বুঝেছেন তার দুটি কারণ। একটি হলো উনি সনাতন ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির মানুষ। ঔপনিবেশিক স্বার্থে তৈরী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিক্টোরীয় নীতিবোধের সঙ্গে ওঁর কী সম্পর্ক ছিল? দ্বিতীয় কারণটা অদ্ভুত। কিংকরদা অভাবনীয় সারল্যে কোনো কিছু গোপন করেননি।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী রামকিংকর

সামাজিক পরিবর্তনের গবেষণার বিষয়-বস্তু হয়ে যাবে শিল্পকলার জীবনী। তাঁর জীবনবৃত্ত শিল্পীজনোচিত। কতো কিংবদন্তী তাঁকে নিয়ে। জীবনীকার মাত্রই বিস্ময় বোধ করবেন। অন্যদিকে বাঁকুড়ার একটি দরিদ্র বালক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে, নন্দলালের ছাত্র হয়ে শিল্পকলা শিখতে এসে, কালক্রমে কলাভবনে ভাস্কর্যের অধ্যাপক এবং ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ভাস্কর হলেন—শুধু কাহিনীর উপাদান হিসাবে ভাবুন। ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের আধুনিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া এ কাহিনী ভাবা যাবে না। আমার এক একসময় মনে হয় পূর্ণেন্দু পত্রীর মতো কোনো তরুণ চিত্র-পরিচালক কিংকরদার একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের রঙীন জীবনীচিত্র করলে ভালোই করবেন।

ইউরোপে কিছু চিত্রকর ভাস্কর হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন—দেগা, মাতিস, পিকাসো। আমাদের দেশে যামিনী রায় কিছু ভাস্কর্য করেছিলেন। এদেশে উলটো-টাও কিন্তু দেখা যায়, কিছু ভাস্কর ছবি এঁকেছেন, যথা দেবীপ্রসাদ ও চিন্তামণি কর। কিন্ত রামকিংকর প্রধানত ভাস্কর হলেও ছবি আঁকায় সমান দক্ষ। তিনিই অন্যতম প্রধান শিল্পী যিনি আপন ক্ষমতা-বলে অবনীন্দ্র-নন্দলাল পরিমণ্ডলে স্বাতন্ত্র্যে স্বরাট হলেন। ওয়াশ, জলরঙ ও টেম্পারার জগতকে পেরিয়ে এসে তৈলচিত্রকে গুরুত্ব দিলেন।

লোকশ্রুতি, একবার অবনীন্দ্রনাথ ও রামকিংকরের ওয়াশে ছবি আঁকার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ না-কি নিজেই তরুণ শিল্পীর কাছে হার স্বীকার করেছিলেন। কিংকরদার প্রথমদিকের জল-রঙে আঁকা ছবির সঙ্গে বিনোদবিহারীর আঁকার ধরনের মিল আছে। আমার কিন্তু সব সময় মনে হয়েছে বিনোদবিহারীর ছন্দিত রেখার আলঙ্কারিক বাহার ও কালি-গ্রাফির বৈচিত্র্য কিংকরদার ছবিতে নেই। বিনোদবিহারীর রচনা পরিশীলিত, জ্যামি-তিক এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিংকরদার কাজে মাটি মানুষ এবং প্রকৃতির নানা দিকের ছবি। তাঁর ছবির অনেকখানিই জুড়ে রয়েছে আবেগ। ছবিও যেন মানতে চাইছে না ক্যানভাসের সীমা। জীবনের রুক্ষ মলিন রূপ তিনি রূঢ় কঠোরভাবে ছবিতে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গ্রাম-বিষয়ক কবিতা ভিন্ন স্বাদের মনে হয়, তেমনি নন্দলালের গ্রাম ও প্রকৃতির ছবি বা বিনোদবিহারীর ছবির সঙ্গে রামকিংকরের ছবির পার্থক্য আছে। বরং যতীন্দ্রনাথের কবিতার একটা শহুরে বিক্ষুব্ধ মানুষ এবং একটা তির্যকদৃষ্টি ও ব্যঙ্গপ্রবণতা পাওয়া যায়। রামকিংকরের প্রকৃতি পর্যায়ের ছবি মাটির কাছাকাছি এক মানুষের আঁকা—ধুলোমাটি, গৃহপালিত পশু, মানুষ এবং গোয়ালঘরের একটা সোঁদা গন্ধ।

রামকিংকরের আবির্ভাব ভারত শিল্প ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় অনুচিত্র ও জলরঙের জগত ছেড়ে লোকশিল্পের সারল্য অঙ্গীকার করার জন্যে মঙ্গলকাব্যের জগতে অবতরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চা শুরু করেছেন কিন্তু দেশবাসী তার মূল্যায়ন করতে তখনও শেখেনি। যামিনী রায় লোকশিল্পের আঙিনায় আপন কোঠাবাড়ি তুলেছেন। অমৃত শের গিল গ্রামীণ জীবন নতুনভাবে আঁকার তোড়জোড় করছেন। ঠিক এইসময় বিনোদবিহারী ও রামকিংকর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন।

রামকিংকর জলরঙ আর টেম্পারায় যেমন দক্ষ তেমনি নিপুণ তেলরঙের ছবি আঁকায়। কতো পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর চিত্রচর্চায়।

তিনি নিজে কখনো ধ্রুপদী ঐতিহ্য বা লোকশিল্পের কাছে দীনের মতো যাননি, কিংবা ইউরোপ থেকে লুটপাট করেননি। এক ধরনের সমন্বয়বাদী তিনি—সব কিছু থেকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের ক'রে নিয়েছেন। উনি কিউবিজম ও পরবর্তী শিল্প আন্দোলন গুলির ভাব ও ভাবনায় আলোড়িত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রভাবিত হননি। এমন কী একসময় বিমূর্ত ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর ছবি উঠে এসেছে বাঁকুড়া আর বীরভূমের মাটির রসে সিক্ত হয়ে। তাঁর কৃষক, মা ও ছেলে, মেয়েমানুষ এবং পশুপাখি যেন নিসর্গের অন্তর্গত। উইটম্যানের মতো তিনিও জাত রোমান্টিক, মানুষের অবনমনের বিলাপ সংগীত শুধু নয়, কিন্তু গৌরবগাথাও গান। তাঁর অনুজ সমসাময়িক গোপাল ঘোষের মতো তিনি প্রকৃতির মন মেজাজের হদিশ পেতে চেয়েছেন। হাওয়ায় পাতা নাড়া থেকে ঝড়, পাতাহীন গাছ থেকে ফুলন্ত গাছ—তাঁর তুলিতে জাগিয়েছে সাড়া। মন্ত্রবলে গাছ হয়েছে লিঙ্গের প্রতীক, নারী হয়েছে মাতৃকামূর্তি। অথচ প্রতীকী অন্তঃস্রোত থাকা সত্ত্বেও তাঁর ছবি কিন্তু মাটি ঘেঁষা। তাঁর কিউবিজম বা বিমূর্ত ছবি খুবই মানবিক। আবেগমথিত ছবিতে কিন্তু রয়েছে জ্যামিতি ও নির্মিতির প্রাধান্য।

রামকিংকরের ভাস্কর্য সাধারণত খাড়া বা কোণাকুণিভাবে করা এবং গতিময় ও আন্দোলিত। তাঁর রেখার মধ্যে অপ্রতিসাম্যের প্রাধান্য। ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্য এমন কী পোড়ামাটির কাজে দেখা যায় কর্মচাঞ্চল্য, বিশেষত মন্দির ভাস্কর্যে নৃত্যের ভঙ্গিমার প্রাধান্য লক্ষণীয়। ওঁর ভাস্কর্যে মানুষ কাজ করছে, ধান ঝাড়ছে, গুণ টানছে, সাঁওতাল দম্পতি হাঁটছে, বা ভোঁ শুনে শ্রমিক চলেছে কলকারখানার দিকে। কোণাকুণিভাবে ক'রে তিনি গতিময়তার ভাবটিকে ধরেছেন। দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে তাঁর যক্ষ যক্ষিণী মূর্তি বোধ হয় তাঁর একমাত্র গতিহীন ভাস্কর্য। ঝাউয়ের মধ্যে তাঁর 'সুজাতা' বরং গতির স্থৈর্যে ঐশ্বর্যময়। তাঁর অনেক ভাস্কর্য সরাসরি মাঠের মধ্যে সিমেণ্ট কংক্রীট দিয়ে করা। তিনি যেন কোনো রুদ্র পুরোহিতের মতো ভূমির উর্বরাশক্তিকে আবাহন করছেন। যৌনতার প্রতীকী চিত্রকল্প তাঁর সৃজনকর্মের মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন। যা কিছু গতিহীন ও স্থির তাও যেন রামকিংকরের মধ্যে প্রাণময় ও চঞ্চল। সকল কিছু ছন্দোময়, কিন্তু পূর্বাভাস রচনা যেন অসম্ভব। হঠাৎ কোন রেখা যে বাঁকবে কোথায়, ঢুকবে কোন গর্তে, কোথায় খাঁজ কেটে দ্রুত বেরিয়ে এসে বর্তুল রূপকে বাঁধবে, টেনে দীর্ঘায়িত হবে কোন অংশ—এসব কিছুই আগেই বলা যাবে না। ওঁর ভাস্কর্যের রূক এবড়ো খেবড়ো অমিশ্রণ, তাই আমাদের স্পর্শ করার ইচ্ছা প্রবল হয়।

চিরকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যের গুণ তাঁর কাছে স্পষ্ট। ইউরোপীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে বাইরের আকাশ-বাতাসের যেন বিরোধ আছে, কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্য পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সহজে নিজের স্থান ক'রে নেয়। পরিবেশকে আহত করে না। ওঁর ভাস্কর্যের এই গুণটা আছে। আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিসর্গের মধ্যে সমাহিত থাকে।

বস্তুত একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে রামকিংকরের সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য যৌবরাজ্যে পদার্পণ করলো।

সন্দীপ সরকার

উৎকৃষ্টতাই সৌন্দর্য্য
পরম যত্নে জগতের সেরা তুলো বাছাই থেকে শুরু করে, তা দিয়ে অনবদ্য সুন্দর কাপড় তৈরী করা পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা অরবিন্দ তার উৎকৃষ্টতা আনতে পেরেছে।
বুট্টা, ডোরিয়া ও অন্যান্য ফুলভয়েল শাড়ীতে অরবিন্দের যে অবিশ্বাস্য সুন্দর বুননী, তা' আপনি হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন।
অরবিন্দের উৎকৃষ্টতা চিরদিন অম্লান থাকে।
অরবিন্দ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

পুজো সংখ্যা

পুজো এসে পড়ল। এটা এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য আকাশে বাতাসে এখনও শরতের চেহারা চোখে পড়ছে না, সেই ঘিনঘিনে বর্ষা, টানা ছাপ্ত পড়ে রয়েছে, আরও প্রবল বর্ষণ অপেক্ষা করছে কোথাও —তবু শরত আসুক না আসুক, কাগজপত্র খুললেই বুঝতে পারছি পুজো এসে গেল। বুঝেছি, পুজো সংখ্যা প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেখে।

একটা সময় ছিল, আমাদের ছেলেবেলার কথা বলছি, দুর্গা মূর্তিতে তখন সবেই খড় বাঁধা শেষ হয়েছে, না হাত না মাথা, ওই খড় বাঁধা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হত পুজো আসছে। তারপর যখন থেকে মাটি পড়তে শুরু করল, ক্রমে ক্রমে মূর্তির অবয়ব স্পষ্ট হল তখন থেকে প্রায় নিত্যই আমাদের একবার করে ঠাকুর গড়া দেখতে যাওয়া ছিল নেশা। এখন ছেলেমেয়েরা ঠাকুর-টাকুরে এত উৎসাহী কিনা বলতে পারব না। তাছাড়া মফস্বল শহরে যা সম্ভব, কলকাতায় তা সম্ভব নয়। ঠাকুরগড়া দেখতে হলে যেতে হবে কুমোরটুলি।

আজকাল আমার মনে হয়, ঠাকুরগড়া দেখার নেশার মতন অন্য একটা নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। আমরা এখন পুজো সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেখি। এমন কি বলা যায়, পুজো সংখ্যার বিজ্ঞাপনের চটক দেখেই অনুমান করি কোন পাড়ায় কেমন ঠাকুর তৈরী হতে চলেছে।

পুজো সংখ্যার ব্যাপারে আমাদের বাঙালীয়ানা আছে। অর্থাৎ সমস্ত কাগজই —সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক, একেবারে অক্ষম না হলে, পুজো সংখ্যা ঠিকই প্রকাশ করে থাকে। যদি বা কারও কারও মুখে পুজো সংখ্যা বলতে সরমে আটকায়, বলবেন শারদীয় সংখ্যা। ব্যাপারটা একই। দুইয়ে কোনো তফাত নেই।

পুজো সংখ্যা প্রকাশকে কি বলা যায়? অভ্যাস, না নিয়ম, না ঐতিহ্য? অথবা ব্যবসা? একেবারে এক কথায় এর জবাব দেওয়া যায় না। কোনো সন্দেহ নেই, পুজোর সময়কার নানা অভ্যাসের মতন এটাও আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আচরণীয় কর্মের অন্যতম। নিয়ম নীতির অন্তর্ভুক্ত। আমরা একে স্বীকার করে নিয়েছি।

আগে পত্রিকার সংখ্যা ছিল কম। ক্রেতাও ছিল অল্প। কাজেই পুজো সংখ্যা নিয়ে হই হই কম শোনা যেত। বোধ হয়, গত যুদ্ধের সময় থেকেই পুজো সংখ্যার জমক বেড়ে উঠতে শুরু করে। তারপর দেখতে দেখতে আজ তিরিশ বছরে তার অনেক কিছু পাল্টে গেছে, আরও জাঁক-জমক বেড়েছে।

স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই, পুজো সংখ্যার একটা ব্যবসায়িক দিক আছে। জামা, কাপড়, এটা-ওটার মতন এরও বিক্রী আছে, মানুষে কেউ শখ করে, কেউ উৎসবের মন-মেজাজ নিয়ে দু চারটে পত্র-পত্রিকা কিনেও থাকেন। আর বলতে বাধা নেই, যত ছোটখাট কাগজই হোক ছাপতে পারলে কিছু বিক্রী হয়, বিজ্ঞাপনও জুটে যায়।

প্রশ্ন হবে, এতে সাহিত্যের কতটুকু লাভ হয়? আদপেই হয় কিনা!

একদল অনেক দিন ধরেই বলে আসছেন, ইদানীং পুজো সংখ্যার সাহিত্য-মূল্য প্রায় নেই। ব্যাপারটা পুরোপুরি ব্যবসায়িক হয়ে উঠেছে।

আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক নয়। যা পুরোনো তার সম্পর্কে একটা মোহ আমাদের থেকে যায়। বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেকার পুজো সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের সে-রকম মোহ রয়েছে। অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করতে হবে, তখন কম লেখা এবং নানা ধরনের লেখা একটা বড় আকর্ষণ ছিল। কোনো কোনো লেখা খুবই উচ্চ মানের হত। তার মানে এই নয় যে, যা প্রকাশ পেত সবই সুপাঠ্য ও সুন্দর। সবই উচ্চমানের।

আজকাল পুজো সংখ্যা কম করেও অন্তত ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে উপন্যাসের আধিক্য চোখে পড়ে। ছোট গল্প ও কবিতা কিছু থাকে। প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা না থাকার মতন।

উপন্যাসের আধিক্য আমি সমর্থন করছি না। বরং এ-বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে —পরে সুযোগ পেলে বলব। শুনেছি, এই

আধিক্যের জন্যে বারো আনা দায়ী পাঠক সমাজ। সেকালের পাঠক কোনো পুজো সংখ্যায় এক ডজন উপন্যাস চাইতেন না। একালের পাঠক মুখে বলেন চাই না, কিন্তু কার্যত চান, কেননা স্বকর্ণে শুনেছি এবং স্বচক্ষে দেখেছি—কাগজের ওজন এবং উপন্যাসের সংখ্যা হিসেব করে পত্রিকা কেনা হচ্ছে। আমরা যখন থেকে পুজো সংখ্যাকে পুরোপুরি অবসর বিনোদনের সামগ্রী ভেবে নিতে শিখেছি তখন থেকেই কিন্তু পত্রিকার চেহারায় বিনোদনের ছাপ এসেছে। কাজেই দোষটা কার?

আজকাল, আমার বন্ধুরা বলেন, পুজো সংখ্যার ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা কদাচিৎ শোনা যায়। যেন পাঠক ওগুলো এড়িয়ে যান। কবিতার অবস্থাও তাই। প্রবন্ধ শতকরা নব্বই জন পড়েন না।

এই রকম অবস্থায় একালের পুজো সংখ্যার দোষ দিয়ে কি লাভ? আরও একটা কথা বলা দরকার, অজস্র পুজো সংখ্যার ভিড়ে দু পাঁচটি ভাল লেখা যে আজও না থাকে এমন তো নয়।

অভিনন্দ
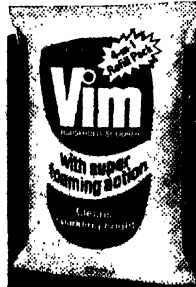
আলোচনা

তরুণ লেখকদের মিলন ভবন প্রসঙ্গে

গত ৭ই আগসট (১৯৭৬) 'দেশ' পত্রিকায় 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' বিভাগে তরুণ লেখকদের মিলনভবন বিষয়ে অভিনন্দ যে আলোচনাটি লিখেছেন, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত। সত্যিই এখন কলকাতার দিকে তাকালে বোঝা যায় কিছু কাজ শুরু হয়েছে; আশা করা যায় আরও এমন কিছু কাজে কর্তৃপক্ষ হাত দেবেন, যাতে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শহরটির সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। কারণ, শুধু কিছু ভাল রাস্তা, ফুলের বাগান বা রঙচঙে ট্রামবাস একটি শহরের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

ঠিক সংখ্যাটা বলা না গেলেও তরুণ সাহিত্যসেবীর সংখ্যা যে অনেক, সেটা সকলেই জানেন। কিন্তু এঁরা বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন, এমন কি বহু ক্ষেত্রেই একে অপরের অপরিচিত। এমন কোনো সুযোগ এখন এঁদের সামনে নেই যাতে এঁরা কাছাকাছি আসতে পারেন, ঘনিষ্ঠ হতে পারেন; অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যাপারটা খুবই দরকারী। যদি সরকারী বা বেসরকারী যে-কোনো উদ্যমেই এঁরা একটি 'মিলনভবন' পেয়ে যান, তবে বহু দিনের একটি অভাব দূর হতে পারে। সমস্ত অর্থেই একটি মিলনকেন্দ্র—যেখানে এইসব কবি-লেখকরা মিলিত হবার সুযোগ পাবেন; যার উদ্দেশ্য অভিনন্দই বলেছেন—লাইব্রেরি, সেমিনার বা সাহিত্যপাঠ সব কিছুই থাকা বা চলতে পারে, এখানে, চলবে। এর অভাবে তরুণ লেখকদের এখন একটি সাহিত্যপাঠ বা আলোচনা-সভার জন্য যে কত ছুটোছুটি করতে হয়, কত ঝামেলা পোহাতে হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তা জানেন।

অভিনন্দ সরকারের কাছে পরিকল্পনা নিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন বা এইসব তরুণদের অন্যের ভরসায় না থেকে নিজেদের কাজে নিজেদেরই এগিয়ে যেতে বলেছেন, খুবই সঙ্গত কথা; কিন্তু এসব কাজে নামতে যে সংগঠন বা টাকার দরকার, তরুণ লেখকরা তা পাবেন কোথায়? আর এটা না থাকারও একটা বড় কারণ বোধহয় কোনো সাধারণ-ভূমির ওপর দাঁড়াতে পারছেন না তাঁরা। আর একটি কথা—কলকাতায় কি কিছু বিত্তবান কিন্তু সাহিত্যপ্রেমিক নাগরিক নেই? তাঁরা এইসব লেখকদের কোনো সাহায্য করতে পারেন না? রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য সদর স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়িটি পাওয়া গেলে তো খুবই ভাল, কিন্তু কিছু আইনগত অসুবিধার কথা তো মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিনন্দ, তাই অন্যভাবে কিছু করবার কথা চিন্তা করতে হবে। আমাদের তরুণ তথ্যমন্ত্রী যিনি অসংখ্য কাজের মধ্যেও ভুলছেন না আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যার কথা, তিনি কি ভেবে দেখবেন, যে, এ শহরে বণিক বা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের আছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবন, কিন্তু কিছুই নেই কবি-লেখকদের মাথার ওপর।

কল্যাণ সেন
কলকাতা ৭০০০৩৩

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ দিন

সম্প্রতি 'দেশ'-এ প্রকাশিত (৪৩ বর্ষ ঃ ৪১ সংখ্যা) শ্রীগৌরচন্দ্র সাহার 'রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ দিনঃ স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রতিদিনের বিবরণ' শীর্ষক লেখায় একটি তথ্যগত দ্বিমতের সম্মুখীন হতে হয়। শ্রীসাহা উক্ত সংকলিত বিবরণীর শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছেনঃ

> "২২ শ্রাবণ। সেই অন্তিম দিনটি এদিন আর গায়ের উত্তাপের রেকর্ড রাখা হয়নি। সকাল ছটা পনেরো ঃ নাড়ির গতি মিনিটে ১৪০ বার, শ্বাস-প্রশ্বাস ৪৬ বার। বেলা আটটা পঁয়তাল্লিশ ঃ নাড়ি ১৩০, শ্বাস-প্রশ্বাস ৪৪। বেলা দশটা তিরিশ, মৃত্যুর ঠিক এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পূর্বে ঃ নাড়ি ৭৮, শ্বাস-প্রশ্বাস ৪৪।"

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সময় ঃ দুপুর ১২-১০ মিঃ।

অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই অন্তিম দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার; সেদিন প্রখ্যাত দুজন চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডঃ ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সকাল প্রায় দশটা নাগাদ শেষবারের মতো কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তারপর ঠিক দুপুর ১২-১৩ মিনিটে আসে সেই অন্তিমক্ষণ: মহাকবির মহাজীবন চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নেয় :

"At thirteen minutes past twelve on Thursday, the 7th August, 1941 (corresponding to the 22nd Sraban, Bengali Era 1348 and Saka Era 1863), a great life peacefully comes to a close."

সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচিত বিষয়ে ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই অনস্বীকার্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: 'দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গ্যাজেট', সাপ্লিমেণ্ট ইস্যু. ভল্যুম-পঁচাত্তর সংখ্যা—একুশ, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৭৮।

মোহিত চক্রবর্তী
শ্রীনিকেতন, বীরভূম

॥ ২ ॥

সাতই আগস্টের দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্র-নাথের শেষ দশদিন : স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিদিনের বিবরণ আগ্রহের সঙ্গে পড়লুম। ডাক্তার হিসাবে অপারেশনের অষ্টম দিনের বিবরণ পড়ে মনে খটকা লাগছে রবীন্দ্রনাথ কিসে মারা গেলেন। লেখা আছে অষ্টম দিনে Difficulty in swallowing. জল বা ওষুধ পড়ে যাচ্ছে। শরীরও মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। এরকম শক্ত হয়ে যাওয়া তো Tetanus-এ হয়। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি Tetanus-এ মারা গেলেন? তখনকার ডাক্তারদের মধ্যে ডাঃ অমিয় সেন বর্তমান। হয়তো তিনি এর উপর কিছু আলোকপাত করতে পারবেন।

ডাঃ মুরলী সেনগুপ্ত
কলকাতা-২৯

॥ ৩ ॥

২২শে শ্রাবণ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ দিন : স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রতিদিনের বিবরণ পড়ে একটি প্রশ্ন মনে জাগছে—এই লেখাটির সঙ্গে কবিগুরুর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর অনবদ্য লেখা 'নির্বাণ'-এ একই বিষয়ের পুঙ্খানু-পুঙ্খ ও সমস্ত তথ্য পরিবেশ অনেকাংশে একরূপ। নির্বাণের পাণ্ডুলিপি নিশ্চয়ই বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে বর্তমান। এই দুটি লেখারই হস্তলিপির তুলনামূলক বিচার করে গৌরবাবু কি জানাবেন 'রবীন্দ্রনাথের

শেষ দশদিন ঃ...' এর তথ্যও, প্রতিমা দেবীরই লেখা বলে ধরা যায় কিনা? আশা করি এ বিষয়েও তিনি বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্যের সাহায্য পাবেন।

ডঃ কল্যাণকুমার দত্ত
কলকাতা-১৬

রবীন্দ্রসংগীতে ইংরেজী অনুবাদ

৭ আগস্টের দেশ পত্রিকায় শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ' সম্পর্কে যে-পত্রখানি লিখেছেন সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার আছে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অবাঙালী ভারতীয় এবং বিদেশী সঙ্গীতরসিকদের অন্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৌলিক রস পৌঁছে দেবার জন্যই' নাকি তাঁর এই প্রচেষ্টা এবং তাঁর 'অনুবাদের যাথার্থ্যের নিরপেক্ষ ও প্রকৃত বিচারক হবেন সেইসব বিদেশী ও অবাঙালী সংগীতরসপিপাসু শ্রোতৃমণ্ডলী।' মুখ্যত বিদেশী, অবাঙালী ও ইংরেজী-জানা বাঙালীদের জন্য প্রকাশিত দৈনিকে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কি চোখে দেখা হয়েছে তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাক: "he presumed to sing 'Purano Shei Diner Kotha' with the words translated into a language that vaguely resembled English. He apparently had no hesitation about rushing in where angels fear to tread." (দি স্টেটসম্যান : ২৯ মে ১৯৭৬)। এর পরেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর নতুন কী বিচার আশা করেন?

এহ বাহ্য। তাঁর এই [illegible]ক প্রচেষ্টা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কী চো[illegible] দেখতেন তা কি তাঁর জানা আছে? দুটি ঘটনার উল্লেখ করি।

ডেম ক্লারা বাট নামের এক বিখ্যাত গায়িকা বিশ্বসফরে বেরিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ এই মহিলা ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে সুর দিয়ে গাইবার জন্য কবিগুরুর অনুমতি চাইলে রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে সে-প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেন। তিনি জানান, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে বাংলা শিখেই গাইতে হবে। ইংরেজী গীতাঞ্জলি শোনাতে হলে সুর দেওয়া চলবে না, বরং আবৃত্তি করে শোনানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গায়ক আর্নল্ড বাকের—শান্তিনিকেতনে কবি-সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন যিনি কাটিয়েছিলেন—সম্বন্ধে। তাঁকেও ইংরেজী অনুবাদের অনুমতি দেননি রবীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত আর্নল্ড বাকে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে বাংলা গান শিখে রবীন্দ্রনাথের ৩২টি গানের

স্বরলিপি ইংরেজী স্টাফ নোটেশনে মুদ্রিত করে একটি পুস্তিকা বার করেছিলেন।

দীপঙ্করবাবু জানিয়েছেন, তাঁর পূজ্যপাদ শিক্ষক 'জর্জ' বিশ্বাস'-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্রনাথের গান ইংরেজী অনুবাদ করে গাইতে চান। গুরুর গরবে গরবী শিষ্য, তাঁর মতামত কি আরও বেশী গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়?

সোমেন ঘোষ
সোদপুর

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গে

আপনাদের কাহারও জানা আছে কিনা জানি না। একবার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম-এ পি আর এস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন, আমার দাদামহাশয় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের আহ্বানে জেমো কান্দিস্থিত তাঁহার বাসভবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা এতই প্রবল ছিল যে কলিকাতায় থাকা কালীন বসু মহাশয় প্রায় প্রত্যেকদিনই আচার্য দেবের কলিকাতাস্থিত বাসভবনে আসিতেন। বসু মহাশয়ের বিশেষত্ব ছিল যে তিনি ৮ নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট বাটীর গলির মোড় হইতে "রাম বাড়ি আছো হে" বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাটীতে প্রবেশ করিতেন। সেখানে নানা রকম সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশ, তৎকালীন দেশীয় রাজনীতি, সাহিত্য পরিষদ, বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা চলিত। সে আলোচনায় যোগদানকারীদের মধ্যে প্রায়ই শ্রীকালিদাস মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, রামগতি ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শশীভূষণ সিংহ, রামকমল সিংহ প্রমুখ সাহিত্যিকবর্গকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যাইত। জাপানী সাহিত্যিক আর কিমুরো সাহেবও নীরব শ্রোতা হিসাবে বসিয়া থাকিতেন।

অবিনাশবাবুর জেমো বাসভবনে আসার পর আচার্যদেবকে উচ্চৈস্বরে বলিলেন "হা হে রাম, আমাকে তো বেশ জায়গায় নিয়ে এসে ফেললে এখন সময় কাটাবার জন্য দু একটি ভাল ইংরেজী বই-টই দাও। আচার্য দেব জানিতেন যে বসু মহাশয় বরাবরই ইংরেজী ভাষারই পক্ষপাতী, বাংলা বই একদম দেখেন না বলিলেও চলে। তাই তিনি জানিয়াই বলিলেন অনেক রকম ইংরেজী, লাতিন ইত্যাদি বই তো পড়েছো আমি একটা বাংলা গল্পের বই পড়ি তুমি শোনো, ভালো লাগে কিনা দেখ, বলিয়া আচার্য দেব গুরুদেবের লিখিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পটি পড়িয়া

[illegible]। গুরুদেবের বন্ধু মহাশয় [illegible] হইয়া [illegible] এবং বলিলেন, 'হা হে রাম বাবুরা ভাবছ রবিবাবুর লেখা এমন চমৎকার গল্পও আছে, এ যে মোপাসাকেও হার মানিয়ে দেয়। এই নতুন শুনেছি, এবার দেখছি আমাকেও রবিবাবুর সমস্ত বাংলা গল্পই পড়তে হবে।'

আমার মাতা শ্রীযুক্তা চঞ্চলা দেবী বলিলেন ৬৪/৬৫ বৎসর আগে গুরুদেবের লেখার এত প্রচলন ছিল না এবং তৎকালীন সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সকলে ঠিক গুরুদেবের লেখা কবিতা বা সাহিত্য নিঃশব্দে হজম করিতে পারিতেন না। তবে দেখিতাম গুরুদেবের নতুন কোন বই বা কবিতা বাহির হইলেই আমার বাবা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এক কপি করিয়া বই লইয়া হাজির হইত; বাবা সেই সমস্ত বই পড়ার পর মনোনীত পদ্য ও গল্পগুলি লাল পেনসিলে চিহ্নিত করিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন. কে জানিত যে সেই লাল পেনসিলে চিহ্নিত কবিতা ও গল্পের এত দাম। আমি তখন বাবাকে বলিতাম যে বাবা রবি ঠাকুরের বই পড়ার পর আর অন্য কোন লেখকের বই পড়িতে ভাল লাগে না কেন? বাবা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিতেন।

মুনীন্দ্রগোপাল রায়
বাঘডাঙ্গা, কাঁদি

সাহিত্য বনাম সাংবাদিকতা

গত ৭ অগাস্ট 'দেশ' আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত তপন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যা বলেছেন সে সম্বন্ধে আরো কিছু ভাববার আছে। জীবনের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায় একটি শিল্প-সুষমার উপস্থিতি আমাদের মহত্তম প্রত্যাশা ও প্রয়াসের অংগ। কিন্তু এক্ষেত্রে 'শিল্প' বা 'আর্ট' কথাটি একটি বিশেষ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই শিল্পের দাবি ও ভিত্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বভাবতই এক নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূলত তা সৃজনধর্মী। সে লৌকিক তথ্যকে অবলম্বন করে একটি অলৌকিক শিল্প-সত্যে উন্নীত করে। এইটিই তার রস ও সৌন্দর্যের মূল কথা। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্পসুষমার ভিত্তি হল সততা ও নিষ্ঠা। আপন কর্মের প্রতি কর্মীর একনিষ্ঠ ভাবটিই তার কীর্তিকে বাইরে থেকে মানুষের অন্তরলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী ব্যবসায়ী—যে-কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য। বিজ্ঞাপনের মধ্যে যেটুকু শিল্প থাকে তা তার বহিরঙ্গের ব্যাপার। শিল্পের দাবিতে সে যদি নিছক অতিকথন অতিক্রম করে অপকথনের আশ্রয় নেয় তা হবে নিন্দনীয়। তেমনি সাংবাদিকতার মধ্যেও যেটুকু শিল্প তা শুধু বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। সাংবাদিক বৃত্তিধারীরা প্রায়ই হয় সাহিত্যিক বা সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন হন। সংবাদ পরিবেশন ও সাহিত্য পরিবেশন এক না হলেও এক করে ফেলার প্রবণতা ও দুর্বলতার চিহ্ন অনেক সময় লক্ষ করা যায়। সংবাদের তথ্যকে সাহিত্যের সাথে উপস্থাপিত করার একটি অনতিসচেতন প্রয়াসের মধ্যে অনেক সময় অতিকথন ও অপকথন দুইই প্রশ্রয় পায়। সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে সমশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়াস উৎসাহদানের বিপদ এইখানে।

অনুরাধা মাইতি
কলকাতা ৬

রবীন্দ্রসংগীতে স্বরলিপি বিভ্রাট

সম্প্রতি 'রবীন্দ্রসংগীতে স্বরলিপি বিভ্রাট' প্রসঙ্গে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটির ছন্দ-তাল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ জানাচ্ছেন, দিনেন্দ্রনাথ-কৃত এই গানটির স্বরলিপি 'কেতকী'র ১ম সংস্করণে ৩ মাত্রা ছন্দের একতালে প্রকাশিত হয়, অথচ উক্ত গ্রন্থের ২য় সংস্করণে দেখা গেল চতুর্মাত্রিক ছন্দের মোট ১৬ মাত্রার ত্রিতালে লিখিত গানটির সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নূতন স্বরলিপি। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের স্বরলিপি অধীক্ষক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস জানাচ্ছেন, 'কেতকী'র ১ম ও ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩২৬ ও ১৩৩৫ সালে দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে এবং ১ম সংস্করণের ত্রিমাত্রিক ছন্দ ও ২য় সংস্করণের চতুর্মাত্রিক ছন্দ দিনেন্দ্রনাথের নামেই প্রকাশিত হয়। আগরতলা থেকে ঠাকুর শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন লিখেছেন, আলোচ্য গানটি তিনি স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথের কাছে শেখেন এবং তখন ত্রিমাত্রিক ছন্দে একতালেই গানটি শেখানো হয়েছিল।

...কয়েক শ্রীমতী মেনকা ঠাকুরের সৌজন্যে শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপ করার সৌভাগ্য হয়। তাঁর বাড়িতে বসেই আমি এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত রেকর্ডখানি শুনি। আমার মনে হয়, সকল প্রশ্নের সমাধান দিনেন্দ্রনাথের এই রেকর্ডখানিতেই হয়ে গেছে। দিনেন্দ্রনাথ গানটি মুক্ত-ছন্দে গেয়েছেন এবং এমন কি, কোন কোন জায়গায় স্বরবিতান ১১ বা ৩৭ থেকে সুরের তারতম্য লক্ষ করার মত।

প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বছর তিনেক আগে শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে দিনেন্দ্রনাথের ৬ খানি গান রিপ্রিন্ট করা হয়েছে, অথচ সেই সময় 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এবং 'আলোকের এই ঝরনাধারায়' গান দুখানি কেন যে রিপ্রিন্ট করা হল না, তা বুঝতে পারলুম না।

তপন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা ৬
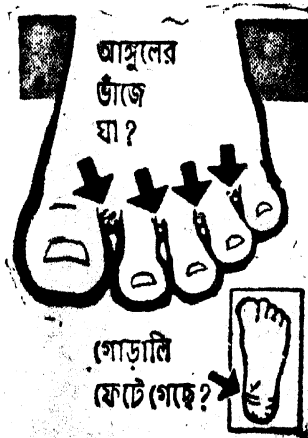
দত্তা : সমালোচকের প্রতি

দেশ পত্রিকায় অজয় কর পরিচালিত "দত্তা"র সমালোচনা পড়ে মর্মাহত হলাম। —কথিত আছে খালি কলসীর আওয়াজ বেশী। কিন্তু এ যে ঢাকের আওয়াজ। থামলে বাঁচি। বার্নার্ড শ-র ঐতিহাসিক শাণিত ভাষা সমৃদ্ধ মঞ্চ সমালোচনা থেকে শুরু করে সাদুল, ত্রুফো, লিন্ডসে অ্যান্ডারসন, আর্থার নাইট প্রভৃতি সমালোচকদের সিনেমা সমালোচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমাদের আছে—সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও বিগত দিনে অনেক ভালো ভালো সমালোচনা আমরা পড়েছি। —দত্তা'র সমালোচনাকে মূর্খতার অপহাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে একটি স্কুলের ছেলেও ক্লোজ শট্‌, লং শট্‌, লাইট সোর্স প্রভৃতি কথাগুলো জানে সুতরাং সমালোচনায় ঐ শব্দগুলো ব্যবহার করে বিশেষ বাহাদুরী উনি পাবেন না। বরং থ্রি স্কীম লাইটিং, টু স্কীম লাইটিং বা মনো-কী-লাইটিং সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দিলে বাধিত হতাম। এই সিনেমার ভাষাতত্ত্ববিদ-টির প্রতি আমার উপদেশ : বাংলার মাটি গায়ে মাখুন, বাংলার জলে স্নান করুন। উপদেশটি যদি না মানতে চান তবে একটু সৎসাহস দেখিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ান, খালি কলসীতে কত আওয়াজ একবার দেখি।

তপন সিংহ

'মেরী'

"দেশ" পত্রিকার ৭ অগাস্ট তারিখের সংখ্যায় (মার্থা আন্দোলন—পৃষ্ঠা ৯৫) সামান্য একটি ভুল নজরে পড়িল। লেখিকা মার্থার বোন মেরীকে মেরীমাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মার্থার বোন যিশুর মাতা মেরী নন। মার্থা ও মেরী দুই সহোদরা ভগিনী ছিলেন ও তাঁহাদের ভাই লাজারসের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছেন। বাইবেলে বেশ কয়েকজন মেরীর নামের উল্লেখ আছে—যীশুর মা মেরী, বেথানীর মেরী, মেরী ম্যাগডালীন ইত্যাদি। কোন মেরী সঠিক উল্লেখ না করিলে তথ্য নির্ভুল হয় না।

সুনীলকুমার মিত্র
মেদিনীপুর

গানের আসর

প্রেমসঙ্গীত—নিধুবাবুর জীবনী ও সঙ্গীত

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংএ সুপ্রাচীন গ্রন্থাদির যে অমূল্য সংগ্রহ আছে তা বোধ করি কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে বলে দিতে হবে না। এই পুরাতন বইয়ের ব্যবসা কতদিনের জানিনে তবে আমরা যখন কলেজে পড়ি তখনও এর রমরমা কারবার দেখেছি। বর্তমানে দোকানের সংখ্যা বহু বিস্তৃত, কিন্তু সেই তুলনায় প্রাচীন গ্রন্থাদির সংখ্যা কম। কলেজ ছাড়বার বহুকাল পরে—বোধ করি ঊনপঞ্চাশ কি পঞ্চাশ সাল হবে, একদিন দুপুর বেলা কলেজ স্ট্রীটে আমরা দুই বন্ধু কোনও কাজ সেরে ফিরছি এমন সময় দেখি ফুটপাথে বেশ কিছু বটতলার বই ছড়ানো রয়েছে। বোধ হয় বইগুলো ভিজে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠেছে। এর মধ্যে একটি বই চোখে পড়ল—নাম 'উপহার গ্রন্থাবলী।' একটি একত্রিত গ্রন্থাকারে রয়েছে—যোগতত্ত্ব, উপন্যাস, জ্যোতিষ, সুখের সংসার, গৃহিণীপনা প্রতিজ্ঞা, আদর্শকৃষক, কুসুমকোরক, যন্ত্র-শিক্ষা, প্রেমসঙ্গীত, ব্যায়াম, সরল চিকিৎসা, ভোজবিদ্যা, সিদ্ধতন্ত্রমন্ত্র, সমাজরহস্য এবং ইন্দ্রজাল—এই ষোলোখানি চিত্তাকর্ষক উপহার। আমাকে যেটা আকৃষ্ট করেছিল সেটা উক্ত গ্রন্থের 'প্রেমসঙ্গীত' অংশটি। পাতা উল্টে দেখি প্রেমসঙ্গীত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিবন্ধ যাতে একত্রে রয়েছে নিধুবাবুর জীবনী, সঙ্গীত ও সমালোচনা। অন্যান্য নিবন্ধে লেখক হিসাবে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামটি রয়েছে, কিন্তু এই নিবন্ধে কোনও লেখকের নাম নেই। বইটি গরাণহাটার সরকার অ্যান্ড কোম্পানী থেকে ১২৯৪ সনে অর্থাৎ আজ থেকে ৮৯ বছর আগে ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। লেখা নিশ্চয়ই তারও দু এক বছর কি তার বেশ কিছুদিন আগেরও হতে পারে। প্রায় ১৮৮৭ সালে যে বই বেরিয়েছে নিধুবাবুর কথা নিয়ে তা বটতলার গ্রন্থ হলেও একটা ঐতিহাসিক মূল্য থেকে বোধ করি বঞ্চিত নয়। এই গ্রন্থটি আমার বাংলার এম এ পাশ করা বন্ধুটি কিনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে আমি সেটি ভাল করে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরে এই বইটির উল্লেখ দু-একবার হয়ত করেছি এবং কোনও কোনও গবেষককে বলেওছি কিন্তু এর বিস্তৃত বিবরণ কোথাও দেখিনি। আজ এই ১৯৭৬ সালে কেন জানি না মনে হল নিবন্ধটির সংক্ষিপ্তাংশ প্রকাশই করা যাক না—হয়ত নব্বই বছরের পুরোনো রম্যরচনা খানিকটা চিত্তাকর্ষক বলেই মনে হবে, বিশেষ করে শ্রীমতীনাম্নী প্রণয়িনীর সঙ্গে নিধুবাবুর প্রণয়রহস্য যাতে বেশ খানিকটা উপন্যাসের আকারেই বলা হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের পাওয়া বইটিতে চারটি পাতা ছিল না। যাঁদের কাছে এই বইটি আছে তাঁরা এই অভাবটি পূর্ণ করে দেবেন। সাহিত্য পরিষদে যদি গ্রন্থটি থেকে থাকে তাহলে অনুসন্ধিৎসুগণ সেটিও দেখতে পারেন। আমার মনে হয় এই নিবন্ধকার সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত নিধুবাবুর জীবনী পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিধুবাবুর জীবনের বহু আখ্যায়িকায় বিশ্বাস করেছেন যা ঈশ্বর গুপ্ত বা জয়গোপাল গুপ্ত করেননি। এছাড়া তিনি আরও একটি সংবাদ দিয়েছেন যা আর কোনও প্রাচীন জীবনীকার দেননি। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে। উক্ত লেখকের মতে শ্রীমতী ঘটিত প্রণয়ের ব্যাপারটি যথার্থই একটি প্রেমের ব্যাপার—যা সে যুগের বাবু সভ্যতায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। নিধুবাবুকেও তো লোকে বাবু বলেই ডাকত। তাঁরও গতিবিধি ছিল অভিজাত সমাজেই বেশি; সাধারণ আসরে তিনি গাইতেন না বললেই চলে। অতএব ঈশ্বর গুপ্ত বা জয়গোপাল গুপ্ত ব্যাপারটিকে অশোভনবোধে চাপা দিতে চাইলেও সেটি অপর অনেকেরই অভিপ্রেত ছিল না। বরঞ্চ তাঁরা বিশ্বাস করতেন বহু উৎকৃষ্ট গান শ্রীমতীর প্রেরণাতেই নিধুবাবুর পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছে। একজন ইংরেজ নাকি লিখে গিয়েছিলেন—'হি কুড নট হ্যাভ রিটেন হিজ বেস্ট হোয়েন ফুলি ড্রাঙ্ক।' জানিনে কথাটি সত্য কিনা, অন্ততঃ ঈশ্বর গুপ্তের মতে তো হতেই পারে না। যাক, এইবার না হয় উদ্ধৃতি শুরু করি।

নিধুবাবু

নিধুবাবু অপরিচিত লোক নহেন, বঙ্গের অনেকেই তাঁহাকে চিনেন, বঙ্গবাসী তাঁহার প্রেমসঙ্গীতে মুগ্ধ। তবে আবার এ জীবন রিত কেন? কারণ আছে। নিধুবাবুর আকার বা চেহারাকে কেহই প্রায় চিনেন না, তিনি ধনী কি নির্ধন, কালো কি

[illegible] নিধুবাবুর [illegible] বা কে? এককালে [illegible] তাঁহার গীত শুনিয়া—[illegible] নিধুবাবুকে চিনিয়া লন। [illegible] নিধুবাবুর চেহারা চিনেন না, হৃদয় চিনেন—তাই আজ তাঁহার চেহারাখানি [illegible] সম্মুখে ধরিতেছি, একবার [illegible] লউন।

নিধুবাবুর সম্পূর্ণ নাম রামনিধি গুপ্ত। নিধুবাবু ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকট (জেলা হুগলী) চাঁপতা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্গীরা যখন কলিকাতার ঘোর দুর্দশা করে, তখন ইঁহার পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজ কলিকাতা কুমারটুলীয় পৈত্রিক বাটী পরিত্যাগ করিয়া চাঁপতায় মাতুলালয়ে বাস করেন। প্রথমে নিধুবাবুর ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চাঁপতার গ্রাম্য-পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অল্প বয়সেই নিধুবাবুর অসীম প্রতিভা দর্শনে তাঁহার পিতা ইংরাজী শিখাইবার জন্য পুত্রসহ পুনর্বার কলিকাতায় আসিলেন। নিধুবাবু পাঠশালার শিক্ষা একপ্রকার আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এখন ইংরাজী শিখিবার জন্য একজন পাদরীর হস্তে সমর্পিত হইলেন। পাদরী সাহেব নিধুর। অসামান্য মেধা ও অতুলনীয় রূপ দেখিয়া মোহিত ও পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নিধুবাবুর পিতা পীড়িত হইলেন, সেই পীড়ায় তাঁহার জীবনদীপ নিবিল নিধুর শিক্ষাপক্ষ অকালে রুদ্ধ হইল, তিনি অগত্যা চাকরী করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতিবেশী রামতনু লাহিড়ীর (ঈশ্বর গুপ্ত রামতনু পালিত) যত্নে নিধুবাবু ছাপরার কালেক-টরীতে একটি চাকরী (কেরানীগিরি) পাইলেন। ছাপরায় যাইবার কিছুদিন পূর্বে শুক্চরে ১১৬৮ সালে কুড়ি বৎসর বয়সে নিধুবাবু বিবাহ করেন।

নিধুবাবু ব্রাহ্মণকে বড় ভক্তি করিতেন। রামতনু লাহিড়ীর মৃত্যুর পর নিধুবাবুই তাঁহার পদ (দেওয়ানী) পাইবার অধিকারী হন। সেই সময় জনাই নিবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় ঐ পদের আশা করিয়া নিধু-বাবুকে মনের কথা ব্যক্ত করেন, আরও বলেন—"আমি এই পদ না পাইলে, যিনি এই পদ লইবেন তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকগ্রস্ত হইতে হইবে।" নিধুবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে পদ পরিত্যাগ করিলেন। বিনা আপত্তিতে এমন স্বার্থত্যাগ ভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ।

ছাপরায় [illegible] নিধুবাবু কালোয়াতি গীত ও [illegible] আলাপাদি শিক্ষা করেন।

নিধুবাবুর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ১১৭৫ সালে একটি পুত্র জন্মে। দৈববশে সেই সন্তানটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অভাগিনী মাতা পুত্রশোকে অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করেন। প্রিয়তমা স্ত্রী ও প্রাণাধিক পুত্রের শোক নিধুবাবু কিভাবে হৃদয়ের অবান্তর ভেদ করিয়া দেখাই-তেছেন, দেখুন:—

খট্ ভৈরবী—আড়াঠেকা

না হতে পতন তনু দাহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ অহারে তো নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুঃখতুষ দিয়ে
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে।

খাম্বাজ—মধ্যমান

এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না
এ চিতে নিশ্চিত ছিল এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবেছিলাম নিরন্তর হয়ে রব একান্তর
যদি হয় প্রাণান্তর মনান্তর তায় হবে না।

ঈশ্বর গুপ্ত এই প্রসঙ্গে "মনোপুর হতে আমার হারায়েছে মন"—এই গানটির

উল্লেখ করেছেন। প্রথম গানটি রাধামোহন সেন এবং দ্বিতীয় গানটি শ্রীধর কথকের নামে চলে আসছে। শ্রীধর কথকের একটা খাতা ছিল যাতে বহু গান লেখা ছিল। বহুজনের বিশ্বাস সেই গানগুলি শ্রীধর কথকের রচনা, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটা যথার্থ নাও হতে পারে। এই নিবন্ধে এমন অনেক গান উদ্ধৃত করা হয়েছে যা শ্রীধর কথকের রচনা বলে অনেকের বিশ্বাস। এমনকি কালী মির্জার বিখ্যাত গান—"এমন নয়ন বাণ কে তোমায় করেছে দান"-কেও নিধুবাবুর জীবনের একটি আখ্যায়িকার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেকালের বহু বিখ্যাত রচনা এরকম অনির্দিষ্টভাবে যুক্ত হয়েছে, আজ সেগুলিকে ঠিকমত বেছে নেওয়া শক্ত। যাক, উদ্ধৃতিটিই চলুক :—

"নিধুবাবু আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় ১১৭৫ সালে জোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাও বিধাতার সহিল না—তাহার দ্বিতীয়বারের পরিবারও অকালে গতাসু হইলেন। বিধাতা বুঝি নিধুবাবুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—তাঁর মর্মভেদী বিরহ-সঙ্গীত শুনিবার জন্যই এই অকালনিধন সাধন করিলেন। এই শোকেই বুঝি নিধুবাবুর সঙ্গীতে স্ফূর্তি জন্মিল।

আবার বিবাহ! আর বিবাহে ইচ্ছা নাই, আর সহ্য হয় না—মর্মে মর্মে যুদ্ধ-অন্তর্দাহ—এ-সকল আর সহ্য হয় না। নিধুবাবু স্পষ্টই একথা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আত্মীয়স্বজন শুনিলেন না—সুরূপ নিধুবাবুকে জামাতা করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কোন বাধা, কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইল না, নিধুবাবুকে বাধ্য হইয়া হাওড়া বরিজহাটীতে আবার বিবাহ করিতে হইল। এই স্ত্রীর গর্ভে নিধুবাবুর চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়।

নিধুবাবু স্ত্রীর সহিত কেমনভাবে জীবনযাপন করিতেন, পাঠক, তাও দেখুন। নিধুবাবু কোন কর্ম উপলক্ষে তিনদিন গৃহে আইসেন নাই, পত্নী অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন। প্রেমিক-চূড়ামণি নিধুর সে অভিমান বুঝিতে বাকি রহিল না, মানভঞ্জন আরম্ভ হইল। পত্নী প্রণয়কোপে কহিলেন—"আমি কুৎসিতা, তাই কি এমন ঘৃণা করিতে হয়?" নিধুবাবু তখনি উত্তর দিলেন :—

খাম্বাজ—মধ্যমান

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে।
সৌরভে গৌরবে কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে যেমন গঙ্গাপূজা
গঙ্গাজলে।

নিধুবাবু প্রেমকে—কিভাবে, কি চক্ষে দেখিতেন তাও দেখুন,—

সিন্ধু—মধ্যমান

অনুভাইব বলে কারে হেরিতে হয় বাসনা
হেরিলে হয় মানের উদয় দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা।
অদর্শনে ভাবি যারে, মনে করি বকব তারে
দৃষ্টি হলে চোখে চোখে তখন সেভাব থাকে না।

নিধুবাবু বড় পরিহাস রসিক ছিলেন। দুইটি যুবতী প্রাতঃকালে স্নান করিতে আসিয়াছেন, নিধুবাবুও প্রাতঃসমীর সেবনে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছেন। দৈববশতঃ যুবতীদ্বয়ের প্রতি নিধুবাবুর দৃষ্টি পড়িল, যুবতীদ্বয়ও চাহিলেন। মনের বন্ধন ছিঁড়িল। যুবতীদ্বয় আপনাআপনি আপনাকে বুঝাইলেন, বলিলেন, "চোখই যত অনর্থের মূল—নয় ভাই?" কথাটা নিধুবাবুর কানে গেল। তিনি তখনই উত্তর দিলেন :—

মুলতান—আড়াঠেকা

নয়নেরে দোষ কেন
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন
আঁখিতে যে কত হেরে সকলই কি মনে ধরে
সেই থাকে মনে করে যে তার মনোরঞ্জন।

পাঠক! সব তত্ত্বই এতে আছে। নয়নী ও মনের সম্বন্ধে দুকথায় কেমন বুঝান হইয়াছে। প্রকৃত উত্তর এই বটে।

শ্রীমতী মুর্শিদাবাদের মহারাজ মহানন্দ রায়বাহাদুরের রক্ষিতা। রাজা-রাজড়ার রক্ষিতা, সুতরাং শ্রীমতী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং যৌবনসাগরের নূতন পানসী। শ্রীমতী প্রেমউদ্যানের ফুলমল্লিকা, গন্ধে ভরপুর সুবাসে প্রাণ মাতোয়ারা। নিধুবাবু রায়বাহাদুরের বড় প্রিয়পাত্র—কেবল সঙ্গীতে। একদিন খোসবাগানে নিধুবাবুর সঙ্গীত শুনিবার মজলিস হইল। মজলিসে লোকের মধ্যে নিধুবাবু, রায়বাহাদুর আর শ্রীমতী। সেই মজলিসে শ্রীমতীর সর্বনাশ হইল। সেই মনোমোহন রূপরাশি—সেই কোকিলকণ্ঠ—সেই মধুর প্রেমসঙ্গীত—শ্রীমতী আপনাহারা—তন্ময়-চিত্তে প্রাণটি গায়ককে বকশীস করিল। তখন প্রেমে ভোর, সঙ্গীতে উন্মত্তা অজ্ঞান হইয়া প্রাণটি দিয়াছে, এখন দেখে সর্বনাশ! অনুপায় শ্রীমতী সহায় সম্পত্তি, ধন ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া নিধুর পদে বিনামূল্যে বিক্রীতা হইল।"

এইবারে এর বেশী সুযোগ নেই, বারান্তরে বাকি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাবে।

শার্ঙ্গদেব

॥ ৩৫ ॥

'আছে।' জয়তী বললে, 'না হলে ওরকম স্ট্রাইকটায় হাত দিতে যেতে না তুমি।'

'স্ট্রাইক। আমি তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় কাজ করতে সুতীর্থ?'

'সাপ্লাই কর্পোরেশনে।'

'কত মাইনে পেতে?'

'পাঁচশো।'

'আরো উন্নতি হচ্ছিল নাকি?'

'টাকাকড়ির? তা হত।'

'কেন ছেড়ে দিলে সব?'

'আমরা জোট পাকিয়ে পরিশ্রম করে মল্লিকদের ফার্ম দাঁড় করিয়ে দিলে ধনী-মানী লোকদেরই তো সুবিধে হবে, যারা না খেতে পেয়ে মরছে সে-সব কেরানী মজুর মাস্টার বেকারদের কোনো লাভ হবে না।'

'এই তোমার বিশ্বাস?'

চুরুট খেতে গিয়ে—চুরুটটা ফেলে দিয়েছে মনে পড়ল সুতীর্থের। আর একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল, কোথায় রেখে দিল যেন তারপর দেশলাইটা, জয়তীর কথা শুনেছে বলে মনে হলো না, চুরুট না টেনে বাইরের রোদ্দুরের বড় ঝিলিকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ধন্য সত্য তোমার সুতীর্থ। অথচ সত্যে অবিশ্বাসীর বদনাম তোমার?'

যে হাঁস আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার মত চোখে যে গহন জলে সাঁতার কেটে চলেছে মাকগাছের সেই গূহ বলিভুক রাজহাঁসিনের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

নিবে গেছে চুরুট, সুতীর্থের চোখ দেশলাই খুঁজে ফিরছিল; নেই; আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু সহজ চোখের পথে কোথাও নেই; আচ্ছা পরে দেখা যাবে।

'কলকাতায় একটা লোককেও তুমি খুঁজে পাবে যে এ-জন্য পাঁচশো টাকার চাকরী ছেড়ে দেয়?'

'কেন, তুমিই তো ছেড়ে দিচ্ছ জয়তী।'

"আমি?" সুতীর্থের নেবাচুরুটটার দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে, 'তুমি দেশলাই খুঁজছিলে? পেয়েছ?'

'না।'

'কোথায় গেল দেশলাইটা?'

'লাখ টাকার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ তো তুমি; আমার সঙ্গে গ্রামে যাবে বলছ। এত শ্রদ্ধা তোমার পৃথিবীর ওপর? এত বিশ্বাস মানুষকে?'

জয়তীর চোখ দেশলাই খুঁজছিল; কোনো কোণে খাঁমচি—কোনো দিকে দেখতে পেল না সেটা।

'অথচ আমার কি মারাত্মক অবিশ্বাস দেখ। আমি জানি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।' বলে আস্তে আস্তে চুরুটটাকে মুখে তুলে টানতে গিয়ে সুতীর্থ টের পেল নিবে গেছে; অনেক আগেই নিবে গেছে, দেশলাই খোঁজা হচ্ছে, এত সব ভুলে গিয়েছিল সে। দেশলাই পেল কি জয়তী?

জয়তী রোদের ভেতর চোখ বুজে কেমন গাঢ় লাল বর্ণের সুধা স্রোতটাকে খানিকটা তিতোর মত অনুভব করে চোখ মেলে বললে, 'আমি এই কেমেশের বাড়িতেই থাকব তবে?'

'থাকো। এ বাড়িটা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, ইঁটের ওপর ইঁট চাড়িয়ে বেশ গেঁথেছে, কিন্তু আমার মাটির দেয়াল হলেই হবে।'

'কোথায়?'

'গ্রামে। আজই চলো।'

'আজই?'

দেশলাইটা খুঁজে পেয়েছে জয়তী, দিই দিই করে সুতীর্থকে দেওয়া হল না। চুরুট নাই বা জ্বালাল সুতীর্থ। না; জ্বালাবার কোনো তাড়া নেই। দেশলাইটার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'পেলে খুঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিল?'

'গদির কিনারে; ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।'

সুতীর্থ নেবাচুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আজ হবে না, তবে আজ-কালই যাব গ্রামে।'

'কোন গ্রামে যাবে ঠিক করেছ?'

'স্টেশনে গেলে ঠিক হবে।'

'তা হবে। সব গ্রামই গ্রাম, একরকম অন্ধকার, একটা সম্ভাবনা, একই রকম শূন্যতা। আলোও আছে?' জয়তী বললে, 'সুতীর্থ, ওদিকে পাকিস্তান হচ্ছে নাকি?—

আমাদের যশোর খুলনা চাটগাঁ নেয়াখালির দিকে যাবে?'

'চলো!' সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল জয়তী হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা দিচ্ছে। হাতের থেকে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটি কি দুটি সন্তানের দরকার।'

কোনো কথা বললে না জয়তী; মুখের ভেতর তার কোনো ভাব নেই; যেন কেউ নেই, কিছু নেই, কেউ কোনো কথা বলেনি যেন।

সুতীর্থ চুরুটের মুখের থেকে সাদা ঠান্ডা ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'আচ্ছা থাক, কোনো দরকার নেই।'

'কেন?'

'এক-আধটা চাষাভুষোর ছেলেকে আমাদের ঘরে এনে মানুষ করলেই হবে।'

চুরুট জ্বালাল সুতীর্থ।

জয়তী একটু হেসে বললে, 'পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক চাষাভুষোর ছেলেগুলোকে নিজেদের ঘরে নিয়ে সন্তানের সাধ মেটাচ্ছে বুঝি? তাই যদি করে তাহলে আমরাও তা করব। কিন্তু না করে যদি তাহলে পৃথিবীর লোকেরা যা করে সেই নিয়মে চলব আমরা। সেই নিয়মে চলবে তুমি সুতীর্থ?

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে খুব গভীর তো সেই নিয়ম—।' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুরুট হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে গ্রামে?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে গভীর সেই নিয়ম। কি যে গভীর। পৃথিবীতে আরো চল্লিশটা শীত ঋতু বাঁচব আমরা— তুমি আর আমি।'

জয়তীর মুখে একথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুতীর্থ, তারপর অন্য চিন্তা এল সুতীর্থের মনে—অন্য ভাব; চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'পৃথিবীটা আজকাল খুব খারাপ, আমার মতন মানুষের মন সেই পৃথিবীর মতনই খারাপ। মনটাকে স্নিগ্ধ, সত্য করে নিতে হলে চাষাভুষো হয়ে থাকতে হবে গিয়ে গ্রামে। আমরা একটু বড়— প্রামাণিক চাষা হব বটে, বেশি সাহস, বেশি বুদ্ধি, বেশি সহানুভূতি নিয়ে কাজ করব —যত বেশি লোকের জন্যে সম্ভব করব। কিন্তু কোনো নতুন সূর্যে নতুন সমাজ আর পুরোনো সমাজের আকাট ভাঁওতার কেলেংকারি থাকবে না আমাদের রক্তের ভেতর কোনো বিষ থাকবে না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে; কাজ করব, উপলব্ধি করব—সেবা করব—সন্তানেরা আসবে— শেখাব তাদের; ফুরিয়ে যাব পৃথিবীর থেকে।'

'এই তো পৃথিবীর কথা।' জয়তী বললে।

'না, পৃথিবীর কথা এর চেয়ে ঢের খারাপ।'

'সব সময় না; যা বলেছ তুমি এইরকম ভালো অনেক সময়—'

জয়তীর শরীরে রোদ এসে পড়েছে তার ভেতরে বসে থেকে সে বললে, বলে ভালো লাগল তার; কথা ভেবে, বলে, ভালো লেগেছে, মুখে হাসি রয়ে গেছে তাই; জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে এসেছি এবার; যা এত চেষ্টা করে পারনি এতদিন —আমি এসেছি বলে সব পারবে।'

শুনে মন খানিকটা আতস কাচের রোদের মত স্থিত, অক্ষুণ্ণ হয়ে এল, কাচে সূর্য ফলিত হয়ে চলেছে, সুতীর্থ বললে 'আমরা যদি পারি—' বলতে বলতে তবু চুপ করে রইল সে।

'তুমি পৃথিবীকে ভালো মনে কর সুতীর্থ। আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাসী তুমি।'

'আমি?'

'কেউ তোমাকে বলেনি এই কথা এতদিনেও, তেমনভাবে বলেনি।' জয়তী নিজেকেই আস্তে আস্তে বলছিল যেন। 'জীবনের ভালো জিনিসগুলো আমি তোমাকে দিয়ে প্রমাণ করাব।' বললে জয়তী —এত চাপা গলায়—যে একটা ফিসফিস শব্দ হল শুধু; নিজেকেই বলতে চাচ্ছিল জয়তী, আর কাউকে নয়। কিন্তু তবুও শুনতে পেল সুতীর্থ; বললে, 'আমাদের জীবন প্রমাণ নিয়ে নয়। প্রমাণ প্রমান নিয়ে নয়। না।'

'তবে?'

'যে জিনিস নিজের থেকে হয় তাই নিয়ে।'

'কি জিনিস?'

'পূবিরুপাক্ষের টাকাকড়ি, বাড়ি যা তুমি

নিয়েছ তার কাছ থেকে, ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। চলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি আজ—' জয়তী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কি ফিরিয়ে দেবে?'

'দলিলপত্র সব।'

'তোমার নিজের হাতে টাকা আছে?' অনেকক্ষণ পরে বললে জয়তী।

'না। নেই।'

'কি করে চলবে তবে সব?'

সুতীর্থ হাসতে লাগল। 'আমি একা মানুষ। তুমি তো নেই জয়তী—সে সব গাঁয়ে। আমি একা তো।'

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও জয়তী বিরূপাক্ষের সব জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা সে রাখতে চাইল, আর বালিগঞ্জের বাড়িটা। এ বিষয়ে জয়তীর মতামত স্থির তো। আরো ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যে একমাস বা অনন্তকাল সময় চায় না সে; তাতে মত বদলাবে না। সে জানে তা; সুতীর্থও জানে। মানুষের জীবনের এইরকম সব ধরন ধারণ, নির্ধারণ।

'সুতীর্থ, কিছু হাতে রেখে তোমার সঙ্গে চলি আমি;—তেমন বেশি কিছু নয়, আমি বলছি তোমাকে—'

'তা হতে পারে না' সুতীর্থ বললে।

কিন্তু বিরূপাক্ষকে টাকাকড়ি সব ঝেড়েপুছে দিয়ে আপোস আসতে হবে সুতীর্থের সঙ্গে? বিরূপাক্ষকে সেরকম করে সব ফিরিয়ে দিতে পারবে না জয়তী।

'তুমি ক্ষেমেশের এ বাড়িতে থাকো। ক্ষেমেশের ভাবে নয়—নিজের মনে। সেটা সম্ভব হবে। পাখিটাখি নিয়ে ক্ষেমেশের ঘর-বার। যেন সব মানুষ পাখি হয়ে গেলে ভালো হত, স্বজনমনের সাদা পাখি সব—' বলতে বলতে জানালা, আলো বাতাস সুদূর্ব চমৎকার দিঙমণ্ডলের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

সুতীর্থ আবার দেশলাই হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় রেখেছে সেটা? নিবে গেছে চুরুটে। নিজের সোফা, জয়তীর সোফা চারদিকে তাকাচ্ছিল সে। পেল না দেশলাই। পেল না যে সেটা টের পেল না জয়তী; সে মেঝের দিকে ঘাড় হেঁট করে তাকিয়েছিল।

দেশলাই উড়ে যায়নি; ছিল; খুঁজে পেল সুতীর্থ; চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'না, বিয়ে করব না আমি। শীতকালে গাঁয়ে একা থাকাই সব থেকে ভালো। একা থাকা। শীতকালে। পাড়াগাঁয়ে।'—চোখের সামনে যেন সবুজ ঘাস—কর্মা ধুলোর পথ—ফসল—শীতের আমেজ—বিকেলের সূর্য দেখা যাচ্ছে—এমনিভাবে বললে সুতীর্থ। কিন্তু ময়লা মলিন হয়ে উঠল আর; গ্রাম মানে—গ্রামের মাড়ীনক্ষত্র—যা অন্ধকারে ও হালকা ও অতল—সেই সব নিয়েই তার কাজ—যতদূর সম্ভব সঙ্গতি আনতে পারা যায়—সেইজন্যেই যাচ্ছে সে।

'ক্ষেমেশের এখানে আমি থাকব না।' জয়তী বললে।

'কোথায় যাবে তাহলে?'

'বাবার ওখানে গিয়ে থাকব। আমি টিচারি করব।'

'ও'—সুতীর্থ যেন লিকলিকে ট্রাম লাইনের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে এসে বললে, 'আচ্ছা উঠি জয়তী।'

'আজই তুমি গ্রামে যাবে?'

'হ্যাঁ, আজই।'

'আজই?' জয়তী কি যেন এক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পেয়েও পাচ্ছে না এমনি চোখে দেয়াল মেঝে চারদিককার ঘাস গাছ পৃথিবীর মানুষের শেষ আশার মত সমস্ত সূর্যের পিণ্ডের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'জিনিস-টিনিস কোথায় তোমার?'

'গাঁয়ে গিয়ে যোগাড় করব।'

'এখন বুঝি টিকিটের টাকা হাতে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

সুতীর্থ চলে গেল।

মানুষের চোখ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না। চোখ ঝলসে পুড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল জয়তীর সূর্যের দিকে তাকাতে তাকাতে। কিন্তু তবুও তাকিয়ে রইল সে; কোনো অশেষ প্রণিধান, অজেয় অমেয়, স্থিরতা অমর আশা লাভ করবার জন্যে নয়; কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না—পৃথিবী বলছে, সুতীর্থ চলেছে—সূর্য জ্বলে—এইসব মেধাবী গভীর মর্ত্যের থেকে কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল তার মন; ফিরে আসতে চাচ্ছিল এসবের দিকে;—কিন্তু পারছে না—সূর্যের চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার—।

ঠাণ্ডা হাত এসে লাগল জয়তীর চোখের ওপর। কারা যেন ঢুকে পড়েছে ঘরে—ক্ষেমেশ—সঙ্গে কে—বিরূপাক্ষ—

'কী করছিলে জয়তী—সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলে যে!—'

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

জানেন,
এমন কিছু জিনিস
আছে যা
বিনীও
বদলাতে চায় না!
ভাগ্যিস!
কিছু জিনিস কখনো বদলায় না!
আজকাল স্বাভাবিক, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের
প্রকাশ দেখেও তৃপ্তি! আর ভাল লাগে বিনীর
অপরিবর্তনীয় উচ্চ মান।
স্থায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক — ফ্যাশানের
চূড়ান্ত — অপূর্ব সমন্বয়... বিনীর অবদান!
স্বচক্ষে দেখুন — অজস্র রঙের মেলা,
অসংখ্য ফ্যাশানের বাহার! বিনীর
পলিএস্টার ব্লেণ্ডসের পোষাক
তৈরী করিয়ে
আনন্দ পাবেন।
ফ্যাশনে দুরন্ত অথচ টেকসই—
বিনী পলিএস্টার ব্লেণ্ডস্

নীললোহিতের চোখের সামনে

ছেলেটি প্রথমেই এসে আমাকে বললো, আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো!

আমি তক্ষুনি বুঝে গেলাম, চাকরির ব্যাপার। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। পৃথিবীর অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে গেছে যে আমার মতন একজন অভাগা অভাজনের কাছেও কেউ অনুগ্রহ চাইতে আসে। আমার নিজেরই নেই চালচুলো, পকেটে অধিকাংশ সময় হাওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সেই আমি কাকে কী দিতে পারি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেটির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। রোগা, লম্বাটে চেহারা, শ্যামলা রং, মলিন ধুতি ও শার্ট পরা। দেখলেই অনুমান করা যায় গ্রামের ছেলে। তবে চোখ দুটি ভারী মমতা মাখানো। মনে হয়, ঐ চোখ দুটিতে অনেক আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে।

আমি তোমায় কী সাহায্য করতে পারি, বলো ভাই?

ছেলেটি বললো, আমি আপনার ভরসাতেই কলকাতায় এসেছি। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

আমি তাকে বললাম, বসো। চা খাবে?

চিৎকার করে চায়ের কথা বললাম। ছেলেটিকে খানিকক্ষণ আপ্যায়ন করা দরকার। যাকে আমি চাকরি দিতে

কাঁধের ঝোলা থেকে একটা অল্পখ্যাত সিনেমা-পত্রিকা বের করলো

পারবো না, তার জন্য কিছুটা সময় অন্তত দেওয়া উচিত। চাকরিও দেবো না, সময়ও দেবো না—দু'কথায় বিদায় করে দেবো—এটা কোনো সভ্যতা নয়।

সে বললো, না, আমি চা খাই না। আমি আপনাকে বেশীক্ষণ বিরক্ত করবো না। আমি চাকরি চাই না, আপনি শুধু কলকাতা শহরে আমার একটু থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এ দেখছি অন্যরকমের প্রস্তাব। এবার একটু মেজাজের সঙ্গে বললাম, চাকরি না করেও থাকা খাওয়ার জায়গা যদি পাওয়া যেত, তাহলে সেরকম জায়গা তো আমিই নিতাম!

সে বললো, মানে আমি তো জানিই, চাকরি পাওয়া কত শক্ত। তাই বলছিলাম, খাওয়া থাকার বদলে আমি ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা এরকম কাজও করতে পারি—আমি শুধু চাই একটা ভদ্র পরিবেশ—আমি বি এ পাশ।

কোনো বি এ পাশ ছেলেকে কেউ বাড়িতে চাকর হিসেব রাখে না। তার প্রথম কারণ, বি এ পাশ চাকর ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার কাজ ঠিকমতন পারবে না। এবং তার স্থায়িত্বের ওপরও নির্ভর করা যাবে না।

আমি বললাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি সেরকম কোনো বাড়ি জানি না, যেখানে তুমি থাকতে পারো। আমার চেনা-শুনোরা সবাই মাঝারি মধ্যবিত্ত লোক, তাদের বাড়িতে একটা বেশী ঘর পর্যন্ত নেই।

—তা হলে আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে।

ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ছেলেটির সমস্যাটা ঠিক দারিদ্র্য নয়। ছেলেটি বলেনি যে, ও খেতে পাচ্ছে না। ও বলছে, কলকাতায় ওর থাকার একটা জায়গা চাই।

আমি বললাম, আচ্ছা ভাই, তুমি আত্ম-হত্যা করবে, এটা কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই আত্মহত্যা করে। কিন্তু সেটা তুমি আমাকে জানিয়ে শুনিয়ে করতে চাও কেন? আমাকে দায়ী করতে চাও?

—না, না, স্যার আপনাকে দায়ী করবো কেন? আমার শুধু একটা দুঃখ রয়ে গেল, আপনি আমাকে কোনো সুযোগ দিলেন না। আমি লেখক হতে চাই—

—লেখক হবার জন্য কলকাতায় থাকতে হবে কেন? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি মেদিনীপুরের এক গ্রামে। বিশেষ কিছুই নেই, তাও বাবা বলছেন কাজকর্ম দেখতে, ঘরে বসে বসে আমাকে কিছু লিখতে দেখলেই রাগ করেন। আমি স্যার, প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু না লিখে পারি না। না লিখলে আমার মনে হয়, জীবনটাই বৃথা।

আমি একটা সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলাম। এমনও তো হতে পারে, এই ছেলেটি বিরাট প্রতিভাবান লেখক। সত্যিই সুযোগের অভাবে এত বড় প্রতিভা অকালে শুকিয়ে যাবে। একটু দেখে নেওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার লেখা টেখা কিছু সঙ্গে আছে? একটু দেখতাম। তুমি আত্মহত্যা করলে তো আর সে সুযোগ পাব না।

সে এবার উৎসাহের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, অনেক লেখা আছে। আমার দুটো লেখা ছাপাও হয়েছে। আপনি কোনটা দেখবেন, হাতের লেখা, না ছাপা?

—ছাপাটাই দাও।

কাঁধের ঝোলা থেকে সে একটি অল্পখ্যাত সিনেমার পত্রিকা বার করলো। তার মধ্যে নিজের লেখাটির পৃষ্ঠা খুলে এগিয়ে দিল আমার দিকে। দুটি পৃষ্ঠায় চোখ বোলালাম। আর বেশী পড়বার দরকার নেই। গল্পটি আসলে শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি। অর্থাৎ রামের সুমতি গল্পটাই নাম-টাম বদলে ছাপা হয়েছে। গল্পটার নামও রাখা হয়েছে কুমতি-সুমতি। পত্রিকার সম্পাদকও সেটা খেয়াল করেননি।

আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এই রকম একটা সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল ওর মুখে স্যার সম্বোধন শুনে। এর আগে যারাই আমাকে স্যার বলেছে, পরে দেখেছি তাদের মাথায় কিছু নেই।

পৃথিবীর অনেক অদ্ভুতের মতো লেখার বাতিকও একটা অসুখ। আমাদের দেশের মতন আর্দ্র জলবায়ুতে ছেলে ঐ মেয়েদের

প্রকোপ একটু বেশী। অনেক ছেলেকে আমি দেখেছি, কবিতা লিখতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। আমি দারুণ লিখছি, অথচ আমার লেখার ঠিক মতন সমাদর হচ্ছে না—এই রকম চিন্তাই হচ্ছে ঐ অসুখের প্রথম লক্ষণ। এই ছেলেটির রোগ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে রামের সুমতিকে এ নিজের গল্প মনে করে বিরাট সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখছে। সাহিত্য জিনিসটা অনেকটা আগুনের মতন, না জেনে ছুঁতে গেলে হাত পুড়ে যাবেই।

আমি পত্রিকাটি ছেলেটির হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম, দেখো, সারা জীবনে আমি নিজেও অন্তত তিনবার আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছি, চেষ্টাও করেছি। কোনোবারই ঠিক সফল হইনি। তুমি ঠিক কোন্ উপায়ে আত্মহত্যা করবে বলো তো।

ছেলেটি বললো, আমি সাঁতার জানি না। আমি সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেবো!

আমার বলতে ইচ্ছে করলো, বাঃ, আমার শুভেচ্ছা রইলো। দেখি তো, পারো কিনা!

কিন্তু এরকম কথা মুখে বলা যায় না। এ ধরনের শুষ্ক রসিকতা অনেকেই বুঝতে পারে না, মনে করে নিষ্ঠুরতা। সুতরাং নরমভাবে বললাম, আমি অতি সামান্য লোক, আমার কোনো উপায় নেই তোমাকে সুযোগ দেবার। তুমি বরং দেশের বাড়িতেই ফিরে যাও, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দ্যাখো বরং—।

ছেলেটি চলে গেল। কিন্তু একটা খোঁচা রেখে গেল আমার মনের মধ্যে। ব্যাপারটা চট্ করে ভোলা যায় না। ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে মনে হলেও ছেলেটি যদি হঠাৎ আত্মহত্যা করে ফেলে। ছেলেটি বোকা, এ ছাড়া আর তো কোনো দোষ নেই। শুধু বোকা হওয়ার জন্য একজনকে মরতে হবে কেন? পৃথিবীতে কি জ্যান্ত বোকার অভাব আছে। আর আমিই বা কী এমন দোষ করেছি, যার জন্য আমাকে এ খবর জানিয়ে যেতে হবে?

খবরের কাগজের বড় বড় হরফের খবর ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পড়তাম না। এরপর থেকে ছোট ছোট খবরও পড়তে লাগলাম। তাও খুব সন্তর্পণে। যদি ছেলেটির আত্মহত্যার কোনো খবর ছাপা হয়। মাস চারেকের মধ্যেও সে রকম কিছু চোখে না পড়ায় আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। তা হলে ফাঁড়া কেটে গেছে। দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা নিয়ে কেউ আত্মহত্যা করে না।

এরপরই একটা চিঠি পেলাম পুরী থেকে। সেই ছেলেটিই লিখেছে। সম্বোধন করেছে দাদা বলে। যাক স্যার লেখেনি। সে লিখেছে যে পুরীতে সে এসেছিল আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই, কিন্তু সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যটা অন্যরকম হয়ে গেল......

ছেলেটি বেশ রোমান্টিক তো। আত্ম-হত্যার জন্য পুরী চলে গেছে। মেদিনীপুর জেলাতেই তো সমুদ্র পাওয়া যায়, তা তার পছন্দ হয়নি, সে কোনো বিখ্যাত জায়গা চায়।

যাই হোক, ছেলেটি পুরীর একটি হোটেলে বেয়ারার কাজ নিয়েছে। সারাদিন অসহ্য পরিশ্রম, অন্য বেয়ারারা তার ওপর অত্যাচার করে। মালিক অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয়—কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বেশী কষ্ট তো আর নেই, তাই, সে লিখেছে, এ সবই সে সহ্য করতে পারছে। শুধু তার একটা অনুরোধ, তার জীবন নিয়ে আমি যেন একটা গল্প লিখি!

মেসের ঝি নিয়ে শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু হোটেলের বেয়ারাকে নিয়ে তো কিছু লেখেন নি। সেই অপরাজেয় কথাশিল্পীই যখন ওকে নিয়ে লিখতে পারেন নি,, তখন আমি তো কোন্ ছার। তা ছাড়া গ্রামের চাষবাস ছেড়ে একটা হোটেলের বেয়ারাগিরি করার মধ্যে কী যে গৌরব আছে, তা বোঝাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

তবু চিঠিটা নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলেটি ভবিষ্যতে কী হবে? আমার মনের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। এক অংশ বললো, হোটেলের ঐ কাজের কষ্ট ছেলেটি বেশীদিন সহ্য করতে পারবে না, নিশ্চয়ই আবার দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্রের অন্য কোনো কাহিনীর অনুকরণে আবার কিছু লিখে সিনেমা পত্রিকায় পাঠাবে। অথবা ও ঐ হোটেলেরই ম্যানেজার হয়ে উঠবে। দু' বছর সময় ধরা যাক, এর মধ্যে কোনটা হবে? আমি নিজের সঙ্গেই একটা বাজি ধরে ফেললাম। আমার মনের রক্ষণশীল অংশটা বললো, দেখো ও ঠিক বাড়িতে ফিরে

গিয়ে একদিন বাপের সুপুত্তুরের হয়ে বিয়ে করে ফেলবে। সাহিত্য বাতিক একেবারে ঘুচবে না, গ্রামের থিয়েটারে শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ দেবে। অন্য মন বললো, না না, ও যখন একবার বেরিয়ে পড়েছে, আর ফিরবে না, কোনো না কোনোভাবে উন্নতি করবেই। এমন কি নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় একদিন সত্যিকারের লেখক হয়েও উঠতে পারে। রক্ষণশীল মন বললো, কত বাজি? আমি বললাম, দশ টাকা।

আরও দু' এক মাস ছেলেটির চিঠি আসতে লাগলো মাঝে মাঝে। ঐ হোটেল থেকেই। নানারকম রোমহর্ষক বর্ণনা। রাত দেড়টায় কাস্টোমার এলে ওকে জাগিয়ে তুলে কত কষ্ট দেওয়া হয়। হেড বেয়ারা কেন ওকে সহ্য করতে পারে না। একজন বেয়ারা জোর করে ওকে একদিন মদ খাইয়ে দিয়েছিল, তার ফলে কী দারুণ কাণ্ড হলো ইত্যাদি।

সব চিঠিই বেশ দীর্ঘ, গোটা গোটা হাতের লেখা, কিন্তু ভাষার কোনো উন্নতি হয়নি। সব সময় একটা কান্না কান্না ভাব। যেন সারা পৃথিবী শুধু ওর ওপর দয়া করবে, ও তাই চায়।

আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে পেয়ে ওর চিঠি লেখা এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি ওর কথা ভুলি নি। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে কোনো সরল মুখের বেয়ারাকে দেখলে আমি দু' এক মুহূর্ত ঐ ছেলেটির কথা ভাবি।

দু' বছর নয়, আড়াই বছরের মধ্যে আমাকে একবার পুরী যেতে হলো। আসলে কাজ ছিল ভুবনেশ্বরে, শুধু একদিনের জন্য পুরীতে চলে এলাম। হোটেলের নামটা মনে ছিল, সেখানেই উঠলাম। ছেলেটিকে দেখতে পেলাম না। আমার মনের রক্ষণশীল মন বললো, কী বাজিতে হেরেছো তো? বলেছিলাম না, সে ঠিক বাড়িতে ফিরে যাবে?

খানিকটা বাদে ধীরে-সুস্থে অন্য একটি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম ওর কথা। ছেলেটির নাম নাও মিলতে পারে, সে হয়তো এখানে অন্য নাম নিতে পারে। তার চেহারারও বর্ণনা দিলাম।

বেয়ারাটি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো। ঠোঁট উল্টে বললো, ও, কানাইয়ের কথা বলছেন তো! সে তো এখন জেলে।

—অ্যাঁ? জেলে কেন?

—মালিকের ক্যাশবাক্স থেকে......... একেবারে বোকার মতন ধরা পড়লো—

আমি একটু দমে গেলাম। তাহ, বাজিতে হেরে গেলাম তা হলে?

শুধু আমার মনের কোন্ অংশটা যে [illegible]

পুস্তক পরিচয়

প্র ব ন্ধ সং ক ল ন

বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ : প্রাপ্তিস্থান জিজ্ঞাসা : মূল্য কুড়ি টাকা

প্রধানত বাংলার উনিশ শতকের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষার আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। নানা মাপের নানা স্বাদের প্রবন্ধগুলিতে বিষয়গত ঐক্য নেই। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এবং মেদিনীপুরের সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি। সেইটিই স্বাভাবিক। ভূমিকায় শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলিও বুদ্ধি ও যুক্তি-নির্ভর, ঐতিহ্য ও ইতিহাসাশ্রয়ী এবং তা বাঙ্গালী জীবনের বাঙ্গালীর বহমান সংস্কৃতির কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে। যে-সূত্রে এই নিবন্ধমালা গাথা হয়েছে তা' এই সূত্রে।'

প্রবোধচন্দ্র সেনের 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়' রচনাটি এ সংকলনের মূল্যবান প্রবন্ধ। উনিশ শতকে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এমন বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সেন নূতন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছেন। কেবল 'বাল্যশিক্ষা' গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্যটি ঈষৎ কঠোর বলে মনে হয়। 'বাল্যশিক্ষা'র রামায়ণ-মহাভারতের পদ্যে সারসংকলনটি আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। বাংলা বর্ণমালা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সেনের মন্তব্যের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহনের ব্যাকরণগ্রন্থে বর্ণমালা প্রসঙ্গগুলি স্মরণ করা কর্তব্য।

কয়েকজন লেখক বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির আলোচনা করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত রীতিবাদী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুও রীতিবাদী অধিকন্তু ব্যাকরণনিষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র গদ্যরীতির আলোচনা করেছেন পর্যাপ্ত উদাহরণ সহযোগে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর বস্তুগত বিচার প্রশংসা পাবার দাবী রাখে। তবে বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বিদ্যাসাগরের গদ্যের গূঢ় মাধুর্য ধরা পড়ে না। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন?' একটি বহুবিতর্কিত বিষয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তৃত তথ্য উদ্ধার করে বিষয়টিকে বিচার করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বিদ্যাসাগর 'হে নাস্তিক আস্তিকের গুরু'। বস্তুত যে বিষয়টিকে বিদ্যাসাগর তাঁর আলোচনার বাইরে রেখেছিলেন সে-সম্বন্ধে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বন্দ্য

'সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক ও বাংলা নাটক' প্রবন্ধে, নাট্যকার-দর্শক সম্পর্কটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিপ্রেত উনিশ শতকের বাংলা নাট্যকর্ম। যে প্রবল ধর্মবোধ নীতিনিষ্ঠা এবং স্বদেশ হিতৈষণা উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উজ্জীবিত করেছিল তারই একরকমের প্রতিফলন দেখি বাংলা রঙ্গমঞ্চে। ফলে মধুসূদনের বিশুদ্ধ নটকর্ম বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে ধারার সূচনা করেছিল পরবর্তী কালে নাট্যকারবৃন্দ তাৎক্ষণিক সাফল্যে মধুসূদনকে অতিক্রম করলেও কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। বিজয়বাবুর অনুসন্ধিৎসা যুক্তি এবং তথ্যনিষ্ঠ। রবীন্দ্র গুপ্তের 'উনিশ শতকের মননচর্চা ও বঙ্গদর্শন' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের লেখকবৃন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ। তিনি বঙ্গদর্শনের লেখকবৃন্দের ইতিহাসচর্চা থেকে ধর্মচর্চায় অধিকতর উৎসাহী হবার ব্যাপারটি সংক্ষেপে অথচ গভীর বিশ্লেষণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনা' পত্রিকার মধ্যে যে বিশ বছরের ব্যবধান—সেই বিশ বছরের কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্র।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মচর্চায় অধিক আগ্রহ বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্যও বোধ করি তাই। ভবতোষ দত্তের 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে দুই মনীষীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ঈর্ষালু ছিলেন এ মন্তব্য খণ্ডনে ভবতোষবাবু নানা তথ্য উপস্থাপন করেছেন। ভবতোষবাবুর প্রবন্ধপাঠে মনে হয় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্থিরনিশ্চয় হতে পারেন নি। প্রবন্ধটি আমাদের তর্কবুদ্ধি জাগাতে প্রচুর সাহায্য করে। সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'হিন্দু কলেজ ঃ ডিরোজিয়ো ঃ আধুনিকতা' দীর্ঘ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত মৈত্র 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রাণপুরুষ ডিরোজিয়ো সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার নিরসনের প্রয়াস পেয়েছেন। রামমোহন ও ডিরোজিয়োর কর্মচিন্তায় তোলন আলোচনায় স্বারা রেনেসাঁসের গতিপ্রকৃতিতে ডিরোজিয়োর স্থান নির্ধারিত হয়েছে প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর। মুহম্মদ আবুতালিবের উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে বাংলা গদ্যনির্মাণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকাকে খাটো করা হয়েছে—যার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্রবন্ধটিতে অহেতুক উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে হিন্দু-মুসলমান লেখকদের কৃতিত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে। আহমদ শরীফের শেখ সাদী রচিত বাংলা পুঁথির বিবরণটি মূল্যবান। ইসলামী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট রচনার পরিচয় দিয়ে শ্রীযুক্ত শরীফ পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রবোধকুমার ভৌমিক মেদিনীপুরের আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সাঁওতাল, লোধা, ওরাওঁ, মুণ্ডা ইত্যাদি আদিবাসীদের সামাজিক জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত চিত্র পাই এই প্রবন্ধে।

নরেশ গুহের 'বাংলা নাটকের আইরিশ প্রতিধ্বনি' প্রবন্ধে ইয়েট্স ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ও ইয়েট্সের 'দি হার্পস্ এগ'-এর সাদৃশ্য দেখিয়ে শ্রীযুক্ত গুহ বলেছেন, 'জীবনীকারদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইয়েট্স আজীবন ভুলতে পারেন নি'।

সংকলন গ্রন্থটি বিপুলাকার। কিন্তু সরকারী আনুকূল্যে ছাপা বলে মূল্য কম।

বিজিতকুমার দত্ত

উপন্যাস

রাজ অলখী কথা। উত্তম ঘোষ। অ্যাপোলো পাবলিশার্স, ১০৫।১৫ ক্যানেল স্ট্রীট। কলকাতা-৪৮। দাম আট টাকা।

আগাগোড়া উজ্জ্বল এক ভাষার [illegible] এই উপন্যাসটি লেখা। [illegible]

বিষয় অপ্রতিরোধ্য প্রেম, যদিও প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই রাজনীতিমনস্ক। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং কর্মী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে দীপার রেবেকা স্টীলের মালিক ধীরাজ রায়ের প্রতি 'শ্রেণী-ঘৃণা' দিয়ে উপন্যাসের শুরু। তাদের পূর্ব পরিচয় একটি কলেজে যেখানে দীপা ছিল বিংশতিবর্ষীয়া ছাত্রী এবং ধীরাজ ইংরাজী ভাষার নবীন অধ্যাপক। যখন 'সারাদিন এলোচুলে ঠান্ডা মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে' শিবরাত্রির নির্জলা উপোস করতো দীপা এবং চোখ বুজলে সুঠাম সুবেশ "অ্যাডোনিসে"র মতো ধীরাজ এসে জেগে থাকতো তার স্বপ্নে। যদিও, আজ বাম-রাজনীতি-মনস্কা দীপার কাছে ধীরাজ রায় সেই সব [illegible] মানুষদের একজন যারা "সুখ-সম্পদের ইজরাদার" হয়ে "হাজার হাজার মানুষকে বেগার খাটাচ্ছে" এবং আজ যে বিশ্বাস করে 'আমার ঘাম আর রক্ত তাদের সাথেই ঝরছে পৃথিবীর মাটিতে। আমার হাতের কোদাল আর গাঁইতি একদিন তাদের সাথেই উদ্যত হয়ে আঘাত হানবে ইজরাদারদের মাথায়। মরীচিকা, পুতুল খেলা, ছুটকো একলা সুখ আমার চাই না।" একদিন শ্রমিক-ছাটাই-এর প্রতিবাদে দীপাদের পার্টি রেবেকা স্টীল ও তার মালিকের ওপর হামলা করে। এই উপন্যাসে এর পরেই পাঠককে হতভম্ব হতে হয় কেননা পাঠ শুরু করার সংগে সংগে যে আপাত পরিণত ভাবনার সংগী হতে হয় পাঠককে, তা এইখানে এসে চূড়ান্ত আঘাত পায়। হামলায় আহত ধীরাজ অর্ধ-অচেতনভাবে শুয়ে শুধু দীপাকে খোঁজে এবং দীপার প্রতি ধীরাজের বহু [illegible] লালিত গোপন প্রেম চায় সে আসুক। দীপা আসে এবং আবিষ্কার করে তার 'বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা আকাঙ্ক্ষা'কে। অবশেষে তার যা কিছু সম্বল সে উজাড় করে দেয় ধীরাজকে। শেষাংশের এই বিশ্লেষণহীন অতি-সরলীকরণের প্রবণতা পাঠককে দুঃখিত করে, কেননা নবীন লেখক যথার্থই ক্ষমতা-বান।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সুব্রত মুখ সম্পাদিত প্রেমিক সন্ন্যাসী (পরিবেশক: দে বুক স্টোর, কলকাতা-১২, আট টাকা) সংকলনটিতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রচিত বাংলা কবিতার এক বিস্তৃত সমাবেশ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে দেবারতি মিত্র পর্যন্ত সত্তর জন কবির রচনা একত্রে আহরণ করা এক গবেষণাধর্মী কাজেরই সমতুল্য। সংকলনটির ছাপা খুব [illegible]

প্রত্যেক কবির পাশে জন্মতারিখ দেওয়া, 'বাংলা কবিতায় বিবেকানন্দের একটা স্বতন্ত্র চেহারা'—সুন্দরতর যা অম্বিষ্ট—নিশ্চিত ধরা পড়ে।

এই বোধহয় প্রথম সংকলন যেখানে রবীন্দ্রপূর্ববর্তী লেখক থেকে শুরু করে উত্তরকালের রচনা একসূত্রে গাঁথা হয়েছে, অথচ রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা নেই। এই অভাব সম্পাদকও নিশ্চিত বোধ করেছেন, বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু গদ্য রচনার অংশ তাই মুখবন্ধেই সংযোজিত করে সংকলনটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন।

সংকলিত কবিতাগুলির মান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অনুচিত, কেননা উদ্দেশ্য যেখানে প্রাথমিক প্রেরণা, সেখানে রচনায় উৎকর্ষ-অপকর্ষ গৌণ হয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, অনেক কবিতাই স্বতন্ত্র কবিতা রূপে উজ্জ্বল। বহু ম্লান ও অক্ষম রচনার ভিড়ে তাদের আলাদা করে চিনে নিতে দেরী হয় না।

*

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাটি আকাশ সমুদ্র** (সংলাপ প্রকাশনী, কলকাতা ৩৯, তিন টাকা) গ্রন্থে ১৭ পৃষ্ঠা রচনা, কিন্তু লেখক পরিচিতি ৩২ লাইন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত কৃতিত্বের পটভূমিতে বিচার করলে এই গ্রন্থের কবিতাবলী কিছুটা ম্লান মনে হতে পারে। 'কবি, প্রবন্ধকার, গল্পকার, অনুবাদক সমালোচক এবং ইন্ডিয়ান ভার্সের প্রধান সম্পাদক রূপে' সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী 'প্রতিভাবান এই পুরুষসিংহ কবি' কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সহজ, সরল এমন এক ভঙ্গি বেছে নিয়েছেন, যার আবেদন একেবারে সরাসরি। তাঁর রচনার ঈষৎ নমুনা—

"গাঁথলেই যে মালা হয়
এমন কথা নয়
যেমন পৈতে পরলেই বামুন হয় না
দড়ি গাছ শক্ত হলেই বাঁধন হয় না
নইলে ফাঁসির মতো শ্রেয়
আর কি আছে!"

বক্তব্য পরিষ্কার। আশংকা এই যে, একটু বেশীই পরিষ্কার।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবিধ

দিশারী—সম্পাদনায় গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থ বার্ষিক প্রচেষ্টা।

দৃষ্টিহীনদের দ্বারা পরিচালিত একটি সুন্দর পত্রিকা। প্রায় প্রতিটি রচনাতেই দৃষ্টিহীনদের জীবনের উজ্জ্বল দিকটির প্রতি ইঙ্গিত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের পত্রিকার প্রকাশ এবং প্রসার বাঞ্ছনীয়।

অরণ্যদেব

লী ফক

পৃথিবীর আকাশে ভিন্ন গ্রহের মহাকাশযান।
মানুষের নকল-সমেত অগ্রবর্তী জাহাজ ছাড়া হয়েছে
ঠিক পথেই যাচ্ছে, জঙ্গলে নামবে...

জঙ্গলের মধ্যে নামাবার ব্যবস্থা হয়েছে।
ঠিক করেছ। ওগুলি কি মানুষ?
না, মনুষ্যেতর জীবজন্তু।

জঙ্গলের জলাশয়ে.....

?
?
???

জন্তুরা ভয় পেল কেন?
আকাশ থেকে কী যেন পড়ল!

কিছু ওখানে পড়েছে...
তাই বুড়বুড়ি উঠছে! কী ওটা?

!!
!!

!!
!!
চলবে। নীলকণ্ঠ

খেলার মাঠে

মোহন বাগানের লীগ জয়ের পেছনে

ছয় বছর পরে মোহনবাগান ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ক্লাবের অগণিত সমর্থকদের মধ্যে খুশির হিল্লোল বয়ে গেছে। মোহনবাগান আগেও ১৪ বার লীগ জয় করেছে। এবারের মত আরও দুবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অপরাজিত থেকে। কিন্তু সদস্য সমর্থকদের এবারের মত এমন মাতোয়ারা হয়ে উঠতে আর কোনদিনই দেখিনি।

ছয় বছর পরে চ্যাম্পিয়ন হবার জনাই কি এত উল্লাস? নাকি গত ছয় বছরের চ্যাম্পিয়ন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লাল-হলুদ জার্সির ঔজ্জ্বল্য ম্লান করাতে এত আনন্দ? আনন্দের জোয়ারের পেছনে আংশিকভাবে হয়তো দুটি ঘটনাই ক্রিয়াশীল। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই কঠিনতম সংগ্রামের সাফল্যেই সদস্য সমর্থকদের মধ্যে উপচে পড়া আনন্দের অভিব্যক্তি।

সত্যিই সংগ্রাম ছিল তীব্র। মাত্র এক পয়েন্টের হেরফেরে জুটেছে জয়মাল্য। ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের সব খেলা শেষ হবার আগেই লিখতে হচ্ছে। যদি ইস্টবেঙ্গল আর একটি পয়েন্ট হারায়ও তবে সেটা হারাবে লীগ জয়ে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু মোহন-বাগানের শেষ খেলার আগে পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে মাত্র এক পয়েন্টেরই ফারাক ছিল এবং মনে হয় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ওই এক পয়েন্টেরই ব্যবধান থাকবে।

এই অবস্থার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিকভাবেই খেলোয়াড়রা স্নায়ুচাপে ভোগে। অনিশ্চিত পরিস্থিতি খেলোয়াড়-দের যথার্থ যোগ্যতা প্রকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

খেলার সংখ্যাও তো ছিল এবার বেশি। যে দল প্রথম খেলাতেই বাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে একটি পয়েন্ট হারিয়েছিল এবং পরে আর একটি পয়েন্ট হারিয়েছিল শক্তিহীন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কাছে, বাকি ২০টি খেলায় তারা জিতবেই জোর করে এমন কথা বলার মত বুকের পাটা ছিল না অনেক সমর্থকেরই। কিন্তু জিতেছে। জিতেছে পারস্পরিক সহযোগিতা, ক্রীড়া দক্ষতা এবং দলগত সংহতিতে। এবং বলতে দ্বিধা নেই, আংশিকভাবে সমর্থকদের অনু-প্রেরণায়ও। সারা মরসুমই সত্য সমর্থকরা খেলোয়াড়দের মনোবল চাঙ্গা করে রেখেছে। এই সার্বজনীন সমর্থনের পরোক্ষ মূল্য অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য বড় ক্লাবের পিছনে চিরকালই বিপুল সমর্থক থাকে। ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পিছনেও তো সমর্থক কম ছিল না। সমর্থনের মূল্য তখনই বেড়ে যায় যখন খেলোয়াড়রা তাদের নিজ নিজ দক্ষতা প্রকাশে এবং ক্রীড়াবিন্যাসে সফল হতে থাকে। আবার জীবন সংগ্রামের মত ক্রীড়া সংগ্রামেও কিছুটা ভাগ্যের প্রয়োজন থাকে।

এ বছরের লীগেও কি পালা বদল হত, যদি ইস্টবেঙ্গল পরাজিত না হত মোহন-বাগানের কাছে? অথচ যথেষ্ট প্রাধান্যের পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও প্রথম পনেরো সেকেণ্ডের গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হল মোহনবাগানের কাছে। গত বছর একইভাবে মোহনবাগানকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল খেলায় আপেক্ষিক আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও। খেলার ব্যাপারেও ভাগ্যকে অস্বীকার করা যায় না।

তবে সাধারণত সেই দলই শেষ পর্যন্ত লীগ-মুকুট মাথায় পরে যে দলের আক্রমণ ও রক্ষণের মধ্যে ভাল যোগাযোগ থাকে, সামগ্রিকভাবে থাকে দলগত সংহতি এবং সুযোগ সদ্ব্যবহার করার মত খেলোয়াড়।

মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডরা, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলিতে রাইট স্ট্রাইকার আকবর অবশ্যই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। না হলে কি ২২টি খেলায় ৫৯টি গোল হয়। তবু আমার নিজের ধারণা, লীগ জয়ে ফরোয়ার্ডদের চেয়ে মোহনবাগানের ডিফেন্সের অবদান বেশি। সারা লীগে মাত্র একবারই রক্ষণ-ব্যূহের শেষ বাধা ভেঙেছে। ২২টি খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল হয়েছে মাত্র একটি। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত যোগ্যতার তুলনা করলে নিঃসন্দেহে ইস্ট বেঙ্গলের ডিফেন্স মোহনবাগানের চেয়ে শক্তিশালী। লিংকম্যান হিসাবে সমরেশ চৌধুরীর ছেড়ে আসা জায়গা নিটোলভাবে ভরাট করেছে প্রশান্ত ব্যানার্জী। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে ১৯টি (৩টি খেলা বাকি)

খেলার মধ্যে পাঁচটি গোল খেতে হয়েছে! কেন ডিফেন্স এমন নড়বড়ে হয়ে গেল? যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। মোহনবাগান ডিফেন্স কেন কপাট-আঁটা হল তার ব্যাখ্যা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়। ২২টি খেলায় মাত্র একটি গোল খাওয়া মোহনবাগানের গোল-কিপার ও অধিনায়ক প্রশান্ত মিত্রের ক্ষেত্রে চাঁদে কলঙ্কের মত। প্রশান্ত সত্যিই নামের মর্যাদা রেখেছে সারা লীগে। ধীর স্থির অবিচল এবং আত্মবিশ্বাসী গোল-রক্ষক। কিন্তু প্রশান্ত ছাড়া ডিফেন্সের বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবল। তার মধ্যে আবার লেফট লিংক-ম্যান প্রসূন ব্যানার্জী ছিল অনবদ্য। ধারা-বাহিকভাবে ভাল খেলে গেছে। প্রকৃত লিংকম্যানের মত আক্রমণ ও রক্ষণের মধ্যে যোগসূত্র বেঁধেছে। প্রয়োজনে এগিয়ে গিয়ে গোল করেছে, পেছনে পড়ে অব্যর্থ গোল বাঁচিয়েছে একাধিক খেলায়। বড় সাফল্যের পেছনে সবারই কিছু না কিছু কৃতিত্ব থাকে। মোহনবাগানের অন্যান্য খেলোয়াড়-দেরও নিশ্চয়ই অবদান আছে। তবে দুই ক্লাবের অনেকেরই গৌরব-গরিমায় বড় রকমের ভাটার টান। যেমন সুভাষ ভৌমিক, যেমন হাবিব, যেমন সুধীর কর্মকার।

হীনবল ক্লাবের বিরুদ্ধে এরা কিছু কিছু বল বিক্রম না দেখিয়েছে, এমন নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলিতে এদের ভূমিকা উল্লেখ না করাই ভাল। বহুদিন ধরে যারা ছিল ময়দানের উজ্জ্বল তারকা এখন মাটির প্রদীপের মতই তারা মিটমিট করে জ্বলছে নিবে যাবার অপেক্ষায়।

মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভে সবচেয়ে গর্বিত মানুষটি কে? বোধ হয় কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী, যিনি ছয় বছরের চ্যাম্পিয়ন দলটিকে ছেড়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিলেন মোহনবাগানে। তবে গর্বিত মানুষ না বলে গরিমাময় মানুষ বলাই উচিত। কেননা পি কে গর্ব ভরে কথা বলেন না, বোদ্ধ কথা বলেন ক্রীড়াবিন্যাস এবং প্রথা প্রকরণ সম্পর্কে। আর একজন খেলোয়াড়ের আত্মতৃপ্তি বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। খেলোয়াড়টির নাম সমরেশ চৌধুরী। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সাত বছর বড় ক্লাবে খেলছেন। দু' বছর ইস্টবেঙ্গলে থেকে লীগ জয়ী খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন। মোহনবাগানে এসেও লীগ জয়ী খেলোয়াড়।

ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থেই লীগ চ্যাম্পিয়নশিপে পালা বদল কাম্য ছিল। দুই প্রধান ছাড়া অন্য কোন দলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ একই প্রয়োজনে কাম্য। লীগ বা শীল্ডে জয়ের মুকুট যদি শুধু দুই প্রধানের অধিকারে থাকে তবে অন্য ক্লাবের সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়। অতীতে তবু দু-একটি দলের লীগ জয়ের সম্ভাবনা ছিল। ইস্টার্ন রেল একবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল। কিন্তু এখন ফুটবলের কাঠামো এমন হয়েছে এবং নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়ার খরচ এত বেড়ে গেছে যে অন্য ক্লাবের পক্ষে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার আসরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা শক্ত। মহমেডান স্পোর্টিংকে তিন প্রধানের মধ্যে ধরা হলেও তাদের সাম্প্রতিক কালের ভূমিকা তেমন উল্লেখ করার মত নয়।

একলব্য

তিন অলিম্পিকে তিনটি সোনা

বিশ্ব অলিম্পিকে যে একটি সোনার পদক পায়, পৃথিবীর মানুষ তাকে চিনে ফেলে। দুটি বা বেশি পদক পেলে তো কথাই নেই। পর পর দুটি অলিম্পিকে যে সোনার পদক পায় সে হয়ে ওঠে ক্রীড়া-জগতের আলোচনার পাত্র। তিনটি অলিম্পিকে সোনা পেলে প্রবাদে পরিণত হয়।

মেক্সিকো, মিউনিখ ও মন্ট্রিল—পর পর তিনটি অলিম্পিকে হপ স্টেপ ও জাম্পের সোনা জিতে হ্যাটট্রিকের সুবাদে এখন প্রবাদ হয়ে উঠেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের অ্যাথলীট ভিক্টর সানিয়েভ। আর কেউ তার কীর্তি ম্লান না করা পর্যন্ত সানিয়েভই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হপ স্টেপ জাম্পার হিসাবে পরিচিত থাকবে।

পৃথিবীতে প্রতি বছরই যেখানে নতুন নতুন অ্যাথলীটের উদয় ঘটছে; রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলছে; বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলনে প্রথম সারির প্রতিযোগীরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সেখানে তিনটি অলিম্পিকে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা অসাধারণ ব্যাপার। অবশ্য সানিয়েভের চেয়েও অসাধারণ কান্ড ঘটিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের অল অর্টার, মেলবোর্ন, রোম, টোকিও ও মেক্সিকো অলিম্পিকে পর পর ডিসকাস নিক্ষেপের সোনা জিতে। চারটি অলিম্পিকের ব্যাপ্তিকাল ১২ বছর। এই ১২ বছর ধরে অর্টার তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছিল। সানিয়েভ ধরে রেখেছে ৮ বছর।

অর্টারের সঙ্গে সানিয়েভের আরও একটু পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিসকাস ছুঁড়িয়ে প্রতি অলিম্পিকে নিক্ষেপের দূরত্ব বাড়িয়েছে। সোভিয়েটের জাম্পারের কিন্তু লাফের দূরত্ব বাড়েনি। বরং কমে গেছে।

মেক্সিকোয় লাফিয়েছিল ৫৭ ফুট ০¾ ইঞ্চি (১৭·৩৯ মিটার), মিউনিখে ৫৬ ফুট ১১¼ ইঞ্চি (১৭·৩৫ মিটার) এবং মন্ট্রিলে ৫৬ ফুট ৮¼ ইঞ্চি (১৭·২৯ মিটার)। দেখা যাচ্ছে যোগ্যতায় ভাটার টান সত্ত্বেও জয়মাল্য জুটেছে সানিয়েভেরই। তাহলে কি হপ স্টেপ জাম্পেই পৃথিবীর মান নেমে আসছে?

না, তাও নয়। মান নামে না, উঠতেই থাকে। এক্ষেত্রেও উঠছে। সানিয়েভের যৌবনেও কঠিন সংগ্রামে শীর্ষস্থান দখল করা। কোনো অলিম্পিকেই সে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিল না। অথচ প্রতি অলিম্পিকেই পরাজিত করেছে বিশ্ব রেকর্ডধারীকে। মেক্সিকো অলিম্পিকের সময় বিশ্ব রেকর্ড ছিল পোল্যান্ডের জোসেফ স্মিড-এর ৫৫ ফুট ১০½ ইঞ্চি। সানিয়েভ সোনা পেল ৫৭ ফুট ০¾ ইঞ্চি লাফিয়ে। মিউনিখ অলিম্পিকের সময় কিউবার পি পিরেজের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৫৭ ফুট ১ ইঞ্চি। এখন বিশ্ব রেকর্ড ব্রাজিলের জোয়াও অলিভিরার ৫৮ ফুট ৮½ ইঞ্চি। কিন্তু মিউনিখ এবং মন্ট্রিলেও বেজেছে সোভিয়েটের জাতীয় সংগীত সানিয়েভ বিজয়-মঞ্চের শীর্ষ ধাপে দাঁড়াবার পর।

তবে একথাও সত্য, অলিম্পিকে দূরত্ব নেমে এলেও সানিয়েভ ধারাবাহিক-ভাবেই দূরত্ব বাড়িয়ে গেছে। গত বছরও বিশ্ব রেকর্ড ছিল তার অধিকারে। ব্রাজিলের তরুণ জাম্পার জোয়াও অলিভিরা তার রেকর্ড ম্লান করে দেয়।

অলিম্পিকের আগে সানিয়েভ বলেছিল, "স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে জোয়াও-এর যোগ্যতা আমার চেয়ে বেশি। তার বয়সও কম। কিন্তু মন্ট্রিলেই হবে মহা-পরীক্ষা। আমি মোটেই বিচলিত নই। একটুও মুষড়ে পড়িনি।"

ভিক্টর সানিয়েভের এই আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তাই বোধ হয় বার বার তাকে বিজয়ী স্ট্যান্ডের চূড়ায় দাঁড় করিয়েছে। শুধু অলিম্পিকেই নয়, একাধিকবার ইউরোপীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে এবং রুশ-মার্কিন দ্বৈত প্রতিযোগিতায়ও।

জন্ম কৃষ্ণসাগরের তীরে জর্জিয়া স্টেটের অন্তর্গত স্বশাসিত আবখাজিয়ান রিপাবলিকের এক গ্রামে। স্কুলে পড়ার সময় খেলাধুলায় সহজাত দক্ষতা প্রকাশ পায়। ওর উপর দৃষ্টি পড়ে অ্যাকপ কারসেলিয়ান নামে এক স্কুল ক্রীড়া-শিক্ষকের। সুন্দর বাস্কেটবল খেলত। কোচ কারসেলিয়ান ওকে অ্যাথলেটিকসের অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করলেন। দেখা গেল লাফেই দক্ষতা বেশি। উঁচু লাফেও যেমন দেহটাকে অনেকখানি তুলে নিতে পারে, দীর্ঘ লাফেও তেমন শরীরটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকখানি। আবখাজিয়ান জাতীয় বাস্কেট-বলে ওর চমৎকার খেলা দেখে কোচ দ্বিধায় পড়লেন ওকে নিয়ে। তখনই একদিন হপ স্টেপে দেখা গেল সানিয়েভ সকলকে মেরে দিয়েছে। ওই লাফ থেকে কোচ ওর ভবিষ্যতের হদিস পেলেন।

১৯৬৭তে সোভিয়েট ইউনিয়নে হপ স্টেপ জাম্পার হিসাবে ওর স্থান ছিল দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে ছিল আলেকজান্ডার জলোটারেভ। কিয়েভে ইউরোপীয়ান কাপ অ্যাথলেটিকসের সময় জলোটারেভ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সানিয়েভের উপর খেতাব রাখার দায়িত্ব পড়ল। খেতাব রাখলও ইউরোপের নামী জাম্পারদের উপর টেক্কা দিয়ে। লাফিয়েছিল ১৬·৬৭ মিটার। সামনেই মেক্সিকো অলিম্পিক। জাতীয় কোচ ভিটোলিড জিয়ার ও অ্যাকপ কার-সেলিয়ানের অধীনে শুরু হল কঠিন অনুশীলন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সংগ্রামে সদাপ্রস্তুত ছেলেটি হপ স্টেপ জাম্পকেই জীবন-ধর্ম হিসাবে বেছে নিল।

মৃত্যুঞ্জয়

তিনটি অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদক বিজয়ী সানিয়েভ

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের
রঙীন পূজাবার্ষিকী

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার/নীলরাম সর্দার/পরিচালনা : রাব ঘোষ

চিতচোর / রাজশ্রী প্রোডাকসনস

একটি মিষ্টি-মধুর চমক দিয়ে বাসু চ্যাটার্জী তাঁর ছবি শেষ করতে ভালোবাসেন। 'রজনীগন্ধা' কিংবা 'ছোটিসি বাত'-এ যেমন ছিল "চিতচোর"-এও তেমনি। শ্রীচ্যাটার্জীর ছবিতে প্রেম আলাদা একটি মর্যাদা পায়। দ্রুতগতি প্রেম কিংবা চটকদার প্রেমকে তিনি আমল দেন না আদৌ। তাঁর ছবিতে প্রেমের জন্ম হৃদয়ের গভীর থেকে, ধীরে ধীরে দল মেলে সারা ছবিটিকে সুরভিত করে তোলে। যে কারণে সুবোধ ঘোষের 'চিত্তচকোর' গল্পে যে সৌরভ, বাসু

চলচ্চিত্র

চ্যাটার্জীর "চিতচোর" ছবিতেও সেই একই সৌরভ। প্রেমের অনুষঙ্গে গান তো কতশত হিন্দি ছবিতেই থাকে, কিন্তু এ-ছবিতে গানও যেন একটা আলাদা মর্যাদার ব্যাপার।

মধুপুরের হেড মাস্টার পিতাম্বর চৌধুরীর (এ কে হাঙ্গল) ছোট মেয়ে গীতার (জারিনা ওয়াহাব) নিষ্পাপ দস্যিপনায় চেহারা পরিচালক ছবির টাইটেল দেখানোর ফাঁকেই দেখিয়ে দিয়েছেন। দুষ্টু দুষ্টু চেহারার মেয়েটিকে দর্শকরা এক পলকেই ভালবেসে ফেলেছেন। ভালবেসে ফেলেছেন তার ছোট্ট সঙ্গী রাজুকেও (শ্রীমান রাজু)। দর্শকের মনে ওদের পৌঁছে দেবার জন্যে অতিরিক্ত কোন দৃশ্য পরিকল্পনার যে প্রয়োজন হল না এজন্য পরিচালকের শিল্পবোধ এবং শিল্পী নির্বাচন দুইই তারিফ পাবার মত।

গীতার জন্য একটি পাত্র নির্বাচন করে বোম্বাই থেকে চিঠি দিয়েছে ওর বড় বোন মীরা। ছেলেটি এঞ্জিনিয়ার, মধুপুরে আসছে কাজের দায়িত্ব নিয়ে, গীতাকে তার পছন্দ হলেই বিয়ে হতে পারে। নির্দিষ্ট দিনে যে এসে পৌঁছল তার নাম বিনোদ (অমোল পালেকর)। গীতার বাবা ও মায়ের (দীনা পাঠক) ছেলেটিকে পছন্দ হল। গীতারও পছন্দ হল, তবে অনেক পরে। পরিচালক নিখুঁত পরিকল্পনায় দুটি হৃদয়কে কাছাকাছি এনে দিলেন। গীতার নিষ্পাপ হৃদয়ে প্রেমের বীজ বপন, খোলামেলা হৃদয় দিয়ে বিনোদের সকলের হৃদয় জয়, যে গীতা গান সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিল তার কণ্ঠে গানের সুর, পরিচালকের আশ্চর্য রসবোধে দুটি হৃদয়ের গভীর থেকে একটি প্রেম ধীরে ধীরে জন্ম নিল।

ছবিতে জটিল পরিস্থিতির আবির্ভাব হল মীরার আর একটি চিঠি পাবার পর। সে জানিয়েছে, তার উদ্দিষ্ট এঞ্জিনিয়ার ছেলেটি এখনও গিয়ে পৌঁছায়নি। যে গেছে সে একজন ওভারসিয়ার মাত্র। এঞ্জিনিয়ার সুনীল (বিজয়েন্দ্র) আগামী কদিনের মধ্যে এসে পৌঁছবে। গীতা যদি তার মন জয় করতে পারে...। এদিকে বিনোদ আর গীতার মন জানাজানি সমাপ্ত, উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এমন সময় গীতার মায়ের নির্দেশ : গীতা যেন সুনীলকেই ভালবাসে, বিনোদকে নয়। সুনীল অবশ্য প্রথম দর্শনেই গীতাকে পছন্দ করে ফেলেছে। কিন্তু গীতা? সে যতবার সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়েছে ততবারই ভেসে উঠেছে বিনোদের মুখ। সুনীলের একটি কথায় তার কানে ভেসে এসেছে বিনোদের অজস্র কথা, গান আর ভালবাসার সেইসব
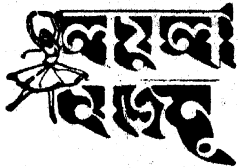
মোহময় মুহূর্তগুলি। যেসব মুহূর্তের সঙ্গে দর্শক আগেই পরিচিত সেইসব মুহূর্তও নতুন এক ব্যঞ্জনা নিয়ে পর্দায় এসে উপস্থিত হয়েছে। দর্শক তখন বেদনা-বোধ করেছেন এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় বালিকাটির জন্য, দিলখোলা আমুদে বিনোদের জন্যও।

অবশেষে বিনোদও যখন জানতে পারল তার প্রিয় এঞ্জিনিয়ার সুনীল গীতার পাণিপ্রার্থী তখন সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল অনেক দূরে। ততদিনে গীতাও মনস্থির করে ফেলেছে। সেও বিনোদের সহযাত্রী হবে। কিন্তু রেলের কামরায় বিনোদকে সে খুঁজে পেল না। খুঁজে পেল স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো সুনীলকে। তারপরই ছবির সেই চমক। বিনোদ আর গীতা যা চেয়েছিল, এবং দর্শকরাও, সেটাই ঘটল। সুনীল দাঁড়িয়ে থেকে অভিভাবকের মত ওদের চার হাত এক করে দিল।

মিষ্টি-মধুর প্রেমের গল্প। ঘটনার ঘন-ঘটা নেই। ত্রিকোণ প্রেমের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু এ-ছবির একটা আলাদা সৌরভ আছে যা সারাক্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ছবির চরিত্রগুলি কোনোটিই অপ্রয়োজনীয় নয়, অতিরিক্ত নয়। একটি সাধারণ সাইকেল পিওন, মূল ঘটনার সংগে যার কোন সাক্ষাত যোগাযোগ নেই, সেও যেন ছবির আনন্দ-বেদনার সমান অংশীদার। শিল্পীরাও সকলেই যথাযথ অভিনয় করেছেন নিজের নিজের চরিত্রে। কেবল গীতার মাকে শেষ দৃশ্যে অমন উদ্ভাসিত মুখে না দেখালেই যেন ভাল হত। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বউ, মেয়ের জন্য যার এঞ্জিনিয়ার পাত্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল, পরিবর্তে ওভারসিয়র পাত্রকে একটু থমথমে মুখে মেনে নিলেই যেন স্বাভাবিক হত। নতুবা দীনা পাঠক বেশ ভালই অভিনয় করেছেন। অমোল পালেকের তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক সরলতায় সকলের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। জারিনা ওয়াহাবও তাই। এ কে হাঙ্গল যে একজন অত্যন্ত নিপুণ অভিনেতা তা কোন মুহূর্তেই ভুলতে দেন না। নবাগত বিজয়েন্দও বেশ স্বাভাবিক। আর ছোট্ট রাজুর তো কথাই নেই। একটি দৃশ্যে তার অভিমানে ফুরফুরে হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটির কথা তো কোনদিনই মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। রবীন্দ্র জৈনের কথা আর সুরে ছবিতে চারখানা গানই সংগীত। গানগুলি গেয়েছেন যেসুদাস এবং হেমলতা। অমলের মুখে শেষ বিরহের গানটি কিছুটা ছন্দো-পতন ঘটায়। কেমন ফর্মুলা মাফিক মনে হয়। আর চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন ফটো-গ্রাফার কে কে মহাজন। একটি দৃশ্যের তো তুলনা নেই। পশ্চাতপটে অস্তগামী সূর্য, ফ্রেমের সামনে হেঁটে চলেছে অমোল আর জারিনা, ভালোবাসার আলোকে ওদের মুখে স্বর্গীয় সুষমা, একটু দূরে একই সরল-রেখায় ছোট্ট রাজু আপনমনে খেলতে খেলতে চলেছে—দর্শককে অন্য এক অনুভূতির সন্ধান দেয়।

শংকর দাদা/কাপুর ফিল্মস

সং থাকার যে বিপত্তি অনেক—শঙ্কর-দাদা-র (কাহিনী এস কে কাপুর) বক্তব্য তাই। কিন্তু সেই বক্তব্যের রূপায়ণে পরি-কল্পিত ঘটনা এবং তার বিন্যাস (পরিচালনা শিবু মিত্র) যে রূপ নিয়ে পর্দায় প্রতি-ফলিত হয় তা দর্শকদেরও দুর্ভোগের খোয়াড়ে নিক্ষেপ করে। ইস্টম্যানকলারে রঙীন বেশ দক্ষ ক্যামেরার (ক্যামেরাম্যান বি গুপ্ত) সহায়তায় পরিমিতিবোধহীন যেসব কাণ্ড ছবিখানিকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তা স্নায়ুকে উৎপীড়িত করে তোলে।

মিথ্যা খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পুলিস ইনসপেক্টর অমর সিং (প্রাণ) সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারে যে পন্থা অবলম্বন করে তা দেখতে দেখতে আমেরিকান ক্রাইম-উপন্যাসের কথাই মানসপটে ভেসে ওঠে। ঠিক তেমনি রাহাজানি, ছিনতাই, ক্যাবারে জুয়া, বিরলবসনা (সেন্সার থেকে কি করে ছাড় পেল!) নারীর নৃত্য। আর এই সব উপাদানকে স্বদেশী রূপ দেবার প্রয়াসে সমাবিষ্ট হয়েছে 'গরিবী হঠাও'কে সূত্র করে দীর্ঘ একটি গান (সুর সোনিক ওমি) যার দৈর্ঘ্যের একঘেয়েমী কাটানোর জন্য পর্দায় প্রতিফলিত হয় (দর্শকের স..., আবেগকে উদ্বেলিত করার জন্য) গান্ধীজী, জওহর-লাল, নেতাজী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রতিকৃতি। তাতেও রেহাই নেই। পুলিসের বড়কর্তা হিসেবে অশোককুমার দুর্বৃত্তদের পাণ্ডা বাবু শেঠকে (আনোয়ার) ধরবার একটা ফাঁদ পাতেন। তাতে তাঁর ভূমিকা এক নবাবের। আসরে বাইজীর গান নাচ, তার সংগে অশোককুমারও যোগ দেন। কত্থক ঢঙের নাচের সংগে তাঁর কণ্ঠে গানের কলিতেই পাওয়া গেল ১৯৩৬ থেকে এ পর্যন্ত চল্লিশ বছর তিনি যেসব ছবিতে অভিনয় করেছেন (আলোচ্য ছবি সমেত) সেসব ছবির নায়িকাদের নাম। আর আছে অমর সিংয়ের যমজ সন্তান রাম ও শংকর চরিত্রে দ্বৈত ভূমিকায় শশী কাপুর। বাবু শেঠকে কাহিনীর পরিশিষ্টে সদলে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত যে ধরনের অবাস্তব ঘটনা প্রবাহ গড়িয়ে যায় তা শেষ অব্দি দেখা রীতিমত ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া। নীতু সিং, হেলেনকে ব্যবহার করা হয়েছে ... আকর্ষণ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে।

শিল্পশোভন তথ্যচিত্র

এতদিন ব্যাঙ্কের লেনদেন চলত বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাঁরা ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের টাকায় বৃহৎ ইনডাস্ট্রি গড়ে তুলে নিজেদের আয়ের পথ প্রশস্ত করতেন। উনিশশো উনসত্তরে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর এই রীতির আমূল রূপান্তর ঘটেছে। ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডার এখন আর কেবলমাত্র বিগ বিজনেসের সেবায় নিয়োজিত নয়, ক্ষেত-মজুর থেকে শুরু করে সাধারণ কারিগর, ছোটখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠান, উঠতি ব্যবসায়ী সবাই এখন ব্যাঙ্কের সাহায্য পেয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন।

এই সুসংবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—যাতে আরো বেশী সংখ্যায় উপযুক্ত প্রার্থী ব্যাঙ্কের সাহায্য নিতে এগিয়ে আসে—একটি চমৎকার তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক। কুড়ি মিনিটের ছবি। নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ—অ্যান এরা অফ চেঞ্জ বা পরিবর্তনের যুগ।

এই পরিবর্তন কীভাবে এবং কত সহজে ঘটেছে তারই একটি তথ্যবহুল দলিল এই ছবিটি। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। তিনি সে দায়িত্ব তাঁর শিল্পখ্যাতি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন। ব্যাঙ্কের বিরাট কর্মকাণ্ডের সবটুকু এই স্বল্প-পরিসর ছবিতে দেখান সম্ভব নয়। তবু যেটুকু দেখান হয়েছে তা ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক।

গ্রামে-গঞ্জে কারখানায় ক্যামেরা বসিয়ে এবং যাঁরা ব্যাঙ্কের সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের ক্যামেরার সামনে হাজির করে তথ্যচিত্রের অবিকৃত মেজাজটি তুলে ধরেছেন পরিচালক। বিভিন্ন অঞ্চলের গান ও সুর ব্যবহার করে সেই সব জায়গার পরিমণ্ডল রচনায় শ্রীপত্রী যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাও মনে রাখবার মত। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজও লক্ষণীয়। ছবিটি অরো-কালারে তোলা।

—অনুজেন্দ্র ভঞ্জ

[illegible]

মৈনাক : বুঝতে পারছি। অন্য কাউকে ভালোবেসে ফেলেছ?

মীরা : বোকার মত বোলো না।

মৈনাক : (মীরাকে নকল করে) বোকার মত বোলো না! এ-ছাড়া আর কি ভাবতে পারতাম? হঠাৎ এসে বললে আমায় কিছু বলার আছে। এমনভাবে বললে মনে হল কোনো মৃত্যু-সংবাদ শোনাবে। ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি এল। আমরা দুজন গাড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে এলাম। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। দেখতে পাচ্ছি তুমি কিভাবে শুরু করবে ভেবে

উৎপল দত্ত, মহুয়া রায়চৌধুরী/**বাবুমশাই**/পরিচালনা : সলিল দত্ত

পাচ্ছ না। তোমার কষ্ট হচ্ছে। যা বলবার বলো। কথাটা বলবার মত এর চেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত হয়তো আর আসবে না। (দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ। বৃষ্টি গাড়ির সামনের কাচে মুষলধারে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। দূরে সমুদ্র আর মেঘ ঝাপসাভাবে একাকার। মৈনাক তার লম্বা-লম্বা চুলের মধ্যে আঙুলগুলোকে আলতোভাবে চালাতে-চালাতে মীরার দিকে তাকালো।)

মীরা : ভাবতে পার কি বলতে চাই? কোনো মৃত্যু-সংবাদ নয়। গতকাল রিপোর্ট পেয়েছি। আমি প্রেগনেণ্ট।

মৈনাক : এই কথাটা বলতে এত কষ্ট পাচ্ছিলে?

মীরা : না তা নয়। ওটাকে রাখতে চাই।

মৈনাক : (খুব শান্তভাবে) তুমি তো জানো-ই মীরা আমি সন্তান চাই না। তোমার সন্তান আর আমি এ-দুয়ের মধ্যে তুমি কোনো একজনকে বেছে নাও।

আমরা নিজের কানকে এতক্ষণে প্রায় বিশ্বাসই করতে পারছি না। কেমনভাবে সম্ভব হল ঠিক এতটাই? আর ঠিক এমনিভাবে—হুবহু—বাংলা কমার্শিয়াল ফিলম-এর মাপটাপ মোটামুটি সঠিক রেখেও, বিশেষ করে সে-ছবির পরিচালক যখন সত্যজিৎ রায় নন? কেননা তাঁর কোনো ছবিতেই এই সব কথাবার্তা শুনেছি বলে আমাদের মনে পড়ে না, আর মীরা ও মৈনাক, এই দুটি নাম তাঁর কোনো ছবিতেই যে নেই সে বিষয়ে আমরা অলকের স্মৃতি-সন্তরণে নিশ্চিত হয়ে যাই। কিন্তু এমন সংলাপ, এমনি অবিকল সিনেমার মাপে কেটে বসানো কথাবার্তা যা সাহিত্যের বা আরো বিশদভাবে বলতে গেলে, নাটকের নিরিখ থেকে নিজেকে স্বাধীন করে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলো—কেমনভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হল সেই যুগান্তকারী বাংলা ছবিটিকে ভুলে যাওয়া যার চিত্রনাট্যের একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ আমরা শুনতে পাচ্ছি এখানে আর সেই আশাতীত আবিষ্কারের চাপে আমাদের শ্বাসনালী যেন কেটে যাচ্ছে? আর সেই সঙ্গে একটা অস্ফুট আনন্দে, আরামে, নিশ্চিন্ত বোধে আমাদের চোখ বুজে আসছে। আমরা মনে-মনে প্রতিভার এই আকস্মিক বিস্ফোরণকে সাধুবাদ জানিয়ে বলে উঠছি, তা হলে সত্যজিৎ রায়ের বাইরেও ভারতীয় সিনেমায় এমন সংলাপ আমরা শুনতে পেলাম যা মুহূর্তের জন্যেও ভিসুয়ালস-কে ব্যাহত করলো না, যা শুধু সেইটুকুই পৌঁছে দিল আমাদের কাছে ছবি যা পারলো না, আর যাতে এই হয়তো প্রথম সিনেমা হোঁচট খেয়ে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো না? 'শেষের কবিতা'র সেই 'চরিত্রহীন' সংলাপের অত্যাচার থেকে, 'দিবারাত্রির কাব্যে'র চলচ্চিত্র-বিরোধী বাক্-প্রগলভতা পেরিয়ে আমরা যে শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হলাম, এ-কথাটা এই আকস্মিক অভিঘাতে আমরা বিদ্যুতের মত বুঝে ফেলি।

কিন্তু যেহেতু এই বৈপ্লবিক বিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়, আর তা ঘটলে সেই ল্যাণ্ডমার্ক ঘটনাটিক আমাদের [illegible] ভুলে যাওয়াও সম্ভব ছিল না—তাই আমরা আত্মবঞ্চনা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের

রঞ্জন বেলুনটিতে স্বীকৃতির ছুঁচ ফুটিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই প্রবন্ধের শুরুতে যে-চিত্রনাট্যের উদ্ধৃত অংশটি পড়তে-পড়তে আমরা চোখ-কচলে উঠে বসেছিলাম সেটি বার্গম্যান-এর 'দ্য ওয়াইলড স্ট্রবেরিজ'-এর কিছু কথাবার্তার অবিকল অনুবাদ। মীরা ও মৈনাক—এই দুটি বাঙালী নামের আড়ালে বার্গম্যানকে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মাত্র!

এখানে, যাতে আমাদের ব্লাডপ্রেসার এই আকস্মিক উদ্ঘাটনের চাপে হঠাৎ না স্বাস্থ্যহীন হিমরেখায় নেমে আসে সে-জন্যে এবার সত্যি-সত্যিই একটি বাংলা-ছবির সংলাপ-অংশ উদ্ধৃত করছি:

অণিমা : আমি চলে যাব?

শঙ্কর : না। বোসো। কথা আছে।

(অণিমা দাঁড়িয়েই থাকে। কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। শঙ্কর আর একটা সিগারেট ধরায়)

অণিমা : কি কথা?

শঙ্কর : ম্যারেজ ইজ এ নোবল ইনস্টিটিউশান।

অণিমা : তুমি কি বলতে চাও?

শঙ্কর : ভাবছি। থিংকিং অ্যালাউড। এত বড় একটা লোকের মেয়ের সঙ্গে এমন একটা লাগসই পাত্রের বিয়ে হল, স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, অনলুকার-এ ছবি উঠলো—আর দশ বছরের মধ্যে সে বিয়েতে ঘুণ ধরে গেল?

অণিমা : ও ভালবাসতো আমাকে। সত্যিই ভালবাসতো।

শঙ্কর : আর তুমি?

অণিমা : আমিও ভালোবেসেছিলাম।—

শঙ্কর : বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল বুঝি?

অণিমা : বুদ্ধি দিয়ে তো হয় না এসব জিনিস সব সময়।

ছবিটির নাম 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সন্দেহ থাকে না 'দ্য ওয়াইলড স্ট্রবেরিজ' আর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সংলাপগুলি, তাদের মেজাজের এবং ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, সমগোত্রীয়, কেননা উভয়ক্ষেত্রেই সংলাপকে একটি মূলত ভিসুয়াল মিডিয়াম-এর মাপে, চরিত্রানুযায়ী ছেঁটে নেয়া হয়েছে। সংলাপের সংহতি আর পর্যাপ্ততা কোথাও পরস্পর বিরোধী নয়। দুটি উদ্ধৃতিতেই এমন কোনো শব্দ নেই যা অহেতুক, বাড়তি কিংবা যার সঙ্গে পর্দার ছবিটির কোনো আত্মিক যোগাযোগ নেই।

এবার যে-আসল কথাটি এতক্ষণ বলি-বলি করেও বলতে পারিনি তা বুক ঠুকে বলে ফেলি। আর তা হল এই যে, যে-বিশেষ কারণে অধিকাংশ ভারতীয় ছবি 'ছায়াছবি' হয়েও 'চলচ্চিত্র' হয়ে উঠতে পারে না, 'অদ্ভুত' পর্যায়ের নাবালকত্ব

দেবিকা দাস, সমিত ভঞ্জ/নেশা/পরিচালনা : সৌমেন কুণ্ডু

কাটিয়ে 'সিনেমা'র দায়িত্ব নিতে অপারগ হয়, তা হল এসব ছবির চিত্রনাট্য, বিশেষ করে তার সংলাপের অংশ। চিত্রনাট্যটিকে মূলত একটি ঘাতপ্রতিঘাতের টানাপোড়েনে গজিয়ে-ওঠা নাটক বা গল্প হিসেবে লেখা হয়, যেখানে একটি সিচুয়েশন, ঘটনা কিংবা সংলাপের অংশকে বেশিরভাগই একটানা ফ্ল্যাটভাবে ভাবা হয়ে থাকে, ক্যামেরার পালটে-পালটে যাওয়া দৃষ্টিকোণ থেকে ভেঙে-ভেঙে নয়। এবং যে-আদর্শটা স্পষ্ট কিংবা আবছাভাবে এই চিত্রনাট্যের পিছনে কাজ করতে থাকে, সেটা নয় পুরোপুরি সাহিত্যের, কিংবা সাহিত্য আর সিনেমা মেশানো এক ধরনের 'হাঁসজারু' ব্যাপার! কিন্তু ছায়াছবিতে তখনই চলচ্চিত্রের চরিত্র-লক্ষণগুলি আমরা দেখতে পাব যখন চিত্রনাট্যটি পুরোপুরি সিনেম্যাটিক হয়ে উঠবে, অর্থাৎ যেখানে সংলাপকে শুধুমাত্র ভিসুয়ালস-এর পরিপূরক হিসেবে ভাবা হবে। সাম্প্রতিককালের যে-হিন্দি ছবিতে ব্যাপারটা ঘটেছে তা হল সাতুর 'গরম হাওয়া'।

বাংলা ছায়াছবির মেকী সাহিত্যধর্মিতার জন্যে আমরা যে-দুজনকে সরাসরি দায়ী করতে পারি তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং প্রলোভন যে কত সর্বনেশে হতে পারে তা শেষের কবিতা'র মত একটি আগাগোড়া আনসিনেম্যাটিক উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে আনার প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। 'শেষের কবিতা'র গল্পটিকে তার সংলাপের বিদ্যুৎ থেকে আলাদা করে নিলে উপন্যাসটি নিভে যায়। আর সংলাপের সঙ্গে কাহিনীটিকে সম্পৃক্ত রাখতে গেলে ওটি সিনেমার পক্ষে দুর্ধর্ষভাবে অযোগ্য হয়ে ওঠে।

এখানে আমি প্রায় ভয় পাচ্ছি যে তর্কের খাতিরে কেউ না বলে ফেলেন, কিন্তু শেকসপীয়ার—তাঁকে তো প্রায় সাহেবরা অপরিবর্তিতই রেখেছেন সিনেমায়! আর স্যার লরেনস-এর পর্দা-কাঁপানো অভিনয় কি সিনেমা নয়? ছায়াছবি নিশ্চয়ই—কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই যে ওটা এক ধরনের স্টাইলাইজড সিনেমা য সম্ভব হয়েছে শেকসপীরিয়ান নাটকের গুণে। অপরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথে সেটা সম্ভব নয় আর এরই সঙ্গে আর একটা নাম আমাদের জিভের ডগায় এসে যায় : স্যার লরেনস-এর স্ক্রীন-শেকসপীয়র তারই অবিস্মরণীয় স্টেজ-প্রোডাকশন-এর কার্বন-ক[illegible] এবং স্বভাবতই, তার সব চমক স[illegible], সিনেমার ভাষায় দুর্বল! শেকসপীয়র যেখানে সম্পূর্ণভাবে সিনেমার হয়ে উঠেছেন, তা হল কুরোসাওয়ার আশ্চর্য 'ম্যাকবেথ'। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে খোলনলচে বদলানো চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রনির্মাতারা আশা করেছিলেন সরকারের সাম্প্রতিক সেনসর-নীতির কিছুটা হয়তো অদল-বদল হবে, কিন্তু সেনসর বোর্ডের বোম্বাইয়ের আঞ্চলিক অধিকর্তা মিঃ থাপার এক বিবৃতিতে তা ধূলিসাৎ হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে সরকার-ঘোষিত নীতির এককুল পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় থেকে সেরকম কোন নির্দেশই পাননি। এর আগে শ্রীজি পি সিপ্পি এক বিবৃতিতে দাবী করেছিলেন যে, সেনসর-নীতির অদল-বদল করতে রাজী হয়েছেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা এবং তিনি এরূপ

একটি আদেশপত্র নাকি সইও করেছেন। খবরটা বোম্বাইয়ের এক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। সেই বিবৃতির জবাবেই শ্রীথাপার বর্তমান বিবৃতি। ফলে এখানকার চিত্রজগতের অবস্থা পূর্ববৎ থেকে গেল। 'ফকিরা' এবং 'জানেমন' ছবি দুখানি মুক্তি পাবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়েও ছিল। এখন তা আবার আটকে গেল। এখানকার চলচ্চিত্র-দর্শকদের আগামী কয়েক সপ্তাহ পুরনো ছবি দেখেই কাটাতে হবে।

ফিল্ম সেনসর বোর্ডের এই কড়াকড়ির আসল কারণটা বোধহয় এখানকার চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখনও পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি। ছবি থেকে তাঁরা মার-দাঙ্গার দৃশ্য বাদ দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা থেকে যাচ্ছে সেটাও কি সেনসর-কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাবে? সম্প্রতি অভিনেত্রী বিন্দু একটি নিজস্ব প্রচারপত্র প্রকাশ করে জানাতে চেয়েছেন আগামী চারখানি ছবিতে তিনি কত মনোগ্রাহী নাচ নেচেছেন। প্রচারপত্রে নাচের যে-সব ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় না সেনসর-কর্তারা ওই সব দৃশ্য খুশি মনে মেনে নেবেন। এর মধ্যে একটি ছবিই যা কিছুটা ব্যতিক্রম। ছবিটি বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষায় তোলা হচ্ছে। বিন্দু এই প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয় করছেন। ছবির নায়ক উত্তমকুমার। পরিচালনা করছেন আলো সরকার—যিনি ইতিপূর্বে 'ছোটিসি মুলাকাত' পরিচালনা করেছিলেন।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। চিত্র-প্রযোজকদের জানা উচিত যে ছবির কোন কোন দৃশ্য অথবা সিকোয়েন্স সম্পর্কে সরকারের একমাত্র আপত্তি নয়। শ্রীশুক্লা স্পষ্টই জানিয়েছেন যে হিন্দি ছবির সম্পূর্ণ চেহারাটাই পাল্টাতে হবে। হিন্দি ছবি বলতে এখন যে চিত্র মানুষের মনে ভেসে ওঠে সেটা পুরোপুরি বদলে ফেলতে হবে। সরকারের এই মনোভাব অভিনেত্রী বিন্দুর অজানা থাকলেও অন্যান্য অনেকেই তা ইতি-মধ্যে উপলব্ধি করে ফেলেছেন। যে কারণে মাদ্রাজের একটি ছবিতে একদা খল-নায়ক প্রেম চোপরা অভিনয় করছেন শাবানা আজমির পিতার চরিত্রে; এবং আর এক ভিলেন রঞ্জিৎ রূপদান করছেন 'মহর্ষি বাল্মীকী' ছবির নাম ভূমিকায়।

—সুরঞ্জন

মাইকেল মধুসূদন মহামেলায় লীলা রায় পরিচালিত সমবেত সংগীত

নতুন করে পাব বলে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাদের আলোচ্য হয়ে ওঠেন। আতিশয্যপ্রীতি প্রীতি ও নৃত্য-নাট্যের আসরে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা-চিত্রাঙ্গদার প্রাকার পেরিয়ে তাঁর সৃষ্টিতেও দৃষ্টিপাত ঘটেছে। এবং ভাগ্যের কথা, সেই দর্শন কখনো শুভদর্শন হয়ে উঠেছে।

এগার অগস্ট রবীন্দ্রসদনে মধুসূদন-মহামেলা মাইকেলের গান কবিতা নৃত্যনাট্য ও প্রহসনের আয়োজন করেছিলেন। মধুসূদনের কবিতা আর শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটকের গানের অংশে সুর বসিয়ে প্রথমে গানের আসর আরম্ভ হল। সুর সংযোগে প্রয়োজনমত মিশ্র রাগ এবং লোকসংগীতের সুর নেওয়া হয়েছিল; কোনো কোনো গানে রবীন্দ্রনাথের সুরের কিঞ্চিৎ প্রভাব অবশ্যই শ্রুতিনন্দন হয়ে উঠেছে। 'জন্মভূমির প্রতি' বা 'আত্মবিলাপ' কবিতার সুরে বরং আধুনিকতার ছোঁয়াচ সামান্য কর্ণপীড়ক। একক গানে রীণা শ্রীমলের গীতভঙ্গীটি চমৎকার, ধ্রুব বিশ্বাস ও সুব্রত রায়ের কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয়। সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর কণ্ঠ ও ভঙ্গী অত্যন্ত হৃদ্য। সম্মেলক সংগীতগুলিও প্রশংসনীয়।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

মধুসূদনের কবিতা পাঠের আসরে আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সেবকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রবোধকুমার সান্যালের ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের আবৃত্তি যথাযথ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শব্দোচ্চারণে ঝোঁক দেওয়ার ভঙ্গীটি কবিতার চরিত্রোচিত, সুশীল রায়ের স্মৃতিধৃত ভঙ্গীটি সশ্রদ্ধ।

বিরতির পর শুধু তক্তাপোশ সরে গেল। মঞ্চ সম্পূর্ণ নিরাভরণ, আলোকসম্পাত ত্রুটিপূর্ণ, নেপথ্যে শুধু বাঁশি বেহালা সেতার। সেই সীমানার মধ্যেও আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে নৃত্য-নাট্যের কী বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। নাট্যের সুরসংযোজন কীর্তনাঙ্গ আর নৃত্যে মণিপুরী ভঙ্গিমার মিশ্রণ; এই শিল্পবোধ নৃত্যনাট্যটিকে মধুসূদনের সৃষ্টির প্রতি বিশ্বস্ত রেখেছে। যথার্থ কোরিওগ্রাফি, হালকা রূপসজ্জা আর অল্পবয়সী বালিকা-দের নাট্যাভিনয় উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদযোগ্য। আর সাধুবাদ প্রাপ্য গানের আসর এবং নৃত্যনাট্যের পরিকল্পিকা পরিচালিকা লীলা রায়ের। অনস্বীকার্য যে, তিনি সাহিত্য ও সংগীতের রসজ্ঞা।

সবশেষে অনুষ্টুপ গোষ্ঠী "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনটি মঞ্চস্থ করেন। কোনো কোনো দৃশ্যে অতিনাটকীয়তা বাদ দিলে তাঁরা মূলের প্রতি অনুগত থেকেছেন।

—অপ্রতিভ বসু

সংগীত

অন্য ভূমিকায় সাগিরুদ্দিন

নিরাভরণ অর্থাৎ সারেঙ্গী বিনা সাগিরুদ্দীন খাঁ সাহেবকে কদাচ দেখা যায়। অন্তত আসরে যেখানে তাঁর ভূমিকা সক্রিয়।

জৌলুস দেখা গেল। সারেঙ্গীহীন সাগির অবশ্যই সুরহীন নয়, কারণ, তিনি তখন গান নিয়ে ব্যাপৃত। ঠিক সাধারণ মামুলি গান বাজনার আসর নয় বলেই বোধ হয় সাগির অ-সাধারণ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। প্রখ্যাত তবলিয়া শ্যামল বসুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর চিরাচরিত ভূমিকাটি বদলে নেয়া বাস্তবিক মন্দ লাগে নি। গাইলেন শ্যামকল্যাণ আর যোগে খেয়াল। উপ-সংহারে গজল। সাগিরের কণ্ঠ যে গানের উপযোগী তার প্রমাণ এর আগেও পেয়েছি। সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর অবিরত সঙ্গত করতে করতে রাগ রাগিণীর নাড়ি-নক্ষত্র যে তাঁর নখদর্পণে সেকথাও অবিদিত নয়। তবে বাঁধা ছকে চক্রবৎ পরিক্রমাতেই সাগিরুদ্দীন তৃপ্ত নন। রাগ বিস্তার তান কর্তব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি স্বাধীনতাকামী এবং যেহেতু তাঁর কল্পনাশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রশস্ত সেহেতু স্বাধীনতা অপব্যবহারের স্বেচ্ছাচারিতা হয়ে ওঠেনি। শ্যামল নাথ বাজালেন সরোদ। রাগ ইমন। আলি আকবর খাঁ তাঁর গুরু। সুতরাং বাজনার চালচলনে আলি আকবরীয় ছক-ছাঁদ থেকে থেকেই দেখা যাচ্ছিল। যাঁর জন্মদিন তিনি অর্থাৎ শ্যামল তবলা সঙ্গত করলেন—সানন্দে, স্বচ্ছন্দে। আসরে যাঁদের কথা শোনা গেল তাঁরা হলেন মুস্তাক আলি খাঁ এবং হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামলের পিতা অনাথনাথ বসু যে একটি সাংগীতিক পরিবার গড়ে দিয়ে গেছেন তার জন্যে স্বর্গতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালেন হীরুবাবু। আর শ্যামলের ছাত্ররা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষাদাতার প্রতি তাঁদের আন্তরিক স্নেহ ও সম্ভ্রম জানালেন বলে খুশী খাঁ সাহেব।

—আশিস চট্টোপাধ্যায়

রক্ষণশীল গোঁড়া পরিবারের কেউ যদি সংস্কার ভেঙে ফেলেন অথবা ভাঙতে চান কায়েমীভাবে, তখন যেমন সকলে মিলে হায় হায় করে ওঠে, ঠিক তেমনি চিৎপুরে নতুন আঙ্গিকের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার-দিকে রব উঠলো : জাত গেল, জাত গেল। বেশিদিন সেই কান্নায় লোক ভোলানো সম্ভব হয় নি। লাইট, মাইক, টেপ রেকর্ডার এসে গিয়েছিলো আগেই। তারপর এলো চলচ্চিত্রের রজতপট। এপিক অপেরা ডবল আসরে পর্দা খাটিয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে কিছু দৃশ্য দেখালেন পর্দায়, কিছু ঘটলো দুই নম্বর আসরে, বাকিটা এক নম্বরে। তিনের আ শ্চ র্য সিনক্রোনাইজেশান 'ওথেলো' পালাকে হঠাৎ জনপ্রিয় করে তুলে-ছিলো। এ থেকেই বোঝা গিয়েছিলো যাত্রার দর্শকরা বৈচিত্র্য অবশ্যই চায়। কিন্তু সে বৈচিত্র্য যেন নাটক আর অভিনয়কে অতিক্রম করে বেশি বাড়াবাড়ি না করে।

এ-মরসুমের নতুন বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে উটের আগমন। যাত্রার আসরে উট আসবে? সারা চিৎপুর জুড়ে কানাঘুষো। রক্ষণশীলরা আবার চিৎকার করতে শুরু করলেন। স্বার্থবাদীরা হলেন নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু রথের দিনে সাত সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নায়েকের ভিড় কমানো গেল না। বায়নার সঙ্গে চেকপত্রে সবাই লিখে দিলেন উটসহ। অর্থাৎ **কলিকাতা যাত্রা সমাজ-এর** নতুন পালা 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ অবশ্য উট দেখাতে হবে। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বায়না প্রমাণ করলো গণমানস এ-পরিবর্তনটাও চাইছে। অবধূতের উপন্যাসটির পালারূপ দিয়েছেন শম্ভু বাগ। নির্দেশনা : শ্যামল ঘোষ, বীর সেনের। কুন্তি সাজছেন ঝর্না চ্যাটারজি, থিরুমল তপন ভট্টাচার্য।

কেবল আসরটুকু অর্থাৎ মূল ফরমকে ঠিক রেখে যাত্রাগানের গোটা অবয়বটাই পালটে দেওয়া হচ্ছে। পালা রচনায় আসছে নতুন নতুন বিষয়বস্তু। আঙ্গিক ও প্রয়োগ ও উপস্থাপনায় আসছে মনোহারী বাহার। কাহিনীর দিক থেকে এবার কেবল 'মরুতীর্থ হিংলাজ'ই বৈচিত্র্য আনবে না, **লোকনাট্য** প্রযোজিত ও উৎপল দত্ত রচিত, পরিচালিত 'তুরুপের তাস'ও আসরে নতুন ধরনের কাহিনী। ধরনটা অনেকটাই ডিটেকটিভ কাহিনীর মতো। কিন্তু এর উৎকণ্ঠাটা অন্য জায়গায়। সি-আই-এ নামক একটি সংস্থা পৃথিবীর দুই বিখ্যাত রাজ-নীতিবিদকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে-ছিলো। ঠিক হলো যে বিমানে ও'রা আসবেন, তাতে রাখা হবে একটা টাইম বোমা। রাখার ব্যবস্থা সব ঠিক। শেষ পর্যন্ত কী যে হলো সেটাই দেখবার মতো।

কল্যাণী অপেরা চিৎপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা জগতে পড়ে গেছে সাড়া। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস **মঞ্জরী অপেরা** তাঁরা আসরে নামালেন। এ এক অভাবিত ব্যাপার। যাত্রা নিয়ে যাত্রাগান। দিল্লিতে এ-পালার অভিনয় দেখে তাবৎ রাজধানীবাসী উল্লসিত হয়েছেন। শতমুখ প্রশংসা পেয়েছেন চিৎপুরে নবাগত অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী অভিনেত্রী রুবী দত্ত। বহুরূপীর অরুণ মুখার্জিও অসম্ভব ভালো যাত্রাভিনয় করে তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন বাংলা মঞ্চের আর দুই বিখ্যাত শিল্পী কালিদাস গাঙ্গুলী ও সুপর্ণা দেবী।

আবদুল জব্বরের 'ইলিশমারির চর'কে যাত্রারূপ দিয়েছেন **প্রদীপ অপেরা**। এ-এক ভিন্ন কাহিনী, ভিন্নতরো জীবন। পটও আলাদা। এরই মধ্যে পালাটি তুমুল আলোড়ন এনেছে কলকাতায়। দর্শক-চাহিদা দিন দিন বাড়ার জন্য ও'রা কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে শুরু করেছেন এর নিয়মিত অভিনয়।

—সূত্রধার

গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত গান বাজনা বেআইনিভাবে ক্যাসেট টেপে রূপান্তরিত করে বিক্রি করার অভিযোগে আনন্দ-এর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যানগরের ভূপিন্দর প্যাটেল ও বীরেশ প্যাটেলকে কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তিন মাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রামোফোন কোম্পানির ওইসব গান ও বাজনা টেপবন্ধ করে 'কল অব দি ফ্লুট' নাম দিয়ে বিক্রি করতেন।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাশুল
ত্রিপুরায় ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাপাদিত্য রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

সাধনা
দশন
সাধনা
টুথ পেষ্ট
সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
শাখা ভারতের সর্বত্র
Sadhana

কি তাড়াতাড়ি
বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!
ফিনিট
ছড়ান বাড়ীতে
নিয়মিতভাবে,
বাড়ী পোকামাকড়
মুক্ত করুন, নিরাপদ
অথচ নিশ্চিতভাবে!
ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা'
ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
উড়ন্ত পোকামাকড়—
বুকেহাঁটা পোকামাকড়—
পড়ে নেবেন।
ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন।
CMHPF-3-244-Ben
FINIT
HOUSEHOLD
insecticide
FOR FLYING—CRAWLING INSECTS
POISON
HP
NET CONTENTS 1 LITRE
বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী
ফিনিট বহু উদ্দেশ্যসাধক
কীটনাশক—মাছি, মশা,
আরশোলা, ছারপোকার মত সব
পোকামাকড় মারবার পক্ষে
যথেষ্ট শক্তিশালী!
অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর
কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক ফিনিট,
মশা, মাছি, আরশোলা,
ছারপোকা:
ফিনিট ছড়ান,
ওদের খতম করুন!
নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!
HP
হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

বাংলা সাহিত্যে যে কটি বই চিরকালের কিশোর চিত্তকে আনন্দ দিয়ে এসেছে, আজও দিচ্ছে এবং পরেও দেবে তারই একটি—

সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর

হিন্দুস্থানী উপকথা

নবসাজে সেই পুরাতন আনন্দ

॥ দশ টাকা ॥

শিশুসাহিত্যসম্রাট দক্ষিণারঞ্জনের

দাদামশায়ের থলে ৯৲

ঠাকুরমার ঝুলি ৯৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিভূতি গল্পসমগ্র

১১২ খানি বিভিন্ন স্বাদের গল্পের সংকলন।

প্রথম খণ্ড ৪০৲

বিভূতি জন্মপক্ষে (২রা সেপ্টেম্বর—১৫ই সেপ্টেম্বর) এই বইটিও বিশেষ কমিশনে দেওয়া হইবে।

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

(১ম খণ্ড) ২০৲

জরাসন্ধের

চলতি মেঘের ছায়া ৮৲

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের

ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ৭৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কালো হাত ১২৲ লালুভুলু ৭৲ অহল্যাঘুম ৭৲

॥ নতুন বই ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র

রজনী শেষের শেষ তারা ৭৲

নচিকেতার

জাতিস্মর ও মৃতের আবির্ভাব ১২৲

জরাসন্ধের

তামসী ১৫৲

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

রেসকোর্স ৯৲

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ :—

তারাশঙ্কর রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড ২০৲

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড ২০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র

অশান্ত ঘূর্ণি (৩য় পর্ব) ১২৲

নারায়ণ সান্যালের

অবাক পৃথিবী ৯৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) ৩০৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ | ৩৪-৩৪৯২

৪৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ | ৩৪-৮৭৯১

(সি ৩৮৮১০)

সূচীপত্র

EXOTICA
Lakme Luxur
চলমান কালের মত
সারাদিন রাতে সুরভিত...
রাশি রাশি ফুলের সৌরভ ভেসে চলে...
আপনার দেহে প্রতি পলে জেগে চলে...
এক্সোটিকা
লাক্‌মে ট্যাল্ক
ল্যাকমে
daCunha/LE/S E BEN.

সূচীপত্র

for the ultimate in stereo music
Solid State Stereo
COSMIC CO-60
DELUXE MK-II
STEREO AMPLIFIER
YOU KNOW THE NAME, NOW KNOW THE SOUND.
Distributors: COSMIC ELECTRONICS Andheri, Bombay 400 093.
CR-82

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : সনৎ কর

প্রচ্ছদ পরিচিতি : (১৯"×১৯" রঙীন ইণ্টাগ্লিও ছাপের ছবি 'গ্রাফিক্স') —সনৎ কর এই ছবিতে একটা নির্দ্বন্দ্ব প্রশান্তির ধ্যান করেছেন। নীলচে ধূসর রঙের মধ্যে হলুদ রঙের ছিট ছিট দেওয়া পটভূমি। একটা খাড়া আর অনুভূমি রেখা মধ্যস্থলে এসে পরস্পরকে ছেদ করেছে। অনুভূমি রেখার দুইদিকে দুটি হাত। ফুল আঁকা ডান হাত বরাভয়ের প্রতীক, বাম হাতে সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে ফুল। অনুভূমি রেখার নিম্নাংশে সুন্দর কাজ করা জামা, উপরে চোখ। লাল আর কালচে নীল যেন ধূসর বর্ণের দোহার দিয়েছে। রেখা ব্যবহারের সংযম লক্ষ্যণীয়।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪৫ সংখ্যা
শনিবার ১৯ ভাদ্র ১৩৮৩

এই জনজলতরঙ্গ !

ভারতের জনসংখ্যা স্বাধীনতার এই উনত্রিশ বছরের মধ্যে পঁচিশ কোটি বেড়েছে। পূর্বতন ত্রিশ কোটির সঙ্গে নতুন পঁচিশ কোটি যুক্ত হয়ে মোট অঙ্ক যা দাঁড়ায়, সেটা জাতির পক্ষে দুঃসহ ভারাক্রান্ত একটা অদৃষ্টের পরিচয়। প্রশ্ন করা চলে, খুব আন্তরিক আগ্রহের প্রেরণা নিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধির পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পেলেও কতখানি বৃদ্ধি পেতে পারে? গত উনত্রিশ বছরের অর্থনীতি ও কৃষির উন্নতির হিসাব ধরলে এই সত্য খুবই স্পষ্ট করে ধরা পড়বে যে, প্রভূত না হলেও এটা আঙ্কিক হিসাবে সামান্য উন্নতি নয়। কিন্তু জাতীয় অভিজ্ঞতার একটি নিদারুণ সত্য এই যে, অতিরিক্ত পঁচিশ কোটি মানুষের খাওয়া-পরার স্বাভাবিক দাবিটা ক্ষুধার্ত হয়ে অতিরিক্ত উৎপাদনের সবটুকু তো খেয়েই ফেলেছে, অধিকন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা কালের অবনত মানের কৃষি এবং শিল্পের উৎপাদনী মাত্রাকেও অনেকটা খেয়েছে। সংক্ষেপে বলা চলে, জন-জীবনের সাধারণ সম্বলের ভান্ডারে এমনই টান পড়েছে যে, জাতির পক্ষে সেটা জৈব অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখবার আশা বিচলিত করবার মতো একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত খাঁটি এবং নিখুঁত বাস্তব সত্যের অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ভারতের জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, সে-হারে জনজীবনের খাওয়া-পরার ন্যূনতম সম্বল কোন্ প্রয়াসে ও অধ্যবসায়ের চরম উৎকর্ষের দ্বারাও সাধিত হবার নয়। ভারতীয় জীবনের সম্মুখে খুবই কঠোর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—এই প্রচন্ড জনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? জন্মশাসনের পরি-কল্পনাকে কার্যকর প্রসন্নতায় সার্থক করে তোলবার কর্তব্যে ভারত যে বিলম্ব করেছে, সেটা আসন্ন ও দূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তার একটি করুণ অযোগ্যতা ও অসতর্কতার প্রমাণ। যথা-কালে অর্থাৎ পঁচিশ বছর আগে পরিকল্পনা করে যদি জন্মহারের হাজারে পঁচিশ কমিয়ে আনবার নীতি বাস্তবায়িত করা হতো, তবে সমস্যা আজ সংকটের প্রকারে ও রূপে দেখা দিত না।

কেন্দ্রীয় সরকার বার-বার ঘোষণা করে এই কথা বলছেন যে, বাধ্যতা নয়, বাধ্যতা নেই। কাউকে জোর করে সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখতে বাধ্য করা হবে না। মনে হয়, দিল্লীতে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের উগ্র বিক্ষোভের কান্ড দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-রীতির সুর এবং স্বর নরম হয়ে গিয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন যে, রাজ্যগুলি নিজের নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখতে নাগরিকের উপর বাধ্যতা আরোপ করতে পারবেন। সংবাদে দেখা যায়, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব বাধ্যতা আরোপ করবার নীতি গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে জন্মশাসনের কর্তব্যে বাধ্যতার নীতি বিহিত করতে কী অসুবিধে ছিল, বুঝতে পারা যায় না। বাধ্যতার নীতি কিংবা রীতি বিহিত করবার ও সার্থক বাস্তবতায় সত্য করে তোলবার ব্যবহারিক দুরূহতা অবশ্যই আছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ব্যক্তির জীবনে সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখবার কর্তব্য সম্বন্ধে বাধ্যতার নির্দেশ না থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জন্মসংখ্যার এমনতর হ্রাস কখনই সম্ভব হবে না, যেটা খাদ্যাভাবের ও দুরামূল্যবৃদ্ধির পীড়ন থেকে জাতীয় অদৃষ্টের মুক্তি ও স্বস্তির ব্যাপার হবে। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার প্রথা বস্তুত বাধ্যতার প্রয়োগের ফলে সফল হতে পেরেছে। কিন্তু বাধ্যতা বলতে শুধু নির্বীজক অস্ত্রোপচার মেনে নিতে বাধ্য হওয়া বোঝায় না। রাজ্য সরকার কোনরকমের বাধ্যতার বিধি প্রচলিত করেননি।

বিপুল প্রকারের জনসংখ্যাভারে অভিভূত ভারতীয় জীবনের দুঃখটা নিতান্ত অর্থনীতিক ক্লেশের কিংবা নিছক খাদ্যাভাবের নয়। বড় রকমের দার্শনিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিচারের প্রয়োজন হয় না, সহজ বুদ্ধিতে এই সত্য অধিগত হয় যে, ভারতের জীবনে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি এবং জন্মহারের প্রবলতায় ভারতীয় জাতির চরিত্র প্রতিভা এবং সাংস্কৃতিক যোগ্যতারও সৌষ্ঠব বিপন্ন হয়েছে। জনভারাক্রান্ত জাতির ভাব অনুভব ও চেতনার ঘরে যথোচিত মহত্ত্ব এবং মমতা কখনও বাস করতে পারে না। কেউ কখনও সমীক্ষা করেনি, তাই কোন হিসাব এবং পরিসংখ্যানও নেই যে, নাগরিকের সাধারণ সৌজন্য কর্তব্যবোধ ও সদাচারের মান আগের তুলনায় অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের তুলনায় কতটা অবনত হয়েছে। নিজের এবং অপরের জীবনের প্রতি মমতার ও শ্রদ্ধার জাগ্রত বোধ একধরনের জড়তায় নিরেট হয়ে যায়, যদি জীবনের পরি-বেশের মধ্যে জনসংখ্যার প্রাচুর্য কিলবিল করে। মানুষের সাধারণ আচরণ ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক সত্য এই যে, সে অপরের প্রতি মননশীল হতে ও সৌজন্য দেখাতে চায়। কিন্তু ট্রামে-বাসে ও পথে-ঘাটে প্রবল ভিড়ের মধ্যে পড়ে এই সৌজন্য ও মমতার মান কি কলকাতার নাগরিকের পক্ষে সহজে রক্ষা করা সম্ভব হয়? এই অবস্থায় নাগরিকের আচরণে উত্তেজনা ও বিকারই বেশী পরিস্ফুট হয়, যেটা সভ্য জীবনের আদর্শ থেকে একটি বিচ্যুতিরই ঘটনা।

মনস্বীদের বিচার ও চিন্তার একটি উপলব্ধির বাণী এই যে, 'ভিড়' একটি ভয়। সাধারণ মানুষ তার সাধারণ অবস্থায় ও পরিবেশে নিষ্ঠুর হয় না, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে পড়ে সে অনেক নিষ্ঠুরতার কাজ করতে বাধ্য হয়। ধর্মের নামে কিংবা যে-কোন ভাবো-ন্মাদনার নামে বিপুল ভিড়ের সমাবেশ মানুষকে দলিত-মথিত করে। জনসংখ্যার বিপুলতায় অভিভূত জাতি কিংবা দেশও একটি বিরাট ভিড়, তার সদাচারের হানি ঘটিয়ে থাকে। শুধু খাদ্য-সম্বল বাঁচাবার প্রয়োজনে নয়, সাংস্কৃতিক অবনতির ভয়াবহ সম্ভাবনা পরিহার করবার জন্যও জন্মশাসনের কর্তব্যে ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল করবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হতে পারে।

এক নজরে

বলহরি ডাক্তার

নাম-করা কার্ডিওলজিস্ট বলহরি বিশ্বাস এসেছিলেন। হৃদযন্ত্রের গতিপ্রকৃতি পরীক্ষা করতে নয়, এসেছিলেন সেকেলে নাম বলহরির বদলে এখন থেকে তিনি একেলে অভিজিৎ নামে পরিচিত হবেন, এই জরুরী তথ্যটি সংবাদপত্রে ছাপানোর কাজে সহায়তা চাইতে। একখানি বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন দপ্তরে কর্মনিরত কোন বন্ধুর নামে চিঠি লিখে দিলাম। প্রীত হয়ে বলহরি চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। বাধা দিয়ে বললাম, চলে যেও না ডাক্তার। হঠাৎ পিতৃদত্ত নামটা পালটানোর প্রয়োজন হল কেন, সেই খবরটা একটু শুনতে চাই যে!

বলহরি বসলেন এবং বললেন, নাম না পালটালে যে পেশাই পালটাতে হবে দাদা! ডাক্তারের নাম বলহরি, এ শুনলেই রুগীরা আঁতকে ওঠেন। বাড়ির লোকেরা বলেন, এই মুখপোড়া অলক্ষুণে ডাক্তারকে ঘরে ঢুকিও না। ঢোকালেই রুগীকে হরিবোল দিয়ে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে হবে। বললাম, এ তোমার অনুমান, না সত্যি সত্যি কারো মুখে শুনেছ? বলহরি বললেন, কারো? হর-হামেশাই তো শুনেছি। এ জায়গায় ছেলে-বুড়োর তফাত নেই, সবারই এক রা। বেশী কি? নিজে ডাক্তার হয়ে প্রাণকেষ্ট বাগচী পর্যন্ত তাঁর ছেলে গোপীকে বলেছিলেন, ওঁর বদলে হারাধন ডাক্তারকে ডেকো এখন থেকে। ভদ্রলোকের নামটা বড্ড ওমিনাস, অর্থাৎ কিনা দুর্লক্ষণযুক্ত!

বলহরি চলে গেলেন। মানুষের জীবনে কারণে-অকারণে যে কতরকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তা ভেবে যেমন কৌতুক বোধ হতে লাগল, তেমনি দুঃখও হল একটু। বলহরির বাবা ছিলেন মহা হরিভক্ত, অহরহ ইষ্টনাম স্মরণের সুযোগ হবে বলে ছেলের নাম দিয়েছিলেন তিনি বলহরি। কিন্তু সেই নামই আজ হয়েছে ছেলের করে খাওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়। অগত্যা তা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন ক্রোরী। শুধু তাই নয়, গুরুজনদের রীতিমত দায়ী করছেন তিনি এজন্যে। বলছেন, না ভেবে-চিন্তে ছেলে-মেয়ের নামকরণ করলে তাদের কেরিয়ার স্রেফ নষ্ট হতে পারে, তাই না দাদা? ধরুন রবীন্দ্রনাথের নাম যদি হত গোবর্ধন, সুভাষচন্দ্রের যদি হত হরগোবিন্দ, তা হলে তাঁদের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববন্দিত হতে অসুবিধা হত!

অকাট্য না হলেও, বলহরির বক্তব্যটা অপ্রণিধানযোগ্য মনে হল না। তবু বললাম, কি জান ভাই, পৃথিবীর দুই মহাকবি দুরকম অভিমত দিয়ে গেছেন এ সম্বন্ধে। গোলাপকে যে নামেই ডাক, তার গন্ধ সমান মধুর থাকবে। রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন, নাম বস্তুটা নাম মাত্র নয়, ওর দ্যুতিতে নামের অধিকারী যে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অবশ্যই কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উর্মিলার নাম মান্ডবী বা শ্রুতকীর্তি হলে, উর্মিলার মাধুর্যময় চরিত্রটির কিছুই ফুটত না তাঁর নামে। আবার দ্রৌপদীর নাম উর্মিলা হলেও তাঁর দীপ্ত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর সামান্যই থাকত সে নামে। তার মানে ব্যাপারটার পক্ষেও বলা যায়, বলা যায় বিপক্ষেও। তবে হ্যাঁ, তোমার এ কথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথকে অন্য কোন নামেই আর মানাত না। সত্যিই সার্থকনামা পুরুষ তিনি!

ভাবতে ভাবতে নামকরণে সেকাল ও একালের দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে যে মৌল পার্থক্যগুলো, তার দিকে দৃষ্টি পড়ল। সাবেকী নামের বেশির ভাগই হত ঠাকুর-দেবতা ছোঁয়া অথবা পুরাণ-ঘেঁষা। মধু-সূদন, দীনবন্ধু, হরিহর, যদুনাথ, গোলক-পতি, এইসব নামের ছিল প্রভূত প্রতিপত্তি। তারপর হল সেকুলার বা লৌকিক নামের চল এবং তখন চলল প্রভাতকুসুম, চিত্তরঞ্জন, স্বদেশভূষণ, আরো অনেক নাম। তারপর এল মধ্যপদলোপী নামের হিড়িক। পদ, চরণ, কুমার, রঞ্জন, ভূষণ, চন্দ্র সব বাতিল হয়ে গেল। হরি দে, কানাই দাস, নিত্য গাঙ্গুলী, বিষ্ণু গুপ্ত, এই শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত নামই যুগসম্মত বলে গণ্য হল। মেয়েদের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণভামিনী, হরকামিনী, মনোরথ-মোহিনীরা রূপ বদল করে হলেন নীলাব্জ-নয়নী, শরৎকুমারী, সুভাষিণী। এঁদের পরের ধাপে এলেন শিপ্রা, রেবা, বিদিশা, অনীতারা, ছেলেদের মত যাঁরা একই রকম মধ্যপদলোপী।

দেখলাম বলহরিও মাঝখানের ভারসাম্য রক্ষাকারী কুমার, পদ, চন্দ্র প্রভৃতি পদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ন্যাড়া বোঁচা অভিজিৎ নামটাই আধুনিকতাসম্মত হবে মনে করে নির্দ্বিধায় নির্বাচন করেছেন। কালরুচি যেদিকে, বলহরি তার বিপরীত দিকে যাবেন কেন? তবে এখানেও ভাববার কথা আছে একটু। যাঁদের নাম আগে থেকে হিসাব করে রাখা হয় নি, তাঁরা মাঝের পদটি বাতিল করবেন কি করে? কামিনী-কুমার, প্রীতিভূষণ, সবিতাব্রত শ্রেণীর নাম যাঁদের, তাঁরা মধ্যপদটি ছাঁটাই করলে, নাম দেখে নারী পুরুষ বোঝা যাবে কি করে? পূজনীয় মাস্টারমশাই যদি কুমার বর্জন করে শুধু সুনীতি চাটুজ্যে হতেন, তা হলে আগামী দিনে হয়তো ডক্টরেটের গবেষকরা ফাঁপরে পড়তেন, এই প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক করতে না পেরে। এ ছাড়া অসুবিধেজনক নামও আছে। ভূতনাথ এবং পশুপতি কি যথাক্রমে নাথ ও পতি বর্জন করে ভদ্র-সমাজে বেরতে পারবেন? ছাড়পত্র পাবেন কি তাঁরা বিয়ের বাজারে?

বুঝতেই পারছেন বলহরি বিচিত্র চিন্তাই জাগিয়ে দিয়ে গেছেন আমার মগজে। কিন্তু সব চেয়ে বড় যে বক্তব্যটা তুলে ধরেছিলেন তিনি, তার কথাই এখনো বলা হয় নি। তিনি বলেন, শব সংকারের সঙ্গে জড়িত হওয়ার দরুন বলহরি কথাটা তার শাব্দিক ব্যঞ্জনা হারিয়েছে। গোটা কথাটাই যেন হয়ে গেছে প্রোফেন, অর্থাৎ মহিমাভ্রষ্ট, অপাঙক্তেয়। প্রতিদিনের সংসারে জীবন্ত মানুষের লেনদেনে তাই আর ওটা চলে না। ওর সঙ্গে মৃত্যু, শবযাত্রা, শ্মশান, মৃতদেহ সংকার, অনেক কিছুর সংসর্গ-জনিত স্মৃতি জড়িয়ে গেছে। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, একটা ত্রাস, একটা বিমর্ষতা, একটা রিক্ত বিবর্ণ শূন্যতার বোধ চেতনাকে সত্যিই অধিকার করে ঐ শব্দটা শুনলে। শহরের পথে চলতে চলতে বল হরি হরি বোল আওয়াজে চমকে না ওঠেন কে? কাংস্যকণ্ঠে কীর্তনের সঙ্গে এই আওয়াজ মিলিত হয়ে রাত্রের অন্ধকারে কি রকম শোনায়, তা কেওড়াতলার অদূরবর্তী পল্লীতে বাস করার সময় একদা আমি ভাল করেই টের পেয়েছি। ঐ আওয়াজে না দেখানো হয় মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা, না [illegible] হয় জীবিতের প্রতি সুবিচার!

খৃষ্টান, মুসলমান, পারসী, ইহুদী, নানা সম্প্রদায়ের শবযাত্রায় দেখেছি আবৃত মৃতদেহ চলেছে গাড়িতে বা মানুষের কাঁধে বাহিত হয়ে। আগেপিছে চলেছে তার পরিচ্ছন্ন পোশাকে আত্মীয়বন্ধু ও চেনা-জানার মৌন মিছিল। এই তো মানায় মৃত্যুর মত মহান পরিসমাপ্তির সঙ্গে। বাজখাই বল হরি হরি বোল, আবার বোল, শব্দ করতে করতে কেউ পাজামা, কেউ ধুতি, কেউ প্যান্ট পরে, যেভাবে পাড়ার শুভার্থী বলে কথিত নিষ্কর্মা ছেলেরা আজকাল আমাদের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়, তা দেখে তো মরতেও ভরসা হয় না। তা ছাড়া শুনেছি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা লাগায় ওরা, গৃহস্থের ঘাড় ভেঙে বহন ও সংকারের দক্ষিণা দরাজ হাতে আদায় করে! শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত শব-পোড়া মড়াদাহের দল বোধ হয় এরাই! এদের শ্রীমুখনিঃসৃত বল হরি আওয়াজের প্রতি বলহরি ডাক্তার কেন, যে-কোন রুচিবান মানুষই তাই বীতস্পৃহ না হয়ে পারেন কি কখনো?

বৈদেশিকী

ভাগ্যের খেলা

বরাত বটে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের। দু বছর আগে কে আর তাঁকে চিনতো? দেশেই লোকে তাঁর নাম জানতো না তা বিদেশে। কপাল খুললো হঠাৎ তাঁর যখন উপরাষ্ট্রপতি অ্যাগনিউ কেলেঙ্কারির পাঁকে অতলে তলিয়ে যেতে সেই খালি কেদারায় তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলেন তখনকার রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন। তাঁদের দুজনের কেউই অবিশ্যি জানতেন না ফোর্ডের ওপরে ওঠার সবে শুরু। তিনি উপরাষ্ট্রপতির গদিতে জমিয়ে বসতে না বসতে রাষ্ট্রপতির তখ্‌ত থেকে মুখ থুবড়ে নিচে পড়লেন নিক্সন নিজে। ঠেলে তাঁকে কেউ ফেলে দেয়নি, ওয়াটারগেটে অপকর্মের যে খাল তিনি কেটেছিলেন তিনি ডুবেছিলেন তাতেই। আর সেই খাল সাঁতরেই মার্কিন রাষ্ট্রপতিভবন হোয়াইট হাউসের ঘাটে এসে উঠলেন জেরাল্ড ফোর্ড। এ যেন একটি খেলাও না খেলে খালি ওয়াকওভার পেয়ে শীল্ড জেতা। নির্বাচনের ঝুঁকি আদৌ না নিয়ে এভাবে ধাপে ধাপে প্রশাসনের চূড়োয় ওঠার কোনও নজির মার্কিন মুল্লুকের দুশো বছরের ইতিহাসে নেই।

আরও একটা নজির প্রায় খাড়া করে ফেলেছিলেন ফোর্ড কানসাস সিটিতে। রিপাবলিকান দলের বৈঠক এবারে সেখানেই বসেছিল। সে বৈঠক বসে চার বছর অন্তর। দলের কাজকর্মের হিসেবনিকেশ আর তার নীতি ঠিক করা হয় ওই বৈঠকেই। কিন্তু তার আসল কাজ যার জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ লোক তার দিকে তাকিয়ে থাকে তা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের উমেদার বাছাই করা। সে নির্বাচন আমেরিকায় হয় চার বছর পরে পরে, দলের বৈঠকও বসে তার সঙ্গে তাল রেখে। ডেমোক্র্যাটদের বৈঠক আগেই হয়ে গেছে নিউ ইয়র্ক শহরে জুলাই মাসে। রিপাবলিকান দলের বৈঠক বসেছিল আগস্টের মাঝামাঝি মিসৌরির কানসাস সিটিতে। দলের তরফ থেকে রাষ্ট্রপতির গদির জন্যে লড়তে তৈরি ছিলেন দুজন—একজন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড, আরেকজন কালিফোর্নিয়ার গভর্নর রোনাল্ড রীগান। এঁদের মধ্যে কাকে রিপাবলিকান দলের হয়ে খাড়া করানো যায় তা নিয়ে বৈঠকে ছিল দারুণ মতান্তর। পাল্লাটা যে শেষ পর্যন্ত কোন দিকে ঝুঁকবে আগে থেকে সঠিক আঁচ করা যায়নি। হেরেছেন অবিশ্যি রীগানই। কিন্তু তাতে তাঁর কোনো অপযশ নেই। ফোর্ডকে তিনি প্রায় কাত করে এনেছিলেন।

রীগান যদি জিততেন তা হলে আমেরিকার একটা চুরাশী বছরের পুরোনো নজির ভেঙে যেত। দুবার নির্বাচনে দাঁড়াতে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কোনো বাধা নেই—আগে তো যতবার খুশী দাঁড়াতে পারতেন। সংবিধান পালটে এখন কাউকে আর দুবারের বেশী রাষ্ট্রপতি হতে দেওয়া হয় না। দেখা গেছে রাষ্ট্রপতি একবারের মেয়াদ ফুরোবার পর আর একবার দাঁড়াতে চান তা হলে দল তাতে আপত্তি করে না। ভোটাররা কি করবে সে অবিশ্যি আলাদা কথা। কিন্তু দল অন্তত চাইলেই তাঁকে ছাড়পত্তর দেয়। চেস্টার অ্যালেন আর্থারের পর কোনও দলই আর নিজের দলের রাষ্ট্রপতিকে দুবার দাঁড়াতে দিতে বাধা দেয়নি। রিপাবলিকান দলের অনেকের এবার ইচ্ছে ছিল সাবেক রেওয়াজ ভেঙে দেওয়া। ফোর্ড বিরোধীরা দলে বেশ ভারী ছিল। তারা যদি তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবনে ফিরে আসার পয়লা বেড়াই না ডিঙোতে দিত তা হলে পুরোনো নজির ভাঙতো বটে কিন্তু লোকে বিশেষ অবাক হতো না—না ঘরে না বাইরে।

হালে যাঁরা রিপাবলিকান দলের ঝাণ্ডা উড়িয়েছেন হোয়াইট হাউসে তাঁদের সঙ্গে জেরাল্ড ফোর্ডের কোনো তুলনাই চলে না—এমন কী যাঁকে কলঙ্কের ডালি মাথায় বয়ে অকালে মাথা হেঁট করে বিদেয় নিতে হয়েছে রাজ্যপাট ফোর্ডের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গেও নয়। দলে নিক্সনের ছিল বেজায় খাতির। চার বছর আগের বৈঠকে তিনি ধরতে গেলে সব ভোটই পেয়েছিলেন, বিপক্ষে পড়েছিল কুল্লে একটি ভোট। আর আইজেনহাওয়ার বলতে তো আমেরিকানরা অজ্ঞান হতো। দলে রোনাল্ড রীগানেরও বেশ প্রতিপত্তি। তাঁর চেলাচামুণ্ডাও দলে ফোর্ডের চাইতে অনেক বেশী। দলের ধাত তিনি যত বোঝেন তত ফোর্ড বোঝেন না। তবুও যে রীগান হেরে গেলেন জিতলেন ফোর্ড তার কারণ হচ্ছে ফোর্ড এখনও গদিতে বসে রয়েছেন। যাঁর হাতে ক্ষমতা লোকে তাঁর দিকে ঢলবে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া ফোর্ড হারলে আর একটা কেলেঙ্কারি হতো। তা হলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি থাকতেন এমন একজন যাঁর কাছে গদি পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা—নির্বাচনের ঝামেলা না পুইয়ে তিনি তা পেয়েছেন। এর ওপর দলের নির্বাচনে হারলে প্রমাণ হতো দলেরও তাঁর ওপর আস্থা নেই।

ঠিক কী ভেবে দলের লোকেরা তাঁকেই ডেমোক্র্যাটদের জিমি কার্টারের সঙ্গে লড়তে বুঝি তাঁর ভাগ্যের খেলা, তাঁর বরাতের জোর। সে জোর এদ্দিন পর্যন্ত টিঁকে এসেছে। নইলে তাঁর গণেশ তো উলটে পড়েছিল কানসাস সিটির বৈঠকে। সে নির্বাচনে জিততে হলে দরকার ছিল ১১৩০ ভোটের। অত ভোট তিনি পাবেন কিনা তা নিয়ে অনেকের বেশ সন্দেহ ছিল। কেউ কেউ অবিশ্যি বলেছিলেন পয়লা দফায় নিষ্পত্তি হবে না—অত ভোট ফোর্ডও পাবেন না, রীগানও নয়। তা হলে আবার এক প্রস্থ নির্বাচন করতে হতো। তা হলে আরও প্রার্থী জুটতো, হয়তো ফোর্ডের আশা ভরসা সব ফরসা হয়ে যেতো। তা অবিশ্যি হয়নি। কেঁদে ককিয়ে জিতে গেছেন ফোর্ড এ যাত্রা। ১১৩০-এর গণ্ডি দুজনেই পার হয়েছিলেন তবে ফোর্ডের বাকসতে পড়েছিল রীগানের চেয়ে মোটে ১১৭টা বেশী ভোট। তবে ভোট বেশীই হোক আর কমই হোক জিত জিতই। রিপাবলিকান দল এখন তাঁকে সামনে নিয়েই লড়তে নামছে ২ নভেম্বরের নির্বাচনী আসরে।

ভাগ্য যাঁকে এতটা তুলেছে সে কি তাঁকে শেষ পর্যন্ত ফেলে দেবে ইতিহাসের আস্তা-কুড়ে এই প্রশ্নই এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। ভোটারের মর্জি ভগবানও জানেন না মানুষ তো কোন্ ছার। কী ভেবে তারা যে ভোট দেয় আর কী ভেবে দেয় না সে একটা বিরাট হেঁয়ালি। তার উত্তর নভেম্বরের আগে আমেরিকায় জানা যাবে না। রিপাবলিকান দলে ফাটল ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। তবুও ফোর্ড যে আকাশে আঁকশি দিতে চলেছেন এমন কথা বলা যাচ্ছে না। এক নম্বর, তাঁকে লড়তে হচ্ছে কার্টারের সঙ্গে যিনি কেনেডিও নন, জনসনও নন। কার্টারের তেমন কিছু প্রতিপত্তি মার্কিন মুল্লুকে নেই। তিনি হেরে গেলে সেটা চমকে ওঠার মতো ঘটনা হবে না। দু নম্বর, দু বছর রাষ্ট্রপতি হয়ে এমন কিছু ফোর্ড করেননি যাতে তাঁকে বিদায় করা যেতে পারে। কার্টার সাধারণ ঘরের ছেলে, তিনিও তাই। কার্টার সৎ লোক, ফোর্ডও অসৎ নন। তা হলে তাঁকে একটা চার বছরের পুরো মেয়াদ রাষ্ট্রপতি করে বাজিয়ে দেখতে দোষ কী এ যুক্তির কোনও জবাব নেই। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ একটিই—কেন তিনি নিক্সনকে মাপ করতে গেলেন? আমেরিকানদের কাছে এটাও একটা কেলেঙ্কারি। কিন্তু চাঁদেও তো কলঙ্ক আছে। তাই বলে চাঁদকে তো কেউ বরবাদ করতে চায় না।

৪৭,১৬২ জন লোক আমাদের বিনামূল্যে 'দামটা যাচাই করুন, গুণটা পরীক্ষা করুন' সুযোগের জন্যে আমাদের কাছে লিখেছেন (এখানে আবার ছাপানো বিজ্ঞাপনটি দেখুন)। হাজার হাজার লোক পয়সা দিয়ে কিনেই পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। মার্চে পয়েন্টের দশ লক্ষ প্যাক নিঃশেষ হয়ে যায়—এই বিজ্ঞাপন প্রথম ছাপানর ছ'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে। কেন? আমরা এখনও চাই আপনি নিজেই এর উত্তর দিন।

দশ লক্ষেরও বেশী প্যাক বিক্রী হয়েছে ছ'মাসেরও কম সময়ে!

Point Point Point Point Point

for sparkling white and brilliant colour washes

পয়েন্ট

দামটা যাচাই করুন।
গুণটা পরীক্ষা করুন।

পয়েন্ট প্যাক দাম	৭৫০ গ্রাম	৫৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
	৮.৭০ টাঃ	৬.৬৬ টাঃ	২.৫৮ টাঃ
(স্থানীয় কর আলাদা)			

আপনি নিজেই দেখুন।

বাঙ্গালোর গভর্নমেন্ট সোপ ফ্যাক্টরীর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বিক্রেতা :

বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট

বিষ্ণু দে

একাই আজকে শিল্পী সেজান এঁকেছেন শতাধিক
যেন বা শৈব কৈলাসিত প্রিয় পাহাড়—
কৌণিকে নীলে নানান রূপের পাহাড়কে বারবার—
সন্ত ভিক্তোয়ার!
(কিছুতে সে মন তৃপ্তি পায় নি সে কথাও বটে ঠিক।)

আগাইয়া তাই ভাবে : পলা কিবা দেখতেন?
আর আঁকতেন কার রূপ শতবার?

পূর্বভারতে শ্রাবণ আকাশে স্নাত শত শত শিলা
এই ত্রিকূটের প্রাচীন পাথরে নানান খোদাই চূড়ায়
আর গহ্বরে আর বিস্তারে ব্যাপ্তিতে
কোন না মাইল দশেক ঘিরেই ঘুরেও—
এই কাছ থেকে, এই আরো দূরে
আলোয়-ছায়ায় কঠিন পাথরে আকাশে জমাট জ্যোতিতে।

দৈব নীরদে যেন পুরুষের গড়া-আঁকা ঘুরে-ঘুরে!

তাই কি সেকেলে রামের সেবক
মহাবীর সেই স্বেচ্ছা-শিল্পী পবনের নন্দন
ক্ষণকাল এই নানান রঙের আলোয়-ছায়ায়
মুগ্ধ পাহাড়ে করেছিল অবতরণ,
তাৎক্ষণিকের দীর্ঘজীবী কী মায়ায়
সদ্যস্নাত কঠিন রঙীন শত কৌণিক কায়ায়?

অঙ্গনা, শিকারী এবং রাধিকাকে

শতদ্রু সাহা

বুকের সামনে কে তুলেছো ফণা
অনাম্নী অঙ্গনা—
নূপুর পায়ে বক্ষোময় জটিল যাতায়াত
তোমার সকল গূঢ়ৈষণা এবং অশ্রুপাত
সবই আমার জানা।

ভুরুর মাঝে কে তুলেছো শর
শিকারী দুর্মর—
নগর এবং নির্জনতার জটিলতার বাঁকে
গভীরগামী প্রহর যদি হঠাৎ পিছু ডাকে
আচম্বিতে পালাবে শম্বর।

অস্তিত্বজুড়ে কে জেবলেছো শিখা
বিনম্র রাধিকা—
কিন্তু রৌদ্রশিখর থেকে বুকের বৃন্দাবনে
ক্রমঃপ্রসার জটিলতা কখন অন্যমনে
সমস্তময় ছড়ায় মরীচিকা।

স্কেচ

গিরিধারী কুণ্ডু

কথার শেষে পলাতক মন স্বপ্ন দেখে।
আমাকে নির্ভর করে বাঁচতে চায় না সে—
প্রসন্ন শরীরের বাহার ফুরিয়ে আসে,
ফুরিয়ে আসে হিম শব্দ, শব্দের যন্ত্রণা!
জ্বলন্ত পিপাসা নিজের মধ্যে হঠাৎ খুব থেমে যায়,
চাপা পড়ে রক্তের স্রোতে অসহায় শাসন;
তবু দুঃখের কাছাকাছি অলজ্জ চোখ ঢেকে
মাঝে মাঝে নির্জনে কানামাছি খেলা।

কার জন্যে এ অপেক্ষা?
আমাকে নির্ভর করে বাঁচতে চায় না সে—
অন্ধকার ফিরে এলে নিবিড় হয় ক্রমশ...
নিজেকে ক্ষমা করা হয় না।

মানুষের দেশে

ভাস্কর চক্রবর্তী

হে ভূতের বাড়ি, তুমি কার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছ?
কেউ আর আসবে না, কোনোদিন, আসবে না কেউ।

হে নদী, একলা নদী, একা একা, কোথায় চলেছ?
আমি আরো একা, তুমি সঙ্গে নেবে পুজোর ছুটিতে?

হে প্রিয় শহর, তুমি চিঠি কেন লেখো না প্রত্যহ?
একা একা একা একা, কেঁপে উঠি, মানুষের দেশে।

খোসা ভাঙতেই উঁকি মারে স্বপ্নবীজ

ব্রততী বিশ্বাস

উঁকি মারে স্বপ্নবীজ। খোসা ভাঙতেই অতীতের মুগ্ধ মুকুর;
উপলব্ধ সুখ বর্তমানের। ভবিষ্যতের পাহাড়সদৃশ সম্পদ।

সতর্ক ভূস্বামীর লালিত জমিতে আঙুরগুচ্ছের উদ্ভাস। অর্পণ
করেছি আমি নির্দিষ্ট জলাশয়। বিস্তৃত আঙিনায়
মেলেছে আঁচল শৈশবের সুখী রোদ। অঢেল
বনোফুল পাপড়ির সংকেতে খুলেছে নিষিদ্ধ কপাট।
চিতল হরিণের সম্ভারেণু মসৃণ ত্বকে। উষ্ণ
জাজিমের নকশায় অজস্র পলাশ পদতল করেছে
চুম্বন আরক্ত সংলাপে।

বাতাসে বাজে রুপোলী ঘুঙুর। আন্দোলিত বৃক্ষের
করতালি রোদের সরোদে। অঙ্কুর যখন ঘুমন্ত হাসিমুখ
খোসা ছাড়ালে খুলে যায় প্রেত অলৌকিক স্বপ্নবীজের পোশাক।

রক্তাক্ত বনস্থলী

আলোকময় দত্ত

নীলগিরির পাহাড় চিন্নাপট্টি নামে ছোট্ট গ্রামের কাছে থাকি। কাজ করি বন-বিভাগে। এ-অঞ্চলে বন-বিভাগের যাবতীয় ধনসম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব আমার। জঙ্গল বিলি, ইজারা—সব কিছু হয়। উনিশটা 'ফরেস্ট ভিলেজ'এর দণ্ডমুণ্ডের ভারও আমার! মাইনে পাই সামান্যই এবং এই বিভাগে উচ্চতর রাজপুরুষের অভাব নেই, তবু, দিব্যি আছি।

চিন্নাপট্টি খুব উঁচু এক পাহাড়ের মাথায়। কাছেই আমার বাংলো আর টিনের চালায় লাগোয়া অফিস। গত বছর পর্যন্ত এই বাড়ি আর দপ্তর ছাড়া চল্লিশ মাইলের মধ্যে সভ্যতার ক্ষীণতম চিহ্নও ছিল না। অবশ্য, আমার সরকারী জীপটাকে যদি অগ্রগতির বাহন মনে করা হয়, তবে, সে-কথা ভিন্ন।

গৃহস্থালীর ভার স্থানীয় একটি টোডা রমণীর উপর। একটি কুর্গি কেরানি ও জনাকয়েক আদিবাসী 'ফরেস্ট গার্ড'কে আমার সরকারী কাজের বোঝা ভাগ করে দিয়েছি। কেরানি বাবুটি প্রবীণ। থাকেন অফিসে। আহারাদি আমার সঙ্গেই। মাসান্তে একবার জীপ গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে ওঁকে—চল্লিশ মাইল দূরে—নিকটতম সড়কে। সেখান থেকে পৈত্রিক গ্রামে দিন দুই কাটিয়ে ফিরে আসেন কাজে। যথা সময়ে, যথারীতি জীপ ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নির্ধারিত স্থানে।

চিনাপট্টিতে কোয়ার্টার আর অফিসের চালাগুলো তোলা হয় আমার উপস্থিতিতে। পাহাড়ের গায়ে সংকীর্ণ ও সর্পিল পথটা বানানো হয় আমারই প্রচেষ্টায়—স্থানীয় আদিবাসীদের শ্রমে। সভ্যতার অপ্রতিরোধ্য গতিকে আর এগোতে দিতে চাইনি। আটকাতে চেয়েছি এখানেই—দুহাতে। স্বভাবতই পারিনি।

দৈনিক কর্মসূচী সরল। সকাল সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত অফিসের কাগজ-পত্র ঘাঁটি। তারপর খেতে যাই বাংলোয়। আহারান্তে একটু গড়াই। হয়ত চিঠি লিখি মাকে। পত্রিকা পড়ি। আবহাওয়া নিদ্রোপযোগী হলে শুধুই ঘুমোই—বেলা তিনটে পর্যন্ত। পড়ন্ত রোদে ফিরে আসি অফিসে। আবার বসি ফাইল খুলে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি বহু নীচে উপত্যকার দিকে। আদিবাসীদের বিঘৎ-পরিমাণ গ্রামের বুড়ো-আংলা কুটিরগুলো থেকে স্থির বাতাসে সাদা পালকের মতো ধোঁয়া ওঠে। ওদিকের পাহাড়ে বা পায়ের নীচের খাদে বিদ্যুৎ চমৎকার, বৃষ্টি নামে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। বেশ লাগে।

অনেক সময় জীপ নিয়ে টহল দিয়ে আসি ব্লকে ব্লকে। বন-রক্ষকদের কাছে খবর নিই বেআইনী পশু বধের। বিনা পারমিট-এ গাছ কাটার। পঞ্চায়েৎ ডাকাই কোনো মনোমালিন্যের খবর পেলে।—মীমাংসা করি সাধ্য মতো। মাঝে-সাঝে, একঘেয়ে লাগলে জীপ ছুটিয়ে দিই রাইফেল হাতে। যেসব ব্লকে হরিণ বা শুয়োর বেড়ে গেছে বাড়াবাড়ি-রকম, ঢুকে যাই সেখানে,—সংখ্যা কিঞ্চিৎ কমাই। কালে-ভদ্রে খবর আসে গোঁয়ার কোনো হাতির কিংবা গ্রাম-উজাড় করা নরখাদক বাঘের। দুরু দুরু বুকে মোকাবিলা করি তাদের।

পাঁচটার পর ছুটি। বেতের চেয়ার টেনে বসি বারান্দায়। আদিবাসী মেয়েটির হাতে তৈরী বর্ষার ঘোলা জলের মতো কফি খাই।

দেখি অবিরাম বৃষ্টি। কখনো কেরানিবাবুর সুখ-দুঃখের কাহিনীতে কর্ণপাত করি; নয়তো মনোযোগী হই ঝিঁঝিঁদের একটানা গানে।

এখানে উচ্চতা হেতু শীত কিছু প্রবল। বছরের বেশ কয়েক মাস সরল গাছের সরস ডাল জ্বলে চুল্লিতে। ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে বেড়ায় ধুনো ধুনো গন্ধ। কোলের উপর কম্বল টেনে রম্য উপন্যাস পড়তে ভালই লাগে

আছি গত ষোল বছর। দেশে গিয়েছিলাম বার কয়েক। শেষবার, তাও বছর চারেক আগে, মা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—পাত্রীও ছিল স্থির। পালিয়ে এসেছি। বিবাহ করবো না—এটাও স্থির। ইতিমধ্যে, তিনবার আমার বদলির প্রসঙ্গ উপরওয়ালাদের মনে হয়েছিল—এবং যতদূর জানি, কোনো সুহৃদের সুপারিশেই উঠেছিল সে প্রশ্ন। প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করেছি পদোন্নতি। আমি এখানে থাকতেই ভালবাসি।

এতগুলো বছরে বিভাগীয় কর্মকর্তারা ছাড়া চিম্নাপুট্রিতে পদার্পণ করেনি একটি প্রাণীও। গত বছর গ্রীষ্মের গোড়ায় এলো জোহান্ উইণ্টারবার্গ। বিদেশী এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিখ্যাত এক সংস্থার তরফ থেকে 'নীলগিরি থর' নামক বুনো-ছাগল সম্পর্কে গবেষণা করতে। চমৎকার লোক। মিশুকে মানুষ। ভাব হয়ে গেল দু'দিনেই। তবু, ও আসাতে খুব একটা সোয়াস্তি অনুভব করিনি।

জোহান উঠেছিল আমার কাছেই। ছিল দিন সাতেক। সঙ্গে সাজ সরঞ্জামের অভাব ছিল না। শুধু প্রয়োজন ছিল [illegible] লোকের। যোগাড়যন্ত্র করে—প্রায় পাঠ্‌পাঠ—ওকে পাঠিয়ে দিই বনের অভ্যন্তরে। কিন্তু সেই থেকে শুরু হয়েছে একটি-দুটি করে বিদেশীদের আনাগোনা। মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সভ্যতাকে রোখা যাবে না। ওরা আসে, ছুটি কাটায়, ছবি তোলে বা শুধুই ফুর্তি করে। এই তো, গত মাসে এসেছিল একটি যুবক আর একটি মেয়ে। তাঁবু খাটিয়ে কাটিয়ে গেলো বেশ কয়েকটা দিন। যাবার সময় সঙ্গের যাবতীয় ওষুধ আর ভিটামিন 'সি'এর ভর্তি বয়ম দিয়ে গেল আমার হাতে। বলে গেল প্রয়োজন মতো টোডাদের দিতে। ওরা বেশ ছেলেমেয়ে!

ছুটির দিন। তবু, শয্যায় পড়ে না থেকে আশ্রয় নিয়েছি অফিস ঘরে। দুটো কারণে—কিছুদিন থেকে. লক্ষ করছি আদিবাসী ললনার রকম সকম ভাল নয়। অতিরিক্ত যত্ন নিচ্ছে আমার প্রতি। তাছাড়া, মাথার পিছনে দু'হাত তুলে কেশ-বিন্যাসে মন দিচ্ছে যখন তখন। ওর উদ্ধত স্তনযুগল সে-অবস্থায় আরো আকর্ষণীয় দেখায়। উদ্দেশ্য বুঝি।-এবং, সেটা সন্দেহজনক। ছুটির

দিনে দপ্তরে বসার অন্য একটা কারণও আছে—গত সন্ধ্যায় জরুরী খবর এসেছে। আগামীকাল প্রাতে একটা রিপোর্ট না পাঠালে নয়। কেরানিবাবু গেছেন বাড়ি। ফরেস্ট গার্ডরাও গেছে গ্রামে—সপ্তাহ শেষে নিয়ম-মাফিক হল্লা করতে। বাড়ি অপর অফিস মিলিয়ে আমরা দুটি প্রাণী—আমি আর চৌকিদার রমণী।

ঘন 'ফগ' সেই সকাল থেকে। গতরাত থেকে টিপ-টিপ বৃষ্টি। একটু আগে মুখ তুলে দেখি মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। দৃষ্টি আর যাই হোক স্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম উষ্মার সঙ্গে—'কী চাই?' উত্তরে ও হেসে ফেলে জানালো—'কিছু না' বরং উল্টে প্রশ্ন—আমি কিছু চাই কি না। দেখো তো কাণ্ড। উত্তর দিতে হলো—'চাই, একটু একা থাকতে!' খানিকক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলাম। হঠাৎ নিঃশব্দে ঢুকলো রিধার।

অন্তত গত দশ বারো বছর ধরে চিনি এই আদিবাসী শিকারীটিকে। এতোগুলো ব্লকে ওর মতো 'ট্র্যাকার' দ্বিতীয়টি নেই। জল গড়াচ্ছে রিধারের সর্বাঙ্গ দিয়ে। কোমরে জড়ানো এক ফালি কাপড়। নগ্ন গায়ে পুরু কম্বল। —সব ভিজে। পায়ের পাতা ঠাণ্ডায় আর জলে কুঁচকে কুঁচকে গেছে। ফ্যাকাশে। ফ্যাকাশে মুখটাও। শুধু চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বোধ হয় —শীতেই। হাঁপাচ্ছে রিধার। অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছে এই বৃষ্টিতে।

ওর অবস্থা দেখে মায়া হল। প্রয়োজন হলে সর্বদা ওর শরণাপন্ন হই। লোকটা সৎ ও পরিশ্রমী। তাছাড়া, ওর আর একটা গুণ —হিন্দী জানে চমৎকার। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম চুল্লিটা। ছুঁড়ে দিলাম দেশলাই। বললাম—'ওটা জেলে একটু সেঁকে নাও নিজেকে। আমি ততক্ষণে হাতের কাজটা সারি।' মনে মনে প্রসন্ন হলাম। যাক্, এতক্ষণে পাওয়া গেল একজন পছন্দসই লোক। দুপুরটা কাটবে ভালই। মন দিলাম লেখায়।

রিধার ডাকল, 'হুজুর'। তাকালাম। ও উঁচু করে তুলে ধরল একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি। বোঝা যায় বোঝাটা ভারি। নীচের দিকটা লাল। টস টস করে ফিকে লাল ফোঁটা ঝরছে মেঝেতে—জল মেশা রক্তের। মাংস হবে হরিণ বা সম্বরের। আদিবাসীরা প্রায়ই দিয়ে যায়। গত সপ্তাহে একটা বুড়ো দিয়ে গিয়েছিল শুয়োরের একটা ঠ্যাং। রিধার মাংস আনায় খুশী হলাম। গত দিন তিনেক ধরে ক্রমাগত খেতে হচ্ছে বিস্বাদ বেগুন-এর ঘাটি। রাত্রে ভাল হবে খাওয়াটা। বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললাম —'বাহ্ বাহ্, নামাও দেখি কী এনেছো?'

চিরকালই শিকারে ওস্তাদ রিধার। মনে পড়লো বছর কয়েক আগের একটা দিন। দূরের ব্লক থেকে ফিরছি। সঙ্গে একজন ফরেস্ট গার্ড; আর কেউ নেই। ড্রাইভারটার —যতদূর মনে পড়ে—ম্যালেরিয়া জ্বর। জীপ চালাচ্ছি নিজেই। দুপাশে পাহাড়। পড়ে এসেছে বেলা। প্রায় চলে এসেছি গ্রিম্ব-পট্টিতে—মাইল সাতেক বাকি। হঠাৎ, গাড়ি গেল বিগড়ে। দেখি তেল নেই। টিনও খালি। অগত্যা সঙ্গের লোকটাকে পাঠালাম হেরিকান হাতে। আপিসের গুদোম খুলে ড্রাম থেকে ভরে আনবে তেল। নিজে জীপের বনেট-এ উঠে বসে সিগারেট ধরালাম।

সাত-সাত চোদ্দ মাইল পথ। তার মধ্যে পুরোটাই চড়াই। কিছু না হোক পাঁচ ছ ঘণ্টার ধাক্কা! বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হবে। কী যে করি! কিছু দূরে একটা ঝরনা ছিল জানতাম। মনে হল দিনের আলো থাকতে থাকতে অন্তত জলের বোতলটা ভরে আনি। তাছাড়া, সারা গায়ে যা ধুলোবালি—সারা দিনের গ্লানি—স্নান সেরে নিলেও মন্দ হবে না।

রওনা হলাম দেরী না করে। ঝরনার কাছাকাছি এসে থেমে গেলাম একটা দৃশ্য দেখে। —জলের ধারে একটা গাছের তলায় এক ফালি জমি। দিনের শেষ রোদ পড়েছে তির্যক। একটু আগুন জ্বালিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে আদিবাসী এক দম্পতি। আগুনের উপর ঝলসানো হচ্ছে মাংস। —অনাদি এক ছবি! ইচ্ছে হলো না ওদের নিভৃতি ভঙ্গ করার। ফিরে যাবো কিনা ভাবছি। এমন সময় পুরুষটি দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। চিনতে পারলাম—রিধার।

ওর বয়েস তখন কমই। চম্পা গাছের পাকানো ডালের মতো পেশীবহুল বাহু। প্রকাণ্ড কাঁধ আর চওড়া বুক। —যৌবনের প্রতীক। সতেরো পেরোয়নি ওর সঙ্গিনীর। পায়রা পুড়ের মতো গায়ের রং। ত্বক পিছল আর টান টান। ঘন পল্লব ঘেরা চোখ দুটো কুয়োর মতো গভীর আর প্রদীপের চাইতে উজ্জ্বল। একবার তাকালে তোলপাড় শুরু

হয় বুকে। অবাঞ্ছিত হলেও। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় কোহল।

রিধার পরিচয় করিয়ে দিলো। বললো মেয়েটি ওর বাগ্‌দত্ত বহুদিনের। পরিণয়ও শিগ্‌গির। নামটা এখনও ভুলিনি—হিনা-হিনি। দেখেশুনে বলেছিলাম রিধারকে—'তুমি ভাগ্যবান লোক।'

ওরা দুজনে সেদিন ছাড়েনি আমায়। ঝরনার কনকনে জলে স্নান করে পেয়েও ছিল দুর্দান্ত খিদে। বসে পড়লাম ধুনীর পাশে। আমার চোখ বার বার ছুঁয়ে আসছিল মেয়েটাকে। দেখলাম হিনাহিনি নিজের মোহিনী ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। আমার আচরণে অভদ্রতা প্রকাশ না পেলেও ওর প্রতি আগ্রহ যে কিছুটা অধিক বুঝে নিলো মেয়েটা। মনে হলো ও খুশীই। উপভোগ করছে গোপনে। সে-অবস্থায় সংযত হওয়া কঠিন, কিন্তু সাবধান হলাম তক্ষুনি।

কাঠ যোগাড় করতে গিয়েছিলো রিধার। বোঝা নামিয়ে মন দিলো অতিথি সংকারে। ঝলসানো মাংসের গন্ধে জিভে জল আসছিল অনেকক্ষণ। আগুন থেকে একটা টুকরো বার করে এনে রিধার বললো ওদের

ভাবার—'হরিণটা কাঁচ, কলিজাটা খাস হুজুর। খুন হবে দারুণ। আপনার শরীরে রক্ত যা কম।' হিনাহিনির দিকে তাকিয়ে হেসেছিল রহস্যময়—মনে পড়ে।

চমক ভাঙলো রিধারের ডাকে—'হুজুর!' পুঁটলি খুলে সোনালী চুলের ঝুঁটি ধরে ও ঝুলিয়ে ধরে আছে একটা মানুষের মাথা। পুরুষের। আঁতকে উঠলাম—'সর্বনাশ! এ কী করেছো রিধার!' ও তখনো ঝুলিয়ে ধরে আছে মুন্ডুটাকে।—টাঁগির এক কোপে কাটা হয়েছে ধড় থেকে। খাদ্যনালী আর শ্বাসনালী অনেকটা বেরিয়ে এসেছে দলাদলা মাংস থেকে,—থক্থকে রক্ত জমে আছে সেখানে। চোখের পাতা আধ-বোজা। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল মার্বেল-এর মতো নিথর দুটি তারা। এক পাশের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে জমে আছে সরু ধারায়। ঠোঁটে অভিব্যক্তি বিদ্রুপের। মৃত্যুতেও নিষ্ঠুর! চেনা লোক—আমাদের জোহান! দিশেহারা হয়ে ছুটে বন্ধ করলাম দরজা।

বহু বছর কেটেছে জঙ্গলে। আকস্মিক ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু, এমন অভাবনীয় অবস্থায় পড়িনি কখনো। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম। কি একটা বলতে গেলাম চেঁচিয়ে—মাথা ঘুরে উঠল। বসে পড়লাম চেয়ারে। আমাকে সুস্থ হতে দেখে ও শুরু করলো—'হুজুর, খুন করেছি এ শয়তানের বাচ্চাকে। আপনি বিচার করবেন...হাজতে পাঠাবেন...ঝো লা বে ন ফাঁসিতে। কিন্তু, পুরোটা একবার শুনুন।' দম নিলো লোকটা। শুরু করলো আবার—'সব চাইতে তাজ্জব হচ্ছি—এই হারামীর বাচ্চাকে আগে কেন খতম করিনি'।

দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। উঠে দরজা খুলে দিলাম। বললাম—'রিধার, কথা দাও পালাবে না।' ও মৃদু হাসলো—'পালাবো না, হুজুর। এতদূর কি এম্নি এম্নি এলাম। আর যাবো কোথায় এ জঙ্গল ছেড়ে? আপনি তো জানেন, আমাদের জান জিম্মা আছে এই সব পাহাড়ে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুছিয়ে বসলো রিধার। চোখ তুলে বললো—'আরাম করুন চেয়ারে। আমার জন্যে ফিকির করবেন না।' গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে লাগলো—'প্রথম ক'দিন আমরা বেশ ছিলাম। বারো-চোদ্দজনকে কাজে লাগালো সাহেব। আমাকে বানালো সর্দার। ছাউনী ফেলা হল গ্রাম থেকে আধা মিল দূরে—জঙ্গলের ভিতর। তারের জাল দিয়ে ঘেরা হলো মস্ত জায়গা। আপনিই তো দিয়েছিলেন পাহাড়ী বর্কার ধরার পার্মিট। কাজে লেগে গেলাম সবাই। দু' হপ্তায় ভরে গেল খোঁয়াড়।' একটু ভেবে নিয়ে ও শুরু করলো—'এদিকে সন্ধ্যে হলে সাহেব চলে যেতো আমাদের গ্রামে। হুজুর, আমরা শিকারীরা তখন ভাবতে...চুক্তি মতো ছুটি নেই আমাদের। ব্যাটা রোজ ভেট দিতো মোড়লকে। মরদদের বোতল আর সিগ্রেট। মেয়েগুলোকে অ্যাত্তো অ্যাত্তো ফিতে আর কাঁচের চুড়ি—গুচ্ছের। ওকে দেখে বাচ্চা-লোগ ভি দৌড়াতে দৌড়তে আসতো রাংতা-মোড়া মেঠাই'এর লোভে। বহুত রাত তক হুল্লোড় হতো হুজুর। অমন ফুর্তিবাজ আদমীকে কে না পসন্দ করে?' —জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। জিজ্ঞেস করলাম—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু, তাতে হয়েছেটা কী?' আমার প্রশ্ন যেন শুনতেই পায়নি। বিড়বিড় করে বলতে লাগলো আপন মনে—'ওজন নিতো বর্কারিগুলোর। দাঁত গিনতো, মাপ নিতো শিঙের। —হয়ে গেলে ছেড়ে দিতো মদ্দা জানোয়ারদের। কুত্তাটা ছাড়তো না শুধু গাভীন মাদী-গুলোকে!' হাঁপাচ্ছিলো রিধার। ইশারায় থামতে বললাম। থামলো না, বলে চললো

এক নাগাড়ে—'আসপাশের সমূচা গাভীন বকরির ভরা হলো খোঁয়াড়ে। সাহেব আমাদের ছাড়লো না তভিও। পাঠাতো দূর দূরে। ফিরতেই পারতাম না দেড়' দু হপ্তার আগে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ধরে আনতাম ছাগল।' থামলো রিধার।

প্রশ্ন করলো অকস্মাৎ—'আর এই শালা তখন কি করতো জানেন?' দাঁতে দাঁত ঘষে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। বলল—'কি করতো জানেন?' মাথা নাড়লাম জানি না।

—'রোজ একটা করে গাভীন বকরির পেটের বাচ্চাকে খেতো!' উবু হয়ে বসে পড়লো আদিবাসীটা। আমার বমি এসে গিয়েছিলো। ওক্ তুলতে তুলতে বেরোলাম বারান্দায়। ফিরে এসে দাঁড়ালাম দরজার কাছে। রিধার তখন বলে চলেছে—প্রায় স্বগত—'এসব জানতেই পারতাম না, হুজুর। কয়েকদিন থেকে বিমার ছিলো—বহুত বুখার। অন্যদের ফাঁদ পাততে পাঠিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিলাম ছাউনিতে। দুপুরবেলা হঠাৎ শুনলাম একটা বকরি চিল্লাচ্ছে পাশের তাঁবুতে। ভাবলাম চিতা-চিতায় ধরলো বুঝি। দেখতে গেলাম বুখার নিয়েই। দেখি জিন্দা অবস্থায় একটা ছাগলকে চিরে ফেলে জল্লাদটা দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে পেটে। শালা আমার সামনেই টেনে বার করলো কাঁচ বাচ্চাটাকে।'

আমার অবস্থা দেখে রিধার বললো—'আমরা জংলী লোক, ঘেন্না-পিত্তি নেই হুজুর, তবু আমারও উল্টি এসে গিয়েছিল। হাম শোচা কি ওসব ডাগডারী হবে সাহেবদের। তাছাড়া কিছু পুছতে ডর লাগলো—এমন পাগলের মতো চোখ

করে তাকালো। আমার তবিয়ত ভাল থাকলে অন্য ব্যত্ত। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লাম।' বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো রিধার। বসে রইল গালে হাত দিয়ে।

ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করছিলাম। সেই সঙ্গে রাগ আর প্রচন্ড ঘেন্না। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম—'বলো, বলো রিধার, কি হলো তারপর?' ও উত্তর দিলো বিষণ্ন গলায়—'রাত্রে খুব ভুখ লেগেছিলো... বুখার ছেড়েছে সাঁঝ হওয়ার আগে। ওদিক থেকে খুশবু আসছিলো গোস্ত-এর। ভাবলাম চাই গিয়ে সাহেবের কাছে। কি বলবো বিশ্বাস করবেন না—দেখি লণ্ঠনের আলোতে চিমাচ হাতে খেতে বসেছে লোকটা—সামনে ওর পিলেটে এত্তোটুকু বকরির সেই বাচ্চা। হুজুর, আস্ত ভাজা। আর পাষন্ডটা একটু একটু করে কেটে কেটে খাচ্ছে! ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো—দুনিয়াতে এমন স্বাদের খাবার ও খায়নি জিন্দগীভর!' চুপ করলো আদিবাসী রিধার। আমিও হতবাক।

অনেকক্ষণ পর আমিই কথা বললাম প্রথম—'কিন্তু, তাই বলে তুমি একটা মানুষকে এমন বীভৎস ভাবে খুন করবে? জানো, কাল সকালেই দুজন গার্ড-এর পাহারায় তোমাকে পাঠাতে হবে শহরে... থানায়?'

ক্ষীণ হাসি দেখা দিলো ঠোঁটের কোণায়। বলল—'না হুজুর, সে জন্যে খতম করিনি। তারপরও তো শকুনটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে জন্মানোর আগে অনেক বাচ্চাকে। ও তো বলেই ছিল—পার্মিট আছে মর্জি-মাফিক যা খুশী করার।' বেশ কিছুক্ষণ থেকে জমা হচ্ছিলো রাগ, ফেটে পড়লাম—'এক দম বাজে কথা! জানোয়ার ধরার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো ভাল কাজের জন্যে। তাই বলে...।' হাত তুলে থামিয়ে দিলো আমার স্ফুরণ। বললো অস্বাভাবিক রকম শান্ত গলায়—'শেষ করতে দিন। গোড়া থেকেই সাহেবের নজর ছিলো আমার জরুর উপর। কিন্তু সন্দেহ করিনি হিনাহিনিকে।' বিকৃত মুখে থামলো লোকটা। মাথা নাড়লো অবিশ্বাসে।

'বহুত তংখা দিতো সাহেব, ফিরতি ঠিক করেছিলাম ছেড়ে দেবো কশাই-এর নোকরি। জঙ্গল থেকে ফিরবার কথা নয় ছ' সাত দিনের আগে...হুট করে চলে এলাম কাল। দূর থেকে দেখলাম ওদের—একসঙ্গে! আশা করেনি আমাকে। একটুও গুস্সা হল না। কিন্তু মন ভেঙ্গে গেল, হুজুর। নিমক-পানি হয়ে গেল শরীরের সমুচা খুন—হাড্ডিগুলো নরম। ভাবলাম ফিরে যাবো জঙ্গলে। বনে বনে ঘুরবো সারা জনম। থাকবো জানোয়ারদের সঙ্গে—সামিল হবো জানোয়ারদের।'

একটু ভেবে প্রশ্ন করলো গম্ভীর হয়ে 'কি আছে আমার? হুজুর, কি নেই সাহেবের? কিত্না রুপিয়া, কিত্না ভারী-জীপ গাড়ি, তিন তিনঠো বন্দুক। রাজ-পুত্তুরের মত সুরত! আর আমি নেকড়েরও অধম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো লোকটা। বললো আর্দ্র গলায়, 'চলে আসছিলাম। হঠাৎ মনে হলো হিনাহিনির যদি বাচ্চা আসে পেটে—তখন তো ইনসান থাকবে না পশুটা। যদি কেটে ফেলে বউটাকে। জান-এর চাইতে আপন—আমার হিনাহিনিকে।'

বসে রইলো মোহামান। তারপর কোমল গলায় বললো অনেক ভালবাসায়—"ওকে দেখছি এত্তোটুকু থেকে। খেলেছি একসঙ্গে, বেড়ে উঠেছি পাশাপাশি। খারাব হয়ে গেল দিমাগ। মাথার মধ্যে লেগে গেল আগ। ছুটে বেরোলাম গাছের আড়াল ছেড়ে—হেঁকে বললাম—'সায়েব, খবদার! হাত হাঠাও আমার বউ-এর বদন থেকে!'"

উঠে দাঁড়ালো। যেন প্রস্তুত হলো শেষ স্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যে। বারুদ-চাপা গলায় বলল ফুসতে ফুসতে। চিৎকার করে উঠলো হিনাহিনি। আর গালি দিয়ে ভর-পোকটা তুলে নিলো বন্দুক। গুলিও করেছিলো। মরেই যেতাম, হুজুর। বাঁচালো হিনাহিনি। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে দিলো নিশান। তারপর, আর কী হুজুর?—টাঙির এক কোপে নামিয়ে দিলাম গর্দান!"

এইমাত্র শেষ করলাম রিপোর্ট—বেশী রকম বড় হয়ে গেল। জুড়তে হলো নতুন

প্যারাগ্রাফ। ভাষা ইংরিজী : প্রখ্যাত প্রাণী-বিজ্ঞানী ও প্রকৃতি-প্রেমিক—জোহান উইণ্টারবার্গ গত কয়েকদিন আগে প্রাণ দিয়েছেন এক নরখাদক বাঘিনীর কবলে। ও'র ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও যাবতীয় সামগ্রী দু-চার দিনের মধ্যে পাঠানো হচ্ছে হেড-অাপিসে। বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের মাথাটা শুধু উদ্ধার হয়েছে। এক অকুতোভয় টোডা শিকারী নিজের জীবন বিপন্ন করে সেটাকে ছিনিয়ে এনেছে বাঘিনীর গ্রাস থেকে। প্রসঙ্গত, ইদানীং নরখাদক বাঘিনীর উপদ্রব বেড়ে গেছে অত্যধিক। এমতাবস্থায়, অদূর ভবিষ্যতে ভ্রমণকারী ও নিরীহ বিজ্ঞানীদের এ-অঞ্চলে না পাঠানোই সমীচীন।

লেখা শেষ করে লেফাফায় ভরে উঠে দাঁড়ালাম। পড়ন্ত বেলা। 'ফগ' মিলিয়ে গিয়ে এই সবে রোদ উঠলো অনেকদিন পরে। ঝলমল করছে সদ্য স্নান-সারা সমস্ত পাহাড়-বন। খোলা জানলা দিয়ে তাকালাম নিচে উপত্যকার দিকে—শান্ত টোডা গ্রামটাকে দেখাচ্ছে সেই অনাদি ছবি।
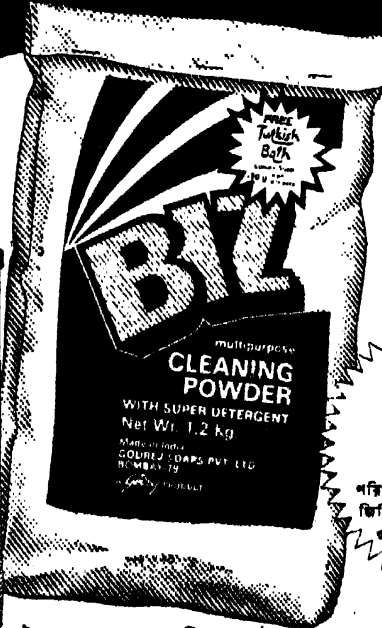
পৃথিবী যখন বরফে ঢেকে যায়

এ বছর ইংলণ্ডে প্রচণ্ড খরা চলছে। আবহাওয়ার তাপমাত্রা বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দারুণ জলকষ্ট। সাম্প্রতিক খবর, সেখানকার কোন কোন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল ভূ-স্তরের এত নিচে নেমে গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে পাম্পের সাহায্যে সে জল তোলা আর সম্ভব হচ্ছে না। পৌরপিতারা শুরু করেছেন জলের রেশন ব্যবস্থা। সেই জল সংগ্রহের জন্যে পড়েছে লম্বা লাইন।

"অবস্থা যা, হয়ত এতেও পার পাওয়া যাবে না", বলছেন কর্তৃপক্ষ। এখন ওঁরা ইউরোপের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে নরওয়ে থেকে জাহাজে করে জল আমদানির কথা ভাবছেন।

একেই বলে ট্র্যাজেডি! ছোট্ট ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে সাগর। অফুরন্ত তাদের জলভাণ্ডার। এমন অবস্থায় ওই দ্বীপপুঞ্জের ভূ-স্তরের নিচে জলের এত ঘাটতি কেন?

আবহাওয়া-বিজ্ঞানীর মতে, এ বছর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আগের তুলনায় বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকায় ভূ-স্তরের নিচে বেশী জল জমতে পারে নি। নিয়মিত ব্যবহারের দরুন আগের বছরের ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

এদিকে অন্য সুরে কথা বলছেন গ্লেসিওলজিস্ট বা হিমবাহ-বিজ্ঞানীরা। কয়েক বছর ধরেই ওঁরা বলে আসছেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা আগের তুলনায় খানিকটা কমেছে। বিশেষ করে এই হ্রাসপ্রাপ্তি বেশী করে নজরে পড়েছে উত্তর আতলান্তিক এলাকায়, গ্রীনল্যাণ্ডের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। তা ছাড়া গত কয়েক বছরে তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের বেশ কিছু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেড়েছে। সেই সঙ্গে উত্তরের বরফ অধ্যুষিত এলাকায় বরফ জমছে বেশী পরিমাণে। তা ছাড়া, বাৎসরিক জলবায়ুর পরিবর্তনে যে একটা নিয়মশৃংখলা থাকার কথা, তাতেও কেমন যেন একটা অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বছরেই। বছর তিন আগে ভারত, আফ্রিকার ব্যাপক অঞ্চল, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ এবং মধ্য এশিয়ায় বড় রকমের খরা হয়ে গেল। এর পর ঘটল প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা। এ সব দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবী আবার হয়ত একটি বরফ যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলে হিমবাহের পরিমাণ বাড়ছে। সেই হিমবাহ হয়ত এগিয়ে আসছে অপেক্ষাকৃত উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলকে গ্রাস করতে। কারণ, আবহাওয়ার অনিয়ত পরিবর্তনই তো বরফ যুগের পূর্বাভাষ!

ইংলণ্ডের জলকষ্টের কথা-প্রসঙ্গে তাই কেউ কেউ মনে করেন, বরফ যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দুটি ঘটনার কথা কেউ উড়িয়ে দিতে পারেন না। এক, ইতিমধ্যে সমুদ্রের বেশ কিছু পরিমাণ জল

এক নজরে

মঙ্গলের চারপাশে পরিক্রমণরত ভাইকিং-১ অরবিটার ওই গ্রহের বৃহত্তম উপগ্রহ ফোবোস-এর এই ছবিটি তুলে পৃথিবীর মানমন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলের চাঁদ দুইটি। ফোবোসের ব্যাস ৩২ কিলোমিটার। এর গায়ে দেখা গেছে অসংখ্য গহ্বর বা জ্বালামুখ। ছবির ডান দিকে এই উপগ্রহটির উত্তর মেরু। তার কাছে বিরাজ করছে তার বৃহত্তম জ্বালামুখ, যার ব্যাস পাঁচ কিলোমিটারের মত।

(বি ও সি এস ৩৩৫১)

হয়ত জমে গিয়ে হিমবাহ সৃষ্টি করেছে। দুই, এর ফলে সমুদ্র এবং মহাসাগরের জলের তল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ খানিকটা নিচে নেমে গেছে। আর এই শেষোক্ত কারণে ইংলণ্ডের ভূ-স্তরের নিচে সঞ্চিত জলভাণ্ডারের পক্ষে আরও গভীর অঞ্চলে নেমে যাওয়া অসম্ভব নয়।

অনুমান হয়ত। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এ সব নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানও চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঁদের বক্তব্য, এখনও প্রচুর তথ্যের প্রয়োজন।

যেমন, অতীতের কয়েকটি বরফ যুগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওই সময় সারা পৃথিবীর আবহাওয়া-মণ্ডলে একটা অনিশ্চয়তা-ভাব দেখা যায়। বিশেষ করে উচ্চ এবং মাঝারি অক্ষাংশ অঞ্চলের ভূ-খণ্ডে তো বটেই। ওই সময় শীতকালের স্থায়িত্ব হত বেশী। পরিবর্তে বসন্ত, শরৎ এবং গ্রীষ্মকাল হ্রস্বতর। দিন এবং রাতের তাপমাত্রার মধ্যে বেশী পার্থক্য থাকত। এ ছাড়া দৈনন্দিন আবহাওয়ায় স্থিরতা ছিল কম। ইউরোপ এবং এশিয়ার বাদামী রঙের দো-আঁশ মাটির দেশগুলিতে (অঞ্চলে), দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বালিয়াড়ি-অধ্যুষিত এলাকায় এবং আফ্রিকার পশ্চিম তটভূমি অঞ্চলে বইত প্রচণ্ড ঝড়।

এ ছাড়া আরও একটি কারণের কথাও বলা হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবী তার কক্ষপথ ধরে সূর্যকে পরিক্রমণ করার সময় কিভাবে অবস্থান করে তার ওপরও নির্ভর করে 'বরফ যুগের আবির্ভাব। অর্থাৎ পরিক্রমণ করার সময় পৃথিবীর অক্ষ সূর্যের দিকে কতটা হেলে আছে তার ওপর। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল, সেই সময় পৃথিবী যদি সূর্যের নিকটতম অঞ্চলে অবস্থান করে এবং তার অক্ষের হেলে থাকাটা কম হয়, তা হলে শৈত্য-প্রবাহ প্রকটতম হয়। আর শৈত্য-প্রবাহ কিছুটা কম হয়, যদি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের শরৎকালে পৃথিবী সূর্যের নিকটতম অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় এবং সেই সময় তার অক্ষ হেলে থাকে বেশী। এসব কতখানি সত্যি, তা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। জানা দরকার পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের দৈনন্দিন বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, আর্দ্রতা, বাতাসের চাপের তারতম্য এমন অনেক খুঁটিনাটি তথ্য। এই সব তথ্যের ওপর নির্ভর করেই হয়ত বলা সম্ভব হবে, বর্তমান পৃথিবী সত্যিই বরফ যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি না।

❀

প্রশ্ন এই, অতীতের বরফ যুগ সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

গবেষকদের বক্তব্য, শত দশ লক্ষ বছরে

পৃথিবী কম করেও দশটি বড় রকমের বরফ যুগ প্রত্যক্ষ করেছে। শেষ বরফ যুগের সূচনা হয়েছিল এক লক্ষ বছর আগে। আজ থেকে প্রায় ১৮০০ বছর আগে সেই যুগ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আর তার পরিসমাপ্তি? সেও প্রায় গত ১০,০০০ বছরের কাহিনী। সেই বরফ যুগে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল বড় বড় বরফের পাহাড়ে ঢেকে গিয়েছিল। বিস্তৃত ভূভাগ ঢাকা পড়েছিল পুরু বরফের আস্তরণে। কোন কোন অঞ্চলে যার গভীরতা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১০,০০০ ফুট। নদীর জল তখন বরফ। স্থলভূমির সমস্ত জল জমাট বরফে আটক। এর ফলে সমুদ্রের গভীরতা কমে গিয়ে যে সব অঞ্চল আগে সমুদ্রের নিচে সব সময় ডুবে থাকত, তাদের অনেকই জলের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

যেমন, বর্তমানের নিউ ইয়র্ক শহরটির পুরো অঞ্চলটাই তখন কয়েক গজ পুরু বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে। সমুদ্রতল নিচে নেমে যাওয়ায় মূল অঞ্চল থেকে তটরেখা বহু দূর পর্যন্ত সরে যায়। মেকসিকো উপসাগরের তটভূমি এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপগুলির আবহাওয়া কিছুটা উষ্ণ ছিল। গরমের সময় সেখানকার আবহাওয়া ছিল আর্দ্র। শীতের সময় সেখানে বৃষ্টি পড়ত এবং তাপমাত্রাও নেমে যেত অনেক নিচে।

হ্যাঁ, ১৮০০০ বছর আগে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে এখনকার মত জলবেষ্টিত কোন ব্যবধান ছিল না। কারণ, তখন ইংলিশ চ্যানেল পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছিল। ইংলণ্ডের বেশ বড় রকমের একটি অংশ বরফের নিচে ঢাকা। ফ্রান্স তুষারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। বরং বলি, তুষারপাত সেখানে ঘটলেও হিমবাহের নিচে চাপা পড়েনি। আলপসের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা জায়গায় বরফ ছিল না। তবে উত্তর ইউরোপের আগ্রাসী এক হিমবাহের সীমানা এগিয়ে এসেছিল এখনকার হামবুর্গ, বার্লিন এবং ওয়ারশ পর্যন্ত। আর আলপসের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে জমে ওঠা হিমবাহ মুনিখ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, জেনিভা, জুরিখ, সালজবুর্গ এবং ইনসব্রুক পুরোপুরি ঢেকে দেয়।

বরফহীন অঞ্চলে, যেখানে মাটি বলতে এক ধরনের বাদামী রঙের দো-আঁশ মাটি, তার ফাঁকে ফাঁকে ঘাস—সেখানে প্রাণী বলতে ছিল মুখ্যত শামুক। বরফ যুগের চরম পর্যায়কালীন ওই সব অঞ্চলে আরও বিভিন্ন রকমের প্রাণীর দেহাবশেষেরও অনুসন্ধান করা হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। তবে ভিয়েনার উত্তরাঞ্চলে পুরাতন প্রস্তর যুগের কিছু মানুষের অস্থি পাওয়া গেছে। যারা আজ থেকে ২৫,০০০ বছর আগে অতিকায় প্রাণী শিকার করে জীবিকা চালাত। ভিয়েনার আবহাওয়া তখন ছিল এখনকার কানাডার উত্তরে কুমেরু অঞ্চলের মত।

তুলনায় মধ্য এশিয়া এবং সাইবেরিয়ার জলবায়ু ছিল প্রায় এখনকারই মত। ওই সব অঞ্চলে বৃষ্টি হত কম। হিমবাহ যা জমেছিল তাদের আয়তন ছিল অনেক ছোট। সাইবেরিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে শীতের প্রকোপ এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। হ্রদগুলি জমে নিরেট বরফে পরিণত হয়। সাইবেরিয়ার উত্তরে কুমেরু বৃত্তের মধ্যে হিমবাহ-অধ্যুষিত এলাকায় প্রায় অবিকৃত অবস্থায় অতিকায় প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা ছিল বরফ যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে এখন বলা হচ্ছে, না, শেষ বরফ যুগ তো ১৮,০০০ বছরের কাহিনী। ওরা বিলুপ্ত হয়েছিল তারও অনেক আগে। প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে। যখন তুলনায় আবহাওয়া ছিল অনেকটা উষ্ণ। অতিকায় প্রাণী সেই ম্যামথদের প্রধান খাদ্য ঘাস। ওই সব অঞ্চলে তাও পাওয়া যেত। কারণ, বরফের নিচ থেকে যে সব ম্যামথের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তাদের পাকস্থলীতে ঘাস পাওয়া গেছে।

ভেনিস। হ্যাঁ, সমুদ্র এই অঞ্চলটিকে এখন প্রতি মুহূর্তে যেন ধ্বংস করার জন্যে হাত তুলেই রয়েছে। অথচ তখন, সেই বরফ যুগে, আজ থেকে ১৮,০০০ বছর আগে এখান থেকে জলভাগের দূরত্ব—অর্থাৎ এখনকার আড্রিয়াটিক সাগরের দূরত্ব ছিল

প্রায় ৪০০ মাইল। দক্ষিণ ইটালির উপত্যকা অঞ্চল তুলনায় অনেকটা উষ্ণ থাকায় সেখানে পাইন, ওক প্রভৃতির বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। পশ্চিম ইটালির দিকে ভূমধ্যসাগরের জলের তাপমাত্রা ছিল ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। যেখানে গ্রীষ্মকালে এখন তাপমাত্রা ওঠে ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত।

অস্ট্রেলিয়া। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের এই মহাদেশটির এখনকার আবহাওয়া বেশির ভাগেই উষ্ণ। এখানকার ব্যাপক মরুভূমি মানুষের বাস করার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ১৮,০০০ বছর আগেও এই মহাদেশটির অবস্থা জীবনধারণের পক্ষে একই রকম প্রতিকূলতা নিয়ে বিরাজ করেছে।

ওই সময় অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনি ও তাসমানিয়ার দ্বীপপুঞ্জ একই ভূভাগের সঙ্গে জোড়া ছিল। এখনকার সাহারার কোন কোন অঞ্চলের মত অস্ট্রেলিয়ার মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল প্রায় পুরোপুরিই বালির পাহাড়ে ঢাকা পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তরাঞ্চলের পর্বতমালা ঢাকা পড়েছিল পুরু হিমবাহের নিচে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এয়্যার হ্রদ এখন আয়তনে কত ছোট, যেন দীঘির মত। জলও লবণাক্ত। কিন্তু তখন এই হ্রদের গভীরতা ছিল গড়ে প্রায় ২০০ ফুট। আয়তন ৩০,০০০ বর্গমাইল। জলও লবণাক্ত ছিল না।

কুমেরু অঞ্চলে এখন যেখানে বড় বড় বরফের পাহাড় দেখা যায়—মুখ্যত যেখানে বেশী শীত—১৮,০০০ বছর আগের গ্রীষ্মকালেই সেখানে ওই ধরনের পাহাড় বিরাজ করত। আর দক্ষিণ গোলার্ধে যখন শীতকাল শুরু হত, তখন বরফের স্তূপ নিম্ন-কুমেরু অঞ্চল থেকে প্রায় ৩৫০ মাইলের মত এগিয়ে আসত নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে। কুমেরু অঞ্চলে তখন ঋতু পরিবর্তন বলতে যা বোঝায় ছিল না বললেই চলে। কুমেরু মহাদেশ সম্পূর্ণভাবে বরফে ঢাকা ছিল।

দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা গেছে, তাতে দেখা যায়, ওই সব অঞ্চলের আবহাওয়া তখন ছিল অত্যন্ত আর্দ্র। তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক কম। ভারতের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। আর্জেণ্টিনার উত্তর অঞ্চলে মরুভূমি। ভেনিজুয়েলার ওরিনোকো অববাহিকা অঞ্চল এবং অ্যামাজন নদীর যে সব জায়গায় এখন প্রবল বর্ষণ ঘটে, যেখানে এখন সবুজ গাছপালায় ভরপুর, সেই হিমযুগে সে সব অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করেছিল। এ কথা এখনকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা অঞ্চল সম্পর্কেও বলা চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি বিষুবরেখার দিকে এগিয়ে ছিল। নীল নদের জলপ্রবাহ ছিল অনেক ক্ষীণ। ভিকটোরিয়া হ্রদ এখনকার চেয়ে অনেক অগভীর। ভারতের উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল।

অর্থাৎ সংক্ষেপে তখনকার পৃথিবীর চেহারাটা ছিল এইরকম : পৃথিবীর মধ্য-অক্ষাংশ বরাবর অঞ্চল পুরু বরফের স্তরে ঢাকা। সমস্ত উঁচু পাহাড়ের মাথায় হিমবাহের পাহাড়। উত্তর আটলাণ্টিকের বুকে শুধু বরফের স্তূপ। গাল্‌ফ স্ট্রিম বা এখনকার উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত তখন উষ্ণ

ছিল না। বরং অনেক বেশী শীতল। সমুদ্রের গভীরতা কমে যাওয়ায় জলে ঢাকা প্রচুর অঞ্চল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সাইবেরিয়া এবং আলাস্কার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল স্থলপথ। আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যে স্থলপথ বা পুরু বরফের সংযোগ গড়ে উঠে তৈরি করেছিল অতিকায় এক মহাদেশ। গাছপালা জন্মানোর মত স্থলভাগ অপরিসর হয়ে ওঠে। মরুভূমিগুলির প্রসারণ ঘটে, বনাঞ্চল সংকুচিত হয়। অর্থাৎ বরফের চাদরে ঢাকা সেই পৃথিবী কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী, কারোর পক্ষেই যে অনুকূল ছিল না, বলাই বাহুল্য।

কোন কোন কারণ বরফ যুগের সূচক গোড়ায় এ সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ করেছি। তবে তার সবটাই প্রাকৃতিক ঘটনা। ইদানীং বলা হচ্ছে, ওই সব প্রাকৃতিক ঘটনার কথা ধরে নিয়েও বলা চলে, আগামী বরফ যুগের আগমন ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে বর্তমান মানবসভ্যতাকেও হয়ত খানিকটা দায়ী করা যেতে পারে। শিল্প-সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে নানারকম কল-কারখানা। যানবাহন। এদের জন্যে পোড়াতে হচ্ছে নানারকম জ্বালানি—কয়লা, কাঠ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। এসব জ্বালানি থেকে বেরিয়ে আসে কার্বন ডাই-অকসাইড প্রভৃতি গ্যাস। আগের তুলনায় বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের মাত্রা বেড়েছে। এর ফলে আবহাওয়ার তাপমাত্রা কোথাও বাড়ছে, কোথাও কমছে। এ ছাড়া নতুন জনবসতি, ক্ষেত-খামার তৈরির জন্যে লক্ষ লক্ষ একর বনভূমি কেটে পরিষ্কার করা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে ধুলোর পরিমাণ বাড়ছে। এই ধূলিকণা ঝড়ের তোড়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়ে স্তরে স্তরে ভেসে থাকে। যা সূর্যের উত্তাপকে যথাযথভাবে পৃথিবীর ভূ-স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দেয়। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের স্বাভাবিক উষ্ণতা ভারসাম্য হারায়। কেউ কেউ মনে করেন, অঞ্চলবিশেষে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি, খরা, শীত অথবা গরম পড়ার পেছনে এ ধরনের ঘটনারও কিছুটা হয়ত হাত রয়েছে।

হিমবাহ-বিজ্ঞানীরা তাই এখন উদ্বিগ্ন। সারা পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের জন্যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা ইতিমধ্যে কাজও শুরু করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্যই হয়ত জানাতে পারবে, আমাদের এই শস্য-শ্যামল প্রাণবন্ত পৃথিবী আবার নিরুত্তাপ এবং নিষ্প্রাণ বরফ যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি না। এবং সে অগ্রগতি কত দ্রুত।

সমরজিৎ কর

ঘরে বাইরে

আন্তর্জাতিক লেখিকা সমাবেশ

জুন মাসের একেবারে শেষে, আঠাশ, উনত্রিশ এবং ত্রিশ তারিখে আন্তর্জাতিক লেখিকা সমাবেশ হয়েছিল প্যারিসের স্যোস্যাইটি দ জাঁ দ লেত্রে, ৩৮ রু দ ফবার্গ, সেন্ট জ্যাকে। প্রায় একশ জন মহিলা এসেছিলেন ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, অ্যালজিরিয়া, ইরান, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউগোস্লাভিয়া, সুইজারল্যান্ড, তুর্কী, পশ্চিম জার্মানি এবং ভারত থেকে। সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দল ছিল ইউগোস্লাভিয়ার। পাঁচ জনের একটি দল। নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী মীরা আলেকোভিক। তিনি উনত্রিশ খানা বই লিখেছেন। তাছাড়া নিজের দেশের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রণী।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় লেখিকা-সঙ্ঘের এই উপযুক্ত স্বীকৃতি। লেখিকা-সঙ্ঘের সঙ্গে পরিচয় বাঙালী পাঠিকাদের আগেই হয়েছে। রজনী পানিক্করের কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি। হিন্দী সাহিত্যে লেখিকা মাত্র ছিলেন না রজনী, তাঁর লেখনীতে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের আলেখ্যও উপেক্ষা করার নয়। শ্রীমতী পানিক্কর ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের ২৫শে লেখিকা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্যের বিষয় আন্তর্জাতিক লেখিকা সমাবেশে প্রমাণ হলো লেখিকা-সঙ্ঘই পৃথিবীতে প্রাচীনতম লেখিকা গোষ্ঠী। তা ছাড়া গত বছর নাইনিতালে লেখিকা-সঙ্ঘ যে অধিবেশন করে নানা বিষয় আলোচনা করেছিলেন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স প্রায় একই বিষয় নিয়ে আলোচ্যসূচি গঠন করেছিলেন। লেখিকা-সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তারিফ হয়েছিল ভারত সরকারের। লেখিকা-সঙ্ঘের সেক্রেটারী নীলিমা সিং প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিসে গিয়েছিলেন ভারত সরকারের আনুকূল্যে। প্যারিস কনফারেন্স সরকারী সাহায্য তো পানই নি, এমনকি সংবাদপত্র বা রেডিও টেলীভিশনও সহায়তা করেনি।

L'association Internationale des Femme erivains মাত্র গত বছর ৭ আগস্ট রেজিস্টার্ড হয়। সংস্থার উদ্দেশ্য : "বিভিন্ন ক্ষেত্রের লেখিকাদের গোষ্ঠী গড়তে হবে, তাদের পেশাগত সমস্যার অনুশীলন ও পরীক্ষা করা দরকার, তাদের অধিকার রক্ষা করা উচিত, তাদের সকল রকম সম্পাদিত কর্মের উন্নতিসাধন প্রয়োজন, অনুবাদ করার উৎসাহ দিতে হবে, সকল প্রকার বুদ্ধিগত সৃজনীশক্তিকে উদ্দীপিত করতে হবে, সভাসমিতি করে ভাবের আদানপ্রদান করবার ব্যবস্থা হবে, লেখিকারা যে সব লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে চান তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, সংযোগ আর তথ্যের বুলেটিন প্রকাশিত হবে, প্রত্যেক দু'বছরে একবার করে যে মিটিং হবে তাতে সভাদের লেখার প্রদর্শনী হবে।"

আন্তর্জাতিক লেখিকা সংঘ রাজনৈতিক দলাদলিমুক্ত এবং সামাজিক, ধর্মসম্বন্ধীয় কোন কুসংস্কার এঁদের নেই।

কনফারেন্সে সবদেশের লেখিকাদের ধারণা হয়েছে যে ভারতে লেখিকাদর উন্নতির জন্য সরকার প্রচুর উৎসাহ দেন। কোথাও এমন হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম ইউগোস্লাভিয়া। মীরা আলেকোভিক্‌কে সম্মানিত করে সরকার তাঁর প্রতিভার পরম স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শ্রীমতী নীলিমা সিং

নীলিমা সিং বলছিলেন, এ কনফারেন্সের কাজ সবই ফরাসী ভাষায় হয়েছিল ও সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল না। ঘোষণা করা হয়েছে যে, আগামী কনফারেন্স মেকসিকোতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের আয়োজন থাকবে যাতে দুনিয়ার সব লেখিকা এক হবার সুযোগ পান। কথা হচ্ছিল মেকসিকোর পরে ভারতবর্ষে হবে আন্তর্জাতিক লেখিকা সম্মেলন। অবশ্য পাকাপাকি ঘোষণা এখনও হয়নি।

সংস্থার প্রেসিডেণ্ট হলেন মিসেস থেরেসা গেরহার্ড। তিনি সাংবাদিক এবং লেখিকা। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন যে, সংস্থার উদ্দেশ্য হলো, যাঁরা লিখতে চান কিন্তু কাগজ যাঁদের কালির আঁচড়বিহীন থেকে যায় তাঁদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করা। বিশাল ও বিশিষ্ট হতে হলে এর সভাসংখ্যা মাত্র এক শতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। শত সহস্র লক্ষ কোটি হতে হবে। সহ-সভাপতি মিসেস বেনোয়া গ্রাউল্ট বিখ্যাত লেখিকা। তাঁর মতে গৃহ ও পরিবারের গণ্ডীতে

পরিপূর্ণভাবে আবদ্ধ থাকাতে মেয়েরা লেখিকা হিসাবে বিকাশের সুযোগ কম পান। তিনি আরও বললেন, ফরাসী সাহিত্য আকাদেমি অর্থাৎ আকাদমি ফ্রাঁসে কোনো মহিলাকে আজও সভ্য করেন না। আরও বেশী আশ্চর্যের কথা যে, বহু ফরাসী লেখিকা পুরুষের ছদ্মনামে লেখেন, কারণ তাঁদের নিজের নামে লেখা হয় প্রকাশিত হয় না, নয়ত পাঠক তা পড়েন না। ভারতবর্ষে হয় ঠিক এর উল্টোটি। বহু খ্যাতনামা পুরুষ লেখকও মেয়েদের নাম নিয়ে লিখেছেন।

অ্যালজিরিয়ার লেখিকা জিজেল হালিমি আইনজীবী ও সাহিত্যিক। নিজের দেশে গর্ভপাত ও নির্বীজকরণের কাজে অগ্রণী। বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা সিমোন দ' বোভোয়ার-এর সঙ্গে একযোগে "জামেলা বুপাশা" নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি মহিলা প্রগতিবাদিনী ও অসমসাহসী লেখিকা। তাঁর সাহসের কিছু পরিচয় তিনি কনফারেন্সেও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, নারীকে বোঝানো হয়েছে সন্তানের জন্মদান তার সৃজনীশক্তির চরম সার্থকতা। কিন্তু সেখানেও সমাজ ও
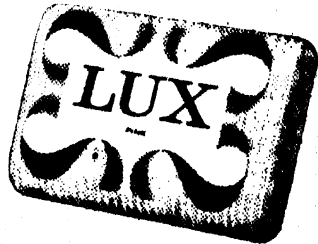
পরিবার রেখে দেয় তার সৃজনী শক্তির চরিতার্থতা। জগতে বন্ধ বা শান্তির কথায় মেয়েদের স্থান নেই, নেই তাদের বিচারবুদ্ধি বা যুক্তির সঙ্গে যোগাযোগ। সেখানে পুরুষের দুনিয়া আজও বর্তমান। নারী হবে দেবী। আদর্শ। ভাল হওয়া তার কর্তব্য, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তার জন্য নয়। পত্র-পত্রিকা মেয়েদের চমকদার হতে বলে। মানসিক অগ্রগতি বা প্রতিভা থেকে দূরে থেকে প্রজাপতির মত সে শুধু সকলের মনোরঞ্জনই করবে। কিন্তু তাই কি ঠিক? না, মেয়েরা নিজেদের মূল্য নির্ণয় ও জীবনের পথ বেছে নেবে সেটাই সব-চেয়ে বেশী কাম্য? শ্রীমতী জার্লিমর সব কথা সব সভ্যা মানতে রাজী হননি।

ডাঃ নীলিমা সিং যে কাগজটি পড়েছিলেন তার বিষয় ছিল, "ডাজ ফ্রিডম অব একসপ্রেশান একজিসট ফর উইমেন?—" "অভিব্যক্তির স্বাধীনতা কি মেয়েদের আছে?" বিষয়টি নিয়ে বাঙালী বিদুষীরাও অনেক আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক কনফারেন্সেও আলোচনাচক্র উদ্বোধন করে আলজিরিয়ার লেখিকা শ্রীমতী কার্ডিনাল বলেন, শব্দ পর্যন্ত পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কি সাংঘাতিক! যদি নারী "লিবার্টি"র কথা বলে তবে তার মানে হয় স্বেচ্ছাচার, আর পুরুষের ক্ষেত্রে লিবার্টি শব্দের মানে দাঁড়ায় স্বাধীনতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। টেবল শব্দটি মেয়েদের জন্য খাবার টেবিল, পুরুষের জন্য অফিস টেবিল। শ্রীমতী কার্ডিনাল আরও বলেন যে, স্বাধীনতা দিয়ে সমাজ মেয়েদের পুরোপুরি সাম্য দিতে পারে না যতদিন মেয়েরা না স্বাধীন চিন্তা করতে পারবে। মুক্ত মন নিয়ে বিচার বিবেচনা করবে।

এই বৈঠকের শেষে শ্রীমতী সিং যা বলেছেন তা সকলেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা যে মেয়েদের নেই তা নয়। তবে তার স্বাধীন অভিব্যক্তি সমাজ যদি স্বীকার করে নেয় তবেই তো তার মূল্য আছে। মেয়েদের এমন কোন সাহিত্যচক্র যদি গড়ে উঠতে পারে যাতে গোষ্ঠী হিসাবে তাঁদের মতবাদের মান স্বীকৃতি পায় তবেই অভিব্যক্তির মর্যাদা হবে। ইতিহাসে কোন সাহিত্য-আন্দোলন মেয়েরা শুরু করেনি। আত্মবিশ্বাসই অভিব্যক্তির মূল। ভারতবর্ষে এখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রেরণা নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। নতুন যুগ এসেছে। শ্রীমতী গান্ধীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মেয়েদের যুগ যুগ ধরে যে অক্ষমতার অপবাদ ছিল তা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

শেষ মিনিটে লেখিকাদের পারিশ্রমিক নিয়ে আলোচনা করা হয়—"হাউ টু লিভ অন পেন"—কলম চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ কি করে সম্ভব? এটি এক মস্ত সমস্যা। শ্রীমতী নীলিমা সিং নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, লেখিকা-সংঘ এদিকে এখনও তেমন দৃষ্টি দেননি। ফ্রান্সে নাকি "সিকিউরিটি সোশিয়েল" লেখক এবং লেখিকাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বার্ধক্যে পেনশন পাবেন তাঁরা, অসুখবিসুখে পাবেন অর্থসাহায্য। আমাদের সরকারের শিল্পীদের জন্য সহৃদয়তা যথেষ্ট কিন্তু সাধারণ লেখিকা বা লেখকের জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা দরকার। লেখনীর পেশা অর্থাগমের জন্য উৎকৃষ্ট নয়। সেদিকেও প্রকাশক, সংবাদপত্র ইত্যাদির সহানুভূতি দরকার। জীবনযাত্রার ক্লেশ সৃজনী প্রতিভাকে ব্যাহত করে। আর এই ক্লেশ অপনোদনের উপায় খুঁজে বের করাও একক চেষ্টায় সম্ভব নয়।

শ্রীমতী

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে
স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
নেস্‌কাফে
শতকরা ১০০ ভাগ
খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি
NESCAFE
instant coffee

॥ ১৪ ॥

টর্চ হাতে বিনয়াবনত রামসিংহাসন বললো : চলিয়ে সাব।

থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন এক পৃথিবীতে আমার চলা শুরু হয়ে গেল। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অধীশ্বর ঈশ্বরকে আর একবার প্রণাম—তাঁর ইচ্ছায় বহু মানুষের বিচিত্র এক মেলায় নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারের দুর্লভ সুযোগ পেলাম। আমার প্রিয় নগরী কলকাতার বিস্ময়ভরা নতুন রূপও আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হলো।

কালের অবহেলায় মলিন এই প্রাসাদ-পুরীর পাশ দিয়ে এর আগেও তো কয়েক-বার যাতায়াত করেছি। বাড়িটা যে নজরে পড়েনি এমনও নয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে সাজানো এই ঘরের ম্যানসনে যে পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষের এত কাহিনী এমনভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে তা কে জানতো?

এই মুহূর্তে আমি একটু ক্লান্ত। অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করি, উত্তেজিত দেহ-মন অল্পে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ আমি কিছুতেই পিছিয়ে পড়তে চাই না। রবিবারের এই ঝিমিয়ে-পড়া সন্ধ্যাতেই থ্যাকারে ম্যানসনের সঙ্গে আমার পরিচয় হোক।

প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে আমি থ্যাকারে ম্যানসনে পদযাত্রা করেছি। সাড়ে-একাত্তরটা ফ্ল্যাটই আমার দেখা হয়েছে। দেখা মানে ভিতর থেকে দেখা নয়। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক-একটা বন্ধ দরজার দিকে আমার নজর পড়েছে। রামসিংহাসন মুখস্ত বলে গিয়েছে : দশ নম্বর ফিলাট, এগারো নম্বর ফিলাট।

দশের পরে যে এগারো আসবে নামতার এই জ্ঞানটুকু সবারই আছে। এই ফ্ল্যাট-গুলো সম্বন্ধে আমি আরও অনেক কিছু জানতে চাই। এই মুহূর্তে ক্রিম-রঙের বিরাট-বিরাট বার্মা টিকের দরজা ছাড়া আমি কিন্তু আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিটা দরজা ঠিক একই সাইজের এবং একই রকমের দেখতে। নয় নম্বরের সঙ্গে দশ নম্বরের, এবং দশ নম্বরের সঙ্গে এগারো নম্বরের এক চুলও পার্থক্য নেই।

ফ্ল্যাটের নম্বরগুলো কানে শুনলেও চোখে দেখতে পাচ্ছি না আমি। রাম-সিংহাসন বহু দিনের অভ্যাসে এদের পরিচয় হয়তো আয়ত্ত করেছে। কিন্তু আমাদের মতো আনাড়িকে এখানের নম্বর খুঁজে বার করতে বেশ কষ্ট পেতে হবে।

সায়েবের তৈরি বাড়ি—কিন্তু নম্বর লেখা নেই কেন?

রামসিংহাসন আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। "কী বলছেন সায়েব? প্রত্যেক ফিলাটের নম্বর 'বিরাশ' পিলেটে লেখা আছে!"

রামসিংহাসন এবার ন' ফুট উঁচু দরজার ফ্রেমের ওপরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ফ্রেমের একটা বিশেষ অংশের ওপর সে এবার বোম্বাই-সাইজ টর্চের তীব্র আলো ফেললো। "দেখতে পাচ্ছেন?" একটু বাঙ্গ মিশিয়েই যেন রামসিংহাসন প্রশ্ন করলো।

পিতলের কাট-আউট টাইপে নম্বরের মতো কী একটা যেন রয়েছে। কিন্তু তার ওপর চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে একের পর এক দরজা-জানলা এবং বাড়ি-ঘরের নানা রঙের পেন্ট ও ভার্নিশ পড়ে বিচিত্র এক চেহারা ধারণ করেছে। রামসিংহাসন এবং সরকারী আর্কিয়োলজিক্যাল বিভাগের গুপ্তলিপি বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কারও পক্ষে এই সব নম্বরের পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।

প্রত্যেক দরজার মাঝখানে একটি নেমপ্লেট শোভা পাচ্ছে। প্রতি ঘরের নেমপ্লেটের সাইজ এবং লেখার ভঙ্গী একেবারে এক দেখে একটু কৌতূহলী হয়ে-ছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো ভাড়াটের ফ্ল্যাটের সামনে নাম-লেখার দায়িত্ব বাড়ি-ওয়ালা নিয়েছেন। কিন্তু পরে জেনেছি, সেইরকম কোনো নিয়মকানুন এখানে নেই। তবে রামসিংহাসনের অদৃশ্য হস্ত এখানে বিশেষভাবে কাজ করে। রামসিংহাসনের

আশ্রিত এক সাইন-পেন্টার ছাড়া আর কারও এ-বাড়িতে প্রবেশ অধিকার নেই। পরিবর্তে রামসিংহাসন অতি সামান্য চার্জ করে থাকে—মোট পাওনা বিলের এক-চতুর্থাংশ রামসিংহাসনের শ্রীচরণকমলে ভক্তিভরে অর্পণ না করলে পেন্টারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গুপ্তভাবে এর নাম 'চৌথ'। যদিও দু'-একজন এই ব্যবস্থাকে 'প্রণামী'ও বলে থাকেন!

কোনো টেনাণ্টের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার উৎসাহ দেখাচ্ছে না রাম-সিংহাসন। সে গম্ভীরভাবে আমাকে জানালো, এর নাম সায়েবপাড়া। 'অ্যাপয়েন্ট-মিন্ট' ছাড়া এখানে কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা করা ঠিক নয়। "আপনার কী কোনো 'ইমের্জিন্সি' দরকার আছে কারও সঙ্গে?"

রামসিংহাসন ইংরিজী, বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো।

এ-বাড়ির কাউকে চিনিই না আমি—সুতরাং জরুরী প্রয়োজনের প্রশ্নই ওঠে না।

আমি শুধু নেমপ্লেটের ওপর নাম-গুলো পড়ে যাচ্ছি। কয়েকখানা বোস, ঘোষ, মজুমদারের নাম দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম। ভয় পেয়েছিলাম, এ-পাড়ায় মাতৃভাষা ব্যবহারের কোনো সুযোগই পাবো না। রামসিংহাসন যতোই সঙ্কোচ বোধ করুক, এক সময় আমি নিজেই এ'দের সঙ্গে আলাপ করে নেবো। এতো বড়ো বাড়িতে দু-একজন পরিচিত প্রিয়জন না-থাকলে আমি অস্বস্তি বোধ করবো—নিঃসঙ্গ কর্মজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

লম্বা রেড-অক্সাইড সিমেন্টের করিডর ধরে আমরা দুজনে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছি। এই সব করিডরে অনেক আলো থাকা উচিত ছিল। কিন্তু একখানা মুমূর্ষু তিরিশ পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না। বিরাট এই করিডরে ওইটুকু আলো অন্ধকারকে যেন গভীরতর করে তুলেছে।

করিডরের দু-দিকেই ফ্ল্যাটের সারি। কোনো কোনো ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটের কাছে একটা ঠুলি-পরানো ছোট আলো ক্রিমকলার একপাল্লা দরজার ওপর রহস্যময় ছায়া বিস্তার করেছে। সব দরজাতেই এই সাঁঝের প্রদীপ নেই।

রামসিংহাসন দুঃখের সঙ্গে নিবেদন করলো, "কী বলবো সাব, সব আদমী 'ইকনমী', রুপেয়া খরচ করতে চায় না।" অথচ এক সময় নাকি এ-বাড়িতে নিয়ম ছিল প্রত্যেক ভাড়াটেকে দরজার কাছে এমন একটি সান্ধ্য পাদপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

নিয়মটা মন্দ লাগলো না আমার। মনে পড়লো, শাজাহান হোটেলে সার্কিটের সময় হ্যারি হবস সায়েবের কাছে শুনেছিলাম, কলকাতায় সরকারী খরচে গ্যাস লাইট বসাবার আগে রাস্তা আলোকিত করবার জন্যে কিছু কিছু অঞ্চলে একই ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। পৌর সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহস্থকে আবশ্যিকভাবে বাড়ির সামনে একটি আলো জ্বেলে রাখতে হতো। হয়তো, মিস্টার ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন সরকারী সেই আইনের কথা স্মরণ করেই নিজের ম্যানসন বাড়িতে এই ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নয়, দশ, গিয়ারা, বারা—একের পর এক ফ্ল্যাট নম্বরের নামতা পড়তে পড়তে রামসিংহাসন ধীর পদক্ষেপে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বারোর পরে এসেই সে কোনো অজ্ঞাত কারণে একেবারে চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

রামসিংহাসনকে সকাল থেকেই দেখছি আমি। কিন্তু তার ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপনের মতো মানসিক অবস্থা আমার

এখনও জানি। কেন জানি না, কোনো অজ্ঞাত কারণে মাঝে-মাঝে একটু অস্বস্তিই বোধ করছি তার সান্নিধ্যে।

এমতাবস্থায়, মনের মধ্যে সন্দেহের লাল সাবধান বাতিটি জ্বলে উঠলো। সেখানে প্রশ্ন : 'বারোর পরে তো চোদ্দ নয়। এই দুয়ের মধ্যে একটি তেরো নম্বর ফ্ল্যাট আছে।' তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটি নতুন ম্যানেজারবাবুকে দেখাতে রামসিংহাসন চৌরাসিয়া কেন উৎসাহী নয়?

মনের মধ্যে আরও অনেকগুলি আলো জটিল ট্রাফিক সিগন্যালের মতো একই সঙ্গে জ্বলতে-নিভতে লাগলো।

রামসিংহাসনকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সে বহু-অভিজ্ঞতাধন্য দু-পুরুষের দারোয়ান হতে পারে, কিন্তু আমার ধমনীতেও ওকালতি রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার বাবা যে উকিল ছিলেন এবং আমি নিজেও কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের শেষ বাবু তা স্মরণে না-রাখলে রামসিংহাসনের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

আমি এবার থমকে দাঁড়ালাম পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে। পিছিয়ে গিয়ে তেরো নম্বরের খোঁজ করবো কি না ভাবছি। হয়তো লোভনীয় কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা পরিদর্শনের প্রথম সন্ধ্যাতেই ধরা পড়ে যাবে। হয়তো এমন কিছু সংবাদ সংগ্রহ করবো, যা-পাঠিয়ে এই ম্যানসন বাড়ির স্বত্বাধিকারিণী ও আমার কর্মদাত্রী শ্রীমতী বিলাসিনী দাসীকে অবাক করে দেওয়া যাবে; রিপোর্ট শুনে তিনি নিজেই হয়তো বলবেন, 'নতুন ম্যানেজার নিয়োগ করা আমার সার্থক হয়েছে।'

রামসিংহাসন আমাকে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নিজেও থমকে গেল। পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এইভাবে দাঁড়ানো যে মোটেই নিরাপদ নয় রামসিংহাসন তা আমাকে চাপা-গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলো।

আমাকে তখনও নিশ্চল দেখে চিন্তিত রামসিংহাসন খবর দিলো, এই ফ্ল্যাট নিয়ে নানা গোলমাল চলছে। তিন তলার বাথরুম থেকে জল চুঁইয়ে দোতলার এই ফ্ল্যাটে টপটপ করে পড়ছে। গতকাল মেমসায়েবকে 'ডবল গোসল' করতে হয়েছে। স্নান সেরে জামা-কাপড় পরে বেরুবার সময়েই মাথার ওপর বাথরুমের কয়েক ফোঁটা জল মেমসায়েবের 'ড্রেস' বরবাদ করে দিয়েছে।

মেক-আপ নষ্ট হওয়ায় মেমসায়েব যে আহত বাঘিনীর মতো ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন এবং একাধিকবার কল-কালি বাবুকে খবর পাঠিয়েছেন এ-কথাও রামসিংহাসন আমাকে অতি দ্রুত

জানিয়ে দিল। জরুরী বার্তা পেয়েও কলকালিবাবু যে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেননি, সে কথাও রাম-সিংহাসন আমার কানে তুলে দিল।

এমতাবস্থায় রামসিংহাসন এবং নতুন ম্যানেজারকে একই সঙ্গে হাতের গোড়ায় পেলে পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অধিশ্বরী যে ছোটখাট একটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবেন এ-বিষয়ে রামসিংহাসনের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রামসিংয়াসন চায় না, আমার কর্মজীবনের প্রথম সন্ধ্যায় কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটুক, ভাড়াটিয়াদের কটুভাষণ শোনবার জন্যে আমার সামনে তো সারাজীবন পড়ে রয়েছে।

সন্দেহের রঙীন অথচ সতর্ক সিগন্যাল-গুলো এখন আমার মনের মধ্যে আরও দ্রুত জ্বলছে নিভছে। সেই সব ভাবনার কোনো রকম বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে শান্ত-ভাবে রামসিংহাসনকে বললাম, "তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটা আমি একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।" মনে-মনে ভাবলাম, রামসিংহাসনের যদি কোনো রকম গোলমাল থাকে তা এবার সহজেই ধরা পড়ে যাবে।

আমার প্রশ্ন শুনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রামসিংহাসন। টর্চের হ্যান্ডেল দিয়ে সে ঘাড় চুলকে নিলো। তারপর আবার ছোট ছেলের মতো নামতা পড়তে লাগলো দশ, গিয়ারা, বারা, চৌদা। নামতা পড়ায় ব্রেক কষলো রামসিংহাসন। আবার হিসাব কষতে লাগলো—দশ, গিয়ারা, বারা, চৌদা।

আমি সুযোগ বুঝে গম্ভীর হয়ে হাফ-ইংলিশে প্রশ্ন করলাম, "হোয়ার ইজ তেরা নম্বার? তের নম্বর ফ্ল্যাটই আমি দেখতে চাই।"

রামসিংহাসন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। ফ্ল্যাটের হিসাব মেলাতে পারছে না সে। রামসিংহাসন বললো, "চোদ্দ বছর বয়সে সে যখন বাবার কাছ থেকে এ-বাড়ির চার্জ নিয়েছে, তখনও তো তেরো নম্বর ছিল না। যা ছিল না, তা সে কোথা থেকে পাবে? রামসিংহাসন একটু অস্বস্তিতে পড়েই পাল্টা প্রশ্ন করলো আমাকে।

কিন্তু একখানা গোটা ফ্ল্যাটই যে উধাও এ-প্রশ্নটা রামসিংহাসনের মনে কখনও উঠলো না কেন, আমি বুঝতে পারছি না। শক্তিমান রামসিংহাসন এবার বেশ নরম হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, "সাব, যা আছে তারই তদারকীর কাজ দারোয়ানের। যা নেই, তা আমি কোথায় পাবো?"

আমাকে করিডরে ফেলে রেখে দ্রুত পদ-ক্ষেপে রামসিংহাসন হঠাৎ অদৃশ্য হলো। এমতাবস্থায় কী করবো ভাবছি। কিন্তু

কয়েক মিনিটের মধ্যে রামসিংহাসন বীর-বিক্রমে নাট্যমঞ্চে ফিরে এলো।

ইতিমধ্যে সে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। একগাল হেসে রামসিংহাসন খবর দিলো, তেরো নম্বরটা সায়েবদের কাছে/অপয়া বলে এ-বাড়িতে কোনোদিনই ফ্ল্যাট নম্বর থার্টিন ছিল না। বারোর পরেই চোদ্দ। ব্যাপারটা নাকি মার্টিন সায়েবের আমল থেকেই চলে আসছে—তিনি নিজেই কোন্ ঘরের কত নম্বর হবে ঠিক করেছিলেন।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বার করলো রামসিংহাসন। কানে গোঁজা পেন্সিলটাও সে নামিয়ে ফেললো। তারপর নোটবইয়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে কী সব হিসেব করলো।

এবার রামসিংহাসন বললো, "আপনি হিসেব দেখুন।" আমাদের ফ্ল্যাটের সংখ্যা সাড়ে-একাত্তর অথবা বাহাত্তর—কিন্তু শেষ ফ্ল্যাটের নম্বর তিয়াত্তর। সুতরাং তেরো নম্বর বেপাত্তা হলেও, গুনতিতে হিসেব মিলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়বার হিসেব মেলাবার জন্যে রামসিংহাসন আবার নামতা পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় পড়ে গিয়েছি। তেরো নম্বরটা যে এ-পাড়ার অধিবাসীদের কাছে এতোখানি ভীতির কারণ তা আমার খেয়াল ছিল না।

অকারণে রামসিংহাসনকে সন্দেহ করায় একটু অনুশোচনা হলো। আমাদের ইস্কুলের অবনীবাবু স্যার বলতেন, "বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। সন্দেহ করলে, যে সন্দেহ করে তারই বেশী ক্ষতি।" গুরুবাক্যটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, তা নিজের জীবনে বেশ কয়েকবার উপলব্ধি করেছি।

রামসিংহাসনের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে সে-রাত্রে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। সহদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার মধ্যে একটি ঘটনা।

তিনতলার করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম সাদা ইউনিফর্ম পরে একটি লোক বিলিতী কায়দায় ডান হাতে একটি ট্রে ধরে এগিয়ে আসছে। ট্রের ওপর একটা ধবধবে সাদা ন্যাপকিন ঢাকা রয়েছে। লোকটা মাথায় একটা হেডগিয়ার চাপিয়েছে।

রামসিংহাসনকে দেখে লোকটা থমকে দাঁড়ালো। এবং রামসিংহাসনকে ভক্তিভরে সেলাম করলো। একা সেলাম পেয়ে রাম-সিংহাসন বোধ হয় একটু অস্বস্তি বোধ করলো। আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে রামসিংহাসন জানালো, ইনিই আমাদের নতুন 'ম্যানেজার' সায়েব। চোখের ইশারায় আমাকেও একটা স্যালুট দেবার নির্দেশ যে রামসিংহাসন লোকটিকে দিল তা আমি

...তে পারলাম। ঢাকা ট্রে কোনো রকমে ...লে লোকটি নিপুণভাবে ওরই মধ্যে ...সিংহাসনের নির্দেশ মান্য করলো।

এবার লোকটির মুখ আমি ভালভাবে দেখতে পেলাম। কোথায় যেন দেখেছি ওকে!

কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সহদেব না? সহদেব দাশ। শাজাহান হোটেলেই আমাদের সংগে কাজ করতো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "শাজাহান হোটেলে আপনি কখনও কাজ করেছেন?"

প্রশ্নটা ভদ্রলোকের মোটেই ভাল লাগলো না। একটু দেমাকের সংগেই উনি জানিয়ে দিল, "শাজাহান হোটেলের সংগে সাতপুরুষে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।" মালিকের খানা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এই কথা ঘোষণা করে লোকটি আর দাঁড়ালো না, আমাদের চোখের সামনেই ট্রে হাতে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লো।

লোকটি আমাকে অবজ্ঞা করেই চলে গেলো। অথচ রামসিংহাসন চিৎকার করে বললো, "সহদেব, তুমি কাল সকালে আমার সংগে দেখা কোরো।"

সহদেব। নামটা তো একই। মুখটাও একরকম। অথচ লোকটা আমাকে চিনতে পারলো না।

সে-রাত্রে নিজের ঘরে ফিরে এসে খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে অন্য অনেক কথার সংগে সহদেবের ঘটনাটাও বার বার ভাবছি। রাত্রে খাওয়ার হাংগামা তেমন রাখিনি। এক সময় টুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে একখানা পাউরুটি ও কিছুটা চিনি কিনে এনেছি। ফারপো কোম্পানির ভিটামিন-সমৃদ্ধ মিল্ক ব্রেডের সংগে চিনি অতি উপাদেয় খাদ্য। শরীরের সমস্ত প্রয়োজন চিনি-পাঁউরুটিতে মেটানো যায় এরকম একটা বিশ্বাস মনের মধ্যে দারিদ্র্য-তাড়িত জীবনে তৈরি করে রেখেছিলাম। বিশেষ করে ফারপোর মিল্ক ব্রেড। এমনই নাম মাহাত্ম্য : মনে হতো অদৃশ্য দুধের সংগে পাউরুটি ও চিনি মিশিয়ে খাচ্ছি। মিল্ক ব্রেডে যে কোনো মিল্ক নেই—তা অনেকদিন পরে শুনেছি; কিন্তু কোনোরকম মোহভঙ্গ হয়নি, কারণ ততদিনে ভাগ্যের দেবতা প্রসন্ন হৃদয়ে আমার অভাবতাড়িত অন্ধকার জীবনে আলোর স্নিগ্ধ প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

চিনি-পাঁউরুটি খেয়ে ঠোঙাটা ... পেপার বাস্কেটে মুড়ে ফেলে দিয়ে চৌকির ওপর হোল্ড-অল খুলে পেতে দিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছি।

এখনও ঘরের আলো জ্বলছে। সহদেবের ব্যাপারটা তখনও মনের মধ্যে খচ খচ করছে। সহদেবকে আমি ভালভাবেই চিনতাম। একবার ওকে স্যাটাদার নির্দেশে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। হাতে ভাঙা কাঁচ ফুটে গলগল করে রক্ত পড়ছিল। আমার সংগে একই রিকশায় চড়ে সে ডাক্তারখানায় গিয়েছে। অথচ সে আজ বললো কিনা সাতপুরুষের মধ্যে সে শাজাহান হোটেলে যায়নি।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বো ভাবছি, এমন সময় আমার বন্ধ ঘরের দরজায় খুব সন্তর্পণে তিনবার টোকা পড়লো।

একটু থেমে আবার শব্দ হলো টক-টক। এবার উঠে দরজা খুলে দেখি সহদেব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"এ কি? সহদেব? তুমি? এখন?"

"[illegible] আমাকে দিন, হুজুর!" সহদেব চাপা গলায় বললো।

ভিতরে ঢুকে নিজেই দরজা ভেজিয়ে দিল সহদেব। তারপর প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললো, "এতো রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করলাম—কিছু মনে করবেন না হুজুর। এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না।"

সহদেবকে আমার বিছানায় বসতে বললাম। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার সে বললো, "তখন ওইভাবে কথা বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না, শংকরবাবু। আপনি সব বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।" সহদেব একটু ভয় পেয়েছে মনে হলো।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

এবার সহদেব নিজেই ব্যাখ্যা করলো। "শাজাহান হোটেলে আমি কিসের কাজ করতাম, শংকরবাবু?"

"সুইপার ছিলে তুমি। ঝাঁট দিয়ে ময়লা টিনে তুলতে গিয়েই তো কাঁচে তোমার হাত কেটে গেল সেবার।"

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো সহদেব। বললো, "স্যর আমি জাতেও ধাঙড়। কিন্তু ক'দিন আর কমোড সাফের কাজ ভাল লাগে বলুন? ওখানে কুক এবং বেয়ারাদের কাজ করতে দেখেছি—ওরা কীভাবে হাঁটে চলে সব শিখে নিয়েছি।"

একটু থামলো সহদেব। বললো, "আমি লাইন পাল্টে ফেলেছি স্যর, আপনাদের আশীর্বাদে। এখানে আমি রান্না করি—কুক বেয়ারা। আমি হোটেলের সুইপার ছিলাম তা যদি এরা জানতে পারে তা হলে এখানে আমার হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে।"

"জাত ভাঁড়িয়ে কাজ করছি হুজুর। না হলে কে আমাকে রাঁধুনি রাখবে বলুন?"

কান্নায় ভেঙে পড়লো সহদেব। বললো, "ওই রামসিংহাসন কতদিন আমার রান্না খেয়েছে। যদি একবার জানতে পারে আমি ধাঙড়। উঃ আমার কী যে হবে!" সহদেবের কান্না আর থামতে চায় না।

সহদেব কেন যে তখন আমাকে চিনতে পারেনি, এবার বুঝতে পারছি। সহদেবকে আশ্বাস দিলাম, "আমার থেকে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, সহদেব।"

সহদেব আমার পা জড়িয়ে ধরলো। বললো, "লোকে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন আপনার পুরনো সায়েবের কাছে কাজ করতাম।"

এখনও পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত না-হতে পেরে সহদেব যাবার আগে বললো, "কুকের চাকরি করতাম বলবেন, কেমন?"

[ক্রমশ]

বিমল
আপনার
স্বাভাবিক
দেহশ্রীকে
ক'রে তোলে
আরও মনোহর
তার আপনার
ব্যক্তিত্বকে
ক'রে তোলে
আরও সুন্দর
VIMAL
A RELIANCE PRODUCT
স্যুটিং • শার্টিং

আলোচনা

"দত্তা" সমালোচনা প্রসঙ্গে

কয়েক সপ্তাহ আগে দেশ-এ 'দত্তা'র সমালোচনা পড়ে চমকে উঠলাম। কারণটা ভিন্ন। এতকাল সংবাদপত্রিকাদিতে চলচ্চিত্র-সমালোচনার যে মামুলি রোমন্থনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, এ-রচনা তার থেকে স্বাদে এবং চরিত্রে স্বতন্ত্র। স্বাদ অর্থে এখানে ভাষা। চরিত্র অর্থে সারফেস ছেড়ে ভিতর দিকে পেনিট্রেট করার চেষ্টা অথবা পদ্ধতি। ইনি ছবিকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন তার চিত্রময়তার দিক থেকে। তাঁর তীর ধনুকের লক্ষ্যস্থল বাক্সর্বচ চলচ্চিত্রের বাস্তববর্জিত নাটকীয়তা। সেই কারণেই এসেছে ক্যামেরার অবস্থান, আলোক-সম্পাত, সাউন্ড ট্রাক, শট্ ইত্যাদির প্রসঙ্গ, অনিবার্যরূপে।

বাংলা ছবির মান আজ ক্রমশ গড়িয়ে চলেছে অধঃপতনের গভীর খাদের দিকে। ভয় হয়, হয়তো অনতিকাল পরেই যাত্রা থিয়েটার এবং চলচ্চিত্র সব একাকার হয়ে যাবে। এই রকম একটা সংকটময় মুহূর্তে চলচ্চিত্রকে তার যথার্থ পটভূমিকায় বসিয়ে কেউ যদি সাম্প্রতিক গড্ডালিকাপ্রবাহের বিরুদ্ধে তাঁর কলমের নীল কালিকে খানিকটা লাল করে ফেলেন, আমি তাঁকে স্বাগত জানাতে এক মুহূর্ত দেরী করতে রাজী নই। তার কারণ এর সঙ্গে আমার এবং আমার মত কারো কারো ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে ওতঃপ্রোত। যেহেতু চারিদিকের এই অসুস্থ পরিবেশই আমাদের ছবি না-করে ওঠার মূল কারণ। যেহেতু নিকৃষ্টতম রুচির কাছে আত্মসমর্পণে আমাদের অনিচ্ছা ঘোরতর। আমরা ছবি না করলেও যদি বাংলা চলচ্চিত্র বাঁচতো দুঃখ ছিল না। জনগণমনরঞ্জনের নামে এত ছেনালীপনা করেও তাকে বাঁচানো গেল না, বাঁচানো যাচ্ছে না, এই পরিণাম আরও মর্মান্তিক। বাংলা ছবি হচ্ছে, উঠে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে স্থায়ী ভাবে কি রেখে যাচ্ছে সে? রেখে যাচ্ছে শিল্পের বদলে এক ধরনের ধারণা, যা ভেলপুরীর মতই মুখরোচক এবং অস্বাস্থ্যকর।

আমাকে আবার একবার চমকাতে হল, গত সংখ্যা দেশ পত্রিকায় তপনবাবুর চিঠিটি পড়ে। যে সমালোচনা পড়ে তপনবাবুর মত পরিচালকের সকলের আগে খুশী হওয়া উচিত, তিনি যে হঠাৎ কেন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, বোঝা গেল না। এই চিঠির ভাষা তাঁর মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর। চলচ্চিত্র সমালোচনায় এর আগে কেউ লং-শট, মিড-শট ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করেননি, কারণ তা স্কুলের ছেলেরাও জানে, এই অপরাধেই কি? এবং স্কুলের ছেলেরা জানে না বলেই কি সাদুল, ত্রুফো, লিন্ডসে আন্ডারসন, আথার নাইট প্রমুখদের নামোল্লেখ?

আমার জানতে ইচ্ছে করে লং-শট, মিড-শট প্রসঙ্গটি বাদ দিলে দত্তার সমালোচকের আর কোন কোন বক্তব্য তপনবাবুর কানে ঢাকের আওয়াজ হয়ে বেজেছে। আমি এক এক করে প্রশ্নগুলি তুলি।

১। 'শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-বিন্যাসে এবং চরিত্রায়নে এমন কিছু মাল-মশলা মেশান যা অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে আজো স্বাদু এবং লোভনীয়'। তপনবাবু কি এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে?

২। 'আর এইখানেই চলচ্চিত্রের বড় সর্বনাশ, কেননা আমরা দেখি শরৎচন্দ্রের গল্প-নির্ভর প্রায় যে-কোনো নাবালক ছবিই বক্স-অফিসে লেগে যেতে তার দুর্বল, প্রায় হাস্যকর সাহিত্য-নির্ভরতার জন্যই, তাদের সিনেমাটিক চরিত্র থেকে শোচনীয় ভাবে ভ্রষ্ট হয়েও।' তপনবাবু কি এই মন্তব্যেরও বিরুদ্ধে?

৩। বাঙালী মেয়েদের কল্লোলিত অংশ 'যাদের দ্বিপ্রাহরিক বদান্যতা ব্যতীত টালিগঞ্জ ধুঁকতে ধুঁকতে আজো চলতো না।' তপনবাবু কি বিশ্বাস করেন না এ-কথা সত্য? আমি তো মাত্র তিনখানা ছবির নাবালক বাপ। তপনবাবু তো ছবি করতে করতে বুড়ো। তিনি কি জানেন না ছবি রিলিজের পর ডিস্ট্রিবিউটররা তীর্থের কাকের মত কি ভাবে তাকিয়ে থাকেন ম্যাটিনি-শো-এর খবর জানতে? ম্যাটিনি শো-এর সাকসেস মানেই চলচ্চিত্রের সাকসেস,

এতো বাঙালী জাতির ট্রেডাশীর একটা কেলেঙ্কারী।

৪। 'দস্তা ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ভিস্যুয়াল টোপ এবং উত্তর ফাল্গুনী'। এটাও কি সত্যি নয়? আমি অন্ততঃ এ পর্যন্ত একশ'জনকে বলতে শুনেছি দত্তা চলছে দুটো স-য়ে। একটা শ। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র। আরেকটা স। অর্থাৎ সুচিত্রা সেন।

৫। 'ছবিটির গ্রামীণ ব্যাক-গ্রাউন্ড এক মুহূর্তের জন্যেও জীবন্ত নয়। এবং সাউন্ড-ট্রাক এই ব্যাপারে আগাগোড়া নিঃসাড়।' এ-রকম অভিমতও কি ঢাকের বাদ্যির মত কটু? এবং বলা বারণ?

৬। অন্যান্য প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে, এবার আসি আসল প্রশ্নে, 'দত্তা শ্লথ, দুর্বল এডিটিং এবং বোঝা টানতে টানতে হয়ে উঠেছে পনেরো রীলের একটি বাক-সর্বস্ব ঢিমেতালের ছবি।' আমি বিশ্বাস করি না, তপনবাবু 'বাক-সর্বস্ব' ছবির পক্ষে। তিনি লিন্ডসে অ্যান্ডারসন পড়েছেন। সেই বিশ্বাস থেকেই বলছি। 'দি ফিল্ম ডাইরেকটার অ্যাজ সুপার স্টার' বইয়ের ১৫৭ পাতার শিরো-দেশে যে ৮টি লাইন রয়েছে, তার মধ্যে সবাক-চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট। না হলে তিনি 'ফিয়ার অ্যান্ড আর্টিস্টিক্যালি মোর ম্যাচিওর' নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ টানতেন না। শুধু বিদেশের নয়, নির্বাক চলচ্চিত্রের স্বপক্ষে আমরা এদেশের সত্যজিৎ রায়ের কণ্ঠস্বরও শুনেছি। কোথাও কিছু গণ্ডগোল না ঘটলে কেন ঘুরে ফিরে নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ উঠবে? যেমন অধুনা পৃথিবীর একাধিক বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হয়ে উঠেছেন রঙীন ছবির প্রতি। পুনরায় তাঁরা ফিরে যেতে চাইছেন সাদা-কালোয়। না পারলে ভেঙে তছনছ করবেন রঙীন চোখ-ভোলানো চিকচিক্কণ, এই তাঁদের ইচ্ছা।

এবার শেষ প্রশ্ন। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, রঞ্জনবাবু খালি কলসীর চেয়ে আরও কিছু বেশী। তিনি তপনবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ মতো এখন থেকে গায়ে মাখবেন বাংলার মাটি, বাংলার জল, তাতে কার লাভ? দেশ পত্রিকায় রঞ্জনবাবু আর কোনদিন লং-শট ইত্যাদি লিখবেন না। এই তো? কিন্তু আমার প্রশ্ন, খালি কলসী বা ফোঁপরা ঢেঁকীর প্রতি যদি তপনবাবুর এতই বিরাগ এবং বিদ্বেষ তিনি কি রঞ্জনবাবু ছাড়া আর কোথাও ঐ জাতীয় ক্ষতিকারক বস্তু খুঁজে পান'নি এতদিন? ফাঁপা স্টুডিও, ফাঁপা ফিল্ম ফাঁপা যন্ত্রপাতি, ফাঁপা অব্যবস্থা, এর জন্যে তিনি কি কাউকে ডেকে কিছু উপদেশ দেবেন। বা দিয়েছেন? কদর্য রুচির সঙ্গে পতিতাবৃত্তি করতে করতে যে বাংলা চলচ্চিত্র আজ সমস্ত গৌরব হারিয়ে পা বাড়িয়েছে গঙ্গা-যাত্রার পথে, তাকে বাঁচাবেন কোন মাটি মাখিয়ে, কোন্ পুকুরের জলে নাইয়ে?

তপনবাবু, আজকের এই অধঃপতিত চলচ্চিত্রের সত্যিকারের শত্রু কে বলুন তো? রঞ্জন, না অবাস্তব মনোরঞ্জন?

পূর্ণেন্দু পত্রী
কলকাতা-৫৫

॥ ২ ॥

১৪ই আগসটের 'দেশ' পত্রিকার রঙ্গ-জগৎ বিভাগে চলচ্চিত্র শাখায় 'দত্তা'র সমালোচনায় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু চমক-জাগানো লেখা পড়লাম। শব্দ, সিনেমা-শিল্প সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞান, অভিনয়-ক্ষমতাবিচারে একান্ত শিক্ষানবিশী বলেই মনে হল তাঁকে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, শরৎচন্দ্রের বহু-আদৃত এবং পুনর্চিত্রায়িত উপন্যাসটির রসঘন মুহূর্তগুলি যখন সেলুলয়েডের বুকে আলোছায়া, সংলাপ, গান আর অভিব্যক্তিতে আঁকা হয়, তখন রঞ্জনের চোখে পড়ে 'নতুন গেঞ্জি, হুঁকো, খোলা গাড়িতে বিকেয়া, অপসৃয়মান গ্রামাদৃশ্যের দ্রুতগতি ব্যাক-প্রজেকশন, বল্লমধারীর অনুপস্থিতি, প্লাসটিকের ফুল, আইলাইনার, ফ্রস্টেড লিপস্টিক, কানের দুলের রূপ-পরিবর্তন।'

সমালোচকের কয়েকটি ত্রুটিত সিদ্ধান্ত হাস্যকর। আঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে গ্রামাপথ দিয়ে জমিদার কন্যার আসা যদি বেআব্রুতার চরম হয়, তাহলে পরে নদীতীরে সন্ধ্যা-কালে পদচারণা তো আরও খারাপ। যে
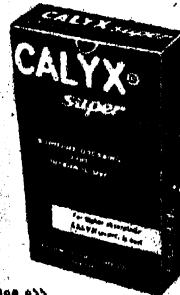
রক্ষীদের দ্বিতীয়বার দর্শন মেলেনি বলে রঞ্জনের আক্ষেপ, তাদের কিন্তু আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার দেখি—বিজয়ার দেহরক্ষী হিসাবে নদীতীরে। তাছাড়া জমিদার বাড়ির সদরে বিজয়ার প্রথম আগমন উপলক্ষে যদি বিশেষ বল্লমধারী মোতায়েন হয়ে থাকে, তাতে রঞ্জনবাবুর আপত্তি থাকার কথা নয়। ঘরফিরতি চাষীর গলায় গোধূলি-বেলায় সুন্দর গানটিতে বিজয়ার প্রাণের কথা মর্মরিত হয়েছে বলেই না দৃশ্যটি সুন্দর। ধরে নিলাম, রঞ্জনবাবুর শ্যেন চক্ষুতে ধরা পড়েছে ফুল প্লাসটিকের—তাই বলে নামগোত্রহীন' কেন—গঠন-সাদৃশ্যে নাম তো বটেই, শিল্পসৌকর্যে বা জন্মসূত্রে তাদের গোত্রসন্ধানও ব্যর্থ হবে মনে হয় না।

একেবারে একেলে ভঙ্গীতে 'মোর বীণা উঠে......' গাওয়া তিনি চান না অথচ সাহিত্যের একান্ত অনুবাদ অপছন্দ। এতো বড় রঙ্গ জাদু! আইলাইনার, ফ্রস্টেড লিপ-স্টিক, ছুঁচালো নখ বিজয়াকে নাকি মানায় না—রঞ্জনবাবুর মনে পড়ে কি—'অশনি-সংকেত' ছবিতে ব্রাহ্মণী 'অনঙ্গ'র প্রসাধন আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সৌমিত্রের কেশচর্চা। সত্যজিৎ রায়ের প্রতি পর্বে শ্রদ্ধা রেখেই বলি—সেখানে রঞ্জনবাবু মিন মিন করে যা বলতেন—তা আমরাও ধর্তব্যের মধ্যে আনতাম না।

অভিনয় কুশলতার বিচার পর্বে তাঁর অর্বাচীন উক্তি স্তম্ভিত করে। উৎপল দত্তের মত প্রবীণ, দক্ষ অভিনেতার মাঝে তিনি পেয়েছেন 'নীচুকণ্ঠ মুদ্রাদোষ'। মার্জিত ভাষায় একে যদি 'ম্যানারিজম' বলি, কোনো অভিনেতাই বুঝি এর থেকে মুক্ত নয়, যা আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রত্যায়ন সিন্‌হা
কালী

॥ ৩ ॥

১৪ অগাস্টের দেশ পত্রিকায় রঙ্গজগৎ বিভাগে 'দত্তা' চলচ্চিত্রের সমালোচনাটি পড়ে লেখক শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধুবাদ জানাই। এই ধরনের সাহসী সমালোচনার জন্য বহুদিন থেকেই উদগ্রীব ছিলাম, যেহেতু চিরাচরিত গল্প বলা 'সমালোচনা' অন্তত দেশ পত্রিকার কাছে আশা করা যায় না। এই দিক্‌ পরিবর্তনের জন্য সম্পাদক মহাশয়কেও ধন্যবাদ।

দিনের পর দিন বাঙালী দর্শককে যে বোকা মনে করে কিছু কিছু পরিচালক যা খুশি তাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার বিরুদ্ধে 'দত্তা' ছবির আলোচনাটি রুখে দাঁড়াতে পেরেছে। ওটি পড়ার পরে, 'দত্তা' ছবিটি আমি দেখেছি এবং আমার মত সাধারণ দর্শকের কাছেও প্লাস্টিকের ফুল, বিজয়ার আঙুলে লম্বা নখ, তাঁর ঠোঁটে ফ্রস্টেড লিপস্টিক এবং পাল্টে যাওয়া কানের দুল ধরা পড়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক খুঁত সহজেই চোখে পড়ল যা শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কেন জানি না উল্লেখ করেননি। যেমন, বিজয়ার সাজপোশাক সবক্ষেত্রে তৎকালীন ব্রাহ্মমহিলাদের মত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির মেয়েদের সমসাময়িক ছবিগুলি দেখলেই তফাৎ-টা চোখে পড়ে। এছাড়া দিনের বেলায় তোলা ঘরের ভেতরের দৃশ্যে দেয়ালের ওপর ঘন কালো ছায়া কি রিয়ালিসটিক?

কিন্তু শ্রীঅজয় কর এবং টালিগঞ্জের অধিকাংশ সমগোত্রীয় পরিচালকই বোধ হয় একথা মেনে নিতে রাজী নন যে, বাঙালী দর্শক আর বোকা বনতে চান না। তাঁরা মনে করেন, বাঙালী দর্শক মাত্রেই ছবির টেকনি-

একদম
নতুন!
SUPER
777
for a whiter wash at a lower cost

ক্যাল দিক কিছুই বোঝেন না এবং ছবির ভুলত্রুটি কিছুই তাঁদের চোখে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী দর্শকই আজ অন্তত এইটুকু বোঝেন যে কোন ছবিতে স্টার থাকলেই সেটা ভাল ছবি হয় না, যদি না সে ছবির লাইটিং, এডিটিং, ক্যামেরার কাজ ভাল হয়।

দুঃখের বিষয় এদেশের চলচ্চিত্র সমালোচকেরাও তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। বিদেশে 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড', 'ফিলমস অ্যান্ড ফিলমিং' প্রভৃতি পত্রিকায় যে ধরনের টেকনিক্যাল সমালোচনা আমরা দেখি তা তো এ দেশে হয় না এবং সেজন্যই এদেশের অধিকাংশ পরিচালকেরা যা খুশি তা করেও পার পেয়ে যান।

বিশাখা মিত্র
কলকাতা-৩

এশিয়াটিক সোসাইটি

৭ই আগস্টের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' সংক্রান্ত যুক্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় জন্য আপনারা বিদ্যোৎসাহী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ অর্থ-সংগতির অসংগত ও অসতর্ক ব্যবহারের যে দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আমরা তা গোচরে আনা কর্তব্য বলে মনে করি।

গত বছরের শেষ দিকে ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রেকর্ডস কমিশন সোসাইটিকে তাদের বিকানীরে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠানোর আমন্ত্রণ জানালে সোসাইটির পরিচালনা পর্ষদ শ্রীশিশির মিত্রকে মনোনীত করেন। শ্রীমিত্র ঐ অধিবেশনে সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত কয়েকটি রাজস্থানী পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক বলে কর্তৃপক্ষকে জানান। এই পুঁথিগুলি রাজস্থানে নিয়ে যাওয়া ও কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার সম্ভাব্য ব্যয়ের কথা চিন্তা করে গ্রন্থাগার সচিব ডঃ কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত লিখিতভাবে পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, এবং পরিচালনা-পর্ষদ তাঁর মত মেনে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর নির্দেশে শ্রীমিত্রকে যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ৬০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। বিকানীর থেকে ফিরে এসে শিশিরবাবু বলেন, ঐ টাকা যেন তাঁর সহকারীর জন্য মঞ্জুর করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, যে শিশিরকুমার মিত্রের ঐ সহকারীর জন্য অর্থ মঞ্জুর কেন হবে?

এবারে আসা যাক স্বয়ং সভাপতি প্রসঙ্গে। কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি বৌদ্ধ তন্ত্রযান শিল্প সংক্রান্ত একটি ব্যয়বহুল গবেষণা কর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটির রূপায়ণে ভারত সরকার ও ইউনেসকো আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন। সেই মত কাজও চলতে থাকে। কাজের দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে দুজন, শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখালদাসের পুত্র), ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। অবশেষে গত বছর ঠিক হয়, বইটি বেরোবে সোসাইটির বর্তমান সভাপতি শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর নামে, বলা বাহুল্য প্রখ্যাত পণ্ডিত-গবেষক শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য গবেষকদের বাদ দিয়েই।

ব্যয়বহুল এই বইটি ছাপা সোসাইটির পক্ষে বিরাট বোঝা স্বরূপ, তখন ইউনেসকো তাদের আর্থিক অনুদান দিতে অসম্মতি জানায় কারণ গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে

বইয়ের কাজ-কর্ম, প্রকাশন সংক্রান্ত যে-সব প্রয়োজনীয় তথ্য ইউনেসকোকে দেওয়ার কথা ছিল, তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীদিলীপ মিত্র এবং বইটির তথাকথিত লেখক ও সোসাইটির সভাপতি সরসীবাবু সেগুলো পাঠিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে বইটির প্রকাশের যাবতীয় খরচ এখন সোসাইটিকেই বহন করতে হবে। তা তার আর্থিক সংকট যতই দুঃসহ হোক-না কেন।

শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক পণ্ডিত ও গবেষকের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ তন্ত্রযান শিল্প নামীয় যন্ত্রস্থ বইটি। এ তথ্য ইতিমধ্যেই সর্বজনবিদিত। কিছু-দিন আগে সোসাইটির সভাপতি সরস্বতী মহাশয়, যাঁর নামে বইটি বেরোচ্ছে, এ-সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইল সোসাইটির সম্পাদক ডঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অজ্ঞাতসারে বাড়ি নিয়ে যান এবং কিছুদিন বাদে সেগুলি ব্যক্তিগত সীলমোহরে বন্ধ করে অফিসে ফেরৎ পাঠান। সঙ্গে নির্দেশ দেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া এ সীল কেউ ভাঙতে পারবে না। বই বেরোবার মুখে সভাপতি তথা বইয়ের লেখকের এই আচরণ একই সঙ্গে রহস্য ও কৌতুকের উদ্রেক করে।

সবিতা রায়
কলিকাতা-১১।

॥ ২ ॥

গত ২২ শ্রাবণের 'দেশ' পত্রিকায় এশিয়াটিক সোসাইটির উপর লেখা সুন্দর সম্পাদকীয়টির জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। দুটো শতাব্দী পেরিয়ে নতুন আর এক শতাব্দীতে পদার্পণ করার মুখে এসে তামাম এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত এই সোসাইটি আজ যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা অতি দুর্ভাগ্যজনক এবং ভারতের সংস্কৃতির পরিপন্থী। অতীতে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না বা এখনও নেই যিনি তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য বাড়াতে এশিয়াটিক সোসাইটির বই ও পুঁথির সাহায্য নেননি। শুধু এ-দেশের কেন, বিদেশের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই এশিয়াটিক সোসাইটির বই পড়তে বা পুঁথি দেখতে আজও ছুটে আসেন। এ-হেন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পত্তি শুধু অবহেলায় আর ছেলেখেলায় নষ্ট হয়ে যাবে এ কোন ভারতবাসী মানতে রাজী নয়।

মোহন গাঙ্গুলী
বারাকপুর

মন্ট্রিলের মোমের পুতুল

আপনার পত্রিকার ১৪ই আগস্ট, ১৯৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মন্ট্রিলের মোমের পুতুল' শীর্ষক নিবন্ধের কয়েকটি তথ্যগত ভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতে বলা হয়েছে, কোমানেসি ছয়টি পদক পেয়েছে। আসলে সে পেয়েছে পাঁচটি; তিনটি সোনা, একটি রুপা, একটি ব্রোঞ্জ। আরো বলা হয়েছে এবারে মন্ট্রিলে কেউ ছটি পদক পায়নি। অথচ সোভিয়েট ইউ-নিয়নের পুরুষ জিমন্যাস্ট নিকোলাই আন্দ্রিয়েনভ পেয়েছেন সাতটি পদক, চারটি সোনা (ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন, রিং, ভলটিং হর্স ও ফ্লোর এক্সারসাইজ-এ) দুটি রুপা (দলগত ও প্যারালাল বার-এ) আর একটি ব্রোঞ্জ (পোমেলড হর্স-এ)। গতবার মিউ-নিখে ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন ওলগা করবুট ছিলেন না, ছিলেন লুডমিলা তুরিশ্চেভা। করবুট সপ্তম স্থান পেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যালান্স বীমে তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা এবং ফ্লোরে ও দলগত বিভাগের একজন হিসেবে অপর দুটি সোনা তাঁকে বিশাল খ্যাতি এনে দিয়েছিল। ইউনিভার্সিয়াডে তিনি পেয়েছিলেন পাঁচটি সোনা। আশা করি, এ ধরনের তথ্যগত ত্রুটি ভবিষ্যতে আর দেখব না। শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

শিরোপা ধর
শান্তিনিকেতন

এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর স্থতী কাপড় এত মজবুত ও টেকসই যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই স্থতী কাপড়
বিনী

॥ ৩৬ ॥

'আমি কিছু দেখছি না ক্ষেমেশ।'

'ঝলসে গেছে তোমার চোখ। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পারবে।'

'কে হাত রেখেছিল আমার চোখের ওপর?'

'আমি।'

'ওদিকে দাঁড়িয়ে কে?'

'রঞ্জন।'

'আর কে?'

'আর কেউ নেই।'

'ও—' না বিরূপাক্ষ নেই। এক ঝলক স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জয়তী?' খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসে ক্ষেমেশ বললে।

'ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। একটু দেরি হবে—'

'তোমার তো গ্লকোমা ছিল। ওরকম কটকটে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে জয়তী—'

'মেঘ? না তো, খুব কড়া রোদ; মেঘ নেই, খুব নীল'।

'ও—' জয়তী বললে, 'হ্যাঁ, রোদ গায় লাগছে—কিন্তু—'

ক্ষেমেশ জয়তীর গরম, রুগ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে রইল—সূর্যের দিকে—কয়েকটা পাখির দিকে তারপর। ভুলেই গিয়েছিল জয়তী ঘরের ভেতরে বসে আছে; অনেকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার খুব পুরু লেনস চাই।'

শাড়ির আঁচল মাটিতে পড়েছিল, উঠিয়ে নিয়ে একটু ধুলো ঝেড়ে জয়তী বললে, 'অনেকদিন থেকেই চশমার দরকার। কিন্তু খুব পুরু না হলেও চলবে।'

'চশমা নাও নি কেন এতদিন?'

'এইবারে নেব।'

'মোটা পাথর লাগবে তোমার।'

'কেন, আমি ছানি কাটিনি তো। পুরু লেনস কেন লাগবে?'

'ছানি নয়—'

'চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার—'

'তারপরে অন্ধ হয়ে যায়। ক্ষেমেশ বললে, 'এর কোনো ওষুধ নেই জয়তী?'

'না। ক্ষেমেশ।'

'আমি ভাবছি কোনো ওষুধ আছে কিনা—'

'তোমার ঘড়িতে কটা?'

'[illegible] বেজেছে?'

'আমি [illegible] [illegible] [illegible]।' জয়তী বললে।

'সময় হলে যাবে—'

রঞ্জন চা নিয়ে এল।

'খন্ড রসিয়ে চা করেছি [illegible]—' রঞ্জন বললে, 'সতীর্থবাবু গরম গরম খেয়ে গেলে পারতেন। এ জিনিস হবে কি আর কোনোদিন।'

চা সাজিয়ে রেখে রঞ্জন [illegible] গেল। চায়ের কাপ শেষ করে টিপয়ের ওপর সরিয়ে রেখে ক্ষেমেশ খুব [illegible] সংগে মুখ মুছছিল।

'লিপটন বুঝি?'

না। খুচরো সব—এ পাতা সে পাতা মেশানো—কোত্থেকে বেছে আনে রঞ্জন;

দুপুর। ফিকে নীল ছিল, এইবারে গাঢ় নীল হয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশ—কানায় কানায়; সাদা মেঘগুলো আরো বেশি সাদা, ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে।

দু'এক চুমুক খেয়ে জয়তী আর চা খাচ্ছে না দেখে ক্ষেমেশ জয়তীর পেয়ালাটা

তুলে নিয়ে আকাশ রোদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল সব—কোথায় সে আছে, ওদিককার সোফায় কে বসে আছে—হাতের তার ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালা জয়তীর না তার নিজের। হঠাৎ তার মনে হল পেয়ালার ডাঁট খুব শক্ত করে ধরে আছে সে—পেয়ালার ভেতরে চা নেই আর। সমস্ত চা খেয়েছে সে? কখন খেল?

'আমার পাইয়োরিয়া আছে।'

'তোমার?' ক্ষেমেশ চোখ তুলে একবার তাকিয়ে বললে 'মাড়ির দাঁতে?'

'হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে। আমার মুখের চা তুমি না খেলেই পারতে।'

'চাই তো খাই আমি—বেছে বেছে মুখ সম্বন্ধে খেয়াল রেখে।' হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে।

চারদিকে খুব বেশি নিঃশব্দতা। মেঝের ওপর দিয়ে মড় মড় করে এক চিলতি কাগজ বাতাসে উড়ছে—ঘুরছে—

'আমার পাইয়োরিয়া নেই—' জয়তী চোখ তাকিয়ে হেসে উঠে বললে। এবার সে আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখছে।

'একটা দাঁতে পোকা কুরছে। তামাকের ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ভালো হবে—'

'খেয়ো দাঁতটা নড়ছে?'

'স্টপ করিয়ে নিলেও যাবে ক্ষেমেশ?'

'আর একটা দাঁত ধরবে।'

'আমি তো বেশি মিষ্টি খাই না। কেন পোকা হচ্ছে?'

'তা হয়।'

'স্বভাব?'

ক্ষেমেশ উঠবে ভাবছিল; রঞ্জনকে বলে আসতে হবে—আরো চা করে দিতে। কি জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ঠিক শুনতে পেল না; উঠল না; রঞ্জনকে কিছু বলবার দরকার নেই ভাবছিল ক্ষেমেশ, যা করবার নিজেই করবে ও, চা দিতে হলে দেবে।

দাঁতের কথা হচ্ছিল, স্বভাবেরও কথা, অন্য এক আধটা কথা মনে হল; জয়তী বললে, 'কেউ আমাকে বলেনি যে মানুষের স্বভাব ভালো—তাই শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে মানুষের—'

ক্ষেমেশ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, ঘরের ভেতরে চোখ ফিরিয়ে টেনে বললে, 'এর পরে বলবে।'

'পরে?—কবে?—'

যে প্রশ্নের দুরকম উত্তর চলে আসছে অনেকদিন থেকে, সেইটে জিজ্ঞেস করেছে জয়তী; কোন উত্তরটা বেশি সত্য এখনও ঠিক করেনি ক্ষেমেশ; তবুও এটা ঠিক যে এখন কিছু হবে না, পরে হবে; ক্ষেমেশ আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের মৃত্যুর পরে।'

'কটা বেজেছে?'

'চা খাবে?'

'আমাদের মৃত্যু—আমাদের এই যুগের?'

'আরো আসছে কয়েকটা যুগের—'

'ও—' জয়তী বললে, 'কিন্তু তখনও ক্ষেমেশের মত হয়তো কেউ বলবে, এখনও হল না, আরো কয়েক যুগ পরে হবে।'

'বুঝেছ তুমি।' বলে ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, চশমা খুলে নিয়ে চোখের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে নিল; 'একেই জানা বলে,' বোজা চোখের ওপর আঙুলের আলতো চাপ রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'কিন্তু তবুও তুমি জ্ঞানী নও।'

'জ্ঞানীর দুঃখ সুতীর্থ অনুভব করেছে? কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারছি না।' বলতে বলতে চশমা পরে নিল ক্ষেমেশ।

'ওর কথা আর না বলাই ভালো।'

'কেন?'

'কেন নেই।' জয়তী বললে, 'চায়ের কথা বলেছিলে—'

চায়ের জল চাপিয়েছে হয় তো রঞ্জন;

সন্তীর্থ স্টেশনে পৌঁছে গেছে? পূর্ব-বঙ্গের দিকে যাবে হয় তো; আসামের দিকে যাবে, নাকি ঢাকার দিকে, না খুলনা রূপসা পেরিয়ে—

'মৈত্রেয়ীর কথা মনে হচ্ছে আমার—' জয়তী বললে, 'তোমার কাছে উপনিষদ আছে?'

'না। চায়ে মাঝে মাঝে বেশি মিষ্টি দেয় রঞ্জন। কিন্তু সব সময়ই দেখেছি তোমার মিষ্টির হাত ঠিক থাকে—'

'কেউ কেউ বিনে চিনিতে চা খায়—'

'আমি লেবুর রস দিয়ে চা খাচ্ছি মাঝে মাঝে—বেশ ভালো লাগছে।'

'লেবুর রস দিয়ে কাঁচা চা? চিনি নেই?'

জয়তী কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে আস্তে আস্তে বললে, 'সুভাষ বোস কি সত্যিই নেই আর ক্ষেমেশ?'

'হ্যাঁ, কালো রঙের চা; চিনি কম; মৈত্রেয়ীর কথা কেন মনে পড়ল তোমার জয়তী?'

'লেবুর রস দিয়ে চা বানিয়ে দেখিনি কোনোদিন আমি।'

'কিছুই না—শুধু লেবুর রস দিয়ে চা বানানো।'

'সহজ—কিন্তু লেবুর রসের উনিশ-বিশে নষ্ট হয়ে যেতে পারে চা।'

'তোমার হাতে চায়ের চিনির কোনো উনিশ-বিশ হয় না তো জয়তী; কেন লেবুর রসের হবে?'

'কটা বেজেছে ক্ষেমেশ?'

কিন্তু ক্ষেমেশ ঘড়ি না দেখে দূরে পাঁচিলের শ্যাওলার দিকে তাকিয়েছিল; সবুজ মখমলের মত পুরু হয়ে উঠেছে; রোদ এসে পড়ছে।

'এটা কার চুরুট?'

'সুতীর্থ ফেলে গেছে—'

ক্ষেমেশ বললে, 'আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি।'

ক্ষেমেশ চুরুট খাচ্ছিল নিঃশব্দে। কোনো কথা বলবার ছিল না জয়তীর।

'চুরুটের মুখে সাদা ছাই জমেছে সেগুলো—'

'সেগুলো? ফেলে দেব না আমি—যদি নিজের থেকে পড়ে যায়।'

'নিজের থেকেই পড়ে যাবে—কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে।'

'ও'—ক্ষেমেশ বললে।

'ব্যাঙ্কে যাবার সময় আছে?'

'না—' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে। 'ব্যাঙ্কে যেতে তুমি জয়তী?'

'দরকার ছিল—'

'আগে বলা উচিত ছিল তোমার।'

'কেন আজই উঠে যাবে বুঝি সব, কোনো ব্যাঙ্ক থাকবে না আর কাল?'

ক্ষেমেশ চশমা খুলে মুছছিল, মুছতে

[illegible] বললে, 'যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাদের অল্প বদল হবে খানিকটা; কিন্তু মানুষের হাতে টাকার কোনো মান-হানি হবে না কোনোদিন। জান তুমি। খুব জ্ঞানের কথা আর শান্তির কথা এইসব।'

চশমা মুছে ঠিক করেছে, পরল ক্রেমেশ।

'আমিও তাই বলছিলাম ক্রেমেশ। বেশ শান্তিতে আছি। আজো আমাদের চীনের মত অবস্থা হয় নি।'

'প্রথমে দেশ স্বাধীন হবে।'

'তারপরে?'

'চীনের মত অবস্থা? ভাবছি আমি তাই। কিন্তু কি হবে চীনের মতন হলে? যারা মানুষকে মেরেছে সেইসব মানুষ শায়েস্তা হবে হয় তো। কিন্তু টাকা মার খাবে না কোনোদিন। এই জেনেছি আমি। মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।'

'কিন্তু প্রতিটি শর্তকই আশা করে যে এইভাবে জ্ঞান হবে। চীন কি আশা করছে না? তোমার চুরুট নিবে গেছে ক্রেমেশ—' কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত। গিয়েছে। মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই

থাক টিপাইয়ের ওপর—এখন জ্বালাব না আর।'

'আমরা আশ করছি? সুতীর্থ নিজে জ্ঞান নিয়ে ঘাস গজাতে গেল—' জয়তী বললে, 'আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী তাই সুতীর্থ আমরা দু'একদিনের হিসেবে জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও হাজার বছরের হিসেবে।'

'খানিকটা চাপা আগুন রয়েছে চুরুটের ভেতর, এখুনি নিবে যাবে।' চুরুট হাতে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'জ্বালাবে?'

'তুমি উঠলে'—?

হ্যাঁ, এইবারে—'

জয়তী আস্তে অভ্রান্তভাবে বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষের ওখানে নয়; সুতীর্থের কোনো ঠিকানা নেই—'

'না। বাবার ওখানেও যাব না আর; আমি নিজে কিছু কাজ করব, নিজে যা ভালো বুঝি সেই হিসেবে।'

'কি কাজ?'

'এই যে তোমার চুরুট—'

'আমি জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'দেশলাই পাচ্ছ না ক্ষেমেশ—'

'কাজ নিয়ে কলকাতায় থাকবে?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে গ্রামে যাবার দরকার নেই। আমার কাজ অন্য-রকম; একজন মানুষকে নিয়ে শুধু, কিন্তু তবুও সাঙ্গ করতে সময় লাগবে—'

'ও—' জয়তীর হাত থেকে দেশলাই তুলে নিল ক্ষেমেশ।

'বিরূপাক্ষের বাড়ি টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দেব। আজই ফিরিয়ে দিলে ভালো হত—কিন্তু কোনোদিন দিতে পারব কিনা সেই নিয়েই সংগ্রাম—একজন মানুষের; সাহায্য করবার কেউ নেই; এতে সমাজের কোনো উপকার হবে না, পৃথিবীর তো দূরের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় আমার নিজের উপকার হবে। মানুষের জীবনের ওপর এখন মানুষদের নানারকম দাবি; কিন্তু আমি টাকাওলা মানুষ বলে এই একটা পরীক্ষা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেখার সুযোগ আমার আছে। তাড়াতাড়ি এর একটা রফা হতে পারলেই ভালো হয়; অন্য কাজ করবার অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু জানি না কতদূর কি হবে। হয় তো সত্তর বছর টাকাকড়ি আঁকড়ে থাকতে পারি—হয়তো সত্তর দিন—' জয়তীর চোখ অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে এখন। 'দেশলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে ক্ষেমেশ—'

'সুতীর্থের সঙ্গে এইসব কথা হয়েছিল বুঝি তোমার?'

ক্ষেমেশ বললে; মেঝের ওপর দেশ-লাইটার দিকে তাকাল সে, তুলল না।

'চীন আমাদের চেয়ে বেশী জেগে উঠেছে।' বলে বাঁ-হাতি জানালার শার্সি-গুলোর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ। রোদ ছিল ওখানে, নেই এখন আর।

'তা হতে পারে—'

'সমস্ত এশিয়াই জেগে উঠবে।'

'কিন্তু কিরকমভাবে? কি হিসেবে?—'

'সেটা ভারতবর্ষ স্থির করবে? ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এই বেলা বোধ হয় ভারতবর্ষেরই স্থির করা উচিত। কিন্তু এসব আন্দোলন থেকে আমি ঢের দূরে সরে রয়েছি।'

'আন্দোলনও এখনও ঢের দূরে। চীন আজকাল দুঃখের দেশ। অবশ্য পুরস্কার পাবে শীগগিরই—আমার মনে হয়। কিন্তু রাশিয়ার হাতে পুরস্কার না নিলেই ভালো হত—' জয়তী বললে।

একটু থেমে বললে, 'মানুষের খাঁটি মঙ্গল মানুষের হাতে মানুষ যদি নেয়—আমার বলবার কিছু নেই অবশ্য তাহলে—'

'চীনের নিজেরও আত্মা আছে।' জয়তী বললে।

'ছিল একদিন।'

'আমাদেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এক হয়ে যাবে হয় তো।'

জয়তী বললে, 'চীন রাশিয়ার কাছ থেকে কি নিচ্ছে—রাশিয়া ভারতের কাছ থেকে কোন জিনিস—তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না তখন। কিন্তু খুব দেরিতে হবে এসব জিনিস—যদি হয়। আমাদের মাথা ব্যথা সত্যিই রাশিয়া বা আমেরিকা বা অন্য কেউ—কে আমাদের বিপদগ্রস্ত করবে তাই নিয়ে। কেমন একটা অন্ধকারের যুগে আছি আমরা—'

'রাশিয়া আলো পেয়েছে, চীন পাচ্ছে তার কাছে; আমেরিকা নিজেই আলোকিত।' বলে চশমাটা খুলে ফেলল ক্ষেমেশ; চশমার পাথরের ওপর রোদ ঝলসাচ্ছে—তাকিয়ে দেখছিল।

'ভারতবর্ষও—' জয়তী হেসে বললে, 'অন্ধকারটা এইরকম।'

মেঝের থেকে কুড়িয়ে ক্ষেমেশের হাতে দেশলাই তুলে দিয়ে জয়তী বললে, 'এটা খেয়ো, চুরুট; এক বাক্স ভালো কিনে নিও তুমি।'

দেশলাই নেবার সময় জয়তীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর আটকে নিবিড়ভাবে চেপে দিল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘনিয়ে এসে ক্ষেমেশের হাত তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে গেল।

চুরুট জ্বালাল ক্ষেমেশ।

জয়তী চলে গেল।

সমাপ্ত
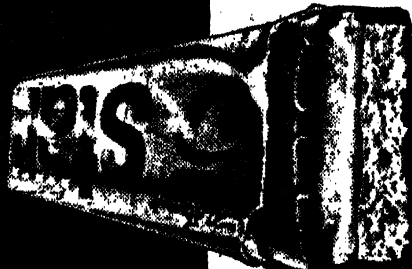
নীললোহিতের চোখের সামনে

আমীর খাঁ সাহেব বললেন, চল বাচ্চা, তোদের এক জায়গা থেকে বহুত আচ্ছা গানা শুনিয়ে আনি!

বুঝলাম খাঁ সাহেব উঠে পড়তে চাইছেন। ঘর ভরতি লোক, সন্ধের দিকে তিনি বেশ আড্ডার মেজাজে ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে এক অবুঝ ভক্ত বারবার অনুরোধ করছে কেদারার কয়েকটি বিশেষ তান শোনবার জন্য। অনেকেই বোঝে না যে, শিল্পীদের মানসিক ছুটির দরকার কত বেশী। খাঁ সাহেব ভোরবেলা উঠে প্রায় সারা দিন রেওয়াজ করেন। উৎকৃষ্ট শিল্প মানুষকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত করে দেয়। স্রষ্টাকে ক্লান্ত করে আরও বেশী। সুতরাং সারা দিন চর্চার পর খাঁ সাহেব তো ক্লান্ত হয়ে থাকবেনই। যখন তখন গান গাইতে বললেই কি গাওয়া যায়? তা ছাড়া কিছু আগে তিনি খানিকটা হুইস্কি পান করেছেন। এসব পান করার পর তিনি সচরাচর তানপুরা ছুঁতে চান না।

ভক্তটি তবু নাছোড়বান্দা। ঐ একই অনুরোধ সকাতরে করে যাচ্ছে বারবার। অবশ্য, অনেক ভক্ত এরকম পাগলই হয়।

আমীর খাঁ অতিশয় সজ্জন ও অমায়িক। কারুর মুখের ওপর রূঢ় কথা বলতে পারেন না। বেশ কয়েকবার না না করে তিনি রকম অসহায় হয়ে পড়ছেন। তারপর যেই তিনি উঠে পড়তে চাইলেন, তখনই বোঝা গেল এই উপায়ে তিনি ভক্তটিকে কাটাতে চাইছেন।

একটা পুরোনো ছোট্ট গাড়ি যোগাড় হয়েছে। সেকেলে স্ট্যাণ্ডার্ড টেন, অনেকটা তোবড়ানো পিঁপড়ের মতন চেহারা। ভেতরে জায়গা খুব কম, আমীর খাঁ সাহেব বেশ লম্বা মানুষ, তাঁর পা ছড়িয়ে বসার খুব অসুবিধে।

সে কথা বলতেই তিনি হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, না না, কোনো অসুবিধে নেই। গাড়ি চড়তে পেয়েছি এই ঢের! ভারতবিখ্যাত মানুষ, হুকুম করলে ভক্তরা দশটা গাড়ি নিয়ে আসবে এক্ষুনি। সেই লোক এই ভাঙা গাড়িতে চড়েও এরকম কথা বলছেন। ভদ্রতা ও বিনয় এক একজনের মুখে এত সুন্দর হতে পারে।

অবশ্য ছোট গাড়ি হওয়ার একটা সুবিধে হয়েছে। বেশী লোক উঠতে পারে নি, তাঁর সেই নাছোড়বান্দা ভক্তটিও বাদ পড়ে গেছে। আমরা দু' তিনজন বন্ধু আগেভাগে এসে উঠে বসে পড়েছি। সঙ্গীতের ব্যাপারে আমি নিতান্ত তাল-কানা মানুষ, তবু মাঝে মাঝে আমীর খাঁর কাছে আসি গল্প শোনার লোভে। উনি কথাবার্তাও খুব সুন্দর বলেন। সরল সাদা-সিধে দার্শনিকের মতন। এমন কি ওঁর মুখের উর্দুও বেশ সহজে বোঝা যায়।

উনি বললেন, তোমরা জানো না, কলকাতায় যখন থাকতাম আমার যৌবনকালে, বউবাজারে এক বাড়ির দারোয়ানের কাছে একটা খাটিয়া চেয়ে নিয়ে রাত্রে শুতাম। সে খাটিয়াটা এত ছোট, খাটিয়া থেকে আমার পা বেরিয়ে থাকতো। লম্বা হওয়ার অনেক বিপদ!

শুনেছিলাম, গলরেথ সাহেব যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, কোথাও বেড়াতে গিয়ে কোনো ডাক বাংলোতেই ওঁর মাপ মতন বিছানা পেতেন না। সব সময় পা বেরিয়ে থাকতো। সত্যজিৎ রায়েরও নিশ্চয়ই সেই অবস্থা হয়। অবশ্য গলব্রেথ সাহেবের জন্য পরে অর্ডার দিয়ে আলাদা স্পেশাল খাট বানানো হয়েছিল।

খাঁ সাহেব বললেন, চল, বউবাজারে আমি যে বাড়িটাতে থাকতাম, সেইখানে নিয়ে যাবো।

তাঁর নির্দেশে গাড়ি গিয়ে থামলো বউবাজার-সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছাকাছি একটা বাড়ির সামনে। এদিককার বাড়িগুলো সব পুরোনো পুরোনো, সরু অন্ধকার প্যাসেজ।

ফুটপাথে একটা ঠেলার ওপর একটা বুড়ো মতন লোক বসে ঝিমোচ্ছিল, খাঁ সাহেব তার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, ক্যায়সা হ্যায়?

লোকটি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে, বিস্মিত চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো খাঁ সাহেবের দিকে। তারপর বললো, আপ?

প্যাসেজ দিয়ে খানিকটা গিয়ে সিঁড়ি। অন্ধকার। অনেকখানি উঁচুতে একটা বাল্ব জ্বলছে, কিন্তু তার আলো নীচে পৌঁছয়

না। সিঁড়িগুলো বহু লোকের যাতায়াতে প্রায় ক্ষয়ে গেছে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠছি তো উঠছিই। শেষ নেই যেন। তারপর চারতলায় এসে থামা হলো। খাঁ সাহেবের বয়েস তখন ষাটের বেশী, কিন্তু ঋজু সবল চেহারা, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙেও একটুও হাঁপালেন না।

চারতলার বারান্দায় এসে ডাক দিলেন, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

ততক্ষণে বাড়িটা কি ধরনের, তা বুঝে গেছি। বিভিন্ন ঘরের দরজায় দেখা যাচ্ছে গালে রঙ মাখা মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে। এবং অনেক ঘরের মধ্য থেকেই হারমোনিয়াম ও ঘুঙুরের আওয়াজ। না, এটা বেশ্যাবাড়ি নয়। বেশ্যাবাড়িতে ঘুঙুর-হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা যেত গত শতাব্দীতে। এ বাড়িতে গত শতাব্দীরই অন্যরকম ঐতিহ্যের কিছুটা বেশ এখনও রয়ে গেছে।

বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটির সামনে এসে খাঁ সাহেব আবার ডাকলেন, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।

একজন পরিচারক বেরিয়ে এসে খাঁ সাহেবকে দেখেই লম্বা সেলাম দিল। তারপর অত্যন্ত যত্ন করে দরজার পর্দা সরিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

ঘরটা রীতিমতন বড়। তার অর্ধাংশে কার্পেট ও বাকি অর্ধাংশে পুরু গদি পাতা। বেশ একটা পরিষ্কার ঝকঝকে ভাব আছে। একটা মস্ত বড় কাচের আলমারিতে প্রত্যেক তাকে শুধু কাচের গেলাস সাজানো। প্রায় এক-শোটা হবে। এক সঙ্গে এত কাচের গেলাস আমি কোনো বাড়িতে আগে দেখিনি।

এ ঘরেও ডুগি তবলা এবং হারমোনিয়াম সাজানো। একটি লোক চুপচাপ বসে আছে, তাকে দেখলেই তবলচি বলে চেনা যায়।

গদির ওপর আমাদের সকলকে বসতে বলে খাঁ সায়েব জানালেন যে, লক্ষ্মী দারুণ গজল গায়। একেবারে বুলবুল। ও আমার মেয়ের মতন। আমি কলকাতায় এলেই একবার ওর গান শুনতে আসি। প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

আমীর খাঁ সাহেব বিশুদ্ধ খেয়ালী। কোনো অনুষ্ঠানে খেয়াল ছাড়া আমি ওঁকে ঠুংরি বা ভজন গাইতে শুনিনি। উনিও তাহলে গজল পছন্দ করেন! এবং উনি যখন প্রশংসা করছেন, তখন লক্ষ্মী নিশ্চয়ই দারুণ গায়িকা! কখনো নাম শুনিনি অবশ্য।

প্রথমে এলো শরবত। আমাদের প্রত্যেকের জন্য। তারপর একটা রুপোর রেকাবি ভরতি প্রায় ডজন দুয়েক পান। তারপর এলো লক্ষ্মী।

দেখলে মোটেই বাঈজী বলে মনে হয় না। বেশ মোটার দিকে চেহারা, বয়েসও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। দু' হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, গায়ে একটা লাল বেনারসী শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ।

খাঁ সাহেবের কাছে এসে সে প্রায় শুয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিল। খাঁ সাহেব বললেন, এই সব বাল-বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

লক্ষ্মী আমাদেরও নমস্কার জানালো বিনীতভাবে।

খাঁ সাহেব গদির ওপর চাপড় মেরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো! এদের এনেছি। একঠো গানা শুনাও!

আমাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, খাঁটি সমঝদাররাই শুধু লক্ষ্মীর কাছে আসে, ফালতু লোকেরা আসে না।

কিন্তু গানের অনুরোধ শুনে লক্ষ্মী একেবারে হায়, হায় করে উঠলো। সে বললো, ওস্তাদজী, আমার কি কপাল! আপনার মতন মানুষ চাইছেন আমার গান শুনতে, আর আমার সেই সৌভাগ্য হবে না! আমার তো আজ গান গাইবার উপায় নেই!

—উপায় নেই? কেন?

—ওস্তাদজী, এটা রোজার মাস। এ সময় তো আমি গান করি না।

খাঁ সাহেব হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমাদের দিকে ফিরে আবার বললেন, শোনো মজার কথা। রোজার মাস বলে এ
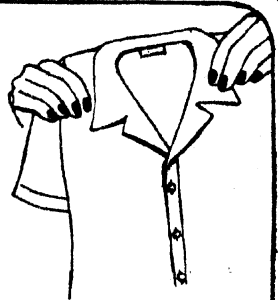
বেটী গান গাইবে না। আরে গাও গাও, কিছু হবে না।

লক্ষ্মী কানে এক হাত দিয়ে জিভ কেটে বললো, আমার ওস্তাদের কাছে কথা দিয়েছি। এ সময় আমি, কোনো মেহমানকেও ডাকি না ঘরে।

—তা হলে কি আমাদেরও চলে যেতে বলছো?

লক্ষ্মী খাঁ সাহেবের পা ধরে বললো, সে কি কথা! আপনি কি মেহমান? আপনি আমার গুরুর গুরু। আপনি বসুন, কি খাবেন বলুন, আমাকে শুধু হুকুম করুন!

—দূর বেটী, তোকে গান গাইতে বললাম, তুই শোনাবি না—

আমার মনে হলো, একটা রূপকথার জগতে এসেছি। এখানকার নিয়মকানুন কিছুই জানি না। লক্ষ্মী যে জাতে হিন্দু তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু সে পবিত্র রোজার মাস উপলক্ষে গান গাইবে না। আর আমীর খাঁ সাহেব ভক্ত মুসলমান, তিনি তাকে পেড়াপিড়ি করছেন গান গাইবার জন্য। সংগীতের জগৎটাই এরকম বিচিত্র।

সে জায়গায় আর কিছুক্ষণ বসে আমরা উঠে পড়লাম। গান শোনা হলো না। লক্ষ্মী অবশ্য বলেছিল, অন্য কোনো ঘর থেকে আর কোনো মেয়েকে ডেকে এনে গান শোনাতে পারে। খাঁ সাহেব রাজী নন। তিনি যার তার গান শুনবেন না।

বাইরে বেরিয়ে এসে খাঁ সাহেব বললেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়?

রাত প্রায় সাড়ে দশটা-এগারোটা। এখন যাবার বিশেষ জায়গা নেই। খাঁ সাহেব নিজেই বললেন, চলো, ময়দানে গিয়ে বসা যাক। বিনা পয়সায় কি চমৎকার হাওয়া পাওয়া যায় ময়দানে!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে গিয়ে বসলাম আমরা। সন্ধের দিকে এখানে খুব ভিড় থাকে। এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। কয়েকজন লোক মাত্র বসে আছে এদিক সেদিকে। পরিষ্কার আকাশ, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, এবং সত্যিই বিনা পয়সার প্রচুর টাটকা বাতাস ওড়াউড়ি করছে সেখানে।

খাঁ সাহেব চুপ করে বসে রইলেন। মনে হয় যেন ধ্যানস্থ। আমরাও কথা বলছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো, প্রকৃতি থেকে যেন একটা গম্ভীর নাদ উঠছে। সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। খাঁ সাহেব সুর ধরেছেন। কেদারা। সন্ধেবেলা যে অনুরোধ তাঁকে করা হয়েছিল, সেটাই বোধ হয় মনের মধ্যে ঘুরছিল এতক্ষণ। এখন আপনি আপনি সেই সুর বেরিয়ে এসেছে। আলাপ শুরু করেছেন আদি সপ্তকে, ঠিক বাঘের মতন গলা। না, বাঘের গলায় কোনো সুর নেই, আমি বলতে চাইছি, খাঁ সাহেবের গলায় জোরালো ভাবটা বাঘের মতন।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম আমরা, এমন সময় অল্প দূরে একটা বিশ্রী বেসুরো শব্দ জেগে উঠলো। তাকিয়ে দেখি যে, খানিকটা দূরে দুজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একটা হুইস্কির বোতল খুলে বসেছিলেন, তাঁদেরই একজন হঠাৎ নিজে গান গেয়ে উঠেছেন কিংবা খাঁ সাহেবকে ভ্যাঙচাচ্ছেন।

রাগে আমাদের শরীর জ্বলে গেল। খালি গায়ে মাঠের মধ্যে বসে আমীর খাঁর গান শোনার মতন দুর্লভ সুযোগ এরা নষ্ট করে দিচ্ছে। ইচ্ছে হলো তক্ষুনি গিয়ে ওদের গলা টিপে দিতে। এর মধ্যে ওরা দুজনেই এক সঙ্গে গান ধরেছে। তারস্বরে।

খাঁ সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে গান থামালেন। আমরা ঐ লোক দুটোকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য একজন উঠে পড়েছিলাম, খাঁ সাহেব থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে প্রাণের আনন্দে গাইছে, গাইতে দাও!

তারপর তিনিই চেঁচিয়ে বললেন, গাইয়ে, জোর সে গাইয়ে!

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দুজন এই ঠাট্টা বা কিছুই বুঝলেন না। আরও বেসুরো গলায় চাঁচামেচি শুরু করলেন। খাঁ সাহেব তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্য আমাদের একজনের পিঠে তাল দিতে লাগলেন রীতিমতন। উৎসাহ পেয়ে পাঞ্জাবীদ্বয় আমাদের কাছে উঠে এলেন, তাঁদের গলায় সুর নেই কিন্তু মাত্র তদুপরি মাতাল অবস্থা, তবু তাঁদের প্রাণের আনন্দের গানে তাল দিতে লাগলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক!

এর কিছুদিন পর, ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম আমীর খাঁ সাহেব একটি মটোর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। প্রত্যেক কাগজে তাঁর ছবি। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল সেই দুই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কি তখনো চিনতে পেরেছেন যে সেই রাত্রে তাঁদের গানের উৎসাহী শ্রোতাটি কে ছিলেন?

প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ (৪)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কয়দিন পূর্বে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক সিন্ধী শিক্ষিতা মহিলা। রবীন্দ্রভবনে অধ্যক্ষ ডাঃ তোমর পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মহিলার প্রশ্নের জবাবের জন্য। তিনি পুনার কনভেন্টের ছাত্রী ছিলেন। পিতা সাইগনে ব্যবসায় করতেন, ভাইরাও ব্যবসায়ী। মহিলা কয়দিন পূর্বে বিনোবা ভাবের কাছে পুনাতেও ছিলেন। আমায় শুধুলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কী বৈশিষ্ট্য যা আপনাকে আকৃষ্ট করেছিল।' তিনি শুনে এসেছেন আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার, বহু দশক কবি ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম। মহিলার প্রশ্ন শুনে আমি বললাম, 'কবির multi personality'। তিনি বললেন, 'সে তো আমরা সবাই—প্রতি মুহূর্তে ভাবনা থেকে ভাবনান্তরে, কর্ম থেকে কর্মান্তরে চলেছি—তবুও তো একটা সূত্র আছে?' আমি বললাম, "নিশ্চয়ই একটা সূত্র, সেটা আমাদের অহংবোধ। কবির বহু ও বিচিত্র ভাবনার সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য হচ্ছে—expression-এ, অর্থাৎ কবি তাঁর ভাবনাকে গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নাটকে অভিনয়ে ও বিচিত্র কর্ম মধ্যে রূপদান করে গেছেন—তাই বলেছি multi - personality—বহু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই যুগপৎ।"

এই বহু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই প্রশান্তচন্দ্রকে লিখিত পত্র মধ্যেও। পৃথিবীতে কোথায় কবে কোন কবি সাহিত্যিক বিদ্যালয় ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কল্পনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এইখানে Unique তুলনাহীন। আসা যাক সমসাময়িক কথায়।

বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে ১৯২১ সালের ২২ ডিসেম্বর বা ১৩২৮-এর ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে। কিন্তু তার কাজকর্ম বা পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল ১৯১৮ সালের জুলাই মাস থেকে গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় খোলার সাথে সাথে। বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গীত হবার কয়েক মাস পূর্বেই অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এসে গিয়েছিলেন—তিনি চীনা, তিব্বতী অধ্যাপনা শুরু করে দেন। আর এসেছেন স্টেলা ক্রামরিশ—যাঁর কথা পরে এক সময়ে বলা যাবে।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাসখানেক পরে প্রশান্তচন্দ্রকে কবি যে দীর্ঘ পত্র লেখেন (পত্র১৬। ১৩ মাঘ ১৩২৮), তাতে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা, তাঁর স্বপ্ন প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখছেন, 'তুমি বলো, আমার দেশের লোক জিজ্ঞাসা করবে, আজকের দিনে, দেশের বর্তমান চিত্তবিক্ষোভের মধ্যে এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কি এমন প্রয়োজন?'

'দেশের বর্তমান 'চিত্ত-বিক্ষোভ' বলতে কবি কি বলতে চেয়েছেন, তা একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সময়টা হচ্ছে ১৯২১-২২, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আদি-পর্ব—যার ঢেউ কবির বিদেশ সফরকালে, শান্তিনিকেতনকে অশান্ত করে তোলে। চারদিকে যখন অসহযোগের আলোচনা, তখন কবি লিখছেন, "বিশ্বভারতীর মধ্যে যে সত্য, যে কল্যাণ আছে, তা প্রয়োজনের অতীত—এই জন্যে তার পক্ষে কোনো সময়ই অসময় নয়—বরঞ্চ যে সময়ে বাহিরে তার প্রতিকূলতা সেই তার প্রকৃত সময়।"

কবির মতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন নেতিধর্মী, বিশ্বের সাথে যোগ

হয়েছে হাত-বন্দী বা বন্ধন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ফল-শ্রুতি হলো খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ; আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হলো বিশ্বের সাথে ভারতের যোগ স্থাপন। এসব তো শক্ত রবির একটি ছটা। আদর্শের কথা যতই বলুন, ব্যবহারিক দিকের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ—ভাবছেন প্রতিষ্ঠান তো হলো—এবার তাই তার জন্য সংবিধান বা Constitution। কবি জানচ্ছেন পাঁচ জনকে নিয়ে। যখন এখন থেকে বিশ্বভারতীর কাজ করতে হবে তখন কন্‌স্টিটিউশন চাই—সেটা তৈরী করে ছাপিয়ে তাড়াতাড়ি প্রচার করবার জন্য প্রশান্তচন্দ্রকে তাগিদ দিচ্ছেন।

সম্পূর্ণ অন্য রবীন্দ্রনাথ পাচ্ছি—একটি নাটক লিখেছেন তার তত্ত্বকথা পত্রে জানাচ্ছেন—'সমস্ত জিনিসটা হচ্ছে পথের কথা।' এই নাটক হচ্ছে 'মুক্ত ধারা'—কবির সাহিত্য পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। তবে নাটকের নাম কী হবে তা নিয়ে প্রশান্ত-চন্দ্রকে কয়েকবারই লিখেছেন—কখনো লিখছেন 'পথমোচন', কখন 'পথ', কখনো বলছেন 'মুক্ত ধারা'।

যাক, কনস্টিটিউশন তো নৈর্ব্যক্তিক—নিয়ম নিষেধের লিখিত তথা মুদ্রিত রূপ। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে কারা, সে-কথাও ভাবছেন। কবির ইচ্ছা কলিকাতায় বিশ্ব-ভারতী হিতাকাঙ্ক্ষী সদস্যদের নিয়ে 'বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনী' নামে একটি সংস্থা সৃষ্টি। এই সংস্থার মাধ্যমে কলকাতায় বক্তৃতা, জলসা, অভিনয়াদি হবে, বাইরের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতী সম্মিলনীর কথায় আসছি। এখন প্রশান্ত-চন্দ্রকে লিখিত (২০ নং) পত্র নিয়ে আলো-চনা করা যাক।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে প্রতিষ্ঠানের Constitution ও অধ্যাপকদের বেতনের জন্যও অর্থচিন্তা করতে হয়। কবি লিখছেন, "অধ্যাপকেরা আয় সম্বন্ধে লেশমাত্র চিন্তা করেন না, অথচ পরস্পরের বেতনাদি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁদের কোনো সংকোচ নেই। আমাদের Constitution-এ সকল বিভাগেরই অধ্যাপকদের ক্ষমতার প্রসার একদা বিপদের কারণ হবে। কর্ম যারা করেন, বিধান তাঁদেরই হলে ব্যবস্থা ভাল হয় না। মাথাটা চলে না বলেই হাতটাকে চালাতে পারে।" (পত্র ১৯) পত্রের পরেও প্রশান্তচন্দ্রকে জানাচ্ছেন, বৎসরে বৎসরে বারো হাজার টাকার ঘাটতি—"অধ্যাপকেরা ব্যয় সম্বন্ধে মনে কোন সংকোচ রাখেন না—অথচ আয় সম্বন্ধে যত উৎকণ্ঠা সমস্তই নিজের ঘাড়ে।' (পত্র ২০)। বারো বৎসর পরে ১৩১৬ সালে অধ্যাপক সম্মিলনীর সম্পাদক বিধুশেখর ভট্টাচার্য লিখেছিলেন যে প্রতি মাসে ৫০ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৬০০ টাকা ঘাটতি পড়ছে—এভাবে চললে বিদ্যালয় কত কাল চলবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে deficit budget সত্ত্বেও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়ে চলেছে।

আর-একটি পুরাতন কথার অবতারণা করছি, ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে কবি তৎকালীন

অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে জানালেন যে, এই নির্দিষ্ট টাকার মধ্যে আশ্রমের কাজ চালাতে হবে। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, কবির নূতন নূতন ব্যবস্থায় সব উলট-পালট হয়ে যেতো। (রবীন্দ্রজীবনী ২। ১১১)।

পরবর্তী যুগে দেখেছি কবির খেয়ালেই খরচ বাড়তে—একটা উদাহরণ দিই। হঠাৎ এক জারমান ছোকরা হাজির—কবি তাকে জারমান ভাষা পড়াবার জন্য নিযুক্ত করলেন। আমি কবিকে গিয়ে বললাম, "বেনোয়া তো জারমান শেখাচ্ছেন, আবার নূতন লোক কেন?" কবি বললেন, "খাঁটি জারমানের কাছে জারমান শিখবে এবার।" বেনোয়া ফরাসী সুইস ছিলেন তিনি জারমানও জানতেন। মাস কয়েক পরে জারমান যুবকটি পাথেয় সংগ্রহ করে চম্পট দিল। কত যে অদ্ভুত, কিম্ভুতকে কবি নিয়োগ করেছেন, সে ইতিহাস আর বাড়ালাম না, অধ্যাপকরা ব্যয়ের জন্য দায়ী কথাটা ঠিক নয়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে বাইরে থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) নামে যে সংস্থা ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সাংস্কৃতিক বিভাগ ১৯১২-এর মধ্যে নিষ্প্রভ হয়ে যায়—জাতীয় শিক্ষালয়ে ছাত্র কমতে কমতে একদিন শূন্যে গিয়ে ঠেকে। যেসব স্থায়ী তহবিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছিল, তার সুদ থেকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সাহায্য পেয়ে আসছিল। সেই টাকাটা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ এসে যাচ্ছে—কবি উৎকণ্ঠিত।

'বিশ্বভারতী সভার কালিকাতিক অধিবেশন' বা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর যথার্থ কর্ণধার হলেন প্রশান্তচন্দ্র। কবির ইচ্ছা এই সম্মিলনীতে বক্তৃতা, জলসা, অভিনয়াদি হয়।

সংশোধন

১৯৭৬ সালের ১২ জুন সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র প্রসঙ্গে' আমার লেখায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল তথ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে পত্র দিয়েছেন চারুচন্দ্রের পুত্র শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুগ্রহপূর্বক তাঁর সংশোধনী তথ্য প্রকাশ করলে সুখী হবো।

'তাঁর পড়া হয় কাশীতে'—এ তথ্য ঠিক নয়। চারুচন্দ্র কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। বি এ পাশের পর তিনি মালদহ জিলা স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন ও তারপর এলাহাবাদে চিন্তামণি ঘোষের Indian Press-এর কাজ গ্রহণ করেন।

আমি কল্যাণীয় কনকের এই তথ্য সরবরাহের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

জার্মান ভাস্করদের গ্রাফিক ছবি

সম্প্রতি গ্রাফিক বা ছাপা ছবির একটা জোয়ার এসেছে সব দেশেই। এর দুটি দিক আছে। প্রথমত একটা ছাঁচ থেকে একাধিক ছবির ছাপ তোলা যায়। দ্বিতীয়ত আঁকা ছবির চেয়ে এর দাম অনেক কম হয়। তাছাড়া এচিং, লিথোগ্রাফ এবং ইন্টাগ্লিও পদ্ধতির নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শিল্পীরা আনন্দ পেয়ে থাকেন। দু ধরণের শিল্পী এমন ছবি ব্যবহার করেন। এক জাতের শিল্পী আছেন যাঁরা ছাপা ছবি ছাড়া অন্য কিছু করেন না। আর দ্বিতীয়ত যাঁরা জাত শিল্পী তাঁরা মাঝে-মিশেলে ছাপা ছবি করেন মুখ বদলাবার জন্যে।

মাক্সমুলার ভবনের দৌলতে সমকালীন পশ্চিম জার্মানীর সমকালীন গ্রাফিক চিত্রের দ্বিতীয় প্রদর্শনী দেখলাম (১৩।৮।৭৬)। এবার ভাস্করদের ছাপা

দম্পতি (এচিং) জোয়াকিম সুমেতুর

ছবি। বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ, যদিও সব কাজই কিছু উপভোগ্য নয়। ছবির সঙ্গে ভাস্কর্যের পার্থক্য হলো ছবি দ্বিমাত্রিক, আর ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক। আলোচ্য ছবির ঝোঁকটা অনুমেয় কারণে ত্রিমাত্রিক। জ্যামিতিক রূপবন্ধের আয়তন ও ভার সম্বন্ধে নানা ভাবনা চিন্তা এসব ছবির মধ্যে স্পষ্ট। তাছাড়া ছাপা ছবি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে। যন্ত্র যে মানুষকে কতোটা গ্রাস করে নিয়েছে, এটাও বুঝতে পারলাম। যন্ত্রশিল্পের নকশার প্রভাবটা যেন স্পষ্ট। সব মিলিয়ে অনুভূতি ও আবেগের নির্বাসন। কিছুটা যেন অমানুষিক।

এঁরা সবাই ভাস্কর তাই এঁদের সঙ্গে একদিকে যেমন ভাস্কর্য, অন্যদিকে তেমনি রেখাচিত্রের সম্পর্ক রয়েছে। জোয়াকিম সুমেতুরের এচিং-এর সঙ্গে রেখাচিত্রের তফাৎ নেই। রেখা সাবলীল ও যথাযথ। তাঁর 'শায়িত মূর্তি' বা 'দম্পতির' চিত্রগত বক্তব্য স্পষ্ট। অনুরূপভাবে উইলহেম লথের 'বসা মূর্তি' বা 'দুটি খাড়া মূর্তি'-র কম্পমান কিন্তু নিশ্চিত রেখাগুলো ধ্বনিতরঙ্গের মতো রোমাঞ্চকর। এরিক হাউসারের এচিং-এর খাড়া বা কোণাকুনি কাজগুলো বিমূর্ত হলেও গতিশীল। কিছু কাজ তো অনবদ্য। যেমন মাইকেল সুয়ানহোলজের তিনটে এচিং। তার মাথা নীচু করা মানুষ বা শুয়ে থাকা মানুষের মধ্যে ভাস্কর্যের বিরাট গাম্ভীর্যের ভাবটা রয়েছে। কাগজে কালো রঙ, রেখা আর সাদা জমি খুব মুনশীয়ানার সঙ্গে সাজিয়েছেন। হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপের আঁচে ঠান্ডা হাত-পা বেশ সেঁকে নেওয়া যায়।

হর্স্ট এগন কালিনাওস্কির ইন্টাগ্লিও ছবির রঙের নানা ছোট ছোট ভাবময় মেজাজ পাওয়া যায়, যদিও এমন একটা বিমূর্ত নকশা যে শেষ পর্যন্ত মন ভরে না। ফ্রেডরিক গ্রাসেয়ল উজ্জ্বল ও উষ্ণ বর্ণময়তার সঙ্গে মৌল জ্যামিতিক আকারের নানা সম্পর্ক খুঁজেছেন। অটো হার্বার্ট হায়াকের বিমূর্ত কাজে দৃষ্টিবিভ্রম ও বিচিত্র আকার দিয়ে জমি ভরিয়ে মজা করেছেন। প্রাথমিক রূপবন্ধ, রেখা আর নক্সাকৃতি আকার নিয়ে টমাস লেংক বা আরউইন হিড়িকের জ্যামিতিক আকারের গতি ও স্থিতির মস্তিষ্কপ্রসূত খেলা কেমন যেন দমবন্ধ, উদ্দেশ্যহীন ও অমানুষিক। বার্নাড হাইলিগার পাথরচাপ ছবিতে তাঁর রূপহীন অন্ধ আবেগকে পটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

এঁদের সকলের কাজের নৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের সামনে যেমন মাথা নীচু হয়, তেমনি কেমন যেন মনে হয় আমি মানুষ নই, একটা যান্ত্রিক হাত, মঙ্গলগ্রহের ধুলোমাটি মুঠি ক'রে নিয়ে যেতে এসে বিকল হয়ে যাচ্ছি। নানারকম তরঙ্গের ক্ষুদ্র-দীর্ঘ বেতার সংকেত আমাকে চালু রাখার চেষ্টা করছে। আমার হৃদয় নেই, মস্তিষ্ক নেই, চিন্তা নেই, আবেগ নেই। নাম নেই তবু শ্বাসকষ্ট। শেষ সংকেত পাঠাচ্ছি : মঙ্গলে কোনো প্রাণী নেই।

শিশু প্রদর্শনী

সম্প্রতি বাটা কোম্পানী আয়োজিত একটি শিশু চিত্রপ্রদর্শনী দেখলাম আকাদমী অব ফাইন আর্টসের চিত্রশালায়। ইতিপূর্বে এই কোম্পানী যে শিশু চিত্র প্রতিযোগিতা করেন, তার থেকে ঝাড়াই বাছাই করেই এই প্রদর্শনী। উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন আনন্দবাজার গ্রুপ অব নিউস পেপারস্-এর সত্বাধিকারী শ্রীঅশোককুমার সরকার।

প্রদর্শিত ছবিগুলোতে কল্পনাপ্রবণ শিশুদের সৃজন ক্ষমতা যথারীতি পুনরায় প্রমাণিত হলো। শিশুর চোখ বাইরের জগতটা ভীষণ কৌতূহল নিয়ে দেখে—চোখ যা দেখে মন তাকে রাঙায়। কিন্তু শিল্পকলার নিয়মকানুন সে জানে না, প্রচলিত রীতি-নীতির সে ধার ধারে না। ছবির ভাষা সে নিজের মতো ক'রে বলে ব্যাকরণ না মেনে। তার ছবিতে কৃত্রিমতার রেশ থাকে না। থাকে প্রাণের ছোঁয়া।

চারিপাশের জগত। নীল আকাশ, ফুল, গাছ, লতাপাতা, সাইকেল, খেলাধুলা, পাখিওয়ালা, সার্কাস, নদীর ধার,

চুল বাঁধা অনন্যা দাস (৯ বৎসর)

বর্ষার ভিজে দিন—সব কিছু এঁকেছে মন দিয়ে। কখনো সাইকেলের চাকা ফুল হয়ে গেছে—রূপা সেনের মখমল সবুজের পরিবেশে আরোহীহীন সাইকেল দেখে মনে হলো। আবার বন্দনা দাসের রথের মেলার নাগরদোলা একপায়ে দাঁড়িয়ে আকাশকে ধ'রে ফেলেছে। আর টম আদারওয়ালার ভিকট্রী স্ট্যান্ডে তিন দৌড়বীর আর অসংখ্য গোল গোল মাথার তুলনা নেই। শৌভিক দাস রায়ের পাখিওয়ালার রেখাচিত্র ভাল।

খারাপ লেগেছে প্রদর্শনীর একধারে জুতোর প্রদর্শনী। এতে মনে হয় প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী নেহাৎ উপলক্ষ। এভাবে বিজ্ঞাপন না দিলেও লোকে বাটার জুতো কিনবে।

: সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ সংকলন

সুধীন্দ্রনাথ। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা ৭০০০০৯। দাম কুড়ি টাকা।

'স্বগত' পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : 'সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্য রচনায় কারো বা চিত্তবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব, কারো বা মননের'। (পৃষ্ঠা ২১৭)। এই একটি উক্তি থেকেই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমগ্র সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে স্বচ্ছ, সম্পূর্ণ একটি ধারণায় পৌঁছতে পারি। আবেগসর্বস্ব শিথিল কবিতার সংসারে তিনি ছিলেন এক বিরল ব্যতিক্রম। মেধা ও মননের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে ছিলেন হৃদয়কে, হৃদয়ের সঙ্গে কবিত্বকে। ফলে, বহিরঙ্গ-প্রসাধনলীলায় তাঁর কবিতা অতিমাত্রায় পরিমার্জিত হলেও, কখনোই তা সমকালীন জীবনযাত্রার কেন্দ্র থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেনি। অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগে তাঁর কবিতা একমাত্র সেই পাঠকের কাছেই দুরূহ মনে হতে পারে, যিনি সহজপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসী, শিল্পের যথার্থ রসগ্রহণে যাঁর পরিশ্রমবিমুখতা অটল, অনড়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আপাতজটিল কারুকার্যের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো নিরন্তর প্রবাহিত মানুষ ও সভ্যতার প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতা ও সুগভীর অনুরাগ। আর সুধীন্দ্রনাথ তো শুধুমাত্র কবি ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক ও দেশের অগ্রগণ্য একজন চিন্তানায়ক। ভারতীয় ও বিশ্বদর্শনের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ফসলগুলিকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন। ভাবিত ছিলেন বিশ্বের নানা সমস্যা ও মানবসমাজের অগ্রগতি বিষয়ে। তাই তাঁকে নিছক ক্লাসিকের কবি হিসেবে খণ্ডিত পটভূমিতে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের কথা যে, প্রবল ব্যক্তিত্ববান, রুচিসম্পন্ন এই ক্ষণজন্মা পুরুষটির যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি সাধারণ্যে। বাঙালী পাঠককে আলোচ্য সংকলনটির মাধ্যমে এই প্রথম সুধীন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে জানার ও জানানোর সুযোগ করে দিলেন সম্পাদক। তিনি অরুণকুমার সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অজয়কুমার সিকদার প্রমুখ সুযোগ্য প্রাবন্ধিকদের লিখিত সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মনোযোগী আলোচনাই শুধু নথিভুক্ত করেন নি, রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর কবিতা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো, দত্তপরিবার, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়েও যথাসম্ভব আলোকপাত করেছেন গ্রন্থটিতে। এছাড়াও আছে সুধীন্দ্রনাথের জীবনী ও রচনাপঞ্জী, রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচী, সুধীন্দ্রনাথ—এম এন রায় পত্রাবলী ও আরো কিছু ঐতিহাসিক চিঠি যা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রায়ই দেখা যায় যে একজন কবি তাঁর পরবর্তী কালের কবিদের রচনার চারিত্রলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে সনাক্ত করতে পারেন না। কিন্তু কবি হিসেবে অন্যপথের পথিক হয়েও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনতে ভুল করেননি রবীন্দ্রনাথ।

বেশীর ভাগ সমালোচকবৃন্দ, যাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম, কাব্যাদর্শ ও ব্যক্তিত্বকে তাঁরা কবির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বড় একটা ভুল করেন নি। মোটামুটিভাবে তাঁরা সকলেই যেমন প্রতিভাস চেতনায় মগ্ন মন, তেমনিই নন বিপ্রলাপিত ও পল্লবগ্রাহী জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধে (সুধীন্দ্রনাথের পটভূমি) সুধীন্দ্রনাথ যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের 'ঠাণ্ডা উপস্থিতি' তাঁর কাব্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন—এই উক্তি বেশ ধাঁধার সৃষ্টি করে। তাঁর বক্তব্য চমকপ্রদ হলেও, শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হবে কিনা সন্দেহ। দুই দত্তজ কবির ঐক্যের প্রসঙ্গে বহিরঙ্গ সাযুজ্য হিসেবে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন কঠিন সংবৃত, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার, অপ্রকৃত যতিচিহ্নের উপস্থাপন ও গঠনের নিবিড় জ্যামিতি। 'গম্ভীরতায় অন্তরঙ্গ মিল' বিষয়ে লিখেছেন : 'দুজনই আত্মতাড়িত, মানসিক জর্জরিত দ্বৈরথ সমরে

দুই বিরুদ্ধ সন্তান, এক দারুণ অপ্রতি-কার্য নিয়তি চৈতন্যের পুত্র, ব্যক্তিজীবনে অলঙ্ঘ্য পার্থক্য, কিন্তু মনোজীবনে দুর্জ্ঞেয় সংযোগে অনন্য : সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক কুশল মানুষের মতোই, ভদ্র-লোকিদের ইস্তিকরা পোশাকের তলায় ঢেকে রেখেছিলেন অন্তর্জগতকে— পশু-শালাকে, যার দরজা খুলে দিলেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসত রবীন্দ্রনাথের ছবি...' (পৃষ্ঠা ৭-৮)। এই বিশ্লেষণে সৈয়দ সাহেব একেবারেই নৈয়াত্ম দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি, বরং খুব বেশী কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। মোহিতলালের সঙ্গে মিলের প্রসঙ্গটিও আগাগোড়া পণ্ড-শ্রম মনে হয়। প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মালার্মে ছাড়াও, ভালেরি, প্রুস্ত, ও এলিয়টের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন! আমরা সুখী যে তিনি জয়েস বা পাউন্ডকে টেনে আনেননি। নিরঞ্জন হালদারের সম্পাদনা প্রায় ত্রুটিহীন। কিন্তু এই গোলমেলে রচনাটিকে স্থায়ী একটি সংকলনে স্থান দেবার আগে তিনি অন্তত আরেকবার ভেবে দেখলে পারতেন।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র ধর্ম চিন্তা

শান্তিনিকেতনের ভাষণমালা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকবিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। মূল্য দশ টাকা।

ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পর্বে যে-সব ভাষণ দিয়েছেন, সুবৃহৎ শান্তি-নিকেতন গ্রন্থে সেগুলির অনুলিখন সংকলিত। বাংলা ১৩১৫ থেকে ১৩২৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত এই ভাষণ-মালার সংখ্যা ১৫৩টি। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই ভাষণমালার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর স্বকীয় রীতিতে। এ কথা ঠিক, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই বিরাট কর্মে পুনরুক্তি বর্জন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তাঁর এই সৎ প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতে উৎসাহী ব্যক্তিকে প্রভূত সাহায্য করবে।

মানবজীবনের যে সমস্যাগুলি সংঘাতের আকারে রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়েছে, সেগুলিকেই তিনি তাঁর ভাবনা থেকে ভাষণে উপস্থিত করেছেন। লেখকের মতে সেগুলি মূলত তিনরকম—এক, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর দ্বন্দ্ব; দুই, শক্তি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব; তিন, স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই প্রসঙ্গে বলেছেন— 'এই যে দ্বন্দ্ব, মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ—এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মকেই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পাই— যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, বারবার আমি বলেছি।' মুখবন্ধের পর লেখক শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রবন্ধাবলিকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, সেগুলি এই—(১) প্রেমের পথে ঈশ্বর লাভ, (২) পিতানোঽসি-তত্ত্ব হতে জীবনদেবতাতত্ত্বে উত্তরণ, (৩) কর্মযোগতত্ত্ব, (৪) জ্ঞানপ্রেমকর্মের মিলিত আদর্শ, (৫) মহর্ষি প্রশস্তি এবং (৬) মিশ্র বিষয়ক চিন্তা। এই সবগুলি বিভাগেই লেখক আলোচনা করেছেন কখনও উদ্ধৃতি, কখনও বা তত্ত্বের সাহায্যে। ভাষণ-গুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন নামক প্রবন্ধটি লেখকের বিস্তৃত রবীন্দ্রতত্ত্বজ্ঞান ও দার্শ-নিক চিন্তার পরিচায়ক। পরিশিষ্টে ভাষণ-মালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সম্পর্কিত কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যা এই প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে। সর্বশেষে উল্লেখ করি, রবীন্দ্র-রচনার দুটি উদ্ধৃতিতে কিছু ভুল চোখে পড়ল। প্রথম, সোনার তরী

কবিতার শেষ অংশ—'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি/যা ছিল তা নিয়ে গেল সোনার তরী।' এখানে যা ছিল তা নয়, হবে—'যাহা ছিল'। দ্বিতীয়টি একটি গান—'ত্রিভুবনাথে যোগে যেথায় বিহার/সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার।' এতে, 'বিহার'-স্থলে 'বিহারো' হবে এবং 'আমার' নয়, হবে 'আমারও'।

প্রবন্ধ

রবিসনাথ। অমিয়কুমার সেন। ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, কলকাতা ৭২। দাম—সুলভ : ১৫·০০, শোভন : ১৮·০০।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অনুরাগী বিশ্বখ্যাত সাতজন বরেণ্য মনীষীর সংযোগ ও ভাবের আদানপ্রদানের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণগ্রন্থ রবিসনাথ। এই সাতজন মনীষী হলেন গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, রোমাঁ রোলাঁ, কুমারস্বামী, উইলিয়ম পিয়রসন ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। প্রারম্ভিক অন্য দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা ও ভারতীয় মানসিকতা ব্যক্ত করে লেখক পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে দেখিয়েছেন—উক্ত মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাযুজ্য কোথায়, অনেক স্থলেই মতপার্থক্য সত্ত্বেও কেন তাঁদের আত্মিক মিলন এমন সর্বতোভাবে সত্য।

আমরা নানা প্রসঙ্গেই জানতে পারি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা স্বরাজ পরিকল্পনা বা চরকা প্রবর্তনের অনিবার্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন না। তথাপি গান্ধীজীর বারবার শান্তিনিকেতনে আসা, রবীন্দ্রনাথের সবরমতী পরিদর্শন; ব্যক্তিগত, আশ্রমিক বা রাজনৈতিক সংকটকালে তাঁদের মনোভাবের আদান-প্রদানের সাক্ষ্যগুলি প্রমাণ করে—কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা তাঁরা পরস্পরের প্রতি অন্তরে বহন করতেন। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনের গভীর সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ভারতীয় চিত্রকলার পুনরভ্যুত্থানের নায়ক আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা সে তুলনায় অল্পজ্ঞাত এবং সেই কারণেই বিশেষ কৌতূহলজনক। এই দুই মনীষীর সম্পর্কের প্রবর্তক শিল্পী ওকাকুরার কথাও প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রতি কুমারস্বামীর অকুণ্ঠ অভিনন্দনের বিস্তৃত বিবরণ লেখক বিভিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়ায় ব্যথিতচিত্ত রোমাঁ রোলাঁ ভারতবর্ষের যে কয়েকজন মনীষীর

দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নাম তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিবেদিত-প্রাণ পিয়রসন ও এণ্ড্রুজের কথাও আমরা নানাভাবে জানি, তথাপি বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের ভারতপ্রীতির ঐকান্তিক পরিচয় লাভ করে পাঠকের মন শ্রদ্ধায় পবিত্র হয়ে ওঠে।

পরিশিষ্ট ও নির্দেশিকা বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। পরবর্তী সুযোগে মুদ্রণ-প্রমাদগুলি যথাস্থানে সংশোধিত হবে, আশা রইল।

উপন্যাস

সেই উত্তম নায়ক। কবিতা সিংহ। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৯। ১১·০০ টাকা।

একদা জ্যোতিশেখর রায়, এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের মধ্যমণি-নায়ক। সেই কালের সবচেয়ে বড়ো দোর্দণ্ড-প্রতাপ হিরো। খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়ায় পৌঁছে হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই তিনি সব কিছু ছেড়ে বেছে নিলেন এক স্বেচ্ছা-নির্বাসনের জীবন। তাঁর এই আকস্মিক বিদায় নিয়ে সাময়িক জল্পনা-কল্পনায় সীমা ছিল না। নায়ক জ্যোতিশেখর, যাঁর জন্য নারীরাও আত্মহত্যা করে, গ্রামে-শহরে আপামর দর্শককুল উদ্‌গ্রীব অধীর হয়ে থাকে, যিনি শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও পুরুষ, কেন রাতারাতি সরে গেলেন সহসা, কেন চুক্তিবদ্ধ শেষ কটি ছবিতে তাঁর ডানদিকের গাল দৃষ্টিগোচর হয়নি দর্শকদের, আসমান-তারা ওরফে জ্যোৎস্না নামের এক নবীনা নায়িকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এমন কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেই নায়িকাকেও জ্যোতিশেখরের প্রায় সমসময়েই সরে যেতে হল অর্থ-যশের প্রাচুর্য থেকে অন্ধকার নেপথ্যলোকে, তা নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে যাবতীয় আলোচনা যখন সম্পূর্ণ স্তব্ধ, বৃদ্ধ, পলিতকেশ জ্যোতিশেখর যখন লোক-চক্ষুর সম্পূর্ণ বাইরে, তখনই সেই গোপন কাহিনী, সেই গ্লানিময় অতীতের তিক্ত উপাখ্যান যাবতীয় যবনিকা সরিয়ে, আলো ফেলে, খুঁজতে এল উঠতি অভিনেত্রী অশোকা মিত্র ওরফে শুকু, যার আরেক পরিচয়—সে আসমানতারা ওরফে জ্যোৎস্না ওরফে সুধা পিসির ভাইঝি। বিধবা সুধা-পিসি যখন জ্যোতিশেখরের অঙ্গুলিহেলনে গ্রাম ছেড়ে চলে এল শহরে, শহর ছেড়ে উঠল জ্যোতিশেখরের বাগান বাড়িতে, রাতা-রাতি নায়িকা হয়ে দাঁড়াল প্রৌঢ় জ্যোতি-শেখরের পাশে, তখন অশোকা নিতান্ত বালিকা। তবু তার বালিকা বয়সের আসক্তি, কৈশোরের ঘৃণা, যৌবনের তিক্ত মধুর স্মৃতি জ্যোতিশেখর। সেই জ্যোতিশেখরের মুখে শেষবারের মতো স্পট লাইট নিক্ষেপ করে অশোকা কীভাবে আবিষ্কার করল এক তীব্র-তিক্ত গোপন লজ্জার ইতিহাস তাই নিয়ে এই উপন্যাস—'সেই উত্তম নায়ক।'

কবিতা সিংহ এই উপন্যাসটি লিখেছেন দারুণ সতেজ ভঙ্গিতে। ঝকঝকে গতিময় বর্ণনা। একবার জ্যোতিশেখরের মুখে, একবার অশোকার চোখে—গল্পটিকে দু-দিক থেকে আলো ফেলতে-ফেলতে টেনে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। রুদ্ধশ্বাস স্বপ্নময় কাহিনী, তবু মানবিক সংবেদনে নিষিক্ত। নাটকীয়, তবু বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এখানেই এই উপন্যাসের আসল সার্থকতা।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'এই যে সকাল মানে বৃষ্টিপাত
এবং আগুনে
এই যে রোদ্দুর অর্থে প্রতিঘাত
কিংবা জ্যোৎস্না অর্থে অভিমান অহংকার
অথবা বিরহ
মানে বৃষ্টিপাত জলছবি
এবং সকাল অর্থে
অভিমান

'সোনালী সুতোর টান কিংবা মুক্তি'

মৃণাল বসু চৌধুরীর নতুন বই **অদৃশ্যচিত্র** (গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, কলকাতা ২৭, চার টাকা)-এর কবিতাবলীতে ব্যবহৃত সংকেত প্রায় উপরি-উদ্ধৃত কবিতারই মতো। অতিরিক্ত সংহত, গূঢ়, প্রতীকী এক-একটি শব্দ ব্যবহার করে মৃণাল তাঁর কবিতাকে এক ধরনের ব্যক্তিগত রূপ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পাঠককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়, কেননা পৌরুষ অর্থে প্রতিঘাত, জ্যোৎস্না অর্থে অভিমান বা অহংকার কিংবা বিরহ অর্থে বৃষ্টিপাত কি জলছবির ব্যবহার কোনো পূর্ব-নির্ধারিত সূত্র ধরে সহজে ধরা দেয় না।

মৃণালের পূর্ববর্তী বই 'যেখানে প্রবাদ' থেকেই এই নিজস্ব পথটি খনন করে চলেছেন তিনি। অত্যন্ত ঝুঁকিময় এই যাত্রা, তবু মৃণাল নিজের উপর নিশ্চিত আস্থা-শীল, না হলে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাননি কেন! এবং এ কথাও ঠিক যে, মৃণালের কবিতার আপাত কঠিন এই আবরণ একসময় হঠাৎ সরে যায়, এবং অন্তঃসংহতিপূর্ণ একটি স্থির বক্তব্য 'দুরূহ নির্মাণ' ভেঙে আপ্লুত, অভিভূত করে তোলে।

দু-একটি বাদে এ-বইয়ের সব কবিতাই ভাঙা অক্ষরবৃত্তে রচনা। শুধু 'সময়' কবিতাটি পড়তে পারা কঠিন। প্রথম দিকের স্বচ্ছন্দ স্বরবৃত্তের চাল 'পর্যটনে বেরোয় মানুষ' থেকে হঠাৎ কী করে ফিরে গেল ভারী অক্ষরবৃত্তে, বোঝা দুষ্কর।

*

ধীরেন হোম রচিত **বিষ বহ্নি বাসনা** (এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২, আট টাকা) উপ-ন্যাসের পটভূমি বোম্বে। এই স্থানান্তর কিছুটা স্বাদ-বদল অবশ্যই ঘটিয়েছে। লোকের বদলে প্রেমিক-প্রেমিকারা ভিড় করে কাফ পেরেডে, নায়ক একলা হাঁটতে-হাঁটতে বেক্-বে এলাকা ছাড়িয়ে কুলাবা পয়েণ্টের কাছে গিয়ে সংবিত ফিরে পায়, দৈনিক কাগজের কলামজীবিনী নায়িকার নাম হয় শিপ্রা মাতুস্কর ইত্যাদি ব্যাপার-স্যাপার মুখ পালটাবার সুযোগ দেয়। কিন্তু মূল কাহিনীটি বিষম শ্লথগতি, কিছুটা তত্ত্বগত আলোচনার ভরা। সর্বোপরি তার ভাষাও অত্যন্ত আড়ষ্ট। 'সভাতার আত্মবিকশক বৈশিষ্ট্যিক', কিংবা 'সে আজ ইংরেজী লেখক হবার জন্য প্রয়াস-বদ্ধ' অথবা 'প্রবীর হয় সমবাধী চেতন' গল্প-উপন্যাসের বাংলা তো নয়ই, ইংরেজীতে ভাষা বাক্যের অনুবাদ হিসেবেও সমান অচল।

অরণ্যদেব

লী ফক

নকল-মানুষ গ্রহে পৌঁছেছে জলের তলায়... ওই তার মাথা জেগে উঠছে.....

গ্রহের মানুষরা আমাদের নকল-মানুষকে দেখতে পেয়েছে.....

গভীর অরণ্যে ...
জঙ্গল এখন শান্ত, গুরন! কোনও ঝঞ্ঝাট নেই'
ঝড় উঠবার আগে প্রকৃতি কিন্তু শান্তই থাকে, অরণ্যদেব।

?!
?!

নকল-মানুষকে হুকুম দিচ্ছি... ডাঙায় ওঠো!
হুকুম তামিল!

জঙ্গলের ধারে.. বিরাট নীল মাথা...
যা যা, বাজে বকিস না!
সত্যি বলছি!

ঠাট্টা করলে থাপ্পড় খাবি!
না খুড়ো, ঠাট্টা নয়! দেখবে এসো!

???
!!!
?!

খেলার মাঠে

প্রথম দ্'টি টেস্ট ড্র হবার পর ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ৪২৫ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করল এবং ৫৫ রানে লীডস টেস্ট জিতে রাবার ও উইসডেন ট্রফি পেল তখন ধরে নিয়েছিলাম ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে পরাভূত। কিন্তু ওভালে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৩১ রানে জয়ী হওয়ায় ধরে নিতে হচ্ছে ইংলণ্ড পর্য্দস্তও বটে।

রাবার নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর সিরিজের বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। ইংলণ্ডের ক্রিকেট রসিকদের শ্ধ্ দেখার আগ্রহ ছিল অন্তত একটি টেস্ট ইংলণ্ড জিততে পারে কিনা। পারেনি। হেরেছে সেইভাবে মান্ষ যেভাবে শ্কনো মাটিতে আছাড় খায়। ওভালের পীচ ছিল পাষাণের মত নিষ্প্রাণ। বলা যেতে পারে বোলারদের বধ্যভূমি। রক্তজল করে বল করে যাবে বিনিময়ে কিছ্ই মিলবে না। তার প্রমাণও মেলে প্রথম দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩ উইকেটে ৩৭০ রান সংগ্রহ করায় এবং ৮ উইকেটে ৬৮৭ রেকর্ড রান (ইংলণ্ডের বির্দ্ধে) করে প্রথম ইনিংসের দান ছেড়ে দেওয়ায়। তার উত্তরে ইংলণ্ডের ৪৩৫ রান প্রাণহীন পীচেরই প্রস্কার। কিন্তু ওই পাষাণ পীচেও প্রাণ সঞ্চার করে মাইকেল হোল্ডিং মাত্র ৯২ রানে ৮টি উইকেট দখল করে।

ধরে নেওয়া হয়েছিল খেলাটির ফল মীমাংসা হবে না। সম্ভবত তাই ইংলণ্ডকে ফলো-অন করানোর স্যোগ পেয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে এবং ঝড়ের গতিতে বিনা উইকেটে ১৮২ রান তুলে আবার দান ছেড়ে দেয়

ইংলণ্ডের জয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রয়োজন ছিল ম্যাচ বাঁচাবার। কিন্তু আবার ব্যাটসম্যানদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় হোল্ডিং। মাত্র ২০৩ রানে শেষ হয়ে গিয়ে হেরে যায় ২৩১ রানে। পর পর তিনটি টেস্টে পরাজয়।

শেষ টেস্টের সবচেয়ে উল্লেখ করার মত ঘটনা পাষাণ-পীচে হোল্ডিংয়ের ১৪৯ রানে ১৪টি উইকেট দখল এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটার হিসাবে ইংলণ্ডে ভিভ রিচার্ডসের রেকর্ড। রেকর্ড ছিল পরলোকগত ফ্রাঙ্ক ওরেলের ১৯৫০ সিরিজে নটিংহাম টেস্টে ২৬১ রান। রিচার্ডস মাত্র ৯ রানের জন্য ৩০০ রান প্রণ করতে পারেনি।

রিচার্ড এবং হোল্ডিংই হয়েছে সিরিজের নায়ক। ১২.৭১ গড়ে হোল্ডিং

ইংলণ্ড পর্য্দস্ত

পেয়েছে ২৮টি উইকেট। ১১৮.৪২ গড়ে রিচার্ডস করেছে ৮২৯ রান, যার মধ্যে আছে দ্'টি সেঞ্চ্রি ও একটি ডাবল সেঞ্চ্রি। সিরিজের পাঁচটি টেস্টে বেশি রান করায় প্রথম স্থান ব্র্যাডম্যানের (৯৭৪), দ্বিতীয় হ্যামণ্ডের (৯০৫) এবং তৃতীয় নীল হার্ভের (৮৩৪)। কিন্তু চারটি টেস্টে রিচার্ডসই শীর্ষে। অস্স্থ থাকায় একটি টেস্ট খেলতে পারেনি।

এক বছরে বেশি রান করার অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসনের বিশ্ব রেকর্ড ১৪২৬ আগেই ম্লান করে দিয়েছিল রিচার্ড। জান্য়ারি থেকে আগস্টের ১৩ তারিখ পর্যন্ত তার মোট টেস্ট রান ১৭১০ সব কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে।

পঞ্চম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৬৮৭ (রিচার্ডস ২৯১, ফ্রেডেরিকস ৭১, লরেন্স রো ৭০, লয়েড ৮৪, কলিস কিং ৬৩, মারে ৩৬, হোল্ডিং ৩২; আণ্ডারউড ৩—১৬৫, গ্রীগ ২—৯৬)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৪৩৫ (ডেনিস অ্যামিস ২০৩, নট ৫০, স্টিল ৪৪, উইলি ৩৩, মিলার ৩৬; হোল্ডিং ৮—৯২)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংসে (বিনা উইকেটে) ১৮২ (ফ্রেডেরিকস নট আউট ৮৬, গ্রীনিজ নট আউট ৮৫)।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস ২০৩ (নট ৫৭, স্টিল ৪২, উলমার ৩০; হোল্ডিং ৬—৫৭, হোল্ডার ২—২৯)।

মণ্ট্রিলের পর মার্ডেকায় ব্যর্থতা

মণ্ট্রিল অলিম্পিকে ভারতের ব্যর্থতার পর মার্ডেকা ফ্টবল প্রতিযোগিতায় শোচনীয় ফল এই কথাই প্রমাণ করছে, সামগ্রিকভাবে ভারতের ক্রীড়ামান হতাশজনক।

এবার ভারত পর পর হেরেছে জাপানের কাছে ১—৫ গোলে, দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ০—৮ গোলে, মালয়শিয়ার কাছে ১—৫ গোলে এবং তাইল্যাণ্ডের কাছে ২—৬ গোলে। চারটি খেলায় ২৪ গোল খাবার পর পঞ্চম খেলায় এবারের সবচেয়ে শক্তিহীন ইন্দোনেশিয়াকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে এবং শেষ খেলা ২—২ গোলে ড্র করে বর্মার সঙ্গে। ছয়টি খেলায় হেরে সাত দলের মধ্যে সাতম হয়েছে যে ইন্দোনেশিয়া তাদের অবশ্য উপরে আছে ভারত। কিন্তু তাদের চেয়েও বেশি গোল খেয়েছে। ইন্দোনেশিয়া খেয়েছে ২৪টি গোল ভারত ২৭টি।

কুয়ালালামপ্র থেকে প্রেরিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, শক্তিশালী বর্মার সঙ্গে ভারত ভাল খেলেছে। অধিনায়ক মানজিৎ সিং যদি পায়ে বেশি সময় বল আঁকড়ে না রাখত, কিংবা শ্ধ্ হরজিন্দারকে পাস না করে অপর খেলোয়াড়বল পাস করত তবে বর্মার বির্দ্ধে ভারত জিততেও পারত। রিপোর্ট অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু চারটি খেলায় শোচনীয় পরাজয়ের পর এটা আত্মসান্ত্বনা ছাড়া কিছ্ নয়—যেমন মণ্ট্রিলে অলিম্পিক হকিতে চারটি খেলায় হেরে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি প্লে অফ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ১০৭½ মিনিট তীব্র সংগ্রাম করে টাইব্রেকারে হেরেছিলাম বলে।

এবার মার্ডেকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গতবারের রানার্স মালয়েশিয়া ফাইনালে জাপানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। সাতটি দলের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলার পর চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লীগে মালয়েশিয়া পরাজিত করে দক্ষিণ কোরিয়াকে ২—১ গোলে, ভারতকে ৫—১ গোলে, ইন্দোনেশিয়াকে ৭—১ গোলে, বর্মাকে ৩—১ গোলে। তাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ০—০ গোলে ও জাপানের সঙ্গে ২—২ গোলে খেলা ড্র করে।

প্রথর দিকের খেলা দেখে বিশেষজ্ঞদের ধারণা হয়েছিল এবারও ফাইনাল হবে দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে। গতবার দক্ষিণ কোরিয়া ফাইনালে ১—০ মালয়েশিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার তাঁদের কিছ্টা দ্ভাগ্য। লীগের প্রথম খেলায় মালয়েশিয়ার কাছে হেরে যায় এবং জাপানের সঙ্গে গোল পার্থক্যে এবং পয়েন্টে সমান থেকেও রানার্স হতে পারে না এবং ফাইনাল খেলতে পারে না জাপান বেশি গোল করায়। প্রতিযোগিতার নিয়ম গোলের ব্যবধান ও পয়েন্ট সমান হলে যে দল বেশি গোল করবে সেই দল উপরে স্থান পাবে। তাই লীগ টেবলে জাপান দ্বিতীয় স্থান পেয়ে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভারতের শোচনীয় ফলের নিরিখে আন্দাজ করা যেতে পারে, প্রতিযোগিতার খেলার মান উন্নত ছিল। সাতটি দলের পর্যায়ক্রমে স্থান : ১। মালয়েশিয়া, ২। জাপান, ৩। দক্ষিণ কোরিয়া, ৪। বর্মা, ৫। তাইল্যাণ্ড, ৬। ভারত, ৭। ইন্দোনেশিয়া।

[illegible]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চৌকস অ্যাথলীট

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস অ্যাথলীট কে? সহজ উত্তর—অলিম্পিকে ডেকাথলন বিজয়ী যে।

ডেকাথলনে অলিম্পিক স্বর্ণ পদক বিজয়ীর বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারীর স্থান কোথায়? অলিম্পিকে সোনা জেতার চেয়েও তো রেকর্ডকারীর যোগ্যতাকে বড় বলে ধরা হয়। সব প্রশ্ন ও সব সন্দেহের অবসান করে দিয়েছে মার্কিন মুলুকের সব ইভেন্ট বিশারদ অ্যাথলীট ব্রুস জেনার, মন্ট্রিলে সোনা জিতে এবং বিশ্ব রেকর্ড করে।

বিশ্ব রেকর্ড অবশ্য করেছিল এক বছর আগেই। যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক দল নির্বাচনের ট্রায়ালে সেই রেকর্ড আরও উন্নত করা সত্ত্বেও সন্দেহ ছিল অলিম্পিকের মহাক্রীড়া আসরে পৃথিবীর প্রথম সারির প্রতিযোগী-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রথম হতে পারবে কিনা। অলিম্পিকের অকূল পাথারে অনেক বিশ্ব শ্রেষ্ঠই তো পথ হারিয়ে ফেলে। তার উপর ডেকাথলন সবচেয়ে কষ্টসাধ্য প্রতি-যোগিতা। বলা হয় মোস্ট গ্রুয়েলিং ইভেন্ট। দুই দিনের ঘাম ঝরানো সংগ্রাম।

দশটি ইভেন্টের মধ্যে আছে তিন রকমের লাফ—হাই জাম্প, লং জাম্প পোল-ভল্ট, তিন রকমের নিক্ষেপ—লোহার ভারী বল, লোহার চাকতি ও বর্শা ছোড়া; তিন রকমের দৌড়—১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার; আর একটি হচ্ছে প্রতি-বন্ধক দৌড়, অর্থাৎ ১১০ মিটার হার্ডল রেস। দশটি ইভেন্ট দুইদিনে শেষ করতে হয়। প্রথম দিনের ইভেন্ট ১০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, সটপাট, হাই জাম্প ও ৪০০ মিটার দৌড়। দ্বিতীয় দিনের হার্ডলস, ডিসকাস, পোলভল্ট ও ১৫০০ মিটার দৌড়। প্রতি ইভেন্টে যোগ্যতার নিরিখে পয়েন্ট দেওয়া হয়। সব চেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ-কারী লাভ করে অ্যাথলেটিকসের রাজ-সম্মান। মন্ট্রিলে সেই সম্মানের অধিকারী হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসের ছাব্বিশ বছর বয়সী দীর্ঘ দেহী ছেলে ব্রুস জেনার।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪২৫জন অলিম্পিক প্রতি-যোগীর মধ্যে জেনার ছিল সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। কোচ বলেছিলেন, যে ছেলেটি এক বছরের মধ্যে দুইবার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে ও গড়তে পারে, আমার মনে হয় না সোভিয়েট দেশের নিখোলাই আভিলভ মন্ট্রিলে তাকে হারাতে পারবে। তাছাড়া ব্রুসের মধ্যে আছে আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা।

নিখোলাই আ ভি ল ভ মিউনিখ অলিম্পিকের ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন। জেনারের আগে বিশ্ব রেকর্ড ছিল ওরই দখলে।

সত্যিই মন্ট্রিলে অ্যাভিলভ হারাতে পারেনি জেনারকে। জেনার ৮৬১৮ পয়েন্টে সোনা জিতেছে। ৮৪১১ পয়েন্টে রুপো পেয়েছে পশ্চিম জার্মানীর গুইডো কাটস্নার। মিউ-নিখ চ্যাম্পিয়ন অ্যাভিলভ ব্রোঞ্জ পেয়েছে ৮৩৬৯ পয়েন্টে।

জেনারের জন্ম নিউ ইয়র্কের শহর-তলীতে। খেলাধুলায় প্রথম অনুরাগ ওয়াটার

যুক্তরাষ্ট্রের চৌকস অ্যাথলীটের [illegible]

স্কীইংয়ে। তিনবার স্কীতে ইস্ট কোস্টের ওভার অল চ্যাম্পিয়ন। অন্য খেলাধুলোও করত। ১৯৭০ সালে গ্রেস ল্যান্ড কলেজে পড়ার সময় কলেজের কোচ আবিষ্কার করলেন ওর মধ্যে অ্যাথলেটিক সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ইভেন্টে ওকে বিশেষজ্ঞ করা যায়? সব ইভেন্টে নামিয়ে ঠিক করলেন, না, কোন বিশেষ ইভেন্টে নয়, দশটি ইভেন্টেই তালিম দেওয়া যাক।

নেই। মিউনিখ অলিম্পিকের ট্রায়ালে ডেকাথলনে ছিল ২১ জন প্রতিযোগী। যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে পাঠানো হবে মিউনিখে। জেনারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ৭টি ইভেন্টের পর ছিল দশম স্থানে। কিন্তু পোলভল্ট ও জ্যাভলিনে বেশি পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করল। তখন ওর মনে হল—"যদি শেষ ইভেন্ট ১৫০০ মিটারে ভাল সময় করতে পারি তবে তিনজনের মধ্যে স্থান পেতেও তো পারি।" সেইভাবেই ১৫০০ মিটার দৌড়ে মিউনিখ দলে স্থান পেয়েছিল মানুষ যেভাবে স্বপ্নের মধ্যে দৌড়য়।

জেনার মন্ট্রিলে সোনা পাবার পর বলেছে—"অলিম্পিকে সোনা জেতা অ্যাথলীট জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। সে সম্মান পেলাম। বিশ্ব রেকর্ড করেও পৃথিবীর এক নম্বরের শিরোপা পেয়েছি। কিন্তু ১৯৭২-এর অলিম্পিক ট্রায়ালে ১৫০০ মিটারে দৌড় আমার অ্যাথলেটিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ছিল!"

মিউনিখে অবশ্য ২২ জন প্রতি-যোগীর মধ্যে জেনার পেয়েছিল দশম স্থান। তারপর থেকে ওকে অলিম্পিক সোনা জেতার নেশায় পেয়ে বসে।

কলেজ জীবনেই এয়ার লাইনসের সুন্দরী স্টুয়ার্ড ক্রিস্টিকে হৃদয় সমর্পণ করেছিল। খেলার বিনিময়ে অর্থ রোজ-গারের সুযোগও ছিল প্রচুর। কিন্তু অলিম্পিক সম্ভাবনাময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি-যোগীদের কঠোরভাবে অ্যামেচার স্ট্যাটাস বজায় রাখতে হয়। ক্রিস্টিকে বিয়ে করে সংসার চালাবে কি করে? ভাবী সহধর্মিণী আশ্বাস দিলেন—ভাবনা কি, আমি তো চাকরী করছি। তুমি মনের আনন্দে অ্যাথ-লেটিকস অনুশীলন করে যাবে। আমি সংসার চালাব।

ওই আশ্বাসেই ওরা ঘর বাঁধল। প্রতি-দিন ৭ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুশীলন করত ব্রুস জেনার।। স্বপ্ন ছিল সোনা জিততেই হবে।

কাগজে অনেকেই হয়তো সেই ছবিটি দেখেছেন, কিংবা দেখেছেন টেলিভিশনের পর্দায় ছবিটি, যে ছবিতে মন্ট্রিলে সোনা জেতার পর ক্রিস্টির গন্ড রাঙিয়ে দিচ্ছে জেনার। প্রশ্ন করা যেতে পারে, ওটা কি আনন্দ-লগ্নের গভীর অনুরাগ? নাকি ক্রিস্টির প্রতি জেনারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ?

মন্ট্রিলেই জেনার বলেছে, আমার আর কোন কামনা নেই। জীবন-স্বপ্ন সফল হয়েছে। এবার ট্র্যাক স্যুট খুলে ফেলব। পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করব সংসার-সুখ।

তীর ভাঙা ঢেউ/শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী ও বিশাখা মজুমদার

অলীকবাবু/থিয়েটার সেণ্টার

"নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।" স্বীকারোক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তারিখটি ছিল ৭ই জুলাই ১৮৭৭। পরে এই নাটক 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এখন অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী। সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় প্রহসনের পূর্বসূরী দুজন দিকপাল মধুসূদন ও দীনবন্ধু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী নাটক থেকে রূপান্তরিত করলেন 'অলীকবাবু' কিন্তু প্রচলিত প্রহসন ঐতিহ্য থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পথ ভিন্নতর। "...সাধারণত ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজ বিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে।...ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সবল, উজ্জ্বল বালকসুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি—নিছক বিশুদ্ধ হাসি।" প্রিয়নাথ সেন সাহিত্য পত্রিকায় (চৈত্র ১৩০৬) এই সমালোচনার উপসংহারে বলেন, "অলীকবাবু যে কোন লেখকের প্রতিভা গৌরব বাড়াইতে এবং যে কোন সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্ধন করিতে সক্ষম।"

সমালোচক নিঃসন্দেহে দূরদর্শী। যেহেতু এই নাটকে

অভিনয়ের সুযোগ প্রচুর সেই জন্য শিল্পী মাত্রেই প্রলুব্ধ হন সার্থক মঞ্চরূপের জন্য। অলীকবাবু সমানভাবেই জনপ্রিয় সেকালে এবং একালে। থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে এই নাটকের সাম্প্রতিকতম রূপ প্রযোজিত। থিয়েটার সেণ্টার-এর উদ্যোগে এ নাটক আগেও একবার অভিনীত হয়েছিল। সুতরাং এবারের প্রযোজনাকে বলা যায় 'নবপর্যায়ে' অলীকবাবুর অভিনয়। বলতে বাধা নেই, এই নবপর্যায় আক্ষরিকভাবে সত্য। অর্থাৎ নবত্ব এর সর্বাঙ্গে। তরুণ রায়ের কুশলী নির্দেশনায় প্রতিটি চরিত্র নতুনভাবে উপস্থিত। ইদানীং কালে 'অলীকবাবু'র যে প্রচলিত রীতিতে সকলে অভ্যস্ত, (বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রযোজনা, বেতার, এমন কি বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপন কার্যক্রমে) থিয়েটার সেণ্টারের শিল্পীরা প্রত্যেকেই সচেষ্ট অন্যভাবে চরিত্রের রূপায়ণে। যে কোন নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনার পরীক্ষার সার্থকতা এখানেই নিহিত। পুনর্মুদ্রণ থেকে পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ সর্বতোভাবে আদরণীয়।

'অলীকবাবু' চরিত্রটি দেবরাজ রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে রূপায়িত করেছেন। প্রায়শই চরিত্রটি অতিশয্যতায় আক্রান্ত হয়, কিন্তু প্রহসনের ধর্মই আতিশয্য বলে অনেকে মেনে নেন। দেবরাজ রায়কে ধন্যবাদ তিনি চরিত্রটিকে 'অলীক' করে তোলেননি। যদিও স্বাভাবিকত্বের জন্য কতকগুলি কথা (প্রধান আলঙ্কার, তাদ্রূপ, তর্কবিতর্ক, মুক্তকণ্ঠে ইত্যাদি শব্দের ইচ্ছাকৃত ব্যবহার) রসসৃষ্টি করতে পারেনি। সত্যসিন্ধুর ভূমিকায় তরুণ রায় তাঁর অভিনয় ক্ষমতার আর একটি উদাহরণ দিলেন। সম্ভবত

এই প্রথম অলীকবাবুর সাথে সত্যসিন্ধুও সমানভাবে নজর কাড়েন। প্রসন্নের ভূমিকায় দীপান্বিতা রায় একটি ভিন্নধর্মী অভিনয়ের সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। হেমাঙ্গিনী চরিত্রে মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রূপসজ্জা এবং অভিনয়ে যেন বই-এর পৃষ্ঠা থেকে উঠে এলেন। গদাধর চরিত্রে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ, যদিও এই একটি মুখ্য চরিত্রে অত্যন্ত রীতির প্রতিফলন।

মঞ্চসজ্জায় রমেন আয়ন দত্ত উনিশ শতকের মেজাজ রাখতে সফল। যদিও উপরের পাখা ও ঝাড়লণ্ঠনটি নিছক মঞ্চ সামগ্রী হয়েই রইল, স্বল্প পরিসর মঞ্চে অনেক কিছুই আছে কিন্তু সংস্থানের জন্য দেওয়ালের পাশের দর্শকের কাছে একটি দিক কোন সময়েই দৃশ্যমান হয় না। সাধারণত উনিশ শতকীয় নাটকে স্বগতোক্তি বাহুল্য বাস্তবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে। 'অলীকবাবু' নাটকে এই স্বগতোক্তির একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। পরিচালক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যা একই সঙ্গে যুক্তিবহ ও সুন্দর কম্পোজিশন রচনায় সাহায্য করেছে। মঞ্চের সামনে কিছুটা জায়গা ফাঁকা করে সেখানে গদাধরের অন্তরাল অবস্থিতির সাজেশন নাটকের গতিকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি, উপরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনীর স্বগতোক্তি প্রসঙ্গেও এ-কথা প্রযোজ্য। কিন্তু একবার গদাধর ও প্রসন্নের কথার সময় হেমাঙ্গিনীর সকৌতুক দৃষ্টি, সবশেষে অলীকবাবুর ওই জোনে চলে আসায় অন্তরাল সম্পর্কে বিভ্রম ঘটায়। সবশেষে একটি মূল্যবান সংযোজন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুইটি গান (সঙ্গীত পরিচালক—সুভাষ চৌধুরী) বিশেষ মুহূর্তে মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'কই এল সে' এবং 'ছেড়ে দেরে পাখি' নাটকটির একটি অন্য ডাইমেনশন আনে। বিশেষত খালি গলায় দুটি বিশেষ রীতির গান শোনা একটি বিরল অভিজ্ঞতা।

থিয়েটার সেনটার সব সময় বিভিন্নধর্মী নাটক করেন কোন কিছুর প্রত্যাশা না রেখেই। এই বেপরোয়া মনোবৃত্তি আমাকেও একটি অনুরোধ রাখতে সাহসী করছে—উনিশ শতকীয় নাটক শুরুর আগে আধুনিক গানের বদলে যদি প্রাচীন গান কিছু বাজান যায় অথবা নাটক অনুযায়ী বিভিন্ন গান দিয়ে যদি দর্শক-প্রস্তুতি ঘটানো যায় তবে তাঁরা হয়ত একটা নতুন ধারার প্রবর্তক হবেন।

কাট ঠোকরা/কার্টুন থিয়েটার

কমল ঘোষদস্তিদার একজন দক্ষ নির্দেশক, তাঁর পরিশ্রমী নেতৃত্বে কার্টুন থিয়েটার একটি সচেতন শিল্পীগোষ্ঠী। কিন্তু বীরেন চক্রবর্তী একজন এমন নাট্যকার যাঁর 'কুয়াশা সর্বনেশে'তেই আসক্তি। যেহেতু নাটক একটি যৌথ-শিল্প এবং একটি সামগ্রিক প্রযোজনার সাফল্যের জন্য, নাট্যকার, পরিচালক ও টিম-ওয়ার্ক-এর সমবাহু ত্রিভুজ গঠনের প্রয়াস 'সুস্বাগতম'—অনাথায় সব থেকেও শুধু নাটকের জন্য কি বিষম বিপত্তি ঘটতে পারে, সম্প্রতি মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে কার্টুন থিয়েটারের 'কাট-ঠোকরা' প্রযোজনায় সেটা উপলব্ধি করা গেল।

একটি মরচে ধরা বক্তব্যকে হাজির করতে নাট্যকারকে কুস্তির আসরে নামতে হয়েছে, কোন প্যাঁচটি জুতসই হবে, সেটি তিনি নিজেও জানেন না,—কখনও রূপকথা, কখনও অ্যাবসার্ড, কখনও অপেরা, কখনও কমেডির আবরণে গম্ভীরতার ভনিতা, আর কখনও বা শুধুই কথা। একই কথা বারবার ফেনিয়ে ওঠে যেন বেলুনের মত, যা পরমুহূর্তেই চুপসে যায়—এত কথা, যে দর্শক ক্লান্ত হয়ে বলতে বাধ্য হয় 'অনেক কথা যাও যে বলি, কোনো কথা না বলি/তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।'

আগেই বলেছি কার্টুন থিয়েটার একটি সচেতন নাট্যগোষ্ঠী। ব্যক্তিগত অভিনয়ে কাজীর ভূমিকায় কমল ঘোষদস্তিদারের নিপুণ অভিব্যক্তি আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে আসে নাটকের শ্লথ-গতির জন্য, নাপিতের ভূমিকায় হীরক দাশ যখন আবির্ভূত হন তাঁর অসামান্য সুরেলা টান দিয়ে তখন চমকে উঠতে হয়, কিছুক্ষণ বাদে তিনিও জালে আটকা পড়েন। জল্লাদের ভূমিকায় অসিত রায় তাঁর কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারতেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর চরিত্রের জট তাঁকে হারিয়ে যেতে বাধ্য করে। হেকিমের ভূমিকায় হারাধন কুন্ডু প্রথম থেকে তাঁর স্টাইলাইজ্‌ড অভিনয় দিয়ে দর্শককে ধরে রাখেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও করুণার পাত্র হতে হয়। ইঁদুর ভূমিকায় তপন চক্রবর্তী প্রথম থেকে যে অসাধারণ টাইপটি রেখে গেলেন, শেষ পর্যন্ত মনে হয় ওই চরিত্রেরই বা কতটুকু প্রয়োজনীয়তা, নাট্যকারের খেয়াল চরিতার্থ করা ছাড়া? সূত্রধর ও নফর, নাটকের মূল বক্তব্য সব সময়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁদের দায়ভাগ সবচেয়ে বেশি, সেই ভূমিকায় যথাক্রমে দীপক ঘোষদস্তিদার ও প্রদীপ সেন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। একটি সম্পূর্ণ সক্ষম নাট্যগোষ্ঠী একটি জোড়াতালি দেওয়া নাটকের জন্য বারবার হোঁচট খেয়েছে। নাটকটি দেখার কয়েকদিন পর সমালোচনা লিখতে বসেও ভুলতে পারিনি অনেক অভিনয়ের কারুকার্য, অনেক চিন্তাপ্রসূত আবহ, অথবা বিভিন্ন মুহূর্তে আলোর গভীর ব্যঞ্জনা (আলো—চিত্ত সরকার) কিন্তু কোন সংলাপ মনে নেই। শুধু মনে হয় বাঁদী চরিত্রটি হয়ত এই পরিশ্রমী নাট্যকর্মীদের প্রতীক। যতবার নাটক জমাট বাঁধতে চাইছে, ততবারই যেন অলক্ষ্যে নাট্যকার হুমকী দিয়েছেন—'বাঁদী তুমি কার?' বাঁদী অসহায়ভাবে বলতে চাইছে, 'আমি নাট্যকারের, শুধুই নাট্যকারের খেয়ালের পুতুল'। —দেবাশিস দাশগুপ্ত

নন্দা/রঙমহল

নন্দা যদি আনন্দ দিতে না পেরে থাকে তবে তার জন্য দায়ী আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী নয়। অন্তত একটি আবেগ-আশ্রিত নাটক এই কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠতে পারত। নাট্যরূপের (প্রভাত হাজরা) ত্রুটিই এই অনাটকীয়তার মূল কারণ। জানি না এই নাট্য গঠনের পশ্চাতে নির্দেশকের

বাসবী নন্দী/নন্দা

(জহর রায়) অতিরিক্ত নির্দেশ কার্যকরী ছিল কি না। কাহিনী-বহির্ভূত এত ব্যাপার নাটকে আছে যে তেমন একটা সন্দেহ জাগতেই পারে। বস্তিবাড়ির বারো ঘর এক উঠোনের পটভূমিকায় সমাজ-জীবনের একটি ক্লেদাক্ত চিত্র সহজেই আঁকা যেতে পারত, জীবনের নানা স্পন্দন সেখানে এনে দেওয়া যেতে পারত, কিংবা এত গভীরে না গিয়েও শুধু সাহসিকা নন্দার (বাসবী নন্দী) ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করেও একটি আনন্দ-বেদনার নাটক তৈরি করে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু নাট্যনির্দেশক দর্শকের তাৎক্ষণিক আনন্দবিধানের কথাই বেশী করে ভেবেছেন। কিন্তু সেটাও কি দেওয়া গেল? নাটক-বহির্ভূত স্থূলে রসের ভাঁড়ামো নাটককে বারংবার আক্রমণ করেছে, বহু ঘটনা এবং চরিত্র বিশ্বাস্যতার সীমা-রেখা অতিক্রম করেছে, ভাবপ্রবণ মুহূর্ত-গুলিও অতি-অভিনয়ের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়েছে।

ধরা যাক, বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা গোকুল দাসের (জহর রায়) তরল চরিত্রটি। এই জাতীয় ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র (অন্তত মঞ্চে যা দেখা গেছে) কখনোই অসামাজিক কালো-পৃথিবীর অনেক অধীশ্বর হতে পারে না। একটি চপল নাচ-গানের অবতারণা করার জন্যই কি ওই দৃশ্য-পরিকল্পনা? নন্দা ও তরুণের (প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়) প্রণয়পর্ব দুটি আবৃত্তি এবং একখানি গান-নির্ভর হতে পারে ১৯৭৬ সালে এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। আসলে পুরো নাটকটাই কেমন এলোমেলো ছেলেমানুষীতে ভরা। নির্দেশক যেন সব চরিত্রকেই 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর লাইসেন্স অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন। মাত্র একটি চরিত্র, আন্না ঠাকরুণ যে স্বাভাবিক মনে হয়েছে তার পিছনেও সরযূ দেবীর সুন্দর অভিনয়ই একমাত্র কারণ। বাসবী নন্দী অবশ্য দাপটে অভিনয় করেছেন। কিন্তু যেখানে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল সেখানে তিনি আর কি করতে পারেন। শ্যামলী চক্রবর্তী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাঁর চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে। জহর রায় যথারীতি দর্শকের হাসি কুড়িয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান দর্শকের চোখে তখন জল আসার উপক্রম। কত বড় এক প্রতিভার কি বিরাট অপচয়!

—রবি বসু

প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র

আজকের আলোচনার জন্যে আমি এমন একটি বিষয় বেছে নিচ্ছি যা আগে কখনো অন্য কোথাও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও আলোচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রসঙ্গটি হল, বাংলা চলচ্চিত্রে ক্লোজআপের ব্যবহার। কিন্তু সরাসরি বিষয়টিকে কাঁটায় বেঁধবার আগে আমি মনে করি একটি ছোট, হালকা ভূমিকার প্রয়োজন আছে যেখানে ক্লোজআপ বলতে আমরা কি বুঝি এবং চলচ্চিত্রে ক্লোজআপের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছু বলে নেয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে একথা আগেই বলে রাখা ভালো যে এ-আলোচনায় অনিবার্যভাবে কিছু বিদেশী নাম আসবে, কেননা চলচ্চিত্র ইতিহাসের যা-কিছু ভূকম্পন আর ওলোটপালোট তার সবটাই প্রায় বিদেশে ঘটেছে এবং ইংরেজি ও ফরাশি ভাষাতে-ই সে-বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এই আলোচনায় আমার উপায়হীন বৈদেশিক বিচরণকে কেউ যেন অহেতুক দেখানোপনা বলে ভুল করে না বসেন।

সহজ করে বলতে গেলে, বিষয়ের খুব কাছাকাছি ক্যামেরা এনে ছবি তোলাকে ক্লোজআপ বলে। কোনো মানুষের ছবি হলে আমরা ক্লোজআপ বলতে বুঝি ঘাড়-মাথা শুন্ধু শুধু তার মুখের ছবিটি। অর্থাৎ সমস্ত পর্দাজুড়ে আমরা যা দেখি তা হল ঐ মানুষটির শুধুমাত্র মুখের ছবিটি। এইটেই সচরাচর ঘটে, কিন্তু প্রয়োজনে এই ফরমুলার সাহসী ও অব্যর্থ ব্যতিক্রম দেখেও আমরা মুগ্ধ হই। যেমন সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির প্রারম্ভিক সিকোয়েনস-এ উত্তমকুমারের ঘাড়ের ক্লোজ-আপ, কিংবা 'জনঅরণ্য' ছবিতে নৈশ-আহারের সেই দীর্ঘ সিকোয়েনসটির পরেই এবং অফিসের দৃশ্যাবলী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নায়ক সোমনাথের মাথার পিছন দিকের ক্লোজআপ। উত্তমকুমারের ঘাড়ের ক্লোজআপটি থেকেই আমরা আমাদের 'নায়ক'-কে চিনে নিতে পারি, তাঁর মুখটি দেখার প্রয়োজন হয় না, এবং আমরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি তিনি কখন ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে সরাসরি তাকাবেন, অর্থাৎ ঘাড়ের—কিংবা বিশদ-ভাবে বলতে গেলে সেই বহু-পরিচিত ইউ-ধরণের কেশভঙ্গির চকিত ক্লোজ-আপটাই 'নায়ক'-এর বিষয়বস্তুর এসট্যাব-লিশিং শট হিসেবে কাজ করে। আর 'জন-অরণ্য' ছবিতে সোমনাথের মাথার ক্লোজআপটি আলোয় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। পূর্ববর্তী নৈশ-আহারের দীর্ঘ সিকোয়েনস-এ আমরা দেখি কলকাতার বিদ্যুৎ ছাঁটাই হয়েছে এবং সেই কারণে আমাদের চোখ সমস্ত দৃশ্যটি ধরে আসতে-আসতে মোমবাতির মৃদু আলোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারপর আমরা কাট্ করে চলে আসি পরের দৃশ্যে যেটি শুরু হয় সোমনাথের অফিসে সকালবেলায়। সুতরাং আলোর এই আকস্মিক পরিবর্তন আমাদের চোখে লাগতো বলে পরিচালক আমাদের চোখকে ক্ষণিক জিরেন দিলেন সোমনাথের ঘনকালো চুলের ক্লোজআপ দিয়ে যাতে আমাদের চোখ কুঁচকে না গিয়ে আলোর শ্লথ ও ক্রমিক পরিবর্তনকে আরামে গ্রহণ করে। এই ক্লোজআপটি সেই ক্রাবলীল শিল্পের একটি চরম উদাহরণ যা শিল্পিতাকে লুকিয়ে রাখে।

এতক্ষণে ক্লোজআপের চরিত্রটি মোটামুটিভাবে ধারণার মধ্যে আনার পর আমরা ক্লোজআপের তাৎপর্য প্রসঙ্গে দু-একটা কথা আলোচনা করতে পারি। হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র-সমালোচক বেলা বালাজ (১৮৮৪-১৯৪৮) এক সময়ে ক্লোজ-আপ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেছিলেন যে ক্লোজআপ আমাদের চারপাশের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটিগুলোকে—যা আমরা দেখেও দেখি না—সিনেমার পর্দায় নাটকীয়ভাবে তুলে ধরে কিংবা ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করে আমাদের চোখে দেখা পৃথিবীর অর্থটা বাড়িয়ে দেয়। এবং ক্লোজআপের ভাষা সেই সব পরিচালকের হাতে-ই অব্যর্থ হয়ে উঠতে পারে যাঁদের অন্তরে কবিতার স্পন্দন আছে। একমাত্র ক্লোজআপের মধ্যে-ই পর্দার বুকে অন্তরের পৃথিবীটাকে ধরা যায়। বালাজ আরো এক জায়গায় সুন্দরভাবে বলেন, কোনো মানুষ বা বস্তুকে সময়ের মণ্ডল ও তার পারি-পার্শ্বিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে তার নিজের-ই সম্পূর্ণতায় আবিষ্কার করতে হলেও একটি চূড়ান্ত ও সময়োপযোগী ক্লোজআপের প্রয়োজন। আর এডনার মরিন এই প্রসঙ্গটিকেই আরো একটু টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন কোনো মানুষের মুখ তার

ল্যান্ডস্কেপ-এর মত। ক্লোজআপ সেই ল্যান্ডস্কেপ-এর চরিত্রটা আমাদের চোখের সামনে খুলে দেয়।

আমার যতদূর মনে পড়েছে ১৯১২ সালে গ্রিফিথ-ই প্রথম সিনেমায় ক্লোজ-আপের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার করেন। তবে আমার স্মৃতি যদি আমায় বঞ্চনা করে থাকে, বিদগ্ধ পাঠক যেন আমায় ক্ষমা করেন। এবং ১৯২৫-এ আইজেনস্টিন-এর 'ব্যাটল শিপ পোটেমকিন'-এ ১৯২৭-এ পুডোভকিন-এর 'মাদার'-এ এবং ঐ ক্লোজ-আপের বিশেষ আঙ্গিকটি তার সম্পূর্ণতা পায়।

ক্লোজআপ মোটামুটিভাবে চার রকমের হতে পারে। ১। মিডিয়াম ক্লোজআপ, কনুই থেকে মাথা পর্যন্ত; ২। মাথা ও ঘাড় নিয়ে ক্লোজআপ; ৩। শুধুমাত্র মুখের ক্লোজ-আপ; ৪। চোকার ক্লোজআপ—ঠোঁট থেকে চোখ। এইখানে বলে রাখা ভাল চোকার ক্লোজআপের ব্যবহার সবচেয়ে শক্ত, এবং বাংলা ছবিতে বিরল উদাহরণের অধি-কাংশ-ই চেষ্টিত ও অক্ষম। কিন্তু দুটি মনে রাখার মত উদাহরণ আমার তহবিলে আছে। প্রথমটি, 'বিপাশা' ছবিতে সুচিত্রা সেনের চোখের পর্দাজোড়া খুব নরম, স্নিগ্ধ ক্লোজআপ যেখানে উড়ে-যাওয়া বকের সারির ছায়া পড়ে। আর দ্বিতীয়টি 'চারুলতা' ছবির বাগানের দৃশ্যে. চারুর চোখের ক্লোজআপ যেটি একটি ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে ডিজল্ভ করে যাচ্ছে। এইমাত্র বলতে যাচ্ছিলাম এই রকম অব্যর্থ চোকার ক্লোজ-আপ আমি বাংলা ছবিতে অন্তত আর কখনো দেখিনি আর ঠিক তখুনি মনে পড়লো 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির একটি দৃশ্য যেখানে সিদ্ধার্থ তার বোনের অফিস-বস-এর বাড়ি এসে তার চাপা রাগ নিয়ে নীরবে বসে মনে-মনে ফেটে পড়ছে। সেখানে একটির পর একটি চোকার ক্লোজআপে আমরা সিদ্ধার্থর মুখটি খণ্ড-খণ্ড করে দেখতে পাই। সমস্ত বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই।

কিন্তু ক্লোজআপের এই অব্যর্থ ও ষোলোআনা সিনেমাটিক ভঙ্গিটিকে যে অক্ষম ব্যবহারে কতদূর যন্ত্রণাদায়ক ও সিনেমা বিরোধী হতে পারে তা প্রায় যে-কোনো বাংলা ছবিতে দেখা যায়। আমি কোনো এক নামকরা পরিচালককে একদিন বলতে শুনেছিলাম, দেখতে হবে সব দৃশ্যে-ই নায়িকাকে সুন্দর দেখাচ্ছে কিনা, এবং সুন্দর দেখালে মাঝে মধ্যেই সেই সুন্দর মুখের ক্লোজআপ দিতে থাকো, তোমার ছবি লেগে যাবে। কথাটা আমি একজনের মুখে শুনেছিলাম। উপলব্ধিটা কিন্তু সমস্ত টালিগঞ্জের। সুচিত্রা উত্তমের বই—অতএব সুযোগ পেলেই দু-জনের মুখ পর্দাজুড়ে দেখাও। কিন্তু ক্লোজআপের মাপে অভিনয় কি সব অবস্থায় সম্ভব এবং সিচুয়েশনটি কি সত্যি-ই ক্লোজ-আপের তীব্রতা দাবি করে? কি প্রয়োজন তার? যতপারো শরীরীভাবে নায়ক-নায়িকাকে দর্শকদের কাছে নিয়ে যাও, না-হলে আ ই ডে ন টি ফি কে শ ন হবে কি করে? টিকিট কেটে প্রিয় নায়ক-নায়িকাকে দেখতে এসেছে, কাছ থেকে দেখবে না? ক্লোজআপই তো পেঁৗছে দেয় শরীরের উষ্ণতা।

এমনি-ই চলে ছবির পর ছবিতে আর আমরা ক্লোজআপের এই বিকৃত রূপটা দেখতে দেখতে ওটাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠি। এবং ততক্ষণ আমরা নীরবে সব সহ্য করেনি যতক্ষণ না কোনো নামকরা পরিচালকের একটি বাংলা ছবির শেষে আমরা একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নকে (?) ক্লোজ-আপে দেখি আকাশ থেকে নামতে-নামতে আমাদের চোখের সামনে মাঝপথে আটকে যায়। যে-জিজ্ঞাসা নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরি তা হল: এরও নাম কি সিনেমা?

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গিলা-রতন/আর বি ফিল্মস

অবস্থা-চক্রে সৎ মানুষ অসৎ হতে পারে, আবার অসৎও হয়ে উঠতে পারে সৎ। সম্ভবত এই বক্তব্যই তুলে ধরতে চেয়েছেন 'রঙ্গিলা রতন'-এর কাহিনীকার (প্রয়াগ রাজ)। কিন্তু এই বক্তব্যটি তুলে ধরার জন্য হিন্দী ছবির ছক-বাঁধা এমন ধরনের ঘটনাবলী উপস্থাপিত যা শেষ পর্যন্ত আসল বক্তব্যকে আড়ালে সরিয়ে দেয়।

রঙ্গিলা অর্থে রসিক এবং বহুরূপী দুই-ই বোঝায়। সেদিক থেকে নায়ক রতন সার্থকনামা। পুত্রের ফাঁসির সাজা হওয়াতে পিতা লক্ষণদাদা (অজিত) পাবলিক প্রসি-কিউটর দীননাথের (অশোককুমার) শিশুপুত্র গোপালকে অপহরণ করে। লক্ষণ দাদা তার নাম রাখে কিষেণ (ঋষি কাপুর)। চুরি, পকেটমারা আবার সেই সঙ্গে নাচ গান কসরতের সঙ্গে গুন্ডামীতে সে পাকা। একদিন জখম হয়ে চিকিৎসার জন্য সে যায় ডাঃ আনন্দের কাছে। ডাঃ আনন্দের উপদেশে কিষেণ অসৎ পথ ছেড়ে সৎ পথে উপার্জন করতে লক্ষণ দাদার গৃহত্যাগ করে। ঘটনা-চক্রে সে ডাঃ আনন্দের কাছে আশ্রয় চায়। পুত্রহারা ডাঃ আনন্দ তাঁর অন্ধ মাতাকে সান্ত্বনা দিতে কিষেণকে তাঁর গৃহে আশ্রয় দেন। কিষেণ হয় ডাঃ আনন্দের মৃতপুত্র রতন। রতনের প্রেমে পড়ে লক্ষপতি মনোহর সিং-এর সদ্য বিলেত ফিরৎ কন্যা মধু (পারবীন বাবি)। ওদের বিবাহও স্থির হয়। কিন্তু লক্ষণ দাদার চক্রান্তে বিবাহ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। পরিশেষে ওদের মিলন হয় এবং দীননাথও তার অপহৃত পুত্র গোপালকে ফিরে পান। কিন্তু যে উপায়ে এই পরিশিষ্ট টানা হয়েছে সে-সব ঘটনা সাধারণ যে-কোন হিন্দী ছবির থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। গুন্ডাদের নিয়ে কাহিনী সুতরাং মারদাঙ্গার অংশ মাত্রাধিক্য না থাকাই ব্যতিক্রম হতো। পরিচালক (এস রামনাথন) ছবিখানিতে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দুর্গা খোটে, জীবন, শ্যামা, মনোরমা, সুন্দর প্রভৃতি এককালের বড় চরিত্রের অভিনয়-শিল্পীদের—অবশ্য সেই সঙ্গে অশোককুমারকে দেখে কিছুটা মন জুড়ায়।

—শৌভিক

প্রভাতী অনুষ্ঠানে আমজাদ আলী

প্রত্যেক বছরই সুরেশসঙ্গীত সংসদ স্বাধীনতা দিবসের সকালে একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এবারের অনুষ্ঠান হয়েছিল আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন সরোদীয়া আমজাদ আলী খাঁ ও কণ্ঠ-শিল্পী অপর্ণা চক্রবর্তী।

অপর্ণা চক্রবর্তী গেয়েছিলেন কোমল

মেঘা/তপতী রায়

ঋষভ, আশাবরী ও কুকুভ বিলাবল রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। বিস্তার ও তানকারি খুবই মুমর্তিল গোছের হয়েছিল। তানে দানার অভাব ছিল ও তারসপ্তকে গলা ঠিক সুরে লাগছিল না। তবলায় অনিল রায়চৌধুরী ও সারেঙ্গীতে বাচ্চা-লাল মিশ্র।

আমজাদ আলী খাঁ অনুষ্ঠান শুরু করলেন ভৈরব ঠাটের বিভাস রাগে আলাপ ও জোড় দিয়ে। বিভাস রাগ চার রকমের —ভৈরব ঠাটের, মারওয়া ঠাটের, পূরবী ঠাটের ও বাংলার বিভাস যেটি বিলাবল ঠাটের।। ভৈরব ঠাটের বিভাস ঔড়ব জাতির, মানে পাঁচ স্বরের রাগ—স, ঋ গ, প দ স। যদিও এর ন্যাস পঞ্চম, প্রায় প্রত্যেকটি স্বরকে কেন্দ্র করেই এই রাগের বিস্তার করা যায়। অবশ্য অবরোহী বর্ণের প্রাধান্য সব সময়ই বজায় রাখতে হয় এবং গান্ধারে কখনই দাঁড়ানো যায় না। না হলে একই স্বরে নির্মিত অন্যান্য রাগ-সেওয়ার ভাব এসে যায়। রাগটি নিয়ে এত কথা বলতে হলো কারণ এর চল প্রায় উঠেই গেছে বললে ভুল হবে না।

আজমাদ আলীর রাগ রূপায়ণে কোন খুঁত ছিল না। সরোদ খুব ভাল বলছিল এবং তাঁকে লম্বা মীড়ের সাহায্যে রাগের ভাব স্থাপন করতে কোন বেগ পেতে হয়নি। মীড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ গ ঋ মীড় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এতে তাঁর কোমল ঋষভ শ্রুতি বড়ো আশ্চর্যভাবে বেজে উঠেছিল। গ দ ও ঋ দ সঙ্গতিরও যথেষ্ট ও যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন তিনি। তবে অন্তরায় যেতে না যেতেই যেন রাগের সুর-ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল এবং শিল্পী যেন বড় তাড়াতাড়ি দ্রুত জোড়ে চলে গেলেন। গমক বোলকারি ও তারপরনের নিপুণতায় অবশ্য জোড় জমে উঠেছিল।

সুর ও লয়ের দিক থেকে নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও ধামার তালে গৎকারি কিন্তু আমজাদ আলীর পক্ষে যথেষ্ট ভাল হয়নি। নবীন তবলিয়া কুমার বসু (তবলাবাদক বিশ্বনাথ বসুর পুত্র) ভাল সঙ্গত করে-ছিলেন। খারাপ মাইক্রোফোন ব্যবস্থার দরুণ তাঁর মেজাজী বেনারসী বোলের খানিকটা ক্ষুন্ন হলেও তাতে প্রতিভা ও বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট ভাবেই দেখা দিয়েছিল। বৈরাগী রাগে ঝাঁপতাল, দ্রুত একতাল ও দ্রুত ত্রিতালে গৎকারিও আমজাদ আলীর পক্ষে যথেষ্ট ভাল হয়নি। লয়কারিতে যেন সে মজা ছিল না। তানকারিতেও শিল্পীর স্বাভাবিক পরিপক্কতার অভাব অনুভব করা যাচ্ছিল।

আসর শেষ হলো ভৈরবীতে একটি ত্রিতাল গৎ ও একটি দাদরা গৎ দিয়ে। ঠুমরী ঢঙের স্বর-বিস্তার ও কিছু কাট্-স্বর প্রয়োগ বেশ ভাল হয়েছিল।

—নীলাক্ষ গুপ্ত

প্রবাসী পাখি

জীবৎকালে অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন প্রবাসী; আপাতত তাঁর গান লোকপ্রিয় হলেও এই শহরবাসীদের কাছে তিনি প্রবাসী হয়েই রয়েছেন। অতুলপ্রসাদ-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'উত্তরা' সম্প্রতি 'গীতিগুঞ্জ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতুলপ্রসাদের জীবন ও সাহিত্য চর্চার একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে 'গীতিগুঞ্জ' এমন আশা করা যাক। এখন প্রার্থনা থাক, প্রবাসী আমাদের ঘরে এসো।

গত ৮ অগস্ট বালিগঞ্জের একটি ছোট

অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়/ফুলশয্যা/পরিচালনা ঃ সারথী

দ্যুগন্না/মমতা শংকর

স্বরে তার সূচনা হল। তাঁরই গানের দীপে এই শুভারম্ভ। 'গীতিগুঞ্জ'র শিক্ষক সুশীল চট্টোপাধ্যায় ও হিমঘ্ন রায়চৌধুরী অতুলপ্রসাদের গান নিবেদন করলেন। সন্দেহ নেই, অতুলপ্রসাদের গানের চরিত্র শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে তাঁরা সঞ্চারিত করতে পারবেন। আর গান শুনিয়েছেন শিখা বসু, মহাশ্বেতা ও দেবস্মিতা ঘোষ।

—অপ্রতিম বসু

যাত্রা

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে যাত্রাগানের উদ্বোধন পর্বটা চালু হয়েছিল গত দশকে। তখন দল ছিল কম, রঙ্গগৃহের অবস্থাও ছিল না এত বাড়বাড়ন্ত। এখন চিৎপুরের সব যাত্রাদলই রঙ্গমঞ্চের দোর-গোড়ায় লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতগুলো নতুন মঞ্চের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না একেবারেই। কারণটা সহজেই অনুমেয়। যত যাত্রাদল, তার দশ ভাগের এক ভাগ রঙ্গমঞ্চও নেই কলকাতায়। এর মধ্যে মহাজাতি সদনে নট্ট কোম্পানি শনি, রবি এবং ছুটির দিন নিয়মিত যাত্রাভিনয় করে যাচ্ছেন 'নটী বিনোদিনী' এবং নতুন পালা 'বিদ্যাসাগর।' নেতাজী মঞ্চের নাটক বন্ধ হবার পর ওই মঞ্চে নিয়মিত যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে। ওখানে **চন্দ্রলোক অপেরা** শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত, পরিচালিত 'হাসির আড়ালে' অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন গত ১৯ আগস্ট থেকে। নবকুমার, কল্যাণী ঘোষ অভিনীত এই নৃত্যগীত বহুল পালাটি এরই মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। স্থায়ী রঙ্গশালার যবনিকার আড়ালে যে-সব কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে তাকে কেন্দ্র করেই পালাটি রচিত। নবরসের ব্যবস্থাও অবশ্যই আছে। আছে উদ্দামতাও। কিন্তু পালার শেষাংশে রয়েছে করুণ রস।

নাট্যভারতী বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পালার নিয়মিত অভিনয় পরিবেশন করে যাচ্ছেন যথাক্রমে রঙমহল ও মিনারভা মঞ্চে। পালারূপ পরিচালনা রমেন লাহিড়ীর। শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন আচার্য পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা থিয়েটারে কবে আনন্দমঠ হয়েছিল স্মরণে নেই কিন্তু প্রদীপ দেবনাথের প্রযোজনায় এ-পালার অভিনয় এরই মধ্যে কলকাতায় আলোড়ন এনেছে। এই একই সঙ্গে প্রদীপ অপেরার 'ইলিশমারীর চর'ও সমান সুযশ অর্জন করে কলকাতার দুটি মঞ্চে নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে।

এখানে নিয়মিত অর্থে আমি বলছি না সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন। কিন্তু বিশ্বরূপা, প্রতাপ, মুক্ত অঙ্গন এবং রঙ্গনা বাদ দিলে বাকি সব কটি মঞ্চেই প্রতি সপ্তাহের কোনো না কোনো দিন যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হচ্ছেই। এ-তালিকা থেকে রবীন্দ্র সদন, কলামন্দিরকেও বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।

থিয়েটার মহলের অনেকে মনে করছেন, যাত্রাশিল্প ধীরে ধীরে কেবল কলকাতাকেই গ্রাস করছে না, সে প্রসেনিয়াম মঞ্চগুলি পর্যন্ত অধিকার করতে বসেছে। শ্রাবণ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত যদি যাত্রা এভাবে অনিয়মিতভাবেও মঞ্চে যাত্রাভিনয় করে যায়, তবে নাট্যের দর্শক কিছু পরিমাণে অন্তত যাত্রাভক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং মঞ্চে যাত্রাভিনয় বন্ধ করা হোক, এরকম একটা আওয়াজ এরই মধ্যে উঠেছে।

কলকাতায় এখন অলিতে গলিতে যাত্রা হয়। ভাদ্র থেকে বৈশাখ পর্যন্ত অবিরত। এ-ছাড়া বিশাল কয়েকটি যাত্রা উৎসবে গোটা কলকাতা ভেঙে পড়ে। ১৯৬১ সালের পর থেকে এই উৎসবের সংখ্যা বছরে বছরেই বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই যাত্রাগানের গতি রোধিবে কে?

কলকাতায় এরই মধ্যে একটি ছোট আকারের যাত্রা স্টেডিয়াম ধরনের মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাম সার্কারিনা। **পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন** একটি যাত্রা স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি হচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে নট্ট কোমপানি তাঁর যাত্রাগানের নিয়মিত অভিনয়ের জন্য কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন। যত-দূর জানি **যাত্রা সংসদেরও** এই ধরনের একটি পরিকল্পনা আছে। এই সব পরি-কল্পনা যদি সত্যিই সফল হয় তবে আশা করা যায়, এই কলকাতার বুকে যাত্রাগান সিনেমা থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলবে। তখন কি মঞ্চের কিছু করবার থাকবে?

—সুত্রধার

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪০
২৩-৮৫৪৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় [illegible] সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
[illegible] (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে ([illegible] ডাকে)	১১১.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
[illegible] লণ্ডন [illegible] মাধ্যমে	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

জনসন্স দিচ্ছে
প্রয়োজনসাধক কটন বাড

এটি এইসব কাজে লাগে

নিরাপদভাবে কান পরিষ্কার করা যায়—বাচ্চার ও আপনার দুজনেরই

বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করা যায়, ভালভাবে অথচ কোমলভাবে

সামান্য ক্ষতে ওষুধের প্রলেপ লাগানো যায়

মেক-আপ লাগাতে অথবা তা তুলে ফেলতে সাহায্য করে

সূক্ষ্ম হাই-ফাই সরঞ্জাম পরিষ্কার করা যায়

জনসন্স কটন বাড প্রতিদিন আরো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়

সবসময় ঘরে জনসন্স কটন বাড রাখুন

নির্মল, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, সুবিধেজনক

Johnson's* COTTON BUDS

নতুন! নমনীয় প্ল্যাস্টিক দণ্ড

পরিষ্কার করুন যত্নের সঙ্গে জনসন্স* কটন বাড দিয়ে

দেশ

লাক্স সুপ্রীম আপনার রূপ-লাবণ্য করে তুলবে
এই রকম অপরূপ অতুলনীয়। এতে আছে অপূর্ব
সুরভির আবেশ। এর ক্রীমে ভরপুর রাশি
রাশি ফেনা আপনার ত্বকে রেখে যায়
রেশম চিকন পরশ। লাক্স সুপ্রীমের
বিউটি ক্রীম আপনার রূপ—
লাবণ্যকে ক'রে তোলে রেশম
কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর।

এর পর আপনার
আর কিছুই পছন্দ হবে না

HLLS 1061

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শর্বরী রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ('বীণা'—ব্রোঞ্জ-নির্মিত প্রতিকৃতি)—এর কাজ সর্বদাই খুব সংবেদনশীল। রসাবেশে ভেসে যেতে হয়। বীণা সাধারণ অর্থে সুন্দরী নন। কিন্তু তথাকথিত সুন্দরী নারীর চেয়ে এ'র মুখের বিশেষত্ব শিল্পীর চোখ এড়ায়নি। বীণার মুখে রয়েছে চরিত্র। পুরু ঠোঁট, চাপা নাক, ছোট কপাল, দৃঢ় চোয়াল এবং গালের কঠিন ও উঁচু হাড়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। তেমনি ছোট ছোট চোখের ফাঁদের মধ্যে থেকে মমতা ঝরে পড়ে। সাধারণ মুখের অনিন্দ্য সৌন্দর্য শর্বরীকে সর্বদাই আকর্ষণ ক'রে থাকে।

বিমল করের কিশোর অ্যাডভেঞ্চার
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর কলকাতার ইতিহাস
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-উপন্যাস
কৈলাসে কেলেংকারি ৫·০০

বুদ্ধদেব গুহর কিশোর অ্যাডভেঞ্চার
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০

শৈলেন ঘোষের রূপকথা-নাটিকা
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০

শংকরীপ্রসাদ বসুর জীবনচরিত
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-গল্প
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০

অমিতাভ চৌধুরীর নাটিকা
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০

নমীগোপাল চক্রবর্তীর ছোটদের গল্প
চরকা বুড়ী ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর অসাধারণ উপন্যাস | পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

পরাজিত সম্রাট ৭.০০

প্রকাশিত হল

স্কুলে নিচের দিকের ক্লাসে পড়া ছোট্ট একটি ছেলে। যেমন দুরন্ত তেমনি প্রাণচঞ্চল। বাড়িতে বাবা-মা আর পিঠো-পিঠি এক ভাই। উত্তরবঙ্গের এক মফস্বল শহরের আধা-নাগরিক আধা-গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠছে এই মানব-শিশু। মায়ের ডাক্তারি জীবিকা, বাবার ডাক্তার স্ত্রীর কেরানী স্বামী হওয়ার হীনম্মন্যতা, দুরন্তপনার কারণে নিজের অনাদরের প্রেক্ষিতে সকলের কাছে গুডি-গুডি ভাইয়ের সমাদর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মাদি—এই সবের অভিঘাতে নানারকম টালমাটালের ভিতর দিয়ে বেড়ে উঠছে একটি বালক। মনে তার নানান জিজ্ঞাসা, চোখে তার অসীম কৌতূহল। শাসন পীড়ন আদর অযত্ন—সব কিছুর মধ্য দিয়েই চলেছে যেন এক আগামী দিনের পূর্ণবয়স্ক মানুষের নিজেকে জানার, নিজেকে বিদ্ধ করার আজীবন-প্রয়াসের এক তরঙ্গিত সূচনাপর্ব। এই কাহিনী নিছক এক ব্যক্তিমানুষের হয়েও কবি সুরজিৎ দাশগুপ্তের হাতে এক চিরন্তন মানবিক আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে পাঠকদের সামনে অভিনবত্বের চমকপ্রদ স্বাদ ও ঘ্রাণ নিয়ে ॥ দাম ॥ ১০·০০ ॥

সুরজিৎ দাশগুপ্তের
অভিনবত্বের চমকপ্রদ স্বাদ ও ঘ্রাণে ভরা উপন্যাস

বিদ্ধ করো

সুবোধ ঘোষের বিশিষ্ট উপন্যাস | চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বন উপবন ৬.০০

সত্যজিৎ রায়ের
ফেলুদার নতুন রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

জয় বাবা ফেলুনাথ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪৬ সংখ্যা
শনিবার ২৬ ভাদ্র ১৩৮৩

কবি নজরুল

আকস্মিক সংবাদটি দেশবাসীর চিত্ত ব্যথিত করেছে. প্রিয় কবি নজরুল আর নেই। কাজি নজরুল ইসলাম দেশবাসীর কাছে যাঁর সর্বাধিক অন্তরঙ্গ পরিচয় হলো কবি নজরুল, ঢাকাতে গত রবিবার তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা লক্ষ-লক্ষ জনের মনে ও প্রাণে দুঃখের ছায়া সম্পাতিত করেছে। তিনি কিছুকাল ধরে ঢাকাতেই অবস্থান করছিলেন। বয়সের হিসাব ধরলে বলতে হয়, কবি পরিণত বয়সে তিরোহিত হয়েছেন। তবু, যে-মানুষটি সুদীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার আস্পদ হয়ে সর্বজনীন অভ্যর্থনা লাভ করেছেন, তাঁর জীবনের অবসান দেশবাসীর অন্তরে একটি শূন্যতার বোধ সঞ্চারিত না করে পারে না। কায়িক সুস্থতার কঠোর সংকটের কারণে তিনি দীর্ঘকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় কোন অনুশীলনী উদযাপিত করতে পারেন নি। কঠোর এই অবস্থা ও ঘটনা দেশবাসীর পক্ষে অতিরিক্ত একটি বেদনার হেতু হয়েছিল। তাঁর চিরপ্রয়াণের ঘটনা তাই অনেকের মনের একটি কষ্টকর উদ্বেগের অবসান ঘটাবে। কবি এখন চিরশান্তির ও চির-স্বস্তির বক্ষে আশ্রিত হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে কবি নজরুল ভাবনা-কল্পনার এবং ভাষা-সৌকর্যের নতুন এক ঐতিহ্যের স্রষ্টা হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও গীতিকা অভিনব এক মাধুর্যের ঝংকার সৃষ্টি করে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন আনন্দের বৈভব নির্মাণ করেছে। তাঁর চিন্তার মহত্ত্ব এই যে, কোন অনুদার ও সংকীর্ণ সংস্কারের সামান্যতম স্পর্শও তিনি অস্বীকার করেছেন। সবার উপর মানুষ সত্য; এই উপলব্ধির রূপ যেমন কবির চিন্তাতে, তেমনই তাঁর জীবনেও সত্য হয়ে উঠেছে।

কবি নজরুলের রচনার বিশেষ মর্যাদা এই যে, রূপে ও প্রকারে ঐতিহ্যের অনুগত হয়েও ঐতিহ্যের দ্বারা সীমায়িত হয়নি। তাঁরই প্রতিভার গুণে ও কৃতিত্বে বাংলা সাহিত্যে আরব ও ইরাণের সাংস্কৃতিক চিত্তের রম্যতা ও বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের সৃষ্টি। নতুন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি।

এ সত্য বিস্মৃত হবার নয় যে, কবি নজরুল তাঁর আন্তরিক আবেগ সহস্র ধারায় উৎসারিত করে দেশানুরাগের বিপুল প্রেরণার প্রবাহ সৃষ্টি
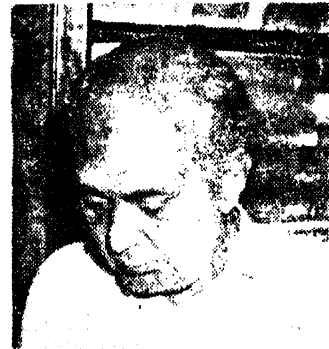
করেছিলেন। ঠিক এমনতর আন্তরিকতার আবেদন নিয়ে প্রতিভার সম্যক্ উৎসর্গ দ্বিতীয় কোন কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি না সন্দেহ, যদি দেশপ্রেমের পুণ্যে প্রলিপ্তহৃদয় আরও অনেক কবি ছিলেন। জনপ্রিয়তার যে রাজমুকুট পেয়েছে কবি নজরুলের গীতিকা, সেটা একান্তরূপে কবি নজরুলেরই গৌরবের পরিচয়।

কবি স্বয়ং জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ পথের পথিক হয়ে অনেক রৌদ্র-জ্বালা বরণ করেছেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রের বহু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে, সাংসারিক কর্তব্যের জীবনে, তাঁর পক্ষে পুষ্পাকীর্ণ পথে চলবার সহজ সৌভাগ্য হয়নি। তিনি বহু 'দুঃখের পুণ্যে' জীবনের আনন্দ ও কৃতিত্বের অধিকার অর্জন করেছিলেন।

আজও দেশবাসীর মধ্যে এমন অজস্রজন আছেন, যাঁরা কবির ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁরাই জানেন, কী উদার ও প্রীতিময় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁদের প্রিয় কাজিদা। তাঁর ব্যক্তিত্বের সহজ সারল্য যেন মায়াডোর হয়ে বহুজনের হৃদয়কে তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

অনুমান করলে ভুল হবে না, কায়িক স্বাস্থ্যের সংকট না থাকলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতিভার আরও অনেক রমাসৃষ্টির উপহার দিয়ে দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের চেতনা অনুপ্রাণিত করে রাখতেন। এবং বাংলার কাব্য কবিতা ও গীতিকা মহান এক নেতৃত্বের দ্বারা অনুশাসিত হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতো। যা হতে পারতো তা হয়নি, এমনতর ঘটনার কথা তুলে খুব বেশি মন্তব্য বিস্তার করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কবি যা দিয়ে গিয়েছেন, তারই মূল্য মর্যাদা ও গৌরবের পরিমাপ করতে হয়। এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আত্যন্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই উপলব্ধির সত্য স্মরণ করতে হয় যে, কবি নজরুলের বাণী জাতির সাংস্কৃতিক অভিরুচির কাছে চিররম্যতার সম্বল। জাতির সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের জীবন এক একটি শুভক্ষণে কবির স্মৃতিকে তাঁরই সংগীতের অঞ্জলি দিয়ে সম্মানিত করবে।

কবি নজরুলের কবিতা ও গীতিকা, তাঁর প্রতিভার দান হয়ে যে আনন্দের মঙ্গল জাতির চিত্তের অভিরুচি আগ্রহ ও শ্রদ্ধায় চিরস্থায়িতা লাভ করেছে, শুধু তার ভাব রূপ ও ভাষার বৈচিত্র্য নয়, তার ছন্দোবৈচিত্র্য, তার আলংকারিক সৌষ্ঠব তার সুরের নবতর ভঙ্গীর মধুরতা দেশের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের জন্য নবতর সার্থকতার অঙ্গীকার হয়ে থেকে গেল, কৃতী কবি নজরুলের জীবন ও প্রতিভা, কাব্য ও সঙ্গীতের উদাত্ত আদর্শের প্রতি যেন সার্থক এক কৃতজ্ঞতার উৎসর্গ ছিল। কোন সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে দেশবাসীও তেমনই কবির কৃতিত্বের আদর্শিক মহত্ত্বের সত্য স্মরণ করে কবির প্রতি সহস্র কৃতজ্ঞতার বন্ধন অনুভব করবে।

এক নজরে

ঘেণ্টু দত্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ বেড়া টপকে একখানি চৌকো কাগজ ও একটি ধাতুনির্মিত চাক্তি লাভ হল যেদিন, সেদিন নিজেকে মহা ধুরন্ধর মনে হয়েছিল। কিন্তু কর্মজীবনে নেমে একটি বেসরকারী স্কুলে মাস্টারি ছাড়া আর কিছুই জুটল না যখন, তখন দুনিয়ার আসল চেহারাটা মালুম হল অনেকটা। এই মাস্টারিও নিজের কৃতিত্বে জোগাড় হয়নি। নিধু ভটচার্যির লেন নামে মোকাম কালিঘাটে খাইবার গিরি সংকটের মত দুর্গম যে গলিটি আছে, তার বরেণ্য বাসিন্দা ঘেণ্টু দত্ত তা জুটিয়ে দিয়েছিলেন এবং এজন্যে তিন কিস্তিতে এক মাসের মাইনেটা দিতে হয়েছিল তাঁকে দস্তুরি হিসাবে।

এই উপলক্ষে ঘেণ্টু বলেছিলেন, জীবনটা ত ভাই পাঁচ জনের জন্যেই। যতটুকু সম্ভব লোকের ভাল করি। কিন্তু পোড়া পেটটা আছে, তাকে দানাপানি দিতে হয়। তাই কিছু কিছু না নিলে চলে না। তা নইলে তোমাদের মত ইয়ং ম্যানদের হাত মুচড়ে টাকা নিতে আমার একদম ভাল লাগে না। তেইশ বছরের তরুণের কানে কথাটা অনুচিত বা বেখাপ্পা শোনায় নি। তারপর সুখে দুঃখে প্রায় সাড়ে চার দশক কেটে গেছে কলকাতার মাটিতে। ভালমন্দ যা হবার হয়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই। কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি জানেন এই ঈষদূন অর্ধশতাব্দীতে? জেনেছি যে ঘেণ্টু দত্ত একটি মানুষ নন, তা একটি মনোভাব এবং জিনিসটা শাশ্বত। দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলছি কথাটা।

কোন নামী কলেজে রেজাল্ট বেরুনর তিন দিন পরে গিয়েছি ছেলে ভর্তি করতে। পরীক্ষার ডিভিসন ও মার্কা যা দরকার, হবু পড়ুয়ার তার চেয়ে একটু বেশীই আছে, তবু ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোক বললেন, উপায় নেই। সব সিট দখল করে নিয়েছে আরো বেশী নম্বরওয়ালারা। নিরাশ হয়ে নেমে আসছি, ইশারা করে ডাকলেন বারান্দা থেকে এক ব্যক্তি। বললেন, আর্টস, না সায়ান্স? বললাম, সায়ান্স। হাত বাড়িয়ে মার্কশিটটা নিলেন। ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, ঠিক আছে। এডমিশন ফী, সেশন ফী ইত্যাদির সঙ্গে লাগবে এনাদার টেন রুপীস, আরো দশটাকা, রাজী আছেন? রাজী না থেকে উপায় কি? হল ছেলে ভর্তি। পরে জেনেছি শুধু প্রথম বিভাগওয়ালারা নয়, কিছু দ্বিতীয় বিভাগও মাথা গলিয়েছে। জানি না তা এই দু নম্বর ঘেণ্টু দত্তের কৃপায় কিনা! অবশ্য একাধিক ঘেণ্টু দত্তও থাকতে পারেন ওখানে।

দ্বিতীয়বার, অথবা তৃতীয়বার বললেই বোধ হয় ভাল হয়, তাঁর দর্শন পেলাম কলকাতা থেকে ঈষৎ দূরবর্তী এক যক্ষ্মা হাসপাতালে। একটি অভাবী আত্মীয়ার হয়ে অনুগ্রহলিপি জোগাড় করেছিলাম স্বয়ং বিধান রায়ের কাছ থেকে। সাফল্য সম্বন্ধে তাই ছিলাম ষোল আনা নিশ্চিন্ত। কিন্তু টক্কর খেলাম যথাস্থানে গিয়ে। ডেপুটি সুপার বললেন, এক বছরের মধ্যে কোন সুযোগ হবে না। যা রুগী আছে, তারাই মেঝেয় পড়ে রয়েছে। বেড কোথায়? বললাম, ডাঃ রায় পাঠিয়েছেন। তাঁর চিঠিখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, চিঠি ত হাত থাকলেই লেখা যায়। জায়গা না থাকলে ত পেশেণ্ট ঢোকান যায় না। বিমর্ষ হয়ে স্টেশনে চলে এলাম রোগিণীকে নিয়ে। পিছন পিছন হাজির হলেন শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক। নাকের ডগায় নিকেলের চশমাটা নামিয়ে বললেন, দিলে না ত সিট! ও শয়তানটার কথা কি বলব দাদু, ওটা আস্ত কসাই। তা থাকবে কি এডভান্সড্ কেস আপনার? মানে রুগী কি এখন তখন? ঘাড় নেড়ে জানালাম হ্যাঁ। বললেন ভদ্রলোক, মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরে যাবেন? আচ্ছা, দিচ্ছি একটা সিট আপনাকে। কিন্তু দাদু পঁচিশটা টেকা ছাড়তে হবে। ছাড়লাম টাকা। ঘণ্টা দেড়েক মধ্যে হল ব্যবস্থা এবং ফিরে এলাম রোগিণীকে ভর্তি করে বিকেলের লোকাল ট্রেনে। পেলাম আর এক ঘেণ্টু দত্তকে।

এর আগে কি পরে ঠিক মনে নেই, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে হল একটু অবনিবনা। আসল বাড়িওয়ালা ছিলেন বন্ধু। তাঁর মৃত্যু হলে বড় ছেলে এবং পুত্রবধূ হলেন বাড়ির মালিক এবং তাঁরা এক লাফেই ভাড়া ডবলেরও বেশী বাড়িয়ে দিলেন বাড়ির। বাধ্য হয়ে বললাম, মাস ছয়েক সময় দাও আমি উঠে যাব। কিন্তু দিন ছয়েকও সময় দিতে রাজী হল না ছোকরা। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকডাক শুরু করল। এক প্রতিবেশীর পরামর্শে তখন গেলাম চেতলায় জনৈক মোহনবাবুর কাছে। মোহন মৎস্যন্দী তাঁর নাম। আড়াই দিনের মাথায় সতীশ মুখুজ্যে রোডে মোটামুটি ভাল একখানা বাড়ি জুটিয়ে দিলেন তিনি সম্ভবমত ভাড়ায়। তবে দক্ষিণা দিতে হল একমাসের ভাড়া, অবশ্য টেকিং ইণ্টু কন্সিডারেশন ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন অব এ মিড্ল ক্লাস ভদ্রলোক, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে, তিন দফায় টাকাটা নিতে সম্মত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর নাম মোহন মৎস্যন্দী হলেও আমি জানি তাঁকে আর একটি ঘেণ্টু দত্ত বলে।

আরো একটি ঘেণ্টু দত্তের দেখা পেয়েছিলাম বাগবাজারে। কাটাপুকুর লেনের খানায় পড়ে লোড শেডিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিয়োগের দণ্ডস্বরূপ যখন পা ভাঙে, আমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে রিকশাযোগে বড় রাস্তার এক ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গিয়ে আগে প্রাথমিক চিকিৎসার ও তারপর এ-টির অর্থাৎ ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক ইনজেক্শনের ব্যবস্থা করে দেন জনৈক অপ্রিয়দর্শন যুবক। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল এই যুবক শুধু ট্যাক্সি এনে তাতে উঠিয়েই দেন নি আমাকে, সঙ্গে করে বাড়িও পৌঁছে দিয়ে যান। আমি যখন তাঁর সহৃদয়তা ও পরোপকার স্পৃহার উল্লেখ করে ধন্যবাদ দিলাম, তিনি বললেন, আমি স্যার এইসব সার্ভিসই (সেবা) করে থাকি মানুষের। রুগী নার্স করি, মড়া পোড়াই। এসবে যা পাই, তাতেই চলে যায় এক রকম করে। দশটি টাকা তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নামটি কি ভাই? যুবক বললেন, নাম? মনে করুন আমার নাম মানুষ। আর কথা বাড়ালাম না। নমস্কার করে চলে গেলেন তিনি।

তালিকা আপাতত এখানেই শেষ করছি। তবে বলে রাখি যে ছোটখাট ঘেণ্টু দত্ত আরো দুপাঁচ জনের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছে আমার জীবনে এবং কোন না কোন কাজে সহায়তাও নিতে হয়েছে। এঁদেরকে কি বলব আমি? সমাজ বন্ধু, না মধ্যস্বত্ব-ভোগী দালাল, না বৃত্তিব্যবসাহীন বেকার, যাঁরা পরোপকারের চাদর মুড়ি দিয়ে ফাঁক-তালে দুপয়সা করে নেন অফিস আদালত ও কাজ কারবারের সংগে সংশ্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে যোগসাজস মারফৎ? যিনি যেমন মনে করেন, তেমনি নাম দিতে পারেন এঁদের। আমি ত দেখি ভব বৈতরণী পার হতে এঁদের লেজ ধরা ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন এঁদের ওপর অকারণ বিরূপ হয়ে লাভ কি? বিরূপতাটা ত আসে এঁদের মানুষ রূপে দেখি বলে। সেই জন্যেই গোড়ায় বলেছি, ঘেণ্টু দত্ত কোন মানুষের নাম নয়, তা একটা মনোভাব এবং তা আমাদের আনাচে কানাচে ওৎ পেতে আছে, সর্বদা জনহিতের বকলমায় আত্মহিতের রাস্তা খুঁজছে। তাই তাঁদের এড়াতে পারি না, এড়ালেও কার্যসিদ্ধি হয় না! অর্থাৎ ঘেণ্টু দত্তেরা অপরিহার্য ত বটেই, অনিবার্যও।

সুদর্শন গুপ্ত

অন্য কোনো স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় সম্পূর্ণ আহার নয়

বৈদেশিকী

হুঁশিয়ারি

এশিয়া-আফ্রিকায় স্বাধীনতার ঢল নামে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ আর বেলজিয়ানদের যে বিরাট সাম্রাজ্য ছিল দুটো মহাদেশে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেল এশিয়া-আফ্রিকার অনেক জাতই। উপনিবেশবাদীরা কিন্তু সহজে তাদের সাধের জমিদারী হাতছাড়া করতে চায়নি। অনেক জাতকেই বুকের রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতা আদায় করতে হয়েছে। তারা স্বাধীন হবার পরও উপনিবেশবাদীরা চেষ্টা করেছে তাদের ওপর মাতব্বরি করতে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের এককালের উপনিবেশগুলোকে এই বলে ভোলাতে চেয়েছে যে, পুরোনো ইতিহাস ভুলে গিয়ে তারা যদি পুরোনো প্রভুদের চেলা বনে যায় তা হলে তাদের লাভ ছাড়া লোকসান হবে না—তা না করলে দুনিয়ার কূটনীতির অকূল দরিয়ায় তারা থই পাবে না। গোটা দুনিয়া তখন দু ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ার মাতব্বর আমেরিকা, সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার সোভিয়েট দেশ। দু মাতব্বরই চেয়েছে নতুন স্বাধীন দেশগুলোকে নিজের দলে টানতে, টোপ ফেলেছে টাকাকড়ির, অস্ত্রশস্ত্রের। ভরসা দিয়েছে বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াবার।

মাতব্বরদের তাঁবেদার দেশ নিয়ে জোট বাঁধার চেষ্টা বিফলে যায়নি। রুশিয়ার জোটে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশ ছাড়া বড় একটা কেউ ছিল না। লাল চীনও সে জোটের সামিল হয়নি। যুগোশ্লাভিয়া গোড়া থেকেই বেয়াড়াপনা করেছে। কিন্তু পশ্চিমীদের খেপলা জালে ধরা পড়েছিল এশিয়া আফ্রিকার অনেক নতুন স্বাধীন দেশই। এভাবে জোটবন্দী হওয়ার মানে যে সদর দরজা দিয়ে যাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে সেই উপনিবেশবাদকে খিড়কি দরজা দিয়ে ফিরিয়ে আনা তা তাদের অনেকেই বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ অবিশ্যি বুঝে ন্যাকা সেজেছে। টাকা, গদি আর ক্ষমতার মোহে তাদের নেতারা দেশকে ভুল পথে নিয়ে গেছেন। এ যে বেচে গলায় ফাঁস পরা তা বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের জহরলাল নেহরু, যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, মিশরের গামাল আবদেল নাসের। তাঁরা হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে ধুরন্ধর দেশগুলোর পাতা জোটের ফাঁদে পা না দিতে। জোটের বাইরে থাকাই যে বুদ্ধিমানের কাজ এই কথাটাই তাঁরা তাদের বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু একালে কোনো দেশই তো একেবারে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। তাই কোনো জোটে নাম না লিখিয়েও এক হয়ে চলার রাস্তা বের করার জন্যে জোট ছাড়া দেশগুলোর পয়লা বৈঠক বসলো যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে ১৯৬১ সনে।

জোট-ছাড়াদের পা মিলিয়ে চলার সেই শুরু। তাদের এ বেয়াদপিতে দারুণ চটেছিল মার্কিনীরা—তাদের রাগ এখনও পড়েনি, তাদের পশ্চিমী স্যাঙাতদেরও না। তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস রেগেমেগে বলেছিলেন জোট না বেঁধে চলা চরম মুখ্যুমি। এখনকার রাষ্ট্র-সচিব ডঃ কিসিংগারের মতও ভিন্ন বলে মনে হয় না। তবে তিনি ঝানু কূটনীতিক রেখেঢেকে কথা বলতে জানেন। রুশিয়াও গোড়ায় তেমন খুশী না হলেও ও আন্দোলনের নিন্দে করেনি, তাকে বানচাল করার ফন্দিও আঁটেনি যদিও মার্শাল টিটোর সঙ্গে রুশ দিকপালদের সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। এখন তো রুশীরা জোট-ছাড়া জোটকে খোলাখুলি মদত দিচ্ছে, তার সঙ্গে খাতির জমিয়ে রেখেছে। জোটের আলগা বাঁধনও ক্রমশ শক্ত হচ্ছে, দলে ভারীও হচ্ছে জোট দিন দিন। হালে যে সব দেশ স্বাধীন হয়েছে তারা কেউই প্রায় দুই প্রধানের জোটে ধরা দেয়নি। তারা প্রায় সবাই জোটছাড়া। পয়লা বৈঠক জোট-ছাড়াদের যখন হয় পনেরো বছর আগে তখন হাজির ছিল ২৫টা দেশ। দু নম্বর বৈঠক বসে কায়রোতে সেখানে জুটেছিল আরও ২২টা। পরের বারের বৈঠকে সংখ্যাটা বেড়ে হলো ৫১। সেটা বসেছিল লুসাকায়। চার নম্বর বৈঠক বসেছিল ১৯৭৩ সনে আলজিয়ার্সে। বাড়তে বাড়তে সদস্য সংখ্যা পৌঁছেছিল সেখানে ৭৬-এ।

সব শেষ বৈঠক বসেছে শ্রীলংকার কলম্বো শহরে ১৬ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট। ৮৬টা দেশ সেখানে হাজির ছিল সদস্য হিসেবে, ১০টা পর্যবেক্ষক হিসেবে। এ ছাড়া যোগ দিয়েছিলেন ১০টা সংস্থার প্রতিনিধি আর ৬ জন অতিথি। এত বড় আন্তর্জাতিক সরকারী প্রতিনিধিদের বৈঠক জাতিপুঞ্জের বাইরে আর হয়নি। কলম্বোয় যোগ দিয়েছিলেন ৪২ জন রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী, ৬৪ জন বিদেশ মন্ত্রী। যাঁরা এ আন্দোলন পত্তন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মার্শাল টিটো ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। চুরাশি বছর বয়েসেও তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। শ্রীলংকার শ্রীমতী বন্দরনায়েক তো ছিলেনই, ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মিশর থেকে সাদাত, আলজেরিয়া থেকে বুমেদিয়েন, ভিয়েতনাম থেকে ফাম ভান দং, কাম্বোডিয়া থেকে খিউ সামফান, জাম্বিয়া থেকে কাউণ্ডা, সাইপ্রাস থেকে আর্চবিশপ মাকারিয়স, ইন্দোনেশিয়া থেকে আদম মালিক। জাতিপুঞ্জও এ বৈঠককে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। করবে কি করে? দুনিয়ার অর্ধেকের ওপর লোকের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন কলম্বো বৈঠকে, জাতিপুঞ্জের সভ্যদের তিন ভাগের দু ভাগই। উদ্বোধনী বৈঠকে ভাষণ দিয়েছিলেন মহাসচিব কুর্ট ভালডহাইম নিজে।

কলম্বো বৈঠকে প্রমাণ হয়েছে জোটছাড়া জোটের জোর ক্রমেই বাড়ছে। সব ব্যাপারে সবাই একমত হয়নি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আর মতান্তর কিছু কিছু রয়ে গেছে। অবিশ্যি দ্বিপাক্ষিক ঝগড়া মেটাবার জায়গা ও বৈঠক নয়, সে চেষ্টা হয়ওনি। তবে আসল ব্যাপারে সবাই একমত। তা হচ্ছে উপনিবেশবাদের সঙ্গে কোনো রফা চলবে না, টাকাকড়ি কী অস্ত্রশস্ত্রের লোভে কোনো জোটে কেউ ভিড়বে না। ২৮টা প্রস্তাব পাস হয়েছে বৈঠকে। তার অনেকগুলোই ভাবিয়ে তুলেছে পশ্চিমী চাঁইদের। উপনিবেশবাদী তা নয়াই হোক আর পুরোনোই হোক তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সব জোটছাড়া দেশই তৈরি। আর তৈরি বর্ণবিদ্বেষীদের এক কাট্টা হয়ে উচ্ছেদ করতে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে গোপনে যে সব দেশ সাহায্য করছে তাদের তেলের যোগান বন্ধ করার দাবি তুলেছে বৈঠক। গোটা দুই ছাড়া তেলের যোগানদার সব দেশই হাজির ছিল কলম্বোতে। নাম করা হয়েছে এ ব্যাপারে বিশেষ করে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, বৃটেনের। এরা চোখে সর্ষে ফুল দেখবে তেল বন্ধ হয়ে গেলে। আফ্রিকায় পশ্চিমীদের সামরিক ঘাঁটিগুলো বন্ধ করার আর ভারত মহাসাগরকে উত্তেজনামুক্ত রাখার দাবি জোরদার হয়েছে কলম্বোতে।

তবে পশ্চিমীদের টনক নড়েছে কলম্বো বৈঠকের আর্থিক সনদে। স্বাধীনতার কোনো মূল্য থাকে না যদি দেশ আর্থিক ব্যাপারে পরাধীন হয়। জোটছাড়া জোটের দেশগুলো গরিব, তারা সব পেছিয়ে পড়া দেশ। তাদের উপনিবেশবাদীরা এতদিন শুষে খেয়েছে বলেই তাদের আজ এই হাল। এরা এখন চায় ন্যায় বিচার। চায় নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে। ধনী দেশের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। অথচ তারা ভোগ করে দুনিয়ার সম্পদের ৭০ ভাগ, চালায় ব্যবসার ৯০ ভাগ। ২৫টা ধনী দেশে দুনিয়ার ১৮ ভাগ লোকের বাস অথচ ৬৬ ভাগ উৎপন্ন জিনিস তাদের হাতে। ওদিকে ১০০টা গরিব দেশে দুনিয়ার অর্ধেকের বেশী লোকের বসতি। অথচ তাদের হাতে রয়েছে মোটে ১৪ ভাগ। এ তো আর চিরদিন চলতে পারে না। তাই কোমর বেঁধে লেগেছে জোটছাড়া জোটের গরিব দেশগুলো নিজেদের অবস্থা ফেরাতে। তারা চাপ দেবে ধনী দেশগুলোর ওপর তাদের সাহায্য করতে। সেটা দয়া নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ধনীদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় না সোজা আঙুলে ঘি উঠবে। গরিবরা চায় তাদের তৈরি কাঁচা মাল আর ফসলের ন্যায্য দাম আর ধনীদের তৈরি জিনিসের ওপর অন্যায় মুনাফা লোটার শেষ।

দেবরাজ
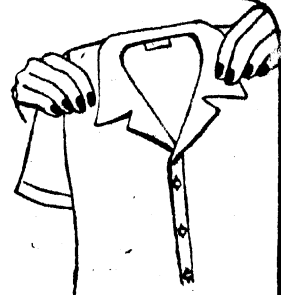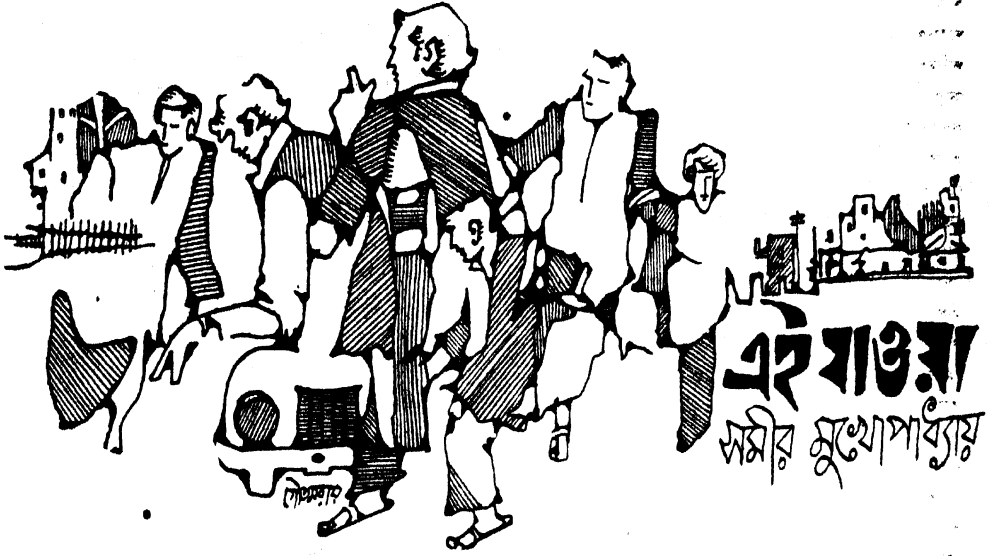
সন্দীপ আমাকে মান্থলিটা ফেরত দেবার আগে পর্যন্ত আমার কোন গন্তব্যের কথা মনে ছিলো না। ওটা জুটে যাবার পর ফর্সা, মাংসল হাতে রক্ত রেখা ফুটে ওঠার মত গন্তব্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দুদিন আগে সুধাকরবাবু কলকাতার অফিসে তাঁর বহুদিনের পুরানো চেয়ারে বসে যে কথা বলেছিলেন তার কতক অংশ ফের আবার টেলিফোনের মত কানের পাশে ঝন্ ঝন্ করে বাজতে থাকলো। 'আপনি চলে আসুন না আমার বাড়ি', এই কথা বলে উনি যতো না লজ্জা পেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন সহাস্যে, 'দ্যাখ কাণ্ড! আপনার সঙ্গে আমার আলাপ ত' আজকের নয়। প্রায় একযুগ ধরে আপনার সঙ্গে লেপ্টে আছি। অথচ আপনিও কখনো আমাকে আপনার বাড়িতে যাবার কথা বলেননি। আমিও বলিনি আপনাকে। কেন অমন হয় বলতে পারেন?' আমিও স্মরণ করতে পারলাম, সত্যি অনেকদিন ওঁর সঙ্গে মেশামেশি সত্ত্বেও ওঁকে কখনো আমার বাড়ি আসতে বলিনি। একথা স্মরণ করে ওঁর মত আমি কিন্তু অবাক হলাম না। কেননা আরো অনেক খেলার মত এ খেলাটাতেও অবাক হবার দিন আমার গেছে।

'যাহোক চলে আসুন রবিবার দেখে। আমি থাকবো তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। ওর মধ্যে আপনি এসে গেলে আপনাকে নিয়ে মিঃ নটরাজনের কাছে যাবো। ওঁর কানেকশান ভালো। চাইকি, আপনি একটা বড়রকমের ব্রেক পেয়েও যেতে পারেন।'

'আপনার ঠিকানাটা?' আমি বিপন্নভাবে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। উনিও লজ্জা গোপন করার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'লেক রোড, আশী। এক নম্বর ফ্ল্যাট। ফোর্থ ফ্লোর। ওদিকটায় গেছেন কখনো?'

একেই বলে ভূয়োদর্শিতা। উনি ঠিকমত লক্ষ্যভেদ করেছেন। খাঁটি ডেলিপ্যাসেঞ্জার-দের নেচার ওঁর দেখছি নখদর্পণে। হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে কলকাতায় যাতায়াত করছি বটে আমার সহযাত্রী আরো অনেকের মত আমি শুধু অফিস-পাড়াটুকুই চিনি। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সুবন্ধুর গতিবিধি একটু ব্যাপক। তাও রাত্রের দিকে। বুঝ সুখ, যে জান সন্ধান। আর কেউ হয়তো ছেলে, মেয়ের কারণে কলেজ স্ট্রীট পাড়া। ব্যাস। বাকি কলকাতা রহস্যময়, সুদূর। নো ম্যানস ল্যাণ্ড।

'ঠিকানা পেলেই সব জায়গায় চিনে চিনে যাওয়া যায় নাকি?'

উনি খুব মৃদুভাবে, অস্পষ্ট একটু হেসেছিলেন। এরপর কেমন করে ওঁর ঠিকানায় পৌঁছোতে হবে তার একটা ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন। দুর্বল, অতি দুর্বল মস্তিষ্ক আমার, সেই ধারাবিবরণীর প্রায় কিছুই ধরে রাখতে পারেনি দেখছি। রেখা আমার কাছ থেকে চলে যাবার পর থেকেই এরকম হয়েছে। রেখারও ঐ একই অভিযোগ। তার কাছ থেকে আমি চলে যাবার পর থেকেই সেও আর কোনকিছু মনে রাখতে পারে না। আমাদের দুজনের সেই প্রথম দেখা হওয়ার অবিস্মরণীয় দিনটিও না। রেখা বলে, 'এসব কথা আমার ছুঁচের মত বেঁধে।' আমি কিছু বলতে পারি না। কেননা কোনকিছু ছুঁচের মত

হরেক
মেজাজের
সঙ্গে খাপ
খাওয়ানো
হরেক
রকমের
কাপড়
বিনী
সংমিশ্রিত কাপড়

বেঁধার বাইরে আমি বহুদিন ভেজে তেজিছি। বাইরে, গ্রীল দেওয়া জানলার বাইরে বৃষ্টি পড়লে তবু ভালো। আমার দুঃখ দুঃখ মনে তাকিয়ে থাকা হয়। কিছু শুনতে হয় না, কিছু বলতে হয় না। এই বৃষ্টি ভালো। আজ কিন্তু কোন বৃষ্টি নেই আর আম্ব্রেলাটাও সুদীপ যথাসময়ে এসে ফেরত দিয়ে গেছে। আমার মনটা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো। যাই হোক, আজকের জন্যে আমি অনেকের ঈর্ষার পাত্র হতে পারি। কেননা আজ আমার আমার মত একটা জায়গা আছে।

ফর্সা, মাংসল হাতে রক্ত রেখার মত আমার গন্তব্যটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ঠিক এই মুহূর্তে অনেকেরই কোন গন্তব্য নেই। এতেও আমি খুশি হবো না? নির্মল আনন্দ পাবো না? আমি আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবলাম আজকের দিনটা অন্তত অন্যদিনের মত আলুনি যাবে না। আজ আমার সত্যিই একটা কাজ আছে। কে জানে কেন, হুগলীর বিবর্ণ বর্মণ গলির চুন বালির অন্তর খসা একটা তোবড়ানো, শ্রীহীন বাড়িতে বসে আজ সকাল আটটায় দুস্তর সমুদ্রের দূরগামী জাহাজের রহস্যময় সাইরেন শুনতে পেলাম। অথচ ব্যাপারটা আসলে খুবই সামান্য, মাত্র কয়েক ঘন্টার মামলা। আমি হুগলী থেকে যাবো কলকাতার লেক রোডে। সেখানে সুধাকরবাবুর সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু উনি ঠিক কী বলেছিলেন? ওঁর অনেক কথার মধ্যে দেখছি 'মন্দির' কথাটাই মগজে বিঁধে আছে। তাহলে কী ধরে নিতে হবে আমার গন্তব্যের সঙ্গে 'মন্দির' কথাটির কোন সংযোগ আছে? আমি কী তীর্থযাত্রী! অ্যাবসার্ড। আমি ত' যাচ্ছি আমার অনেকদিনের পুরানো বন্ধু, সুধাকরবাবুর ঠিকানায়। তবে 'মন্দির' কেন? আমি ভেবেছিলাম জীবনে রহস্যের শেষ হয়ে গেছে। রেখার সঙ্গে মিশে এটা আমি টের পেয়েছিলাম। এখন দেখছি সামান্য ঠিকানা খোঁজার মধ্যেও কতো খেলা। বৃষ্টি পড়ছিলো না বটে তবে আকাশে মেঘ থমকে ছিলো। হঠাৎ দেখছি আকাশটা আলোয় ভরে গেছে। আমার ভাইঝি তাই দেখে আমাকে বললে, 'মেজ কাকা দ্যাখ, ভগবান কেমন নিজের হাতে আকাশে আলো জ্বেলে দিলেন।' আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মনে মনে বললাম, 'মন্দির, মন্দির।'

এরপর কখন যে ধ্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে গাড়ি ধরেছি, কামরার একটি নিরাপদ কোণে, জানলার ধারে বসেছি, বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, একে একে স্টেশনগুলো জানলার পাশ দিয়ে কখন চলে গেছে, খেয়াল করিনি। আমার মাথায় তখন কিছুই ছিলো না। একবার গন্তব্য ঠিক হয়ে গেলে তখন শুধু গন্তব্যের কথাই দেখছি মাথায় থাকে। মনকে একাগ্র করে আমি শুধু ভাবছিলাম সুধাকরবাবুকে ঠিক আমি কী বলবো? কেমন করে কথাটা পাড়বো? অবশ্য উনি ত' সব জানেন। নিজে থেকেই দুদিন আগে মিঃ নটরাজনের কথা আমাকে বলেছেন। তবু কতটুকু উনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? আচ্ছা, উনি কী

for the ultimate in stereo music
Solid State Stereo
COSMIC CO-60
DELUXE MK-II
STEREO AMPLIFIER
YOU KNOW THE NAME, NOW KNOW THE SOUND.
Distributors: COSMIC ELECTRONICS Andheri, Bombay 400 093.
CR-87

সিরিয়াস? উনি কী সত্যিই মনে করেন এতোখানি বয়েসেও আমি কোন বড় রকমের 'ব্রেক' পেতে পারি? মিঃ নটরাজন ব্লাফ্ নয়তো? ধ্যাঃ শালা, এসব কী ভাবছি রে। সুধাকরবাবু যে বহুদিনের চেনাজানা। ওঁর সংগে অনেকদিন অনেক সিগারেট পুড়িয়েছি। মণ্টি কার্লোতে মন-ভারি-করা কোন কোন নিঃসঙ্গ দুপুরে ওর সঙ্গে দু'চার পেগ হাতে নিয়ে বসেছি। বহুদিন প্ল্যান করেছি দক্ষিণ কলকাতায় রীণা ঘোষের অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটানোর। উনি এককথায় আমায় নাকচ করবেন কী করে? কে জানে শালা হয়তো নিছক গল্প করবার জন্যেই ডেকেছে! সময় কাটানোর জন্যে কেউ হয়তো হাতের কাছে নেই তাই 'আসুন না আমার বাড়ি', আর মাছটিকে খেলিয়ে তোলার জন্যে 'চাই কী বড় রকমের একটা ব্রেকও পেয়ে যেতে পারেন' আসলে টোপ, যাতে আমায় গাঁথা যায়! তা হলে শালা, মারদাংগা হয়ে যাবে। ওসব সুধাকর ফুধাকর ফুটিয়ে দোব। কিন্তু এসব ভেবে মন খারাপ করে না। আপাতত আমি ত' একটা লক্ষ্য পেয়ে গেছি। আমার ত' একটা জায়গা আছে যাবার। এটা কী খুবই কম?

হাওড়া স্টেশনে পা দিতেই পাশ দিয়ে একটা হিপিনি চলে গেল। এরকম একটা কিছু হয়ে যেতে বেশ লাগে। ওরা ত দেখি সব জায়গায় হাঁটে। ওদের কী কোন গন্তব্য নেই? না হেঁটে হেঁটে ওরা গন্তব্য খুঁজছে? বম্বের রাস্তায় তাজ হোটেলের পিছনে প্রকাণ্ড কংক্রীটের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে সামান্য একটা গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে দুহাতের তালুতে গাঁজার কলকেতেও জোর টান দিতে দেখেছিলাম নিতান্তই ছন্নছাড়া একটা হিপিনিকে। তার সামনেই দাঁড় করানো ছিলো একটা ধুলো-জড়ানো অ্যামব্যাসাডার। বোঝা যাচ্ছিলো ঐ গাড়ি করেই শত শত মাইল পার হয়ে বম্বের উপকূলে ও ভিড়েছে। ওকে কে জানে কেন, বলেছিলাম, তুমি কোথায় যাবে?' ও প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে আচ্ছন্নগলায় জলপাত্ত করে বলেছিলো, 'নো হায়ার। উইল য়ু গো উইথ মী ডার্লিং?' যদিও জানতাম না ঠিক বলছি কিনা, তবু বলেছিলাম, 'আই হ্যাভ সাম হোয়্যার টু গো। উইল য়ু গো উইথ মী হনি?' উত্তরে ও হেসে ছিলো। অনবরত হাত নেড়ে নেড়ে রকমারি হেসে বলেছিলো, 'আই উইল গো নট উইথ য়ু। বিকজ ইউ হ্যাভ সাম হোয়্যার টু গো। ও কে?'

ট্রাম না বাস? কিসে যাবো? বাসই ভালো। প্রায়ান্ধকার সাবওয়েটা বেশ ভালো। মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে চোর, গাঁটকাটা, লম্পট আর দালালদের নিয়ে এর ভেতর সোরগোল করে সভা করতে আমার বেশ লাগে। যখন গোটা কোলকাতা ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন আমি একটা সভা করছি, একটা দুঃস্বপ্ন পরিচালনা করছি, একথা ভাবতে আমার বেশ লাগে। কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস ভাবতে গিয়ে এসব আবোল তাবোল কী ভাবছি আমি? কোন মানে হয়? আচ্ছা, ঠিকানাটা ঠিক মনে আছে ত? আছে। কিন্তু ঠিকানাই সব নয়। বলেছিলেন সুধাকর-বাবু। উনি অস্পষ্ট রহস্যময় হেসেছিলেন। তারপর দিয়েছিলেন একটি সারগর্ভ ধারা-বিবরণী যার আমি সবটাই ভুলে মেরে দিয়েছি। তার জন্যে অসুবিধে হবে? কখনো যাইনি ওদিকে। কী করে বলবো অসুবিধে হবে কিনা? কিন্তু আমাকে ত যেতেই হবে। ঠিক জায়গায় যদি নামাতে না পারি তাহলে হয়রানিও বিচিত্র নয়। আকাশের অবস্থাটা আর আগের মত নেই। কে যেন একটা ভারি রোলার চালিয়ে সাদার সঙ্গে কালোকে পিষে দিয়ে আকাশে লেপ্টে দিয়েছে রাস্তায় আলকাতরার মত। বৃষ্টি এখনো পড়েনি তবে আর্দ্র বাতাস বইছে। সুতরাং যদি আমাকে অনেক বেশি হাঁটতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়েই আমাকে হাঁটতে হবে। হয়তো আমার যাওয়াই হবে না। প্রচুর জল ঝড় নেমে গেলে আমি যাবো কী করে? অথচ আজ যে আমার যেতেই হবে সুধাকরবাবুর বাড়ি। এই কাজটার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা কিন্তু আকাশ, আকাশের অবস্থা দেখে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। পৃথিবীতে নিশ্চয়তা বলে দেখছি কোন শব্দ নেই। সামান্য একটা যাওয়া তাও কতো অনিশ্চয়তায় ভরা! অথচ একটু আগেই আমার গন্তব্য নিয়ে পাঁড় মাতালের মত আমি খুশি হয়ে উঠেছিলাম। পাগল আর কাকে বলে?

বাসটা যখন বড়বাজার পার হয়েছে

খন আর মনের উদ্বিগ্নতা চেপে রাখতে রলাম না। পাশের যাত্রীটিকে জিগ্যেস রলাম, 'আচ্ছা, লেক রোডের আশী নম্বরে বো। কোথায় ঠিক নামলে আমার সুবিধে যে বলে দিতে পারেন?'

'লেক মার্কেটে নামতে পারেন। ওখান কে'—

'ওখানে নামলে লেক রোড, আশীতে আমি যেতে পারবো ত!' আমি নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম। 'আশী নম্বরই' আমি দুবার রিপিট করাতে উনি এই প্রথম সিরিয়াস হলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি দেশপ্রিয় পার্কে নামুন। মনে হয় কাছাকাছি হবে। বেশি হাঁটিতে হবে না।'

আমার দুর্বুদ্ধি। আমি ফস করে বলে বসলাম, 'ওইখানেই নামবেন বুঝি?'

উনি বিরক্ত হলেন। রেগে গিয়ে বললেন, 'দেখতেই পাবেন।' আমি কিছু না বলে হেসে ফেললাম। মানুষের এই এক দুর্বলতা। উনি দেশপ্রিয় পার্কে নামতে চান বলে আমাকেও দেশপ্রিয় পার্কে নামাতে চান। তাতে আমার সুবিধেই হোক আর অসুবিধেই হোক। আমরা সবাই কী এরকম চাই?

যাহোক, ভদ্রলোক অবিকল দেশপ্রিয় পার্কেই নামলেন। আমি ও'র অনুসরণ করলাম।

উনি পাশের একটা গলি দিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন হঠাৎ যেতে যেতে একটু ফিরে হাতটা তুলে বললেন, 'ট্রাম লাইন পেরিয়ে ঐ রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। পেয়ে যাবেন।'

আমি ভাবতেই পারিনি এরপরও উনি কথা বলবেন। মানুষের আমি কতো কম জানি। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে বললাম, 'থ্যাংক ইউ।' মানুষ কী সুন্দর! কেউ কিছু মনে রাখে না। আমি হাঁটিতে লাগলাম ডানদিকের ফুট ধরে। আর একবার যাচাই করে নেওয়া যাক ঠিকানাটা। পথচারী একজনকে জিগ্যেস করলাম, 'জানেন নাকি ঠিকানাটা? লেক রোড আশী নম্বর?'

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না জানি না। আমি কলকাতায় আজই প্রথম এসেছি। আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি। আমার ঠিকানাটা খুঁজে দেবেন?'

আমি আরো বিরক্ত হয়ে ও'র দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললাম, 'কখনো না। কোনদিনও না।'

এসব দেখছি আমারই হয়। যে লোক কলকাতার কিছুই জানে না, একেবারে নতুন এসেছে, ঠিক সেই লোকটিকে আমি বরাতগুণে পেয়ে যাবোই। তিন চার মাস আগে অবিকল এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিলো। মায়ের দাঁত তোলা হয়ে গেছে, মাকে নিয়ে ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে বাড়ি যাবো, রিকশা দরকার, ডাকলাম একটা রিকশাঅলাকে। বলল, মৃদু হেসে, 'আইয়ে মহারাজ।' কপারে, এতো খাতির! কেন খাতির তিন চারশো হাত যাবার পর টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। শালা এমন গাড়ি চালাচ্ছে যেন গাড়িকে মাল খাইয়েছে কিংবা নিজে নীট টেনেছে। আর একটু হ'লে বাসের তলাতেই চলে যাচ্ছিলাম।'

মা বলল, 'যে দু-চারখানা দাঁত এখনো আছে সেগুলোও ভেঙে যাবে।'

আমি বললাম, 'কীরে! কী রকম চালাচ্ছিস রে? নতুন নাকি?' রিকশাঅলা একগাল হেসে আমাকে মোহিত করে বলল, 'হুজুরের কৃপায় আজই প্রথম। আপনিই আমার প্রথম খদ্দের।'

এই কপাল আমার। যে রিকশাঅলাটা নির্ঘাৎ আমাকে ডোবাতে পারে আমি
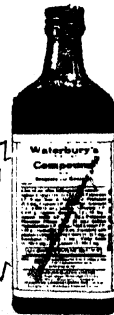
অনেক অনুসন্ধানের পর তাকে পেয়ে যাবোই।

স্টেশনে মাঝে মাঝে গাড়ির বিভ্রাট হয়। ডেলিপ্যাসেঞ্জার হলেও জিগ্যেস করে জেনে নিতে হয় আজকাল। হয়তো কাউকে জিগ্যেস করি, হ্যাঁ ভাই, গাড়ি ক'টায় ব্যান্ডেলের?' যাকে জিগ্যেস করি, সে ভারি সুন্দর নির্দেশ দেয়, 'এনকোয়ারীতে খোঁজ নিন।'

'এনকোয়ারীতেই যদি খোঁজ নেব তবে শালা তোমাকেই বা কেন জিগ্যেস করা?' একথাটা মনে মনে বলি। এসব আমার গা সওয়া। তবু বিরক্ত লাগে। যার কোথাও যাবার থাকে তারই বোধ হয় এরকম হয়। যার কোন গন্তব্য নেই তার কোন ঝামেলাও নেই। আমি এই প্রথম-বার আমার গন্তব্য আছে বলে খুশি হয়ে উঠলাম। আচ্ছা, সুধাকরবাবু কী সত্যিই মিঃ নটরাজনকে চেনেন? কে এই রহস্যময় নটরাজন? সুধাকরবাবু বলেছিলেন, ও'র নাকি অনেক কানেকশান। কীরকম কানেকশান? কানেকশানগুলো কোথায় তৈরী হয়? বারে? ক্যাবারে দেখতে গিয়ে? রেসকোর্সের মাঠে? আচ্ছা, সুধাকরবাবু কী সিরিয়াস? চ্যাংড়ামি করছেন না ত'? তা' কী করে করবেন? আমরা অনেকদিন এক সঙ্গে অনেক সিগারেট পুড়িয়েছি, আমরা অনেকদিন মণ্টিকার্লোতে দু'চার পেগ হাতে নিয়ে পরস্পর বসেছি, আমরা অনেকদিন দক্ষিণ কোলকাতার বীণা ঘোষের অ্যাপার্টমেন্টে যাবার জন্য প্ল্যান করেছি। উনি কী করে ব্লাফ দেবেন? কী করে আমাকে অস্বীকার করবেন? কিন্তু উদভ্রান্তের মত হাঁটছি কোথায়? শুধু ফুট ধরে হেঁটে গেলেই হবে? আমাকে কী কোথাও যেতে হবে না? আমি শুধু হাটবোই? হেঁটে যাবোই? কোথায় যাবে তুমি? তার উত্তরে বম্বের সেই হিপিনির মত গাঁজার কলকেতে টান দিয়ে একগাল হেসে বলবো, 'নো হোয়্যার?' কিন্তু আমার ত' একটা গন্তব্য আছে। আমার কী শুধু শুধু হাটার জন্যে হাটলে চলে?

রাস্তার এ পাশ থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ববিকাট, ডগ কলার সার্টটির একাংশ দেখা যাচ্ছে। মিটার ডাউন-ক'রে ও কী করছে? যাই ওকেই জিগ্যেস করা যাক। ও বললে, সরকারী ফ্ল্যাট মনে হচ্ছে। আপনি আর একটু যান। বিরাট কম্পাউন্ড। অনেকগুলো ফ্ল্যাট আছে। ওখানেই পেয়ে যাবেন।'

আমার মন বলল ঠিকানা পেয়ে গেলাম। প্রায় মাইল দু'এক হেঁটেছি। সেই দুটো থেকে হাটছি। শালা, হাটা যেন আর ফুরোচ্ছে না। ঐ তো সরকারী ফ্ল্যাট, ঐ তো বিরাট দেয়াল ঘেরা মস্ত মস্ত বাড়ি। বেশ স্মার্টলি ভেতরে ঢুকে গেলাম। এক মধ্যবয়েসী ভদ্রমহিলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে বললুম, 'আচ্ছা ম্যাডাম, এক নম্বর ফ্ল্যাটটা কোন দিকে হতে পারে বলতে পারেন?'

'ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করাতে মধ্যবয়সী, একেবারেই গৃহস্থ বধূ ভদ্রমহিলাটি খুশি হ'লেন বোঝা গেল। এ সব ব্যাপারে আমার শরসন্ধান এখনো দেখছি অব্যর্থ।

উনি বললেন, 'একটু বাঁয়ে ঘুরুন। সামনেই যে ফ্ল্যাটটা দেখবেন ওটাই এক নম্বর ফ্ল্যাট। কাকে খুঁজছেন?' একেবারেই মেয়েলি কৌতূহল।

খুঁজছি একজনকে। পেছনে রহস্য রেখে আমি আর একদম পেছনে না তাকিয়ে বাঁ ঘরে এক নম্বর ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরে ঢুকে করিডরে দাঁড়াতেই, জিনের বেলবটম, হলুদ টি সার্ট, পিঠে একরাশ স্যাম্পু করা চুল, স্পষ্টই বোঝা যায় মেয়েটি ভেতরের জামা পরেনি (এইটেই লেটেস্ট ফ্যাশন কিনা জানি না), বাঙালী অনায়াস ইংরেজীতে বলল, 'কাকে খুঁজছেন?'

কোথ' ফ্লোর? কিন্তু ওখানে ত' সুধাকরবাবু বলে কোন লোক থাকেন না। বেশ গোলগাল দেখতে? ফর্সা মত? ফিল্ম অ্যাক্টরের মত হ্যান্ডসাম? না সেরকম কেউ থাকেন না। আচ্ছা আপনার ঠিকানাটা কী?

ঠিকানাটা বলতেই মেয়েটি সারা শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, 'দুঃখিত, এটা আশী নম্বর লেক রোড নয়। আপনি বরং এখান থেকে ডাইনের রাস্তাটা ধরে সোজা উত্তর হাটতে থাকুন। সামনেই লেক। লেক পার

হলেই বুদ্ধ মন্দির। বুদ্ধ মন্দিরের গায়েই হ'বে আশী নম্বর। সামনেই ঢাকুরিয়া ব্রিজ। ওদিক দিয়ে এলে আপনার এতো হয়রানি হ'ত না।'

দ্যাখ কাণ্ড! যাবো একটা জায়গায় তার কতো ঝঞ্ঝাট। আবার নিজে থেকেও কতো ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুলি। ড্রাইভারটা বলেছে বলেই একেবারে কানার মত ছুটলাম। কোথায় যাচ্ছি, খানাখন্দ সামনে আছে কিনা কোন লক্ষ্য করলাম না, তার ফল ভুগতে হবে বইকি, এখন ক'টা? তিনটে হল। অবশ্য পাঁচটা পর্যন্ত উনি মানে সুধাকরবাবু অপেক্ষা করবেনই। আর মেয়েটি যা বলল, তা'তে ত' মনে হয় না খুব দূরে এখনো আছে। আর মেরে কেটে আধ ঘন্টার পথ তাহলেই—

কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা এতো জটিল কেন? অবশ্য মুশকিল আসান সব জায়গাতেই আছে। এক্ষেত্রে যেমন মেয়েটি। মেয়েটি ত' আমাকে পাত্তা না দিতেও পারতো। তাছাড়া আমি ত' ওকে জিগ্যেসও করিনি। ওই আমাকে বিপন্ন দেখে সাহায্য করেছে। কিন্তু এতেও আমার কোন সান্ত্বনা ছিলো না। বিষণ্ন মনে আমি হাঁটতে লাগলাম লেকের ভেতর দিয়ে। খানিকটা হেঁটেছি হন্ হন্ করে, দূরে থেকে গাছপালার ফাঁকে 'বুদ্ধ মন্দির'-এর চূড়াটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত 'মন্দির' শব্দটা মাথায় খেলে গেল। একথা আমার এই মুহূর্তে ভাবতে ভালো লাগলো, যতো সামান্য যাত্রা হোক সব যাত্রাই তীর্থযাত্রা, কেননা যে কোন পথের প্রান্তেই আছে মন্দির, যে কোন মন্দির, হোক না কেন বুদ্ধ মন্দির! কিন্তু প্রচণ্ড ঘোরা হয়েছে। এতো ঘুরতে হ'ত না, যদি সুধাকরবাবু পথের যে ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন তা মনে থাকতো।

কিন্তু তা' বুঝি মনে থাকে না। তাই মিছিমিছি অনেক অনেক পথ হাঁটা। যাই হোক, যখন লেক পেরিয়ে 'বুদ্ধ মন্দির'-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন মন্দিরটিকে দেখে একটা আচ্ছন্নভাব আমার এসে গিয়েছিলো। কিন্তু 'মন্দির' আমার গন্তব্য নয় বলে আমি দ্রুত পাশ কাটিয়ে কম্পাউন্ড-এ ঢুকে পড়লাম। এবার ঢোকার সময় আশী নম্বরটি দেখে নিতে আর ভুল করিনি।

একজনকে জিগ্যেস করে জেনে নিলাম এক নম্বর ফ্ল্যাটটি কোনদিকে। মনে মনে মুখস্থ করতে করতে চলেছি সুধাকরবাবুকে প্রথমেই কি বলবো। এতো শুধু যাওয়ার জন্যেই যাওয়া নয়। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া। সুতরাং সমস্ত মনকে একাগ্র করে ভাবতে লাগলাম প্রথমে ঠিক কী কথাটি আমি বলবো। লিফটের জায়গায় দাঁড়াতেই লিফটম্যান গেট খুলে দিয়ে দাঁড়ালো। আমি বললাম, 'ফোর্থ ফ্লোর।' আয়নার ভেতর দিয়ে আমার বিপর্যস্ত চেহারা দেখতে দেখতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে উঠলাম। আমি করিডরে দাঁড়িয়ে, এদিক ওদিক তাকাতেই কলিংবেল পেয়ে গেলাম। তারপর কলিং বেলটা টিপে হাসি হাসি মুখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু বুঝিবা ঘাম হচ্ছে। উত্তেজনা আর কী। সুধাকরবাবু আমাকে পছন্দ করেন তা আমি জানি। কাজটি ও আমার হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কী রকম যেন মনে মনে জোর পেলাম। আর মনে মনে স্মরণ করলাম, আমরা একসঙ্গে অনেক সিগারেট পুড়িয়েছি। আমরা দুঃখ ভুলতে মন্টিকার্লো'তে দু চার পেগ হাতে নিয়ে পাশাপাশি সোফায় বিষণ্ন হয়ে বসে থেকেছি কতোদিন, কতোদিন দক্ষিণ কলকাতা নিবাসিনী রীণা ঘোষের অ্যাপার্টমেন্টে যাবার জন্যে একসঙ্গে কতো পরিকল্পনা করেছি। দরজা খুলে গেল। কিন্তু কোথায় সুধাকরবাবু? উনি কী ভেতরে?

'কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?' একজন ভদ্রলোক দরজার ভেতর থেকে মুখ বাড়ালেন।

'এখানে সুধাকরবাবু থাকেন ত?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু উনি ত সকালেই বেরিয়েছেন। ও'র দিদির বাড়িতে।'

'কোন কিছু বলে যাননি?'

'না। কিছু বলতে হবে?'

বলার অনেককিছু ছিলো। কিন্তু বলার প্রবৃত্তি আর নেই। আমি কোন-রকমে মাথা নেড়ে লিফটম্যানের অপেক্ষা না করে হনহন করে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তা, রাস্তা পার হয়ে একেবারে বুদ্ধ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন্দিরের ভেতর থেকে তখন অদ্ভুত সব শব্দ হচ্ছিলো। যেন

ভৌতিক হাতে ড্রাম বাজছে। অন্যসময় হলে এখানে আমাকে দাঁড়াতেই হত। সুধাকরবাবুর ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। সেই রাগের চোটে একেবারে পুড়তে পুড়তে একটা হাউইএর মত আমি একেবারে ছিটকে ঢাকুরিয়া ব্রিজের নীচেতে এসে দাঁড়ালাম। কার মুখ দেখে অজ্ঞ উঠেছিলাম? ছিঃ ছিঃ, সমস্তটাই পণ্ড হল। যাওয়ার একটা জায়গা জুটে গেছে বলে আমি না মনে মনে লাফাচ্ছিলাম? যাওয়ার জায়গা থাকলেই শুধু হয় না, যাওয়ার শেষে একটা কিছু থাকা চাই। তাই না? সুধাকরবাবু যদি থাকতেন, তাহলে আমার এতো হাঁটা, এতো ভুল পথে হাঁটাহাঁটি, এতো পরিশ্রম সব উশুল হয়ে যেত। এখন আমার মনে হচ্ছে আমার এতো ঘোরাঘুরি এসব বৃথা। ঘরে ফিরে বম্বের সেই হিপিনির কথাই দেখছি সত্য হল। কংক্রীটের দেয়ালে পিঠ ঠেসান দিয়ে বসে, গায়ে একটা মাত্র গেঞ্জি লেপেট রয়েছে, পরনে প্যাণ্ট, দু হাতে গাঁজার কলকে, দু পা আলসাভরে দুদিকে ছড়িয়ে সে বসেছিলো। তাকে যখন জিগ্যেস করলাম তুমি কোথায় যাবে, সে বলেছিলো রহস্যময় হেসে, 'নো হোয়্যার' এই নো হোয়্যার কথাটাই দেখছি সত্যি। আমি শুধু শুধু সুধাকরবাবুর জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে গেছি। আসলে যে আমার কোন গন্তব্য নেই, থাকতে পারে না, এটা বুঝিনি। মনে মনে সুধাকরবাবুর মুণ্ডপাত করতে করতে পান-সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনে নীচু হয়ে ঝুলন্ত দড়িটায় ধরিয়ে নিয়ে যেই রাস্তার দিকে মুখটা তুলেছি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক ঘটে গেল। ঢাকুরিয়া ব্রিজটার ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে রাস্তার সমতলে যেখানে এসে মিশেছে সেইখানে, এখন, এই শেষ বিকেলে একেবারে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে একটি হলুদ রঙের ফিয়েট নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো। তার থেকে আরো নিঃশব্দে ফোমের চটি পরে যে বেরিয়ে এলো সে নিঃসন্দেহে মেয়ে বটে, কিন্তু এমন মেয়ে, এমন নারী আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমি তার কোন বর্ণনা দেবার চেষ্টা করবো না। কেননা তার কোন বর্ণনা হয় না। কিন্তু আমার প্রতি তার অসীম অনুগ্রহের কথা বলতেই হয়। আরো ত সবাই ছিলো, সবাই তাকে দেখছিলো, সকলেই উদগ্রীব হয়ে তার কৃপা, করুণা চাইছিলো, তাদের সকলের চোখেমুখে আমি সেরকমের আলো জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম। কিন্তু মহার্ঘ সেই নারী, গর্ব আর কমনীয়তায় ভরা তার গ্রীবা তুলে, হাতের সাদা ফিতে-বাঁধা বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে আমার দিকে এলো, না, শেষপর্যন্ত আমার কাছে না দুখানি বৃহৎ বাড়ির সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো, যাবার আগে সেই বিজয়িনী অল্প একটু হেসে ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে একটু তাকালো, বড় গরীব আমি, বড় সর্বস্বান্ত আমি, সেই মুহূর্তে আমি তার কেনা গোলাম হয়ে গেলাম। সে যে কী দৃষ্টি, কী যে তার মায়া, সম্মোহন, আমি তা কেমন করে বলি।

এখন আমার আর কোন রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, অবসাদ, ক্লান্তি কিছু নেই। একটু আগে সুধাকরবাবুর সঙ্গে দেখা হল না বলে আফসোস করছিলাম। এখন আর নারী তারপর কোথায় গেল আমার তা আমার আফসোস নেই। এমন কী সেই জানার কৌতূহলও নেই।

আপনারা যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কখনো কোন সুধাকরবাবুকে খুঁজতে যান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক ঘুরপাক খেয়ে, অনেক হয়রান হয়ে অবশেষে ঠিকানা খুঁজে পেয়েও যদি শোনেন সুধাকরবাবু নেই, তিনি সাতসকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন তবু সুধাকরবাবুর সন্ধানেই বের হবেন, কেননা, শেষ বিকেলের দিকে এইখানে, এই ঢাকুরিয়া ব্রিজের তলায় হলুদ রঙের ফিয়েট গাড়িটি আসবে, এই যে, পাছে ভুল হয় বলে গাড়ির নম্বরটা পর্যন্ত মুখস্থ করে রেখেছি, এই যে.....

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

বিশ্ববিজ্ঞান

হিমালয় প্রসঙ্গে

গারা হিমবাহ সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্যে ১৯৭৩ সালের সেপটেমবর এবং অকটোবর মাসে জিওলজিকেল সার্ভে অব ইনডিয়া একটি অভিযান চালায়। হিমবাহের জায়গাটি হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার মধ্যে পড়ে। এই অভিযানে সহযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন সার্ভে অব ইনডিয়া, ভাকরা পরিচালনা পর্ষদ, ভারত সরকারের আবহাওয়া বিভাগ, প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সোফিয়া কলেজের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

দুর্ধর্ষ এই অভিযান।

১৭ সেপটেমবর চন্ডীগড় থেকে বিশেষজ্ঞরা যাত্রা করেন। পরে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড, যার আর এক নাম ২২ নম্বর জাতীয় সড়ক—এই পথ ধরে তাঁরা অগ্রসর হন। এবং অবশেষে গিয়ে পেঁাছন মোরাং নামে একটি গ্রামে। এখানেই বসান হয় বেস ক্যাম্প।

শতদ্রুর ভূমিতল থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উচ্চতায় মোরাং গ্রামের অবস্থান। এখান থেকে শুরু পায়ে চলার পথ। দুর্গম এই পথ ধরে অভিযাত্রীরা তিরুং খাদের ৩০০ মিটার ওপরের গ্রাম থাংগিতে গিয়ে উপস্থিত হন। এরপর আরও ১৫০০ মিটার খাড়াই। অতঃপর গারা হিমবাহ। প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ এই হিমবাহ শতদ্রুর অন্যতম শাখা তিরুং খাদের কাছাকাছি অবস্থিত। যার বিগলিত জলধারা শতদ্রুর স্রোত হিসেবে সমভূমির দিকে এগিয়ে আসছে, কতকাল ধরে কে জানে? পাঞ্জাবের বিস্তৃত অঞ্চল শস্য শ্যামল করে রেখেছে তার প্রাণদায়ী জলপ্রবাহ। আবহমানকাল। ভাকরা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সেচ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের পেছনেও এই স্রোতস্বিনীর ভূমিকা এখন অনবদ্য।

গারা হিমবাহর যাত্রাপথে বেস ক্যাম্প বসিয়েছেন জিওলজিকেল সার্ভে অভ্ ইনডিয়ার অভিযাত্রীরা

এই অভিযানে বেস ক্যাম্পের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল ৩১ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ, ৭৮ ডিগ্রি ২৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমা, উচ্চতা ৪৪৩০ মিটার।

এখানকার আবহাওয়া প্রসঙ্গে অভিযাত্রীদের দিনলিপিটি ছিল এইরকম :

১ অকটোবর, ১৯৭৩ : আজ সারাদিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে তুষার পড়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মোট তুষারপাতের পরিমাণ ছিল ২০ সেণ্টিমিটার। সন্ধ্যের পর থেকে সারারাত অবিশ্রান্ত তুষারপাত।

২ অকটোবর, ১৯৭৩ : সকাল ৮টা বেজে ৩০ মিনিট। তুষারপাতের পরিমাণ ১০ সেণ্টিমিটার, দিন এবং রাতের আকাশ প্রায় পরিষ্কার বললেই চলে।

৩ অকটোবর, ১৯৭৩ : পরিষ্কার আকাশ দিনের দিকে। রাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন। এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল একাধিক।' বলেছেন জনৈক ভূতাত্ত্বিক। 'হিমালয়ের দুর্গম এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন, ভূতাত্ত্বিক স্থিতিস্থাপকতা, এখানকার আবহাওয়া বিষয়ক তথ্যাবলী, জলের প্রবাহ এবং গারা হিমবাহর গতিপ্রকৃতি এ সবের ওপর একটা স্পষ্ট ধারণা যাতে আমরা পেতে পারি তার জন্যেই এই অভিযান।'

বলা বাহুল্য, শুধু মৌল অনুসন্ধানই নয়, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে দীর্ঘ এই গিরিপ্রাচীর দেশের বিজ্ঞানীদের এখন যথেষ্ট ব্যস্ত করে রেখেছে।

হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে

গারা হিমবাহের একাংশ। হিমবাহের কঠিন বরফ গলে সৃষ্ট হচ্ছে জলপ্রবাহ। এই জল শতদ্রু নদীর প্রাণ

রয়েছে বরফের পাহাড়। হিমবাহ। এই সব হিমবাহ কি ভাবে সেখানে জমে? আমরা জানি, হিমবাহের গতি অত্যন্ত ধীর। বছরে কয়েক ইঞ্চি মাত্র। ধীর গতিতে পর্বত-মালার উচ্চতর অঞ্চল থেকে ক্রমে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। অবশেষে হিমরেখার (snow line) কাছাকাছি আসার পর গলতে থাকে। সৃষ্টি হয় তখন ঝরনা এবং অসংখ্য জলধারা। যারা পরস্পর মিলিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে এক একটি নদীর।

ওই সব নদীর জলের গভীরতা এবং প্রবাহ বর্ষার জলের ওপর আংশিক নির্ভর করলেও বেশীর ভাগই নির্ভরশীল হিমবাহের জলের ওপর। মুখ্যত বরফ গলা জলে সৃষ্ট হিমালয়ের একাধিক নদীকে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছরে নানারকম পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামান হচ্ছে। এই সব পরিকল্পনার মধ্যে আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। হিমালয়ের বরফগলা জলে সৃষ্ট নদী এবং জলাধারকে [illegible]ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেশের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার রূপায়ণ। যেমন করা হয়েছে শতদ্রু, গঙ্গা এবং যমুনা নদীর ক্ষেত্রে। এছাড়া আছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ। ইদানীং কেউ কেউ এমন কথাও ভাবছেন, হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে, যেমন দার্জিলিং, আসাম প্রভৃতি জায়গায় ঝরনা বা পাহাড়ে নদীর জল সঞ্চিত করে তৈরি করা হবে বড় বড় জলা-ধার। এই সব জলাধারের জলের সাহায্যে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে শুরু করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মাছ চাষের কাজ।

হ্যাঁ, এসব করতে গেলে জল চাই। আর সে জলের বেশির ভাগ উৎসই হিমালয়ের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে থাকা শতেক হিমবাহ। কিভাবে এই হিমবাহ জলপুষ্ট হয়, বছরে কোন সময়ে কতটা জল এক একটি হিমবাহ থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে, কোন পথ ধরে আসে, কোথায় গিয়ে জমে বা জমিয়ে রাখার সম্ভাবনা, এ সব জানতে গেলে হিমবাহগুলির ওপর ব্যাপক অনু-সন্ধান দরকার। কিন্নর জেলার গারা হিমবাহ অভিযানের পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এটাই।

*

এ ছাড়াও হিমালয় অনুসন্ধান আরও কতকগুলি কারণে এখন প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকেই জানেন, দীর্ঘ এই গিরি-প্রাচীরের ওপর এই উপমহাদেশের জলবায়ুর গতিপ্রকৃতিও অনেকটা নির্ভরশীল। হিমালয়ের উচ্চতর অঞ্চল এবং বিশেষ করে হিমবাহ অধ্যুষিত এলাকার তথ্যাবলী আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের এ দেশের আবহাওয়া বিষয়ক মানচিত্র তৈরি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

জানা দরকার, দীর্ঘ এই পর্বতমালার কোন অঞ্চলের ভূস্তর কি রকম। অবক্ষয় অথবা অন্য কোন কারণে কোন কোন অঞ্চলে ফাটল ধরার সম্ভাবনা, অথবা কোথাও কোথাও ভূপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কিনা। এ-সব তথ্য জানার মূল উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার পর হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে মানুষের আনাগোনা বেড়েছে। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে একের পর এক নতুন জনবসতি। পুরনো বসতিগুলির সংস্কার করা হচ্ছে। ওই সব অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক এবং জীবনের মান উন্নয়নের জন্যে নেওয়া হয়েছে নানা রকম প্রকল্প। তাদের নিরাপত্তার জন্যেই জানা দরকার যেখানে তাদের বাস সেখানকার পায়ের নীচের মাটির অবস্থাটি কেমন। জল এবং আবহাওয়া মানুষের স্থায়ীভাবে বাস করার পক্ষে কতটা অনুকূল।

বন-সম্পদের প্রয়োজনে হিমালয়ের গভীর এবং দুর্গম অঞ্চলে গাড়ি চলার পথ তৈরি, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যে সব খনিজ সম্পদের আকর আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের যথাযথ কাজে লাগান অথবা এখনও নতুন খনির সন্ধানে যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাদের রূপায়ণের জন্যে, নতুন বসতি গড়ার প্রয়োজন। প্রয়োজন নতুন পথঘাটের। এ সব কাজ করতে গেলেও ভূতাত্ত্বিকদের সাহায্যের প্রয়োজন।

কঠিন কাজ।

জিওলজিকেল সার্ভে অভ্ ইনডিয়ার বয়েস এ বছরে ১২৫-এ এসে দাঁড়াল। পৃথিবীর বিশিষ্টতম ভূ-অনুসন্ধানী সংস্থা দীর্ঘ ১২৫ বছর ধরে দেশের ভূতাত্ত্বিক গবেষণা এবং খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের ব্যাপারে একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করে আসছেন। তবে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সে কাজ যতটা সার্থক হয়েছিল সমতল ভূমি অথবা দেশের অবশিষ্ট পর্বত-সঙ্কুল অঞ্চলে, সে তুলনায় হিমালয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ খুব বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি। এর প্রধান অন্তরায়, ওই সময় হিমালয় অধ্যুষিত বেশির ভাগ অঞ্চল ছিল দেশীয় রাজাদের অধীন। যাদের উপযুক্ত জনবল ছিল না। না ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা আধুনিক সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা। এসব নিয়ে তাঁরা বড় একটা মাথাও ঘামান নি।

দুর্গম হিমালয়ের বরফ অধ্যুষিত অঞ্চল। পেছনে গিরিখাত। এমন পরিবেশে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানীদের প্রাণ হাতে করে কাজ করা ছাড়া উপায় থাকে না

স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় এ ধরনের অসুবিধে দূর হল। আর তারপরই হিমালয়কে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন জিওলজিকেল সার্ভে অভ্ ইনডিয়ার বিশেষজ্ঞরা।

ওঁদেরই চেষ্টায় গত পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে শুরু হয় হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান। এবং এ পর্যন্ত তার ফলাফল যা চোখে পড়ছে, এক কথায় তা অভিনন্দনীয়।

যেমন ধরুন ওঁদের চেষ্টায় নিম্ন-হিমালয়ের পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলে সন্ধান পাওয়া গেছে কয়লার নতুন উৎস। এই সব অঞ্চলের মধ্যে আছে দার্জিলিং জেলা, সিকিমের র‍্যাংগিট উপত্যকা, ভূটানের দক্ষিণাঞ্চল এবং অরুণাচলের কামেং, সুবনসিরি এবং সিয়াং জেলা। প্রায় অ্যানথ্রেসাইট এই কয়লার স্তর কোথাও মাত্র ২০ সেন্টিমিটার পুরু, কোথাও বা পুরু ১২·২ মিটার। এক একটি স্তর কোন কোন ক্ষেত্রে ৮০০ মিটারের মত দীর্ঘ। মুশকিল এই, দুর্গমতার দরুন ওই সব অঞ্চলে বড় রকমের খননকার্য চালান এখনও সম্ভব হয় নি। এ ছাড়া পশ্চিম অঞ্চলে জম্মুর কালাকোট, মেটকা এবং মাহোগোলাতেও পাওয়া গেছে কয়লার সন্ধান। ওই সব জায়গার খনি থেকে এখন বছরে প্রায় এক লক্ষ টনের মত কয়লা কাটার কাজ চলছে। এই কয়লা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কাজেও লাগান হচ্ছে। জিওলজিকেল সার্ভে অভ্ ইনডিয়ার অনুমান কাশ্মীর উপত্যকার করেওয়ায় আরও ৮৪ লক্ষ টন কয়লা পাওয়া যেতে পারে। আসামের মত পাঞ্জাবের হিমালয় অধ্যুষিত এলাকায় জ্বালানি গ্যাসেরও সন্ধান পেয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা।

জিওলজিকেল সার্ভে অভ্ ইনডিয়ার অনুসন্ধানের ফলে গত কয়েক বছরে কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশের সাহি বেল্ট, উত্তর প্রদেশে এবং পূর্বাঞ্চলের বাক্সায় পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণ চুনা পাথর এবং ডোলোমাইট। যা সিমেন্ট শিল্প গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। উচ্চমানের জিপসাম পাওয়া গেছে জম্মু এবং কাশ্মীরের বারমুলা, রাম্বন এবং আসার এলাকায়। পাওয়া গেছে ভূটানের কোথাকপাতেও। সিমেন্ট এবং সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই জিপসাম যথেষ্ট সাহায্য করবে।

মুসৌরির এক জায়গায় প্রচুর ফস্‌ফোরাইটেরও সন্ধান মিলেছে। আলমোড়ায়

পাওয়া গেছে ম্যাগনেসাইট। কাশ্মীর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে ম্যাগনাইট। এ ছাড়া পটাস, বোরাক্স প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ অধাতব পদার্থ। তামা, সীসে, দস্তা, বিসমাথ প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। কাশ্মীর এলাকায় কিছু কিছু নীলকান্ত মণিরও সন্ধান পেয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে'র অনুসন্ধানীরা।

জম্মু এলাকায় ভূ-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার মত জায়গাও পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুসন্ধান চালালে হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে এ ধরনের জায়গা আরও হয়ত পাওয়া যাবে।

খবর : আগামী ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে বসছে একটি আলোচনাচক্র। উদ্যোক্তা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইনডিয়া। এই আলোচনাচক্রে প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ এই গিরিপ্রাচীর সম্পর্কে হয়ত আরও নতুন আলোকপাত করবেন বিশেষজ্ঞ বক্তারা।

সমরজিৎ কর

নিরপেক্ষ আন্দোলনের পনেরো বছরে

শংকর ঘোষ

১৯৬১ সাল থেকে সুরু করে পনেরো বছরে পাঁচটি জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল। ষষ্ঠ সম্মেলনের স্থান কালও স্থির হয়ে গেছে—স্থান হাভানা, কাল ১৯৭৯। যদিও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে, তাহলেও প্রথম নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ইউরোপে, যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেড সহরে। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কাইরোতে, তৃতীয় লুসোকায়, চতুর্থ আলজিয়ারসে—তিনটি সম্মেলনই ভৌগোলিক অর্থে আফ্রিকায়। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্মভূমি এশিয়ায় এতদিন কোন শীর্ষ সম্মেলন হয়নি। কলমবো সম্মেলন কেবল শ্রীলংকা বা দক্ষিণ এশিয়া নয়, সারা এশিয়ায় প্রথম নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন। তেমনি ১৯৭৯ সালে প্রস্তাবিত হাভানা সম্মেলন হবে লাতিন আমেরিকায় প্রথম নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন।

তিন বছর অন্তর শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। গত দশকে এই রেওয়াজের একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল। দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয় ১৯৬৪ সালে, তৃতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান ১৯৭০ সালের আগে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনেও প্রস্তাব উঠেছিল যে দুতিন বছর অন্তর অনুরূপ সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। কিন্তু বান্দুং সম্মেলনের নেপথ্য নায়ক জওহরলাল নেহরু (নেপথ্যনায়ক এই কারণে যে তিনি মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন চু এন-লাইকে) এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল, এক বান্দুংই যথেষ্ট, দ্বিতীয় বান্দুং-এর প্রয়োজন নেই।

অবশ্য বান্দুং সম্মেলনে উপস্থিত দেশগুলি সমাদর্শের ছিল না। বান্দুং-এ মিলিত হয়েছিলেন এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন ২৯টি দেশের নেতৃবৃন্দ। এই ২৯টি দেশের মধ্যে যেমন ভারত, মিশর ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশের মতো জোট নিরপেক্ষ দেশ ছিল, তেমনি ছিল পাকিস্তান, ফিলিপিনস ও থাইল্যান্ডের মতো মারকিন নেতৃত্বে গঠিত সামরিক জোটের সদস্য দেশও। স্বভাবতই সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সম্মেলনের রাজনৈতিক কমিটিতে তুমুল বিতন্ডার সৃষ্টি হয়। একদিন তো চু এন-লাই আলোচনাকক্ষ থেকে সপারিষদ বেরিয়ে এসে রেস্তোরাঁয় বসে ছিলেন ঘণ্টাখানেক। কয়েক মিনিট পরেই এলেন কৃষ্ণ মেনন, চু এন-লাইয়ের পাশে বসে আলোচনা সুরু করলেন। আলোচনার শেষে দুজনে আবার ফিরে গেলেন রাজনৈতিক কমিটির অধিবেশনে। নেহরু পরে বান্দুং সম্মেলনে উপস্থিত ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, রাজনৈতিক কমিটির বৈঠকে মাথা ঠিক রাখা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণ মেননের উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দেন। কৃষ্ণ মেনন ছাড়া আর কারও পক্ষে ওই তুমুল মতবিরোধের মধ্যে সকলের গ্রহণীয় একটি ঘোষণার খসড়া তৈরী করা সম্ভব ছিল না। বান্দুং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতাদের মধ্যে এক যুবক ছিলেন, তখন তিনি কর্ণেল নাসের নামে পরিচিত। নাসের মেননের পারদর্শিতায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পরে সুয়েজ জাতীয়করণ সংক্রান্ত খসড়া ঘোষণা রচনার ভার তিনি মেননকেই দেন।

বান্দুং সম্মেলনের পর দুই দশক অতিক্রান্ত। এই দুই দশকে বিশ্ব রাজনীতিতে, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার

বেলগ্রেড-এ নিরপেক্ষ দেশ-এর শীর্ষ সম্মেলনে নেহেরু, নাসের ও টিটো

রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ অঞ্চলের ভূগোলের পরিবর্তন হয়েছে; পুরনো নেতারা অনেকেই প্রয়াত, তাঁরা যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তা পর্যুদস্ত; তখনকার ক্ষয়িষ্ণু ঔপনিবেশিকতা আজ এই দুই মহাদেশ থেকে প্রায় অবলুপ্ত; এ-অঞ্চলের দেশ ও জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ বান্দুং সম্মেলনের দশ দফা ঘোষণায় সামরিক জোটের সমর্থক দেশগুলি জিতেছিল না নিরপেক্ষ দেশগুলি জিতেছিল, তা নিয়ে বিতর্কের অবসান এখনও হয়নি। কেউ বলেন, দশ দফা ঘোষণা পঞ্চশীলের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়, কারও মতে দশদফা ঘোষণা গ্রহণ করার অর্থ পঞ্চশীলকে খারিজ করা। বান্দুং-এই এই বিতর্কের সূচনা। সম্ভবত সেজনাই সম্মেলনের শেষে যখন নেহরুকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সম্মেলনের সার্থকতা কোথায়, তখন তিনি উত্তর দেন, সম্মেলনটি যে হয়েছে এইটেই সম্মেলনের সার্থকতা, সবচেয়ে বড় কীর্তি (দি গ্রেটেসট অ্যাচীভমেনট অব দি কনফারেনস ইজ দি কনফারেনস ইটসেলফ)। মত-পার্থক্যের জন্য সম্মেলন যে ভেঙেগ যায়নি এবং শেষ পর্যন্ত সকলেই যে একটি খসড়া ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছেন সেইটিই সবচেয়ে বড় কথা, খসড়া ঘোষণার প্রকৃত অর্থ কি তা গৌণ।

দ্বিতীয় একটি সম্মেলনে এই সীমিত সাফল্য সম্পর্কেও নেহরুর সংশয় ছিল। তাই দ্বিতীয় বান্দুং-এর প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৯৬১ সালের প্রথম গোষ্ঠী নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। ঠান্ডা লড়াই তখন যে কোন সময়ে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। নিরপেক্ষ নীতিরও তখন সংকটের কাল। বান্দুং সম্মেলনের দুই মিত্র, ভারত ও চীনের মধ্যে তখন সীমান্ত সংঘর্ষ সুরু হয়েছে, সীমান্তবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কোন আশা তখন নেই এবং ভারত-চীন বিরোধকে কেন্দ্র করে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিও তখন দ্বিধা বিভক্ত। কিন্তু টিটো ও নাসেরের চাপে নেহরুকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়েছিল; অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে তাঁর অসম্মতি সত্ত্বেও সম্মেলন ডাকা হল। সম্মেলন আহ্বান করার সপক্ষে টিটো ও নাসেরের প্রধান যুক্তি ছিল, আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্কের এত অবনতি হয়েছে যে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-নেতারা তৎপর না হলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। বিশ্বশান্তি রক্ষার চেষ্টায় এই সম্মেলনের প্রয়োজন।

শুধু সম্মত নয়, শেষ পর্যন্ত নেহরু বেলগ্রেডে প্রথম নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলনে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি আবেদন গৃহীত হয়। সম্মেলনের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেনট কেনেডির কাছে আবেদনটি পৌঁছে দেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেনট সুকর্ণ ও মালির প্রেসিডেনট কেইটা। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের কাছে পৌঁছে দেন নেহরু ও ঘানার প্রেসিডেনট এনক্রুমা। এই আবেদনের জবাব কেনেডি ও ক্রুশ্চভ দুজনেই দিয়েছিলন।

বেলগ্রেড সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ২৫টি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নেতারা। কায়রোতে তিন বছর পরে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে পূর্ণ সদস্য হিসাবে নিমন্ত্রণ করা হয় ৪৭টি দেশকে। তখন থেকেই নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। কায়রো সম্মেলনে চীন ও পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ করার জন্য একটি প্রস্তাব হয়েছিল। নেহরু তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, চীন ও পাকিস্তান বান্দুং ধরনের সম্মেলনে বিশ্বাসী, জোট নিরপেক্ষতায় তাদের আস্থা নেই। সুতরাং সম্মেলনে তাদের উপস্থিতি জোট নিরপেক্ষ নীতির সহায়ক হবে না। অবশ্য নেহরু কায়রো সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। সম্মেলনের কয়েক মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়। কায়রোতে ভারতীয় প্রতি-নিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

তারপর থেকে প্রত্যেক নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনেই নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক উঠেছে। এই তর্কের আংশিক নিরসনের জন্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত দেশগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা প্রথায় দাঁড়িয়েছে। যেসব দেশের নিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তারা পূর্ণ সদস্য হিসাবে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে; তাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার

কলম্বো শীর্ষ সম্মেলনের দুই প্রধান ইন্দিরা গান্ধী ও সিরিমাভো বন্দরনায়ক

ও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে। যেসব দেশের আলোচনায় অংশ নেওয়ার অধিকার থাকে, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে না তারা পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়। যাদের কেবল শোনবার অধিকার দেওয়া হয়, বলারও নয়, ভোট দেওয়ারও নয় সেসব দেশকে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এসব সত্ত্বেও বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের অভিমত, অতিথি বা পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রিত দেশগুলির সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কোন সংস্রব নেই. অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হওয়ার অর্থ এই নয় তারা পূর্ণ সদস্য হওয়ার লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়েছে। বিপরীত মতাবলম্বীদের অভিমত, অতিথি দেশ হিসাবে আমন্ত্রিত হওয়ার অর্থ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত হওয়া। আজ যে দেশ অতিথি, কাল সে দেশ পর্যবেক্ষক, তারপর পূর্ণ সদস্য। কলম্বো সম্মেলনের পর এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে উঠেছে, কারণ সেখানে পর্তুগাল, ফিলিপিনস ও রুমানিয়াকে অতিথি দেশ হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই তিনটি অতিথি দেশই বহুপাক্ষিক সামরিক চুক্তির সদস্য ও ১৯৬১ সালে বেলগ্রেড সম্মেলনে গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার যে-লক্ষণ স্থির করা হয়েছিল তার বিচারে নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার যোগ্যতা তাদের নেই। এই তিনটি দেশই পর্যবেক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল, কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ না জানিয়ে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদি অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রিত হওয়া নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রথম ধাপ হয় তাহলে বলতে হবে নিরপেক্ষ সম্মেলনের রূপান্তর সুরু হয়েছে। ভারত অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে। চবন বলেছেন, বেলগ্রেড সংজ্ঞা থেকে কোন বিচ্যুতিতে তাঁরা সম্মত হননি। এই সংজ্ঞার সঙ্গে সংগতি রেখেই তিনটি দেশকে অতিথি হিসাবে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল।

কলম্বো সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পূর্ণ সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় একমাত্র মালদ্বীপকে। ফলে আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৮৬। যে-আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা পনেরো বছরে ২৫ থেকে ৮৬তে উঠেছে, সে-আন্দোলনের আদি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা অব্যাহত থাকাটাই আশ্চর্যের হত। এই দ্রুত প্রসারের একটি বড় কারণ অবশ্য, গত পনেরো বছরে এশিয়া ও আফ্রিকার একদা-উপনিবেশগুলির অনেকেই স্বাধীনতা পেয়েছে ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে নিরপেক্ষতার পথ বেছে নিয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই ও সেই সঙ্গে সামরিক-জোট নীতির অবসানও এই সংখ্যাস্ফীতির আর একটি কারণ।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের শৈশবে যেসব রাষ্ট্র এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের সঙ্গে বর্তমানের নতুন সদস্যদের অনেক প্রভেদ। এখন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনকে উপেক্ষা করার স্পর্ধা কারও নেই। নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সচিবের যোগ দেওয়া এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ সম্ভবত এই যে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ দেশগুলির সংখ্যাধিক্য; সাধারণ পরিষদে তাদের সম্মিলিত অভিমত রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিমত হিসাবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। যে কোন সদ্য স্বাধীন দেশের পক্ষে এই প্রাধান্যের অংশীদার হওয়ার অভিলাষ স্বাভাবিক। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে এই প্রাধান্যলাভের আশা তাই পক্ষে সুদূরপরাহত। কেননা রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রাধান্য শিল্পে অগ্রসর দেশগুলির, ভিটোধারী পঞ্চশক্তির। রাষ্ট্রপুঞ্জে গণতন্ত্রের অভাব, সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য সেখানে সংখ্যাধিক্যের অত্যাচার হিসাবে ধিক্কৃত। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গণতান্ত্রিক ধারণায় পুষ্ট; এখানে কারও ভিটো নেই, ধনী-নির্ধন দেশে তফাৎ নেই।

সংগীতের তিন সহজ পাঠ!
নতুন!
এইচ এম ভি
ফিয়েস্টা
পপুলার
রেকর্ড প্লেয়ার। ঘরে ও
বাইরে বাজানোর জন্য
এ সি মেইনস্
ও ব্যাটারি মডেল।
উৎপাদন শুল্ক সমেত
অনুমোদিত সর্বাধিক দাম
মাত্র ৪৭৫ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা।
মনের মত দামে
যে দামে নতুন এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার পাচ্ছেন তা রীতিমত লাভজনক। এটি যেমন মজবুত ও টেঁকসই তেমনি চোখ জুড়নো এর গড়ন। দুরঙা আকর্ষণীয় ক্যাবিনেট। আজীবন আনন্দের জন্য, নামমাত্র দামে অফুরন্ত সংগীতের জন্য—ফিয়েস্টা পপুলার।
শ্রুতিমধুর
বিল্ট্-ইন এম্প্লিফায়ার দেয় নিখুঁত পরিষ্কার ধ্বনি। এতে আছে জোরালো লিড-মাউণ্টেড স্পীকার। যে কোনো অবস্থানে পছন্দমতো বসিয়ে শোনা যায়।
রেকর্ডের পক্ষে মসৃণ
এর টোন-আর্মটি হালকা বলে স্টাইলাস ও রেকর্ড দুয়েরই কোনো ক্ষয়ক্ষতি হতে দেয় না। স্টাইলাস সহজেই বদলানো যায়—খরচও সামান্য।
GC 8673
মানানসই দামে আপনার
পছন্দসই গান শোনার জন্য
HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি
সব সেরা
কাজ পেতে হলে
"এভারেডী" হুপার ৯৯
ব্যাটারি ব্যবহার করুন
EVEREADY

আন্তর্জাতিক রাজনীতির গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করায়ত্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব এতদিন ছিল যৌথ, সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সর্বজনীন অভিমতের ভিত্তিতে, বিরোধের নিষ্পত্তি হত "কনসেনসাস"-এর মাধ্যমে, ভোটের দ্বারা নয়। এর ফলে নিরপেক্ষ আন্দোলনের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। কলম্বো সম্মেলনের পর নিরপেক্ষ আন্দোলনের সংহতি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক।

পর্যবেক্ষক ও অতিথি হিসাবে কোন দেশকে আমন্ত্রণ করা হবে তা নিয়ে শীর্ষ সম্মেলনে মতান্তর নতুন নয়। তবে কলম্বো সম্মেলনে এই মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বিতর্ক কেবল সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত তিনটি দেশকে কেন্দ্র করে হয়নি। তারা তো নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যথারীতি আবেদন করেছিল। বিতর্ক হয়েছিল পাকিস্তানকে নিয়েও, যদিও পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে কোন আবেদন করেনি। পাকিস্তানকে পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ করার জন্য সৌদি আরবের হঠাৎ-সুপারিশে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। সৌদি আরবের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তান জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় আগ্রহী, এবং সেজন্য নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বাসনা পাকিস্তান সৌদি আরবের কাছে প্রকাশ করেছে।

সৌদি আরবের প্রস্তাবটি অবশ্য গৃহীত হয়নি কিন্তু এই প্রস্তাবে একটি প্রবণতা দেখা গেছে যা নিরপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে চিন্তার কারণ হতে পারে। যদিও পাকিস্তান নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী নয় তাহলেও পাকিস্তানকে নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সৌদি আরবের চেষ্টায় এটিই প্রমাণ হয় যে আদর্শ ও নীতির মিলকে এখানে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়নি। মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে ধর্মকে। কলম্বো সম্মেলনে উপস্থিত দেশগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশ্য তারা সবাই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, কোন কোন রাষ্ট্র প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র নিজেদের ধর্মভিত্তিক বলে ঘোষণা করেছে তারা যদি ধর্মের বন্ধনকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আদর্শের বন্ধনের চেয়ে দৃঢ়তর মনে করে এবং ধর্মভিত্তিক সহযোগিতার পথ বেছে নেয় তাহলে তা নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আঘাত করবে। সৌদি আরবের ওকালতিতে এই প্রবণতা ধরা পড়েছে।

নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে গোষ্ঠী গড়বার চেষ্টা কেবল ধর্মের ভিত্তিতেই হচ্ছে না। আঞ্চলিক ভিত্তিতেও হচ্ছে। নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কলম্বোয় স্থির হয়েছে যে আন্দোলনের সমন্বয় ব্যুরোর সদস্য সংখ্যা হবে ২৫। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্স সম্মেলনে যখন এই ব্যুরো গঠন করা হয় তখন এর সদস্য সংখ্যা স্থির হয় ১৮; কিন্তু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে চিলি বেরিয়ে যাওয়ার পর এই সংখ্যা ১৭তে দাঁড়ায়। ব্যুরোর ১৭টি সদস্য দেশের মধ্যে সাতটি ছিল আফ্রিকার, ছয়টি এশিয়ার, তিনটি লাতিন আমেরিকার ও একটি ইউরোপের। কলম্বোয় যখন এই সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তখন আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কলম্বোয় উপস্থিত ৮৬টি দেশের মধ্যে ৪৮টি আফ্রিকার,

২৮টি এশিয়ার, সাতটি লাটিন আমেরিকার ও তিনটি ইউরোপের। আফ্রিকার দেশগুলি দাবি করে সমন্বয় ব্যুরোর আসনগুলি এই চারটি মহাদেশের মধ্যে সভ্যসংখ্যা অনু-সারে ভাগ করে দিতে হবে। গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকটি দেশের আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই নীতিই গৃহীত হয়। স্থির হয় যে নতুন বর্ধিত ব্যুরোর ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন হবেন আফ্রিকার, আটজন এশিয়ার চারজন লাতিন আমেরিকার ও একজন ইউরোপের।

চারটি মহাদেশের মধ্যে আসন ভাগের প্রশ্ন মীমাংসিত হওয়ার পরও কিন্তু সব বিরোধের নিষ্পত্তি হল না। এরপর বিতর্ক সুরু হল, মহাদেশের আসনগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কীভাবে ভাগ করা হবে। লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিরোধ ওঠেনি, উঠেছিল আফ্রিকার ও এশিয়ার বেলায়। আফ্রিকার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাগাভাগির যে-নীতি গৃহীত হয় তাতে নতুন সমন্বয় ব্যুরোয় গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিশরের স্থান হয়নি। শ্রীলংকার

প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়ক ব্যক্তিগত আবেদন জানান, নিরপেক্ষ আন্দোলনের এই আদি সদস্যটিকে আফ্রিকার ১২টি আসনের একটি দেওয়া হোক, কিন্তু তাঁর এই আবেদনে আফ্রিকার সদস্য দেশগুলি কর্ণপাত করেনি।

এশিয়ার আসনভাগের প্রশ্নে তো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়ার দ্বন্দ্বের অবসান শেষ পর্যন্ত হয় এশীয় গোষ্ঠীর সভাপতি শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফেলিকস বন্দরনায়েকের হুমকিতে। তিনি বলেন আপসে এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি না হলে তিনি ভোট নিতে বাধ্য হবেন। ভোটে নিশ্চিত পরাজয় জেনে উত্তর কোরিয়া সরে দাঁড়ায় ও বাংলাদেশ দেড় বছরের জন্য সদস্য হওয়ার আপস প্রস্তাব মেনে নেয়। এই দুই বিরোধের মূলেও ছিল আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। উত্তর কোরিয়ার বক্তব্য ছিল, ভিয়েতনামকে যে আসনটি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি দূর প্রাচ্যের ভাগে পড়া উচিত। ভিয়েতনাম দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ, সুতরাং সমন্বয় ব্যুরোয় ওই অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত কোন আসনে ভিয়েতনামকে মনোনীত করা উচিত। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের বক্তব্য ছিল যে-আসনটি দক্ষিণ এশিয়ার ভাগে পড়েছে সেই আসনটি আফগানিস্তানকে দেওয়া ঠিক হবে না। আফগানিস্তান পশ্চিম এশিয়ার—দেশ, পশ্চিম এশিয়ার প্রতিনিধি—হিসাবেই তার সমন্বয় ব্যুরোতে যাওয়া উচিত।

ধর্মীয় ও আঞ্চলিক উপগোষ্ঠী গঠনের প্রবণতা ছাড়া কলম্বো সম্মেলনে আরও একটি অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে—দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশগুলির প্রকাশ্যে কলহ। পশ্চিম সাহারার প্রশ্নে মরক্কো ও আলজিরিয়ার মতভেদ, পূর্ব তিমরের প্রশ্নে ইনদোনেশিয়া ও মোজামবিকের মতভেদ বা ভিয়েতনামের সঙ্গে "এশিয়ান" (অ্যাসোসিয়েসন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস) দেশগুলির মতভেদ রাজনৈতিক কমিটির আলোচনায় যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। দু একটি বিষয়ে যে শেষ পর্যন্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

মিশর, যুগোশ্লাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের মতো আদি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি বরাবরই দ্বিপাক্ষিক সমস্যা উত্থাপনের বিরোধী। শুধু নিরপেক্ষ সম্মেলনে নয়, কমনওয়েলথ সম্মেলনেও দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় না। তাই কাশ্মীর সংক্রান্ত ভারত-পাকিস্তান বিরোধ কোনদিন কমনওয়েলথের আলোচ্য বিষয় হয়নি। অতীতে নিরপেক্ষ সম্মেলনে কোন দ্বিপাক্ষিক সমস্যা উত্থাপিত হয়নি বলা চলে না, তবে কলম্বোয় যত দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে এত ইতিপূর্বে হয়নি। এবারে যেসব নতুন দ্বিপাক্ষিক সমস্যা শীর্ষ সম্মেলনে তোলা হয়েছে তার মধ্যে ফরাক্কা অন্যতম। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হয়: আলজিয়ার্সে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তখনও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার জল বণ্টন নিয়ে আলোচনা চলছে। মুজিব কিন্তু সে প্রশ্ন তোলেননি। বাংলাদেশে যে জমানা বদল হয়েছে তা প্রমাণ করবার জন্যই যেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা কলম্বো সম্মেলনে সব স্তরের আলোচনায় ফরাক্কার প্রশ্নটি তোলেন। শীর্ষ সম্মেলনে এ-বিষয়ে বলেন স্বয়ং প্রেসিডেনট সায়েম, পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে জেনারেল জিয়াযুর রহমন ও রাজনৈতিক কমিটির আলোচনায় এম আর সিদ্দিকি। সিদ্দিকি ভারতের নাম করে তিনদফা অভিযোগ করেন—ভারত বাংলাদেশকে গঙ্গার জল থেকে বঞ্চিত করছে, সীমান্ত উপদ্রব করছে, ও দেশদ্রোহী শক্তিকে সাহায্য করছে। বস্তুত ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কলম্বোয় যে বিষোদ্গার করেছে, পাঁচটি শীর্ষ সম্মেলনে তার কোন তুলনা মিলবে না।

কলম্বো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মতৈক্যও দেখা গেছে। সাম্রাজ্যবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, ঔপনিবেশিকতা, নিরপেক্ষ সংবাদ সংস্থা ইত্যাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ আন্দোলন আগের মতোই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু এই ঐক্য সত্ত্বেও কলম্বো সম্মেলনে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক কলহ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কলম্বো সম্মেলনের আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক নিরপেক্ষ নেতাই অভিযোগ করেছিলেন যে নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা হচ্ছে। কলম্বোতে দ্বিপাক্ষিক বিরোধের এত ছড়াছড়ি সেই অপচেষ্টার ফল, এ-অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পারে। কলম্বো সম্মেলনের অনেক সিদ্ধান্তের গুরুত্বই অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত যদি সত্যই কার্যকর হয় তাহলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তা হবে স্বয়ংভরতা ও শিল্পোন্নতির দিকে বিরাট পদক্ষেপ। যতদিন তা না হয় ততদিন নেহরুর মন্তব্যের পুনরুক্তি করেই বলা চলে, সম্মেলনই কলম্বোর সবচেয়ে বড় সাফল্য।

অমৃতাঞ্জন ডারমল্ অয়েণ্টমেণ্ট
শরীরের গভীরে প্রবেশ করে সেজন্য
দাদ্, একজিমা, চুলকুনি ও ত্বকের
অন্যান্য সাধারণ অসুখে ইহা অত্যন্ত
ফলপ্রদ। আজই এক টিন কিনে নিন।
Amrutanjan
Dermal Ointment
for
RING WORM . ECZEMA ETC.
অমৃতাঞ্জন
ডারমল্ অয়েণ্টমেণ্ট
অমৃতাঞ্জন লিমিটেড,
আপনার
ত্বক সুরক্ষা
করুন।

আলোচনা

বন্দে মাতরম ঃ শতবর্ষ

১৪ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅমিয়সূদন ভট্টাচার্যের "বন্দেমাতরম্‌ ঃ শতবর্ষ" প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই চিঠি লিখছি।

'বঙ্গদর্শন'-এ কিছু Matter কম পড়লে প্রেসের কর্মচারী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। সেই সূত্রেই গানটি তিনি নেন।

১৯০৯ খৃীষ্টাব্দে (তারিখটা ঠিক মনে পড়ছে না) আমি আমার পিতা 'মেঘনাথ ভট্টাচার্য' এবং 'গোপীনাথ কবিরাজ কাঁঠালপাড়ায় রামচন্দ্রের বাড়িতে যাই। এ প্রসঙ্গে তিনি তখন যা বলেছিলেন তা আমি একটি নোটবুকে লিখে রেখেছিলাম। সেই নোটবুক থেকে প্রায় হুবহু নকল করে দিচ্ছি'—

"বন্দেমাতরম্‌ গানটি আনন্দমঠ লেখার পূর্বেই রচনা করা হইয়াছিল। প্রথমত প্রিয়নাথ কথককে সুরে চড়াইবার জন্য কহিলেন। তিনি অসমর্থ হইলে যদুনাথ ভট্টকে কহিলেন। তিনি যখন গাহিলেন সকলের মনোরঞ্জন হইল। তখন রাম পণ্ডিত মহাশয় বঙ্গদর্শনের একটি আর্টিকেলের জন্য বঙ্কিমের নিকট গিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, গীতটি কেমন শুনিলে? রামচন্দ্র—শুনিলাম ভাল। 'কিন্তু এ সকল গীতের দিকে আপনার প্রবৃত্তি হইল? দ্বিসপ্ত ভুজৈ ইত্যাদি ছেলে ছোকরার ঢং কেন? বাঙ্গালী কি রাজা হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র ঃ—রাজা প্রজা কি? রাজা যেই হোক না কিন্তু প্রজারা স্বাধীনতা বুঝিবে। এ কি ছেলে ছোকরার ঢং? এ গীতের মহিমা ২৫ বৎসর যদি বাঁচ ত জানিতে পারিবে। আমি অত বাঁচিব না। কিন্তু তোমরা তখন দেখিয়া লইবে। ইহা ভারতকে মাতাইয়া তুলিবে। সমস্ত দেশ প্লাবিত করিবে। প্রথমে কিছু অনিষ্ট হইবে। কিন্তু আর ২৫ বৎসর পর সুফল ফলিবে।

রামচন্দ্র ঃ—আমার বুদ্ধিতে এসব প্রবেশ করিল না তবে আপনার যেরূপ লেখা অভ্যাস তাহাতে জগতের উপকার হইতেছে, তাহাই লিখুন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ—আমি অদ্যাবধি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে বঙ্গ সংসারের কিছুই উপকার হয় নাই বরং ক্ষতি হইয়াছে।

রামচন্দ্র ঃ—কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ—কতকগুলি স্ত্রীলোক কুন্দ কতকগুলি পুরুষ জগৎসিংহ হইতে চেষ্টা করিবে ইত্যাদি অথচ ইহাতে কোন ফল হইবে না। আমি এবার যাহা লিখিব তাহাতে দেশের যথার্থ উপকার হইবে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'মেঘনাথ ভট্টাচার্য' তখন জয়পুর কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন এবং 'গোপীনাথ কবিরাজ সেই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য
—শাস্ত্রী রোড, নৈহাটি

রাজেশ্বরী দত্ত

'বন্ধু রাজেশ্বরী দত্ত' প্রবন্ধটির জন্য (দেশ, ৩১ জুলাই ১৯৭৬) শ্রীমতী প্রতিভা বসুকে ধন্যবাদ। তিনি রাজেশ্বরী দত্তের যে-ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা যেমন অন্তরঙ্গ, তেমই মর্মস্পর্শী। তবে তাঁর দুটি মন্তব্য তথ্য-নির্ভর নয়। একই ভুল ছিল দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধটিতে। এবং সেই ভুলের কারণ সম্ভবত রাজেশ্বরী দত্ত মারা যাওয়ার পরের দিন অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেশ্বরী দত্তের জীবনীতে ভুল থাকার জন্য। শ্রীমতী প্রতিভা বসু লিখেছেন, "তারপর উনিশ শো উনসত্তর সালে সেই কাজ ছেড়ে 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'-এর দায়িত্বভার গ্রহণ। সেই কাজেই নে এই অকটোবর মাসে দেশে আসে।" শ্রীমতী দত্ত লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের ডিরেকটারও ছিলেন না, দায়িত্বভারও নেননি। তিনি ১৯৬৯ সালের অক্টোবর থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গীতের লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। গত অক্টোবরে তিনি দেশে এসেছিলেন দশ মাসের 'স্টাডি লীভ' নিয়ে। রাগমালা পেন্টিংসের সূত্র ধরে রাগের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা ব্যাখ্যা করাই তাঁর গবেষণার বিষয়

ছিল এবং ওই পাণ্ডুলিপির সন্ধানেই তিনি ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে যাচ্ছিলেন। শুনেছি, বেনারসে তিনি একটা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান, কিন্তু সেইদিনই লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে একটা রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে অসুস্থ হন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাইপো, হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ছেলে বেনারসে গিয়ে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীমতী দত্তকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।'

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, রাজেশ্বরী দত্ত এবারে দেশে ফিরে তাঁর স্বামীর ভাইদের পরিবারের সকলের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট ছিলেন, এমনটি আগে কখনও দেখা যায়নি। সৌরীনবাবু সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরী দত্তের উইলের ট্রাস্টি এবং তাঁর বাড়ি কলকাতায় শ্রীমতী দত্তের স্থায়ী ঠিকানা থাকলেও "সৌরীন দত্ত' মহাশয়কে সুধীনবাবুর 'প্রিয়তম ভ্রাতা' বলা বোধ হয় ঠিক নয়। সব ভাই-বোনই সুধীনবাবুর প্রিয় ছিল এবং সুধীনবাবুর জীবিতকালে মেজভাই হরীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বই নির্ভুলভাবে প্রকাশের দিকে লক্ষ রাখতেন, সুধীনবাবুর মৃত্যুর পরেও তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

নিরঞ্জন হালদার
কলকাতা-৪২

রবীন্দ্র সংগীতের ইংরাজী অনুবাদ

৭ আগস্টের 'দেশ'এ 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ' এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আত্মপক্ষ সমর্থন ছলে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা পড়লাম। এখন আমার মনে স্বভাবতই কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত, উক্ত মহাশয় কি রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী অথবা অনুবাদ রসিক? যদি উনি সঙ্গীত রসিক হন, তবে গীতাঞ্জলির গানগুলি (যা কবিগুরুর অনুবাদ) পরিবেশন করতে পারেন। আর যদি অনুবাদই প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। উনি বলেছেন যে উনি বিদেশী ও অবাঙালীদের মনোরঞ্জনের জন্য এই কর্মে প্রয়াসী। এখন প্রশ্ন হল একই রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিভিন্ন ইংরাজী অনুবাদ যে হবে না একথা অস্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে বিদেশী ও বাঙালী শ্রোতারা কি বিভিন্ন অনুবাদে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন না?

দ্বিতীয়ত, একই কবিতার বিভিন্ন অনুবাদ হলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই শ্রোতারা কোনটি যথার্থ রবীন্দ্র সঙ্গীত তা টের পাবেন কিভাবে? সেক্ষেত্রে কোন অনুবাদের মৌলিকতা কিভাবে স্বীকার করা যাবে?

প্রশান্ত রানা
বর্ধমান

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

কলকাতাকে সুন্দর করার বিচিত্র পরিকল্পনার আড়ম্বরে মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত একটি দিকের প্রতি ৩১ জুলাই 'শিল্পকলা প্রসঙ্গে' যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে ধন্যবাদ। আস্তাকুড় পরিষ্কার হলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি, তাই বলে পরিচ্ছন্নতাবোধ এমন কি বিশুদ্ধ প্রকৃতিপ্রেমও মানবিক সৌন্দর্যবোধের যথেষ্ট পরিচয় বহন করে না একথা মানলেও এ বোধ আমাদের নেই, তা অনস্বীকার্য।

উত্তর থেকে দক্ষিণ শহরের সর্বত্রই মূর্তি স্থাপনের যে ক্ষীণ স্বীকৃতি রয়েছে তাও কোন সৌন্দর্যবোধ থেকে প্রেরণা লাভ করে নি। বড় আকারের একটা প্রতিকৃতি গড়লেই যে ভাস্কর্য হয় না, 'মনুমেণ্টের' আকারে মহামানবের মূর্তি গড়তে চাইলেই যে তাতে 'মনুমেণ্টাল' গুণ আরোপিত হয় না এই নির্মম সত্যকে লেখক স্পষ্ট করে বলে শিল্পানুরাগীদের তরফ থেকে একটা মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য কলকাতার বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূর্তি করার কথা ভাবলে বিষয়-নির্বাচনেও শিল্পীর স্বাধীনতা প্রয়োজন। প্রকৃতি-জনজীবন-যন্ত্রবহুল শিল্পাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বিমূর্ত রূপের জগতে অবাধ বিচরণের অধিকার শিল্পীকে দেওয়া হোক। (দেবতাদের প্রতি ভক্তি এবং মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে) কলকাতার কর্মকর্তাদের কাছে আমার এই বিনীত অনুরোধ।

দেবাশিস ভট্টাচার্য
কলকাতা ৩৪

গ্রন্থাগার সমস্যা

সাংস্কৃতিক সম্বল, গ্রন্থাগার সম্পর্কে আপনার সময়োচিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের (দেশ, ৫ ভাদ্র ১৩৮৩) জন্যে ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য দেশ পাঠকের তথা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত মানুষের কাজে লাগবে বলে আশা করি। আপনারা লিখেছেন, খাস সরকারী উদ্যোগের সৃষ্টি সাত শত (এখন প্রায় আট শত) গ্রন্থাগারের অবস্থাও খুব সুস্থ এবং প্রাণ খুব সজীব নয়। কথাটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ব্যবহারের কথা যদি বলা হয়ে থাকে; বাস্তব অভিজ্ঞ মাত্রেই বলবেন এমনকি গ্রামগঞ্জেও আজকাল গ্রন্থাগার থাকার দরুন সাধারণভাবে জ্ঞান, বিদ্যা ও আনন্দ সাধারণ জনজীবনে অধিগত হচ্ছে। আর যদি গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থা আইন কানুন ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়, তাহলে বলতেই হয় গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য আজ পর্যন্ত কোন আইন বা সুষ্ঠু নিয়মাবিধি তৈরীই হয়নি। স্বভাবতই বিভিন্ন জেলায় জেলা অফিসারেরা নিজ নিজ জেলায় নিজস্ব নিয়ম কানুন চালান। অফিসার বদল হয়। আইনও বদলে যায়। আর এখনও বেশীর ভাগ জেলায় জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারীকের পদ খালিই পড়ে রয়েছে।

আর এক জানতে চাওয়া হয়েছে, গ্রন্থাগারের সাহায্যের জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন, সেটা যথোচিত সুফলপ্রসূ হয়নি, হচ্ছেও না। এর কারণ কী? এর কারণেরও মূলে রয়েছে, গ্রন্থাগার-আইন না থাকা। যেমন ধরা যাক। অনুদানের টাকা। কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকার জন্য জেলা অফিসারেরা যেমন খুশি টাকা তার জেলায় এনে নিজের খুশিমত গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান হিসাবে বই কিনে দিতে পারেন। ফল সহজেই অনুমেয়। রামমোহন ফাউণ্ডেশন এবং তাদের পুস্তক সরবরাহ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে ৪০—৪৫% কমিশনে ফাউণ্ডেশন বই কিনেছেন।

বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগারগুলির জন্য বই কেনবার এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সেই বই প্রেরণ করবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে হয়। প্রথমত কোন বিশেষ বৎসরে বিশেষ কারণে হঠাৎ কিছু বই গ্রন্থাগারগুলিকে দেওয়া হলেও প্রতি বৎসর সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নিয়মমাফিক বই সরবরাহ অদ্যাবধি হয়নি। প্রসঙ্গত পুস্তক নির্বাচনের জন্য কোথাও আদৌ কোন কমিটিই নেই। গ্রন্থাগার পরিচালনা সংগঠন ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকেরা যতদিন স্বাদশ-ব্যাক্তি হয়ে থাকবেন ততদিন কিইবা আশা করা যেতে পারে।

অনঙ্গ ভট্টাচার্য
পাণ্ডুয়া ঃ হুগলী

আপনি ভাল পয়সাই খরচ করছেন। আমাদের মনে হয় আপনার ভাল কাপড়ই পাওয়া উচিত।

সেই জন্যেই তো আমরা 'টেরীন' এ ট্রেডমার্ক লাগাই, যাতে আপনি কাপড়ে সেটা দেখতে পান আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, আপনি পাচ্ছেন পরীক্ষিত পলিয়েস্টার কাপড়— 'টেরীন' পলিয়েস্টার ফাইবারের নির্মাতা কেমিকালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (ক্যাফি) দ্বারা পরীক্ষিত কাপড়। একটি পরীক্ষার কথাই ধরুন। পাকা রঙের পরীক্ষা।
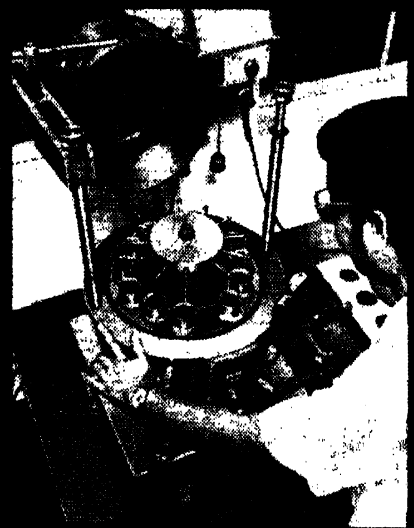
এই যন্ত্রে পরীক্ষামূলক পরিবেশে পরীক্ষায় বুঝতে পারা যায় ৬০ বার যথারীতি ধোয়ার পর কাপড় কেমন হবে।

আমরা কাপড়ের একটা টুকরো নিয়ে তার সঙ্গে এক ফালি সাদা কাপড় লাগাই। [illegible]

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী

অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে গেলে বিস্ময়কর এক বৈদগ্ধ্যের সম্মুখীন হতে হয় কিংবা একরকম আন্তরিক সারল্যের। ছবি এতো সহজ যে আঁকার কৌশলের কথা মনে হয় না। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি এবং একাদমী অব ফাইন আর্টসের যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর ছবিগুলো সুনির্বাচিত একথা স্বীকার করতেই হয় (একাদমী চিত্রশালা—১৮—২৭শে অগাস্ট)। শুধু মনে হচ্ছিল ক্যাটলগে প্রতিটি ছবির আমল বা আনুমানিক রচনাকাল থাকলে নেহাত মন্দ হতো না।

অবনীন্দ্রনাথের সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে জাতীয়তাবোধ ইন্ধন যুগিয়েছিল, কিন্তু সেটা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্তরে কখনো নামেনি বলেই আমার বিশ্বাস। বরং যেটা স্পষ্ট সেটা হলো বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অগাধ বিস্ময়। আর এক আশ্চর্য কল্পনাপ্রবণতা। নিজস্ব রীতিতে বাস্তব জগৎটা সাজিয়ে নেওয়া। একদিকে যেমন ইংলণ্ডীয় জলরঙ ব্যবহারের প্রক্রিয়া তিনি গ্রহণ করেছেন, অন্য দিকে তেমনি জাপানী ওয়াশ পদ্ধতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এসবের চেয়ে তাঁকে আকর্ষণ করেছে পারসিক, মুঘল এবং উত্তর ভারতীয় নানা রীতির অনুচিত্র। বস্তুত বড় ছবি আঁকার মানসিকতা তাঁর নয়। অথচ কী অপূর্ব সারস্বত তাঁর সংবেদনশীলতা। আবার এসব ছেড়ে কতো সহজে, অনায়াসে তিনি এলেন লোকশিল্পীর জগতে। অর্থাৎ তাঁর জগতটাই ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক, শৌখিন, নবাবী, কায়দা শিষ্টতা ও সহবতের। এক ধরনের হাস্য-পরিহাস আর হৃদ্য উদারতার।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিকতার পায়ের তলায় মাটি ছিল। কাছারীতে বা দরবারে, লৌকিকতা আর উৎসবে সাধারণ মানুষ যাওয়া আসা করতো। তা ছাড়া প্রজা শাসন কিংবা মতান্তরে পীড়নের জন্যেও পরগনায় যেতে হতো। নগরায়ণের জন্যে অধুনা গ্রাম ও শহরের দুস্তর বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি। সামন্ততান্ত্রিকতার অপর পাশেই লোকায়ত চিন্তা, লৌকিকতার অলৌকিক উপস্থিতি। ঠাকুরবাড়ির সৃজনশীল ব্যক্তিদের রক্তের ভেতর নিবিড় ভারতীয় এক বোধ কাজ করে গেছে।

এই প্রদর্শনীতে কিছু অনুচিত্র আছে যা উত্তর ভারতীয় নানা কলমের মিশ্রিত ফল, আবার কিছু কাজ আছে যা বহুলাংশে পারসিক বা হয়তো সেমেটিক—মধ্যপ্রাচ্যের একটা মরুপ্রান্তরের আবহাওয়া। এখানে সেই বিখ্যাত ছবি শাহাজাহানের মৃত্যুর অবনীন্দ্রনাথেরই করা একটা অনবদ্য নকল দেখলাম। হয়তো ছবিতে একটু ভাবাবেগ বেশি—না, তা ঠিক নয়। দূরে দিগন্ত ইউরোপীয় পার্সপেকটিভের বা দূরত্বভ্রমের নীতি মেনে তাজমহল। আর সাধারণ খাটে শুয়ে শাহাজাহান, মৃত। দুটি থাম আর তার গায়ে লতাপাতার ডিজাইন, একপাশে মাটিতে বসে জাহানারা। নীরব। কার্পেটের পাকা পাঁতলেবু হলুদ আর শাহাজাহানের গায়ে জড়ানো ইটলাল শাল। রঙ অস্বচ্ছ, কিন্তু কী তার দ্যুতি। একটা অদৃশ্য ত্রিভুজের মধ্যে নিপুণভাবে সাজানো আসবাবপত্র, পাত্রপাত্রী। কিন্তু সমস্তটা আমাদের মায়ায় জড়িয়ে ফেলে। সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়া, মানুষের সাফল্য ব্যর্থতা সব কিছু কেমন অতীত হয়ে যায়। তবুও কি ... এই মানবলীলা! এরই অন্য পিঠ তাঁর "মেঘদূত"—এর আবহাওয়া যেন অনুচিত্রের রাগরূপের চিত্রমালার কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজপুত আর পাহাড়ী কলমের মিশ্রিত রূপ। নীল আর সবুজে স্নাত ছবিটার একটা ভিজে আর মেঘের ছায়াঘন ভাব আছে। হঠাৎ কেন যেন পেখম তোলা ময়ূরের ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

মুখোশ শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আরব্য রজনীর' চিত্রমালার মধ্যে শুধু মুঘল নয়, মধ্য প্রাচীর অনুচিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মূল ছবির একপাশে তিনি একটি মোটা আঁচলা রেখেছেন একরঙা জমাট। যেমন ধরা যাক "বাসরঘরের পথে শাহাজাদী"। ছবির বাঁ পাশে ইঞ্চিখানেক একটা খাড়া লাল পাড়। অস্বচ্ছ। বা "ভারতীয় সুফি" ছবিটার উপরে ও ডান পাশে একটি সবুজ গালিচার বর্ডার। এই একরঙা আঁচলাটা গানের আলাপের মতো যেন অচিন-রাগরূপের রহস্য উন্মোচন করে আমাদের কাছে। প্রথম ছবিটার খাড়া লালের আঁচলার পাশে মূল পটভূমি অনুভূমি রেখা বরাবর নীচে নীল আর ওপরে সবুজ রঙে ভাগ করা হয়েছে। কিশোরী শাহাজাদীর

একপাশে কালো জোব্বা পরা বুড়ো। কিশোরীর গায়ে লাল পাঞ্জাবি আর তার ওপরে বেগুনি হাতকাটা কোট। কিশোরীর অন্য পাশে মহিলার গায়ে হাল্কা গোলাপী সালওয়ার কামিজ। প্রত্যেক ত্বকবর্ণ ভিন্ন,—বৃদ্ধের তামাটে লোল ত্বক, মহিলার মোলায়েম আর কিশোরীর পাপড়ির মতো নরম। প্রত্যেকের মুখে বিষাদের ছায়া যেন।

তিনি রূপকথার রূপকার। দেখতে দেখতে এক আশ্চর্য মোহাবেশে ধন্ধ লাগে চোখে। পট ছোট কিন্তু সুকৌশলে প্রতিটি সেণ্টিমিটার জমি তিনি কাজে লাগান। তাঁর জ্যামিতিক বোধ তীক্ষ্ণ। কোথায় কি রাখলে ভারসাম্য ও টান বজায় থাকবে তা তাঁর নখাগ্রে। চিত্ররচনার গূঢ়তম কৌশল তাঁর আয়ত্তে। এসবের বোধ হয় চরম একটা সাদা কালো বেড়াল—ধনুকের মতো বেঁকে মাটিতে কি একটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। পশ্চাৎপট সিঁদুর রঙের গালিচা—ওপর থেকে নীচে সবটুকু রঙ দিয়ে বন্ধ করা। দারুণ দুঃসাহসী রচনা।

প্রতিকৃতি রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এখানে ২"×১" ছোট্ট পাশ থেকে আঁকা আনন্দ কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি আছে। ছোট কাজ, কিন্তু মেজাজে করা। সূক্ষ্ম অনুভব যেন ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। মুখের হালকা গোলাপী আভার সঙ্গে শ্বেতশুভ্র পাগড়ী খুব মানিয়ে গেছে। ফাঁক দিয়ে কানের অংশ। আর চঞ্চুর মতো বাঁকা নাক। 'ফাল্গুনী' সিরিজে রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথের যৌথ বা একক ছবি তাঁদের অভিনীত চরিত্রের সাজসজ্জায় অল্প রঙ খরচ করে আঁকা। অন্য দিকে মুখোশ পর্যায়ের ছবিগুলো খুঁটিনাটি বর্ণনা করার দিকে ঝোঁক। 'কিরাতী'-র মোঙ্গলীয় ধাঁচের মুখ ও শিরোভূষণ লাল, হলুদ ও নীলের সমহারে উজ্জ্বল। এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে তাঁর স্বপ্রতিকৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ।

নিসর্গদৃশ্যে জলরঙ, 'ওয়াশ' ও ভূমি বিভাজনের অনৈসর্গিক সারল্যেরই প্রাধান্য। বাংলা দেশের নদী, ঘাট, অনিগন্ত মাঠ, ধানক্ষেতের রৌদ্রছায়ার ছবি এঁকেছেন। এখানকার জল হাওয়া সূর্য আর আলো জুড়ে রয়েছে পট। কিংবা উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল। কিংবা পাখি, কাঠঠোকরা, পেঁচা, পায়রা। এর মধ্যে একটা কোলা-ব্যাঙের কোনো তুলনা নেই। ওপরে নীল আকাশ আর নীচে মেটে রঙের ব্যাঙ, ব্যাঙের ছাতা আর সবুজ জল। সমস্ত পরি-বেশটা কেমন গা ছমছমে প্রাগৈতিহাসিক। ব্যাঙের মধ্যে আদিরূপের আদল। হয়তো মগ্নচেতনার অসতর্ক ছায়া বা যৌথ চেতনার স্মৃতি। একটা জলজ স্যাঁতসেঁতে ভাব।

'কৃষ্ণমঙ্গল' বা 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'-র

শেষ হুঙ্কার — শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগৎটা কিন্তু পুরোপুরি লৌকিক। তাঁর সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ী লিখিয়ে অধ্যাপকরা "লোক" শব্দটা ইনভারটেড কমার মধ্যে বন্দী করতে সক্ষম হননি। এখানে রেখার প্রাধান্য। রঙ মূলত সমতল। পটকে একটা আঁকাবাঁকা রেখা দিয়ে সাধারণত ভাগ করে নেওয়া হয় মাঝ বরাবর। নীচের অর্ধেকটায় থাকে একটা মানুষ বা জন্তু—রূপারোপ বা স্টাইলাইজেশনের ওপর জোর দেওয়া হয়। পশ্চাৎপট হালকা রঙের বুনোট। নীচের অর্ধেকটায় আরো কিছু গোল গোল রেখা আর তার ওপর ফুটকি। উবড়োখাবড়া জমি আর আগাছা। "মুমূর্ষু বাঘের" লাল জিব আর নখ, কালো গায়ের ফোঁটা ফোঁটা দাগগুলো এলোমেলো—এই প্রথম একটা ছবি দেখি যেখানে তিনি ধরে ধরে রঙ লাগাননি। এই ছবিগুলোতে তিনি খুঁটি-নাটির দিকে নজর দিতে ভোলেননি। কেমন যেন একটা সরল বুনো গন্ধ আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির নান্দনিক নির্যাস আর কোনো শিল্পী বোধ হয় এমনভাবে পান করেননি। তাঁর চেতনায় হিন্দু বা মুসলমান সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। বর্তমান থেকে পেছন ঘুরে তিনি পালাননি। বরং মাটি, মানুষ ও তাদের কল্পনার জগতের চাবিকাঠি ছিল তাঁর হাতে। তাঁর জগৎটা সামন্ততান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু ঐশ-নির্দেশক গন্ধ নেই তায়। এমন তীব্র, পরিপ্লুত, চাক্ষুষ তাঁর স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু কী শুচিশুভ্র তাঁর নিরাসক্তি। গৃহী তিনি, কিন্তু মন তাঁর বিবাগী। আমি তাঁর জগতে চিরকাল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজিত বালকের মতো ঘুরে বেড়াব।

পুনশ্চ : অবনীন্দ্রনাথের ছবি জাতীয় সম্পদ। অযত্নে ধুসর, পোকায় কাটা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রঙ-চটা ছবিগুলোর আয়ু সম্বন্ধে সংশয় থেকে গেল। এ-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছি।

যোগেন চৌধুরী ও রামেশ্বর ব্রুটা

গত জুলাই থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের কান-সুর-মার (Cagnes - Sur - mer)-এ আন্তর্জাতিক শিল্পকলা উৎসব চলছে। এই প্রদর্শনীর জন্যে ভারতবর্ষ থেকে যে দুজন শিল্পীর কাজ নির্বাচিত হয়েছে, তাঁরা হলেন যোগেন চৌধুরী ও রামেশ্বর ব্রুটা। নির্বাচক Indian Council for Cultural Relations। যোগেন আবার ভারত-ফ্রান্স একসচেঞ্জ প্রোগ্রামে ফ্রান্সে যাবার জন্যে ফরাসী সরকারের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় তিনি পৌঁছবেন ফরাসী দেশে, কারণ প্রদর্শনীতে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে। কলকাতার এই তরুণ ও শক্তিমান শিল্পীর সাফল্যে আমরা গর্বিত। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানালাম।

সন্দীপ সরকার

॥ ১৫ ॥
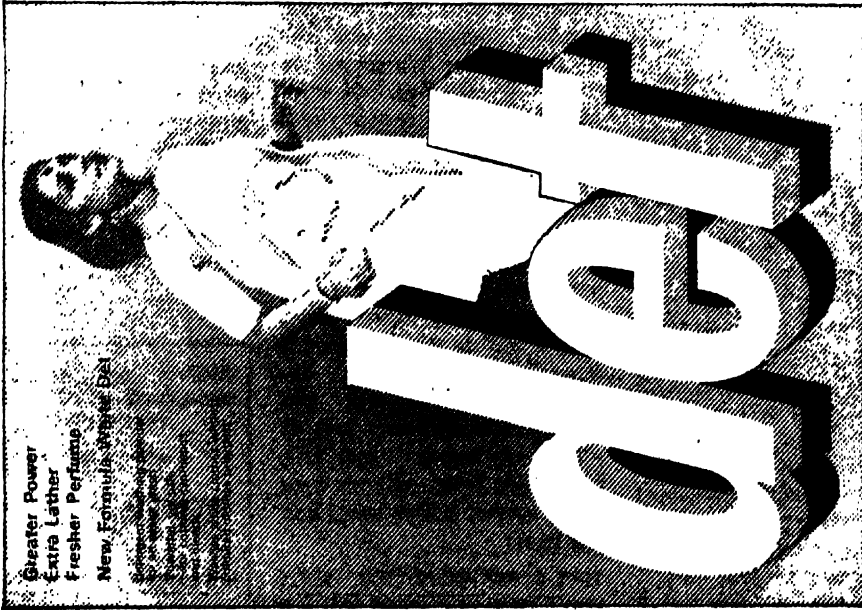
আমার নীরব আশ্বাস আদায় করে সহদেব যখন ঘর থেকে বিদায় নিল তখন রাত প্রায় বারটা।

যাবার আগে সে আচমকা আমার পা-জড়িয়ে ধরলো। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললো, আমার মতো মানুষ নাকি ত্রিভুবনে বিরল। অন্য যে-কেউ হলেই নাকি এই সুযোগে সবাইকে জানিয়ে দিতো একজন জমাদার এই বাড়িতে জাত ভাঁড়িয়ে বাউনের কাজ করছে।

পরবাসের প্রথম রাত্রেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারে আমাদের এই দেশের হতভাগ্য মানুষরা এখনও কোথায় পড়ে আছে তার একটা নগদ নমুনা পেলাম।

সহদেব বললো, "আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছে, শংকরবাবু। কী কুক্ষণে যে কাক হয়ে ময়ূর সাজবার লোভ হলো। দেশে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই, কাউকে ঠিকানা দিই না—কখন কে রামসিংহাসনজীর জেলার সামনে পড়ে সব ফাঁস করে দেবে।"

সহদেব আরও বলেছিল, তার এই পাপের শাস্তি গুরুতর হতে পারে। সে শুনেছে, প্রামা-বামার লাইনে আসতে গিয়ে তাদেরই জানাশোনা এক আত্মীয় গ্রামের মধ্যে খুন হয়েছিল। "মেথরের হাতে খেলে যে জাত যায়," সহদেব আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

বুঝতে পারছি সমাজের চাপে পড়ে সহদেব নিজেও এই জাত যাওয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে—তার মনের গভীরে কোথাও একটা পাপবোধ রয়ে গিয়েছে।

বললাম, "সহদেব, যে-কাজ তোমার পছন্দ তাই করবার অধিকার তোমার আছে। এসব নিয়ে ভেবো না।"

সহদেব চোখ মুছলো। বললো, "সারা-জীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো, শংকরবাবু।"

সহদেব আবার চোখের ঘুম কেড়ে নিল। কিছুই করলাম না। অথচ একটা লোক সারাজীবন কেন আমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে?

আজ অনেক দিন পরে সত্যসুন্দর বোসের অভাব অনুভব করছি। তিনি থাকলে এই সব অবস্থায় আমার কোনো অসুবিধাই হতো না। সংসারের জটিল সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান খুঁজে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

ঘুম ভাঙলো পাখির ডাকে। একটা নাম না-জানা দিশী পাখি কেমন করে এই সায়েব পাড়ায় আমার ঠিকানা সংগ্রহ করলো কে জানে। আমার ঘরের সবুজ রঙের জানালার ওপর বসে মিষ্টি গানে সে নতুন ম্যানেজারবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে দিল। অন্য জানালা দিয়ে নিচে খ্যাকারে ম্যানসনের কম-পাউণ্ডের দিকে তাকালাম। হাফ-প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোককে মিলিটারি কায়দায় অনেকক্ষণ কুইকমার্চ করতে দেখলাম।

স্বাস্থ্যান্বেষী এই ভদ্রলোকটি এইভাবে বাড়ির মধ্যেই বারান্দায় পাক খাচ্ছেন—শুধু একটি বেওয়ারিশ কুকুর ছাড়া কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না।

ঘরে টোকা পড়লো। গত রাত্রে পরিচিত সেই চা-বালকটি ঘুম-ভরা চোখে আমাকে লম্বা সেলাম করলো। জিজ্ঞেস করলো, চা আনবে কিনা।

এই সকালে ঘরে বসে চা খাবার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মতো মনোবল সংগ্রহ করতে পারলাম না।

কিন্তু ছেলেটিকে দেখে মায়া হলো। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?"

সে থতমত খেয়ে গেল। কিছুতেই স্বীকার করলো না এখনও তার চোখে ঘুম লেগে রয়েছে। প্রতিবাদ জানালো, "কী বলছেন সাব! আমি অনেকক্ষণ উঠেছি। আগে না-উঠলে এখনও তো পায়খানার লাইন লাগাতে হতো!"

আন্দাজ করলাম, এখানকার অসংখ্য বেওয়ারিশ কর্মচারির জন্যে হয়তো একটি মাত্র কলঘর আছে, যেখানে ভোরের আলো ফোটা মাত্রই লম্বা লাইন পড়ে।

চা-বালক বললো, তারপর সে কয়লা ভেঙে উনুনে আঁচ দিয়েছে। আগুন ধরতে অন্তত আধঘণ্টা লাগে, তারপর একটব জল গরম চাপিয়েছে। কয়েক কেটলি চাও ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি, আমার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু মালিক তাকে খুব বকুনি লাগিয়েছে, জানতে চেয়েছে নয়া সায়েবের খোঁজ করেছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসেছে।

চায়ের সঙ্গে দুখানা নিমকি বিস্কুটের বিলাসিতায় ডুব দেওয়া গেল। আমার গেলাসে বাড়তি একটু চা ঢেলে দেবার জন্যে ছেলেটি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি চা খেয়েছো?"

আমার প্রশ্নে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না সে। একটু বিরক্ত হয়েই জানিয়ে দিল, সে চা খায় না। "চা খেলে তবিয়ত খারাপ হয়" —গাঁ থেকে আসবার সময় তার পিতাজী বলে দিয়েছে!

আমি ওর চোখে এখনও ঘুমের অদৃশ্য উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। সে বললো, প্রথম যখন এসেছিল তখন খুব ঘুম পেতো তার। মায়ের কথা, বাবার কথা, গাঁয়ের কথা মনে পড়লেই ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করতো না। মালিক তাকে ঠেলে তুলে দেবার জন্যে টানাটানি করতো। একদিন রামসিংহাসনজীর চা দিতে দেরি হওয়ায় কেলেংকারি কাণ্ড।

শুনলাম, দোকানের তৈরি প্রথম কাপ চা রামসিংহাসনজীকে প্রতিদিন নিবেদন করা হয়। এই ব্যবস্থা বহুদিন ধরে চলে আসছে।

আরও শুনলাম, কর্মচারীকে ঘুম থেকে তুলবার জন্যে মালিকের স্পেশাল ব্যবস্থা আছে। রোজ-রোজ গলা ফাটিয়ে ডাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্পেশাল ব্যবস্থাটি হলো, আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া। ঘাড়ের কাছে জ্বলন্ত বিড়ি, সিগারেট কিংবা দড়ির আগুনের গোটাদুয়েক ছ্যাঁকা পড়লেই গ্রাম্যঘুম সদ্য আগত বালকের চোখ থেকে ছুটে পালাবার পথ পায় না।

চায়ের এঁটো কাপ নিয়ে ফিরে যাবার পথে ওর ঘাড়ের কাছে বেশ কয়েকটা কাল কাল দাগ দেখলাম। না দেখলেই ভাল হতো। বিহারের অসহায় এক গ্রাম্য বালকের বিষণ্ণ সরল হাসি নাম-না-জানা পাখির প্রভাতী গানকে কেমন বেসুরো করে তুললো।

।

একটু পরেই বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটি খাদি ফতুয়া, এবং চপ্পল পরে থ্যাকারে ম্যানসনের একতলায় নেমে এসেছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুম হয়েছিল তো?"

বিনীতভাবে 'হ্যাঁ' বললাম।

"কোনো আজে-বাজে স্বপ্ন দেখেননি তো? নতুন লোক দেখলেই এখানকার আজে-বাজে স্বপ্নগুলো রাত্রে জ্বালায়", বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে খবর দিলেন।

"আমি মশাই, আর্লি রাইজার। ছোটবেলায় মুখস্ত করেছিলাম : আর্লি টু বেড, অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ—মেকস এ ম্যান হেলথি, ওয়েলথি অ্যান্ড ওয়াইজ।"

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "দুখানা আইটেম মিলেছে। হেলথি এবং ওয়াইজ হয়েছি। বলা যায় না, কবে হয়তো ধনী হয়ে উঠবো।"

আমি কথাবার্তা শুনে যাচ্ছি। বরদাপ্রসন্ন নিজের থেকেই জানালেন, "আমাদের কলকালিবাবু পয়লা নম্বরের [illegible]। বলে কিনা জানেন? বড় লোকেরা কখনও সকাল-সকাল ঘুম থেকে ওঠে না। ওয়েলথি মাত্রই লেট রাইজার।"

ভোরবেলায় যে-পাখিটা আমাকে গান শুনিয়েছে তার কথা বরদাপ্রসন্নকে না-বলে

পারলাম না। নতুন এই পরিবেশে একটা লোককে তো চাই যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়।

আঁতকে উঠলেন বরদাপ্রসন্ন। "আপনি পোয়েট্রি-ফোয়েট্রি লেখেন নাকি মশাই?" রীতিমত জেরা শুরু করলেন তিনি।

তারপর বললেন, "আপনি ভাগ্যবান, মশাই। আমি তো কোঁকড়-কো ম্লেচ্ছ মুরগীর ডাক ছাড়া সকালে কিছুই শুনতে পাই না। কী বলবো, ব্রাহ্মণ-সন্তান—সকালবেলায় ওই নোংরা জিনিসের ডাক শুনে গা ঘুলিয়ে ওঠে। কত পাপ করেছি, তাই এই ঠাকরে ম্যানসনে 'নিশ্বাসন যন্ত্রণা' ভোগ করতে এসেছি।"

"মুরগী কোত্থেকে এল?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ছাদের ওপর বাবুর্চি'গুলো ডজনে-ডজনে পুষেছে। এক টাকার মাল নিজের সায়েবের কাছে সাত টাকায় বেচবার লোভ কে ছাড়তে চায়? এক চিলতে শোবার ঘর—কোথায় নিজেরা একটু হাত পা ছড়িয়ে থাকবি। তা না, ওরই মধ্যে হাঁস-মুরগী গিজগিজ করছে।"

বরদাপ্রসন্ন আরও বললেন, "সকাল-বেলায় ওই কোঁকড়-কোঁ শুনলেই মনে হয় সমস্ত দেহটা নোংরা হয়ে গেল। তখনই স্নান সেরে না ফেললে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। 'ও' অশ্বত্থাম্নে নমঃ' এই বলে তিন-বার তিন ফোঁটা তেল মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েই ঝপাঝপ তেল মেখে ফেলি।"

এরপর কীভাবে তেল মাখতে হয় তার বিশ্লেষণ শুরু করলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "তেল মাখার আইন আজকাল কেউ মানে না—তাই তো দেশে এতো দুঃখু কষ্ট। 'শিরোভাগাবশিষ্টেন তৈলনাঙ্গং ন লেপয়েৎ'। মাথায় তেল দিয়ে অবশিষ্ট তেল দিয়ে অঙ্গালেপন মহাপাপ। সবসময় নিম্ন অঙ্গ থেকে ওপরের দিকে তেল মাখতে হয়। বুকে হাতে তেল দিয়ে তারপর পায়ে তেল মাখা ইজ এ ভেরি ভেরি ব্যাড হ্যাবিট!"

ফতুয়ার পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "সর্বনাশ! কথা বলতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছি। এখনই একবার মার্কেটে ঘুরে আসতে হবে।"

মার্কেট বলতে আমি নিউ মার্কেটের বাজার বুঝেছি। সকালে হয়তো কিছু শাক-শব্জী তরিতরকারি কিনতে চান বরদাপ্রসন্ন।

"মার্কেটে যাবার অভ্যাস আছে তো?" জানতে চাইলেন বরদাপ্রসন্ন।

একসময় বাজার-যাওয়া আমি খুব পছন্দ করতাম। বাজার সম্পর্কে আমার ছোটখাট একটা রেকর্ড'ও আছে। সাত বছর বয়স থেকে নিয়মিত একলা-একলা বাজার করেছি আমি, পাকে-চক্রে পড়ে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চলুন, আমার সঙ্গে। এখন তো হাতে কোনো কাজ নেই।"

খুশী মনেই বেরিয়ে পড়লাম বরদা-প্রসন্নর সঙ্গে। নিউ মার্কেটের কাঁচাবাজার সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে গেলে কিছু লোকের সঙ্গে হয়তো চেনাও হয়ে যাবে।

বাজারে যাচ্ছেন, অথচ ও'র হাতে কোনো থলে দেখলাম না। থলে ছাড়া বাজারযাত্রী কোনো বাঙালীকে কল্পনাও করা যায় না। আমার এক দক্ষিণ-ভারতীয় বন্ধুর স্ত্রী একবার বলেছিলেন, বাঙালীদের মতন এমন কদর্য, নোংরা এবং দুর্গন্ধ থলে পৃথিবীর আর কোনো জাত ব্যবহার করে না। এমন বাজার-পাগল জাতও নাকি ভূ-ভারতে নেই।

ভাবলাম, থলের কথাটা বরদাপ্রসন্নকে একবার মনে করিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম, হয়তো সামান্য কিছু তরিতরকারি কিনবেন। নিউ মার্কেটের ব্যাপার—নিশ্চয় ওখানে ঠোঙায় করে আলু-পটল বিক্রি হয়।

রাস্তায় যেতে-যেতে বরদাপ্রসন্ন গম্ভীর-ভাবে উপদেশ দিলেন, "সকালের এই বাজারটা কারও ওপরে ছাড়বেন না, স্যার। বিশ্বাস করেছেন কাউকে, কি ডুবেছেন।"

মনে মনে ভাবলাম, কীই বা কিনবো

আমি। তাতে কতখানি ডোবানো সম্ভব?

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যত অসুবিধেই হোক—সকালের বাজারটা আমি কাউকে হাতছাড়া করি না।"

হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেট পেরিয়ে গেলাম—কিন্তু বাজারে প্রবেশ করবার কোনো লক্ষণই বরদাপ্রসন্নর মধ্যে দেখতে পেলাম না।

ভাবলাম, হয়তো কাছাকাছি কোনো সস্তার বাজার আছে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই।

কিন্তু হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চৌরঙ্গীর গ্র্যান্ড হোটেলের কাছে এসে পড়েছি। গল্প করতে করতে ভদ্রলোক বাজারের কথা ভুলেই গেলেন নাকি? এক একজন ওইরকম ভুলো-লোক থাকে। এবার বাধ্য হয়ে ওঁকে মনে করিয়ে দিলাম, "বাজার করবেন না?"

আমার প্রশ্নে বেশ অবাক হয়ে গেলেন বরদাপ্রসন্ন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিশ্চয় করবো। সওদা না থাকলে কেউ সাত-সকালে শখ করে জাত-বেজাতের দুর্গন্ধ শুঁকতে বাজারে আসে?"

এরপর আমার নিজেরই অবাক হবার পালা। তাঁর তরকারি মাছ মাংস নয়, মানুষের বাজারে চলেছেন বরদাপ্রসন্ন!

মানুষের এই বাজার সম্বন্ধে এতোদিন আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। সাহস করে বরদাপ্রসন্নকে তা বলতেও পারছি না, হয়তো আমার সম্বন্ধে সমস্ত শ্রদ্ধাই তাঁর নষ্ট হয়ে যাবে।

দুধের বাজার বসে হাওড়া স্টেশনে এবং নতুন বাজারে, পুরনো কাপড়ের বাজার বসে কলাবাগান বস্তির কাছে, গোরু ছাগলের বাজার বসে খিদিরপুরে—কিন্তু এখনও যে কলকাতায় মানুষের বাজার বসে তা জানা ছিল না। শুধু শুনেছি, গত-শতাব্দীতেও কলকাতার মুর্গীহাটায় ক্রীতদাস কেনা-বেচার বাজার বসতো। নিজেদের পছন্দ মতো দিশী কিংবা কাফ্রি স্লেভ কেনবার জন্যে সাহেব-মেমরা এই বাজারে আসতেন। কিন্তু এখনকার মানুষ-বাজারে কী হয়?

হোয়াইট-ওয়ে ল্যাডলোর কাছে রাস্তা পেরোতে পেরোতে বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললেন, "এই বাজারে নিজের দরকার মতো সবরকম মানুষ পাবেন না। এখানে কেবল পাবেন রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি এবং জোগাড়ে।"

এসপ্ল্যানেডের বুকের ওপরে খোলা মাঠে মানুষের বাজার বসেছে। চৌরঙ্গী পেরিয়ে পশ্চিম দিকে আসতে আসতে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কলকাতার বিগেস্ট মানুষ-মার্কেট। পছন্দ-করে নিতে পারলে, ন্যায্য দামে খুব ভাল জিনিস পেয়ে যাবেন স্যর এখানে।"

আমি দেখলাম, ভোরবেলায় এস-

প্যানেন্ডে কয়েকজন লোকের হাট বসেছে। লুঙি আর গেঞ্জি, পাজামা আর শার্ট, ফতুয়া আর ধুতি পরে সারে-সারে লোক অধীর আগ্রহে বসে আছে। তাদের সামনে কয়েকটা ছোট-ছোট রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি। কিছু ক্রেতাও গম্ভীরভাবে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এখানকার পণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বরদাপ্রসন্নকে দেখে কয়েকজন পণ্য এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ওঁকে আহ্বান জানিয়ে বললো, "আসুন না স্যার! কী দরকার?"

বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললেন, "না বাপধন, আজ আমার রাজমিস্ত্রির দরকার নেই।"

বরদাপ্রসন্নর কথা ওরা বিশ্বাস করলো বলে মনে হলো না। ভাল বাংলায় বললো, "বাজার মন্দা আজ, তাই ডাকছি। টপক্লাশ লোক রোজ পাবেন না।"

আমার মনে হলো শত শত বছর আগের কোনো রোমান মানুষ-বাজারে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কোনোরকম আগ্রহ নেই এমন ভাব দেখিয়ে বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "বাজার দর কত যাচ্ছে?"

চাপা-গলায় একটি লোক ইঁটের ওপর বসে থেকেই উত্তর দিল, "ছ' টাকা-তিন টাকা।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ডিমান্ড থাক না-থাক, দর পড়ে না। রাজমিস্ত্রি ছ'টাকা রোজ, আর যোগাড়ে তিন টাকা।"

একটু এগোলেন বরদাপ্রসন্ন। ফিস ফিস করে বললেন, "ওই দাম হাঁকছে। কিন্তু একটু চাপ দিলেই পেয়ে যাবেন পাঁচ টাকা বার আনা/পৌনে তিন টাকা রেটে।"

এইসব দৃশ্য আমার দেখতে ভাল লাগে না। দরদস্তুর করে নিয়ে নিলেই পারতেন বরদাপ্রসন্ন। উনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "ভেজাল মালে বাজার বোঝাই! হাতে একখানা কর্নিক নিয়ে বসলেই জোগাড়ে নিশ্চিন্ত হয় না, মশাই। ভাল মিস্ত্রি যদি চান তাহলে আপনাকে সকাল-সকাল আসতে হবে। সেসব জিনিস পড়তে পায় না—বাজারে আসা মাত্রই বড় বড় পার্টিরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তারা দরও কমাবে না।"

বাজারের মধ্যে একটা দ্রুত চক্কর দিলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "আমার রাজমিস্ত্রির দরকার নেই। চলুন ছুতোর মার্কেটে।"

ওরই মধ্যে এক কোণে কয়েকজনকে দেখা গেল—যাদের সামনে কাঠের যন্ত্রপাতি। অভিজ্ঞ বরদাপ্রসন্ন এক নজরে বললেন, "বাজার খুব চড়া মনে হচ্ছে—ছুতোরের সাপ্লাই নেই বললেই চলে।"

ছুতোরদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এদের বাজার ভাল হবে না তো কাদের হবে? আজকালকার কাঠের যা অবস্থা। সিজন না-করা শাল সেগুনে কাজকর্ম হচ্ছে। ফলে বিপেত্তার লেগেই আছে। প্রতিদিন দরজা-জানলা নিয়ে কমপ্লেন—প্রতি বাড়িতে এখন একখানা হোলটাইম ছুতোর রাখতে পারলে ভাল হয়।"

একটি লোক বরদাপ্রসন্নর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে বললো, "নমস্কার হুজুর।"

বরদাপ্রসন্ন তার নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু আপন মনেই বললেন, "তোমাকে আবার নিচ্ছি বটে! সেবার আমার তিনখানা পাল্লার বারটা বাজিয়ে দিয়ে এসেছো তুমি। দরজা-জানলার কালাপাহাড় তুমি!"

আবার ঠোঁট বেঁকালেন বরদাপ্রসন্ন। "টানের বাজার—ইনিও এখনই চলে যাবেন। কারও বাড়ির সর্বনাশ হবে আজ।"

"আরও আগে আসা উচিত ছিল আজ। ছুতোরমিস্ত্রির বাজারে এমন আগুন লাগবে কী করে জানবো?" স্বগতোক্তি করলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "আকবরকে দেখছি যেন!"

দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেলেন বরদাপ্রসন্ন। একখানা থান ইঁটের ওপর বসে দাড়িওয়ালা আকবর আপন মনে বিড়ি খাচ্ছিল। বরদাপ্রসন্ন কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হাত খালি তো?"

বিড়িতে একটা টান দিয়ে আকবর জিজ্ঞেস করলো, "পুরো দিনের কাজ তো?"

এবার মুশকিলে পড়লেন বরদাপ্রসন্ন। "না বাবা, গোটা কয়েক দরজা জানালার ছিটকিনি লাগানো। হাফ্-ডের কাজ।"

অর্ধেক দিনের কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছে না আকবর। তবে পুরনো পার্টি, তাই বললো, "হাত খালি থাকলে কোনো সময়ে করে দিয়ে আসবো।"

বরদাপ্রসন্ন সন্তুষ্ট হলেন না। সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলেন, "সেবারেও তো বললি গত শনিবারে এসে ঠুক করে সেরে দিয়ে যাবি।"

"ছেলের অসুখ করেছিল," বিড়িতে টান দিল আকবর।

মিষ্টি কথায় আকবরকে ভিজিয়ে কাজ হাসিল করবার জন্যে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চল না, যাবি আর আসবি। ছেলে এখন কেমন আছে?"

"বাঁচলো নি। কালই গোর দিয়ে এসেছি।" বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়ে আকবর যেন নিজের দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলো। তারপর উদাসভাবে বললো, "আজ ঠিক বাজারে চলে এসেছি। দিনমজুরের কি কাঁদবার সময় আছে, হুজুর?"

কী উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না হতভম্ব বরদাপ্রসন্ন। কিন্তু আকবর নিজেই উত্তর দিল। "একটু দাঁড়ান, হুজুর। কাছাকাছি কাজ না পেলে আপনার সঙ্গেই চলে যাবো। কাজ নিয়ে আজ বেশী দূরে যাবার ইচ্ছে নেই।"

[ক্রমশ]

দোল দোলানো
ঝিলমিলে
প্রাণবন্ত চুলের জন্যে
স্যাটিন ডল
শ্যাম্পু
আপনার চুল এমন করে তুলুন—লোকে যেন ফিরে ফিরে চায়। স্যাটিন ডল ব্যবহার করুন। এ এক
কার্যকরী শ্যাম্পু—যা মৃদু অথচ পুরোপুরিভাবে কাজ করে।
সত্যিকারের পরিষ্কার চুলের জন্যে আর অযথা পরিশ্রম করবেন না—
স্যাটিন ডলের সমৃদ্ধ ফেনা চুলের ময়লা আর অতিরিক্ত তেল চট করে পুরোপুরিভাবে নিংড়ে বার
করে দেয়, চুলের একান্ত প্রয়োজনীয় সহজাত তেল বজায় রাখে। এর ঘনীভূত গুণ চুল
পরিষ্কার ক'রে সুন্দর ক'রে তোলে। স্যাটিন ডলের যাদুস্পর্শে আপনার চুল দুলে ওঠে...ফুলে ওঠে...
দেখায় বেশী। আপনি পান কোমল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুরভিত...অপূর্ব সুন্দর চুল। নিয়মিত স্যাটিন ডল
ব্যবহার করুন—নিজেই দেখতে পাবেন অন্যের সঙ্গে এর পার্থক্য কত রমনীয়।
স্যাটিন ডল
চিকন নির্মল চুলের জন্যে বহুগুণের শ্যাম্পু!
satin doll®
SHAMPOO
FOR LOVELY HAIR
everest/494/ACW-ba

নীললোহিতের চোখের সামনে

আমার বন্ধু মণীশের বড় শখ ছিল বাড়ি থেকে পালাবার। তখন আমরা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ভোরবেলা দু'জনে একসঙ্গে পার্কে বেড়াতে যাই সবুজ দেখবার জন্য। ভোরবেলা সবুজ দেখলে নাকি চোখ ভালো হয়। আমার অবশ্য চোখ যথেষ্ট ভালো, কিন্তু মণীশের ছোটবেলা থেকেই চোখে চশমা।

পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মণীশ প্রায়ই বলতো, চল্, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

—কেন, পালাবি কেন?

মণীশ হেসে বলতো, বাড়ির লোককে বেশ কষ্ট দেওয়া হবে। বাড়ির লোক খোঁজা-খুঁজি করবে, পুলিশে খবর দেবে, হাস-পাতালে যাবে, বেশ মজা হবে! আমি কিন্তু আর ফিরবো না, পালাবো মানে একদম পালাবো!

ব্যাপারটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। মণীশরা মাঝারি ধরনের বড়লোক। মণীশ বাড়ির আদুরে ছেলে, ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি পড়ে যাবে। মণীশের বাবার দু'তিন রকম ব্যবসা, দারুণ পরিশ্রম করেন, সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তিনি—সপ্তাহের মধ্যে ছদিন—বাবার সঙ্গে মণীশের দেখাই হয় না। এই কারণেই বাবার ওপর মণীশের একটা রাগ ছিল। মণীশ বাড়ি ছেড়ে পালালে ওর বাবা জরুরী সব কাজ কম্ম ফেলে যে মণীশের খোঁজে এদিক ওদিক ছুটবেন—এটাই মণীশের মজা।

কিন্তু আমার তো সে ব্যাপার নয়। আমি অতি সাধারণ বাড়ির ছেলে। আমি চলে গেলে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাবে না। বরং হয়তো ভাববে, যাক, গেছে বাঁচা গেছে! তাছাড়া আমি খুব অল্প বয়েস থেকেই বাড়ি ছেড়ে একা একা চলে গেছি নানান জায়গায় সুতরাং আমার কাছে এর নতুনত্ব কিছু নেই।

মণীশ তবু প্রায়ই আমাকে বলে, চল পালাই, চল পালাই!

আমি ওকে বলি, তাহলে তুই একাই পালিয়ে যা না! বাড়ি থেকে পালাবার সময় একা যাওয়াই তো নিয়ম?

মণীশ বলে, দূর, তা ভাল্লাগে না! একা গেলে কথা বলার কোনো লোক পাবো না! তুই চল।

—কেন, যেখানে যাবি, সেখানেই অনেক লোকের সঙ্গে ভাব হবে।

—আমার একদম নতুন লোকের সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করে না! তাছাড়া ধর, যেখানেই যাবো, সেখানে নিশ্চয়ই প্রায়ই সাইকেল-রিকশা ভাড়া করতে হবে! দু'জনে সাইকেল-রিকশা চাপলেও যা ভাড়া, একজন চাপলেও সেই একই ভাড়া। তাহলে শুধু একজন যাওয়ার কোনো মানে হয় না!

মণীশের এই অদ্ভুত যুক্তি আমি বুঝতে পারি না।

একদিন সকালবেলা পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মণীশ বললো, চল্, শিয়ালদা স্টেশনে যাই। আজই পালাবো।

আমি বললাম, ধুৎ! সঙ্গে টাকা পয়সা কিছু নেই, পালাবো কি করে?

মণীশ বললো, আমার কাছে আছে, এই দ্যাখ।

মণীশ পকেট থেকে এক গাদা টাকা বার করে দেখালো। সব সুদ্ধু তিনশো টাকা। তখন আমাদের কাছে তিন শো টাকা মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কলেজে যাবার সময় বাস ভাড়া ও জলখাবারের জন্য রোজ আট আনা করে পাই। আর মণীশের পকেটে জলজ্যান্ত তিনশো টাকা! বললাম, চল্!

হাওড়ার বদলে শিয়ালদা স্টেশনে যাওয়াই আমাদের প্রথম ভুল। হাওড়া থেকে অনেক দূর পাল্লার ট্রেন ছাড়ে। শিয়ালদার অধিকাংশ ট্রেনই কাছাকাছি জায়গার। তা ছাড়া, শিয়ালদা স্টেশন তখন এত নোংরা আর রিফিউজিতে ভরা যে একটুক্ষণও সেখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে ট্রেন, মণীশ সেটাতেই উঠে পড়তে চায়। আমরা পেলাম ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন।

সেটা ছুটির দিন নয়, সপ্তাহের মাঝা-মাঝি, এ রকম দিনে কেউ ডায়মণ্ড-হারবার বেড়াতে যায় না। হকার, ফড়ে আর মলিন

মানুষে কামরা ভর্তি, চকচকে প্যান্ট সার্ট পরা শুধু আমরা দু'জন। মণীশ এর আগে কখনো বাড়ির লোকজনের সংগে ছাড়া কোথাও যায় নি। ও এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে, মুখ চোখে এমন অস্থিরতা যে যে-কেউ একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, আমরা বাড়ি থেকে পালাচ্ছি। অবশ্য সে রকম লক্ষ্য করে দেখবার মতন কেউ ছিল না।

আমি এর আগে ডায়মন্ড হারবার দু' বার গেছি। অর্থাৎ আমার চেনা জায়গা। চেনা জায়গায় কেউ পালায় না। সুতরাং ডায়মন্ড হারবারে নেমে আমরা আবার কাকদ্বীপের বাস ধরলাম।

কাকদ্বীপে পৌঁছে দেখা গেল, সেটা মোটেই দ্বীপ নয়। এমনিই একটা ছোট-খাটো শহর-বাজার জায়গা। নামটা আমাদের ঠকিয়েছে। সেই জন্যই জায়গাটা আমাদের পছন্দ হলো না। সেখান থেকে আবার বাসে চেপে চলে এলাম নামখানায়। এবার বেশ অনেকটা দূরে আসা গেছে। এবার এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যায়।

নামখানা জায়গাটা ছোট হলেও বেশ একটা বন্দর-বন্দর ভাব আছে। জাহাজ নয়, নৌকোর বন্দর। নদীর এপারে থেমে আছে অনেকগুলো বেশ বড় বড় নৌকো। ঘাটের কাছে গেলেই লাইন বাঁধা অনেকগুলো হোটেল। বেছে টেছে আমরা একটা হোটেলে ঢুকে পড়লাম। দুপুর হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে খুব।

হোটেল ঘরের মেঝেতে যেন একটি জ্যান্ত কার্পেট পাতা। এত অসংখ্য মাছি যে সেইরকমই মনে হয়। ভেতরে পা দিলেই কিছু মাছি উড়ে গিয়ে শুধু পা ফেলার জায়গা করে দেয়। প্রত্যেক টেবিলে রয়েছে কয়েকটা হাত পাখা। খাবার সময় এক হাতে পাখা নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াতে হয়। ফ্লিট বা অন্য কিছু দিয়ে মাছি তাড়াবার কথা এখানে কেউ চিন্তাও করে না।

খাওয়াটা কিন্তু দারুণ জমলো। গরম গরম মোটা চালের ভাত, বিউলির ডাল আর আলুভাজা, পার্শে মাছ ভাজা। তারপর ভেটকি মাছের ঝোল, তারপর চিংড়ির মালাইকারি। মণীশ আমার তুলনায় অনেক ভোজন রসিক। সে এর পরও নিল একটা প্রকাণ্ড কাৎলা মাছের মুড়ো। সেই আস্ত মুড়োটার চেহারা রীতিমতন ভয়াবহ। মণীশ কিন্তু বেশ সুচারুভাবে সেটা খেয়ে ফেললো। আমাদের বিল হলো সতেরো টাকা। এই রেটে চললে আমাদের তিনশো টাকা খুবই স্বল্পজীবী হবে।

রাত্রে থাকার জায়গাটা আগেই ঠিক করে রাখা দরকার। মণীশ হোটেলের মালিককে জিজ্ঞেস করলো, এখানে রাত্তিরে কোথায় থাকা যায় বলতে পারেন?

হোটেলের মালিক আমাদের দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকালো। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, রাত্তিরে এখানে থাকবেন? কেন?

মণীশ বেপরোয়াভাবে বললো, এমনিই! ইচ্ছে হয়েছে, তাই থাকবো!

মালিক বললো, ডাক বাংলো আছে, কিন্তু সেখানে তো এখন জায়গা পাবেন না। কাল থেকে এক মিনিস্টার তাঁর পার্টি নিয়ে সেখানে আছেন।

—আর কোনো জায়গা নেই?

—জায়গা আছে, আমার এখানেই আছে। কিন্তু সেখানে আপনারা থাকতে পারবেন না। আপনারা ভদ্দরলোক।

যেন ভদ্দরলোক কথাটা একটা গালা-গাল, সেই ভাবে উচ্চারণ করলো হোটেলের মালিক। আমরা চটে গেলাম। মণীশ কড়া গলায় বললো, কে বলেছে আমরা ভদ্দর-লোক? আমাদের গায়ে লেখা আছে? কোথায় আপনার জায়গা দেখান।

নাজেহাল কলকাতা

আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার আমরা নতুন প্রচার অভিযানে নামতে পারি? আমরা কি ঢাক পেটাতে পারি যে কলকাতার পরিবর্তন আসছে বা এসেছে?

পরিবর্তন যে এসেছে সেটা সমস্যার তুলনায় হয়তো খুব বেশী নয়! আরও পরিবর্তন আসতে পারে যদি......।

এতবার বিজ্ঞাপন দিলাম, কিন্তু কৈ, এখনও তো চা-মিষ্টির দোকানের সামনে শালপাতা, মাটির ভাঁড় এসব ফেলবার ঝুড়ি বা বাসকেট হ'ল না। এটা কি খুব খরচের ব্যাপার? এখনও তো রাস্তায় অসময়ে যখন তখন জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হল না। এটা কি অসম্ভব? এখনও তো যেখানে সেখানে পেচ্ছাব-পায়খানা করা বন্ধ হল না। এটা কি সভ্যতা? এখনও তো ট্রামে বাসে সব সময় মহিলা এবং অক্ষমদের সাহায্য করতে সবাই এগিয়ে এলেন না। কলকাতার মানুষ কি অমানুষ?

তাহলে কলকাতা ভাল বলে বাইরের লোকের কাছে গর্ব করবো কি করে?

অনেক সময় আমরা সাহেবদের কথা একটু বেশী শুনি। সাহেবরা বলে গেলে কথাটা যেন খাঁটি লাগে। বিশ্ব ব্যাংকের সাহেবরা এবার সেই কথাই বলে গেছেন। "কলকাতার মত শহর হয় না।" যদি এখানকার নাগরিকরা আর একটু সচেতন হন, যদি তাঁরা জলের অপচয় না করেন, যদি রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন না করেন। যদি কর্পোরেশনের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে আপত্তি না করেন......। কলকাতার উন্নয়নের জন্য ভাল কাজ হয়েছে আরও ভাল হবে যদি আরও খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেন। আরও খোঁড়াখুঁড়ি? এমনিতেই তো সি এম ডি এ-র খোঁড়াখুঁড়িতে আমরা অতিষ্ঠ। পেয়েছে টা কি? তবে শুনুন। এক গ্লাস জলে যদি তেষ্টা না মেটে, তাহলে লোকে কি করে? আর এক গ্লাস খায়।

কলকাতার লোকেরা যেন একটু অন্য রকমের। তাঁরা রাগ করে নিরন্তর উপবাস করতে চান। জল জমলে তাঁরা সি এম ডি এ বা কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়েন। একবারও বলেন না যে "আরও নালা-নর্দমা দরকার, আরও পাইপ দরকার, এমন কি আরও খোঁড়াখুঁড়ি দরকার।"

মানুষ চাঁদে গেলেও রাস্তা না খুঁড়ে পাইপ বসানো যায় না। আপনারা তার জন্য প্রস্তুত আছেন তো? নাকি সি এম ডি এ-কে গালাগালি দিয়ে পেট ভরবে বা জল-জমা কমবে? এবার বর্ষায় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন লোকের যে দুর্দশা হ'ল তার শিক্ষা কি? বেশী বৃষ্টি হয়েছিল, তাই জলটাও বেশী জমেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে আগের আগের বছরের চেয়ে তাড়াতাড়ি জল সরেছে। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, যাঁরা সি এম ডি এ-র ওপর খড়্গহস্ত তাঁদের কথাও। আর যদি না গিয়ে থাকে, তাহলে কি করা দরকার? আরও বেশী কাজ করা দরকার, ঐ যে বললাম, আরও খোঁড়াখুঁড়ি......। আমরা খোলাখুলি কথাই শুনতে পছন্দ করি, বলতেও ভালবাসি। খোঁড়াখুঁড়ি করতে আমাদেরও ভাল লাগে না কলকাতার লোকের মুখ ঝামটা খেয়েও শহরটার ভালর জন্য কিছু কিছু অপকর্ম করতে হচ্ছে।

তাই বলছি, সি এম ডি এ-র অপকর্মের তালিকা কি একটা? অবিশ্বাস্য কিরিস্তিটা কুমীরের ছানার মত আবার "রিপিট" করবো? রাস্তা, ব্রীজ, সাবওয়ে, আলো, বস্তী উন্নয়ন, জলসরবরাহ, জল ও মলনিকাশী ব্যবস্থা, উদ্যান কি রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মত গজালো? আসলে "হচ্ছে না, হবে না" করেও যা হয়েছে, সেটা মনে রাখুন, দেখবেন সত্যি হচ্ছে। আরও হবে যদি সবাই এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে নামীদামী প্রতিষ্ঠানগুলি। তাঁরা শহরটাকে ক'টা হাসপাতাল, ক'টা পার্ক, ক'টা ডিস্পেন্সারী দিয়েছেন? ক'টা শিল্প বা ভাস্কর্য নিদর্শন দিয়ে তাঁরা শহরটাকে সাজিয়েছেন? আশা করেছিলাম, এই সব প্রশ্ন আমাদের ওঠাতে হবে না। নিজেরা খোঁচা খাচ্ছি, তাই আমাদের কাউকে খোঁচাতে হবে না।

দেখেছেন কি, রাস্তায় রাস্তায় গাছ লাগানো হচ্ছে? এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কি কেবল কর্পোরেশনের বা সি এম ডি এ-র বা বন-বিভাগের।

ডিসেম্বর মাসে সি এম ডি এ বিধানসভা প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য প্রদর্শনী করবে। শিল্প-নিদর্শন কিনে কলকাতাকে সাজানো কি একমাত্র তাঁদেরই কাজ?

সি এম ডি এ-র বিজ্ঞাপন নাকি একঘেয়ে হয়ে গেছে। লোকের আচরণও তো তাই। গালাগাল দিতে ওস্তাদ, কাজের কথায় চুপ।

—ওপরে আমার রুম আছে। সেখানে দেড় টাকা করে খাট ভাড়া পড়বে।

আমরা সেটা দেখতে গেলাম। হোটেল বাড়িটা পাকা নয়, মাঠকোঠা, তবু তারও দোতলা আছে। ওপরের ঘরটা বেশ বড়, সেখানে আট খানা খাট পাতা, সঙ্গে তোষক আর বালিশ। ঘরের জানলা দিয়ে নদী দেখা যায়। আমাদের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। টাকা অ্যাডভান্স করে দিলাম তক্ষুনি। জানলার ঠিক নীচেই একটা টিউব ওয়েল, সেখানে স্নান করছে একটি মেয়ে। স্বাস্থ্যটি ভালো, বেশ চমকানো চমকানো চেহারা। যাক, এখানে থাকলে তাহলে কিছু সৌন্দর্য-চর্চাও করা যাবে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নদী পেরিয়ে আবার বাসে করে ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু তিনদিন ধরে কী কারণে যেন বাস বন্ধ। সুতরাং ওদিকে আর যাওয়ার উপায় নেই।

নৌকোর ঘাটে একটা পাগলকে নিয়ে অনেকে মস্করা করছে। পাগলটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গলায় আবার একটা সাপ জড়ানো। মস্ত বড় সাপ। এদিকে সাপ প্রচুর। আমরা কাকদ্বীপ থেকে বাসে করে আসার সময়ই দেখেছিলাম, একটি বিশাল সাপ হেলে দুলে রাস্তা পার হচ্ছে। বাস ড্রাইভার কিন্তু সাপটাকে চাপা দিল না। বাস থামিয়ে সাপটাকে রাস্তা পার হবার সময় দিল। এরা চট্ করে সাপ মারে না। পাগলটা সাপটাকে দিব্যি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা একটা নৌকো ভাড়া করলাম। নৌকোর মাঝিরা এখন অলস। বড় বড় নৌকো ছাড়বে শেষ রাত্রে, তখন জোয়ার আসবে। এইসব নৌকো যাবে সুন্দরবনে, আবার উল্টো দিকে খুলনার দিকেও যাওয়া যায়।

নৌকো করে বেড়াতে বেড়াতে মনে হলো, আমরা এবার সত্যিই মুক্ত, স্বাধীন। কোনো অভিভাবকের চোখ রাঙানি নেই। হু হু করছে হাওয়া, কাছেই সমুদ্র। আমরা ইচ্ছে মতন যেখানে খুশী যেতে পারি। ঘণ্টাখানেক নৌকো করে এগোবার পরই কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ দেখা যায়। কোনো কোনো দ্বীপে গাছ পালা, মানুষ-জনও আছে, কোনো দ্বীপ একেবারে ফাঁকা।

আমি মণীশকে বললাম, এরকম একটা ফাঁকা দ্বীপেই তো আমরা থেকে যেতে পারি? কী বল্!

মণীশ চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সেখানে বসে তুই শুধু কবিতা লিখবি?

—লিখলেই বা ক্ষতি কি?

—আর খাবোটা কি? হাওয়া! শুধু হাওয়া খেয়ে কবিদের পেট ভরতে পারে,

আমার চলবে না। আমি ঐ নামখানাতেই থাকতে চাই, ওখানে একটা বইয়ের দোকান খুলবো।

কলেজ স্ট্রিটে মণীশদের মস্ত বড়ো বইয়ের দোকান। সুতরাং ও বইয়ের ব্যবসাটা বোঝে। কিন্তু নামখানায় শুধু মাঝি মাল্লা আর মাছের ব্যাপারীদের ভিড়, সেখানে বই কিনবে কে?

কোনো একটা দ্বীপে নামবার ইচ্ছে ছিল, তা আর হলো না। দারুণ বৃষ্টি এসে গেল। এবং অনেকক্ষণ ধরে সেই বৃষ্টি চললো। সন্ধের সময় আমরা ফিরে এলাম নামখানায়। তখনো বৃষ্টিই চলছে। আর বাইরে ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা ওপরের ঘরে শুতে চলে গেলাম।

এর মধ্যে আরও চরাখানা খাটে লোক এসে গেছে এবং এরই মধ্যে তারা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। এরা শেষ রাতের নৌকোয় যাবে, তাই এখনই ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

ঘরে একটি মিটমিটে হ্যারিকেন ছিল? একটু বাদেই হোটেলের মালিক এসে সেটা নিয়ে গেল। সারা রাত হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখার বিলাসিতা এখানে চলে না। মালিক জানিয়ে দিয়ে গেল বাইরের তাকে মোম আর দেশলাই আছে, রাত্রে বাথরুমে যেতে হলে মোম জ্বেলে নিতে হবে। বাথরুম মানে অবশ্য হোটেলের পেছন দিকের খোলা মাঠ।

ফুটফুটে অন্ধকারে আমি আর মণীশ পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে রইলাম। মাথার বালিশটা তেল চিটচিটে, তার থেকে সরষের তেলের গন্ধ ছাড়ছে। মোটে সাড়ে আটটা-পৌনে নটা বাজে, এর মধ্যেই বাইরেটা একদম চুপচাপ।

মণীশ জিজ্ঞেস করলো, কি রে নীলু তোর বাড়ির কথা মনে পড়ছে।

আমি বললাম, একটু একটু!

—আমার কিন্তু একটুও মনে পড়ছে না। বেশ মজা লাগছে। বাবা এখন কত ছোটাছুটি করছে বল্ তো! বেশ হয়েছে!

একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মণীশ, তুই এই তিনশো টাকা কোথা থেকে পেয়েছিস রে?

মণীশ বললো, তুই কি ভাবছিস আমি চুরি করে এনেছি? মণীশ ব্যানার্জি কোনোদিন চুরি করে না আর মিথ্যে কথা বলে না।

আমি বললাম, আমি ঐ দুটোই করি। কিন্তু তুই টাকাটা পেলি কোথায়?

—আমার পৈতের টাকা। মায়ের কাছে ছিল। ইচ্ছে মতন খরচ করবো বলে চেয়ে নিয়েছি কালকে।

—কিন্তু তিনশো টাকায় কতদিন চলবে? রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে

—বললাম তো বইয়ের দোকান খুলবো।

—এখানে বইয়ের দোকান চলবে না।

—চলবে না? ঠিক আছে, তা হলে হোটেল খুলবো। হোটেল খুব ভালো চলবে। তুই রান্না করতে জানিস না?

রান্না আমি বেশ ভালোই পারি। বয়েজ স্কাউটে থাকবার সময় কুকিং ব্যাজ পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনশো টাকা ইতিমধ্যেই অনেক কমে গেছে, এ দিয়ে হোটেল খোলা যায়?

মণীশ বললো, উঃ, কী কামড়ালো রে?

আমি বললাম, আমাকেও কামড়াচ্ছে।

মণীশ বললো, সারা গা কুটকুট করছে। ব্যাপারটা কি?

—এমন কিছু না! ছারপোকা?

—আঁ ছারপোকা? তা হলে তো সারা রাত কামড়াবে!

ক্রমশ ছারপোকার উৎপাত এত বাড়লো যে আমরা বিছানায় দাপাদাপি করতে লাগলাম। সেই যে সূঁচ রাজার গল্প পড়েছিলাম, আমাদের অবস্থাও সেই রকম সারা গায়ে সূঁচ ফুটছে। মণীশ চ্যাঁচামেচি করতে লাগলো। অন্য খাট থেকে একজন

ঘুম জড়ানো গলায় বললো, আঃ মোশাই, চুপ করুন না!

সারারাত আমরা ঘুমোতে পারলুম না একেবারে। তখনই বুঝতে পারলুম, হোটেলের ম্যানেজার কেন আমাদের ভদ্দর-লোক বলে ঠাট্টা করেছিল? অন্য লোকগুলো তো ঐ ছারপোকার কামড় খেয়েও দিব্যি ঘুমিয়েছিল নাক ডাকিয়ে।

চা-টা খেয়ে আমরা বাইরে বেড়াতে এলাম। মণীশ আর আমার দুজনেরই সারা গা ছারপোকার কামড়ে ফুলে গেছে। চোখ লাল করকরে। তবু নদীর টাটকা হাওয়ায় একটু ভালো লাগে। ঘাট আজ অনেক ফাঁকা, বেশীর ভাগ নৌকোই শেষ রাতে ছেড়ে গেছে। কিছু নতুন নৌকো আসছে।

ঘাটের কাছে এক জায়গায় কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখানে কিন্তু কালকের সেই পাগলটি নয়, একটি ন' দশ বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি ইজের পরা, খালি গা, কাঁদিছে। কান্না শুনলেই বোঝা যায়, ছেলেটি কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে।

ভিড়ের লোকরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কেউ ছেলেটির কান্না থামাতে চাইছে না? একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই আমরা কারণটা বুঝতে পারলাম। ছেলেটিকে তার বাড়ির লোক ইচ্ছে করে এখানে ফেলে চলে গেছে। শুনলাম এরকম ঘটনা মাঝে মাঝেই হয়। সুন্দরবনের কোন্ দূর গ্রামে ওর বাড়ি, ওদের সংসারে অনেক ছেলেমেয়ে, বাবা-মা সবাইকে খেতে দিতে পারে না। তাই কুকুর বিড়াল পার করবার মতন, ছেলেটিকে এত দূরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, যাতে আর ফিরতে না পারে। এখন কে এই ছেলেটির ভার নেবে? আজকালকার দিনে কেউ নিতে চায় না। কেউ ছেলেটির হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ডুকরে উঠছে।

আমি আর মণীশ চোখাচোখি করলাম। মণীশের মুখটা ম্লান হয়ে গেছে। আমার বুকটা কাঁপছে, কেন জানি না।

বলাই বাহুল্য, সেই তিনশো টাকা ফুরোবার আগেই আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। বিশেষত ঐ ছারপোকার অত্যাচারই আমাদের বেশী মন মরা করে দিয়েছিল। আমাদের দুজনের বাড়িতে অবশ্য অভ্যর্থনা হয়েছিল দু' রকম। মণীশ যে নিজের থেকেই আবার ফিরে এসেছে, এতেই তার বাড়ির লোক এত খুশী হয়ে গেল যে তাকে একটুও বকুনি দিল না, বরং তার আদর যত্ন বেড়ে গেল। আর আমি, বাড়ির লোককে অকারণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলাম বলে, বাবার হাতে প্রচণ্ড মার খেলাম। সে যাকগে, এমন কিছু নয়, ওরকম মার তো আমি কতই খেয়েছি।

কিন্তু তার পরে যতবারই আমাদের ঐ ব্যর্থ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর কথা ভেবেছি, ততবারই মনে পড়েছে সেই ইজের পরা ছেলেটির কথা। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছেলেটি, মা—আ-আ বলে কাঁদছিল, কী অসম্ভব করুণ সেই আর্তনাদ। আমরা শখ করে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েছিলাম, আর ঐ ছেলেটিকে তার বাড়ির লোকই ফেলে পালিয়েছে!

সাহিত্য প্রসঙ্গ

রামায়ণের বাংলা অনুবাদ

বাল্যকালে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণের হাত ধরে আমরা অযোধ্যায় প্রবেশ করেছিলাম। তখনকার সেই বিস্ময়, সেই অভিভূত অবস্থাটিকে এখন আর কোনো ভাবেই বোঝানো যাবে না। রামচন্দ্রের বীরত্বে, পিতৃসত্য রক্ষায় বন গমনে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের মতন বালকদল যত উদ্দীপ্ত, বিষণ্ণ আর আনন্দিত হত—ততটাই চমৎকৃত ও উৎফুল্ল হত হনুমানের কীর্তিকলাপে। শুধুমাত্র পয়ারের সহজ টানে নয়, বিষয়গুণের কৌলীন্যে নয়, বা ধর্মভীরু বাঙালী সমাজের স্বাভাবিক সংস্কারে নয়, আরও একটি বড় আকর্ষণ ছিল সেই রামায়ণের। সেটা হল ছবি। রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ, তাড়কা রাক্ষসীর সেই বিকট চেহারা, জটায়ুর সঙ্গে আকাশ পথে রাবণের যুদ্ধ—এইসব ছবি বারেবারে কত যে দেখেছি। আমার মতন আজ যারা যথেষ্ট বয়স্ক, পঞ্চাশের কোঠায় বয়স, তাঁরাও হয়তো চোখ বুজলে সেই বটতলার রামায়ণের কথা মনে করতে পারবেন। বাঙালী সমাজে তখন সবচেয়ে প্রচলিত গ্রন্থ ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আর কাশীরামের মহাভারত। বৃদ্ধ থেকে বালক সকলেই এই দুই মহাগ্রন্থ পড়ত।

তারপর অনেক কাল কেটে গেল। জানি না, এখনও সাধারণ বাঙালী সমাজে রামায়ণ-মহাভারতের কদর কতটা। শুনি, সমাজের চেহারা পালটেছে, এই সব প্রাচীনতম সাহিত্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ আর নেই; ধর্মসংস্কার থেকেও নাকি মানুষ এখন অনেক মুক্ত। কথাটা নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু একটি জিনিস নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ, রামায়ণ-মহাভারত আজও বয়স্ক পাঠকের কাছে আদরণীয়। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদগুলি আমরা সমাদরে গ্রহণ করছি। রাজশেখর বসু-মশাই সংস্কৃত রামায়ণের ও মহাভারতের সারানুবাদ করে সম্ভবত সাধারণ পাঠকের সঙ্গে মূল গ্রন্থের যোগাযোগ ঘটাবার চেষ্টা করেন। অবশ্য তার আগেও, বহু আগেই মূল রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ বাংলায় হয়েছে। যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ; হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাইয়ের রামায়ণের অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন মহাভারতের অনুবাদ বহুশ্রুত হলেও তা চোখে দেখা যেত না, কেননা তা ছাপা হত না আর। সম্প্রতি সে অভাব দূর হয়েছে। কালীপ্রসন্নর তবু নাম শোনা যেত, কিন্তু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সাহিত্যের অধ্যাপক এবং গুণী মহলের বাইরে বড় একটা শুনতাম না। একেবারে হালে সে অভাবও মিটেছে, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদটিও দুটি খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুধু নয়, বাঙালীর কাছেও এই গ্রন্থের অশেষ মূল্য।

পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, কালীপ্রসন্নর সমসাময়িক। কালীপ্রসন্নর মহাভারত অনুবাদে যে সব পণ্ডিতরা তাঁকে সাহায্য করতেন, হেমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ১৮৬৬ সালে মহাভারতের শেষ খণ্ড প্রকাশ পায়, তার চার বছর পরে ১৮৭০ সালে কালীপ্রসন্ন মারা যান। হেমচন্দ্র তখন একাই রামায়ণের অনুবাদ-কর্মে হাত দেন, এবং দীর্ঘ পনেরো বৎসরের চেষ্টায় এই বিশাল ও দুরূহ কাজটি তিনি শেষ করেন (১৮৬৯—৮৪)। শুনলে অবাক হতে হয়—এই সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত - মানুষটি মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদে জীবনের ত্রিশটি বছর ব্যয় করেছিলেন। এমন অবিচল নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, সাধনা ও সাহিত্যপ্রেম আজকের দিনে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

হেমচন্দ্রের অনুবাদ কত উচ্চাঙ্গের সে সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। রমেশচন্দ্র লিখেছিলেন, "তাঁহার অনুবাদের ন্যায় উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই।" অবশ্য বলে রাখা ভাল, হেমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ অনুবাদের প্রসঙ্গ নয়, মন্তব্যটি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সম্পর্কে। রমেশচন্দ্র নিজে এই দায়িত্ব হেমচন্দ্রকে দিয়েছিলেন।

আমি স্বীকার করি, আমাদের সকলের পক্ষে মূল বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ সম্ভব নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ও ভাষার সঙ্গে যে নিবিড়তা থাকলে মূলের মর্মোদ্ধার সম্ভব—আমাদের বেশির ভাগের তা নেই। কৃত্তিবাস এখনও নিশ্চয় আমাদের বটতলায় বিরাজ করছেন—কিন্তু কৃত্তিবাস তো বাল্মীকি নন। বাল্মীকি রামায়ণ পাঠের তা হলে একটিমাত্র পথ—রাজশেখরের রামায়ণ। কিন্তু রাজশেখরের রামায়ণও পূর্ণাঙ্গ নয়, সারানুবাদ। কাজেই বাংলা ভাষায় আমরা কেমন করে বাল্মীকি রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ সার্থক অনুবাদ পড়ব? একমাত্র হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যই এখানে আমাদের গতি। তাঁর অনুবাদের বহু গুণ, বড় গুণ বাল্মীকিকে তিনি শব্দে শব্দে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। যেমন যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ ঃ

হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ॥
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলাম।
ইত্যাদি

হেমচন্দ্রের অনুবাদ-এর উদাহরণ ঃ

"প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গারপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে।" ইত্যাদি

হেমচন্দ্রের অনুবাদের একটি বিশেষ গুণ মাধুর্য। তিনি মূল থেকে কিছু ত্যাগ করতে চান নি। এবং অনুবাদের সময় বাংলা ভাষার গতিকে সাধ্যমত সচল রেখেছেন। এই অনুবাদ না পড়লে তাঁর কৃতিত্ব বোঝা দুঃসাধ্য। এমন একটি অমূল্য অনুবাদ আবার আমরা হাতে পাচ্ছি—এ আমাদের সৌভাগ্য। পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকাটি অবশ্যপাঠ্য। সুনীলমাধব সেনের আঁকা ছবিগুলিও অপরূপ। প্রকাশককে ধন্যবাদ—এমন সযত্ন পরিশ্রমে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত। ভারবি ঃ ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—একত্রে পঞ্চাশ টাকা।

অভিনন্দ

চলচ্চিত্র-চিন্তার পথ-পরিক্রমা

আওয়ার ফিল্মস্, দেয়ার ফিল্মস্। শ্রীসত্যজিৎ রায়। ওরিয়েন্ট লংগম্যানস লিমিটেড। দাম ৬০ টাকা।

এই বইয়ের ভূমিকায় সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে এতে সংকলিত প্রবন্ধগুলি নানা লোকের ও নানা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে লেখা। অনুরোধ-উপরোধে লেখা সাধারণত দায়-সারা গোছের হয়। সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধগুলি তার অসাধারণ ব্যতিক্রম। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দর একটা উক্তি মনে পড়ে। স্বামীজি একবার বলেছিলেন যে সব কাজই ভাল ভাবে করতে গেলে মন দিয়ে করতে হয় তা ভগবানকে ডাকাই হোক বা লোটা মাজাই হোক। সত্যজিৎ রায়ের বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় যে তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে ছবি করেন ঠিক সেই রকম নিষ্ঠা দিয়েই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন।

'আওয়ার ফিল্মস্, দেয়ার ফিল্মস্'-এ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে লেখা পঁচিশটি প্রবন্ধ ছাড়া একটি বড় ভূমিকা আছে। বইয়ের প্রথম ভাগে ছবি করার ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় চলচ্চিত্রের নানান দিক ও সমস্যা নিয়ে বারটি প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে বিদেশি ছবি, বিদেশি পরিচালক ও চলচ্চিত্র-বিষয়ক বই নিয়ে তেরটি প্রবন্ধ। ভূমিকায় আরও অন্যান্য বিষয় ছাড়া সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগ ও চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার ক্রম-বিকাশের কথা ভারি সুন্দরভাবে লিখেছেন। অনিবার্য কারণে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা বিদেশি প্রভাবান্বিত। বিদেশি বই পড়ে, বিদেশি ছবি দেখে মানুষ হলেও দেশের জীবন, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও যোগাযোগ গভীর ও
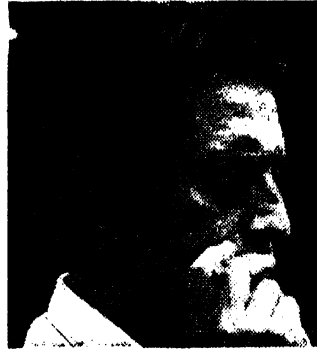
নিবিড়। বলাবাহুল্য, এই দুটি জিনিসের মিল না ঘটলে তিনি পথের পাঁচালী করতে পারতেন না।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলির কয়েকটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে কেউ না বললেও তিনি নিজেই যেগুলি লিখতেন সেগুলি হল ছবি তোলার ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর মনে হয় এই লেখাগুলি পড়লে নতুন চলচ্চিত্রকাররা হয়ত উপকৃত হতে পারেন। উপকারিতার কথা বাদ দিলেও একথা বলা যায় যে ভূমিকা ও এই লেখাগুলিই দেশি বিদেশি সব পাঠকদের বোধ হয় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও দামী মনে হবে।

ভূমিকায় রয়েছে পথের পাঁচালীর সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য যেখানে প্রথম রেলগাড়ি দেখবার জন্য অপু আর দুর্গা কাশ বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে সেটা তোলার কাহিনী। এইটি দিয়েই সত্যজিৎ রায়ের ছবি করার হাতে-খড়ি হয় এবং সেই প্রথম দিনের শুটিং করতে গিয়ে তিনি দুটি মূল সত্য উপলব্ধি করেন। প্রথমটা হ'ল একটা শট বা খণ্ড দৃশ্য যতই অদ্ভুত সুন্দর হ'ক না কেন সেটা যদি পুরো সিকোয়েন্স-এর সঙ্গে সংগতভাবে খাপ না খায় তা হ'লে শুধু যে তার কোন দাম নেই তাই নয়, তা সমস্ত ব্যাপারটাকে ভেস্তে দিতে পারে। দ্বিতীয়টা হল ছবি তোলার খুঁটিনাটির ব্যাপারে এমন কোন লোকের কথা শোনা উচিত নয় যার মাথায় পুরো ছবির চেহারাটা নেই। 'এ লং টাইম অন দি লিটল রোড'-এ তিনি লিখেছেন যে পথের পাঁচালীর শুটিং আরম্ভ করে তিনি নিজের মত করে বুঝতে পারলেন যে কেতাবী জ্ঞানের চেয়ে হাতে-নাতে অভিজ্ঞতার দাম ঢের বেশী আর মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগাযোগ না থাকলে সার্থক ছবি করা অসম্ভব। তিনি 'ফিল্ম মেকিং' নামে লেখায় বলেছেন যে পথের পাঁচালী করার সময় তিনি আরও একটা বড় কথা বুঝতে পারেন। সেটা হল যে একটা বিরাট লড়াইয়ের দৃশ্য তোলার চেয়ে উঁচু উঁচু ঘাস বনের মধ্যে অপু তার দিদি দুর্গাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা তোলা ঢের বেশি শক্ত। কারণ এখানে মন জিনিসটা ঢুকে

পড়ে। এই দৃশ্যটা তুলতে গেলে পরিচালককে অপুর মনের ভাবটা বুঝতে হবে কারণ তারই উপর নির্ভর করবে অপু কতক্ষণ কিভাবে হাঁটবে, কখন ও কতক্ষণ থামবে, ঠিক কখন দিদিকে খোঁজবার জন্যে এধার ওধার তাকানোর জন্য মাথা ঘোরাবে এবং আবার ঠিক কখন হাঁটতে শুরু করবে। এই দৃশ্যটা তোলবার সময় সত্যজিৎ রায়ের নিজের কথায় তাঁর চোখ খুলে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন যে মানুষের আচরণের পেছনের সত্যটাকে খুঁজে বার করে সেই সত্যটাকে অভিনেতাকে দিয়ে প্রকাশ করানো ছবি তোলার একটা সবচেয়ে কঠিন দিক।

পথের পাঁচালীর পর অপরাজিতার কথা সত্যজিৎ রায় লিখেছেন তাঁর 'এক্স-ট্র্যাকটস ফ্রম এ বেনারাস ডায়েরী'তে। সকালের উজ্জ্বল আলোয় কাশীর ঘাটের জীবনের ব্যস্ততার চেহারার সঙ্গে সন্ধ্যার ম্লান, বিষণ্ণ আলোয় তার কর্মবিরত প্রশান্ত রূপটার যে তফাৎ তাঁর চোখে পড়েছে ছবি তোলার ব্যাপারে তার তাৎপর্য তিনি খুলে বলেছেন। বাঙালীটোলা ও গণেশ মোহল্লার গলি যেখানে সকাল-বিকেলের আলোর চেহারার কোন তফাৎ নেই, দুর্গা মন্দিরে রূপী বাঁদরদের মজার কান্ড-কারখানা, বিশ্বনাথের মন্দিরে সহস্র পুণ্যার্থীদের ভীড়ে গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনি ও কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ সহযোগে সন্ধ্যারতির অলৌকিক রূপ তোলার তিনি এমন জলজ্যান্ত বর্ণনা করেছেন যে তা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন সিনেমার পর্দায় আমরা এই ছবিগুলি দেখছি।

'ফিল্ম মেকিং' প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় লিখেছেন যে দশ বছর ছবি করার পর তিনি এই ব্যাপারে আর বিশেষ কোন গোঁড়ামি পোষণ করেন না। পথের পাঁচালীর মতন প্রায় সব নতুন মুখ নিয়ে ছবি করতে হবে তার কোন মানে নেই, প্রয়োজনমত পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও দরকার। এমন কি 'জলসাঘর' গল্পটি তিনি ছবি বিশ্বাসকেই মনে রেখে নির্বাচন করেন। সব শুটিংই 'লোকেসানে' করতে হবে তারও কোন নিয়ম নেই। তাঁর জাঁ রেনোয়া সম্পর্কিত লেখাটি পড়লে এই ব্যাপার-গুলোতে তাঁর সঙ্গে রেনোয়ার মতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায় আরও লিখেছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁর নিউ ওয়েভ পরিচালকদের মত হাতে-ধরা ক্যামেরা, ফ্রিজ-ফ্রেম, জাম্প-কাট ইত্যাদি ব্যবহার করার ইচ্ছে হয়। কেবল নিউ ওয়েভের একটি ব্যাপারে তিনি নারাজ। সেটা হল নিউ ওয়েভ ফিল্মের শোবার ঘরের দৃশ্য। নিউ ওয়েভ ফিল্মে শোবার ঘরের দৃশ্যে কি ব্যাপার ঘটে সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান স্বল্প যদিও অবশ্য তা খানিকটা

অনুমান করে নিতে পারি। সত্যজিৎ রায়ের এই উক্তি এতটা বিশদভাবে আলোচনা করার একটা কারণ হ'ল যে এর মধ্যে এমন একটা চিকন ঠেশ আছে যাতে একটা প্রশ্ন মনে আসে এবং তা বোধহয় খুব অসংলগ্ন নয়। সেটা হল প্রক্ষিপ্তভাবে না এসে যদি কোন ছবিতে কাহিনীর ক্রমবিবর্তনের সংগে সংগতি রেখে তার ন্যায়সংগত বিস্তারে বিবসনা নারীকে দেখানো প্রয়োজন হয় সত্যজিৎ রায় সেখানে কি তা দেখাবেন না?

'সাম অ্যাসপেক্টস অফ মাই ক্রাফট' নামক প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় ছবির জন্যে গল্প নির্বাচন, স্ক্রিপ্ট লেখা ইত্যাদি থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাই, সেট ও কসটিউম, ডিজাইনিং, ক্যামেরা, এডিটিং ও আবহ-সংগীত ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে পরিচালক হিসেবে তিনি কি ভাবে কাজ করেন তার কথা লিখেছেন। এই প্রসংগে একটি কথা বলা দরকার। অনেকের মতে গ্রীফিথের আগে যে সব ছবি তোলা হত তাতে পরিচালক বলে কেউ থাকতেন না। গ্রীফিথই পরি-চালককে 'উদ্ভব' করে ছবি তোলার ব্যাপারে তাকে "সেনাপতির" পদে কায়েম করে দিয়ে যান। আজকের চলচ্চিত্রের জগতে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনকে এই অর্থে পরি-চালক বলা যায়, সত্যজিৎ রায় তাঁদের অন্যতম। ছবি করার এমন কোন দিক নেই যাতে সত্যজিৎ রায় তাঁর মাথার মধ্যে সম্পূর্ণ ছবিটার চেহারা ধরে রেখে চূড়ান্ত নির্দেশনা না দেন। চারুলতার পর থেকে তিনিই ক্যামেরা চালান। আজ বহু বছর ধরে তিনিই আবহসংগীত রচনা করছেন এবং এডিটিং-এর প্রতিটি স্তরে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকে। এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পৃথিবীতে বোধহয় আর কোন পরিচালক নেই যিনি সত্যজিৎ রায়ের মতন নিজের ছবির ক্রেডিট টাইটেল, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, হোর্ডিং ইত্যাদি সমস্তই নিজে লেখেন ও ডিজাইন করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাই সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় এক জায়গায় বলেছেন যে তিনি এ ব্যাপারে ভাগ্যবান। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আপাত-দৃষ্টিতে সাধারণ দেখতে অচেনা অজানা সব রকম বয়সের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিত্ব পর্দায় কি অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠবে তা আন্দাজ করার তাঁর নির্ভুল ক্ষমতা রয়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর থেকে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় অবধি ছোট বড় অনেকেই তার প্রমাণ।

বইয়ের প্রথম ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের চেহারা ও তার প্রধান সমস্যাগুলো কি কি তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে প্রধান সমস্যা হলো ভারতীয় চিত্রপরিচালকদের "fundamental concept of a coherent

ধারণার অভাব বা ভ্রান্ত ধারণা। তাই অনেক ছবিতেই কিছু ভালো অভিনয়, কিছু ভালো ফোটোগ্রাফি, কিছু ভাল সিকোয়েন্স এবং ভালো ডায়ালগ পাওয়া যায়। কিন্তু পুরো-পুরি ভাল ছবি প্রায় হয় না বললেই চলে। এই জিনিসটকেই তিনি আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়েছেন সংগীতের কথা পেড়ে। তাঁর মতে চলচ্চিত্রের যে একটা সাংগীতিক গঠন আছে সে সম্বন্ধে আমাদের পরিচালকরা খেয়াল রাখেন না। এর কারণ ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতে 'ড্রামাটিক স্ট্রাকচারের' অভাব যেটা পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সংগীতে আছে। রাগ রাগই যা পূর্বনির্ধারিত একটা ভাবের ব্যঞ্জনা। ভারতীয় সংগীতের এই 'স্ট্রাকচার' নিয়ে ছবি করা একেবারে অসম্ভব না হলেও তার ব্যবহার চলচ্চিত্রে সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। সত্যজিৎ রায়ের মতে হলিউড যে ধরনের ছবির 'স্ট্রাকচার' তৈরি হয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেটাই আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকাররা বেশির ভাগ যে রকম গল্প নির্বাচন করেন তার চিত্ররূপ দেওয়ার একমাত্র বাহন। তবে 'স্ট্রাকচার'-এর কথা এক এবং দৃষ্টিভঙ্গী এবং 'ট্রিটমেন্ট'-এর কথা আলাদা। তাই তিনি তাঁর বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে লিখেছেন যে সাধারণত ভারতীয় ছবি খারাপ হওয়ার একটা মূল কারণ হল হলিউডের সর্বব্যাপী প্রভাব। এরই জের টেনে তিনি অন্য এক জায়গায় লিখেছেন :

আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত ভিমিক নয় ডি সিকা।

বইয়ের প্রথম ভাগের প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ তর্কের শুরু হয়েছে সেটা হল 'অ্যান ইণ্ডিয়ান নিউ ওয়েভ?' এই লেখাটিতে সত্যজিৎ রায় বলেছেন যেটাকে ভারতীয় নিউ ওয়েভ বলে চালানো হচ্ছে সেটা আসলে তা নয়। বিষয়-টাকে তিনি নানা দিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। প্রথমত এর একটা ব্যবসায়িক দিক আছে। খাঁটি আভাঁগার্দ ফিল্মের দর্শক সব দেশেই কম আর আমাদের দেশে আরও কম। দর্শকের এই অভাবের জন্যে বিদেশে দশটার মধ্যে ন'টা আভাঁগার্দ ছবিতে সেক্সের খাদ মিশিয়ে বক্স অফিসের দিকটা সামলানো হয়। বলা বাহুল্য, এদেশে তা করা সম্ভব নয়। বিদেশে কোথাও কোথাও কখনও কখনও সরকার আভাঁগার্দ পরিচালকদের তাই অর্থ সাহায্য করেছেন যাতে তাঁরা ছবি তুলে যেতে পারেন। যেমন ফরাসী দেশে মালরো ব্রেস' ও অন্য দু চার জনকে করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় ইহো বাহ্য। না চললেও যে দু-একজন পরিচালক যে ভাল আভাঁগার্দ

আজও তৈরি হয়নি সত্যজিৎ রায়ের মতে তার আসল কারণ হল যে এই ধরনের ছবির মূল কথা হল এক্সপেরিমেণ্ট যা আমাদের দেশের কোন পরিচালক আজও করেননি। খাঁটি 'বোম্বাই ফিলমের' ফরমুলার মাল-মশলাগুলো থেকে দু-একটা বাদ দিলে তা এক্সপেরিমেণ্ট হয় না। তার জন্যে চাই নতুন দর্শন, নতুন আঙ্গিক। যেমন দেখা গেছে রেনোয়ার 'লা রেগল্ দু জুতে' অরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন'-এ, ডি সিকার 'বাইসিকল থিভস'-এ কুরাশোয়ার 'রসোমন'-এ গোদারের 'ম্যাসকিউলিন-ফেমিনিন'-এ।

বইটির দ্বিতীয় ভাগে ভারি সুন্দর একটি প্রবন্ধ হল 'রেনোয়া ইন ক্যালকাটা'। এত কম কথায় একজন মানুষের এত জীবন্ত ছবি ও তাঁর কাজ ও মতামতের এত সুন্দর বিশ্লেষণ বড় একটা চোখে পড়ে না। আমাদের মত যাঁদের বহু বছর আগে কলকাতায় রেনোয়ার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা এই লেখাটি পড়তে পড়তে আবার সেই পুরনো দিনে ফিরে যাবেন। জন ফোর্ড, কুরাশোয়া, ফ্লাহার্টি, চ্যাপলিন, হিচকক, গোদার প্রমুখ দিকপাল-দের সম্বন্ধে সত্যজিৎ রায়ের লেখাগুলি অসামান্য। আর একটি অসাধারণ লেখা হল 'হলিউড দেন অ্যাণ্ড নাউ' এতে নির্বাক যুগের শেষ কয়েকটি ছবি থেকে ষাট সাল অবধি মার্কিনী ছবির পট পরিবর্তনের কথা সত্যজিৎ রায় তাঁর স্বভাবসুলভ চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচনা করেছেন। এই লেখার এক জায়গায় তিনি যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল যে যদি তিনি কখনও কোন নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হন আর তাঁকে মাত্র একটা ছবি নিয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে তিনি মার্কস ব্রাদার্সের কোন একটি ফিলম—হয়ত 'এ নাইট অ্যাট দি অপেরা'—সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কথাটা তোলার উদ্দেশ্য সত্যজিৎ রায় মার্কস ব্রাদার্সদের ছবির কথা বড় সংক্ষেপে লিখেছেন। তা না হলে এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে অনেক দামী কথা শোনা যেত। হলিউডের একাল ও সেকালের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল মোটামুটি এই। এখনও হলিউডে মাঝে মাঝে মহৎ ছবি তোলা হয়। এখনও হলিউডের সাধারণ ছবি অন্যান্য দেশের সাধারণ ছবির চেয়ে ভালো। কিন্তু এখন আর সেই ধরনের ছবি তোলা হয় না যেটাকে 'পারসোনাল ফিল্ম' বলা যেতে পারে। সেই ধরনের ছবি প্রায় উঠে গেছে যার পেছনে রয়েছে একজনের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা যা একজনের মনের রঙে রাঙানো, যা একজনের আবেগ ও অনুভূতিমণ্ডিত লেখাটা ১৯৬২ সালে হলেও মনে হয় না যে সত্যজিৎ রায় আজ এই প্রবন্ধ লিখলে তাঁর মতামত বদলাতেন।

বইয়ের আর একটি ভাল প্রবন্ধ

হল 'সাইলেনট ফিল্মস' এতে তিনি অন্য নানা বিষয় ছাড়া বলেছেন যে নির্বাক ছবিকে এক সময় লোকে কাঁচা ও ছেলেমানুষী কাণ্ড ভাবত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে লোকে আবার নতুন করে নির্বাক ছবি দেখার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পেরেছে যে সব শিল্পের আদিযুগের কাজ-গুলির মত সেগুলির একটা স্বকীয় সত্তা ও শিল্পরূপ আছে, একটা বিশেষ এস্থেটিকস আছে যেগুলির আবেদন অসামান্য। তিনি আরও লিখেছেন যে কথা ও শব্দ ছবিতে ঢুকে নির্বাক ছবির 'ভিজুয়্যাল পিউরিটি' নষ্ট করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি গোল্ড রাস-এ চ্যাপলিনের জুতো রেঁধে খাওয়ার দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর ভের্দু ও লাইমলাইটের তুলনা করে তফাৎটা বুঝিয়েছেন। তবে এটা খুব সুখের কথা যে কিছুদিন ধরে সবাক চলচ্চিত্রে নির্বাক ছবির বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনবার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অনেকেই আবার অনুপ্রেরণার জন্য চলচ্চিত্রের মূল উৎসের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। সত্যজিৎ রায়ের এই কথার মর্মার্থ কয়েকদিন আগে 'ব্রেস'র' ইউন ফাম ভুস' দেখতে দেখতে অনুভব করলাম।

'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস'-এর সমালোচনার এইখানে শেষ করলে বইটির সম্বন্ধে একটা আসল কথাই বলা হবে না। সেটা হল সত্যজিৎ রায়ের লেখার মুন্সীয়ানা। প্রতি লেখাই তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও রুচির দ্যুতিতে ঝকঝক করছে। আর সাধারণ কথাই হক বা দুরূহ তত্ত্বই হক সব কিছুরই এমন জলের মতন পরিষ্কার, সরল ও সরস আলোচনা আমাদের দেশে আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। বইটি পড়তে পড়তে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তির কথা মনে পড়ে : 'পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের মনের ভেতর প্রবেশ করে।' ছবির ভাষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যজিৎ রায়ের লেখার ভাষার ওপর যে কি অসামান্য দখল ও কথার ব্যবহারে তাঁর কি সূক্ষ্ম অনুভূতি তা বইটি না পড়লে বোঝা যায় না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে ভাষায় তিনি লিখেছেন তা তাঁর মাতৃভাষা নয়।

বইটির প্রকাশকদের ধন্যবাদ যে তাঁরা নানা অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত লেখাগুলি একত্র করে সুন্দরভাবে ছেপে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন যদিও বলা দরকার যে এই লেখাগুলির উদ্ধার কার্য সম্ভব হয়েছে লেখকের সহায়তায়। তবে সম্পাদনার ব্যাপারে কতকগুলো ত্রুটির উল্লেখ করা দরকার। প্রথমটা হল যে সত্যজিৎ

রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন 'চারুলতা প্রসঙ্গে' লেখককে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে এই সংকলনে ছাপালে এটি আরও অনেক সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ হত। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি লেখার শেষে রচনাকাল দেওয়া থাকলেও কোনও অজানা কারণে সেটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তার হদিশ দেওয়া হয়নি। খবরটি শুধু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্ত করত তাই নয়, সংকলন প্রকাশনায় এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার একটি চিরাচরিত সৌজন্য। তৃতীয়ত প্রুফ-রিডিং ব্যাপারটা সম্বন্ধে প্রকাশকদের আর একটু হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ বড় চোখে লাগে।

সবশেষে বইয়ের দাম সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বইটির দাম ষাট টাকা যাতে এই দুর্দিনেও ছোট গেরস্থ পরিবারের দশ দিনের কাঁচা বাজার হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, যাঁরা সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে ও ফিল্ম সম্বন্ধে সত্যিকারের অনুরাগী তাঁদের মধ্যে বহু লোকই এই বই কিনতে পারবেন না। সুতরাং কবে পেপারব্যাক বেরোবে তার জন্যে তাঁদের হাঁ করে বসে থাকতে হবে। একটি হাফটোন-ছবিওয়ালা দু'শ পাতার বইয়ের ষাট টাকা দাম যে অন্যায্য তা নিম্নলিখিত কথাগুলি থেকে বোঝা যাবে :

"In the book trade, for instance, other things being equal, a slim volume costs less than a fat one regardless of author and quality.

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই মন্তব্য কোন বাংলা প্রকাশকের নয় যদিও তা হতে পারত। কথাগুলি সত্যজিৎ রায়ের (আন ইন্ডিয়ান নিউ ওয়েভ, পৃষ্ঠা ৯৯ দ্রষ্টব্য) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

জীবনী

Splendour in the Cave. Shyamananda Banerjee, M C Sarkar & Sons, Calcutta-12. Price Rs 15.00

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা যখন অজ্ঞেয়বাদের দিকে ঝুঁকছিলেন, সেই সময়ে দুই সাধকের আবির্ভাবের ফলে সেই শোচনীয়তার গতি কিছুটা শ্লথ হয়। সেই দুইজনের একজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও দ্বিতীয় জন বালানন্দ ব্রহ্মচারী।

এ বই সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সিদ্ধির ও সাধনার কথা। ভারতীয় জীবন দর্শনের মর্মকথা বেদ উপনিষৎ গীতার সূক্তিতে আছে, বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে এ সবের যে মিল ছিল তা উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। যোগ-সাধনার উপকারিতা আছেই। এ বই পাঠ করলে এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হবে—এইটুকুই আমাদের লাভ।

লং-ক্লথের টেক্কার দর খুব সস্তা যাচ্ছে!

কমলার কাপড়-
কম দাম, দেখতে দামী

খেলার মাঠে

ফুটবল লীগের উপর যবনিকা পড়ার পর আই এফ এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়েছে। তবে লীগের তুলনায় শীল্ডের আসর জমবে বলে মনে হয় না। লীগে এ বছর যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, বিশেষ করে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাগুলি দেখার জন্য যে জনসমাগম হয়েছে তাকে অভূতপূর্ব বলা যায়। শীল্ডেও এদের খেলায় দর্শকে মাঠ উপচে পড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে আই এফ এ শীল্ডকে বলা হত 'ব্লু রিবান্ড' অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল, ভারতের সমস্ত কেন্দ্র হতে যে প্রতিযোগিতায় নামী দলগুলি খেলতে আসত তাদের মধ্যে একমাত্র গোয়া একাদশ ছাড়া আর কেউ আসছে না।

তবু শীল্ডের আসর বসেছে এবং প্রাথমিক খেলাও শুরু হয়েছে চারটি কেন্দ্রে। এবারের নতুন কেন্দ্র খড়্গপুর। দুটি কোয়ার্টার ফাইনালের ব্যবস্থা হয়েছে পুরুলিয়ায়। শীল্ডের পড়তি আকর্ষণের মধ্যে খেলাকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত আই এফ এ কয়েক বছর আগে গ্রহণ করেছিল তাকে দূরদৃষ্টিই বলব। খড়্গপুর, কৃষ্ণনগর, বার্ণপুর, পুরুলিয়ায় যে খেলাগুলি হবে ওই খেলাগুলি কলকাতায় হলে মাঠের গ্যালারি হয়তো ফাঁকাই থাকত। কিন্তু ওই সব জায়গায় উৎসাহ উদ্দীপনা দেখার মত।

সিংদের জন্যই শুটিংয়ের কৌলীন্য

কিছুদিন আগে মণ্ট্রিল ব্যর্থতা সম্পর্কে সঞ্জয় গান্ধী বলেছিলেন, কুস্তিগীরদের পাঠানো হলে তারা হয়তো একটি বা দুটি পদক পেতে পারত। কারণ কুস্তিতে ভারতের এক ঐতিহ্য আছে এবং ভারতীয় কুস্তির মানও নিচু নয়। কুস্তিগীরদের মণ্ট্রিল পাঠাবার জন্য সঞ্জয় নাকি সুপারিশও করেছিলেন। কিন্তু তার অনুরোধ রাখা হয়নি।

কুস্তিতে অবশ্যই ভারতের ঐতিহ্য অনস্বীকার্য। কারণ ভারত গামা, গোবর, করিমবক্স, গোঙ্গা পালোয়ানের দেশ। অতীতে হকি ছাড়া ভারত আর যে একটি অলিম্পিক পদক পেয়েছে তা কুস্তিগীর কে ডি যাদবের দৌলতে। এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং আন্তর্জাতিক হকিতেও ভারতীয় পালোয়ানদের সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ জেতার অনেক নজির আছে। তবু কিন্তু ভারতীয় কুস্তিগীরদের নিদারুণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে মণ্ট্রিল অলিম্পিকের দল নির্বাচনে। অথচ যে শুটিংয়ে আমাদের ব্যর্থতা বার বার সেই শুটিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনজন প্রতিযোগীকে। চারজনকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। কার্নী সিং শারীরিক কারণে যেতে অস্বীকার করায় তিনজন প্রতিযোগী ও একজন গান মেকারকে (আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ) পাঠানো হয়েছিল।

এবার তাদের ভূমিকার কথায় পরে আসছি। তার আগে দেখা যাক চার বছর আগে মিউনিখ অলিম্পিকে শুটারদের ভূমিকা কী ছিল।

স্মল বোর প্রোণে পরিমল চ্যাটার্জী মোট ১০১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৯৫তম স্থান পেয়েছিলেন ৬০০-র মধ্যে ৫৭২ স্কোর করে। ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর স্কোর ৫৯৭। স্কিট শুটিংয়ে মহারাজা কার্নী সিং পেয়েছিলেন ৩৬তম স্থান। স্কোর ১৮৬। ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর ১৯৩। মিউনিখের অলিম্পিক ফলের পূর্ণ তালিকায় ভীম সিং বা রণধীর সিংয়ের নাম নেই। ধরে নিতে হচ্ছে দুই প্রতিযোগীই বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন।

মণ্ট্রিলের স্কিটে ৬০ জন শুটারের মধ্যে গুরবীর সিং সাঁধু ৫৬তম (১৭৯ পয়েন্ট) এবং কোটার মহারাজা ভীম সিং ৫৯তম স্থান (১৬১ পয়েন্ট) পেয়েছেন। পাতিয়ালার রাজা বলীন্দার সিংয়ের পুত্র রণধীর সিং পেয়েছেন ২১তম স্থান (১৭৫ পয়েন্ট)।

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের ঘোষিত নীতি আগের অলিম্পিকের ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর যোগ্যতায় পৌঁছতে না পারলে কোন প্রতিযোগীকে অলিম্পিকে পাঠানো হবে না। এখন প্রশ্ন, গুরবীর সিং, ভীম সিং ও রণধীর সিং কি মিউনিখ যোগ্যতায় পৌঁছেছিলেন? যদি পৌঁছে থাকেন তবে মণ্ট্রিলে তাদের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ কি? অ্যাথলীটরা যোগ্যতায় না পৌঁছেও মণ্ট্রিলে অনেক ভাল ফল দেখিয়েছেন। শুটারদের নিরিখ অবিশ্বাস্যভাবে কমে গেল কেন?

আসল কথা শুটিং ধনীদের স্পোর্টস এবং সিং পদবীধারী প্রাক্তন রাজা মহারাজারা এ স্পোর্টসে জেঁকে বসে আছে, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে যাদের আধিপত্য। তাই কৌলীন্যের মর্যাদা। সাধারণ ঘরের ছেলে, যারা ল্যাঙ্গোটি পরে, ধুলো-মাটি-ঘামে পালোয়ান হিসাবে গড়ে ওঠে তারা উপেক্ষিত। সঞ্জয় গান্ধীর সুপারিশেও তাদের আখের খোলেনি।

নারী-পুরুষ এবং পুরুষ-নারী

অঘটন প্রথম যখন ঘটল তখন ব্যাপারটিকে খোদার উপর খোদগারি বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এখন আর অঘটন নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অলৌকিকতা বলে ধরা যেতে পারে। আমি যৌন রূপান্তরের কথাই বলছি।

সম্প্রতি দুটি রূপান্তর ঘটে গেছে। দুটিই খেলোয়াড় কুলে। একটি আমাদের দেশে। আর একটি মার্কিন মুলুকে।

আমাদের অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে কেরালার নামী মেয়ে, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী নানী রাধা অস্ত্রোপচারের ফলে পুরুষ হয়ে গেছে। নানী রাধার বদলে এখন রাধাকৃষ্ণন নাম গ্রহণ করেছে। একদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসে ৩৫ নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় ডাঃ রেনি রিচার্ডস পুসকিন অস্ত্রোপচারের ফলে নারীত্ব লাভ করেছেন।

যৌন রূপান্তরের পর রাধাকৃষ্ণন আর স্পোর্টসে ফিরে আসবে কিনা অনিশ্চিত। এলেও হয়তো পুরুষদের সঙ্গে

প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারবে না। কিন্তু ডাঃ রিচার্ডসের সুবিধা বহু নাম্নী মেয়েকে তিনি সহজেই হারাতে পারবেন। ইতিমধ্যে মেয়েদের সাউথ অরেঞ্জ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবও পেয়েছেন। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ এই ডাক্তারের যদিও বয়স ৪২ বছর তবু বাড়তি সুবিধা ৬ ফুট মাথায় উঁচু। পুরুষদের টেনিসেই যার দক্ষতা ছিল তার পক্ষে মেয়েদের উপর টেক্কা দেওয়া কষ্টকর হবে না।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে মেয়েদের প্রতিবাদে। মেয়ে টেনিস খেলোয়াড়রা তাকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু ডাঃ রিচার্ডস এখন খেলতে চাইছেন প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন মার্গারেট কোর্টের সঙ্গে। সময় নেই বলে কোর্ট সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন : ভগবান রেনিকে পুরুষ করেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। যতক্ষণ উনি অন্যভাবে নিজের নারীত্বের প্রমাণ না দিচ্ছেন তখন আমি ওকে পুরুষই বলব। ডাঃ রেনি রিচার্ডসের এখন হাস-জারুর অবস্থা।

একলব্য

যার কাছে স্বর্ণপদক স্বর্ণখনির চেয়ে বড়

মিউনিখে ও মন্ট্রিলে, পর পর দুটি অলিম্পিকে হেভিওয়েট বক্সিংয়ের স্বর্ণপদক জিতে কিউবার বক্সার টিওফিলো স্টিভেনসন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অবশ্য পর পর তিনটি অলিম্পিকে (লণ্ডন, হেলসিংকি ও মেলবোর্ন) বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হবার নজির আছে হাঙ্গেরীর লাজলো প্যাপ-এর। তবে লাইট মিডল ওয়েট অলিম্পিক ইতিহাসের উইয়ে-কাটা ছেঁড়া-পাতায় চোখ বোলালে আরও একটি নজির মেলে। আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন অলিম্পিকে পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ক্যালিস্টো-ফানোসের (বন্য অলিভ বৃক্ষের পাতা) মালা গলায় পরেছিল সিসিলির বক্সার টিসামেনস। কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগের বক্সিংয়ের সংগে এখনকার বক্সিংয়ের আকাশ-জমিন ফারাক। লাইট মিডল ওয়েটের তুলনায় হেভি ওয়েটে চ্যাম্পিয়নের কদরও অনেক বেশী। স্টিভেনসন মন্ট্রিলের উজ্জ্বল তারকাদের অন্যতম, যার ঘুঁষিতে বজ্রের শক্তি।

চার বছর আগের কথা। মিউনিখ অলিম্পিকের অফিসিয়াল রিপোর্টে মুষ্টি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ অ্যালান হুবার্ড লিখে-ছিলেন—"যারা বক্সিং ও বক্সিং ব্যান করার জন্য সদাই পঞ্চমুখ তাদের মুখ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বক্সিং হলে দর্শক-সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে। বিশেষ করে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল কিউবার হেভিওয়েট বক্সার টিওফিলো স্টিভেনসন তার শৌর্যমিশ্রিত সংগ্রামের সৌন্দর্যে।"

আসুরিক খেলা বলে বক্সিংয়ের এক বদনাম আছে। কেননা, এ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মুষ্ট্যাঘাতে নাক-মুখের বিকৃতি এবং রক্তক্ষরণ সচরাচরই ঘটে থাকে। আবার বক্সিং রসিকদের মতে, বক্সিং হচ্ছে মরদের খেলা, যার মধ্যে আছে রুদ্ধশ্বাস সংগ্রামের নাটকীয়তা, অসম সাহসিকতা, হাত পায়ের চটুলতা ও দক্ষতা, আর আত্মরক্ষার কলা-কৌশল।

যদিও বক্সিংয়ে বীভৎসতা ব্যতিক্রম নয় তবু এই মতবাদ স্বীকার করে নিতে কোন আপত্তি থাকে না, যদি হিংস্রতা বাদ দিয়ে প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে দুই মুষ্টিক বীর বিক্রমে লড়াই করে। টিওফিলো স্টিভেনসন সেই ধরনের বক্সার যার মধ্যে হিংস্রতা নেই। মুষ্টিযুদ্ধের মামুলী "কিল হিম" কথাটিকে স্টিভেনসন ঘৃণা করে, পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোলে

টিওফিলো স্টিভেনসন

তুলে নিতে এগিয়ে যায়। মিউনিখেই তো সেমিফাইনালের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানীর পিটার হাসিংকে তাহুত করার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে গিয়েছিল স্টিভেনসন।

রক্ত ঝরানো ঘুঁষোঘুঁষি খেলায় বিশ্ব-বিখ্যাত হলেও স্টিভেনসন নরম মনের মানুষ। আবার মানসিক দৃঢ়তায় অসাধারণ। শ্বাপদের চর্মের চিক্কণতা তার তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখরের হিংস্রতাকে ঢেকে রাখে। স্টিভেনসনের ঠিক উল্টো। ওর শিহরণ জাগানো মুষ্টিবদ্ধ হাতের পেশী এবং সারা অঙ্গের তেজ ও বিক্রমের আড়ালে আছে একটি নরম ও নির্লোভী মন।

হুবার্ডই লিখেছেন, ওর মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত হাতে থাকে সংহারের সংকেত, হাতের গুলিগুলি চকচক করতে থাকে, আতঙ্কে জর্জ ফোরম্যানের চোখও (ফোরম্যান রিংয়ের পাশেই ছিলেন) যেন বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তবু স্টিভেনসন মুষ্টিযুদ্ধের মহান শিল্পী। ওর স্ট্যান্স, আক্রমণ, আঘাত—সব কিছুই সুষমাময়।

মিউনিখে সোনা জেতার পরই মুষ্টি-যুদ্ধের পেশাদার প্রবর্তকদের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছিল—"আর দেরি কেন? সামনেই তো তোমার সোনার খনি। এবার নেমে পড়। মই আমাদের হাতেই রয়েছে।

"না, সোনার খনিতে কাজ নেই। মন্ট্রিলেও আমি পেতে চাই একটিমাত্র সোনা।" সহজ অথচ দৃঢ় কথায় প্রবর্তকদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল স্টিভেনসন।

মন্ট্রিল অলিম্পিকের কিছু আগেও প্রস্তাব এসেছিল মহম্মদ আলির সংগে লড়াইয়ে নামলে দশ লক্ষ ডলার পাবে। বলেছিল, দশ লক্ষ কেন, বিশ লক্ষ পেলেও না।

মন্ট্রিলে সোনা জিতে মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টির পর স্টিভেনসনকে জিজ্ঞাসা করা হয়—"এবার কি তুমি মত বদল করবে? শেষ বী লড়াইয়ের জন্য আলি পাচ্ছে ৬০ লক্ষ ডলার। তুমিও তো পেতে পার।"

স্টিভেনসনের উত্তর: আমি সেই স্টিভেনসনই আছি। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তাও আমার আছে। আমি খেলা-ধুলো ভালবাসি। আনন্দের জন্যই খেলাধুলা করি। পয়সার জন্য নয়। তা ছাড়া পেশাদার বক্সিংয়ে কষাই-এর মনোবৃত্তিসম্পন্ন ম্যানেজাররা বক্সারদের ভাঙিয়ে দু হাতে পয়সা লোটে। বক্সারের জীবন বিপন্ন করে তোলে। আলিও ব্যতিক্রম নয়। অনেকেই তাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। সেটা অবশ্য আলির ভাবার কথা, আমার নয়। পেশাদার বক্সিংয়ে সৌন্দর্য নেই। বক্সিং ভাঙিয়ে আমি জীবন নির্বাহ করতে চাই না।"

সাধারণ মানুষ কি কল্পনা করতে পারে কিউবার ২৪ বছর বয়সী কৃষ্ণকায় ছেলেটি কী প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে চলেছে? দশ লক্ষ ডলার আমাদের হিসাবে প্রায় এক কোটি টাকা। শুধু আলির সঙ্গে লড়ার জন্য সেই প্রস্তাব এসেছিল। পেশাদার হলে বহু কোটি টাকাই হয়তো উপার্জন করতে পারত। মহম্মদ আলি (রোম অলিম্পিক), জো ফ্রেজিয়ার (টোকিও অলিম্পিক), জর্জ ফোরম্যান (মেক্সিকো অলিম্পিক)—সবাই তো স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছে একবার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হবার পরে। কেউ প্রলোভন সংবরণ করতে পারে নি। আর স্টিভেনসন দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েও অ্যামেচার থাকতে অবিচল।

মুষ্টি যুদ্ধ থেকে কত টাকা রোজগার করেছে আলি? হিসাব করতে গেলে কলমের রেঞ্জে পাব না। ১৯৭৪-এর অক্টোবর থেকে ১৯৭৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরেই দশ কোটি টাকার বেশী। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে মহারথীদের অভাব নেই। জ্যাক জনসন, জো লুই, ফ্লয়েড প্যাটার্সন, জো ওয়ালকট, এজার্ড চার্লস, রকি মার্সিয়ানো, ইনগেমার জোহানসন, সোনি লিস্টন—কত বর্ণময় নাম। এদের সঙ্গে টিওফিলো স্টিভেনসনের পার্থক্য কত? বোধ হয় একটি স্বর্ণপদক ও একটি স্বর্ণখনির মধ্যে পার্থক্য যত।

অথচ কারো চেয়েই সম্ভবত স্টিভেন-সনের যোগ্যতা কম নয়। অন্তত আলি, ফ্রেজিয়ার ও ফোরম্যানের চেয়ে দুবারই স্টিভেনসন অলিম্পিক খেতাব জিতেছে অনেক অল্পায়াসে।

মিউনিখে সেমিফাইনালে পরাজিত পশ্চিম জার্মানীর পিটার হাসিং কবুল করেছিল—জীবনের ২১২টি লড়াইয়ের মধ্যে কোন লড়াইয়ে এমন কাহিল হইনি, কারো কাছে এমন মার খাইনি। মন্ট্রিলের সেমি-ফাইনালে ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি মাথায় উঁচু স্টিভেনসনের শালপ্রাংশু হাতের মুষ্ট্যাঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশালদেহী বক্সার জন টেট রিংয়ের উপর মাতালের মত টলতে থাকে। অথচ লড়েছিল মাত্র ৮৯ সেকেন্ড। ফাইনালে বুলগেরিয়ার মিরচিয়া সিমনেরও ওই অবস্থা ঘটে। অবশ্য তৃতীয় রাউণ্ডে। মন্ট্রিলে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বীই পরাজিত হয় নক আউটে।

পেশাদার না হলে টিওফিলো হয়তো আলির মত আলোড়ন তুলতে পারবে না। কিন্তু অ্যামেচারের মর্যাদার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করল তা প্রেমের জন্য অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের সঙ্গে তুলনীয়।

মনবাসর/সমিত ভঞ্জ ও মহুয়া রায়চৌধুরী

হংসরাজ/অরামা চিত্রম

অরামা চিত্রমের 'হংসরাজ' বিজ্ঞাপনে ও চিত্রে একটি বাউল বালকের কাহিনী মনে হতে পারে। প্রথমেই জানা যায় সে তিন পুরুষাবধি বাউল। অথচ, একটিও বাউল-অঙ্গের গান সে গায়নি। গল্পাংশ দুর্বল : বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান হংসরাজ, ভিক্ষা তার জীবিকা। সে পদক-পরিহিত কবিয়ালকেও হারায়, আবার কলকাতার স্কুলের ছেলেদের ক্রিকেট খেলার মধ্যে ঢুকে পড়ে তৎক্ষণাৎ গান বেঁধে তাদেরও মুগ্ধ করে। তাদেরই কাছ থেকে রেডিওতে চান্স পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে একদিন বিনা টিকিটেই

চলচ্চিত্র

কলকাতায় পালিয়ে এল। এই শহরে তার অভিজ্ঞতা কিছুটা মর্মান্তিক, তবু তার কণ্ঠের গান সমস্ত বিরুদ্ধতাকে হটিয়ে দেয় এমনকি বিখ্যাত স্কুলের গুম্ফবান দারোয়ানকেও গলাতে পারে। এই পর্বে এই বাংলা ছবিটি হিন্দী চিত্রের ফরমুলাকে মান্য করেছে। সংলাপে আর ব্যবহারে ধনী-দরিদ্রের মূল্য-বোধের সংঘাত বারেবারে চলে আসে। খল নায়কের টাকার দাপটে হংসরাজ অপবাদ এবং বিপদের সামনে পড়ে, সৎ সহযোগীদের (স্বভাবতই তারা গরীব) সৌজন্যে আবার অনায়াসে সেসব বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। খ্যাতনাম্নী শিল্পী অঞ্জনা রায়কে বাড়ির সামনে শেষ রাত্রে গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে রেডিওতে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। তারপরও প্রতিযোগিতা থাকে, কূট ষড়যন্ত্রে বন্দী হয় বাউল, আবার মুক্তি এবং সম্মান যুগপৎ পায়। তার কণ্ঠের মত তার মানসিক সম্পদও বিস্ময়কর। এবং শেষ পর্যন্ত এই বালক-বীর বিশ্বজয়ের শেষে গ্রামের রাস্তায় মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়। যথারীতি শেষ শটটি ফ্রিজ। এবং সুখাবহ।

অরামা চিত্রমের এই নিবেদনটিকে বলা হয়েছে 'কিশোর চিত্র'। এখানেই সমস্ত আপাত দুর্বলতা মার্জিত হয়ে যায়। কেননা, চিত্রটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। কোথাও যুক্তির অভাব থাকলেও হৃদয়কে সেখানে পরিচালক (অজিত গাঙ্গুলি) সম্ভাষণ করেন। চিত্রনাট্যও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য পরিণত ব্যঞ্জনায় বয়স্কদেরও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। যেমন, ধরা যাক বসন্তর জুতোর ক্ষীয়মান শুকতলার ক্লোজ শট, রেডিওতে হংসরাজের গানের সম্প্রচার, নূপুরের গানের সহযোগী কার্টুন, খলচরিত্রের গালে চুনকালি আর মাথায় গাধার টুপির কল্পনা। ছবিতে যথেষ্ট রঙ্গরস আছে। তাতে নিশ্চিত ওরিজিনালিটি কম, কিন্তু পরিচালকের সূক্ষ্ম রসবোধ ও সংযমবোধ সেখানে চোখে পড়ার মত।

ভূমিকালিপিতে বলা হয়েছে, এই চিত্রের বালক ও কিশোর অভিনেতারা আগামীকালের বাংলা ছবির সম্ভাব্য অভিনেতা। এ কথায় সামান্য আশঙ্কা হয়। মূল চরিত্র (কেননা, চিত্রনাট্যের গুণে বা দোষে বসন্ত নায়ক হয়ে ওঠে, বাউল হংসরাজ উপলক্ষ মাত্র) ভূমিকাভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলির চেহারা ওষ্ঠসঞ্চালন চলাফেরা সুন্দরীসুলভ; বাংলা চলচ্চিত্রে যে কতদিন সুদর্শনা নায়কের প্রভাব চলবে! বরং বসন্তর অভিনয়ে সম্ভাবনা আছে। টিয়ার ভূমিকায়

বালিকাটির সংলাপ পরিপক্ক, কিন্তু অভিনয় অত্যন্ত সপ্রতিভ। গায়িকার ভূমিকায় বিনতা রায় একটি চমৎকার ব্যক্তিত্ব উপহার দিতে পেরেছেন, সন্ধ্যাসনীর অভিনয় যথাযথ। জহর রায়কে দেখলে এখন দুঃখ হয়।

সংগীত-পরিচালনায় নতুনত্ব কিছু নেই; অর্থাৎ বিষাদের দৃশ্যে উচ্চকিতভাবে করুণ সুর বেজে ওঠে, আর যে-কথা আগেই বলা হয়েছে — আকাশবাণীতে লোকসংগীতের ঘোষণা সত্ত্বেও লয় ছাড়া কোথাও লোক-গীতির আবহ মেলে না। সন্ধ্যা বা আরতির গান যেমন হয় আর অমিতকুমার একটিমাত্র গানেই তাঁর পিতার প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। রূপসজ্জা এবং সম্পাদনা যত্নবান।

—অপ্রতিম বসু

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাজঘরে

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে/আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান"—কথাটা কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছিল সেদিন—২৮ আগস্ট—সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে বর্ষীয়ান বরেণ্য শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের একক-সঙ্গীতের আসরে। রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্য উপস্থিতি যেন সর্বক্ষণ অনুভূত হচ্ছিল ওই অনুষ্ঠানে, পূর্বোক্ত বাণীর মূর্ত রূপ ছিল যেন এই আসর। রবীন্দ্রসদন-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে অগ্রগণ্য শিল্পী উপহার দিলেন অননাস্বাদের একটি আনন্দ-সন্ধ্যা, তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সহযোগে প্রসন্ন পরিণত কণ্ঠের কুড়িটি গান শ্রবণ ও মননকে একসঙ্গে পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত করে তুলল। শান্তিদেবের স্বকীয় সবল সতেজ উদাত্ত গায়নভঙ্গি বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল, বরণীয় এই শিল্পী একাধারে স্রষ্টা ও শিক্ষক, রবীন্দ্র সঙ্গীতের সোনায় বোঝাই তাঁর ভেলা. "তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী"—বলার অধিকার তিনি অর্জন করেছেন।

অবশ্য তিনি তা বলেননি। রবীন্দ্র-সদনের পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করলেন প্রশাসন আধিকারিক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা তুলে ধরলেন প্রবোধকুমার সান্যাল ও দক্ষিণারঞ্জন বসু। সবিনয় স্বল্পবাক ভাষণে শান্তিদেব ঘোষ জানালেন, কোনো কিছুর প্রত্যাশা করে জীবনে কিছু করেননি তিনি। গুরুদেবের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পাথেয় জুগিয়েছে তাঁকে। কিন্তু কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছেন তিনি, নিজে জানেন না। এখনও তিনি প্রতিদিন ঘণ্টা-দুই গান করেন, একা-একা, সে-গান বাইরের কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, সম্পূর্ণ অন্তরের তাগিদে এই চর্চা। তাঁর এই ভাষণ চিনিয়ে দিল নিরভিমান এক বিরল ব্যক্তিসত্তাকে, সঙ্গীত যাঁর জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক এক স্ফূর্তি।

নিশ্চিত তাই। স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিময় তাঁর গানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব যত সহজে প্রকাশিত, তেমন দৃষ্টান্ত এ-যুগে আর কোথায়? জীবিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে শান্তিদেব নিঃসন্দেহে নিজেই এক যুগ।

সেদিন তাঁর আলোচনার বিষয়, এক কথায় বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাজঘরের বর্ণনা। কবির কিছু সঙ্গীত রচনায় প্রেরণায় প্রত্যক্ষ বাস্তব উৎস সম্পর্কে বহু আকর্ষণীয় তথ্য উদ্ধার ও সংগ্রহ করে তিনি আলোচনা সহযোগে শোনালেন সেই গান-

আলোচনা সহ একক সংগীত পরিবেশনে শান্তিদেব ঘোষ ফটো : সুবীর চ্যাটার্জী

গুলি। অসম্ভব কৌতূহলকর এই তথ্যাবলী, গানগুলিকে নতুন মাত্রায় স্থাপিত ক'রে রবীন্দ্র-অনুরাগী ও সন্ধানী শ্রোতাকে প্রাণিত ও উদ্দীপিত করে তোলে।

এই আলোচনা জানিয়ে দেয়, 'নন্দনেরই নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া'—'তুমি উষার সোনার বিন্দু' গানটির এই কলি বাস্তবিক এক বালিকা নন্দিনীর ছবি, 'কিশন তোমার ধুলোয় হয়েছে ধূলি'র উৎস একটি ছেঁড়া চিঠির টুকরো, 'দুই হাতে কালের মন্দিরা' যার হাতে প্রথম বেজেছিল সে কাথিয়াবাড়ের একটি চাষী পরিবারের মেয়ে, দিনেন্দ্রনাথের পোষা হরিণের নিষ্ঠুর মৃতির স্মৃতিতে রচিত 'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে', 'সময় কারো যে নাই', কিংবা 'পাছে সুর ভুলি' এক বিভ্রান্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিবাদ, মৃত্যুঞ্জয় যতীন দাসের আমরণ অনশনের ঘটনায় ব্যথিত কলমে ঝলসে উঠেছিল 'হে ভৈরব শক্তি দাও' গানটি, কবি-পত্নীর মৃত্যুশোকসম্ভূত সৃষ্টি 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু', 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' কিংবা 'দুঃখরাতে হে নাথ' গানগুলি, অথবা চলন্ত ট্রেনের তালে জেগে-ওঠা মনের বিশেষ ভাবটি ফাল্গুনী নাটকের 'চলি গো চলি গো যাই গো চলি'তে রূপান্তরিত। এমনতর আরো বহু রসসমৃদ্ধ খবর তিনি যেমন জানালেন তেমনি আনন্দ ও বেদনা, বিহ্বলতা ও বিষণ্ণতা, কৌতুক ও কর্মপ্রেরণা, প্রতিবাদ ও লাঞ্ছনার বিভিন্ন অনুভূতিকে মূর্ত করে তুললেন অননুকরণীয় ভঙ্গির গানের মাধ্যমে।

আলোচনা অংশ পাঠ করে শোনালেন তরুণ শমীক ঘোষ। তাঁর নম্র নমনীয় কণ্ঠ-স্বরে ও মার্জিত উচ্চারণ ভাষ্য পাঠের পক্ষে বিশেষ উপযোগী পরিবেশ সহজেই রচনা করেছিল।

পঞ্চাশ বছরের কবি-কিশোর

পঞ্চাশ বছরের সুকান্ত ভট্টাচার্যকে কল্পনা করতে বেশ কষ্ট হয়। গালে হাত-রাখা অনিন্দ্য মূর্তির উজ্জ্বল মুখে একুশের তারুণ্য, বিস্ময় ও বিদ্রোহ—সুকান্তর এই অতি-চেনা ছবিটির বয়স কখনো যে বাড়বে না, বোঝা গেল সেদিন, ১৬ আগস্ট, গর্কি সদনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে সুকান্তর অর্ধশত জন্মানুষ্ঠান পালিত হল। প্রশস্ত মঞ্চের এক পাশে রাখা ছিল সুকান্তর ওই প্রতিকৃতিটি। পঞ্চাশের প্রৌঢ় মালিন্যের চিহ্ন এক মুহূর্তের জন্যও সুকান্তকে যেন স্পর্শ করল না।

উদ্বোধনী ভাষণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, "সরকারী উদ্যোগে এ-রাজ্যে কবি সুকান্ত নিয়ে অনুষ্ঠান এই প্রথম।" তাঁর ভাষণেই অন্যত্র ছিল—"ইতিপূর্বে আমরা 'সুকান্ত মূল্যায়ন' অনুষ্ঠান করেছি।" সেই মূল্যায়নের প্রবন্ধাবলী (আনুষ্ঠানিকভাবে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল সেদিন।

'সুকান্ত মূল্যায়ন' ও 'সুকান্ত জন্মানুষ্ঠানের আনন্দ-বাসর' যে এক গোত্রের নয় আরেকটু স্পষ্ট হল সভাপতি অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কর্মতৎপরতায়। সুকান্তর কবিতার পরিচয় ও বিশ্লেষণ নিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা যাতে আনন্দ-সন্ধ্যার অন্য অনুষ্ঠানগুলিকে বিলম্বিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক বক্তাকে মাত্রই দশ মিনিট কাল সময় দিলেন তিনি। ফলে, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের আবেগ-উজ্জীবিত ভাষণ, ডঃ অরুণ বসুর দৃপ্ত সুকান্ত-বিশ্লেষণ এবং অশোক ভট্টাচার্যের তথ্যপূর্ণ পারিবারিক স্মৃতির ছবি শুরুতেই শেষ হয়ে গেল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিলম্বিত হল না ঠিকই, কিন্তু কবি সুকান্তকে ঈষৎ বিড়ম্বিত নিশ্চিত করে তোলা হল।

কেননা, সুকান্ত-র প্রথম ও শেষ পরিচয় কবি রূপেই। তাঁর গান সুরারোপিত কবিতা, নাচ কবিতারই সংগে, জীবনী কবিতা-লেখার ইতিহাসেরই অংশ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাই এক গান তিনবার তিন কণ্ঠে শুনতে হয়েছে।

সুকান্তর কবিতায় সুরারোপ করার প্রথম কৃতিত্ব যাঁর সেই অসামান্য সুরশিল্পী সলিল চৌধুরী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সেদিন। সুকান্তর 'অনুভব ১৯৪০-'৪৬' কবিতায় সুর দেবার করুণ রঙীন স্মৃতি বর্ণনা করলেন তিনি। শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী ও সলিল চৌধুরী দ্বৈত-কণ্ঠে শোনালেন সেই গান—"অবাক পৃথিবী" ও "বিদ্রোহ আজ"। বহুশ্রুত, তবু সুরস্রষ্টার এই নিজস্ব পরিবেশনে সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত হল এই গানে। বিস্ময় ও বিদ্রোহ, অনুভব ও অন্তর্দাহ গানের প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে নতুন ভাবে সঞ্চারিত হল। বর্ষীয়ান নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্যও তাঁর 'রানার' নৃত্যে নতুন করে রোমাঞ্চিত করে তুললেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'অনুভব ১৯৪০-৪৬' এবং ঠিকানা ছাড়াও নতুন একটি গান শোনালেন—'মাথা তোলো তুমি বিন্ধ্যাচল' (ঘুম ভাঙার গান)। প্রদীপ ঘোষের কণ্ঠে সুকান্তর আবৃত্তি ও শ্রীসুনীত বসু রূপায়িত সুকান্তর কবি-জীবনীর অংশ "এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে" (রচনা : ভাস্কর বসু) ছিল সেই সন্ধ্যায় অন্যান্য আকর্ষণের অন্যতম।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

'কিশোর কবি সুকান্ত'/সম্পা চক্রবর্তী, উমানাথ ভট্টাচার্য পরিচালনা : সরোজ বায়

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

ক্রমশ কমে আসছে তাঁর ছবির সংখ্যা। গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে, জড়ো করে আনছেন সংহত বিন্দুতে আলগা, বিশ্লেষণ বিমুখ পর্যাপ্ততা থেকে। যে-কোনো পরিচালকের ছবি আর নয়। কিংবা গোত্রহীন অথচ পরিচিত পরিচালকের ছবিও একেবারে চোখ বুজে ব্যবসায়িক কানামাছির ঝোঁকে হঠাৎ ধরে ফেলতে আর রাজি নন তিনি। যেন, অনেক পথ তো তিনি এলেন প্রতিটি সিঁড়ি মাড়িয়ে মাড়িয়েই। বাকি পথটুকু—একেবারে সেই মেঘ ছুঁই-ছুঁই প্রান্তিক আকাশ পর্যন্ত যা আপাতত আর কোনো টালিগঞ্জীয় মদিরেক্ষণার নাগালের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না—তিনি অতিক্রম করে যাবেন শুধুমাত্র দু-একটি চূড়ান্ত ধাপে পা রেখে, এবং মধ্যবর্তী একাকার অসংখ্যকে তাঁর এত দিনের উপার্জিত মর্যাদায় প্রায় অস্বীকার করে। এই যে তিনি ঠিক করেছেন যে এবার থেকে তিনি শুধু বেছে নেবেন সেই সব ছবি যেগুলো তাঁর রুচিতে অন্তত সহনীয়ভাবে ভালো বলে ঠেকবে, এটা তাঁকে মানায়, এবং তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা তাঁর ক্রমিক বিবর্তন তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে সন্দেহাতীত ভাবে, পৌঁছে দিয়েছে, সেই কক্ষপথে যেখানে তাঁকে একটি একক তারকা বলে চিনে নিতে আমাদের আর ভুল হয় না।

কিন্তু এই দীর্ঘ, ভঙ্গুর পরিক্রমা তো শুধু সঞ্চয়ের, উপার্জনের, আত্মিক-স্ফুরণের ইতিহাস নয়। অনেক চোরাবালির ঘূর্ণিতে তাঁর হাজার পথভ্রষ্ট প্রতিশ্রুতি তলিয়ে গেছে, প্রতিভার অনেক ফুল, অনেক পাতা নকল ডালে আটকে আছে, আর মাঝে মাঝে যেন তাঁর মনে হয় নিজেকে ঠিক এতটাই বিচারহীন অপর্যাপ্ততায় ছড়িয়ে দেবার সত্যিই হয়তো কোনো প্রয়োজন 'ছল না। 'সমাপ্তি' থেকে 'অসময়'—এই দীর্ঘ এলোমেলো উপত্যকা পেরিয়ে আসার পর ঠিক এমনি-ই আমাদের আজকের সাম্প্রতিকতম অপর্ণা সেন কিছুটা ক্লান্ত তিনি, আর প্রতিভার অপচয়ে একান্ত বিমুখ, তিনি হাতের সব তাস গুছিয়ে তুলেছেন, নিজস্ব গভীর আয়নায় বুঝে নিয়েছেন নিজেকে আর জেনেছেন যে বাকি পথটুকু পেরোতে তাঁর পক্ষে সব মাটি মাড়িয়ে যাবার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

তবু অপর্ণা সেন সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু আর বিষয়ে সবচেয়ে প্রথম কথাটি হল, টালিগঞ্জে আজ তাঁর কোনো বিকল্প নেই। নেই, কেননা অপর্ণার ইমেজের মধ্যে যেটা তথ

একান্ত নিজস্ব ক্যারিসমা বা চারিত্রিক রামধনু—অনুরণন, সেটা সম্ভব হয়েছে সেকস-আপীল-এর সঙ্গে রোম্যানটিক শান্তায়নের (সাবলিমেশন), সৌন্দর্যের সঙ্গে শহুরে মার্জনার (সফিসটিকেশন) আর প্রতিভার সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের বিরল মিশ্রণে তাঁকে দেখামাত্র তাঁর দ্বারা আমরা সংক্রামিত হই, তিনি যে-চরিত্রেই অভিনয় করুন আর অভিনয় তাঁর যে-রকম-ই হক, তাঁর আবেদন আমাদের সংবেদনায় বীজাণুর মত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই গভীরস্পর্শী সেকস-অ্যাপীল কখনো আমাদের অবচেতন থেকে তুলে আনে না কোনো বিকৃত স্বপ্ন। কখনো এই আবেদনের অভিঘাতে আমরা চ্যুত হই না আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্য থেকে। এবং এর কারণ তাঁর সৌন্দর্যের ওপর আঁচলের মত ছড়িয়ে থাকে এক পেলব রোম্যানটিক, অথবা অ-প্রাত্যহিক সংরাগ। শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের পর অপর্ণা সেনের মতো আর কাউকেই আমাদের পরিচিত দৈনন্দিন স্থূলতা থেকে সুদূরে বলেই সুন্দর বলে মনে হয়নি।

যে-জরুরী প্রশ্নটিতে আসা মাত্র অপর্ণার আবেদনের সবচেয়ে তীব্রতম দিকটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, তা হল, ভালো অভিনয়ে বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন আছে কি না, আর থাকলেও ঠিক কতোটা? ভালো অভিনয় বলতে আমি অন্তত বুঝি 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি' অর্থাৎ নিজেকে অস্বীকার বা নেগেশান-এর মধ্যে দিয়ে অন্য কিছু হয়ে ওঠার ক্ষমতা, যার জন্যে প্রয়োজন স্পর্শকাতরতা, এবং কল্পনার পরিব্যাপ্তি এবং সেটা সম্ভব নয় উপলব্ধি, মনন, পরিশীলন, মার্জনা ছাড়া। অর্থাৎ ইনটেলেকশন ছাড়া অভিনয় সম্ভব না। অন্তত অপর্ণা যে-ধরনের অভিনয় করেন, যাকে আমরা বলতে পারি সচেতনভাবে সিনেমার মাপে অভিনয় করা, বা কনশাস আনডার অ্যাকটিং, সেটা কখনো-ই পুরোপুরি 'ইনসটিংচুয়াল' বা স্বভাবের দ্বারা প্রণোদিত নয়। তার অনেকটাই পঠন, মনন, আর শীলন থেকে উপার্জিত। এবং এইটাই অপর্ণার অভিনয়ে সফিসটিকেশন-এর দিকে। অপর্ণা একটি সফিসটিকেটেড মেয়ে বলতে আমরা যা বুঝবো, তিনি একজন সফিসটিকেটেড অভিনেত্রী বলতেও যদি আমরা তা-ই বুঝি তাহলে আমাদের পক্ষে সেটা নিদারুণ ভুল বোঝা হবে। এবং এই ভুল ধারণায় আজ টালিগঞ্জের অনেক পরিচালকই আক্রান্ত। তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, অপর্ণার অভিনয় সফিসটিকেটেড এই অর্থে যে তা পুরোপুরিভাবে ড্রয়িংরুমের মাপে ছাটা, যেহেতু তাঁর কথাবার্তা, হাঁটা-বসা এবং সর্বোপরি ইংরেজি উচ্চারণের সাবলীলতা

সাম্প্রতিকতম অপর্ণা সেন

অনস্বীকার্য। অন্য অনেকের মধ্যে যা অভিনীত বলে মনে হয়, তা-ই অপর্ণার মধ্যে স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পায়।

কিন্তু তার উল্টো দিকের কথাটাও তো সত্যি—অর্থাৎ 'সমাপ্তি'র মত গ্রামীণ মেয়ের চরিত্রায়ণেও তো অপর্ণা অনেক অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর হিংসে উদ্রেক করার মত স্বাভাবিক! এবং পরে আরো অনেক অনেক চরিত্রে অভিনয় তিনি করেছেন—একেবারে সর্বাদিক থেকে খুলে ছবিতেও তুমুলে অভিনয় করেছেন তিনি—যে-গুলোকে কোনোভাবেই ড্রয়িংরুমের মাপে ছাঁটা অভিনয় বলা যায় না। আর প্রতি বারেই—সে-ছবির মান যাই হোক না কেন—তিনি এতদূর স্বাভাবিক যে তাঁর অ্যাকটিংকে প্রায় 'ব্যবহারিক' বা 'বিহেভিয়ারিসটিক' বলা যায়। আর আমি বলবো, এইটেই তাঁর অভিনয়ের সফিসটিকেশন-এর দিক। তাঁর এই স্বাভাবিকতা ইনসটিংটিভ নয়—আর নয় বলেই তাঁর ওপর পরিচালকেরা এমনি নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন। অপর্ণা যে-ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করুন না কেন, তাঁর সেই চরিত্রের প্রতি রেসপনসটা মূলত ইনটেলেকচুয়াল। তিনি, এক কথায়, তলিয়ে দেখেন, বুঝে নেন, মেপে তোলেন!

প্রথমত, অপর্ণা সেই বিরল অভিনেত্রী-দের একজন যিনি স্টেজ ও স্ক্রীন অভিনয়ের তফাতটা খুব নিশ্চিতভাবে বোঝেন। দ্বিতীয়ত, কোনো চরিত্রে অভিনয় করার আগে তিনি খুব স্পষ্টভাবে ধারণা করে নিতে চান ঠিক কতটা সেই চরিত্রটি বিভিন্ন অবস্থা বা সিচুয়েশন-এ দাবি করছে এবং তৃতীয়ত, সিনেমার মাপে আনতে গেলে সেই অভিনয়ের সুর ঠিক কোন চাবিতে বাঁধতে হবে।

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা হল,

অপর্ণার অভিনয়ের রেঞ্জ অনেক দূরের ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। নানা ধরনের চরিত্রে তিনি এ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন, এবং প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি—বিশ্বাস্য। গ্রামীণ সারল্য থেকে, সোসাইটি গার্ল-এর নাক-উঁচু মেজাজ পর্যন্ত সব কটি তারেই তাঁর অভিনয়ে সুর আসে। আমার সবচেয়ে যেটা ভাল লাগে তা হল তাঁর টাইম আর স্পেসিং বিষয়ে জ্ঞান, যার ফলে ক্যামেরার সামনে তাঁর অভিনয় কখনো ঠোক্কর খায় না এবং কখনো তাঁর অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয় না অসময়ে ছেদ বা যতি পড়লো। আর একটা জরুরী কথা এই যে, অপর্ণা তাঁর মুখের ওপর ক্লোজআপ ধরে রাখতে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই চূড়ান্তভাবে সফল। ক্যামেরার অত কাছাকাছি অপর্ণার মত অতো সুঠাম অভিনয় খুব কম অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু অপর্ণার প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন হল, অপর্ণার সব চেক ভাঙিয়ে দেবার পক্ষে টালিগঞ্জের তহবিল কি বড় বেশি দুর্বল নয়?

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

সলিউশন এক্স এবং .../প্রয়াসী

যদি কোনদিন সান্ধ্য-অভিনয় শেষে আপনি কোন গৃহাভিমুখী চিন্তামগ্ন অন্যমনস্ক দর্শককে দেখেন যিনি বহু চেষ্টায়ও সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে পারছেন না, আঙুল কাঁপার জন্য—খোঁজ নিয়ে দেখুন তিনি হয়ত এবং ইন্দ্রজিৎ, কিংবা বাকি ইতিহাস অথবা স্পার্টাকুসের কোন সার্থক প্রযোজনা দেখে ফিরছেন। আবার অন্যদিন আপনার এমন অভিজ্ঞতাও হতে পারে, যখন ঘর-ফিরতি কোন মহিলা দর্শক হাসির দমক কিছুতেই আটকাতে পারছেন না, যে পোশাকী হাসি তিনি সযত্নে সব সময় ধরে রাখেন, সেই হাসি এখন প্রবল উচ্ছ্বাসে মুখবিকৃতি করে বেরিয়ে আসছে, বেশবাস আলুথালু—ওদিকে নজর দেবেন না, ও'র কোন দোষ নেই, উনি হয়ত বল্লভপুরের রূপকথা, না-হয় কবিকাহিনী, অথবা সলিউশন এক্স দেখে এইমাত্র বেরোলেন। বাংলা নাটকে ইদানীংকালে যিনি দর্শককে নির্লিপ্ত থাকতে দেন না, হঠাৎ 'চন্ডালিকা'র মা-এর মত দর্শকের সামনে 'মায়াদর্পণ' তুলে ধরেন এবং দর্শক নিজের গভীরে ডুব দিয়ে বেদনায় বিমূঢ় হয়ে স্বগতোক্তি করে 'আমি দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ', আবার একই সঙ্গে যিনি দর্শকদের 'রাম-গরুড়ের ছানা' হতে দিতে নারাজ—সেই একক ব্যক্তিত্বের নাম, বাদল সরকার। হাসি মানে যে ভাঁড়ামী নয়, ব্যঙ্গ মানে শুধু খোঁচা নয়, রঙ্গ মানেই যে খিস্তি খেউড় নয়, কমিক অ্যাকশন, মানে যে ডিগবাজি খাওয়া নয়, আতিশয্য মানেই যে নির্বুদ্ধিতার অন্য সংস্করণ নয়, আবার বুদ্ধিদীপ্ত হাসি মানেই যে ইনটেলেক-চুয়াল দেঁতো হাসি নয়, এসব কথা বাদল সরকার বারবার প্রমাণ করেছেন। এবং প্রয়াসী তাঁর চিন্তার সার্থক রূপকার।

সলিউশন এক্স নাটকটি নতুন নয়। প্রয়াসী সংস্থা আকাদমী মঞ্চে এই নাটকের সার্থক প্রযোজনা করে স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবেন (প রি চা ল না—শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য) কোনরকম আতিশয্য-আক্রান্ত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অভিনয়েই দর্শক উচ্ছ্বসিত। হাসির কথা বলতে গেলেই অনেকে জনপ্রিয় অভিনেতার নকল করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে 'গিমিক' একটা বড় জায়গা দখল করে, আবার কণ্ঠস্বর বিকৃত করে অকারণ কুৎসিত যথেচ্ছাচারের উদাহরণও কম নয়। 'প্রয়াসী' সংস্থা এর কোনটিরই সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিক অভিনয় (যেটা আরও শক্ত) দিয়েই নাটকের মঞ্চ-সফলতার একটি উদাহরণ দিলেন। এ নাটকের টিম-ওয়ার্ক অত্যন্ত জোরালো। তবু আলাদাভাবে বিক্রম সেন ও নীলা সেনের নাম বলতেই হয়। বিশেষতঃ নীলা সেন, বিভিন্ন মুহূর্তের অভিব্যক্তি, স্বাভাবিক অথচ স্বরক্ষেপণের সূক্ষ্ম কারুকার্য কোন সময়েই অবহেলিত হতে দেননি। সাম্প্রতিককালে এই অভিনেত্রী তাঁর নিজগুণেই চিহ্নিত হওয়ার অধিকার রাখেন। আর অবাক করে দেয় শিশু-শিল্পী আত্রেয়ী সেন। শিশুদের পিঠ-চাপড়ানোর স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে এ প্রশস্তি নয়, বরঞ্চ অবাক হয়েছি ভেবে, এই ছেলেমানুষ কখনই 'ছেলেমানুষী' করল না দেখে?

মূল নাটকের আগে আর একটি ছোট একাঙ্ক অভিনীত হয়, 'প্রজ্ঞাময়বাবু বিবেকবান' (নাটক—স্বপ্না সেন)। নাটকটি বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীতিকথা হয়েই থাকল, এর জন্য শেষের বিরাট ছড়া অনেকাংশে দায়ী। অভিনেতাদের প্রস্তুতিও সবসময় সুসম নয়। দুটি নাটকের মঞ্চ সজ্জা বেশ ভাল, বিশেষত প্রথম নাটকের প্রতীকি মঞ্চ (মঞ্চ—সমীর ঘোষাল) বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আলোর কাজ নাটকে বাঞ্ছিত আনে (আলো—পিন্টু বসু)। প্রথম নাটকে একটানা আবহ বিরক্তিকর। দ্বিতীয় নাটকের আবহ সুনির্বাচিত।

প্রয়াসী সংস্থার হাসির নাটকে খুব সুনাম আছে। গ্রুপ থিয়েটারের লক্ষ্য প্রতিভার প্রসার ঘটানো, শুধু একই ধরনের নাটক করলে উদ্দেশ্য বিচ্যুতি ঘটে। আবার প্রাথমিক সূচনায় ফিরে আসি—যদি কোন পদচারী অভিনয় শেষে অপসৃয়মান উচ্ছ্বসিত দর্শকের হাসি দেখে মন্তব্য করে, 'বোধ হয় প্রয়াসীর নাটক ছিল', তবে 'প্রয়াসী'র প্রয়াস সম্পর্কে শঙ্কা থেকেই যায়।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু ভট্টাচার্য কর্তৃক
...

টেলিফোন
২৩-২২৪৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়, সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২০·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লন্ডন অফিস মারফৎ	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬০·০০ টাকা

(লন্ডন পর্যন্ত বিমানে)

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

জঙ্গলে জলাশয়ের ধারে
কী খুড়ো দেখলে?
তাই তো!

মস্ত মূর্তি! পাথরের! কে বানাল?
?
?

এত বড় মূর্তি কে বানাল? এখানে ফেলে রেখেই বা গেল কেন?
?
??

এসো ও!
এগোচ্ছি...!
আরে, এ যে জ্যান্ত!
1/25

সাইজ দেখছি বড্ড বড়!
রঙটাও ঠিক হয়নি। কারিগর, নকল বানাতে ভুল হল কেন?

ওরে বাবা, তেড়ে আসছে!
!!

মহাকাশ থেকে ব্যাপারটা দেখা হচ্ছে...
পালাচ্ছে! ভয় পেয়েছে, না লোক ডাকতে যাচ্ছে? সাইজ ও রঙ পালটাও...

এখন আর পাল্টাবার সময় নেই। বরং এগিয়ে যাও...
এগোচ্ছি...
ক্রমশ : নীলদৈত্য

কত শত রঙ
কত শত ডিজাইন
অপূর্ব মদুরার কাপড়
এ পর্যন্ত কোথাও কেউ এত রকমের কাপড় দিতে পারে নি।
নীল, সবুজ, ধূসর, কালো আর বীজ - ২৬০টি আভায় আর ডিজাইনে, পলিয়েস্টার আর পলিয়েস্টার ব্লেন্ডে কাপড়ের অপূর্ব সম্ভার।
মদুরার কাপড় - তৈরী করেন
মদুরা কোট্‌স
MCL-173 BEN

সূচীপত্র

নতুন সমস্যার মোকাবিলা আমাদের তরুণ রাখে
টাটা স্টীল

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : সুকুমার দেউস্কর

প্রচ্ছদ পরিচিতি : শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার নতুন রহস্য অ্যাডভেন্চার

জয় বাবা ফেলুনাথ

দাম ৬.০০

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর মাথায় নতুন গল্পের প্লট আসছিল না কিছুতেই; ফেলুদাও ঠায় বসে তিন মাস—কোনও কেস আসছিল না তার হাতে। এমন সময় খবরের কাগজে দেখা গেল মছলি-বাবা নামে এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী সাধু প্রয়াগ থেকে গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছেন কাশীতে। খবরটায় কিরকম একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে তোপ্‌সেকে সঙ্গে নিয়ে জটায়ু আর ফেলুদা কাশীতে গিয়ে হাজির হলো। বলা বাহুল্য, একজন গল্পের প্লটের সন্ধানে, অন্যজন কেসের। দুজনেই তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়েছিল। শুধু পায়নি—প্রায় প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছিল। ফেলুদার জীবনে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল সে এখানেই। ফেলুদার কথায়—'এইরকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপ্‌সে। এসব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা টনিকের কাজ দেয়।' যে সফল অ্যাডভেন্চার ফেলুদার মত লোকের কাছেও টনিকের কাজ দেয়, তার শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজক কাহিনী পাঠকদের কাছেও সুনিশ্চিত টনিকের কাজ দেবে।

প্রকাশিত হল

গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস

গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে

দুজনে ৪.০০

সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী

প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা-কাহিনী

যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

মতি নন্দীর ক্রীড়াভিত্তিক উপন্যাস

ননীদা নট আউট ৪.০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর ছড়ার বই

ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

বুদ্ধদেব বসুর নাট্যগ্রন্থ | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

কলকাতার ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ ৬.০০

সাগরময় ঘোষের চরিতকথা

একটি পেরেকের কাহিনী ৪.০০

বরুণ সেনগুপ্তের নেতাজী-প্রসঙ্গ

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ৭.০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধগ্রন্থ

প্রবন্ধ-সংগ্রহ ৫.০০

শিশিরকুমার বসুর নেতাজী-কথা

মহানিষ্ক্রমণ ৮.০০

শৈলেন ঘোষের রূপকথার গল্প | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

ছপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটদের ভূতের গল্প

পাঁচ মুণ্ডীর আসর

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯
ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪৭ সংখ্যা
শনিবার ২ আশ্বিন ১৩৮৩

শরৎ জন্মশতবার্ষিকী

শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত করে দেশবাসী মহান্ এক কথা-শিল্পীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার একটি আনুষ্ঠানিক কৃত্য পালন করছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার কথা-শিল্পের ইতিবৃত্তে বস্তুত একটি নূতন ঐতিহ্যের নাম। সুন্দর সরল ও প্রীতিপ্রবণ মানবতার প্রতি জনহৃদয়ের একটি নতুন আনুগত্যের ঐতিহ্য। বৃহত্তর এই সত্যটি স্মরণ করতে হয় যে, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ রূপে তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিবেদন হয়েও পরোক্ষরূপে সাহিত্যেরই প্রতি শ্রদ্ধা মমতা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। কথিত আছে যে, থীবিস নামক শহরটিকে ধ্বংস করবার সময় আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সাবধান, কবি পিন্ডারের গৃহটিকে ধ্বংস করো না। ইতিহাসখ্যাত এক দিগ্বিজয়ী ও সমর-স্পর্ধী ব্যক্তির এই মনোভাবের মধ্যে এই সত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় যে, সাহিত্যের প্রতি মমতাশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়াই ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রাণের একটি সহজ প্রবৃত্তি। জনচিত্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মমতা ও শ্রদ্ধার সংযোগ না থাকলে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বিচলিত হ'য়ে থাকে। ইতিহাসের বৃত্তান্তে এরকম পরিণামের অনেক ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাই শরৎ জন্মশতবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক উদ্যমের গুরুত্ব স্মরণ করে সেই প্রতিভাধর স্রষ্টার শুভ সাধনা ও কৃতিত্বের গৌরব স্মরণ করতে হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির কী বৈশিষ্ট্যে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের কী উপকার সাধিত হয়েছে; তবে এক কথায় কিংবা সংক্ষেপে তার উত্তর নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। তবু খুব সরল করে ও সংক্ষেপ করে বললে এই স্বীকৃতি সরব হয়ে উঠবে যে, শরৎ-সাহিত্য তাঁর দেশবাসীর অন্তরে ও স্বভাবে মানসিক মমতার একটি দিব্য প্রেরণার সম্বল উপহার দিয়েছে। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের আখ্যান-পট যেন মানুষের প্রতি প্রশস্ত এক মমতার আদর্শিক সুষমায় সুরঞ্জিত। দুঃখ ও দীনতার মধ্যেও মানুষের আন্তরিক সত্তা কত মহৎ ও প্রীতিশীল হতে পারে, কী বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে পারে; তারই সহস্র পরিচয়ে তাঁর সাহিত্যে সমাকীর্ণ। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, ফরাসী দার্শনিক ভিকতর কুজাঁর প্রচারিত ভাগবত সত্যের এই তিন স্বরূপের সবই যেমন মানবীয় জীবনের সাত্ত্বিক পূর্ণতার জন্য দরকার, তেমনই সাহিত্যেরও পক্ষে তিনটি আত্মিক প্রয়োজন। যে সমালোচক যতই কূটবিচার করুক না কেন, সাহিত্যের পক্ষে এই তিন আত্মিক সত্যে সমাশ্রিত হওয়া চাই-ই চাই। সত্যতা সুন্দরতা ও শিবত্ব তথা কল্যাণে গুণান্বিত না হলে সাহিত্যের কোন মহনীয় স্থায়িত্বতা ও সার্থকতা থাকে না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই আত্মিক ত্রিস্বরূপ নানা সুষমায় প্রতিচ্ছবিত হয়েছে। এই সাহিত্য সমাজকে সত্যাশ্রিত হবার সংসাহস ও প্রেরণা দেয়, কল্যাণের উদ্বোধন সম্ভাবিত করে, এবং জীবনের আশা আনন্দ প্রত্যয় ও অভিরুচিকে সুন্দরতায় অভিমণ্ডিত করে।

একথা বলা চলে, যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র বাঙালীর হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর সৃষ্টির উপন্যাসে ও গল্পে বাঙালী-জীবনের পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্টতায় বিমূর্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি বাঙালী-জীবনের ছবির মধ্যে যে হৃদয়বৃত্তির মহত্ত্ব অঙ্কিত করেছেন, সেটা নিতান্ত বাঙালী হৃদয়-বৃত্তি নিশ্চয় নয়। মনস্তত্ত্বের সত্য অনুযায়ী বলতে হয়, সেটা নিখিল মানবেরই হৃদয়বৃত্তি। বাংলার বাইরে অ-বাংলাভাষী বিরাট জনসমাজের শিক্ষিত মহলে শরৎ-সাহিত্য খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক হৃদয়গ্রাহ্যতার ও জনপ্রিয়তার একটি সাংস্কৃতিক আস্পদ। বলা বাহুল্য, তিনি যে প্রীতিধর্মের বাণী শুনিয়েছেন, যে মমতাকে আহ্বান করেছেন, তার কোন জাতিত্ব নেই। তার মধ্যে মানবতারই অভ্যর্থনা উদ্বোধিত হয়েছে।

তাঁর চিন্তার ও কল্পনার, এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিধির মধ্যে যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানুষের প্রতি [illegible] পরিস্ফুর্ত হয়েছে, তেমনই সামাজিক জীবনের মধ্যে আশ্রিত এক-একটি কঠোর অসদাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল ভর্ৎসনা ক্রিয়ান্বিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি কোন প্রগল্ভ উদারতার ও ক্ষমিষ্ণু মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারেননি। তাঁর চিন্তা ও আগ্রহ এক্ষেত্রে অ ঘাতপ্রবণ হতে একটুও কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু লক্ষ্য করতে হয়, এই কর্তব্যেও তাঁর শিল্পিসুলভ নিষ্ঠার কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি। তাঁর সাহিত্য গ্রীসীয় মিউজ দেবিকার মতো সুষ্ঠু অভিরুচির রূপ রক্ষা করে বিদ্রোহ ক্ষোভ প্রতিবাদ এবং ভর্ৎসনাকেও সৌষ্ঠব প্রদান করেছে। শরৎ-সাহিত্যের এই বিশেষ সত্যটি এই বিশেষ কারণে আজ স্মরণ করতে হয় যে, সাহিত্যে রিয়্যালিজম তথা বাস্তবতার রূপ প্রতিচ্ছবিত করবার নাম করে সাহিত্যে এক ধরণের সৌষ্ঠবশূন্যতা, এমন কি কুরূপ আতিশয্যেরও প্রকাশ দেখা যায়। শরৎ-সাহিত্যের প্রভাব বাংলার সাহিত্যকে অভিরুচির বিকার ও উদভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। তিনি 'দরদী কথাশিল্পী' বলে সাধারণ জনমতের দ্বারা বিচারিত ও প্রচারিত একটি সম্মানে বিশেষিত হয়েছেন। সার্থক বিশেষণ।

শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসের অন্তহীন জনপ্রিয়তার মধ্যে জনমানসের একটি সহজ অথচ নিগূঢ় স্বভাবের পরিচয় অবশ্যই আবিষ্কার করা চলে। রম্য সাহিত্যের অঙ্গনে বুদ্ধিময় তাত্ত্বিক বাণীর মুখরতা একটি নিদারুণ কাটাবন হয়ে আনন্দের বাধা সৃষ্টি করে। প্রখর তর্ক এবং পাণ্ডিত্য রম্য সাহিত্যের বক্তব্যের মধ্যে যে বিচার সঞ্চারিত করে, সেটা অত্যুচ্চ মহত্ত্বের সুপারিশ হলেও কথাশিল্পের আন্তরিক আবেদন বিনষ্ট না করে পারে না। লক্ষ্য করতে হয়, শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস এধরনের তাত্ত্বিক আগ্রহ ও বিচারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে লক্ষ জনের অন্তরের একটি সুশ্রীক রম্য বিনোদন সম্ভব করেছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এই সুপরীক্ষিত সত্যের চির-সাক্ষী হয়ে থাকবে যে, পাণ্ডিত্যের অজস্র তর্ক এবং ভণিতা দিয়ে রচিত গল্প ও উপন্যাস যদি-প্রচার এবং প্ররোচনার সাময়িক সুযোগ পেয়ে জ্ঞানানুশীলিত একটি কৃতিত্বের সৃষ্টি বলে সমাদৃতও হয়, তবু রম্য সাহিত্যের নিদর্শন বলে [illegible] স্বীকৃত [illegible]।

মাতৃভাষা ও সাহিত্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি যে সাহিত্যের সকল দিক ও বিভাগ লইয়া প্রকাণ্ড একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিতে পারিব, আমার এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য বা ভরসা নাই। তবে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম এবং প্রকৃতি এই ক্ষুদ্র স্থানে যতটা সম্ভব আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। আমার উদ্দেশ্য বৃহৎ নহে; অতএব যিনি বৃহৎ একটা আশা লইয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িতে বসিবেন, তাঁহার আশার তৃপ্তি সাধন করিতে আমি একান্ত অপারগ।

একটা কথা আমার অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে পড়িতেছে, আমার জীবনে আমি এমন দুই একটি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছি, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলাই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও মাতৃভাষা জানা এবং না-জানার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেন না। যাঁহারা সব কটাই পাস করিয়াছেন এবং সরকারি চাকরিতে হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। অর্থাৎ যেসব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিলে বাঙ্গালী সমাজে মানুষ প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তাঁহারা সেই সব করিয়াছেন। অথচ বাঙ্গলায় একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। অবশ্য না শিখিলে কিছুই [illegible] যায় না—ইহাতেও অত দুঃখের কথা নাই, কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে, তাঁহারা নিজেদের এই অক্ষমতাটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে আহ্লাদ করিয়া বলিতে ভাল বাসিতেন। লজ্জার পরিবর্তে শ্লাঘা বোধ করিতেন অর্থাৎ ভাবটা এই যে, এত ইংরিজি শিখিয়াছি যে, বাঙ্গলায় একখানা চিঠি লিখিবার বিদ্যাটুকু পর্যন্ত আয়ত্ত করিবার সময় পাই নাই। জানি না, এ রকম হাজার টাকার বাঙ্গালী আরো কত আছেন, কিন্তু এটা যদি তাঁহারা জানিতেন যে মাতৃভাষা না শিখিয়াও ঐ অতটা পর্যন্তই পারা যায়, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় না, ঐ চলা-বলা-খাওয়া-টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, আর হয় না, যথার্থই বড় কাজ, যা করিলে মানুষ অমর হয়, যাঁর মৃত্যুতে দেশে হাহাকার উঠে, তেমন বড় কর্মী কিছুতেই হওয়া যায় না, তাহা হইলে নিজেদের ঐ অক্ষমতার পরিচয় দিবার সময় অমন করিয়া হাসিয়া আকুল হইতে পারিতেন না।

তাই আজ আমি এই কথাটাই আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইতে চাই যে, যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না। যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃগৃহদ্বারের ভিতর দিয়াই। বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালী সে যখন সাহেব নয়, তখন বিলাতি ভাষার মস্ত বড় ফাটকের সম্মুখে যুগযুগান্তর দাঁড়াইয়াও কোনদিনই সে পথের সন্ধান পাইবে না।

একথা শুধু ইতিহাসের দিক দিয়াই সত্য নহে, মনোবিজ্ঞান ও ভাষা বিজ্ঞানের দিক দিয়াও সত্য।

কেন যে আজ পর্যন্ত জগতে, মানুষ যত কিছু বড় চিন্তা করিয়া গিয়াছেন সে সমস্তই মাতৃভাষায় বৈষয়িক উন্নতির অবনতির ফলে এক একটা ভাষা সাময়িক প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং সেই ভাষা সর্বতোভাবে আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও কেন যে চিন্তাশীল ভাবুকেরা নামের লোভ ত্যাগ করিয়া নিজেদের অমূল্য চিন্তারাশি মাতৃভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কেন মাতৃভাষা ভিন্ন অপরের ভাষায় বড় চিন্তায় অধিকার জন্মায় না, এই সত্যটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গেলে প্রথমতঃ ভাষা বিজ্ঞানের দুটো মূল কথা মনে করিয়া লওয়া উচিত।

ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি? আছে আমার চৈতন্য এবং তদ্বিষয়ীভূত যাবতীয় পদার্থ। আন্তর্জগৎ এবং বাহ্যজগৎ। উভয়ে কি সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ সত্য কিম্বা অলীক, সে আলাদা কথা। কিন্তু এই যে পরিচয় গ্রহণ, একের উপরে অপরের কার্য, ইহাই মানবের ভাব এবং চিন্তা। এবং এই পদার্থ নিশ্চয়ই মানবের চিন্তার বিষয়। এমনি করিয়াই সমস্ত স্থূল বিশ্ব একে একে মানবের ভাব-রাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। ঘর, বাড়ী, সমাজ, দেশ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এক একটি চিন্তার জন্মদান করিয়া ইহারাই মানবচিত্তে এক একটি ভাব উৎপন্ন করে। অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই বিচিত্র তথ্য ও ঘটনায় ভরিয়া উঠে। উভয় জগতের এই সব তথ্য ও ঘটনা ছাড়া মানুষ ভাবিতেই পারে না। অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই মানবচিত্ত আন্দোলিত হইয়া ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এক কথায় ইহারা ভাব ও ভাবনার কারণও বটে, ইহারা তাহার বিষয়ও বটে।

এইবার মনের মধ্যে পদার্থের পরীক্ষা হইতে থাকে। ভাব ও চিন্তার কাছে তাহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ ধরা পড়ে। ধর্ম ও গুণের হিসাবে নানা লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া বাহ্যজগৎ এইবার ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ ম নির্দিষ্ট হইতে থাকে।

মানবের ভাব ও চিন্তাই যাবতীয় পদার্থে গুণের আরোপ করে। সে কি, আর একটার সহিত তাহার কি প্রভেদ স্থির করিয়া দেয়। তারপর পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া ধর্মবিশিষ্ট করিয়া আমরা তাহাদের ধারণা কার্য সম্পূর্ণ করি।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের মানব চিন্তা প্রণালী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, এই চিন্তা-প্রণালী কয়েকটা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। একই নিয়মে মানবের চিন্তারাশি পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

যেমন বাহ্যজগতে দেখা যায় দুটি বস্তু একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না, অন্তর্জগতেও ঠিক তাই। সেখানেও কোন দুটি বস্তু এক সঙ্গেই চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। সেইজন্যই আমরা কোনমতেই এক সঙ্গে একই আয়াসে দুটি বস্তুর পরিচয় লাভ কিম্বা একটি বস্তুর দুটি গুণ নির্ণয় করিতে পারি না। আমরা বিষয় ভাগ

করিয়া একটি একটি করিয়া লক্ষণ স্থির করি। অর্থাৎ চিন্তার কার্য ক্রমশঃ নিষ্পন্ন হয়। অন্তর্জগতে, মন যেমন দুটি বস্তু বা দুটি গুণ একসঙ্গে গ্রাহ্য করে না, বাহ্যজগতে পদার্থও তেমনি তাহার সবকটা গুণই একই সময়ে মানবচিত্তের কাছে প্রকাশ করে না। যুবতী রমণীর রূপ শিশুচিত্তের কাছে ধরা দেয় না। যে রূপের মূল্য উপলব্ধি করিবার জন্য শিশুচিত্তকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়।

এইজন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ, বয়োবৃদ্ধি ও ধারণা-শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে। এবং তাহার উপর ভাব ও চিন্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু চিন্তা-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সাধারণ নিয়ম এই যে, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিতি চিন্তাস্রোতে গা ভাসান না দিয়া মানবচিত্ত কোন মতেই নূতন ধারণা বা নূতন ভাব আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট পদার্থনিচয় অতীত দিনে যেভাবে চিত্তকে নাড়া দিয়া তাহার গুণ ও ধর্মের কাহিনী জানাইয়া দিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই জ্ঞানের সহিত তুলনা না করিয়া তাহাদিগকে ব্যবহার না করিয়া কোনমতেই মানুষ পদার্থের নূতন লক্ষণ ও ধর্মের পরিচয় পাইতে পারে না।

যেমন করিয়া এবং যে যে উপায়ে শিশুচিত্তে প্রথম চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল, জানিয়া এবং না-জানিয়া যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই তরুণ চিত্ত, ভাব, চিন্তা ও ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে সমস্ত জল হাওয়া ও আলোক পাইয়া তাহার জ্ঞানের অংকুর পল্লবিত হইয়া আজ শাখা-প্রশাখায় বড় হইয়াছে, সেই জল হাওয়া আলোককে বাদ দিয়া আর একটা অভিনব প্রণালীতে মানবচিত্ত কোনমতেই নূতন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্থাৎ যেমন করিয়া সে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল, মরিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সে-পথ ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পুরাতন জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া, কাহারোই নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা জন্মে না।

আরো একটা কথা। ভাব ও চিন্তা যেমন ভাষার জন্ম দান করে ভাষাও তেমনি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত, সুসম্বন্ধ ও শৃংখলিত করে। ভাষা ভিন্ন ভাবা যায় না। একটুখানি অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটা ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করিয়াই চিন্তা করে—যেখানে ভাষা নাই, সেখানে চিন্তাও নাই।

আবার এইমাত্র বলিয়াছি, পুরাতন নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া, পুরাতনের উপর পা না ফেলিয়া নূতনে যাওয়া যায় না—আবার ভাষা ছাড়া সুসম্বন্ধ চিন্তাও হয় না—তাহা হইলে এই দাঁড়ায় বাঙ্গালী বাঙ্গলা ছাড়া চিন্তা করিতে পারে না, ইংরাজ ইংরাজি ছাড়া ভাবিতে পারে না। তাহার পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন যথার্থ চিন্তা যেমন অসম্ভব, বাঙ্গালীর পক্ষেও তেমনি। তা তিনি যত বড় ইংরাজি জানা মানুষই হউন, বাঙ্গলা ভাষা ছাড়া স্বাধীন, মৌলিক বড় চিন্তা কোনমতেই সম্ভব হইবে না।

এসব বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। চলে শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে না।

যে ভাষায় প্রথম মা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা দিয়া প্রথম এটা ওটা সেটা চিনিয়াছি, যে ভাষায় প্রথমে 'কেন' প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছি, সেই ভাষার সাহায্য ভিন্ন ভাবুক, চিন্তাশীল, কর্মী হইবার আশা করা আর পাগলামী করা এক। তাই যে কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি, পর-ভাষায় যত বড় দখলই থাক, তাহাতে ঐ চলা-বলা-খাওয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা, টাকা রোজগার পর্যন্তই হয়, এর বেশী হয় না, হইতে পারে না।

তারপরে সাহিত্য। আমার মনে হয়, সর্বত্র এবং সকল সময়েই ভাষা ও সাহিত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। যেন পদার্থ ও তাহার ছায়া। অবশ্য প্রমাণ করিতে পারি না যে, পশুদের ভাষা আছে বলিয়া তাহদের সাহিত্যও আছে। যাঁহারা 'নাই' বলেন, তাঁহাদের অস্বীকার খণ্ডন করিবার যুক্তি আমার নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, ভাষা আছে, কিন্তু সাহিত্য নাই।

ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মানবের কোন্ অবস্থায় তাহার প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি তাহা বলিবার যো নাই, খুব সম্ভব, যেদিন হইতে তাহার ভাষা, সেইদিন হইতে তাহার সাহিত্য। যেদিন হইতে সে তাহার হত দলপতির বীরত্ব-কাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, যেদিন হইতে প্রণয়ীর মন পাইবার অভিপ্রায়ে সে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই তাহার সাহিত্য।

তাই যদি হয়, কে জোর করিয়া বলিতে পারে পশু-পক্ষীর ভাষা আছে, অথচ সাহিত্য নাই? আমি নিজে অনেক রকমের পাখী পুষিয়াছি, অনেকবার দেখিয়াছি, তাহারা প্রয়োজনের বেশী কথা কহে, গান গাহে। সে কথা, সে গান, আর একটা পাখী মন দিয়া শুনে। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, উভয়েই এমন করিয়া তৃপ্তির আস্বাদ উপভোগ করে, যাহা ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তির অতিরিক্ত আর কিছু। তখন কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ইহাদের ভাষা আছে, গান আছে, কিন্তু সাহিত্য নাই? কথাটা হয়ত হাসির উদ্রেক করিতে পারে, পশু-পক্ষীর সাহিত্য! কিন্তু সেদিন পর্যন্ত কে ভাবিতে পারিয়াছিল, গাছ-পালা সুখ-দুঃখ অনুভব করে? শুধু তাই নয়, সেটা প্রকাশও করে। তেমনি হয়ত, আমার কল্পনাটাও একদিন প্রমাণ হইয়া যাইতেও পারে।

যাক্ ও কথা। আমার বলিবার বিষয় শুধু এই যে, ভাষা থাকিলেই সাহিত্য থাকা সম্ভব; তা সে যাহারই হোক্ এবং যেখানেই হোক। অনুভূতির পরিণতি যেমন ভাব ও চিন্তা ভাষার পরিণতিও তেমনি সাহিত্য। ভাব প্রকাশ করিবার উপায় যেমন ভাষা, চিন্তা প্রকাশ করিবার উপায়ও তেমনি সাহিত্য। জাতির সাহিত্যই শুধু জানাইয়া দিতে সক্ষম সে জাতির চিন্তাধারা কোন্ দিকে, কোথায় এবং কত দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, এমন কি যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান ও চিন্তাও দেশের সাহিত্যই প্রকাশ করে।

একবার বলিয়াছি, ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তাই জগতে যাঁহারা চিন্তাশীল বলিয়া খ্যাত, তা সে চিন্তার যে কোন দিকই হোক, মাতৃভাষায় দেশের সাহিত্যে তাঁহারা ব্যুৎপন্ন একথা বোধ করি অসংশয়ে বলা যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি চোখ ফিরাইলে এই সত্য সহজেই সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা দর্শন বা বিজ্ঞান লইয়াই থাকেন, লোকে তাঁহাদের চিন্তার ঐ দিকটার পরিচয় পায়। কিন্তু দৈবাৎ কোন কারণ-প্রকাশ পাইলে, বৈজ্ঞানিকের

অসাধারণ সাহিত্য ব্যুৎপত্তি দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। বিলাতের হাকসলি, টিনডল, লজ, ওয়ালেস, হেল্‌ম হোজ, হেকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা খুব বড় সাহিত্যিক। আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র কোন খ্যাত সাহিত্যিকের অপেক্ষা ছোট নহেন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকে না, যদি এই কথাটা মনে রাখা যায়, সাহিত্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের সংসার তাঁহাদের পরিচয় পায় না। কারণ, ভাষা সাহিত্যকে অবহেলা করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন চিন্তাশক্তিও অন্তর্ধান করে।

এইবার সাহিত্যের দ্বিতীয় অংশের কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। কিন্তু তাহার পূর্বে এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা কি? তাহা শুধু এই যে, মাতৃভাষা শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। পরের ভাষায় সংসারের সাধারণ মামুলি কর্তব্যই করা যায়, কিন্তু বড় কাজ, বড় কর্তব্যের পথ মায়ের উঠানের উপর দিয়াই—তাহার আর কোন পথ নাই। ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই সত্যই প্রচার করে।

কিন্তু সাহিত্য বলিতে সাধারণতঃ কাব্য ও উপন্যাসই বুঝায়। সে যে নিছক কাল্পনিক বস্তু! এক শ্রেণীর কাজের লোক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যাহা কল্পনা, তাহাই মিথ্যা এবং মিথ্যা কোনদিন কাজে লাগিতে পারে না। সেটা পড়িয়া নিশ্চয়ই জানিয়া রাখা উচিত, বিলাতের রাজা অত নম্বরের হেনরীর কতগুলি ভার্যা ছিল এবং অমুক অমুক সালে তাহাদের অমুক অমুক কারণে, অমুক অমুক দশা ঘটিয়াছিল। কারণ, কথাগুলি সত্য কথা এবং দশাগুলি সত্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু, কি হইবে জানিয়া বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের ভার্যা সূর্যমুখীর কি দশা ঘটিয়াছিল এবং কেন ঘটিয়াছিল? তাহা তো সত্যই ঘটে নাই—লেখক বানাইয়া বলিয়াছেন মাত্র। বানানো কথা পড়িয়া বড় জোর সময়টাই কাটিতে পারে। কিন্তু আর কোন কাজ হইবে? তাঁহাদের মতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই সত্য, কিন্তু, যাহা হয়ত ঘটিলে ঘটিতে পারিত, কিন্তু ঘটে নাই, তাহা মিথ্যা। কিন্তু বস্তুতঃ তাই কি? এইখানে কবির অমর উক্তি উদ্ধৃত করি—

'ঘটে যা তা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

বস্তুতঃ ইহাই সত্য এবং বড়রকমের সত্য। ইংরাজরা যাহাকে A higher kind of Truth বলেন, ইহা তাহাই। সীতা দেবী যথার্থই শ্রীরামচন্দ্রকে অতখানি ভালবাসিয়া ছিলেন কিনা, ঠিক অমনি পতিগতপ্রাণা ছিলেন কিনা, যথার্থই রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে স্বামীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন কিনা, কিম্বা ঐতিহাসিক প্রমাণে তাঁহাদের বাস্তব সত্তা কিছু ছিল কি না, ইহাও তত বড় সত্য নয়, যত বড় সত্য কবির মনোভূমিতে জন্মিয়া রামায়ণের শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানকী দেবী হউন, মানবী হউন, সত্য হউন, রূপক হউন; অত গভীর পতিপ্রেম তাঁহাতে সম্ভব অসম্ভব যাহাই হৌক, কিছুমাত্র আসে যায় না, যখন ঐ গভীর দাম্পত্য প্রেমের ছবি কবির হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারিয়াছে এবং যুগ-যুগান্তর নরনারীকে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমে দীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। ইহাই সত্য। সত্যকার অযোধ্যা, সত্যকার রাম সীতা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সত্য, কিন্তু কবির কল্পনায় যে রাম-সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হয়ত তাহা আজ পর্যন্ত কোটি কোটি রামসীতাতে সত্য হইয়াছে।

সেদিন স্নেহলতার আত্মবিসর্জন কাহিনী, সম্বাদপত্রে পড়িয়াই মনে হইয়াছিল ঠিক এমনি করুণ, এমনি স্বার্থ-ত্যাগের চিত্র কিছুদিন পূর্বে গল্প সাহিত্যে পড়িয়াছিলাম। সে মেয়েটিও দরিদ্র পিতাকে দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহারও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতেছিল এবং পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না।

সম্বাদপত্রের কাহিনী ঐ একটি স্নেহলতাতেই সত্য কিন্তু কবির কল্পনায় যে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহা হয়ত শত সহস্রে সত্য।

স্নেহলতা শিক্ষিতা ছিলেন, কে জানে তিনি কাহিনী পড়িয়াছিলেন কিনা এবং স্বার্থ ত্যাগ মন্ত্র ইহাতেই পাইয়া-ছিলেন কিনা!

আমার বিশ্বাস কিন্তু এই। আমার নিশ্চয় মনে হয়, তিনি লেখাপড়া না জানিলে, সাহিত্যচর্চা না করিয়া থাকিলে কিছুতেই এ শক্তি, এ বল নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। কবির কল্পনা এমনি করিয়াই সত্য হয়, কবির কল্পনা এমনি করিয়াই কাজ করে।

দেশের কল্পনা, দেশের সাহিত্য, দেশের ইতিহাস বড় হউক, জীবন্ত হউক, সত্য হউক, সুন্দর হউক, এই প্রার্থনাই আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক সুসন্তান অকপটে মাতৃভাষার সেবা করুন, এইটুকু মাত্র ভিক্ষা আপনাদের কাছে সবিনয়ে করিতেছি। কিন্তু কি করিলে সাহিত্য ঠিক অমনটি হইবে, সে পরামর্শ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, যাহা সত্য বলিয়া মনে হইবে অন্তরের সহিত যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝিবেন, নিজের সাধ্যমত সেই পথ ধরিয়াই চলিবেন—তারপরে ফল ভবিষ্যতের হাতে।

যাঁহারা বড় সাহিত্যিক, বড় সমালোচক, তাঁহারা পরামর্শ দিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, ইংরাজি ভাব, ইংরাজি ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া খাঁটি স্বদেশী হইতে। আমি নিজেও একজন অতি ক্ষুদ্র নগণ্য সাহিত্য সেবক, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদের পরামর্শ, তাঁহাদের উপদেশ যে ঠিক কি, তাহা এখন পর্যন্ত বুঝি নাই।

কে কোথায় হ্রস্ব ই-কার স্থানে ঈ দিয়াছেন, কে কোথায় 'অ'কারের পরিবর্তে ও-কার ব্যবহার করিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছেন, কে কোথায় কোন বিধবা বঙ্গনারীকে দিয়া এক মুমূর্ষু হতভাগ্য পরপুরুষের মুখে জল দিয়া সাহিত্যে বিষম কুরুচি টানিয়া আনিয়াছেন, এই সব লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহা তোলপাড় হইতেছে, কেন হইতেছে, যথার্থ কি তাতে দোষ, কি হইলে ঠিকটি হইত, এ সব খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে মতামত দিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কিছুই আমার নাই।

কোন সাহিত্য সেবককেই আমি উপদেশ দিতে পারি না, এই কর কিম্বা এই করা উচিত। শুধু এইটুকু বলি; হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্য সেবা করুন, যেন আপনার সেবা মাতৃভাষার দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তখন কি উচিত, কি উচিত নয়, তাহা দেশের হৃদয় ও প্রাণই বলিয়া দিবেন।
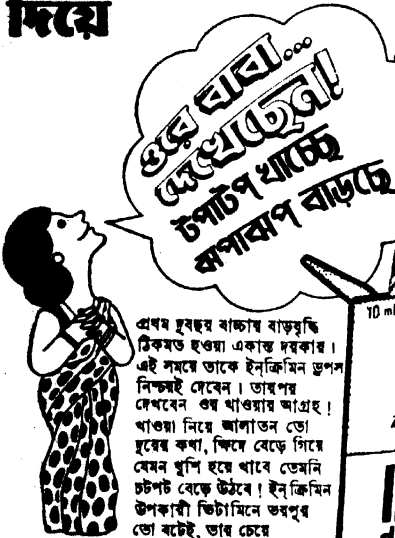
বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইন্‌ক্রিমিন* দিয়ে
ওরে বাবা... দেখেছেন! টপাটপ খাচ্ছে ঝপাঝপ বাড়ছে
প্রথম দুবছর বাচ্চার বাড়বৃদ্ধি ঠিকমত হওয়া একান্ত দরকার। এই সময়ে তাকে ইন্‌ক্রিমিন ড্রপস নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে! ইন্‌ক্রিমিন উপকারী ভিটামিনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে
বড়কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
10 ml
Incremin
drops LYSINE·VITAMINS
TONIC APPETITE STIMULANT
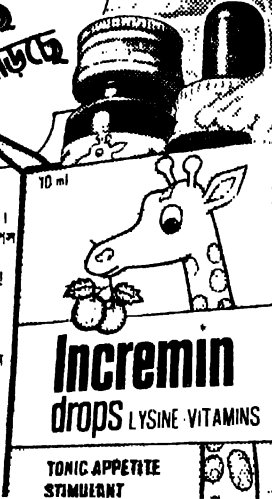
রেঙ্গুনে অবস্থান কালে ১৯০৯ টাব্দে শরৎচন্দ্রের একবার হৃদরোগের প্রকাশ পায়। তখন তিনি রেঙ্গুনের ড ফ্রি লাইব্রেরীতে যে গভীরভাবে নো করতেন, তা বন্ধ করে অয়েল টং ধরেছিলেন। এই ছবি আঁকার ই তিনি তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিও ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু যোগেন্দ্র-সরকার তাঁর 'ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র' লিখেছেন—এক রবিবারে তিনি শরৎ-র বাড়িতে তাঁর ছবি আঁকা দেখতে গিয়ে চন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের পাণ্ডু-ও দেখেছিলেন এবং সেই পাণ্ডুলিপির অংশ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্য চর্চাও করেন, যোগেনবাবু এই জানতে পারেন।

যোগেনবাবু তাঁর বইয়ে লিখেছেন—নের 'বেঙ্গল সোসাল ক্লাবের' কয়েক-সদস্য ঐ ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে ক ভাবে 'বেঙ্গল ক্লাবের' প্রতিষ্ঠা করে-ন। তাতে তাঁদের সাহিত্য চর্চার পক্ষে ষ সুবিধা হয়েছিল।

যোগেনবাবু তাঁদের ক্লাবের সাহিত্য য় একটা প্রবন্ধ লিখে পড়বার জন্য চন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করেন। শরৎ-কিন্তু সে কথায় কান দিতেন না। তবে কখন বলতেন—আচ্ছা, পড়বার মত া হলে, তখন পড়ব।

তিনি মাঝে মাঝে যোগেনবাবুদের হিত্য সভায় যোগ দিতেন বটে, কিন্তু া না পড়ে কেবল গান গেয়ে ও গল্প চলে আসতেন।

যোগেনবাবু লিখেছেন—'হঠাৎ এখান-বেঙ্গল ক্লাবে একটি জাঁকালো গোছের হইল। শরৎচন্দ্র সভাপতি হইবেন, লেই খুব উৎসাহিত। 'ভাষার জয়' ও সংগীত' নামক দুইটি গান এই লক্ষে রচিত হইল। পূর্বটি আমার, বর্তীটি কাহার তাহা বলিতে পারি না। বেণীমাধব গাঙ্গুলীর উৎসাহে গান টি এবং তৎসহ প্রোগ্রামও ছাপান হইল। নকার অপর একজন সাহিত্যরসিক র্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন। নকে অনেক প্রবন্ধ পড়িলেন। সেই য়ই কুমুদিনীকান্ত কর একটি রচনা ন। আমি প্রতাপাদিত্য নামক একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। সে সভায় চন্দ্রের অভিভাষণটি ভালই হইয়াছিল।'

যোগেনবাবুদের বেঙ্গল ক্লাবের এই কালো গোছের সভাটি হয়েছিল ১৯১৪ ষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ। সভার গে সভায় ছাপানো প্রোগ্রামে 'ভাষার জয়' টি দেখেই শরৎচন্দ্র সভায় পড়বার জন্য ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

পরে তিনি তাঁর এই অভিভাষণ বা প্রবন্ধটিকে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশনের জন্য রেঙ্গুন থেকে যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফণি-বাবু প্রবন্ধটি পেয়ে ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসের যমুনায় প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সময় যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিও ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল বলে, শরৎচন্দ্র প্রবন্ধটি তাঁর দিদি অনিলা দেবীর নামে ছাপবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র 'যমুনায়' তাঁর প্রবন্ধগুলি সাধারণত অনিলা দেবী এই ছদ্মনামেই প্রকাশ করতেন।

শরৎচন্দ্রের এই 'মাতৃভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি এ পর্যন্ত তাঁর কোনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এমন কি কোন শরৎ-গবেষকও শরৎ-চন্দ্রের এই প্রবন্ধটির নাম পর্যন্ত কোথাও করেন নি। সকলের অজ্ঞাত শরৎচন্দ্রের সেই প্রবন্ধটিই এখানে দিলাম।—গোপালচন্দ্র রায়]

উৎকৃষ্টতাই
সৌন্দর্য্য
অরবিন্দ যে ১০০% পলিএস্টার
শাড়ী* তৈরী করে, তা যেন
সৌন্দর্য্যের প্রতীক।
কেউ কেউ মনে করেন, শুধু দেখতে
সুন্দর হলেই সেটি উৎকৃষ্ট।
আমরা মনে করি, মোলায়েম
ও মীহি বুননীর এমন সৃষ্টি
হবে যাতে প্রতিটি শাড়ীই
হবে একটি শিল্প।
* পদ্মিনী ও পদ্মাবতী
অরবিন্দ মিলস
অরবিন্দের উৎকৃষ্টতা চিরদিন অম্লান থাকে।
অরবিন্দ
খুচরা দোকান: চণ্ডুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঁকীপুর, পাটনা-৪
enterpub/AM/4/76 Ben
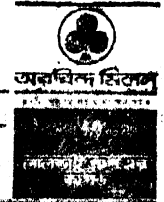
নমঃ শরৎচন্দ্রায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১৯২০ সালে কেম্ব্রিজে রোমাঁ রোলাঁর বিশ্ববিশ্রুত "জাঁ ক্রিস্তফ" উপন্যাসটি পড়ে আমি এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে, ঝোঁকের মাথায় তাঁকে একটি চিঠি লিখি তাঁর দর্শন চেয়ে। লিখবার সময়ে সত্যিই এমন দুরাশাকে মনে ঠাঁই দিইনি যে, এহেন জগদ্বিখ্যাত মনীষী মাদৃশ এক অখ্যাত-নামা যুবকের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু জগতে অঘটন আজো ঘটে বলেই হয়ত তিনি সাদরে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন সুইজর্লণ্ডে। আমি মহোল্লাসে সুইজর্লণ্ডে গিয়ে তাঁকে খুশি করি রাগসংগীত ও পিতৃদেবের নানা গান শুনিয়ে—যে-বিবৃতি পরে আমার তীর্থংকর ও AMONG THE GREAT-এ ছাপা হয়।

অতঃপর তাঁর স্নেহাশিস পেয়ে তাঁকে আমি বড় বড় চিঠি লিখতাম ফরাসী ভাষায় লিখবার আনন্দে তথা তাঁর কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার প্রফুল্ল প্রত্যাশায়। তিনি প্রতি চিঠিটির উত্তর দিতেন। আমি অবাক হতাম বই কি, কিন্তু কৃতজ্ঞ বোধ করতাম ঢের বেশি। তাছাড়া জীবনসমস্যার নানা গ্রন্থিমোচন ও দুর্ভাবনার নিরসন চাইতাম বলেও তাঁর মতন মহামনীষীর শরণাপন্ন হতাম সাগ্রহে। আমি একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র ও সুভাষ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম :

"য়ুরোপে বাস্তববাদীরা (realist) দেখি গড়পড়তাদের নিয়েই বেশি মাতামাতি করেন, মহাজনদের তেমন আমল দেন না মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কবি শিল্পী মনীষীদের ব্যক্তিরূপেই কি প্রতি জাতির অন্তর স্বরূপের দীপ্তিদিশা দেয় না?"

উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন পিঠপিঠ (Villa Olga 29.11.22) :

Cher ami,

Votre bonne lettre de Naples m'a vivement touches... Vous avez raison de juger chaque race par ses meilleurs types. Un heros de Corneille disait : "Rome n'est plus dans Rome; elle est ou je suis".

Les types superieures de chaque ace l'incarnent non pas dans son actualite passagere, mais dans ses profondeurs millenaires ....Il's representent les forces virtuelles les grandioses possibilits qui sont au fond de leur peuple.

(ভাব) : নেপল্‌স-থেকে-লেখা তোমার সুন্দর চিঠিটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি ঠিকই ধরেছ : প্রতি জাতির মূল্যায়ন করতে হয় তার মহাজনদের চরিত্রের নিরিখেই। কর্ণেই-এর এক নায়ক বলেছিলেন :

"রোমকে রোমে খুঁজে পাবে না, পাবে যেখানে আমি বিরাজ করি।"

প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ফুটে ওঠে তার মহামানবদের জীবনেই বটে—তবে ঠিক বর্তমানের ক্ষণজীয়মান পটভূমিকায় নয়—যুগযুগান্তরের গভীর অন্তর্লোকে। এই মহামানবরাই ফুটিয়ে তোলেন প্রতি জাতির নিগূঢ় শক্তিদের, মহান্ সম্ভাবনাদের—যারা সুগুপ্ত আছে প্রতি জাতির অন্তঃসত্ত্বায়।

উত্তরে আমি তাঁকে আরো ফলিয়ে লিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের কথা—বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের।

"বিশেষ করে" বলছি কেন? কারণ শরৎচন্দ্র এক হিসেবে ছিলেন অনন্য—ইউনিক। অবশ্য প্রতি মানুষই অনন্য—এমনকি একটি বালুকণারও যমজ মেলে না—দুটি পরমাণুর অতিসাদৃশ্যের মধ্যেও প্রতিটির অদ্বিতীয়তা থাকবেই থাকবে। তবু বলা চলে শরৎচন্দ্র যেকথা আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন :

"প্রায়ই শুনি মানুষকে গড়ে তোলে তার বংশ কুলাচার—হেরেডিটি—আর তার পরিবেশ। কিন্তু আমার জীবনের প্রতি পদে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। আমি না পেয়েছি স্কুলকলেজের শিক্ষা, না ভদ্রতার দীক্ষা না সভাভব্যদের সঙ্গ। আমার সহচারী ছিল রাজ্যের বাউণ্ডুলে, বাপে-খেদানো-মায়ে-তাড়ানো ডানপিটে, মাতাল, দুর্বৃত্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আজও জেলে, কেউ কেউ ঝুলেছে ফাঁসিকাঠে। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে থেকেও তাদের দলে ভিড়োই নি তো: শোনো দু একটি দৃষ্টান্ত দিই আমার বাল্যপরিবেশের।

"আমি তখন গাঁজাখোরদের সঙ্গে জা খাই। বাবা জানতেন না। একদিন জা খেয়ে বেটক্কর হয়ে বাবা বলতেই টির কলসী থেকে তাঁর গেলাসে জল লে দিয়েই কলসীটি রাখলাম তাঁর পাটির উপরে। বাবা আমার দিকে বস্ময়ে চেয়ে আমার চোখ লাল দেখে টি কথাও না বলে উঠে চলে গেলেন খেয়ে। এর পরে আর গাঁজা খাইনি।

"আর একদিন রেঙ্গুনে এক বন্ধুর ানে বসে মদ খাচ্ছি। হঠাৎ বন্ধু শচল। আমি সভয়ে তাকে ঝাঁকি দিয়ে লাম : 'ও কি। ওঠো ওঠো!' আর ঠা!—সে তখন আমাদের নাগালের রে চলে গেছে। অতঃপর মদ আর কখনো খাইনি বলব না, কিন্তু টাল সামলে নিয়েছিলাম একথা বলতে পারি সত্যের অপলাপ না করে।"

আর একটি ঘটনার কথা বলি। গল্পটি তিনি আরো অনেকের কাছেই করেছিলেন, তবে হয়ত কারুর কারুর কাছে কিছুটা রেখে ঢেকেও বলে থাকতে পারেন, জানি না—কেন না তাঁদের কেউ কেউ তাঁর মান রাখতে আখ্যানটির পুনরাবৃত্তি করেন এইভাবে সাজিয়ে যেন এটি শরৎদার চোখে-দেখা অভিজ্ঞতা নয়, কানে-শোনা কাহিনী। কিন্তু আমার কাছে তিনি মুখরুলসা ভণিতার এ-অঘটনটির কথা যেভাবে বলেছিলেন সেইভাবেই বলছি—অবশ্য তাঁর ভাষায় নয়, আমার নিজের ভাষায়। আমার স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য হলেও খুঁটিনাটিতে কিছু কিঞ্চিৎ ভুলচুক থাকা অসম্ভব নয়—তবে মূল বক্তব্যটি যে ষোলো আনা সত্য একথা বলতে পারি হলফ করে।

শরৎদা বললেন: "আমরা সেদিন আমোদ করতে গেছি এক ফুর্তিবাজের বরসা হয়ে, তার নাম—ধরো—প্রমোদ। তার হাতে তখন কয়েক হাজার টাকা জমেছে—জমিদারের টাকা। সে বলল: 'চলো, একটু চুটিয়ে ফুর্তি করে আসা যাক।' দেখি—তার পকেট ফোলা—এক তাল নোট।

"হৈ হৈ করতে করতে গেলাম এক নর্তকীর বাড়ি। বেশ চটকদার মেয়ে—নাচতে গাইতে হাসতে হাসাতে একেবারে চৌখস। রংরাজ ছিলাম আমরা অনেক-গুলি—কাজেই ডাকা হল আরো কয়েকটি নর্তকীকে।

"নাচগান চলছে বারুণীরাগে বাহবার সঙ্গতে। প্রমোদবাবু দেখলাম মদ খেতে যত পটু নেশার টাল সামলাতে তেমন পটু নন। এক একজন মাতাল আছে মদ খেয়ে যাদের পা টললেও মাথা স্বস্থানেই থাকে। প্রমোদবাবু এদের সতীর্থ নন—মদের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই ভালোবাসতেন। ফলে আধ বোতল কাবার হতে না হতে একেবারে দাতা কর্ণ—পকেট থেকে একের পর এক দশ টাকার নোট বার করে ছুঁড়ে ফেলে বকশিশ দেন নর্তকীদের: 'আরো মদ লাও, আওরৎ লাও'—আর থেকে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন উচ্চাঙ্গের হাসি:' 'কেমন? জমেছে কি না? বলি নি? আরে ভাই, এরি তো নাম জীবন, দিলদরিয়া..." ইত্যাদি।

"অনেক রাত পর্যন্ত চলল ফুর্তি-মজলিসের হররা। একে একে প্রমত্তরা ফরাসেই এলিয়ে পড়লেন। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে ছিলাম কিন্তু শেষ রাতে ঢলে পড়লাম।

"সকালবেলা ঘুম ভাঙল প্রমোদবাবুর হাহাকারে। চোখ রগড়ে দেখি—তিনি বুক

চাপড়াচ্ছেন হাহাকারের রোলে "হায় হায়! সব লোপাট গো, সব লোপাট—পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা। কী হবে? এ-টাকা আমার নয়—জমিদারের খাজনা। ভেবেছিলাম দু'তিনশো টাকা এ থেকে সরিয়ে ফুর্তি করে চাঙ্গা হয়ে ফিরব—কিন্তু এবার—হায় হায় চাকরি তো যাবেই—জেলে যেতে হবে"...ইত্যাদি ইত্যাদি হুতুশে কান্না!

"খোঁজ খোঁজ খোঁজ! কোথায় এ-ঘরের ঘরণী? দেখি পাশের ছোট ঘরে সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে—কোমরে শাড়ির আঁচলটা কোমর-বন্ধের মতন দু'তিন পাকে জড়িয়ে।

"তাকে জাগাতে সে চোখ কচলাতে কচলাতে সব শুনল। তারপরে প্রমোদ-বাবুকে বলল: 'আপনার কি মাথা খারাপ বাবু? নৈলে এত টাকা নিয়ে কেউ আসে এসব জায়গায়—যেখানে দশবিশ টাকার জন্যে মেয়েরা ছাড়ে লজ্জাসরম আর গুণ্ডারা করে খুনখারাপি? আমি তো প্রথম থেকেই থ হয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাণ্ড দেখে—সবার সামনে বেপরোয়া হয়ে নোটের পর নোট বার করে ফেলে দিচ্ছেন—এ কী ব্যাপার! দেখি—সবারই চোখ আপনার পকেটের উপরে—কখন আপনি বেসামাল হবেন।

'ভেবেচিন্তে শেষে আমি করলাম কি—আপনি ঘুমে এলিয়ে পড়তে না পড়তে আপনার পকেট থেকে নোটের গোছাটা টুক করে ছিনিয়ে নিয়ে আমার আঁচলে কষে বেঁধে দু'পাক জড়িয়ে কোমরবন্দের মতন করে ঘুরিয়ে পুঁটুলিটা গুঁজে রাখলাম আমার তলপেটের দিকে—যাতে কেউ টানবামাত্র আমার ঘুম ভেঙে যায়। এই নিন আপনার সে-টাকা বাবু—কিন্তু আর কখনো করবেন না এমন বোকামি। ভাবুন তো—আমি যদি সে সময়ে নোটের বাণ্ডিলটা ছোঁ মেরে লুটে না নিতাম তাহলে কী হত। পুলিশ ডাকতেন? কিন্তু পুলিশ কাকে ধরত শুনি এক ঘর লোকের মধ্যে?"

শুনে আমিও থ। এ কি রোমান্স না রূপকথা? যে-জগতের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সঙ্গে এ-জগতের যোগ কোথায়—কতটুকু? অথচ কিছু যোগ আছেই আছে। রোলাঁ প্রায়ই বলতেন: "tout se tient"—কোনো কিছুই সর্ববিচ্ছিন্ন নয়।

আমাকে হতভম্ব দেখে শরৎদা বলে চললেন: "একবার ভাবো দিলীপ, ব্যাপারটা! পাঁচ হাজার টাকা কিছু অঢেল টাকা নয় মানি, কিন্তু যে-মেয়ে দশ বিশ টাকার জন্যে দেহকে পণ্য করে তার কাছে পাঁচ হাজার টাকা কি লাখ টাকার সামিল নয়? তাছাড়া এহেন ক্ষেত্রে—যেখানে টাকাটা আত্মসাৎ করলে কেউই ধরতে পারত না—সে-মেয়েটি শুধু হৃদয়ের একটি সহজ অনুকম্পা ছাড়া আর কোন নীতি-বাদের তাগিদে এক লম্পটকে এত টাকা যেচে ফিরিয়ে দিল বলবে—এত টাকা যা সে হয়ত সোমবৎসরেও রোজগার করতে পারত না? আরো একটা কথা ভেবে দেখো মানুষ অনেক সময়েই মহৎ কাজ করে লোকের তারিফ পেতে। কিন্তু এখানে সে-মেয়েটি স্বার্থ ছেড়ে পরার্থ বরণ করেছিল কার প্রশংসা পেতে? প্রশংসা বরং বলা যায় না কি যে, তার আশেপাশের সখী ও সঙ্গীরা তার এ-মূঢ়তা নিয়ে হাসাহাসিই করে থাকবে—যেমন বদমায়েস সাক্ষীরা করে থাকে যদি কোনো সাক্ষী ভুলে সত্যি কথা বলে ফেলে? এই অসতীটিকে আমি কতদিনই যে মনে মনে প্রণাম করেছি—অনেক সতীসাধ্বীর চেয়ে সতীত্বগৌরবে না হোক নারীত্ব-গৌরবে বড় বলে!"...

প্রসঙ্গত মনে পড়ে কথাশিল্পী শিরোমণি সমর্সেট মম-এর একটি কথা। তিনি যে-দুটি স্মৃতিচারণী কাহিনীর উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করেছিলেন সে-দুটি শুনে লিখতে গেলে এ ছোট তর্পণটি মহাকায় হয়ে উঠবে। (তাছাড়া সমর্সেট মম সম্বন্ধে ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছা আছে, তাঁর সমস্ত বইই আমি পড়েছি পরমানন্দে)—তাই শুধু এ-প্রসঙ্গে তাঁর একটি বিচিত্র জীবন দর্শনের সূত্র পেশ করি। তিনি লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে যে, অনেকেই তাঁকে সিনিক বিশেষণে দেগে দেয় কিন্তু তিনি আদৌ সিনিক নন যতদিন একজন মানুষও নিঃস্বার্থে অন্য আর একজন মানুষের সহায় হবে বা স্বে

-বে তত্ত্বাদির সীমিকের দর্শন মজুর হতে -রে না। মন আরো বলেছেন -, সত্য সৌন্দর্য ও পরার্থনিষ্ঠা—Truth, Beauty, Goodness—এদের -ধ্যে সবচেয়ে বড় হল পরার্থনিষ্ঠা—আর পরার্থনিষ্ঠা যার সহজাত দুর্দৈব বা দুঃখ -াকে কাঙালই করে, পক্ষান্তরে যে স্বভাবে -তিরে নীচ সে সুখে দৈন্যে আরো নীচ -নে যায়।

আমি নিজে অনেক সময়েই ভেবেছি -ই পতিতা মেয়েটির কথা—যে কলুষিত -রিবেশে থেকেও পরার্থনিষ্ঠা হারায় নি—-াগুনের মধ্যে থেকেও পুড়ে কালো হয়ে -য় নি, যেন সোনার মতন ঝলকেই -ঠেছিল।

শরৎচন্দ্রকে আমি ভালোবেসে এসেছি -াঁর নানা চমৎকার উপন্যাস পড়ে—কিন্তু -বচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি তাঁর তিনটি অপরূপ -থিকা পড়ে : নিষ্কৃতি, রামের সুমতি ও -ন্দুর ছেলে। গল্প তো কতই পড়ি। -িন্তু কজনের গল্পে মন অভিভূত হয় -মন হয় সমর্সেট মম বা শরৎচন্দ্রের -ল্পে? বাস্তব ও আদর্শ, চরিত্রচিত্রণ ও -ল্পগাঁথুনি (প্লট) রসালতা ও কথালাপ -কানটা ছেড়ে কোনটা বলব? শুনি না কি -াজকের দিনে অনেক বলিষ্ঠ নওজোয়ান -াঁকে ছোট করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর -শ্রেষ্ঠ গল্পে যাদের অন্তর শিল্পের রস ও -হত্তের খোরাক পেয়েছে, তাঁর নারীচরিত্র--ায়ণে যাদের মনে নারীর কমনীয়তা ও -তজস্বিতার মণিকাঞ্চনযোগ বিস্ময় -াগিয়েছে, নতুন করে মনে হয়েছে নারীর -তি অশ্রদ্ধার মূলে আছে কল্পনার ক্লৈব্য -দৃষ্টির দৈন্য তারা তাঁকে শুধু বাংলার -র জগতের শ্রেষ্ঠ কথাচিত্রীদের দীপ্ত--ংসদে স্থান দেবেই দেবে। সত্যেন্দ্রনাথ -যমন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছিলেন -ংকৃত ঘোষণা :

-জগৎকবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব :
-াঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী
নহে খর্ব—

আমি তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ঢঙেই -শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করতে চাই এই বলে :
-াহিরে যারা দৈন্য দেখে তাদের নাই দৃষ্টি :
-শিল্পী করে অন্তরের মহিমারসবৃষ্টি।

ভালোই হল, নারীর প্রতি শ্রদ্ধার -সঙ্গ এসে গেল।

আমি আবাল্য পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের -াদর্শবাদের আবহে গড়ে উঠেছি—তার -লে নারীকে দেবীর পদবী দিতে আমার -কণ্ঠও বাধে না। পিতৃদেব লেখেছিলেন -দ করে :

-চন্দ্রনিন্দুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুল
প্রবরা সে।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিনকার বলে-ছিলেন এই কথাই : যে, চোখধাঁধানো শাদায় তাঁর মন আকৃষ্ট হয় না, তিনি চান শ্যামলী মেয়ে। তাঁরও অগাধ শ্রদ্ধা ছিল নারীজাতির প্রতি। তাঁর অপরূপ "কৃতজ্ঞ" কবিতায় কবিগুরু লিখেছিলেন সোচ্ছ্বাসেই (পূরবী) :

"শুধু জানি, একদিন তুমি দেখা
দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ-জীবনে উঠেছিল ফলে
আজো নাই শেষ।"

স্বামী বিবেকানন্দও নারীজাতিকে দেবীর পদবী দিতে কোনোদিনই কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

তারপরে শরৎচন্দ্র নারীকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেও আমাদের সামনে ধরলেন তার তেজ, আত্মশক্তি, নিষ্ঠা, স্নেহের চিত্র। আহা, কী অপরূপ মাতৃস্নেহের ছবি। রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে যতবারই পড়ি চোখে জল আসে। সম্প্রতি বিন্দুর ছেলে অনুবাদ করেছি ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায়—অনুবাদের সময়ে আমাদের মধ্যে প্রায়ই প্রতিযোগিতা হত চোখের জলের। কী নিখুঁত ছবি! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে
আসে জল ভরে।

শরৎচন্দ্রের মাতৃস্নেহের ছবি দেখে আমার মন এমনি অভিভূত হয়েই তাকে প্রণাম করেছিল :

মা-র যে-চিত্র আঁকিলে দরদী, মন যে
কেমন করে!

শরৎদার সম্বন্ধে আরো কত কথাই বলার আছে যা বলার মতন। যখন আমি ত'ার "নিষ্কৃতি" গল্পটির অনুবাদ করবার সংকল্প করি তখন ভরসা পাইনি বলে শ্রীঅরবিন্দকে এ-গল্পটির সঙ্গে "মহেশ"

SIMO26/RTVS/1/A

গল্পটি পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করি—আমি নিষ্কৃতি-র তর্জমায় হাত দিলে তিনি দেখে দিতে রাজী কি না। তিনি সম্মত হয়ে আমাকে লেখেন শরৎপ্রতিভার সম্বন্ধে:
"A wonderful style and a great creative artist with a propound emotional power!"
(অপূর্ব শৈলী, মহান্ স্রষ্টা শিল্পী, আশ্চর্য হৃদয়াবেগের গভীরতা।)

শ্রীঅরবিন্দের এ-তথ্যটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লিখি যে, আমি পরপর নিষ্কৃতি ও রামের সুমতি অনুবাদ করতে চাই. তিনি যদি একটি প্রাক্‌কথন (Foreword) লিখে দেন...ইত্যাদি। উদার রবীন্দ্রনাথ পিঠ পিঠ একটি নাতিদীর্ঘ প্রাক্‌কথন লিখে পাঠান যেটি পরে আমার MOTHERS & SONS * বইটিতে ছাপা হয়। তাতে তিনি শরৎদার ভাষাশৈলীর ক্রমবিকাশের তারিফ করে শেষে লেখেন : He has achieved the best reward of a novelist: he has completely won the hearts of Bengali readers."
(ঔপন্যাসিকের সব চেয়ে বড় পুরস্কার তাঁর অধিগত হয়েছে—তিনি বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন।)

শরৎদা যে কী খুশি হয়েছিলেন বলবার ভাষা খুঁজে পাই না—তাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ও আমার প্রণাম জানিয়ে শুধু টুক ক'রে জুড়ে দিই যে, শরৎদার "শ্রীকান্ত"-র প্রথম পর্বের ইতালিয়ান অনুবাদ প'ড়ে রোলাঁ তাঁকে "প্রথম শ্রেণীর কথাসাহিত্যিক" শিরোপা দিয়েছিলেন। মহাজনের কাছে মহাজনের গুণগান করতে কার মন না দুলে ওঠে?

কিন্তু নিবন্ধের কায়া বেসামাল হ'য়ে উঠতে চাইছে, রাশ না কষলেই নয়। তাই আর দুটি মাত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করেই ইতিপাঠ করব: শরৎদার রসিকতা ও মহাজনের মহত্ত্বে সাড়া দেওয়া ভক্তির কীর্তনে, শ্রদ্ধার বন্দনায়।

*

একদা কলকাতায় আমি সংগীতনায়ক আবদুল করিম খাঁকে অভ্যর্থনা করতে আমাদের থিয়েটার রোডের প্রশস্ত হলে এক মজলিশ করি। শরৎদাকে বলি—বহু গুণ-গ্রাহী ও গুণী আসবেন—আপনাকেও আসতে হবে। উত্তরে তিনি মেঘলা মুখে বলেন: "যেতে পারি দিলীপ, যদি আগে একটু ভরসা দাও।"

আমি (হেসে): ভরসা? কী?

শরৎদা: তিনি থামেন তো?

অতঃপর শরৎদার এ-রসিকতাটি রবীন্দ্র-নাথকে বলতে তিনি একগাল হেসে বলে-ছিলেন: "শরৎ মাক্ষম তীরন্দাজি করেছে হে, একেবারে ক্লাসিক! আমি এর পাটা সমর্থনে এর জুড়ি গল্প বলি শোনো। একদা এক দুর্ধর্ষ ওস্তাদ এসে অজস্র তানের চরকিবাজি করে হিন্দিতে গাইলেন একটি বিখ্যাত গান পরজ রাগে। বিষয়-বস্তু—'কারী কারী কামেলিয়া' অর্থাৎ কালো কালো কম্বল চোরে চুরি করেছে। এ কেবল হিন্দুস্থানী ওস্তাদেই পারে দিলীপ। বাঙালী কালো কালো কম্বল চুরি হ'লে পুলিশে খবর দেবে কিন্তু এ নিয়ে গান বাঁধবে না।" বলে সে কী মধুর হাসি! মনে পড়ে বিল্বমঙ্গলের উচ্ছ্বাস: "মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"

শরৎদা তাঁর আর একটি দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন একদিন ওস্তাদি প্রসঙ্গে: "একবার গিয়েছি এক পেল্লায় ওস্তাদের গান শুনতে। সে তো আর থামে না—কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তানের

* এ-বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। দ্বিতীয় সংস্করণে নিষ্কৃতি ও রামের সুমতির সঙ্গে বিন্দুর ছেলে-র অনুবাদ ছাপা হবে আশা করি এক বৎসরের মধ্যেই।

হাহাকার : 'সৈ'য়াঁ, তু কহাঁ গৈ'য়াঁ—কহাঁ গৈ'য়াঁ মেরী সৈ'য়াঁ—তু কহাঁ গৈ'য়া রে...' শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমি ফার্শি'র নল ফেলে গর্জে উঠলাম : আরে, সৈ'য়াঁ তোর কাশী মিত্তিরের ঘাটে গৈ'য়াঁ—তারপরে কী হ'ল বল্‌ না।'"

★

একদা নিমন্ত্রণ করেছি শরৎদা, সুভাষ, কিরণশংকর রায়, তুলসী গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু আরো কয়েকটি বন্ধুকে। প্রোগ্রাম —শরৎদা গল্প জমাবেন, আমি গান গাইব, সমাপ্তি—ভজনের পর ভোজনে। সুভাষ তখন কংগ্রেসের কাজ অশ্রান্ত ঘুরছে, তাছাড়া জেলে ওর যে-অসুখ করেছিল পুরো সারে নি। আমি বললাম : "সুভাষ, তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে—বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়—এবার কিছুদিন অন্তত বিশ্রাম নাও—চলো নৌকাবিহারে, সুন্দরবনের অপরূপ গঙ্গায়। সব বন্দোবস্তের ভার আমার।"

সুভাষ : সুন্দরবনের বাহার, নৌকা-বিহার, তোমার গান—লোভ না হয় বলো? কিন্তু হ'লে হবে কি, কং কাজে এখন খাঁটি কর্মীর বিষম দুর্ভি এ সময়ে আমি না থাকলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরো নেতিয়ে পড়বেন। তবে যদি শরৎবাবু বি পি সি সি-র* প্রেসিডেন্ট হ'তে রাজী হন তবে তাঁকে সব কাজের ভার দিয়ে দুদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে জিরুতে পারি তোমার সাহচর্যে।

শরৎদা (তৎক্ষণাৎ) : সুভাষ, আমি দেখতে বোকা হলেও আসলে বিষম চালাক। বি পি সি সি আমার মাথায় থাকুন, কিন্তু জেলে যাওয়া আমার পোষাবে না।

সুভাষ (হেসে) : আহা, আপনাকে জেলে যেতে হবে এমন কথা কে বলছে?

শরৎদা : আমার মন ভগবান আর কে—যে বলে দুয়ে দুয়ে চার হ'বেই হবে! বি পি সি সি'-র প্রেসিডেন্ট মানেই জেল।

সুভাষ (প্রাণখোলা হাসি হেসে) : আপনাকে ওরা কিছু বলবে না।

শরৎদা : আর যদি বলে তখন? ম্যাও ধরবে কে শুনি? "শেষের সে-ভয়ংকর" দিনে কী হবে আমি যে ধ্যান নেত্রে ছবির মতন দেখতে পাচ্ছি সুভাষ? ওরা আসবে গুটি গুটি, আমার হাতে পরাবে বালা, পায়ে নূপুর—তারপর আমাকে ওদের বন্ধ ভ্যান-এ টেনে তুলে বলবে : "চালাও হরিণবাড়ী"। চমকে আমি হাপুসে নয়নে কাঁদতে থাকব—আর ঠিক সেই সময়ে তোমরা জাঁকিয়ে এসে মালা ছুঁড়ে আমাকে জেলের দিকে তোফা রওনা ক'রে দিয়ে হৈ হৈ করে হাঁকবে: "বন্দে মাতরম্‌"! ব্যস, তারপর আমার অজ্ঞাতবাস পাঁচটি বৎসর—তার উপর শুনি জেলে আফিং-এর প্রবেশ নিষেধ। না সুভাষ! তোমাদের বি পি সি সি-র ঘরে দণ্ডবৎ। আমি যা পারি তার চেয়ে বেশি পারব কেমন ক'রে?

(সকলের কলহাস্য)

হাসছ কি? কাঁদো ভাই, কাঁদো। দেশোদ্ধার করতে গিয়ে আমার কী হাল হয়েছে জানো? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চরকা-প্রসঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রে যে-মহাপাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে—দিনের পর দিন। হবে না? গুরুর সঙ্গে বিতণ্ডা! কর্মফল ফলবে না?

সুভাষ (হেসে) : কী ভাব কর্মফল ফলল শুনতে পাই না?

শরৎদা : খদ্দর হে, খদ্দর। বাসায় চাকরানী টেঁকে না আর। তারা বলে : খদ্দরের ধুতি কাচতে বালতিতে ডোবাতে পারে কিন্তু আর তুলতে পারে না। আহা, অবলা তো, পারবে কোত্থেকে বলো?

সুভাষ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। কী সুন্দর যে ওকে দেখাত হাসলে! একেবারে পটপরিবর্তন যাকে বলে। গম্ভীর মেঘে ফুটে ওঠে উষার রাঙা ঝলকানি। শরৎদা জের টেনে বলেন : "হাসছ কি? কাঁদো সুভাষ, কাঁদো। খদ্দরের ধুতি কষতে কষতে কোমরে 'গান্ধিবিহ্বল' হ'য়ে গেল!"

কিন্তু চটুলতা থেকে এবার ফিরি সমীক্ষা-সর কোঠায়।

★

শরৎদার চোখের পিছনে থাকত হৃদয়। শুধু বুদ্ধির দেখা নয়, তাঁরই ভাষায়—"বুকের দরদ" দিয়ে দেখা। তাই যেখানেই তিনি নির্ভেজাল মহত্ব দেখতেন মান দিতেন সর্বান্তঃকরণে। পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি কিরকম শ্রদ্ধা করতেন আজো মনে পড়ে। বিশেষ ক'রে তাঁর গান শুনতে তিনি কী যে ভালোবাসতেন! একদিন বলেছিলেন, আমার মুখে তাঁর "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" কীর্তনটি শুনে—"আহা, দিলীপ, 'সে যে দেবতা ভিখারী মানবদুয়ারে' গৌরাঙ্গের প্রেমের মহিমার এমন বর্ণনা..." ইত্যাদি—বলতে বলতে তাঁর চোখ চিকিয়ে উঠত। তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন সুদূর বর্মা থেকে : "দ্বিজুবাবুর মৃত্যুসংবাদ রেংগুনে গেজেটে পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। সত্যই তাঁর স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না...দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পরে এক রবিবাবু ছাড়া 'ভারতবর্ষে'র মতন এতবড় কাগজ আর কেউ চালাতে পারবে না।... [illegible] আবশ্যক হ'লে ও-কাগজ প্রায় একাই চালিয়ে দিতে পারতেন। ও কি আর [illegible]?" আর একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন : "একদিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এসে বলেছিল তোমার উপন্যাস 'দোলা' চমৎকার হয়েছে। শুনে বিস্মিত হইনি। তোমার উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরো চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায়? তাছাড়া উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া রয়েছে আর্টিস্ট হৃদয়—যেমন বৃহৎ, তেমনি মহৎ, তেমনি পরদুঃখকাতর।...তোমার প্রতি স্নেহও আমার তাই অকৃত্রিম—কোনো বাইরের ঘাতপ্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়।" পিতৃদেবের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি চিঠি আমাকে প্রমথবাবু দেখিয়েছিলেন।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে বলতে বলতেও তিনি প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন। সুভাষের কাছে শুনেছিলাম দেশবন্ধুও তাঁকে ক[রতেন] গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর "নারায়ণ" পত্রিকায় শরৎদা তাঁর "স্বামী" গল্পটি পাঠান। দেশবন্ধু দক্ষিণা পাঠান শাদা চেক সই ক'রে—অর্থাৎ শরৎদা যে-দক্ষিণা চান শুধু বসিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। শরৎদা স্বচ্ছন্দচিত্তেই পাঁচশো টাকা পকেটস্থ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি চেকে আঁক কাটেন মাত্র একশো টাকার। এমনি বিচিত্র ছিল এ-দুটি মহাপ্রাণ মানুষের অন্তর সম্বন্ধ। দেশবন্ধুকে তিনি কী চোখে দেখতেন লিখেছিলেন তাঁর দেহরক্ষার পর একটি আশ্চর্য ছত্রে: "দেশবন্ধু করিতেন দেশের কাজ আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" পড়ে চমকে উঠেছিলাম, মনে পড়েছিল মিলটনের বিখ্যাত চরণ : He for God only she for God in him.

দেশবন্ধুও শরৎদাকে কী গভীর শ্রদ্ধা করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। শরৎদা আমাকে যা বলেছিলেন তাঁর জবানীতেই উদ্ধৃত করি : "জানো দিলীপ, দেশবন্ধু সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী করি বলুন তো? অনেকে বলছে ফের ব্যারিস্টারি ক'রে লাখখানেক টাকা কংগ্রেসে দিতে—বলছে দেশের কাজে যখন টাকা চাই-ই চাই তখন রোজগার ক'রে কংগ্রেসকে দান করলে তো দেশের কাজই করা হবে।"

আমি (সাগ্রহে) : আপনি কী বললেন?

শরৎদা (একটু খেদের সুরেই) : আমি বললাম : "দেখুন, যারা এমন কথা মুখে আনে তাদের আপনি মুখদর্শনও করবেন না। টাকা—টাকা—টাকা! কিন্তু দেশের কাজে টাকা ঢলাটাই কি সবচেয়ে বড় আহুতি? আপনি বিপুল আয়ের পসার ছেড়ে দিয়ে যে-আশ্চর্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখালেন, ফের ওকালতি করে পুনর্মূষিক হয়ে সেই দৃষ্টান্তের মহিমাকে ম্লান ক'রে দেবেন না, দেবেন না, দেবেন না।

আমি (সানন্দে) : চমৎকার! সুভাষও এই কথাই বলে।

শরৎদা : সুভাষ শুধু দেশভক্ত না

---

* Bengal Provincial Congerss Committee.

লীপ, খাঁটি ত্যাগী, নিখাদ সোনা। তাই শবন্ধুর ত্যাগের মহামহিমা ও না বুঝলে ঝবে কে? জহুরী না হলে কি জহর চেনা য়?

*

এবার পুনশ্চ ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ সম্বন্ধে শরৎদার গভীর শ্রদ্ধার থা কিছু বলে সমাপ্তি টানবার সময় এলো।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ভক্তি যে কী কৃত্রিম ছিল তার আমি বহু দৃষ্টান্ত দিতে রি। কিন্তু প্রবন্ধের কায়া সংক্ষেপ করতে বে ব'লে বলি যে তিনি আমাকে একটি ঠিতে যা লিখেছিলেন সে-ই তাঁর যথার্থ ত্মপরিচয়: "হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত ন হবে তোমার যে আমি অত্যধিক নতা প্রকাশ করছি কিন্তু এই সাধনাই মি সারাজীবন করেছি। এইজন্যেই আমি নো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি না। দিনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি য়—বিকৃতি।"

উত্তরে আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে আমি কথা পুরোপুরিই বিশ্বাস করি। তাই মার আরো আক্ষেপ হ'তো যখন তাঁর ও বীন্দ্রনাথের মতান্তরে মনান্তরের সূচনা খতাম। কারণ এ-তর্কাতর্কি সত্যিই বাহ্য—াসল কথা হ'ল রবীন্দ্রনাথকে তিনি াকৈশোর বরণ করে এসেছিলেন বঙ্গ-াহিত্যের দিশারি গুরু বলে। মনে পড়ে কদা শরৎদাকে বলেছিলাম যে রবিদেশে স্টয়ের যে-তুঙ্গ স্থান বাংলাদেশে রবীন্দ্র-াথের সেই স্থান, তিনি শুধু বঙ্গবাণীর রপুত্রই নন—গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই সব্যসাচী থা পথিকৃৎ। শরৎদা এমন কথাও বলতেন ায়ই যে, আমাদের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের শত আকর্ষণে যে-পথে চলেছে সেই পথই ংলাভাষার জনপথ ও রাজপথ। তিনি ঠতে বসতে উদ্ধৃত করতেন রবীন্দ্রনাথের ত যে কবিতা (পূরবী):

দুয়ারবাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হ'ল যেন চিনি
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
(লীলাসঙ্গিনী)

কিংবা

ও খুলে দাও দ্বার,
ওই তার বেলা হ'ল শেষ—
বুকে লও তারে... (সাবিত্রী)

বে বলতেন প্রায়ই যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে র্বতোমুখী প্রতিভায় অনন্য হ'লেও সব াগে তিনি মহাকবি—যুগপ্রবর্তক কবি।

একবার মনে আছে—তখন সূর্য চন্দ্রের াম্তর গভীর—এক রবিদ্বেষী বলল: রৎবাবু, আপনি যা লেখেন আমরা বুঝি কিন্তু রবিবাবু কী যে লেখেন আগড়ম াড়ম বোঝা দায়।" উত্তরে শরৎদা বললেন: "তার কারণ আমি লিখি তোমাদের জন্যে, তিনি লেখেন আমাদের জন্যে।" এ-ধাক্কার (Snubbing) মন্তব্য অনাবশ্যক।

এবার উপসংহারে বলি শ্রীঅরবিন্দকেও শরৎদা কী গভীর শ্রদ্ধা করতেন। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার দরুন তিনি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি নিজের ভুল বুঝবামাত্র ঋষিকবিকে দিয়েছিলেন তাঁর প্রণতি-অর্ঘ্য। আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন (৩রা মাঘ; ১৩৪১):

"নিষ্কৃতি-র অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছি। তার কারণ, তুমি তো শুধু অনুবাদক নও—নিজেও বড় লেখক। অনুবাদ ভালো হবেই যখন দেখে দেবার সংকল্প করেছেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ।...তুমি যেদিন 'শ্রীকান্ত' প্রকাশ করতে পারবে সেদিনই শুধু আশা করব—হয়ত একজন বাঙালী গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওরাও একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। তোমার উদ্যোগ এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ-অসম্ভবও হয়ত একদিন সম্ভব হবে।"

আমার গুরুভক্তিকে নেকনজ'র না দেখা সত্ত্বেও যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তিকে মান দিতে কুণ্ঠিত হননি এতেই বোঝা যায় যে, প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধার ত্রিবেণীসংগম হয়েছিল তাঁর আশ্চর্য শিল্পচরিত্রে।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় কলকাতায় তাঁর রম্য নিলয়ে অশ্বিনী দত্ত রোডে—১৯৩৭ সালে জুলাই মাসে। কত কথাই যে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যেমন বরাবরই করতেন। বললেন—আমি তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের নানা কবিতা পাঠাবার আগে তিনি সত্যিই জানতেন না যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু মহাঋষিই নন, মহাকবিও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনিই সজাগ ছিল—প্রতি পদেই বাছাই করতে চাইতেন আমার কোন্ উচ্ছ্বাসটি মহনীয়, গুরুবাদের কতটা গ্রহণীয়। কিন্তু আমাদের যোগাশ্রমের নানা আইনকানুনে তিনি সায় না দিলেও শ্রীঅরবিন্দের বীর্য জ্ঞান নিষ্ঠা ও তপস্যাকে তিনি বরণীয় বলে অংগীকার করেছিলেন অকপটেই।

শেষে বললেন: "আর কতদিন থাকবে কলকাতায়?"

আমার সংগী ছিল আমার ভাই শচীন—সে বলল: "পনেরাই আগস্ট গুরুদেবের জন্মদিন, তাই দিলীপদা ১১ই রওনা হবে—১৪ই নাগাদ পণ্ডিচেরি পৌঁছবে।"

শরৎদা (একটু চুপ ক'রে থেকে): তোমার সঙ্গে এবার কিছুই কথা হ'ল না, দিলীপ। পরে আর হবে কি না তাও জানি নে। কিন্তু তোমাকে থাকতেও তো বলতে পারি নে—তাঁর জন্মতিথি তুমি আর কোথাও কাটাবেই বা কেমন ক'রে?

এমনি ছোট ছোট মন্তব্য—কিন্তু যেমন সুন্দর তেমনি স্নেহোচ্ছল। শুনে মন কেমন করে—বিশেষ আর দেখা না হ'তেও পারে ভাবতে। কিন্তু বিষাদকে দাবিয়ে জোর করে মুখে হাসি টেনে বললাম: "কিন্তু আমার সুবুদ্ধি বন্ধুরা তো প্রায়ই বলেন—গুরু-ভক্তিটক্তি সব সেকেলে মনোভাব—নামঞ্জুর।"

শরৎদা (গম্ভীর হ'য়ে): দিলীপ, আমি মন্ত্রতন্ত্র, জপতপ, যোগযাগ কিছুই বুঝি না। কিন্তু বুঝি ও মানি একটি জিনিস—যে, পাওয়ার মতন কিছুই পাওয়া যায় না প্রণাম করতে না শিখলে।

বুকের তারে বেজে ওঠে একটি উর্দু গজলের ধুয়ো:

তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়,
মরণকে জীবন দেব না, দেব তোমার পায়,
বৈরাগী এ-প্রাণ শুধু ঐ প্রেমের দুয়োরায়।

ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজল। শরৎদাকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। আকাশের তারা-দের চোখেও যেন জল!......

শরৎদার স্মৃতি

হেমচন্দ্র ঘোষ

মাসটা আজ আর মনে নেই, তবে এটা বেশ মনে আছে, সেটা ছিল ১৯১২ খৃষ্টাব্দ। সেই সময় আমি ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে একদিন দুপুরে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে আমাদের দলের একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাই। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গিয়ে আমাদের দলের সেই কর্মীটিকে খুঁজছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কাকে খুঁজছ?

আমি যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তার নাম বললাম। বলার পরেই ভদ্রলোক আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি আমার নাম বললাম। বলে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম, তিনি যেন আমাকে চিনতে পেরেছেন, এমনি ভাব। তারপর তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন,—আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমিও এখানে একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পরে শুনেছিলাম, শরৎচন্দ্র ঐ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন থেকে ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিলেন। যাই হোক, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন আমার পরিচয় ঐ পর্যন্তই। এ ছাড়া আর কোন কথা হয় নি। আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের মামা বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলীই হয়ত কখন তাঁর কাছে আমার নাম বলেছিলেন। তাতেই তিনি আমার নাম শুনেই হয়ত আমাকে চিনতে পেরেছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি আমার দল 'মুক্তি সংঘ' স্থাপন করি। এই দলেরই পরে 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স' বা সংক্ষেপে বি ভি নাম দিই। আমি যখন মুক্তি সংঘ স্থাপন করি, সেই সময় বিপিনবাবুও তাঁর দল 'আত্মোন্নতি সমিতি' গঠন করেন। পৃথক দল হলেও আমাদের উভয় দলের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এইজন্যই আমাদের উভয় দলের কর্মীরা ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে কলকাতায় পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করে। ইনি মোকামাঘাটে প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। পরে আমাদের এই উভয় দলের কর্মীরাই আবার একত্রে কলকাতায় দিনে দুপুরে রডা কোম্পানীর গাড়ি বোঝাই অস্ত্র লুণ্ঠন করে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। শরৎচন্দ্র তখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা। বাস করছিলেন হাওড়ার বাজে শিবপুরে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন আগে আমি প্রায় ছ' বছর পরে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পাই। মুক্তি পেয়ে আমি কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে আসি।

হেমচন্দ্র ঘোষ

শরৎচন্দ্রও কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেদিনও তাঁর সঙ্গে আমার তেমন কথাবার্তা হয় নি বটে, তবে পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই যে আমার পরিচয় হ'ল, তারপর থেকে যখনই আমি জেলের বাইরে থেকেছি, তখনই সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। শরৎচন্দ্র আমার চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। তাই আমি তাঁকে দাদা বলতাম। তিনিও আমাকে ছোট ভাই-এর মত স্নেহ করতেন।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দাদা কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হলেও, তিনি আমাদের মত বিপ্লবীদেরও যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এমন কি দেশের মুক্তির জন্য আমাদের সহিংস সংগ্রামকেও সমর্থন করতেন। দাদার কাছে গেলে তিনি আমার বিপ্লব জীবনের কাহিনী এবং আমার পরিচিত বিপ্লবীদের বিপ্লবের কাহিনী শুনতেন। আমাদের বি ভি দলের আদর্শ ছিল—এ দেশের প্রধান প্রধান শাসক ইংরাজদের নিধন করে করে ঐ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা। যার ফলে কোন ইংরাজই আর ঐ শাসকের গদিতে বসতে সাহস করবে না। এবং শেষে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।

এই নীতি নিয়েই আমাদের বি ভি দলের বিনয় বসু ঢাকায় আই জি লোম্যানকে খতম করেছিলেন। কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে আমাদের বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল, ভবানী ভট্টাচার্য গবর্নর অ্যান্ডারসনকে গুলি করেছিল। মেদিনীপুরে আমাদের দলের কর্মীরা পর পর তিনজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে—পেডি, ডগলাস ও বার্জকে নিধন করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা মেদিনীপুরে ঘোষণা করেছিলাম, এখানে যে ইংরাজই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসবে, আমরা তাকে নিধন করবই। আমাদের এই ঘোষণায় ইংরাজ গবর্নমেন্ট তখন রীতিমত ভয় পেয়েছিল। এমন কি বিলাতেও ইংরাজ আই সি এস-রা ভারতে আসতে ইতস্তত করেছিল। তারা বলেছিল—আমরা কি তবে প্রাণ দিতে যাব?

বার্জ নিধনের পর ইংরাজ সরকার ভয়ে আর কোন ইংরাজকে মেদিনীপুরে পাঠাল না। পাঠাল বাঙ্গালী বি আর সেনকে। এঁকেও আমাদের দলের কর্মীরা খতম করার আয়োজন করলে, আমি নিষেধ করলাম। বললাম, এই ধরনের ইংরাজদের গোলাম দেশদ্রোহীদের মারতে আরম্ভ করলে, এদের মেরে আর শেষ করা যাবে না। তাই আমাদের আদর্শ অনুযায়ী শুধু ইংরাজ মেরেই যাও এবং তাদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি কর।

আমি, রাসবিহারী বসু, যতীন মুখার্জী, সূর্য সেন, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিপ্লবী নেতাদের বহুবার বলেছি, একজনের নেতৃত্বে সকলে কাজ কর, তা যদি না হয়ত সকলে মিলিত হয়ে এক সঙ্গে কাজ কর। কিন্তু তা কখনই হয় নি। তা যদি হ'ত তাহলে শুধু এই বিপ্লবীরাই ১৯৪৭-এর অনেক আগেই ভারতের স্বাধীনতা এনে দিতে পারত।

বিনয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে

হেমবাবুর কাছে রক্ষিত 'বিপ্রদাসের' পান্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

ষ্ট তারিখে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে জি লোম্যানকে হত্যা করে। এর ন পরেই পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার । ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধী উইন চুক্তির ফলে সত্যাগ্রহীরা মুক্তি কিন্তু বিপ্লবীরা মুক্তি পেল না। ও গবর্নমেন্ট কিন্তু আমাকে ছেড়ে । তার কারণ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৮ই নম্বর তারিখে বিনয়, বাদল ও দীনেশ র্স বিল্ডিংসে ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল, তাতে আমাদের দলের অনেককে পুলিস গ্রেপ্তার করলেও অনেকে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিল। আমি যদিও তখন জেলে, তবু গবর্নমেন্ট আমার সম্বন্ধে ভেবেছিল—আমাকে ছেড়ে দিলে দলের নেতা হিসাবে আমাদের আত্ম-গোপনকারী কর্মীরা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তখন তাদের সঙ্গে আমাকেও আবার গ্রেপ্তার করবে।

গবর্নমেন্টের এই চালাকি আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই জেল থেকে বেরিয়েই, সেই সময় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চে করাচীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধি-বেশনে যোগ দিতে চলে যাই। করাচী কংগ্রেসে সেবার সভাপতি ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। আর ঐ করাচী কংগ্রেসেই যুব সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

কলকাতা থেকে আমি সুভাষবাবুর সঙ্গেই করাচী গেলাম। তার কারণ, সুভাষ-বাবু তখন বি পি সি সি-র প্রেসিডেন্ট, আর আমি ছিলাম জেনারেল সেক্রেটারী।

করাচী কংগ্রেসের পর প্রায় মাস খানেক আর কলকাতায় না ফিরে সারা সিন্ধু প্রদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ফিরলাম এপ্রিলের মাঝামাঝি। ক'দিন আগেই ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে আমাদের দলের বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে নিধন করে। আমি ঐ সময় একদিন সামতাবেড়ে শরৎদার কাছে যাই। সেদিন তাঁর সঙ্গে বিনয়, বাদল ও দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংসে যুদ্ধের কথা এবং পেডি হত্যার কথা নিয়ে আলোচনা হয়। দাদা আমার মুখে বিস্তৃতভাবে সব শুনে অত্যন্ত খুশী হন। খুশী হয়ে, আমাদের দলের জন্য আমার হাতে দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন।

আমি তখন তাঁকে বললাম—দাদা, টাকা আমাদের কি হবে? আমরা ইংরাজ মারি এবং নিজেরা মরি। এতে আমাদের টাকার কি প্রয়োজন। টাকার দরকার হলে আমরা ত রাজনৈতিক ডাকাতিই করতে পারতাম। কিন্তু সেটা আমাদের নীতি নয়। কারণ, আমাদের এই সোজাসুজি ইংরাজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন দরকারই হয় না।

সস্তায় 'কাট-পিস' কেনার গোলাম নাকি আপনি?

কমলার কাপড় - কম দাম, দেখতে দামী

CU-A/1868-Ben. Rev.

হয়, তা আমরা নিজেরাই চালিয়ে

রা খুশীভরা চোখে অবাক হয়ে
দিকে চেয়ে রইলেন। আর টাকার
কথাই বললেন না।

র কয়েক বছর আগে ঠিক এমনি
দাদা একদিন আমাকে বলেছিলেন
আমার রিভালবারটা তুমি নিয়ে
এটা তোমার কাছেই থাক।
র কাজে লাগবে।

দিনও আমি তাঁকে বলেছিলাম—
রভলবার আমাদের অনেক আছে।
র অভাব গুলির। কিছু গুলি দিন।

আমার এই কথা শুনে তিনি তখনই
াড়িতে রিভলবার ও বন্দুকের যা
ছিল সবই দিয়ে দিলেন। তাঁর কাছ
আমি অনেকবার গোপনে অনেকগুলি
। এনে আমাদের দলের কর্মীদের
ভাগ করে দিয়েছি। তাঁর দেওয়া
তও আমরা ইংরাজ মেরেছি।

কদিন শরৎদার সামতাবেড়ের বাড়িতে
দাওয়ার পর তিনি আমাকে
ন—হেম, তোমার দলের জন্য টাকা
গেলে ত নিতে চাও না। তা তোমার
কিছু নাও।

লাম—দাদা, আমার টাকার কি
! আমি ত জেলে জেলেই থাকি।

লেন—যখন জেলে রইলে, তখন না
াল। কিন্তু জেলের বাইরে যখন
, তখন তোমার চলবে কোথা থেকে?
তোমাকে 'পথের দাবী' ও 'চরিত্রহীন'
টা দিয়ে দিই। 'পথের দাবী' যদিও
বাজেয়াপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু চরিত্র-
বইটা থেকে কিছু পাবে। তোমার মত
চরকুমার, আদর্শবাদী বিপ্লবীকে এই
দিলে বইটারও একটু মর্যাদা বাড়বে।

আমি বললাম—দাদা, আমার কোন
চলে যাবে। কিন্ত আপনি বই দিলে
ার চলবে কি করে? আপনার কত
আপনি দিলেও আমি নেব না।

রে শুনেছি, দাদা তাঁর এক দুঃস্থ
সাহায্যের জন্য তাঁকে তাঁর 'কাশীনাথ'
দান করেছিলেন। আর অগ্নিবলী বর্মণ
ী করে জেল খেটে এসে বইএর
ন করলে তাঁকেও 'স্বদেশ ও সাহিত্য'
'তরুণের বিদ্রোহ' বই দুটী দান
হলেন।

১৯৩১ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে
ন মাস আমি জেলের বাইরে ছিলাম,
সময় আমি প্রায়ই সামতাবেড়ের বাড়ীতে
ত যেতাম। শরৎদা যে আমাকে
ত স্নেহ করতেন, একথা বাংলা
দ নেতারা সকলেই জানতেন। একদিন
চন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস
স এসে কথায় কথায় আমায় বললেন—

হেমবাব্, আমাকে একদিন আপনার শরৎদার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে চল্ন।

শ্নে আমি বললাম—তাহলে সামনের রবিবারেই চল্ন। আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

শরৎবাব্ রাজী হলে রবিবারে শরৎবাব্, আমি এবং আমার ভাগ্নে সন্তারঞ্জন বক্সী, তিনজনে মিলে শরৎদার বাড়ি যাই। শরৎবাব্র কথামত আমরা সকলেই অবশ্য সেদিন সকালে খেয়ে দেয়েই গিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়া করে যেতে আমাদের একট্ দেরিই হয়েছিল। তাই প্রায় দ্প্র নাগাদ আমরা দাদার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাই। দেউলটি স্টেশন থেকে প্রায় দ্ মাইল মেঠো পথ শরৎবাব্ও আমাদের সঙ্গে হেঁটেই গিয়েছিলেন।

আমি প্রতিবারের মত এবারও আগে থেকে দাদাকে আমাদের যাওয়ার কোন খবর না দিয়েই গিয়েছিলাম।

আমরা দাদার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলে, তিনি আমার সঙ্গে শরৎবাব্কে দেখে যেমন বিস্মিত হলেন, তেমনি আমার উপরে রেগেও গেলেন। তিনি আমাকে তিরস্কার করে বললেন—হেম, তোমার ঐ ইংরাজ খ্ন করা মাথায় এ ব্দ্ধিটা এল না যে, এমন একজন সাহেব স্বো মান্ষকে নিয়ে গেলে দাদা তাঁকে বসাবেন কোথায়? তার ওপর এই প্রচণ্ড রোদে শরৎবাব্কে এতটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে এলে কেন, স্টেশনে কি পাল্কী ছিল না। পাল্কীতে করে আনতে পারলে না?

দাদার এই কথা শ্নে শরৎবাব্ দাদাকে বললেন—আমি এসেছি আমার মিতা শরৎচন্দ্রকে দেখতে এবং দেশের এক অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখককে নমস্কার জানাতে। এজন্য আপনি 'কিন্তু' বোধ করছেন কেন?

দাদা শরৎবাব্কে সাদরে বসিয়ে ভৃত্যকে ডেকে হাত পা ধোওয়ার জল দিতে বললেন।

আমি ও সন্তু তৎক্ষণে দাদার সামনের প্কুরে গিয়ে হাত পা ধ্য়ে এলাম। এসে আমি দাদার চাকরকে বললাম—ননী, বাগানের গাছ থেকে ডাব পাড়।

দাদা বললেন—বেশী করে পাড়বি। বেশ বড় ও ভাল দেখে একটা কাঁদি পেড়ে আন।

ডাব পাড়া হলে শরৎবাব্ একটা একটা করে তিনটা ডাব খেলেন। আমরাও ঐরকমই খেলাম।

এরপর দাদা শরৎবাব্র সঙ্গে স্ভাষচন্দ্রের কথা, কলকাতার কথা ও দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন শেষে এক সময় শরৎবাব্ দাদার সঙ্গে দাদার বাড়িঘর, বাগান, প্কুর, বাড়ির ধারে র্পনারায়ণ নদ সব ঘ্রে ঘ্রে দেখলেন।

এরই ফাঁকে দাদা এক সময় তাঁর ভৃত্যকে জাল ফেলে প্কুর থেকে মাছ ধরতে বলায় সে বড় বড় ক'টা মাছও ধরল দেখলাম।

কিছ্ক্ষণের মধ্যেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা হল। দাদার বাড়ির তৈরি ঘিয়ের ল্চি, মাছের ও অন্যান্য তরকারী, আর দাদার পোষা গর্র প্র্ সরপড়া একবাটি করে দ্ধ।

আমি দাদার বাড়িতে এ খাবার বহ্বারই খেয়েছি। শরৎবাব্ খেয়ে সেদিন দাদাকে বললেন—এমন স্ন্দর ঘিয়ের ল্চি আর এমন মিষ্টি দ্ধ আমি কখনও খাইনি শরৎবাব্। আজ খেয়ে সত্যিই খ্ব তৃপ্তি ও আনন্দ পেলাম।

খাওয়ার পর বিশ্রাম। সেই সময় আবার শরৎবাব্র সঙ্গে দাদার দেশের কথা নিয়ে নানা আলোচনা চলল। পরে বিকাল হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। তিনি সেদিন আমাদের আগিয়ে দেবার জন্য অনেক দ্র পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি

বাবুর জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করেছিলেন, তু শরৎবাবু আগের মত হেঁটেই াদের সঙ্গে ষ্টেশনে এসেছিলেন।

দিন দুই পরে কংগ্রেস অফিসে আমি াষচন্দ্র ও কিরণশংকর রায়ের কাছে বাবু ও সত্যকে নিয়ে দাদার বাড়ি য়ার গল্প করলে, সব শুনে সেদিন াষচন্দ্র ও কিরণশংকর আমাকে বলে- ...আমাদের... একদিন শরৎ- রে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে চলুন।

আমি বলেছিলাম—আচ্ছা, নিয়ে যাব। তু এর কয়েকদিন পরেই আমি জেলে যাওয়ায় এবং সে যাত্রায় সাত বছর লে থেকে দাদার মৃত্যুর পরে ছাড়া য়ায় ওঁদের আর নিয়ে যাওয়া হয়নি।

আমাদের বি, ভি, দলের কাগজ তে শরৎচন্দ্রের 'যুব-সংঘ' ও 'নতুন গ্রাম' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত ছিল। এ ছাড়া তাঁর 'বিপ্রদাস' উপ- সেরও দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত ছিল।

আমাদের প্রতি স্নেহবশত দাদা আমাদের থেকে কোন দক্ষিণা না নিয়ে যখন তে একটা উপন্যাস লিখবেন বললেন, ন আমি বলেছিলাম, দাদা, জমিদার ও াদের কথা নিয়ে আমাদের একটা উপন্যাস । জমিদারী প্রথা যখন যাচ্ছেই না, তখন দার ভাল হলে, প্রজাদের যে মংগল, া যে সুখে থাকে সেইটাই দেখাবেন। ণ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সব দারই প্রজাপীড়ক বা অত্যাচারী হয় জমিদার ভাল হলে নিজের জমিদারীতে ল, কলেজ, হাসপাতাল, অতিথিশালা তি করে দেয়। পুকুর কাটায়, খাল য়, রাস্তা তৈরি করে দেয়, এইরূপ া ভাল কাজ করে।

দাদা বলেছিলেন—আচ্ছা দেখি, তাই না লিখব।

লিখতে আরম্ভ করে দাদা সেই সময় াকে একদিন বলেছিলেন—আমার এক পন মামা আছেন, তাঁর নাম বিপ্রদাস। ন অতি ধার্মিক লোক। তাঁর নাম দিয়েই ন্যাসের নামকরণ করেছি এবং উপন্যাসে কে এক প্রধান, চরিত্ররূপে দাঁড় করাব ক করেছি।

দাদা বেণুর প্রথম কিস্তির লেখা দিলে লাম, তিনি আমার কথা রেখেছেন। মিদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের দাবির কথা য়েই বই আরম্ভ করেছেন। পরে আরও থা পেয়ে দেখলাম, তিনি একজন আদর্শ মদারও চিত্রিত করবার চেষ্টা করছেন।

এরপর আমরা জেলে চলে যাওয়ায় ণু বন্ধ হয়ে যায়। দাদাও তখন ঐ লেখা ন্য কোথাও আর না দিয়ে বন্ধ করে দেন।

বছর দুই পরে দেখলাম—আমাদের ণুতে বিপ্রদাসের যে অংশ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পুনঃ- প্রকাশিত হচ্ছে। তারপরে বিচিত্রায় আরও ধারাবাহিকভাবে লিখে দাদা বিপ্রদাস উপন্যাস শেষ করেন। খুব সম্ভব বিচিত্রা- সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলীর আগ্রহেই তিনি বিচিত্রায় লিখেছিলেন।

আমরা তখন জেলে। জেলে বসেই বিচিত্রায় প্রকাশিত সমগ্র বিপ্রদাস পড়ে দেখলাম, দাদা বইয়ের প্রথমেই যা কৃষক আন্দোলনের কথা বলে ছিলেন, বইয়ে আর কোথাও তাদের আন্দোলন বা সভাসমিতির কথা বলেননি। তিনি বিপ্রদাসকে একজন ভাল জমিদার করেছেন বটে, কিন্তু সে তেমন কিছুই নয়। বেণুতে প্রকাশিত অংশের পর থেকে বিপ্রদাস উপন্যাসকে দাদা মূলত একটি হৃদয়-সর্বস্ব উপন্যাসে পরিণত করেন। সেখানে জমিদার সাধারণ প্রজাদের কথা আর তেমন চিন্তা করেন না। বই শেষও হয় অন্যভাবে।

পথের দাবী রচনা কালে আমি দাদাকে বহু বিপ্লবীর কাহিনী শুনিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম উপন্যাসে বিপ্লবী নায়ককে তার বৈপ্লবিক গুণাবলীর সঙ্গে ভাল একজন চরিত্রবান, খাঁটি আদর্শবাদী মানুষ হিসাবেও চিত্রিত করবেন। কারণ, আসল বিপ্লবীরা তাই-ই। পথের দাবী লেখার সময় স্নেহবশত আমার কথা কিছুটা শুনেছিলেন, তা তাঁর পথের দাবী পড়ে জেনেছি।

বেণুতে 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হওয়ার সময় আমরা যদি তখন জেলে না যেতাম, তাহলে বেণু বন্ধ হত না। আর আমরাও দাদাকে বলে তাঁর বিপ্রদাসকে আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাসে পরিণত করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জেলে যাওয়ায় সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।

আমি জীবনের দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর ইংরাজের তৈরি জেলে ও অন্তরীণ অবস্থায় কাটিয়েছি। শরৎদার চিঠিপত্র সহ আমার বহু জিনিসই পুলিস নষ্ট করেছে। কিন্তু বিপ্রদাসের যতটা আমাদের 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার পাণ্ডু- লিপিটা আমি কোনরকমে রক্ষা করতে পেরেছি। দাদার স্মৃতি হিসাবে সেই পাণ্ডুলিপিটা আজও আমার কাছেই রেখেছি।

স্বয়ম্ভূ শরৎচন্দ্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

একদা সাময়িক পত্রগুলির পাতা ওলটালেই একটা-না-একটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত। তখনকার দিনে বাজারে তেল ছিল মেয়েদের প্রিয়—লক্ষ্মী-বিলাস, নিরুপমা, জবাকুসুম ও কুন্তলীন। এদের মধ্যে নিরুপমার মালিকরা 'বর্ষস্মৃতি' নামক একটি বার্ষিক সাহিত্য সংকলন ও কুন্তলীনের মালিকরা 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রকাশ করতেন। তৎকালীন গল্প লেখকদের কাছে আবেদন জানিয়ে ও'রা অনুরোধ করতেন, আপনাদের গল্পের মধ্যে যদি আমাদের সুগন্ধী তেলের নামটি উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।

গল্পলেখক বসে গেলেন কাহিনী রচনায়!—কথায়-কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে, রান্নাবান্না খরচ-পত্র নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। স্ত্রী অপব্যয় করে, স্বামী চটে আগুন। আট আনায় এক শিশি দামী মাথার তেল কিনতে গেলে কেন? পাঁচ আনায় এক সের খাঁটি নারকেল তেল পাওয়া যেত না? এত নবাবী, এত বিলাস? দুধ-কলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষছি? দাও, ফেলে ও তেলের শিশি। এক্ষুনি ছুড়ে ফেলে দাও!

নতুন তেলের শিশি নিয়ে ঝটাপটি, কাড়াকাড়ি আর দাপাদাপি করতে গিয়ে সেটা মেঝের উপর ছিটকিয়ে পড়ে চুরমার হয়। কিন্তু এবার যাবে কোথা? সেই বিশেষ তেলটির মধুর মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ফুর-ফুরিয়ে ওঠে। স্বামীর মুখে হাসি ফোটে: বাঃ চমৎকার গন্ধ ত?

স্বামী-স্ত্রীর সব বিবাদ মিটে গিয়ে আবার ভালবাসা হয়।

বাহাদুর লেখক সকলের সুখ্যাতি পান!

সেই যুগে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক বার্ষিকীতে একটি ছোট গল্প ছাপা হয়, নাম 'মন্দির' এবং তার লেখক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের মাতুল। তখনকার দিনে পাঠক সমাজ ছিল খুবই স্বল্প-সংখ্যক, শিক্ষাদীক্ষা ছিল কম, এবং দুপুরবেলাকার বেকার মেয়েরা ঘুমোবার আগে বই-কাগজ জোগাড় করে গল্প পড়তে পড়তেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হত। 'মন্দির' গল্পটি যখন সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তখন সুরেনবাবু প্রচার করলেন, ও গল্প তাঁর লেখা নয়, ওর লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র? তিনি আবার কে? বাড়ি কোথায়? বিষয়-কর্মাদি কেমন?—সাহিত্যের মজলিশে নানা প্রশ্নাদি দেখা দিল।

সাহিত্যের অবিসম্বাদী বিচারক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বহু কাল পূর্ব কুন্তলীন পুরস্কারে একটি ছোট গল্প পড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় 'মন্দির।' পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে, এই নূতন লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র'......

'মন্দির' গল্পটির পর যখন 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশিত হল, তখন এক-দল সাহিত্যরসিক ছুটলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। বললেন, ঠাকুর, ভানু সিংহের পর এবার আপনার এ কেমন ছদ্মবেশ? গল্পের আসর যে মাতিয়ে তুললেন আপনার 'বড়দিদিতে'?

আমি?—রবীন্দ্রনাথ অবাক, আমি লিখিনি ত? ওর লেখক এক নতুন ব্যক্তি। নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! খোঁজ নাওগে।

এই ভাবেই একদা শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

অধিকাংশ লেখকের পক্ষেই একটা অনু-শীলনের কাল থাকে, তাঁরা লিখতে লিখতেই বিশেষ নিপুণতা অর্জন করেন এবং এই

...ই তাঁরা ক্রমশ প্রতিষ্ঠালাভ করতেন। অমুক লেখকের অমুক গল্পটি ভাল হয়নি, অমুক গল্পটি মন্দ হয়নি, বা অমুক লেখাটি জমেনি—এ ধরনের মন্তব্য শরৎচন্দ্রের বেলায় শোনা যেতো না। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ থেকে তাঁর ছোট বা বড় গল্প রচনার বিস্ময়জনক দক্ষতা, তাঁর রচনারীতির সর্বজনগ্রাহ্য মাধুর্য, তাঁর অনুবীক্ষণিক দৃষ্টি, এগুলি ছিল তাঁর সহজাত গুণপনা। শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখনকার দিনে একালের মতো বিভিন্ন জীবনসমস্যা দেখা দেয়নি। সেটি প্রথম মহাযুদ্ধের কাল এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের যুগ। যুদ্ধ ঘটেছিল ইউরোপে, ভারতবর্ষ সেই যুদ্ধের বারুদের গন্ধ পায়নি। তখনকার দিনে বাঙলায় ছিল অনড় দারিদ্র্য, এবং সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে ছিল ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, হাঁপানি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি। মেয়েদেরকে বসিয়ে রাখা হত ঘরের মধ্যে, তাদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল যৎকিঞ্চিৎ, এবং তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে পুরুষসমাজের মুখ চাওয়া। তখন বাঙলার শহরে-নগরে অন্নবস্ত্র বা যে কোনও খাদ্য সামগ্রী ছিল সহজলভ্য, কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ছিল একেবারেই কম। গ্রামজীবন ছিল অনুন্নত, কিন্তু তবু এখনকার মতো অন্ন নিয়ে কাড়াকাড়ি ছিল না। শরৎচন্দ্র সেইকালের গ্রামীণ সমাজের মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত সাধারণের মুখপাত্র হয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজে দরিদ্র জীবন থেকে উঠেছিলেন। দেশের জনজীবনের প্রত্যেকটি স্তরে—উচ্চ-নীচ নির্বিচারে—তাঁর গল্প আপন প্রাণশক্তিতে প্রবেশপথ পেয়েছিল—এমন করে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনায় পাঠক সাধারণ অপর কোনও লেখককে সেদিন গ্রহণ করেনি। যে-গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মতো পাঠক অভিভূত হচ্ছেন, সেই একই গল্প পড়ে মুদি-মসলার দোকানের স্বল্প-শিক্ষার বিক্রেতাও আনন্দে আর আবেগে মুগ্ধ হচ্ছে। গল্প লেখকের পক্ষে এত বড় গৌরব এই শতকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য সাহিত্য জীবন বোধ হয় পঁচিশ বছরের বেশি নয়। সাহিত্য-গগনে রবীন্দ্রসূর্য যখন মধ্যপথে, তখন শরৎচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলেন অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের মতো এবং যখন চলে গেলেন তখনও পশ্চিম গগনে সেই রবীন্দ্রসূর্য অস্তাচলের শিরে দাঁড়িয়ে লোহিতরশ্মিজাল বিকীর্ণ করে রয়েছেন।

রাজনীতির দিক থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারাকে অনেকটা প্রভাবিত করেন এবং দেশবন্ধুর অনুরক্ত মহলে মজলিশী শরৎচন্দ্রের গল্প-গুজব আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এক সময়ে স্বর্গত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে তিনি একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'রূপ ও রঙ্গ।' তৎকালে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ মহলের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, হেমন্তকুমার সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং আরও অনেকে। শরৎচন্দ্রের খোশ গল্প এঁদেরকে মাতিয়ে রাখত। সম্ভবত এই মজলিসের কাল থেকেই শরৎচন্দ্রের কল্পনায় 'পথের দাবী' উপন্যাস দানা বাঁধে। সে যাই হোক, মজলিশী শরৎচন্দ্র নিজের শরীর-পালন, নিয়ম-নীতি বা স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিনিষেধ ইত্যাদির সম্বন্ধে সম্পূর্ণই উদাসীন ও বেপরোয়া ছিলেন। আফিং ও তামাক তাঁর নিত্য সহচর ছিল।

আহারাদি ছিল নির্বিচার এবং সে ব্যাপারে তাঁর সময়-অসময় বিবেচনা ছিল না। এই অনিয়ম থেকেই তাঁর নিজের প্রতি একপ্রকার নিষ্ঠুর অবহেলা আসে। তাঁর জীবন যে অতি মূল্যবান, একথা চিকিৎসকের মুখে শুনলে তিনি তাঁদের নিয়ে কৌতুকরঙ্গ করতেন। তাঁর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ছিল নানা প্রকার। তাঁর মাতুল তথা আবাল্য সুহৃদ সুরেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখে শুনেছি, শরৎচন্দ্র তাঁর তরুণ বয়সে বন্দুক নিয়ে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতেন। শুধু তাই নয়, রাত্রে শোবার সময়ে তিনি বালিশের তলায় মস্ত ছোরা লুকিয়ে রাখতেন এবং পরিণত বয়সেও তিনি নাকি পকেটে রিভলবার নিয়ে কলকাতায় ঘোরাফেরা করতেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদা শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েক বাণ্ডিল চিঠি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। সে প্রায় আড়াই শ' চিঠি হবে। রেঙ্গুন, কলকাতা, শিবপুর, সামতাবেড়, কাশী—বহু স্থান থেকেই চিঠিগুলি লেখা। বিস্ময়ের কথা এই, ১৯১৩ বা ১৯১৬ সালে লেখা চিঠিগুলিতেও তাঁর অসুস্থ ও অপটু শরীরের কথা রয়েছে। ১৯৩০-৩২-এও তাই এবং ১৯৩৬-৩৭-এর চিঠিগুলিও তাই। এত বড় একজন লেখক—যিনি চলে ফিরে বেড়ান, আমোদ-আহ্লাদ করেন, থিয়েটার ও সিনেমায় যান এবং কোথাও মজলিশে ঢুকলে আত্মহারা হন—তিনি পঁচিশ বছর ধরে নানা ব্যাধি ও পীড়ায় জীর্ণ হচ্ছেন, এটিও অভিনব। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তিনি রাত্রে ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন, এ খবর অনেকেই জানত। কথায় কথায় ডাক্তার ডাকা নিজের জন্য বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহ করা বা আপন বৈভব নিয়ে কথাবার্তা চালানো—এসব তাঁর ধাতে ছিল না। জীবন সম্বন্ধে তাঁর স্বভ বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্য, তাঁকে আত্মনা দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

৬১ বছর বয়স হতেই দেখা গেল, বহুকালের অর্শ রোগ ছাড়াও তাঁর পে মধ্যে লীভার ও কিডনির দোষ, তাৎ জ্বর, শরীরে বেদনা ও বাতব্যাধি, ফুলো উদরাময়—ইত্যাদি প্রবেশ করেছে। ডা ওষুধ দিয়েছে, তিনি ওষুধ সরিয়ে রেখে ও তামাক খাচ্ছেন এবং তার স আফিং। এমনি একটা স যখন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ কুম শঙ্কর রায় তাঁর চিকিৎসার ভার তখন একটু দেরীই হয়ে গেছে। সংবাদ বা সভা-সম্মেলনে যখন তাঁর স্বাস্থ্য ি উদ্বেগ প্রকাশ করা চলছে, তখন ি কুমুদশঙ্কর ও মাতুল সুরেন্দ্রনাথকে ি অনর্গল হাসি পরিহাসে মত্ত হয়ে উ ছিলেন।

দেখতে দেখতে অসুখ বেড়ে উঠ তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, হাঙ্গারফ স্ট্রীটের এক ইউরোপীয় নার্সিং হো সেখানে পরীক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন ল ব্যানার্জি, সুবোধ দত্ত, ক্যাপ্টেন এস চ্যাটা প্রভৃতি। উত্তমরূপে একস-রে পরীক্ষার দেখা গেল, রোগীর খাদ্যনালীর শেষপ্রা দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ বাসা বেঁধে শরৎচন্দ্র ছাড়া আর সকলেই এতে পেলেন। ক্যানসারের ওষুধ আ অনাবিষ্কৃত।

ইউরোপীয় নার্সিং হোমে আফিং তামাক থাকে না। শরৎচন্দ্র রুগ্ন ডাক্তারদের ডেকে বললেন, ...টি বস্তু তোমরা আমাকে না দাও তাহলে এক হঠাৎ সকালে এসে দেখবে আমি রাতার পাঁচিল টপকিয়ে পালিয়ে গেছি!

সুরেন গাঙ্গুলী মশাই শরৎচন্দ্রের কথা অবিশ্বাস করলেন না। সুতরাং ি শরৎচন্দ্রকে তুলে নিয়ে পার্ক নার্সিং হো ভর্তি করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই ভয় ব্যাধি উত্তরোত্তর যতই বাড়তে থাকে, দে ময় ততই উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। শা নিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে শর চন্দ্রকে লেখেন, "সমগ্র বঙ্গদেশ তো নিরাময় সংবাদ শোনার জন্য উদ্বিগ্ন হ প্রতীক্ষা করছে।"

এই চিঠি পেয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞ জানিয়ে শরৎচন্দ্র মহাকবিকে কি প্রকার জ দিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে মা সুরেন্দ্রনাথকে একটি ছত্র হাতে লিখে তি জানান, "এবার কেন্ শালা বাঁচে।"

শরৎচন্দ্রের হাতের লেখা এই চারটি শ ব্লক করে 'যুগান্তরে' ছাপা হয় সেই দি —যেদিন তাঁর মৃত্যু ঘটে।

যাই হোক, রোগের সংকটকালে বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় শরৎচন্দ্রের পে
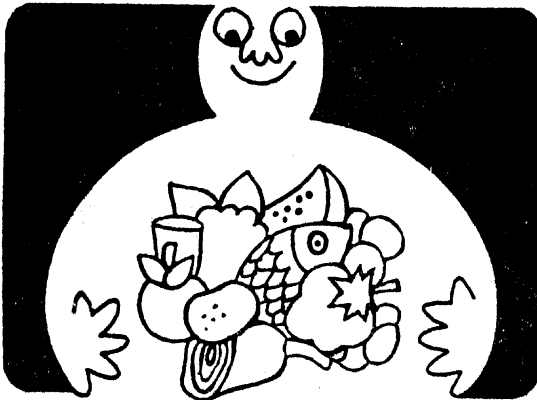
অস্ত্রোপচারের সিম্ধান্ত নিলেন। তখন দ্রুত-গতিতে অন্তিম ঘনিয়ে আসছিল। এই অস্ত্রোপচারের নাম 'জ্জুনোস্টমি।' কণ্ঠনালীর বদলে একটি রবারের নলের সাহায্যে ভিতরে তরল খাদ্যবস্তু পৌঁছিয়ে দেওয়া। এই প্রকার অস্ত্রোপচারের খরচ তখন এক হাজার টাকা।

এখানে একটি ছোট্ট বেদনাদায়ক ঘটনার উল্লেখ না করে পারিনে। শরৎচন্দ্র তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কিছুকাল আগে নানা কারণে তিনি অর্থশূন্য হন। তাঁর অশ্বিনী দত্ত রোডের নতুন বাড়ির দরুন দেনাও হয়েছিল। সেই অবস্থায় যখন তাঁর কঠিন ব্যাধি নিয়ে সমগ্র দেশব্যাপী উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে তখন একদিন সুরেন গাঙ্গুলী মশায় আমাকে নিয়ে গুরুদাসের দোকানে আসেন। তাঁর ধারণা, আমি সঙ্গে থাকলে হরিদাসবাবু আমাদের অনুরোধ ফেলবেন না। তিনি ভুল করেছিলেন।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাদি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে এবং ভবিষ্যৎকালেও হবে। কিন্তু সেদিন মাত্র এক হাজার টাকা তাঁর প্রকাশকদের কাছে পাওয়া গেল না। কারণ, হিসাব করে নাকি দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র সেদিন পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকা নিয়েছেন! সুতরাং তাঁদের পক্ষে আর কিছু দেওয়া সম্ভব ছিল না।

আমরা ফিরে এলুম। কিন্তু যাঁরা সেই চরম দুঃসময়ে শরৎচন্দ্রের নামে এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন নিউ থিয়েটার্সের মালিক বি এন সরকার, দেবসাহিত্য কুটীর এবং অজাতশত্রু প্রকাশক এম সি সরকারের মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়। এ'রা তিনজনে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, সুধীর একদিন তুমিই টাকা দিয়ে আমাকে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এনেছিলে, এবার বিদায় নেবার সময় তোমার টাকাই আমার অন্তিমের কাজে লাগল!

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে শরৎচন্দ্রের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু সাময়িক স্বস্তিলাভ ঘটলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। পার্ক নার্সিং হোমেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারিখটা ছিল ২ মাঘ, ১৩৪৪। বেলা তখন ১০টা। এই মৃত্যু সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ, সি এফ এণ্ডরুজ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গোপালা রেড্ডি, বাঙ্গালার গভর্নর লর্ড ব্রাবোর্ন প্রভৃতি গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুকালে শরৎচন্দ্রের বয়স হয়েছিল ৬১ বছর ৪ মাস। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে এক বিশাল শবযাত্রা নানা পথ পরিক্রমা করে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শবদেহ নিয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষের' কর্তৃপক্ষ আমাকে ডাকেন এবং পরবর্তী দুটি সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৪, শরৎচন্দ্র সংখ্যা হিসাবে আমাকে সম্পাদনা করতে বলেন। তখন রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় ভারতবর্ষের সম্পাদক। আমি ওই দুটি সংখ্যার 'শরৎচন্দ্র অংশের' নামকরণ করি, "অপরাজেয় কথাশিল্পী সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য।"

এই সংখ্যা দুটিতে তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক ও লেখিকাদের বহু মূল্যবান রচনা ছাপা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানিকুমারী বসু, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার—এ'দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন ও তাঁর কাহিত্যচর্চার যে আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখে পাঠান শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট—শরৎচন্দ্রের বাল্য, কৈশোর ও তরুণ বয়সের এমন নির্ভুল ইতিহাস আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি যে টেলিগ্রামটি পাঠাই, তার জবাবে মহাকবি প্রথম পাঠিয়ে দেন একটি কবিতা, সেটি এই :

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'॥

১২ মাঘ ১৩৪৪ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির চিঠি

অতঃপর তিনি আরেকখানি পত্র আমার নিকট পাঠান, সেইটিই বোধ করি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর প্রীতির সর্বশেষ নিদর্শন। চিঠিটি এই :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার অনুরোধটি আমার পক্ষে সহজে স্বীকার্য নয় একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে। তার প্রধান কারণ দাবী চারদিক থেকে এসেছে, অনেককে নিরাশ না করলে একজনের আশা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ পুণ্য যতটুকু অর্জন করবো অপরাধের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে পড়বে। অথচ হরির লুঠের মত চারদিকে রচনার হালকা বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। সকলের চেয়ে বড় বিঘ্ন রূপে সত্তাত্তর বছরের উপর জয়ধ্বজা উঁচিয়ে বসে আছে জরা, কর্মের পথে যে-টুকু বরাদ্দ সে মঞ্জুর করেছে সেটার উপর নির্ভর করে নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে লজ্জা বোধ করি। মহাকাল হঠাৎ একসময়ে কৃপণ গবর্মেণ্টের মত বেতন লাঘব করতে আরম্ভ করে, আমার উপর সম্প্রতি সেই বিধান চালানো হয়েছে। এতদিন যাদের মুঠো ভরে দিতে পেরেছি আজ তারা ক্ষমা করে না।—কৃপণতা যে আমার নয়, কৃপণতা কালেরই সে-কথা তারা কিছুতেই মানতে চায় না, কেন না কালকে গাল দিলে সে তার গায়ে লাগে না। সেই-জন্যেই শরতের মৃত্যুতে একখানি সার্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে দেওয়ার বেশী আর কিছু করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল নিতান্ত অবিবেচকের মত শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি: আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ-করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উলটোটাই ঘটে তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময় মত মরতে পারতুম তা হলে নিঃসন্দেহই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন। শরতের জন্যে তোমাদের শোককৃত্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমার পক্ষের এই কথাটা মনে রেখো যে, আমি যখন বিদায় নেবো তখন শরৎ থাকবেন না। আমার জীবন-রঙ্গভূমিতে যবনিকা পতনের সময় আসন্ন, এখন থেকেই ভেবে দেখ বড়ো আওয়াজের হাত-তালিটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে। একটা ভালো মতো তালিকা যদি পাঠিয়ে দাও তবে সেইটে চোখের সামনে রেখে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই যতটা পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মরতে রুচি হয় না।

আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা গিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা করে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে

সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারেনি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলেম সেটাকে আমি মস্ত লাভ ব'লে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশী সত্য করে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তার পূর্ববর্তীদের অল্প কারো তেমন ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্বতোবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে। বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্যমণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনাশোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক ক'রনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অবাবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্য যে নিভৃত কোণ আশ্রয় করে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হোলো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয় যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়ো দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসায় পক্ষে এই যথেষ্ট।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপার সেভেন রেকর্ড

আগমনী গান
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

পদাবলী কীর্তন
'গৌরলীলা'
গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকগীতি
নির্মলেন্দু চৌধুরী

বাউল
পূর্ণদাস বাউল/
প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও মঞ্জু দাস

দ্বিজেন্দ্রগীতি
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শর্বাণী সেন

আধুনিক
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বৃন্দগান (স্টিরিও)
ক্যালকাটা ইউথ কয়্যার

ই. পি. রেকর্ড

আধুনিক
অনুপ ঘোষাল
আরতি মুখোপাধ্যায়
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মান্না দে
শ্যামল মিত্র
শ্রাবন্তী মজুমদার
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
হৈমন্তী শুক্লা ও
অরুণ দত্ত

কাব্যগীতি
মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

এইচ এম ভি-র
শারদ অর্ঘ্য

কৌতুকগীতি
মিন্টু দাশগুপ্ত

কৌতুক নক্সা
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশিকান্তের গান
গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়
ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়

ভক্তিগীতি
নির্মল মুখোপাধ্যায়

এস. পি. রেকর্ড

আধুনিক
অমিতকুমার
অরুন্ধতী হোম চৌধুরী
আশা ভোঁসলে
উষা মঙ্গেশকর
কল্যাণ মুখোপাধ্যায়
কিশোরকুমার
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্মলা মিশ্র
পিন্টু ভট্টাচার্য
বনশ্রী সেনগুপ্ত
রাণু মুখোপাধ্যায়
রাহুল দেব বর্মণ
শিপ্রা বসু

এল. পি. রেকর্ড

'দূর কোন পরবাসে'
বরণীয় শিল্পী শচীন দেব বর্মণের কণ্ঠে স্মরণীয় কয়েকটি গান

'গোল্ডেন লিরিকস অফ অজয় ভট্টাচার্য'
সঙ্গীতে ঃ হেমন্ত, সন্ধ্যা, ধনঞ্জয়, আরতি, মানবেন্দ্র, নির্মলা, তরুণ, প্রতিমা, ভূপেন হাজরিকা, মীনা মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর, শিপ্রা, অনুপ ও শ্যামলী মুখোঃ
সুরকার ঃ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর মিত্র, হেমন্ত, মানবেন্দ্র, বীরেশ্বর সরকার, ভি, বালসারা, প্রবীর মজুমদার, অশোক রায় ও নির্মল ভট্টাচার্য

নাটক
'বিবি আনন্দময়ী'
পরিবেশনায় ঃ 'শিল্পীতীর্থ'
পরিচালনায় ঃ অরুণ রায়
সঙ্গীতে ঃ শ্যামল মিত্র
রূপায়ণে ঃ জ্যোৎস্না দত্ত, ভোলা পাল, অসীম বোস, মণীন্দ্র নন্দী, গুরুদাস ধাড়া ও অন্যান্য।

শিশুদের জন্য
'ছোটদের রামায়ণ'
রচনা ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত ঃ সুধীন দাশগুপ্ত
রূপায়ণে ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অংশুমান রায় ও অন্যান্য

ইলেকট্রিক গীটার
১২টি হিন্দী চিত্রগীতির জনপ্রিয় সুর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতি শনিবার রাত ৯॥০ থেকে ১০টা পর্যন্ত কলকাতার 'বিবিধ ভারতী' কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হচ্ছে 'এইচ এম ভি সঙ্গীতাঞ্জলি'' শুনতে ভুলবেন না।

অচিরেই প্রকাশিত হবে আপনাদের চির প্রিয়—চির নতুন 'শারদ অর্ঘ্য'।

এছাড়া শারদীয়া সংখ্যা 'রেকর্ড সঙ্গীত'ও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

HMV হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি এ-লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানা-বিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে, কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এইসব মিথ্যের আপনি প্রতীকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতীকার করার দায় আমার নয়—তাঁদের। তাঁদের করতে বলোগে—"[1]—কথাগুলি শরৎচন্দ্রের।

এই মিথ্যার প্রচার শুধু তাঁর বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত নিয়েই নয়। তাঁর অন্তিম-কালে মৃত্যুক্ষণ ঘিরেও এক নাটকীয় রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা চলে। কোথায় ও কেমনভাবে,—তারই উল্লেখ প্রথমে করি।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "শরৎ পরিচয়" নামে একখানি বই আছে। তারই শেষ অংশে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা এই:

"অপারেশন হোল। তাতে দেখা গেল যে যকৃতটা একেবারে পোচে গেছে। সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্যে একটা নল বসিয়ে দিয়ে—তরল খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র হোল। টাকা যা খরচ হোল, তা পাঁচ ছ' শোর কম হবে না।

ললিতবাবু[2] বোললেন: বৃথা নার্সিং হোমে রেখে টাকা খরচের প্রয়োজন কি? বাড়ী নিয়ে যান। অস্ত্রের পর ললিতবাবু আর ফি নেননি।

বাড়ীতে তাঁকে নীচের হল ঘরে রাখার ব্যবস্থা হল। ললিতবাবু রাত ন'টা দশটার সময় এসে দেখে বোললেন: কাল ভোর ছটার সময় অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে এসে আমি বাড়ী পৌঁছে দেবো।

সব ঠিক হোল। সন্ধ্যের কিছু আগে আমি বাড়ীতে খেতে যাবার সময় শরৎকে বোললাম, কাল সকালে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। একটি কথা মনে রেখো—মুখ দিয়ে কিছু খাবে না। শরৎ বোললেন: দেখ, তুমি আমাকে খুব চেন। কারণ না বোললে আমি কোন আদেশ উপদেশ মানিনে; বুঝিয়ে দাও, কেন খাব না।

মুখ দিয়ে খেলে তোমার নিশ্চয় বমি হবে। যদি বমি হয় তো পেটের সব বাঁধন কেটে গেলে আর রক্ষা করা যাবে না। এতো অতি সহজ কথা।

শরৎ আদর করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বোললেন: এবার তুমি আমাকে খাইয়ে দিয়ে যাও।

খাওয়ান, মানে টিউবে কোরে—আঙ্গুরের রস খাইয়ে দিয়ে বোললুম,—খেতে যাচ্ছি। নটা দশটার সময় ফিরবো।

শরৎ বোললেন: কেন কষ্ট কোরে আসবে?

বাঃ সকালে ললিতবাবু এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন, ঠিক হোয়ে গেছে। আজ তোমার খাট, বিছানা বাইরের ঘরে আনা হোয়েছে। এখেনে থেকে মিছে খরচপত্র হোচ্ছে। তুমি একটু সারলে—তোমাকে কুমুদবাবু[3] ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে উচিত ব্যবস্থা কোরে ফিরিয়ে আনবেন।

*

বাড়ী এলাম; বড়মাকে[4] বোললাম তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আজ—কাল সকালে শরৎকে বাড়ী আনতে হবে।

খেতে বোসলে ছোটমা[5] এসে বোসে বোললেন—তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন

আসার সময় তাঁকে দেখতে পাইনি আমি হেঁটে এসেছি। এক্ষুনি খেয়ে ফিরবো। এমন সময় প্রকাশ[6] এসে বোললেন: দাদা বোলে দিলেন আপনি সকালে যাবেন। আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম

বেশ, আমি হেঁটেই যাব।

কি দরকার? প্রকাশ বোললেন।

উত্তরে বোললেম,—শেষ রক্ষা দরকার হেঁটেই যাব।

হেঁটে যাবার সময় দুই বৌ আমার যাওয়ায় বাধা দিতে লাগলেন।

বোকা মানুষ তো, তাঁদের দুঃখ কোরলাম।

তখন রাত দুটো হবে। ফোন বেজে উঠলো।

কে?

---

১ 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত—পঞ্চম সংস্করণ,—পৃঃ ২১৫—'বাল্যস্মৃতি'।

২ ডাক্তার ললিতমোহন ব্যানার্জি—তৎ-কালীন বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক।

৩। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়

৪ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী—হিরণ্ময়ী দেবী।

৫ শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রী।

৬ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

রুমটার।

ইংরাজিতে প্রশ্ন হোল : ডাঃ চাটার্জি কেমন?

ভালই।

কোথা থেকে বোলছো?

বাড়ী থেকে।

ফোন স্তব্ধ হোল।

বড়মা দৌড়ে এলেন। কি মামা?

কিছু না, কাগজওয়ালারা জানতে চাচ্ছে।

শুনে মনে হোল কিছু একটা গোলমাল হোয়েছে। রয়টার জানতে চায় কেন?

নার্সিং হোমে ফোন করতেই—জবাব এলো—ডাঃ চ্যাটার্জি বমি কোরছেন।

সর্বনাশ!

উঠে পোড়লাম। ছুটে পায়খানায় যাচ্ছি—বড়মা বেরিয়ে বোললেন : কি হোয়েছে মামা?

আমাকে যেতে হবে।

চা কোরে দি? বোলে তিনি স্টোভ জ্বাললেন।

চা খেয়ে—তখনও বেশ অন্ধকার—ছুটে দিলাম।

পৌঁছে দেখি শরৎচন্দ্র বমি কোরছেন এবং মৃত্যুঞ্জয়[৭] পাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকতেই তিনি অদৃশ্য হোলেন।

একি শরৎ?

আমি মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে—

চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

ডাঃ সুশীলকে[৮] ডাকতে তিনি এলেন।

তিনি ফোন কোরলেন কুমুদবাবুকে। তিনি এলেন।

বমির পর বমি!

অবশেষে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান লোপ হোল। আমাদের সকল প্রচেষ্টার শেষ হোল।

ললিতবাবু এলেন।

ফিরে গেলেন।

এইখেনেই শরৎচন্দ্রের জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের শেষ!"

সুরেন্দ্রবাবুর এই বিবৃতি নির্ভরযোগ্য ও প্রকৃত বলে গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। শরৎচন্দ্রের তিনি শুধু আত্মীয়ই ছিলেন না, তাঁর আবাল্য বন্ধুও। শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ কয়েক মা[illegible] তাঁর নিকটে থেকে রোগীর যথে[illegible] সেবা-শুশ্রূষাও তিনি করেন। অতএব, 'শরৎ পা[illegible]য়' লেখবার তাঁর অধিকারও থাকে। সে বই-এর প্রথম প্রকাশ কবে, জানি না। শরৎচন্দ্রের জীবনী নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়, তার কোন জীবনীই পড়বার আমার আগ্রহ থাকে না। সুরেন্দ্রবাবুর এই রচনা দু'একজন বন্ধু অনেককাল পরে আমার নজরে আনেন। তখন দেখে দুঃখ জাগে, তাঁরও বইখানিতে ভুল তথ্যের সমাবেশ। সেসব ভুল দেখানো এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বর্ণনার মাধ্যমে তিনি যে অসত্যের প্রচার করে গেছেন ও দেশের লোকের মনে এক অবাস্তব ও অলীক ছায়াচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, সেই মিথ্যার মুখোশ খুলে দেওয়াই উদ্দেশ্য।

---

৭ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন,—তাঁর সাংসারিক কাজেকর্মে সেবা করতেন।

৮ পার্ক নার্সিং হোমের ডাক্তার সুশীল চট্টোপাধ্যায়।

বাদ-প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব নয়, রুচিতেও বাধে। তাছাড়া সুরেন্দ্রবাবু আজ পরলোকে। তাঁর সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শরৎচন্দ্রের অন্তিম-কালে তাঁর অতি সন্নিকটে উপস্থিত থাকার আমারও সুযোগ হয়। নানা কারণে এর প্রচারণে সংকোচ বোধ করি। তবুও, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুরেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত বিবরণীর প্রতিবাদ সবিনয়ে লিখে যাই।

সুরেন্দ্রবাবুর বর্ণনার মধ্যে ঘটনার অস্বাভাবিকতা, সময়ের বিভ্রান্তি ও অসংগতি সহজেই চোখে পড়ে। "যকৃৎ একেবারে পচে গেছে", অপারেশনের পর রোগীর "পেটের সব বাঁধন" বাঁধা, নল-বসানো—সেই অবস্থায় অপারেশনের তিন দিনের মধ্যেই ললিতবাবুর মত প্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক, কেবলমাত্র খরচ বাঁচানোর জন্য শরৎচন্দ্রকে বাড়ী নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন,—একথা ভাবাই যায় না। শুধু তাই নয়। ললিতবাবু চলে এলেন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে "রাত নটা দশটার সময়"—রোগীকে বাড়ীতে এনে নীচের হল-ঘরে রাখার ব্যবস্থা দেখতে। তারপর নিজেই বললেন, "কাল ভোর ছটার সময়" অ্যামবুলেন্স করে তিনিই বাড়ী পৌঁছে দেবেন। যাঁরা ললিতবাবুকে দেখেছেন বা জানতেন তাঁরা একবাক্যে বলবেন, ললিতবাবুর পক্ষে এসব বলা বা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিধানবাবু, কুমুদ-শংকর, যাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং ডাক্তার হিসাবে নিয়মিত দেখছেনও—তাঁরা তখন কোথায় গেলেন বোঝা যায় না।

যাই হোক, ললিতবাবুর সঙ্গে রাত নটা দশটার সময় এইসব কথাবার্তা হবার পর সুরেন্দ্রবাবু নার্সিং হোম-এ গেলেন এবং "সন্ধ্যের কিছু আগে" খেতে যাবার সময় (!) শরৎচন্দ্রকে জানালেন, "খেতে যাচ্ছি। নটা দশটার সময় ফিরবো।" পরের দিন "সকালে ললিতবাবু এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন, ঠিক হোয়ে গেছে।"—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাড়ী ফিরে তবে বড়মাকে জানালেন, "কাল সকালে শরৎকে বাড়ী আনতে হবে।" অথচ, এর আগে শরৎচন্দ্রের খাট বিছানা নীচে বাইরের হল-ঘরে নামিয়ে এনে রাখা হয়েছে (বাড়ীর দোতলায় শরৎচন্দ্রের শোবার ঘর), ললিতবাবু এসেছিলেন, এতো কাণ্ড, তবু বড়মা বাড়ীতে থেকেও কিছুই টের পেলেন না, শরৎচন্দ্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তাও তাঁকে জানানো হোল না,—এও কি সম্ভব?

বাড়ী ফেরবার কিছু পরে প্রকাশচন্দ্র এলেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁকে জানালেন, "শেষ রক্ষা দরকার", তাঁকে তাই রাত্রে তখনি আবার নার্সিং হোম-এ ফিরতে হবে।

কীসের "শেষ রক্ষা"? নার্সিং হোম থেকে বাড়ীতে যেতে আসার আগে শরৎ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, মুখ দিয়ে কোন কিছু না খাওয়ার সতর্কবাণী, অন্যথায় সমূহ বিপদের আশঙ্কাপূর্ণ যুক্তি দেখানো,—এরই মধ্যে এ-প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাবটা যেন, শরৎ-চন্দ্র মুখ দিয়ে আফিং খেয়ে আত্মহত্যার সুযোগ খুঁজছেন, আর তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর আপ্রাণ চেষ্টা।

তারপর। রাত দুটোয় রয়টারের টেলি-ফোন। রয়টারই বাড়ীর নম্বরে করছেন। প্রশ্নের উত্তরও পাচ্ছেন। তবুও তাঁরাই জিজ্ঞাসা করছেন, "কোথা থেকে বোলছো?"

এরপর নাটক আরও জমে। বমির খবর পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ "ছুট" দিয়ে নার্সিং হোম-এ এলেন বালিগঞ্জের বাড়ী থেকে। পৌঁছেই দেখেন, শরৎচন্দ্র বমি করছেন, পাশে দাঁড়ানো মৃত্যুঞ্জয় তখনি অদৃশ্য হোয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্র স্বীকার করলেন, —"মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে—"

অথচ, নার্সিং হোম-এ রোগীর শয্যা-পার্শ্বে চব্বিশ ঘণ্টা নার্স। মরণোন্মুখ রোগী। মৃত্যুর আগের রাত্রে আমি ও আরও কয়েকজন সারা-রাতই নার্সিং হোম-এ জেগে কাটাচ্ছি,—কখন বুঝি বা সব শেষ হয়!

কিন্তু থাক ঐ বিবরণীর আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ। প্রকৃত বৃত্তান্ত আমার যা জানা তাই লিখি।

*

১৯৩৭ সাল। নভেম্বর মাস। অর্থাৎ,

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দু'মাস আগে সুরেন্দ্রবাবুর এক চিঠি পাই। তারিখ ১৮ই নভেম্বর। সামতাবেড় থেকে তিনি লেখেন:

"গত ৩রা নভেম্বর শরতের অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে চলে আসি, সেই অবধি এইখেনেই আছি। অসুখটা এখনও বিশেষ বাগ মানেনি। মধ্যে মধ্যে দু-চার দিন সামলায়—আবার যে-কে সেই চাল! ভাত ইত্যাদি মোটে হজম হয় না। তরলের মধ্যে দুধ—তাতে অরুচি; সম্প্রতি ওটের পরীক্ষা চলেছে কলকাতা যাবার তেমন গা-গোছ দেখিনে। হয়ত একদিন হঠাৎ খেয়াল হবে। গেলে ত জানতেই পারবেন।......"

সেইমত শরৎচন্দ্র একদিন চলেও আসেন কলকাতায়। রোগ তাঁর ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ডাক্তারদের পরীক্ষা ও চিকিৎসা চলে। পেটের অপারেশনের কথাও ওঠে। সেই সময়কার ও পরবর্তী কিছু ঘটনার সামান্য বিবরণী দিয়ে আমার এক ছোট প্রবন্ধ 'শরৎচন্দ্রের শেষ লিখন' শিরোনামায় ১৩৬৩ সালের শারদীয়া 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করি:

"১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাস। বড়-দিনের ছুটি। সপ্তাহ খানেকের জন্যে কলকাতার বাইরে যাবো কিনা ভাবছি।

শরৎচন্দ্রের পেটের ব্যথাটা বেড়ে চলেছে। দুর্বলতাও বাড়ছে। অস্ত্র করা চলবে কিনা ডাক্তাররা আলোচনা করছেন। নানান রকম পরীক্ষা চলেছে। ডাক্তার কুমুদ-শঙ্কর রায়ের ল্যাবোরেটারিতে প্রায় রোজই যান। তিনি শুধু চিকিৎসক নন, তাঁর পরম ভক্ত, বিশ্বস্ত বন্ধু, একান্ত অনুরক্ত। ব্যথার যাতনা আছে, তবু ঘোরাফেরা কমতি হলেও বন্ধ নয়। হেসে বলেন, এ সারবার নয়। তুমি কদিন ঘুরে এসো। এ ক'দিনে কাটাকুটি করার সম্ভাবনা নেই। এক সপ্তাহ তো? তা ছাড়া কুমুদও তো কদিন বাইরে যাচ্ছেন। তুমি চিঠিতে সব খবর পাবে। দরকার হলেই আসতে লিখব, তখনি কিন্তু চলে এসো নিশ্চয়।

শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী তখন তাঁর কাছে থাকেন। সব দেখাশুনা করেন। শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয় প্রকৃত বন্ধু। তিনি চিঠি লেখার ভার নেন।

২৫শে ডিসেম্বর তিনি লিখে জানান:

"৫টা সকাল।

......সেদিন কুমুদবাবুর লেবরেটারিতে শরতের পরীক্ষা হয়েছিল ' এবং সুবোধ-বাবু[৯] অস্ত্র করতে রাজিও আছেন। পরের দিন সকালে সুবোধবাবুর বাড়ী যাই—সবিশেষ জানার জন্যে, কিন্তু তিনি কোন কথাই আমাদের অর্থাৎ যারা ডাক্তার নয় তাদের বলতে চান না।

দুদিন শরৎ ছুঁচির ভোজন করাতে আরও দুর্বল হয়ে গেছেন। কাল সন্ধ্যা বেলায় হঠাৎ শরীর খুব খারাপ বোধ হয়—কুমুদ-বাবু নেই—অন্য কোন ডাক্তার ডাকতে চাই—তা দেবেন না। অতএব ঘন ঘন ক্যালিফস—আর আফিং দিয়ে টালটা সামলায়।

...কাল একটি নার্সিং হোম ঠিক করেছি। পার্ক স্ট্রীটে সুশীল চাটুয্যের—সুশীল ভাগ্যক্রমে আমাদের ভাগ্নী-জামাই-এর ছেলে। বোধ হয় শুক্রবারে ৩১শে ওখানে যেতে হবে।

আজ ৭॥টার সময় সকালে ডাঃ দাস-গুপ্তের[১০] সঙ্গে সুবোধবাবুর কাছে যাব। এখন এই পর্যন্ত—ফিরে এসে যা হয় জানাব। মোট কথা আপনি চলে যাওয়াতে আমাদের ভরসা কমেছে—যদি ২।৪ দিনের

---

৯ ডাক্তার সুবোধ দত্ত—প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক

১০ ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত

"লিওর শ্যাম্পুর
মনমাতানো সুরভির রেশ...
তাজা হয়ে থাকবে
আপনার তাঁর মনে."
বলেন, অ্যানিটা রবিন্‌স্‌, এক্সপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
লিওরের রকমারি নতুন শ্যাম্পুর। প্রত্যেকটিতে আছে নিজস্ব বিশিষ্ট সৌরভ। আর, এই শ্যাম্পুগুলি সবরকম যত্ন নিয়ে আপনার চুল করে তোলে পরিষ্কার, সুন্দর, আকর্ষণীয় সৌরভে ভরপুর···যাতে আপনার তাঁর মন মেতে ওঠে।
লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয় সৌন্দর্য্য, লিওর শ্যাম্পুর যত্নে হয়—নির্মল, সুন্দর, সুরভিত অনিবার্য্য!
Lure
Lure
Lure
Lure
SHIKAKAI SHAMPOO
Creative Unit-A 2251-Ben

মধ্যে ফিরে আসতে পারেন ত' বড় ভাল হয়। আশা করি তা করতে পারবেন। ৩০শে ফিরে আসুন।

১০টার।

সুবোধবাবু আজ ৬।টায় সময় আসবেন। তিনিই আজ থেকে রুগীর চার্জ নেবেন......।"

দুদিন পরেই চিঠি পাই।

"২৭।১২।৩৭ বেলা দশটা।

কাল আর সময় করে উঠতে পারি নি চিঠি দেওয়ার। আজ সকাল শান্তভাবেই আরম্ভ হচ্ছে—তাই ও বেলার জন্য ভয় হয়। এখন মুড়ির সংগে তামাক খাওয়া চলছে। মুড়ি খাদ্য হিসাবে নয় : ওটা শুধু খাবার ইচ্ছাকে তৃপ্তি দেবে বলেই ডাক্তারেরা মানা করেন না। কাল শুতে আমাদের ১২॥টা হয়েছিল।

এখন ডুশ দেওয়ার পর্ব হতে হতে বোধ হয় বেলা ১২টা হবে। তারপর অলিভ অয়েল মাখা—তারপর রেকটাল গ্লুকোজ—তারপর ১০০ সি সি গ্লুকোজ—ইণ্টার ভেনাস। এর মধ্যে একটা স্ট্রীকনিন অবসর মত দিতে হবে।

পেটে—মুখ দিয়ে কোন খাবারই সইচে না : এমন কি টুইনকানি'সও নয়। মুখের খাবার কেবল কষ্টই সৃষ্টি করছে। কিন্তু আত্ম মেটবার জন্যে ওটা। রাতে দেরী হয় কাজ আরম্ভ করতে। অলিভ অয়েল মাখানো, তারপর রেকটাম দিয়ে তিন আউন্স দিয়ে দেওয়া। শেষ শুতে শুতে কাল রাতে বললেন : শোন একটা গান : শেষ পারানির কড়ি, আমি কণ্ঠে নিলাম গান। আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব—তাই তোমায় গান শোনাচ্ছি।

বাকি খবর ভাল। আমার পূর্বের আপিল আপনার ফেরার সম্বন্ধে দ্বিতীয় তাগিদের দ্বারা সজোর করতে চাই।......"

এ-চিঠি পেয়েই কলকাতায় ফিরে এলাম। সেদিন ৩০শে ডিসেম্বর।"

আমার ঐ প্রবন্ধে লিখিত এর পরের কয়েকটি ঘটনার এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। জীবনপ্রান্তে এসে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে সেই অমর কথাশিল্পীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক শক্তি ও রসবোধ তখনও কেমন সজাগ ও প্রখর থাকে তারই কতিপয় দৃষ্টান্ত লিখেছিলাম। এবং তাও তাঁর অপারেশনের দিন ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত। সুরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত মৃত্যুক্ষণ তার পরের ঘটনা।

নার্সিং হোম-এ থাকাকালে স্থূলে ঘটনা-গুলি যা আমার চোখে দেখা অথবা আমার কাছে যে কাগজপত্রাদি এখনও আছে তা থেকে জানা যায়—তারই উল্লেখ করি।

শরৎচন্দ্রকে প্রথমে যে নার্সিং হোম-এ নিয়ে যাওয়া হয়,—সেখানে তিনি থাকেন আড়াই দিন,—২৯শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর। সেই নার্সিং হোম-এর বিল ও রসিদে নাম দেখা যায়, মিস রিয়রডান-এর প্রাইভেট নার্সিং হোম। ঠিকানা—৫ সুবারবন হস-পিটাল রোড। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শরৎচন্দ্রকে পার্ক নার্সিং হোম, ৪ ভিকটোরিয়া টেরেস-এ নিয়ে আসা হয়। তাঁর তখনি এমন শারীরিক দুর্বলতা ও রোগের গুরুতর অবস্থা, রোগীকে আনতে হয় অ্যামবুলেন্সে করে। যদিও দুই নার্সিং হোম-এর মধ্যে দূরত্ব অতি সামান্যই।

পার্ক নার্সিং হোম-এ শরৎচন্দ্র এলেন। প্রত্যেক নার্সিং হোম-এ 'ভিজিটিং-আওয়ারস'-এর বিধিবিধান থাকে। তবুও

এখানে এসে ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে আমাদের কয়েকজনের রোগীর কাছে যখন-তখন যাওয়া-আসার ও থাকবার বাধানিষেধ ছিল না। আমি প্রায় সারাক্ষণই শরৎচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে থাকতাম। এমন কি সারা রাতও কাটতো।

ওই নার্সিং হোম-এ নিয়ে আসার পরের একটি ঘটনা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শুধু ডাক্তার হিসাবেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে আসতেন না তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। কখনও ফি-ও নেননি। বিধানবাবুর সঙ্গে আমাদেরও পারিবারিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। যথারীতি এখানে তিনি শরৎচন্দ্রকে দেখতে এলেন। আরও দু-একজন ডাক্তার সে-সময়ে উপস্থিত। শরৎচন্দ্রের অহিফেন সেবনের অভ্যাস আমাদের সকলেরই জানা। তাই, বিধানবাবু রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে এ-বিষয়ে জানতে চাই, আফিং খেতে চাইলে কি করা যাবে? কে একজন ডাক্তার তখনি বলে ওঠেন, নাঃ, নাঃ—ও সব আর চলবে না। —বিধানবাবু গম্ভীর মুখে নিষ্কম্প কণ্ঠে যে কথাগুলি তখন বলেন, এখনও তা কানে বাজে,—আফিং না খেতে দিলেও কি ওঁকে তোমরা আর বাঁচাতে পারবে?—তারপরই আমাকে জানান, ও নিয়ে ভাববার কারণ নেই, এখন আর খেতে চাইবেন না, দেখো।

বিজ্ঞ ডাক্তারের অভিজ্ঞতা, অথবা শরৎচন্দ্রের মনোবল সম্বন্ধে বিশ্বাস—কিসের ভিত্তিতে ওই কথাগুলি বলা, জানি না।

কিন্তু বিধানবাবুর সেই উক্তির যাথার্থ্য নিজের চোখেই দেখি। শরৎচন্দ্র অতিরিক্ত ধূমপানও করতেন। অথচ, এর পরে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকদিন কখনও ধূমপানের অথবা অহিফেন সেবনের জন্যে তিনি আর কোন আগ্রহ দেখাননি, খেতে চানও নি, খানও নি। খাওয়ার আকাঙ্ক্ষামাত্রও যে মনে জেগেছে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশও দেখিনি। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছি, শেষের যে ক'দিন যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, নিশ্চিত মরণের সম্মুখে দাঁড়িয়েও কি প্রশান্ত মুখচ্ছবি। 'ভয়হীন। অবিচল। সাহসে অটল।'

অহিফেনের বা ধূমপানের প্রতি তাঁর এই অনাসক্তির হয়ত একটা কারণ, পার্ক নার্সিং হোম-এ আসার পর থেকে সর্বদা তাঁর বমি-বমি ভাব ও হিক্কার ক্লান্তিদায়ক উপসর্গের প্রকাশ। তরল পথ্যও পেটে থাকে না। তখনি উঠে আসে। পেটে অসহ্য যন্ত্রণাও। তাঁর যাতনা দেখে আমাদেরও কষ্ট হয়, কিন্তু তিনি অবিচলিত। তাঁর সাহস থেকে সাহস নিয়ে মিথ্যা আশায় বুক বেঁধে বসে থাকি তাঁরই পাশে। জানি না, রোগক্লিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুর এই করুণ দৃশ্য এড়াবার জন্যই কি না, সুরেন্দ্রবাবু রোগীর ঘরে খুবই কম যেতেন। বেশির ভাগ সময় কম্পাউণ্ডে-রাখা শরৎচন্দ্রের মোটরগাড়ির মধ্যে চুপ করে বসে থাকতেন। তাঁর উপর যে-সব দায়িত্বভার থাকে তার মধ্যে খরচখরচার টাকার ভারটাই প্রধান। সুরেন্দ্রবাবুর নামে ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। যাকে যা টাকা দেবার, চেক কেটে দিতেন। সেই চেক-বই-এর কাউন্টার ফয়েল-অংশ ওই সময়কার কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে আমার কাছে রয়েছে।

এই নার্সিং হোম-এ অতিবাহিত দিনগুলির কয়েকটি পারম্পরিক ঘটনা, রোগীর অপারেশন ও পরবর্তী অবস্থার নিম্নমুখী গতির প্রধান ধাপগুলি বলি।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭—পার্ক নার্সিং হোম-এ আসা। তারই দু-একদিন পরেই রোগীর বমি ও হিক্কা শুরু। পেটের যন্ত্রণা তো আছেই। ডাক্তাররা ঘন ঘন আসেন। এই উপসর্গের উপশমের বৃথাই চেষ্টা করেন। কখনও বাড়ে, কখনও হয়ত ক্ষণিক ক্ষান্ত হয়। নার্সিং হোম-এ নার্সের ব্যবস্থা থাকে। তবুও শরৎচন্দ্রের চব্বিশ ঘণ্টা সেবাশুশ্রূষার জন্য অতিরিক্ত নার্সেরও আয়োজন হয়। লেডি রজার্স ইনডিয়ান নার্সেস হসটেল থেকে সারাদিন ও সারা রাত্রির জন্য নার্স আসতে থাকে। ৮ই জানুয়ারির রাত্রি থেকে ১৬ই জানুয়ারি—তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলে। এঁদের বিল-এর টাকাও চেক কেটে দেওয়া হয়। তাতেও এই একটানা তারিখগুলির উল্লেখ আছে। নার্সিং হোম-এ অনেকেই আসেন খবর নিতে। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় মাঝে মাঝে 'বুলেটিন' লিখে বাইরে টাঙিয়ে দেন। তারও একটি কপি এখনও কাগজপত্রাদির মধ্যে রয়েছে :

"9|1|38 (Bulletin)

Dr. Sarat Chandra Chatterji's condition remains the same. He had no hiccough today. He passed 14 ounces of urine. He is still troubled with nausea.

9.30 P.M. K. S. RAY"

ডাক্তারদের কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায় অপারেশনে বিশেষ কিছু ফলের প্রত্যাশা রাখেন না। এই সময়েই একবার কথা ওঠে, অপারেশন যদি নাই হয় তবে অর্থব্যয় করে নার্সিং হোমে থাকা কেন, বাড়িতে আনিয়ে চিকিৎসা চলুক। প্রস্তাবটি করেন ডাক্তার কুমুদশঙ্কর। সেইমত ব্যবস্থাও হতে থাকে। কিন্তু পরের দিনই শরৎচন্দ্র নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁর সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেন, অপারেশন করালে আরোগ্যের বিন্দুমাত্রও আশা যদি থাকে তিনি তাই করাতে চান : ডাক্তাররাও সম্মত হন। দুদিন পরে অপারেশন হবে স্থির করা হয়।

নার্সিং হোম ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসার এই আয়োজনের বিবর সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বর্ণনায় রূপান্তরিত করে নিয়ে যান অপারেশনের পর তাঁর স্বকপোলকল্পিত আফিং-জল খাওয়ানোর নাটকের পটভূমি বানানোর জন্যে। কুমুদশঙ্করকে সরিয়ে, আনেন ডাক্তার ললিত ব্যানার্জিকে।

১১ই জানুয়ারি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে[১১]

---

[১১] এটর্নি। কংগ্রেস-নেতা। শরৎচন্দ্রের স্নেহাধীন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

I take on myself all risks of operation and request Dr. K. S. Ray operate on me.

Park Nursing Home
12.1.38.

12/1/38

With all my senses & courage in tact

শরৎচন্দ্রের শেষ হস্তাক্ষর

দিয়ে উইল লিখিয়ে শরৎচন্দ্র স্বাক্ষর করেন। আমি তার সাক্ষী থাকি।

রোগীর শরীরে রক্ত দেওয়ার আবশ্যকতা থাকায় সেদিন প্রকাশচন্দ্র রক্ত দান করেন।

১২ই তারিখে অপারেশনের আগে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রোগীর কাছে লিখিত অনুমোদন প্রস্তাব করেন। শরৎচন্দ্রের মুখে তখনও হাসির রেখা। বলেন, আনো লিখে, আমি সই করে দিই। ডাক্তার লিখে তাঁর হাতে দেন। তাতে লেখা :

I take on myself all risks of operation and request Dr. K. S. Ray to operate on me.
Park Nursing Home,
12.1.38.

শরৎচন্দ্র সই করেন। পুনরায় তারিখ লেখেন। তারপর নিজে থেকেই সই-এর নীচে যোগ করেন :

With all my senses and courage in tact.

তাঁর সেই মৃত্যুবরণ লিপিখানি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। ওই কাগজেই সেই আজীবন সাহিত্যসেবীর শেষ হস্তাক্ষর।

অস্ত্রোপচারের পর শরৎচন্দ্র মাত্র চারদিন জীবিত ছিলেন। ১৬ই জানুয়ারি সকালে তাঁর তিরোধান

কণ্ঠনালীর মাধ্যমে আর কোন তরল খাদ্য গ্রহণেরও শক্তি না থাকায়, ডাক্তাররা অপারেশনের সময় উদরের একস্থানে ছিদ্র করে রবারের নল বসিয়ে তরল খাদ্য প্রবেশের কৃত্রিম পথ করে রাখেন।

অপারেশন ঘর থেকে রোগীকে শয্যায় ফিরিয়ে আনা হয়। কিছু পরে জ্ঞান ফেরে। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের অন্তিম অবস্থা। রক্তহীন পান্ডুর মুখ। নির্জীব হয়ে পড়ে থাকেন। মাঝে মাঝে চোখ খুলে তাকান। ক্ষীণকণ্ঠে দু-একটা কথাও বলেন। আশ্চর্য হই দেখে, তখনও সেই অল্প কথার মাঝেও পরিহাসের দীপ্তি! রোগবিশীর্ণ মুখে কী শান্ত ভাব। নির্ভীক। নির্বিকার। নিরাসক্ত। জানি না, ঔষধের প্রভাব কিনা, অবসন্ন দেহের মধ্যে যন্ত্রণাবোধের সাময়িক প্রকাশ থাকে না। আশাবাদী মানুষের মন। শরৎচন্দ্র চির বিদায় নেবেন, দেশবাসী ভাবতেই চায় না। তাঁর এই বাহ্য শান্ত ভাবের ও হাস্য পরিহাসের ছিটেফোঁটার সংবাদে অনেকে মনে দুরাশা পোষণ করেন, ভাগ্য-দেবতা বুঝি প্রসন্ন হলেন।

এইভাবেই দু-দিন কাটে।

বেশ বুঝতে পারি, এটা দিনশেষে সূর্যাস্তের শান্ত রঙীন আভা। ধীরে ধীরে নামবে সন্ধ্যার ছায়া,—হঠাৎ রাতের ঘন আঁধার।

দেখি, চিকিৎসকদের আর কিছু করণীয় নেই। বিধানবাবু, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর আসেন। কিছুক্ষণ দাঁড়ান। ম্লানমুখে চলে যান।

ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জি—যাঁর এই নার্সিং হোম ও এই বাড়িরই উপরতলায় থাকেন—তাঁরও ওই একই রকম আসা-যাওয়া। শয্যাপাশে' সারা দিনরাত—চব্বিশ ঘণ্টা—নার্স। তাঁরাই রোগীর যা কিছু সেবাশুশ্রূষার প্রয়োজন, সযত্নে করেন। পেটে-লাগানো নলের মাধ্যমে তাঁরাই সাবধানে খাওয়ান। অন্য কারও খাওয়ানো নিষেধ, খাওয়াবার প্রশ্নও ওঠে না। আমার শুধু খাটের কাছে চেয়ার টেনে স্থির হয়ে বসে থাকা, চোখ চাইলেই মুখে করুণ হাসির রেখা টানার প্রয়াস,—কখনো বা পায়ে, মাথায়, কপালে অতি ধীরে হাত বুলানো। চোখে চোখ রেখে—এই তো রয়েছি—এই-টুকু জানানো। কেবলি ভাবতে থাকা,—প্রাণ দিয়েও কি এ-প্রাণ বাঁচানো যায় না!

১৪ই জানুয়ারি। রোগীর দেহে আবার রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এবার রক্তদান করেন নকুলচন্দ্র পতি।১২ সেইদিন রাত থেকেই আবার রোগযন্ত্রণার সূচনা। ১৫ই যাতনা বেড়েই চলে। অবিরাম হিক্কাও ওঠে। ডাক্তাররা ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণ শান্ত থেকে আবার কষ্ট শুরু হয়। শ্বাসের ক্লেশও দেখা দেয়। অক্সিজেন প্রয়োগ চলে। অসহ্য বেদনা প্রকট ও নির্মম হয়ে ওঠে। চোখের ভিতর কেমন এক জলভরা আবিল রক্তিম ভাব। মনে হয়, দূর হতে দূরান্তরে যেতে যেতে ঝাপসা কাঁচের চশমা চোখে তাকিয়ে দেখেন। লোসানে ভিজিয়ে তুলো দিয়ে চোখ কেবলি মুছাতে হয়।

সন্ধ্যা থেকেই সন্দেহ জাগে জ্ঞান আছে কি না। কিন্তু তাকালে চেনেন মনে হয়। সারারাত সকলে গভীর উৎকণ্ঠায় কাটাই। শেষ রাত্রে শান্ত হয়ে আসেন। অধরে অস্ফুটে কি যেন কথা ফোটে। কান পেতে শুনি। ও-পারের জড়িত ক্ষীণ স্বর এ-পারে যেন বোঝাই যায় না। তারপরই—সংজ্ঞাহীন। কণ্ঠে শুধু শ্বাসের শেষ টান। শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। সুস্পষ্ট হয়, দীপ নিভে এল।

সকালবেলায় তাঁর বাড়ি থেকে মেয়েদের একবার এনে শেষবারের মত দেখানোর কথা হয়। ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জির অনুমোদন নিই। তিনি জানান, আনাতে পারেন তবে অন্য ঘরেও রোগীরা রয়েছেন। দেখবেন, যেন এখানে কান্নাকাটি না ওঠে।

বাড়ির সকলে আসেন। ছায়ামূর্তির মত দাঁড়ান। সবারই চোখে অশ্রুর বন্যা। ধরাধরি করে নিঃশব্দে আবার বাড়িতে পাঠানো হয়।

বেলা দশটায় শরৎচন্দ্রের শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয়।

*

এই হলো তাঁর অন্তিমকালের প্রকৃত বিবরণ। অথচ, সুরেন্দ্রবাবু লিখে গেলেন,—মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে তাঁর বমির পর বমি শুরু—জ্ঞানলোপ—"জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের শেষ"!

ভাবি, নাটক-সৃজনই বটে!

কেন এই মিথ্যা-সৃষ্টি বুঝি না।

তবে দেখি, সুসাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ নিজেই রসাল ভাষায় লিখে যান তাঁর ওই বই-এর ১৪৫ পৃষ্ঠায়ঃ

> "যুধিষ্ঠির ছিলেন মহাভারতের প্রবলেম। তেমনি 'ইতিহাস'! যতই না কেন তুমি সত্যের ভান কর, অন্ধকূপ হত্যাকে খাড়া না করলে যে ইংরেজের রাজাই দাঁড়ায় না! সময়ে সময়ে মিথ্যাও হয় অমূল্য! এলোপ্যাথিরা বলেন, জলের ইনজেকশনও ইনজেকশন। বোকা মন ওতেই ভোলে। আবার হোমিওপ্যাথরা 'স্যাকল্যাকে' ওষুধের গুণ দেখেন! এ দুনিয়ার রথের চাকা টানে 'ইতিগজে'।"

১২ সামতাবেড়ের প্রতিবেশী পুত্র। শরৎ-চন্দ্রের স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত সেবক।

শরৎচন্দ্রের কথা

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার

হাওড়ায় বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনের ৪নং বাড়িতে থাকতেন শরৎচন্দ্র, আর ৫নং বাড়িতে থাকতাম আমরা। একই বাড়ির দালানের ছোট হলটাকে পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের একটা গাঁথুনি দিয়ে দুভাগ করা হয়েছে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে আসার অনেক আগে থেকেই ঐ ৪নং বাড়িতে আমার বাবা থাকতেন। শরৎচন্দ্র এসেই বাবার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর আসার বছর দুই পরে আমি হাওড়া শহরে পড়বার জন্য গ্রাম থেকে বাবার কাছে আসি। আমার বয়স তখন বার তের।

আমি বাজে শিবপুরে এসে দু'একদিন পরেই শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গেলে, তিনি আমার পরিচয় নিয়ে আমাকে বললেন—তুমি আমাকে জ্যাঠামশায় বলেই ডেকো। যদিও তোমার বাবা আমার চেয়ে বয়সে বড়, তা হলেও তাঁর মাথার চুল তো আমার মত পাকে নি।

শরৎচন্দ্রের এই কথা মত আমি তাঁকে জ্যাঠামশায় এবং তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে জ্যাঠাইমা বলতাম। আমি তাঁদের যেমন যারপরনাই শ্রদ্ধা ভক্তি করতাম, তাঁরাও তেমনি তাঁদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করে গেছেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, কত কথাই না মনে আসে। এখানে কয়েকটা ঘটনামাত্র বলছি—

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে আসার কয়েক বছর পরেই যখন তাঁর আরও নাম হল, তখন দেখেছি—কত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক তাঁদের কাগজের জন্য তাঁর কাছে লেখা চাইতে, কত সভা-সমিতির উদ্যোক্তা তাঁদের সভায় তাঁকে সভাপতি করবার অনুরোধ নিয়ে, আর অমনিও কত লোক যে তাঁকে শুধু দেখতেও আসতেন, তার ইয়ত্তা নেই। দেশের নানা স্থানের বিশেষ করে হাওড়া শহরের সাহিত্যিকরা ত প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। হাওড়ার সাহিত্যিকদের মধ্যে বাজে শিবপুরে আমাদের প্রতিবেশী কবি গিরিজাকুমার বসু ঘন ঘন আসতেন। গিরিজাবাবু খুব গল্পপটু মানুষ ছিলেন, তিনি এলে সহজে উঠতে চাইতেন না। এই গিরিজাবাবুর মত আরও যাঁরা এসে অযথা শরৎচন্দ্রের সময় নষ্ট করে যেতেন, তাঁদের সচেতন করবার জন্যই শরৎচন্দ্র একদিন আমাকে বললেন—খাঁদু, (আমার ডাক নাম) একটা কাজ করত। একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে লেখ—'আমারও কাজ আছে।' লিখে আমার এই বসবার চেয়ারের পিছনে মাথার উপর দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও।

শরৎচন্দ্রের কথামত আমি ঐ কথা লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। লেখাটা অনেকদিন ছিল। দেখেছিলাম, ফল ভালই হয়েছিল, কারণ, গিরিজাবাবু ঘন ঘন আসা এবং এলে বহুক্ষণ থাকা দুইই কমিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্যরাও এসে প্রয়োজন মত কথা বলেই চলে যেতেন।

শরৎচন্দ্রের দর্শনপ্রার্থীরা অনেকেই লোকের মুখে মুখে তাঁর 'ভেলু' কুকুরের কথা শুনেছিলেন। ভেলু বাড়িতে অচেনা লোক ঢুকতে দেখলেই ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যেত। তখন শরৎচন্দ্র শুধু 'ভেলু' বলে ডাকলেই সে চুপ করে যেত।

ভেলু সব সময়েই ছাড়া থাকত। শরৎ-

সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাসগৃহ
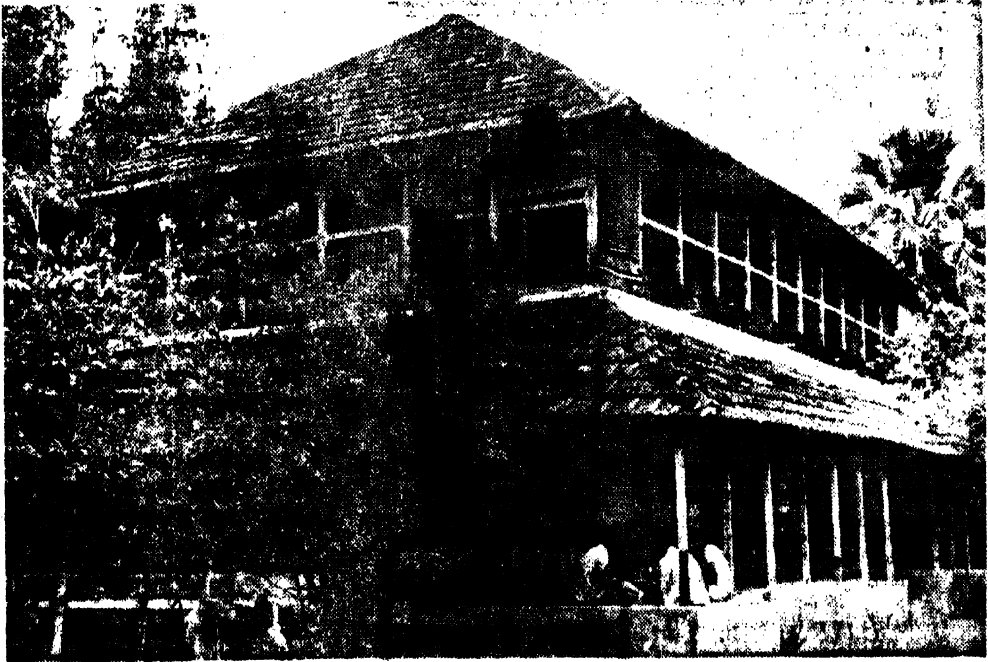
চন্দ্র, যতক্ষণ বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন, সে ততক্ষণ শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে থাকত।

শরৎচন্দ্রের দর্শনপ্রার্থীরা যাঁরা ভেলুর কথা জানতেন, তাঁরা ত বটেই; তা ছাড়া অন্যান্যরা এসে প্রথমে বাড়ির বাইরে দরজার কড়া নাড়তেন। কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই ভেলু তার প্রভুর পদাশ্রয় ছেড়ে ঘেউ ঘেউ করে দরজার কাছে ছুটে যেত।

শরৎচন্দ্রও লোকের ঐ কড়া নাড়ার খটাখট্ শব্দে বড় বিরক্ত হতেন। তাই একদিন কয়েকটা তারের পেরেক ও একটা হাতুড়ি হাতে নিয়ে তিনি আমাকে বললেন —চলতো খাঁদু, পেরেক দিয়ে দরজার কড়া দুটো আটকে দিয়ে আসি। লোকে এসে কড়া নেড়ে বড্ড খটাখট্ শব্দ করে।

তাঁর কথামত তক্ষুনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দুজনে মিলে, যাতে না আর নাড়া যায় সেই রকম করে পেরেক দিয়ে কড়া দুটোকে আটকে দিলাম।

পথের কুকুর নিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনে অনেক ঘটনা আছে। এখানে তার একটা ঘটনা বলছি—

শীতকালে একদিন বেলা ৯টা ১০টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে বড় রাস্তা বাজে শিবপুর রোডে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন—অদূরে রাস্তার একপাশে গোটা চারেক কুকুর-ছানা পড়ে পড়ে কুঁই কুঁই করছে। কুকুর-ছানাগুলোর তখনও ভাল পা হয় নি, তাই তারা চলতে না পেরে এক জায়গায় জটলা করে পড়ে রয়েছে।

বড় রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছে আসছে। কুকুর-ছানাগুলোর কুঁই কুঁই শব্দ শুনে কেউ হয়তো একবার তাকাচ্ছে, কেউ বা চোখও ফেরাচ্ছে না। যে যার কাজে চলে যাচ্ছে। কেবল তিনটি কৌতূহলী ছোট ছেলে কুকুর-ছানাগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

শরৎচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই এগিয়ে গিয়ে ছেলে তিনটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে এদের মা কোথায় গেল?

ছেলে তিনটির মধ্যে যেটি বড়, সে বলল —তাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি না। শুধু এরাই পড়ে আছে।

শরৎচন্দ্র ভাবলেন—পথের কুকুর, তাই হয়তো ক্ষুধার জ্বালায় কোথাও খেতে গিয়ে নিশ্চয়ই সে বিপদে পড়েছে, তা না হলে সদ্যজাত বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে সে এতক্ষণ থাকবে কেন?

তিনি ছেলে তিনটিকে বললেন—এদের মাকে তোরা চিনিস্?

—হাঁ, আমরা চিনি। সেটা দেখতে কালো রঙের।

—তোরা তা হলে পাড়ার আশেপাশে খুঁজে দেখ দেখি, তাকে দেখতে পাস্ কিনা। আমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়াই। তোরা যা। পাড়ায় খুঁজে এখানে এসে আমাকে খবর দিবি।

ছেলে তিনটি কুকুরের খোঁজে চলে গেলে, শরৎচন্দ্র একা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা ফিরে এসে তাঁকে জানাল—তারা পাড়ায় অনেক খুঁজেও সেই কুকুরের সন্ধান পেল না।

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র মহা ভাবনায় পড়লেন। তিনি আপন মনেই বলতে লাগলেন—তাই তো রে, এদের মা না এলে, এরা বাঁচবে কি করে?

এই বলে তিনি দু হাতে দুটি কুকুর-ছানাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে, বড় ছেলে দুটিকে বললেন—নে, তোরা দুজনে একটা করে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।

বাড়িতে এসেই শরৎচন্দ্র তাঁর ভৃত্য ভোলাকে ডেকে বললেন—ভোলা, একটা বড় দেখে চটের থলে নিয়ে আয় শিগ্‌গির।

ভোলা থলে নিয়ে এলে তার উপর কুকুর-ছানাগুলিকে শুইয়ে ভোলাকে বললেন —বাড়িতে যা দুধ আছে, সেটা গরম করে নিয়ে আয়। পরে গোয়ালার কাছ থেকে এদের জন্যে আলাদা দুধের ব্যবস্থা করলে হবে।

এদিকে শরৎচন্দ্রের নিজের কুকুর ভেলু, হঠাৎ বাড়িতে তার স্বজাতীয় কয়েকটি বাচ্চাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শরৎচন্দ্র শুধু মোটা গলায় 'ভেলু' বলে শাসাতেই সে চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভোলা দুধ গরম করে আনলে, শরৎচন্দ্র নিজেই একটা চামচে করে সেই দুধ কুকুর-ছানাগুলোকে খাইয়ে দিলেন।

রাস্তায় ছেলে তিনটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে

[illegible] সব দেখছিল। শরৎচন্দ্র তাদের [illegible] এবার তাকে [illegible] তোরা সমস্ত [illegible] পাড়ায় তাকে খ্‌ুজে দেখিস। দেখতে পেলে তাকে এখানে নিয়ে আসবি, না পারলে আমায় খবর দিবি, বুঝলি?

ছেলে তিনটি সম্মতি জানিয়ে [illegible] গেল।

এরপর শরৎচন্দ্র এক দিকে যেমন ঐ মাতৃহারা অসহায় কুকুর-ছানাগুলোকে বাঁচাবার জন্য ঘড়ি ধরে সময়ে সময়ে তাদের খাইয়ে যেতে লাগলেন, অপর দিকে তেমনি নিজে তো বটেই, ভৃত্য ভোলা এবং আমিও—তিনজনে মিলে ঐ কুকুর-ছানাগুলোর মাকে খ্‌ুজে বেড়াতে লাগলাম।

তিনি দু-তিন দিন ধরে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও সে কুকুরের সন্ধান পেলেন না। সেই ছেলে তিনটিও এসে শরৎচন্দ্রকে বলে গেল যে, তারাও কোথাও তাকে দেখতে পায় নি।

শরৎচন্দ্র ভাবলেন, হয় তাকে কেউ ধরে রেখেছে, না হয় সে গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে।

যাই হোক, তবুও তিনি তার খোঁজ করতে ছাড়লেন না।

দু-তিন দিন পরে একদিন সকালে স্নান করে দেশবন্ধুর দেওয়া রাধাকৃষ্ণের পুজো করে শরৎচন্দ্র তসরের কাপড়-পরা এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা অবস্থাতেই আমাকে ডেকে বললেন, খাঁদু, আজ আমার মনে হচ্ছে কুকুরটাকে ঠিক পাওয়া যাবে। চল দেখি একবার খ্‌ুজতে বেরোই। এই

সামতাবেড় বাড়িতে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত লেখার টেবিল, চেয়ার, আলোদান, লাঠি

বলে শরৎচন্দ্র সেই অবস্থাতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে কুকুর খ্‌ুজতে বেরিয়ে পড়লেন।

আমাদের বাড়ির অদূরে একটা পোড়ো বাড়ি ছিল। বাড়িটায় কোন লোকজন না থাকায় বাড়িটা বনজঙ্গলে ভর্তি হয়েছিল। শরৎচন্দ্র কিছুটা গিয়ে আমায় বললেন—খাঁদু, অনেক জায়গায় ঘুরে দেখেছি, কিন্তু ঐ পোড়ো বাড়িটায় যাওয়া হয় নি। চল, একবার ওখানটা দেখি।

এই বলে দুজনেই বন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পোড়ো বাড়িটার উঠানে গেলাম। উঠানের এক পাশে একটা পাতকুয়া ছিল। সেই পাতকুয়া দেখে শরৎচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে পাতকুয়ার ভিতরে উঁকি দিলেন। উঁকি দিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, অগভীর শুকনো পাতকুয়ার মধ্যে কালো রঙের কুকুরের মত কি যেন একটা শুয়ে রয়েছে। শরৎচন্দ্র এই দেখেই বলে উঠলেন—দেখ, দেখ খাঁদু, মনে হচ্ছে যেন এই সেই কুকুর!

আমি দেখে বললাম—ঐটাই আমারও মনে হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—খাবারের সন্ধানে এসে, নিশ্চয়ই এই কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে এখনও মরে নি। ক্ষুধায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে।

বললাম—না মরে নি। ঐ যে নড়ছে দেখা যাচ্ছে।

তিনি বললেন—খাঁদু, তুমি এক কাজ কর, এখনি বাড়িতে গিয়ে ভোলাকে বলে এস, সে যেন দোকান থেকে কিছু কাতা দড়ি, সন্দেশ ও গোটাকয়েক পাঁউরুটি কিনে, একটা বড় ঝোড়া সঙ্গে নিয়ে এখনি এখানে চলে আসে।

আমি তখনি ভোলাকে খবর দিতে গেলাম। খবর দিয়েই আবার শরৎচন্দ্রের কাছে ফিরে এলাম।

ভোলা সব নিয়ে এলে, শরৎচন্দ্র ভোলাকে বললেন—তুই খাঁদুকে নিয়ে দড়িটা খুলে দু-তিন ফেরতা কর। তারপর সমান সমান ব্যবধানে ঝোড়াটার চার জায়গায় বেঁধে, ওটাকে একটা ঝোলার মত কর।

বাঁধা হলে শরৎচন্দ্র এবার নিজে কয়েকটা সন্দেশ এবং কয়েকটা পাঁউরুটিকে বড় বড় টুকরো করে ঝোড়ার মধ্যে দিয়ে দড়ি বাঁধা ঝোড়াটাকে পাতকুয়ার মধ্যে নামিয়ে বসিয়ে দিলেন।

ক্ষুধার্ত দুর্বল কুকুরটা ক'দিন পরে খাবারের গন্ধ পেয়ে কোন রকমে ঝোড়ার মধ্যে উঠে পাঁউরুটি ও সন্দেশ খেতে শুরু করল। তখন শরৎচন্দ্র কুকুর সমেত সেই ঝোড়াটা টেনে উপরে নিয়ে এলেন। উপরে

যে পাঁউরুটি ও সন্দেশ ছিল, সেগুলোও ঝোড়ার মধ্যে দিয়ে দিলেন।

কুকুরটা একে তো সদ্য প্রসবের পর দুর্বল ছিলই, তার উপর কদিন খেতে না পেয়ে একেবারে মরার মত হয়ে গেসল। সে নড়তে পারছিল না, ঝোড়ার মধ্যে শুয়ে শুয়েই থাকছিল।

এবার শরৎচন্দ্র, আমার ও ভোলার সাহায্যে ঝোড়া সমেত কুকুরটাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। এনে তাকে তার বাচ্চাদের কাছে ছেড়ে দিলেন।

নিজের সন্তানদের পেয়ে কুকুরটার মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। চোখে মুখে তার কি খুশীর ভাব। সে তার সন্তানদের স্তন্যদান করতে করতে অসীম বিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল। মানুষের মত কুকুরেরও মন বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে হয়তো সে তখন ভাবছিল—লোকটা মানুষ না দেবতা!

ওদিকে দাওয়ার উপর ভেলু বাড়িতে আর একটা কুকুর এল দেখে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র ভেলুর দিকে চেয়ে শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন—এই ভেলু!

অমনি ভেলু ঘেউ ঘেউ বন্ধ করে নিজের তক্তপোষের উপর লাফিয়ে উঠে অভিমান ভরে কিছুক্ষণ ধরে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বাজে শিবপুরেই একদিন সকালে শরৎচন্দ্রের কাছে বসে আছি, এমন সময় বাড়ির বাইরে দরজার কাছে এক বৈষ্ণব ভিখারী করতাল বাজিয়ে গান ধরল। এদিকে ভেলুও সঙ্গে সঙ্গেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শরৎচন্দ্র ভেলুকে থামালে শোনা গেল বৈষ্ণব ভিখারী গান ধরেছে—শেষের সে দিন কর রে স্মরণ...

বৈষ্ণবের গানের এই কলিটা শুনেই শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন—দেখলে, খেয়ে দেয়ে কাজ নেই সকাল বেলাতেই ভয় দেখাতে এসেছে।

এরপর বললেন—দেখ খাঁদু, আমার কিন্তু পুনর্জন্ম হবে না। কারণ, আমার কোন বাসনা নেই। অপূর্ণ বাসনা পূরণের জন্যই আবার জন্মাতে হয়।

আমি শরৎচন্দ্রের মুখেই শুনেছি—রবীন্দ্রনাথ একবার এক সাহিত্যিককে বলেছিলেন, হাওড়ায় শিবপুর আছে জানতাম। কিন্তু বাজে শিবপুর আছে জানতাম না। শরতের চিঠির ঠিকানা দেখে সেটা জানতে পারলাম। শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে, আর বাজে শিবপুরে জানলাম সেখানে শরৎ থাকে।

আমি তখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে বি এ পড়ি। সেই সময় একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংএ পুরনো বইএর দোকানে দেখি শরৎচন্দ্রের 'গীতাঞ্জলি' বইটা টাঙানো। খুলে দেখলাম—শরৎচন্দ্র নিজে লিখে একজনকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই বই কিভাবে এখানে এসেছে।

বাড়ি ফিরে শরৎচন্দ্রকে কথাটা বললাম।

তিনি শুনে বললেন—যাকে উপহার দিয়েছিলাম হয় সে, নয়ত অন্য কেউ বিক্রি করে গেছে। বইটা কাল কিনে এনো ত। যাবার সময় পয়সা নিয়ে যেও। তোমার এই কথায়, আমারও ঐখানকার একদিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি সেদিন দেখেছিলাম—একটি লোক রেলিং থেকে হারাণ রক্ষিতের কি একটা উপন্যাস নিয়ে একবার পড়ে, আবার রাখে। বার কয়েক এই রকম করায় দোকানী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল—কি মশায় নেবেন?

লোকটি বললে—নেবার ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথমের পাঁচটা পাতা নেই।

দোকানী বললে—ঐ পাঁচ পাতার বদলে পাঁচটা শব্দ লিখে নিন—যুবক-যুবতী প্রান্তর পার হইতেছে—তারপর পড়ুন মিলে যাবে। ঐ পাঁচ পাতায় শুধু কি রকম

শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত গড়গড়া, চরকা, আলমারিতে বই

যুবক, কি রকম যুবতী, কি রকম প্রান্তর, কি করে পার হচ্ছে—এই কথাই আছে।

আমি যখন বি এ পড়ি সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে একবার বি এ পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি তখন যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার একটা প্রশ্ন আজও আমার মনে আছে। প্রশ্নটা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ্য ছিল বলে তা থেকেই। সেই প্রশ্নটা এই—

নারীত্বের দিক দিয়া রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হইল কেন, কোন্ অপরাধে এবং কাহার অপরাধে?

সাংসারিক দিক দিয়া ভ্রমরের জীবন ব্যর্থ হইল কেন? কোন্ অপরাধে এবং কাহার অপরাধে?

আমি পরীক্ষার সময় রাত জেগে পড়তাম। একদিন রাত তখন প্রায় দেড়টা, তখনও আমি পড়ছি দেখে হিরন্ময়ী দেবী আমাকে ডেকে বললেন—খাঁদু এখনও পড়ছ? তোমার জ্যাঠামশায়ও বর্মায় মাঝে মাঝে এমনি সারা রাত পড়তেন। আমি জিজ্ঞাসা করতাম—কি গো কাল অফিস যেতে হবে না? উনি বলতেন—নিশ্চয়, অফিসও যাব, পড়াও চলবে।

বাজে শিবপুরে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে শরৎচন্দ্রকে লেখাপড়া করতে আমি দেখেছি। তিনি হ্যাসাক জেবলে লিখতেন। পড়া বন্ধ করা বা কম করে শুধু লেখা তিনি কখনও পছন্দ করতেন না। তি আমাকে বলেছিলেন, বর্মায় এক সাহেবের এক লাইব্রেরী কিনেছিলেন, এবং সেখানে খুব পড়তেন।

তিনি কোন কিছু তাড়াতাড়ি লিখতেন না। বলতেন, যেটা ১৬ ঘণ্টায় লিখবো, কারুর খাতিরে বা কোন প্রলোভনে ১৫ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটেও তা লিখব না।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড়েয় যে বাড়ি করেছিলেন, তাঁর সেই বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে হাওড়া জেলাতেই দেউল গ্রামে আমার বাড়ি। হাওড়া শহর থেকে দেউল গ্রাম যেতে হলে দেউলটি স্টেশনে নেমে সামতাবেড়ের উপর দিয়েই যেতে হয়। আমি বাজে শিবপুর থেকে বাড়ি যাবার সময় প্রতিবারেই সামতা-বেড়ের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তবে বাড়ি যেতাম। আবার বাড়ি থেকে বাজে শিবপুরে আসবার সময়ও তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে আসতাম।

একদিন সকালে সামতাবেড়ের শরৎ-চন্দ্রের বাড়িতে গেছি। গিয়ে দেখি শরৎচন্দ্র

তাঁর বাড়িতে আগত দুঃস্থ রোগীদের হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিচ্ছেন। বাড়িতে বসে এই ডাক্তারী তিনি রোজই করতেন। প্রয়োজন হলে অবশ্য রোগীদের বাড়িতেও যেতেন। সেদিন দেখলাম—ওষুধ দিতে দিতে তিনি প্রায় প্রত্যেককেই পথ্যেরও পয়সা দিতে লাগলেন। একজন রোগী বললে—বাবু, ঘর নেই, বাইরে পড়ে থাকি। তাই ঠান্ডায় অসুখ করে গেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোর ঘর নেই তা আগে বলিস নি কেন? কত টাকা লাগবে ঘর করতে?

—আজ্ঞে বাবু, তিন টাকা।

—সে কিরে! তিন টাকাতেই ঘর হয়ে যাবে!

—আজ্ঞে, বাঁশ দিয়ে তালপাতার ঘর ঐ ওতেই হয়ে যাবে।

দেখলাম, শরৎচন্দ্র তাকে ওষুধ দিয়ে পথ্য খরচ এবং ঘর তৈরির জন্য আরও তিন টাকা দিলেন।

আমি সকালে গেলে ওখানে স্নান আহার করে বিকালে বাড়ি ফিরতাম। তার আগে আমাকে আসতে দিতেন না। একদিন গিয়ে কাজ আছে বলে ভাত না খেয়েই চলে এসেছিলাম। আসবার সময় শুধু শরৎচন্দ্রকে বলে এসেছিলাম, হিরণ্ময়ী দেবীকে বলে আসতে ভুলে গেসলাম। কদিন পরে আবার গেলে শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন—খাঁদু সেদিন তুমি বাড়ি যাবার সময় তোমার জ্যাঠাইমাকে কেন বলে যাওনি? তুমি না খেয়ে চলে গেলে, সেজন্য তোমার জ্যাঠাইমার কাছে আমাকে কথা শুনতে হল। যেদিন তোমার আগে যাবার কথা থাকবে, সেদিন তুমি তোমার জ্যাঠাইমাকে জানিয়ে যাবে।

একবার গিয়ে স্নানের সময় স্নান করতে যাব বলে তৈরি হচ্ছি। এমন সময় একজন ভিখারী বাড়িতে এল। হিরণ্ময়ী দেবী ভিখারীটিকে চাল ভিক্ষা দিলেন।

ভিখারীটি চাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে বললে—বাবু কোথায় গেলেন, দেখছি না। আমরা বাবুর কাছ থেকে পয়সাও পাই।

শরৎচন্দ্র অদূরে বাগানের মধ্যে ছিলেন। তিনি ভিখারীটির কথা শুনতে পেয়ে সাড়া দিয়ে বললেন—কোথাও যাইনি। এখানে আছি। আমি যাচ্ছি দাঁড়াও।—এই বলে তিনি বাগান থেকে সিধা ভিখারীটির কাছে এলেন। এসে মের্জাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে কিছু পয়সা নিয়ে ভিখারীটিকে দিলেন।

ভিখারীটি পয়সা নিয়ে চলে গেল।

আমি একদিন বিকালের দিকে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে যাই। গেলে তিনি আমাকে বললেন—খাঁদু, তোমাদের বাড়ির কাছে বাকসীর হাট থেকে আমার জন্যে দুটো শপ্ (লম্বা ধরনের বড় মাদুর) কিনে এনো ত! বাড়ি যাবার সময় আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও। আসবার দিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে এনো।

শরৎচন্দ্রের এই কথায় আমি বললাম—শপ্ কি করবেন? মাদুর সতরঞ্চি তো অনেক আছে।

বললেন—নতুন রেডিও এনেছি দেখেছ ত? সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকেরা রেডিও শুনতে আসে। দোরে হ্যাসাক জেলে দিই। দুটো শপ্ হলে ভাল হয়। তাহলে তারা ওতে ভাল ভাবে বসে গান শুনতে পারবে।

আমি বাকসীর হাট থেকে দুটো বড় শপ্ কিনে শরৎচন্দ্রকে দিয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় দীর্ঘদিন অর্শে ভুগেছেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লেখা তাঁর অনেক চিঠির মধ্যে তাঁর এই অর্শরোগের কথা আছে। শেষে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় তাঁর অর্শ অপারেশন করেছিলেন। অর্শ অপারেশন করলে তখন তিনি পরিহাস করে কুমুদবাবুকে বলেছিলেন—কুমুদ, এ ছিল আমার অনেক দিনের সঙ্গী। আজ ওকে সঙ্গ ছাড়া করলে। এবার তোমাকে ধরবে।

শরৎচন্দ্রের এই অর্শের প্রসঙ্গেই একটা কাহিনী এখানে বলছি। সেটা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম এ পড়ি। শরৎচন্দ্রও তখন শিবপুর ছেড়ে সামতাবেড়েয় এসে বাস করছেন। আমি এম এ পড়ার সময় ক্লাসে একদিন শুনেছিলাম আমাদের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী পি এইচ ডি মশায় অর্শের ওষুধ দেন। একটা শিকড় দেন, সেটা মাদুলির ভিতর ভরে পরে

সামতাবেড় বাড়িতে পূজিত গৃহদেবতা

থাকতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোন বাছ বিচার নেই।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েয় গিয়ে অর্শে ভুগছেন শুনে, আমি একদিন শাস্ত্রী মশায়কে বলে শরৎচন্দ্রের জন্য অর্শের ওষুধ নিই। ওষুধটা একটা রূপোর মাদুলিতে ভরে, মাদুলিটা নিয়ে একদিন সামতাবেড়ের গিয়ে শরৎচন্দ্রকে দিই। দিয়ে সমস্ত বলি। তখন সেখানে হিরণ্ময়ী দেবীও ছিলেন।

শরৎচন্দ্র মাদুলিটা নিয়ে হিরণ্ময়ী

বাঁ দিকে প্রথম ভ্রাতা প্রভাস (স্বামী বেদানন্দ), ডাইনে শরৎচন্দ্র ও মাঝখানে বাঁশ দিয়ে ঘেরা হিরণ্ময়ী দেবীর সমাধি

দেবীকে বললেন—খাঁদ্ন আমাদের ছেলের মতই। ওর ছোটবেলা থেকেই ওকে ছেলের মত ভালবাসি। ও যখন এনেছে, তখন পারি, কি বল বড় বউ?

হিরণ্ময়ী দেবী, হ্যাঁ বলবার জন্য ত প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি জানালেন।

শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মশায়ের দেওয়া সেই ওষুধ বহু দিন ধারণ করে ছিলেন। কিন্তু কোন উপকার হয়নি। তাই তিনি একদিন আমাকে একটা পোস্ট কার্ডে লিখেছিলেন—খাঁদ্ন, তোমার দেওয়া সেই মাদুলির নিষ্ফল বোঝা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি।—চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু চিঠির ভাষাটা আমার আজও মুখস্থ হয়ে আছে।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই স্বামী বেদানন্দ সামতাবেড়েয় দাদার কাছে এসে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর দিন দুই পরে আমি বাড়ি থেকে হাওড়া আসার সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাই। গেলে তিনি কাঁদ কাঁদ হয়ে মেজ ভাই-এর মৃত্যুর কথা বললেন। বলে শেষে বললেন—স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, সন্ন্যাসী বলে অশৌচ পর্যন্তও নেই। যেন শ্লেটের লেখা মুছে দিয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র তখন তাঁর কলকাতার বাড়িতে বাস করছেন। আমিও তখন হাওড়ায় নরসিংহ দত্ত কলেজে কিছুদিন হল অধ্যাপনা করছি। ঐ সময় একদিন আমি ও আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কলেজের এক উৎসবে শরৎচন্দ্রকে আনবার জন্য অনুরোধ করতে যাই।

শরীরটা ভাল নয়, তবুও খাঁদ্ন যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই যাব—এই বলে তিনি আমাদের অনুরোধে মত দিলেন। এবং আমাদের জলযোগ করিয়ে অসুস্থ শরীর নিয়েও অনেক গল্প করতে লাগলেন।

জ্ঞানবাবু ছিলেন বিজ্ঞানের লোক। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শরৎচন্দ্র কথায় কথায় জ্ঞানবাবুর এই পরিচয় পেয়েই নিজের সম্বন্ধে বললেন—জ্ঞানবাবু, আমিও আসলে একজন বিজ্ঞানেরই ছাত্র। বিজ্ঞানের বই পড়ে আমি যে আনন্দ পাই, অন্য কিছুতে সে আনন্দ পাই না। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের বই পড়তে আমি ভালবাসি। একবার কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এত নম্বর পেয়েছিলাম যে, প্রিন্সিপ্যালের ধারণা হয়েছিল, আমি বই দেখে দেখে লিখেছি। তাই তিনি আবার ঐ বিষয়েই আমার পরীক্ষা নিলেন। সেবার কিন্তু আরও ভাল উত্তর দিয়েছিলাম। তাও এই যে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, আমার আবার বই ছিল না। পরীক্ষায় আগের রাত্রে বিশ্বনাথ নামে আমার এক সহপাঠীর কাছ থেকে বই চেয়ে এনে সারারাত ধরে পড়েছিলাম। অভাবের জন্য তখন বই কিনতে পারতাম না, বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে বই চেয়ে চিন্তে এনে পড়তাম।

উপেন গাঙ্গুলীর 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা প্রথম বেরোয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে। যে কোন কারণেই হোক, শরৎচন্দ্র প্রথম ক'বছর উপেনবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ কাগজে কোন লেখা দেন নি। অথচ উপেনবাবু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা হতেন।

উপেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দেখা হলে তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন—আপনি ত শরতের কাছে কাছেই থাকেন। আমাদের কাগজের জন্য শরৎকে কিছু একটা লিখতে বলুন না!

আমি একদিন সামতাবেড়েয় শরৎচন্দ্রকে উপেনবাবুর ঐ কথা বলি। শুনেই তিনি আমাকে বললেন—তুমি লিখতে বলছ? তা কি লিখতে বল?

আমি বললাম—শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব শুরু করুন না!

আমার এই কথা শুনে, তখনই তাঁর ছোট ভাই প্রকাশকে ডাকলেন। ডেকে বললেন—বাড়ীতে শ্রীকান্ত তিনটা পর্বই আছে কিনা দেখ ত?

প্রকাশবাবু খুঁজে ফিরে এসে বললেন—বাড়ীতে ছিল, কিন্তু এখন বই দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত কেউ পড়তে নিয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আজই তাহলে খেয়ে-দেয়ে একবার কলকাতা যা। গিয়ে হরিদাসের দোকান থেকে একখানা করে শ্রীকান্ত তিন পর্বই নিয়ে আয়।

এর মাসখানেক পরেই একদিন দেখলাম শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব লিখতে শুরু করেছেন। এর আগে উপেনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কি কথাবার্তা হয়েছিল, তা অবশ্য জানি না।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব কয়েক মাস বিচিত্রায় প্রকাশিত হলে, একদিন শরৎচন্দ্র কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্য আমার এই শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে দিয়ে গেলাম।

আমাকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটা চিঠি এবং আমাকে উপহার দেওয়া তাঁর নিজের কয়েকটা বই আমি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। আর আমার প্রতি তাঁর সেই স্নেহের স্মৃতিকে আমি অন্তরে অক্ষয় করে রেখেছি।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্রগুলির ফটোগ্রাফার মিনতি চৌধুরী
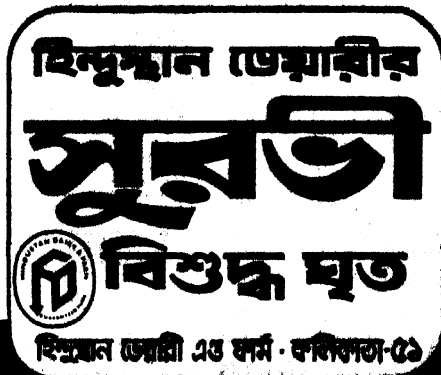
কংগ্রেস ও শরৎচন্দ্র

ইন্দ্রমিত্র

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন: 'মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।'

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বললেন—কলম ছেড়ে রাজনীতিকের দলে ভিড়ে পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নয়।

শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন—আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছেড়ে চরকাই ধরেছি।

শরৎচন্দ্র, ১৯২১ সালের ২৭ জুন, লিখেছেন: 'এখন আমার এক মুহূর্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা যদি সার্থক হয় ত আবার হয়ত সময় পাওয়া যাবে। আজকাল আমার সেই দু'বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলনটিয়ার—আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬।৭ জন যখন 'জান গিয়া' বলে গুলি খেয়ে পড়ে মরে গেল—তখন আমি পালাই নি কিন্তু আমার লাগে নি। অনেক দিন আশ্চর্য হয়েছি, সেদিন কি কোরে মেশিনগানের গুলি লাগেনি। আজ মনে হয় তারও প্রয়োজন ছিল।'

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সবসময়ে শরৎচন্দ্রের মতের মিল হয়নি। কিন্তু মুখের কথায় ও কলমের লেখায় শরৎচন্দ্রের কাছে গান্ধীজী সবসময়েই 'মহাত্মা' থেকেছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় 'বাঙ্গলার কথা' নামে একখানা সাপ্তাহিক-পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। প্রথম সংখ্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কারও লেখা ছাপা হয়নি।

ভারতবর্ষের মাটিতে প্রিন্স অব ওয়েলস প্রথম পদার্পণ করেছেন ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর। সেদিন কলকাতায় সম্পূর্ণ হরতাল হয়েছে। ১৯২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতা এসেছেন। 'বিজলী', ১৯২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর, লিখেছে: '২৩ ডিসেম্বর বিকেল-বেলা থেকেই দোকানপাট বন্ধ হওয়া সুরু হল। ২৪ তারিখ প্রাতঃকালে সমস্ত দোকানপাট, গাড়ি ঘোড়া রিক্সা-ট্যাক্সি সব বন্ধ।'

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা, তাঁর বাসা তখন শিবপুরে। হরতালের দিন সকাল আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ শরৎচন্দ্র খালি পায়ে উপেন্দ্রনাথের বাসায় এসে উপস্থিত। বললেন—উপীন, শুনেছি হাওড়া স্টেশনে ভারি দুরবস্থা। ট্রেনে ট্রেনে বহু লোক না জেনে এসে পড়েছে। শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, ছেলে-মেয়েরা খাবার পাচ্ছে না, স্ত্রীলোকেরা বাড়ি যাবার গাড়ি পাচ্ছে না। যাবে? যদি কোনও কাজে লাগতে পারি।

উপেন্দ্রনাথ আপত্তি করলেন না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

শরৎচন্দ্র, ১৯২২ সালের ১৪ জুলাই বলেছেন: 'হাবড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটির আমি ছিলাম সভাপতি। আমি ও আমার সহকারী বা সহকর্মী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই পদত্যাগ করেছেন।'

কিন্তু এই ইস্তফাই শেষ কথা নয়। আবার হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছেন শরৎচন্দ্র।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। আগেও একবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। গয়াতে তুমুল মতবিরোধ হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির পদ ছাড়লেন কিন্তু কংগ্রেস ছাড়লেন না। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে নিয়ে তিনি নতুন একটি দল গড়ে তুললেন—কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি। ১৯২৩ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে নতুন দলটির নাম সংক্ষিপ্ত হল—স্বরাজ্য পার্টি। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'স্বরাজ্য পার্টি

গঠিত হবার পরে শরৎচন্দ্র স্বরাজ্য পার্টি এবং দেশবন্ধুর কাজে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এ সময়ে দেশবন্ধুর অজস্র বাঙলা বিবৃতি শরৎচন্দ্র রচনা করে দিয়েছেন। নানাভাবে তিনি স্বরাজ্য পার্টি ও দেশবন্ধুর কাজে সাহায্য করেছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে দরদের সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য কাজ করেছেন। কিন্তু নিজেকে তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না, নিজেকে প্রচার করতেন না।'

দেশবন্ধুর একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা অনেকে অপছন্দ করেছেন। অনেকেই তখন দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। কিন্তু শরৎচন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধুকে বললেন—কিছু ভাববেন না আপনি। এই তো আপনার পথ! যে সত্য আপনি একান্তমনে উপলব্ধি করেছেন, নিঃসংকোচে তাকে প্রচার করুন।

দেশবন্ধু কৌতুক করে বললেন—সবাই যে বিপক্ষ, শরৎবাবু!

শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করে বললেন—হোক সবাই বিপক্ষ। সবাইকার মত আপনার জন্য নয়। আপনার মতই সবাইকার জন্য।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বলে উঠলেন—লোকে শুনছে না? শুনবেই না তো! লোকে তো কোনোদিনই সত্যের বাণী প্রথমে শোনে না। রাজা রামমোহন যখন সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, লোকে শুনেছিল? বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের বিধান লোকে শুনেছিল? নেপোলিয়ান যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, লোকে শুনেছিল? আপনার কথাও লোকে আজ শুনছে না— কিন্তু শুনবে। কাল শুনবে, পরশু শুনবে, নিশ্চয়ই শুনবে।

দেশবন্ধুর তখন দারুণ দুঃসময়। হাতে টাকা নেই, নিজের দলে অল্প কয়েকজন লোক। নিতান্ত নগণ্য লোকজন পর্যন্ত তখন দেশবন্ধুর নিন্দা করে।

১৯২৩ সালের মে মাসে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। দেশবন্ধু বরিশালে পৌঁছেছেন ১৯২৩ সালের ১২ মে। সেদিনই সভা আরম্ভ হয়েছে। সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। আবার পরদিন সভা বসেছে। সভায় গোলমাল হয়েছে। 'আত্মশক্তি', ১৯২৩ সালের ২৩ মে, লিখেছেঃ 'এই গোলমালের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায় সানুনয়ে সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এটা সভা হচ্ছে না তামাসা হচ্ছে।' শ্যামসুন্দর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং শরৎবাবুকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। অনেক সভ্য বললেন—শরৎবাবুকে এই কথা প্রত্যাহার করার কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু বের করে দেওয়া হতে পারে না। অগ্নিশর্মা সভাপতি বললেন—I can't bear his sight— আমি তার মুখদর্শন করব না।...সকলের অনুরোধে শরৎবাবু তাঁর কথা প্রত্যাহার করলেন।' কথা প্রত্যাহার করেছেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্র মনে করেননি যে তিনি অন্যায় বলেছেন।

দারুণ অপমানিত বোধ করেছেন শরৎচন্দ্র। সভার পর তিনি রাগ করে বললেন—যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানী হতে হয়, তাতে আর আমি নেই I have had enough of it and I would have none of it anymore

দেশবন্ধু হাসলেন। শরৎচন্দ্রের একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন—তাই করুন, শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ, আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত বাধা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না। এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি

কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।

শরৎচন্দ্র একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। গড়গড়ায় দু-একটা টান মেরে বললেন—কিন্তু কী করে ছাড়ি!!

মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধা-বিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কী করে? আমাদের ব্যথা তো নিতান্তই সামান্য, উপমা দিতে হলে হয়তো গোষ্পদই বলা চলে, কিন্তু আপনি যে দুঃখের মহার্ণব হয়ে রয়েছেন। যাঃ, আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না।

শরৎচন্দ্র গড়গড়া টানতে লাগলেন।

বরিশাল থেকে দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরে এসেছেন ১৯২৩ সালের ১৭ মে।

হেমন্তকুমার সরকার লিখেছেন: 'দেশবন্ধুর যখন চরম আর্থিক দুর্দশা শরৎচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, 'ত্যাগ এবং দুঃখবরণ ব্যতীত যখন স্বরাজ লাভ হবেই না, আর সবই যখন ত্যাগ করেছেন এবং দুঃখেরও চরম হয়েছে তখন একখানা পা কেটে ফেলুন, তাতে আপনার যে ত্যাগ ও দুঃখ, তাতে স্বরাজ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে', এই বলে শরৎচন্দ্র মোটা টাকার একখানা চেক দেশবন্ধুর হাতে দিলেন।

দেশবন্ধু একদিন বললেন—শরৎবাবু, আপনি হাওড়া থেকে দাঁড়ান।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—আপনি ক্ষেপেছেন? আমি দাঁড়াব কাউন্সিল ইলেকশনে?

দেশবন্ধু বললেন কেন দাঁড়াবেন না?

শরৎচন্দ্র বললেন—না না, দূর দূর, সে কি হয়? আমি সামান্য গ্রন্থকার মানুষ আমি কি কাউন্সিল ইলেকশনে দাঁড়াবার যোগ্য? লোকে বলবে কি?

দেশবন্ধু সবিস্ময়ে বললেন—আপনি কি বলছেন শরৎবাবু?

শরৎচন্দ্র স্মিতমুখে বললেন—ঠিক বলছি। দেশের জন্য আমি কি করেছি? আমি জেলে যাইনি, ওকালতী ব্যারিস্টারী ত্যাগ করিনি, দেশের জন্য আমি তো কোনও নির্যাতন-বরণ, কোনও ত্যাগস্বীকারই

হরেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি শ্রীঅমিয় ঘোষের সৌজন্যে

করিনি। আপনি আমাকে ভালবাসেন—সে আপনার আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আপনি নিজে কবি সাহিত্যিক, আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে ভালোবাসেন। বন্ধুত্বের জন্য আমি আপনার প্রিয়জন হতে পারি, কিন্তু দেশের লোক আমাকে প্রিয়জন মনে করবে কেন? তা ছাড়া আমার নিজের সামান্য সাহিত্য-সাধনাকে আমি রাজনীতির মূলধন করতে চাই না। বিশেষত কাউন্সিলের যা কাজ—ইংরেজী বক্তৃতা শোনা আর ইংরেজী বক্তৃতা দেওয়া, দুটোতেই আমার অত্যন্ত অরুচি। আপনি আমাকে রেহাই দিন। এমন কাউকে দাঁড় করান লোকে যাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করবে। আপনার এখনই বাধাবিপত্তি অসুবিধার অন্ত নেই, তার উপরে ভোটার-দের উপরে আপনার নিজের 'liking' চাপিয়ে দিয়ে বাধাবিপত্তি আর বাড়াবেন না।

কোনোদিনই ইলেকশনে দাঁড়াতে রাজী হননি শরৎচন্দ্র।

১৯২৪ সালের ২২ অগাস্ট। জন্মাষ্টমী। শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর বাড়িতে এসেছেন। কথা-বার্তায় রাত এগারোটা বেজে গেল।
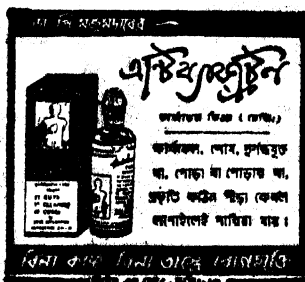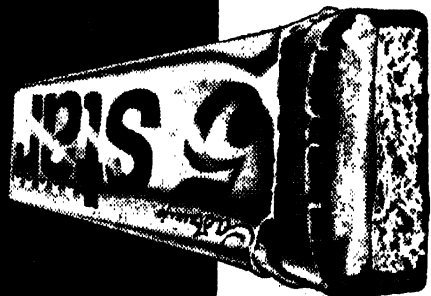
টেলিফোনে খবর এল তারকেশ্বরে গুলি চলেছে। কিছুক্ষণ বাদে দুজন কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে লালমোহন ঘোষ এলেন, তিনিও ওই খবরই নিয়ে এসেছেন। খবর শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন দেশবন্ধু। বললেন—নিরীহ ছেলেরা গুলি খেল, ধর্মের স্থানে রক্তপাত হল, আর বাকি কি?

CHAITRA-C-29 BEN

অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ চলল। কর্মীদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দেশবন্ধু বিদায় দিলেন। শরৎচন্দ্রও বিদায় নিয়ে উঠলেন।

তাঁকে বিদায় দিতে সিঁড়ি পর্যন্ত নামলেন দেশবন্ধু। সিঁড়ির পাশে চমৎকার মস্ত কালো পাথরের একটি কৃষ্ণমূর্তি। উড়িষ্যা থেকে মূর্তিটি আনা হয়েছে। দেশবন্ধু বললেন—মূর্তিটির বয়স পাঁচশ বছরের কম নয়। আরও একজোড়া রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে, আপনাকে দিচ্ছি।

বলে আবার উপরে উঠে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে এলেন। শরৎচন্দ্রকে দিলেন। বললেন—আজ জন্মাষ্টমী, তাতে তারকেশ্বরে গুলি চলেছে, ঠাকুর স্বয়ং আজ আপনার ঘরে যাচ্ছেন। নন্দের বাড়ি ছেড়ে আজ গোকুলে যাচ্ছেন।

হেসে বললেন—তোমারে বাঁধবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে কেউ বলেন 'সি-আর', কেউ বলেন 'দাশ সাহেব', কেউ বলেন 'কর্তা'। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মুখে 'দেশবন্ধু' ছাড়া অন্য কোনও উচ্চারণ নেই।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় একদিন ঠাট্টা করে বললেন—আপনার মুখে কি 'দেশবন্ধু' ভিন্ন তাঁর আর কোনও নাম আসেই না? কত লোকে 'কর্তা' বলে, 'সি আর' বলে, 'দাশ সাহেব' বলে?

শরৎচন্দ্র বললেন—না, আমার মুখে তাঁর আর কোনও নামই আসে না। ওই তো ও'র সত্য পরিচয়। কে জানে কে সর্বপ্রথম ওই একটি নামের মধ্যেই ও'র ভেতর-বার যথার্থ-রূপে আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। দেশবন্ধু সত্যই দেশবন্ধু। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, ভাল মন্দ নরনারী পতিত তুচ্ছ ব্যতীত সকলের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। মানুষের এত বড় দরদী বন্ধু আমি কখনও কোথাও দেখিনি।

বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল, গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

১৯২৫ সালের ২ মে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে ফরিদপুরে গেলেন। কিন্তু সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। কলকাতা ফিরে এলেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, মন খুব বিষণ্ণ। সাব্যস্ত হল, দার্জিলিং থেকে শরীর সুস্থ করে এসে আবার পূর্ণোদ্যমে দেশ-সেবার কাজে লাগবেন। মন খুব বিষণ্ণ, শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "শরৎচন্দ্র বসে বসে তাঁর হাতের দশ আঙুলে দেশবন্ধুর দশ আঙুলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত বিশ্বাস ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে দিতে লাগলেন। বহুক্ষণ পরে বললেন, "আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, দার্জিলিং থেকে

ফিরে আসুন স্বাস্থ্যলাভ করে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি সর্বত্যাগী, আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নিশুদ্ধ, আপনিই দেশের নেতা। দেশ আপনারই, টম ডিক হ্যারির নয়।"

১৯২৫ সালের ১১ মে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিং রওনা হলেন। আর তিনি ফিরে আসেননি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ১৯২৫ সালের ১৬ জুন, ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন।

দেশবন্ধু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের 'স্মৃতি-কথা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'মাসিক বসুমতী'তে—১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি।

"মনে হয়, পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃংখল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এত বড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন।

সেদিন পাটনায় যাইবার পূর্বে আমায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শয্যাগত; আমি কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবার final শরৎবাবু।

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না।...

লোক বলিতেছে, এত বড় দাতা, এত বড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক, সর্বপ্রকার কর্মের মধ্যেও এত বড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধন সম্পদের মূল্য যে কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকাকড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না তো ফেলিবে কে?...

লোক কাঁদিতেছে,—মহতের জন্য দেশের লোক ইতিপূর্বে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়। একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই। আর আমরা, যাহারা তাঁহার আশে পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশ-বন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে! যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ। ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সহস্র প্রমাণ প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার যো ছিল না।

সেদিন বরিশালের পথে, স্টীমারে, ঘরের মধ্যে আলো নিবানো, আমি মনে করিয়াছিলাম, পাশের বিছানায় দেশবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অনেক রাত্রিতে হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, শরৎবাবু, ঘুমাইয়াছেন?

বলিলাম, না।

তবে চলুন, ডেকে গিয়ে বসিগে।

বলিলাম, ভয়ানক পোকার উৎপাত।

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বিছানায় শুয়ে ছটফট করার চেয়ে ঢের সুসহ। চলুন।

দুই জনে ডেকে আসিয়া বসিলাম। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়, নদীর অসংখ্য বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টীমার চলিয়াছে, তাহার দূর-প্রসারী সার্চলাইটের আলো কখনও বা তীরে বাঁধা ক্ষুদ্র নৌকার ছাতে, কখনও বা তরুশিরে, কখনও বা জেলেদের কুটিরের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দেশবন্ধু বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, শরৎবাবু, নদী-মাতৃক কথাটার সত্যকার অর্থ যে কি, এ দেশে যারা না জন্মায়, তারা জানেই না। এ আমাদের চাই-ই চাই।

এ কথার তাৎপর্য বুঝিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পরে তিনি একা কত কথাই না বলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।...

নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লাঞ্ছনার কথায় তাঁহার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকিত। কে নাকি একবার তাঁহাকে গালিয়াছিল, দেশবন্ধু শব্দের আর একটা অর্থ চণ্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়া-ছিলেন বলিয়াই বোধহয়, উচ্চজাতির দেওয়া

বিনা দোষে এই অপমানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনারা দয়া করে' আমাকে এই 'পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে' দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে। আমি ঢের কাজ করতে পারবো।

এই বলিয়া তিনি ইহাদের প্রতি দীর্ঘ-কাল ধরিয়া হিন্দুসমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই এক একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন।...

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, শুতে যাবেন না? চলুন।

চলুন, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতে-ছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তাছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিস যাবে না, তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজ-ওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রি শেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখে দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।......

দেশের মধ্যে রেভোলিউসনারী ও গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়া-ছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলি স্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনই অসম্ভব ছিল। তাঁহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙ্গলায় একটা আপিল লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিতেও না পারো, ত অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থ চিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে 'assuming but not admitting' করে এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।...

একবার একটা সভার পরে গাড়ীর মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনেকে আমাকে আবার প্র্যাকটিস করে দেশের জন্যে টাকা রোজগার করে দিতে পরামর্শ দেন। আপনি কি বলেন?

আমি বলিলাম, না। টাকার কাজের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়েই থাক। এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড়।

দেশবন্ধু জবাব দিলেন না। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই হাসিটা এবং

স্তব্ধতার মূল্য যেন আমরা বুঝিতে পারি,—ইহার চেয়ে বড় কামনা আর নাই।"

১৯২৪ সালের অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হয়েছেন। 'স্মৃতিকথা' যখন প্রকাশিত হয়েছে তিনি তখন মান্দালয় জেলে বন্দী। সেখান থেকে তিনি, ১৯২৫ সালের ১২ আগস্ট, শরৎচন্দ্রকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছিঃ

"মাসিক বসুমতীতে আপনার 'স্মৃতি-কথা' পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার অন্তর্দৃষ্টি, দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা,—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।......

আমার—শুধু আমার কেন এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতি-কথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না—অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

১৯২৭ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেয়েছেন। কিছুকাল বাদে দেখা গেল—বাঙলাদেশে কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুটি দল—এক দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আরেক দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র রইলেন সুভাষচন্দ্রের দলে।

শরৎচন্দ্র সমস্ত হৃদয় দিয়ে সুভাষ-চন্দ্রকে ভালোবেসেছেন। বলতেন—সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারিনে।

হাওড়া জেলার কর্মী সম্মেলনে দলা-দলির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে নেমন্তন্ন করা হল না। তাই নেমন্তন্ন পেয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—আমি যাব না।

প্রশ্ন হল—কেন যাবেন না? হাওড়া জেলার কর্মী সম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে।

কয়েকজন বিপ্লবী তরুণের উদ্যোগে 'বেণু' নামে একখানা মাসিকপত্র চলে। শরৎ-চন্দ্রের 'বিপ্রদাস' দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হল 'বেণু'তে—১৩৩৬-৩৮ বঙ্গাব্দে।

শরৎচন্দ্রকে একদিন প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, কত টাকা নিয়ে তিনি 'বেণু'র ছোকরাদের লেখা দিচ্ছেন।

শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছেন—ওরা দেবে টাকা? কোথায় পাবে? ওদেরকেই আমার সাহায্য করা উচিৎ—কিন্তু তা পারি কই?

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছেন ওদের সঙ্গে যে আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের কাছ থেকে নেব টাকা? বলো কি তোমরা!

বহুদিন শরৎচন্দ্র 'বেণু'র কর্মীদের বলেছেন—দ্যাখো, তোমরা বড় দেখে একটা বাড়ি নিয়ে 'বেণু'র আপিস করো, আমি প্রায়ই যাব, কলকাতা গিয়ে ওখানেই উঠব—দেখবে, বাঙলার সাহিত্যিকগোষ্ঠী তোমাদের সঙ্গে কেমন আত্মীয়তা করেন।

কিন্তু 'বেণু'র নিঃসম্বল কর্মীরা বড় বাড়ি ভাড়া করে আপিস খুলতে পারেনি।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ১৩ মে, লিখেছেনঃ 'দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম্ শেম্ বললে, গাড়ীর জানলার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে, আবার এক দল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক রূপনারাণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।... জয় হোক্ কয়লার গুঁড়োর! জয় হোক্ বারো ঘোড়ার গাড়ীর!'

শরৎচন্দ্র, ১৯৩১ সালের ২০ জুন, ঈষৎ কৌতুক করে লিখেছেনঃ "কাল আমাদের হাবড়ার জেলা Congress election হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালিগালাজ ও লাঠি ঠকঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি President, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটাতারের বেড়া, মায় electrification সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয়নি, নির্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক President আছি, vested interest জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না।"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসের নীতির বিরোধী; প্রতিবাদ করে তিনি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন, এই বিরোধিতার ফলে কংগ্রেসী ন্যাশনালিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বন্ধুপুত্র পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁর সামনে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন—পণ্ডিত মালব্য এতদিনে মস্ত ভুল করলেন।

কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বললেন—কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—কংগ্রেস যদি সাম্প্র-দায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ভুল করেই থাকে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কি সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা চলত না? মালব্যজী যে পথ বেছে নিলেন তাতে যে কংগ্রেসকেই দুর্বল করা হবে। অথচ কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে কমুনাল অ্যাওয়ার্ড রদকরণের চেষ্টা কি কোনোদিন সার্থক হবে ভাবো?

পাঁচুগোপাল উৎকর্ণ হয়ে বললেন—

[illegible] এই অভিমত সর্বসাধারণকে [illegible] পারি?

[illegible]—ঠিকে বিবরটা আমাকে [illegible]

পরদিন পাঁচুগোপাল বিবরটা সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে দিয়ে গেলেন, আদ্যন্ত পড়ে শরৎচন্দ্র বললেন—কিছুই হয়নি। মোটেই লিখতে পারোনি হে।

জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন পাঁচুগোপাল।

শরৎচন্দ্র বললেন—মালব্যজীকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—সেই কথাটাই কোথাও পরিস্ফুট হয়নি। দেখো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করি ক্ষতি নেই, কিন্তু যে কথাটা বলব তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা চাই। তোমাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ওটা দাও, আমি নিজেই আগাগোড়া লিখে দেব।

নিজেই আগাগোড়া লিখে দিয়েছেন।

একদা কংগ্রেস ছিল, শরৎচন্দ্রের মতে, বিচ্ছিন্ন অক্ষম জাতীয় মহাসমিতি; নিজের অদম্য অকপট বিশ্বাসের জোরে মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিষ্ঠানে সমগ্রতা এনেছেন, শক্তি দিয়েছেন, প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন; তাঁর এই দান সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয়। মৃত্যুর অল্পকাল আগে শরৎচন্দ্র লিখেছেন: "উত্তর কালে হয়ত তাঁহার (মহাত্মা গান্ধী) মত ও পথ উভয়ই পরিবর্তিত হইবে, তাঁহার প্রবর্তিত আদর্শের হয়ত চিহ্নও থাকিবে না, তথাপি তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত ঋণ তাঁহার কোনও দিন বিস্মৃত হইবে না।"

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯২৩ সালে কংগ্রেসে এসেছেন। তিনি বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহকর্মী। ১৯২৬ সালে হরেন্দ্রনাথ হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হয়েছেন। বহুকাল তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটিতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেছেন; শরৎচন্দ্র সভাপতি, হরেন্দ্রনাথ সম্পাদক।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৪ সালের ১২ জুলাই, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

"তোমার কাছে এসেছিলাম এই আশা নিয়ে যে দেখা হবে এবং আজই যা হোক একটা Congress ব্যাপারের সমাপ্তি করে যাবো। কারণ এইটুকু তোমার কাছে প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নয় যে যে-হরেনকে আমি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও আপনার করে রেখে ছিলাম সে আজ আমার এই দুঃসময়ে পরিত্যাগ করবে। আজ যদি একটা ভুল করেই থাকি তবু আমাকে শাস্তি না জুগিয়ে পারবে না।

"তোমার কাছে আমার প্রার্থনা আমাকে সমস্ত বাঙলা দেশের কাছে অন্ততঃ তুমি লাঞ্ছিত করো না।

"আজও আমার বিশ্বাস তুমি যদি আমাকে দুর্বল না করো কোন কর্মীই আমাকে বলহীন অক্ষম করতে পারবে না।

"আমার আদেশ বলো অনুরোধ বলো তোমার কাছে এইটুকু আমি চাই।"

'বাতায়ন', ১৯৩৪ সালের ৩ আগস্ট, লিখেছে: "সংবাদ পাওয়া গেল যে শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাওড়া জিলার কংগ্রেসের দলাদলির অবসান ঘটেছে এবং তাঁরা একযোগে কাজ করবেন বলে মনস্থ করেছেন।..."

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরি, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারিকে লিখেছেন:

"Please call a meeting of the Ex. Committee as early as possible and have my resignation accepted in the meeting."

কিন্তু সেবারের ইস্তাফাপত্র নিষ্ফল হয়েছে; শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন তেমনি সভাপতি থেকেছেন।

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ২ মে, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: "হাবড়ার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা বিশেষ দরকার। নিকুঞ্জ কার্তিক প্রভৃতি দু'একজনকে নিয়ে একবার এসো। আমি দিন চারেক হলো বাড়ী থেকে এসেছি। সুস্থ মোটেই নয় তবু সাবেক কালের নেশা কাটিতে চায় না। এখনো

congress-এর ভালমন্দর জন্যে মন যেমন করে। কিরণের কাছে কিছু কিছু শুনেছি তুমি এলেই সব ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারি।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১০ জুলাই, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : "অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আমার দরকার। পত্র-পাঠ মাত্র আসা চাই।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১০ অক্টোবর, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

"কাল বিকালে তুমি notice দিতে পারোনি আজকের কাগজে তার উল্লেখ না দেখতে পেয়ে মনে হলো। যদি meeting-এর notice কাগজে না গিয়ে থাকে তা হলে Howrah Town Hallটাই ঠিক করো। খরচ যা লাগে আমিই দেবো। অবশ্য যদি লাগে। আর যদি ওরা exempt করে তা হলে খরচ লাগবে না।

যেখানে সেদিন হয়েছিল অর্থাৎ তোমাদের পাড়ায় আমার যেতে সত্যই ভরসা হয় না। তুমি দায়িত্ব নিয়েছো বটে, কিন্তু হয়ত তোমার কথাও থাকবে না। কারণ...এ'দের সামলাতে পারবে না। সমস্ত দোষ তোমার উপরেই পড়বে। কারণ, আমার সম্ভ্রমের সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই নেই। তাই ভেবেচিন্তে দেখলাম Town Hall হলে ও রকম ব্যবহার তাঁরা হয়ত করবেন না। তুমি শুধু তিনজন rate payers দস্তখত নিয়ে permission-এর জন্যে vice chairman Howrah municipality-র কাছে একটা application করো। এবং স্থানটা Town Hall বলেই কাগজে notice দিও। কাল থেকে আমার শরীরটা আবার খুব খারাপ হয়েছে। আশা করি তুমি ভালোই আছ।"

শরৎচন্দ্র, ১৯৩৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর, হরেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

"This is to submit my resignation from the Presidentship of the Howrah Dist. Congress.

It is not due to any slight difference between myself and the Committee, for wherever there is no difference dispute and bitter quarrels in the Congress organisation throught Bengal, therefore, it is not for that. Recently I have become very ill and I feel I could not be of any use to the Congress in future : It is best that I should vacate.
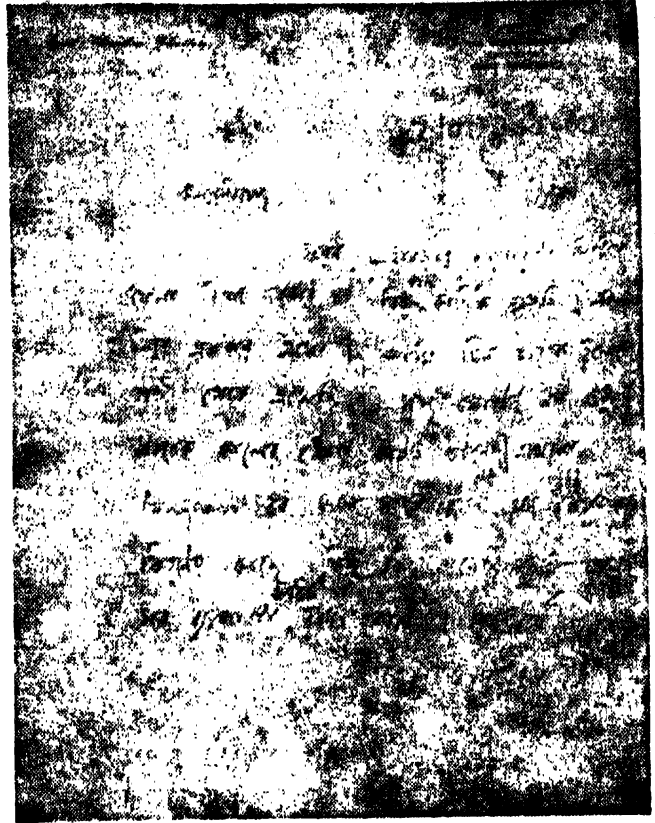
In tendering my resignation I have no ill will against any one and least of all aginst you, the same affection you will always find in me. Or perhaps, I should not ever have come into politics. It is so very alien to my vocation and so often becomes painful to my inner self. Strife, dissension and disputes inherent in politics were not meant for me : they always destroy that peace of mind I so essentially require....."

হরেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা শরৎচন্দ্রের আরও একটা চিঠি

সকল দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের পরমাত্মীয়। বহু দেশপ্রেমিককে তিনি সাহায্য করেছেন। কেবল সাহিত্যিক হিসেবে নয়, কংগ্রেসকর্মী হিসেবেও শরৎচন্দ্র স্মরণীয়। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন : "বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে।"
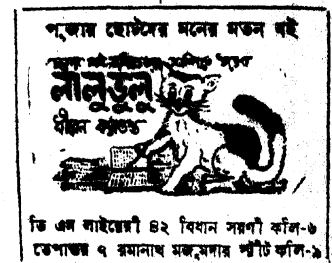
---

*এই রচনায় ব্যবহৃত শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী স্বর্গত হরেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমিয় ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আলোকচিত্রটি

শান্ত রায়

রাত কম হয়নি। পৃথিবী আস্তে আস্তে নিঝুম। ঘরের এক পাশে এক প্রৌঢ় চেয়ারে বসা। নিবিষ্টভাবে লিখে চলেছেন। পরনে ঈষৎ উঁচু করে বাঁধা ধুতি ও লংক্লথের ফতুয়া। মাথায় অধিকাংশ পলিত কেশ। বাঁ হাতটি টেবিলের ওপর ফেলে রাখা। লিখতে লিখতে কতো কাটাকুটি হয়। একটা লেখা কাগজ মুড়ে দলা পাকিয়ে টেবিলের নিচে রাখা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দেন। ক্লান্ত কলমটিকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বার দুই পায়চারি করে ইজিচেয়ারটিতে গা এলিয়ে দেন। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়েন। গলায় গান এসে যায় তাঁর। গুনগুনিয়ে। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল হইল মম প্রাণ/সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।'

ঘরে আরো দুটি প্রাণী আছে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক আর গৌরবর্ণা অতুলনীয় রূপের অধিকারিণী এক তরুণী গৃহবধূ। এই রায়বাড়ির বউ, প্রৌঢ়ের অনুজপ্রতিম মণি—অর্থাৎ মনীন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, নির্মলারাণী দেবী। প্রৌঢ়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর কৃষ্ণবর্ণ যুবার নাম—তুলু, শরৎবাবুর দিদির ভাগনে। শরৎবাবু যখনই স্বগৃহ পানিত্রাস থেকে আসেন কলকাতায়, বেহালায় মণিবাবুদের বাড়িতে তখন তাঁর সঙ্গে থাকেন এই তুলুবাবু।

ঘরের ডান দিকে, কৌচের ওপর তুলুবাবু কি একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। আর বাঁ দিকে মাটিতে, আসনে বসে আছে বউটি, নির্মলা। নির্মলার স্বামী মণিবাবু ঘণ্টাখানেক আগে, নৈশভোজের পর শরৎবাবুর সঙ্গে গল্পসল্প করলেন কিছুক্ষণ। তারপর দাদা, গুডনাইট, কাল ভোরে উঠতে হবে—' বলে সোফা ছেড়েছেন।

—গুডনাইট মণি, যাও, শুয়ে পড়ো, বলে শরৎবাবু নির্মলার দিকে মুখ ফেরালেন ঃ কি গো বউমা, তোমার ঘুম পায় নি? রাত তো কম হলো না।

—আপনার বউমা থাকতে পারে। কৌতুকের স্বরে মণিবাবু বলেছেন, ও দেরীতে ঘুমোলেও তো কোনো ক্ষতি নেই, যখনই ঘুম ভাঙুক না কেন, ঘরের কাজ তারপরই ঠিক হয়ে যাবে। জ্যোৎস্নার মতন স্নিগ্ধ হাসি শরৎচন্দ্রের চোখে মুখে ফোটে। মণিবাবু পরোক্ষভাবে নির্মলাকে থাকতে বললেন। তিনি জানেন ঃ ফটো তোলার ব্যাপারে দাদাকে রাজী করাতে পারবে হয়তো তাঁরই এই 'বউমা'টি। গ্রন্থে ছাপবার মতো একটিও উল্লেখযোগ্য ছবি নেই দাদার। গতকাল শরৎবাবুর কাছে এ-কথা পেড়েছিলেন মণিবাবু। শুনে-টুনে শরৎবাবু বললেন, এর আগে এ-ব্যাপারে দু' একজন বলেচে, আমার একবার মনেও হয়েছিলো, কিন্তু তেমন গা করিনি। এমন কি গুরুত্বপূর্ণ! তা তুমিও বলছো—। একটু অনামনস্ক হয়ে শরৎবাবু বলেছেন, বইয়ের সঙ্গে লেখকের ছবি-ছাপা না হলে কি তার আকর্ষণ কমে যায়?

—দাদা, আপনার লেখার সঙ্গে 'আকর্ষণ' কথাটা একেবারে মানায় না। আপনার লেখা বই বাংলার প্রায় সব মানুষই পড়েছেন এবং সে সব বইয়ে আপনার ছবি ছাপা ছিলো না। কিন্তু কথাটা কি জানেন, সব পাঠকই তাঁদের প্রিয় গ্রন্থকারকে চাক্ষুষ, সম্ভব না হলে অন্তত ফটোর মাধ্যমে দেখতে চান। আজও এ প্রসঙ্গে কথা তুলেছিলেন মণিবাবু। কিছুটা যেন নিমরাজী মনে হচ্ছিলো শরৎবাবুকে, তাঁর কথার ভাব থেকে। তারপর কথার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এসে গেছে অন্য প্রসঙ্গ। কাল সকাল-সকাল উঠতে হবে মণিবাবুকে, তাই তিনি দেরী করতে চান

বোর্ন এন্ড শেফার্ড-এ তোলা শরচন্দ্রের বিখ্যাত ফটো

না। নির্মলাকে সব বলেছেন মণিবাবু, ও ঝাঁঝিয়ে-সাঁঝিয়ে আসবে।
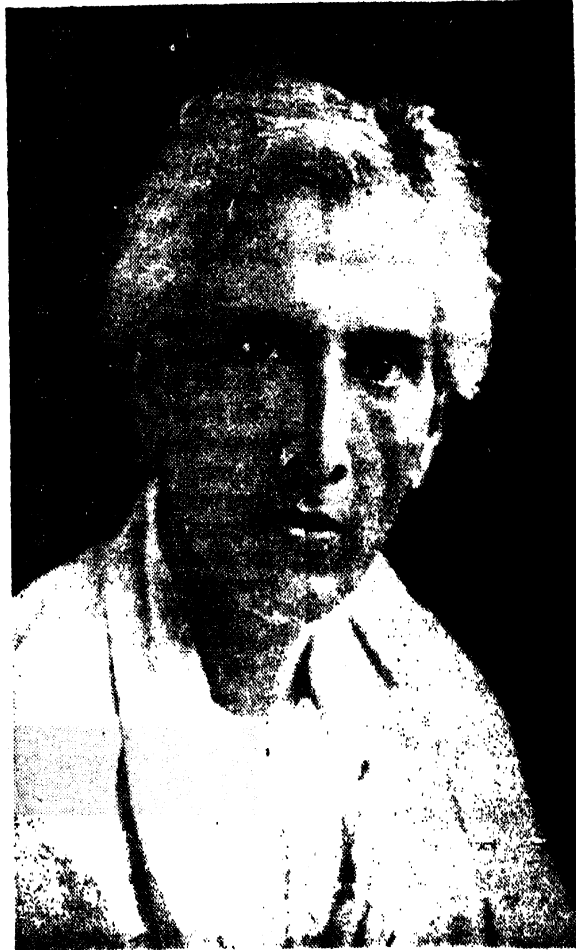
দাদার টেবিলে সরবৎ বা চা দিতে এসে অনেক সময় নির্মলা দেখেছে : নিজের লেখার ওপর দাদা কতো কাটাকুটি করেন। নিজের লেখা কতো লাইন একেবারে কেটে উড়িয়েই দেন—দয়া-মায়া নেই!...এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘুম এসে গিয়েছিলো দু' চোখের পাতায়। হঠাৎ দাদার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' শুনে নড়েচড়ে বসলো। আঙুল দিয়ে চোখ কচলে নিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো : ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর রাখা দাদার হাতে, দু' আঙুলের ফাঁকে চুরোট। জ্বলছে। একটু একটু পা নড়ছে গানের তালে-তালে।

দু' চোখ তাঁর বোজা। ভাবে বিভোর। চণ্ডীদাসের গান দাদার বড্ড প্রিয়।

আজ দুপুরের কথা মনে পড়ে গেলো নির্মলার। বাড়ির কর্তা—অর্থাৎ শ্বশুর মশাইয়ের হুকুম—বেলা বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা। এদিকে বারোটা বেজে গেলো, দাদা তাঁর নিচের ঘরে লেখায় মগ্ন। তাঁর গালে হরতুকীর টুকরো —অর্শের জন্য এই কবরেজী ওষুধ।

গড়গড়ায় বার দুই টান মেরে তিনি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ রেখে-ছিলেন। এমনিতেই তাঁর চোখ দুটি বড়ো মায়াবী-মায়াবী, এখন বিন্দুমাত্র প্রখরতা—এমনকি চোখের সামনের কোনো কিছুর ওপরই তাঁর দৃষ্টি নেই। একটু-ক্ষণের জন্য চোখ বুজে আবার টান দিলেন গড়গড়ায়। সে মুহূর্তে তাঁর চোখে অন্য এক জগৎ, কিছু মানুষ-জনের চলাফেরা, কথা।...স্বপ্নের মতন। অথচ ঠিক স্বপ্নও নয়, দারুণ জীবন্ত।

নির্মলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মৃদু হাসি ফুটেছিলো তাঁর ঠোঁটে।—কী গো বউমা। চাপা কৌতুক আর কপট অভিমান মেশানো নির্মলার কণ্ঠস্বরে : আপনি তো দাদা, হরতুকীর টুকরো, গড়গড়া চুরোট আর সিগারেটের জোরে খিদে তেষ্টা ভুলতে বসেছেন। কিন্তু আমাদের ভগবান তেমন শক্তি দেননি যে—

—বউমা, সত্যি বলচি, এখন আমার খেতে ঠিক রুচি আসচে না। শিশুসুলভ কাকুতি তাঁর গলায়। তারপর বললেন মণিও বোধহয় আমার জন্যে না খেয়ে বসে রয়েচে?

—থাকবে না! রোজই তো ওঁকে ন'টার ভেতর খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় হয়, তা আজ হপ্তায় একটা দিন রোববার সে দাদার সঙ্গে বসে খাবে ভেবেছিল—।

ঈষৎ চিন্তিত দেখালো তাঁর চোখ, কপাল। নির্মলা খানিকটা যেন সাহস পেয়ে বলে, তাছাড়া আমরা নয় একটা বেলা উপোস করেই রয়ে গেলুম, কিন্তু বামুন আর ঝি-চাকরেরা? আমাদের খাওয়া-দাওয়া না হলে যে ওরাও খেতে পাবে না। এবার লজ্জিত দেখালো তাঁর চোখ-মুখ। বললেন তুমি খাবার ঠিক করো বউমা, মণিকে বলো আমি আসচি, মাথাটা ধুয়ে নিই, চান এক-দিন না করলেও চলবে।

খেতে খেতে মণিবাবু বললেন, কাল বিকেলে কে কে এসেছিলেন, দাদা?

—হুঁ? কা—ল, রাধু নরেন, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী—

—কাল! ও'রা তো পরশু সন্ধ্যায় এসেছিলেন, আমার সঙ্গেও দ্যাখা হয়েছে। শুনলুম, কাল নাকি নির্মলবাবু এসে-ছিলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরা তো কাল আসেনি, পরশুই এসেছিলো। অন্যমনস্ক ভাবটা খানিক কাটিয়ে শরৎবাবু বললেন, কাল বিকেলে নির্মল (নির্মলচন্দ্র চন্দ্র) আর কুমুদশঙ্কর রায় এসেছিলো। নির্মল আমাকে বারু বার বললে, আপনি কিছুদিন আমার বাড়িতে এসে থাকুন অনুগ্রহ করে, বললে, আমার সান্নিধ্য ওদের সকলের কাম্য।

—আপনি কী বললেন? মণিবাবু এক-টুকরো মাছ মুখে পুরে জিজ্ঞেস করলেন।

—আমি বললুম, বেশীরভাগ সময় আমাকে থাকতে হয় পানিত্রাসে। কলকাতায় এলে মণির বাড়িতে এসে উঠতে হয়। মণি আর বউমার আতিথ্য ঠেলে আর কোথাও গিয়ে বড় একটা থাকতে পারিনে। তোমাদের যখন খুশি আমার কাছে আসবে...বললুম আমার সান্নিধ্য তোমাদের কাম্য তা আমি জানি। এ আমার সৌভাগ্য ছাড়া আর কী হতে পারে।

—দাদা, আপনি আমাদের 'আতিথ্যে'র কথা তুললেন কেন? আমরা আপনার যোগ্য কতোটুকু কী করতে পাচ্ছি?

—না মণি, আমি মিথ্যে বলি না। তোমা-দের ভালোবাসা না পেলে আমার জীবনে অনেকখানি অপূর্ণতা থেকে যেতো। শরৎ-বাবুর কথায় এমন ধ্বনি এমন আন্তরিক মাধুর্যের বিচ্ছুরণ যে এরপর আর কোনো কথা খাটে না। মণিবাবু চুপচাপ খেতে লাগলেন। খেতে খেতে শরৎবাবুও অন্য-মনস্ক।

—কালিয়া আর একটু দিতে বলি, দাদা?

—না বউমা, আর কিছু নয়। এক চুমুক জল খেয়ে দুটো হাত কাছাকাছি এনে উঠবার উপক্রম করছিলেন শরৎবাবু।

—কী হলো? লাউঘণ্ট, মাছ ভাজা, দই—সবই তো পড়ে রইলো। কী খেলেন আপনি? নির্মলা অবাক।

—দাদা, আজ আপনার কী হয়েছে বলুন তো। অমন ছেলেমানুষের মতন ছটফট করছেন কেন? কী ব্যাপার আমাকে ফ্রাঙ্কলি বলুন। মণিবাবু খাওয়া থামিয়ে বললেন।

—মাথার মধ্যে কতোগুলো কথা এসে জড়ো হয়েছে, মণি। এ বিষয়ে সকাল থেকেই ভাবছিলুম। এখন তারই একটা ডিসিশন খুঁজে পেয়েছি, না লিখে রাখতে পারলে—

—ও। এই ব্যাপার? এ জন্যে আপনি খাওয়া ছেড়ে উঠবেন? আপনি বসুন। মণি-বাবু আশ্বস্ত হয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি সাবধানে দাদার কলম, চশমা, লেখার প্যাড—সব নিয়ে এসো। হ্যাঁ, আর একটা জলচৌকি, ওটার ওপর কাগজ রেখে লিখতে খুব অসুবিধে হবে না। তারপর একটা 'পট' এনে জল ঢেলে দাও দাদার হাতে। মণিবাবু অনুযোগ-মেশা ভর্ৎসনার

সুরে বললেন, দাদা, আজ আপনার লেখার জন্যে খাওয়াই হচ্ছিলো না। আমায় বলবেন তো এই কথাটুকু। চাকরকে জলচৌকি আনতে বলে কথামতো কাজ সাঙ্গলো নির্মলা। লেখা হলে কলম বন্ধ করে শরৎবাবু বললেন, তুমি আমার গত জন্মে মা ছিলে বোধ হয় বউমা। এ-জন্মে এই বুড়ো ছেলের ব্যবহারে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছো।

—দাদা, আপনার মুখে খালি 'আমাদের কষ্ট', 'আমাদের আতিথ্য' এ ছাড়া কি আর কথা আসে না! আর বলবেন না এ-সব। ঠোঁট ফুলিয়ে নির্মলা বলে। কিন্তু 'গত-জন্মের মা' কথাটা শুনে প্রৌঢ়র প্রতি অন্তর কেমন আর্দ্র হয়ে ওঠে নির্মলার। বড্ড ছেলেমানুষ মনে হয় এই 'বুড়ো' দাদাটিকে।

—বউমা। শরৎবাবু ডাকলেন। রাত দেড়টার ঘণ্টা বাজলো দেয়াল ঘড়িতে। অনেক রাত হলো আজ এই অব্দি। লেখার কাগজ-পত্র গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন শরৎবাবু।

—আপনার হয়েছে, দাদা? নির্মলা উঠে দাঁড়ায়। তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো ওর চোখে। তুলুবাবু ঘুমিয়ে, না জেগে ঠিক বোঝা যায় না। চোখের পাতা দুটো পিটপিট করছে। চোখ লালচে। ঘুমে। মস্ত হাই তুললেন তুলুবাবু।

—চলো বউমা, তোমাকে তোমার ঘর অবধি পেঁছে দিয়ে আসি। নির্মলা লজ্জা পায়: না-না দাদা, সে কি! আমি একলাই যেতে পারবো ঠিক।

—চলো, ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে এসে শরৎবাবু বললেন, এটা তো আমার কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যেই বউমা। এ এমন কিছু কাজ নয়।

সিঁড়িতে এক ধাপ উঠেই নির্মলা বলে, আপনাকে একটা কথা বলবো বলে এলুম, ঘুম পেয়ে গেলো, আর বলাই হলো না।

—বেশ তো। কী কথা বলো।

—কাল আপনাকে যেতে হবে—

—কোথায়?

—বোর্ন এণ্ড শেফার্ডে—

—ও, ফটো তোলাবার জন্যে তো? তা তোমরা আমার ফটো তোলাবার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেচো, কিন্তু আমার মনে হয় —এমন চাষার মতন একটা মানুষের ছবি লোকে ভ্রূক্ষেপও করবে না।

—হ্যাঁ। তাই তো। আপনি লোকেদের অন্তর্যামী কিনা—!

শরৎবাবুকে ঈষৎ লজ্জিত দেখায়। বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন।

বিকেলে মণিবাবুর গাড়ি বেরুলো। ফটো তোলানোর ব্যাপারে শরৎবাবুকে রাজী করাতে ক'দিন সময় গেছে। বেশ ভালো করে —— — —— মণিবাবু ও

বেহালার মণীন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর পত্নী নির্মলারাণী দেবী

নির্মলা।—একটা উল্লেখযোগ্য ফটো বলে কথা! সস্ত্রীক মণিবাবু, তুলুবাবু ও শরৎবাবু এবং শরৎবাবু ও মণিবাবুর ঘনিষ্ঠ ক'জন সঙ্গে চললেন। 'বোর্ন এণ্ড শেফার্ড' স্টুডিওর গেটে গাড়ি দাঁড়ালো। সবাই নামলেন। মাটিতে পা দিয়েই মাথায় হাত বুলিয়ে চুল এলোমেলো করে ফেললেন শরৎবাবু।

—এ কী দাদা, সব চুল ঘেঁটে দিলেন! উদ্বিগ্নভাবে বলে ফেলে নির্মলা।

—তা এ বয়সে কি বর সাজলে আমায় মানাবে?

—বয়স যাই হোক, আপনি এখন আবার বর সেজে দাঁড়ালে, বাঙলাদেশের অনেক মেয়েই মালা হাতে এসে হাজির হবে এখানে, তা জানেন? কৌতুক নির্মলার স্বরে। দাদার কথার জের টেনেই ও জবাব দিয়েছে। শরৎবাবু হেসে ফেলে বললেন, শোনো মণি, একবার বউমার কথাটা শোনো। বড় বউ এ-কথা শুনলেই হয়েচে।

অবিন্যস্ত চুলেই ক্যামেরার সামনে বসলেন শরৎবাবু। গায়ে পাঞ্জাবির ওপর উত্তরীয়। ফটো উঠলো। এই ফটোটিই আজ সর্বপরিচিত, শরৎচন্দ্রের প্রায় সব গ্রন্থের পাতায় মুদ্রিত। উত্তরীয়টি যেন এ-ফটোকে দিয়েছে অনেকটা গাম্ভীর্য। এ-কাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জ্ঞাত 'যমুনা'-সম্পাদক ফণি পাল, 'ভারতবর্ষ'-এর জলধর সেন, বিপ্লবী বারীন ঘোষ, কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ, দিলীপকুমার রায়, হরেন ঘোষ এবং আরো অনেক গুণিজন। এঁরা আমার—এই লেখকের পরম শ্রদ্ধাস্পদ। মণীন্দ্রনাথ রায় ও নির্মলারাণী দেবী আমার পিতামহ-পিতামহী। আমার পিতা প্রভাত-কুমার শরৎচন্দ্রের স্নেহরসে সিক্ত হয়েছেন। তাঁর মুখ-নিঃসৃত অনেক কথা হয়তো শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত অজ্ঞাত কোনো বিষয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করতে সক্ষম হতো। কিন্তু শৈশবে তাঁর সান্নিধ্য থেকে আমাকে চিরকালের মতো বঞ্চিত হতে হয়েছে—তাঁর আত্মা অসময়ে ইহলোক ছেড়ে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছে। এ-রচনা পিতামহীর মুখে শোনা স্মৃতি-বিজড়িত কথা অবলম্বনে রচিত।

এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর সুতী কাপড় এত মজবুত ও টেকসই যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই সুতী কাপড়
BCCM-32-75 BEN
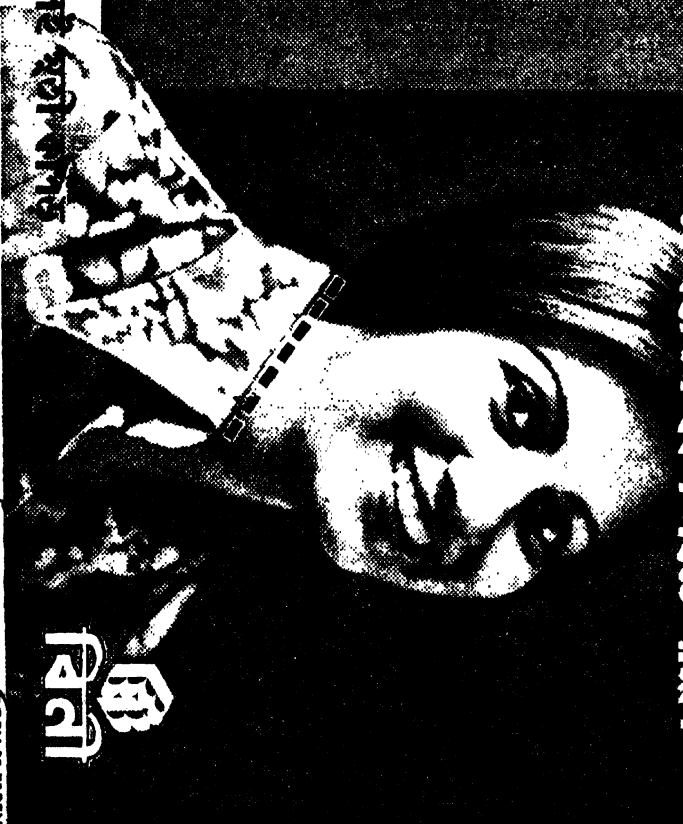
হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

রামবহাল তেওয়ারী

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সাযুজ্য ঘটায় সাহিত্য। তার রসের গতি হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে। যথার্থ রসিক মনের ছোঁয়ায় রস হয়ে ওঠে উদ্বেল। অগণিত হৃদয়ে চায় সে প্রসার ও বিস্তার। পক্ষান্তরে রসিক-মন খোঁজে বিচিত্র রসের আস্বাদ। যত পায় তত চায়। এই পাওয়া ও চাওয়ার প্রবল চাপে সাহিত্যের ঘটে ভাষান্তর। আনন্দানুভূতির ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়ে নানা-ভাষাভাষী পাঠকের মন। সার্থক হয়ে ওঠে সৃষ্টি।

শরৎ-সাহিত্য সার্থক সৃষ্টি। তার ঘটেছে ভাষান্তর। বাংলার সীমা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সর্বভারতে। সর্বাধিক হিন্দীভাষীদের মধ্যে। 'শরৎবাবু' তাঁদের পরম আপনজন। হিন্দী সাহিত্যিকদের কাছেও। বঙ্কিম, রমেশ, রবীন্দ্রনাথ অপরিচিত নন। খুবই পরিচিত। তা হলেও শরৎচন্দ্রের মতো নয়। তাই বলে শরৎচন্দ্রকে জানা ও বোঝা শেষ হয়নি।

হিন্দী-পাঠক শরৎচন্দ্রকে পড়তে, বুঝতে ও আপন করতে শুরু করে বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ায়। সে কাজ আজও শেষ হয়নি। বাড়ছে তার বৈচিত্র্য ও গভীরতা। বোম্বাইয়ের নাম করা প্রতিষ্ঠান—হিন্দীগ্রন্থ-রত্নাকর। তাঁরা ছেপেছেন সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদ। কোনো কোনো গ্রন্থের বেরিয়েছে একাধিক সংস্করণ। নারীর মূল্য, শরৎ-প্রবন্ধাবলী, শরৎ-পত্রাবলীও তাঁরা ছেপেছেন। তাঁদের এই ব্রতের সূচনা এই শতকের তিনের দশকে। এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদের 'কিতাব মহল' ও 'ইণ্ডিয়ান প্রেস', বারাণসীর 'সাহিত্য-সেবক কার্যালয়' প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। অনুবাদকের সংখ্যাও কম নয়। বারো-'চান্দজন প্রতিষ্ঠিত। ধন্যকুমার জৈন, রামচন্দ্র বর্মা ও রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় সুপ্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে হিন্দীতে মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অন্তত দশটির কথা জানি। আরও হচ্ছে। সংখ্যায় কম হলেও বিষয়বৈগুণ্যে বেশির ভাগই উচ্চ মানের। শরৎচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠ ও গভীরভাবে জানবার ও বোঝবার প্রবল উৎসাহ এবং অদম্য কৌতূহল ছড়িয়ে আছে গ্রন্থ কয়টির পাতায় পাতায়। তাঁর জীবন ও মানসগঠন, জীবন-দর্শন, সাহিত্য-জিজ্ঞাসা এবং সাহিত্য-সৃজন—সবই আলোচিত এবং প্রশংসিত। শরৎচন্দ্র বিষয়ে বাংলায় যা নেই, হিন্দীতে তা আছে। একটি প্রামাণিক জীবনালেখ্য। নাম 'আওয়ারা মসীহা।' বিষ্ণু প্রভাকরের দীর্ঘ পনের বছরের অক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত সাধনার ফল। বইটি দোষত্রুটিহীন। আমরা কেউ এ পরিশ্রমে রাজি নই। অনেকে ভাবি পণ্ডশ্রম। কী বা আছে শরৎচন্দ্রে। গেঁয়োযোগী ভিখ পায় না। পেলেও তাতে মন জুড়োয় না। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমও ঘটে। যাক্ সে কথা।

বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত মানব জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করেছেন শরৎচন্দ্র। প্রেমের জটিল অস্থিরতা পেয়েছে মনোবৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি। প্রতিটি দুঃখী ভাবুক হৃদয়কে স্নেহে লালন করেছেন তিনিই সর্বপ্রথম। করেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নারী-হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেন। সহজ, স্বাভাবিক মমতা ও সহৃদয়তায় সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করেছেন। আর দিয়েছেন শিল্পরূপ। এইভাবে তাঁর ও পাঠকের মাঝে সৃষ্টি করেছেন রসের জগৎ। তাঁর বিচার ও দর্শন যেমন সরস তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। উপন্যাসে উদ্ভূত জীবন-নাট্যের সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে না চাপিয়ে, মানসিক জাগরণের মাধ্যমে সম্ভব—একথা শরৎচন্দ্রের। এসব মন্তব্য তাঁদেরই। কাজেই এসব হিন্দী সাহিত্যিক ও পাঠক-পাঠিকার অগোচর নয়। হিন্দী উপন্যাসেও দুর্লভ নয়। এ হল হিন্দী উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান। এইভাবে হিন্দী সাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করেন শরৎচন্দ্র। অতি পরিচিতির ফলে তাঁর বাঙালি-পরিচয় খসে পড়ল। হয়ে পড়লেন অখিল ভারতীয়। কেড়ে নিলেন সকলের মন। হয়ে পড়লেন হিন্দীর সর্বজনপ্রিয় লেখক।

পঞ্চম দশক থেকে হিন্দীতে উপন্যাসের আলোচনা বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পায় গবেষণা-কর্মও। এসব ক্ষেত্রে লক্ষিতব্য—শরৎচন্দ্রের জয়-জয়-কার। তিনি বহু আলোচিত, স্বীকৃত এবং পূজিত। স্বীকৃতি যেমন সশ্রদ্ধ গৌরব গানও তেমনি আন্তরিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, শিল্প ও মানবতাবোধে অনেকে অনুপ্রেরিত, উদ্বুদ্ধ। সমসাময়িক হিন্দী উপন্যাসকারগণ এবং তরুণরাও। তার প্রমাণ ও স্বীকৃতি ছড়িয়ে আছে হিন্দী-সাহিত্যের যত্রতত্র। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করি।—

প্রখ্যাত হিন্দী ঔপন্যাসিক প্রেমচাঁদের তুলনা করা হয় ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর তুলনা চলে। উভয়ের উপন্যাসে কয়েকটি বিষয়ে বেশ মিল। শরৎসাহিত্য-পাঠে তিনি প্রেরণা ও উৎসাহ পান—এমন কথা বলা চলে। তবে দুজনের ধাত আলাদা। শরৎচন্দ্রের হৃদয়-ঐশ্বর্য তাঁর কাছে স্পৃহনীয় কিন্তু গ্রহণীয় নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে তিনি জৈনেন্দ্রকুমারকে বলেছিলেন, 'হৃদয়কে প্রবলভাবে স্পর্শ করে বাংলাসাহিত্য, কারণ তাতে স্ত্রীভাবনার আধিক্য।' যা তাঁর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই, কারণ তিনি বাঙালী নন। বাঙালীর ভাবুকতা যেখানে যেতে পারে, তিনি সেখানে অক্ষম। জ্ঞানের যেখানে গতি নেই, ভাবুকতা সেখানে অবাধগতি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই 'মহৎ সাহিত্য স্রষ্টা।' এই মহৎ দুই শিল্পীকে প্রেমচাঁদ কতকাংশে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জৈনেন্দ্রকুমারের মধ্যে—'হিন্দী সাহিত্য জৈনেন্দ্রের মধ্যে শরৎ ও রবীন্দ্রনাথকে একসঙ্গে পেয়েছে।' কবি ও নাট্যকার জয়শংকর প্রসাদ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হলেও পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারেন নি। শরৎ-সাহিত্যের পরিবেশ বাংলায়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল একজন 'হিন্দী শরৎচন্দ্রের'। কিন্তু চিন্তা ছিল—শরতের উপন্যাসের সমাজ কি হিন্দীভাষী অঞ্চলে সম্ভব? জয়শংকর প্রসাদের এই আকাঙ্ক্ষা সমস্ত হিন্দীভাষীর। যা এখনো মেটেনি। হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি অনুধাবনের পক্ষে কি এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৩ সালের মার্চ-সংখ্যা 'হংস'-পত্রিকায় 'সাহিত্য কী প্রগতি' ছাপা হয়। লেখক প্রেমচাঁদ। এই মূল্যবান প্রবন্ধটির এক স্থলে আছে, "ম্যাক্সিম গোর্কি, আনাতোল ফ্রান্স, রোমাঁ-রোলাঁ, এইচ. জি ওয়েলস আদি য়ুরোপীয় এবং স্বর্গীয় রতননাথ সরশার, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ভারতীয়—এঁরা সকলে আমাদের আনন্দের জগৎকে বাড়িয়ে চলেছেন।" এই অভিনব আনন্দের জগৎটির পরিচয় যে ভাষায় যেভাবে তুলে ধরেছেন প্রেমচাঁদ, তা নিশ্চিতভাবে শরৎ-সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের কথা স্মরণ করায়। পাঠকের তা অজানা নয়। সাহিত্যিক বনারসীদাস চতুর্বেদী অকপটে স্বীকার করেছেন যে, শরৎ-সাহিত্যের করুণ রস তাঁকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করে। 'শরৎচন্দ্রের

উপন্যাস পড়ে আমি ৭৫% করুণ রসে অভিভূত হই আর ২৫% চিন্তার প্রেরণা লাভ করি।' জৈনেন্দ্রকুমারের অভিমতও অনুরূপ। 'শরৎচন্দ্র আমায় যেমন কাঁদিয়েছেন, অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

জনৈক হিন্দী-উপন্যাস আলোচকের মতে শরৎচন্দ্র হিন্দী-সাহিত্যকে দৃষ্টি দিয়েছেন, সমাজের অভ্যন্তরটি দেখবার। মূলমন্ত্র দিয়েছেন সহানুভূতি ও আত্মীয়তার দ্বারা মানবতার উত্থানের; জীবনকে স্বীকার করে নেবার প্রেরণা দিয়েছেন হিন্দী ঔপন্যাসিকদের।...মুন্সী প্রেমচাঁদ সমাজের অনিষ্টকারী সংস্কারের প্রতি ধিক্কার বর্ষণ করেছেন—মানবতার এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। প্রেমচাঁদ গোষ্ঠীর অন্য উপন্যাস-কারগণও প্রেরণা নিয়েছেন বাংলা সাহিত্য থেকে। সহানুভূতি দেখিয়েছেন সমাজের পীড়িত ও শোষিত অংশের প্রতি। উত্তরকালে অজ্ঞেয়, যশপাল, অমৃত রায়, বৃন্দাবনলাল বর্মা, রাঁগেয় রাঘব প্রমুখ ঔপন্যাসিকরাও এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক রূপে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।'

হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে শরৎ-চন্দ্র অপরিহার্য ও অচ্ছেদ্যভাবেযুক্ত। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাঙালী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র হিন্দীভাষী পাঠকের হৃদয়েও কথাসাহিত্যসম্রাট রূপে অধিষ্ঠিত। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার পাঠক-পাঠিকার কাছেও শরৎচন্দ্র নামটি সুপরিচিত। শরৎ-সাহিত্য অধিকাংশেরই পঠিত। অন্তত আশা করা যায়। তাই শরৎচন্দ্র আজ ভারতীয়, সর্বভারতীয়-সাহিত্যিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে কলা-কৌশল প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র পড়ে সাধারণ পাঠক সমাজ অভিভূত হয়ে পড়েন। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবের সাথে এক বিচিত্র অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। কিন্তু এর অন্তঃরহস্যটা কি? কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে শরৎ-সাহিত্য এত জনপ্রিয় এবং আবেদনমুখর?

বিশিষ্ট সমালোচকরা বলেন, সাহিত্যিকের শিল্প-কৌশল ও তার সাহিত্য চিন্তা এই দুই-এর সার্থক সমন্বয় সাধনেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু এ দুই-এর মধ্যে সব চাইতে ক্রিয়াশীল ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে সাহিত্যের কলাকৌশল বা শিল্পশৈলী। সাহিত্যিক কত বড় সেটা বিচারের মাপকাঠি তাই বড় চিন্তা, বড় ভাবনা নয়, সেটা তো সাহিত্যের অবশ্য অঙ্গ হওয়া চাই-ই। কিন্তু আসল গুণ ও তার কার্যকারিতার বিচার করা যায় সে সাহিত্যকর্ম কত উন্নত ধরনের; শিল্প কুশলতা, শিল্পভাবনা, শিল্পনৈপুণ্য উপযুক্ত রসসৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে কিনা, এর ওপর।

আর এই ক্ষমতার দিক থেকে, সাহিত্য-শৈলীতে শরৎচন্দ্রের সমকক্ষ সাহিত্যিক বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিরল। এবং এই ক্ষমতার বলেই শরৎ-সাহিত্য পাঠক-চিত্ত-জয়ে এত সহজে সক্ষম।

কিন্তু নিছক জনপ্রিয় হবার তাগিদেই শরৎচন্দ্র কলম ধরেন নি। সামাজিক প্রয়োজন সাধনে তিনি সাহিত্যকে সচেতনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলছেন, "...সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্যরসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এর ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।" (জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত)।

বর্তমান যুগেও রস সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠক সমাজকে সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী নয়া-চিন্তা চেতনার সাথে পরিচিত করতে হলে শরৎ-সাহিত্যের কলাকৌশলের দিকটি যথার্থভাবে অনুধাবন করা দরকার। তবেই আধুনিক উচ্চচিন্তাভিত্তিক রবীন্দ্রোত্তর বা শরতোত্তর রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

কলাকৌশল রপ্ত করার আগের স্তর সাহিত্যিকের আত্ম-প্রস্তুতি। স্ব-নির্ভর অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা গড়ে তোলা। শরৎ-চন্দ্র বলছেন, "Concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না। নিজের অভিজ্ঞতা চাই।"

"জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকারের অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না তার পরের-মুখে-ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে?...নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাংলাদেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" (......পত্রাবলী)

চন্দননগরের সাহিত্যসভায় পরিষ্কার-ভাবে বললেন, "মানুষের ভিতরকার সত্তাটা realise করাই আমার উদ্দেশ্য...আমি মানুষের ভেতরটা বারবার দেখি।... সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবাই-গ্রস্ত হলে চলে না।"

তিনি নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইতিহাসে বলছেন, "আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত বাঙালী কুল-ত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহনত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল।" (...পত্রাবলী)

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের সাথে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় তার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। "...বহুর সাহচর্যে

বহু মানবকে যেন চিনতে পারো। মানুষের স্বরূপের জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মাল-মশলা। এই সত্যটি কোনদিন ভুলো না।" (শরৎচন্দ্র। ৩য় খণ্ড। গোপালচন্দ্র রায়)

"গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য ও বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি, তখনি মনে করো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসার শূন্য, সে টিঁকবে না।" (ঐ)

অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতিই যথেষ্ট নয়, যদি না সাহিত্যের কলাকৌশলটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করা যায়।

শরৎচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলছেন, "কেবল হৃদয়ে অনুভব করিলেই একটা জিনিস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত জিনিসই কিছু না কিছু শিখিতে হয়।"

"সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও তো আয়ত্ত করা চাই,...নইলে শুধু শুধু তো নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না।...কতটুকু লিখতে হয়, কোনটা বাদ দিতে হয়, কোনটা চেপে যেতে হয়।

"ঘটে যা তা সব সত্য নয়,
কবি তব মনভূমি রামের জনমস্থান,
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।"

এত বড় সত্য কথা নেই।...যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট করে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।" (পত্রাবলী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ)

"সংসারে যা কিছু ঘটে—এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা Photography হতে পারে কিন্তু সে কি ছবি হবে?" (শরৎচন্দ্র। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

কথোপকথন সূত্রে তিনি বলছেন, "...বাস্তব মাত্রই সাহিত্য নয়। যা কিছু ঘটছে তাই লিপিবদ্ধ করলে সাহিত্য হবে না। আমার মতে, বাস্তব ও আদর্শের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পথটা চলে।"

তাহলে বাস্তবের সাথে কল্পনার যোগ কেমন হবে? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এইভাবে—"সাহিত্যের ব্যাপারে গোড়া থেকেই বলেছি যেন আমি কখন মিথ্যার আশ্রয় না নি। অবশ্য সত্য জিনিসটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার আছে যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নীচে থাকে এবং তা হলে তার ওপর যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে সেটা সহজে ডুবে যাবে না।" (ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ)

নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি নিজে বিশ্লেষণ করছেন—"আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।" (শরৎচন্দ্র। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

কিন্তু সাহিত্যের কলাকৌশল আয়ত্ত করা এবং সার্থক সাহিত্যকার হবার প্রচেষ্টা কষ্টসাধ্য। ফাঁকির পথে তাকে পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষায়—"প্রথমে অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয় না। এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য! অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু কোন পরিশ্রমই কোনদিন সত্য সত্যই নষ্ট হয় না—আর একভাবে ফিরিয়া আসে।" (পত্রাবলী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ)

"হিসেব, ওজন, নিষ্ঠা সাধনা দিয়ে যে লেখা লেখা যায় তা ভাল হতেই হবে। আমি কোনদিন কলম ছেড়ে দিয়ে লিখিনি। যা মনে এলো লিখে গেলুম, একটা কাটাকুটি হয় না আমার, এসব বাহাদুরী যারা করে, তাদের কথা শুনে হাসি পায় আমার।" ('স্বদেশী বাজার'। ৬ই আশ্বিন ১৩৩৫।)

এককালে শরৎচন্দ্রের কাছে সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন অনেকে। তাদের তৎকালীন সাহিত্যের জগতে কৃতী পুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। রাধারানী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, "একদিন ছেলেবেলায়—নিরুপমা, সুরেন গঙ্গো প্রভৃতিকে নিয়ে আমি ছোট অখ্যাত অজ্ঞাত সাহিত্য সভা করেছিলাম। তাই তো আজ বাঙলা-সাহিত্য তাদের কাছে কত কি পাচ্ছে।"

বাস্তবিক, তিনি যে প্রত্যক্ষভাবে এদেরই তালিম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তাই না উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলারানী গঙ্গো, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ প্রখ্যাত ও অল্পখ্যাত অনেকেই তার কাছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের কলা-কৌশল শিক্ষার ব্যাপারে কম বেশি ঋণী।

অথচ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি বাংলা সাহিত্যে তার এই অতুলনীয় দান সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে চেয়েছেন। বরং সাহিত্যকারদের বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছেন দেশ, সমাজ ও বৃহত্তর মানবসমাজ সম্পর্কে তাদের সচেতন থাকার কথা।

"কোন সাহিত্য-সেবককেই আমি উপদেশ দিতে পারি না; এই কর, কিংবা এই করা উচিত। শুধু এইটুকু বলি, হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্য সেবা করুন যেন আপনার সেবা মাতৃভাষার দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তখন কি উচিত, কি উচিত নয়, তাহা দেশের হৃদয় ও প্রাণই বলিয়া দিবেন।" (শরৎচন্দ্র। ৩য় খণ্ড। গোপালচন্দ্র রায়)

লেখার প্রাথমিক পাঠ। লেখার কৌশল গত দিক সম্পর্কে শরৎচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা দিচ্ছেন অতি সহজ সরল ভঙ্গিতে।

"রচনার অধ্যায় ভাগ করিতে হয় এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেক জিনিস তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। এবং বুদ্ধি সাপেক্ষও বটে।" (পত্রাবলী)

চরিত্রহীন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের পরিকল্পনার মধ্যে ওপরের কথাটার বাস্তব প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের সূচনায় দুটি প্রধান চরিত্র উপেন্দ্র ও সতীশের সাক্ষাৎ ঘটে হাল্কা, রসপূর্ণ সংলাপের মধ্যে। এখানে বিস্তারিত বিবরণ বা ইতিহাস বর্ণনা করা হয়নি। সহজ ঘটনার মধ্য দিয়ে আকর্ষণীয় সূচনা হয়েছে—মূল চরিত্র ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে পাঠকের মধ্যে। তেমনি এই উপন্যাসের পরিণতির শেষটি গড়ে তোলার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পাঠকের কল্পনার ওপর। সেই ভাবুক কিরণময়ীর কি হল। বা কেন এমন হল।

লেখার সূচনা তার আরম্ভ করার কৌশল আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন, "...আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।...পড়ার interest গোড়ার দিকে অন্তত যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।"

শরৎচন্দ্র গল্প লেখার কৌশল ব্যক্ত করছেন এইভাবে।

"ঘরে নিয়ো একটি ছোট গল্প লিখছি; প্রথম গল্পের বিষয়বস্তুটা কি হবে মনে দৃঢ় ধারণা করে নিতে হয়। সেটা এমন বদ্ধমূল হওয়া চাই যে, গল্পের মধ্যে একটা কথা, একটি লাইন, কি একটা প্যারাও যেন ঐ বিষয়বস্তুর বিরোধী বা অবান্তর না হয়। এই সব বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক না হলে লেখা কিছুতেই জমাতে পারা যায় না।..." (স্বদেশীবাজার...)

প্লট নির্বাচন বড় কথা নয় আসল সমস্যা চরিত্র-চিত্রণ। গল্পের প্লট নির্বাচনে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েন। বিষয় খুঁজে পান না। প্লট হাতড়ে বেড়ান। শরৎচন্দ্র এই প্লট অন্বেষণের সমস্যা প্রসঙ্গে বলছেন, "অনেকে বলে আমরা প্লট পাই না বলে লিখি না। আমি অবাক হই এতবড় প্রকাণ্ড পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে—এত বৈচিত্র্য আর এরা প্লট খুঁজে পায় না! তার কারণ তারা মানুষটাকে খোঁজে না, গল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কিসে লোকের মনোরঞ্জন হয়—আমি সেটা করি না।"

তিনি চরিত্র সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বলছেন, "প্রথমে চরিত্রগুলিকে আমি ঠিক করে নিই, এক দুই, তিন করে। "চরিত্রহীন" উপন্যাসের চরিত্রগুলি তিনি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নিজের কথায়, "আজ তিন-চার বছর ধরে আমি তিন চারটি চরিত্র মনে মনে গড়ে তুলেছি; আরো তিন-চারটে ঠিক হয়ে গেলে একটা প্রকাণ্ড নভেল লিখতে আরম্ভ করব —তার নামটা এখন ঠিক হয়ে গেছে—চরিত্রহীন।" (স্বদেশী বাজার...)

চরিত্র-চিত্রণের কৌশল সম্পর্কে তিনি বলছেন, "গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাকে খুব জানো, তোমার বাবা কিংবা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে; তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।" (লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্র)।

চরিত্র অবলম্বন করে যে লেখা গড়ে উঠবে সেখানে লেখককে নিখুঁত ভাবে চরিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। তবেই বাস্তবের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করা যায়। লেখা বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। গল্প উপন্যাসে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেটা তার ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক দিক। কিন্তু এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যে সমস্যাটি যুক্ত তা হল প্লটের সমস্যা। "এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য।" যে বিশেষ সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে লেখাগুলি তৈরী হচ্ছে—তার নানান সীমাবদ্ধতা ও বিকাশের সম্ভাবনা এ দুটির দিকে খেয়াল রেখেই তার জট ছাড়াতে হবে। নইলে যেমন তেমন উপায়ে, যুক্তি-বিচারহীন পদ্ধতিতে লেখকের খেয়াল খুশী মাফিক সমাধান করলে তা দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে। পাঠকের কাছে সে রচনা হাল্কা বোধ হতে পারে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যের মাত্রা" প্রসঙ্গে এ দিকটি বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" উপন্যাসটি উল্লেখ করে। কুমু ও প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সমস্যা অতি সহজে লেডি ডাক্তার এসে সমাধান করে যান—এই ঘটনাটির প্রতি তিনি

দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছেন, প্লটের সমস্যা সমাধানে এই অতি-সহজ পন্থাটি যথার্থ হয়নি। বাস্তবানুগ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে "পথ-নির্দেশ" সম্পর্কে তাঁর আত্মসমালোচনা লক্ষণীয়। "যাহারা নিজে গল্প লিখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথ-নির্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও-রকম গোলযোগ Circumstance-এর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-জ-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে।"

সংলাপ শিল্পসম্মত ও রুচিপূর্ণ হওয়া চাই। গল্প-উপন্যাসে সংলাপের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর শিল্প ও রুচি-সম্মত গঠনের ওপর সাহিত্য রসত্তীর্ণ হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করে। শরৎচন্দ্র এই সংলাপের কৌশল সম্পর্কে বলছেন—।

"Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি বলছে। এই হলো artistic form-এর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হলো না, পাঠকেরা বোধ হয় ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না। কিন্তু এইখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশি বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়।... যে পড়ে সে যদি ভেবে বোঝবার অবকাশ না পায় তো নিজের বুদ্ধির প্রমাণ পায় না। তখন রাগ করে।

"কথোপকথন (dialogue) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার করো। তর্ক-বিতর্ক যেন ছোট হয় অর্থাৎ, একসঙ্গে অনেকখানি নয়। এক অধ্যায়ে একটু, পরের অধ্যায়ে বাকি অংশটুকু এমনি। উপমা উদাহরণ—কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও অসম্বন্ধ না হয়। এখানে logic যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলংকার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলংকার দিয়ে show-case সাজানোর রুচি এক নয়। এ কথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্য ভার যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই বোঝে।" (পত্রাবলী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ।)

রবীন্দ্রনাথ এক সময় হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে প্রবর্তক-সংঘের মতিলাল রায়কে একখানা চিঠি লিখে-ছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। শরৎচন্দ্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে এমন জন্তু জানোয়ারের উদাহরণ টানা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। তিনি এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, "বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ-সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। ...শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।" (পত্রাবলী)

অথচ এর দ্বারা মনে করার কোন কারণ নেই যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছুই নেবার মত পাননি। বা তার কাছে কবির স্থান কিছুটা নেমে গিয়েছিল। মোটেই না, বরং শরৎচন্দ্র নিজেই বিভিন্ন উপলক্ষে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথই তাঁর সাহিত্যের গুরু। তাঁর কাছ থেকেই লেখা শিখেছেন তিনি। উৎসাহ পেয়েছেন সাহিত্যকর্মে।

কিন্তু লেখার কৌশলগত দিকে, সাহিত্যশৈলীতে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যের মহিমায় উজ্জ্বল। সেখানে তিনি অদ্ভুত-ভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। তাঁর সজাগ, সচেতন ও সংযত দৃষ্টিভঙ্গি তাকে অতুলনীয় করে তুলেছে।

লেখায় সংযম সাধনা এক শক্ত সাধনা। শরৎচন্দ্র লেখার কৌশলগত প্রশ্নে বারে বারেই সংযম সাধনার ওপর জোর দিয়েছেন। হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু কিন্তু তার গতিপথে যদি প্রয়োজন মত বাঁধ না দেওয়া যায় তবে সে আবেগ বন্যাস্রোতে সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আবার সঞ্চিত আবেগের আধার থেকে বুদ্ধিমানের মত খরচা করতে পারলে অনেক কিছুই সৃষ্টি হবে। পথের-দাবী-তে শরৎ-চন্দ্র এই চিন্তার কথাটি রেখেছেন সুন্দর-ভাবে—"হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এত বড় শত্রু আর মানুষের নেই।" তিনি বলছেন, "লেখায় সংযম সাধনার মতো শক্ত সাধনা আর নেই। যা অনায়াসে লিখতে পারতাম তা না-লেখা। রসজ্ঞ পাঠকের মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখনি সে দেখতে পায় এই সংযমের চিহ্নটুকু। ...লিখতে বসে লেখার চেয়ে না-লেখা ঢের শক্ত। ...বক্তব্য বিষয়বস্তু যেন আবেগের প্রখরতায় প্রয়োজনের বেশি এক পাও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারে। বরঞ্চ এক পা পেছিয়ে থাকে সেও ভালো। "এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেছি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধরদা (জলধর সেন) তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ-মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইল, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুত, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।...আর এক ধরনের অসংযম দেখতে পাই অ...র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্তের জন্যেই ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তি গদগদ 'আদকলে-পনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে।" (পত্রাবলী)

শরৎচন্দ্র নানান সময়ে "বিদ্যের-বাচালতা" অথবা "পাণ্ডিত্যের দম্ভ" দিয়ে আঘাত করার বিপদ সম্পর্কে লেখক মহলকে সচেতন থাকতে বলেছেন। এটা লক্ষণীয় যে তিনি তাঁর লেখায় বড় কথা, বড় ভাব এবং জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কিন্তু তার সবটাই উপস্থাপিত হয়েছে রসের মাধ্যমে। ঘটনার বাস্তবসম্মত বিস্তার ও সংলাপের নিখুঁত বাঁধনে সে রস সুন্দরভাবে ঘনীভূত হয়েছে, মনের গভীরে সেই ভাবগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করেছে। 'শেষ-প্রশ্নে'-এ কমল ও রাজেনের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার-এ রাজেন চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও কমলের সর্ব-প্রথম পরাজয়-স্বীকারের আকর্ষণীয় ঘটনাটি তিনি ষোল পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। নীতি ও আদর্শগত প্রশ্নে সন্ত্রাসবাদী রাজেনের কাছে সব-কিছুই যে কিভাবে তুচ্ছ হয়ে যায় সে দিকটি মনের ভেতর গেঁথে রাখার মত।

বাস্তবিক শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য ধারায় বারে বারে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে "বিদ্যের বাচালতা" যেন না প্রকাশ পায়। লেখক কত জানে সেটা প্রকাশ করতেই সে যেন ব্যস্ত না হয়ে ওঠে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলছেন, "...কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এমনি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাকে কখন কৃপণতা কোরব না এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুললে চলবে না। অথচ বড় ভাব,

বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ এই নিয়েই চলা চাই—লেখা—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর জায়ে জায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিংবা প্রভাত মুখুজ্যের বর্ণনার নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারী, ক'টা সোফা, প্রদীপে কটা শলতে দেওয়া এবং আলনায় কটা এবং কি পাড়ের কাঁচানো শাড়ি—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।"

"ঐশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।" (পত্রাবলী)

লেখার শেষ অংশে ধৈর্য হারালে চলবে না : গল্প লেখার কৌশল, পদ্ধতি এবং সংলাপ রচনার ধারা, এ দুটোর সার্থক মিল ঘটলে তবেই উচ্চমানের সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু লেখা শেষ করার ব্যাপারে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। লেখার অন্তিম পর্যায়ে তারা বুদ্ধি, বিবেচনা ও বাস্তব নির্ভর যুক্তি বোধ থেকে সরে দাঁড়ান। সে অবস্থায় ভাল লেখাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই প্রসংগে ঔপন্যাসিক মনিলাল গংগোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর চিঠির একটি ছোট্ট অংশ মনে রাখা যেতে পারে।

"তা লিখবেন অস্থির (impatient) হইয়া শেষ করিবেন না এইখানে বোধ করি আপনার দোষ হয়।" (পত্রাবলী)

লেখক ও পাঠকের মধ্যে চিন্তার যোগ সাধিত হোক। তবেই তা হবে যথার্থ সাহিত্য। এ প্রসংগে শরৎচন্দ্র বলছেন, "লেখকের কাজ সমস্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলা। সেটির পরিণতি কী হোলে ভাল হয় সেটি থাকবে পাঠকের আওতায়। পাঠক নিজেই বলবেন কোনটি উচিত বা কোনটি ভাল। শেষ সিদ্ধান্তটিও যদি লেখকই নিজে দিয়ে 'আমার কথাটি ফুরালো নটেগাছটি মুড়ুলো' বলে দেন গল্পটির ছিপি বন্ধ করে তাহলে শিশুরা যতই খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত হোক না—গল্পটিকে কিন্তু নটে-গাছটির মতই মুড়িয়ে ফেলা হয় সন্দেহ নেই।"

উদাহরণ হিসাবে চরিত্রহীন, পল্লী-সমাজ, বড়দিদি, পথের দাবী, শেষ-প্রশ্ন প্রভৃতি উপন্যাসের নাম হয়ত অপ্রাসংগিক হবে না।

শরৎচন্দ্র বলছেন, "সাহিত্যশিল্পের সমস্তটাই লেখকের কল্পনায় এলাকাবন্দী করে রাখলে পাঠকের কল্পনা কোথায় ঠাঁই পাবে? লেখকে-পাঠকে মিলেই তো সাহিত্য। কেউ লেখে কেউ পড়ে এই সহ-যোগিতাই সাহিত্য। একা একা লেখক সাহিত্য গড়তে পারে না পাঠকের জন্য জায়গা খুলে না রাখলে।" (শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য। রাধারাণী দেবী। দেশ। ৮ই ফাল্গুন ১৩৮২)

সফলোত্তীর্ণ লেখা বুদ্ধি ও পরিশ্রম নির্ভর। শরৎচন্দ্র নিজেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি নিজের জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সাহিত্য-সাধনা করেছেন যারই ফলশ্রুতি তার অনবদ্য সাহিত্যশৈলী।

এ প্রসংগে তার নিজের কথা—"যা বোঝাতে চাই তা মনে রাখি—তার জন্য অনেক পরিশ্রম করি। লেখা অনেক ঘষামাজা করতে হয়—স্বতঃ উৎসর মত বেরোয় না। যারা বলে—যা লিখে যাব তাই ভাল—তারা প্রকাণ্ড ভুল করে। মানুষের বলায় যত লেখাতেও অনেক irrelevant কথা থাকে। সেদিক নজর রাখতে হয়। আমি যা-তা করে কোন কাজ করি না।"

কথোপকথনের মধ্যে যত তার আর একটি মূল্যবান কথা সর্বশেষ উল্লেখ করা চলে।

"অনেকে কিছু একটা লিখে শোককালে বলেন, সময় কম, আরও যদি বেশী সময় পেতাম তো—আরও ভাল করে লিখতে পারতুম।...এ সব বড়াই কথা নয় কি?

সময় যদি নাই পাও তো লিখো না; যেটুকু সময় পেয়েছ এমন করে ততটুকুই লিখো, পরে দুঃখ করতে না হয় যে, আমি আরও ভাল লিখতে পারি।...সাহিত্য লিখতে অবহেলা করলে তা সাহিত্য হয় না; হয় পাপ।" (প্রথম প্রকাশ, স্বদেশী বাজার পত্রিকায়। ৬ই আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল)।

ইন্দ্রনাথ এবং একটি দলিল

বারিদবরণ ঘোষ

আমার এই 'ভব-ঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।...কি করিয়া 'ভব-ঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সেকথা বলিতে গেলে প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কিনা জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘর-বাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে এক বস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না।'

শ্রীকান্ত—১ম পর্ব

—কে এই ইন্দ্রনাথ তা আর অজানা নয়। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন—

'ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একটি বাস্তব চরিত্র। ভাগলপুরে আমাদের বাড়ির কাছে নাম-করা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, রামরতন মজুমদার। রামরতনবাবুর একটি ছেলের নাম রাজেন। আমরা ডাকতাম রাজু বলে। এই রাজুই আমার শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ। ...শ্রীকান্ত উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের চরিত্র আঁকতে গিয়ে আমাকে কোন কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।"

দ্রষ্টব্য, গোপালচন্দ্র রায়, 'শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৯৫

শরৎচন্দ্র রাজুর আকৈশোর বন্ধু। এক প্রবল প্রাণাবেগ উভয়ের জীবনকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য-উজ্জ্বল প্রাণ শক্তির আধার এই রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে রাজু ওরফে ইন্দ্রনাথ এক সময়ে ভাগলপুরের মাটি থেকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই নিরুদ্দেশের সময়-কাল এবং কীভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য আমাদের কাছে একাল পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল। অথচ তা জ্ঞাত হতে পারলে শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক জীবনের কিছু সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি একটি পারিবারিক দলিল আমাদের হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে। এই দলিলে রাজেন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশের সময়কাল এবং কারণ লিপিবদ্ধ আছে। সম্প্রতি বিভাগ-বণ্টনের দলিল, দীর্ঘ তার বয়ান। সমগ্রের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। আমাদের সিদ্ধান্ত গঠনে তার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি মাত্র যত্রতত্র উল্লেখ করবো। প্রাসঙ্গিক অংশের একটি প্রতিলিপি চিত্র আমরা এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত করে দিলাম। রাজেন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে বিরাট গ্রন্থ রচিত হতে পারে। এখানে তার বহুল চেষ্টা করছি না। আমাদের আলোচনা প্রধানত দলিল-ভিত্তিক।

দলিলের এক স্থানে লেখা রয়েছে ..."রামরতন মজুমদারের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনার্থে ১লা জানুয়ারি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বাটী ত্যাগ পূর্বক নিরুদ্দেশ হইয়াছে..." তাঁর অনুপস্থিতির কারণে তাঁদের 'সম্পত্তি সকলের মধ্যে বিভাগ না হওয়াতে নষ্ট এবং ধ্বংস হইয়া যাচ্ছিল—সে কারণে রাজেন্দ্রনাথের বিধবা মা এবং সহোদরগণ একটি
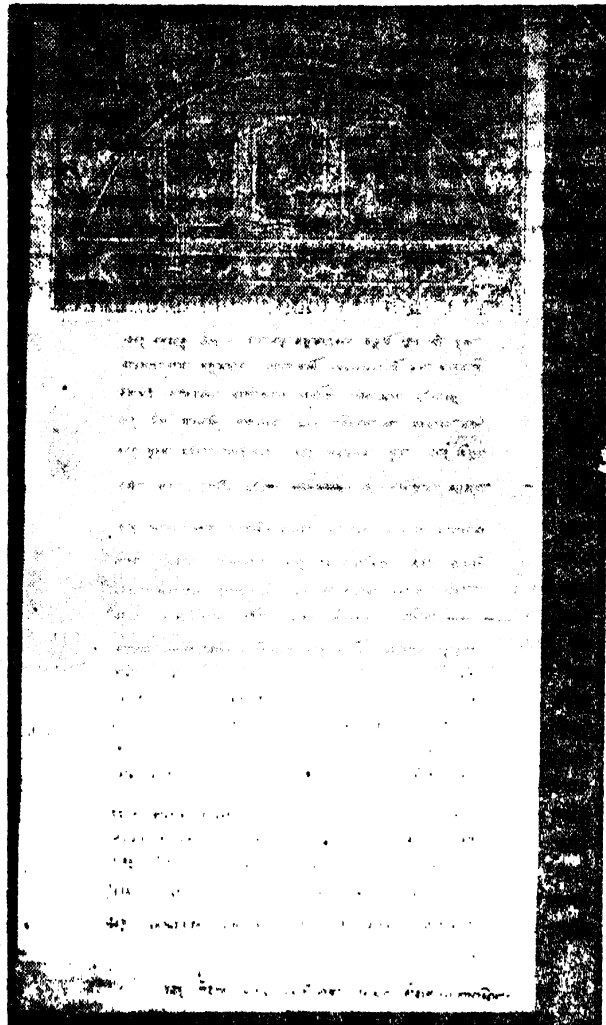
'ইন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে একটি দলিলের একাংশ

দলিল সম্পাদনা করেন। রাজেন্দ্রনাথের স্বার্থও এই দলিলে সুরক্ষিত হয়। এই দলিল তাঁর মা মনোমোহিনী দেবী এবং সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র এবং যতীন্দ্রনাথ সহোদরবৃন্দ ১০ই আগস্ট ১৯০৭ তারিখে সম্পাদনা করেন (দ্রঃ Registered Book No. 1, Vol. No. 37, Page No. 172 to 181, Registered Deed No. 2964 of 1907, Bhagalpur Sub-Register Office).

এই দলিলে রাজেন্দ্রের অংশে ৫নং হিস্যার অন্তর্ভুক্ত ৩৯০০ টাকা মূল্যের '২ বিঘা লাখ রাজ জমি (খাজপুরের) গোলকুঠীর উত্তরে লাখ রাজ জমি ও ঘাটের দিয়ারা' পড়ে। দলিলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অন্যেরা প্রত্যেকেই বাড়ির অংশ পেয়েছেন কেবলমাত্র রাজেন্দ্র পেয়েছেন লাখেরাজ জমি। রামরতন (দলিলে ইনি 'রামরত্ন' বানানে উল্লিখিত) মজুমদার সাত ছেলের জন্য সাতটি বাড়ি করেছিলেন। ছয়জন ভাইয়ের ছটি এবং মাতার জন্য বাড়ি নির্দিষ্ট হল। রাজেন্দ্র সন্ন্যাসী, তাঁর অংশে বাড়ি থাকলে তিনি বাস না-ও করতে পারেন অথবা বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হতে পারে সম্ভবত এই আশংকায় তাঁকে বাড়ি দেওয়া হয় নি। অবশ্য এ-আলোচনা আমাদের পরিধিভুক্ত নয়। দলিলের এই সব বিভাগ বণ্টনের বিস্তারিত উল্লেখে আমরা বিরত থাকলাম।

রাজেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালে তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁর 'ছোড়দা' শরৎচন্দ্র মজুমদারের, যিনি ভাগলপুরের উকিল ছিলেন, তাঁর রক্ষণাধীনে ন্যস্ত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে যে সব জীবনী গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পরেই রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'শরৎ পরিচয়' অন্যতম। তিনি শরৎচন্দ্র-কথিত প্রাগুক্ত 'ফুটবল ম্যাচ' সম্পর্কে বিবিধ তথ্য এবং রাজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা সংবাদ সরবরাহ করলেও রাজুর নিরুদ্দেশ সম্পর্কে এই গ্রন্থে কোনো কথা বলেন নি। তাঁর কাছ থেকে সঠিক সংবাদ প্রত্যাশিত ছিল। কারণ, একাধারে তিনি শরৎচন্দ্রের মাতুল ছিলেন, এঁদের বাড়ির পাশেই রাজেন্দ্রনাথদের বাড়ি, অন্যদিকে তিনি ছিলেন ভাগলপুরেরই স্থায়ী বাসিন্দা, স্থানীয় বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি অবশ্য অন্যত্র রাজুর নিরুদ্দেশ সম্পর্কে কিছু সংবাদ দিয়েছেন। ১৯২৬ সালে হীরালাল দাশগুপ্ত নামক জনৈক শরৎ-প্রেমীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—

'রাজু ?

সে কোথায় কেউ জানে না। ঐ ডানপিটে দুরন্ত ছেলে জলে জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে দাপাদাপি করে একদিন ডুব দিলে। কোথায় গেল কেউ তার সন্ধান জানে না। হয়তো বেঁচে আছে। হয়তো নেই। বোধ হয় ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়েছে।' দ্রষ্টব্য দৈনিক বসুমতী শারদীয় সংখ্যা, পৃঃ ৬৮ 'শ্রীকান্তের দেশে।'

শরৎচন্দ্রের খঞ্জরপুরের প্রতিবেশী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'..আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। ...ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র...'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।... 'মৃণালিনী', 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি ও জনার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়-সুখ্যাতি বর্ধিত করেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অরিজিন্যাল বলিয়া যে রাজুর (রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের) উল্লেখ করা হয়, তিনি উপরোক্ত মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ে গিরিজায়া ও পাগলিনীর অংশ অভিনয় করেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গল অভিনয় হইবার রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ এবং এই পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।'

—দ্রঃ 'শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী' 'বাতায়ন', শরৎ স্মৃতি-সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪।

সুরেনবাবু হীরালালবাবুকে আরও বলেছিলেন, 'কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়েছে। সন্ন্যাসী হয়েছে সেইটেই ঠিক।' যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিরুদ্দেশের বছরটির ইঙ্গিত দিলেও সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলেন নি। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তিতে যে সন্দেহ ছিল, দলিলটিতে তার নিশ্চিত অবস্থাটুকু জ্ঞাত হওয়া গেল।

নিরুদ্দেশের তারিখটি আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ববহ। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে অনুমান হয় প্রাগুক্ত নাটকগুলির অভিনয় ১৮৯৭ সালে মঞ্চস্থ হয়। এর বিভিন্ন চরিত্রে বন্ধু শরৎচন্দ্রের মত ক্লাবের অন্যতম সদস্য রাজেন্দ্রনাথও অংশ গ্রহণ করেন। যতীনবাবু আমাদের সঠিক হদিশ দিয়েছেন বেশ জোরের সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের অভিনয়ের রাত্রি থেকে রাজেন্দ্রনাথ উধাও। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষে 'কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী'তে শরৎচন্দ্রের 'আদমপুর ক্লাবে অভিনয়-এর বৎসর '১৯০০' খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৭ সালে রাজু নিরুদ্দেশ হলে এই তারিখের নির্দেশ ঠিক হয় না।

একটা প্রশ্ন মনে জাগে। শরৎচন্দ্রও কি রাজুর নিরুদ্দেশের সম্পর্কে কোনো কথা জানতেন না? মামার বাড়িতে শরৎচন্দ্রের আড্ডা। তাঁদের বাড়ির পাশে রাজুদের বাড়ি। জানতেন সম্ভবত। প্রবন্ধের প্রথমেই উদ্ধৃত 'শ্রীকান্তে'র শেষাংশ পাঠ করলেই বোঝা যায়। তিনি কি আকৈশোর সুহৃদের সন্ধান করেন নি? কে জানে ১৯০১-২ সালে শরৎচন্দ্রের হঠাৎ নিরুদ্দেশ সন্ন্যাসী বেশে (পিতার তিরস্কারের প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণে রেখেও বলছি) রাজুর সন্ধানেই কিনা! সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তো হীরালালবাবুকে বলেছিলেন, 'সেবারে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।... হঠাৎ একটি সাধুকে দেখে মনে হল ও রাজু।'

গোপালবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৩২) রাজুর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রাজুরা ছিল সাত ভাই। ভাইদের মধ্যে রাজু ছিল পঞ্চম।' এ বিষয়ে দলিলের অংশ বিশেষ উদ্ধার করে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি "রামরত্ন মজুমদারের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার...।" এঁরা সাত ভাই সত্য। তবে রাজু পঞ্চম নন, চতুর্থ। জ্যেষ্ঠাগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রখ্যাত সংগীতবিদ এবং ডেপুটি কালেকটার ছিলেন। মধ্যমাগ্রজ নগেন্দ্রনাথ এই দলিল সম্পাদনকালে মুঙ্গেরে ডাক্তার ছিলেন। কনিষ্ঠাগ্রজ পূর্বোল্লিখিত শরৎচন্দ্র মজুমদার। কনিষ্ঠানুজগণের নামও পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এই দীর্ঘ দলিলের একাংশে হরেন্দ্রলাল রায় নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে—

ইহাও প্রকাশ থাকিবে যে, এক্সবর্তী পরিবারের সানুকুল্যে উক্ত ভূতপূর্ব গার্জিয়েন দ্বারা (অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—প্রবন্ধ লেখক) রক্ষিত ২৫০০ পঁচিশ শত টাকার মধ্যে ৯০০ নয় শত টাকা মাতা ঠাকুরানী শ্রীমতী মনমোহিনী দেব্যার তীর্থাদির ঋণের আংশিক পরিশোধ করিতে ব্যয় হইয়াছে এবং বক্রী ১৬০০ টাকা (এই বিনষ্ট অংশের পাঠ দুষ্পাঠ্য—প্রবন্ধ লেখক) অন্যান্য খরচ বাবদ, যাহা এই দলিলের এক দফা বর্ণিত প্রথমোক্ত তিনজন তৎকালীন সাবালক ভ্রাতা হ্যাণ্ডনোট দ্বারা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়ের নিকট হাওলাত করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিতে ব্যয় হইয়াছে...।'

—এই হরেন্দ্রলাল রায় হলেন, স্বনাম-খ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অগ্রজ—তাঁর 'রাঙা দাদা'। ইনি 'নবপ্রভা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রতিবেশী হরেন্দ্রবাবু সুরেনবাবুর সঙ্গে

মিলিত হয়ে একলব্যে ওস্তাদ রেখে গান শিখতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বহু সময়ে এখানে আসতেন, যেমন শরৎচন্দ্রও এখানে গানের আসরে যোগ দিতেন। আমাদের কাছে এই পর্বের সংবাদ একেবারে অনুপস্থিত।

২নং প্রতিলিপিচিত্র রাজুর পিতৃভবনের। বাড়ির সম্মুখস্থ দেওয়ালে মার্বেল-পাথরে লেখা আছে—

শ্যামরতন ভবন
১৬নং, রামরতন লেন
আদমপুর, ভাগলপুর
১৮৬৪

রামরতন ছিলেন একজন প্রখ্যাত ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এই বাড়িতে কিছুদিন ইনকাম ট্যাক্সের অফিস ছিল, বর্তমানে এন সি সি-এর অফিস রয়েছে। ছবিতে তারই সাইন-বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এই বাড়িতেই ইন্দ্রনাথের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় (আনুমানিক জানুয়ারি ১৯৭৩-এর প্রথমার্ধে) শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি রচনার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের বাড়ি বলে যে ছবিটি মুদ্রিত হয়, সেটি আসলে ইন্দ্রনাথের জোড়া শরৎচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি। ইন্দ্রনাথের বাড়ির ছবিটি এখানে মুদ্রিত হল।

দলিলের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ দ্রষ্টব্য। এখানে লিখিত আছে—

'...আমরা উপরিলিখিত ব্যক্তিগণ সকলে একমত হইয়া স্বীকার করিতেছি যে, তপশীলের বর্ণিত ৫নং হিস্সার সম্পত্তি উক্ত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে একজনের জিম্মায় থাকিবে এবং জিম্মাদার উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং তাঁহার অমনোযোগীতায় কিংবা তাঁহার গাফিলতিতে উক্ত সম্পত্তি নষ্ট হইলে তিনি তাহার জন্য দায়ী রহিলেন এবং ১লা জানুয়ারি ১৮৯৭ সাল হইতে ২০ বৎসর মধ্যে যদি উক্ত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার তৎকালীন সকল ভ্রাতার কিংবা তাহাদের ওয়ারিশানগণের নিকট সন্তোষজনক প্রমাণ কিংবা চিহ্ন দ্বারা পরিচিত এবং সেনাক্ত হইতে পারেন কিংবা উচিত আদালতে স্বীয় সেনাক্ত এবং সত্ত্বাদি সাব্যস্থ করিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত ৫নং হিস্সার সম্পত্তিতে দাখিলকার হইয়া ভোগ ও দখল করিতে থাকিবেন অন্যথা উক্ত সময় অতীত হইলে উক্ত সকল ভ্রাতাই কিংবা তাহাদের ওয়ারিশানগণ আইন সঙ্গত মতে উক্ত ৫নং হিস্সার সম্পত্তি বণ্টন করিয়া যথেচ্ছা ভোগ দখল করিতে থাকিব।'
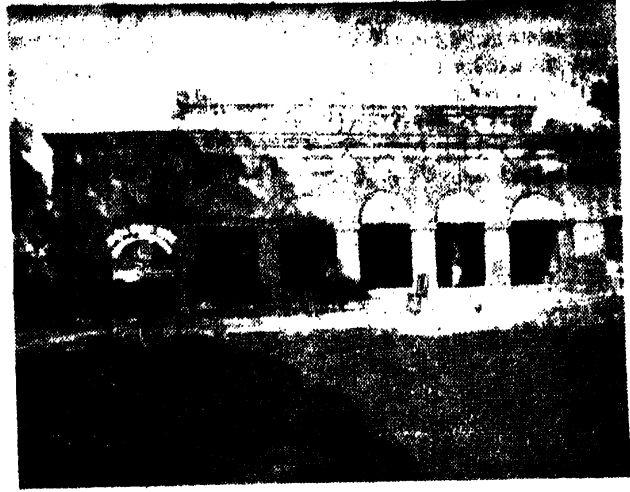
ইন্দ্রনাথের বাড়ি

—এই অংশে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে বিশ বছর পরে ফিরে আসার শর্তাধীন অংশটুকু। ১৮৯৭-এর ১লা জানুয়ারি থেকে বিশ বছরের হিসাব করলে আমরা ১৯১৬ সালের ২রা জানুয়ারিতে এসে পৌঁছাবো। শরৎচন্দ্র কি দলিলের এই বিশ বছরের শর্তের কথা জানতেন? আর পাঁচটা বঙ্গসন্তান যেমন কর্মসন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়ে তৎকালে ব্রহ্মদেশে হাজির হত, শরৎচন্দ্র কি ভেবেছিলেন রাজুও তেমনি নিরুদ্দেশের পথে ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছে? তিনি কি ব্রহ্মদেশে রাজুর সন্ধান করেছিলেন? এত সব প্রশ্নের উত্তর নেতি-বাচক হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই প্রবন্ধের সূচনায় যার কথা লিখেছি, তার কথা শরৎচন্দ্র এতদিন পরে ১৯১৬ সালেই এমন করে লেখেন কেন? কেনইবা আগে লেখেননি? লেখার অবসর হল ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস—বাংলা ১৩২২ সালের মাঘ মাসে। এই কাহিনী রচনা শুরু করেছিলেন শরৎচন্দ্র ব্রহ্মপ্রবাসেই। তিনি তো দেশে ফেরেন চিরকালের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে এপ্রিল ১৯১৬ সালে। দুটি ঘটনা কি কাকতালীয়, না পরস্পর সংযুক্ত? 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩২২ এবং বৈশাখ-মাঘ ১৩২৩ সংখ্যাগুলিতে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। তখন নাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'। কিসের জন্য এই ভ্রমণ? ভ্রমণের মধ্যে ইন্দ্রনাথের শেষ সন্ধান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম পর্বে দর্জিপাড়ার নতুনদার সঙ্গে ইন্দ্রনাথও অন্তর্হিত হয়ে গেছিল। যাবেই না বা কেন! অন্নদাদিদির এই তো আশীর্বাদ, এই জন্যেই তো রাজু সন্ন্যাসী! অন্নদাদিদি 'যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার করে নেন।'

—'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র লেখক কে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? প্রথম প্রকাশকালে তা তো আমরা জানি নি। লেখক ছিলেন 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা।' যদি কখনও রাজুর চোখে পড়ে এ কাহিনী?

প্রশ্ন উঠতে পারে রাজু শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয় কতটুকু জানতেন। সে অনেকখানি। '১৮৯৪ সনে শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বাল্যসঙ্গীরা ভাগলপুরে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যসভাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই সভার সভাপতি।' —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎস্মরণিকা পঞ্চম বর্ষ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ৯১।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর শরৎ-চন্দ্রের জীবনরহস্য গ্রন্থে (১৩৬৬) লিখেছেন, 'কলেজে পড়বার আগেই সাহিত্য সাধনা শুরু হয়।' এবং 'এই সময়েই ভাগলপুরে তাঁর লেখনীতে সুধাবৃষ্টি শুরু হলো অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের পর।' বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, সুকুমারের বাল্য কথা সব কিছু তো আগেই St. C. Lara (শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম) কর্তৃক রচিত হয়ে গেছিল। ডানপিটে রাজু যে শরৎচন্দ্রকে এত ভালবাসতেন সে তো তাঁর সাহিত্যিক মনের উদার-কোমল পরিচয়ের জন্য।

আর শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ?

'এই রাজ্জ্ব একদিন কাউকে কিছ্ব না বলে, কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেল, আজও কেউ তার সন্ধান পেলে না। তার মুখ মনে পড়লে আজও আমার বুকটা কেমন করতে থাকে। সে যে কত বড় বন্ধু ছিল আমার! সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি কত দেশ-বিদেশ তো ঘুরলাম, কত মানুষই তো দেখলাম, কিন্তু কই, রাজুর মতো অমন মানুষ আর একটিও চোখে পড়ল না!'

* মূল দলিল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের পৌত্রদ্বয় শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীদেবব্রত মজুমদারের (আদমপুর, ভাগলপুর-১) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রতিলিপি চিত্র ও অন্যান্য কয়েকটি তথ্যের জন্য আমি ভাগলপুরনিবাসী বন্ধু শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী।

'শেষের পরিচয়'এর অপ্রকাশিত অংশ

শেষের পরিচয়

(১৬)

সারদাকে অপমান করিয়া তাহার ঘর হইতে ফিরিয়া রাখাল বাসায় আসিল। দাসী তখনো বাড়ি যায় নাই, কুকারে রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া তখনো সে অপেক্ষা করিতেছিল। রাখাল বলিল, আজ খাবো না নানী, ক্ষিদে নেই। রান্নার দরকার হবে না।

ঝি রাগ করিয়া বলিল, সে হবে না বাবু। আলিসা করে রাঁধবে না, না খেয়ে উপোস করে শুয়ে থাকবে, সে আমি কিছুতেই সইবো না। দিন দিন দেহটা কি রকম হয়ে যাচ্ছে একবার চেয়ে দেখো দিকি। এই বলিয়া সে একটা ছোট আর্শি আনিয়া সুমুখে ধরিতেছিল। রাখাল সলজ্জ হাসে হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, বুড়ো হয়ে তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হয়ে যাচ্ছে,—আমি ত ভালই আছি।

না, তুমি ভাল নেই দাদাবাবু, আমার মাতা খাও, আগের মতো খাওয়া-দাওয়ায় আবার দৃষ্টি দাও। না হয় আমাকে ছুটি দাও, দেখতেও আসবো না, বলতেও যাবো না।

রাগের ওপর আমাকে ত্যাগ করবে নানী? তুমি ছাড়া আমার ত সংসারে কেউ নেই। এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিয়া কুকারে খাবার চড়াইয়া দিল। ক্ষুধার প্রয়োজনে নয়, এই পুরাতন দাসীটিকে কেবল খুশী করার জনাই।

রাখাল মুখে যাই বলুক, মনে মনে বুঝিতে পারে পূর্বের মতো সে আর নাই। কিসে যেন তাহার মুখের লাবণ্য প্রতিদিন ম্লান করিয়া আনিতেছে। আনন্দের পাত্রে ঠিক কোন্‌খানে যে চিড় খাইয়াছে ধরিতে পারে না; কিন্তু সঞ্চয় ধীরে ধীরে কমিতেছে টের পায়।

উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ, বেগার খাটার আবেদন, কর্তব্য পালনের আহ্বান আজও তেমনি আসিয়া পৌঁছে, যায় না, করে না তাও নয়, তিরস্কারের দাবি যাহাদের কর্তব্য অবহেলার অপরাধে তিরস্কার তেমনি করে, ভর্ৎসনার উত্তরে আজও রাখাল তেমনি সবিনয়ে ক্ষমা করে, ভিক্ষা করে, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়া তেমনি উৎসাহে কাজে নামে তবু যেন কেমন করিয়া এই কথাটা প্রকাশ পায় সে-রাখাল ও এ-রাখাল ঠিক এক মানুষই নয়। কাজ করার হঠাৎ কোন ফাঁকে তাহার মনের ঔদাসীন্য এমনি ধরা পড়ে যে সে অপ্রতিভ হইয়া যায়—উত্তর দিতে পারে না। এতদিন এইভাবেই তাহার কাল কাটিতেছিল। মনের তলদেশ কি দিয়া কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আচ্ছাদিত হইতেছিল যাচাই করিয়া জেরা করিয়া দেখে নাই, আজ সারদার সঙ্গে কলহ, কথা কাটাকাটির ফলে ভিতরের পঙ্ক উপরে উঠিয়া হঠাৎ সমস্ত স্থানটা এমনি ঘুলাইয়া কলুষিত করিয়া দিল যে, সে নিজেই একেবারে অবাক হইয়া গেল। নতুন-মার বাড়ি হইতে চলিয়া আসার সময়ে তাহার মনের মধ্যে এই ছিল যে সারদার অশিষ্ট দুর্বিনয়ের জবাব সে নিঃশব্দ উপেক্ষায় দূরে থাকিয়া দিবে, কোন সম্বন্ধই আর রাখিবে না, কিন্তু নিজের বাড়িতে ফিরিয়া সংকল্প স্থির করিতে পারিল না। মন তিক্তকণ্ঠে বারবার বলিতে লাগিল, সারদার আচরণ ক্ষমার অযোগ্য, যাহা বলিয়াছে সে শুধু কৃতঘ্নতাই নয়, নিরতিশয় অপমানকর। অথচ এই উত্তেজনা তাহার কানে কানে কে দিতে লাগিল রাখাল ভাবিয়া দেখিল না, বিচার করিল না সারদা কি বলিয়াছে, কেন বলিয়াছে এবং কেমন করিয়া অপমান করিয়াছে। কৃতঘ্নতা তাহার কোন্‌খানে। প্রতিহিংসার আগুন এক নিমেষে যেন তাহাকে পাগল করিয়া দিল।

চুল্লীর উপর কুকার চড়ানো রহিল, গায়ের চাদরটা আলনা হইতে টানিয়া লইয়া সে ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাড়িতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন পাশাপাশি ঠাঁই করিয়া দিয়া তারক ও বিমলবাবুকে সারদা খাইতে দিয়াছে। অনতিদূরে বসিয়া সবিতা এবং এক ধারে দাঁড়াইয়া সারদা। তাহার প্রতি চোখ পড়িল সকলের আগে সবিতার, তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, রাজু যে, ব্যাপার কি? তাঁহার মুখ সংশয়ে পাংশু হইয়া গেল।

এইমাত্র সে গিয়াছে, এখনি ফিরিয়া আসার হেতু নাই, অকারণে আসা-যাওয়া তাহার প্রকৃতিও নয়—ভয় হইল স্বামী ও মেয়ের জন্য, হয়ত ইতিমধ্যে কি-একটা খবর আসিয়াছে। এবং তাহাই জানাইতে সে আসিয়াছে। বলিলেন, বাড়িতে সবাই ভালো আছে রাজু? রেণু, তার বাবা?

আমি কি ক'রে জানবো নতুন-মা?

সবিতা ধীরে ধীরে বলিলেন, একা তুমিই ত তাঁদের খবর রাখো বাবা।

আগে রাখতাম যখন তাঁরা এখানে ছিলেন। নানা কাজে এখন আর বড় সময় পাইনে।

সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন, এ কথায় অভিযোগ করিবার কিছু নাই, কিন্তু আঘাত যেখানে লাগিবার সেখানে লাগিল।

একটি মাঝারি মোটা খাতায় লেখা শরৎচন্দ্রের এই অপ্রকাশিত রচনাটি সম্প্রতি এক জায়গা থেকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সকলেই জানি, শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে আর লেখেননি।

বলো কি? মাসের শেষে সত্যিসত্যিই তোমার হাতে পয়সা বেঁচে যাচ্ছে?
হুঁহুঁ, শুধু কি তাই? এর ওপর স্টেট ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলেছি–এতে প্রত্যেক মাসে কিছু করে টাকা জমতে থাকবে!

তাঁর এই অসমাপ্ত 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি তখন ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৫শ পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যায়।

এখানে উদ্ধৃত শেষের পরিচয়ের এই অপ্রকাশিত অংশটির মাথায় (১৬) লেখা থাকায় এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, শরৎচন্দ্র এক সময় ষোড়শ পরিচ্ছেদ লিখতে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত লিখেছিলেন। কিন্তু এই অপ্রকাশিত অংশটা এবং প্রকাশিত ১৫শ পরিচ্ছেদটা ভাল করে পড়লে দেখা যায়, এই অপ্রকাশিত (১৬) অংশটা প্রকাশিত ১৫ পরিচ্ছেদেরই একটা পরিত্যক্ত অংশ।

শরৎচন্দ্র প্রথমে ১৫নং পরিচ্ছেদ লেখার সময় এর এক জায়গায় এই পরিচ্ছেদ শেষ করে, ১৬নং পরিচ্ছেদ হিসাবে ঐ অংশটা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু পরে এই ষোড়শ পরিচ্ছেদের লেখাটা বাদ দিয়ে এইটাই আবার নতুন করে লিখে এবং এর সংগে আরও খানিকটা বাড়িয়ে সবই ১৫নং পরিচ্ছেদের অন্তর্গত করেন। এখানে উদ্ধৃত ঐ ১৬নং পরিচ্ছেদটা যে তখন পরিবর্তিত হয়ে ১৫নং পরিচ্ছেদেরই অন্তর্গত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫নং পরিচ্ছেদের ঐ অংশটা পড়লেই। ঐ অংশটা পরে উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি। তার আগে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য 'শেষের পরিচয়'এর প্রকাশিত ১৪ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সমস্তটার একটা সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি—

সবিতা তার স্বামী ব্রজবাবু ও কন্যা রেণুকে ত্যাগ করে ব্রজবাবুরই এক আত্মীয় রমণীবাবুর সংগে কলকাতাতেই থাকে। রমণীবাবু সবিতার নামে একটা বাড়ি করে দিয়েছে। কয়েক ঘর ভাড়াটেও বসিয়েছে। ভাড়াটেদের মধ্যে বিধবা সারদা সবিতার খুব স্নেহের পাত্রী। একজন তাকে বিয়ে করবে বলে ফুসলে আনে; কিন্তু কিছুদিন পরে সে তাকে ত্যাগ করে পালায়। সারদা সবিতার কাজকর্ম করে দেয় ও থাকে।

এক সময় রমণীবাবুও সবিতাকে ছেড়ে চলে যায়। তবে বিমলবাবু নামে রমণীবাবুর এক ধনী বন্ধু সবিতার খোঁজখবর নেয়। সবিতা তাকে বন্ধুর মতই দেখে।

সবিতা যখন তার স্বামীর সংসারে ছিল, তখন সে তার বাপের বাড়ির দেশের রাখালরাজ নামে একটি ছেলেকে এনে মানুষ করেছিল। সবিতা তাকে রাজু বলে ডাকে। এই রাখাল বা রাজু এখন যুবক। কলকাতার এক মেসে থাকে। সে ব্রজবাবু এবং সবিতা উভয়েরই সংগে সম্পর্ক রেখেছে।

রাখালের এক বন্ধু তারক। সে বর্ধমান জেলার হরিণপুর স্কুলের হেড মাস্টার। রাখালের মারফৎ তারকের সংগেও সবিতা এবং সারদার আলাপ হয়। তারক রাখালকে না জানিয়ে এখন মাঝে মাঝে সবিতাদের বাড়িতে আসে এবং সারদার সংগেও আলাপ করে।

সারদা একবার আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। তখন রাখালই হাসপাতাল ঘর করে তাকে বাঁচায়। সারদা সেজন্য রাখালকে দেবতা বলে ডাকে।

রাখাল এক রাত্রে সবিতার বাড়িতে গিয়ে শুনল, কাল সকালেই সবিতা এবং সারদা হরিণপুর যাবে। তারক তাদের নিয়ে যেতে এসেছে। সে বাজারে জিনিসপত্র কিনতে গেছে।

রাখাল সবিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় নীচে পথের ধারে দেখে সারদা দাঁড়িয়ে। সারদা অনুরোধ করে রাখালকে একবার তার ঘরে নিয়ে গেল।

১৪ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনীর এই হ'ল সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৫শ পরিচ্ছেদের প্রথমেই আছে—রাখাল সারদার ঘরে গেলে সারদা দু একটা অন্য কথার পর রাখালকে বলে—দেবতা, আপনি বলুন সারদার হরিণপুর যাওয়া হবে না। নতুন-মার (সবিতাকে রাখাল, তারক ও সারদা নতুন-মা বলে) ইচ্ছা হয় তিনি যান।

রাখাল বলে—তোমাকে নিষেধ করবো, সে অধিকার আমার নেই।

এর পর উভয়ের মধ্যে যে কথা হয় তাতে সারদা আভাসে রাখালের প্রতি তার ভালবাসার কথাই জানায়। কিন্তু রাখাল সারদাকে একরূপ অপমান করেই তার ঘর থেকে চলে আসে। শরৎচন্দ্র লিখছেন—

'পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না, এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে সকল মান-অভিমানের পালা সাংগ করিয়া আসিল সে কিসের জন্য?...সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান।... অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে।...অকপট নারীত্বের এত বড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ এই সাড়াকে আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।'

আমার দৃঢ় ধারণা, শরৎচন্দ্র এইখানেই ১৫শ পরিচ্ছেদ শেষ করে, নতুন আবিষ্কৃত ঐ '(১৬)' পরিচ্ছেদটা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ষোড়শ পরিচ্ছেদ হিসাবে। কিন্তু পরে কি ভেবে (১৬) পরিচ্ছেদের এই লেখাটা বদলে, এর সংগে আরও কিছুটা লিখে সবই ১৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দিয়ে দেন।

আমার অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৫নং পরিচ্ছেদে যে অংশটাকে বদলে লেখা বলছি, তার সংগে এই আবিষ্কৃত (১৬) পরিচ্ছেদের লেখাটা মিলিয়ে দেখলেই। এখন ১৫নং পরিচ্ছেদ থেকে ঐ অংশটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'বাসায় পেঁৗছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত জোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি,—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যিই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্বেও এমন কত দিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরি-ভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ আজ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েচো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বলো তো? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদাবাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই তো। কিন্তু বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেছি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দু-দিন বেঁচে থেকে

চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘর-বাড়ি নেই, বাপ-মা আপনার লোক নেই, মোটা মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস্! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা বেন দিলে, কিন্তু বউ এসে খাবে কি বলো ত? খাবি খাবে নাকি?

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা; গেরস্থ-ঘরে সবাই যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। শৌখিন মানুষ—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন চারিটা পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেক দিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে—বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্যি দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে, তা হলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল কহিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজিচেয়ারটায় শুইয়া পড়িল, খাবার তৈরির প্রায় ঘণ্টা দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকি নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার। মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না। ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোন মতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকেও বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। এই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকরুণ লাঞ্ছনা। অথচ ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক্ আমার রান্না—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি, সে-সব সত্যি নয়, সে একেবারে মিথ্যে।

কুকারে খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ-বাটীতে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে, সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখ পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল তো আর সময় পাওয়া যাবে না।'

আবিষ্কৃত অপ্রকাশিত ঐ '(১৬)' পরিচ্ছেদের সঙ্গে প্রকাশিত ১৫নং পরিচ্ছেদের উদ্ধৃত এই অংশের কয়েকটা জায়গায় হুবহু মিল দেখা যায়। যেমন—(১) রাখাল বাসায় ফিরে দেখল, তখনো ঝি আছে। (২) কুকারে রান্না হতে লাগল, রাখাল চাদরটা টেনে নিয়ে সবিতার বাড়িতে গেল। ইত্যাদি।

অপ্রকাশিত '(১৬)' পরিচ্ছেদের শুরুতেই আছে—রাখাল সারদার ঘর থেকে বাসায় এসে দেখল, ঝি তখনও আছে।

কিন্তু ১৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে—রাখাল সারদার ঘর বন্ধ দেখে উপরে সবিতার ঘরে যায় এবং সেখানেই তার সঙ্গে কথা বলে চলে আসে—অতএব রাখাল সারদার ঘর থেকে আসতে পারে না।

আর, ১৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদেই আছে, ঝি রাখালের রান্নার ব্যবস্থা করে তার বাড়ি চলে গেল।—অতএব ঝি তখনও আছে, এও হতে পারে না।

তাই নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে—আবিষ্কৃত এই পাণ্ডুলিপিটিতে শরৎচন্দ্রের নিজের হাতে 'শেষের পরিচয়—(১৬)' লেখা থাকলেও এটি তাঁর একটি পরিত্যক্ত রচনাই এবং ১৫শ পরিচ্ছেদের এই উদ্ধৃত অংশেরই আদিরূপ।

গোপালচন্দ্র রায়

অলস শরৎচন্দ্রের সরস জীবন

দেবনারায়ণ গুপ্ত

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বছর তিনেক পরেই আমি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কাজে যোগদান করি। সে সময়ে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার যাঁরা পুরাতন লেখক ছিলেন এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের যাঁরা কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের কাছে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কত গল্পই না শুনেছি। তিনি 'ভারতবর্ষ' অফিসে এলে কেমন মজলিশ বসে যেত, কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাতেন, আর সেই সঙ্গে চুটকি রঙ্গ-রসিকতায় আড্ডাটি কেমন জম-জমাট করে তুলতেন। এক একদিন এমন অবস্থা হতো যে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর বইয়ের দোকানের দরজা বন্ধ করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে যেত। মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশাইকে কোন কোন দিন বলতে হোত—"দাদা এবার উঠুন, দরজা বন্ধ করতে হবে।"

"ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যে এত ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা তার পেছনে ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস এই যে, হরিদাসবাবু তাঁকে মাসিক একশত টাকা আয়ের ভরসা দিয়ে রেঙ্গুন থেকে আনিয়েছিলেন। উত্তরকালে হরিদাসবাবুর এই ভরসাটুকু লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। অর্থ, সম্মান ও যশে তিনি বাংলা কথা-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত "যমুনা" মাসিকপত্রে নিয়মিত লিখতে থাকেন। ১৩২০ সালে আষাঢ় মাসে "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্র আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়) তাঁকে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কয়েকটি পত্র লেখেন। "যমুনা" সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ সে কথা জানতে পেরে, পাছে তাঁর রচনা থেকে বঞ্চিত হন, এই ভয়ে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। ফণীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে ১৯১৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী, শরৎচন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে লিখেছিলেন—"আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোনদিন মনেও করবেন না।...আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।" এমনতর আশ্বাস একাধিক পত্রে দিলেও, শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষের" নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলে, "যমুনা" সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিলো। যদিও শরৎচন্দ্র জানতেন তাঁর 'কাশীনাথ' নিয়ে প্রমথবাবু তথা 'ভারত-বর্ষ' গোষ্ঠি এক সময় তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন এবং প্রমথবাবুর অনুরোধে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি পাঠানো সত্ত্বেও তা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়নি। তথাপি তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠে-ছিলেন। প্রমথবাবুর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ-কালের বন্ধুত্ব এবং হরিদাসবাবুর মাসিক একশত টাকা আয়ের আশ্বাসদান করাটাই এর একমাত্র কারণ নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের লেখা দেখে 'যমুনা' সম্পাদক খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। এবং 'যমুনা'র সঙ্গে শরৎ-চন্দ্রের সম্পর্ক পাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এই আশঙ্কায় 'যমুনা' সম্পাদক ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা পাঠক-পাঠিকাদের জানান — 'যমুনার পাঠকগণ বোধহয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে 'যমুনা'র সম্পাদন কার্যে যোগদান করিলেন। 'যমুনা'র পাঠকগণের নিকট শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত—অতএব পরিচিতের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।'

শরৎচন্দ্র ছিলেন চিরদিনই বাঁধনহারা

মানুষ। তাঁকে এইভাবে 'যমুনা' সম্পাদকের বাঁধার চেষ্টা এবং সম্ভবত বিনা অনুমতিতে সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'যমুনা'য় যুগ্ম সম্পাদকরূপে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হয়। এই সময় 'ভারতবর্ষে' 'পণ্ডিত-মশাই'ও তাঁর কয়েকটি গল্প পর পর প্রকাশিত হয়েছিলো। অন্যদিকে তখন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' ধারাবাহিক ভাবে যমুনায় প্রকাশিত হচ্ছিল। 'চরিত্রহীন' অসমাপ্ত রেখেই এই সময় শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালের ১১ই এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ করেন ও বাজে শিবপুরে বাসাভাড়া করে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে এই সময় থেকে তাঁর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। তাঁর বৃহৎ উপন্যাসগুলি একের পর এক 'ভারত-বর্ষে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু এই ধারাবাহিক লেখাগুলি যথাসময়ে তাঁর কাছ থেকে আদায় করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। শরৎচন্দ্র বড় অলস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শরৎ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত শরৎ-স্মরণিকা গ্রন্থে 'শরৎ-স্মৃতি' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—'ঢাকা থেকে ফিরিয়া আসিবার পরে তাঁর একটি কুকুর মারা যায়—সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমার স্ত্রী তাঁহাকে একদিন বলিয়া ছিলেন যে, কুকুর-বেড়ালের প্রতি যাঁর এত দরদ বাংলার পাঠক-পাঠিকার প্রতি তিনি এত অকরুণ কেন? শরৎবাবু একটু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, মাসিক পত্রে আপনার ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস যখন মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে, তখন আপনার পাঠক-পাঠিকার কিরূপ কষ্ট হয় তাহা কি আপনি জানেন না? শরৎবাবু শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং খানিকক্ষণ বেশ জোরে জোরে হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে, না জানি কি গুরুতর অভিযোগই শুনতে হবে। আমার লেখা যে নিয়মিত বার হয় না তার কারণ আমি বড় অলস লোক।"...(শরৎ-স্মরণিকা পৃঃ ২৩—২৪)। সত্যই যে তিনি অলস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন সে কথা তিনি একাধিক পত্রে তাঁর সতীর্থদের কাছে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে অজস্র রচনায় বাংলা কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে গেছেন। এর পেছনে একজনের লেখা আদায় করা বা তাঁকে দিয়ে লেখানোর নিরলস চেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক সার্বজনীন 'দাদা' স্বর্গত রায়-বাহাদুর জলধর সেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হোত। পত্রিকা পরিচালকদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে, এর ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না। কাজেই শরৎ-চন্দ্রের লেখার জন্য নিয়মিত তাগিদ দেওয়া জলধরদাদার একটি বিশেষ কাজ ছিল বলা চলে। এ সম্পর্কে জলধরদাদা নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "শরৎ-বন্দনা, পুস্তকে 'শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—"শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন, তখন এবং এখন যে রূপনারায়ণ তীরে দুর্গম স্থানে আছেন, সেখানেও অনেক সাহিত্যিকের সমাগম দেখেছি। আমাকেও প্রায়ই 'শরৎ-আলয়ে' যেতে হোত। সাহিত্যালোচনার জন্য নয়। অন্য উদ্দেশ্যে ... (শরৎ-বন্দনা, পৃঃ ১৮)। —এই অন্য উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়—লেখা আদায় করা।

'ভারতবর্ষ' অফিসে এলে শরৎচন্দ্রের রেহাই ছিল না। জলধরদাদা তাঁকে ঘরে আবদ্ধ করে রেখে লেখা আদায় করে নিতেন। অবশ্য গড়গড়া আর সেই সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা করে দিতেন 'ভারতবর্ষ'র মালিকপক্ষ। কিন্তু নাগালের মধ্যে শরৎ-চন্দ্রকে কিছুদিন না পেলেই জলধরদাদাকে ছুটোছুটি করতে হ'ত হয় শিবপুরে না হয় সামতাবেড়ে। এই লেখা আদায় করা সম্পর্কে একটা চমৎকার গল্প 'ভারতবর্ষে' কাজ করা কালীন একাধিকবার শুনেছি। গল্পটি এই—মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে গেল, তখনও শরৎচন্দ্রের কিস্তির লেখা আসেনি। হরিদাসবাবু বিশেষ উদ্বিগ্ন। জলধরদাদা হাতের লাঠিটি নিয়ে বেলা ৩টা নাগাদ টুক্‌টুক্ করে বেরিয়ে পড়লেন, শিবপুরের উদ্দেশ্যে। বেলা ৪টা নাগাদ শিবপুরে শরৎচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হলেন। শরৎচন্দ্র জলধরদাদাকে দেখেই বুঝলেন যে বন্ধ লেখা আদায় করতে এসেছেন। শরৎচন্দ্র তখন কয়কজনের সঙ্গে কথা কইছিলেন। জলধরদাদা সেদিকে দৃকপাত না করে সোজা অন্দরে চলে গেলেন এবং জামা ছেড়ে, চুরুট ধরিয়ে একটা ঘরে শয্যা গ্রহণ করে বই পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বৌমা অর্থাৎ হিরণ্ময়ী দেবী চা-জলখাবার এনে দিলেন। চা পান করতে করতে জলধর-দাদা হিরণ্ময়ী দেবীকে বললেন—বৌমা রাত্রে থাকবো। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে জলধরদাদার রাত্রে থাকার কথা শুনে

লেন, আজ আর তাঁর রেহাই নেই। আদায় না করে বন্ধ উঠবেন না। চন্দ্রের সংগে ইতিমধ্যে বার কয়েক র চোখাচোখি হোল। কিন্তু পরস্পরের কোনরূপে বাক্য-বিনিময় হোল না। দ্জন এক সঙ্গে খেতে বসলেন। নে হিরন্ময়ী দেবী। দাদার যত কথা অর্থাৎ 'হিরন্ময়ী দেবীর সংগে। চন্দ্রের সংগে কোন বাক্যালাপ করলেন শরৎচন্দ্র মুখ টিপে হাসলেন একটু। নও দাদার সংগে কোন কথা কইলেন আহারাদির পর দাদা একটি ঘরে নিলেন। শরৎচন্দ্র নিজের ঘরে গিয়ে জ কলম নিয়ে বসলেন। ভোরে উঠে চা খাচ্ছেন। শরৎচন্দ্র তখনও কলম চ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে কিস্তির লেখা করে শরৎচন্দ্র কাগজগুলি দাদার ত তুলে দিয়ে বল্লেন—বেলা এখন প্রায় । তাহলে এবেলা এখান থেকেই দুটি য় অফিসে যাবেন। দাদা একগাল হেসে ন—"তা বলছ যখন, তাই যাবো।"

এমনি করে অলস মানুষ শরৎচন্দ্রকে য় দাদা যে কত লেখা লিখিয়ে নিয়েছেন আর ইয়ত্তা নেই। জলধর দাদার রেও শরৎচন্দ্রের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। কে শরৎচন্দ্র ঠিক অগ্রজের মতই ভক্তি তেন। ১৩৪১ সালের ২রা মাঘ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জলধরদাদার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে যে সংবর্ধনা র আয়োজন করা হয়, সেই সংবর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। অভিনন্দন পত্রটিও তিনিই লিখে দেন। সেই অভিনন্দন পত্রের এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"বাণীর মন্দিরদ্বারে তুমি য়েছ সকলকে অবারিত পথ। কনিষ্ঠকে দিয়েছ আশা। দুর্বলকে দিয়েছ ক। অখ্যাতকে দিয়েছ খ্যাতি। আশ্রয়হীন শঙ্কাকুল কত আগন্তুক জনই সাহিত্য পূজার বেদীমূলে তোমার সা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা জিয়া পাইয়াছে।" (জলধর কথা)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। নি তাঁর অভিভাষণে বলেন—"বাংলার থাসাহিত্যের যোগসিদ্ধ পুরুষ শরৎচন্দ্র সংবর্ধনা সভার কর্ণধার, এবং সাহিত্যের বাসাচী রায়বাহাদুর জলধর সেন যে বর্ধনার পাত্র—সেই সংবর্ধনা শুধু আজ খানে সমবেত আমাদের নহে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সংবর্ধনা।"

নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রতিও শরৎচন্দ্রের বরাবরই অনুরাগ ছিল। ভাগলপুরে কাকালীন যৌবনের প্রারম্ভে তিনি "মৃণালিনীতে মৃণালিনী", "বিল্বমঙ্গলে" চিন্তামণি এবং "জনা" নাটকে জনার ভূমিকায় অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

হরিদাসবাবুও ছিলেন নাটকের একান্ত অনুরাগী ও ভক্ত। "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মূলেও তাঁর এই নাট্যানুরাগের কথা বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। অনেকেই হয়তো জানেন না কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত ইভনিং ক্লাব একদা কলিকাতার একটি বিশিষ্ট নাট্য-সংস্থারূপে চিহ্নিত ছিল। প্রমথবাবু ও হরিদাসবাবু এই নাট্যসংস্থার যথাক্রমে সম্পাদক ও বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। একদা এই ক্লাব থেকে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু মাসিক কাগজ প্রকাশ করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা তাঁদের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময় হরিদাসবাবু প্রস্তাব করেন দ্বিজেন্দ্রলাল যদি কাগজের সম্পাদনা করতে সম্মত হন, তাহলে তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন। হরিদাসবাবুর প্রস্তাবে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্মতি দান করলে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নামকরণ দ্বিজেন্দ্রলালই করেন। এরপর শরৎচন্দ্রের সংগে হরিদাসবাবুর যোগাযোগ হলে, প্রায়ই তাঁদের মধ্যে নাটক নিয়ে আলোচনা হোত। তাঁর উপন্যাসের নাট্রূপ প্রদানের ব্যাপারে হরিদাসবাবুর বিশেষ প্রেরণা ছিল। ১৩৩০ সালের ৭ই আষাঢ় সামতাবেড় থেকে তিনি এক পত্রে হরিদাসবাবুকে জানান—"...আপনি "দত্তা"র অভিনয় স্বত্ব চেয়েছিলেন অতএব আমি খুশি হয়েই দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে 'বিজয়া' নাটক এতদিন শেষ করে আনতাম। আপনি অপরকে দিয়ে সেটা লেখাতে চাইছেন, কিন্তু সে কি আমার চেয়েও শীঘ্র পেরে উঠবে? ওরা দেখছি অনেক অসুবিধা আছে। মাঝখানে গ্রন্থকার নিজে না হলে সে যে বিশেষ ভাল হবে ভরসা করিনে। আমার নিজের লেখা হলে সে বাধা থাকে না এবং আমিও একখানা নাটক 'বিজয়া' নাম দিয়ে ছাপাতে পারি। পরের তৈরী হলে তো তা পারবো না।...

অথচ আপনাদের বিলম্ব হলে—(অর্থাৎ 'বিজয়া'র আশায়) বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্ছে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে করবো বুঝতে পারিনে। অথচ সমস্ত বইটাই একরকম তৈরী করা আছে; শুধু একটু অদল-বদল বা অল্প স্বল্প লিখে কপি করানো। ইতিমধ্যে যদি ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই করে তুলবো। কিছুদিন পূর্বে যদি এ মতলব করতেন ভাবনাই ছিল না।" যাই হোক 'বিজয়া' এ সময়ে অভিনীত না হলেও এর এক বছর পরে, স্টার রঙ্গমঞ্চে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে "নবনাট্যমন্দির"

কর্তৃক ১৩৪১ সালে ৬ই পৌষ প্রথম অভিনীত হয়।

কিন্তু "বিজয়া" মঞ্চস্থ হলেও নাটকের শেষাংশটি তাঁর মনোমত হচ্ছিল না। এ নিয়ে হরিদাসবাবুর সঙ্গে তাঁর কয়েকবার আলোচনাও হয়েছিল। শেষে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষ" অফিসে এলে, হরিদাসবাবু তাঁকে জানান যে "বিজয়া" নাটকের পূর্ববর্তী সংস্করণ নিঃশেষিত, নতুন সংস্করণ ছাপতে হবে। শরৎচন্দ্র শুনে বললেন—তাহলে শেষটা তো এবার পরিবর্তন করতে হয়। কাগজ কলম দাও—আজই ওটা লিখে দিয়ে যাই। শেষের যে সংলাপগুলি সেদিন তিনি সংযোজিত করলেন তা এইরূপঃ—

রাস॥ দয়াল মেয়েটি কে?

দয়াল॥ আমার ভাগ্নি নলিনী।

রাস॥ বড় জ্যাঠা মেয়ে। (প্রস্থান)

দয়াল॥ (সেইদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। ভগবান ওঁর ক্ষোভ দূর করুন। গাঙ্গুলীমশাই, চলুন আমরা অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখিগে। আজকের দিনে কোথাও না অপরাধ স্পর্শ করে।

পূর্ণ॥ প্রজাপতির আশীর্বাদে কোথাও ত্রুটি নেই দয়ালবাবু—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে। (প্রস্থান)

দয়াল॥ (ইংগিতে বরবধূকে দেখাইয়া) নলিনী, এদেরও যা হোক দুটো খেতে দিতে হবে যে মা। যাও তোমার মামীমাকে বলো গে।

নলিনী॥ যাই মামাবাবু—

দয়াল॥ আমি যাচ্ছি চলো (প্রস্থান)

[ক্ষণকালের জন্য রংগমঞ্চে বরবধূ ভিন্ন আর কেহ রহিল না।]

নরেন॥ (গম্ভীর হয়ে) কি ভাবছো বলো তো?

বিজয়া॥ (সহাস্যে) ভাবছি তোমার দুর্গতির কথা। সেই যে ঠকিয়ে Microscope বেচেছিলে তার ফল হোল এই। অবশেষে আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হোল।

নরেন॥ (গলার মালা দেখাইয়া) তার এই ফল! এই শাস্তি?

বিজয়া॥ হাঁ। তাই তো। শাস্তি কি তোমার কম হোল নাকি?

নরেন॥ তা হোক। কিন্তু বাইরে আর একথা প্রকাশ কোর না,—তাহলে রাজ্যশুদ্ধ লোক তোমাকে Microscope বেচতে ছুটে আসবে। (উভয়ে হাস্য)

নলিনী॥ (প্রবেশ করিয়া) এসো ভাই, আসুন Dr. Mukherjee মামীমা আপনাদের খাবার দিয়ে বসে আছে, কিন্তু অমন অট্টহাস্য হচ্ছিল কেন?

বিজয়া॥ সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।—

॥ যবনিকা ॥

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে আমাকে একদিন বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র আসলে নাটকে মানুষ ছিলেন—বলেই, উপন্যাসের সংলাপগুলিও হোত নাটকীয়।

শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ী তৈরী হওয়ার কিছুকাল পরে হরিদাসবাবুও বালীগঞ্জে নূতন বাড়ী তৈরী করে উত্তর কলকাতা থেকে চলে যান। সে সময়ে হরিদাসবাবু প্রায়ই শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে যেতেন। হরিদাসবাবু গেলে শরৎচন্দ্র চা নিয়ে আসার জন্য চাকরকে নির্দেশ দিতেন। চাকরটি দু' কাপ চা একটি চারচৌকো কাঠের ওপর বসিয়ে নিয়ে আসতো। এই চারচৌকো কাঠটি ছিল—ইলেকট্রিকের সুইচ বোর্ড। বাড়ী তৈরীর পর ইলেকট্রিকের কাজ শেষ হলে, ঐ কাঠখানি বেঁচেছিল। শরৎচন্দ্র তাকে ট্রের কাজে লাগিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন হরিদাসবাবু বলেন—"দাদা এত হোল কিন্তু একটা ট্রে আর হোল না। আপনার ঐ কাঠখানাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।" উত্তরে শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেছিলেন—"পয়সা দিয়ে কেনা জিনিসের ওপর মমত্ব আছে বলেই ওটা কাজে লাগিয়েছি ভায়া।"

এর কিছুদিন পরে হরিদাসবাবুর পুত্র শ্রীসরোজকুমার কাশীতে বেড়াতে যান। হরিদাসবাবু তাঁকে একটি মোরাদাবাদী ট্রে কিনে আনতে নির্দেশ দেন। সরোজকুমার কাশী থেকে ট্রে-টি কিনে নিয়ে এলে হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে ট্রে-টি দিয়ে বলেন—সরোজ এটা কাশী থেকে আপনার জন্যে কিনে এনেছে। ট্রে-টি পেয়ে শরৎচন্দ্র খুব খুশী। হরিদাসবাবু বলেন—এখুনি এই ট্রেতে করে চা নিয়ে আসার অর্ডার দিন, আর আগের কাঠখানা ফেলে দেবার ব্যবস্থা করুন। শরৎচন্দ্র তখুনি চায়ের অর্ডার দিলেন। যথাসময়ে দু'কাপ চা মোরাদাবাদী ট্রেটির ওপর বসিয়ে চাকর দিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে গেলে, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন পুনরায় সেই পূর্বতন কাঠের ওপর দু' কাপ চা নিয়ে চাকরটি প্রবেশ করছে। হরিদাসবাবু চটে গিয়ে বলেন—"দাদা আবার সেই কাঠটা বার করেছেন?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে বলেন—"ভায়া রাগ করো না। তোমার ট্রে-র আমি আরো ভালভাবে সদ্ব্যবহার করছি। তুমি দেখলে খুশিই হবে।" তারপর চাকরের দিকে চেয়ে বলেন—"যা তো ট্রে-টা নিয়ে আয় তো—"

চাকর চলে যায় ও কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসে। হরিদাসবাবু সবিস্ময়ে দেখলেন ট্রে-র ওপর কতগুলি নানা রঙের কলম, পেনসিল, দোয়াত, কাগজ কাটা, আলপিন জেমক্লিপ ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র হেসে বলেন—"বল ভায়া, তোমার দেওয়া ট্রে-র সত্যি আমি সদ্ব্যবহার করছি কিনা?"

হরিদাসবাবুর মুখ দিয়ে তখন আর কোন কথাই বের হয় না। খুশিতে তাঁর মুখ তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

১৩৪১ সালের ২রা মাঘ, জলধর দাদার সংবর্ধনার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এর তিন বছর পরে, ১৩৪৪ সালের ঠিক ঐ দিনটিতেই অর্থাৎ ২রা মাঘ তারিখে শরৎচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

একদা স্বাস্থ্যের কারণেই শরৎচন্দ্রকে রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু কলিকাতায় এসেও মধ্যে মধ্যে তাঁকে নানা রোগে ভুগতে হয়েছে। শেষ জীবনে স্বাস্থ্যের কারণে তিনি যেমন 'ভারতবর্ষে' যথাসময়ে লেখা দিতে পারতেন না, তেমনি বার্ধক্যের ভারে অপটু হওয়ায় জলধরদাদার পক্ষেও নিয়মিত তাগিদ দেওয়া সম্ভব হোত না। "ভারতবর্ষে" "শেষের পরিচয়" তাঁর শেষ ধারাবাহিক রচনা। যা শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তাঁর মৃত্যুর মাস কয়েক পূর্বে হরিদাসবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লাবণ্য দেবী মুসৌরীতে বেড়াতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের জন্য একটি সুন্দর লাঠি কিনে এনে দিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু সেটি শরৎচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলে শরৎচন্দ্র এক পত্রে লেখেন—

২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোড
৫ই আষাঢ় ১৩৪৪

ভায়া—জ্যাঠামশায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করার জন্যে কন্যা এনেছেন দণ্ড বহু দূরে মুসৌরী থেকে। শ্রীচরণে অর্পণ করার ইঙ্গিত বোধ করি এই যে, ভবিষ্যতে না লিখলে কাজকর্ম না করলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়া হবে।

যাই হোক লাঠিটি চমৎকার। আমার কাজে লাগবে ঠ্যাং দুটোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে।

শরৎদা

কিন্তু এ লাঠিটি তিনি বেশীদিন ব্যবহার করতে পারেননি। শুধু পা দুটোকেই বিশ্রাম দেওয়া নয়—চিরতরেই সাহিত্যের আসর থেকে তিনি বিশ্রাম নিয়ে চলে গেছেন।

"শ্রীকান্ত"-র চারটি পর্ব নিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থের ংখ্যা চৌত্রিশ। এর মধ্যে অবশ্য ধরা হয়েছে াঁর অসমাপ্ত লেখা "শেষের পরিচয়" (যা ন্যে শেষ করেছেন) এবং দুটি বারোয়ারি ‌ উপন্যাস (যা দশ-বারোজন লেখকের যৌথ ৃষ্টি)। চার-পাঁচটি বাদে এ পর্যন্ত এই ব গল্প অবলম্বনে শতাধিক ফিল্ম উঠেছে লকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের স্টুডিওুলিতে।

চলচ্চিত্র জগতে একই লেখকের এতুলি গল্পের চিত্রায়ণ শুধু বিরল নয়, র দ্বিতীয় নজির নেই এদেশে—সম্ভবত ৃথিবীর কোন দেশেই। শরৎচন্দ্রের াকান্তর ঘটেছে প্রায় চার দশক আগে। াঁর জীবদ্দশায় তাঁর গল্পের যতগুলি ছবি ঠেছে, তাঁর মরণোত্তর ছবির সংখ্যা তার াগুণ। এখানেই শেষ নয়। সত্তরের শকেও শরৎ-কাহিনী চিত্রায়িত করবার ক্ষতা অব্যাহত রয়েছে চলচ্চিত্রকারদের ধ্যে। এ বছরেই দুটি ছবি ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে, আর একটি মুক্তির প্রতীক্ষায় য়েছে। এবং কলকাতা ও বোম্বাইয়ে র্তমানে "রামের সুমতি", "পণ্ডিতমশাই", "স্বামী" ও "দেবদাস" এই কাধিকবার চিত্রায়িত গল্প চারটির নব ূপায়ণ চলছে। শরৎচন্দ্রের যুগোত্তর প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন এটি।

শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "বড়দিদি" ১৯১৩) বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর াহিত্যিক খ্যাতির সূত্রপাত। তখনও াংলায় চলচ্চিত্র শিল্পের পত্তন হয়নি। র্ঘ ন'বছর বাদে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও রেশচন্দ্র মিত্রের মত শিক্ষিত কলাবিদ যখন ত্র নির্মাণে ব্রতী হলেন তখন তাঁরা থমেই নির্বাচন করলেন শরৎচন্দ্রের একটি াট গল্প—"আঁধারে আলো"। সিনেমার ুপোলী পর্দায় শরৎ প্রতিভার সেই প্রথম বজলী-চমক।

এদেশে সবাক ছবি তোলা শুরু হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠান ই বছরেই যাত্রা শুরু করে শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা" চিত্রায়ণের মাধ্যমে। তার াগেই—১৯২২ ও ১৯৩১-এর মধ্যে—ছ'টি নির্বাক ছবি উঠেছিল শরৎচন্দ্রের গল্পের।

সবাক ছবির জগতে নিউ থিয়েটার্স'ই শরৎচন্দ্রের খ্যাতির ভিত্তি স্থাপন করে পর পর তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়ে। বাংলার সঙ্গে হিন্দী সংস্করণ তোলারও প্রবর্তন করে এই প্রতিষ্ঠান। নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবির মাধ্যমেই সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে শরৎচন্দ্রের প্রথম পদক্ষেপ।

শরৎ-কাহিনী অবলম্বনে তোলা এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ও হিন্দী ছবিগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে ছবি উঠেছে। তাদের সংখ্যাও কম নয়। সেগুলির পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করা যায় নি বলে এখানে তা দেওয়া সম্ভব হল না। আন্দাজে বলা চলে মারাঠী, গুজরাতী ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে পঞ্চাশটির মত ছবি তৈরি হয়েছে বিগত তিন দশকে। বাংলার বাইরে শরৎ-কাহিনীর অসামান্য জনপ্রিয়তার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। বছর দুয়েক আগে হায়দ্রাবাদের একটি সিনেমাতে তেলেগু "দেবদাস"-এর পুনঃ প্রদর্শন শুরু হয় রবিবারের মর্নিং-শোতে। পুরোন ছবির সকালের প্রদর্শনী সাধারণত দু-তিন হপ্তার বেশী চলে না। "দেবদাস" চলেছিল পুরো একটি বছর। পুনঃ প্রদর্শনের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান এইভাবে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল।

সারা দেশ জুড়ে আজ যাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে, আরো শতবর্ষ পরে তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্বাক্ষর এমনিভাবেই কি সিনেমার পর্দায় প্রতিফলিত

হবে? জানি না। তবে আশা করবো যে-হৃদয় দিয়ে সংবেদনশীল শিল্পের রসাস্বাদ করা যায় তার পরিবর্তন ঘটবে না।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির তালিকা

॥ নির্বাক ॥

১। **আঁধারে আলো** (তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী)
পরিচালক : শিশিরকুমার ভাদুড়ী।
অভিনয়ে : শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, দুর্গারাণী, যোগেশ চৌধুরী।
প্রথম মুক্তি : ১৯২২

২। চন্দ্রনাথ (তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী)
পরিচালক : নরেশচন্দ্র মিত্র।
অভিনয়ে : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, শিশুবালা।
প্রথম মুক্তি—১৯২৪

৩। দেবদাস (ইস্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেট)
পরিচালক : নরেশচন্দ্র মিত্র।
অভিনয়ে : ফণি বর্মা, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নীহারবালা।
প্রথম মুক্তি—১৯২৮

৪। **শ্রীকান্ত** (রাধা ফিল্মস)
পরিচালক : তারাকুমার ভাদুড়ী।
অভিনয়ে : কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার ভাদুড়ী, শান্তাকুমারী।
প্রথম মুক্তি—১৯৩০

৫। **চরিত্রহীন** (ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস)
পরিচালক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : হেম গুপ্ত, কালিদাস, সমিতা দেবী, শীলা।
প্রথম মুক্তি ১৯৩১

৬। **স্বামী** (ফিল্মস্ অফ দি ইস্ট)
পরিচালনা : চারু রায়।
অভিনয়ে : ফণি বর্মা, তিনকড়ি চক্রবর্তী, রেণু, বীণাপাণি।
প্রথম মুক্তি—১৯৩১

বাংলা

॥ সবাক ॥

১। **দেনা পাওনা** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
অভিনয়ে : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী, জহর গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক, ভূমেন রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশুবালা, অনুপমা, উমাশশী।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৩১

২। **পল্লীসমাজ** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : শিশিরকুমার ভাদুড়ী।
অভিনয়ে : শিশির ভাদুড়ী, প্রভা দেবী, কঙ্কাবতী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, ঊষা, রাজলক্ষ্মী।
প্রথম মুক্তি—জুলাই ১৯৩২

৩। **দেবদাস** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া।
অভিনয়ে : প্রমথেশ, যমুনা, চন্দ্রাবতী, দীনেশরঞ্জন দাশ, অমর মল্লিক।
প্রথম মুক্তি—মার্চ ১৯৩৫

৪। গৃহদাহ (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া।
অভিনয়ে : যমুনা, প্রমথেশ, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মলিনা, অমর মল্লিক।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৩৬

৫। **বিজয়া** (নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস)
পরিচালক : দীনেশরঞ্জন দাশ।
অভিনয়ে : পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, অমর মল্লিক, শ্যাম লাহা, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, আরতি।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৩৬

৬। **পণ্ডিত মশাই**—(পপুলার পিকচার্স)
পরিচালক : সতু সেন।
অভিনয়ে : রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, রবি রায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রেণুকা, রাণীবালা।
প্রথম মুক্তি—নভেম্বর ১৯৩৬

৭। **বড়দিদি** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : অমর মল্লিক।
অভিনয়ে : পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, যোগেশ চৌধুরী, সাবিত্রী, নিভাননী, মেনকা, শৈলেন চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী।
প্রথম মুক্তি এপ্রিল ১৯৩৯

৮। **পরিণীতা** (পি আর প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : ছবি বিশ্বাস, প্রভা দেবী, সন্ধ্যারাণী, প্রমোদ গাঙ্গুলি।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৪২

৯। **কাশীনাথ** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : নীতিন বসু।
অভিনয়ে : অসিতবরণ, সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, দিলীপ বসু।
প্রথম মুক্তি এপ্রিল ১৯৪৩

১০। **বিরাজ বৌ** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : অমর মল্লিক।
অভিনয়ে : ছবি বিশ্বাস, সুনন্দা দেবী, সিধু গাঙ্গুলি, দেবী মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা দেবী।
প্রথম মুক্তি—জুলাই ১৯৪৬

১১। **পথের দাবী** (এসোসিয়েটেড পিকচার্স)
পরিচালক : সতীশ দাশগুপ্ত ও দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : দেবী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলি।
প্রথম মুক্তি—মার্চ ১৯৪৭

১২। **রামের সুমতি** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : ছবি রায়, মলিনা দেবী, শিশির বটব্যাল, ফণী রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৪৭

১৩। **অরক্ষণীয়া** (পি আর প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : সন্ধ্যারাণী, রবীন মজুমদার, নীলিমা দাস, নিভাননী।
প্রথম মুক্তি—জুন ১৯৪৮

১৪। **শেষ নিবেদন** (ডি জি পিকচার্স)
পরিচালক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : মলিনা দেবী, সরযূবালা, ডিজি, ছবি বিশ্বাস, নবদ্বীপ হালদার।
প্রথম মুক্তি—জানুয়ারী ১৯৪৮

১৫। **অনুরাধা** (ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল টকিজ)
পরিচালক : প্রণব রায়।
অভিনয়ে : কানন দেবী, জহর গাঙ্গুলি, মোহন ঘোষাল, শুক্তিধারা, কানু বন্দ্যো
প্রথম মুক্তি—জুন, ১৯৪৯

১৬। **স্বামী** (কলালক্ষ্মী চিত্র মন্দির)
পরিচালক : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : সুমিত্রা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, প্রদীপকুমার, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
প্রথম মুক্তি—সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

১৭। **বামুনের মেয়ে** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : সব্যসাচী।
অভিনয়ে : অনুভা গুপ্তা, পাহাড়ী সান্যাল, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সুনীল দাশগুপ্ত।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৪৯

১৮। **বৈকুণ্ঠের উইল** (যুগান্তর চিত্র প্রতিষ্ঠান)
পরিচালক : মানু সেন।
অভিনয়ে : মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলি, রেণুকা রায়, বিকাশ রায়, নীলিমা।
প্রথম মুক্তি—ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

১৯। **মেজদিদি** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : সব্যসাচী।
অভিনয়ে : কানন দেবী, জহর গাঙ্গুলি, রেণুকা রায়, তুলসী চক্রবর্তী।
প্রথম মুক্তি—নভেম্বর ১৯৫০

২০। **দত্তা** (এস বি প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : সুনন্দা দেবী, পূর্ণেন্দু, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলি, অনুভা গুপ্তা।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৫১

২১। **পণ্ডিত মশাই** (এমার প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : নরেশচন্দ্র মিত্র।

অভিনয়ে : সুনন্দা দেবী, সন্ধ্যারানী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা, নরেশ মিত্র।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৫১

২। **মন্দির** (চিত্রমূপা)
পরিচালক : চন্দ্রশেখর বসু।
অভিনয়ে : জহর গাঙ্গুলি, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সমর, যমুনা সিংহ।
প্রথম মুক্তি—জুন ১৯৫২

৩। **পল্লীসমাজ** (এস বি প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী।
অভিনয়ে : সুনন্দা দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলি, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী।
প্রথম মুক্তি—সেপ্টেম্বর ১৯৫২

৪। **বিন্দুর ছেলে** (যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান)
পরিচালক : চিত্ত বসু।
অভিনয়ে : সন্ধ্যারানী, মলিনা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যো, রেণুকা রায়।
প্রথম মুক্তি— সেপ্টেম্বর ১৯৫২

৫। **শুভদা** (এস বি প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী।
অভিনয়ে : সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৫২

৬। **দর্পচূর্ণ** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : এস পি ইউনিট।
অভিনয়ে : কানন দেবী, রাধামোহন, জহর গাঙ্গুলি, পদ্মা দেবী।
প্রথম মুক্তি—ডিসেম্বর ১৯৫২

৭। **পথ নির্দেশ** (এসোসিয়েটেড প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : সারথি।
অভিনয়ে : সুমনা, মনীষা, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার।
প্রথম মুক্তি—জানুয়ারি ১৯৫৩

৮। **হরিলক্ষ্মী** (এস বি প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : সন্ধ্যারাণী, সুনন্দা দেবী, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলি।
প্রথম মুক্তি—মে ১৯৫৩

৯। **নিষ্কৃতি** (কল্পরূপা)
পরিচালক : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলি, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ রেণুকা রায়।
প্রথম মুক্তি— অক্টোবর ১৯৫৩

১০। **নব বিধান** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য।
অভিনয়ে : কানন দেবী, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলি, মঞ্জু দে।
প্রথম মুক্তি—মার্চ ১৯৫৪

৩১। **সতী** (জ্যোতির্ময়ী)
পরিচালক : অমর মল্লিক।
অভিনয়ে : অরুন্ধতী, ভারতী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলি, কমল মিত্র।
প্রথম মুক্তি—জুলাই ১৯৫৪

৩২। **ষোড়শী** (নভেলটি ফিল্মস)
পরিচালক : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : ছবি বিশ্বাস, দীপ্তি রায়, কমল মিত্র, অরুন্ধতী দেবী।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৫৪

৩৩। **ষোড়শী** (নভেলটি ফিল্মস)
পরিচালক : অজয় কর।
অভিনয়ে : পাহাড়ী সান্যাল, নির্মলকুমার, সাবিত্রী চট্টো, মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, কমল মিত্র, শোভা সেন।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৫৫

৩৪। **মামলার ফল** (এস এন প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলি, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস।
প্রথম মুক্তি—জুলাই ১৯৫৬

৩৫। **বড়দিদি** (শরৎ বাণী চিত্র)
পরিচালক : অজয় কর।
অভিনয়ে : উত্তমকুমার, সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি রায়, মঞ্জু দে, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী, ধীরাজ।
প্রথম মুক্তি—জানুয়ারী ১৯৫৭

৩৬। **আঁধারে আলো** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য।
অভিনয়ে : সুমিত্রা দেবী, বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, যমুনা।
প্রথম মুক্তি—এপ্রিল ১৯৫৭

৩৭। **চন্দ্রনাথ** (স্ক্রীন ক্ল্যাসিকস)
পরিচালক : কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, জহর গাঙ্গুলি, চন্দ্রাবতী।
প্রথম মুক্তি—নভেম্বর ১৯৫৭

৩৮। **রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য।
অভিনয়ে : সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়।
প্রথম মুক্তি—ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

৩৯। **ছবি** (ইন্দো বার্মা ফিল্ম করপোরেশন)
পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী।
অভিনয়ে : মালা সিংহ, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, আশীষকুমার, অপর্ণা।
প্রথম মুক্তি—অগাস্ট ১৯৫৯

৪০। **ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য।
অভিনয়ে : কানন দেবী, বিকাশ রায়, পার্থপ্রতিম, সজল ঘোষ।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৫৯

৪১। **জয়া** (বলাকা চিত্রম)
পরিচালক : চিত্ত বসু।
অভিনয়ে : সাবিত্রী চট্টো, অনিল চট্টো, সন্ধ্যারাণী, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্তা।
প্রথম মুক্তি—মার্চ ১৯৬৫

৪২। **অভয়া ও শ্রীকান্ত** (শ্রীমতী পিকচার্স)
পরিচালক : হরিদাস ভট্টাচার্য।
অভিনয়ে : মালা সিংহ, বসন্ত চৌধুরী, বাসবী নন্দী, বিকাশ রায়, তরুণকুমার।
প্রথম মুক্তি—আগস্ট ১৯৬৫

৪৩। **গৃহদাহ** (উত্তমকুমার ফিল্মস)
পরিচালক : সুবোধ মিত্র।
অভিনয়ে : সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, প্রদীপকুমার, সাবিত্রী চট্টো, পাহাড়ী সান্যাল।
প্রথম মুক্তি—মে ১৯৬৭

৪৪। **পরিণীতা** (চিত্রলিপি ফিল্মস)
পরিচালক : অজয় কর।
অভিনয়ে : সৌমিত্র চট্টো, মৌসুমী চট্টো, শমিত ভঞ্জ, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী।
প্রথম মুক্তি—জুন ১৯৬৯

৪৫। **কমললতা** (চারু চিত্র)
পরিচালক : হরিসাধন দাশগুপ্ত।
অভিনয়ে : সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার,

নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৬৯

৪৬। **মা ও মেয়ে** (বি এন রায় প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : মৌসুমী চট্টো, স্বরূপ দত্ত, সন্ধ্যারাণী।
প্রথম মুক্তি—অক্টোবর ১৯৬৯

৪৭। **বিরাজ বৌ** (কে সি দাস প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : মানু সেন।
অভিনয়ে : উত্তমকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টো, বিকাশ রায়।
প্রথম মুক্তি—ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

৪৮। **বিন্দুর ছেলে** (এস এস প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : গুরুদাস বাগচী।
অভিনয়ে : মাধবী মুখো, সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার।
প্রথম মুক্তি—অগাষ্ট ১৯৭৩

৪৯। **আলো ও ছায়া** (এইচ এম ফিল্মস্)
পরিচালক : গুরুদাস বাগচী।
অভিনয়ে : দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টো, জুঁই বন্দ্যো, সত্য বন্দ্যো।
প্রথম মুক্তি—মার্চ ১৯৭৪

৫০। **দত্তা** (চিত্রলিপি ফিল্মস্)
পরিচালক : অজয় কর।
অভিনয়ে : সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টো, উৎপল দত্ত, শমিত ভঞ্জ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।
প্রথম মুক্তি—জুন ১৯৭৬

হিন্দী সবাক

(১) **দেবদাস** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া।
অভিনয়ে : সায়গল, যমুনা দেবী, চন্দ্রাবতী, অমর মল্লিক।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৩৬

(২) **মঞ্জিল** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া।
অভিনয়ে : পৃথ্বিরাজ, যমুনা, মলিনা দেবী।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৩৭

(৩) **চিৎগারি** (সাগর মুভিটোন)
পরিচালক : সর্বোত্তম বাদামি।
অভিনয়ে : সবিতা দেবী, মতিলাল
কলকাতায় মুক্তি—১৯৪০

(৪) **বড়দিদি** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : অমর মল্লিক।
অভিনয়ে : পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৪০

(৫) **কাশীনাথ** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : নীতিন বসু।
অভিনয়ে : অসিতবরণ, সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৪৩

(৬) **ইনকার** (লক্ষ্মী প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : সুধীর সেন।
অভিনয়ে : লীলা দেশাই, পাহাড়ী সান্যাল, স্বর্ণলতা।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৪৩

(৭) **সব্যসাচী** (এসোসিয়েটেড পিকচার্স)
পরিচালক : অগ্রদূত।
অভিনয়ে : কমল মিত্র, মীরা মিশ্র, সন্ধ্যারাণী, পরেশ, ব্যানার্জি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।
কলকাতায় মুক্তি—জানুয়ারী ১৯৪৯

(৮) **ছোটাভাই** (নিউ থিয়েটার্স)
পরিচালক : কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : মলিনা দেবী, সুকুকুর, পল মহেন্দ্র, রাজলক্ষ্মী।
কলকাতায় মুক্তি—সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

(৯) **জলজলা** (আর্ট ফিল্মস্ অফ এশিয়া)
পরিচালক : পল জিল্‌স্।
অভিনয়ে : কিশোর সাহু, গীতা বালি, দেব আনন্দ, জগদেব।
কলকাতায় মুক্তি—এপ্রিল ১৯৫২

(১০) **ছোটী মা** (এইচ এম ফিল্মস্)
পরিচালক : হেম চন্দ্র।
অভিনয়ে : মীরা মিশ্র, মলিনা দেবী, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, আনন্দ।
কলকাতায় মুক্তি—ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

(১১) **পরিণীতা** (অশোককুমার প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : বিমল রায়।
অভিনয়ে : অশোককুমার, মীনাকুমারী, অসিতবরণ, বেবি শীলা।
কলকাতায় মুক্তি—অগাষ্ট ১৯৫৩

(১২) **বিরাজবহু** (হিতেন চৌধুরী প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : বিমল রায়।
অভিনয়ে : কামিনী কৌশল, অভি ভট্টাচার্য, শকুন্তলা, প্রাণ, মনোরমা।
কলকাতায় মুক্তি—সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

(১৩) **দেবদাস** (বিমল রায় প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : বিমল রায়।
অভিনয়ে : দিলীপকুমার বৈজয়ন্তীমালা, মতিলাল, সুচিত্রা সেন।
কলকাতায় মুক্তি—জানুয়ারী ১৯৫৬

(১৪) **খোজ** (এস বি প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী।
অভিনয়ে : উষা কিরণ, অভি ভট্টাচার্য, সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস, মঞ্জু দে।
কলকাতায় মুক্তি—মে ১৯৫৮

(১৫) **মেঝলি দিদি** (কে জি পিকচার্স)
পরিচালক : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।
অভিনয়ে : মীনাকুমারী, ধর্মেন্দ্র, বিপিন গুপ্ত, মাষ্টার শচীন।
কলকাতায় মুক্তি—জুন ১৯৬৮

১৬। **ছোটী বহু** (ডি-লাক্স্ প্রোডাকসন্স)
পরিচালক : কে বি তিলক।
অভিনয়ে : শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, তরুণ বসু, নিরূপা রায়।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৭১

১৭। **খুশবু** (তিরুপতি পিকচার্স কম্বাইন)
পরিচালক : গুলজার।
অভিনয়ে : জিতেন্দ্র, হেমা মালিনী, দুর্গা খোটে, ফরিদা জালাল, ওম শিবপুরী।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৭৫

১৮। **সঙ্কোচ** (সুযোগ ফিল্মস্)
পরিচালক : অনিল গাঙ্গুলি।
অভিনয়ে : জিতেন্দ্র, সুলক্ষণা পণ্ডিত।
কলকাতায় মুক্তি—১৯৭৬

উপরের তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একাধিকবার চিত্রায়িত শরৎ কাহিনীর সংখ্যা কুড়ি। কোনটি কতবার চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে—শুধু বাংলা ও হিন্দীতে—তার বিবরণ :

পাঁচবার- শ্রীকান্ত।

চারবার—দেবদাস, পরিণীতা, পণ্ডিত মশাই ও পথের দাবী।

তিনবার—রামের সুমতি, গৃহদাহ, বিরাজ বৌ, অরক্ষণীয়া, দত্তা, বিন্দুর ছেলে ও বড়দিদি।

দু'বার—স্বামী, চন্দ্রনাথ, দেনাপাওনা, পল্লীসমাজ, কাশীনাথ, মেজদিদি, ও সুভদা।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

শান্তিনিকেতনের পল্লী-পরিবেশে গড়ে-ওঠা বিশ্বভারতীর কলাভবনের আকর্ষণে মহারাষ্ট্রের যে ছাত্রদের আসা-যাওয়া তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বোধহয় বিনায়ক শিবরাম মাসোজি। বিশের দশকে মহারাষ্ট্রের মানুষ বিনায়ক শিবরাম মাসোজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কলাভবনের আকর্ষণে। কিন্তু তাঁরও আগে যে মহারাষ্ট্রীয় কিশোর শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। কবিগুরুর স্নেহধন্য নারায়ণ কাশীনাথ দেবলই বোধকরি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বহু আগে আসা নারায়ণ কাশীনাথ দেবলের শান্তিনিকেতন ত্যাগ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

নারায়ণ কাশীনাথের পরে মহারাষ্ট্রের যে তরুণ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চারুকলা অনুশীলন করতে এসেছিলেন তিনি সুকুমার দেউস্কর। সুকুমারের কলাভবনে যোগদানের বেশ কিছু পরে বিনায়ক শিবরাম মাসোজির শান্তিনিকেতনে আগমন।

এবারের 'দেশ'-এর প্রচ্ছদে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যে প্রতিকৃতিটি মুদ্রিত হলো তার শিল্পী সুকুমার দেউস্কর। চিত্রটি সাগরময় ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সুকুমার দেউস্করের আঁকা শরৎচন্দ্রের এ চিত্র রচনার প্রত্যক্ষদর্শী সাগরময় নিজে এবং এ চিত্র সম্পর্কে তিনি আলোচনাও করেছেন তাঁর 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থে।

সাগরময় ঘোষের মত সুকুমারকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁদের অন্যতম প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুকুমার সম্পর্কে প্রভাতমোহন সম্প্রতি স্মৃতিচারণ করেছেন এক চিঠিতে। শ্রীনিকেতন থেকে লেখা শিল্পী, কবি ও দেশকর্মী প্রভাতমোহন সুকুমার প্রসঙ্গে লিখেছেন :

১৯২৩ সালে ১লা জানুয়ারি আমি শান্তিনিকেতনে যোগ দিই, সুকুমার তার কয়েকদিন পরেই আসে। আমার বয়স তখন উনিশ, তার বোধহয় ষোলো কি সতেরো। বাবা মারাঠী, মা বাঙ্গালী। সুন্দর বাংলা বলত, অমায়িক ব্যবহার এবং দিলদরিয়া মেজাজ।......আমাদের সঙ্গে প্রথমে আদিকুটিরে (প্রাক্‌কুটিরে টালির ঘরে) পরে তোরণ ঘরের নীচের তলায় অনেকদিন ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকত প্রথমে, বিচিত্রাতেই ছবি ছাপা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিকৃতি চিত্রণে পরে বেশি কৃতিত্ব দেখায়। ইটালিয়ান ক্লাসে তুচি সাহেবের কাছে আমি পড়েছি। সে আমার সহপাঠী না হলেও পড়েছে বোধহয় ইটালি যাবার আগে। সে যাবার আগে আমি গুরুদেবের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র এনে দিই তাকে। স্টেশনে বিদায় দিতে গেছলুম আমি, সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর, সত্যেন বিশী মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। ট্রেন ছাড়বার আগে মাস্টারমশাই কান্না চাপছিলেন, সে দৃশ্যটা আমার তোলা ছিল, দেখতে পাচ্ছি না। ইটালিতে সে তেলরঙে ভালো করেই ছবি আঁকতে শিখেছিল।...... ফিরে এসে কোথায় অধ্যক্ষ হয়েছিল শুনেছি, আমি তখন সত্যাগ্রহের জন্যে বাইরে ঘুরছিলুম, যোগাযোগ করতে পারিনি......যতদূর মনে পড়ে বছর চারেক ছিল এখানে—কলাভবনে এবং শিক্ষাভবনে।

প্রথিতযশা শিল্পী শশিকুমার হেসের ভাগিনেয় সুকুমার দেউস্কর আজ পরলোকে। মহারাষ্ট্রের এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা অতি অল্প। শশিকুমার হেসের ছোট দুই বোনের যিনি জ্যেষ্ঠা তিনিই সুকুমারের মাতা। তাঁর পিতার নাম আর ডাবলিউ দেউস্কর। মহারাষ্ট্রের মানুষ আর ডাবলিউ দেউস্কর হায়দ্রাবাদের স্বনামধন্য নবাব তৃতীয় সালার জং-এর অভিন্নহৃদয় বন্ধুরূপে পরিচিত। নবাব তৃতীয় সালার জং অর্থাৎ মীর ইউসুফ আলি খান-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূচনা তাঁর চিত্রকলার জন্যে। হায়দ্রাবাদের সালার জং মিউজিয়ামে আর ডাবলিউ দেউস্করের আঁকা বহু চিত্র রক্ষিত আছে।

শিল্পী আর ডাবলিউ দেউস্করের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই শশিকুমার হয়েছিলেন মুগ্ধ। পরিণামে শিল্পী শশিকুমার নির্বাচন করেছিলেন আর এক শিল্পী আর ডাবলিউ দেউস্করকে নিজের ভগিনীর স্বামী হিসেবে। এ বিয়ে নিজেই দিয়েছিলেন শশিকুমার। আর ডাবলিউ দেউস্কর এবং শশিকুমারের ভগিনী মুক্তকেশী দেবীর পুত্র সুকুমার দেউস্কর।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে সুকুমারের জন্ম। জন্মের কিছু পরে পিতামাতার সঙ্গে শিশু সুকুমারের হায়দ্রাবাদ প্রত্যাবর্তন।

সুকুমার দেউস্কর

হায়দ্রাবাদের সেণ্ট জর্জ গ্রামার স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে কৈশোরে সে এসেছিল শান্তিনিকেতনে। পিতামাতার নির্দেশে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে তার চারুকলা অনুশীলন।

কলাভবনের অনুশীলন শেষে সুকুমার প্রথমে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সে। সেখান থেকে যান জার্মানীর মিউনিকে। মিউনিকে তাঁর চারুকলা অনুশীলন প্রায় দু বছর। পরে প্যারিসেও ছিলেন এক বছর। সুকুমারের কর্মজীবনের সূচনা স্পেনের বার্সিলোনায়। বার্সিলোনায় পাকাপাকিভাবে শিল্পী জীবন শুরুর পর কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন ভারতে। এই সময়ে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধে তাঁর স্টুডিওটি হয় ক্ষতিগ্রস্ত ফলে তাঁর আর ফিরে যাওয়া হয়নি বার্সিলোনায়। এ ঘটনা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়েই এঁকেছিলেন শরৎচন্দ্রের এই তৈলচিত্রটি।

পরবর্তী সময়ে হায়দরাবাদের স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন সুকুমার। অধ্যক্ষতার সময়ে ছাত্রদের সঙ্গে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশ গ্রহণের ফলে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে অকস্মাৎ হৃদরোগে তাঁর পরলোকগমন (২৫ অক্টোবর ১৯৫২)।

—কমল সরকার

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

দাম : ৮০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক— আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কোমল সোহাগ...
ঝুরঝুরে, ফুরফুরে পাউডার। কিম্বা নিরেট, ঠাসা সৌখিন কমপ্যাক্ট। এদের কোমল সোহাগ—আপনার মুখখানিতে ফুটিয়ে তোলে অনুজ্জ্বল জৌলুষের মৃদু আভা...জাগিয়ে রাখে নিখুঁত সুন্দর, স্বাভাবিক কপোল-রাগ...দীর্ঘ সময় ধরে...
ল্যাকমে
আল্ট্রা-সিল্ক ফেস পাউডার
আর কমপ্যাক্ট
সৌন্দর্য্য সাধনায়
ল্যাকমে
daCunha/LFP/2 E BEN

REGD. NO. WB|CC|184|74

আরও বেশী
কোকোর পুষ্টি

আরও বেশী
কোকোর স্বাদ

নতুন
বোর্নভিটা অধিক কোকোসহ!

অন্য যে-কোনো মল্ট-যুক্ত খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে বোর্নভিটায় সবসময়েই কোকো বেশী ছিল। এখন বোর্নভিটায় আরও বেশী কোকো থাকায় বোর্নভিটা আরও অনেক বেশী পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

বোর্নভিটার কোকো রক্ত গ'ড়ে-তোলার আয়রণে সমৃদ্ধ, এছাড়াও এতে আছে ভিটামিন বি এবং ডি আর ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মত খনিজ পদার্থ। শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।

আপনার বাচ্চাদের বোর্নভিটা রোজই খাওয়ান, দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত বয়সে মূল্যবান যে-সব পুষ্টিগুণ দরকার—বোর্নভিটা সে-সব যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার...ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে!

৭৫ পয়সা বাঁচান

বোর্নভিটা আপনি ৪৫০ গ্রাঃ রিফিল-প্যাকেও পাবেন, যা'তে আপনার বাঁচবে ৭৫ পয়সা! বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক থেকে সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার এক টিনে ঢেলে রাখবেন।
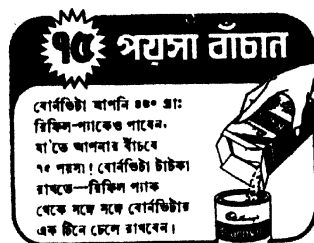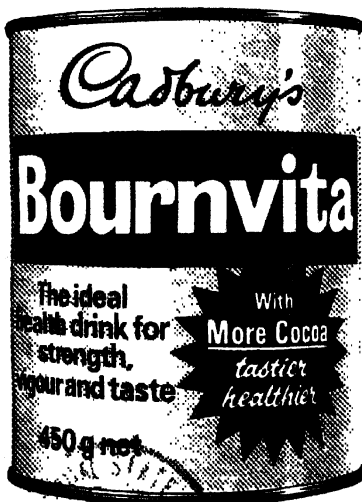
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
অধিক কোকো,
অধিক শক্তি, অধিক স্বাদ

OSM-6714 BEN.

কতশত রং
কতশত ডিজাইন
অপূর্ব মদুরার
কাপড়
এ পর্যন্ত কোথাও কেউ এত রকমের কাপড় দিতে পারে নি।
মদুরা কোট্‌স
175 BEN

for the ultimate in stereo music
Solid State Stereo
COSMIC CO-60
DELUXE MK-II
STEREO AMPLIFIER
YOU KNOW THE NAME, NOW KNOW THE SOUND.
Distributors: COSMIC ELECTRONICS Andheri, Bombay 400 093.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিচিতি : (বোর্ডে আঁকা তৈলচিত্র ২৭" × ১৮") এ'র কাজে সর্বদা একটা যন্ত্রণার ভাব ফুটে ওঠে। ইনি অবলা জীবদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করতে ভালবাসেন। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি-রূপেই এরা আসে। হাড় জিরজিরে ঘোড়া নীল সাদা ও অন্যান্য হাল্কা ও গাঢ় রঙের পটভূমিতে জীবনের এক গূঢ় সমাচার নিয়ে হাজির। শিল্পীর এই ব্যথাবোধের সঙ্গে সহজেই আমরা একাত্ম হতে পারি।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা
শনিবার ৯ আশ্বিন ১৩৮৩

উৎসবের সৌষ্ঠব

জাতির সাংস্কৃতিক আচরণের বিশেষ একটি প্রকাশ, উৎসব। সুতরাং, এমন সিদ্ধান্ত করলে কোন ভুল হবে না যে, উৎসবের সৌষ্ঠব বস্তুত জাতির সাংস্কৃতিক জীবন ও অভিরুচির সৌষ্ঠব প্রতিফলিত করে। এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে আমাদের জাতীয় জীবনের কয়েকটি উৎসবের রীতি-নীতির পরিমাপ করতে পারা যায়। যথা, দুর্গাপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসব। পূজার শাস্ত্রীয় রীতি-নীতির বিচার করবার দরকার হয় না। তবু এই সত্য মানতে হয় যে, শাস্ত্র ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে পূজার আনুষ্ঠানিক রূপের ও প্রকারের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে, রাখা উচিত। এক্ষেত্রে অভিনবত্বের কোন প্রশ্রয় থাকতে পারে না। প্রতিমার নির্মাণ থেকে শুরু করে পূজার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি পর্যন্ত সব বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধির মর্যাদা বিসর্জন করবার মতো কোন নতুন চমৎকারিতার প্রবেশ অনুমোদিত হতে পারে না। কিংবা শাস্ত্রানুমোদিত রীতি নীতির কাটছাঁট করে পূজার আনুষ্ঠানিক রূপ একেবারে সংক্ষিপ্ত করে দেবার ধর্মসম্মত অধিকার কোন উদ্যোক্তা কমিটির নেই। দুঃখের বিষয়, এবং পরিতাপেরও বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্মীদের হুল্লা-প্রবণ উৎসাহের আতিশয্যে পূজার শাস্ত্র-সম্মত এবং ঐতিহ্যের অনুগত সৌকর্য ব্যাহত হয়।

বিশেষ চিন্তার বিষয় হলো পূজার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যবিধ নানা কর্মতৎপরতার রীতি-নীতি এবং উৎসবের প্রকৃতি। এক্ষেত্রে পূজার আসন্নতার কালে অনেকের মনে যে উদ্বেগের আলোড়ন জেগে ওঠে, সেটা প্রত্যক্ষভাবে জনজীবনের সাংস্কৃতিক পরিণামের ভাল-মন্দ সম্পর্কে দুর্ভাবনা-ময় একটি জিজ্ঞাসার প্রকাশ। এই উৎসব কি সমুচিত সৌষ্ঠবে শোভান্বিত হয়ে জনজীবনের যথার্থ ও প্রকৃত সাংস্কৃতিক আগ্রহ পরিতৃপ্ত করতে সাহায্য করে? প্রথম দুর্ভাবনার বিষয় হলো, পূজার অনুষ্ঠান ও উৎসবের জন্য উদ্যোক্তা সমিতি ও সঙ্ঘগুলির পক্ষ থেকে চাঁদা সংগ্রহের প্রয়াস স্বীকার করতে হয়; এই ব্যাপারে যথোচিত সৌজন্য শিষ্টতা ও সংযম রক্ষা করবার মতো অভ্যস্ত উদ্যোগের অভাব নেই। কিন্তু তাদেরও সংখ্যা-প্রাবল্যের অভাব নেই, যারা পূজার চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারটিকে বস্তুত স্বার্থ সংগ্রহের একটা উপায় এবং সুযোগের ব্যাপার বলে মনে করে। পুলিস কর্তৃপক্ষ যদি এই সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিষেধের জন্য কঠোর বিধি-নিষেধ কার্যায়িত না করেন তবে উৎসবের কোন সাংস্কৃতিক সার্থকতা ও মর্যাদা থাকবে না। উৎসব বস্তুত সামাজিক শান্তির ব্যাঘাত এবং সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবের উপর বাৎসরিক নিপীড়নের অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। পথ অবরোধ করে পূজাস্থলীর নির্মাণ একটি অনাচার, যেটা শহরের অনেক পল্লীর স্থানীয় নিরাপত্তার পরিবেশ খুবই বিকৃত করে থাকে। স্থানীয় উৎসবের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের কাছে বৃহৎ জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকারের সীমা বিকৃত কিংবা খন্ডিত করে দেবার অধিকার, কোন যুক্তিতে স্বীকৃত হতে পারে না। কলকাতা শহর এবং শহরতলির অনেক পল্লীতে না হোক, অলি-গলিতে সঙ্কীর্ণ বেশ-কিছু সংখ্যক স্থানে পথ অবরোধ করে পূজামন্ডপের স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়। দৃশ্যটা এই শোচনীয় সত্যেরই প্রমাণ যে, পূজার নামে ও প্রয়োজনে অনাচার ও অবৈধ কাজ করবার শোচনীয় এক মনোবৃত্তি জনজীবনের ভিতরে থেকেই পরিপুষ্ট হয়েছে ও হয়ে চলেছে। অন্য অনেক ক্ষেত্রেও দেখা যায়, জন-জীবনের সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠব যেন নিরেট অপরুচির উত্তেজিত চঞ্চলতার কাছে পরাভূত হয়ে শান্তি ও সৌন্দর্যের ভয় বাড়িয়েই চলেছে। যথা : শবযাত্রার দৃশ্য। অন্ত্যেষ্টির আনুষ্ঠানিক রূপ শান্ত ও গম্ভীর হবে। এক্ষেত্রে শবযাত্রা বস্তুত শান্ত এক শোভাযাত্রার রূপ গ্রহণ করবে, এটাই সভ্যজীবনের সাংস্কৃতিক আশা ও দাবি। কিন্তু হরিধ্বনির মর্যাদাকে উৎকট চিৎকারে আহত করে, চটুল একটা মত্ততার মতো যে ছুটন্ত শবযাত্রার দৃশ্য দেখা যায়, সেটা মৃতের প্রতি এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবেরও প্রতি একটি অসম্মান।

পূজাকালীন উৎসবের মধ্যে যদি নানা রূপের ও নানা প্রকৃতির ভয় উপদ্রব অশান্তি এবং বিপত্তির সমারোহ থাকে, তবে উৎসব নিশ্চয়ই সাংস্কৃতিক হানির হেতু হয়ে দাঁড়ায়। আর আছে, একটি দানবিক প্রকৃতির অনাচার, মাইক তথা লাউড-স্পীকারের উচ্চকিত কোলাহল। পুলিস কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সামাজিক জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বনিয়াদের কিছু পরিচয়ের তথ্য জানেন। কর্কশ কোলাহল, উচ্চকিত শ্রুতিপীড়ক শব্দ, ব্যক্তির স্নায়বিক স্বাস্থ্যের অপঘাতক। কল-কাতার পুলিস কমিশনারের প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তির সুস্পষ্ট ভাষার অনুযায়ী এটাই ধারণা করতে হয় যে, শহরে (এবং শহরতলিতে) লাউড-স্পীকারের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'নিষিদ্ধ' কথাটির সম্যক্ ও প্রত্যক্ষ তাৎপর্য নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওই নিষেধের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা প্রদর্শিত করে শহর ও শহরতলির এখানে-ওখানে লাউড-স্পীকারের সাঙ্গীতিক চিৎকারের করাল শব্দ ধ্বনিত হয়ে চলেছে। স্থানীয় জনজীবনের অভিযোগ যদি অন্বেষণ করা হয়, তবে পুলিস কর্তৃপক্ষ বুঝবেন যে, লাউড-স্পীকার সাংস্কৃতিক জীবনের সৌষ্ঠব রক্ষার সহায়ক না হয়ে বস্তুত শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ছাত্রের অধ্যয়ন, গবেষকের তথ্যানুশীলন, বিজ্ঞানীর নিরীক্ষার কাজ, শিল্পীর কল্পনা ও সাহিত্য-চিন্তকের ভাবনা: সব সাংস্কৃ-তিক কর্তব্যের প্রতিষ্ঠাই যেন লাউড-স্পীকার নামধেয় ওই যন্ত্রটির নির্ঘোষের আঘাতে বধির হয়ে যায়। বুঝতে পারা যায় না, দেশের সরকার কেন পরিণামের সঙ্কেত বুঝেও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার জন্য লাউড-স্পীকারকে সার্থক প্রকারে নিষিদ্ধ করে দিচ্ছেন না। ঐতিহাসিকের মন্তব্যে অভিযোগ শোনা যায়, গ্রীসের জীবনে একদিন কদর্য উৎসবের প্রবলতায় সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবের অবনমন ঘটেছিল। কদর্য উৎসবের চেয়ে বিনা উৎসবের পরিবেশ জাতির সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠবের পক্ষে কল্যাণকর।

বৈদেশিকী

অনন্য

ইতিহাসের যাঁরা মোড় ঘুরিয়েছেন সেই বিরল ক্ষণজন্মাদের একজন মাও সে-তুং। সে ইতিহাস কেবল চীনের নয়, তামাম দুনিয়ার। তাঁর কর্মক্ষেত্র অবিশ্যি ছিল চীন। রুশিয়া ছাড়া দেশের বাইরে তিনি কোথাও যাননি পর্যন্ত। তবুও গোটা পৃথিবীতে যেখানেই ক্ষেতে-খামারে কলে-কারখানায় কাছারিতে-দপ্তরে সমাজের নিচের তলার মানুষেরা বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সেখানেই শোনা যায় তাঁর নাম। মার্কসের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে নতুন রাষ্ট্র আর সমাজ গড়ে তুলেছিলেন রুশিয়াতে লেনিন। ওই একই কাজ করেছেন চীনে মাও সে-তুং। তবে তাঁর কাজের ধারা ছিল আলাদা। লেনিন রুশিয়াতে যে সর্বহারাদের রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন তারা হলো মজুর, চাষীরা অবিশ্যি তাদের সামিল হয়েছে। মাও সে-তুংয়ের চীনে সর্বহারা হচ্ছে চাষীরা। তাই বলে সেখানে মজুররা বরবাদ হয়ে যায়নি, তবে মুখ্য ভূমিকা রাষ্ট্রীয় সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিপ্লবে তাদের নয়, চাষীদের।

প্রথম যখন মাও সে-তুং চীনকে সাম্যবাদে দীক্ষা দেন তখন পশ্চিমীরা তাঁর বিপ্লবের সত্যিকারের রূপটা ধরতে পারেনি। তারা ভেবেছিল তিনি চান কৃষি সংস্কার — চীনের চাষীদের আধুনিক চাষের কায়দা-কানুন শিখিয়ে তাদের অবস্থা ফেরানোই তাঁর লক্ষ্য। জমির স্বত্বস্বামিত্ব চাষীদের ওপর বর্তালেই তিনি খুশী হবেন আর তার জন্যে আইনের হেরফেরই যথেষ্ট। এও তারা ধরে নিয়েছিল রুশী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তিনি ভিড়েছেন তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে। চিরদিন তিনি রুশী কম্যুনিস্ট চাঁইদের হাত-ধরা হয়ে থাকবেন এই ছিল পশ্চিমীদের ধারণা। গোড়ায় গোড়ায় রুশীদেরও। মাও সে-তুংকে স্ট্যালিন বলেছিলেন চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে মিটমাট করে মিলে-মিশে চলতে। মাও-এর শিরদাঁড়াটা যে সোজা আর শক্ত তা স্ট্যালিনও ধরতে পারেননি।

মাও জন্মেছিলেন সম্পন্ন চাষী পরিবারে। কিন্তু ছেলেবেলাটা তাঁর সুখে কাটেনি। বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না —তাঁর সম্বন্ধ ছিল মার সঙ্গে। তাঁর মেজাজী বাবা মার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করেননি। ছেলে প্রশ্রয় পেয়েছে মার কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে নয়। পড়াশুনো তিনি করেন হুনান প্রদেশের রাজধানী চাংশায়। ও সময়ই তিনি জড়িয়ে পড়েন ছাত্র আন্দোলনে। রাজনীতিতে সেই তাঁর হাতেখড়ি। প্রগতিবাদী ভাবধারার সঙ্গে সেই তাঁর পরিচয়। ক্রমেই সে পরিচয় গাঢ় হয়ে ওঠে। সাম্যবাদের মূল সূত্রগুলি তিনি আয়ত্ত করে ফেললেন। ১৯২১ সনে যখন চীনে কম্যুনিস্ট দলের পত্তন হলো তখন তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মাও সে-তুং। চিয়াং কাইশেকের আমলে তাঁর হাতে মার খেয়ে শহর ছেড়ে কম্যুনিস্টরা ডেরা বাঁধলে গাঁয়ে গঞ্জে। মাও সে-তুং তাদের নিয়ে গড়লেন গেরিলা বাহিনী। ১৯৩৪ সনে প্রচণ্ড সরকারী আঘাত সহ্য করে ৩০০০ মাইল হেঁটে তারা এসে পৌঁছুলো উত্তরে সেনসি প্রদেশে। এই লং মার্চের নেতা ছিলেন মাও সে-তুং নিজে।

জাপানীদের রুখতে কুয়োমিণ্টাংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কম্যুনিস্টরা। সেই সুযোগে মাও সে-তুং নতুন করে গড়ে

তুলেছিলেন লাল ফৌজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন জাপানীদের কবল থেকে মুক্তি পেলো চীন, কিন্তু শুরু হলো ঘরোয়া লড়াই। চিয়াং কাইশেক বলতে গেলে নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছিলেন। ঘুষখোর আমলা আর মুনাফাবাজ ব্যবসাদারেরা মিলে দেশটাকে উচ্ছন্নের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। অকর্মণ্য প্রশাসনের খপ্পর থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দেশে কম্যুনিস্ট শাসন কায়েম করলেন মাও সে-তুং ১৯৪৯ সনে। পত্তন হলো শুধু নতুন শাসন নয় নতুন সমাজ। প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই, সমাজ গড়ার ভার মাও সে-তুং নিজে। চীনের সংহতি সেই থেকে অটুট আছে, তা ক্রমশ জোরদারও হয়েছে। কিন্তু নতুন সমাজ গড়ার কাজ সহজ হয়নি। অনেক বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে দেশকে। অনেক পরীক্ষাই মাওয়ের ব্যর্থ হয়েছে। যে বিরাট লাফ দিয়ে দুস্তর বৈষয়িক অবনতির সাগর তিনি পার হতে চেয়েছিলেন তা সফল হয়নি। সফল হয়নি সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজের কাঠামো বদলাবার প্রচেষ্টা।

তবুও মাও যা করেছেন ইতিহাসে তার নজির নেই। বাইরের সাহায্য তিনি পাননি বললেই চলে। গোড়ায় গোড়ায় রুশীরা তাঁকে মদত দিয়েছিল, কিন্তু তারা হাত গোটালো যখন তাদের মাতব্বরি তিনি মানতে চাইলেন না। ক্রুশ্চফের পর থেকেই রুশী কম্যুনিস্টরা বিপথে গেছে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাই তাদের সঙ্গে আপস করতে রাজী হননি—রুশীরা সব সাহায্য বন্ধ করে দিলেও নয়। ১৯৬০ থেকে রুশ-চীন সম্পর্কে যে চিড় খেয়েছে তা আর জোড়া লাগেনি। তাতে চীনের অসুবিধে হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার এগিয়ে যাওয়া রোখা যায়নি। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত চীনকে তিনি একতার সূত্রে বেঁধে তাকে দুনিয়ার মহাশক্তির পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন। যে আমেরিকা পণ করেছিল প্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বনাশ করবে, যেচে সে এসে তার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। ইতিহাসে এমন অঘটন খুব কমই ঘটেছে। পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে মাও সে-তুং প্রমাণ করেছেন চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। সবচেয়ে বড় কথা চীনের মানুষদের হারানো আত্মমর্যাদাজ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছেন।

কথা উঠেছে মাও সে-তুংয়ের শূন্য আসনে কে বসবেন? এ নিয়ে তামাম দুনিয়ায় জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। যাঁরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা ভুলে গেছেন মাও সে-তুংয়ের কোনও গদি ছিল না। তিনি না ছিলেন রাষ্ট্রপতি, না ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, ছিলেন শুধু দলের প্রধান। কোনও সরকারী পদ তো খালি হয়নি তিনি মারা যাওয়াতে যে সে পদে বসার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। তিনি ছিলেন নয়া চীনের প্রাণপুরুষ, শক্তির আধার, প্রেরণার উৎস। তাঁর জায়গায় কে আর বসবে? সে ব্যক্তিত্ব, প্রভাব আর প্রতিভা কার আছে? তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্য সৃষ্টি হয়েছে মহাচীনের রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডলে তা শূন্যই থাকবে, কোনো দিনই ভরাট হবে না। তাঁর উত্তরাধিকারী চীনে কেউ নেই, কেউ হতে পারে না। এক হিসেবে গোটা দেশটাই তাঁর উত্তরসাধক। পথ তিনি দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সে পথ ধরে চলবার দায়িত্ব চীনের আশী কোটি সন্তানের। সে দায়িত্ব তারা পালন করতে পারবে কি না—এ জিজ্ঞাসার উত্তর জানেন একমাত্র মহাকাল।

দেবরাজ

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে"
সঞ্চয় ও ভবিষ্যত নিরাপত্তাবোধ
আপনার ও পরিজনবর্গের জীবনে
এই আনন্দের ধারা
জীবনভর অব্যাহত রাখিবে
উৎসব মুখরিত
শারদীয়ার
শুভেচ্ছার সঙ্গে
এই কামনা জানাই
আশ্বিন ১৩৮৩
বি, কে, রায়
সেক্রেটারী
দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ
(পূর্বতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ)
(স্থাপিত ১৯৩২)
রেজিস্টার্ড অফিস :
পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৬৯
PRASA

এক নজরে

রাজপথের রোমিও

অরু অর্থাৎ অরিন্দম ছিল মিত্র স্কুলে বড় খোকার সহপাঠী। সেই সুবাদে সে আমাদের বাড়ি আসত। ছোটদের সঙ্গে লুডো আর ক্যারম খেলত। ছাদে জাল খাটিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলত। তার বাবা রামদুর্লভবাবুর সঙ্গেও পরিচয় ছিল। স্থানীয় একটি বালিকা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াতেন তিনি। তাছাড়া পাড়াঘরে করাতেন পুরোহিতের কাজ। সেকেলে ধাঁচের বামুন-পণ্ডিত মানুষ, যদিও অরুর সাজসজ্জা এবং চলন বলন ছিল আর দশটা ছেলের মতই।

তখন আমরা মধু রায়ের গলিতে থাকি। ওরা ছিল প্রতিবেশী এবং থাকত খানতিনেক বাড়ির পরেই। তারপর কলকাতিয়া সম্পর্কের যা হয়, আমরা অন্য পাড়ায় উঠে গেছি, ঘনিষ্ঠতাও শেষ হয়েছে। হঠাৎ একদিন সকালে এক তরুণ ও তার পিছন পিছন এক তরুণী এসে হাজির হল আমার বাইরের ঘরে। ঢুকেই প্রণাম করে ছেলেটি বলল, আমাকে চিনতে পারছেন মেসোমশাই, আমি অরু, অরিন্দম ভটচার্যি। চিনলাম, যদিও চেহারায় চেনার উপায় নেই। থাকবে কি? ইতিমধ্যে দশ এগার বছর পার হয়ে গেছে যে হুহু করে। অরু বলল, বোধহয় জানেন না মেসোমশাই, এখন আমি কবিতা লিখি। বললাম, বেশ বেশ, তা কিসে লিখিস? জবাব দিল মেয়েটি, কেন, দেখেননি? হুইসিল, তিন্তিড়ি, খধপ, এল ঢল, সমস্ত আধুনিক কাগজেই ত লেখে ও।

আস্তে ব্যস্তে অরু বলল, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওর নাম অঞ্জলি পুরকায়স্থ, য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে আমার সঙ্গে। ও-ও কবি। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা গ্রেপ্তার হয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল এবং চা ও জলযোগান্তে আর এক দফা প্রণাম করে যখন বিদায় নিল, বাড়ির কর্ত্রী বললেন, চমৎকার মেয়েটি। দিব্যি মানাবে দুজনে। নিঃশব্দে একবার তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, ভাবসাব হয়েছে আর কি! তা বাপু, মন্দই বা কি? এখন ত হয়েছেই এসব। অবশ্য পড়াশোনা করছে না অরুটা। বড় খোকার সঙ্গে ত পড়ত। সে দেখ, কবেই প্রফেসার হয়ে গেছে, আর ও এখনো সেই এম-এ ক্লাসেই ঘসটাচ্ছে। তবে হ্যাঁ রোজগার করে ভাল। মেয়েটিই বলল, কবিতা লিখে, গল্প লিখে নাকি তিনচারশো টাকা করে আনে। আর একবার তাকালাম তাঁর দিকে। কারণ ও মুদ্রুকটা অচেনা নয় আমার।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম, রামদুর্লভ ভট্টাচার্যের কথা। ভদ্রলোক এতই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে কোনদিন আমাদের বাড়ি এক কাপ চা পর্যন্ত খাননি। রোজ ভোরে উঠে যেতেন গঙ্গাস্নানে, ফোঁটা তিলকে সজ্জিত হয়ে ফিরতেন মন্ত্র বলতে বলতে। কথা প্রসঙ্গে জানাতেন, ছেলেকেও তিনি সংস্কৃতের স্কলারই করবেন। কিন্তু ছেলে তাঁর স্বপ্ন নিষ্ফল করে দিয়ে পড়ছে ইকনমিক্স নিয়ে এবং অসবর্ণ বিবাহের জমি তৈরি করে রেখেছে, রোজগার শুরু করার আগেই। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ অবশ্য কালের ধর্ম, সব পরিবারেই কমবেশী তার পদচিহ্ন পড়েছে। পড়েছে এবং আরো পড়বে সব সংসারেই। এ নিয়ে ক্ষোভ করার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে চলে গেছে বছর তিন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে একদিন বিকেল নাগাদ একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে নূতন বই দেখছি, হঠাৎ দেখি অরু একটি শ্যামলা মেয়ের সঙ্গে আইসক্রিম খেতে খেতে একেবারে সোজা আমার মুখোমুখি এসে পড়ল। ওর কুণ্ঠিত ভাব দেখে আমিই আগে কথা বললাম। বললাম, কিরে অরু, কেমন আছিস? লিখছিস টিখছিস ত? অরু বলল, লিখছি মেসোমশাই, দুতিন খানা বইও জমে গেছে, কিন্তু প্রকাশক পাচ্ছি না। সঙ্গের মেয়েটিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বলল, অনীতা বোস, প্লেব্যাক গাইয়ে। তা ছাড়া এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজি নিয়ে রিসার্চ করছেন। বোকার মত বলে ফেললাম, তোমার নাম অঞ্জলি বলেছিলে না? তা এতদিনেও তোমাদের বিয়ে হয়নি! মেয়েটি হিহি করে হেসে বলল, অঞ্জলি নয়, অঞ্জলি নয়, আমার নাম অনীতাই। অঞ্জলি ছিল ওর প্রথম, শ্রীলা দ্বিতীয়, সুনীপা তৃতীয়...আমি বললাম, তুমি চতুর্থ। বেশ, তুমিই ফাইনাল হও। তা ত হবই, মেয়েটি বলল, আটকে আছে শুধু দুজনের পরীক্ষার জন্যে।

অর্থাৎ আজও অরুর এম-এ পরীক্ষা শেষ হয়নি এবং এটি হল তার আর একটি সহপাঠিনী। বোধহয় ওরা অপেক্ষা করছিল সিনেমা হাউসের দরজা খোলার জন্যে। টাইম হতেই আসি মেসোমশাই বলে ফাঁকতালে সরে পড়ল দুজনে। আমিও স্বস্তি পেলাম যেন ওরা সরে যেতে। বুঝলাম সুন্দর চেহারাটা ভাঙিয়ে পেশাদার প্রেমিক হয়েছে অরু। কিন্তু চলছে কি করে তার? বাবা ত ছিলেন গরীব পুরোহিত। বিষয় সম্পত্তি ত কিছু রেখে যাননি। নিজেও ও একটি কুটো পয়সা রোজগার করে না, অনন্তকাল ধরে খালি বিশ্ববিদ্যালয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে। তাহলে? মনটা কেমন কেমন করতে লাগল যেন! বাড়ি এসে বললাম ওর কথাটা। শুনে অরুর মা আমাদির জন্যেই চোখের জল ফেললেন।

মাস চারের পরে একদিন দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে একখানা গোয়েন্দা নভেল পড়ছি, এমন সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা হন হন করে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে সেই অনীতা। উঠে বসে দুজনকে দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললাম। যদিও না বলে কয়ে একেবারে শোবার ঘরে চড়াও হওয়ার জন্যে মনে মনে চটলামই একটু। মহিলা বললেন, বড় বিপদে পড়েই অসময়ে এমন হামলা করেছি আপনার ঘরে। আমায় আপনি রক্ষা করুন সুদর্শনবাবু। তাঁর পরবর্তী বক্তব্যের জন্যে প্রতীক্ষা করছি, ইতিমধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অনীতা। সে বলল, অরিন্দম আমাকে ডুবিয়ে গেছে মেসোমশাই। এখন আমার মরা ছাড়া রাস্তা নেই! বুঝতে না পেরে বললাম, কেন কি হয়েছে? বাড়ির কর্ত্রী সোয়েটার বুনছিলেন, ঝংকার দিয়ে বললেন, কিছুই কি ছাই বোঝ না দুনিয়ার! বলা বাহুল্য এবার বুঝলাম। বললাম, তা কোথায় এখন সেই পাজিটা? অনীতা বলল, সে জেলে। মিসায় আটক হয়েছে। সে একটা স্মাগলার, জাহাজীদের সঙ্গে মিশে চোরাই ব্যবসা করত।

এরকম লোকের সঙ্গে মিশতে কোন ভরসায়, জিজ্ঞাসা করলেন বড় খোকার মা। প্রৌঢ়া বললেন, জানত কি? ও বলত দেশে মস্ত সম্পত্তি আছে, কলকাতায় বাড়ি আছে, দুদিন বাদে বিলেত যাবে। সব বিশ্বাস করেছে। ছেলেমানুষ ত! কতটুকু আর চেনে বোঝে পৃথিবীকে? গৃহকর্ত্রী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, না বাঁচিয়ে বাজিয়ে, আরো পাঁচ সাতটা মেয়ে আগে পার হয়ে গেছে জেনেও ঝাঁপ দেয় যারা, তাদের খুব নিষ্পাপ বলে ত মনে হয় না! তারপরে সঙ্গের মহিলা বললেন, আপনি ত সবই বুঝছেন সুদর্শনবাবু, বাচ্চা মেয়েটার কথা ভেবেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন। কি ব্যবস্থা করব আমি? সমাজের ওপর তলা নীচুতলা সব জায়গায় আজ ওঁৎ পেতে আছে ছদ্মবেশী সরীসৃপরা। তাদের প্ররোচনায় কত জ্ঞানহীন অনীতাই ত এই রকম অন্ধ গলির বন্ধ দুয়োরে মাথা কুটে মরছে! তাদের হাত ধরে জোর করে আনব আমি, নিরুপায় কলমজীবী, বলুন ত কোন কৌশলে?

সুদর্শন গুপ্ত

আলোকচিত্র : মোনা চৌধুরী

'যেদিন আমি থাকব না কো থাকবে আমার গান,
বলবে সবাই, 'কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা
সখার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে।'

নজরুল ইসলাম

মানুষ নজরুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

...মার কাছে কবি নজরুলের চেয়ে নজরুল অনেক বড়ো। একই দেশে ...র বাড়ি, একই জল-হাওয়ায় আমরা ...হয়েছি, নজরুল আমার সহপাঠী, ...ধু। তাকে যখন আমি ভালবেসে-..., অনেক বন্ধুর মাঝখান থেকে আমরা ...একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, ... আমরা কেউ সাহিত্যের ধারও ...র না।

...আমি সেই নজরুলকে চিনি যে নজরুল ... গ্রামের বাবুদের বাড়ি বাসন্তী ...র সময় ভাঙা প্রাচীরের উপর বসে ...ন শুনছে, যে-নজরুল 'লেটো'র দলে ...ঢোলক বাজাচ্ছে, যে-নজরুল সুর করে ...ণ-মহাভারত পড়ছে।

...যখানে সাধু-সন্ন্যাসী নাঙ্গা ফকির— ...নেই নজরুল! শুনেছে শিয়ারশোলের ...-বাগানের কাছে একটা গাছের তলায় ...ন ফকির বসে আছে। আমাকে ডাকতে ...।—চল দেখে আসি।

...গয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।

ওদিকে তখন পশ্চিম-আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো। দুজনে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছি। ওদিকটা ছিল তখন জনহীন বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। কাঁকর পাথরে হাঁটুর কাছে খানিকটা চামড়া ছড়ে গেলো, খানিকটা রক্তও পড়লো। নজরুল তার নিজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরলো জায়গাটা। তার কাপড়টা রক্তে ভিজে গেলো। বললাম, 'এ কি করলে?'

'ও কিছু না। সাবান দিলেই উঠে যাবে।'

সেদিক দিয়ে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। সে আমাকে তক্ষুনি সুস্থ করে তুলতে চায়। বললে, 'হাঁটতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারবো, চলো।'

ঝড়ের বেগ থেমে এসেছে। আমাদের আর দৌড়তে হচ্ছে না।

নজরুল বললে, 'আমি একবার গাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একবার—এই দেখো, সাইকেল চড়া অভ্যেস করতে গিয়ে সাইকেলের চেনে কেটে গিয়েছিলো অনেকখানি।'

এ-সব কথার অবতারণা—আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি।

রাণীগঞ্জে তখন ওষুধের দোকান বলে কিছু ছিলো না। ডাক্তারের কাছেই ওষুধ পাওয়া যেতো। সাধনের দাদা সবে ডাক্তারী পাস করে এসেছে। রাস্তার ধারেই সাধনের বাড়ি। নজরুল দাঁড়ালো সেইখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি হবে?'

সামনের ঘরেই বসেছিলো সাধনের দাদা। সে তখন আমাদের দেখতে পেয়েছে।—'এই যে মাণিকজোড়! বাঃ, বেশ মানিয়েছে দুটিকে। একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। আর-একটি কোথায়? সেই ক্রিশ্চান ছেলেটি? শৈলেন!'

নজরুলকে কথা বলার অবসরই দিচ্ছে না। ডাক্তার ভেবেছিলো আমরা সাধনকে খুঁজছি। বললে, 'সাধন বাজারে গেছে।'

নজরুল বললে, 'একটু টিনচার আইডিন দেবেন?'

'কি হবে?'

নজরুল আমার পা-টা দেখিয়ে দিলে।

ডাক্তার রসিকতা আরম্ভ করলে—'গাছে উঠেছিলে বুঝি? তা বেশ হয়েছে। হাত-পা ভেঙে গেলেই ভালো হতো। টিনচার আইডিন লাগাতে হবে না। রাস্তার ধুলো খানিকটা ঘষে ঘষে ওখানে লাগিয়ে দাও—ভালো হয়ে যাবে।'

আমি তখন নজরুলের হাত ধরে টানছি।

ডাক্তার বললে, 'না ভাই, টিনচার আইডিন নেই আমার কাছে। এই তো সবে ডাক্তারী পাস করলাম। ডাক্তার হয়ে বসি, তখন ওষুধপত্র সবই পাবে।'

নজরুলকে রাস্তায় টেনে এনে বললাম, 'টিনচার আইডিন আছে আমাদের বাড়িতে।'

নজরুল বললে, 'গিয়েই লাগিয়ে নাওগে। আর-একটা খুব ভালো ওষুধ আমি জানি। কাল দেবো।'

'তাই দিও। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেরি হলে বকাবকি করবে। আমি পালাই।'

দুজনে খুব কাছাকাছি থাকি। নজরুল গেল তার শিয়ারশোল স্কুলের মোহমেডেন বোর্ডিং-এ। খড়ে ছাওয়া মাটির একখানি ছোট ঘর। পাঁচজন মুসলমান ছাত্রের খাবার-থাকবার জায়গা। আর আমি গেলাম আমার

SIMOES/RTU/D/1A

স্তানায়। রায়-সাহেবের প্রকাণ্ড লাল-ঠর নীচের তলার একখানা ঘরে।

পায়ে টিনচার আইডিন লাগালে ভালো তা। কিন্তু দোতলায় বাড়ির গিন্নির কাছে য়ে চাইতে হবে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ঠ গিয়েও নেমে এলাম। এই মেয়েটির য় আমাকে সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে কতে হয়। এইটি আমার জীবনে সবচেয়ে ড়া অভিশাপ। টিনচার আইডিন কেন ইছি বলতে হবে। হাঁটুর কাছে ছড়ে ওয়া জায়গাটা দেখাতে হবে। আছাড় য়েছি বললে সে বিশ্বাস করবে না। বিশ্রী কটা অপবাদ রটিয়ে সারা বাড়িতে একটা ই-চই না বাধিয়ে ছাড়বে না। যার একটা ধু মুসলমান আর একটা ক্রিশ্চান, সে খনও ভালো ছেলে হতে পারে না।

তার চেয়ে কাজ নেই টিনচার আইডিন গিয়ে।

একটা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসলাম।

খানিক পরেই দেখি নজরুল এসে ডাকো। তার দু-হাত ভর্তি অনেকগুলো মের পাতা। বলল, 'এইগুলো বেশ করে টে ওইখানে লাগিয়ে নাও। ব্যথা-বেদনা ছু থাকবে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে নিমপাতা াথায় পেলে?'

'নিমগাছ খুঁজতেই তো দেরি হয়ে ল। শেষে মনে পড়লো ক্রিশ্চানদের কবর-নার মুখে সেই বড় নিমগাছটার কথা।'

দিনের বেলাও সে নির্জন জায়গাটার কউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না, ভয়ে গা ছম্ ছম্ রে।

বললাম, 'এই অন্ধকারে তুমি ওই াছটায় উঠতে গেলে কেন? গাছটায় ভূত াছে।'

নজরুল বললে, 'তোমার মুণ্ডু আছে।'

এই বলে সে হাসতে হাসতে চলে গলো। জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলো আমি াইডিন লাগিয়েছি কি না।

ভালই হলো, আমি বেঁচে গেলাম। জজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না।

আবার না ফিরে আসে, তাই দোরের দকে তাকিয়ে রইলাম।

না, ফিরে সে এলো না। শুধু দেখলাম তার কাপড়ে আমার রক্তের দাগটা তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে।

এই নজরুল!

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ. স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ। মাথার চুল-গুলো কিছুতেই বাগ মানছে না।—এই যা দুঃখ। আমার মাথায় চুল খুব সুন্দর। কেমন করে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না। লোকে ভাবে, বুঝি মাথায় বড়ো বড়ো বাবরি চুল আমি শখ করে রেখেছি। কিন্তু তা নয়। চুল কাটবার পয়সা পাই না, এমন কি আঁচড়াবার একটা চিরুনি পর্যন্ত নেই।

নজরুল বলে, 'তোমার অমনি চুল কেমন করে হলো তাই বলো।'

আমরা তখন পনেরো-ষোলো বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দুজন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙা গাছ থেকে পেড়ে নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ-দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোট ছোট গল্প লেখে, আমাকে শোনায়। আমি কবিতা লিখি—নজরুলকে শোনাই। আর-কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না। শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে-মাঝে। শোনে আর ফিক ফিক করে হাসে। বলে, 'ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।'

আমাকে রাগায়। বলে 'ওই জন্যেই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না।'

নজরুলকে বলে, 'তুমি গদ্য লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি বলে রাখছি।'

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিলো আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, নজরুল লিখছে কবিতা।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিলো করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হলো সৈনিক-কবি।

তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। গান লিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বাড়ির আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদা-পরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগণ্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিন-জন। নজরুল, আমি আর শৈলেন।

আবার যেন আমরা সেই পুরোনো দি ফিরে যাই। এখানে কবি বলে নজরু আলাদা কোনও সম্মান নেই। সবাই এখা অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শাদ পুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা তখন ভালো রপ্ত হয়নি। আমাদের জন্মভূ সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত মাতৃভাষায় প্র খুলে কথা বলে আর হো হো করে হাসে

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে ত বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সে গানটি শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, 'যাক্, এতদিন প আমার কথাটা আমি withdraw ক নিলাম। তবে withdraw করবার দরক হতো না যদি না তোমাদের লেখা দু তোমরা পাল্টা-পাল্টি করে নিতে। তু যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবি লিখতো তাহলে তোমরা দুজনেই মরতে

আমি বললাম, 'নজরুল এখনই বেঁচে আছে কোথায়? সবাই হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে—গান গ কবিতা শোনাও। বাহবা দিচ্ছে, প্রশ করছে। কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আ জানি। যে গল্পগুলো ও লিখেছিলো তা কপিরাইট বেচার জন্যে বসে আছে। তা তো আফজল বলছে এককো টাকার বেশি দেবে না।'

এই কথাগুলো কেউ শোনে নজরু তা পছন্দ করে না। হে হে ক'রে হা আর অর্গ্যানের সুর তুলে আমার কথা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে।- 'হে হে ক'রে হাসছে দেখো। যারা দু পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মত খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পারো না?'

নজরুল বলে, 'তাদের কি বলবো আচ্ছা খোকা তো!'

'তাদের বলবে তুমি যাবে না, তোমার লিখতে হবে। টাকার দরকার। দুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে।

শৈলেন বললে, 'ও বলবে, তবে হয়েছে। টাকার কথা ও কখখনো কাউকে বলতে পারবে না। মাথার চুলের দুঃখ ছিলো ওর চিরকাল। এখন চুলগু বাগিয়েছে, কবি-কবি চেহারা হয়েছে ওইতেই খুশি।'

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশি

কেটে ফেলবো কিন্তু।'

নজরুলের খুব আপত্তি—'না না, কাটবে না।'

শৈলেন বলেছিলো, 'তা না হয় কাটবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা ক'রে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গি'য়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরী করিয়ে দেবো। তোমাকে বলছি, দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা কোরো না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।'

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো হো ক'রে হাসতো আর বলতো, 'আমি হবো না হবো না হবো না তাপস, যদি না পাই তপস্বিনী! মহাদেব হবো কেমন করে? পার্বতী কোথায় পাবো?'

শৈলেন বলতো, 'কাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘন-ঘন ডাক আসছে তোমার পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিলো শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভিতর থেকে স্বতঃ উৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধার অন্ন নয়, পার্থিব কোনো সম্পদ নয়, সুর-সুন্দরের কাছ থেকে সে আনন্দ তার আপনিই আসে। সেই আনন্দে সে দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকে।

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ সম!'

সেদিন তার খাবার সময় আমি তার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে; তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, 'খাবে?'

আমি বললাম, 'না।'

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের উপর কয়েক মুঠো ভাত, একটি প্লেটের উপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকচিতে রান্না হয়েছিলো সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে। তাতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না করে সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খাবে না? নেই তো কিছু।'

লোকটি বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

নজরুল ব'লে উঠলো,—'কেন, হোটেলে খাবে কেন?'

লোকটি বললে, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে!'

এতক্ষণে মনে পড়লো নজরুলের। বললে, 'ধেৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে? সে এসেছিলো আমার কাছে টাকা ধার করতে।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।'

'তাই বুঝি তাকে খাইয়ে বিদায় করলে?'

নজরুল বললে, 'না না, দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, দু'দিন ভাত খাইনি।'

বললাম, 'তাকেও তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠাতে পারতে?'

নজরুল বললে, 'দশ টাকার একটি নোট ছাড়া আমার কাছে কিছু ছিলো না যে! টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে আসতেও চায় না, থাকতেও চায় না। আমার সঙ্গে কী শত্রুতা যে আছে তাদের কে জানে।'

'সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি?'

নজরুল বললে, 'হু'। ভারি লজ্জা করছিলো। চেয়েছিলো একশো টাকা, দিলাম মাত্র দশটি টাকা।'

রাঁধুনী ছোকরাটি দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে বললাম, 'এখন ওকে কি দেবে দাও।'

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকালে আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোকরাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, 'টাকা আছে আমার কাছে।'

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো।—'এই দেখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে, আমার কাছে থাকে না।'

ছোকরাটি বললে, 'হোটেলে আমাকে খেতে হতো না, যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খ লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।'

নজরুল ধমক দিলে।—'ধেৎ, ও করে বলতে নেই। আমি ওর মুখ দে বুঝতে পেরেছিলাম বেচারার খুব f পেয়েছিলো। খেয়েছে বেশ করেছে।'

খাওয়া শেষ করে হাত-কাটা ফতু উপর বাসন্তী রঙের চাদরটি গায়ে f

পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে
ল নজরুল, আমাকে বললে, 'চলো,
াকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

বললাম, 'খুব হয়েছে। তুমি যাবে
ম্মে, আমি যাবো পরে।'

নজরুল বললে, 'গাড়ী এনেছো তো!
রকার।'

মোটরকার এলে আর রক্ষে নেই।
ানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পারো।
পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল এই
রে চড়ার শখটা তার গেলো না
ুতেই। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে
ন্নমে নিয়ে যায় তো ও তক্ষুনি যেতে
ী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকেলে শৈলেন-
বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে বসে গল্প
ছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্তদন্ত
। নজরুল ঢুকলো। আমাদের কাছে হাত
ে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে
ক্স দাঁড়িয়ে আছে।'

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া
চ্ছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেটে
লো মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি
ইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে,
কা আনছি, তুমি দাঁড়াও।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন
লে, 'এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার
লাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও
। তোমার গলায় গামছা দিয়ে আমি
দায় করবো।'

তার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে
সতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের
য়গায়। মানে অর্গানের সামনে। বললে,
মি তো খৃস্টান ছিলে, হিন্দু হলে
বে?'

শৈলেন বললে, 'হয়েছি তোমার
ন্যে।'

'তা বেশ করেছো। সেই রাণীগঞ্জ
কে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার
ছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাতত
'পেয়ালা চা দাও।'

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'দু'পেয়ালা
ন?'

নজরুল বললে, 'লাখ পেয়ালা চা না
খলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে
ামার এখনও দু'পেয়ালা বাকি আছে।'

শৈলেন বলেছিলো, 'লাখ পেয়ালা চা
খয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না,
কন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো
নর্ঘাত মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সে
থা আমি হলফ করে বলতে পারি।'

আমাদের দুর্ভাগ্য, শৈলেন অনেক-
দন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।
জরুল আজ [illegible] মধ্যে। সারা-
ীবনে সে মদ্যপান দূরের কথা, ধূমপান
র্যন্ত [illegible] না। [illegible] সে মাইকেল

হলো কিনা শৈলেন দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা ক'জনে হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা ক'জন পায়?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সবজন-শ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

একদিকে জীবন-দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর অপরিমাণ যন্ত্রণা।

কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক—অনেক বড়। শিশুর মতো সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহংকার, এমন অজাতশত্রু, হৃদয়বান এবং আনন্দময় পুরুষ এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন একদিন হাসি-রহস্য করে বলেছিলো 'তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে বোম বোম করে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটা মনে পড়ছে। বলেছিলো 'সমুদ্র মন্থনের অমৃতটুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।'

তাই হয়েছে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে। নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতো চুপ করে বসে আছে।

'নজরুল স্মৃতি' পুস্তক থেকে গৃহীত।

কালের নির্মমতায় ২৯শে অগস্ট
৭৬ নজরুল-কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে
।। নিদারুণ ব্যাধি-ক্লিষ্ট কবির কণ্ঠ
শ্য বহু বছর আগেই রুদ্ধ হয়ে
য়ছিল। কবির অনুরাগীবৃন্দের বহু
াশা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সেই যুগান্তকারী
তাগুলি বা তাঁর নিজস্ব অনন্য ভঙ্গীতে
চিত অজস্র গানের একটি ছেঁড়া কলি
। মুখে শোনার কোনও উপায় ছিল না।
র সেই যৌবনের দিনগুলির দিকে
র তাকালেই মানস-চক্ষে দেখতে পাই
ব্যক্তিগত অনুভূতিতে, কি স্বাধীনতা
ন্দোলনের নানা পর্যায়ে কিংবা মনীষী-
রোধানে কবি-চিত্ত কত না ভাবেই
ন্দিত হয়ে উঠেছে এবং কবির লেখনী
য় ঝরে পড়েছে কত না কবিতা ও গান!
ব শুধু দুর্বার গতিতে লিখেই ক্ষান্ত
নি, কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সেই
বতা ও গানের পশরা। কবির যৌবনের
স্ফুদ্ধ কণ্ঠের সেই আবৃত্তি, তার ভঙ্গী
শৈলী, আবেগ বা প্রস্বর, দরদ-ভরা সেই
।-চিত্ত-বিমোহিত কণ্ঠের সামান্য কয়েকটি
দর্শন ব্যতিরেকে কোনও কিছুই
রক্ষিত হয়নি।

করাচীর বাঙ্গালী পল্টন হতে নজরুল
লকাতায় এসে পৌঁছলেন ১৯২০
ষ্টাব্দে। এর আগেই সৈনিক জীবনে
বির কবিতা ও অন্যান্য লেখা 'বঙ্গীয়
সলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও অন্যান্য পত্র-
ত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে তাঁর
রও লেখা 'মোসলেম ভারত', 'সওগাত
বং 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে
ারম্ভ করল। স্বখাত-ধারায় কবি যে
াব-বন্যা বয়ে আনলেন বাঙ্গালী চিত্তকে
বশেষ করে যুব-চিত্তকে প্লাবিত করতে
কানও সংস্কারের পর্বত বাধা হয়ে
ড়াতে পারল না। শুধু পত্র-পত্রিকায়
কাশিত রচনা নয় তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে
ছল তাঁর সেই কণ্ঠ ভরা গান। নজরুলের
না সেদিন ছিল দিকে দিকে গানের
নমন্ত্রণ। আত্মভোলা সেই উদাত্ত-কণ্ঠ
বীন গায়কের গান শোনার জন্য সেদিন
জন-চিত্ত ছিল বিশেষভাবে উন্মুখ। জনাব
মুজফফর আহমেদ তাঁর 'কাজী নজরুল
ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থের কলকাতায়
নজরুলের জনপ্রিয়তা পরিচ্ছেদে লিখেছেন
—'নজরুলের জনপ্রিয়তার অন্য একটি
কারণ ছিল তার গান। আমার মতে নজরুল
খুব সুকণ্ঠ গায়ক ছিল না। তবে প্রাণের
সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে সে গান গাইত।
তাই, তার গান সব শ্রেণীর লোককে
আকর্ষণ করত। সকলেই তার গান শুনতে
চাইত। সময় হাতে থাকলে নজরুল কারুর
অনুরোধ ফেলত না। প্রথমে তো হিন্দু-
মুসলিম ছাত্র ও কেরানীদের মেসগুলি
হতেই গান গাওয়ার জন্য নজরুলের আমন্ত্রণ
আসতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে এই
আমন্ত্রণ প্রসারিত হতে লাগল অনেক সব
হিন্দু পরিবারেও। আমি অনেক সময়ে
নজরুলের সঙ্গে অনেক মেসে গিয়েছি।
গানের মজলিসের খরচ ছিল মাত্র কয়েক
পেয়ালা চা। নজরুলের সঙ্গে কোনো হিন্দু
পারিবারিক গানের মজলিসে আমি কখনও
যাইনি। এইসব পরিবারে নিশ্চয় নজরুলের
অনেক যত্ন হতো। এইভাবে তার শুধু
জনপ্রিয়তা যে বাড়ছিল তা নয়, সে একটা
সামাজিক বাঁধও ভেঙে দিচ্ছিল।

"অন্য গান যে নজরুল দু' একটা গাইত
না তা নয়, কোনো হিন্দুস্তানী বস্তী
সংলগ্ন জায়গায় গেলে সে হিন্দুস্তানী
গানও গাইত, এমন কি দু'একটি
হিন্দুস্তানী গান সে নিজেও রচনা করে-
ছিল। এ সব সত্ত্বেও সে মূলত গাইত রবীন্দ্র-
নাথের গান। এত বেশী রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে
কি করে মুখস্থ করেছিল তা ভেবে আমরা
আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সমস্ত 'কুরআন'
যাঁরা মুখস্থ করেন তাঁদের হাফিজ বলা
যায়। আমরা বলতাম নজরুল ইসলাম
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের হাফিজ।

"নানান জায়গায় গান গাওয়ার ভিতর
দিয়ে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত
নজরুল ইসলামের সংযোগ ও পরিচয় ঘটে।
রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়ক হিসাবে তখন কল-
কাতায় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের খুব নাম। এই
পরিচয়ের পর হতে হরিদাসবাবু ও নজরুল
রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার জন্য এক সঙ্গে
অনেক যায়গায় যেতে লাগলেন।

* * * "নজরুল শুধু শিক্ষিত-সমাজে
কাব্য-চর্চা করত না। তার পরিচয়ের
পরিধিও সুবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আমি
দেখেছি, তার গান ও কবিতার আবৃত্তি
শোনার জন্য চটকলের মজুরেরা পর্যন্ত
তাকে ডেকেছে। পরে সে কৃষকদের মধ্যেও
ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষিত
সমাজের গন্ডীর ভিতরে সে শুধু নিজেকে
ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেচে জনগণের
মধ্যেও। এই জন্যই বাংলাদেশের কবিদের
ভিতরে নজরুল ইসলাম সর্বাপেক্ষা জন-
প্রিয় কবি হতে পেরেছিল। আজ কারখানা
মজুরেরা পর্যন্ত তার জন্মদিবস পালন
করে।" (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা

৬২-৬৪)

এই প্রসঙ্গে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে লিখেছেন—"নজরুল সেই আড্ডায় (গজেন দা'র আড্ডা) এসে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন। তখন তার স্বরচিত সংগীত বেশী ছিল না। কেবলমাত্র একটি স্বরচিত গান তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত—'পথিক ওগো চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা'।

"কলকাতার স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব' ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়ে যাবার বছর খানেক পরে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনে আইন আদালত, স্কুল কলেজ, রাস্তা পার্ক, এমন কি অন্তঃপুর পর্যন্ত যখন আলোড়িত—নজরুল ইসলামের নতুন নতুন কবিতা ও গান সাহিত্যে ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দীপ্ত করে তুললো। এই সময়ে নজরুলের প্রতিভা ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলায় সকালবেলাকার নবোদিত সূর্য যেন অকস্মাৎ মধ্যগগনে ভাস্বর হয়ে উঠে সকলকে বিস্ময়-বিমোহিত করে তুললো।

"নজরুল সুকণ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু স্বরচিত সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠে যেন রূপে র সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো। নজরুলের ক এমন একটি উপাদান ছিল যাতে তিনি ত গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে মূর্ত ক এঁকে দিতেন—শ্রোতাদের মানস পটে। (মিত্র-ঘোষ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ ১৩৪-৩৫)

১৯২৫ সাল থেকেই নজরুল-গীতি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। যদিও সেই সময়ে রেকর্ডে লেবেলে রচয়িতা বা সুরকারের কোনও নামো ল্লেখ থাকত না। প্রচার-পত্রে কখনও কখন

সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, তৎকালীন প্রসিদ্ধ শৌখিন গায়ক হরেন্দ্রনাথ দত্ত কবির 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে প্রথম গান। এই পি ৬৯৪৫নং রেকর্ডটি প্রকাশিত হয় শারদীয়া পুজো-উপলক্ষে ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। যাবৎ যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এই রেকর্ডটিকে নজরুল-গীতির সর্বপ্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড হিসাবে গণ্য করার সঙ্গত কারণ আছে (দেশ পত্রিকার ১লা জুন ১৯৭৪ তারিখের সংখ্যায় লেখকের নজরুল-গীতির প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে হরেন্দ্রনাথ দত্তের কণ্ঠে আরও দুটি নজরুলের গান ('পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর বিধির বিধান সত্য হোক' এবং দোহাই তোদের, এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল') হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী রেকর্ডের লেবেলে রচয়িতা বা সুরকারের নাম ইত্যাদি উল্লেখ না থাকলেও গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁদের প্রচার-পত্রে এই সব তথ্য যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছিলেন। নজরুল-গীতির প্রথম রেকর্ডের প্রকাশের সময় কবির পরিচয় গোপন করা হয়েছিল এই ধারণার বশবর্তী হয়ে একই কথা ইতিপূর্বে বিশিষ্ট লেখকবন্ধু যে লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। নজরুলের গান এই সময়ে রেকর্ডে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলেও নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর সাক্ষাৎ পরিচয় বা যোগাযোগ ঘটেছে কিনা তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রামোফোন রেকর্ডে রচনা ব্যবহারের জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্মান দক্ষিণা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বিধিবদ্ধ কোনও ব্যবস্থা তখনও প্রবর্তিত হয়নি। গ্রামোফোন রেকর্ডে রচনা ব্যবহারের জন্য প্রথম রয়্যালটি পান রবীন্দ্রনাথ। এদিক থেকে ৫ই অক্টোবর ১৯২৬ সালে গ্রামোফোন কোম্পানী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটিকে ঐতিহাসিক সনদ বলে অভিহিত করা যায়। সুতরাং এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, নজরুল গানের জন্য রয়্যালটি পেতে আরম্ভ করেছেন ওই তারিখের পর কোনও সময় থেকে।

১৯২৮ সালে শারদীয়া পুজো উপলক্ষে রেকর্ডে নজরুলের স্বকণ্ঠে 'নারী' কবিতাটির আবৃত্তি প্রকাশিত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, কে মল্লিকের কণ্ঠে রেকর্ড 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' এবং 'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিল কে' একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করে। 'নারী'র রেকর্ডটিই নজরুলের নিজ কণ্ঠের প্রথম রেকর্ড। অনেক অনুসন্ধান করেও এই কবিতাটির রেকর্ডিংয়ের তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এইচ এম ভির স্বনামধন্য সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅনিমেষ বসু অনেক পরিশ্রম করেও এর রেকর্ডিংয়ের সঠিক তারিখ নির্ণয় করতে পারেননি, তবে তাঁর ধারণা এই রেকর্ডটি প্রকাশের অল্প কিছুদিন আগেই রেকর্ডিং হয়ে থাকবে। 'নারী' কবে রেকর্ডিং হয়ে থাকতে পারে এ সম্বন্ধে হদিস পাবার জন্য আমি তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী রথীন্দ্রমোহন সরকার (বর্তমানে লোকান্তরিত) মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই রেকর্ডটি পুজোর অন্যান্য রেকর্ডের সঙ্গে ১৯২৮ সালে জুন কিংবা জুলাই মাসে রেকর্ডিং হয়ে থাকবে। এই সময়েই আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে নজরুল যখন গানে এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তখন তাঁর প্রথম রেকর্ড গানের রেকর্ড না হয়ে আবৃত্তির রেকর্ড হল কেন? এর উত্তরে রথীনবাবু যা জানিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেই সময়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন পেশাদার শিল্পী, যাঁরা বিশেষভাবে কণ্ঠ-চর্চা করতেন। ভারতে কেন বিদেশেও তখন রেকর্ডিং করার যন্ত্রপাতি এবং কলা-কৌশলের এত উন্নতি হয়নি। শুধু সুমিষ্ট বা দরদী কণ্ঠ হলেই হত না, রেকর্ডে গান করার জন্য প্রয়োজন হত পরিষ্কার এবং জোরালো আওয়াজের। সেই তুলনায় নজরুলের গানের কণ্ঠ রেকর্ডে প্রকাশের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়নি। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ এবং নারী কবিতাটি রেকর্ড প্রকাশ হবার

মেগাফোন প্রকাশিত প্রথম রেকর্ড-তালিকার প্রচ্ছদপট

কাগজ সম্পর্কে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁর ৮ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখের পত্রে আমাকে যা লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ উল্লেখ করছি। "নজরুলের সঙ্গে ঠিক কোন্ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর যোগাযোগ হ'লো, আমার ঠিক স্মরণে নেই। আপনি লিখেছেন—'১৯২৮ সালে প্রকাশিত হল কবির নিজ-কণ্ঠে নারী কবিতার আবৃত্তির রেকর্ড।' আপনি যদি নিশ্চিতভাবে জেনে থাকেন ১৯২৮ সালেই 'নারী' কবিতার আবৃত্তি গ্রামোফোন কোম্পানী বের করেছিলেন, তাহলে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, তার পূর্বে অনুমান ১৯২৭ সালে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিল। আমি এই কাজ-নিয়োগ সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলতে পারি ঐ সময় আমি ১৫নং জেলিয়াটোলা স্ট্রীটে (বর্তমান সুধীর চাটার্জি স্ট্রীট) থাকতাম। আমার বাড়ির বৈঠকখানায় কে মল্লিক আসতেন গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে। সেইখানে বসে দক্ষিণাদি প্রাপ্য সম্বন্ধে নজরুলের সঙ্গে কে মল্লিক কথাবার্তা কইতেন। * * * যে সময় নজরুলের 'নারী' কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড বের হয় সেই সময় 'বিদ্রোহী', 'সব্যসাচী' ও 'নারী'—এই তিনটি কবিতা বহু জনসমাবেশে নজরুল আবৃত্তি করতো। তিনটি কবিতাই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আমার মনে হয়, এই জনপ্রিয়তার জন্যই গ্রামোফোন কোম্পানী ঐ তিনটি কবিতার মধ্যে 'নারী' কবিতাটি রেকর্ড করবার জন্য বেছে নিয়েছিল।' ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তি রেকর্ডে প্রকাশ হলে জনমানসে সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া হতে পারত এবং তার ফলে হয়ত সরকার রেকর্ডটি বাজেয়াপ্ত করতেন। ইংরেজ রেকর্ড কোম্পানী সম্ভবত এই কারণেই 'নারী' কবিতাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই রেকর্ডটি যখন প্রকাশ হয় তখন কবির বয়স ২৯ বছর। সুস্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত এবং সচ্ছন্দভাবে পরি-বেশিত নারী রেকর্ডটি অসাধারণ জন-সমাদর লাভ করে। তৎকালীন 'রেকর্ড সঙ্গীত'-গ্রন্থে কবির সুমুদ্রিত আলোক-চিত্র সহ নারীর পূর্ণ-পাঠ দেওয়া হত। প্রায় দশ বছর চালু থাকার পর ১৯৩৮ সালের জুন মাসে রেকর্ডটি বাজারে অচল হলে বাতিল করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন রেকর্ডটি দুষ্প্রাপ্য থাকার পর ডাঃ অজিত ঠাকুর পুরাতন বাজার থেকে রেকর্ডটির একটি কপি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তিনি এবং কয়েকজন নজরুল অনুরাগী এটি নিয়ে গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীকে এবং এটি পুনঃ প্রকাশের জন্য অনু[...] করেন। তৎকালীন প্রযোজক শ্রীস[...] সেনগুপ্ত এবং রেকর্ডিং অধি[...] শ্রীঅধীরচন্দ্র সেন এই প্রস্তাব সানন্দে [...] করেন এবং ঐ পুরাতন রেকর্ড [...] একটি নতুন ছাঁচ (matrix) তৈরী [...] মাইক্রোগ্রুভ রেকর্ডে ১৯৬৯ [...] নজরুলের জন্মদিনে এটি পুনঃ প্র[...] করেন। দুঃখের বিষয় ১৯৭২ সা[...] ৩০শে জুন থেকে এই রেকর্ডটিকে অ[...] বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। আশা [...] যায় গ্রামোফোন কোম্পানী শুধু [...] আবার পুনঃ প্রবর্তন করবেন না, ব্যবসা[...] স্বার্থের কথা না ভেবেই রেকর্ডটি ব[...] কণ্ঠস্বর রূপেই সযত্নে রক্ষা করবেন [...] ভাবীকালের নজরুল অনুরাগীদের [...] কবিকণ্ঠকে সুলভে পৌঁছে দেবার দী[...] মেয়াদী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২ অগস্ট ১৯৩২ সাল নজ[...] অনুরাগীদের কাছে একটি স্মরণীয় দি[...] এইদিনই প্রথম কাজী নজরুলের স্ব[...] গান রেকর্ডিং হয়। মেগাফোন কোম্পা[...] রেকর্ডিংয়ের শুরু থেকেই নজরুল এ[...] সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মেগাফো[...] প্রথম যে গান রেকর্ডিং হয় তা নজরু[...]

গান এবং তৎকালীন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ
। ধীরেন্দ্রনাথ দাসের কণ্ঠে তাঁরা যে
গান মেগাফোনের এক নম্বর রেকর্ডে
করেন তাও নজরুলের রচনা।
ফোনে রেকর্ডিং শুরু হয় ১৫ই
১৯৩২ সালে। ১৫ই জুলাই হতে
অগাস্টের মধ্যে মোট ৫।৬ দিনে
এক হিন্দী ও বাংলা গান রেকর্ডিং হয়।
মধ্যে কাজী সাহেবের গান ছিল মোট
। এর পরই ১২ অগস্ট কাজী
রের চারটি গান রেকর্ডিং হয়। এই
গান হল—'দিতে এলে ফুল হে
'কেন আসিলে ভালোবাসিলে',
লে দুয়ারে মোর কে 'তুমি' এবং
াণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার
ায়'।

এই চারটি গান যখন রেকর্ডিং হয়
ন কবির বয়স ৩৩ বছর। অনেকেই
নন নজরুল নিয়মিত সঙ্গীত-শিক্ষা বা
-চর্চা করেননি, তাঁর সে অবকাশও ছিল
কিন্তু তিনি জমীরুদ্দীন খাঁর শিষ্যত্ব
ণ করার পর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেক
জুই আহরণ করেছিলেন। স্বীয় প্রতিভা-
ন তিনি হিন্দুস্থানী এবং ইসলামী
গীতের বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাংলা গানে
সুপভাবে প্রয়োগ করে গেছেন। নজরুল
নেক গজল বাংলায় বেঁধেছেন এবং তা
য়েছেন বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।
ই তুলনায় তাঁর নিজ-কণ্ঠের এই চারটি
ন নিশ্চয় এক সারিতে রাখা যাবে না।
ন্তু সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র কোথায় তা
জরুল ভালো ভাবেই জানতেন। তাই জন্যই
খি যেন সহজাত ক্ষমতায় প্রত্যেকটি গানকে
তিনি রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন কথা, সুর,
াব এবং কণ্ঠের সুষ্ঠু সমন্বয়ে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৩২
সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেগাফোন কোম্পানী
তাঁদের রেকর্ডের প্রথম তালিকা প্রকাশ
করেন। এতে মোট ৭টি কণ্ঠ-সঙ্গীতের
এবং একটি যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ড
ছিল। কণ্ঠ-সঙ্গীতের ১৪টি গানের
মধ্যে ১০টি গানই কাজী নজরুল-রচিত।
এর মধ্যে কাজী নজরুলের কণ্ঠ-নিঃসৃত
দুটি গানের ('দিতে এলে ফুল হে, প্রিয়'
এবং 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম') একটি
রেকর্ডও ছিল। মেগাফোন কোম্পানী
তাঁদের প্রথম প্রচার-পত্রে নজরুলকে বিশেষ-
ভাবে উল্লেখ করেছিলেন (এর প্রতিলিপি
মুদ্রিত হল)। কবির উক্ত দুটি গানের
রেকর্ডের পরিচয়ে নজরুল এবং তাঁর গান
সম্বন্ধে মেগাফোন কোম্পানী যা লিখে-
ছিলেন তা শুধু কৌতূহলোদ্দীপক নয়
তৎকালীন নজরুল-গীতির মূল্যায়নের
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে।
তার অংশবিশেষ উল্লেখ করছি। "এই গান

নজরুলের স্বকণ্ঠে গীত দ্বিতীয় গানের রেকর্ডের লেবেল

দুইটি গাহিয়াছেন বঙ্গবাণীর প্রিয় দুলাল কবিবর কাজী নজরুল ইসলাম। কথা ও সুর তাঁহার নিজের। কবির সর্বতোমুখী প্রতিভার সহিত বাঙ্গালী আজ সর্বতো-ভাবে পরিচিত তাই নূতন করিয়া তার পরিচয় কি দিব। তবে ইহা বিদ্রোহী কবির অন্তর্নিহিত জ্বালার গৈরিক নিঃস্রাব নয়, ইহা দরদী কবির দরদী দিলের দুঃখ-দরিয়ার ফেনিল উচ্ছ্বাস। দরদী সম্রাট সাজাহান অমর—তাঁর তাজমহলের জন্য,

(বি ৩১১৩৬)

তাঁর আত্মা দর্পের জন্য নয়। আমাদের কবিও অমরত্ব লাভ করিবেন তাঁর প্রেমিক প্রাণের সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রাণস্পর্শী প্রেম-গাথায়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীতরসের পরিচয় পাইয়া আসিতেছে কবির রচিত শত শত জনপ্রিয় সঙ্গীতে। যে কণ্ঠ একদিন বাংলার পথে প্রান্তরে, নগরে গ্রামে, গঙ্গার পদ্মার তীরে নবপ্রাণের বাণী শুনাইয়া ফিরিয়াছে, প্রাণ-উন্মাদিনী সেই কণ্ঠকে চিরস্থায়ীভাবে রেকর্ডে রেখা-বদ্ধ করা হয় নাই, আজ প্রত্যেক দেশবাসীর দ্বারে আমরা সেই সুবিধা লইয়া আসিয়াছি। তাঁর স্বকণ্ঠে গীত এই গান দুখানি সকলকে শুনিতে অনুরোধ করি। বাণীর কমল-বন-বিহারী কবি-ভৃঙ্গের এই সুমধুর গুঞ্জনে সকলেই প্রীত হইবেন ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।"

১২ই অগস্ট ১৯৩২ সালে রেকর্ড করা কবিকণ্ঠের অপর দুটি গানের ('কেন আসিলে ভালোবাসিলে' এবং 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি') দ্বিতীয় রেকর্ডটি মেগাফোন কোম্পানী প্রকাশ করেন এপ্রিল ১৯৩৩ সালে। দুঃখের বিষয়, কবির এই দুটি গানের রেকর্ড চাহিদা না থাকায় অচল হয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক মানদণ্ডে ব্যর্থ হওয়ায় মেগাফোন কোম্পানী এই দুটি রেকর্ড শীঘ্রই বাতিল করে দেন। কবির কণ্ঠস্বর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই রেকর্ড দুটি মাইক্রোগ্রুভ রেকর্ডে পুনঃপ্রবর্তন করলে মেগাফোন কোম্পানী নজরুল-অনুরাগি-বৃন্দের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

এর পর হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানীতে সম্ভবত ১৯৩৪ সালে কাজী নজরুলের স্বকণ্ঠে একটি গান রেকর্ডিং হয়, কিন্তু তা আশানুরূপ না হওয়ায় প্রকাশ করা হয়নি। গানটি হল 'এত কথা কি গো কহিতে জানে চঞ্চল তব আঁখি' এই তথ্যটি আমাকে জানিয়েছেন গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রাক্তন রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রীঅধীরচন্দ্র সেন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজী নজরুলের কণ্ঠস্বর একটি রেকর্ডের সেটে থেকে গেছে। এ-সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রাক্তন রেকর্ডিং প্রতিনিধি হেমচন্দ্র সোম (বর্তমানে লোকান্তরিত)। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই নাটিকাটি প্রকাশিত হয়। বহুদিন অনুসন্ধান করে আমি এই রেকর্ডের একটি সেট পুরাতন রেকর্ডের বাজার থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হই। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের এন ৭৩২৬-২৮নং তিনটি রেকর্ডের লেবেলে মাত্র উল্লেখ আছে—প্রীতি উপহার

Quazi Nazrul Islam

J.N.G. 8

বাংলার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব
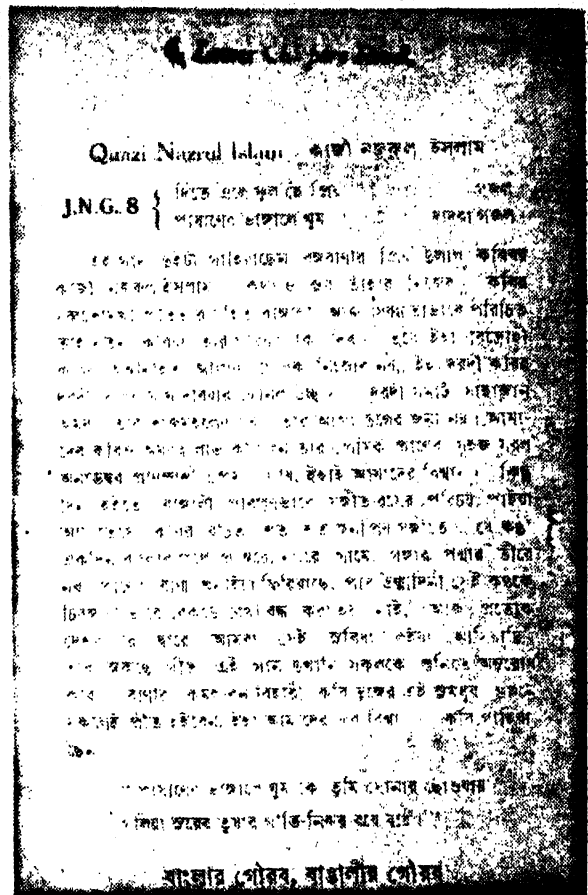
মেগাফোন রেকর্ড-তালিকায় নজরুলের প্রথম গানের পরিচিতি

১ম—৬ষ্ঠ (কাজী নজরুল) এবং ইংরেজীতে গ্রামোফোন ক্লাব। যে কোনও কারণেই হোক রেকর্ডে বা রেকর্ডের প্রচারপত্রে অংশগ্রহণ-কারী শিল্পীদের নাম দেওয়া হয়নি। এই রেকর্ডের সেটটি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে অভি-নবভাবে প্রচার করা হত। তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। "মাঘ ফাল্গুন দুটো মাসই বিয়ের মাস। প্রায় প্রতিদিনই আসে গোলাপী রঙের খাম প্রজাপতির দূত হয়ে। প্রিয়জনের জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব, সুতরাং যেতেই হয় এবং সেই মধুর ও মদির মিলন-রাত্রিটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য কিছু উপহারও সঙ্গে নিতে হয়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় সেই অভিনব উপহার যা উপহারের ভিড়ে সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে?

"এই সমস্যার ভার নিয়েছেন এবার 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'। আপনাদের জন্য তাঁরা সত্যই একটি অভিনব 'প্রীতি উপহার' নিয়ে এসেছেন। বিয়েবাড়ির জন্য এই উপহার বিয়ে-বাড়িরই নিখুঁত বাস্তব ছবি। এতে আছে, বেহাই বেয়ানের রহস্যালাপ, বর-বধূর প্রণয়-গুঞ্জন, মুখরা ননদিনীর আক্রমণে নব-বধূর আত্মসমর্পণ, শাশুড়ী এবং দিদির আশীর্বাদ এবং ঠানদির রসালো মিষ্টি পরিহাস। উৎসব-কলরোলের ফাঁকে ফাঁকে বরের বাড়ির চাকর আর কনে-বাড়ির ঝি-র যে কৌতুক-কথা বিনিময় তাও আছে। আরও আছে শানাই, শঙ্খ, উলু-ধ্বনি।

"বাংলা দেশের গায়ক-গায়িকা বলতে যাঁদের নাম আপনাদের মুখে আগে আসে, তাঁরাই বিবাহ-বাসর গানে গানে মুখর করে তুলেছেন। ফিরে বাড়ি যাবার সময় যিনি এই 'প্রীতি উপহার' আগে নিয়ে যাবেন, তাঁরই হবে জিত,—এ কথাটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম এবং যে বর প্রমাণ করতে পারবেন, এই 'প্রীতি উপহার' তিনি সর্ব-প্রথম পেয়েছেন, তাঁর মিলন-রাত্রিটিকে

স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমরা উপহারের একটি সুন্দরতম আধারে বর-বধূরে নাম অঙ্কিত করে দেব।

"উপহারোপযোগী মনোরম বাক্সে তিন-খানি ... ইঞ্চি রেকর্ড (এন্ ৭৩২৬, ৭৩২৭ এবং ৭৩২৮) ও 'বিয়েবাড়ি' গংপ পুস্তিকা সমেত দক্ষিণা মাত্র আট টাকা চার আনা।" উক্ত নাটিকায় প্রথম বেহাইয়ের ভূমিকায় কাজী নজরুল স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন। হেমচন্দ্র সোম মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রেবা বসু (সোম) উক্ত রেকর্ড-নাটিকায় প্রত্যেক শিল্পীর পরিচয় আমাকে জানিয়েছেন—রেকর্ড-পঞ্জীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জনাব আজহারউদ্দীন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" গ্রন্থে 'প্রীতি উপহার' এবং 'বিয়ে বাড়ি'কে দুটি স্বতন্ত্র নাটিকা বলে ভুলক্রমে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত রেকর্ডে প্রীতি-উপহার এবং বিজ্ঞাপনে বিয়ে-বাড়ি কথাটির প্রাধান্য থাকায় এই বিভ্রান্তি ঘটেছে। এই সেট রেকর্ডটি পনেরো বছর চালু ছিল। অবশেষে এটি ১৯৫০ সালের শেষে বাতিল হয়ে যায়। এটি পুনঃপ্রকাশের কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে বলে জানি না।

শ্রীবরদা গুপ্ত জানিয়েছেন যে তাঁর দাদা ডাঃ সারদা গুপ্ত কাজী নজরুলের 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কমিকটি রেকর্ড করেছিলেন মেগাফোনে। তাতে 'দে গরুর গা ধুইয়ে'র ধুয়ার এবং হাসির অংশে কাজী সাহেব নিজে কণ্ঠদান করেছেন। ধীরেন দাস মহাশয়ের কণ্ঠস্বরও এই রেকর্ডে আছে।

কাজী নজরুলের কণ্ঠস্বর আরও কয়েকটি রেকর্ডে বোধ হয় বহুজনের অলক্ষ্যে থেকে গেছে। স্বর্গত শিল্পী ধীরেন দাসের পুত্র অমর দাস জানিয়েছেন যে, 'প্ল্যানচেট' নাটিকার রেকর্ডে ঘোষকের ভূমিকায় এবং ছোটদের রেকর্ড 'চার ক্যালা'য় কাজী সাহেবের কণ্ঠস্বর আছে। শ্রীমতী রেবা বসুর (সোম) 'জয়তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী' গানের রেকর্ডে সমবেত অংশে কাজী নজরুলের কণ্ঠস্বর পাওয়া যাবে।

গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল শেষ কণ্ঠদান করেছেন রবীন্দ্র তিরোধানের কয়েক দিনের মধ্যেই। 'রবিহারা' কবিতাটি রচনার উপলক্ষ রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণ। প্রথমে তিনি এটি আবৃত্তি করেন কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে। পরে এই কবিতাটি তিনি রেকর্ড করেন, যার অপর দিকে আছে 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গানটি। এই গানে কবির সঙ্গে কণ্ঠে সহযোগিতা করেছেন শ্রীমতী ইলা মিত্র (ঘোষ) ও শ্রীসুনীল ঘোষ। বিশেষ কারণবশত সহযোগী শিল্পীদের নাম রেকর্ডের লেবেলে বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। জনাব আবদুল আজিজ আল-আমান তাঁর 'নজরুল-পরিক্রমা' গ্রন্থে এই গানটি শ্রীমতী যূথিকা রায় রেকর্ডে একক কণ্ঠে গেয়েছেন বলে ভুল তথ্য দিয়েছেন। কবির ঐ রেকর্ডের সঙ্গে একযোগে প্রকাশিত শ্রীমতী যূথিকা রায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্র তিরোধান উপলক্ষে প্রকাশিত রেকর্ডের গান দুটি হল 'সন্ধ্যা ঘনালো গঙ্গার কূলে' (প্রণব রায়) এবং 'হে কবি বিদায়' (শৈলেন রায়), সুরকার কমল দাশগুপ্ত। 'রবিহারা' এবং 'ঘুমাইতে দাও রবিরে' রেকর্ডটি ১৯৫০ সালের শেষে বাতিল হয়ে যায়। সুখের বিষয়, ১৯৬৮ সালে নজরুলের জন্মদিনে গ্রামোফোন কোম্পানী এটি মাইক্রোগ্রুভ রেকর্ডে পরিবর্তিত করে পুনঃপ্রকাশ করেছেন এবং এখনও এটি প্রাপ্তব্য রেকর্ড-তালিকায় বহাল আছে।

পায়োনীয়ার ফিল্মের সর্বপ্রথম সবাক চিত্র 'ধ্রুব' ১৯৩৪ সালে মুক্তিলাভ করে। কাজী নজরুল এই কথাচিত্রে অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিচালনাও করেছিলেন। 'ধ্রুব' কথাচিত্রের অনেক গান নজরুল একক কণ্ঠে বা দ্বৈত-কণ্ঠে গেয়েছিলেন—এগুলির কোনও গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল কি না অনেক অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। ১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কালী ফিল্মসের 'পাতালপুরী'র একটি পুস্তিকা থেকে জানতে পারি যে, উক্ত চিত্রে ব্যবহৃত ১৪টি গানের মধ্যে অন্তত ৭টি গান রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল। শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া-গীত দুটি গানের রচয়িতার নাম দেওয়া নেই। যদিও একথা সর্বজনবিদিত যে উক্ত চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল, বিস্ময়ের বিষয় উক্ত প্রচার-পুস্তিকায় সঙ্গীত-পরিচালক বা সুরস্রষ্টা হিসাবে কাজী নজরুলের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এই গানগুলিরও কোনও গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানি না। জনাব

আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুল পরিক্রমা' গ্রন্থে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে আছে যে, 'পাতালপুরীতে 'ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে হয়েছিল নজরুলকে।' শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম যে, কোনও গানের সামান্যতম অংশেও নজরুল স্বয়ং কণ্ঠদান করেছিলেন কি না? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে চিঠির উত্তর আসার আগেই শৈলজানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে লোকান্তরিত হন। 'ধ্রুব' এবং 'পাতালপুরী' কথাচিত্রের বোধ হয় আর প্রিন্ট পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং চলচ্চিত্রে বিধৃত নজরুলের কণ্ঠস্বর চিরতরে হারিয়ে গেছে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে আগে অনুষ্ঠানের 'টেপ' করে রাখা হত না। ফলে, নজরুলের বেতারের কোনও অনুষ্ঠানের নিদর্শনই বোধ হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।,

কবির কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আর কোনও গ্রামোফোন রেকর্ডে বা অন্য কোনও ভাবে আছে কি না ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জাতীয় সম্পদরূপে কবির কণ্ঠস্বর সংরক্ষণের জন্য আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রেকর্ড-পঞ্জী

বন্ধনী মধ্যে প্রকাশ কাল দেওয়া হয়েছে। তারকা (*) চিহ্নিত রেকর্ডগুলি মাইক্রোগ্রুভ রেকর্ডে পরিবর্তিত এবং পুনঃ প্রকাশিত।

কণ্ঠসংগীত ও আবৃত্তি

পি ১১৫২০ (সেপ্টেম্বর ১৯২৮) নারী (আবৃত্তি)

* ৪৫-এন ৮৩৩১৫ (জুন ১৯৬৯) ঐ

জে এন জি ৮ (সেপ্টেম্বর ১৯৩২) দিতে এলে ফুল হে প্রিয় (গজল); পাষাণের ভাঙালে ঘুম (দাদরা গজল)

জে এন জি ৪৪ (এপ্রিল ১৯৩৩) কেন আসিলে ভালোবাসিলে (গজল); দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি (ঐ)

এন ২৭১৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৯৪১) রবিহারা (আবৃত্তি);

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে—কণ্ঠে সহযোগিতা ইলা মিত্র (ঘোষ) ও সুনীল ঘোষ

* ৭-ইপিই১০৬৩ (জুন ১৯৬৮) ঐ;

[অপর দিকে সংযোজিত কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠে আবৃত্তি 'নম নম বাংলা দেশ মম', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' এবং 'দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি']

কমিক ও নাটিকায় অংশগ্রহণ

জি টি ৪০ (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪) চার কালা অন্যান্য চরিত্রে ধীরেন দাস, রঞ্জিত রায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী)।

[শিক্ষকের শিক্ষালাভ]

এন ৭৩২৬-২৮ (জানুয়ারী ১৯৩৫) প্রীতি-উপহার (বিয়ে-বাড়ী)

(অন্যান্য চরিত্রে কমলা ঝরিয়া, তুলসী চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী, ধীরেন দাস, নিভাননী, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, সরযুবালা এবং হরিমতী)

এন ৯৭৬০ (আগস্ট ১৯৩৬) প্ল্যানচেট

(অন্যান্য চরিত্রে ধীরেন দাস, নিভাননী ও সুহাসিনী)

অন্যের গানে সহযোগিতা

এন ১৭০২২ (জানুয়ারী ১৯৩৮) রেবা বসু (সোম);

জয়তু শ্রীকৃষ্ণ মুরারী (ধীরেন দাসেরও সহকণ্ঠে)

[জপো ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণকে নাম]

অন্যের রেকর্ডে কণ্ঠদান

সারদা গুপ্ত

জে এন সি ৫৫২৫ (ডিসেম্বর ১৯৪০)

দে গরুর গা ধুইয়ে (ধীরেন দাসেরও সহকণ্ঠে)

[চরণ-নেশা চণ্ডুর নেশা]

রেকর্ড-সংকেত

৭৮ আর পি এম ১০" : এন ও পি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস

ঐ : জে এন জি—মেগাফোন

৭৮ আর পি এম ৭" : জিটি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস

৪৫ আর পি এম (মাইক্রোগ্রুভ) : স্ট্যান্ডার্ড—৪৫-এন—হিজ মাস্টার্স ভয়েস

ঐ : এক্সটেনডেড প্লে (ইপি) ৭-ইপিই ঐ

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডের আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন শ্রীসলিলরঞ্জন রায় মহাশয়ের রেকর্ড থেকে। এঁদের কাছে আমার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলার সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে দেখা গেছে যখনই বন্ধ্যাযুগ এসে গেছে বা সঙ্গীতে বিকৃতির আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়েছে তখনই একজন বা একাধিক প্রতিভাবান রচয়িতা এসে সেই যুগকে উদ্ধার করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ যুগে এলেন নিধুবাবু, রাধামোহন সেন, কালী মীর্জা প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তি, উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্র একটি বৃহৎ প্রেরণা প্রদান করেছিলেন এবং শেষভাগে উদিত হলেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি। তাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কলকাতা জুড়ে ছিলেন। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হল, রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে, রজনীকান্ত সেনও গত হলেন, শেষ পর্যন্ত অতুলপ্রসাদ সেনও উত্তরপ্রদেশের লখনউ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। সঙ্গীতের দিক থেকে কলকাতায় একটা শূন্যতা নেমে এল। এই সময় দেখা যায় প্রচলিত নানান ধরনের গান এবং থিয়েটারের গান কলকাতা তথা তাবৎ বাংলায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এটা সঙ্গীতের একটা একঘেয়ে যুগ। এই যুগে সার্থক গীতিকারদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি রঙ্গালয় বা সাধারণ্যে প্রচলিত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করলে বাংলা গানের একটা অধঃপতন সুনিশ্চিত ছিল। তিনি জনচিত্তে অতি যত্ন সহকারে একটি স্বাভাবিক রুচিবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, যদিচ তিনি নিজে সুরকার ছিলেন না। সময়টা যখন এইরকম তখন সহসা ঘটল নজরুল ইসলামের আবির্ভাব।

নজরুলের অভ্যুত্থান ঘটেছিল কবিরূপে এবং সাহিত্যিক সমাজেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। গান তাঁর স্বভাবের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল এবং যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই গান গাইতেন অসঙ্কোচে। তাঁর গাইবার ভঙ্গী ছিল বলিষ্ঠ কিন্তু তাতে তিনি মনপ্রাণ এমনভাবে ঢেলে দিতেন যে একটা চমৎকার আকৃতি ফুটে উঠত তাঁর সমস্ত গানের অন্তঃস্থল থেকে। এটিই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সুন্দরতম নিদর্শন। তাঁর রচনাশৈলী এবং গায়কীতে কোথায় যেন দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালও ছিলেন এমনি উদাত্তকণ্ঠ গায়নরীতির প্রবর্তক অথচ কত কোমল মনোহর ভঙ্গীও তাঁর গানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। দুঃখের বিষয় গানের এই পুরুষোচিত ভঙ্গীটি আজ দুর্লভ, এমন কি এ যুগে যাঁরা তাঁর গান গেয়ে থাকেন তাঁদের কণ্ঠেও সেই বীর্যবান সত্তার এতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় না। এইটি বাদ পড়লে নজরুলগীতিতে নজরুলই অনুপস্থিত থেকে যান, তা হয়ে পড়ে তথাকথিত নজরুলগীতি।

ক্রমে নজরুলের গান রচনায় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল; কবিতা তিনি লিখতেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গীতিকবিরূপেই পরিচিতি লাভ করলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীতে প্রবেশলাভের সংগে সংগে তাঁর গানের প্রচার অসামান্য বৃদ্ধি পেল এবং তাঁর গান তখন সাধারণ্যে "কাজীর গান" বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এই জনপ্রিয়তা কিন্তু তাঁর স্বদেশসংগীতের জন্যই নয়, তিনি উত্তর ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলের নানান ধরনের সুর বাংলা গানে প্রয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে গজল ছিল অন্যতম প্রধান রীতি। এই সুললিত ধারাগুলিই তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বাংলায় এই রীতিগুলি একেবারে নতুন এবং এই সব মেলডির আবেদন ছিল বিচিত্র ধরনের যার স্বাদ বাঙালীরা তেমন করে পায়নি।

এর আগে কলকাতার যখন নবাব ওয়াজিদ আলী শার প্রভাব ছিল তখন ঠুংরি এবং উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু রীতি বাংলা গানে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলির ধরন ধারণ এত বিচিত্র ছিল না যদিচ

নূতনত্বের অভাবও সেগুলিতে ছিল না। কাজী সাহেব বাংলা গানে কেমন যেন একটা "এক্‌জটিক" মায়াজাল বিস্তার করলেন, তিনি বহু সুললিত উর্দু, ফার্সী শব্দ এবং কায়দা কানুন এমন নিপুণভাবে প্রয়োগ করলেন যে তাতে একটা রোমান্টিক অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হল। অনেকে কাজী সাহেবকে তাঁর নানা রকম রাগধর্মী বা ভক্তিসাধক গানের জন্য প্রাধান্য প্রদান করেন, আমার কিন্তু মনে হয় তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় অবদান গজল রচনায় স্বীকৃত হওয়া উচিত, কেননা এই চেষ্টা এমন করে এর আগে হয়নি। ভাল করে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় এই প্রয়াস কম স্বকীয়তার পরিচায়ক নয়। আমরা প্রায়ই শুনে এসেছি যে অনেক বাঙালীই ভাল ফার্সী জানতেন, কিন্তু তার সার্থক পরিচয় আমরা পাইনি বললেই চলে কারণ উৎকৃষ্ট ফার্সী সাহিত্যের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যে নেই। নজরুল কিন্তু তেমন একজন স্কলার না হয়েও হাফিজের ধরনে গান লিখলেন—একটি নয় একাধিক এবং উৎকৃষ্ট ফার্সী গজলের ধরনে সুরও প্রদান করলেন। এমনভাবে তিনি ফার্সী শব্দ বাংলায় প্রয়োগ করেছেন যাতে সেগুলি খুব সুখশ্রাব্য হয়েছিল। যা শত শত বৎসরের মুসলিম শাসনে হয়নি সেটি সম্ভব হল ব্রিটিশ শাসনের প্রায় দুশো বৎসর গত হলে। ভাল উর্দু গজলের প্রয়োগও তাঁর গানে কম নয়। সুরেলা কাব্যপঠনের রীতি উর্দু ঢঙে তিনিই প্রথম বাংলার সংগীতে প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত পদ্ধতিগুলির আরও উৎকৃষ্টতর আর্টে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সেটি হয়নি। দুঃখের বিষয় নানা কারণে এই সব স্টাইলকে তাঁর লঘু করে আনতে হয় এবং ক্রমে অনেক গানে তা চটুল ব্যবসায়ী ঢঙে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের দেশের শক্তিমান কবি বা গীতিকারদের ভাগ্যের এটি একটি অভিশাপ যে তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ব্যবসায়িক প্রলোভন আকৃষ্ট করে এবং একবার এই আকর্ষণে আত্ম-সমর্পণ করবার পর স্বধর্মে ফিরে আসার দৃষ্টান্ত তাঁদের জীবনে আর দেখা যায় না। নজরুলের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন বা যে পথ দেখিয়ে-ছেন তার মূল্যও কম নয়। নজরুলের সঙ্গীত প্রতিভার আলোচনা করতে বসে এই দিকটা খুব কম সমালোচকই তুলে ধরেছেন। তিনি অবশ্য নানা সূত্রে এই সব ধারাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর আসল কৃতিত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য একটি ভাষায় এইগুলিকে প্রয়োগ করা যে ভাষা উর্দু কিংবা ফার্সী কোনটিরই সমগোত্রীয় নয়। ইস্কুলেও তিনি যতটুকু ফার্সী অধ্যয়ন করেন তা ভালই করেছিলেন। তাঁর সিয়ারসোল ইস্কুলের অধ্যাপক আমাদের

কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির একজন মহাফিজখানার মৌলবী ছিলেন। অবশেষ বয়সে কয়েক বৎসর আগে তিনি তাঁর দেশ-ময়মনসিংহে চলে যান। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে খুবই অল্প বয়সে কলকাতার মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সিয়ারসোলে শিক্ষকতার কাজ পান। তখন নজরুল তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং ফার্সী তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। পরেও হয়ত নজরুল তাঁর সঙ্গে কিছু সংযোগ রেখে থাকবেন। তাঁর এই অধ্যাপকটির মত উদারহৃদয় ধর্মপ্রাণ এবং অগাধ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন বাঙালী মুসলমান আমি কমই দেখেছি। বহু হিন্দু ছাত্রকে তিনি অল্প-বিস্তর পড়িয়েছেন এবং শিক্ষাপ্রদানে তাঁর কিছুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। তবে নজরুলের তথাকথিত ইসলামী গানগুলি প্রায়ই রসোত্তীর্ণ হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। স্পষ্টই বোঝা যায় এইগুলি তাঁর স্বাভাবিক প্রেরণায় রচিত হয়নি এবং এর পশ্চাতে রাজনৈতিক ইঙ্গিত ছিল।

নজরুল মুর্শিদাবাদের মঞ্জুসাহেব এবং কলকাতার স্বনামধন্য ঠুংরীর রাজা জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। বিশেষ করে জমীরুদ্দীনের কাছে তিনি নানা প্রকারের গান পেয়েছিলেন যেগুলির বাংলা রূপান্তর তিনি ঘটিয়েছিলেন নিপুণভাবে। কাজরী, দাদরা, কাফী—নানান ধরনের বিচিত্র গান তাঁর রচনার মধ্যে আছে যেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অতুলপ্রসাদ সেনও এই রকম একাধিক গান রচনা করেছেন। কিন্তু নজরুল তাঁর অধিকাংশ গানকে একটু চটুল করে দিয়েছিলেন যাতে সেগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও ভাবে এবং গাম্ভীর্যে অতুলপ্রসাদের রচনার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু এটা অবশ্য স্বীকার্য যে বৈচিত্র্য তাঁর ছিল অফুরন্ত এবং তাতে গায়ক গায়িকারা স্বকীয়তাকে ফোটাবার সুযোগ পেতেন যথেষ্ট। নজরুল জনগণের কবি এই আখ্যা পেয়েছেন, তিনি যে জনগণের গীতিকারও ছিলেন এটিও সর্বাংশে সত্য। আমার মনে হয় নজরুল সুযোগ্য গায়ক-গায়িকদের তাঁদের নিজস্ব রীতি-নীতিকে ব্যাহত হতে দিতেন না অথচ তাঁর লিরিককে তাঁর নিজস্ব প্রস্তাব সহ তাদের অর্পণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। প্রসঙ্গত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। নজরুলের অনেক গান তিনি গেয়েছেন কিন্তু গোঁসাইজীর স্বকীয়তা সে সব গানে ভাস্বর হয়ে আছে। কেউ হয়ত খেয়াল খাঁর গাইবার ধরনে অভ্যস্ত, সেখানে সেই গায়কী ফুটিয়ে তোলবার অবকাশও কাজী সাহেব রেখেছেন। এতে বহু বিখ্যাত আমেদজান কাজী সাহেবের ভাবিজিনাল বুরের

আইডিয়া কিরকম ছিল সেটা বোঝবার উপায় নেই। অতুলপ্রসাদও লিবারেল ছিলেন, কিন্তু বোধ করি এতটা ছিলেন না। কিন্তু কতকগুলি গান আছে যাতে কাজী সাহেবের নিজস্ব স্টাইল পুরোপুরি বর্তমান। যাঁরা প্রাক্তন যুগে ইন্দুবালা, আঙুরবালা অথবা কে মল্লিকের রেকর্ডে কাজী সাহেবের গান শুনেছেন তাঁরা একথার সারবত্তা উপলব্ধি করবেন। বোধ করি কাজী সাহেবের গানের বৈচিত্র্য ইন্দুবালার মত আর কারুর রেকর্ডে পাওয়া যাবে না। আজকাল এই সব গানের নবরূপায়ণ শুনি কিন্তু এটাই উপলব্ধি করি যে অপারগ ও অপটু গায়ক গায়িকারা এসব গানকে নিজেদের মত করে নিয়েছেন, কোন রচয়িতার যে কী স্টাইল সেটা ধারণা করবার মত ব্যাপক সাংগীতিক ধারণাও এঁরা অর্জন করেননি। আর একজনের নাম মনে আসে, তিনি পরলোকগত ধীরেন দাস। এমন পরিমার্জিত সুকণ্ঠ শিল্পী খুব কম দেখা যায়। এযুগে জগন্ময় মিত্রের অপূর্ব কণ্ঠে সেই রোমাণ্টিক রেশ পেতুম, কিন্তু তিনিও বহু দিন হল প্রত্যক্ষভাবে সংগীতজগতে অনুপস্থিত। ধীরেন দাস কাজী সাহেবের বহু দেশাত্মবোধক গান গেয়েছেন যতটুকু তখনকার দিনে ইংরেজ রেকর্ড কোম্পানীর পক্ষে প্রচার করা সম্ভব ছিল। তাঁর "সোবার" এবং সুললিত গম্ভীর কণ্ঠে সেযুগের বহু গায়ক গায়িকার স্বভাবগত ভালগারিটি ছিল না। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে তিনি এই সব গান রেকর্ড করে কাজী সাহেবের রচনার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

বিদ্রোহী কবি কিন্তু সংগীতে বিদ্রোহী ছিলেন না। ট্র্যাডিশনের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। সংগীত রচনায় রীতিনীতির দিক থেকে তিনি কনজারভেটিভ, কিন্তু নতুন আইডিয়া তাঁর মাথায় খেলত নিরন্তর। তথাপি যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে আমাদের চিরন্তন সংগীতের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। শ্রোতারা তাঁর গানে নতুনকে পেয়েছেন চিরায়ত সংগীতের মাধ্যমে তাই তিনি যথার্থ জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত হতে পেরেছিলেন। শেষ জীবনে বহু বিচিত্র রাগে তিনি সংগীত সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছিলেন। হয়ত কিছু কিছু গান কৃত্রিম মনে হতে পা[illegible] কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য সিনসিয়ারিটির অভাব তাঁর কখনও ছিল না।

শ্যামাসংগীত তিনি বেশ কিছু রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি প্রকৃত লিরিকে উত্তীর্ণ হয়েছে। নামে শ্যামাসংগীত হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি দেবীর স্তুতি পর্যায়ের কবিতা নয়, বা উনবিংশ শতাব্দীতে যেভাবে শ্যামাসংগীত রচিত হয়েছিল সেই ধারাটিকেও তিনি অনুসরণ করেননি, তাঁর এই সব রচনায় তিনি বিশ্বপ্রকৃতির নানান বিচিত্র শক্তিকে সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করেছেন। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে একে বলতে হয় "প্যানথিজম"। এই গানগুলির অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ এইখানেই নিহিত। শুধু সুরেই নয় ইমোশনের দিক থেকেও এগুলি লোকের চিত্তজয় করেছে সহজে।

নাট্যসংগীতেও তিনি কৃতকার্যতার পরিচয় রেখেছেন। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ

জনপ্রিয় নাটক কারাগারের কয়েকটি গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন। সেগুলি শ্রোতাদের অভিনন্দন লাভ করেছিল। আলেয়া নামে একটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন। তখনকার প্রসিদ্ধ গায়ক জ্ঞান দত্ত, এর গানগুলি গেয়ে নাম করেছিলেন। "রক্ত-কমল" নামক আর একটি নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তবে নাটকের গানে সুর দিতে বা সুর সহ গান রচনা করতেও অনেকে তাঁকে ডেকে আনতেন এবং সরল কবিকে কেবল পান আর চা খাইয়ে নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করে নিতেন।

সে যুগে আরও কয়েকজন প্রতিভাবান কবি রেকর্ড কোম্পানীগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,—তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। কাউকে কাউকে তিনি নিজের প্রভাব আরোপ করে সঙ্গীত-জগতে প্রবেশ করিয়েছেন, পরে তাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুত এমন উদার-হৃদয় ব্যক্তি প্রোফেশনাল জগতে একান্ত বিরল।

ব্যাধিগ্রস্ত হবার কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলার সঙ্গীত জগতে একটি রোমান্টিক যুগের সূত্রপাত হয়। এর নায়কতা করেন পরলোকগত হিমাংশুকুমার দত্ত। হিমাংশু-কুমার ইণ্টেলেকচুয়াল সুরকার ছিলেন। তিনি ছিলেন কুমিল্লার অধিবাসী যেখানে কাজী সাহেব তাঁর স্ত্রী প্রমীলাদেবীর সঙ্গে পরিচিত হন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর কাছ থেকে শুনেছি একদিন নজরুল এবং হিমাংশুবাবু এসেছিলেন স্বামী অভেদা-নন্দের কাছে সন্ন্যাসজীবনের অভিলাষ নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা উক্ত জীবন বেছে নেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব থেকেই চলমান সঙ্গীতজগতে এমন কিছু ভাবধারার প্রবেশ ঘটেছিল যাতে মনে হয়েছিল নজরুলের পক্ষে আর একটি নবতর আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এটি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুস্থ পদক্ষেপ। নজরুল তাঁর অল্পকালের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির কবলে না পড়লে হয়ত তাঁর কাছ থেকে আমরা অপ্রত্যাশিত আরও নতুন কিছু পেতুম;—কিন্তু তার আর সম্ভাবনা রইল না।

আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি নজরুল সঙ্গীতজগতে কত অসামান্যভাবে আমাদের কত প্রত্যাশার পূরণ করেছেন। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পরীক্ষা নিরীক্ষায় যা মেটেনি, তিনি ছিলেন তার পরিপূরক। আবার তিনি স্বয়ং কত প্রতিশ্রুতিকে সফল করেছেন এবং কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত রেখে গেছেন যা ভবিষ্যতের প্রতিভা এসে পূরণ করতে সমর্থ হবে। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি সঙ্গীতে ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেননি এবং নূতনকেও আহ্বান করেছেন,—কিন্তু ভারসাম্যকে এতটুকু বিচ্যুত হতে দেননি।

নীল আকাশে সূর্য তারা
শ্রী দেবীর হাতের লেখন,
সিন্ধু লেখে মহাসাগর
[illegible] কাঁকন বালির [illegible]।
মেঘে, ফুলে, অগ্নি-শিখায়,
হাসিতে [illegible] সিন্ধু [illegible]
-মেয়েদের লেখায় - আকাশে তাই
সেই মহা-শিল্পের স্মৃতি।

নজরুল ইসলাম
18/9/38

[১৯৩৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। এক অমেচার নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। যবনিকা ওঠার আগে শ্রীঅমল মিত্র অটোগ্রাফের খাতাটি কবির হাতে দিয়ে, একটি কবিতা রচনা করে নাম সই করে দিতে অনুরোধ করেন। কবি হেসে বলেন—"এই হট্টগোলে কবিতা লেখা সম্ভব?" উত্তরে অমলবাবু বলেছিলেন, "আপনার পক্ষে সম্ভব।" শুনে কবি দু' মিনিটের মধ্যে উপরোক্ত কবিতাটি লিখে নাম স্বাক্ষর করে খাতাটি অমলবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন —"হয়েছে?" বলেই তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসি। কবিতাটি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।]

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে অপচয় প্রসঙ্গে

২৮ অগাস্ট **বিশ্ববিজ্ঞান** পর্যায়ে রচনা **'বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে এখনও অপচয় কেন?'** প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের দফতরে বেশ কয়েকটি চিঠি এসেছে। কেউ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। কারোর সমর্থন এবং পাল্টা অভিযোগ। বিশেষ করে পরলোকগত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিজ্ঞানীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি ইনসটিটিউটকে কেন্দ্র করে। মূল রচনা প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের বিনীত বক্তব্য তুলে ধরার আগে কয়েকটি চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি। জায়গার অভাবে কোন চিঠিরই পুরোপুরি অংশ প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত। তাছাড়া কোন কোন চিঠিতে নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিছু কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে যাতে বিতর্কই বাড়ে, মূল রচনার সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই অনিবার্য কারণে সে সব অংশও বাদ দিতে হল।

শ্রীযুগলকান্তি রায় (কলকাতা ঃ ৩৭) লিখেছেন ঃ 'শ্রীসমরজিৎ কর লোকান্তরিত একজন বিজ্ঞানীর নামে স্থাপিত একটি নতুন ইনসটিটিউট-এর পঠন-পাঠন এবং অধ্যাপকদের যোগ্যতা এবং অর্থব্যয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার ইনসটিটিউটের নাম তিনি করেননি। এবং যে সব মন্তব্য করেছেন তা নিজের চোখে দেখে নয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নয়—অপরের মুখে শুনে (কান পাতলা নিশ্চয়!)...এই দুই বছরে ইনসটিটিউটের কাজকর্ম প্রভৃতির বিচার বিশ্লেষণ করে সেই সমস্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা তিনি যদি পাঠকদের সামনে দেখাতেন তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য সাধু বলে মনে হত। আমরাও ভাববার অবকাশ পেতাম, ইনসটিটিউটও তার বক্তব্য রাখতে পারতো (যদি থাকে)।... এই ইনসটিটিউটে অর্থ অপব্যয় হচ্ছে জেনেও বিশেষজ্ঞরা কেন সোচ্চার নন তার যে তিনটি কারণ দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি 'দেশ'-এর মত একটি পত্রিকার পাঠকদের একেবারে নাবালক ভেবেছেন।... সৎসাহস থাকে সমরজিৎবাবু পত্রলেখকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।' (সম্ভবত ইনস-টিটিউটের নাম প্রকাশ প্রসঙ্গেই এই চ্যালেঞ্জ।)

যুগলবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে লেখকের বিনীত নিবেদন, 'ইনসটিটিউটটির নাম এস এন বোস ইনসটিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়ান্সেস'।

'বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে এখনও অপচয় কেন?' রচনাটি পড়ার পর একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগের খয়রা অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান **অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য** লিখেছেন ঃ 'প্রাক্তন খয়রা (স্বর্গত) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি। তারপরও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। যতদূর মনে পড়ে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর ৮০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় (ফলিত রসায়ন বিভাগের হলে) উনি তাঁর নামে কোন ইনসটিটিউট করার প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তবুও তাঁর নামে ইনসটিটিউট করার অজুহাতে যা করা হচ্ছে তা মোটেই সমীচীন নয়। পরিকল্পনাবিহীন এই ভাবের কাজকর্ম শিক্ষাক্ষেত্রে আমি মোটেই সমর্থন করি না।'

ডঃ বিমলেন্দু মিত্র, রীডার, (বসু বিজ্ঞান মন্দির) লিখেছেন ঃ 'আমি যে ইনস-টিটিউটের কথা ভাবছি, বছর দুই আগে প্রচুর প্রচার ইত্যাদি করে পরলোকগত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বিজ্ঞানীর নামে তার পত্তন করা হয়। কিন্তু আমার মনে পড়ছে, আশি বছরের কোঠায় ছোঁয়া ঐ বিজ্ঞানী মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করতে গিয়ে

নিজেই এরকম ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, তবু দেখলাম, তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর নামে ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হল—যে প্রতিষ্ঠান তিনি নিজে সৃষ্টি করেন নি……' এ যদি ঐ বিশ্বখ্যাত নামটিকে এক্সপ্লয়েট করা না হয় তো তবে কি? এই ইনসটিটিউটে বিনা বেতনে পড়ানোর জন্যে আমিও এক সময়ে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। ঐ পরলোকগত বিজ্ঞানীর আমি শ্রদ্ধাশীল ছাত্র ছিলাম, যে কারণে আমি রাজি হই ও এক বছর সে কর্তব্য যথাযথ পালন করি। কিন্তু দেখলাম, ছাত্রদের পড়ার কোন উৎসাহ নেই। কোর্স শেষ করার কোন তাগাদা নেই, অ্যাসেসমেন্টের কোন সুযোগ নেই। এমন কি আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক (তাঁরও পড়াবার কথা ছিল) একদিনের জন্যেও ক্লাশ না নেয়াতেও ছাত্রের প্রথম শ্রেণীর গ্রেড পেতে কোন অসুবিধে হল না। বিবেকবিরুদ্ধ কাজ যাতে আর না করতে হয় সে জন্যে এ বছরে এ দায়িত্ব আমি অস্বীকার করেছি। আমার ধারণা হয়েছে, এ ইনসটিটিউটে কোন শিক্ষা দেয়া হয় না, ছাত্রের প্রকৃত কোন লাভ নেই।'

শ্রীকমল দত্ত (পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর) লিখেছেন : **'বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে এখনও অপচয় কেন?'** প্রবন্ধে 'কাগজে ইনসটিটিউট' বলে যে প্রতিষ্ঠানটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব বিজ্ঞানীর কাছেই সুস্পষ্ট যে, সেটি হল 'সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনসটিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়ান্সেস।' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নামে যে প্রতিষ্ঠান, তা তাঁর নামের যোগ্য হবে—এটা আমরা সকলেই আশা করেছিলাম এবং এখনও করি। তবে আজ পর্যন্ত যেভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে, তা বাঙালী জাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের ওপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(এক) প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব শিক্ষক বলতে মাত্র একজন। তিনিই এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বুলেটিনে অন্য যে সব শিক্ষকদের নাম আছে, তাঁরা বস্তুত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী, অবৈতনিকভাবে এখানে শিক্ষকতা করেন। এখানকার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে?……ওই সব শিক্ষকদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এখানে কোনদিন শিক্ষকতা করেন নি। এমন কি এখানে শিক্ষকতা করবেন বলে সম্মতি জানান নি, এ রকম লোকের নামও ওই নামের তালিকায় আছে।

(দুই) প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত পোস্ট এম এস সি কোর্স পরিচালনার ব্যাপারে বহু শিক্ষকেরই মতামত গ্রহণ করা হয় না।…… এই কোর্স যথেষ্ট উঁচু মানেরও নয়। এই কোর্সের যে পাঠক্রম আছে, তার অনেকটাই লোক দেখানো, তার সম্পূর্ণ অংশ নির্দিষ্ট এক বছরের মধ্যে পড়ান সম্ভব নয়। বস্তুত তার বহু অংশই ছাত্রদের পড়ানো হয় না। এই কোর্সের পরীক্ষাও নিয়মিত হয় না। অনেক পরীক্ষাই যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নি।

(তিন) যে সব শিক্ষক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং এখানে অবৈতনিকভাবে কাজ করেন, তাঁদের লিখিত গবেষণাপত্রগুলিকে (যে গবেষণার সঙ্গে এখানকার কোন সম্পর্ক নেই) এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে গণ্য করে প্রতিষ্ঠানটির বুলেটিনে যে দাবী করা হয়েছে, তা নিশ্চয় ন্যায়সঙ্গত নয়।

(চার) ভৌত বিজ্ঞান চর্চার জন্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। অথচ পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই।

(পাঁচ) প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের একটি অংশমাত্র হিসেবে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটিকে এইভাবেই রাখার জন্যে সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে এটি কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ হওয়ার যোগ্য নয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জড়িত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার আগে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তার প্রায় কিছুই করা হয় নি।'

*

বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী বর্তমান লেখকের কাছে মন্তব্য করেছেন 'আমরা দেখেছি ভারতে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা নাম বহন করছে এক এক একজন বরেণ্য বিজ্ঞানীর। ওই সব প্রতিষ্ঠান হঠাৎ একদিনে জন্মায় নি। যাঁদের নাম তারা বহন করছে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের দূরদর্শিতা, চেষ্টা, গবেষণা এবং পরিকল্পনা মত ওই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। গড়ে তোলার ব্যাপারে মূল নেতৃত্বও ছিল তাঁদের। তাঁদের কৃতিত্ব এবং অবদানের সম্মানে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। উদাহরণ সাহা ইনসটিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস (স্বর্গত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নামে) ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, বীরবল সাহানী ইনসটিটিউট, বসু বিজ্ঞান মন্দির (আচার্য জগদীশচন্দ্রের নামে), রামন ইনসটিটিউট, প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনসটিটিউটের পেছনে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের দিক দিয়ে কোন দিনই এ ধরনের প্রচেষ্টা আমরা দেখিনি।'

সে যাই হোক, বর্তমান লেখকের বিনীত নিবেদন, ২৮ আগস্টে প্রকাশিত তাঁর রচনায় কেউ যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন, তার জন্যে তিনি দুঃখিত। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করার ধৃষ্টতা এ লেখকের নেই। শ্রীযুক্ত
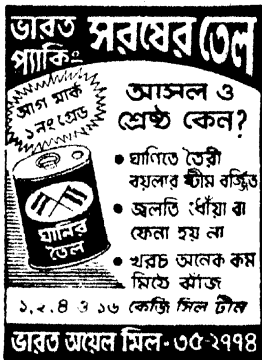
যুগলকান্তি রায় মহাশয় বর্তমান লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'যে সব মন্তব্য করেছেন...অপরের মুখে শুনে।' এবং সঙ্গে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন—'কানপাতলা নিশ্চয়।' জানি না, নিছক অনুমানবশত এ ধরনের মন্তব্য, কেন তিনি করলেন। যা একান্তই অর্থহীন এবং ঠিক নয়। তাঁর অবগতির জন্যে জানাই, ১৯৭৩ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন জীবিত, সেই সময় জাতীয় অধ্যাপকের ৮০তম জন্মজয়ন্তী পালন এবং তাঁর অসামান্য অবদান 'বসু সংখ্যায়ন' বা 'বোস স্ট্যাটিসটিকস'-এর পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে কোমিটি তৈরি হয়, যে কমিটির সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরয় উপাচার্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাদেব দত্ত, বর্তমান লেখক সেই কমিটির সদস্যও ছিলেন। কমিটিতে ঠিক হয়, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। সে কাজ এখনও বাকি। পরে হঠাৎ গড়ে উঠল সত্যেন্দ্রনাথ ইনসটিটিউট। ফাঁকে ফাঁকে এই ইনসটিটিউট সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্যও কানে এল। উপরে উদ্ধৃত কোন কোন পত্রলেখক যে ধরনের মন্তব্য করেছেন, সেই ধরনের।

বিতর্ক থাক। ২৮ আগস্টে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে সমস্যাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি (এমন নতুন কিছুও নয়) সেটা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে নয়, দেশের অনেক নামী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বলেই কোন প্রতিষ্ঠানের নাম করার ব্যাপারে বিরতি টেনেছি। আসলে যা বলতে চেয়েছি, সেটা হল, যাঁরা যোগ্য বিজ্ঞানী তাঁরা যথাযথ কাজের সুযোগ পান। যে সব তরুণ ছাত্র এবং গবেষক প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা রাখেন তাঁরা যেন অলক্ষে না থেকে যান। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করার মত উপযুক্ত সাহায্য পান। কোনু রকম খামখেয়ালিপনা, দীর্ঘসূত্রিতা অথবা অনীহার শিকার হয়ে না পড়েন।

কোন কোন পত্রলেখক বিজ্ঞানীদের নিয়মিত গবেষণা এবং সমস্যাদি দেখার ব্যাপারে ওই রচনায় যে জাতীয় কমিটির কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। খানিকটা হতাশাও। তাঁদের বক্তব্য, উপযুক্ত সংগঠন, পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ করার দায়িত্ব যাঁদের হাতে গিয়ে পড়ে, অন্তত দীর্ঘকাল পড়ে আসছে, তাঁরা যেভাবে চলছেন তাতে কাজ হবে না। দরকার প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, উদার মানসিকতা এবং সত্যিকারের গুণীজনকে স্বীকৃতি দেবার মত বিশ্লেষণধর্মী বলিষ্ঠ মন।

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পর নানা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন হলেও (ভালর দিকে) বিজ্ঞানী মহলের মধ্যে থেকে এসব ত্রুটির তেমন লাঘব হয়নি। দেশের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের রূপায়ণে অনেক ক্ষেত্রে এটাই এখন বড় রকমের বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে।

সমরজিৎ কর

আলোচনা

এশিয়াটিক সোসাইটি

দেশ পত্রিকায় শ্রীমতী সবিতা রায় এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন। ওই চিঠি পড়লেই বোঝা যায় যে, এটি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা।

এই চিঠিতে বলা হয়েছে যে, সোসাইটি তন্ত্রযান শিল্প সংক্রান্ত একটি গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু লেখিকা এ কথা উল্লেখ করেননি যে, এই পরিকল্পনার পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী। ওই পদে নিযুক্ত হওয়ার সময় তিনি সোসাইটির সভাপতি বা পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন না। প্রকৃত তথ্য এই যে, এই প্রকল্পের রিপোর্টে ওই প্রকল্পে নিযুক্ত কোন্ গবেষক কি কাজ করেছেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ওই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যাবে যে, এই সম্পর্কে লেখিকার অভিযোগ কিরূপ ভিত্তিহীন।

ওই রিপোর্ট প্রকাশের আগে সোসাইটি Tantrayana Art Album নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করছেন। এর Notes এবং Introduction লিখেছেন শ্রী সরস্বতী। এতে উপর্যুক্ত প্রকল্পে নিযুক্ত কোন্ গবেষক কি কাজ করেছেন তার উল্লেখ আছে।

প্রকল্পের পরিচালক প্রকল্প সংক্রান্ত রিপোর্টের সম্পাদক হবেন এটাই স্বাভাবিক। তার মানে কি এই দাঁড়ায় যে, তিনি অন্য গবেষকদের আহৃত তথ্যাদি নিজের নামে প্রকাশ করছেন?

এই Art Album-এর ছাপার খরচের জন্য কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নাই বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা মিথ্যা। ইউনেসকো এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু অর্থসাহায্য করেছেন। এ ছাড়া আরও অর্থসাহায্য পাওয়া গেছে। ভারত সরকার ও ইউনেসকো থেকে আরও অর্থসাহায্য পাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ওই বই কেনার যথেষ্ট অগ্রিম অর্ডার গ্রহণ করার জন্য সোসাইটির কাছে প্রস্তাব এসেছে। সুতরাং এই বই বিক্রয় করা দুঃসাধ্য কাজ হবে না। কাজেই এটি সোসাইটির 'বোঝাস্বরূপ' বলে পরিগণিত হতে পারে না।

শ্রীমতী সবিতা রায় লিখেছেন যে, শ্রী সরস্বতী তন্ত্রযান শিল্প সংক্রান্ত ফাইল তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন এবং কিছু দিন বাদে ব্যক্তিগত শীলমোহর বন্ধ করে সোসাইটির অফিসে ফেরত দিয়েছেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর থেকেই বোঝা যায় যে, লেখিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটানো। এই হীন প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করা উচিত সকলেরই।

আর একটি কথা, শ্রীমতী সবিতা রায় সোসাইটির তরফ থেকে শ্রীশিশিরকুমার মিত্রর বিকানীরে যাবার ব্যাপারে একটি মিথ্যা কথা লিখেছেন। শ্রী মিত্রকে পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনের জন্য বিকানীরে পাঠান সোসাইটির পরিচালক সমিতি, কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়। ওই পরিচালক সমিতির একটি সভাতেই শ্রী মিত্র কর্তৃক প্রেরিত সংশ্লিষ্ট বিলটি অনুমোদিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই সভাতে শ্রী সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, তিনি তখন ভারতের বাইরে ছিলেন।

উপরের তথ্যগুলি থেকে এ কথা স্পষ্ট

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মমত সম্পর্কিত নানা জটিল প্রশ্নে যে বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অবধারিত ছিল তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশীয় স্বীকৃতির অনেক আগেই তিনি পেয়ে গেলেন বিদেশের সমাদর। রবীন্দ্রনাথের ওই সম্মানে দেশের একদল ঈর্ষাজর্জরিত মানুষ যে যুক্তিহীন ও বিবেকহীন আক্রমণে কবিকে বিক্ষত ও বেদনার্ত করে তুলেছিলেন এবং ওইসব মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ সংযম ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারই তথ্যনিষ্ঠ দলিল সুজিতকুমার সেনগুপ্ত রচিত "জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল" আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

হয় যে, শ্রীমতী রায় কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর মিথ্যার বেসাতি সাজিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা নিন্দনীয়।

ফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়
সদস্য, পরিচালক সমিতি,
এশিয়াটিক সোসাইটি
কলিকাতা-১৪

॥ ২ ॥

আপনাদের দেশ পত্রিকায় (৪৫ সংখ্যা, তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) সবিতা রায় নামাঙ্কিত এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে যে পত্রটি ছাপা হয়েছে, তার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অভিসন্ধিমূলক। সোসাইটির ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ তারিখের মাসিক সাধারণ সভায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই অসত্য কথনের প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আপনাদের জানানো প্রয়োজন যে, তন্ত্রযান শিল্প সম্পর্কীয় য়ুনেসকো-সোসাইটির যুক্ত প্রকল্পের সহিত অধ্যাপক সরস্বতী পরিচালকরূপে পূর্বাবধি যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে এই কার্য ১৯৭৩ সালে সম্পন্ন হয়। তন্ত্রযান শিল্প সম্পর্কীয় অ্যালবাম য়ুনেসকো অনুমোদিত একটি পৃথক প্রকল্প। এই প্রকল্পটির রূপায়ণের দায়িত্বও সোসাইটি কর্তৃক অধ্যাপক সরস্বতীর উপর অর্পিত হয়। আরও জানানো প্রয়োজন যে, অধ্যাপক সরস্বতী যখন তন্ত্রযান প্রকল্পের সহিত যুক্ত হন তখন তিনি সোসাইটির সভাপতি এমন কি পরিচালক সমিতির সদস্যও ছিলেন না।

সবিতা রায় নাম্নী এশিয়াটিক সোসাইটির কোন সদস্যা বা কর্মীর নাম আমাদের জানা নেই।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটি

॥ ৩ ॥

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটি সংক্রান্ত একটি চিঠিতে আমার নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তারই প্রতিবাদে এই চিঠির অবতারণা।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে তন্ত্রযান শিল্প সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হয় অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর অধীনে। তিনি যখন ওই প্রকল্পের পরিচালক নিযুক্ত হন, তখন তিনি ওই সংস্থার সভাপতি বা পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন না। ওই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমি, অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য শ্রীদীপক ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা। ওই প্রকল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রী সরস্বতীর তত্ত্বাবধানে তাঁদের অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ওই অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাদির সহিত শ্রী সরস্বতী মহাশয় তাঁর নিজের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি যুক্ত করেন এবং সম্পূর্ণ তথ্যাদিকে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করে রিপোর্ট তৈয়ারী করেন। এই রিপোর্টে কোন গবেষক কি কাজ করেছেন এবং কত-

টুকু কাজ করেছেন, তা পরিষ্কারভাবে লিখিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের বাদ দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রকল্পের পরিচালক হিসাবে স্বভাবতই শ্রী সরস্বতী এই রিপোর্টটির সম্পাদকরূপে পরিগণিত হবেন।

এই রিপোর্ট প্রকাশ করার আগে Tantrayana Art Album নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পুস্তকটির Notes এবং Introduction লিখেছেন শ্রী সরস্বতী। এই পুস্তকে প্রকাশিতব্য তথ্যাদি চয়নের কার্যে উপর্যুক্ত গবেষকদের যা ভূমিকা তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সুতরাং শ্রী সরস্বতী অন্য গবেষকদের আহৃত তথ্যাদি নিজের নামে চালাবার প্রচেষ্টা করেছেন বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অভিযোগকারিণীর হীন মনোভাবের পরিচায়ক।

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-২

[এ সম্পর্কে আর কোনো পত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়]

'দত্তা' সমালোচনা প্রসঙ্গে

'দেশ' পত্রিকায় 'দত্তা' ছায়াছবির সমালোচনার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত তপন সিংহের চিঠিটা পড়লাম। পড়ার পর তপনবাবুর আহ্বান শুনে (যদিও তা রঞ্জনবাবুকে করেছেন) চলচ্চিত্র সম্পর্কে শেখার ব্যাপারে আমার মতন একজন সাধারণ দর্শকের বাসনাটা প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিম্নলিখিত কতকগুলো বক্তব্য, ঘটনা আমার ওই আগ্রহকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। আশা করি তপনবাবু তাঁর সুচিন্তিত মতামতের দ্বারা আমার বিভ্রান্তিকে দূর করে দেবেন।

'...বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গে যে সামাজিক বিপর্যয় চলছিল, তাতে আমাদের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।... বাংলা চলচ্চিত্র মার খেতে বসেছিল। এবং এই কারণেই 'সাগিনা মাহাতো' বম্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' (আন্তর্জাতিক আঙ্গিক, শরৎকালীন সংখ্যা, ১৩৭৯)। কিন্তু ওই একই সংখ্যায় মৃণাল সেন বলেছেন, '...দু-চার দিন অসুবিধা হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে খুব সাহস করে বুক ঠুকে কাজ করি। তারপর স্বাভাবিক অবস্থা, অন্ততঃ স্টুডিওর কাজকর্মে ফিরে আসে।'—এটা কি 'বাংলার মাটি গায়ে মাখুন, বাংলার জলে স্নান করুন' উপদেশের নমুনা?

তারপর তপনবাবু ওই সংখ্যাতেই কলকাতার স্টুডিওর যান্ত্রিক অসুবিধার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, '...বাংলা ছবি যেহেতু ফরিন্ মানি আনার নয়, তাই যন্ত্র আনার স্কোপ কম। তাই আপস করতেই হয়। এমন কি মূলে চলচ্চিত্র-ভাবনা থেকেও সরে আসতে হয়।' —শত অসুবিধার মধ্যে আর দুজন পরিচালক কিভাবে কাজ করে যাচ্ছেন? তাঁরা কি আপস করে চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যস্ত?

তপনবাবু আরও এক জায়গায় বলেছিলেন, ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের জন্য নাকি স্বাধীনভাবে ছবি করতে পারেন না। স্বাধীনতা বলতে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তা হলে ভারতীয় চলচ্চিত্রে কলকাতা ৭১', 'পদাতিক', 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো', 'জন অরণ্য' ছবিগুলো কিভাবে নির্মিত হলো?

উপরের প্রশ্নগুলো 'দত্তা' ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে নয়। কিন্তু একজন যখন কিছু শিখিয়ে দেবেন বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

খুশী হতাম বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে একজন স্কুল-ছাত্র চলচ্চিত্রের লঙ শট, ক্লোজ শট ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারলে। তা হলে আর বাংলা ছবিকে বাঁচানোর জন্য আইনের প্রয়োজন হতো না। যেদিন ৮০ শতাংশ দর্শক চলচ্চিত্রের ক্রিয়েটিভ ব্যাপারটা বুঝতে শিখবে সেদিন 'আপনজন', 'এখনই', 'রাজা', '[illegible]র পেরিয়ে', 'সাগিনা মাহাতো' প্রভৃতি ছবিগুলোকে আস্তাকুড়েতে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

সুধাময় তালুকদার
কলকাতা—৪৮

॥ ২ ॥

১৪ আগস্ট-এর 'দেশ'-এ 'দত্তা' ছবির সমালোচনার জন্য রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎসহ 'দেশ' সম্পাদককে ধন্যবাদ এতগুলো সত্যি কথা লেখার জন্য এবং এরকম একটি আনকনভেনশনাল লেখা ('দেশ'-এর পক্ষে) বহু দিন পর প্রকাশ করলেন বলে। দুজনেই মনে হয়, টালিগঞ্জের প্রথম সারির ব্যবসায়িক পরিচালকদের ঈষৎ ক্রোধের খোরাকি বহন করবেন। কারণ, হিট বাংলা ছবির নির্মাতারা ভেবে নিয়েছিলেন যে, তাদের বিশুদ্ধ মূর্খতা দর্শক অনন্তকালের জন্য চোখ বুজে সহ্য করে যাবেন। ভাবা যায়, বিংশ শতকের শেষার্ধে কলকাতা শহরে প্রদর্শিত হচ্ছে শিশু-হাসানো, কুৎসিত রুচির 'হারমোনিয়ম'

কিংবা মধ্যবিত্ত সেণ্টিমেণ্টের ষাঁড়দেভরা 'দত্তা'! তৃতীয়বার 'দত্তা' চিত্রায়িত হবার পর বুঝতে পারলাম শরৎচন্দ্রের প্রতি বাঙালী পরিচালকদের এত মমতা কেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতি অবশ্যই সুবিস্তৃত, সেই তুলনায় তাঁর রচনার সাহিত্যমূল্য কত সেটা তর্কাধীন—কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, তিনি কয়েকটি রমরমা বাংলা ছবির জন্য কিছু গল্প লিখে গিয়েছিলেন। প্রহরশেষের আলোয় রাঙা ঝিলের ধারে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা, আর অন্য দিকে নায়িকার বাড়ির ভেতরে গড়ে উঠছে হিতাকাঙ্ক্ষীবেশী ভিলেনের চক্রান্ত! দম আটকানো সাসপেন্স! এবং সর্বোপরি রয়েছে 'অষ্টাদশী' বিজয়া! উঃ, ভাবা যায়, সেই ভূমিকায় পঞ্চাশোর্ধ, কসমেটিক-সর্বস্ব সুচিত্রা সেন! তার ওপর আবার প্লাস্টিকের ফুল, অতি দ্রুত ব্যাক-প্রোজেকশন এবং আধুনিক ধাঁচের রবীন্দ্রসংগীত! ভাগ্যিস, সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন এখনো বেঁচে আছেন!

অরূপ দে
কলকাতা-১৯

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ দিন

গত ২৮ অগস্ট ১৯৭৬ তারিখের 'দেশ'-এ 'রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ দিন : স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতি দিনের বিবরণ' প্রসঙ্গে শ্রীমোহিত চক্রবর্তী, ডাঃ মুরলী সেনগুপ্ত এবং ডঃ কল্যাণকুমার দত্তের চিঠি তিনখানি পড়লাম। তাঁদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে যে যে তথ্য আমাদের হাতে আছে তা এখানে পেশ করা হল।

১। মোহিতবাবু কবির মৃত্যুক্ষণকে বেলা ১২টা ১৩ মিনিট বলে জানিয়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আমরা ৭ অগস্ট ১৯৪১-এ প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখছি উল্লেখ করা হয়েছে—" দীর্ঘ দিনের রোগভোগের পর কবি রবীন্দ্রনাথ ৮১ বৎসর বয়সে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় পরলোকগমন করেন।"

প্রতিমা দেবীও তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন, "...বারোটা দশ মিনিটে গুরুদেবের নির্লিপ্ত আত্মা দেহবন্ধন থেকে মুক্তি পেল।" [নির্বাণ, পৃ ৬৬]

শ্রীমতী রানী চন্দ শেষ দিনে সর্বক্ষণ কবির শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "...বেলা দ্বিপ্রহর বারোটা দশ মিনিটে আমাদের গুরুদেবের শেষ নিশ্বাস পড়লো।" [প্রবাসী, ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃঃ ৭৪৭]

সুতরাং, এ বিষয়ে মনে হয় ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত গেজেটের চেয়ে যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের বিবরণের উপর এবং সেদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করাই বেশী যুক্তিসঙ্গত।

২। মুরলীবাবুর আশঙ্কা, কবির হয়তো বা শেষ অবধি টিটেনাসে মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁর এ সংশয়ের অবসান ঘটানোর এক্তিয়ার অবশ্য আমাদের নেই। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাথমিক যে রোগের জন্য কবির উপর অপারেশন করা হয়েছিল সে রোগটির নাম 'এনলার্জ্‌ প্রস্টেট' বা 'প্রস্টেটিক এনলার্জমেণ্ট'। [দ্রঃ নির্মলকুমারী মহলানবিশ, বাইশে শ্রাবণ, পৃ ১৮১]

৮ অগস্ট ১৯৪১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকাতেও উল্লেখ করা হয়েছে, কবির 'মূত্রাশয়ের পীড়ার' অপারেশন হয়েছিল।

৩। কল্যাণবাবুর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, 'নির্বাণ'-এর পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর সংগ্রহে নেই এবং কবির ওই দশ দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিবরণও প্রতিমা দেবীর হাতে লেখা নয়। প্রকৃতপক্ষে, কবিকে যখন চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাওয়া হল তখন প্রতিমা দেবী অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতনেই শয্যাশায়ী ছিলেন। অপারেশনের ৫ম দিনে ৩ অগস্ট কবির আশঙ্কাজনক অবস্থার খবর পেয়ে তিনি কলকাতা পৌঁছলেন [দ্রঃ নির্বাণ, পৃ ৬৩]। আসলে যে খাতাটিতে কবির প্রতি দিনের অবস্থা লিপিবদ্ধ করা আছে সেটি কোন একজনের লেখা নয়। যখন যিনি কবির পরিচর্যার কর্তব্যে থাকতেন তখন তিনিই ডাক্তারদের নির্দেশমত কবির শারীরিক অবস্থার বিবরণ লিখে রাখতেন, আর তাঁদের মধ্যে ছিলেন রানী চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, নন্দিতা কৃপালনী প্রমুখ হয়তো আরও কেউ কেউ।

গৌরচন্দ্র সাহা
শান্তিনিকেতন
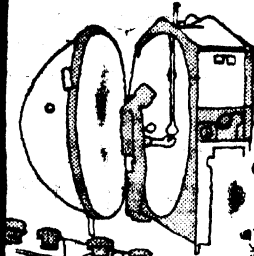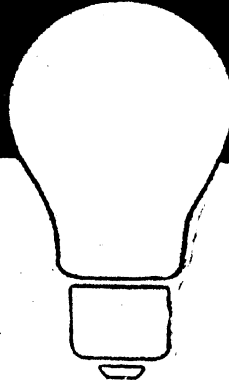
সব রকমেই ভাল বাল্ব
ফিলিপ্স বাল্ব
ক্রেতাদের কাছে সুনাম অর্জনের জন্যে আমরা কঠিন পরিশ্রম করেছি। তাঁদের আস্থা বজায় রাখা সহজ কাজ নয়।
এর জন্যে, আমাদের গুণমান নিয়ন্ত্রণের কঠিনতম উপায় অবলম্বন করতে হয়। প্রতিটি ল্যাম্পকে ৪৭ টি গুণমান – নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।
ফলে প্রতিটি ল্যাম্প হয়ে ওঠে উচ্চতম আন্তর্জাতিক গুণমানসম্পন্ন।
আস্থা রাখেন বলেই আপনাদের সেরা জিনিষ দেওয়া আমাদের কর্তব্য।
ফিলিপ্স—ল্যাম্প ও আলোর জগতে অগ্রণী
PHILIPS
ফিলিপ্স
ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

॥ ১৬ ॥

মানুষ-বাজার থেকে ফিরে আকবরকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো। দশ এবং বাইশ নম্বর ঘরে অনেকগুলো দরজা-জানলার কব্জা উধাও হয়ে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

আকবর বললো, "আধ দিন বলছেন। হুজুর, এ বাড়িতে আধ বছরের কাজ জমা হয়ে আছে।"

"তোকে বাজে বকতে হবে না। কাজ-কর্ম সেরে রোজ নিয়ে তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যা।" সস্নেহ বকুনি লাগিয়ে বরদা-প্রসন্ন অপ্রিয় প্রসংগটা এড়িয়ে গেলেন। আকবর যে খুব বাড়িয়ে বলেনি, তা বরদা-প্রসন্নর কণ্ঠস্বর থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আকবরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে বরদাপ্রসন্ন এবার আমাকে বললেন, "একটুও মিথ্যে বলেনি আকবর। এ-বাড়ির এখন হাড়-মড়মড়ি ব্যারাম ধরেছে। সব কটা দরজা-জানলাই একবার মেরামত করিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। অ্যাদ্দিন যে কীভাবে চলেছে তা ভগবান রামচন্দরই জানেন। নেহাত বার্মা-সেগুন তাই এখনও টিকে রয়েছে। কিন্তু স্ক্রু এবং কব্জা তো বার্মা থেকে আসে নি।"

আমি গম্ভীরভাবে ম্যানেজারোচিত ব্যবহারের চেষ্টা করলাম। জানতে চাইলাম, "এতোদিন এসব রিপেয়ার হয়নি কেন?"

"সেসব জিজ্ঞেস করে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন বরদা-প্রসন্ন। বুঝলাম, এর পেছনেও কোনো অস্বস্তিকর অভিযোগ আছে, যা বরদাপ্রসন্ন এই ভোরবেলায় আমার সঙ্গে আলোচনা করতে উৎসাহী নন।

"কিছু বলবেন?" আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

গম্ভীর হয়ে বরদাপ্রসন্ন উত্তর দিলেন, "মনিব হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা দেবতা। কত পাপ করেছি তাই এই ঠাকুরে মানসনে 'নিষ্কাসন যন্ত্রণা' ভোগ করছি। পাপ আর বাড়াবো না স্যার!"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "দরজা-জানলার এই অবস্থা তো রাখা চলে না। মেরামতির একটা হিসেব করে রাখা প্রয়োজন। সমস্ত বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে একটা এস্টিমেট তৈরি করে ফেলতে চাই। লিখিত হিসেবপত্তর থাকলে কাজ-কর্মের সুবিধে হয়। মালিকের সঙ্গে সোজা-সুজি কথাবার্তা বলা যায়।"

ফিক করে হেসে ফেললেন বরদাপ্রসন্ন। "লেখাই সার হবে। এ-বাড়িতে কত দরজা জানলা আছে, জানেন?"

এই ধরনের সেনসাসের কথা আমার মাথায় ছিল না। অর্ধনিমীলিত চোখে বরদা-প্রসন্ন দ্রুত মানসিক হিসেব করতে লাগলেন। এ বাড়ির প্রতিটা দরজা-জানলার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে মনে হচ্ছে। চোখ খুলে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আমার হিসেব রেডি।"

আমি একটু গম্ভীরভাবেই ও'র মুখের দিকে তাকালাম। বরদাপ্রসন্ন ঘোষণা করলেন, "সবশুদ্ধ [illegible] দরজা জানলা আছে স্যার। তার মধ্যে বারশ সাতাত্তরখানারই বোধ হয় তদারকী প্রয়োজন।"

তিনখানা বাদ দিলেন কেন বরদাপ্রসন্ন? একগাল হেসে ফেললেন তিনি। বললেন, "রামসিংহাসনের ঘরের দরজা-জানলাগুলো বেশ ভাল কণ্ডিশনেই আছে।"

অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ও-ব্যাপারে আলোচনা চালাতে উৎসাহ প্রকাশ করলাম না। আমার উৎসাহের অভাব সত্ত্বেও কী হতো জানি না, কিন্তু অকস্মাৎ দশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে আকবর বেরিয়ে এসে আমার সুবিধে করে দিল।

আকবর বললো, "ফর্দটা লিখে নিন, হুজুর। মালপত্তরগুলো তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিন। কব্জাগুলো সবই পাল্টাতে হবে।"

"পালটাতে হবে!" খবরটা শুনে বরদা-প্রসন্ন যে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না তা তাঁর

কথার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আকবর বললো, "কব্জার আর দোষ কী? দেখে মনে হচ্ছে, একশ বছর মালিকের সেবা করেছে। আর কদ্দিন জল-ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করবে? কব্জা বলে কি পেনসেন নিতে সাধ হয় না!"

অনিচ্ছুক বরদাপ্রসন্ন পকেট থেকে নোটবই বার করে আকবরের মালের তালিকা লিখে নিলেন।

আকবর বললে, "এর মধ্যে চারখানা পাল্লা বাইরের। সেই বুঝে মাল কিনবেন। লোহার কব্জা এবং ইসকুরুপ আনলে তিন হপ্তা পরে আমাকে আবার ডেকে পাঠাতে হবে।"

"তোমাকে ওই জন্য ডাকতে ইচ্ছে করে না আকবর। সব সময় বড় বড় অর্ডার! আকবর, এটা সম্রাট শাজাহানের প্যালেস নয়—এটা ঠাকরে ম্যানসন। ভাড়া-বাড়িতে কোন্ সাহসে তুমি পিতলের কব্জা এবং পেরেক চাইছো?"

"বাইরের জানলা যে হুজুর। সব সময় জল-হাওয়া লেগে মরচে পড়ে যাবে। পিতলের জিনিসে তার ভয় নেই।"

"যত মধু ঢালবে তত মিষ্টি লাগবে তা আমিও জানি, আকবর।" মৃদু বকুনি লাগালেন বরদাপ্রসন্ন।

আকবর আবার দশ নম্বর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। বরদাপ্রসন্ন এবার বললেন, "শুনলেন তো? ওই ক'খানা পাল্লা পরাতেই একশো টাকার মেটিরিয়াল অর্ডার দিল। উপায়ও নেই। সেদিন একখানা পাল্লা খুলে দড়াম করে তিনতলা থেকে একতলায় পড়েছে। ভাগ্যে কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। থাকলে নির্ঘাৎ মৃত্যু! পুলিসের যা স্বভাব, হয়তো সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে শালাকেই কোমরে দড়ি দিয়ে হাজতে নিয়ে যেতো।"

"যাক! আপনি এসে গেছেন—এসব দায়িত্ব আমার চুকে গেল", এই বলে বরদাপ্রসন্ন বেরিয়ে গেলেন। মনে হলো, তিনি আকবরের জিনিসগুলো কেনার জন্য কাছাকাছি কোনো দোকানে ছুটলেন।

কিছুক্ষণ একা-একা ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পাওয়া গেল। আমার সঙ্গে কেউ নেই। থ্যাকারে ম্যানসনের এই বিচিত্র জগতটা দিনের আলোয় নিজের চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না-দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এ-বাড়ির প্রতিটা বাঁক এবং গলি-ঘুঁজি ঠিক মতো চিনতে আমার অনেক সময় লাগবে। রাতের অস্পষ্ট আলোতে যা দেখেছিলাম দিনের উজ্জ্বল আলোতে তাকেই অন্যরকম মনে হচ্ছে।

একলা-একলা থ্যাকারে ম্যানসনের করিডর ধরে হাঁটতে বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করছি। নতুন চাকরি পেয়ে আমি যেন রাতারাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আমি কেমন শান্তভাবে গম্ভীরমুখে নিজের মধ্যে নিজেকে সমাহিত রেখে এগিয়ে চলেছি—যেন আমার হাঁটার কায়দাই পাল্টে গেছে! বেকারদের হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়—কথাটা নিছক বানানো নয়।

বিভিন্ন তলায় পাক খেতে খেতে এবং দরজায় লেখা বিভিন্ন নামের প্লেটগুলো দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে কতরকম ছেলেমানুষী প্রশ্ন জাগছে। এইসব নামাঙ্কিত সামন্তানী, ভাবনানী, কারনানি ডিসুজা ছাবড়ারা কারা? এঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় না হলেও, একদিন সবাইকে আমি চিনে ফেলবো, জেনে ফেলবো। তখন এইসব নেমপ্লেটগুলোর সঙ্গে এক একটা পরিবারের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

এই এতোদিন পরে থ্যাকারে ম্যানসনের ইতিবৃত্ত লিখতে বসে ভাবি, মনটা তখনও কত সবুজ ছিল—নতুন মানুষ সম্বন্ধে জানবার কী অদম্য নিষ্পাপ কৌতূহল ছিল মনে। কর্মজীবনের চাপে পড়ে স্বাভাবিক এই আকর্ষণ ধীরে-ধীরে কখন যে নষ্ট হয়ে যায় তা নিজেরও খেয়াল থাকে না। অভিজ্ঞতার গরম ইস্তিরির চাপে বিধ্বস্ত মনটা পরামর্শ দেয়, তুমি তোমার নির্ধারিত কাজটুকু করে মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করে মাইনে পকেটস্থ করবার জন্যেই তোমার জন্ম—কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে, কী করে, কেমন লোক, তা জেনে তোমার কী হবে? তাতে তোমার মাইনে তো বাড়বে না!

হয়তো এই ধরনের মানসিকতাই কর্মজীবনের পক্ষে উপযুক্ত। হয়তো এইভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখাই সংসারের পিচ্ছিল পথে নিরাপদ। কাউকে চেনা মানেই তাকে জানার পথ প্রশস্ত হওয়া। আমার এক বৃদ্ধা দিদিমা বলতেন 'জানা মানেই কানা হওয়া!' কারুর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হলেই তার সম্বন্ধে হয় পছন্দ, না-হয় অপছন্দের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে—দৃষ্টি কিছুতেই আর স্বচ্ছ স্বাভাবিক থাকে না।

সেদিন এসব প্রশ্ন তখনও মনের মধ্যে উঁকি মারেনি। বয়স তখন কম, শাজাহান হোটেলের অবিশ্বাস্য জগতে সত্যসুন্দরদার স্নেহপ্রশ্রয় থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছি। মানুষ ও পৃথিবী সম্বন্ধে তখনও এক অদ্ভুত ধারণা করে বসে আছি। মানুষের সান্নিধ্যে এলেই তাঁকে জানতে ইচ্ছে করে—তাঁকে ভালবাসার জন্যে মনটা ছটফট করে।

থ্যাকারে ম্যানসনের করিডর ধরে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরছি, এখানে অনেকেই আমাকে এখনও চেনে না। একজন ভদ্রলোক তো

সুট পরে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে দেখে রীতিমত সন্দেহ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই আমি?"

নিজের পরিচয় এড়িয়ে বললাম, "কিছুই চাই না আমি। ধন্যবাদ।"

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে এই-ভাবে হঠাৎ যে ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম সেখানে এক ঘোষ মহাশয়ের নামাঙ্কিত রয়েছে। আর সি ঘোষ। রামচন্দ্র কিংবা রমেশচন্দ্র ওই ধরনের কিছু একটা হবেন নিশ্চয়। নিজের দেশের লোকের নাম দেখে মনটা হঠাৎ ছটফট করে উঠলো। ইচ্ছা হলো একটু আলাপ করি। নিজে থেকে আলাপের অনেক সুবিধা। বরদাপ্রসন্ন অথবা রামসিংহাসনের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করলে এ-বাড়ির সব ধরনের মানুষের সঙ্গে সহজ আমার পরিচয় কোনদিনও না-হতে পারে।

মনে মনে ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে একটা ছবিও এঁকে নিলাম। এ-পাড়ার বঙ্গ-সন্তান নিশ্চয় একটু সাহেবী মেজাজের হবেন। হাওড়া অথবা ভবানীপুরের মার্কামারা গৃহস্থ জীবনযাত্রা এই সাডার স্ট্রীট অথবা সাডার লেনে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। দেখে-শুনে যে মিস্টার ঘোষ এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন তাঁর প্রয়োজন ও রুচি নিশ্চয় সাধারণ বাঙালী-জীবন থেকে একটু আলাদা।

ঘোষজায়ার একটি ছবিও মানসপটে এঁকে নিতে দেরি হলো না। ধরে নিলাম, তিনিও প্রকৃতিতে মেমসায়েব হবেন। মেম-সাহেবী মেজাজ ছাড়া এই থ্যাকারে ম্যানসনে দিনের পর দিন সংসারযাত্রা নির্বাহ করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয় সম্ভব হতো না। দীর্ঘদিন ধরেই যে এঁরা এখানে ভাড়া রয়েছেন তা বরদাপ্রসন্নর খাতা না-খুলেই আমি বলে দিতে পারি। এ-ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটই তার ইঙ্গিত বহন করছে। নামের ওপর জমে-ওঠা ধুলোর পরিমাণ থেকে সহজেই বলে দেওয়া যায়, রামসিংহাসন চৌরঙ্গীপাড়ার সাইন আর্টিস্টকে এখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করতে হয়নি।

এসব খবর একেবারে খোদ ঘোড়া অর্থাৎ শ্রীআর সি ঘোষ মহাশয়ের মুখ থেকেই এখন জানতে পারবো। থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি নিজেও নিশ্চয় খুশী হবেন। হয়তো, এ-বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে এমন সব কথা শ্রীঘোষের মুখ থেকে শুনবো যা আমাকে কিছুটা অভিজ্ঞ করে তুলবে, হয়তো আমি নতুন পথও দেখতে পাবো।

বেল বাজাতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। রামসিংহাসনের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল। হয়তো রিপেয়ার সংক্রান্ত-নানা অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি এখনই আমাকে মন দিয়ে শুনতে হবে এবং কিছু কিছু কাজ দ্রুত করিয়ে দিতে না-পারলে মান-সম্মান থাকবে না।

এ-বাড়ি সম্পর্কে আমার যে এখনও কোনো অভিজ্ঞতা নেই তা ক্ষণেকের উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছি। দুঃসাহসী মন আমাকে উৎসাহ যোগাবার জন্যে বললো, 'তুমি না এখন এই ঐতিহাসিক থ্যাকারে ম্যানসনের কর্তা? এ-বাড়িতে যারা ভাড়া দিয়ে থাকে তাদের সুখ-দুঃখ সুবিধে-অসুবিধার কথা জানাটাই তো তোমার কাজ। অপ্রিয় বক্তব্য শুনতে এতো সংকোচ কেন?'

জয় মা কালী, আমি বেল টিপে দিচ্ছি। কেমন বুঝলে আমি নিজেই ফ্ল্যাটের সুবিধে-অসুবিধের কথা জানতে চাইবো। আদর্শ ম্যানেজারের তাই তো কর্তব্য!

বেল বাজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। বেল বাজছে কিনা তাও এখান থেকে বুঝতে পারছি না। এক-একটা বেল রীতি-মত বেয়াড়া থাকে—অপরিচিত লোকের হাতের মর্দনে প্রথমবারে সাড়াই দেয় না। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার বেল-টেপার

কথা ভাবছি, এমন সময় ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হলো।

আমান্য ফাঁক দিয়ে একটি প্রসাধন-স্নিগ্ধ সুন্দরী নারী-মুখের কিছু অংশ বেরিয়ে এল। আমার দিকে একবার সুগম্ভীর দৃষ্টি হেনেই তাঁর মসৃণ মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

আমি ওঁকে সুপ্রভাত জানালাম। এ-বাড়ির গৃহিণী বোধ হয় আমার পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। কারণ আর কিছু বলবার আগেই আমাকে অবাক করে দিয়ে ঝকঝকে কলিনোস দাঁতের সারি বিকশিত হলো। গৃহিণী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন?" যেন আমি কতদিনের চেনা মানুষ।

দরজার ফাঁক আরও একটু বড় হয়ে উঠলো এবং ভদ্রমহিলা দ্রুত আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন।

এ-বাড়ির সুন্দরী গৃহিণীর সর্বাঙ্গ এবার আমি এক ঝলক দেখে নিলাম। এই সকালে একটা ময়ূরকণ্ঠী রঙের ভারী দক্ষিণী সিল্কের শাড়ি পরেছেন তিনি। মাথার চুল এয়ার হোস্টেস-দের স্টাইলে বাঁধা। সিঁথিতে বিবাহের রাঙা চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে—বেশ মোটা করেই এই সীমন্তিনী সিঁদুর লাগিয়েছেন, যা এ-পাড়ায় দুর্লভ হবে ভেবেছিলাম।

'প্লিজ, বসুন—আমি দু'মিনিটে আসছি' এই বলে কাঠের পার্টিশনের ওধারে দ্রুত উধাও হয়ে গেলেন ফ্ল্যাটের মধুরহাসিনী গৃহলক্ষ্মী।

অগত্যা আমিও সুন্দরভাবে সাজানো ড্রয়িং রুমের নরম সোফার ওপর নিশ্চিন্তে বসে পড়লাম। বসে বসে লক্ষ্য করলাম, বিরাট ঘরখানা সুদৃশ্য এই টেম্পোরারি পার্টিশনের সাহায্যে দৃষ্টির অগোচর রাখা হয়েছে। সাংসারিক প্রয়োজনে ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করে নিয়েছেন এই ঘোষ পরিবার। দুটি যামিনী রায়ের ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। সামনের নিচু টেবিলে কয়েকখানা ইংরিজী সাময়িকপত্র। ঘোষ পরিবারের সুরুচি ছোট্ট এই ঘরটুকুর মধ্যে ফুটে উঠেছে, এ-কথা নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে।

আন্দাজ করছি, শ্রীযুক্ত ঘোষ ভিতরেই রয়েছেন। এবং তাঁকে ডেকে আনবার জন্যই শ্রীমতী ঘোষ হয়তো চটুল পদক্ষেপে অন্দর-মহলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভুল। শ্রীমতী ঘোষ স্বামীকে ডাকতে যাননি। মুখের মেক-আপের সামান্য যা দোষ ত্রুটি ছিল তাই অ্যাজেস্ট মেরামতের জন্যেই যেন তিনি ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তাঁকে আরও ফিটফাট ও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটিও লিপ-স্টিকের অনুগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেনবাদ যাই হোক, অন্তত আন্তরিক

অভ্যর্থনা জানালেন এ-বাড়ির গৃহলক্ষ্মী। মধুর হেসে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খাবেন? চা না ঠাণ্ডা?'

আমি না-বলতে গেলাম। কিন্তু রীতিমত ধমকের কায়দায় তিনি বললেন, "আমি কিছুই শুনতে চাই না। কিছু না-খেলে আমি খুউব রাগ করবো।"

প্রথম পরিচয়ে টেনাণ্টের অর্ধাঙ্গিণীকে চটাবার দুঃসাহস পৃথিবীর কোন ম্যানসন ম্যানেজারের আছে? অতএব সন্দেহ হুকুমের সুমধুর স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিলাম।

চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবার আমার খুব কাছে এসে বসলেন। এই সকালেই বিলিতি সেণ্টের মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করে ওঁর সুবন্ধ শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমার সাম্প্রতিক খবরাখবর যে ওঁর কিছুই অজানা নয় তা পরের প্রশ্ন থেকেই জানতে পারলাম।

উনি বললেন, "কবে এলেন?"

"গত কাল সকালেই তো হাজির হলাম।"

"ও মা!" কচি মেয়ের মতো অবাক হয়ে গেলেন মিসেস ঘোষ। "আমি শুনলাম পরশুদিন বিকেলেই আপনি এসে গিয়েছেন।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। পরশুদিন বিকেলে আমি যখন বিলাসিনী দেবীর প্রাসাদে চাকরিতে বহাল হচ্ছি। তখন থেকেই তা হলে এ-বাড়িতে গুজব ছড়াতে আরম্ভ করেছে, আমি ভাবলাম। নিজের চাকরির সম্বন্ধে রীতিমত উচ্চ ধারণা হচ্ছে আমার। আমার প্রতিটি মুভমেণ্টের খবর এ-বাড়ির গৃহিণীদের কানেও অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে একটু চাপা গর্ব বোধ করলাম।

ঘোষ ফ্ল্যাটের গৃহলক্ষ্মী এবার আমাকে আরও অবাক করে দিলেন। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সস্নেহ অনুযোগের সুরে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাত্রে এলেন না যে বড় ?"

কাল রাত্রে আমি যে রাম্‌সিংহাসনের সঙ্গে থ্যাকারে ম্যানসন পরিক্রমায় বেরিয়েছি সে-খবরও এখানে তাহলে এসে গিয়েছে! আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি।

ভদ্রতার খাতিরে এখন কিছু উত্তর দিতে হয়। বললাম, "প্রথম দিন—ঘুরতে ঘুরতে বেশ দেরী হয়ে গেল।"

ফ্ল্যাটের গৃহলক্ষ্মী এবার আচমকা বিপজ্জনকভাবে কাছে সরে এলেন। অভিমানভরা কণ্ঠে বললেন, "আপনি আসবেন বলে আমি এখানে বসে আছি, আর আপনি নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!"

রীতিমত নাভাস হয়ে পড়েছি এবার। এসব কী বলতে চাইছেন ভদ্রমহিলা? উনি আরও কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বললেন, "আজ যদি না আসতেন, তা হলে আমি আড়ি করে দিতাম। ডেকে পাঠালেও কিছুতেই আসতাম না," একি! কথা বন্ধ রেখে আচমকা নরম হাতে আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন ঘোষ ফ্ল্যাটের রহস্যময়ী গৃহলক্ষ্মী।

অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অপরিচিতা নারীর সঙ্গে সন্দেহজনক সম্পর্ক থেকে কী সব বিপদ আসতে পারে তা হোটেলের প্রাক্তন কর্মচারী হিসেবে আমার অজানা নয়। কীভাবে বাহুডোর থেকে মুক্তি পাবো ভাবছি এমন সময় তীব্র সুরে বেল বেজে উঠতেই মহিলাটি আমাকে বিদ্যুৎবেগে আলিঙ্গনমুক্ত করলেন এবং

দ্রুত আঁচল সামলে নিলেন। বিরক্ত-ভাবে এগিয়ে গিয়ে তিনি দরজা খুলতেই আর এক ভদ্রলোককে অ্যাটাচি কেস হাতে দেখা গেল।

আগন্তুক বললেন, "মিসেস সেন? নমস্কার।"

ভদ্রমহিলা বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? এইভাবে ডিস্টার্ব করছেন!"

আগন্তুক সবিস্ময়ে বললেন, "আমি মিঃ চট্টরাজ! এই মাত্র আপনার সঙ্গে ফোনে কথা হলো—দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি বললাম।"

শিউরে উঠলেন ভদ্রমহিলা। আমি ততক্ষণে প্রায় ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি। প্রচণ্ড কোনো গোলমাল হয়ে গিয়েছে। শ্রীমতী সেন নিশ্চয় এতক্ষণ আমাকে চট্টরাজ বলে ভুল করেছেন।

মিসেস সেন এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তাহলে কে?"

আমার কোনো দোষ নেই। এতক্ষণ আমাকে কোনোরকম পরিচয় দেবার সুযোগই দেননি এই নীলবসনা সুন্দরী। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পরিচয় দিলাম। বললাম, "আমি এসেছি মিস্টার ঘোষের খোঁজ করতে।"

"ঘোষ? সে আবার কে?" আকাশ থেকে পড়লেন ফ্ল্যাটের চঞ্চলা গৃহলক্ষ্মী।

"মিস্টার আর সি ঘোষ। এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। বাইরে যাঁর নাম লেখা আছে" আমি তখনও হাঁপাচ্ছি।

"ফ্ল্যাট তো জেঠমালানি ট্রেডিং কোম্পানির!" খিলখিল করে হেসে উঠলেন নীলবসনা সুন্দরী।

অবথা সময় নষ্ট না করে নতুন আগন্তুককে হাত ধরে ভিতরে টেনে নিলেন সুন্দরী। ওঁকে বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কাল রাত্রে আসেননি, আমি খুউব রাগ করেছি। ফ্ল্যাট বন্ধ করে আমি চলে যাচ্ছিলাম এমন সময় আপনার ফোন এল।"

আমার দিকে তাকিয়ে নীলসুন্দরী বললেন, "ওমা! কী ভীষণ ভুল হয়ে যাচ্ছিল। আপনি অন্য কোথাও খোঁজ করুন—এখানে মিস্টার ঘোষ বলে কেউ নেই।"

চট্টরাজকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দ্রুত আমার নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন মিসেস সেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মাথা এখনও ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে।

ভোরবেলায় আরব্য রজনীর অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে সোজা চলে এসে-ছিলাম অফিস ঘরে। কিছুক্ষণ আগের আচমকা বিপদ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে সাহস হলো না।

একবার আর সি ঘোষের খোঁজ করা প্রয়োজন।

খাতাপত্র ঘেঁটে দেখলাম, আমার ভুল হয়নি। ফ্ল্যাটের ভাড়াটে অবশ্যই রমেশচন্দ্র ঘোষ।

রামসিংহাসনকে ডাকলাম আমি। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে কে?"

"মিস্টার আর সি ঘোষ।" তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল রামসিংহাসন। এসব বিবরণ তার কণ্ঠস্থ।

জিজ্ঞেস করলাম, "ভাড়া কতদূর দেওয়া আছে?"

"ভেরি গুড পে মাস্টার।" উত্তর দিলেন বরদাপ্রসন্ন। "আমাকে যেতে পর্যন্ত হয় না—রামসিংহাসনের হাতে দিয়ে আগাম ক্যাশ পাঠিয়ে দেন।"

আমি দু'মিনিট আকাশ-পাতাল ভাবলাম। তারপর গম্ভীরভাবে বললাম, "রামসিংহাসন, আমি ৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটের মিস্টার আর সি ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

নীললোহিতের চোখের সামনে

—আচ্ছা, আপনাকে কী বলে ডাকবো? নীললোহিতদা, না শুধু নীললোহিত?

—শুধু নীললোহিত। আর তুমি। আমাকে আপনি বলার দরকার নেই।

—কেন, আপনি তো অনেক বড়ো?

—কে বলেছে আমি বড়ো? আমি সাতাশ বছরে থেমে আছি। এর থেকে আর আমি বড়ো হবো না ঠিক করেছি! আমার বয়েস বছর বছর বাড়তে থাকবে ঠিকই, সেটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু আমি বড়ো আর হবো না। বড় হতে আমার ভাল্লাগে না!

মেয়েটি টেলিফোনে কুলকুল করে হেসে বললো, আমার বয়েস কিন্তু সাতাশ বছরেরও অনেক কম।

আমি বললুম, সেটা তোমার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মেয়েরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী বয়েসের পুরুষদেরও তুমি বলতে পারে।

—মোটেই কেউ তা বলে না।

—হ্যাঁ বলে। মনে করো তোমার সঙ্গে চল্লিশ বছরের কোনো লোকের বিয়ে হলো, তাকেও তো তুমি তুমিই বলবে?

—চল্লিশ বছরের লোককে আমি বিয়ে করতে যাবো কেন? বয়ে গেছে!

—সে কথা তুমি জোর দিয়ে বলতে পারো না। ধরো যদি উত্তমকুমার তোমাকে বিয়ে করতে চান?

—ধ্যাৎ! যাকগে ওসব কথা। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি, আপনি মার্গারিটকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন—

—গল্প কোথায়? ওটা তো অনেক বড়। উপন্যাসই বলা যায়।

—সে যাই হোক, ঐ গল্পটা যে লিখেছেন, তা কি সত্যি? মার্গারিট বলে কেউ আছে?

অনেক মেয়েই উপন্যাস টুপন্যাস কিছু বোঝে না। যা পড়ে, সবই তাদের কাছে গল্প। লাইব্রেরিতে গিয়ে তারা ছোট গল্পের বই ও উপন্যাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে, টুকরো টুকরো গল্প, না টানা গল্প? এটা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি।

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ ভাই, সত্যি। একদম সব সত্যি।

—আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল? আপনি সত্যিই ওদেশে গিয়েছিলেন?

আমি যে কখনো বিদেশে ছিলাম, সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে না। আমার একটাও সুট-টাই নেই, মোজার সঙ্গে বুট জুতোর বদলে চটি পায়ে ঘুরি, আর বার্ডকে ব্যা-র-ড, গার্লকে গ্যা-র্-র্-ল—এই ধরনের উচ্চারণে ইংরিজিও বলতে পারি না। আমার চেহারা একদম ভেতো বাঙালীর মতন। কেউ কেউ বলে গেঁয়ো ভূত!

অচেনা মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ ঠাট্টা ইয়ার্কির পর আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমাকে মার্গারিটের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিল।

মার্গারিটের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন আমার বয়েস সাতাশ। আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বয়েস, উনিশ আর সাতাশ। ঐ দুই বয়েসে আমি দুটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলাম।

একটা বই খুলে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসলো না। চোখের সামনে ভেসে উঠলো, মার্গারিটের মুখ। সে হাসছে, খানিকটা দুষ্টুমী মেশানো হাসি।

...ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন ছিল পল এঙ্গেলের বাড়িতে। মার্গারিটের নেমন্তন্ন নেই, কারণ পলের স্ত্রী মেরি মেয়েদের তেমন পছন্দ করে না। মেরি খানিকটা পাগলাটে ধরনের, কখন কী রকম ব্যবহার করবে, তার কোনো ঠিক নেই। মার্গারিট সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, তাকে ফেলে একা আমার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়া খুব বিশ্রী ব্যাপার। অথচ পলের কাছে মুখ ফুটে মার্গারিটের কথা বলতে পারিনি।

মার্গারিট নিজেই সে সমস্যার সমাধান করে দিল। ওকে গীর্জায় যেতে হবে মধ্যরাত্রির প্রার্থনায় যোগ দিতে। ক্যাথোলিকরা এদিন গীর্জায় যাবেই। তার আগে মার্গারিট ওদের ফরাসী বিভাগের অধ্যাপকের বাড়িতে যাবে একবার। তিনি অবশ্য আমাদের দুজনকেই নেমন্তন্ন করেছেন। আমি সেখানটা একবার ঘুরে চলে যাবো পল এঙ্গেলের বাড়ি।

সেটাই হলো। কিন্তু আমি পল এঙ্গেলের বাড়িতে গিয়ে লাভ করলুম এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

পল নেমন্তন্ন করেছে মাত্র দশ বারোজন লোককে। শান্ত ছিমছাম পার্টি। অন্যান্য জায়গায় ক্রিসমাসের উৎসবে দারুণ হৈ চৈ হয়, কিন্তু এখানে আমরা সবাই বসে অল্প অল্প স্কচে চুমুক দিয়ে ম্যারি ম্যাকার্থির সদ্য আলোড়ন তোলা উপন্যাস বিষয়ে

আলোচনা করছি। মেরির দেখা নেই।

আমার বেশ খিদে পেয়েছিল। কিন্তু মেরি না এলে খাবার কে দেবে? এদের বাড়িতে তো আর ঠাকুর-চাকর নেই। অনারা আলোচনায় মেতে থাকলেও খাবারের জন্য খানিকটা চাঞ্চল্যও প্রকাশ করছে। লেট সাপারের পক্ষেও দেরি হয়ে গেছে অনেক।

এক সময় পল আমাকে বললো, নীল, দেখো তো মেরি কোথায়? একটু ডেকে আনো না।

মেরির পাগলাটে স্বভাবের জন্য অনেকেই তাকে ভয় করে। কিন্তু মেরি আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। পল সেটা জানে বলেই আমাকে বললো মেরিকে ডেকে আনতে।

বসবার ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেলাম। মেরির শোওয়ার ঘরের দরজা খোলা, মেরি বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। সামনেই টেলিভিশন সেট।

আমি খুব নরম করে ডাকলাম, মেরি! সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কোনো সাড়া নেই।

আর এক পা এগিয়ে বললাম, মেরি, তোমার কি শরীর খারাপ?

—গো অ্যাওয়ে! লীভ মি অ্যালোন!

তুমি! তুমি এখানে বসে বসে খাচ্ছো? তোমার লজ্জা করে না

এই রে, তার মানে আজ মেরির মেজাজ খারাপ। আর কথা বলার সাহস হলো না, ফিরে এলাম। পলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ইশারায় জানালাম ব্যাপারটা। পল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, চলো, আমরা নিজেরাই নিজেদের খাবার নিয়ে নিই।

রান্নাঘরে অনেক রকমের খাবার সাজানো। ওভেনে চাপানো আছে স্টেক, একটু বোতাম ঘুরিয়ে সেটা গরম করে নেওয়া খুব সোজা। সবাই আমরা যে-যার প্লেটে খাবার তুলে নিলাম। আজ এখানে ফ্রায়েড রাইস পর্যন্ত আছে, সম্ভবত আমারই সম্মানে।

খাবারের প্লেট নিয়ে সবে মাত্র বসবার ঘরে এসেছি এমন সময় মেরির আবির্ভাব। সকলকে ছেড়ে সে আমারই দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো। তারপর কড়া গলায় বললো, তুমি! তুমি এখানে বসে বসে খাচ্ছো? তোমার লজ্জা করে না?

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী অন্যায় করেছি রে বাবা?

মেরি বললো, আমি এই মাত্র টেলিভিশনে কলকাতার একটা ছবি দেখলাম। সেখানে হাজার হাজার লোক খেতে পায় না। পথে পথে ভিখিরি। রাত্তিরে সন্তর হাজার লোক রাস্তায় শুয়ে থাকে, এমনকি ছোটো ছোটো বাচ্চারা পর্যন্ত! উঃ! কী ভয়ংকর!

মেরি চোখে হাত দিয়ে কেঁদে ফেললো।

পল উঠে এসে মেরির কাঁধ ধরে খুব কোমল ভাবে বললো, মেরি, প্লীজ, আজ ক্রিসমাস...

মেরি এক ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তোমাদের লজ্জা করে না? কলকাতায় এই মুহূর্তে কত লোক না খেয়ে আছে, আর তোমরা এত খাবার...উঃ, মানুষের এত কষ্ট—আর ঐ ছেলেটা—

মেরি ছুটে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই ছেলেটা—নিজের দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, আর এখানে ও বসে বসে হাসছে? ছি ছি!

মেরি একটা থাপ্পড় লাগালো আমার হাতের খাবারের প্লেটে। সেটা উড়ে গিয়ে পড়লো বেশ খানিকটা দূরে, ঝনঝন শব্দে ভাঙলো, সমস্ত খাবার ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। তখন পর্যন্ত আমি একটা কিছু মুখে দিই নি।

তারপর মেরি এমন পাগলামি শুরু করলো যে আর নতুন করে খাবার নেওয়া কিংবা সেখানে বসে থাকারও কোনো মানে হয় না। পার্টি ভেঙে গেল। সবাই মেরিকে জানে, তার মাঝে মাঝে এরকম হয়। আর একজন অধ্যাপক তাঁর গাড়িতে আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

আমি জামা-প্যান্ট না ছেড়েই বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলাম। মনটা বিষম দমে গেছে। টেলিভিশনওয়ালারা কী পাজি! আজই ঐ কলকাতার দারিদ্র্যের ছবি না দেখালে চলতো না? বাইরে ঝরেঝরে করে বরফ পড়ছে। এখন কত জায়গায় কত রকম আনন্দ উৎসব চলছে, আর আমি শুধু ঘরের মধ্যে একা। তাও পেটে অসহ্য খিদে। দূরে ছাই!

বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজায় খটখট শব্দ হলো। আবার কে এই অসময়ে? দরজা খুলে দেখি মার্গারিট। মাথার এলোমেলো সোনালি চুলগুলো একটা স্কার্ফে বাঁধা। ওভারকোটে তখনও বরফের টুকরো জমে আছে। ঘরে ঢুকেই বললো, উঃ, সাংঘাতিক শীত করছে, হাত দুটো জমে যাচ্ছে—আমার হাতে হাত ঘষে দাও শীগগির!

আমি ওর হাতে হাত আর গালে গাল ঘষে দিতে লাগলাম। তারপর ওকে নিয়ে এলাম বিছানায় কম্বলের নীচে।

মার্গারিট বললো, আমি চার্চ থেকে হেঁটে ফিরছিলাম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে চলে এলাম। তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? ক্রিসমাস পার্টি তো ভোর পর্যন্ত চলে?

আমি ওকে সব ঘটনাটা বললাম। মার্গারিট খিল খিল করে হাসতে লাগলো। তারপর বললো, বেশ হয়েছে! যেমন

লাক্স সুপ্রীম আপনার রূপ-লাবণ্য করে তুলবে এই রকম অপরূপ অতুলনীয়। এতে আছে অপূর্ব সুরভির আবেশ। এর ক্রীমে ভরপুর রাশি রাশি ফেনা আপনার ত্বকে রেখে যায় রেশম চিক্কন পরশ। লাক্স সুপ্রীমের বিউটি ক্রীম আপনার রূপ-লাবণ্যকে ক'রে তোলে রেশম কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর।

LUX

LUX SUPREME

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

HLLS.1060

আমাকে না নিয়ে গেছো! খুব নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে তো! অ্যামেরিকানরা এই রকমই ইমোশনাল হয়। হঠাৎ হঠাৎ পরের দুঃখ দেখে প্রাণ একেবারে উথলে যায়। কালকেই সব ভুলে যাবে। কিংবা বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ ডলার সাহায্য পাঠিয়ে দেবে, ব্যাস তাতেই বিবেক পরিষ্কার হয়ে গেল।

—মাঝে মাঝে হলেও তবু তো ওরা ভাবে।

—চুপ করো, ওটা বড়লোকদের বিলাসিতা।

একটু পরেই মার্গারিট ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বললো, কিন্তু কলকাতায় সত্তর হাজার লোক না খেয়ে থাকলেও আর একজন ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়বে কেন? তাতে কি ওদের কোনো উপকার হবে? আমি এক্ষুনি তোমার জন্য রান্না করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই। এখন রাত দেড়টা বাজে। বাকি রাত-টুকু না খেলেও চলবে।

মার্গারিট কোনো কথাই শুনলো না। সে শুধু একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি মঁসিয়ো অ্যাসপেলের বাড়িতে অনেক রকম খাবার খেয়ে এসেছি। আর তুমি না খেয়ে থাকবে? আমি এটা সহ্য করতে পারি?

আমার ভাঁড়ারে খাবার বিশেষ কিছু নেই। ফ্রিজে শুধু খানিকটা কর্নড বীফ বা মাংসের কিমা আর একটা বাঁধা কপি। মার্গারিট উনুনের দুটো মুখ জেলে একটাতে ভাত চাপালো আর একটাতে বাঁধা কপি আর কিমা দিয়ে একটা তরকারি বানিয়ে ফেললো। রাত আড়াইটের সময় সেরকম অপূর্ব সুস্বাদু খাদ্য বোধ হয় আমি জীবনে আর কখনো খাইনি।

এর দু' তিন দিন বাদে মার্গারিট নিজেই একটা পাগলামির কাণ্ড করে ফেললো। দুপুরবেলা আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, মার্গারিট গেছে ওর মাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে। এক সময় দরজায় বেল শুনে বুঝলাম, ও ফিরেছে। দরজা খুলে দেখি, ও একা নয়, ওর পেছনে তিনটি প্রায় দৈত্যের মতন চেহারার নিগ্রো।

মার্গারিট তাদের বসার ঘরে এনে বসালো, তারপর বললো, এঁরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, আমার কাছে রাস্তার খোঁজ নিচ্ছিলেন। এরা অনেক দূর থেকে আসছেন। খুব ক্লান্ত, তাই আমি এঁদের কফি খাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছি। ঠিক করিনি?

আমি অবাক। তিন তিনটে [illegible]

চমৎকার। প্রায় প্রত্যেক মোড়ে মোড়েই নানান জায়গার নির্দেশ লেখা থাকে—দূরের যাত্রীদের কোনোই অসুবিধে হয় না।

আমি নিগ্রো তিনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন?

একজন অস্পষ্ট ভাবে একটা জায়গার নাম করলো। আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে সোজা বাহাত্তর মাইল গেলেই সেখানে পৌঁছোনো যায়। একটু আগেই সাইনের কাছে সে কথা লেখা আছে, চোখে না পড়ে উপায় নেই।

লোকগুলি বেশী কথা বলে না। আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হলো, আমি ওদের দেখে যতটা অবাক হয়েছি, ওরাও আমাকে দেখে তার চেয়ে কম অবাক হয়নি।

ব্যাপারটা অনেকটা বুঝতে পারলুম। ছুটির সময়, অনেকেই বাইরে বেড়াতে গেছে, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। এই সময় এই তিন নিগ্রো পথের মধ্যে এই একাকী শ্বেতাঙ্গিনী রমণীকে দেখে কুমতলব করেছিল। রাস্তা দেখিয়ে দেবার নামে মার্গারিটকে গাড়িতে তুলতো, তারপর শহর ছাড়িয়ে কোনো নির্জন জায়গায় বলাৎকার ও খুন করে ওর দেহটা মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে যেত। খবরের কাগজে এরকম ঘটনা প্রায়ই পড়া যায়। মার্গারিটের কফি খাওয়াবার আমন্ত্রণে যে ওরা এসেছে, তার কারণ ওরা মনে করেছিল মার্গারিট একা থাকে; তা হলে ফ্ল্যাটে নিরিবিলিতে কাজটা আরও সুবিধা-জনক হয়।

ফ্ল্যাটের মধ্যে একলা মেয়েদের খুন হবার ঘটনাও এখানে প্রায়ই ঘটে।

লোকগুলোর চেহারা মোটেই সুবিধে-জনক নয়। মুখে নিষ্ঠুর ভাব, এই দুপুরেই ওদের গা থেকে কড়া মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে বার বার। আমাকে ওরা একটুও পছন্দ করেনি। ওদের কোটের তলায় পিস্তল বা ছোরাছুরি আছে নিশ্চয়ই। এখন ওরা যদি আমাকে মেরে মার্গারিটকে নিয়ে পালাতে চায়, আমি কী করে বাধা দেবো?

মার্গারিট কফির জল চাপাতে রান্না ঘরে গেছে, আমি সেখানে উঠে গিয়ে ফিস-ফিস করে বললাম, এদের নিয়ে এলে কেন এখানে?

মার্গারিট বললো, কেন, কী হয়েছে? এরা ক্লান্ত, সারা রাত ধরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে—

—কিন্তু এরা যদি খারাপ লোক হয়?

কেন পৃথিবীতে কোনো খারাপ লোক নেই, শুধু এই রকম [illegible]। আমি আরও কিছু বলতে গেলাম, ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, তুমি সাধারণ অধিকাংশ অ্যামেরিকানরা [illegible] সম্পর্কে এমন খারাপ [illegible] করে...

মার্গারিট হয়তো ভেবেছে, আমি গরীব দেশের লোক বলে নিগ্রোদের সঙ্গে খুশী হবো। কিন্তু শ্রমিক হলে কি খুনী হতে পারে না? অ্যামেরিকায় অনেক নিগ্রোই নির্যাতিত হয়, আবার অসংখ্য হিংস্র খুনীও আছে ওদের মধ্যে। বিশেষত সাদা মেয়েদের প্রতি ওদের অস্বাভাবিক লোভ এবং ক্রোধ আছে।

আবার ঘরে এলাম। ওদের সঙ্গে দু একটা কথা বলার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। ওরা আমাকে একদমই পছন্দ করেনি, বোঝা যায়। আমি যেন কাবাবের মধ্যে হাড্ডি কিংবা গুড়ের মধ্যে [illegible]। ওরা আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। আমাকে ঠিক কোন্ মুহূর্তে মারবে সেই পরামর্শ করছে?

আমার বাড়ির [illegible] অ্যাপার্টমেন্টে কেউ নেই। [illegible] কেউ শুনতে পাবে না। কিংবা ওরা যদি [illegible] আমাদের দু' জনের মুখ বেঁধে [illegible], চ্যাঁচাবারও উপায় থাকবে না। একমাত্র ভরসা টেলিফোন। আমি টেলিফোনে [illegible] কোনো বন্ধুকে ডাকবার জন্য [illegible] অমনি একটা নিগ্রো [illegible] গলায় বললো, আমি তোমার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?

সে নিজেই টেলিফোনটা নিয়ে এলোমেলো ডায়াল ঘোরাতে লাগলো। তার মাতাল হাতে বার বার গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম, লোকটি ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করছে। এবার আমার রীতিমতন ভয় করতে লাগলো। আর বোধ হয় কোনো উপায় নেই। ছুরি পিস্তলেরও দরকার হবে না, ওরা খালি হাতেই আমাকে শেষ করে দিতে পারবে।

একটি নিগ্রো সোফার ওপর বসে তার লম্বা ঠ্যাং দুটো বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে রেখেছে সামনে। তার একটা জুতোর মুখ ছেঁড়া, হাঁ করা। অচেনা লোকের বাড়িতে গিয়ে কেউ এভাবে বসে না। মার্গারিট ঘরে ঢুকে লোকটিকে সেই অবস্থায় দেখে বললো, আপনি জুতো খুলে ফেলুন না। আরাম করে বসুন। জুতো খুলে ফেলুন।

লোকটা বিব্রত করে বললো, দরকার নেই।

—কেন, খুলে ফেলুন, কোনো লজ্জা নেই। একি, আপনার একটা জুতো ছেঁড়া?

খাইট হয়ে যাবে! আপনি এক্ষুনি জুতো খুলে ফেলুন, আমি গরম জল আনছি, তাতে পা ডুবিয়ে রাখুন, আরাম হবে: সারারাত এই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে—ছি ছি।

লোকটি আপত্তি করতে লাগলো, মার্গারিট শুনলো না কিছুতেই। গামলায় করে গরম জল এনে লোকটির পায়ের কাছে বসে পড়লো। আর একটু হলে সে নিজেই জুতো খুলে দিত। লোকটি বাধ্য হয়ে গরম জলে পা ডোবালো। আর দু' জন লোককেও মার্গারিট বললো, আপনারাও তো ক্লান্ত, স্নান করবেন? অন্তত মুখ টুখ ধুয়ে নিন, কলে গরম জল আছে, এই নিন তোয়ালে—

শেষ পর্যন্ত লোক তিনটি খারাপ কিছুই করলো না। ভাত খেয়ে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকগুলির উদ্দেশ্য খুব খারাপ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা হেরে গেল।

সেদিন মার্গারিটকে দেখে আমি বুঝে-ছিলাম, খাঁটি সরলতা ও সততার কাছে হিংস্রতাও অনেক সময় হেরে যায়!

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

মধ্যগ্রীষ্মের প্রদর্শনী

ভরা ভাদরকে কি মধ্য গ্রীষ্ম বলে ভারতীয় ভাষায়? এমন কী কৃষ্ণবর্ণ সাহেবদের দিশী ইংরাজীতে? ষড়ঋতুর ঐশ্বর্য ইংলণ্ডে নেই, তাই ইংরাজী সাহিত্যে বর্ষার রূপবর্ণনা নেই। ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকে ধ্রুপদী পাশ্চাত্ত্য সংগীত প্রশিক্ষণ ও পরিবেশনের সময় দিশী জলহাওয়ার কথা মনে মনে রাখা হয়। বর্ষাকালে তাদের সংগীত অনুষ্ঠানের নাম 'মনসুন কনসার্ট'। মধ্যগ্রীষ্মের স্বপ্নময়তার পক্ষে সেকসপীয়ার একা, অথচ বর্ষার পক্ষে আছেন কালিদাস, বৈষ্ণব-পদকর্তা ও রবীন্দ্রনাথ।

প্রদর্শনী তেমন জমেনি (একাদেমী অব ফাইন আর্টস—১৯শে অগাস্ট—২রা সেপটেম্বার)। ভাল কাজ অবশ্যই ছিল। তবে সংখ্যায় সামান্য। মাঝারী ধরনের কাজ কিছু ছিল। খারাপ কাজ কম ছিল না। একটু সময় দিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করলে প্রদর্শনী আরো ভাল হতো। প্রদর্শনী যেন ডিমওয়ালা মাছের মতো ঢাউস পূজা সংখ্যা। প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ লেখকদের লেখা থাকে বিস্তর, কিন্তু মনে রাখার মতো লেখা থাকে কম।

নতুন ধরনের কাজ প্রায় দেখিনি। সবই যেন আগে দেখা, গতানুগতিক। চৈত্রে দার্জিলিংএ ভ্রমণ করতে গিয়ে কলকাতার লোকদের সঙ্গে যদি ক্রমাগত দেখা হতে থাকে, তাহলে সেটা যেমন বিরক্তিকর হয়, এও অনেকটা তাই। প্রথমেই রমেন দাঁয়ের আঁকা একটা ছবি দিয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ করব। একটা গান বাজনার আসরে কাঁচুলি বাঁধা নাদুস নুদুস মেয়ে—এক ধরনের ছবি যা এক সময় জমিদারের জলসাঘরে দেখা যেতো। ১৯শ শতাব্দীতে যে ধরনের রুচির লোকদের এই ছবি তৃপ্তি দিতে পারতো, তারা তো মজে হেজে গেছে বলে জানি। না, খারাপ ছবির আলোচনা থাক।

আমার খুব ভাল লেগেছে নির্মল দত্তের মাছের রূপবন্ধের মজা। মাছের রূপের আদিম ও আদিরূপ যেন। একটা জলজ বাদামী, বেগুনী, লাল রঙ দিয়ে আঁকা মাছ। তুলনায় পাশের সবুজ মাছটা একটু বানিয়ে তোলা মনে হয়। বরেন বসুর অঙ্কনপ্রধান 'আকাঙ্ক্ষা ২' গোল ক্যাপসুলের মধ্যে নম্র ও পতনশীল

গোপীনাথ দাস — নিসর্গচিত্র

বেশ চোখে ধরে। রঙ আর রেখার মধ্যে একটা গতিশীল ছন্দোময়তা নজরে পড়ে। সুকোমল শাসমলের 'অর্জুনের লক্ষভেদ' করার দৃশ্যে বীরের নীল কৃষ্ণ বর্ণ, তীর-ধনুক আর হলুদ আর কমলা রঙের রূপারোপের মধ্যে একটা লৌকিক ধরন আছে। যদিও হাতটা এখনও ততোটা সচল নয়। কাঞ্চন দাশগুপ্ত পটের ওপর কাগজ সাটিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে অমসৃণ ত্বক তৈরী করেছেন। তারপর ঘোড়ায় চড়া মানুষ—তাঁর অঙ্কনের সরলীকরণ, সাহস করে শূন্য পটভূমি ছেড়েছেন। এই ছবিতে তেজী আর তাজা ব্যাপার আছে। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাপুড়ে'-তে রেখার সাবলীল গতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা সাদামাটা দেশজ রীতি। কিন্তু তিনি নিজের কক্ষপথে আবর্তনে ব্যস্ত। অমল চাকলাদারের সিন্ধুসারসের 'অবতরণ' দৃশ্যের মেঘ, সূর্য ও তাঁর রশ্মিচ্ছটা কমলা রঙ স্নাত পটকে জমিয়ে তুলেছে। আমি পূর্বেও বলেছি, অসিত মণ্ডল বয়সে তরুণ হলেও শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ, অনুচিত্র, পল ক্লী এবং সাম্প্রতিক জনপ্রিয় টেম্পেরা ছবির জগতে তাঁর বিলম্বিত বিচরণ আখেরে তাঁর ক্ষতি করছে। স্বপ্নময় কৈশোর—নিস্তরঙ্গ ছেলেবেলার গৃহগত সুখ এইসব এবং পুরাণকল্পের একটা ছবিল রূপ প্রশ্রয় পায় তাঁর মানুষী অবয়ব আঁকেন। সুন্দর কিন্তু নিরক্ত ছবি। রঞ্জনা চৌধুরীর অনেক মানুষের সমাবেশের ছবিতে রেখার মায়াজাল, পট বিভাজন ও নির্মিতি মন্দ নয়, কিন্তু রঙ পাতলা ও স্তিমিত। মৈনাক শংকর রায় সাদাকালো কুক দিয়ে পট সাজিয়ে বিস্তারের ভাবটা এনেছেন। অকালপক্কতা ও কৌতুকবোধ নেহাৎ মন্দ লাগে না। বসন্ত পণ্ডিত ক্যাকটাসের প্রতিবেশে বিকেলের আকাশের আগুন ধরে যাবার দৃশ্য মেজাজে এঁকেছেন।

শেষ পর্যন্ত মনে হলো বাছাইয়ের ব্যাপারে নির্মম হওয়া দরকার। বরং পরে অমনোনীত ছবির একটা প্রদর্শনী করলেই হবে।

সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ সাহিত্য তত্ত্ব

সাহিত্য-বিবেক। ডক্টর বিমল মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থমেলা, এ-১৬ কলেজ স্ট্রীট-মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭। দাম ১৪·০০।

বাংলায় সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যে-সব আলোচনার বই আছে সেগুলির মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের আলোচনাই একাধারে পরিচ্ছন্ন ও সুখপাঠ্য। কিন্তু তাদের কেউ-ই সমালোচনা-পদ্ধতি ও রচনারীতি-পদ্ধতির আধুনিক মতবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করেননি। সেই দিক থেকে ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায়ের এই বই একেবারেই প্রথম বই। আমাদের জানা-শোনা কোনো বাঙলা বই নেই যাতে শিল্পের সংজ্ঞার্থ থেকে শুরু করে প্রেরণা, কল্পনা, বিষয়, রূপ, রীতি ও স্টাইল, ভাববাদ, লীলাবাদ, রসবাদ, কলাকৈবল্যবাদ, বাস্তববাদ, ন্যাচারালিজম, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, ডাডাবাদ, সুররিয়ালিজম, অস্তিত্ববাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ পর্যন্ত সাহিত্যের যাবতীয় আধুনিক তত্ত্বগুলির পৃথক পৃথক পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ আছে। সেই দিক থেকে 'সাহিত্য-বিবেক' প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী অলংকারশাস্ত্রের নিপুণ মূল্যায়নে সাহিত্যের ছাত্র ও কৌতূহলী পাঠকের সাহিত্য-বিবেক জাগাতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তত্ত্বের বই বলেই লেখক কিছুটা সচেতন হয়েই সুন্দরভাবে তাঁর আলোচনার বিষয়টিকে ভাগ করে নিয়েছেন। শিল্পের সংজ্ঞার্থ, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, শিল্পের শ্রেণী-বৈষম্য ও সাদৃশ্য আলোচনার নাম 'বহির্দ্বারে'। প্রেরণা, প্রতিভা, অনুকরণ, কল্পনা, স্বপ্ন, সঞ্চার, বিষয়-রূপ-রীতি ইত্যাদির নাম 'অন্তঃপুরে'। ভাববাদ, খেলা ও লীলা, রস ও আনন্দ, কলাকৈবল্যবাদ ইত্যাদির নাম 'বিশ্বাস ও আনন্দ'। বাস্তববাদ, ন্যাচারালিজম, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ইত্যাদির আলোচনার নাম 'সংশয়, দ্বন্দ্ব ও পথের সন্ধানে'। ডাডাবাদ, অধিবাস্তববাদ, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদির নাম 'বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা'। এ ছাড়া 'উপসংহারে' আছে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। একমাত্র বিদেশী সাহিত্যতাত্ত্বিকেরাই শিল্পের সমস্যাগুলিকে এমন নিপুণ হাতে বিচিত্র সাহিত্য-শিল্প থেকে উদাহরণ দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষমতার পরিচয় 'সাহিত্য-বিবেক-এর লেখক দিতে পেরেছেন বলে আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো এই, লেখক প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের সমস্ত মতবাদগুলির গুণ-দোষ নিপুণভাবে বিচার করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে পুরোনো তত্ত্বগুলিকে যাচাই করেছেন। লক্ষ করেছি, প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়কে ধরে যুগে যুগে বিভিন্ন শিল্প-শাস্ত্রীদের মন্তব্যকে যাচাই করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিতে পৌঁছেছেন। কিন্তু অন্যান্য মত-বাদীদের সঙ্গে এই বাস্তববাদের যে মিল আছে সেগুলিকেও তিনি তৎপরতার সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন। প্রয়োজনমত বাঙালী লেখকদের মতবাদ ও রচনার সঙ্গে মেলে (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে অ্যাবসার্ডিস্ট ভঙ্গির মিল বা অমিলের কথা। বোধ হয় এঁদের সঙ্গে এডওয়ার্ড লীয়ার এবং সুকুমার রায়ের নামও সাহস করে জুড়তে পারি।) তারও উল্লেখ করেছেন। এ কথা ঠিক যে, পাঠকের রুচি ও চাহিদার সঠিক মূল্যায়ন করতে হয় যে সাহিত্যিককে, সে সাহিত্যিককে স্বাধীনতা যে 'সামাজিক' এটা তো বুঝতে হবেই, সেই সঙ্গে বুঝতে হবে শিল্পীর 'স্বাধীন' কর্তব্যের কথা, যে স্বাধীনতার খেয়াল-খুশিমতো নয়)। তিনি বিষয়ের উপকরণ ও উপস্থাপনাপদ্ধতির 'নিজস্ব' নির্বাচনে এবং প্রতিভায় জীবনের একটি দিক ফুটিয়ে প্রমাণ করবেন, জীবন যে-রকম ছিল সে-রকম নেই; আরও ব্যাপক হয়েছে, আরও গভীর হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার মধ্যে যে স্বাধীনতা, নিজস্বতা এবং প্রতিভাগত মূল্য শিল্পীর থাকে এই দিকটির প্রতি আরও একটু নজর দিলে বোধ হয় ভালো হতো। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাও যে শিল্পমূল্যকে প্রধান বলে মান্য করে এটা যেমন লেখক শিল্পরসিক রাজনীতিবিদদের কথা তুলে প্রমাণ করেছেন, তেমনি শিল্পীর 'ইউনিক-নেস'-কেও আরও একটু স্পষ্ট করে বললে ভালো হতো। অন্যথা যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে তিনি প্রাচীন তত্ত্বগুলির অসম্পূর্ণতার সূত্রে ধীরে ধীরে যুক্তির সঙ্গে অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা অবিশ্বাসীর পক্ষেও অমান্য করা শক্ত।

বাংলায় শিল্পসাহিত্যের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিচারে বইটি যে দারুণ নিষ্ঠার প্রমাণ রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আগেই বলেছি, নিছক তত্ত্বের বিচার এবং পরিচ্ছন্ন বিচার, বাংলায় বেশী নেই।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

রম্যরচনা

লণ্ডনের আড্ডায়। হিমানীশ গোস্বামী। পুস্তক প্রকাশনী, কলকাতা-৯। ছ' টাকা।

বাঙলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই, আড্ডাবাজদের এ-হেন দাবি নস্যাৎ করে একদা সৈয়দ মুজতবা আলী আড্ডাবাজ কায়রোবাসীদের সম্পর্কে বহু অগোচর তথ্য জ্ঞাপন করেছিলেন। শতকরা নব্বুইজনই কায়রো-অধিবাসী যে আড্ডাবাজ এবং তার দশ-আনা পরিমাণ অংশ যে অর্ধেক জীবনই কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে—মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্রে এ-জাতীয় সরস সংবাদে বাঙালী আড্ডাবাজদের আত্মশ্লাঘা নিশ্চিত কিঞ্চিৎ খর্ব হয়েছিল। হিমানীশ গোস্বামী সেই লুপ্ত গৌরব অনেকটাই উদ্ধার করলেন তাঁর এই নতুন বইতে। তাঁর এই গল্পের লণ্ডন শহর কোনো বিশেষ সময়ের লণ্ডন নয়, চিরন্তন এক লণ্ডন—সেখানে কলকাতার মতই আড্ডা জমে, সকালে, দুপুরে সন্ধ্যায় এবং মধ্যরাত্রে, কোনো সময়ের ধার না ধেরেই এবং এই আড্ডার বাঙালীরাও এক চিরন্তন বাঙালী চরিত্র, লণ্ডনে যারা পৌঁছে যায় উচ্চশিক্ষার মহান আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লালন করে, এবং অতঃপর দিন-কয়েকের মধ্যেই টেমসের জলে ধুয়ে ফেলে সব পবিত্র বাসনাটাসনা, পাটি হয়ে সেঁটে যায় লণ্ডন শহরে, এক অলৌকিক হই-হই আড্ডায় জমে গিয়ে পার করে দেয় বছরের পর বছর, আর এমন এক ধ্রুব এই জীবন যে ভুল করে দৈবাৎ কেউ যদি পাশ করেও যায়, বাড়ির লোক বিশ্বাস করতে পর্যন্ত চায় না।

হিমানীশ গোস্বামীর রচনার পাঠক জানেন, লেখার মধ্যে সূক্ষ্ম সরস মন্তব্য, তির্যক একটি অপ্রতিরোধ্য ভঙ্গি কী স্বচ্ছন্দে সহজে তিনি ছড়িয়ে দেন। তাঁর লেখা পড়ে কখনো দমকা অট্টহাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠা যায় না, কিন্তু আদ্যন্ত মৃদু-মুচকি হাসি অধিকার করে থাকে পাঠকের মুখ এবং মগজ। অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর মন্তব্য, সতেজ এবং সরস তাঁর বর্ণনা, ঘটনাবলী নিতান্ত স্বাভাবিক তবু নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাস্য ভাবে জারিত।

লণ্ডন নিয়ে এটি তাঁর চতুর্থ বই। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এই রচনাবলীতে তবু পুনরাবৃত্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই। অনিঃশেষ তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, আশ্চর্য তাঁর গল্প-বলার ভঙ্গি। এক চিরন্তন আড্ডাবাজ কথক চিরন্তন লণ্ডনের চিরন্তন আড্ডার গল্প বলে যাচ্ছেন চিরন্তন পাঠকের উদ্দেশে—হিমানীশের বই পড়ে এ-অভিজ্ঞতা সব বয়সের পাঠকেরই মনে হবে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কথা শুরুতেই ব্যক্ত করেছেন তিনি। সৌভাগ্য বলতে হবে, কেননা এই ভরসা না দিলে শুধু বাইরের চেহারা দেখে ফিরে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী টীকা ও বারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা এক মলাটের মধ্যে দুটি উপন্যাসের পক্ষেও সাংঘাতিক গুরুভার মনে হতে পারে লঘু-ভোজী যে কোনও আধুনিক পাঠকের। যদিও বইটি শেষ পর্যন্ত পড়লে আরম্ভের তত্ত্ব-কথা ও উপসংহারের টীকা-অংশ অতিরিক্ত পাওনা বলে মনে হবে এবং এক অর্থে অতি প্রয়োজনীয় বলেও গণ্য হতে পারে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে।

কারণ, নিছক 'সাহিত্যরস পরিবেশনে'র আধার উপন্যাস দুটিতে যে 'পরম প্রেমে'র রূপটি চিত্রিত হয়েছে তা বস্তুত তত্ত্বরূপেরই সাহিত্যরূপ। 'পরম প্রেমে'র এক পর্বের নায়িকা রাধা, অন্য পর্বের বিষ্ণুপ্রিয়া। রাধারূপে যিনি নিত্যসিদ্ধা, ব্রজলীলায় তাঁর সাধিকার অপূরিত ভূমিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যেই যেন পূর্ণতা ও চরিতার্থতা পেয়েছে। রাধার যে প্রেমানুভবকে আস্বাদন করতে এলেন গৌরাঙ্গ-অবতার, সেই প্রেমপ্রাপ্তিরই সাধনপদ্ধতি শেখাতে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া—সাধিকা হয়েও যিনি এই পর্বে সাধিকা।

রাধাকে 'বিরহ-বিন্ধা' ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'বিরহ-সিদ্ধা' রূপে আঁকা এই উপন্যাস দুটি কিন্তু এই জাতীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েও পড়ে ফেলা যায় এবং উপন্যাস পাঠের আনন্দ তার ফলে বিন্দুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

নীরেন্দ্র গুপ্তের লেখা ঝরঝরে, বর্ণনা সহজ, স্বচ্ছন্দ। উপন্যাসের গতি কোথাও যাতে মন্থর হয়ে না আসে, সেদিকে সতর্ক লক্ষ ছিল তাঁর। পরিবেশ-উপযোগী করতে গিয়ে দু-একটি অতি দুরূহ শব্দ ব্যবহার করেননি এমন নয়, তবে টীকা-অংশে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন।

*

মনীষা ও মনসী (সংলাপ প্রকাশনী, কলকাতা ৩৯, তিন টাকা) অমিয় সরস্বতীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ যন্ত্রস্থ, এ ছাড়াও যন্ত্রস্থ দ্বিভাষিক একটি সংকলন ও পূর্ণাঙ্গ একটি, ইংরেজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থ। এত সব কাণ্ডকারখানার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, তাঁর এই বইটি মাত্রই ষোল পৃষ্ঠায় কবিতা নিয়ে কেন বেরুল?

কবিতা লেখার ব্যাপারটা কিছু সোজা করে নিয়েছেন অমিয় সরস্বতী। আলংকারিক

—সন্ধি করে 'মনাকাম' লিখতেও দ্বিধা নেই তাঁর। ফলে, ষোল পৃষ্ঠা অনায়াসেই ভরে গিয়েছে।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবিধ

ঐতিহাসিক। ত্রৈমাসিক, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক: অশীন দাশগুপ্ত, নিমাইসাধন বসু, অরুণকুমার দাশগুপ্ত। দাম: পাঁচ টাকা।

শুধু ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাকে স্বাগত জানাই। কতখানি দুঃসাহস এবং বক্তব্যের মেরুদণ্ডে বলিষ্ঠতা থাকলে ৬৪ পৃষ্ঠার চারটি প্রবন্ধের পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা রাখা যায়, ভেবে দেখবার। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের এই পত্রিকাটি বিশেষ উপকারে লাগবে। 'মালাবার ইন এশিয়ান ট্রেড' ইংরেজী গ্রন্থের লেখক অশীন দাশগুপ্তের বণিক ও সৈনিক প্রবন্ধটি সুরাট বন্দর ও কালিকট বন্দরের ভেঙে পড়ার ইতিহাস বিধৃত করে একটি অনিবার্য পরিণতিকে প্রমাণ করতে পেরেছেন—ইংরেজরা যেখানে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়েছে তৎক্ষণাৎ সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে একচেটিয়া বাণিজ্যের কাঠামো তৈরি করেছে। অসংখ্য সূত্রনির্দেশ উল্লেখ করে শ্যামলী সুর 'বাঙালীর ইতিহাসচর্চার কয়েকটি দিক' প্রবন্ধে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে এক ধরনের স্বাজাত্যবোধ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তা যথাযথভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সেই প্রচেষ্টা পুরোপুরি সার্থক হয়েছে। এ ছাড়া 'চব্বিশ পরগনার লবণ শিল্প ও মলঙ্গী শোধন ও ইঙ্গ-ভুটান সম্পর্ক প্রসঙ্গে দুটি দলিল' প্রবন্ধ দুটিও তথ্য-নির্ভর এবং সুলিখিত।

অন্বিষ্ট (অষ্টাদশ সংকলন)। সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯।১।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন। কলকাতা ৩। ৩ টাকা।

এই ত্রৈমাসিকটিকে কেন্দ্র করে যে পরিকল্পনাটি রূপ পরিগ্রহ করেছে তা প্রশংসার্হ। এই সংখ্যাটির লেখকবৃন্দ লীলা রায়, সুকুমার ঘোষ, অতীন্দ্র পাঠক, পুণ্যশ্লোক রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রবাল দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভাষা, শব্দ, বাংলা ব্যাকরণ, ভারতীয় সঙ্গীতে শব্দতত্ত্ব ও দর্শনচিন্তা ইত্যাদি প্রভৃতি রচনাই নির্বাচনেহে

খেলার মাঠে

ইংলণ্ড দলে অনেকে উপেক্ষিত

ভারত, শ্রীলংকা ও অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ইংলণ্ডের নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমরা আবার সেই ৭ জনকে দেখতে পাব যারা ৪ বছর আগে এম সি সি দলের সঙ্গে ভারতে এসেছিল। বাকি ৯টি নতুন মুখ।

দলটি কত শক্তিশালী এখন বলা সম্ভব নয়। তবে আন্দাজ করা যেতে পারে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দল গড়া হয়েছে। ক্রিকেট লিখিয়ে এবং প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সতর্কবাণীও ছিল—ভারতে যেন দুর্বল দল পাঠানো না হয়। কারণ ভারতে দ্বিতীয় পর্যায়ের দল পাঠাবার দিন শেষ হয়ে গেছে। প্রাক্তন অধিনায়ক টনি লুইস ইংলণ্ডের নির্বাচকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভারতে বিগত পাঁচটি সফরে ইংলণ্ড জিতেছে মাত্র চারটি টেস্ট। তাছাড়া যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ইংলণ্ড ৩—০ সিরিজ হেরেছে সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজকেই হারাবার শক্তি দেখিয়েছে ভারতীয়রা ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই মাঠে।

অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তারুণ্যের উপর জোর দিয়ে দল গড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যে ২১ জনকে টেস্ট খেলিয়েছিল তাদের মধ্যে ১১ জনই দলে নেই। উল্লেখযোগ্য নাম ডেভিড স্টিল, জন এডরিচ, ব্রায়ান ক্লোজ, জন স্নো, ব্যারী উড, ফ্রাঙ্ক হেজ, প্যাট পোকক, মাইক হেণ্ড্রিক ও অ্যালান ওয়ার্ড।

স্টিল গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অসাধারণ খেলেছিল। ওর বীরোচিত ব্যাটিংয়ের জন্যই "স্পোর্টসম্যান অফ দি ইয়ার"-এর সম্মান পেয়েছিল। এ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি সেঞ্চুরি সহ করেছে ৩০৮ রান। ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রান স্টিলেরই। সেই স্টিলকে বাদ দেওয়া রীতিমত বিস্ময়কর। ফাস্ট বোলার হিসাবে স্নো এখনও ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পেয়েছে ১৫টি উইকেট, ২৮·২০ গড়ে। সুতরাং স্নোকে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণও অজ্ঞাত। প্রাক্তন অধিনায়ক ক্লোজ বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ব্যাটিং অ্যাভারেজে তৃতীয় স্থানে আছেন, অপর বর্ষীয়ান খেলোয়াড় এডরিচ আছেন দ্বিতীয়

তারুণ্যের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। তবু বলতে দ্বিধা নেই, বেশ কয়েকজনই উপেক্ষিত।

ভারতের স্পিন বোলারদের বিরুদ্ধে এরা কতখানি সফল হবে বা ইংল্যাণ্ডের পেস বোলাররা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কতখানি বেগ দিতে পারবে তা দেখার জন্য শীত মরসুম পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পাঁচটি টেস্ট সহ মোট ১৩টি ম্যাচ খেলার জন্য ইংলণ্ড দল ২৫ নভেম্বর ভারতে এসে পৌঁছবে।

নীচে নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হল।

টনি গ্রীগ (অধিনায়ক), মাইক ব্রিয়ারলি (সহ অধিনায়ক), ডেনিস অ্যামিস, গ্রাহাম বার্লো, জিওফ কোপ, কিথ ফ্লেচার, অ্যালান নট, জন লিভার, জিওফ মিলার, ক্রিস ওল্ড, ডেরেক র‍্যানডাল, মাইক সেলভি, রজার টলচার্ড, ডেরেক আণ্ডারউড, বব উইলিস ও বব উলমার।

বরদলুইয়ে মোহনবাগানের হ্যাট্রিক

কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব বরদলুই ট্রফি ফুটবলে হ্যাট্রিক করেছে উপর্যুপরি তিন বছর জয়ের সুবাদে। এবার ছিল বরদলুই ট্রফির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান। এর আগে কোন দলই টানা তিন বছর এই ট্রফি জয় করতে পারেনি।

মোহনবাগান ফাইনালে পরাজিত করে গোয়া একাদশকে ৩—০ গোলে। তার আগে আসাম পুলিসকে ১—০ গোলে, বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ৩—০ গোলে এবং কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাবকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। গোয়া একাদশ ফাইনালে ওঠে পর পর এরিয়ানকে ২—০, নাগাল্যাণ্ড পুলিসকে ৩—০ ও আসাম পুলিসকে ২—১ গোলে হারিয়ে। প্রতিযোগিতার মোট চারটি খেলার মোহনবাগান গোল করেছে ১১টি, একটিও গোল খায়নি। নিষ্কলঙ্ক রেকর্ড বলা যেতে পারে। চারটি খেলার মধ্যে মোহনবাগান শুধু বেগ পেয়েছে প্রথম খেলায় আসাম পুলিসকে হারাতে।

আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতিতে আয়োজিত বরদলুই ট্রফি আসামের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাইরের দলগুলির অংশ গ্রহণের সুবাদে বলা যেতে পারে ক্রমেই প্রতিযোগিতার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সেই সঙ্গে ফুটবলেও আসাম অনেকখানি এগিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে কেন দিল্লি, গোয়া, বোম্বাইয়ের দল কলকাতার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে গৌহাটিতে খেলার আগ্রহ দেখাচ্ছে আর কলকাতায় আই এফ এ শীল্ড খেলতে অনীহা প্রকাশ করছে? একটি কারণ বোধহয় বরদলুই ট্রফির উদ্যোক্তারা বাইরের দলগুলিকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ মান্ধাতার নিয়মই বজায় রেখেছেন। বাড়তি সুযোগ দিতে নারাজ। তাই এখন আই এফ এ শীল্ডের চেয়ে ভারতের অনেক প্রতিযোগিতারই আকর্ষণ বেশি। একটি বাবসায়িক সংস্থার ফুটবল প্রতিযোগিতা ডি সি এম ট্রফিতেই খেলতে আসছে তিনটি বিদেশী দল।

গঙ্গাবক্ষে সাঁতার

মুর্শিদাবাদ গঙ্গাবক্ষের সাঁতার বাংলার এক বিশেষ ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের কাছে এক বার্ষিক উৎসব। একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি প্রতিযোগিতা। সর্বসাধারণ প্রতিযোগীর জন্য ৭৪ কিলোমিটার, জুনিয়র সাঁতারুদের জন্য ১৯ কিলোমিটার এবং শুধু মেয়ে প্রতিযোগিনীদের জন্য ১১ কিলোমিটার হচ্ছে প্রতিযোগিতার পাল্লা পথ। বিভিন্ন সময়ে প্রথম দুটি প্রতিযোগিতা শুরু হয় জঙ্গীপুর সদরঘাট থেকে, মেয়েদের প্রতিযোগিতা শুরু হয় লালবাগ হাজারদুয়ারি ঘাট থেকে। সমাপ্তি ঘটে বহরমপুর গোরাবাজারে। সাঁতারের দিন সকাল থেকেই দেখা যায় জঙ্গীপুর থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীরে শুধু মানুষের মাথা। এই বার্ষিক উৎসবে অসাধারণ তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা। পরিচালক সংস্থা মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ৩২ বছর আগে ১৯৪৪ সালে গঙ্গাবক্ষে এই দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এবার হয়ে গেল ৩৩তম প্রতিযোগিতা। উদ্যোক্তাদের দাবি, ৭৪ কিলোমিটার সাঁতার পৃথিবীর দীর্ঘতম পাল্লা। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত দীর্ঘ-পাল্লার প্রতিযোগিতা থাকলেও সাংগঠনিক নিয়মে তার স্বীকৃতি নেই।

প্রায় ৬০।৭০ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে একই দিনে এই ধরনের তিনটি প্রতিযোগিতার আয়োজন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে শেষ করাও একটি সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ।

গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই তিনটি প্রতিযোগিতায় ফল নীচে দেওয়া হল।

৭৪ কিলোমিটারে—প্রথম খগেন দত্ত (ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস) সময় ১০ ঘঃ ১২ মিঃ ৩০ সেঃ, দ্বিতীয় সহদেব দাস (চুঁচুড়া স্পোর্টিং) সময় ১০ ঘঃ ১৯ মিঃ ৪০ সেঃ, তৃতীয়—অঞ্জন মজুমদার (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি) সময় ১০ ঘঃ ২৪ মিঃ ৩২ সেঃ।

১৯ কিলোমিটারে—প্রথম—রতন বণিক (আগরতলা রামঠাকুর কলেজ) সময় ২ ঘঃ ১১ মিঃ ৫৭ সেঃ, দ্বিতীয়—অনুপ সরকার (মুর্শিদাবাদ) সময় ২ ঘঃ ১২ মিঃ ২৭ সেঃ, তৃতীয়—পঞ্চানন ঘোষ (বহরমপুর বিবেকানন্দ কলেজ) সময় ২ ঘঃ ১৩ মিঃ ৪৭ সেঃ।

মেয়েদের ১১ কিলোমিটারে—প্রথম—সুচিত্রা সরকার (সোনামুড়া সুইমিং ক্লাব) সময় ১ ঘঃ ২৮ মিঃ ৩৫ সেঃ, দ্বিতীয়—রুণা ব্যানার্জি (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি) সময়—১ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৪১ সেঃ, তৃতীয়—যূথিকা পাল (ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি) সময়—১ ঘঃ ৩৫ মিঃ ১০ সেঃ।

উল্লেখ্য সর্বসাধারণের ৭৪ কিলোমিটারে একটি মেয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে ১৯ জন পুরুষ সাঁতারুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মেয়েটির নাম রেখা ঠাকুর। ওয়াই এম সি এ কলেজ ব্রাঞ্চের সদস্যা। রেখা অবশ্য কোন স্থান দখল করতে পারেনি। কিন্তু যে সাঁতারে ৯ জন পুরুষ মাঝপথে অবসর নিতে বাধ্য হয় সেখানে ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট অবিরাম সাঁতার কেটে পাল্লা পথ অতিক্রম করা একটি মেয়ের পক্ষে নতুন নজির।

একলব্য

পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম মানব

অলিম্পিকের যে কোন ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয় করলেই রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি। তার মধ্যে আবার কতগুলি ইভেন্টে স্বর্ণ জয়ীর বিশেষ মর্যাদা। যেমন ডেকাথলন, পেণ্টাথলন, ম্যারাথন প্রভৃতি।

কিন্তু সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম সময়ের প্রতিযোগিতাতেই সবচেয়ে চমক এবং রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। এই ইভেন্টে জয়ীর মর্যাদাও অপরিসীম। সোনার সঙ্গে শিরোপা—"ফাস্টেস্ট হিউম্যান অফ দি ওয়ার্লড।" অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম মানব।

কারো হয়তো বুঝতে বাকি নেই, আমি ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার কথাই বলছি। এবার মন্ট্রিল অলিম্পিকে এই ইভেন্ট জিতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ২৪ বছর বয়সী দৌড়বীর হেসলী ক্রফোর্ড বিশ্বের ক্ষিপ্রতম মানবের সম্মান শুধু পেয়েছেই, সেই সঙ্গে দেশের হয়েও সৃষ্টি করেছে এক নতুন নজির। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর আর কোন প্রতিযোগী আগে অলিম্পিকে সোনা পায়নি। এবারও ক্রফোর্ড ছাড়া আর কেউ না। ক্রফোর্ডই প্রথম তার নিজের দেশে একটি অলিম্পিক পদক নিয়ে গেল।

১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতাকে বলা হয় এক্সপ্লোসিভ ইভেন্ট। কেননা গতির পাল্লায় থাকে বিস্ফোরণের বৈচিত্র্য। আর একটি কারণে এই ইভেন্ট মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। কারণটি হচ্ছে ১০০ মিটারের সোনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। মন্ট্রিলে একুশতম অলিম্পিক হয়ে গেলেও আসলে ওটি অলিম্পিকের ১৮তম আসর। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তিনবার অলিম্পিক খেলাধুলো হয়নি। ১৮টি অলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড়ের ১২টি স্বর্ণপদক গিয়েছে মার্কিন মুলুকে, ৬টি অন্য দেশে। গতবার পেয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের ভ্যালেরি বরজোভ, এবার পেয়েছে ত্রিনিদাদের হেসলী ক্রফোর্ড। এটা মার্কিন মর্যাদায় এক বড় আঘাত।

দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় শরীরের শক্তি ও গতি নিওড়ে ১০০ মিটারের সোনা জিততে হয়। অবশ্য সব ইভেন্ট সম্পর্কেই এ কথা খাটে। তবু ১০০ মিটার দৌড়ের সঙ্গে অন্য ইভেন্টের পার্থক্য, স্বল্প পাল্লায় এই প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয় সময়ের সূক্ষ্মাতিতম ভগ্নাংশের ব্যবধানে। এবং এই ইভেন্টে সময়ের উন্নতিও পল অনুপলে।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৩২ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ১০০ মিটারের সোনা জিতেছিল যুক্তরাষ্ট্রের এডি টোলান ১০·৩ সেকেন্ড সময়ে। এই সময় কমাতে পৃথিবীর ২৮ বছর কেটে যায়। অর্থাৎ ১৯৩২-এর পর ১৯৬০এ রোম অলিম্পিকে পশ্চিম জার্মানীর আর্মিন হ্যারী ১০·২ সেকেন্ডে ১০০ মিটারের সোনা জেতে। তারপর বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুশীলন ও স্পোর্টস মেডিসিনের দৌলতে যুক্তরাষ্ট্রের বব হেজ টোকিও অলিম্পিকে পুরো ১০ সেকেন্ড সময় করে। মেক্সিকো অলিম্পিকে ৯·৯০ সেকেন্ড সময় করে মানব-রকেট নাম পরিগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রের জিম হাইন। ওই ৯·৯০

সেকেন্ড এখন ১০০ মিটারের বিশ্ব রেকর্ড। শুধু জিম হাইন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের কম করে ৭জন যুগ্মভাবে এই বিশ্ব রেকর্ডের দাবীদার। যে যুক্তরাষ্ট্র মানবদেহে রকেটের গতি সঞ্চার করেছে সেই যুক্তরাষ্ট্র এবার মন্ট্রিলে ১০০ মিটারে কোন পদকই পায়নি। এবং অ্যাথলেটিক বিশ্বের যে ধারণা ছিল বরজোভ এবারও সোনা জিতে অলিম্পিকে নতুন নজির সৃষ্টি করবে সে ধারণাও ভেঙে দিয়েছে হেসলী ক্রফোর্ড। আজ পর্যন্ত কোন দৌড়বীর দুটি অলিম্পিকে ১০০ মিটারে জয়ী হয়নি।

কে জানে এই হেসলী ক্রফোর্ডই হতে পারত কিনা। ...

১০·১৪ সেকেন্ড সময়ে। ক্রফোর্ড দ্বিতীয় রাউন্ডের হিটে সময় করেছিল ১০·১৮। সেমি ফাইনালে পায়ের পেশীতে টান ধরা সত্ত্বেও সময় করেছিল ১০·৩৬। বরজোভ প্রথম ফিতে ছিঁড়েছে দেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মরণ দৌড় দিয়েছিল। হতাশায় মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে পাল্লা শেষ করেই লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। তবু সেমি ফাইনালে দ্বিতীয়। ফাইনালে মিটার দশেক এগোবার পর ওই পেশী সংকোচনে আবার লুটিয়ে পড়েছিল।

অলিম্পিক সোনা জয়ের স্বপ্ন ওর ষোলো বছর বয়স থেকে। মিউনিখে বিপর্যয়ের পর পুরো দুটি বছর অনুশীলন করতে পারেনি পায়ে চোটের ফলে। স্বপ্ন কিন্তু দেখেছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

জন্মেছিল সান ফার্নান্দোর এক দরিদ্র পরিবারে। মা-বাবার ১১টি সন্তানের অন্যতম। দু বেলা অন্ন জুটতো না। রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে দৌড়তো এক টুকরো মিছরির লোভে। নিয়ম ছিল, যে প্রথম হবে সেই শুধু মিছরির টুকরো পাবে। ক্রফোর্ডই প্রতি দৌড়ে প্রথম হত আর মিছরি পেত। ট্র্যাকে দৌড় শুরু করে ১৬ বছর বয়সে। স্পাইকওয়ালা দৌড়ের সু ছিল না। এক অ্যাথলীটের ছেঁড়া রানিং সু চেয়ে নিয়ে দৌড়তে শুরু করে। ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে ১৯৭০ সালে। এডিনবরার কমনওয়েলথ গেমসে ওর স্টেপিং দেখে এক অ্যাথলেটিক বিশেষজ্ঞ ইস্টার্ন মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে স্পোর্টস স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেন। সেখানেই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ। তারপর মিউনিখে ওই বিপর্যয়।

পেশায় ইণ্ডাসট্রিয়াল ডিজাইনার। যে সংস্থায় চাকরী করে সেই সংস্থার কাছে দু মাসের ছুটি চাইল মন্ট্রিল অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য। ছুটি মিলল। কিন্তু বিনা বেতনে। তাই সই। শুরু করল কঠিন অনুশীলন। মন্ট্রিলে এসেও ভয়ে ভয়ে সময় কাটিয়েছে, যদি ডান পায়ের পেশীতে আবার টান ধরে।

মন্ট্রিলে হেসলী ক্রফোর্ডের সময় অবশ্য ভাল হয়নি। সোনা জিতেছে ১০·০৬ সেকেন্ডে। হয়তো সময় আরও ভাল করতে পারত, যদি নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ পেত।

শুধু অ্যাথলেটিকসেই ওর দক্ষতা নয়। ভাল ফুটবল খেলোয়াড়ও। উত্তর আমেরিকায় পেশাদার ফুটবলার হবার জন্য মন্ট্রিলেই প্রস্তাব আসে। প্রচুর অর্থের প্রলোভনও। কিন্তু ক্রফোর্ড বলেছে, আমি ধনী হতে চাই না, সুখী হতে চাই। অলিম্পিকের সোনা জয়ের চেয়ে বড় সুখ আর কী আছে ...

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যে আতঙ্ক!

দৌড়ে পালা!

ওই আসছে··

ধরল!

খুড়ো, যা দেখলাম, তা সত্যি?

কে জানে, শয়তানদের কারসাজি কিনা!

খুব বেঁচে গেছি!

রাজা, আমি একটু ঘুরে আসছি। তোমরা শান্ত হয়ে থেকো!

ঠিক আছে!

নকল করতে ভুল করেছ···

সাইজ বড্ড বড় হয়ে গেছে··· রঙও ঠিক হয়নি···

যান্ত্রিক ত্রুটি!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন/প্রণয়পাশা/পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী ফটো : দেশ
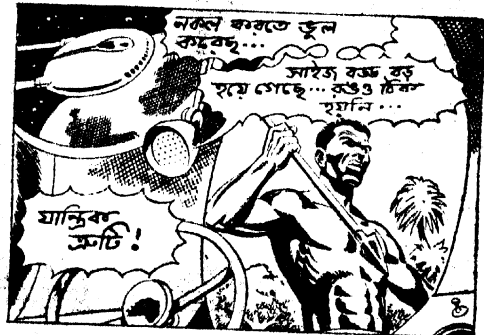
সংকোচ/সুযোগ ফিল্মস

শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' গল্পটি পড়েননি এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া ভার। সুতরাং ঐ উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি ংকোচ' ছবিটির সমালোচনায় গল্পের পাঠ ঢুকিয়ে নেয়ার াক্তি রইলো না। তবে যেহেতু এই উপন্যাসের আবেদন াধুনিক কালে কিছুটা জোলো, এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি র্বাগ্রে নিবেদন করছি যে 'সংকোচ'-এ পরিচালক অজিত াঙ্গুলী শরৎচন্দ্রকে ঢেলে সাজিয়েছেন। কিন্তু তাদ্রেও

িবিটি বিষয়ে-উৎসাহিত হওয়ার শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকে ।

আমার অবশ্য শরৎচন্দ্রের আধুনিকীকরণে কোনো াপত্তি নেই। ম্যারোউইটজ যদি 'হ্যামলেট' নিয়ে ছিনিমিনি লে 'সাহিত্যিক' পার পেয়ে যান, তাহলে সিনেমার জুহাতে 'পরিণীতা' গল্পটিকে কিছুটা পালটে নিলে াতারাত অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু আপত্তিটা আমাদের অন্য রণে। শরৎচন্দ্রের সব ওলোটপালোট সত্ত্বেও আমরা ংকোচ' দেখতে দেখতে প্রতি মুহূর্তে সিনেমা হিসেবেই রেফারেন্স-এ রসভঙ্গ হতো না। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ছবির মতই 'সংকোচ'-ও ছবির ভাষায় কথা বলতে অক্ষম। আর সে-জন্যেই আমাদের কাছে মূল গল্পের রসটিকে আধুনিক ব্যঞ্জনায় জ্বাল দিয়ে নেবার প্রচেষ্টাকে অর্থহীন মনে হয়। আসল কথাটা হল, শরৎচন্দ্রের এই আধুনিকী-করণের পিছনে কোনো ফিল্মিক তাগিদ কাজ করেনি। অশোককুমার-মীনাকুমারী অভিনীত বিমল রায়ের 'পরিণীতা' থেকে সরে আসার কোনো সহজতর উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি বলেই এই রস-পরিবর্তনের স্টানট।

ললিতা-শেখরের প্রেম 'সংকোচ'-এর অন্যতম বিষয়। মূল উপন্যাসে ললিতা-প্রসঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিটির (গিরীন) উচ্চারণ যদিও খুব অস্পষ্ট, তাতে গূঢ়তার আভাস আছে। ছবিতে ললিতা-শেখর-গিরিশ প্রায় একটি আধুনিক ত্রিভুজ। ফলে ললিতার ভূমিকায় সুলক্ষণা পন্ডিত ও শেখরের ভূমিকায় জীতেন্দ্রর অভিনয়ে আধুনিক সিনেমাটিক প্রেমের ফরমুলাটা অনেকাংশে কাজে লেগে গেছে। এবং গিরিশের ভূমিকায় বিক্রম মূল উপন্যাসের সেনটিমেনট থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য প্রায় ভিলেন পর্যায়ের দ্বিতীয় নায়ক হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া পরিচালক আরো একটি টোপ ফেলেন অরুণা ইরাণী আর আই এস জোহরের অশ্লীল ভাঁড়ামি দিয়ে। মূল গল্পে যার কোনো আশ্রয় নেই। কিন্তু ঠিক কাদের জন্যে এই এনটারটেনমেনট-

জানেমন/নবকেতন ইণ্টারন্যাশনাল

অনেক ওপর থেকে তোলা একটি সুন্দর শহরের—ভেবে নেয়া যায় বম্বের—নৈশ দৃশ্য দিয়ে জানেমন ছবির শুরু। আকাশ থেকে রাতের শহর আমাদের এতোটাই ভালো লাগে যে আমরা একেবারে হলিউড স্টাইলের একটি জমজমাট ছবির দেখবো বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছে বসি। এবং ক্যামেরাম্যান ফালি মিস্ত্রিকে প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে মন উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তারপর গোটা ছবিতেই তিনি এমনি চমকে দেবার মত ফটোগ্রাফি একেবারে অসংলগ্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। যেমন সান্ধ্য মুহূর্তের নির্জন হাইওয়ের ছবি, দুটি গাঢ় বর্ণের সূর্যাস্ত দৃশ্য, আর দেবানন্দের একটি দৌড় দৃশ্যে হ্যাণ্ডহেল্ড ক্যামেরার মনোমুগ্ধকর ব্যবহার মনে রাখার মত। কিন্তু শুধুমাত্র সুন্দর ফটোগ্র্যাফি দিয়ে তো উত্তীর্ণ সিনেমা হয় না। আগাগোড়া পরিচালক চেতন আনন্দের চিত্রনাট্য এমনি অসংলগ্ন এবং উদ্ভট, ছবিটি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাই এমনি ছেঁড়া-ছেঁড়া,

অস্পষ্ট যে জানেমন সাবানের রঙীন ফেনার চেয়ে আর বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ করে রঙের ব্যবহার আমাদের চোখকে এত বেশি কষ্ট দেয় যে আর্ট ডিরেক্টর দেশাইয়ের কাছে আমাদের হাজার প্রশ্ন জমে ওঠে। আর স্মাগলার অজিতের পক্ষে কি লাল পাগড়ি আর হলদে স্যুট অত্যাই প্রয়োজনীয়? আর প্রেমনাথের পক্ষে হলদে রঙের লেজ আর রক্তবর্ণ ল্যাঙোট? আর ট্যাক্সি-ড্রাইভার দেবানন্দের জন্যে লাল ব্যানডলন পোলোনেক জার্সি? ছবিটির আগাগোড়া কোনো দৃশ্যের পরি-মণ্ডলই আমাদের কাছে বিশ্বাস্য নয়। তবে জানেমন-এর মত রঙীন ললিপপ্-এও হয়তো আর্ট আছে। আর তার জন্যে আর্ট ডিরেকটর দেশাইকে ধন্যবাদ।

এবার গল্পটা ছোটো কথায় সেরে নেয়ার পালা। গল্পের নায়িকা দুজন—দ্বৈত ভূমিকায় হেমা মালিনী। বলা বাহুল্য এ'রা হারিয়ে-যাওয়া দুই যমজ বোন। একজন অবস্থার চাপে স্মাগলার এবং বাইজী এবং প্রতিশোধে প্রতিশ্রুত। নাম রামকেলি। অন্য জন রামকেলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন দেবানন্দের সাহচর্যে। এদিকে রামকেলির সঙ্গে দেবানন্দের দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি প্রেমের সূচনা হয়। অর্থাৎ মধ্যিখানে ফুরন্ত দেবানন্দ আর দু-দিক থেকে দুই প্রেমের চুম্বক আকর্ষণ। এর ওপর আছে ভিলেনবেশি অজিতের চক্রান্ত আর বজরং-বলীর ভক্ত প্রেমনাথের অশ্লীল বক্তৃতা। কেমন করে মধুরেণ সমাপয়েৎ হল সে-কথা হিন্দি ছবির ফরমুলায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের বলে দেবার প্রয়োজন নেই। অভিনয়ের কথায় আসতে হয়, অজিত আর প্রেমনাথ অসহনীয়। হেমা মালিনীর হাসি বিদ্যুতের মত স্পর্শ করে। এবং এই জগঝম্পের মধ্যে দেবানন্দ তাঁর অচল মুদ্রাটি আরো একবার চালাতে চেষ্টা করে পারলেন না। নিঃসন্দেহে তাঁর দিক-পরিবর্তনের সময় এসেছে।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারে মুকেশ আমেরিকায় গেছলেন ডাক্তারের আজ্ঞা অমান্য করে। শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকারের সঙ্গে কানাডা আর যুক্ত-রাষ্ট্রের নানান শহরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। ২৮শে অগাস্ট গাইবার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রোয়েট শহরে। কিন্তু ফাংশান শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে মুকেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে একটি অ্যামবুলেন্স ছুটলো হসপিটাল-এর দিকে। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হবার আগেই সব শেষ হয়ে গেল মাত্র ৫৩ বছর বয়সে।

মুকেশ, মান্না দে আর মহম্মদ রফি প্লে-ব্যাক গায়ক হিসেবে প্রায় একই সঙ্গে

মুকেশ

নজর' ছবিতে 'দিল জলতা হ্যায় তো জলনে দে' গানটি গেয়ে মুকেশ প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। মুকেশ 'মালহার' ও 'অনুরাগ' বলে যে দুটি ছবি প্রযোজনা করেন সে দুটি ছবিই মার খায়। রাজ-কাপুরের প্লে-ব্যাক-এ মুকেশ সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ কাপুর বলেন, "আমি আমার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য হারালাম।' মুকেশ তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ৫ সপ্তাহ কাটিয়ে মান্না দে সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরলেন। সেখানে তিনি সবসুদ্ধ দশটি অনুষ্ঠান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গায়ক কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, এবং জয়শ্রী টি ও মীনা টি। মুকেশের মৃত্যুসংবাদ মান্না দেকে একটি সাক্ষাৎকারের সময় দেয়া হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লতাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে জানতে পারেন যে প্লেনে তাঁদের ফেরার কথা সেই প্লেনেই মুকেশের মৃতদেহ দেশে ফিরছে।

• • •

বোম্বাই দূরদর্শন কেন্দ্র চলচ্চিত্রের ৮০ বছর স্মরণ করে যে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন সেটি তেমন সুবিধের হয়নি। অনুষ্ঠানে প্রশ্নকর্তা ছিলেন প্রবীণ চলচ্চিত্র-সমালোচক শ্রীফিরোজ রেঙ্গুন-ওয়ালা—যিনি নিজেকে একজন চলচ্চিত্র-ঐতিহাসিক বলেও দাবী করেন। অন্য যে তিনজন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তাঁরা হলেন রিগ্যাল সিনেমার শ্রীটাটা, রয়েল অপেরা হাউসের শ্রীগিরিবরসিংজী এবং আমেরিকান চিত্র-পরিবেশক প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট ও ইউনিভার্সালের ভারতীয় শাখার ম্যানেজার শ্রীরামচন্দ্রন। এই অনুষ্ঠানে এ'দের অংশ গ্রহণের যোগ্যতা

১৯৩৭ সালে বিদেশী কোম্পানিতে চাকরির সূত্রে। শ্রীগিরিবরসিংজী ১৯৪৪-এর আগে চলচ্চিত্র নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। ওই সালে তিনি ব্যাঙ্গালোরে মর্নিং শো নিয়ে ছবির ব্যবসা শুরু করেন। আর শ্রীটাটার জন্মই তো ১৯৪০ সালে। এ'রা কি করে চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ হন বোঝা মুশকিল। ও'দের দু-একটি মন্তব্যের উদাহরণ দিই। শ্রীটাটা জানালেন যেহেতু তাঁর রিগ্যাল সিনেমা ভারতের সর্বপ্রথম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহ সেই হেতু তিনি গর্ববোধ করছেন। রয়েল অপেরা হাউসে উন্নত মানের ছবি দেখানো হচ্ছে। তাঁর আমলে—এটাই শ্রীগিরিবরসিংজীর গর্বের কারণ। আর শ্রীরামচন্দ্রন ভারতে আমেরিকান ছবির বাজার সুদৃঢ় করেছেন বলে বিশেষ আনন্দিত। উদাহরণস্বরূপ তিনি "সাইকো" ছবিতে যেভাবে বিজ্ঞাপন করেছিলেন সে কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর বিজ্ঞাপন ছিল, ছবি শুরু হবার পর কেউ হলে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমন কি ম্যানেজারের শ্যালক হলেও না। সেটাই নাকি ওই ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের অন্যতম কারণ।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ওই আলোচনা-চক্রে শান্তারামের প্রসঙ্গ উঠলই না। সত্যজিৎ রায়ের একটি ছবি চকিতদর্শনেই মিলিয়ে গেল। দাদাসাহেব ফলকে এডিটিং রুমে বসে কাজ করছেন—এই শটটির কথা অবশ্য বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়।

এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে যাঁরা আধখানা শতাব্দীর উপর জড়িত, এবং এখনও কর্মক্ষম তেমন অনেকের নাম হয়তো আপনার মনে আসতে পারে। যেমন অভিনেতা জয়রাজ, অভিনেত্রী ললিতা পাওয়ার, সুলোচনা (রুবী মায়ার্স), পরিচালক ভি শান্তারাম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ'দের কি শ্রীটাটা, শ্রীরামচন্দ্রন কিংবা শ্রীগিরিবরসিংজীর মত অত যোগ্যতা আছে নাকি? জয়রাজের কি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন জ্ঞান আছে? রুবী মায়ার্স কি অপেরা হাউসের অগ্রগতি সম্পর্কে সুচারু কথা বলতে পারবেন?

এদেশে এখনও এমন অনেকেই আছেন যাঁদের মনে চলচ্চিত্রের বহু পুরনো স্মৃতিই উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমি একজন প্রবীণা ভদ্রমহিলাকে জানি যিনি সত্তর বছর আগে ইংলণ্ডে তাঁর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারেন—যে যুগে ছোট ছোট নির্বাক ছবি দেখানোর সময় চিত্রগৃহে যন্ত্রসংগীত সহযোগে আবহ সৃষ্টি করা হত। এরকম আরও অনেকেই আছেন যাঁদের একটু চেষ্টা করলেই শ্রীরেঙ্গুনওয়ালা এবং দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ খুঁজে বার করতে

সেই সুরের কান্না

এমন আমন্ত্রণপত্র আর দেখিনি যা মুচিকেও আমন্ত্রণ করে। আর সমগ্র অনুষ্ঠানটি এই আমন্ত্রণলিপির সঙ্গে সমতা বজায় রেখেছে। তার জন্য আমরা অবশ্যই পুনরায় পরিকল্পক সুভাষ চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রায় একক প্রয়াসে 'ইন্দিরা'র প্রযোজনায় 'সানাই' গ্রন্থের বাইশটি কবিতা ও গানের এই অনুষ্ঠান ২৯ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে হয়েছিল।

'সানাই' যখন মুদ্রণস্থ তখন পর্বত-প্রবাসী কবির মনে হল যে, বইটি ক্ষীণকায় হবে। কয়েকটি গান তিনি কবিতায় রূপান্তরিত করলেন, একটি কবিতাকে গানে : 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে'। অনুষ্ঠানে সেই পাঠ আর গান তাই পাশা-পাশি ছিল। স্বভাবতই কবিতায় শব্দ

ইন্দিরা আয়োজিত অনুষ্ঠানের দৃশ্য ফটো : দেশ

স্পষ্টতা পায়, গানে সুরের প্রাবল্যে শব্দ তার স্বচ্ছতাকে হারায়। একথা সম্মেলক গানগুলি সম্বন্ধেই বেশী প্রযোজ্য। এই অনুষ্ঠানে সম্মেলক গানগুলির পরি-কল্পনাও ছিল চমকপ্রদ। আর একক গানে সুচিত্রা মিত্র ও শ্রীনন্দা চৌধুরীর মত শব্দোচ্চারণের প্রোজ্জ্বল রীতি কারও শুনিনি।

সুচিত্রা আবৃত্তিতেও প্রখর। 'ব্যথিতা' কবিতায় তাঁর পাঠ 'তামসী মসির তুলিকায়' বা 'বেদনার গুঞ্জন/সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো' এখনও মন্দ্রিত হতে থাকে। সমস্যাটা এইখানেই। কখনো মনে হয়, কবিতা বুঝি একটিমাত্র শব্দে গানকে পেরিয়ে গেল, আবার গান কখনো সুরের শরক্ষেপে কবিতার স্মৃতিকে আক্রমণ করে। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' কবিতাটি গানে (শ্রীনন্দা মল্লিক) 'বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে' গভীরতর হয়ে ওঠে। 'বাণীহারা' কবিতা (পাঠ : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) ভাটার স্রোতের মত ধীর পংক্তিতে যখন শেষ হয় সেখানে গান (সুপূর্ণা চৌধুরী) 'বিপুল অন্ধকার বাহি' পংক্তিটিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। 'পর্ণা' কবিতায় (পাঠ : সুপ্রিয় ঠাকুর) বিশদবিবৃত গোপন অশান্তিও 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' গানের (নীলিমা সেন) যন্ত্রণাকে স্পর্শই করে না। 'ছায়াছবি' (পাঠ : নীরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী) গানে সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে যায় 'প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ' (সুবিনয় রায়)। সেখানে সুর অবশ্য কিছু চাতুরী করে। আবার 'রূপণা' কবিতায় 'তব যৌবন-মাঝে লাবণ্য বিরাজে' এমনতর স্মরণীয় বাণী তার সহযোগী 'এসেছিনু দ্বারে তব' গানে নেই বলে কবিতা চকিতে সুরকেও পরাস্ত করে। তেমনি 'আসা-যাওয়া' কবিতাটি গানের চেয়েও স্পর্শকাতর; 'গোধূলি ধেয়ে' কবিতায় প্রকুঞ্চন করে কিন্তু সুরের জাদুতে সেই শব্দই তো কায়াহীন হয়ে যায়। হয়ে পড়ল সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে; তাঁর এই সমাপ্তি সংগীত যেন আরাধনার ঘণ্টা বাজিয়ে গেল।

এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকাটি সর্বদিক দিয়েই অতীব মূল্যবান। বিমলা-কান্ত রায়চৌধুরী আর বিশেষ করে, শঙ্খ ঘোষের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঈর্ষাযোগ্য। এবং বারে বারেই অবগাহনের।

—অপ্রাজিত বসু

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ইন্দ্রনীল

সেতার শিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের বাদন শৈলী বহুদিন ধরে রবিশঙ্করী ধাঁচের মধ্যে আটকে ছিল। সম্প্রতি এতে বেশ কিছু নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ঢঙের স্বরবিস্তার প্রণালীর সংযোজন হয়েছে। অন্তত আলি আকবর কলেজ আয়োজিত এক অনুষ্ঠান (অবনমহল, ২১শে অগাস্ট) শুনে তাই মনে হলো।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল রাগেশ্রী রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা দিয়ে ধীর, স্থির ও সুপরিকল্পিত স্বরবিস্তার দ্বারা শিল্পী এক আবেগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। ধ—গ সঙ্গতির বৈচিত্র্যময় প্রয়োগও উল্লেখ-যোগ্য। তবে গ ম র স পকড় আর একটু বেশী ব্যবহার হলে ভাল হত। জোড়ে সুর ও লয়ের যথাযথ মিশ্রণ ও বিস্তার অংশের কাজ শিল্পীর পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছিল।

মাঝ খম্বাজে বিলম্বিত গতের লয়কারি ও বিস্তারের বিষয়ে একই কথা বলা যায়। তবে দ্রুত গতে হঠাৎ রাগমালার কায়দায় তীব্র মধ্যম ও কোমল ধৈবত লাগানো ঠিক হয়নি।

তবলাবাদক শঙ্কর ঘোষ দক্ষতার সঙ্গে কায়দা ও রেলা বাজিয়েছিলেন কিন্তু
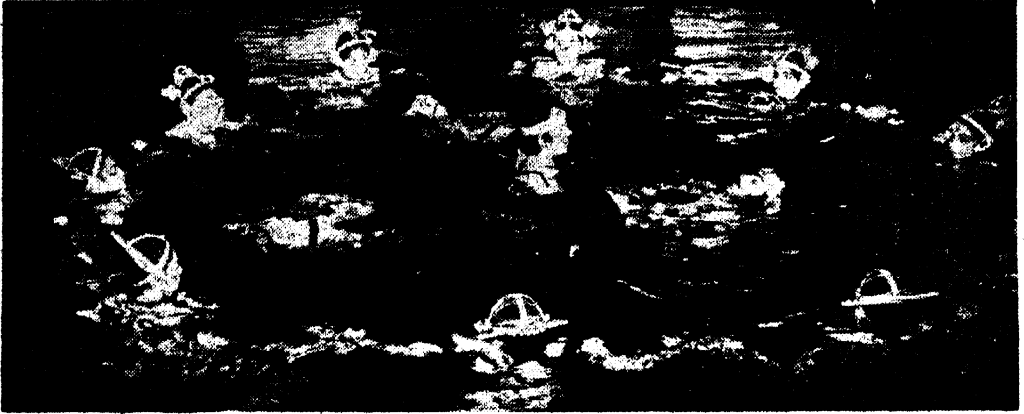
"তাসের দেশ" জলনাটিকার একটি দৃশ্য

ফটো : দেশ

কখনও সেতারীর লয়কারি বা তেহাইয়ের যথাযথ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেননি।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল রবিশঙ্কর সৃষ্ট গঙ্গেশ্বরী রাগে ধ্রুপক তাল নিবদ্ধ গত্ দিয়ে। রাগটি রবিশঙ্করের মতে সকালের এবং এর আরোহণ স গ ম প দ ণ স। কাজেই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এই রাগ বাজানো ঠিক হয়নি আর শিল্পী কেনই বা ম দ ণ স আরোহণ ব্যবহার করলেন ঠিক বোঝা গেল না।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে শঙ্কর ঘোষের কিশোর ছাত্র সুব্রত সারখেল এক মনোরম নিদর্শন রাখলেন তবলা লহরাতে। কায়দা, রেলা ও টুকরোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছিল। ধের-ধের কেটে বোলের ওপর দখলও প্রশংসনীয়।

ডাগর সঙ্গীত আশ্রমের অনুষ্ঠান

ওস্তাদ নাসির মইনুদ্দিন ডাগর ধ্রুপদ সঙ্গীত আশ্রমের এক বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৬ই অগাস্ট কলামন্দিরে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগরের গান। কিন্তু বক্তৃতা, মাল্যদান, সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা ও ছাত্র ছাত্রী-দের গানই বেশীর ভাগ সময় নিয়ে নিল। গাইতে বসে ওস্তাদ বললেন, যেহেতু পরের দিন ভোরে তাঁকে তেহেরাণ যেতে হবে, সেই কারণে তাঁর অনুষ্ঠান তিনি অতি সংক্ষেপে সারবেন। কাজেই দুর্লভ রাগ মীরাবাঈ কি মল্লারের চলনটুকুই দেখালেন ছোট্ট আওচারে। পরে এই রাগে ও মেঘ রাগে ধ্রুপদও গাইলেন নম নম করে। মায়া চট্টো-পাধ্যায়ের কথক নৃত্যই ছিল এই অনু-ষ্ঠানের একমাত্র উপভোগ্য ব্যাপার। দেব-শঙ্কর ত্রিবেদী মিয়ামল্লারে আলাপ ও ধ্রুপদ গেয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। —নীলাক্ষ গুপ্ত

বিবিধ

ক্রীড়াসরসীনীরে তাসের দেশ

তাসের দেশের রাজপুত্র অথবা তাস-বংশীয়রা এবার মঞ্চে ছিলেন না। ইনডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি সম্প্রতি এই নাটকটিকে সলিলস্থ করেছিলেন। অবশ্যই বলা দরকার, পরিচালনার (অরিজিৎ গুহ) গুণে সলিলসমাধি ঘটেনি।

সমস্ত নাটকটিকে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। সংলাপ ছিল নেপথ্যে উচ্চধ্বনি-সহযোগে, সুতরাং সেই পরিচিত প্রদীপ্ত বচন যথারীতি গোচরে এসেছে। শুধু দুই হাতের সঞ্চালনে, বুক চিৎ বা স্বচ্ছন্দ সাঁতারে এই নাট্যের কুশীলবরা যথাযোগ্য অভিনয় করতে চেয়েছেন। এই ধরনের একসপেরিমেন্টে কাহিনীর বাণী বা মেসেজ কিছুটা অপ্রকাশ থাকে, বহিরঙ্গ বড় হয়ে ওঠে। তবু এই প্রয়াস অভিনন্দনীয়। কারণটা আগেই বলেছি, অরিজিৎ গুহর সতর্ক আর শিল্পিত দৃষ্টি কাজ করেছে; সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল বর্ণাঢ্য। প্রকাশের চমৎকারিত্ব সর্বক্ষণই দৃষ্টিনন্দন হতে পেরেছে। বিশেষ কতকগুলি দৃশ্যে, যেমন রাজপুত্রের ভ্রমণতরীর চেহারা বা রাজসভার দৃশ্য অথবা তরীর ডুবে-যাওয়া ইত্যাকার ঘটনাগুলি এই ধরনের আঙ্গিকের একটি উত্তরণ বলা চলে। জলের স্বচ্ছতা আর তরঙ্গের মতোই তাসের দেশ অনায়াসে এখানে গতির সৌন্দর্য পেয়েছে। রাজপুত্রের ভূমিকায় মহিলা-শিল্পীর (মীনাক্ষী গোস্বামী) অবতরণ ভাল লাগেনি, তাঁর অভিনয় যথাযথ হলেও চেহারায় সেই তীক্ষ্ম রোমান্টিকতা ধরা পড়েনি। অথচ সওদাগরপুত্র (পরি বন্দ্যোপাধ্যায়) বেশ মনোগ্রাহী, বিশেষত তাঁর 'হ্যাঁচ্ছো' গানের সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন জলকে চমকপ্রদভাবে কাজে লাগিয়েছিল। হরতনি (শ্রীপর্ণা) রাজাসাহেব (অভিজিৎ সরকার) গোলাম ((সুদর্শন রায়) রানীমা (সুচেতা ঘোষ) বিশেষ প্রশংসনীয়।

আবহসংগীত (পরিচালনা : দীনেশ চন্দ্র) বড় বেশি উচ্চকণ্ঠ এবং প্রায়ই কর্ণপীড়ক। হরতনির গান (গীতা ঘটক) কণ্ঠসম্পদে ভাল লাগে, আবার আওরাজটি স্মরণীয় হলেও রাজপুত্রের গান (অর্ঘ সেন) কেন যে মাঝে মাঝেই তালছাড়া বা আড়ে গাওয়া হবে বুঝি না। এই অতি-নাটকীয় প্রলোভনেই 'যাবই আমি যাবই' গানের মধ্যে চকিতে "ঝর বায়ু" প্রবেশ করেছে। ভাষাপাঠ সুখশ্রাব্য। কণিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত নাট্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। রূপসজ্জা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য।

—অপ্রতিম বসু

নাটক

উইল শেকসপীয়র বর্তিক

কারো কারো জীবনটাই নাটক। উই-লিয়াম শেকসপীয়রের জীবন সেই বিরল প্রতিভার সমগোত্রীয়। খৃষ্ট ট্রাজেডি থেকে হয়ত তাঁর নিজের জীবনের বিয়োগান্ত অধ্যায় মহত্তর, যেখানে তিনি স্বয়ং নায়ক। চারশ বছর অতিক্রান্ত, তবু শেকসপীয়র-চর্চা বারেবারেই নতুন, ফিরে ফিরেই নতুন।

নাটকীয় ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে সার্থক নাটক রচনার নজির খুব কম। অনেকে নাটককে শুধুই দলিল করে তোলেন, কেউ বা কল্পনার আবর্তে ইতিহাসের জল ঘোলা করেই ক্লান্ত হন। জীবনী-নাট্যকারকে একই

সঙ্গে 'নর্ম' হয়ে যাছাই করতে হয়। আবার সহৃদয় অনুভূতি নিয়ে চরিত্রের বর্ণবিন্যাস করতে হয়। একালের বাংলা থিয়েটারে মোহিত চট্টোপাধ্যায় সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যাঁর মধ্যে 'কবিত্ব' ও গৃহিণীপনা'র স্বাগত সমন্বয়। সার্থক নাটকেরও অহল্যাপ্রতীক্ষা করতে হয়, নিপুণ প্রযোজকের দরদী স্পর্শে প্রাণ পাওয়ার জন্য। গত দশ পনের বছর ধরে 'ক্লমেন্স ডেইনের' এই মূল নাটকটি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকর্মীরা আগ্রহী। নাটকটি দুইবার রূপান্তরিত হয়েছে এবং এই নিয়ে তৃতীয় একটি দল নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন।

যাঁদের নাট্যভাবনা আমাদের আশাবাদী করে তুলেছিল ঠিক এই মুহূর্তে তাঁদের অনেকেই নিস্পৃহ অথবা নিষ্ক্রিয় (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সে একেবারেই আক্ষরিক অর্থে ব্যতিক্রম) ঠিক তখনই একটি দল মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'উইল শেকসপীয়র' মঞ্চস্থ করে আবার আমাদের আশান্বিত করলেন—দিন ফুরোয়নি। ও'রা এলেন, দেখালেন, জয় করলেন। ও'রা এলেন জামশেদপুর থেকে দেখালেন আকাদেমী মঞ্চে, জয় করলেন উপস্থিত কলকাতার নাট্যামোদীদের অকৃপণ প্রশংসা। অসম্ভব পরিশীলিত অভিনয় সব কিছু নিখুঁত মাপের। এক কথায় 'ডিরেকটারস থিয়েটার'। সংলাপের প্রতিটি শব্দই স্পষ্ট উচ্চারিত, প্রতিটি অভিপ্রেত মুহূর্ত নির্দেশকের আয়ত্তাধীন, কোনোটিকেই তাঁর ধ্যান অনুযায়ী হারাতে দেননি। সাম্প্রতিক কালে এরকম পরিচ্ছন্ন 'টীমওয়ারক' বিরল-দৃষ্ট। অভিনয়ে অমর লালা, নীলু চক্রবর্তী, রমা চক্রবর্তী শিখা গুহ প্রমুখ সকলেই একতারে বাঁধা। বিশেষত প্রদীপ চক্রবর্তী, মালা ঘোষের চমকপ্রদ অভিনয়, বহুদিন ভোলা যাবে না। এঁরা প্রত্যেকেই সংলাপের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন, এমনকি কয়েক জায়গায় ছন্দোবদ্ধ কবিতার মত আমেজটুকু পর্যন্ত দিয়েছেন। ইস্পাত নগরীর এই গোষ্ঠী প্রমাণ করলেন ইস্পাত সম্পর্কে 'ধ্বংস বিকটদন্ত' কথাটাই শেষ কথা নয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় একটি জাদু (খারাপ অর্থে) আছে। এই সংলাপের জাদু গভীর রাতে বৃষ্টি-ধারায় শব্দের মত দর্শক ও শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে। এই আচ্ছন্নতায় নির্দেশক প্রদীপ চক্রবর্তীও আক্রান্ত। তিনি সব সময় সংলাপে এত মগ্ন-চেতনা যে অন্যদিকে তাঁর নজর কম। মঞ্চ খুবই সহজ সরল। এলিজাবেথের প্রাসাদে যখন একটি প্রতীক ব্যবহৃত হল, তখন অন্য দৃশ্যে প্রতীক ব্যবহারে ক্ষতি কি ছিল? পাত্র-পাত্রীরা প্রায়শই এক লাইনে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলেন, মঞ্চের বিভিন্ন স্তর অব্যবহৃত থাকায় ডাইমেনশন আনে না। আলো শুধু আলোকিতই করে, ছায়ারও যে আলাদা একটি মায়া আছে সেটি অনাস্বাদিত। এ নাটকে আবহের একটি বিশেষ ভূমিকা। কিন্তু সে শুধু ব্যবহৃত স্থগিত মুহূর্তে। সামান্য একটু সময় বেজেই সংলাপের সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেছে। কোন ঝুঁকি নেওয়া হয়নি, পাছে সংলাপ মারা যায়। অথচ যে দৃশ্যে রোমিও জুলিয়েট অভিনীত হচ্ছে, সেখানে স্টেজের বিভিন্ন শব্দ কি অদ্ভুত ভাবে প্রাণবন্ত করতে পারত। প্রচণ্ড করতালি কি শুধুই উল্লাস? মোহিনী মায়ার কাছে যখন অদেখা, অসহায় আত্মজ পরাভব মানে, তখন সেই করতালি অদৃষ্টের নিদারুণ ব্যর্থ পরিহাস হিসাবে বধির করতে পারত। সরাইখানার হল্লার মাঝখানে যে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হল, সেখানে বীভৎস উল্লাস বিষাদকে গাঢ়তর করতে পারত। ওই দৃশ্যের ঝড় কি শুধু বাইরের? এই সংলাপ-নির্ভর হওয়ার জন্যই প্রথম দৃশ্য যে তুঙ্গে ওঠে পরবর্তী দৃশ্যে সে চমক অনেকখানি ম্লান। এই নাটকের পোশাকের বর্ণ-বিন্যাসে চিন্তা-শক্তির পরিচয় আছে। ঘটনাক্রমের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের পোশাকের রং বদল হতে থাকে একমাত্র হেনসলো ছাড়া। কারণ নাটকে হেনসলোর ভূমিকায় কোন বদল হয় না। পোশাক নিয়ে চিন্তা করার সুবি হয় এই যে, পোশাক সংলাপে বা করে না। তবু এতে কিছু আসে কারণ প্রযোজনার মেরুদণ্ড ন অভিনয়। বর্তিক সে সম্পদে রূপান্তরিত নাটক হওয়া সত্ত্বেও স্বমহিম।

জামশেদপুরের এই দল যা কলকাতায় এলে আমরা বুঝতে আমাদের নাট্য-চিন্তা ভৌগলিব অতিক্রম করতে পারছে। আর তৈরী মাঠে তাঁরা খেলে গেলে ত গৌরব। একথা নির্দ্বিধায় বল পরিশ্রম ও আন্তরিক শিল্প-সাধন এক নাম বর্তিক।

—দেবাশিস দ

নজরুল ও মুকেশ স্মরণে

পরলোকগত কাজী নজরুল এবং চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট নেপথ মুকেশের স্মরণে গ্রামোফোন কোম্পা ইনডিয়া লিমিটেড দুটি শো আয়োজন করেন গত ৩০ আগস্ট ত সভায় নজরুলের জাতীয় চেত গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক তাঁর গান এবং অন্যান্য রচনা বিস্তৃ প্রকাশ করার একটি প্রস্তাব সভায় হয়। ওই সভায় মুকেশের অ মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হ 'তুলসী রামায়ণ' পর্যায়ের গানগুলি বাসী দীর্ঘকাল স্মরণে রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। গ্রা কোম্পানির পক্ষ থেকে ম্যানেজিং শ্রীসুদ ওই দুই স্বর্গত শিল্পীর প বর্গের প্রতি সমবেদনা জানান।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
[illegible]
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমা
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১ টা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪ টা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	x
আমাদের লন্ডন অফিস মারফতে	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩ টা

[illegible]

আমার
5 স্টারে ভাগ বসাবে ?
কলা পাবে !

বম্বের ডাইং
পোশাকে
মুখোমুখি
এসে তুমি
দাও ভরি
পুলকে
কাপিতান পলিয়েস্টার শার্টিং
ওয়াড্রীন পলিয়েস্টার স্যুটিং
বম্বে ডাইং